সচিত্র

মাসিক বসুমতী

২২শ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৫০ সাল—বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

স্থাপিত ১২৮৭ সাল

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে'
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাসিক

বসুমতী

সম্পাদক
শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূচী

২২শ বর্ষ] ১৩৫০ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম সংখ্যা

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

কবিতা :—

অশ্রু-অর্ঘ্য :—

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য :—

ছোটদের আসর :—

আলোচনা :—

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

চিত্রসূচী — বিষয়ানুক্রমিক

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক চিত্র-সূচী

সচিত্র

মাসিক বসুমতী

২২শ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৫০ সাল—বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত)

সম্পাদক
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী সাহিত্য মন্দির
স্থাপিত
১২৮৭ সাল

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে'
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাসিক বসুমতী

সম্পাদক
শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূচী

২২শ বর্ষ] ১৩৫০ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম সংখ্যা

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্র — পত্রাঙ্ক

দেশ-বিদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য :—

প্রসাধন ও শক্তি-সাধনার চিত্র :—

সাহিত্য চিত্রালঙ্কার :—

চিত্র — পত্রাঙ্ক

বৈজ্ঞানিক চিত্র :—

দেশ-বিদেশের পশু-পক্ষী :—

জাপান

মিনিয়াকোঙ্কা

সৌর জগতের চিত্র :—

শিল্প-চিত্র :—

বৈদেশিক রাষ্ট্রনায়কদিগের চিত্র :—

ব্যঙ্গ চিত্র :—

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক চিত্র-সূচী

সচিত্র
মাসিক বসুমতী
২২শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৫০ | ১ম সংখ্যা

সন্ধি

ঝোড়ো ঝড়-বৃষ্টির পর পৃথিবীর বুকে যেমন স্তব্ধতা দেখা যায়···যে-স্তব্ধতায় মনে হয়, ঝড়-বৃষ্টির বিপর্য্যয়ের মধ্যে বুকের কতখানি ঝরিয়া গেল, কতটুকু বা রহিল, পৃথিবী যেন দেখিয়া বুঝিয়া লইতেছে,—ঘরের মধ্যে ঠিক তেমনি স্তব্ধতা !

স্বামী অনিল। স্ত্রী মায়া। একটু আগে দু'জনে খুব-খানিক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে ! রূঢ় তীব্র বচনের শরক্ষেপে দু'পক্ষের কেহ মমতা-ভরে কাহাকেও এতটুকু ছাড়িয়া দেয় নাই ! এখন যুদ্ধশেষে সুগভীর ক্লান্তি-ভারে দু'জনেই নির্ব্বাক্। খোলা জানলা দিয়া চাঁদ ভয়ে-ভয়ে ঘরের মধ্যে মলিন জ্যোৎস্নার দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে আসিয়াছে, দু'জনের বুক কতখানি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেছে !

অনিল চাহিয়াছিল ঘরের কোণে—টুলের উপর সদ্য-আনা টেবল-ক্লথের প্যাকেটটার পানে। মায়া চাহিয়াছিল খোলা জানলা দিয়া বাহিরে আকাশের দিকে···দু'জনের মনের মধ্যে কত-কি ছত্রাকার হইয়া আছে !

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অনিল প্রথমে কহিল। বলিল,—শুনচো ?

মায়া চাহিল অনিলের পানে।

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সে-আলোয় অনিল দেখিল, মায়ার দু'চোখ অপরাধের গ্লানিতে ভরিয়া মলিন ! অনিল মায়ার কাছে সরিয়া আসিল। মায়ার একখানি হাত নিজের হাতে লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল,—আমায় মাপ করো মায়া ! যা-যা বলেছি, ভুলে যেয়ো। মনে রেখো না।

মায়ার চোখের পিছনে একরাশ অশ্রু কখন আসিয়া স্তম্ভিত দাঁড়াইয়াছিল, মায়া জানে না। এখন অনিলের কথায় দু'চোখ ঠেলিয়া সে-অশ্রু একেবারে হু-হু করিয়া ঝরিয়া পড়িল। মায়া নিজেকে খাড়া রাখিতে পারিল না···ভাঙ্গিয়া গলিয়া অনিলের বুকে মুখ গুঁজিয়া বলিল,—আমারই অন্যায়, তুমি আমাকে মাপ করো।

অনিল বলিল—না, না মায়া···অন্যায় আমার। তুমি···মানে, সারা দিন খেটে-খুটে পাঁচটা কাজে মন আমার যেন মরে থাকে ! বুদ্ধি লোপ পায় !···তোমাকে যা বলেছি, তা রাগের মুখে···সে শুধু মুখের কথা···মনের কথা নয় !

মায়া মুখ তুলিল না ; অনিলের বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল—আমার দোষ ! আমার সুখের জন্য কি না তুমি করচো, অথচ আমি তোমাকে কি-কথাই না বলি !

অনিল বলিল—যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ হবে না। আমি জানি, তুমি আমায় যে-সব কথা বলেছো, সেগুলো তোমার মনের কথা নয় !···তা এখন শোনো যা বলি···মুখ তোলো ···শোনো···

মায়া মুখ তুলিল। বলিল,—বলো···

অনিল বলিল—চোখের জল মোছো।

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া মায়া চাহিয়া রহিল অনিলের পানে।

অনিল বলিল—দু'জনে সন্ধি করি, এসো।

বলিয়া মায়ার দুই হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া অনিল বলিল,—সন্ধি হলো···সব ঝগড়ার শেষ ! এসো, দু'জনে দু'জনের হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করি, এখন থেকে অন্ততঃপক্ষে ছত্রিশ ঘণ্টা আমাদের ঝগড়া হবে না···আমি যদি দোষ করি, তুমি সয়ে থাকবে ! তুমি যদি দোষ করো, আমি সয়ে থাকবো !···

মায়া বলিল—আচ্ছা···

অনিল বলিল—আচ্ছা নয়···মুখের কথায় দু'জনে এ-প্রতিজ্ঞা করবো।

তাহাই হইল। মন্ত্রের মতো দু'জনে মুখের বাক্যে উচ্চারণ করিল—এই রাত্রি আটটা বারো মিনিটে প্রতিজ্ঞা করছি, এখন থেকে অন্ততঃপক্ষে ছত্রিশ ঘণ্টা আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হবে না। তুমি যদি দোষ করো, নিঃশব্দে আমি তা সয়ে থাকবো ! আর আমি যদি দোষ করি, নিঃশব্দে তুমি তা সয়ে থাকবে !

প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের মন বলিল, জলের লিখন আর তোমাদের প্রতিজ্ঞা ! হায় রে, এমন প্রতিজ্ঞা তো দিনে ছত্রিশ বার করিতেছ !

সাত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। দু'জনে দু'জনকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না···একের উপর অপরের নির্ভর কতখানি! তবু কি যে হয়···

অতি-তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া প্রথমে দেখা দেয় ছোট এতটুকু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ! তার পর সেই স্ফুলিঙ্গ বড় হইয়া যেন এত-বড় পৃথিবী-খানাকেই পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে, এমনি প্রখর তেজে বাড়িয়া বিস্তার লাভ করে! সে-আগুনে এক জন জলে না,—জ্বলে দু'জনেই। সে জ্বালার যাতনা নিবাইতে অনিল যেমন মায়াকে চায়, মায়ার মনের জ্বালাও তেমনি অনিলকে না পাইলে বিরাম মানে না!

রাগ পড়িলে অনিল বলে,—এমন করে বাঁচা যায় না মায়া! কুকুর-বেড়ালের মতো এমনি খেয়োখেয়ি! আমি যখন রাগ করি, কেন একটু চুপ করে তুমি থাকো না তখন? তাহলে তো আর···

মায়া বোঝে। নিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দেয়,—আমি জ্ঞানপাপী গো! কেমন আমার বদ স্বভাব!

দু'জনে বসিয়া ভাব করে। সন্ধি হয়। পরের দিন অনিল গিয়া সিনেমায় শীট রিজার্ভ করিয়া আসে—দু'জনের জন্য; রান্নার বই দেখিয়া সারাদিন খাটিয়া মায়া তৈয়ারী করে নূতন দু'-চার রকম খাবার, অনিল যে-সব খাবার ভালোবাসে!

দু'জনে প্রাণপণে চেষ্টা করে, ঝগড়া নয়, কটু কথা নয়! স্বামি-স্ত্রী···পর নয়···জ্ঞাতি নয়···কুটুম নয়! তাছাড়া···

ঐ যে পাশের বস্তীতে মোটর-ড্রাইভার বলরাম···মদ খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া কি তর্জ্জন-গর্জ্জন না সুরু করে! স্ত্রীটাও তেমনি···সমানে স্বামীর সঙ্গে লড়াই চালায়! শেষে বলরাম স্ত্রীকে মারে লাথি জুতা··· যা পায় সামনে, তাই দিয়া। স্ত্রী সে দিন বলরামের একটা কাণ কামড়াইয়া প্রায় ছিঁড়িয়া দিয়াছিল! পুলিশ-কেস হইবার জো! তারাই···পাড়ার পাঁচ জনে মিলিয়া শাসাইয়া দিয়াছে,—ফের যদি এমন গুণ্ডামি করো বলরাম, পুলিশ ডাকিয়া শায়েস্তা করিয়া দিব। এ বস্তী তোমাকে ছাড়িতে হইবে!

ধিক্কারে অনিলের মন ভরিয়া ওঠে! সে ভাবে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, সভ্যতা-কালচারের গর্ব্ব করে···তার সঙ্গে ঐ গুণ্ডা মাতাল বলরামের তফাৎ কোন্‌খানে!

স্বামি-স্ত্রী···পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে! বৈশাখের এক শুভ-লগ্নে বিবাহ···ফুলশয্যার রাত্রেই দু'জনে দু'জনকে কি ভয়ঙ্কর ভাবে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল! পেন্সন লইয়া কোথায় দূর-বিদেশে পড়িয়া আছেন মায়ার বাবা চিন্তামণি বাবু···মায়া তাঁর একটিমাত্র সন্তান। মা মারা গিয়াছেন বিবাহের পূর্ব্বে···বিবাহের পর মায়া সেই যে অনিলের সংসারে আসিয়া ঢুকিয়াছে, বাপের কাছে যাইবার নামটি করে না! কখনো না! বাপ কত বার লিখিয়াছেন, দু'দিন আসিয়া আমার কাছে থাকিয়া যা, মায়া! অনিলও বলিয়াছে,—সত্যি মায়া, বছরে একটিবার করে এক হপ্তা অন্ততঃ তাঁর কাছে গিয়ে··· অভিমান-ভরা দৃষ্টিতে মায়া স্বামীর কথায় জবাব দিয়াছে,—আমি তোমার আপদ···না? আমাকে দূর করে দিতে পারলে তোমার গায়ে হাওয়া লাগে, বুঝেছি!

অপ্রতিভ হইয়া অনিল বলে,—তা নয়! বাপ্···তুমি ছাড়া তাঁর আর কে আছে, বলো?

মায়া বলে—বেশ, তুমিও চলো আমার সঙ্গে···দু'দিন আপিসে ছুটী নাও!

এবং তাহাই হইতেছে। বড় দিনের সময়, পূজার সময়··· ছুটীছাটায় দু'-চার দিনের জন্য মায়াকে লইয়া অনিল যায় চিন্তামণি বাবুর কাছে। চিন্তামণি বাবুও মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া যান।

চিন্তামণি বাবু বলেন মায়াকে—আসা তোর সাধ্য নয়, বুঝি মা! তিনিও···(অর্থাৎ মায়ার মা) দশ-বছর বয়সে বিয়ে হয়ে সেই যে আমার কাছে এসেছিলেন, কখনো আর বাপের বাড়ীর মুখো হন্‌নি!···সাঁইত্রিশ বৎসর দু'জনে পাশাপাশি কাটিয়েছেন··· তিনি বলতেন, আমি না থাকলে তোমার ভারী কষ্ট হবে, সে ভাবনায় এক দণ্ড সেখানে আমার স্বস্তি মিলবে না!

শুনিয়া সলজ্জ হাস্যে মায়া বলে—তুমি জানো না বাবা, তোমার জামাইটি কেমন! ছেলেমানুষের বেহদ্দ! নাইতে যাবার সময় মাথায় তেল মাখতে হয়, এ কথা মনে করিয়া না দিলে চলে না! ঝোলের আগে ডাল খেতে হয়, এ কথাও আমায় রোজ মনে করিয়ে দিতে হয়। তা ছাড়া কোথায় থাকে জামা, কোথায় জুতো! এক দিন জানো বাবা, কি হয়েছিল? আমার খুব জ্বর··· যাকে বলে জ্বরে বেহুঁশ! আর উনি কি না স্যুটটুট পরে চটিজুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন! মধু চাকর এসে আমাকে বললে। শুনে তাকে তখনি পাঠাই ওঁর খোঁজে। ডাকতে এলেন। জুতোর কথা বলতে তোমার জামাই হেসে কি জবাব দিলে, জানো? বললে, রোজ স্যুট পরবার সময় মোজা-জামা হাতে তুমি এগিয়ে দাও··· অভ্যাস হয়ে গেছে···নিজের হাতে কিছু নিই না কি না···

হাসিয়া চিন্তামণি বাবু বলিলেন—তুই ওকে আয়েসী করে ফেলেছিস মায়া। এতটা করিস্ নে!

বাপের এ কথায় মায়া কতখানি লজ্জা পাইয়াছিল! অনিলের এ-নিঃসহায়তা, তার উপর এমন নির্ভর···দেখিয়া মায়ার মনে সুখের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না! অনিলের গৃহ···অনিলের সংসার বলিয়া কিছু নাই! সে-গৃহে, সে সংসারে মায়া যা করে···মায়াই সব! অথচ কেন যে তুচ্ছ কারণে দু'জনের মনে মনে ঠুকিয়া এমন ভাবে আগুন জ্বলে! মন তো নয়, যেন দু'খানা চকমকি পাথর!

এই সেদিন রবিবার···

বাহিরের ঘরের জন্য সখ করিয়া অনিল কিনিয়া আনিয়াছিল একজোড়া পর্দ্দা···কোন্ সাহেবের বাড়ী তেমনি পর্দ্দা দেখিয়া ভালো লাগিয়াছিল, তাই! পর্দ্দা দেখিয়া মায়া বলিয়া বসিল,—মাগো, কি পছন্দ! ক্রমে সেই পছন্দ আর পর্দ্দা লইয়া কণ্ঠ উঠিল চড়া পর্দ্দায় এবং দু'জনে দু'জনকে "ডাউন্" করিতে একেবারে রণ-মূর্ত্তি! তার পর অনিল না খাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং কাঁদিয়া-কাটিয়া মায়া কি কাণ্ডটাই না করিল!

আর এক দিন···অনিল নিউ মার্কেট হইতে একখানা জর্জ্জেট শাড়ী কিনিয়া আনিয়া হাজির! ভাবিয়াছিল, মায়া খুব খুশী হইবে! তা না, শাড়ী দেখিয়া মায়া যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল! বলিল,—সব তাতে কর্ত্তামি করো কেন বলো তো! আটপৌরে শাড়ী নেই, সব ছিঁড়ে গেছে···বলে-বলে মুখে আমার পোকা পড়ে গেল···এক জোড়া আটপৌরে শাড়ী কিনে আনলে লজ্জা রক্ষা হয়,

তা নয়, হুম করে আনা হলো জর্জ্জেট শাড়ী! ভারী বড়-মানুষ হয়েছো, না? অনিল অমনি না খাইয়া বিছানায় গিয়া ঢুকিল···মায়া সাধ করিয়া মাংস রাঁধিয়াছিল, সেগুলা চাকর-বামুনকে ধরিয়া দিয়া রাত-উপবাসী রহিল!

প্রতিদিনের ইতিহাস খুলিলে তার প্রতি পৃষ্ঠায় এমনি ছোট-বড় কলহ-বিবাদের পরিচয় মিলিবে। ওঠা-বসা চলা-ফেরা—সব ব্যাপারেই যেন মেঘে-মেঘে লাগিয়া বজ্র-বিদ্যুতের চমক! অথচ···

মনে মনে দু'জনে প্রতিদিন পণ করিয়াছে,—না, আর রাগ নয়। যা বলে, সহিয়া থাকিব! কিন্তু তা হয় না। কে যেন অভিশাপ দিয়াছে···সেই অভিশাপে দু'জনের সুখেরই-লাগিয়া-বাঁধা ঘর অনলে পুড়িতেছে।

বন্ধুদের কাছে অনিল বলে—মায়া আছে, তাই রক্ষা! নাহলে আমার মতো লক্ষ্মীছাড়ার কি দশা যে হতো! এমন স্ত্রী কারো হয় না!···সে দিন মেয়ে-মজলিশে জিতু হালদারের স্ত্রী শশিমুখী··· সস্ত-গড়ানো চুড়ি দেখাইতে সকলে বলিল—একালে কি আর ও ফ্যাশনের চুড়ি কেউ পরে শশি! কম নয় তো পনেরো ভরির চুড়ি! এত সোনা নষ্ট করলি! শশিমুখী বলিল—ওঁর সখ···কিছু বলবার জো আছে! বাবাঃ! বলেন, তুমি স্ত্রী···স্বামী যা দেবে, হাসি-মুখে নেবে! না নাও, চুড়ি ফিরিয়ে দাও···দরকার নেই তোমার নতুন চুড়ি পরে!

এ কথায় মায়া সগর্ব্বে জবাব দিয়াছিল—সে-সম্বন্ধে ভাই, উনি··· আমি যা করবো! শুধু কি গহনা গড়ানো? সব বিষয়ে···আমি যা করি।

হায় রে, এত নির্ভর, এমন গভীর প্রেম···তবু রাগ করিয়া কত বার অনিল বলিয়াছে,—চললুম···আজ আর আমি বাড়ী ফিরবো না!

অবশ্য অফিসের ছুটীর পরে আবার যথাসময়ে ঠিক বাড়ী ফিরিয়া আসে! তাও শুধু-হাতে নয়, মায়ার জন্য কিছু-না-কিছু উপহার লইয়া! মায়াও জোর-গলায় কত বার বলিয়াছে—আজ তোমার আপদ বিদায় হবে···ভয় নেই! দুপুরের ট্রেণে মধুকে নিয়ে বাবার কাছে চলে যাবো। সত্যি, ভেবেছো আমার চাল নেই? চুলো নেই? আছে। চাল আছে, চুলোও আছে!

এ কথা বলিলেও বাড়ী ছাড়িয়া মায়ার নড়িবার এতটুকু লক্ষণ কোন দিন দেখা যায় নাই···বিকালে চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া অনিলের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে!

দু'জনে দু'জনকে চিনিয়া ফেলিয়াছে! মুখে যত আস্ফালন করুক, এ বাড়ী ছাড়িয়া দু'জনের কোথাও আর গতি নাই, দু'জনেই তা জানে!

পরের দিনের কথা। কাল সেই দু'জনে হাতে-হাত রাখিয়া পণ করিয়াছে···

সন্ধ্যার পর। দোতলার ঘরে বসিয়া মায়া টেবল-ক্লথে ফুস-পাতা তৈয়ারী করিতেছে···মনে পড়িতেছিল ও-বাড়ীর কালোর মায়ের কথা। কালোর মা বলে, সাত-সাত বছর কাটলো···ছেলে-মেয়ে হলো না! আনিয়ে দেবো বৌমা, জনার্দ্দনের মাদুলি? একেবারে অব্যর্থ!···ছেলে-মেয়ে না হলে কি বাড়ী মানায়?

ভাবিতেছিল, কিসের দুঃখ? ছেলে-মেয়ে নাই, সে জন্য কোনো অভাব, কোনো অভিযোগ তো মনের কোণে উঁকি দেয় না! সুখের সংসার! দু'জনের ভালোবাসা দিয়া গড়া সংসার! এ সংসারের স্বপ্নও সে দেখে নাই কোনো দিন!

অনিল বসিয়া অফিসের মোটা ফাইল খুলিয়াছে। রাজ্যের অঙ্ক ফাঁদিয়া পাতার পর পাতার হিসাব মিলাইতেছে। সিগারেট পুড়িয়া গেল···দেশলাই জ্বালিয়া আর-একটা সিগারেট ধরাইল।

দেশলাই জ্বালার শব্দে মায়া ফিরিয়া চাহিল। দেখে, কোনো দিকে না চাহিয়া দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটা অনিল ছুড়িয়া দিল এমন যে সেটা গিয়া পড়িল খাটের উপরকার সজ্জিত বিছানায়!

মায়া খ্যাঁক্ করিয়া উঠিল,—এ স্বভাব কখনো কি ছাড়বে না? ছাই ফেলবার ট্রে দিয়েছি, তাতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ো, পোড়া কাঠি ফ্যালো, তা নয়···একেবারে বিছানার উপর! বিছানা ঠিক করে রেখেছি ঝেড়ে-ঝুড়ে···ভেবেছো, দাসী-বাঁদী আছে···খেতে-পরতে দিচ্ছি···সে কেন, তার বাবা করবে আবার বিছানা ঠিক!

হিসাবে জট পাকাইয়াছিল···সে-জটে পড়িয়া মাথা পর্য্যন্ত টন্‌টন্ করিতেছিল···মেজাজ ছিল যেন বারুদের মতো···সেই মেজাজের উপর মায়ার কথা আসিয়া লাগিল যেন দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি! বারুদে আগুন লাগিল! অনিল গর্জ্জন তুলিল—তোমাকে বলিনি তো বিছানা করো, সিগারেটের ছাই ঝাড়ো! চাকর রয়েছে···সে করবে এ সব কাজ।

মায়া বলিল—চাকরকে দিয়ে এ কাজ আমি করাবো না···লক্ষ বার তোমায় বলেছি সে কথা! চাকরের কথা তোলা, ও শুধু ছুতো! তার চেয়ে স্পষ্ট বলো না, আমি পুরুষ মানুষ···রোজগার করছি··· আমার বাড়ী···আমি বাড়ীর কর্ত্তা···আর কারো সুখ-সুবিধা আমি দেখবো না···দেখতে পারবো না! বলে, হুঁঃ, স্বভাব কি মানুষ ছাড়তে পারে!

এ-কথায় অনিল প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যদি চুপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আর লঙ্কায় আগুন লাগে না! কিন্তু তার জো কি! বরাতের ভোগ···অদৃশ্য কার সেই অভিশাপ আছে যে!

অনিল ফোঁশ করিয়া উঠিল—আমারই স্বভাব শুধু বদ, না? নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলো···বুঝলে!

মায়ার চোখে ভ্রূকুটি-কুটিল রেখা! মায়া বলিল—তার মানে? কি মন্দ স্বভাবটা আমার দেখেছো, শুনি?

অনিল বলিল—হুঁঃ, আমার আর কাজ নেই তো! আমি এখন তার ফিরিস্তি দিতে বসি!

—না, তোমাকে বলতেই হবে! পারো যদি দেখিয়ে দিতে, গুণে তোমার কাছে দশ জুতো খাবো।

নিরুপায়ে অনিল খাতায় মনোনিবেশ করিতেছিল! পারিল না! মায়া ছাড়িল না! আগাইয়া আসিয়া খাতা টানিয়া সরাইয়া দিয়া মায়া বলিল—বলতেই হবে! যে না বলবে, তার অতি-বড় গুরুর দিব্যি!

দিব্যি! অনিল চাহিল মায়ার পানে···বুকের মধ্যে বিজয়ী বীরের আস্ফালন যেন প্রচণ্ড বেগে রুখিয়া উঠিল! অনিল বলিল— এই যে, তুমি যে-সব কথা বলো! ঐ অতি-বড় গুরুর দিব্যি দিচ্ছ··· তাছাড়া বাপ, তুললে! বললে, গুণে দশ ঘা জুতো খাবে! তোমার মুখে এ-সব কথা···শুনলে লোকে কি বলবে?

মায়া বলিল—বলবে, আমি ছোট লোক !

—ঐ তো দোষ ! সব সময়ে তুমি উলটো বুঝবে !

মায়া বলিল—কি করবো, বলো ! মুখ্‌খু মেয়ে-মানুষ···তোমার মতো বি-এ, এম-এ পাশ করিনি তো !

—পাশের কথা হচ্ছে না, মায়া···

তার পর প্যাণ্ডেমোনিয়াম্ ! মায়া ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করিয়া মেঝেয় মাথা ঠুকিতে লাগিল, খাতা ফেলিয়া অনিল তাকে ধরিল !

ধুধা ! মায়ার মুখে তুবড়ি ফুটিতেছে, অনিলের মুখে পটকা···

এবং এই অগ্নিচক্রের মধ্যে চির দিন যেমন হয়···তুই লম্ফে ঘর ছাড়িয়া অনিল সহসা পথে ছুটিল···মায়া পড়িল মেঝেয় লুটাইয়া !

সে রাত্রে তু'জনে দেখা হইল না। অনিল শুইল বাহিরের ঘরে··· মায়া একা দোতলার ঘরে খালি মেঝেয়···

পরের দিন সকালেও তু'জনে কথা নাই। কলে চলিয়াছে সংসারের কাজ ! এবং যন্ত্র-চালিতের মতো আহারাদি সারিয়া অনিল গেল অফিস—মায়া নিঃশব্দে আহার সারিয়া ঘরে আসিয়া একখানা নভেল খুলিয়া বসিল।

নভেলের পাতায় মন নাই। মন কালিকার রণক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে পোড়া ছাইয়ের রাশি মাড়াইয়া !

বিশ্রী লাগিতেছিল···

মনে হইতেছিল, অমন ভাবে পণ-গ্রহণ···হাতে হাত রাখিয়া··· কিন্তু উনিই প্রথমে পণ করিয়াছিলেন···

ভাবিল, ইহ-জন্মটা এমনি চুলোচুলি করিয়াই কাটিবে ?

বেলা প্রায় পাঁচটা···চাকর আসিল। তার হাতে টেলিগ্রাম।

বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। অনিলের নামে টেলিগ্রাম। সহি দিয়া টেলিগ্রাম লইল। মনে দারুণ কৌতূহল ! কে টেলিগ্রাম করিল ? বাবা নয় তো ? এ-চিন্তায় বুকখানা যেন দশ হাত নামিয়া গেল !

খাম ছিঁড়িয়া টেলিগ্রাম পড়িল।

তাই। যা ভাবিয়াছিল···বাবার টেলিগ্রাম ! সেখানকার ডাক্তার-বাবু টেলিগ্রাম করিয়াছেন অনিলের নামে। জরুরি টেলিগ্রাম—

—চিন্তামণি বাবুর সাংঘাতিক অসুখ। শীঘ্র আসিবেন।—

তুশ্চিন্তায় ভয়ে মায়া এতটুকু !

বেলা এখন পাঁচটা ! অনিল আসিবে সেই সাতটায়···তু'ঘণ্টা দেরী। এ তু'ঘণ্টায় সেখানে ওদিকে কে জানে···

পাশের বাড়ীতে ছুটিল। সে বাড়ীতে টেলিফোন আছে। অফিসে টেলিফোন্ করিয়া দিল।

অনিল বলিল,—এখনি যাচ্ছি।

অনিল আসিল। তু'চোখে জল···মায়া বলিল—কি হবে ? নিশ্চয় খুব বেশী অসুখ ! হয়তো সব শেষ হয়ে এসেছে। না হলে টেলিগ্রাম তো কখনো আসেনি বাবার কাছ থেকে ! ওগো···

অনিল একটা নিশ্বাস ফেলিল। বলিল—তা নয় ! একা আছেন ! আমরা ছাড়া তাঁকে দেখবার আর কে আছে ? তাই টেলিগ্রাম করিয়েছেন ! কাল বেলা দশটার ট্রেণে তু'জনেই যাবো। আজ ট্রেণ থাকলে আজই যেতুম।

মায়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—বাবা বাঁচবেন তো ?

—আঃ, কি বক্‌চো মায়া ! অসুখ মানুষের হয় না ?

—কিন্তু বাবার বয়স হয়েছে যে ! তা ছাড়া গেল-বারে আসবার সময় বাবার চোখে জল দেখে এসেছি। কখনো তা দেখিনি ! বাবা বললেন, আবার কবে দেখা হবে, মা ! হবে, কি, হবে না··· কেন এমন কথা···?

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কথা বাধিয়া গেল।

অনিল বলিল,—কেঁদো না মায়া। অসুখ যদি বেশী হয়, তাঁকে নিয়ে আসবো এখানে আমাদের কাছে। ভালো করে চিকিৎসা করাবো ···নিশ্চয় সেরে উঠবেন।

মায়া থাকিতে পারিল না···মনের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছে ! একেবারে ভাঙ্গিয়া অনিলের পায়ের উপরে পড়িল, বলিল,—আমাকে তুমি ক্ষমা করো···তোমাকে আমি বড় মন্দ কথা বলি···ঝগড়া করি ···মহাপাতক করি। সেই পাপেই···

তু'হাত ধরিয়া মায়াকে তুলিয়া সস্নেহে অনিল বলিল—কি পাগলের মতো বকছো !···ওঠো মায়া। এখন থেকে সব গুছিয়ে ঠিক করো ! কিছু কেনবার আছে···মানে, কমলালেবু, আঙুর, আপেল, বেদানা···হরলিক্স···ওভালটিন···আমি যাই, আজই কিনে রাখি। তুমি সব গোছগাছ করো। একটা রাত্রি ! নিরুপায় ! মা-কালীকে ডাকো···নারায়ণকে প্রার্থনা জানাও···

ডাক্তার বলিলেন, রোগ কঠিন···নিউমোনিয়া। এই বয়স ···শরীরে কি-বা আছে···কিসের জোরে যুঝিবেন !

গভীর রাত্রি। প্রদীপের ক্ষীণ আলো। বিছানায় পড়িয়া আছেন চিন্তামণি বাবু···মূর্চ্ছিতের মতো ! মাথার শিয়রে বসিয়া মায়া। পাশের ঘরে অনিল ঘুমাইতেছে। অনিল যাইতে চাহে নাই···মায়া তাকে পাঠাইয়াছে জোর করিয়া। সর্ত্ত হইয়াছে, রাত্রি তু'টা পর্য্যন্ত মায়া জাগিবে রোগীর শিয়রে···তার পর তু'টা হইতে ভোর পর্য্যন্ত জাগিবে অনিল !

মায়া ভাবিতেছিল,···অনেক কথা ! অতীত দিনের কথা··· যখন ছোট ছিল···মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন ! মায়ের কত আদর-যত্ন—তবু মায়ের কাছে মায়ার-অনেক উপরে ছিল বাপের আসন ! মনে পড়িল, সে বার মামার বাড়ীতে মামার ছেলের অন্নপ্রাশন··· চিন্তামণি বাবুর ছুটী মিলিল না বলিয়া তিনি যাইবেন না, মা তাই নিমন্ত্রণে যান নাই। মায়া গিয়াছিল মামার সঙ্গে মামার বাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে !···মায়ের ঐ ব্রোমাইড ছবি···প্রদীপের আলো পড়িয়াছে ছবির উপর···দেওয়ালে এমন জায়গায় ও-ছবি টাঙানো, ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিবামাত্র ছবির উপর বাপের দৃষ্টি পড়ে সব-আগে ! মনে পড়িল, বাবাকে একবার মায়া বলিয়াছিল, ও-ছবি ও-দেওয়াল থেকে নামিয়ে যদি এদিককার দেওয়ালে রাখি, বাবা ? ও-দেওয়ালে তেমন আলো পড়ে না ! বাবা জবাব দিয়াছিলেন, না রে, ঐখানেই থাকুক। বেঁচে থেকে নিজে তিনি ঐ দেওয়ালে ও-ছবি টাঙ্গিয়ে গেছেন···তাঁর হাতের স্পর্শ ওতে আছে···ও-ছবি নাড়া চলে না, মা।

কথার শেষের দিকে বাবার কণ্ঠ আবেগে বিজড়িত হইয়াছিল···মায়ার মনে পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, মায়ের সঙ্গে বাবার কখনো কথা

কাটাকাটি হয় নাই···কখনো না···ছোট-বড় কোনো ব্যাপারে নয়! মা আগে কোনো কথা বলিলে বাবা তাহা মানিয়া লইতেন। আবার বাবা যদি নিজে হইতে কোনো প্রস্তাব করিতেন, মা তাহাতে 'হুঁ' বলিয়া সায় দিতেন! বরাবর···বেশ মনে আছে! সেই···

ঘুমের ঘোরে চিন্তামণি ডাকিলেন,—মক্ষি···

মায়া চমকিয়া উঠিল···মক্ষি! মায়ের নাম ছিল মোক্ষদা-সুন্দরী। বাবা ডাকিতেন, মক্ষি! বুঝিল, বাবা স্বপ্ন দেখিতেছেন!

চিন্তামণি বলিলেন,—আরো কত দিন একা ফেলে রাখবে, মক্ষি? এখানকার কোনো কাজ তো আমার বাকী নেই। মায়ার বিয়ে হয়ে গেছে···মনের মতো ঘর-বর পেয়েছে সে। দু'জনে কত ভাব। আমাদের যেমন ছিল! কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। চিন্তামণি চুপ করিলেন।

মায়া ডাকিল—বাবা···

সে ডাকে চিন্তামণির নিদ্রাচ্ছন্ন-ভাব কাটিয়া গেল···চিন্তামণি বলিলেন,—কে?

—আমি, বাবা···তোমার মায়া।

বাপের রোগশীর্ণ হাতখানি মায়া নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল,—আবেগ-ভরে বলিল,—ঘুমোও বাবা···

—ও! তুই এসেছিস! মনে হচ্ছিল, তাই। কখন এলি?

—সন্ধ্যার পর।···তুমি ঘুমোচ্ছিলে, তাই ডাকিনি।

—অনিল?

—এসেছে। ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে। কিছুতে ঘুমোতে যেতে চায় না···জোর করে পাঠিয়েছি।

—হুঁ···

মেয়ের হাতে বাপের হাত···দু'জনের কাহারো মুখে কথা নাই··· অনেকক্ষণ!

মায়া বলিল,—এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখি, গা তোমার পুড়ে যাচ্ছে। এখন গা তত গরম নয় তো! এখন কেমন আছো বাবা?

চিন্তামণি বলিলেন,—ভালো নয় মা! বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

—কি কষ্ট হচ্ছে? কোথায় কষ্ট হচ্ছে?

—ভিতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। বুকে খুব ব্যথা।

মায়ার দু' চোখের সামনে যেন মলিন ছায়া···কালো কালো ছায়া! ছায়ার পর ছায়া সরিয়া চলিয়াছে!

মায়া বলিল,—উনি বলছিলেন, ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে—তিনি যদি অমত না করেন,—কালই তোমাকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবেন। সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছেন। তাছাড়া এ বয়সে তোমাকে একলা এত দূরে উনি ফেলে রাখতে চান্ না।

চিন্তামণি বলিলেন,—এখান থেকে আমায় টেনে নিয়ে যাস্‌নে তোরা। এইখান থেকেই তিনি বিদায় নিয়ে গেছেন···এই ঘর থেকে···মনে নেই? চিন্তামণি নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—তোদের দু'জনকে দেখে যাচ্ছি, সুখে আছিস···মনে-মনে মিল···এর উপর আমার আর চাইবার কিছু নেই তো মা···এ দেখে যাওয়া মা-বাপের অনেক সৌভাগ্য!

জ্বর নরম পড়িয়াছে! মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া চিন্তামণির বুকের মধ্যে প্রাণ যেন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

অনিল বলিল—আমাদের যে উপায় নেই এখানে এসে থাকি, আপনাকে দেখি। অথচ এখানে আপনাকে একা রেখে আমরাও সেখানে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

চিন্তামণি বলিলেন—না বাবা, আমাকে ধরে টানাটানি করো না ···এখান থেকেই আমি একেবারে ছুটী নিয়ে যেতে চাই।

চিন্তামণিকে কলিকাতায় আনা গেল না। তিনি আসিলেন না।···অগত্যা অনিলকে ফিরিয়া গিয়া অফিসের সঙ্গে বুঝাপড়া করিয়া ছুটীর মেয়াদ বাড়াইয়া আসিতে হইল।

বাপের পাশ ছাড়িয়া মায়া নিমেষের জন্য নড়ে না। মনে পড়ে মায়ের কথা। ছেলেবেলায় দেখিয়াছে, একটু অসুখেই বাবা কতখানি কাতর হইয়া পড়িতেন এবং মা তখন সংসার ছাড়িয়া, তাকে ছাড়িয়া, সব ছাড়িয়া নিজেকে কি ভাবে চিন্তামণির সেবা-পরিচর্যায় ডুবাইয়া দিতেন।

থাকিয়া থাকিয়া চিন্তামণির ঘোর আসে। তখন কোথায় থাকে অনিল, কোথায় বা মায়া! মৃতা পত্নীকে ডাকিয়া তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া কত কথাই কন্! মায়া কাঁদিয়া অনিলকে বলে,—বাবা আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন না কেন? ফরমাশ করছেন, এটা-ওটা বলছেন···পাশ ফিরিয়ে দিতে বলছেন, বিছানা ঠিক করে দিতে বলেছেন, কিন্তু আমায় ডেকে কিছু বলেন না! ডাকছেন শুধু মাকে!

কাঠ হইয়া অনিল শোনে! ভাবে, তরুণ বন্ধু শিবচরণের স্ত্রী-বিয়োগের দুঃখে বিগলিত হইয়া অনিল বলিয়াছিল,—সামনে দীর্ঘ-জীবন···কি লইয়া শিবু বাঁচিবে? সদ্য-বিধবা ভাগিনেয়ীর কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু এই বৃদ্ধ···সাঁইত্রিশ বছর ধরিয়া যাঁর সঙ্গে বাস···যাঁর চিন্তায়-বাক্যে নিজের চিন্তা-বাক্য সব বিজড়িত ছিল···সেই সাঁইত্রিশ বৎসরের সঙ্গিনীকে হারাইয়া তাঁর দুঃখ কত গভীর! সাঁইত্রিশ বছরের প্রতি দিন প্রতি নিমেষের কত শত স্মৃতি···

ডাক্তারের কাছে কাঁদিয়া মায়া বলে,—বাবা আমায় ডাকছেন না কেন? আমি ডাকলে মুখের পানে চেয়ে দেখছেন, কিন্তু বাবা ডাকছেন শুধু মাকে!

ডাক্তার বলিলেন,—জ্ঞান তো নেই···আচ্ছন্ন ভাব! আর ঐ এক চিন্তায় উনি বিভোর হয়ে আছেন!

—তবে কি বাঁচবেন না?

- বলা শক্ত।

চিন্তামণি বাঁচিলেন না। অনিল-মায়াকে সামনে রাখিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিলেন। অন্তিম-নিদ্রার পূর্ব্বক্ষণেও মৃদু কম্পিত অধরে অস্ফুট আহ্বান—চলো মক্ষি···

কঠিন কর্ত্তব্য। জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এখানে কোথায় থাকিবে! কেনই বা!

জিনিষপত্র গুছাইতে গিয়া মায়া দেখে মায়ের শত স্মৃতি···সেই মাথার কাঁটা, চুলের ফিতা, সিঁদুরের কৌটা···মায়ের হাতের তৈয়ারী কত দিন-আগেকার সাজা শুকনো পান, ভাজা মশলা···সমস্ত জিনিষ বাবা কি চমৎকার করিয়াই না সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন! সে মেয়ে···সে তো এ-সবের দাম বোঝে নাই।

বাপের লেখা একখানা ডায়েরির খাতা···পাতা উল্টাইতে লাগিল।

মাকে সম্বোধন করিয়া বাবা পাতায়-পাতায় প্রতিদিন চিঠি লিখিয়াছেন। একখানা চিঠিতে নিজের নাম দেখিয়া মায়া না পড়িয়া থাকিতে পারিল না!

চিন্তামণি লিখিয়াছেন···এই সে-দিন···মৃত্যুর ঠিক দেড়-মাস আগে। লিখিয়াছেন—

মনে অভিমান হয় বৈ কি মক্ষি! মায়াকে এত করিয়া বলি, ওরে আমার কি সাধ হয় না, দু'দিন তুই আমার কাছে আসিয়া থাকিস্? সে আসে না! কত ছল করে, কত ছুতা তোলে! তাই ভাবি, পরের ঘরে গিয়া মেয়ে বাপকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকে! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তোমার কথা! তোমাকে বলিতাম, বাপের বাড়ী যাও না···তাঁরা ভাবেন, আমি বুঝি বন্দী করিয়া রাখিয়াছি! তুমি বলিতে, তা নয়। বাপের বাড়ীতে যে-মেয়ে যাইতে চায় না স্বামীর পাশ ছাড়িয়া—সে-মেয়ের মা-বাপ তাহাতে দুঃখ পায় না—অনেকখানি সুখ পায়···গর্ব্ব বোধ করে। সে কথা মনে পড়িলে মনের অভিমান কাটিয়া যায়! সত্যি মক্ষি, মান-অভিমান হইলেও মেয়েরা অনেক সময় বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। তোমার মায়া তাও কখনো আসিল না! তাহা হইতেই বুঝি, দু'জনে মনে-মনে কতখানি মিল! ওরা না আসুক আমার কাছে—আশীর্ব্বাদ করি, এমনি সুখে ওদের দিন কাটুক! এ-সুখ দেখিয়া আমি যেন তোমার কাছে যাইতে পারি!

কিন্তু তুমি কেমন করিয়া আছো মক্ষি, আমাকে এত দিন একা ফেলিয়া? প্রত্যহ মনে করি, আজ তোমার ডাক আসিবে! কিন্তু প্রত্যহই নিরাশ হই···

আর পড়া গেল না! অশ্রুর ঘন বাষ্পে দু'চোখের দৃষ্টি বন্ধ হইয়া আসিল। ডায়েরি হাতে মায়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনিল আসিয়া ডাকিল,—মায়া···

চোখ তুলিয়া মায়া অনিলের পানে চাহিতে পারিল না।

অনিল বলিল,—কাঁদছো! কাঁদবার দিন পড়ে আছে, মায়া। তবু এর মধ্যে শক্ত হতে হবে।···ওদিকে কদ্দূর হলো? আজ সন্ধ্যার ট্রেণেই যেতে হবে যে!

মায়ার কি মনে হইল, মায়া একেবারে অনিলের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। বলিল,—ওগো···

—কি করছো মায়া! ছি! পায়ে কেন?

মায়া বলিল—কখনো তোমাকে আর কটু কথা বলবো না আমি। তুমি আমায় একটি আশীর্ব্বাদ করো শুধু···

বিস্ময়ে অনিল অবাক্! কহিল—এর মানে?

মায়া বলিল—তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করো, আমার মার মতো ভাগ্যবতী যেন আমি হতে পারি। আমার জন্য আমার মা যেন স্বর্গে বসে কোনো দিন লজ্জা না পান!

অনিলের দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত! সেই বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি মায়ার মুখে নিবদ্ধ!

মায়া বলিল—এই সব দেখছি আর মনে হচ্ছে, সংসার করতে বসে এতটুকু ধৈর্য্য থাকে না যে পরস্পরের মন বুঝবো! তোমাকে নিয়েই আমার সব···অথচ সেই তোমাকে কটু কথায় জর্জ্জরিত করি! এবার থেকে আমি খুব ভালো হবো, সত্যি! তুমি যা বলবে, তাতে কোনো কথা কইবো না···কখখনো না! ভালোবাসার মর্ম্ম বাবা-মা···তাঁরা সেকেলে লোক···জানতেন, আমরা ভালোবাসতে জানি না···শুধু নিজেদের অহঙ্কার নিয়েই মরি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রত্যাসন্ন

তোমার হৃদয়-কুঞ্জে আচম্বিতে এক দিন হেসে
খুঁজিব সঞ্চিত মধু ঢল-ঢল ষোড়শী-বালার—
চিনিতে পারিবে তব ওই দু'টি আঁখি-সুকুমার
সে দিন কি সুগভীর মূর্চ্ছনায় মোরে ভালোবেসে?
অথবা ব্যাকুল হবে অতর্কিত ঈক্ষণ-আশ্লেষে?
কখনো দেখেছো তুমি স্বপ্নদ্যুতি প্রথম উষার
অর্দ্ধনিশা প্রলম্বিত ঝিল্লীভরা জ্যোৎস্না-আঁধিয়ার?
তাহলে আমারে ভেবো প্রত্যাসন্ন অতনুর বেশে!

শান্ত পায়ে টিপি-টিপি আসি তব সুন্দর ভবনে
হেরিব গাঁথিছ মালা একাকিনী নিকুঞ্জ-বিতানে,
মঞ্জীর ছন্দিয়া কভু বিলসিবে প্রিয়হারা গানে
লয়ে বীণা সপ্তস্বরা—অর্দ্ধস্ফুট সোণার স্বপনে,
হয়তো দেখিব গিয়া মূর্চ্ছাতুর বিরহ-শয়নে!

গ্রন্থাগার

হেথা আসি' মিলিয়াছে সর্ব্ব দেশ-কাল, হাতে হাত ধরি;
সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে মনে মনে হেথা অবাধ সম্ভোগ।
জাতি, ধর্ম্ম বর্ণ—সবে আলিঙ্গিত হেথা, ভেদ পরিহরি';
মৃতামৃতে, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যে, শত্রু-মিত্রে হেথা নাহি বিপ্রয়োগ।
ত্যাগী, ভোগী, উচ্চ-নীচ রহে একাসনে প্রেমে মগ্ন চিত;
'শাস্ত্র', 'নীতি' 'মার্গ', 'বাদ',—নির্ব্বিরোধে আশ্লিষ্ট সকল।
স্তব্ধ রূপায়িত হেথা মসীকৃষ্ণ বেণী অনাদি অতীত;
সর্ব্ব ভুবনের লীলা রহে হেথা মূর্ত্ত অচঞ্চল।

অতীতের কর-যুগ বর্ত্তমান হেথা করিয়া ধারণ,—
ডাকে, ওই ভবিষ্যেরে সাধিবারে আসি' ত্রিবেণী-সঙ্গম।
দেশে-দেশে কণ্ঠে-কণ্ঠে পুণ্যতীর্থে হেথা সৌভ্রাত্র-মিলন;
এক ধামে সম্মিলিত জগতের যত জ্ঞান-বিহঙ্গম,—
মৈত্রীভাবে পরস্পরে আলিঙ্গন হেথা সম্পন্ন সবার—
অপূর্ব্ব মিলনকেন্দ্র! বিশ্বমাঝে হেন নাহি কোথা আর!

জাপান

ছ'-সাত বৎসর আগেকার কথা। এমন বর্ব্বরের মতো হিংসায় মাতিয়া নরমেধ-যজ্ঞের কল্পনাও জাপান বোধ হয় তখন করে নাই! শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুশীলনে জাপানের অখণ্ড অনুরাগ, শিল্প-বাণিজ্যে জাপানীর অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া কে তখন ভাবিয়াছিল, বাহিরে শিক্ষা-সভ্যতার পালিশ থাকিলেও জাপানের বুকে দানবের বাস! সেই তখনকার কথা বলিতেছি। জন্ প্যাট্রিক নামে এক জন মার্কিণ সুধী তখন জাপানে গিয়াছিলেন—জাপানের আকস্মিক অভ্যুদয় দেখিয়া জাপানের পরিচয় লইতে। সে পরিচয় তিনি সন্দর্ভ-ছন্দে গাঁথিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। *

জন প্যাট্রিক প্রথমে গিয়া য়োকোহামায় নামেন। য়োকোহামাকে তিনি দেখেন, পাশ্চাত্য ছাঁদে গড়া যেন নূতন সহর! ঘর-বাড়ী সব আধুনিক ছাঁদের; পথে রিক্শর সংখ্যা খুব অল্প এবং তরুণ জাপানীরা সব মোটরে চড়িতেছে! তাছাড়া বাইসিকলের যেন সংখ্যা নাই!

য়োকোহামা হইতে জাপানের তুঙ্গতম পর্ব্বত ফুজিশান্ দেখা যায় —ফুজিশানের শিখর ১২৩৯৫ ফুট উঁচু। জাপানে আসিলে ফুজিশানে চড়িবার লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। চড়িবার ব্যবস্থা আছে। ফুজিশানে চড়িতে হইলে ট্রেণে করিয়া আসিয়া গোতেম্বায় নামিতে হয়। মোটা লাঠির আশ্রয় ব্যতিরেকে ফুজিশানে চড়া সম্ভব নয়। পাহাড়ের বুক হইতে দূরে ওশিমা আগ্নেয়গিরি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই ওশিমার অগ্নি-গহ্বরে প্রাণাহুতি দেওয়া—জাপানীদের কাছে মহাপুণ্য! এ অগ্নিগিরিতে ঝাঁপ দিয়া যে মৃত্যু বরণ করে, স্বর্গে তার স্থান একেবারে রিজার্ভ থাকে!

গ্রীষ্মকালে ফুজিশান্ পাহাড় যেন সহর হইয়া ওঠে! এ পাহাড়ে প্রায় কুড়িটি মন্দির আছে; এবং পুণ্য-কামী শিন্তো-মতাবলম্বীরা দলে দলে এই পাহাড়ে তীর্থ করিতে আসে। পাহাড়ে বারোটি যাত্রি-নিবাস আছে—যাত্রীর ভিড়ে সেগুলিতে তখন আর তিল-ধারণের স্থান থাকে না!

য়োকোহামার উত্তরে এবং অদূরে কামাকুরা গ্রাম। এখানে অমিত বুদ্ধের বিরাট্ মূর্ত্তি আছে। সাত শত বৎসর পূর্ব্বে পুরু ব্রোঞ্জ-প্লেট দিয়া মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মূর্ত্তির নির্ম্মাণ শেষ হইলে মূর্ত্তিকে ঘিরিয়া বিরাট্ মন্দির গড়িয়া মূর্ত্তিটিকে সেই মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ ঝড়ে মন্দির ভাঙ্গিয়া যায়। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ-মধ্যে মূর্ত্তিটি অটুট ছিল—তার পর ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রের বন্যায় মন্দিরের সে ধ্বংসাবশেষ ভাসিয়া যায়। তখন হইতে মূর্ত্তিটির মাথায় আর কোনো আচ্ছাদন রচিত হয় নাই! ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত হিম-রৌদ্র মাথায় বহিয়া মুক্ত আকাশ-তলে মূর্ত্তিটি বিরাজ করিতেছে। মূর্ত্তির চরণদেশে যাত্রীরা সহজে যাহাতে পৌছিতে পারে, সে জন্য সোপানশ্রেণী গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধ-মূর্ত্তির-মাথায় কার্ণিশের মত যে রূপার বন্ধনী (boss) আছে, সেটির ব্যাস প্রায় এক ফুট।

য়োকোহামা হইতে টোকিয়ো—ট্রেণে আধ ঘণ্টার পথ। আট মিনিট অন্তর ট্রেণ ছাড়িতেছে। ট্রেণে থার্ড ক্লাশ কামরা অসংখ্য—থার্ড ক্লাশের আসন নীল রঙের গদি মোড়া, সব সময়েই ভিড়ে ঠাশা থাকে। সেকণ্ড ক্লাশে সবুজ রঙের গদি। থার্ড ক্লাশের সঙ্গে এই টুকুই যা তফাৎ! তাছাড়া সেকণ্ড ক্লাশ কামরা প্রায় খালি থাকে। যখন সম্রাট্ ট্রেণে চড়েন, তখন ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরা আঁটা হয়।

* জাপান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ১৩৪৯ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে "না-জানা জাপান" প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখক লিখিতেছেন, ব্রেজিলের অবসর-প্রাপ্ত রাজদূতের সঙ্গে তাঁর আলাপ হইয়াছিল। জাপানে তিনি দীর্ঘ দিবস অতিবাহিত করিয়াছেন। জাপানী-চরিত্র সম্বন্ধে ব্রেজিলিয়ান রাজদূত বলিয়াছিলেন—উঁচু হইতে নীচের দিকে চাহিয়া সম্রাট্‌কে দেখা বারণ—দেখিলে সম্রাটের মর্য্যাদা হানির ফলে পাপ হইবে। এ জন্য সম্রাট্ যখন পথে বাহির হন, সে সময় পথের ধারে যত বাড়ীর উপর-তলার দ্বার-জানলা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সম্রাট্ উঁচু প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ফৌজ পরিদর্শন করেন, ফৌজের সঙ্গে সমতল-ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে সম্রাটের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে! প্রাসাদের উপর দিয়া কাহারো প্লেন চালাইয়া যাইবার নিয়ম নাই!

শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিভূষিত হইলেও জাপানী-জাত আজও নিসর্গের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া চলে। পারতপক্ষে ঘরের মেঝে, দেওয়াল বা জানলা-দরজায় ও আসবাবপত্রে তারা কোনো রকম রঙ লাগায় না; কাঠের গায়ে পালিশ লাগাইয়া তার স্বাভাবিক বর্ণ রক্ষা করিয়া চলে।

জাপানে বহু গৃহের দেওয়াল মাটী-লেপা। দরজা তৈয়ারী হয় কাগজ দিয়া, মেঝে ঘাসে-ছাওয়া; এবং ছাদে খড় কিম্বা মাটীর টালি বিছানো। তবে অতি-দরিদ্রের বাড়ীর সঙ্গেও খানিকটা করিয়া খোলা জায়গা আছে। বিছানাপত্র দিনের বেলায় গুটাইয়া তুলিয়া রাখা হয়; রাত্রে শুইবার সময় জাপানীরা ঘরে বিছানা পাতে। দিনের বেলায় শয়ন-ঘরে অফিসের এবং গৃহের সর্ব্ববিধ কাজকর্ম্ম করা হয়। শয়ন-ঘর বলিয়া জাপানে স্বতন্ত্র কোনো ঘর নাই।

গ্রীষ্মের দিনে গৃহস্থ ও দরিদ্র ঘরের মেয়েরা বাগানে কাজ করে। কোমরের উপর কোনো আচ্ছাদন থাকে না। পল্লী-গ্রামেই এ ব্যবস্থা খুব বেশী প্রচলিত।

লেখক লিখিতেছেন—টোকিয়োর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ডিনারের নিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলাম। আহার্য্যের মধ্যে ছিল ল্যাকারের কাজকরা বড় পাত্রে ভাত; চিংড়ী মাছের পুচ্ছের ফ্রাই; এবং মাংসের ঝোল। তার পর আসিল সবুজ চায়ের সঙ্গে ভাতের সাদা কেক্। সয়া-শস্ ছিল; তার উপর এক ডিশ করিয়া পেঁয়াজ, ডিম এবং লীন্-মীটের টুকরা। শেষোক্ত এই ডিশকে বলে

পল্লীর সাধারণ গৃহস্থ-ঘর
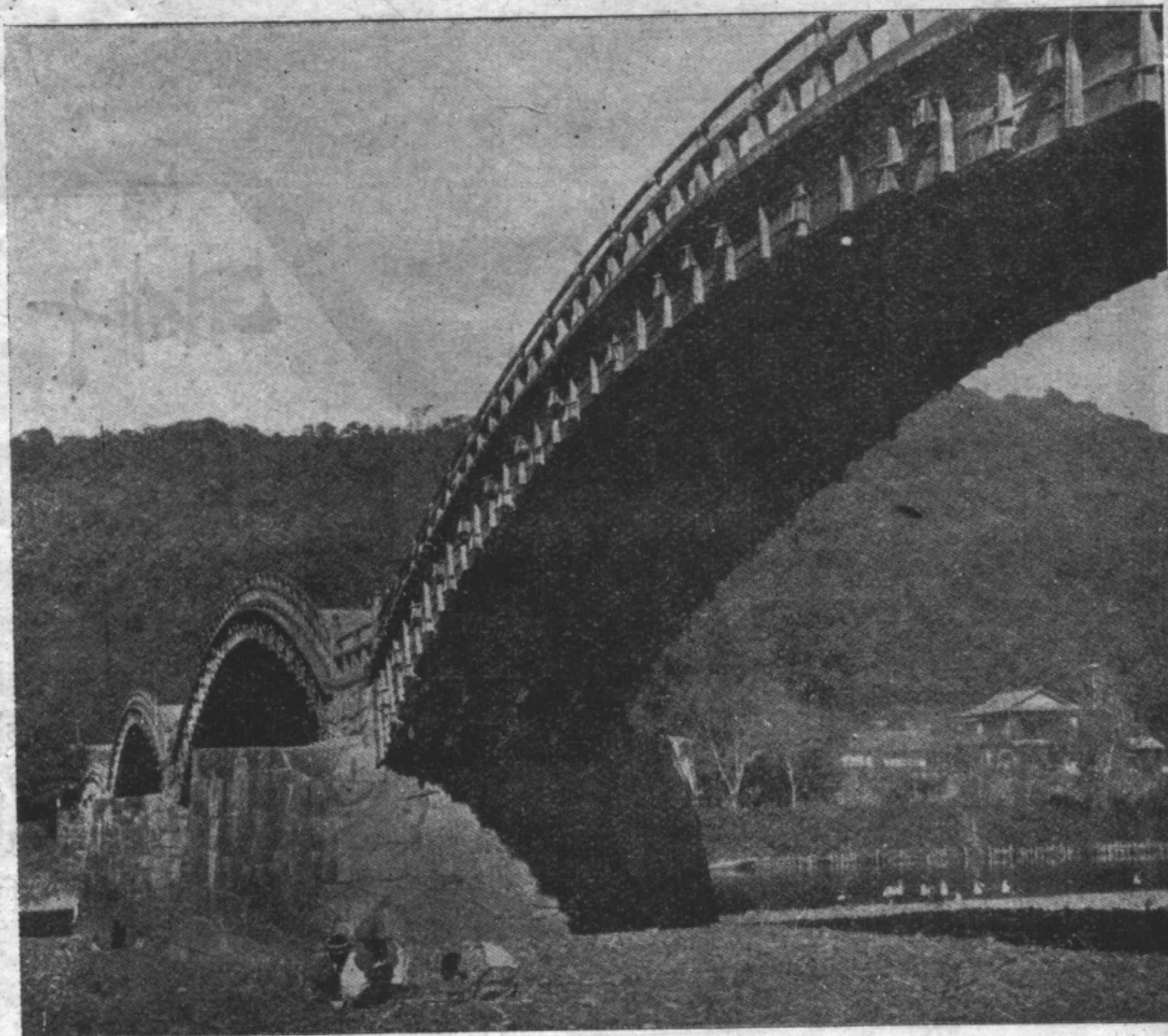
নিশিকির উপরে পুল—এ পুলের উপর সমতল পথ নাই—পুল পার হইতে পাঁচ বার চড়াই-নামাই করিতে হয়

ফুজিশান্ পর্ব্বত

জল-চক্র

রুমাল এবং এমনি ছোটখাট জিনিষ। এ সব জিনিষ বাড়ীতে আনিয়া নিমন্ত্রিতেরা সাজাইয়া রাখে। বহু গৃহে এমনি উপহারের স্তূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

টোকিয়ো হইতে লেখক গিয়াছিলেন নিক্কোয়। এখানে অসংখ্য জাপানী সরাই আছে। সরাইয়ে বাসের খরচ দৈনিক তিন ইয়েন মাত্র। এ সব সরাইয়ের নাম 'হোটেরু'। ইংরেজী কথার অদল-বদল করিয়া জাপানীরা বহু জাপানী কথার সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন হোটেল=হোটেরু; বীয়ার=বীরূ; ম্যাচ্=ম্যাচি; কিস্=কিসু। হোটেলে বাস করিতে আসিলে শুধু ঘর মেলে না—সেই সঙ্গে হোটেলওয়ালারা ব্যবহারের জন্য নরম শ্লীপারও দেয়। ভারতবর্ষের ন্যায় এখানে মাতুর পাতিয়া শোওয়া-বসার রীতি আছে। তবে জাপানীরা মাতুরের চারি প্রান্তে কাপড়ে মুড়িয়া দেয়—তাহাতে মাতুরের পরমায়ু দীর্ঘ হয়; বুনন বা কাঠি খুলিয়া যায় না। ঘরের মেঝেয় মাতুর পাতা থাকে—জুতা পায়ে দিয়া মাতুর মাড়ানো অনাচার বলিয়া পরিগণিত। দ্বারের বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া তবে ঘরের মধ্যে মাতুরে পা দিব, ইহাই বিধি।

হোটেলের ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য-আরামের অভাব নাই। আসবাবপত্রের মধ্যে ঘরে আছে জ্বলন্ত কয়লা-পূর্ণ টবের উপরে চায়ের পেয়ালা; ছোট একটি টেবিল; এবং আয়না-দেওয়া ত্রিশ ইঞ্চি উঁচু ছোট ড্রেসিং টেবল। মেঝেয় মাতুরে বসিয়া এ ড্রেসিং টেবল ব্যবহারের ব্যবস্থা। কোণে উঁচু বেদীর উপরে সজ্জিত পুষ্পগুচ্ছ থাকে। ঘরের দেওয়াল কাগজের তৈয়ারী—সে কাগজের গায়ে থাকে বহু বিচিত্র নক্সা; এবং নানা ছাঁদে এই দেওয়াল কাটিয়াই রকমারি বাতায়ন রচিত হয়। হোটেলে পরিচর্য্যা করিবার জন্য ভৃত্য বা বেয়ারা-খানশামা নাই; দাসী আছে। দাসীর নাম জোচু। দ্বারের বাহিরে টোকা দিয়া সে সঙ্কেত জানায়—ঘরে আসিব কি? আসিতে বলিলে তবে সে ঘরে ঢোকে। দাসীরা রূপসী, সুভাষিণী; এবং কাজে তাদের আন্তরিকতার সীমা নাই। যাত্রীদের খাওয়ার সময় দাসী কাছে বসিয়া থাকে। দাসীর

সুকি-ইয়াকি। জাপানে নিমন্ত্রণে গিয়া নিমন্ত্রিতেরা প্রত্যেকে উপহার পায়। ইহাই সেখানকার দেশাচার। উপহার বলিতে—পুতুল, ফ্যান্,

কাজ অনেক। ঘর সাফ করা, বাসন মাজা, কাপড়-চোপড় কাচা, শয্যা-রচনা; তাছাড়া কাপড়-চোপড় ইস্ত্রী করা, জামা-মোজা
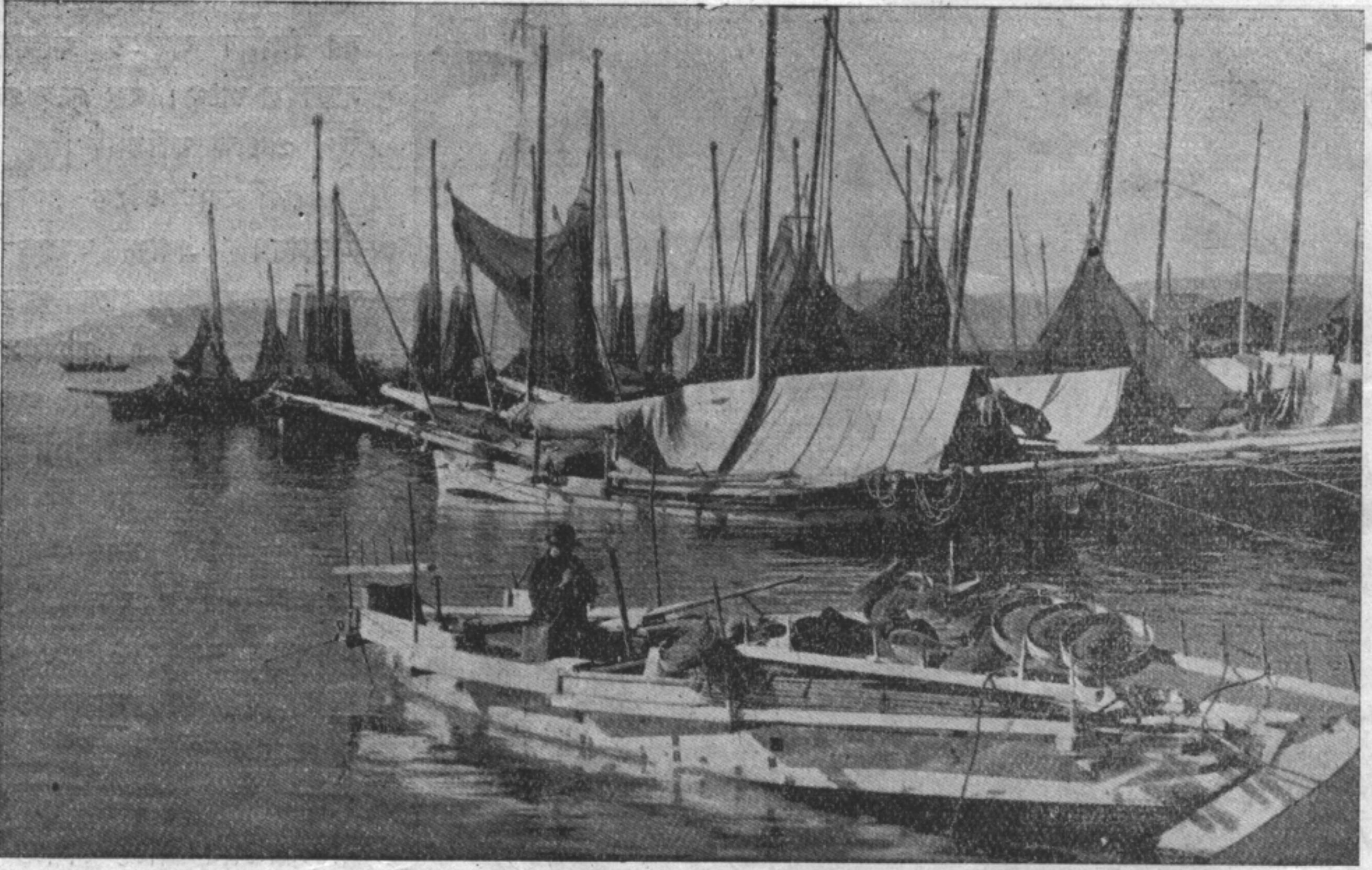
জাপানের হাউস-বোট

ছিঁড়িয়া গেলে সেলাই করা। লেখক লিখিতেছেন—দাসীরা চলে ঘড়ির কাঁটার মত! এতটুকু ব্যতিক্রম দেখি নাই। সন্ধ্যার সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিত, আমার স্নানের জল তৈয়ারী। স্নান করিতে যাইতাম। কাঠের বা মাটীর ট্যাঙ্কে গরম জল সুরক্ষিত—এত গরম যে, বিদেশীয়েরা সে গরম সহিতে পারে না। জাপানীরা কিন্তু পারে। এ জলে গা ডুবাইয়া বসিয়া তারা স্নান করে। আমি এই জলে গামছা ডুবাইয়া গা রগড়াইয়া তার পর আর একখানি শুষ্ক গামছায় গা মুছিতাম! জাপানে টার্কিস তোয়ালে দেখি নাই। স্নানের জন্য সূতিবোনা ওয়াশ-ক্লথ বা গামছার প্রচলন। স্নানের সময় লজ্জা রক্ষা করার দিকে কাহারো দৃষ্টি থাকিতে পারে

পর্ব্ব-উৎসবে মিছিল—সামনে পুরোহিত
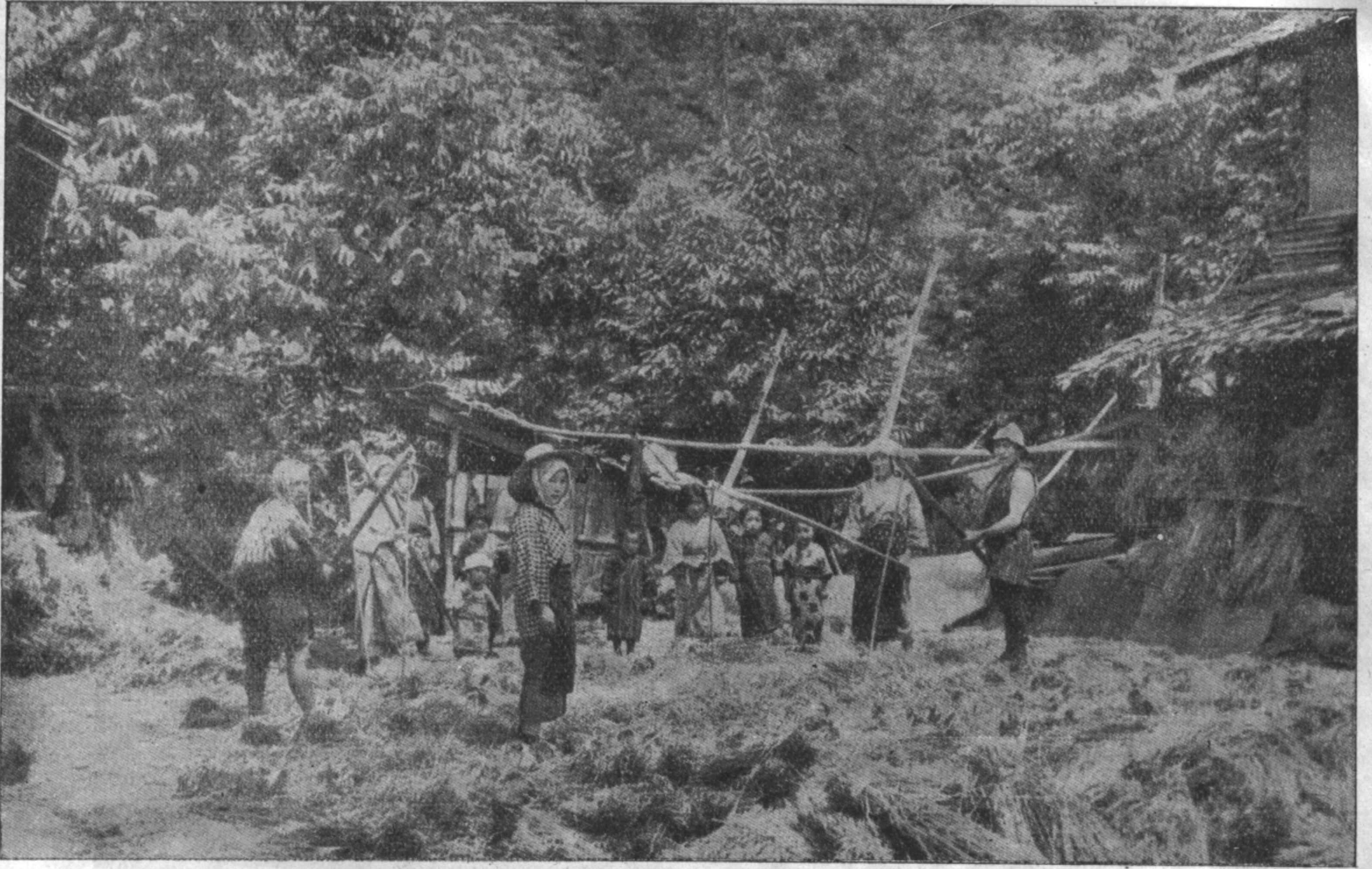
চাষের কাজে
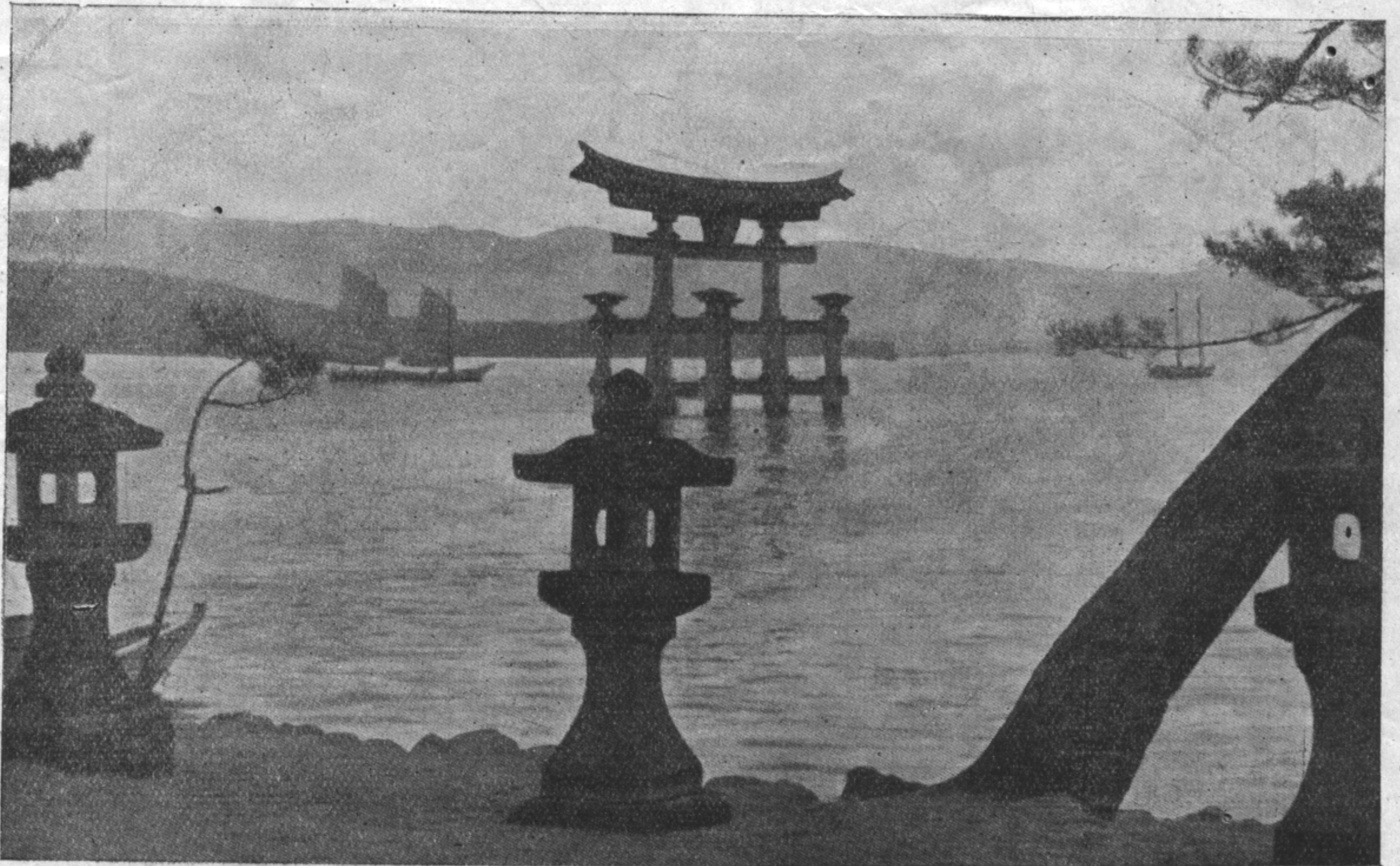
লোহিত স্তম্ভ—মিয়াজিমা

আইয়াশু মন্দির—নিক্কো

অমিত-বুদ্ধমূর্ত্তি—কামাকুরা
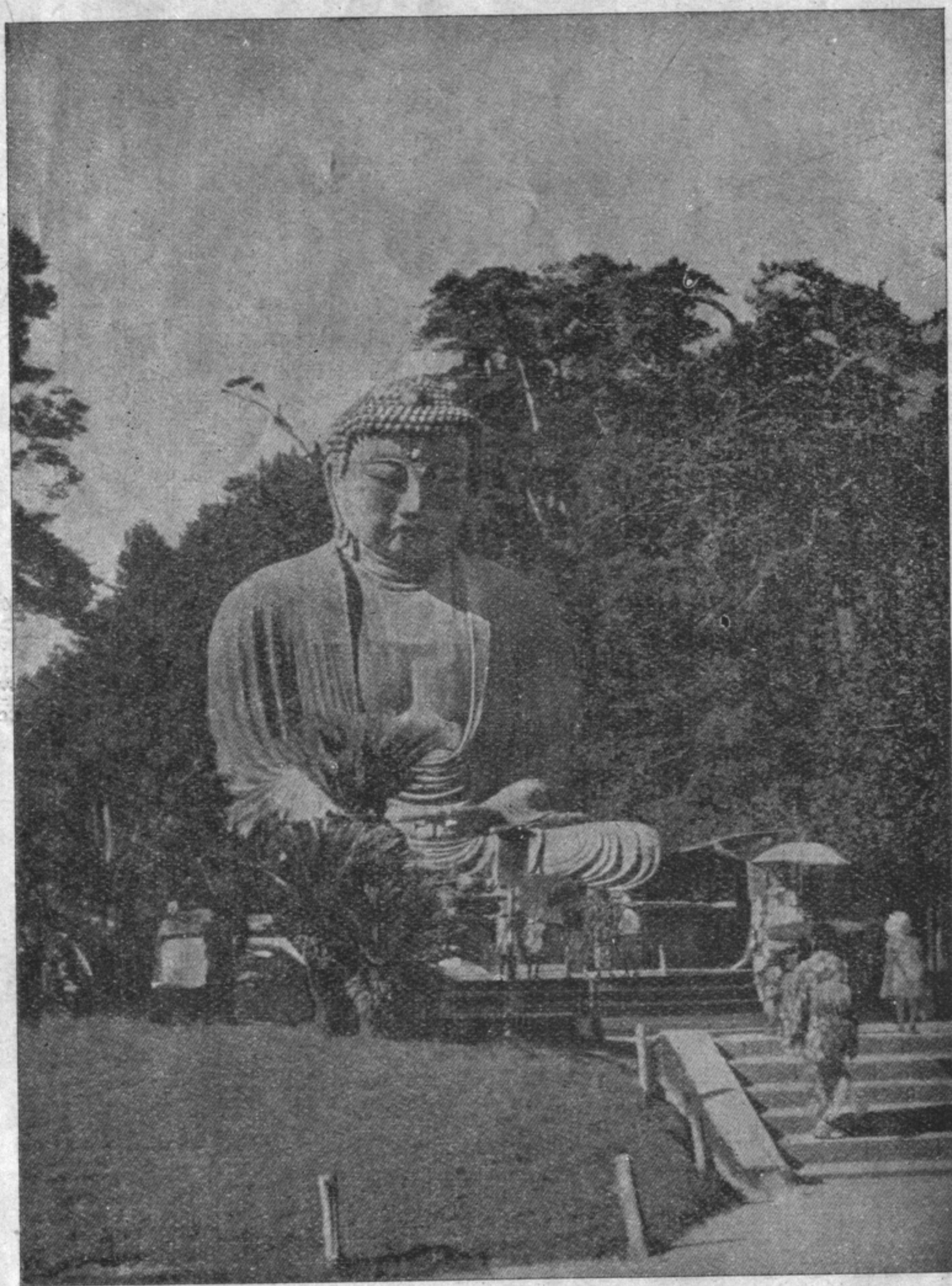
মাছের খাঁচা

বাল্‌তি চাপা দিয়া অক্টোপাশের ছানা ধরা

না ; এক কামরায় গা খুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে অকুণ্ঠিত ভাবে স্নান করে। এক জন ইংরেজ যে লিখিয়া গিয়াছেন—Privacy is not much observed in Japan this word is difficult to translate—সে কথা খুব সত্য। নিক্কোয় একটি বিশাল হ্রদ আছে—চুজেঞ্জি। এ হ্রদের দৃশ্য-মাধুরী স্বর্গীয়! ৩৩০ ফুট উঁচু গিরি-মুখ হইতে অজস্রধারে জল পড়িতেছে। সে জলধারার উপ

আশাফুশা মন্দির-প্রাঙ্গণে পায়রাদের দানা খাওয়ানো
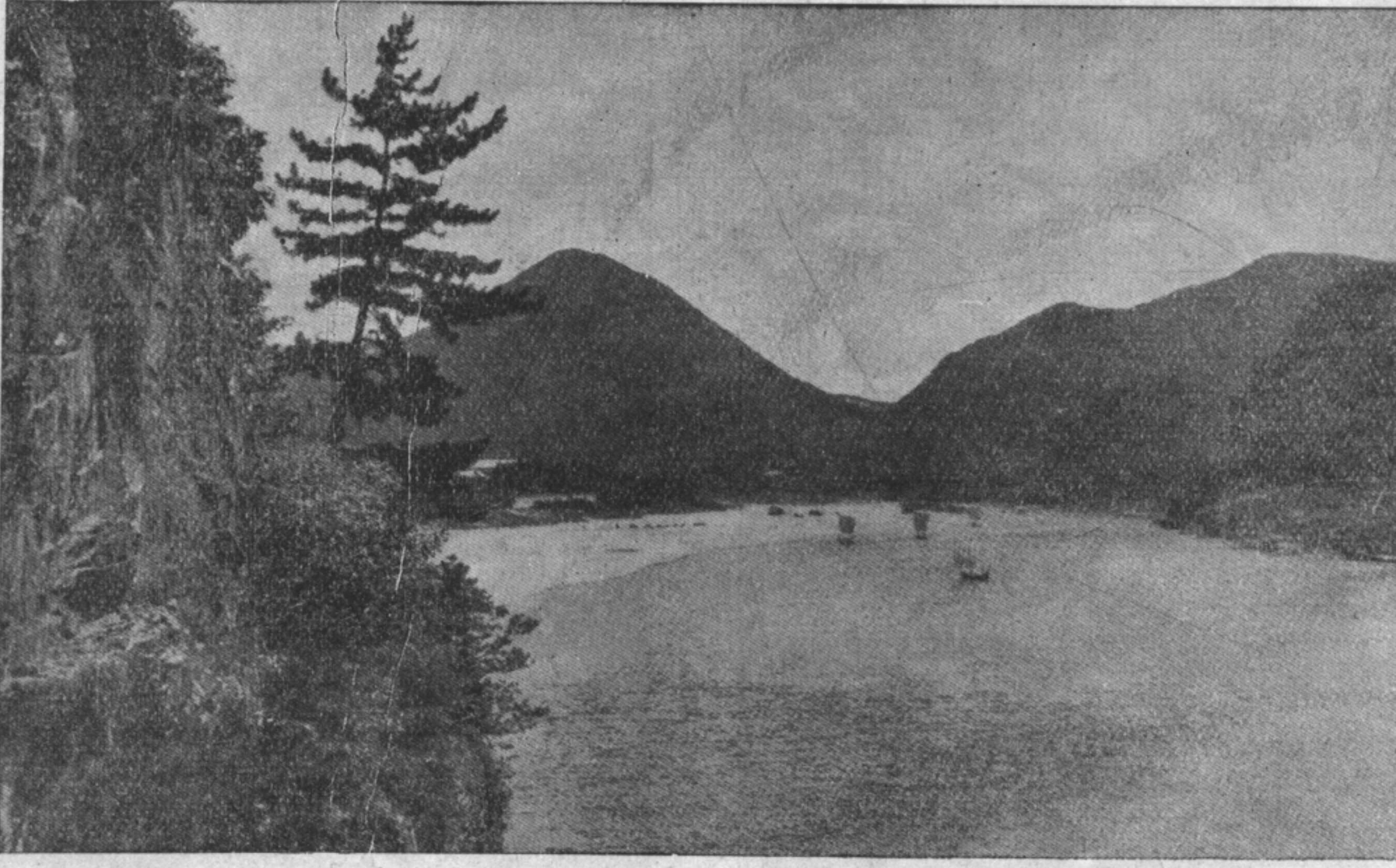
কিশো নদী—(জাপানের 'রাইন্')—এ নদীতে ষ্টীমার চলে না

সূর্য্যকিরণ পড়িলে মনে হয়, যেন রূপালি সূতার ঝালর দুলিতেছে! শীতের সময় এ জল জমিয়া নানা রঙে রঙীন তুষার-কণিকায় স্ফটিক রচনা করে।

নিক্কো হইতে লেখক ইয়োজো নোমুরায় গিয়াছিলেন ট্রেণে চড়িয়া। হোটেল হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পথ দু'ধারে লাল রঙের অজস্র ক্রিপটোমেরিয়া ফুলে রাঙা হইয়া আছে! ছোট ছোট নদী—তীরে ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে, তাদের মায়েরা নদীর জলে কাপড় কাচিতেছে; নদীর ধারেই চা তৈয়ারী হইতেছে; পাত্রে ভাত ফুটিতেছে—ঘরকর্ণার কাজ বাহিরেই সকলেই সারিয়া লয়!

এখানে ছোট একটি মিল আছে। এ-মিলে লোহার চিহ্ন নাই! কাঠ, পাথর এবং চামড়া দিয়াই মিলের যন্ত্রপাতি কলকব্জা তৈয়ারী।

ইংরেজী ভাষাকে জাপানীরা একেবারে যেন নিজের করিয়া লইয়াছে। সাইনবোর্ড লেবেল ডাকটিকেট সিগারেটের বাক্স—এ সব জিনিষের উপর নাম-ধাম ইংরেজী অক্ষরে ছাপা। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষা অবশ্য-পাঠ্য-তালিকাভুক্ত এবং জাপানী কুলি-মজুরের দলও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথা কহিয়া কাজ চালাইতে চমৎকার পটুতা লাভ করিয়াছে।

পথে একটি গ্রাম দেখিলাম। নাম সেনদাই। এ গ্রামে প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার লোকের বাস। এই সেনদাই হইতে এক দিন ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে রাজদূত হাশেকুরা রকুয়েমন্ রাজকার্য্য-ব্যপদেশে রোমে গিয়াছিলেন। সেনদাইয়ের কাছে দেবদারু-কুঞ্জসেবিত মাৎসুইমা দ্বীপপুঞ্জ—ছোট বড় বহু দ্বীপ লইয়া গঠিত। একটি দ্বীপে বহু বৎসরের প্রাচীন একটি বৌদ্ধ-মন্দির আছে।

এ দ্বীপে জলের কোলে অসংখ্য শাম্পান বা নৌকা। পাল তুলিয়া বাতাসের মুখে ছাড়িয়া দিলেই হইল, এ নৌকা তীরের বেগে ছোটে। মাৎসুশিমার গায়ে ইশিনোমাকি উপসাগর—মাছ ধরিবার মস্ত ঘাঁটী। ইশিনোমাকির জল তেমন গভীর নয়! বুকে
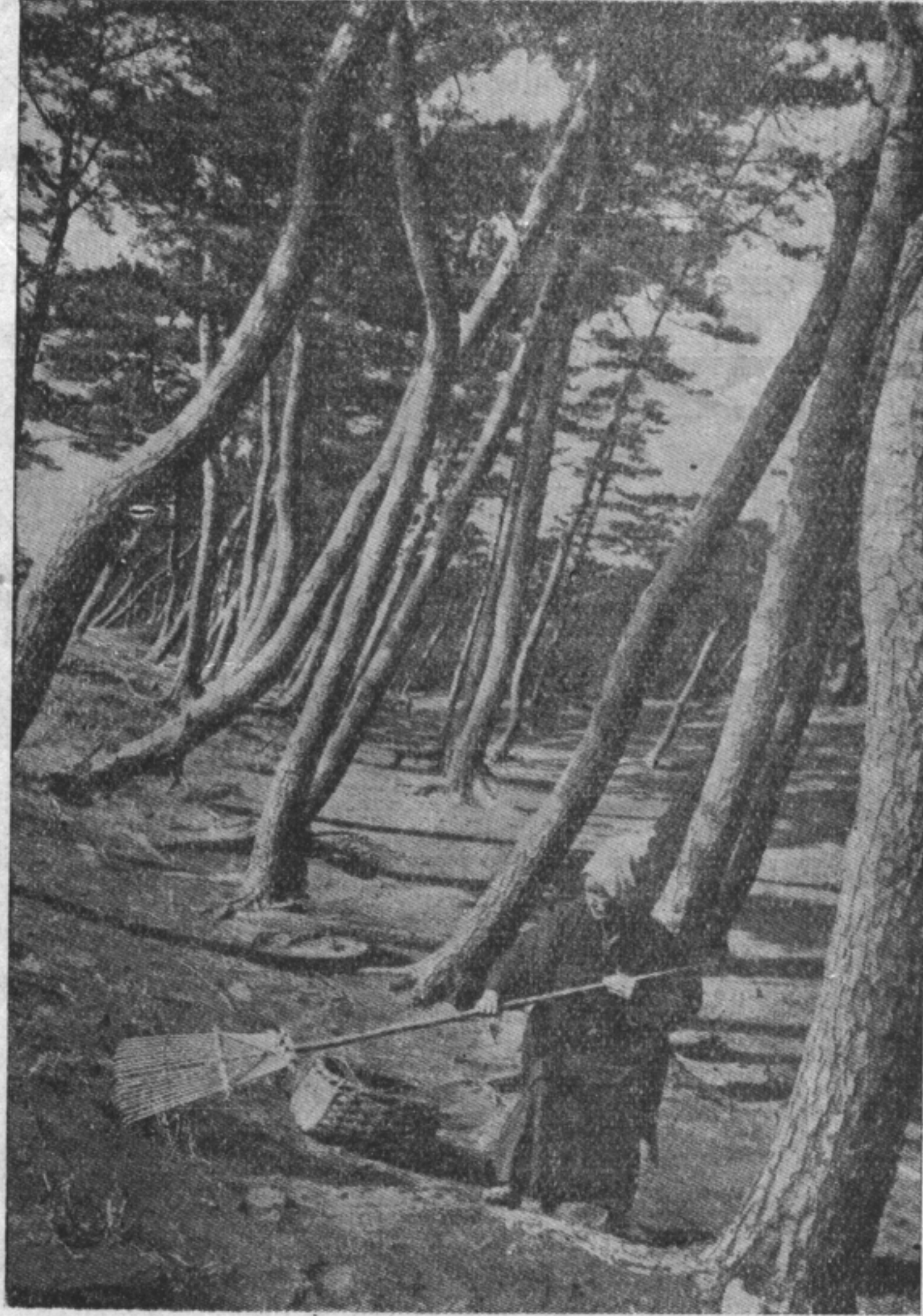
এ গাছের তক্তা খুব মজবুত

শৈবালদামের মধ্যে নানা জাতের মাছ খেলা করিতেছে দেখা যায়, নৌকা হইতে হাত বাড়াইয়া সে-মাছ ধরা চলে—জলে এত মাছ! তীরে বড় বড় খাঁচা সজ্জিত আছে। ধীবরদের খাঁচা। মাছ

ধরিয়া এই খাঁচায় তারা সে মাছ রাখে; তার পর সব মাছ বাজারে চালান যায়।

জাপানে অক্টোপাশের মাংসের খুব আদর! তার স্বাদ না কি মধুর! অক্টোপাশের ছানা ধরিয়া তার মাংস খায়। এ মাংস রাজভোগ! ধরিবার কৌশল অপরূপ। বালতির তলায় কাচ লাগাইয়া সেই বালতি চাপা দিয়া জাপানী ধীবরের দল অক্টোপাশের ছানা ধরে।

লেখক লিখিতেছেন—জাপানে রেলোয়ে-লাইনের পত্তন হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। খেলার ছোটখাট লাইন

দীর্ঘপুচ্ছ মোরগ

আনিয়া ইংরেজ পূর্ত্তশিল্পী বেরি সম্রাটের প্রাসাদের চারি দিকে লাইন পাতেন। সে-লাইনে খেলার ট্রেন চলিত। দেখিয়া সম্রাট্ বিমুগ্ধ হইয়া তখনি রেল-পথ নির্ম্মাণের আদেশ দেন।

এখন জাপানের অঙ্গ ভেদ করিয়া শিরা-উপশিরার মত অজস্র রেলোয়ে-লাইন বিন্যস্ত। পাঁচ-মিনিট, সাত-মিনিট, আট-মিনিট অন্তর ট্রেন ছাড়িতেছে। ট্রেনের ভাড়াও খুব সস্তা। জাপানীরা বেড়াইতে খুব ভালোবাসে। সময় পাইলেই টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চড়িয়া যতখানি পারে, বেড়াইয়া আসে।

আওমোরির কাছে তামাকের সমৃদ্ধ চাষ-আবাদ। এ-তামাকের চাষ গবর্ণমেণ্টের খাশে আছে। আইন এমন কঠিন যে, তামাকের
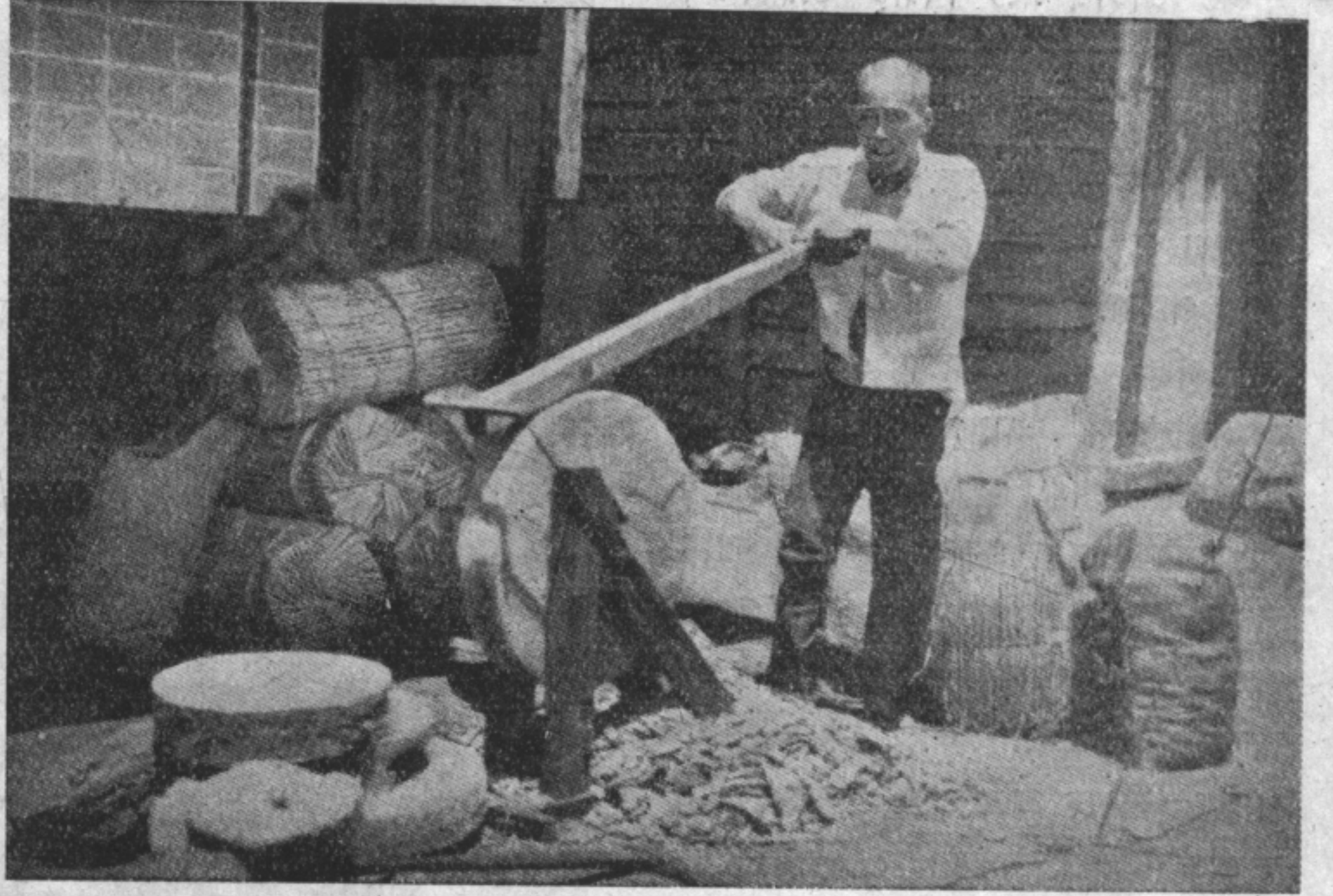
স্তয়-বীনের পিণ্ড
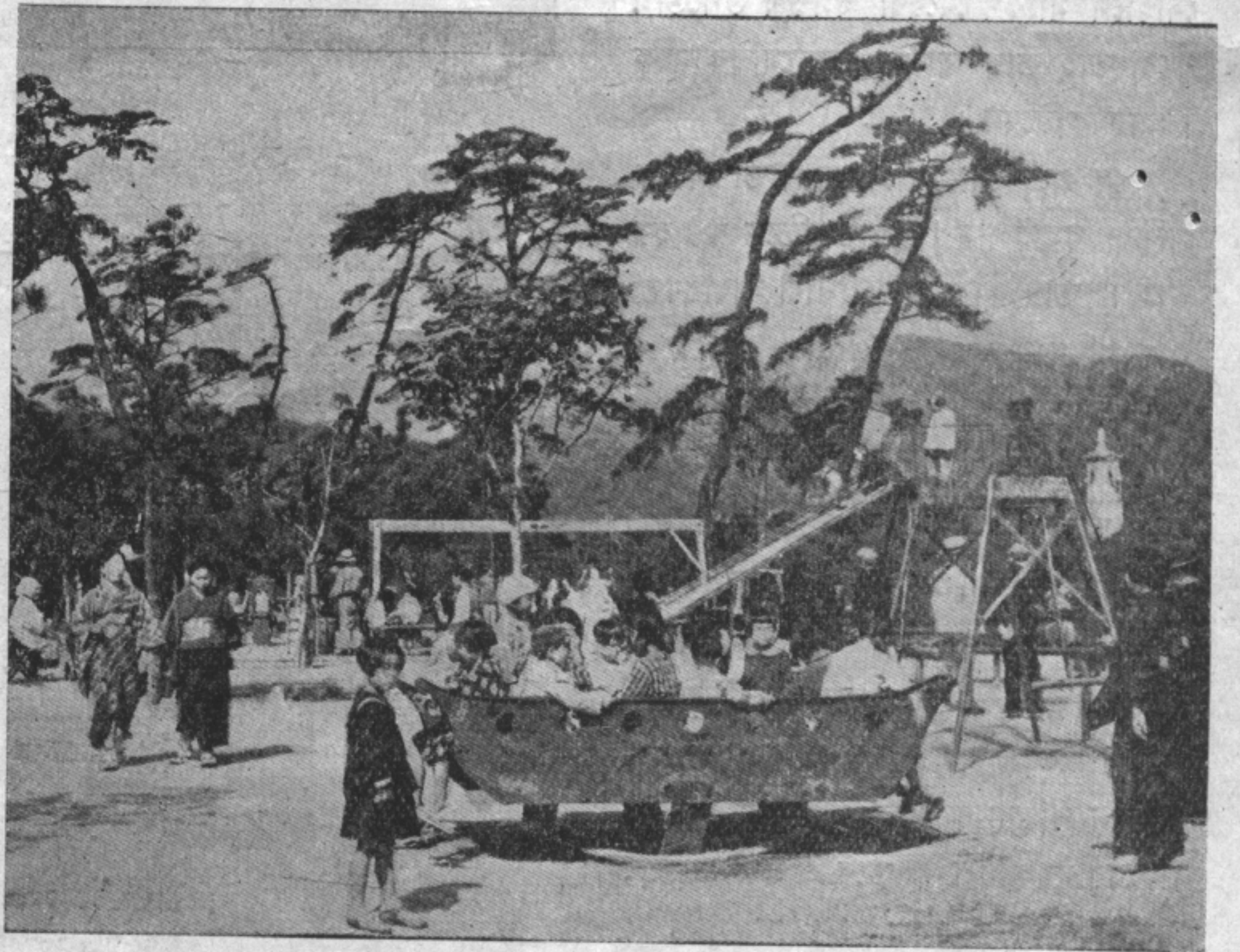
ছোটদের খেলার পার্ক

একটি পাতা কেহ ছিঁড়িতে পারে না! চাষারা চাষের তামাকের পাতা লইবে, সে উপায় নাই! চাষের তামাক পুরাপুরি গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগে বুঝাইয়া জমা দিতে হয়—সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্ধারিত হারে দাম মেলে। নিজের হাতে চাষ করিলেও চাষাকে তামাক পাতা কিনিয়া তবে তার স্বাদ লইতে হয়!

আওমোরিকে বলে হোক্কাইদোর তোরণ! হোক্কাইদো জাপানের

আলাস্কা ! সমস্ত জাহাজী-চালানী জিনিষ সুমারু অন্তরীপ হইয়া প্রথমে আসে এই হোস্কাইদোয়। সমুদ্র পার হইতে হয় রাত্রে। দিনে পার হইবার ব্যবস্থা নাই। এ জন্য জাহাজ-ঘাটে বিরাট্ ওয়েটিং-রুম আছে এবং সে ওয়েটিং-রুমে যাত্রীর ভিড়ও জমে বিরাট্ রকম।

লেখক লিখিতেছেন,—জাহাজের জন্য আসিয়া ওয়েটিং-রুমে বিশ্রামের জন্য আমি স্থান পাইলাম না! বাহিরে পায়চারি করিতেছি, এমন সময়ে এক সুদর্শনা জাপানী-তরুণী আমাকে তাঁর আসন ছাড়িয়া দিলেন। ইংরেজী ভাষায় পরিচয়ের আদান-প্রদান হইল। আমি আমেরিকান্—শুনিয়া তরুণী বেশ গম্ভীর ভাবেই, আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—আমেরিকায় গেলে আমেরিকান্ স্বামী পাইব—বিবাহ করিতে? আমেরিকান্ স্বামীদের দরদ, মমতা, প্রীতি, স্নেহের বহু কথা তিনি বইয়ে পড়িয়াছেন, সে কথা বলিলেন। বলিলেন, স্বামীর আদরে-সোহাগে মার্কিণ মেয়েরা স্বর্গসুখ উপভোগ করে, তাই তাঁর বাসনা, আমেরিকান্‌কে বিবাহ করিবেন!

সে রাত্রে বোটের মাদুর-পাতা মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইলাম। অত ভিড়ে কষ্ট হয় নাই। তার কারণ, জাপানীরা সাধারণতঃ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। গায়ে ও জামা কাপড়ে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না!

অন্তরীপ পার হইয়া প্রথমে আসিলাম স্যাপোরায়। এক জন বন্ধুর দেখা মিলিল। তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। বন্ধুটি কৃতবিদ্য। প্রায় বলিতেন, আমেরিকার প্রধান গৌরব তার বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি। বন্ধু বলিলেন,—আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। আমাদের অনেক শিক্ষার দরকার। তবে এ কথাও ঠিক, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জাপান বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তির জোরে পৃথিবীর অন্য শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে একাসনে বসিবে।

স্যাপোরার পরেই সারি সারি অসংখ্য গ্রাম। গ্রামগুলির মধ্যে সিরায়োই বেশ সমৃদ্ধ! সিরায়োই গ্রামে দীর্ঘশ্মশ্রু বহু বৃদ্ধের বাস। ইঁহারা প্রাচীন আইনু-বংশীয়। এ-জাতির বিবাহিতা রমণীরা দুই ঠোঁটে চিত্রবিচিত্র নক্সা আঁকেন। এ নক্সা

নমস্কার

খাবারের দোকান—ওশাকা

স্কুলের জিম্‌নাশিয়াম্‌

এয়োতির চিহ্ন। সিরায়োইয়ের অদূরে ওহুমা হ্রদ। এই হ্রদের অদূরে কোমাগাটাকে আগ্নেয়-গিরি—মাথায় ৩৭৪০ ফুট উঁচু। এ আগ্নেয়-গিরি হইতে প্রায়ই অগ্নি-স্রাব হয়। এক বার এই গিরির অগ্নিবর্ষণে সতেরো মাইল দূরবর্ত্তী হাকোডেট সহর প্রায় ধ্বংস হইতে বসিয়াছিল। হঠাৎ ঝড়ো বাতাস উঠিয়া সহর রক্ষা করিল। সে-বাতাসে গিরি-নিঃসৃত অগ্নিকণাগুলি বিপরীত দিকে উড়িয়া উচিয়ুরা উপসাগরে গিয়া পড়ে।

জাপানের পাহাড়গুলি রুক্ষ অগ্নিশুষ্ক! সে জন্য এ সব পাহাড়ের অধিকাংশই চাষ-বাসের অযোগ্য। কোমাগাটাকে পূর্ব্বে আরো উঁচু ছিল! বহু বৎসর পূর্ব্বে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে মাথার উপরকার

কলা-ভবনের শিক্ষা

এক-তৃতীয়াংশ ফাটিয়া বহুদূর সাগর-জলে গিয়া পড়ে।

কোমাগাটাকের কোলে রাস্‌প্‌বেরির অজস্র কুঞ্জ—ফলে ভরিয়া আছে।

আওমোরি হইতে আকিতা পর্য্যন্ত সমুদ্রের ধারে-ধারে জাপানী গ্রাম ও ঘর-বাড়ীর চেহারার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার মত। সহরের বাড়ী-ঘরে পাকা ছাদ, ছাদে অগ্নি-নিবারক টালি। গ্রামে সব বাড়ী খড়ে ছাওয়া। সমুদ্রের ধারে যে-সব ঘর-বাড়ী, সেগুলি বেশ মজবুত ভাবে তৈয়ারী করা হয়। বন্যায় সেগুলি সহজে ভাসে না বা নষ্ট হয় না।

নিগাতায় লোক-জন বোটে বাস করে।

লেখক লিখিতেছেন—জাপানী গ্রামগুলির মোহ আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল! কোনো গ্রাম না দেখিয়া ছাড়ি নাই! নাওয়েৎসু, তোয়ামা, কানাজাওয়া, ফুকুই প্রভৃতি গ্রামগুলি রেলোয়ে-লাইনের গায়ে গায়ে অবস্থিত। সবগুলিতেই ষ্টেশন আছে। ট্রেণ-যাত্রীর জন্য প্রতি ষ্টেশনে সব সময়েই ভাত-তরকারী কিনিতে পাওয়া যায়। মাইজুরু হইতে লোকাল ট্রেণে চড়িয়া আমানো-হাশিদেতে আসিলাম। এ সহরটি স্বর্গের সেতু। এই সেতু দিয়াই না কি ভগবানের পুত্র আসিয়া সম্রাট্-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! সরু একখণ্ড জমি সোজা গিয়া মিশিয়াছে জাপান-সাগরের বুকে—এই জমিটুকুই সেতু-গর্ব্বে ধন্য হইয়াছে।

হোন্‌শুর ওপারে মিয়াজিমা দ্বীপ। এখানে জলের বুকে লাল রঙের বহু স্তম্ভ আছে। জাপানে এইরূপ স্তম্ভ দেখিলে বুঝিতে হইবে, নিকটে মন্দির আছে। মিয়াজিমায় এই স্তম্ভের গায়ে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স আরিশুগাওয়া তারুহিতো মন্দিরের সম্বন্ধে স্বহস্তে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। লেখা-লাইনগুলি লম্বে ৭৩ ফুট।

মিয়াজিমায় অসংখ্য হরিণ। তারা ভয়-ডর জানে না; পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাদের উৎপাতে ক্ষেতের ফশল ও বাগানের ফলমূল রক্ষা করা দায়।

আইনু জাতি—শিরায়োই

ঠ্যালা-গাড়ার পশরা

মিয়াজিমা দুর্গ সুরক্ষিত। এখানে শ্বেত-পাথরের বিরাট্ একটি অশ্ব-মূর্ত্তি আছে। লোকে বহু কষ্ট করিয়া ফশলের অর্ঘ্য আনিয়া এই মূর্ত্তির পায়ে পূজা নিবেদন করে। এ মূর্ত্তির পূজা করিলে অজন্মা কাটিয়া শস্য-সম্পদে ভূমি ভরিয়া ওঠে!

লেখক লিখিতেছেন—সমুদ্রের তীরে নানা রঙের কাঁকড়া দেখিলাম—মাছরাঙা পাখীর দলও দেখিলাম, মহানন্দে মাছ ধরিতেছে।
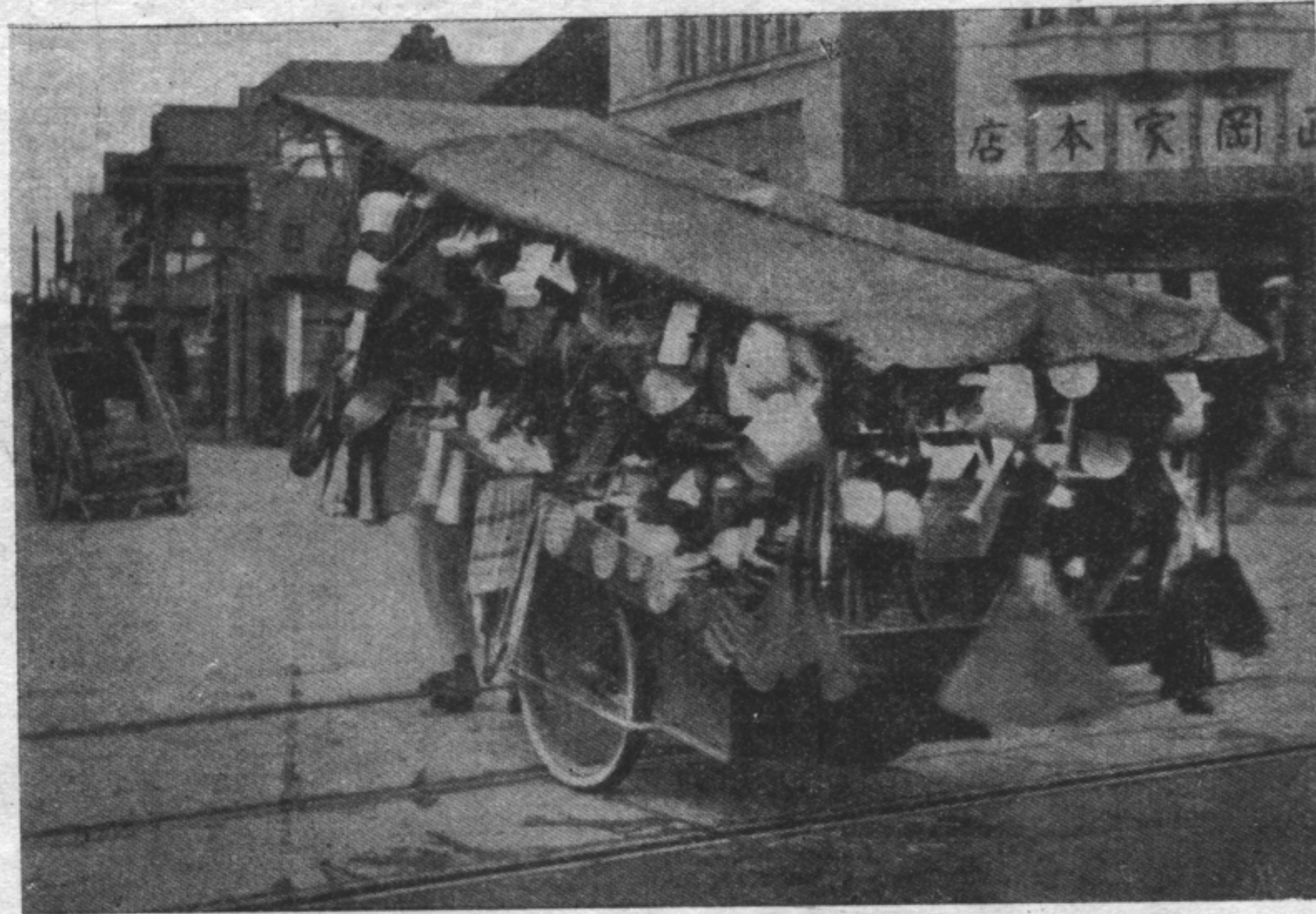
মোজির কাছে শিমোনোয়েসৃকি—দু'জায়গার মধ্যে সরু একটি খালের ব্যবধান। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানগুলি এমন দুর্ভেদ্য দুর্গাদির দ্বারা সুরক্ষিত যে, শিমোনোয়েসৃকিকে অনেকে বলেন, প্রাচ্য জগতের জিব্রালটার! শিমোনোয়েসৃকি হইতে এক রাত্রির গাড়ির পথে চোশেন্ বা প্রাচীন কোরিয়া। মাঞ্চুতিকুয়োর সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যাপারে শিমোনোয়েসৃকি এবং চোশেন—এদিক্‌কার দু'টি প্রধানতম কেন্দ্র।

জাপানে প্রজার সঙ্গে রাজার অন্যতম সর্ত্ত, প্রয়োজন ঘটিলে ফৌজদলে যোগ দিয়া প্রজাদের লড়াই করিতে হইবে; না করিলে জমি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইবে।

জাপানে এক-জাতের বীন্ জন্মায়, সে বীনের মোটা মোটা পিণ্ড তৈয়ারী করিয়া জমির সারের কাজে তাহা ব্যবহার করা হয়। সারের কাজে এ কেক না কি অব্যর্থ! কেক-গুলি দেখায় যেন গরুর গাড়ীর চাকা!

জাপানে আবর্জ্জনা বলিয়া কোনো বস্তু ফেলিয়া দেওয়া হয় না। অতি তুচ্ছ বলিয়া জাপানে কোনো সামগ্রী নাই। আবর্জ্জনাকেও জাপানীরা নানা কাজে লাগাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী তৈয়ারী করে—করিয়া বেচে; বেচিয়া পয়সা রোজগার করে। জাপানীর বুদ্ধি ও শ্রমশক্তির তুলনা নাই। তার উপর যে কাজ তারা করে, তাহাতে প্রাণ-মন সঁপিয়া দেয়। এই আন্তরিকতার গুণেই এত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পে-বাণিজ্যে জাপান সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে!

জাপানে কল-কারখানার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িলেও জাপানীর হাত এখনো আলস্যে বিজড়িত হয় নাই। ধানের চাষে এখনো সাবেকী প্রথায় হাত দিয়া বোনা ও ঝাড়া-মাপার কাজ চলিতেছে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে কাজে কাহারো কামাই দেখা যায় না। রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য চাষা-চাষীরা গায়ে খড়ের তৈয়ারী জামা, মাথায় খড়ের টুপি আঁটিয়া ক্ষেতে অবিরাম কাজ করে।

পথে যে-সব ফিরিওয়ালার দেখা মেলে, তারা ঠেলাগাড়ীতে খাবার-দাবার হইতে সুরু করিয়া রুজ, ক্রীম, জুতার পালিশ, হাতপাখা, খেলনা—সর্ব্ববিধ দ্রব্যের পশরা লইয়া বাহির হয়। গাড়ীর মাথায় আচ্ছাদন আছে; কাজেই রৌদ্র-বৃষ্টিতে তাদের কাজ বন্ধ থাকে না।

তোকিয়ো-সীমান্ত: এখানে পাশপোর্ট দেখা হয়

পাকা রাস্তা—হোন্‌শু

জাপান দেখিয়া একটা কথা মনে হয়, জাপান যেন স্বপ্নের দেশ! রঙের দেশ! ফুলের দেশ! উৎসবের দেশ! এত রকমের ফুল ফোটে যে, তার আর সংখ্যা নাই! ঋতু-ভেদে গ্রামে-গ্রামে সহরে-সহরে নানা উৎসবের সাড়া পড়ে; মেলা বসে; নৃত্য-গীতে পূজার্চ্চনায় লোকে যেন মাতিয়া ওঠে।

বসন্তে ফুলের হাসি যখন দিকে-দিকে বিকশিত হইয়া ওঠে, তখন উৎসব-আনন্দ একেবারে সীমাহীন হয়। মন্দিরের ছাঁদে কাগজের অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির তৈয়ারী করিয়া ছেলেমেয়েরা সে সব কাগজের মন্দির পুষ্পভারে ভূষিত করে; করিয়া দেবমন্দিরে লইয়া যায়—মিছিল করিয়া। মন্দিরে ধূমধামে পূজার্ঘ্য নিবেদিত হয়। প্রতি দলের সঙ্গে এক জন করিয়া শিন্তো পুরোহিত থাকেন।
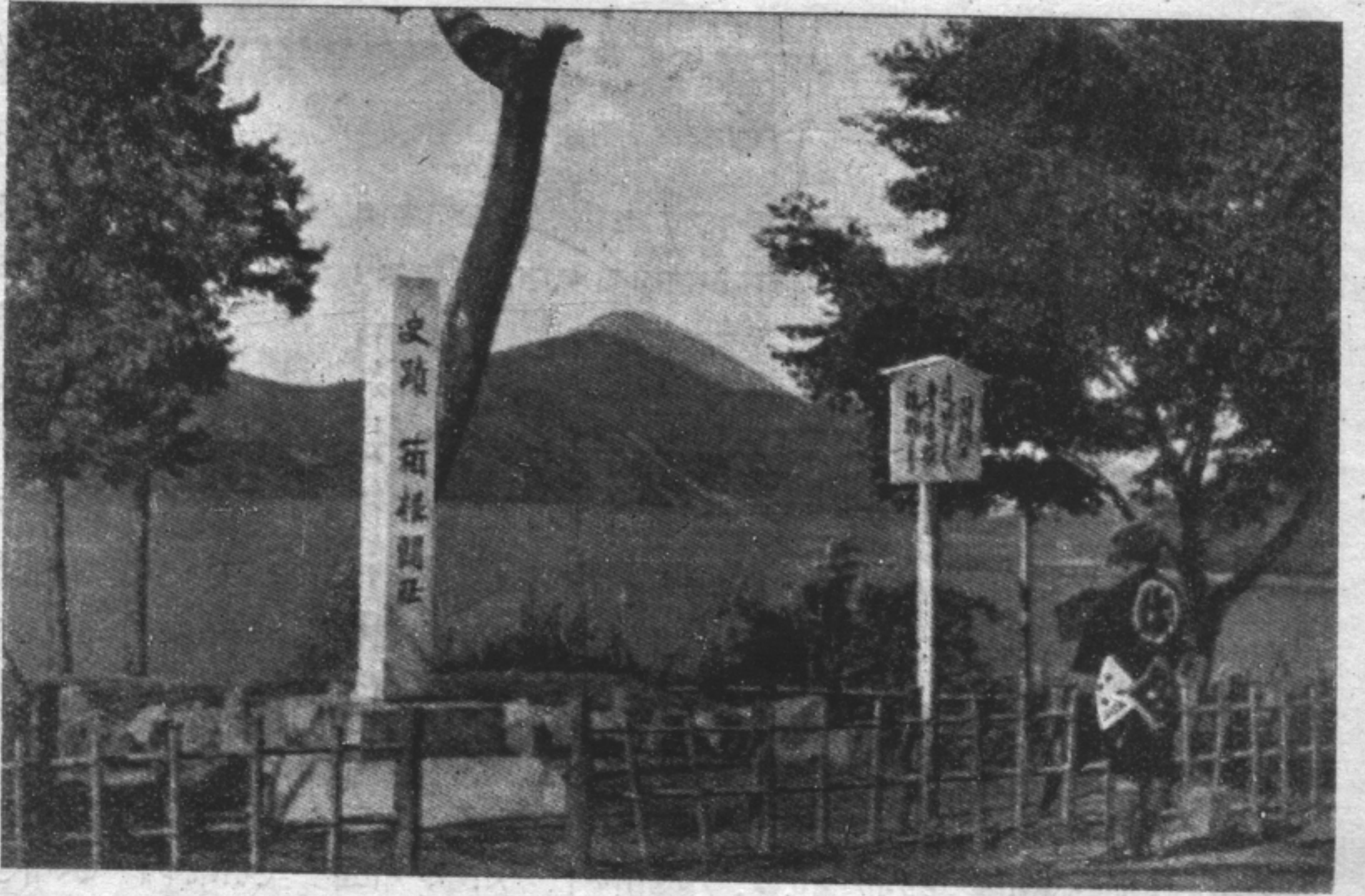
শিল্প-বিজ্ঞানে অসাধারণ পটুতা লাভ করিলেও জাপান তার ধর্ম্ম-বিশ্বাস এতটুকু ত্যাগ করে নাই! সে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দরুণ দেশের নামে তারা বর্ব্বর নৃশংস হইতে এতটুকু কুণ্ঠাও বোধ করে না। এ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য স্নেহ মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিতেও তাদের বাধে না! এমন অমানুষিক বৈশিষ্ট্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোনো জাতের মানব-চরিত্রে দেখা যায় না!

সাহিত্যদর্পণে বিবৃত হইয়াছে—ভয়ানক-রসের স্থায়িভাব ভয়, কাল অধিদেবতা, স্ত্রী-নীচ-প্রকৃতি প্রভৃতি উহার নায়ক বা পাত্র, বর্ণ কৃষ্ণ। যাহা হইতে ভীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই উহার আলম্বন। আলম্বনের ঘোরতর চেষ্টাসমূহ উদ্দীপন। বৈবর্ণ্য-গদ্গদ-প্রলয়-স্বেদ-রোমাঞ্চ-কম্প-দিগবলোকন প্রভৃতি অনুভাব। জুগুপ্সা-আবেগ-সম্মোহ-সন্ত্রাস-গ্লানি-দীনতা-শঙ্কা-অপস্মার-সম্ভ্রান্তি-মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারী (১)।

নীচ-পাত্রে উৎপন্ন ভয়ানক-রসের প্রসিদ্ধ উদাহরণ শ্রীহর্ষের রত্নাবলীতে দৃষ্ট হয়—'মনুষ্য-নামের অযোগ্য নপুংসক রাজপুর-চারী ভৃত্যগণ বানর-ভয়ে লজ্জা ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে—বামনাকৃতি ভৃত্যটি ভয়ে কঞ্চুকীর কঞ্চুকের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়াছে'—ইত্যাদি। স্ত্রীলোকে উৎপন্ন ভয়ানক-রস, যথা—'ইন্দ্রের বজ্র স্মরণে দৈত্য-স্ত্রীগণের গর্ভপাত হইয়া থাকে', ইত্যাদি। বালক-পাত্রে ভয়ানক, যথা—'ঘোর মেঘ-ধ্বনি শ্রবণে ব্রজ-বালকগণ কম্পিত কলেবরে ও বিকৃত কণ্ঠে মাতার অঙ্কে লুকাইত'—ইত্যাদি (২)।

দশরূপকে ধনঞ্জয় বলিয়াছেন—বিকৃত-স্বর-বিশিষ্ট প্রাণিগণ হইতে উৎপাদিত ভয়-ভাবই ভয়ানক-রস। ইহার ব্যাখ্যায় ধনিক বলিয়াছেন—রৌদ্র-শব্দ শ্রবণে বা রৌদ্র-প্রকৃতি প্রাণীর দর্শনে ভয়-স্থায়িভাব-সমুৎপন্ন রসই ভয়ানক। সর্ব্বাঙ্গ-বেপথু, স্বেদ, শোষ, বৈবর্ণ্য, বৈচিত্ত্য (চিত্তের অস্থারস্য) ইহার অনুভাব। দৈন্য-সম্ভ্রম-সম্মোহ-ত্রাসাদি ব্যভিচারী (৩)।

ভাবপ্রকাশনে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ভয়-স্থায়িভাব ভয়ানক-রসের উপাদান-হেতু। ভয় চিত্তের চলন। যাহা হইতে স্বয়ং ভয় পায় বা অপরকে ভয় পাওয়ান যায়, তাহাই ভয় বা ত্রাস (৪)।

শঙ্কা-নির্ব্বেদ-চিন্তা-জাড্য-গ্লানি-দীনতা-আবেগ-মদ-উন্মাদ-বিষাদ-ব্যাধি-চিন্তা-মোহ-অপস্মৃতি-(অপস্মার)-ত্রাস-আলস্য, মধ্যে মধ্যে স্তম্ভ-কম্প, রোমাঞ্চ-স্বেদ-বেপথু-বৈবর্ণ্য-মরণ-ত্রাস-গদ্গদ প্রভৃতি ভয়ানকে ব্যভিচারী। মহারণ্যে প্রবিষ্ট, মহাসংগ্রামকারী, গুরু ও রাজার নিকট অপরাধিগণ ভয়ানকের আলম্বন বিভাব।

ভয়ানকের উদ্দীপন বিভাবগুলির পারিভাষিক সংজ্ঞা 'বিকৃত'। যে বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-স্পৃষ্ট হইলে বিকৃতি উৎপাদন করে, সেইগুলিকে 'বিকৃত' ভাব বলা হয় (৫)। এই সকল বিকৃত বিভাব যখন স্বযোগ্য সহকারি ভাবগুলির সহিত নাট্যকর্ম্মে (অভিনয়ে) সমাশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবে (ভয়ে) অবস্থান করে, তখন প্রেক্ষকগণের মন চিন্তাবস্থায় উপনীত ও তমঃ-সত্ত্ব-দ্বারা অম্বিত হইয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থাপন্ন মনের যে বিকার, তাহাই ভয়ানক-রস (৬)। ইহাই বাসুকি-মত।

নারদমতে বাহ্য-বিষয়াশ্রিত সত্ত্ববুদ্ধি-বিহীন তমোম্বিত মন হইতে ভয়ানকের উৎপত্তি (৭)। বাসুকি-মতে সত্ত্বের সূক্ষ্মরূপে অন্বয় স্বীকৃত হয়, নারদমতে তাহা হয় না—ইহাই মাত্র বিশেষ।

ভয়ানক-পদের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—'ভী' ধাতু ভয়-বাচক। 'ভয়' শব্দের অর্থ চলন। কর্ম্ম-বিশেষ-দ্বারা যখন কেহ স্বয়ং চলিত হয় (অর্থাৎ—কোন ভাববিশেষ-হেতু যখন কেহ চঞ্চল হইয়া উঠে), অথবা যখন ঐরূপ ভাব-বিশেষ-দ্বারা অপরকে চালিত করা হয়, তখন বলা হয়—অমুক ভয় পাইয়াছে অথবা অমুক অমুককে ভয় দেখাইতেছে। এই কারণেই বলা হয়, ভয় চলনাত্মক। কোন প্রাণীর ভয় বা আক্রোশ বশে উৎপন্ন রসই ভয়ানক (৮)।

ভয়ানক-রসের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ব্রহ্ম-সভায় ভরতগণ-কর্ত্তৃক শম্ভুর কল্পান্ত-কর্ম্মের (প্রলয়-কালীন সংহার-লীলার) অনুকরণ নিপুণ ভাবে অভিনীত হইতে দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে ভারতী বৃত্তি ও তদুৎপন্ন বীভৎস-রসের আবির্ভাব ঘটে। এই বীভৎস হইতে আবার ভয়ানক

(১) বৈবর্ণ্য-স্বেদ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব হইলেও সাধারণতঃ সাত্ত্বিকভাবগুলি অনুভাবমধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জুগুপ্সা—ইহা বীভৎসের স্থায়িভাব। এক রসের স্থায়ী অন্য রসে ব্যভিচারী হইতে পারে। সম্ভ্রান্তি—উন্মাদ (রামতর্কবাগীশ)।

(২) নীচ-পাত্রের দৃষ্টান্ত—"নষ্টং বর্ষবরৈর্ম্মনুষ্যগণনাভাবাদপাস্য ত্রপামন্তঃকঞ্চুকিকঞ্চুকস্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ" ইত্যাদি (রত্নাবলী)। স্ত্রী-পাত্র—"ইদং মঘোনঃ কুলিশং ধারাসন্নিহিতাননম্। স্মরণং যস্য দৈত্যস্ত্রীগর্ভপাতায় কল্পতে" ॥ (রাম-তর্কবাগীশ-টীকা)। বালক-পাত্র—"ঘোরমম্ভোধরধ্বানং নিশম্য ব্রজবালকাঃ। মাতুরঙ্কে ব্যলীয়ন্ত সকম্পবিকৃতস্বরাঃ" ॥ (রাম-তর্কবাগীশ-টীকা)।

(৩) বিকৃতস্বরসত্ত্বাদের্ভয়ভাবো ভয়ানকঃ। সর্ব্বাঙ্গবেপথু-স্বেদশোষবৈচিত্ত্যলক্ষণঃ। দৈন্যসম্ভ্রমসম্মোহত্রাসাদিস্তৎসহোদরঃ"। দশরূপক (৪।৮০)

(৪) "ভয়ং চিত্তস্য চলনং তচ্চ প্রাদুরনেকধা। বিভেতি ভাপয়ত্যস্মান্ ত্রাসাদিস্ত্বমুচ্যতে" ।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ পৃঃ ৩৫-৩৬।

(৫) "ভয়ানকস্য বিকৃতা বীভৎসস্য চ নিন্দিতাঃ।... বিষয়াস্ত্বিন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃষ্টা বিকৃতিং জনয়ন্তি যে। তে ভাবা বিকৃতাঃ খ্যাতা ভয়ানকবিভাবকাঃ" ।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ৪—৫।

(৬) "যদা তু বিকৃতা ভাবা স্বোচিতৈঃ সহকারিভিঃ। স্থায়িন্যভিনয়োপেতা বর্ত্তন্তে নাট্যকর্ম্মণি। তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং চিন্তাবস্থং তমোঽন্বয়ি। সত্ত্বান্বিতং চ তদ্‌ভূয়ো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। ভয়ানকরসাখ্যং তু লভতে রস্যতে চ তৈঃ" ।—ভাব প্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৫। চিন্তাবস্থ—মনের চিন্তাবস্থা—স্মরণাত্মিকা বৃত্তি। চিত্তের কার্য্য স্মরণ।

(৭) "সত্ত্ববুদ্ধিবিহীনাত্তু মনসস্তমসাহিতাৎ। বাহ্যাদেব সমুৎপন্নো ভয়ানক ইতীরিতঃ" ।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৮।

(৮) "ঞিভী ভয় ইতি প্রায়ো ধাতুঃ স্যাদ্ভয়বাচকঃ। চলনং ভয়শব্দার্থ ইতি বিদ্বদ্ভিরুচ্যতে। বিভেতি ভায়য়ত্যস্মান্ কর্ম্মণেতি যথাক্রমম্। কশ্চিচ্চলতি কস্মাচ্চিদ্ভাবাদ্যেনৈব হেতুনা॥ চাল্যতে চ যতস্তস্মাদ্ ভয়ং তু চলনাত্মকম্। ভয়েনাক্রোশতো জন্তোর্জায়তে যো ভয়ানকঃ" ।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, ৫৯—৫০।

রসের উৎপত্তি। দগ্ধ অসুরগণের অস্থি পরিধানপূর্ব্বক ভৈরব যখন অসুরগণের শ্মশানে অধিষ্ঠান করতঃ উক্ত অসুর-দেহ-ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারই অনুচর প্রমথ-ভূত-সজ্ঘও তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া ভয়-বিমূঢ়-ভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। এই কারণেই বলা হয়, বীভৎস হইতে ভয়ানকের জন্ম (৯)।

ভয়ানকের বিভাবাদি-বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, ইহাতে ভয়-ভাব স্থায়ী। এই ভয় দ্বিবিধ—স্বাভাবিক ও কৃতক (কৃত্রিম) (১০)। বিকটাকার (বিকৃতাকার) প্রাণিগণের দর্শন বা বিকৃত স্বর শ্রবণ, শূন্য অরণ্যাদিতে গমন, সংগ্রামাদিতে প্রবেশ, গুরু-রাজা প্রভৃতির নিকট অপরাধ প্রভৃতি হেতু দ্বারা ইহার উৎপত্তি। অর্থাৎ—ঐগুলিই ইহার বিভাব। ইহার অনুভাবগুলি বাঙ্-মনঃ-কায়-ভেদে ত্রিবিধ। উক্তানুক্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, দিঙ্‌মোহ প্রভৃতি ইহার অনুভাব।

বাঙ্-মনঃ-কায়ভেদে ভয়ানক ত্রিবিধ। উহাদিগের মধ্যে মানস ভয়ানক স্বাভাবিক আর আঙ্গিক কৃত্রিম। দিঙ্‌মোহ, কান্দিশীকত্ব মুহুর্ম্মুহুঃ সহায়ান্বেষণ, পার্শ্ববীক্ষণ, পাণি-পাদ-কম্পন, অঙ্গুলি-দংশন, অভয়-যাচন, দন্ত-দংশন—এইগুলি দ্বারা আঙ্গিক ভয়ানক অভিনেয়। উরুস্তম্ভ, হৃৎকম্প, স্বেদ, চঞ্চল-তারকাযুক্ত দৃষ্টি, শুষ্ক ওষ্ঠ, মুখশোষ, গদ্গদ বাক্য, বিবর্ণতা, বিষয়বোধের অভাব, উক্তানুক্তের অনভিজ্ঞতা (কি বলিল না বলিল—বুঝিতে না পারা) এইগুলি দ্বারা স্বাভাবিক মানস ভয়ানক-রসের অস্তিত্ব সূচিত হইয়া থাকে (১১)।

ভয়ানকের অধিদেবতা কাল। বিকৃতাকারতা, বিকৃতরূপতা—ভয়ানকের অধিষ্ঠান। সংহারকালে কালদেবের ঐরূপ বিকৃতি আসে বলিয়াই তিনি ভয়ানকের অধিদেবতা।

বর্ণ ভয়ানকের কৃষ্ণ—কালদেবের গাত্রবর্ণ সদৃশ। আর অন্ধকারই সর্ব্ববিধ ভয়ের উৎস। এ কারণেও অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণই ভয়ানকের বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শারদাতনয়ের ভয়ানক-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশে মম্মটভট্ট ভয়ানক-রসের দৃষ্টান্ত-রূপে মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটক হইতে বিখ্যাত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে অনুসরণকারী রথের উপর মুহুর্ম্মুহুঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে মৃগটি লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে। শরপতন-ভয়ে তাহার দেহের শেষার্দ্ধ সঙ্কুচিত—মনে হইতেছে যেন উহা পূর্ব্বকায়ে প্রবেশ করিয়াছে। দারুণ শ্রমে মুখব্যাদান করিয়াই দৌড়িতেছে—ফলে মুখভ্রষ্ট অর্দ্ধভুক্ত দর্ভ-কবলে তাহার পথ আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অত্যুগ্র লম্ফ-প্রদানের ফলে তাহার গতি আকাশেই অধিক—পৃথিবীতে অল্প—অর্থাৎ—মাটিতে তাহার পা যেন প্রায় পড়িতেছেই না—আকাশমার্গেই যেন ছুটিয়া চলিয়াছে।

এস্থলে রথ বা রথারূঢ় রাজা দুষ্মন্ত ভয়-স্থায়িভাবের আলম্বন। শরপতনের ভয়ে দৌড়িতেছে বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ ভয় তাহা হইতে নহে। এই কারণে শব্দবাচ্যতা দোষ ঘটে নাই। শরপতনের ভয় ও রথের অনুসরণ উদ্দীপন, গ্রীবাভঙ্গ-পলায়ন প্রভৃতি অনুভাব। শঙ্কা-ত্রাস-শ্রমাদি ব্যভিচারী (১২)।

গোবিন্দ ঠক্কুর প্রদীপে বলিয়াছেন—রৌদ্র-শক্তি-দ্বারা জনিত অন্তরের বৈক্লব্য-দায়ক চিত্তবৃত্তি-বিশেষ ভয়। তৎপ্রকৃতিক ভয়ানক (১৩)।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র-কৃত নাট্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে—পতাকা-কীর্ত্তি-রৌদ্র-আজি-শূন্য-তস্কর-দোষ প্রভৃতি হইতে জাত ভয়ানক-রস। স্তম্ভ-রোমাঞ্চ-কম্পন প্রভৃতি দ্বারা উহা অভিনেয়। পতাকা—রণস্থলে উড্ডীয়মান শত্রুর বিজয়-পতাকা ভয়ের কারণ। প্রতিপক্ষের কীর্ত্তিও প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তরে ভয় জন্মাইয়া থাকে। রৌদ্র—ভীষণাকৃতি ও বিকৃতস্বর পিশাচ উলূক প্রভৃতি। আজি (যুদ্ধ)—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শস্ত্রাঘাত। ইহা হইতে বধ-বন্ধন প্রভৃতিরও সংগ্রহ করিতে হইবে। শূন্য—নির্জ্জন গেহ-অরণ্য প্রভৃতি। দোষ—গুরু-নৃপতি প্রভৃতির প্রতি কৃত অপরাধ। এই সকল বিভাব দৃষ্ট-শ্রুত বা চিন্তিত হইলেও ইহাদিগের নিকট হইতে ভয়-স্থায়ী ভয়ানক রস জন্মে। স্তম্ভ—গাত্রাদির চলনাভাব। কম্পন—হস্ত-পদাদির বেপথু। এই দুইটি হইতেই গাত্র-মুখ-দৃষ্টি-বিকার, গলশোষ, বৈবর্ণ্য, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অনুভাবগুলি সংগৃহীত হইয়া থাকে। শঙ্কা-মোহ-দৈন্য-আবেগ-চপলতা

---

(৯) "যদাভিনীতঃ কল্পান্তকর্ম্ম শম্ভোর্ন টৈস্তদা। ভারতী-বৃত্তিতো জজ্ঞে বীভৎসশ্চোত্তরাননাৎ॥"—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৫৭। ভারতীবৃত্তি—পুরুষ-প্রধান, নটাশ্রিত বাগ্‌ব্যাপার। "দগ্ধানামাদি-দেবানামস্থীন্যামুচ্য ভৈরবে। তচ্ছ্মশানমধিষ্ঠায় তদ্ভস্মালিপ্য নৃত্যতি। প্রমথা ভূতসজ্ঘাস্তমবেক্ষ্য ভ্রান্তচেতসঃ। তমেব শরণং জগ্মুর্যতো ভয়বিমোহিতাঃ। তস্মাদ্ভয়ানকো জাতো বীভৎসাদিতি গণ্যতে॥"—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৫৮।

(১০) "ভয়ানকো ভয়স্থায়ী স্বভাবকৃতকাত্মকঃ"—ভাব প্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৩। স্বভাবকৃতকাত্মক—ইহার অর্থ ইহার স্বরূপ—স্বাভাবিক ও কৃতক। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—স্বাভাবিক ভয়ানক-রস রজস্তমঃ-প্রকৃতিক নীচ জনে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে, উত্তম সাত্ত্বিক-প্রকৃতিক জনের দ্বারা কৃত্রিম ভয়ানক-রসের অভিনয় মাত্র প্রদর্শিত হয়। শারদাতনয়ের মতে মানস ভয়ানক স্বাভাবিক আর আঙ্গিক কৃতক।

(১১) "ভয়ানকঃ সবীভৎসস্ত্রিধা বাক্‌কায়মানসৈঃ। স্বাভাবিকো মানসঃ স্যাদাঙ্গিকঃ কৃতকো ভবেৎ॥"—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৪। কান্দিশীক—পলায়নপর।

(১২) গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্। দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢৈঃ শ্রমবিবৃতমুখ-ভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি॥—শাকু ১।

"রথানুপাধ্বা ভয়ং স্থায়িভাবো ন শরপতনভয়াদিতি ন তস্য শব্দ-বাচ্যতা দোষঃ। পশ্চাদ্‌গচ্ছৎস্যন্দনো রাজা বালম্বনম্। শরপতন-ভয়মনুসরণং চোদ্দীপনম্। গ্রীবাভঙ্গপলায়নাদয়োঽনুভাবাঃ। শঙ্কাত্রাসশ্রমাদয়ো ব্যভিচারিণঃ"—নাগোজীকৃত উদ্দ্যোত।

(১৩) "রৌদ্রশক্ত্যা তু জনিতং চিত্তবৈক্লব্যদং ভয়ম্। তৎকৃতিকো ভয়ানকঃ"।—প্রদীপ; "চিত্তবৈক্লব্যদং—তজ্জনকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ"—উদ্দ্যোত।

ত্রাস-অপস্মার-মরণ প্রভৃতি ব্যভিচারী। আর স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চ-বেপথু-স্বরভেদ-বৈবর্ণ্যাদি সাত্ত্বিক ভাবও সংগ্রহযোগ্য।

শিঙ্গভূপাল রসার্ণব-সুধাকরে বলিয়াছেন—ভয় স্থায়িভাব স্বোচিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব-সংযোগে সদস্যগণের আস্বাদনীয় হইলে ভয়ানক-রসে পরিণত হয়। সন্ত্রাস-মরণ-চাপল-আবেগ-দীনতা-বিষাদ-মোহ-অপস্মার-শঙ্কা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী। মুখশোষাদি ইহার বিকার (অনুভাব)। অশ্রু ব্যতীত অপর সকল সাত্ত্বিক ভাবই ইহাতে প্রযোজ্য।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে কথিত হইয়াছে—উগ্র ও প্রচণ্ড সঙ্ঘাত (সম্বাধ), রাক্ষস-প্রেতাদির দর্শন, শূন্যাগার-মহারণ্য-বধ-বন্ধন-বীক্ষণ, ত্রাস ও আয়াস জনিত উদ্বেগ, শিবা-পেচকাদির ধ্বনি প্রভৃতি বিভাব হইতে স্ত্রীলোক ও নীচগণের ভয়ানক-রস জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গ ও অক্ষির ভেদ, সঙ্কোচ প্রভৃতি, তালু-কণ্ঠ-শোষ, হৃৎ-পাণি-চরণ-কম্প, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহা প্রদর্শনীয়। বৈবর্ণ্য-দৈন্য—আলস্য—ত্রাস-অপস্মার-মৃত্যু—বেপথু-স্বেদ-রোমাঞ্চ—স্বরভেদ-আবেগ-শঙ্কা প্রভৃতি ভাব ব্যভিচারী।

ভয়ানক-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

অতঃপর বীভৎস-রস। ভয়ানকের যে যে বিভাব উক্ত হইয়াছে, বীভৎসের বিভাবগুলির সহিত তাহাদিগের সাম্যের কিছু সম্ভাবনা থাকায় ভয়ানকের অব্যবহিত পরেই বীভৎসের স্থান কথিত হইয়াছে। ইহাই আচার্য্য অভিনবগুপ্তপাদের অভিমত (১৪)।

মহর্ষি বলিতেছেন—বীভৎস-রস জুগুপ্সা-স্থায়িভাবাত্মক। ইহা অহৃদ্য অপ্রশস্ত অপ্রিয় অচোক্ষ্য অনিষ্ট বিষয়-সমূহের শ্রবণ বা দর্শন, ও তজ্জনিত উদ্বেগ বা তত্তৎ বস্তুর পরিকীর্ত্তন প্রভৃতি বিভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে (১৫)। সর্ব্বাঙ্গ-সংহার, মুখাদির বিকূণন, উল্লেখন, নিষ্ঠীবন, উদ্বেজন প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য (১৬)। অপস্মার-উদ্বেগ-আবেগ-মোহ-ব্যাধি মরণ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দুইটি আর্য্যা-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অনভিমত বস্তু দর্শনে, গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দের দোষহেতু ও বহু উদ্বেজন-বশতঃ বীভৎস-রস সমুদ্ভূত হইয়া থাকে (১৭)।

মুখ-নেত্র-বিকূণন, নাসা-প্রচ্ছাদন, অবনমিত মুখমণ্ডল, অব্যক্ত পাদপতন প্রভৃতি দ্বারা সম্যগ্‌রূপে ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য (১৮)।

নাট্যশাস্ত্রের বীভৎস-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে;

সাহিত্যদর্পণে কথিত হইয়াছে—জুগুপ্সা-স্থায়িভাবাত্মক বীভৎস-রস নীলবর্ণ, মহাকালাধিদৈবত; দুর্গন্ধ মাংস-রক্ত-মেদ প্রভৃতি ইহার আলম্বন; ঐ সকল পদার্থে কৃমিসঞ্চার প্রভৃতি উদ্দীপন; নিষ্ঠীবন আস্যবলন (মুখসংবরণ), নেত্র-সঙ্কোচন প্রভৃতি অনুভাব; মোহ-অপস্মার-আবেগ-ব্যাধি-মরণ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

ভট্টনারায়ণ-কবি-রচিত বেণীসংহারে রাক্ষস-রাক্ষসীর দৃশ্যটি এই বীভৎস-রসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দশরূপকে ও তাহার অবলোকে বিবৃত হইয়াছে—কৃমি-পূতিগন্ধি বমথু-বহুল রুধির-তন্ত্র-বসা-কীকস-(অস্থি)-মাংস প্রভৃতি বিভাব হইতে উদ্ভূত বীভৎস-রসের স্থায়িভাব কেবল জুগুপ্সা। বিভাবাদি দ্বারা এই জুগুপ্সারই পরিপোষণ হইয়া বীভৎস উদ্রিক্ত হয়। ইহা অত্যন্ত উদ্বেগকর (উদ্বেগী) ও ক্ষোভের জনক (ক্ষোভণ)। এই বিবরণে নূতনত্ব কিছু নাই। কিন্তু ইহার পর ধনঞ্জয়-ধনিক একটি নূতন কথা বলিয়াছেন। সাধারণতঃ, উদ্বেগজনক অশুচি পদার্থই যে বীভৎস-রসের জনক হইবে—এরূপ নিয়ম নাই। যাহা সাধারণ লোকের নিকট অতি রমণীয়—শৃঙ্গারের উদ্রেক-হেতু সেই রম্য রমণী-শরীরও বৈরাগ্যবশতঃ ঘৃণাজনক ও অশুদ্ধ প্রতীয়মান হইয়া বীভৎস-রসের জনক হইতে পারে। ইহাকে শান্ত-রসও বলা চলে না। কারণ, প্রথমতঃ এই সকল বিভাব দর্শনে জুগুপ্সাগ্রস্ত হইয়া বিরক্ত ব্যক্তি

---

(১৪) "···তদনন্তরং ভয়ানকঃ। তদ্বিভাবসাধারণ্যসম্ভাবনাত্ততো বীভৎসঃ"।—অভিনব-ভারতী, বরোদা সং, নাট্যশাস্ত্র, প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৬১।

(১৫) মূলে আছে—"স চাহৃদ্যা (প্রশস্তা) প্রিয়াচোক্ষ্যানিষ্টা-শ্রবণদর্শনোদ্বেজন[পরি]কীর্ত্তনাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে"। অহৃদ্য—কাহারও কোন বস্তু স্বভাবতঃ হৃদয়ের অপ্রিয়; যথা—দ্বিজগণের লশুন। অপ্রিয়—ধাতু প্রভৃতির দোষবশতঃ; যথা—শ্লেষ্মা রোগে পীড়িতের নিকট দুগ্ধ। অচোক্ষ—অশুচি, অপরিষ্কৃত; চোক্ষ—পরিষ্কৃত, পবিত্র শুচি, সাধু, চতুর দক্ষ, প্রীতিকর ইত্যাদি; অভিনব অর্থ করিয়াছেন—'অচোক্ষ' স্বরূপে দুষ্ট না হইলেও মলাদি-দ্বারা উপহত। অনিষ্ট—দিবারাত্রি উপভোগের ফলে যাহার প্রতি ভোগেচ্ছা স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়াছে। পাঠান্তর—"চাহৃদ্যাপ্রশস্তাপ্রিয়াবে(পে)ক্ষানিষ্টশ্রবণ-দর্শন···" Dr. Mukherjee এই পাঠ গ্রহণ করিয়া ভাষান্তর দিয়াছেন—"It arises from the excitants of unpleasant unlovely and disagreeable sights and the hearing vision or description of undesirable things."

in of the whole body" (M). "বিকূণন—সঙ্কোচন; অভিনব বলিয়াছেন—মুখ (অর্থাৎ—তদবয়বগুলির) সঙ্কোচন; contortion (M); a side glance, a leer (Apte)। উল্লেখন—উল্লাঘ (অভিনব); উল্লাঘ অর্থে—নীরোগ, শ্লেগমুক্ত, চতুর, দক্ষ, পবিত্র, সুখী তুষ্ট বা কৃষ্ণবর্ণ—"উল্লাঘো নিপুণে হৃষ্টে শুচিনীরোগয়োরপি"—হৈমঃ। উল্লেখন—রেখাঙ্কিত করা, marking out by lines (Apte) অথবা বমন vomitting (Apte); এই শেষোক্ত অর্থটিই বড় ভাল লাগে; "furrowing of the face" (M). নিষ্ঠীবন—কফ নিরসন (অভি), থুথু ফেলা। উদ্বেজন—গাত্রোদ্ধূনন (অভি); উদ্ধূনন—কম্পন, agitation (M). উদ্বেজন—উদ্বেগ অথবা গাত্রকম্পন।

(১৭) অনভিমত বস্তু দর্শন—এ স্থলে রূপের (আকৃতির) দোষ সূচিত হইতেছে। পরে, গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দের দোষও কথিত হইয়াছে। গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ এই পঞ্চ বিষয়ের দোষ থাকিলে উহারা উদ্বেগজনক হইয়া বীভৎস-রসের উৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে।

(১৮) নাসা-প্রচ্ছাদন—দুর্গন্ধবহুল বস্তুর ঘ্রাণে নাসা আচ্ছাদন করা হয়। অব্যক্ত পাদ-পতন—প্রতিঘাত-বশতঃ অব্যক্ত। অস্থি-কঙ্কাল-সমাকুল শ্মশানাদিতে সঞ্চরণকালে পাদক্ষেপ কখনও দীর্ঘ

বৈরাগ্য লাভ করে—তদনন্তর শান্তি। নাসাবক্ত্র বিকূণনাদি অনুভাব। আবেগ-আর্ত্তি-শঙ্কা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব (১৯)।

শারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে বলিতেছেন—জুগুপ্সা-স্থায়িভাব হইতে বীভৎস উৎপন্ন হয়। নিন্দাত্মক চিত্তসঙ্কোচই জুগুপ্সা। উহার রসে পরিণাম-প্রকার দ্বিবিধ। সকল ইন্দ্রিয়ার্থের (অর্থাৎ বিষয়ের) গর্হা বা নিন্দাই জুগুপ্সা (২০)।

মোহ-অপস্মার-উন্মাদ--বিষাদ-ভয়-চাপল-আবেগ-জাড্য-দৈন্য-মতি-গ্লানি-শ্রম ও এক প্রলয় ব্যতীত স্তম্ভ প্রভৃতি সাতটি সাত্ত্বিক ভাব—এই গুলি বীভৎসের পুষ্টিকর ব্যভিচারি-ভাব। নিন্দিতাকৃতি ও নিন্দিতবেশ নিন্দিতাচার, নিন্দাবাদযুক্ত ও নিন্দিতরোগযুক্ত পিশাচাদি বীভৎসের আলম্বন বিভাব।

বীভৎসের উদ্দীপন-বিভাবগুলির পারিভাষিক সংজ্ঞা 'নিন্দিত'। যে সকল ভাব অক্ষিকে সহসা নিমীলিত করাইয়া দেয় ও যাহাদিগের জন্য কোন স্পৃহা জন্মে না—সেই সকল ভাবই 'নিন্দিত' নামে খ্যাত। উহারা বীভৎস-রসের পরিপোষক (২১)। এই সকল নিন্দিত বিভাব যখন স্বযোগ্য সহকারি-ভাবগুলির সহিত অভিনয়াশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবে (জুগুপ্সাতে) অবস্থান করে, তখন প্রেক্ষকগণের মন বুদ্ধ্যবস্থাপন্ন, অথচ সত্ত্বগুণযুক্ত (ইহাতে তখন রজস্তমোযোগের প্রাবল্য থাকে না,) ও চিন্ময়ী অবস্থায় বর্ত্তমানে থাকে। ঐরূপ দশাগ্রস্ত অন্তঃকরণের যে বিকার, তাহাই বীভৎস-রস(২২)।—ইহা বাসুকি-মত।

নারদ-মতে—বাহ্য-বিষয়াশ্রিত মন যখন চিত্তাবস্থ ও তমঃসত্ত্বযুক্ত, তখনই তাহা হইতে বীভৎস-রসের উদ্রেক হয়। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, নারদ-মতে যাহা বীভৎস, বাসুকি-মতে তাহা ভয়ানক (২৩)।

বীভৎস-রস উৎপত্তির ইতিহাস পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সভায় ভরতগণ-কর্ত্তৃক শম্ভুর প্রলয়কালীন সংহারক্রিয়ার সুনিপুণ অভিনয় দর্শনে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উত্তরমুখ হইতে ভারতী বৃত্তি ও তৎসঞ্জাত বীভৎস-রসের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। [এই প্রসঙ্গে (১) সংখ্যক ফুটনোট দ্রষ্টব্য]।

বীভৎসের বিভাবাদি-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, ইহাতে জুগুপ্সা স্থায়ী—জুগুপ্সাত্মক। ইহা দ্বিধা বিভক্ত—(১) ক্ষোভাত্মক ও (২) উদ্বেগাত্মক। ক্ষোভাত্মক বীভৎস রুধির-অন্ত্রাদি দর্শন ও স্পর্শনে জন্মে। আর উদ্বেগাত্মক বীভৎস কৃমি-বমন-পূতি-বিষ্ঠাদি হইতে জাত (২৪)। অ এব রুধির-অন্ত্র-কৃমি-বমনাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব। নাসাপ্রচ্ছাদনাদি অনুভাব। দ্বেষ-গ্লানি-ভয়-মোহ-ক্রোধ-নিদ্রা-ভ্রম-মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী।

পূর্ব্বেই বলা হইল যে, বীভৎস দ্বিবিধ—(১) রুধিরাদি-ক্ষোভ-জাত ও (২) বিষ্ঠাদি-উদ্বেগ-সঞ্জাত। আবার বলা হইয়াছে যে, ভয়ানকের ন্যায় বীভৎসের ত্রিবিধ ভেদ—(১) বাচিক, (২) কায়িক ও (৩) মানস। রুধিরাদি দৃষ্ট হইলে মন চঞ্চল—ক্ষুব্ধ হয়। অতএব ক্ষোভণ বীভৎসই মানস। এই মানস বীভৎসের উদ্রেকে ভয় পায়, ম্লান হয়, বিদ্বেষ প্রকাশ করে, মুহুর্ম্মুহুঃ মোহগ্রস্ত হয় ও প্রবোধ প্রাপ্ত হয় (মূর্চ্ছা-ভঙ্গে আশ্বস্ত হয়), ক্রন্দন করে, পলায়ন করে, বিষণ্ণ হয়, নিন্দা করে, দয়া প্রকাশ করে, ভ্রমণ করে, ত্রাস পায়, তূষ্ণী (মৌন) অবলম্বন করে, গোপন করে। এই সকল কারণে ক্ষোভজ বীভৎসকে মানস বলা হয়। পক্ষান্তরে, উদ্বেগজ বীভৎস আঙ্গিক। বস্ত্রের অবকুণ্ঠন (কাপড় গুটাইয়া লওয়া), নাসাচ্ছাদন, নেত্রকূণন (সঙ্কোচন), অস্পষ্ট পাদ পতন (খুব সাবধানে অশুচি দ্রব্য বাছিয়া অনিয়মিত ভাবে পা ফেলা), বক্ত্রের অপবর্ত্তন (মুখ ফেরান), পাদাগ্রে ভর দিয়া দ্রুত গমন, মুহুর্ম্মুহুঃ নিষ্ঠীবন-ত্যাগ—উদ্বেগজ আঙ্গিক বীভৎস এইরূপে অভিনেয় (২৫)।

বীভৎসের অধিদেবতা মহাকাল। মহাকাল প্রলয়কালে রক্তাপ্লুত-দেহে বিরাজ করেন। রক্ত বীভৎসের অধিষ্ঠান বা আলম্বন। অতএব, বীভৎসের অধিষ্ঠান মহাকাল।

বীভৎসের বর্ণ নীল। কারণ, বমন-কালে যে পিত্ত উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে, তাহার বর্ণ নীল। এই কারণে বীভৎসকে নীলবর্ণ বলা হয়।

শারদাতনয়ের বীভৎস-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে মহাকবি ভবভূতির মালতীমাধব প্রকরণ হইতে শ্মশান-বর্ণনার একটি শ্লোক বীভৎসের দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক পিশাচ একটি শবদেহের মাংস কর্ত্তন-পূর্ব্বক

---

(১৯) "বীভৎসঃ কৃমিপূতিগন্ধিবমথুপ্রায়ৈর্জুগুপ্সৈকভূরুদ্বেগী রুধিরান্ত্রকীকসবসামাংসাদিভিঃ ক্ষোভণঃ। বৈরাগ্যাজ্জঘনস্তনাদিষু ঘৃণাশুদ্ধোঽনুভাবৈর্বৃতো নাসাবক্ত্র বিকূণনাদিভিরিহাবেগার্ত্তিশঙ্কাদয়ঃ" ॥ অত্যন্তাহৃদ্যৈঃ কৃমিপূতিগন্ধিপ্রায়বিভাবৈরুদ্ভূতো জুগুপ্সাস্থায়িভাব-পরিপোষণলক্ষণ উদ্বেগী বীভৎসঃ।···রুধিরান্ত্রবসামাংসাদিবিভাবঃ ক্ষোভণো বীভৎসঃ।···রম্যেষ্বপি রমণীজঘনস্তনাদিষু বৈরাগ্যাদ্ ঘৃণা শুদ্ধো বীভৎসঃ।···ন চায়ং শান্ত এব বিরক্তো যতো বীভৎসমানো বিরজ্যতে" ।—দশরূপকাবলোক (৪।৭৩)।

(২০) "নিন্দাত্মা চিত্তসঙ্কোচো জুগুপ্সেত্যভিধীয়তে। দ্বিধা বিভজ্যতে সাপি পরিণামে রসাত্মনা" ॥—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৩৫। "সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থগর্হৈব জুগুপ্সেত্যভিধীয়তে"—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৩৬।

(২১) ······বীভৎসস্য চ নিন্দিতাঃ।···অক্ষীণি দ্রাক্ নিমীলন্তি যেভ্যো ন স্পৃহয়ন্তি চ। তে ভাবা নিন্দিতাখ্যাঃ স্যুর্বীভৎসোল্লাস-কারকাঃ" ।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ৪-৫।

(২২) "নিন্দিতা যে বিভাবাঃ স্যুঃ স্বেতরৈঃ সহকারিভিঃ ॥ যদা স্থায়িনি বর্ত্তন্তে তৈস্তৈরভিনয়ৈঃ সহ। তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং বুদ্ধ্যবস্থমসত্ত্বযুক্ ॥ চিন্ময়ী চ তত্রত্যো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। স বীভৎসরসাখ্যাং তু লভতে রস্যতে চ তৈঃ" ॥—ভাবপ্রঃ, ২য় অধি, পৃঃ, ৪৫। বুদ্ধ্যবস্থা—নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি 'বুদ্ধি'।

(২৩) "চিত্তাবস্থা তু মনসো বাহ্যার্থালম্বনাত্মনঃ। তমঃসত্ত্ব-যুতাজ্জাতো বীভৎস ইতি কথ্যতে" ।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৭-৪৮। এই প্রসঙ্গে (৬) ও (৭) সংখ্যক ফুটনোট আলোচনীয়।

(২৪) "বীভৎসঃ স্যাজ্জুগুপ্সাত্মা ক্ষোভোদ্বেগবিভাগভাক্। ক্ষোভাত্মা রুধিরান্ত্রাদিদর্শনস্পর্শনাদিজঃ। উদ্বেগাত্মা কৃমিচ্ছর্দিপূতিবিষ্ঠাদিভো ভবেৎ" ॥—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৩।

(২৫) "রুধিরাদিষু দৃষ্টেষু মনঃ ক্ষুভ্যতি চঞ্চলম্। অতো হি মানসঃ সদ্ভির্বীভৎসঃ ক্ষোভণঃ স্মৃতঃ। যত্ততো মানসঃ ক্ষোভজন্মা বীভৎস উচ্যতে। উদ্বেগজো যো বীভৎসঃ স ত্বাঙ্গিক উদাহৃতঃ"॥ —ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৭।

ভোজন করিতেছে—ইহাই শ্লোকটির মূল বর্ণনীয় বিষয়। নাগোজী উদ্দ্যোতে বলিয়াছেন—এ স্থলে পিশাচ অথবা শবদেহ—এই দুইটির যে কোনটিকে আলম্বন বলা যায়। তাহার মাংস কর্ত্তন ও ভোজন উদ্দীপন। দ্রষ্টার নাসা-কুঞ্চন, বদন-বিধূনন, নিষ্ঠীবন-ত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব। উদ্বেগাদি সঞ্চারী।

গোবিন্দ ঠক্কুর টীকায় (প্রদীপে) বলিয়াছেন—বিষয়সমূহের দোষাধিক্য-দর্শনে গর্হণাই (অর্থাৎ—নাসাবদন-সঙ্কোচাদি-জনক চিত্ত-বৃত্তিবিশেষই) জুগুপ্সা। তৎপ্রকৃতিক বীভৎস (২৬)।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নাট্যদর্পণে বলিয়াছেন—জুগুপ্সনীয় রূপাদি দর্শন, পরশ্লাঘা শ্রবণ প্রভৃতি হইতে সমুদ্ভূত বীভৎস-রস। নিষ্ঠেব-উদ্বেগ-নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা ইহা অভিনেয়।

জুগুপ্সনীয় রূপ—মালিন্য-দুর্গন্ধিত্ব-কর্কশত্বাদি হেতু অমনোজ্ঞ রূপ। 'রূপ' বলিতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—এই পঞ্চ বিষয়ই বুঝিতে হইবে। পরশ্লাঘা—'পর' অর্থে বিপক্ষ; তাহার 'শ্লাঘা' বা স্তুতি। শত্রুর স্তুতিতে বিশেষরূপে জুগুপ্সার উদ্রেক হইয়া থাকে। উক্ত বিভাবগুলি দৃষ্ট বা শ্রুত হইলে তাহা হইতে জুগুপ্সা-স্থায়ী বীভৎস-রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্ঠেব—কফ নিরসন। উদ্বেগ—গাত্রধূনন। নিন্দা—দোষোদ্‌ঘটন। এই তিনটি হইতে গাত্র সঙ্কোচন-মুখবিকূণন-নাসা-কর্ণ-প্রচ্ছাদন-হৃল্লেখ প্রভৃতি অনুভাবও সূচিত হইতেছে। ব্যাধি-মোহ-অপস্মার-আবেগ-মরণাদি উহার ব্যভিচারী।

শিঙ্গভূপাল রসার্ণব-সুধাকরে বলিয়াছেন—জুগুপ্সা স্থায়ী ভাব স্বযোগ্য বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব-সংযোগে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া বীভৎস-রসে পরিণত হইয়া থাকে। গ্লানি-শ্রম-উন্মাদ-মোহ-অপস্মার-দীনতা-বিষাদ-চাপল-আবেগ-জাড্য প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী। স্বেদ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ও নাসা-প্রচ্ছাদনাদি ইহার বিকার বা অনুভাব।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে নূতন কথা কিছুই নাই। জুগুপ্সা যাহার স্থায়িভাব সেই বীভৎস বীর-সংশ্রিত (২৭)। বিকৃত উৎপূতি মাংসভক্ষক (রাক্ষস-পিশাচাদির) দর্শন-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ও দুর্গন্ধাদি-বিশিষ্ট বস্তুরূপ বিভাব হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গ-সঙ্কোচ-নিষ্ঠীবন-ত্যাগ-আস্য-বিকুঞ্চন-নাসা-প্রচ্ছাদন-অব্যক্ত-পাদপাত-অক্ষিকূণন-হৃল্লেখ-উদ্বেজন প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহা অভিনেয়। অপস্মার-মোহ-মরণ-ব্যাধি-আবেগ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী ভাব।

বীভৎস-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

অতঃপর অদ্ভুত-রস। বীররসে যাহা প্রথমে আক্ষিপ্ত (অর্থাৎ সূচিত—উপক্ষিপ্ত) হইয়াছে, তাহারই চরম পরিণাম অদ্ভুত। বীর-রস বীজ, অদ্ভুত ফল। এই কারণে বলা হইয়াছে—সর্ব্বশেষে অদ্ভুত-রসের স্থান। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল (২৮)।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(২৬) "জুগুপ্সা গর্হণার্থানাং দোষমাহাত্ম্যদর্শনাৎ। তৎ-প্রকৃতিকো বীভৎসঃ"।—প্রদীপ। "দোষমাহাত্ম্যম্। দোষাধিক্যম্। গর্হণা। নাসাবদনসঙ্কোচাদিজনকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ"।—উদ্দ্যোত।

(২৭) "জুগুপ্সাস্থায়িভাবো যো বীভৎসো বীরসংশ্রয়ঃ"। সাগরনন্দী, নাটকলক্ষণরত্নকোষ (পৃঃ ১১৪১)। হৃল্লেখ—হৃদয়ের ব্যথা, হৃৎপীড়া, heart-ache (Apte). উদ্বেজন—উদ্বেগ, গাত্রকম্প।

(২৮) "যদ্বীরেণাক্ষিপ্তং বীরস্য পর্য্যন্তেঽদ্ভুতঃ ফলমিত্যনন্তরং তদুপাদানং, তথা চ বক্ষ্যতে 'পর্য্যন্তে কর্ত্তব্যো নিত্যং রসোঽদ্ভুত' ইতি"—অভিনবভারতী, নাট্যশাস্ত্র, বরোদা সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৬১। "'সর্ব্বত্রান্তেঽদ্ভুত' ইত্যুক্তম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩০।

কাল-বৈশাখী

উড়াইয়া জটা কাল-বৈশাখী
আসিতেছে মহাকাল!
ডমরু বাজিছে, চারি দিকে তাই
মৃত্যুর কঙ্কাল।
রুদ্রাণী নাচে তাথৈ তাথৈ;
বরাভয় ক'রে ডাকিছে মাভৈঃ;
অট্ট-অট্ট খল-খল হাসি
জ্বলিছে অনল-জাল;
ঐ আসিতেছে কাল-বৈশাখী
মৃত্যুর মহাকাল!

শ্যামের অধরে মুরলী বাজে না—
আজি সে চক্রধারী!
দুন্দুভি বাজে মহা-প্রলয়ের
গাণ্ডীব টঙ্কারি!
চারি দিকে শুধু জ্বলিছে অনল,
বজ্র-নিনাদে ধরা টলমল!
বাঁশী ছেড়ে তাই প্রলয়ের অসি
ধরিয়াছে শ্রীমুরারি!
প্রলয়ের বেশে কাল-বৈশাখী
রুদ্র অনল তারি।

গৌরী মায়ের কণ্ঠে কেমন
দুলিছে মুণ্ডমালা!
ত্রিনয়নে জ্বলে ধ্বক্-ধ্বক্-ধ্বক্
আগুনের শিখা-জ্বালা!
নয়নেতে নাই স্নেহ-নির্ঝর;
বহিতেছে মহা-প্রলয়ের ঝড়;
সম্বর মা গো মূরতি ভীষণ
নেত্রে বহ্নি ঢালা!
সৃষ্টির সুখে উঠুক নাচিয়া
কিশোর নন্দলালা!

শ্রীনকুলেশ্বর পাল (বি, এল)।

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

৪

নামের স্লিপ পাঠাইবার অনেকক্ষণ পরে মিষ্টার গোস্বামীর ঘরে রমেশের ডাক পড়িল।

সুবৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবলের উপর রাশীকৃত কাগজ-পত্র ভাঁজে-ভাঁজে রক্ষিত—কতকগুলা খোলা; পাশে ঘোরা-শেলফে মোটা-মোটা আইনের বই। মিষ্টার গোস্বামী নিবিষ্ট মনে মকর্দ্দমার ব্রীফ্ পড়িতেছিলেন। ব্রীফে এমন তন্ময় যে ডান হাতের কাছেই পাইপ পড়িয়া আছে, তুলিবার খেয়াল নাই!

রমেশ ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার নূতন জুতার মস্-মস্ শব্দে ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, রমেশের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই! বোধ হয় জানেন না, জুতার এ-আওয়াজ ফ্যাশন-দুরস্ত নয়! তাই কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া মিষ্টার গোস্বামীর টেবলের অপর প্রান্তে চেয়ার টানিয়া রমেশ তাহাতে বসিলেন।

মিষ্টার গোস্বামী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, "আপনি কি চান?" 'আপনি' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই টাইপ-করা ব্রীফের কাগজগুলার উপর চশমা-পরা চক্ষু-যুগলের দৃষ্টি আবার আঁটিয়া গেল।

রমেশ একটু থতমত খাইলেন। এমন সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া—তাঁহার পক্ষে কেমন কঠিন হইল। এ ধরণের প্রশ্নের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই মনের মধ্যে যা কিছু গড়িয়া-পিটিয়া উৎফুল্ল চিত্তে এ ঘরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, বাতাসের মুখে এলো-সূতার মত জট পাকাইয়া সে-সবের খেই হারাইলেন।

এক দিন যাহার সঙ্গে গভীর ভালোবাসা থাকে—কিশোর-চিত্তের অমল ভালোবাসা, স্বার্থ-কলুষহীন নিবিড় প্রীতি—দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সময়-স্রোতের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে অকস্মাৎ কোথায় যে তাহা মাটী চাপা পড়িয়া সমাহিত হয়, তাহার উপর নূতন নূতন কত সৌধ গড়িয়া ওঠে, তাহার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না! কিন্তু সেই ধ্বংস-স্তূপ যদি ভূগর্ভের আশ্রয় হইতে মাথা তুলিয়া অকস্মাৎ নিজের দাবী জানায়, তখন সে মস্ত হেঁয়ালি হইয়া ওঠে!

সত্যপ্রসাদের মুখ দিয়া এমন প্রশ্ন বাহির হইবে, রমেশের তাহা কল্পনার অতীত ছিল! কিন্তু ইহা লইয়া দোষারোপ করিতে গেলে অবিচার করা হয়। সমসাময়িকদের মধ্য হইতে যে উঁচু হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, চারি পাশের দৃষ্টি গিয়া নিবদ্ধ হয় সেই উন্নত শিরে। কিন্তু তাহাদের পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত ক্বচিৎ-দৃষ্টি মুখগুলাকে চলার পথে সব সময়ে মনে থাকে না। কালের ধর্ম্মই বিশিষ্টকে বুকে ধারণ করিয়া রাখা—তথাপি মনস্তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণের দিক্‌টা কেহ সহজে মাড়ায় না। তাই মানুষ প্রথমেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, এটা অহমিকার তাচ্ছল্য!

কুণ্ঠিত স্বরে রমেশ কহিলেন, "আমি হরিপাল থেকে আসছি।"

"হরিপাল! ও! হুঁ, জানা জায়গা বটে! তা আপনি কি করেন?" কথাগুলা অবশ্য গোস্বামী-সাহেব মুখ না তুলিয়াই কহিলেন।

মুখ নীচু করিয়া রমেশ উত্তর দিল, "ওখানকার স্কুলের আমি হেড মাষ্টার।"

আবার সেই নীরবতা। মিষ্টার গোস্বামী কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। সে জমাট-কঠিন স্তব্ধতা রমেশের আত্মমর্য্যাদার উপর যেন রূঢ় আঘাতের মত ভয়ঙ্কর হইয়া বাজিল! নিজেকে এমন ছোট করিয়া ফেলিবার কি প্রয়োজন তাঁহার ছিল? এ দুর্ম্মতি তাঁহার কেন হইল! যে-মানুষ তাঁহাকে এমন করিয়া ভুলিয়া গিয়াছে, বন্ধু বলিয়া সেই ধন-মর্য্যাদাশীল ব্যক্তির পরিচয় ধরিয়া কেন তিনি নিজের সম্ভ্রম-বৃদ্ধির অমন প্রয়াস পাইলেন? নিজের কাছেও হাস্যাস্পদ হইলেন। কঠিন ধিক্কারে দুঃসহ আত্মগ্লানিতে রমেশের আহত অন্তর বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল।

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন কহিলেন, "আমি তা হলে আসি।"

কাগজের উপর তেমনি দৃষ্টি রাখিয়াই গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—"কৈ, প্রয়োজনের কথা, দেখা করার উদ্দেশ্য—কিছুই তো বললেন না আপনি!"

রমেশ বুঝিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে! সাক্ষাতের কৈফিয়ৎ একটা দিতে হয়! ব্যারিষ্টার-সাহেবরা দামী সময় অযথা ব্যয় করেন না!

পরিত্যক্ত আসনে রমেশ আবার বসিলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর কহিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, আপনি আমাকে চিন্‌তে পারবেন!"

"চিন্‌তে পারবো!" মিষ্টার গোস্বামী তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া বিস্মিত চোখের সন্ধানী দৃষ্টিতে রমেশের পানে মুহূর্ত্ত-কাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। পরিচয় বলুন তো!"

তীব্রতর অপমানে রমেশের কর্ণমূল হইতে ললাট পর্য্যন্ত জ্বলন্ত লোহার মত আরক্ত হইয়া উঠিল!

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মাপ করবেন, এসে আপনাকে ডিস্টার্ব করলুম!"

গোস্বামী-সাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তা হোক, কিন্তু আপনি যে বললেন, চিন্‌তে পারবেন! পরিচয় দিন তো!"

রমেশের মুখ দিয়া ফশ্ করিয়া কথা বাহির হইল। "আমার মনে হয়, সে কথা আর উত্থাপন না করাই ভালো।"

মিষ্টার গোস্বামী সবিস্ময়ে কহিলেন, "সে কি! অথচ এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন! দেখা করতে আসার প্রয়োজন বলুন।"

রমেশের মনে যেন আগুনের জ্বালা! তিনি বলিলেন, "এই অপেক্ষা করা ভুল হয়েছিল। চলে যাওয়াই আমার উচিত ছিল।" রমেশ থামিলেন। ইচ্ছা করিয়া না হইলেও আত্মসম্ভ্রমের ক্ষুণ্ণতা অজ্ঞাতে কণ্ঠকে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কণ্ঠের এ বিকৃত সুর নিজের কাণে বিশ্রী লাগিল! নিক্ষিপ্ত শরকে ফিরানো যায় না। তাই যত দূর সাধ্য, কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া রমেশ কহিলেন, "নমস্কার, তবে আসি।" কথাটা বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিষ্টার গোস্বামী বিস্ময়ে অবাক্! জীবনে অনেক রকমের মানুষ দেখিয়াছেন! ভাবিলেন, হয়তো কোনো প্রত্যাশা লইয়া ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন! তার পর প্রত্যাশার কথা বলিতে বোধ হয় দ্বিধা জাগিয়াছে! কিন্তু হরিপালের নাম করিলেন! তাঁহার বাল্যকালের শত স্মৃতি-ঘেরা হরিপাল!

তাই তিনি বলিলেন, "আপনি হরিপালের কথা বলছিলেন যে।"

রমেশের মনে হইল, একটা তীব্র শ্লেষে গোস্বামীকে বিঁধিবেন। তিনি বলিলেন, "হরিপালের কথা মনে আছে?"

মিষ্টার গোস্বামী বলিলেন, "বিলক্ষণ! সেখানে আমার মামার বাড়ী। কত বার সেখানে গেছি—তখন অবশ্য মা বেঁচে ছিলেন। ছোট-বেলার কথা।"

রমেশের মুখে যেন মুক্ত বাতায়ন-পথের আলো আসিয়া পড়িল! ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া তিনি কহিলেন, "হরিপালে একটা মস্ত পোড়ো বাড়ীর কথা আপনার মনে আছে? কবিরাজদের বাড়ী?"

প্রসন্ন হাস্যে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "নিশ্চয় আছে। আচ্ছা, প্রমাণ দিচ্ছি! একটি বউ সেখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। আহা, বউটি ভারী ভালো ছিল,—কত কাঁচা পেয়ারা, কাঁচা আম খেতে দিত আমাদের।"

"রমেশের মনের মেঘ লঘু হইয়া স্বচ্ছ হইল। তিনি কহিলেন, "আর সেই বাড়ীর পাশের মাঠে বকুল গাছ—কোকিলের ছানা?"

ছেলে-বেলাকার স্মৃতির দোলায় ব্যারিষ্টার-সাহেবের গম্ভীর মুখ হাসির জ্যোৎস্নায় যেন ঝলমল্ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—"নিশ্চয় মনে আছে। আচ্ছা, আপনি হরিপালে থাকেন, সেই বকুল গাছটার খবর কিছু জানেন?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি কহিলেন, "সে বছর পুরী গেছলুম। সেখানে একটা মঠ আছে। সে মঠে বকুল গাছ দেখিয়ে সেখানকার পাণ্ডারা বললে, এইখানে বসে মহাপ্রভু মালা জপ করতেন, প্রণাম করুন। পাণ্ডার কথায় প্রণামী-সমেত প্রণামটা বকুল গাছকে নিবেদন করলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল হরিপালে আমাদের বকুল গাছের তলায় আড্ডার কথা।"

পূর্ণিমার চাঁদের উপর হইতে খণ্ড মেঘ সরিয়া দশ দিক্ যেন আলোর প্লাবনে ভরিয়া গেল!

রমেশের ম্লান মুখ নিমেষে দীপ্ত হইয়া উঠিল। উল্লসিত অন্তরে তিনি কহিলেন, "গাছটার সঙ্গে আপনার আর কিছু মনে পড়ছে না?" ঔৎসুক্যভরা দুই চোখের দৃষ্টি ব্যারিষ্টার-সাহেবের গুম্ফহীন মুখের উপর রমেশ মেলিয়া ধরিলেন।

গোস্বামী-সাহেব হাসিলেন। ঝর্ণার জলে সূর্য্য-কিরণ লাগিয়া যেমন দ্যুতি বিকিরণ করে, তেমনি অনাবিল আনন্দ-দীপ্তিতে তাঁহার মুখ ঝলমল্ করিয়া উঠিল। বলিলেন, "নিশ্চয় পড়ছে! কত কথা।" বলিয়া তিনি একটু থামিলেন। বোধ করি, এই নীরবতার মধ্য দিয়া স্মৃতির গহনে চকিতের জন্য এক বার চাহিয়া লইলেন। সেখানকার বিস্মৃত, অবিস্মৃত, মলিন, দীপ্ত ছোট-বড় সংখ্যাতীত ছবি!

বলিলেন, "আচ্ছা এক জনের খবর দিতে পারেন? তার নাম বল্টু! ভালো নামটা মনে পড়ছে না! তার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। মামার বাড়ীর দেশে সে ছিল আমার প্রধান সঙ্গী। যেমন চমৎকার গান গাইত, তেমনি নাচতো! যাত্রার দলে রাণী সাজতো। কি চমৎকার! সে ছিল আমার আদর্শ! আপনি চেনেন তাঁকে?"

ঈষৎ হাসিয়া রমেশ কহিল, "চিনি"।

"ও! এবার বুঝেছি। সে আপনাকে পাঠিয়েছে? হ্যাঁ, তা সে এখন কি করছে?"

"ইস্কুলের হেড-মাষ্টারী।" রমেশের চোখে-মুখে হাসির বিদ্যুৎ-রশ্মি!

মিষ্টার গোস্বামী কহিলেন, "আপনি—মানে, তুমিই বল্টু! আ রে! চেনার জো কি, বলো! এমন দাড়ি-গোঁফের সখ হলো কোথা থেকে? সে দুধে-আলতা রং তামা মেরে গেছে!"

আনন্দের হাসিতে বল্টুর ওষ্ঠাধর ভরিয়া উঠিল। কৈশোরের বন্ধুকে গোস্বামী-সাহেব অবহেলা করেন নাই! এই উপলব্ধিই রাত্রি-শেষে আকাশের রাঙ্গা উষার মত মনের সব অভিমান-কুণ্ঠা-উষ্মাকে ধুইয়া অন্তরকে স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল করিয়া দিল।

৫

রমেশের দিকে চেয়ার ঘুরাইয়া গোস্বামী-সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন। কহিলেন, "তার পর বল্টু, হঠাৎ এত দিন পরে আবির্ভাব! আচ্ছা, আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল কবে? তখন বোধ হয় আমি ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠেছি—বয়স আমার চৌদ্দ,—সেই ফিরে এসেই মা মারা গেলেন।" গোস্বামী-সাহেবের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল।

প্রশান্ত স্বরে রমেশ কহিলেন, "আমার বয়স তখন পনেরো, মনে আছে, আমি এণ্ট্রান্সে স্কলার্সিপ পেয়েছি! তোমার মামাবাবু তোমার কাছে কত সুখ্যাতি করলেন! তার পর সেই বকুল-তলাতে নাচ শেখা! তুমি পারতে না! স্থরেন অধিকারী—"

গোস্বামী-সাহেব সবেগে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "খুব মনে আছে। ছেলেমেয়েরা এখন সব নাচ শিখছে। মিসেস্ গোস্বামী 'নৃত্যশালা" স্কুল খুলেছেন—নাচে তাঁর ভারি ঝোঁক! কিন্তু আমি তো দেখি শুনি,—মনে মনে হাসি। সে কালের কথা ভাবি। এক দিন তোমার সঙ্গে নাচছিলুম, মা এসে পড়লেন। উঃ, কি বকুনী! সে কি দুর্গতি! শেষে মার অবধি খেলুম। আচ্ছা বল্ট সেই সুরেশ, না, স্থরেন অধিকারী,—তার যাত্রার দল আছে তো? মিত্তির-পাড়ার সেই আখড়া?"

"না! সে সব কোথায় ভেঙ্গে-চুরে নিঃশেষ হয়ে গেছে খুঁজলে এখন তার কঙ্কালও পাবে না ভাই! সেই হরিপদ গাঙ্গুলী—সে এখন কোথায় একটা গানের ইস্কুলে বুঝি চাকরী নিয়েছে। দেশের পাট মুছে দেছে। সে স্থরেন অধিকারীও মরেছে। তার দলবলও শেষ!" রমেশের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইল। রমেশ কহিলেন,—"আর ভাই, দেশের লোক এখন খেতে পায় না! দু' বেল দু'টো অন্নের সংস্থান করবে, না, আমোদ-প্রমোদ করবে?"

"তা সত্যি!" বলিয়া গোস্বামী-সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। এবং এই স্বল্প নীরবতার ফাঁক পাইয়া মনের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল ক্ষণেকের জন্য অসংখ্য স্মৃতি। সে-সব স্মৃতির কোন রেখা মস্তিষ্কের কোন কোণে আঁকা আছে কি না, ব্যারিষ্টার সাহেবের মনে সংশয় ছিল।

তাঁহার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি, বিমনা ভাব লক্ষ্য করিয়া রমেশ কহিলেন, "ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, দুর্ভিক্ষ—বছর-বছর একটা-না-একটা—সেকালের বর্গীর আক্রমণের চেয়েও দুর্দ্দান্ত হয়ে মানুষকে নাস্তানাবুদ করছে। এদের তাড়াবার কোন রাস্তাই খোলা নেই। এই আমি একটা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার—কত ছেলে আমার হাত দিয়ে পার হচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কীর্ত্তিমান্ না হয়েছে, এমন নয়। এক জন শুনেছি, মস্ত বৈজ্ঞানিক। সাগর-পার পর্য্যন্ত খ্যাতি

ছড়িয়ে এসেছে। কিন্তু দেশকে এরা বর্জ্জন করেছে। সাত পুরুষের বাস্তু-ভিটা সংস্কারের অভাবে পড়ে ভূমিসাৎ হচ্ছে। শোবার ঘরে বট-অশথের জঙ্গল। কে দেখবে? সে ছাতি কোথা? সে ছাতি কার আছে? এমনি করেই আমরা আমাদের শ্রী-সম্পদ্ হারাচ্ছি!"

ঈষৎ শুষ্ক হাস্যে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তোমার অভিযোগ মিথ্যে নয় বল্টু! কিন্তু দোষী কি এক-পক্ষই? গ্রাম কি এখনো সে গোঁড়ামি ত্যাগ করেছে? সেই যে অজরামর অচলায়তন, তার সংস্কার কৈ? বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে তার সঙ্গে হাতাহাতি না করে কেউ যদি চলে আসে, সে তো সনাতনকে সম্মান দিয়েই এসেছে!"

অল্প উত্তেজিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "তোমার কথা অযথার্থ না হলেও যুক্তি বলে মানা চলে না। আপনার জন মন্দ বলেই পরিত্যাজ্য হবে, এ যে ঘোর স্বার্থপরের কথা! আমি যাদের মধ্য দিয়ে এসেছি, আমার বড় হবার মূলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে যেমন করে যে ভাবেই হোক না কেন, তাদের অল্প-বিস্তর চেষ্টা বা সাহায্য ছিল তো! সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে নিজেকে কেউ গড়ে তুলতে পারে না। অনুকূল কোথাও কিছু ছিল বই কি! ভালো বীজ হলেও সার-মাটী না পেলে জল না পেলে খোরাক সে পাবে কোথা বাঁচবার জন্য? বিচার তার পরে—কিন্তু যাক্, তোমার অনেকখানি সময় নষ্ট করছি!"

গোস্বামী সাহেব ঘড়ির দিকে চাহিলেন। মৃদু হাস্যে কহিলেন, "আর এক দিন এ সব আলোচনা হবে। এখন তোমার কাজের কথা বলো!" বলিয়াই তিনি কহিলেন, "সুরেন অধিকারীর কথা থেকে আর একটা কথা মনে পড়ছে।"

রমেশ কহিলেন, "কি কথা?"

গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "আজকাল এখানে একটা কীর্ত্তনের রেওয়াজ উঠেছে! যেন মহাপ্রভুর রিফর্ম্ম যুগ! বড় বড় ঘরে খোলের আওয়াজ হচ্ছে! কিন্তু সে বছর ম্যাসেমব্লির ফেরৎ দিল্লী থেকে বৃন্দাবনে গেছলুম। সুরেন অধিকারীর "মাথুর" পালা আমার মনে ছিল। হ্যাঁ, গান শুনলুম বটে সাধকের কণ্ঠে! সে সুর দেহকেই শুধু রোমাঞ্চিত করে তোলেনি—মনে হচ্ছিল, অধ্যাত্ম-রাজ্যের এক সূক্ষ্ম অনুভূতি-লোকে নিঃশব্দে যেন টেনে নিয়ে চলেছে! সেই যে কবি বলেছেন, 'সুরের হাওয়ায় জগৎ গেল ছেয়ে'—তা যেন বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি হলো!"

রমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হাসিয়া তিনি কহিলেন, "রক্তের ধারায় যে বীজ রয়েছে, তুমি তা তাড়াবে কি করে? অনুকূল আবহাওয়া পেলেই সে সবল হয়ে মাথা চাড়া দেয়। তোমার দিদিমা, দাদামশাই তো শেষ জীবনটা শ্রীবৃন্দাবনেই কাটিয়ে গেছেন।"

মাথা নাড়িয়া গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "যা বলেছো। আজ অনেক দিন পরে সেই পুরানো দিনগুলোকে যেন দেখতে পাচ্ছি। দিদিমা ঠাকুর-ঘরে তাঁর গোপাল-গোপীবল্লভকে প্রণাম কচ্ছেন! সেই পাথরের ঠাকুরকে প্রণাম করে কি আনন্দই তিনি পেতেন! জীবন্ত গোপাল আমি লুব্ধ নেত্রে সেই পাথরের রেকাবীর মাখন-সন্দেশগুলোর দিকে চেয়ে আছি! দিদিমাকে খুশী করতে পাথরের মেঝেয় ঢুম্-ঢুম্ করে মাথা ঠুকে প্রণাম কচ্ছি! যাক, অনেকখানি সময় ধরে রাখলুম বাজে কথায়! এবারে বলো—"

"বলি" বলিয়া রমেশ থামিলেন।

সত্যপ্রসাদ রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন। স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, "কি এত ভাবচিস্ বল্টু, আমি সেই সত্য রে—কোকিলের বাচ্ছার জন্য তোর কম খোসামোদ করেছি! ইস্কুলের টীমে নাম-করা ফুটবল-প্লেয়ার, অথচ গাছে চড়তে জানতুম না!"

রমেশ দীপ্ত-মুখে কহিলেন, "সেই সব ভেবেই তো আগে এখানে এলুম। মেয়েটাকে কলেজে দিলুম কি না!"

বিস্মিত কণ্ঠে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তোর মেয়ে?"

"হ্যাঁ। রত্না। কুড়ি টাকা করে স্কলারশিপ পেয়েছে। সারা জীবন শুধু পরের ছেলেই পিটে পিটে পড়িয়ে এলুম! একটা সাধ তো!" রমেশের কণ্ঠে যেন জবাবদিহির সুর!

গোস্বামী-সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "ভেরী গুড গার্ল! কুড়ি টাকা! বলিস্ কি বল্টু! আমার ছেলেদের সকলে ভালো বলে—তারাও যে পায়নি—শুধু ঐ ফার্ষ্ট ডিভিসন আর লেটার! বেশ করেছিস্ কলেজে দিয়ে!"

কন্যা-গর্ব্বে রমেশের বুকখানা ভাদ্রের নদীর মত স্ফীত হইয়া উঠিল। রমেশ কহিলেন, "হোষ্টেলে রাখলুম। কিন্তু আমার তো আসবার বড় একটা সুবিধা হবে না! এখানকার অভিভাবক বলে তোমার নামটা দিলুম! ওকে একা রেখে যাচ্ছি। মনটা—মানে, কখনো তো—"

সব কথা রমেশ বলিতে পারিলেন না। গোস্বামী-সাহেব কথার মাঝখানেই খুশী কণ্ঠে বলিলেন, "ভ্যাট্‌স্ রাইট! খোঁজ-তল্লাস নেবো বই কি—নিশ্চয় নেবো। মিসেস্ গোস্বামীকেও বলে দেবো। এখন তিনি বাড়ী নেই। না হলে তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতুম।"

রমেশ উত্তর করিলেন, "অন্য সময় হবে'খন। রত্না চমৎকার গান গায়। তার গান মিসেস্ গোস্বামীর নিশ্চয় ভালো লাগবে।"

গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তাই না কি? মিসেস্ গোস্বামী তো তা হলে লুফে নেবেন। হ্যাঁ বল্টু, একটা কথা"—বলিয়া তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার এক ছেলে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসেছে! একটি ব্যারিষ্টার। পরিচয় দিয়ে রাখলুম। বাল্যবন্ধু, অথচ ছেলে-মেয়েদের পরিচয় আমরা জানি না; লজ্জার কথা!"

রমেশ হাসিলেন, "নিশ্চয়।"

৬

উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যে ইন্দ্রপুরীর কথা রত্না পড়িত, ভোজবাজির মত তাহাই যেন অকস্মাৎ চোখের উপর সুপরিস্ফুট হইয়া তাহাকে একেবারে দিশাহারা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে!

আড়ম্বরহীন সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্তা আঠারো বছরের এই তরুণীর কাছে গোস্বামি-ভবনের ঐশ্বর্য্য-বিভব শুধু কুবের-সম্পদ্ বলিয়াই মনে হয় নাই, ইহার মোহ দুর্ব্বার শক্তিতে অনুক্ষণ তাহাকে টানিতেছে! রত্নার মনে হয়, মানব-জীবনের সকল সার্থকতা সব আনন্দ যেন সেখানে নিবিড় হইয়া আছে!

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রত্না দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। ইহার মধ্যে অনেক বার সে গোস্বামি-ভবনে যাতায়াত করিয়াছে। প্রথম ক্ষেপে গোস্বামী সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন; তার পর তিনি আসিতেন না, বার-কয়েক মিসেস্

গোস্বামী আসিয়াছিলেন। এখন রত্নাকে গোস্বামি-গৃহে লইয়া যাইবার ভার পড়িয়াছে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার অনিল গোস্বামীর উপর।

মুসলমানদের পর্ব্ব উপলক্ষে কলেজ ক'দিন বন্ধ থাকিবে। সেদিন শনিবার। রত্না উৎসুক চিত্তে প্রত্যাশিত নেত্রে গোস্বামি-ভবনের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কল্পনা চাটার্জ্জি আসিয়া রত্নার পাশে দাঁড়াইল। ইচ্ছা করিয়াই সে রত্নার সন্ধানে আসিয়াছিল। রত্নার তন্ময় মূর্ত্তির পানে চাহিয়া ব্যঙ্গের প্রলোভন সে সম্বরণ করিতে পারিল না, কহিল, "এই যে, ব্রজবিলাসিনী রাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্!"

রত্না চমকিত হইল। কাঁচুমাচু মুখে অপ্রতিভ কণ্ঠে রত্না কহিল, "কি রকমের ঠাট্টা কল্পনা!"

হাসিয়া কল্পনা কহিল, "এ ঠাট্টা নয়। সত্যি কথা বলছি। গোঁসাই-সাহেবের বাড়ী তোর কাছে যেন বৈকুণ্ঠ-পুরী!"

"কেন? আমি কি করেছি?" রত্নার স্বর আহতের মত।

"কি না করেছিস,-সেইটেই বরং বল্ রত্না! আমি একা নই,—হোষ্টেলের সব মেয়েরাই এই কথা বলে।"

রত্নার বিস্ময় এবার রোষে পরিণত হইল। গায়ে পড়িয়া কল্পনার বন্ধুত্ব করার মাঝে প্রচ্ছন্ন টিট্‌কারী থাকে—রত্না তাহা জানে বলিয়াই কল্পনাকে সে সর্ব্বদা এড়াইয়া চলে। কিন্তু দুষ্ট গ্রহের প্রভাব যেমন নানা উপায়ে ক্ষীণ করা গেলেও মুছিয়া ফেলা যায় না, রত্নার নিরীহতার মর্ম্মভেদ করিয়াও কল্পনার বিদ্রূপগুলা তেমনি তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে।

বিরক্ত কণ্ঠে রত্না কহিল, "তাঁদের ধন্যবাদ! আমার জন্য এতখানি ব্যাকুল! আমি যাই আমার আপনার লোকের বাড়ী—"

"তা যা না,—কে তোকে বারণ করছে? আর বারণ করলে তুই শুনবিই বা কেন? ঝর্ণা কিছু মন্দ বলেনি!"

ঝাঁজিয়া রত্না উত্তর দিল, "তার ভালো কথা শোনবার আমার কোনো দরকার নেই।"

"ইস্, একেবারে মেশিন গান্! তা তোর গোঁসাই-বাড়ী তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না! এত মার-মুখী কেন! কর্‌গে যা না রাই সেখানে তোর রাস-বিলাস!"

লজ্জায় রত্নার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ঈষৎ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সে কহিল, "আমি বুঝি। আমার হিংসেয় সকলে—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নীহার আসিয়া উপস্থিত হইল, কহিল, "তোদের কিসের ঝগড়া হচ্ছে?"

মুখ বাঁকাইয়া কল্পনা কহিল, "ঝগড়া নয়, ভাই! আমরা তো অমন আ-দেখ্‌লা নই যে কিছু দেখলেই ভীরমি যাবো! আমার বাবা—বলে—"

রত্না কোন উত্তর না দিয়া কল্পনার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দুম্-দুম্ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

নীহার কহিল, "কি হলো রে রত্নার?"

ঠোঁট বাঁকাইয়া কল্পনা কহিল, "হার ম্যাজেষ্টি! কি মেজাজ! আমি ঠাট্টা করেছিলুম গোস্বামীদের বাড়ী নিয়ে, তাই চোখ-মুখ রাঙিয়ে কি তড়পানি!"

নীহার হাসিল। কহিল, "ওঃ এই! দুষ্মন্তর ভাবনায় শকুন্তলা আত্মভোলা হয়েছিল,—আমিও অনেকক্ষণ থেকে দেখেছি। কিন্তু ঋষি দুর্ব্বাসা হয়ে তুই আসবি, তা জানতুম না।"

কৃত্রিম ক্রোধে কল্পনা কিল তুলিল। কহিল, "দূর, আমি দুর্ব্বাসা হবো কেন? তেমনি দাড়ি আমার? নাঃ, তোরা রত্নার রূপের সুখ্যাতি করে করে ওকে মাথায় তুলেছিস! অজ পাড়াগেঁয়ে —এলো যখন, কি করে শাড়ী পরতো! মা গো, মনে হলে এখনো হাসি পায়!"

প্রতিবাদ করিয়া নীহার কহিল, "আমি কক্ষণো মাথায় তুলি না! প্রিন্সিপ্যাল ওকে একটু ভালোবাসে, তাই! কিন্তু সত্যি বলছি, আমার মাসিমার দেওরের মেয়ে ওর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর!"

"ঢের—ঢের সুন্দর অনেক আছে। নিজেকে উনি ভাবেন, ক্লিওপেট্রা!"

শিখা আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কি রে, তোদের কিসের কমিটী বসেছে?"

কল্পনা কহিল, "রত্নার রূপের দেমাকের কথা হচ্ছে।"

শিখা কহিল, কিন্তু ভাই, পাড়াগেঁয়ে অমন মোদ্দা কথনো দেখা যায় না! ঐ যা গোবর-গাদায় পদ্ম! তাতে কি এসে যায়—আমাদের মত য়্যারিষ্টক্রেট্ ফ্যামিলির মেয়ে তো ও নয়!"

কল্পনা কহিল, "নিশ্চয় নয়! আমার বাবা স্যার। আমরা যে ওর সঙ্গে মিশি, বন্ধুত্ব করি—"

নীহার মুন্সেফের মেয়ে। সে কহিল, "ও-কথা যাক্। রত্না আগে কিন্তু খুব ভালোমানুষ ছিল—সাত চড়ে মুখে রা বেরুতো না!"

কল্পনা কহিল, "আহা, তখন যে একটা গেঁয়ো মেয়ে ছিল। এখন 'পিয়ার্স' না হলে চলে না! দিশী স্নো মাখে না,—ওর সমস্ত ফ্রেঞ্চ টয়লেট্! দেখেছিস?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শিখা কহিল, "তা সব দেখতে পাই বৈ কি! রূপ থাকলে রূপোর অভাব থাকে না।"

নীহার কহিল, "আচ্ছা, মিসেস্ গোস্বামী ওর মাসিমা হলো কি করে?"

শিখা কহিল, "তাঁর কি রকম বোন-ঝী; ওর বাবার বন্ধু!"

ব্যঙ্গের হাস্যে কল্পনা কহিল, "ওরে বাবা, তাতেই এত! একটা ঠাট্টা অবধি সইতে পারেন না! ফোঁস্ করে ওঠেন!"

বারান্দায় দাঁড়াইয়া কল্পনার দল যখন এমনি জটলা পাকাইতেছিল, বাগানের এক প্রান্তে রত্না তখন মাধবীলতার মঞ্জরীগুলাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

ঝর্ণা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল, কহিল, "রত্নাবলীর কি হচ্ছে?"

ঝর্ণার দিকে একবার চোখ তুলিয়া রত্না আনত মুখে গাছটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

ঝর্ণা কাছে আসিল। রত্নার চিবুক তুলিয়া কহিল, "ও কি, কাঁদছিস্!"

"দেখ্ না ভাই, কল্পনা আমাকে কি রকম যা-তা বললে আমি গোস্বামীদের বাড়ী যাই বলে। বাবা তো ওঁকেই আমার গার্জ্জেন করে গেছেন।"

"কি তাতে দোষ হয়েছে? তোমার বাবার তিনি বিশেষ বন্ধু! কল্পনার কথা ছেড়ে দে। ও বড়-লোকের মেয়ে। বাপ জজ বলে কাউকে ও গ্রাহ্য করে না।"

মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া রত্না কহিল, "ও বললে, তুমিও না কি আমার নামে কি সব বলেছো !"

"আমি ?" ঝর্ণা হাসিল। কহিল, "না, না ! ওদের সে দিন কথা হচ্ছিল. আমি বলেছিলুম, রত্না নিজেকে ডিঙ্গিয়ে চলছে !"

"ডিঙ্গিয়ে চলছি কি রকম ?" রত্না ঝর্ণার পানে চাহিল।

একটা লোহার বেঞ্চে রত্নাকে লইয়া ঝর্ণা বসিল। কহিল, "হ্যাঁ রত্না। নিজের দিকে চেয়ে নিজেকে একটু দেখিস্। আচ্ছা, আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি. তোর টুথব্রাস থেকে সেণ্ট পর্য্যন্ত কোন্‌টা দামী জিনিষ নয়, বল্ তো ? তাই আমি বলেছি, রত্নাকে যেন বড়মানুষী নেশাতে পেয়েছে !"

রত্না নীরব হইয়া রহিল,—উত্তর খুঁজিয়া পাইল না বলিয়া নয়; সুস্পষ্ট সত্য উক্তির মধ্যে এমন শক্তি নিহিত থাকে, যাহাকে সহসা অস্বীকার করা যায় না ! সঙ্কোচে মন বিমূঢ় হইয়া পড়ে !

ঝর্ণা রত্নার সেই ফ্যাল্-ফ্যাল্ দৃষ্টির পানে চাহিয়া কহিল, "সে যাক্ রত্না ! প্রিন্সিপ্যাল্ সে দিন বললেন, রত্না একটা জিনিয়াস গার্ল ! আমি কিন্তু বলছি—যত গোল বাধাতে সংসারে মজবুত এই জিনিয়সের দল ! কারণ, পাঁচ জনের চলা রাস্তাটাই তারা গুলিয়ে ফেলে।"

রত্না আড়ষ্টের মত বসিয়া রহিল ! কিন্তু অধিকক্ষণ এমন অপরাধীর মত সঙ্কুচিত থাকিতে হইল না ! মুক্তি দিলেন লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি আসিয়া রত্নাকে কহিলেন, "রত্না, গোস্বামী-সাহেবের ওখান থেকে তোমায় নিতে এসেছেন ! প্রিন্সিপ্যাল্‌স্-রুমে তিনি আছেন।"

চাঁদের উপর হইতে খণ্ড মেঘখানা নিমেষে সরিয়া গেল। পুলকদীপ্ত মুখে রত্না বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রফুল্ল স্বরে রত্না কহিল, "আসি ভাই !"

"এসো রত্না।"

বাগানের মোড় ঘুরিয়া বারান্দার সিঁড়িতে পা দিতেই রত্না দেখিল, কল্পনার দল তখনও গুলতান্ করিয়া একটা মুখরোচক আলোচনায় মাতিয়া রহিয়াছে ! কাণে কিছু না শুনিলেও রত্না নিঃসংশয়ে অনুমান করিল, তাহারই সমালোচনা হইতেছে। নিষ্ফল আক্রোশে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া স্বস্থানে যাইতে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতেই কাণে শুনিল, জ্যোৎস্না কহিতেছে, "তা ভাই যাই বলিস্, রত্নার বরাত বটে ! কত বড়লোক—"

সুষমা কহিল, "থাম্ থাম্, বড়লোক। তুইও রত্নার মত মূর্চ্ছা যাবি—না, দিনে তারা গুণ্‌বি !"

থতমত খাইয়া জ্যোৎস্না কহিল,"না, তা বলিনি ! মিষ্টার গোস্বামী কিন্তু খুব সুপুরুষ ! সে দিন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলছিল, আমি ভেবেছিলুম, কোন সাহেব না কি !"

কল্পনা কহিল, "তবে আর কি ! যাও বরমাল্য নিয়ে রত্নার আগে ছোটো ! বাবা, হ্যাঙ্‌লা বটে তোরা !"

শান্তি কহিল, "চুপ !"

সকলে সচকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল,—গম্ভীর পদবিক্ষেপে রত্না তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় তাহার মুখ গম্ভীর।

রত্না কয়েক পা অগ্রসর হইতেই সহাধ্যায়িনীদের উচ্চ হাস্যরোল বোমা-ফাটার শব্দের মত রত্নার কর্ণে প্রবেশ করিল ! এবং আহত চিত্তের ব্যর্থ আক্রোশ কান্নার মত গুমরিয়া বুকের মধ্যে মাথা কুটিতে লাগিল।

৭

অনিল মোটরের দরজা খুলিয়া দিতেই রত্না উঠিয়া গাড়ীতে বসিল। পাশে বসিল অনিল। গাড়ী ছুটিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া অনিল কহিল, "আজ এত গম্ভীর যে !"

রত্না কোন উত্তর দিল না। পাশে পথের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

সহাস্যে অনিল কহিল, "কি হলো ? মুখ ফিরিয়ে বসে আছো যে !"

এ প্রশ্নেরও কোন জবাব মিলিল না। রত্না মুখ ফিরিয়া চাহিলও না ! যেমন ছিল, তেমনি রহিল।

আশ্চর্য্য হইয়া অনিল হাত বাড়াইয়া রত্নার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতেই তাহার কৃষ্ণ-তারকা-শোভিত শ্বেত পলাশ হইতে শিশির-বিন্দু ঝরিয়া পড়িল। যে অশ্রু এতক্ষণ নয়ন-পল্লবে সঞ্চিত ছিল, সমস্ত শক্তি দিয়া রত্না যে-অশ্রুকে ঠেলিয়া রাখিতেছিল, সে অশ্রু আর নিজেকে সম্বৃত রাখিতে পারিল না—ঝরিয়া পড়িল।

সাশ্চর্য্য স্বরে অনিল কহিল, "এ কি রত্না, তুমি কাঁদচো !" ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সাগ্রহে সে রত্নার চোখের জল মুছাইয়া দিল। অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, "কেন ? কি হয়েছে তোমার ? কাঁদচ কেন ?"

রত্না নীরব।

সে রত্নার হাত ধরিল। মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিল, "আমায় বলবে না, কি হয়েছে ? বলো লক্ষ্মীটি !"

তবু রত্নার মুখে কথা নাই। অনিলের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাতখানা কিন্তু টানিয়া লইল না।

অনিল কহিল, "বুঝেছি। বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে !"

এবার রত্নার মুখে কথা ফুটিল। এ অপবাদ যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণের জন্য ধরা-গলাতেই সে কহিল, "আমি তো ছেলেমানুষ খুকী নই যে, বাড়ীর জন্য বসে বসে কাঁদবো !"

পরিহাসের সুরে অনিল কহিল, "না, তুমি একেবারে আদ্যিকালের বদ্দি বুড়ী ! বয়স তোমার সাতাশ হাজার কুড়ি !"

অনিলের কথা বলার ভঙ্গীতে কান্নার মধ্যেও রত্না হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "আপনি খালি ঠাট্টা করেন !"

হাসিতে হাসিতে অনিল কহিল, "হুঁ, আমি খালি ঠাট্টা করি—আর তুমি কেঁদে হাট বসাও ! কি হয়েছে, বলো তো ? এত কান্না-কাটি কিসের ?"

রত্না চুপ করিয়া রহিল। অভিমানি-চিত্তের যে-দুঃখ তাল পাকাইয়া অশ্রুর আকারে ঝরিতেছিল, তাহা কোন মতেই অন্যের কাছে প্রকাশ করা চলে না।

তরুণীর লজ্জা-রক্তিম মুখের উপর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কৌতুক-জড়িত কণ্ঠে অনিল প্রশ্ন করিল, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে বুঝি বকুনী খেয়েছ ?"

মাথা নাড়িয়া সবেগ প্রতিবাদে রত্না কহিল, "না। মিস্ গুহ আমাকে কিছু বলেননি।"

"বলেননি! বলো কি? তিনি তো আমায় দেখেই মুখখানা ভীমরুলের চাকের মত করেছিলেন। নেহাৎ প্রিন্সিপ্যালের আদেশ!"

"কিন্তু তিনি আমায় কোন কিছুই বলেননি!"

"তবে কে তোমায় কি বলেছে? কি হয়েছে বলবে না রত্না? কেন তুমি কাঁদচ?" অনিলের কণ্ঠে এমন জিদ, এতখানি আগ্রহ যে, তাহাকে উপেক্ষা করা যায় না। পরিপূর্ণ নেত্রে অনিল রত্নার মুখের পানে চাহিল।

সে-দৃষ্টির সহিত রত্নার দৃষ্টি মিলিবামাত্র রত্নার অশ্রুধৌত সুগৌর কপোলের উপর যেন দু'টি রক্ত-গোলাপ ফুটিল।

লজ্জিত কণ্ঠে রত্না কহিল, "না, আমায় কেউ কিছু বলেনি।"

রত্নার সেই অপরূপ সুন্দর মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনিল কহিল, "তবে কাঁদছিলে কেন?"

রত্না মুখ নত করিল। জড়িত কণ্ঠে কহিল, "আপনারা আমাকে স্নেহ করেন, যত্ন করেন, তাই কলেজের মেয়েরা—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া অনিল হাসিয়া উঠিল। কহিল, "ও, বুঝেছি। আমরা ভালোবাসি বলে তোমায় ঠাট্টা করে? তাই তোমার অভিমান হয়েছে! আচ্ছা, আজই মাকে গিয়ে এ কথা বলবো।" অনিলের স্বরে দুষ্টামি মাখানো।

রত্না অনিলের হাত চাপিয়া ধরিল। "না, না, মাসিমাকে আপনি এ-কথা বলতে পাবেন না।"

"বেশ। বলবো না। কিন্তু তুমি সর্ত্ত করো।"

"কি সর্ত্ত, বলুন?" রত্না চোখ তুলিয়া চাহিল।

"তুমি আমায় 'আপনি' বলে কথা কইতে পাবে না। 'তুমি' বলতে হবে।"

"বা রে, আমি কি বলবো—আপনাকে?"

"আবার 'আপনাকে'! বেশ, বাড়ী চলো, কথা ফাঁশ করে দেবো। বাড়ীতে আজ আবার এক জন নতুন লোক এসেছে।"

সাগ্রহে রত্না জিজ্ঞাসা করিল, "কে নতুন লোক?"

"বলবো না যতক্ষণ না আমায় 'তুমি' বলবে। আর সেই নতুন লোকটির সামনে কি বলবো, জানো?"

সবিস্ময়ে রত্না কহিল, "কি?"

"তুমি কি রকম করে কলেজের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমানুষের মত কাঁদছিলে! কি রকম কাঁদুনে তুমি!"

"না কক্ষনো না।"

"কিন্তু কেঁদেছ তো! সেই আমার মস্ত প্রমাণ। সবাই ভাববে, রত্না কচি খুকী! সেই নতুন লোকটিও বলবে, একে একটা চুষি, ঝুমঝুমি কিনে দিতে হবে—কলেজে পড়তে আসাই এর বিড়ম্বনা—এর এখন দেশে ফিরে যাওয়া উচিত; তার পর ডাগর হয়ে কান্না থামলে কলেজে পড়তে আসবে।"

অনিল হাসিতে লাগিল।

রত্না মনে মনে আহত হইল। ছেলেমানুষের মত রাগিয়া উঠিয়া সে কহিল, "না, আপনি এমন সব কথা কক্ষনো বলতে পাবেন না!"

"কেন পাবো না? তুমি আমায় ঘুষ দেবে না?"

"কি ঘুষ দেবো?" সরল কণ্ঠে রত্না চাহিল।

"তুমি আমায় 'তুমি' বলবে—বলো! বেশ, বলবে না তো? আমিও বাড়ী গিয়ে আমার যা মনে আসে বলবো।"

"না, না, দোহাই আপনার! বলছি—'তোমার'—হয়েছে তো?"

"হয়েছে! চলো, আজ সিনেমায় যাই।"

"সিনেমা!"

"হ্যাঁ। দোষ কি? তুমি আমায় আনন্দ দিয়েছ, আমিও তোমায় আনন্দ দেবো!"

"আনন্দ!" রত্নার মুখ প্রদীপ্ত হইল।

মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে অনিল কহিল, "আজ তোমার 'আপনি' বিসর্জ্জন হলো!"

রত্না কহিল, "আপনার যত সৃষ্টিছাড়া কথা!"

কৃত্রিম বকুনীর স্বরে অনিল কহিল, "আবার আপনার!"

"না, না, 'তোমার'! কিন্তু দেখুন—"

"না, দেখবো না! এই মুখ ফেরালুম!"

অনিল মুখ ফিরাইল।

রত্না হাসিল। কহিল, "ইস্, রাগ হলো? কিন্তু বায়োস্কোপে যে যাবো, মাসিমা মত দেবেন?"

তখনই মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া অনিল কহিল, "মার কাছে কৌশলে মত আদায় করার ভার আমার।"

"কি কৌশল করবেন 'আপনি'—না, না, তুমি? শুনি।"

"মা'র শুদ্ধু টিকিট কিনবো। কিন্তু আজ **শনিবার**, মা তার নাচের স্কুলের জন্য যেতে পারবে না। অথচ তোমায় 'না' বলতে পারবে না!"

তার পর ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া অনিল আবার বলিল, "মা তোমায় অত ভালোবাসে কেন, জানো?"

"কেন?"

"আমাদের বোন ছিল,—মা তাকে নিজের হাতে গড়ছিল। সে নেই বলে—"

রত্নার আয়ত চোখের পিছনে বাষ্প-ভার! রত্না কহিল, "কৈ, তাঁর নাম তো শুনি না!"

"মার সামনে আমরা কেউ কখনো তার নাম করতে পারি না। মা বড্ড কাতর হয়ে পড়ে। তার পরই তো মা নাচের স্কুল করলে। ওই সব নিয়ে ভুলে থাকে।"

"ও!" বলিয়া রত্না চুপ করিল।

মিসেস্ গোস্বামী দু'জনকে দেখিয়া কহিলেন, "তোমরা এতক্ষণে ফিরলে! আমি বেড়াতে যেতে পাইনি! রত্নার সঙ্গে অমিয়র আলাপ করিয়ে দেবো বলেছি, কাজেই বেরুতে পাইনি।"

সপ্রতিভ কণ্ঠে অনিল কহিল, "রত্নার বড্ড মাথা ধরেছিল। তাই মাঠে দু'টো চক্র দিলুম!"

মিসেস্ গোস্বামীর অসন্তোষ কাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "মাথা ধরেছিল—খুব রাত জেগে পড়ছো, বুঝি? না, না,—শরীরকে যত্ন করবে। স্বাস্থ্য আগে, তার পরে যা হয়। এসো রত্না, আমার বড় ছেলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। অনিল যেমন তোমার ভাই, সেও তেমনি।"

ড্রয়িং-রুমে পুত্রের সহিত মিষ্টার গোস্বামী কথা কহিতেছিলেন। রত্না প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে আনত হইল।

গোস্বামী-সাহেব সস্নেহে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—"থাক্ মা, হয়েছে। বেশ ভালো আছো?"

মাথা নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া রত্না জানাইল, সে ভালো আছে।

নিজের পাশের আসনখানা দেখাইয়া তিনি কহিলেন, "বসো মা! কে আনতে গেছলো তোমাকে? অনিল?"

মৃদু স্বরে রত্না উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

মিসেস্ গোস্বামী ঘরে আসিলেন। তাঁর পিছনে আসিল অনিল। মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "রত্নার আসতে দেরী হচ্ছিল দেখে ভারী ব্যস্ত হচ্ছিলুম। অনিল তাকে নিয়ে মাঠে গেছলো! রত্নার বড্ড মাথা ধরেছিল।"

সহাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "বেশ করেছিল। রত্না ছেলেমানুষ! তেমন কিছু দেখতে পায় না! ওর বয়সের ছেলেমেয়েরা কত দেখে-শুনে বেড়ায়। হ্যাঁ রত্না, আমি তোমার প্রিন্সিপ্যালকে লিখেছি, এক্মাসের ছুটিটা তুমি এইখানে কাটাবে, বল্টুকেও তাই লিখেছি।"

রত্নার মুখ আনন্দে ঝলমল্ করিয়া উঠিল। সস্মিত স্বরে সে কহিল, "বেশ হবে মেসোমশায়।"

মিসেস্ গোস্বামী নির্ব্বাক্! জ্যেষ্ঠ পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "অমিয়র সঙ্গে বুঝি এখনও রত্নার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি?"

গোস্বামী সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "না, ও আমার সঙ্গেই কথা কইছিল। অমিয়, এটি আমার ছেলেবেলার বন্ধু বল্টু—তার মেয়ে রত্না! রত্নাকে তোমরা বোনের মত দেখবে। রত্না, অনিল যেমন তোমার ভাই হয়, অমিয়ও তেমনি ভাই। তার উপর ও আবার হাকিম।"

গোস্বামী সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

তার পর কহিলেন, "রত্না খুব ভালো মেয়ে! ম্যাট্রিকে কুড়ি টাকা 'স্কলারশিপ' পেয়েছে! আই-এতেও পাবে, সে আশা আমরা রাখি।"

অমিয় এতক্ষণে পদোচিত গাম্ভীর্য্য লইয়াই কথা কহিতেছিল। তেমনই অনাসক্ত কণ্ঠেই কহিল, "ভেরী ইন্‌টেলিজেন্ট গার্ল।"

"শুধু ইন্‌টেলিজেন্ট নয়—ও একটা জিনিয়াস্! তোমার মাকে জিজ্ঞেসা করো, এই অতি অল্প দিনে কি রকম নাচতে শিখেছে ও।"

মিসেস্ গোস্বামী সায় দিয়া কহিলেন, "তা সত্যি। আমার ইস্কুলের কোনো মেয়ে রত্নার মত নাচতে পারে না। রত্নাকে যেমন হাতে ধরে শেখাই, তাদেরও তেমনি করি তো!"

গোস্বামী-সাহেব প্রদীপ্ত মুখে কহিলেন, "হবে না? কার মেয়ে রত্না! বল্টু কি রকম ভালো নাচতো! তবে শোনো, হাটে হাঁড়ি ভাঙি রত্না, তোমার বাবাকে গিয়ে বলো, তুমি নারদের মত দাড়ি রেখে এখন নিজেকে যতই ভারিক্কি বলে পরিচয় দাও না কেন, মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি, তুমি কি রকম লক্ষ্মী ছেলে ছিলে!" বলিয়া গোস্বামী-সাহেব আনন্দের স্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

তার পর কহিলেন, "সে ভারী মজার কাহিনী। মামার বাড়ীতে রাধামাধবের রাসে খুব ধুমধাম হতো। যাত্রা হবে। 'অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর' পালা। হঠাৎ উর্ব্বশী বেচারার হলো ম্যালেরিয়া জ্বর। একদম বেড্‌স! কিন্তু তা বলে যাত্রা তো বন্ধ থাকবে না! বল্টু তখন লুকিয়ে স্বরেন অধিকারীর সাকরেদী করে, তার নাচের মহলা আমরা বটতলাতে দেখতে যাই। স্বরেন অধিকারী বল্টুকে বললে,—তুমি মুখ রাখো বল্টু, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি পারবে! বল্টু প্রথমে ভয় পাচ্ছিল। স্বরেন অধিকারীর জিদে শেষে উর্ব্বশী সাজতে রাজী হলো। বল্টুর বাবা এসেছেন নিমন্ত্রণে। আসরে বসে তন্ময় হয়ে তিনি যাত্রা শুনছেন—দেখছেন। মুগ্ধ হয়ে উর্ব্বশীর নাচের তারিফ কচ্ছেন! হরিপদ গাঙ্গুলী বেহালা বাজাচ্ছে আর মুখ টিপে টিপে হাসছে। মামাবাবুর ওপাশে বসে আমিও যাত্রা দেখছি। বল্টুর বাবা বুঝতেই পাচ্ছেন না, ওড়না-উড়ানী বেণী-দুলুনী উর্ব্বশীটি তাঁর বল্টু! হঠাৎ এক সময়ে আমি বলে ফেলেছি—মামাবাবু, স্বরেন অধিকারী বল্টুকে কেমন নাচতে শিখিয়েছে, দেখছেন! বল্টুর বাবা চমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে নাচতে শিখিয়েছে? আমি তখন অত বুঝিনি, বললুম,—বল্টুকে! ব্যস, যে নাচে ভদ্রলোক অমন মসগুল হয়েছিলেন, এক নিমেষে তা চুরমার। ইন্দ্রের সভার কোন অনুশাসন না মেনে দেবরাজকে গ্রাহ্য না করে তখনি তিনি ছুটলেন স্বর্গের সেরা নর্ত্তকীকে জুতোপেটা করতে! সে কি হৈ-হৈ হাঁ-হাঁ হট্টগোল! মামাবাবু খপ করে তাঁর পাঞ্জাবী টেনে ধরলেন! পাঞ্জাবীর আধখানা মামাবাবুর হাতে রেখে ভদ্রলোক সংহার-মূর্ত্তি ধরলেন! ভদ্রলোক ভীষণ রাগী! উর্ব্বশী কিন্তু অর্জ্জুনের হাতের তলা দিয়ে ততক্ষণে দে চম্পট"! গোস্বামী-সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস্ গোস্বামীও হাসিতেছিলেন। কহিলেন, "এমনি করেই আমাদের দেশের কলাবিদ্যাকে আমরা নষ্ট করছি। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সকলেই মিসেস্ গোস্বামীর পানে চাহিল।

"তোমার বার্থ-ডেতে আমি অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর অভিনয় করাবো। রত্না সাজবে উর্ব্বশী।"

সকলের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তার পর রত্নাকে কি তার বাপের মত দুর্দ্দশা ভোগ করাতে চাও?"

অনিল কহিল, "তা কেন? রমেশ বাবুর কাছ থেকে আমরা অনুমতি চেয়ে নেবো।"

অমিয় কহিল, "ছুটীটা তা হলে মন্দ কাটে না।"

গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "উত্তম প্রস্তাব।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "শুধু উত্তম প্রস্তাব করলেই চলবে না! তুমি সাজবে দেবরাজ, আর তোমার বন্ধু হবেন ভরত মুনি!"

গোস্বামী-সাহেব আর এক বার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "চমৎকার হবে!"

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

পতি-সংশোধনী সমিতি

[গল্প]

এবার পৌষ মাসে তেমন শীত পড়ে নাই ; সারা মাঘ মাসটা মাঝে-মাঝে ঝড়-বৃষ্টিতে কাটিয়াছে। তাই ফাল্গুনের শেষের দিকেও বেশ একটু শীত রহিয়াছে। দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর অচিন্ত্য বাবু বৈঠকখানা-ঘরে র‍্যাগ মুড়ি দিয়া এক-ঘুম ঘুমাইবার পর যখন চোখ চাহিলেন, দেখিলেন, ঘড়িতে প্রায় তিনটা বাজে। বাহিরে জোলো-ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। র‍্যাগখানাকে ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া তিনি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। তবে আর ঘুমাইলেন না, শুইয়া শুইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন—

ঋতুর এবার ওলট-পালট অবস্থা সুরু হলো। কি একখানা বইয়ে যে লিখেচে,—আসচে ভাদ্র মাসে কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ পড়বে, তার আগে অনেক রকম অঘটন ঘটবে, হয়তো এ-ও তারি একটা। মেদিনীপুরের বন্যা, উড়িষ্যার ঝড়, হালসীবাগানের অগ্নি-কাণ্ড, এ সবই হয়তো ঐ অঘটনের সামিল। তার ওপর জগৎ-জোড়া যুদ্ধ তো চলছেই। লোকটার গণনা হয়তো ঠিক। কলির যে শেষ, তার আর সন্দেহ নেই। রমানাথের কাণ্ডটা এক বার দেখ। চাইতে-না-চাইতে পঁচিশটে টাকা দিলুম—নইলে তার ইনসিওর বাতিল হয়ে যায়! বললে, পরশু মাইনে পাবো, পেয়েই আপনার টাকাটা দিয়ে দেবো। তা পরশুর জায়গায় আজ সাত মাস হয়ে গেল, কিছুতেই আর টাকাটা আদায় করতে পারলুম না! চাইতে গেলে উল্টে মহা বিরক্ত! নাঃ, কলির যে শেষ, তার আর কোন ভুল নেই!

ভাবতে-ভাবিতে অচিন্ত্য বাবুর একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রার মাঝে তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—গভীর রাত; বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া তিনি 'কল্কিপুরাণ' পড়িতেছেন, এমন সময় একটা শব্দ শুনিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দেখেন, প্রকাণ্ড একটা ভালুক। অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁর দিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে। ভয়ে তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিতেই ভালুক কহিল—'ভয় নেই, আমি সত্যযুগের ভালুক, নিরামিষ ছাড়া আহার করি না।' অতঃপর জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, যেখানে ভালুক দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আর ভালুক নাই, আছে রমানাথের ভূত দাঁড়াইয়া! তাহার হাতে টাকা-ভরা একটা থলি! তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া রমানাথের ভূত বলিতে লাগিল—"আঁমি মোঁরে গেঁছি। বঁউটা ইঁনসিঁওরেঁর চাঁর হাঁজাঁর টাঁকা পেঁয়েছিঁলো, কেঁড়ে এঁনেছি। তোঁমাঁর পঁচিশটা টাঁকা দিঁতে এঁসেঁছি। আঁমি তঁআঁর মাঁনুষ নঁই—ভূঁত! সুঁতরাং আঁমাঁয় তোঁমাঁর আঁর ভঁয়ের কাঁরণ নেঁই! নাঁও, এঁসো, তোঁমার টাঁকা নাঁও।"

আঁৎকাইয়া উঠিয়া তিনি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহির হইতে তখন রমানাথের ভূত জানালায় ধাক্কা দিতে লাগিল। সেই ধাক্কায় অচিন্ত্য বাবুর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তবু জানালার ধাক্কা থামিল না। বিরক্ত হইয়া অচিন্ত্য বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কে হে?"

"আজ্ঞে, আমি।"

"আমি কে?"

"আজ্ঞে, আপনি ত অচিন্ত্য বাবু?"

"আরে ভালো মুস্কিল!—তুমি কে?" বলিয়া অচিন্ত্য বাবু শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জানালা খুলিয়া দেখেন, 'বাসন্তিকা বস্ত্রালয়'-এর সরকার, হাতে তাহার একটা 'বিল্'। লোকটি কহিল—"মা সেদিন দু'জোড়া শাড়ী এনেছিলেন। এই বিল্টা,—৩৪৷৴১০। টাকাটা দেবেন কি?"

"দেবো। আঁকুষি আছে তোমার কাছে?"

"আজ্ঞে—আঁকুষি! কি বলচেন?"

"এই আমার উঠোনের গাছে ফলেছে; টাকাটা পাড়তে হবে কি না—তাই আঁকুষি চাই।"

লোকটি ভ্যাবা-চাকা খাইয়া এক-দৃষ্টে অচিন্ত্য বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "চেয়ে থাকলে কি হবে! যিনি কাপড় এনেচেন, তিনিই টাকা দেবেন। দাঁড়াও, তাঁকে ডেকে দি। নিমাই! অ নিমাই!"

"আইজ্ঞা!" বলিয়া নিমাই আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "তোমার মাকে একবার ডেকে দাও দেখি, আইজ্ঞা।"

"আইজ্ঞা, তিনি তো ঘরকে নাই। আপনি ঘুমালে পর তিনি···"

"কোথায় গেছেন?"

"আইজ্ঞা, বাসকুপ দেখবারে···"

"ওহে, কোথায় গেলে? অ চৌত্রিশ সাড়ে-ন' আনা!"

"কি বলচেন বাবু?" বলিয়া লোকটি পুনরায় আসিয়া জানালার ধারে মুখ বাড়াইল।

অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "ওহে, ফিরে যেতে হলো। তিনি ঘরে নেই, বাসকুপ দেখতে গেছেন।"

লোকটি বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে আর এক মূর্ত্তি—পিঠে ও হাতে বোঁচকা-বুচকি ঝুলাইয়া দেখা দিল। লোকটা লেস্-ফিতা-ওলা। সে কিছু বলিবার আগেই অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "মক্কেল গর হাজির, ফিরতে হবে।"

"আজ্ঞে, মা-ঠাকরুণ বলেছিলেন, চওড়া সাটিনের ফিতের কথা···"

"আহা-হা, বলচি যে মক্কেল গর-হাজির, যাও।"

"বাবু, খুব ভালো সাবান আছে। দামে সুবিধে হবে। এক বার দেখবেন কি?"

"না।"

"উপন্যাস বই-টই কিছু চাই না বাবু?"

একটু বিস্মিত হইয়া অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "লেস্-ফিতে-সাবানের সঙ্গে উপন্যাসও রাখো না কি?"

"আজ্ঞে, মা-ঠাকরুণরা চান কি না। দেখাবো বাবু দু'-একখানা?" বলিয়া গাঁটরি খুলিতে খুলিতে বলিল—'প্রণয়ের ক্ষিদে' নিন বাবু একখানা। এ-রকম কেতাব আর জন্মায়নি। 'বসন্তের কোকিল' নিতেও পারেন। খুব ভালো বই। 'প্রথম প্রিয়া'···"

"চাই না, চাই না। আর বকিও না বাবা। তোমার 'প্রথম প্রিয়া' 'শেষের প্রিয়া' কিছুই দরকার নেই। সরে পড়।"

লেস্-ফিতা-ওলা তাহার বোঁচকা লইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীমান্ নিমাইচন্দ্র তখনও তাহার মিশ কালো রংয়ের 'ছিটে বেড়া'র গায়ে কোঁচার কাপড়খানা জড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অচিন্ত্য বাবু ঘড়ির দিকে এক বার দেখিয়া লইয়া কহিলেন—"নিমাই চন্দোর!"

"আইজ্ঞা বাবু।"

"এক কাপ চা তৈরী করতে পারবে ধন?"

"আ—ই—জ্ঞা……"

"আইজ্ঞার বহর দেখে বুঝতে পেরেচি। যা বেটা, ওই ঠাকুরকে বল্ গিয়ে—এক কাপ চা করে আন্‌তে।"

নিমাই চলিয়া গেল।

"মায়-জি!"

"তুমি আবার কে বাবা?"

"ছিট্-কাপ্‌ড়াওয়ালা বাবু-সাব! মায়জি ওহি রোজ বোলা থা……"

"ও রোজ বোলা থা, কিন্তু আজ রোজ বোলতা যে, তোম হিঁয়া আউর মত্ আও। ছিট্-উট্ আউর নেহি লেগা।"

"কেঁও বাবুজি, কুছ কসুর হুয়া?"

"তোমরা মাইজি বিধবা হুয়া! ছিট্-ফিট্‌কা আর দরকার নেহি হোগা। যাও, ভাগো।"

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া ছিটওয়ালা খানিকক্ষণ অচিন্ত্য বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং তার পর এক-পা এক-পা করিয়া চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই ঠাকুর এক-কাপ চা লইয়া হাজির হইল এবং অচিন্ত্য বাবুও পাঁচ-সাত মিনিট ধরিয়া তাহা তোয়াজের সহিত পান করিয়া ডাকিলেন—"নিমাই!"

নিমাই আসিলে কহিলেন—"সিগারেটের বাক্সটা—আইজ্ঞা! আর, ম্যাচ-বাক্সটা—আইজ্ঞা।"

প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোটা চার-পাঁচ সিগারেট ধ্বংস করিয়া অচিন্ত্য বাবু উঠিলেন এবং নিকটবর্ত্তী পার্কে গিয়া একখানি বেঞ্চের উপর বসিলেন। খানিক পরে ঐ পাড়ারই দেবেশ বাবু আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়া কহিলেন—"অচিন্ত্য বাবুকে রোজই মনে মনে চিন্তা করি, কিন্তু দর্শন আর ভাগ্যে মেলে না। আছেন কেমন বলুন?"

গম্ভীর বদনে অচিন্ত্য বাবু কহিলেন—"কেমন অনেক দূরে, আছিই কি না সন্দেহ!"

"ব্যাপার তাই বটে। ৩১ টাকা দিয়ে দু'মণ চাল কিনলুম মশাই। আচ্ছা, আটা কত করে কিনছেন আপনি?"

"আটা? বলতে পারি না। তবে আটা নামে এক রকম সাদা গুঁড়ো চোদ্দ আনা করে সের আনে, দেখেচি।"

"উঃ! কি হবে বলুন তো?"

"বিশেষ কিছুই নয়। যে জিনিষটা অত্যন্ত সত্য সেইটেই হবে, অর্থাৎ যাকে বলে, মৃত্যু!"—অচিন্ত্য বাবুর গম্ভীর বদন অধিকতর গম্ভীর হইল।

হঠাৎ দেবেশ বাবু অদূরে কাহাকে দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া সেই দিকে চলিয়া গেলেন। অচিন্ত্য বাবু একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজ নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সুরবালার অর্থাৎ স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে রাগ তাঁহার মনে একটু একটু করিয়া সঞ্চিত হইতেছিল, এখন তাহা চরমে উঠিল। তিনি বাড়ী ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, সুরবালা আরাম-কেদারায় বসিয়া চা খাইতেছে, হাতে একখানা 'গরমিল'-এর গানের বই।

অচিন্ত্য বাবু পাশের চেয়ারখানায় বসিয়া কহিলেন—"তোমার আজ অনেক মক্কেলের আমদানী হয়েছিল। বাসন্তিকা বস্ত্রালয়, ছিটের কাপড়ওলা, লেস-ফিতে-ওলা। তার পর বেড়াতে বেরুচ্চি, এমন সময় 'স্নাপি বয়' এসে হাজির। বলে, গিন্নীমা প্রায়ই কেনেন, আজ আসতে বলে দিয়েচেন। আমি তাকে বায়োস্কোপে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম,—গিয়েছিল?"

চায়ের শূন্য বাটিটা মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া সুরবালা কহিল—"পাঠিয়ে যখন দিয়েছিলে, তখন নিশ্চয়ই গিয়েছিল বই কি।"

"কিন্তু তোমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে যে।"

"হুকুম হোক্।"

"হুকুম নয়কো, ভিক্ষা! ভিক্ষা এই যে, বর্ত্তমানের এই দুর্দ্দিন যত দিন থাকবে, তত দিন আমার ঘাড় থেকে নেমে তোমার পিত্রালয়ে গিয়ে ভর করতে হবে।"

"তার মানে?"

"তার মানে—'তাহার' সংস্কৃততে—'তস্য', আর ইংরেজীতে—'হিজ্ বা 'হার'।"

"রসের হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বললেই ভালো হয়।"

"আসল কথা হচ্চে, দেড়শো টাকা পাই পেন্সন, আর খরচ মাসে তিনশো। তার ভেতর বেশীর ভাগই তোমার বাজে-খরচ! সুতরাং……"

"সুতরাং কি করতে বলো?"

"ঐ সব বাজে-খরচ আর কিছুতেই চলবে না! বায়োস্কোপ দেখা, ঐ রং-বেরংএর শাড়ী, ব্লাউশ, ঐ সব লেস-ফিতে, ঐ 'স্নাপি-বয়'—এ সব আর এই আন্‌স্নাপি দিনে চলবে না। চাল কিনতে হচ্চে কুড়ি টাকা মণ! কয়লা, তেল, আটা, তরি-তরকারী সব পাঁচ গুণ সাত গুণ দাম বেশী! সুতরাং এ সময়ে আর……"

একটু শ্লেষ-মেশানো স্বরে সুরবালা কহিল—"তা সংসার চালাতে যদি অক্ষম হয়েই থাকো, আমাকে দাদার ওখানেই দিয়ে এসো। একটু বললে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তুমিও ওখানে পেতে পারবে। সিঁড়ির নীচে চোরকুঠুরীর ঘর আছে। সেখানাও বোধ হয় বলে-কয়ে তোমার শোবার জন্য করে দিতে পারবো।"

মুখখানা কথঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া অচিন্ত্য বাবু কহিলেন—"বটে! অপার দয়া তোমার! তবে দাদার সংসারে গিয়ে আবির্ভাব হলে আমার ভয় হয়, সে-বেচারার সংসারটিও ছারখার যাবে!"

বিষম বিরক্তির সহিত সুরবালা কহিল—"যেমন তোমার সংসার গিয়েচে?"

"না গেলেও যাবার লক্ষণ দেখা দিয়েচে। তোমার ও-সব নবাবী-চাল আর চলবে না। কিছুতেই চলবে না।"

"স্ত্রীকে যদি খেতে-পরতে দিতে না পারবে তো বিয়ে করেছিলে কেন?"

"খাওয়া-পরা মানে তো নবাবী করা নয়। নবাবী আর চলবে

না!" বলিয়া অচিন্ত্য বাবু চোখ দিয়া সুরবালার প্রতি যেন এক ঝলক আগুন ছিট্‌কাইয়া দিলেন।

তেমনি আগুন ছিটাইয়া সুরবালাও লাফাইয়া উঠিল—"আলবৎ চলবে।"

তার পরই তুমুল কাণ্ড। প্রথমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বচসা, তার পর বাদাবাদি তরজা। শেষে তুবড়ি জ্বলিয়া, হাউই উড়িয়া, বোম্ ফাটিয়া সারা বাড়ী ধূমে ধূমাচ্ছন্ন! সুরবালার অনাহারে শয়ন এবং অচিন্ত্য বাবুর দ্বিগুণ আহারের পর বৈঠকখানায় রাত্রি-যাপন।

* * *

পরদিন প্রভাতে চা-পানের পর সুরবালা সাজগোজ করিয়া বাহির হইয়া গেল। নিমাই উঠানের কলতলায় বাসন মাজিতেছিল, মনে মনে কহিল—আজ সকাল থেকেই মা'র বাসকুপ্! অচিন্ত্য বাবু আন্দাজ করিলেন, বোধ হয় শ্যামবাজারে দাদার ওখানেই যাইতেছে! সুরবালা কিন্তু ও-পাড়ায়, অর্থাৎ যতীন দাস রোডে তার বন্ধু মীনাক্ষীর বাড়ী গেল। মীনাক্ষী তখন 'গরমিল'-এর স্বরলিপির বই দেখিয়া গান তুলিতেছিল—

'সেই আমি আর সেই তুমি
সেই কুসুমিত বন-ভূমি।'

ঘরে প্রবেশ করিয়াই সুরবালা কহিল, "সেই তুমি—সেই আমি ঠিক আছি বটে, কিন্তু সেই কুসুমিত বনভূমি আর নেই! বনভূমি শুকিয়ে আসছে।" বলিয়া সুরবালা মেঝেয়-পাতা কার্পেটের উপর মীনাক্ষীর পাশে আসিয়া বসিল।

অতঃপর দুই জনের বহুক্ষণ ধরিয়া বহু কথা আলোচনা এবং বহু শলা-পরামর্শ হইবার পর মীনাক্ষী কহিল—"খুব দরকার। এতে আমার খুব মত আর উৎসাহ সুরোদি। এ রকম না হলে ওঁরা শায়েস্তা হবেন না। ওঁরা বেটা-ছেলে বলে মনে ভাবেন, ওঁরাই সব, আমরা কিছুই নই!"

"তা হলে—তোর মত তো?"

"খুব—খুব। কিন্তু আর দেরী করো না।"

ব্যাপারটা এই যে—ইঁহারা স্ত্রীরা, স্বামীদের অত্যাচার অবিচার দূরীকরণ-মানসে একটা সমিতি গঠন করিবেন এবং রেজোলিউশন পাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহা প্রচার করিবেন।

মীনাক্ষী জিজ্ঞাসা করিল—"বিজলী সেনের কাছে গিয়েছিলে?"

"কোথাও এখনও যাইনি। তোর কাছেই প্রথম এলুম। দেখ্ না, সাত দিনের মধ্যেই আমি 'সমিতি' বসিয়ে ফেলবো।"

"কি নাম হবে বলো তো?"

"নাম? নাম হবে—নাম হবে—নাম হবে—'স্বামি-সংশোধনী সমিতি'। সোজা নামই ভালো।"

একটু ভাবিয়া লইয়া মীনাক্ষী বলিল—'না দিদি, স্বামী নয়। কথাটা 'পতি' দিতে হবে। কেন না, শাস্ত্রীয় কথাটা যখন—'পতি পরম গুরু', 'পতিই সতীর গতি', তখন ও নাম না হয়ে·········"

"কি নাম হবে বল্।"

"পতি-সংশোধনী সমিতি।"

হাসিয়া সুরবালা কহিল—"বেশ। তাই।"

* * *

এক সপ্তাহের মধ্যে বাইশ জন সভ্যার একত্র সংযোগে ও ঐকান্তিক আগ্রহে পতি-সংশোধনী সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবে গৃহের অভাবে এখনও ইহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যালয় স্থাপিত হয় নাই। পতিদের অনুপস্থিতির সুযোগে সভ্যাদিগের কাহারো-না-কাহারো গৃহেই সমিতির বৈঠক বসে এবং কার্য্যপন্থা বিষয়ে আলোচনা-পরামর্শ হয়। সে দিন চাঁদিমা দত্তের গৃহে বৈকালিক বৈঠকে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, এই হপ্তার মধ্যেই একখানি ঘর ঠিক এবং সমিতির সাইন-বোর্ড ঝুলাইয়া যথারীতি কাজ-কর্ম্ম সুরু করিয়া দিতে হইবে।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সুরবালা মীনাক্ষীকে সঙ্গে লইয়া ঘর খুঁজিতে বাহির হইল। সদানন্দ রোডে একখানি ঘরের দেওয়ালে 'টু লেট্' ঝুলিতেছে দেখিয়া মীনাক্ষী দরজার কড়া নাড়িল। সঙ্গে-সঙ্গেই খোলা গা, গলায় পৈতা, ভুঁড়িওলা এক ভদ্রলোক হুঁকা-হাতে তামাক টানিতে টানিতে বাহিরে আসিয়া কহিল—"কাকে চান্?"

সুরবালা কহিল—"রাস্তার ধারের এ ঘরখানা ভাড়া দেওয়া হবে কি?"

"হবে।"

"ভাড়া কত?"

"ঘরটা আগে দেখুন একবার, তার পর ভাড়ার কথা হবে।"

ঘর দেখা হইল। বেশ বড় ঘর। দেওয়ালের গায়ে কাচ-দেওয়া দু'টো দেয়াল-আলমারী আছে। মীনাক্ষী বলিল—"বেশ হবে সুরোদি। আমাদের সমিতির খাতা-পত্তর, কাগজ-টাগজ রাখবার বেশ সুবিধে হবে।"

ভুঁড়ি-ওলা ভদ্রলোক কহিল—"আপনাদের কিসের সমিতি?"

"পতি-সংশোধনী সমিতি।"

তার পর সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া ভদ্রলোক কহিল—"মাপ করবেন, আপনাদের এ রকম সমিতির জন্য ঘর ভাড়া দিতে পারবো না।" ভদ্রলোক আর সেখানে দাঁড়াইল না; তামাক খাইতে খাইতে ভিতরে চলিয়া গেল।

অতঃপর প্রতাপাদিত্য রোড, রাণী-ভবানী রোড ঘুরিয়া দু'জনে সর্দ্দার শঙ্কর রোডে আসিয়া একখানা ভালো ঘরের সন্ধান পাইল। ভাড়া ১৬৲ টাকা। ঘরখানা খুব প্রশস্ত। বাড়ীওলা কহিলেন—"মাঝে একটা পার্টিসন যদি দিয়ে নেন্ তো দু'টো বেড্‌রুম চল্‌তে পারে। আপনাদের ছোট ছেলেমেয়ে ক'জন?"

"আমরা এখানে থাকবো না কেউ, অফিস হবে।"

"সে হলে ভালোই হবে। কোন হাঙ্গামা নেই। কিসের অফিস আপনাদের? সেলাইয়ের কলের?"

"না। আমাদের পতি-সংশোধনী সমিতি।"

"পতি-সংশোধনী সমিতি! পতিদের সংশোধন······দেখুন, আমার এখানে ওটা সুবিধে হবে না। আপনারা অন্যত্র চেষ্টা করুন।"

কয়েক পা ফিরিয়া আসিয়া মীনাক্ষী কহিল—"সুরোদি, তিল্-তিল্ করে ব্যাপারটা কোথায় উঠেছে, দেখচো তো?"

"খুব দেখেচি। তবে না এত দিন পরে আর সহ্য করতে না পেরে এই কাজে নামলুম! কি সাংঘাতিক স্বার্থপর এই পুরুষ জাতটা, একবার ভাব্ দেখি। স্ত্রীকে মুখে এরা যেটুকু ভালোবাসা

দখায়, জানবি সেটা ওদের নিজেদের স্বার্থে। স্ত্রীর জন্য স্ত্রীকে ভালোবাসে, এ রকম স্বামী……

"স্বামী বলো না সুরোদি—পতি বলো। স্বামী বল্লেই যেন মনে হয়, আমাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব সব ওঁদেরই দখলে।……এই যে একটা 'টু লেট্' ঝুলছে। একবার দেখ না।"

দরজার কড়া নাড়িতেই একটি সধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া দরজা ঈষৎ ফাঁক করিল এবং আগন্তুক দুই জন স্ত্রীলোক দেখিয়া সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল—"কি চান আপনারা?"

যা তাঁরা চান, তা বলাতে স্ত্রীলোকটি কহিলেন—"পতি সং…… কি বল্লেন আপনারা? থিয়েটারের দল কি আপনাদের? আপনারা নিজেরা বাস করবেন না?"

মীনাক্ষী কহিল—"থিয়েটারের দল নয়। আমাদের হলো—সমিতি! আমরা রাত-দিন কেউ এখানে থাকবো না, খালি দুপুর বেলাটায় ঘণ্টা দু'তিন্ করে আমাদের সমিতির কাজকর্ম্ম……"

অতঃপর সুরবালাই পরিষ্কার ভাবে এবং খুব সোজা করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে পর স্ত্রীলোকটি একটু বিস্ময় ও ভয়ের সহিত কহিল—"আপনারা কাল সকালে একবার আসবেন। বাড়ীর পুরুষ-মানুষরা এখন আফিস গেছেন। আমি বলে রাখবো, আপনারা কাল সকালে একবার এসে দেখা করবেন।"

স্ত্রীলোকটি আর অপেক্ষা না করিয়া ভয়ে ভয়ে দরজায় ভালো করিয়া খিল লাগাইয়া চলিয়া গেল।

মীনাক্ষী বলিল—"সুরোদি, এ-ও লক্ষণ ভাল বলে মনে হচ্চে না।"

"আমারও তাই মনে হয়। তবুও কাল সকালে এসে খবরটা জেনে যেতে হবে।"

পরদিন প্রাতঃকালেই সুরবালা মীনাক্ষীকে সঙ্গে করিয়া সর্দ্দার শঙ্কর রোডের সেই বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া ভিতর হইতে একটি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসরের ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া কহিলেন—"ঘর-ভাড়ার জন্য কাল আপনারাই এসেছিলেন?"

সুরবালা কহিল—"হ্যাঁ।"

"আপনাদের কিসের সমিতি বলুন তো?"

সুরবালা সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলে, ভদ্রলোকটি কহিলেন—"বটে! দেখচি মস্ত বড় কাজে আপনারা হাত দিয়েচেন।"

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে যেন অসন্তোষের একটা ঢেউ ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। ভদ্রলোক কহিলেন—"এ দিকে আপনাদের ঘর পাওয়া শক্ত! একটা ঠিকানা বলে দি, আপনারা যান, যেখানে ঘর পেতে পারেন, এই—পার্ক ষ্ট্রীট্ দিয়ে বরাবর পূব-মুখে ঢুকে পশ্চিম দিকে পাবেন একটা প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তাকে ডাইনে রেখে বাঁয়ে চলে গেলেই দক্ষিণ দিকে পাবেন একটা কচু-ক্ষেত। ঐ কচু-ক্ষেতের পশ্চিমে রশি চার-পাঁচ গেলেই দেখবেন ক'খানা বড় বড় ঘর…"

সুরবালা কহিল—"ওঃ, সে তো আমরা জানি। সেটা একটা গাধার খোঁয়াড়। সেখান থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসেও দেখচি তার পথ-ঘাটের কথা সবই আপনার মনে আছে!" বলিয়া মীনাক্ষীর হাতটা জোর করিয়া ধরিয়া সুরবালা হন্-হন্ করিয়া চলিয়া আসিল।

মীনাক্ষী বলিল—"সুরোদি, অভদ্রলোকটাকে বেশ ভালো করে দু'টো কথা শুনিয়ে দিয়ে এলে হতো। ভদ্র-ঘরের ঝি-বৌদের এমনি ভাবে……বলে আসবো, সুরোদি?"

"বৃথা, মীনা, বৃথা। ও বলবে এখন, ভদ্রঘরের ঝি-বৌয়েরা কি এমনি করে পথে বেরিয়ে……বুঝলি না? এদের দু'কথা শুনিয়ে কিছু হবে না, একেবারে ঢেলে সাজবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জন্যই তো এই স্বামী সং……"

"আবার স্বামী! স্বামীতেই তোমাকে পেয়ে বসেছে, সুরোদি, তোমার দ্বারা আমাদের সমিতি চলবে না। এ দিকে কোথা যাবে?"

"আয় না, রাজা বসন্ত রায় রোডটাও একবার ঘুরে যাই।"

শুধু রাজা বসন্ত রায় রোড নয়, পরাশর রোড, সাদার্ণ এভেনিউ, রাণী ভবানী রোড, শ্রীমোহন লেন প্রভৃতি ঘুরিয়াও যখন সমিতির জন্য কোন ঘর পাওয়া গেল না, তখন বেলা প্রায় এগারোটা। সুরবালা বলিল—"চ, এ-বেলা আর নয়। তবে ঘর আমি যেমন করে হোক যোগাড় করবোই।"

* * *

"এত দাম দিয়ে এত ভাল শাড়ী আনবার কি দরকার ছিল?"

"তুমি পরবে, লতা।"

"ব্লাউশ তো আমার অনেকগুলো রয়েচে—আবার এত ছিট্ নিয়ে এলে!"

"তা হোক্। তোমাকে সাজাবার জন্য, তোমার সুখের জন্যই তো আমার পয়সা। নাও, স্নাপি বয়টা খেয়ে ফেল, ওটা যে গলে যাচ্চে!"

"নাঃ—ও আনলে কেন? তুমি খাও, আমি কিছুতেই খাবো না।"

"খেতেই হবে। তুমি যে ভালোবাস।"

বৈঠকখানা-ঘরের ভিতর দিকের দালানে বসিয়া স্বামী তরুবর দত্ত ও স্ত্রী শ্রীমতী লতিকারাণীর কথা হইতেছিল।

লতিকা কহিল—"এই দুর্মূল্যের দিনে তুমি এত বাজে খরচ করতেও পারো! কাল নীলাদের বাড়ী বেড়াতে গেছলুম। নীলার মামী বুঝি নীলার মামাকে এক-বাক্‌স সাবান আনতে বলেছিল, তাইতে নীলার মামার কি কাণ্ড! নীলার মামীকে তেড়ে মারতে এলো। বলে, 'এই দুর্দ্দিনে সাবান! দিন কতক পরে যে ভাত-ই আর জুটবে না।' নীলার মামী ভয়ে আর লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল!"

তরুবর কহিল—"অত্যাচার! ঘোর অত্যাচার! আমাদের জাতের এই স্বামীগুলো—তাদের স্ত্রীদের ওপর কি অত্যাচারই না করে! তারা এত নিষ্ঠুর, এত স্বার্থপর যে, তা আর বলবার নয়। এই স্ত্রীজাতি সংসার-মরুভূমিতে সুশীতল বারি-স্বরূপ, এরা না থাকলে প্রভুদের……কে?"

বাহির হইতে নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন আসিল—"আপনাদের কোন্ ঘর ভাড়া দেওয়া হবে?"

তরুবর তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিতেই সুরবালা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তরুবর একখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া কহিল—"বসুন, বসুন।"

"আপনারা ক'খানা ঘর ভাড়া দেবেন?"

"একখানা। এই ঘরেরই ও-পাশের ঘরখানা। একখানা ঘরে

কি আপনাদের চলবে? শুধু স্বামি-স্ত্রী আর দু'-একটি ছেলে-মেয়ে হলে……"

"বসবাসের জন্য নয়। আমাদের সমিতির অফিস করবো। রাস্তার দিকের একটা জানালা খুলে যদি একটা দরজা……"

"সমিতি! কিসের সমিতি?"

"পতি-সংশোধনী সমিতি।"

"একটা অনুরোধ করতে পারি কি? এক কাপ চা……ইনি আমার স্ত্রী। মনে করুন, ওঁরই অনুরোধ……"

"তা আমার আপত্তি নেই! চা তো খেয়েই থাকি।"

তরুবর হৃষ্ট চিত্তে উঠিয়া গিয়া লতিকাকে মৃদু স্বরে কি বলিতেই লতিকা ভিতরে চলিয়া গেল এবং মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে একটা রেকাবীতে কিছু জলখাবার ও এক-কাপ চা লইয়া আসিল।

ইতিপূর্ব্বেই সুরবালা তরুবরকে তাহাদের সমিতি-গঠনের কারণ এবং উদ্দেশ্য বলিয়াছিল। তরুবর কহিল—"ঘর তো আপনাদের দেবোই! ভাড়া যা ইচ্ছে তাই দেবেন। না দিলেও অসন্তুষ্ট হব না। আপনারা যে-কাজে নামচেন, এটা খুব হওয়া উচিত। এ কাজে আমার ষোল আনা সহানুভূতি আছে। আমার দ্বারা এতে আপনাদের যতটা সম্ভব সাহায্য হবার, তা হবে জানবেন। স্ত্রী হলো সংসারে শান্তির নির্ঝরিণী! সেই স্ত্রীর ওপর স্বামীরা যে কি অমানুষিক……"

প্রফুল্ল চিত্তে সুরবালা জলখাবার ও চায়ের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিল।

পরদিনই শ্রীযুক্ত তরুবর দত্তর ঘরে 'পতি-সংশোধনী সমিতি'র কার্য্যালয় স্থাপিত হইল। পূর্ব্বেই কয়েকখানি চেয়ার, একখানা টেবিল, একটা আলমারী, কাগজ-পত্র, দোয়াত-কলম প্রভৃতি কেনা হইয়াছিল; ঐগুলি আনাইয়া অফিস সাজানো হইল। একখানা নাতিবৃহৎ সাইন-বোর্ডও লেখানো হইয়াছিল, উহাও সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

তৎপরদিন দ্বিপ্রহরেই অসীম আনন্দ ও উৎসাহের মধ্যে সমিতির উদ্বোধন হইয়া কার্য্য সুরু হইল। বাইশ জন সভ্যার একমতানুসারে সুরবালাই সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং বিজলী সেন সেক্রেটারী মনোনীত হইল। উদ্বোধন-বক্তৃতায় সুরবালা কহিল—"নর-নারী লইয়াই জগৎ। এই সর্ব্বসুখের আধার পৃথিবী কেবলমাত্র নরের বা কেবলমাত্র নারীর নহে। উভয়েরই সমানাধিকার। এই বিশাল বিশ্বের সর্ব্বদেশেই দেখিবেন, উভয়ের এই সমানাধিকার শুধুই অব্যাহত রাখা হয় নাই; দেখিবেন, সর্ব্বদেশেই নারীর মান, মর্য্যাদা, আদর কত বেশী! কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নারীরা কিরূপ লাঞ্ছিতা, কিরূপ অনাদৃতা, কিরূপ **neglected**—অর্থাৎ কি-না তাচ্ছিল্যকৃতা, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। নারীর প্রতি দেশব্যাপী এই দুর্ব্যবহারের প্রতিকার-মানসে আজ আমরা……" —ইত্যাদি।

চাঁদিমা দত্ত উঠিয়া প্রস্তাব করিল—"আমি প্রস্তাব করি, স্ত্রীর প্রতি স্বামীদের আচার-ব্যবহার সংশোধন-উদ্দেশে আমাদের এই সমিতির নাম হউক—'পতি-সংশোধনী সমিতি'।"

মীনাক্ষী টপ্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"শ্রীযুক্তা চাঁদিমা কথাগুলির মধ্যে 'স্বামীদের' এই কথাটির বদলে 'পতিদের' এই কথাটি ব্যবহার করা হউক।"

তখন সুদীপা সরকার দাঁড়াইয়া উঠিল এবং চাঁদিমা দত্তর সংশোধিত প্রস্তাবটি সমর্থন করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমতীদিগের যত্নে এবং উৎসাহে সমিতির শ্রী পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সভ্যা-সংখ্যা বাইশ হইতে সাড়ে সাতান্নয় আসিয়া পড়িল। কুহেলিকা চ্যাটার্জী নামে এক জন সভ্যাকে ঠিক পূরা পত্নী বলা যায় না; যেহেতু, তিনি স-পত্নী, তাঁহার সতীন আছে এবং সেই সতীন অত্যন্ত স্বামিগতপ্রাণা। সেই হেতু তিনি সভ্যাশ্রেণীভুক্তা হন নাই। সুতরাং শ্রীমতী কুহেলিকা চ্যাটার্জীকে অর্দ্ধ-সভ্যা ধরা যাইতে পারে এবং এই কারণেই সভ্যার সংখ্যা সাড়ে সাতান্ন।

প্রত্যহই দ্বিপ্রহরে সমিতি বসে; কেবল রবিবারে বন্ধ থাকে। পথিকেরা সাইনবোর্ডখানা দেখিয়া সচকিতে দাঁড়াইয়া পড়ে। ইহা লইয়া পাড়ায় পাড়ায় গৃহে গৃহে বেশ একটু আন্দোলন-আলোচনা চলিতে লাগিল।

লতিকার যদিও সভ্যা-শ্রেণীভুক্ত হইবার কোন আবশ্যক বা কারণ নাই, যেহেতু, স্বামী তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং প্রেমশীল, তথাপি সমিতির প্রতি তাহাদের পতি-পত্নীর অগাধ সহানুভূতি। তরুবর লতিকাকে বলিল—"তুমিও ওদের এক জন সভ্যা হলে পারতে।"

লতিকা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল—"আমি অসভ্যই থাকি।"

তার পর গুন্ গুন্ করিয়া সুরের সঙ্গে গাহিল—

"তুমি তরু, আমি লতা,
আমার বলো কিসের ব্যথা!"

—আনন্দে, গর্ব্বে ও আত্মপ্রসাদে তরুবরের হৃদয় ভরিয়া উঠিল

* * * *

ঠং ঠং।

সমিতির ক্লকটায় দু'টা বাজিল এবং তখনি সমিতির কাজ আরম্ভ হইল।

রেবা সমাদ্দার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আজ আমার একটা প্রস্তাব আছে।"

সুরবালা কহিল—"বলুন!"

"দেখুন, পুরুষরা কত দূর আমাদের……"

চঞ্চলা চৌধুরী কথাটায় বাধাদান করিয়া কহিল—"পুরুষ বললে ব্যাকরণগত একটু দোষ হয়ে পড়ে। আমাদের লক্ষ্য—সমস্ত পুরুষ-জাতি নয়, আমাদের লক্ষ্য শুধু পতিরা।"

প্রেসিডেণ্ট হিসাবে সুরবালা বলিল, "উনি যে পুরুষদের কথা বলছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা কারো না কারো পতি ছিলেন। আপনি বলে যান।"

রেবা সমাদ্দার বলিয়া যাইতে লাগিল—"পুরুষরা আমাদের কি পরিমাণে হেয় জ্ঞান করে আসচে, একবার ভেবে দেখুন। এরা আমাদের হীন প্রতিপন্ন করবার জন্য শাস্ত্রের মধ্যে পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে

ইত্যাদি। আমাদের বিরুদ্ধে ঘরোয়া প্রবাদ সৃষ্টি হ'তেও বাকী থাকেনি—

'বনের সাপ বনে থাকে,
ঘরের সাপ নারী।
দুধ-কলা দে পুষবে তবু—
ছোবল্ খাবে তারি।

ইংরেজদের বাইবেলে পর্য্যন্ত মানব জাতির দুঃখের জন্য নারীকে অর্থাৎ ঈভ্‌কে দায়ী করা হয়েচে!—এর একটা বিহিত করা কর্ত্তব্য।"

নীহার গাঙ্গুলী কহিল—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এ প্রস্তাবের সমর্থন করচি। এ বিষয়ে জোর প্রবন্ধ লিখে সংবাদপত্রে এবং মাসিকপত্রে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।"

এই সময়ে ফিস্‌-ফিস্ করিয়া শ্রীমতী স্বস্তিকা সোম সুরবালাকে কহিল—"আমাদের দুঃখের আর পার নেই। দেখুন, আমার পতি হচ্ছেন এক জন কবি। চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি কবিতার মধ্যে মশ্‌গুল্ হয়ে আছেন; জ্যান্ত কবিতার দিকে একবারও ফিরে তাকান না। লেখবার সময় কাছে গেলে মুখ-টুখ সিঁট্‌কে দূর-দূর করে তেড়ে আসেন।"

সুরবালা সমবেদনার স্বরে কহিল—"কবিতা আর বনিতা দুই-ই সমশ্রেণীর আরাধনার বস্তু! এ হলো শাস্ত্রীয় বচন। তবে এটা হলো কলিকাল কি না, সুতরাং উল্টো বিচার হবে। আপনি বিনা আরাধনাতে যদি কাছে যান, দূর-দূর করে পতি তো তেড়ে আসবেই। আপনি কি বলেন?" বলিয়া সুরবালা তাহার এ-পাশের সভ্যাটির দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন—"ওঁকে তো শুধু তেড়ে আসেন, আমাকে মারেন!"

সবিস্ময়ে সুরবালা কহিল—"মারেন!"

"মারেনই তো। সে দিন বই পড়তে-পড়তে হাতের বইখানাই ছুড়ে মারলেন।"

"অপরাধ?"

"অপরাধ, একটু বায়োস্কোপ দেখবার সখ আছে! তা আমার দু'-এক জন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখতে যাই। তাতে কি অপরাধ, তা এই সাত বছরেও বুঝে উঠতে পারলুম না। সে দিন মিষ্টার মুখার্জ্জির সঙ্গে 'গোপন প্রেম' দেখতে গিয়েছিলুম! বাড়ী ফিরে আসতেই······"

বাধা দিয়া ও-ধারের একটি সভ্যা—শ্রীমতী বন্দিনী নন্দী—বলিয়া উঠিলেন, "আরে, আপনি তো বন্ধুদের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যান! আমি কোথাও যাই না, দিন-রাতই ঘরের কোণে পড়ে থাকি······"

মৃদু হাস্যের সহিত সুরবালা কহিল—"সে তো আপনার নামেতেই প্রকাশ! তা, কি বলছিলেন বলুন।"

"বলছিলুম যে, দিনরাতই ঘরের কোণে বন্দিনী হয়ে আছি। আর উনি রোজ সন্ধ্যা না হতেই সেজে-গুজে সেণ্ট্ মেখে ঘড়ি-ছড়ি নিয়ে পাণ চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে যান আর ফেরেন রাত একটা-দু'টোয়। কোনো দিন বা ফেরেনই না! তাই আর থাকতে না পেরে সে দিন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেলুম—"

"তাতে কি জবাব দিলেন?"

"মুখের জবাব কিছু পেলুম না! পেলুম তাঁর ছড়ির জবাব—পিঠের ওপর!"

রাগে আর দুঃখে সকলেরই মুখের ভাব কি-এক-রকম হইয়া গেল।

এই সময়ে সভ্যা হইবার ইচ্ছায় তিন জন নবাগতা প্রবেশ করিল। সেক্রেটারী বিজলী সেন তাহাদের নাম-ধাম আদি রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিতে বসিল।

"আপনার নাম?"

"মৌমাছি মিত্র।"

"ঠিকানা?"

"৩।২, ফুলবাগান এভেনিউ।"

"আপনার নাম?"

"নিশীথিনী গুপ্ত।"

"আপনার পতির পেশা?"

"পেশা!—দিনরাত আমায় গালাগালি। এখন চাকরী নেই, পেন্সন নিয়েছেন। যত দিন চাকরী ছিল, দুপুর-বেলাটা তবু একটু রেহাই পেতুম! এখন চব্বিশ ঘণ্টাই আমার সঙ্গে লেগে আছেন।"

সকলের মিশ্র চাপা হাসিকে ঠেলিয়া মীনাক্ষীর উচ্চ হাসিতে ঘরখানা ভরিয়া উঠিল।

"আপনার নাম কি ভাই?"

"অভাগিনী ব্যানার্জ্জী।"

"পতির নাম?"

"কালীফরণ ব্যানার্জ্জী।"

ফের একটা চাপা হাসির রোল উঠিল। সুরবালা কহিল, "বুঝলুম, আপনার পতির নাম 'কালী' উচ্চারণ করবেন না বলে 'ফালী'—কিন্তু 'চরণে'র বদলে 'ফরণ' কেন?"

"ওটা যে আবার আমার শ্বশুরের নাম।"

মৃদু হাস্যে সুরবালা কহিল—"আপনি এত আইন-সঙ্গত হিসেবে চলেও পতির কাছ থেকে নিশ্চয়ই অবিচার পাচ্ছেন। আপনার ভাগ্যে আর নামে যথার্থ ই মিল হয়ে গেছে।"

অতঃপর বিজলী সেন খাতার উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া কহিলেন—"আর কেউ নতুন সভ্যা নেই তো?"

"আমি আছি"—বলিয়া বিমর্ষ মুখে লতিকা ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রথমটায় সকলে মনে করিয়াছিল, স্বামি-ভাগ্যে ভাগ্যবতী লতিকার ইহা রহস্য মাত্র! কিন্তু তাহার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সহিত সকলে ইহা সত্য বলিয়া স্থির করিল।

লতিকা সুরবালার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরের বারান্দার এক কোণে লইয়া গেল। সেখানে একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল, দুই জনে তাহাতে বসিল। লতিকা কহিল—"দিদি, আপনাদের ধারণাই ঠিক। স্বামীরা যে এত স্বার্থপর, এদের ভালোবাসা যে খালি মুখের ভালোবাসা, তার মধ্যে যে কোন আন্তরিকতা নেই, এত দিন পরে আমি তা বুঝলুম।"

"কি হয়েচে বলুন তো?"

"আমি জানতুম, অন্ততঃ আমার স্বামী আমাকে খুবই ভালো-বাসেন! কিন্তু আজ তাঁর আসল রূপ বের হয়ে পড়েচে।" বলিয়া লতিকা নীরবে মুখ নীচু করিয়া রহিল। সকল কথা তাহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না; আবার না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছে

না! অবশেষে সুরবালার পীড়াপীড়িতে সব কথা খুলিয়া বলিল। যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

লতিকার পিতা এক জন পয়সাওয়ালা কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। লতিকা তাঁহার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল বলিয়া মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি লতিকাকে ২১ হাজার টাকা দিয়া যান। টাকাটা লতিকার নামে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। সে আজ তের বৎসরের কথা। লতিকার তখন সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে। তরুবর সেই ২১ হাজারের মধ্যে এই কয় বৎসরে ১৫ হাজার টাকা লতিকার দ্বারা ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইয়া সংসার-খরচে চালাইয়াছে। এদিকে লতিকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাংসারিক অবস্থা বর্ত্তমানে কোন কারণে হঠাৎ হীন হওয়ায় কোন একটা ব্যাপারে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং সে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য গোপনে সে ভগিনীর শরণাপন্ন হয়। লতিকাও গোপনে তাহাকে ঐ ছয় হাজার টাকার মধ্যে ৫ হাজার টাকা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। গত কাল সে তাহার দাদার বাড়ী গিয়া তাহার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কাজটা গোপন না থাকিয়া কালই তরুবর কি করিয়া তাহা জানিতে পারে এবং লতিকা সন্ধ্যার পর এ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ দিয়া সে যে কাণ্ড বাধায়, তাহা ইতর শ্রেণীর মধ্যেও দেখা যায় না!

সমস্ত শুনিয়া সুরবালা কহিল—"তা হলে বিষম রেগেছেন?"

"সাংঘাতিক।"

"তা'হলে বলুন, ১৩ বৎসরের পোষা বেড়াল এক দিনেই বুনো বাঘে পরিণত!"

"ঠিক তাই। সকাল-সকাল খেয়ে ব্যাঙ্কে গেছেন, পাকা খবরটা জানবার জন্য। এসেই আবার কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবেন! কি ভয়ানক স্বার্থপর বলুন তো! স্বামী জাতটাই দেখছি বর্ণচোরা! কখন যে কি······"

"দেখুন, কে-একজন লেখক ছিলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে এত ভালোবাসতেন যে, সম্রাট সাজাহানও বোধ হয় মমতাজকে অমন ভালোবাসতে পারেননি। তাঁর সেই স্ত্রী মারা গেলে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তাঁর সমস্ত চোখের জল দিয়ে একখানা বই লিখলেন। তাঁর পর কি হলো বলুন দেখি?"

"সন্ন্যাসী হলেন বোধ হয়!"

একটু হাসিয়া সুরবালা কহিল—"না। আবার বিয়ে তিনি করলেন!—বুঝতে পারলেন না? স্বামীরা নিজের আনন্দের ঝুলি ভরাবার জন্যই স্ত্রীকে ভালোবাসে। স্ত্রীকে ভালবেসে তাঁরা নিজেরা সুখী হন। স্ত্রীর জন্য স্ত্রীকে ভালোবাসেন না।"

"যাই হোক, আজ থেকে দিদি, আমিও আপনাদের সমিতির সভ্যা হবো। আমার নামটাও আপনাদের খাতায় লিখে নিন।"

"চলুন। আজ শনিবার, সমিতি এখনি বন্ধ হবে।"

"কাল রবিবার বন্ধ থাকবে?"

"নিশ্চয়।"

তখন দুই জনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

সে রাত্রে তরুবর আর গৃহে ফিরিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত [illegible] জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্তার 'ব্ল্যাক্-আউটে'র সঙ্গে তাহার মনের 'ব্ল্যাক্ আউট' মিশিয়া একাকার হইল। রাত প্রায় একটা পর্য্যন্ত এই ভাবে থাকিয়া লতিকা শয়ন করিল।

পরদিন বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় তরুবর যেন ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অবস্থায় গৃহে ফিরিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় ভীষণ ক্রোধ-ব্যঞ্জক, দৃষ্টি জ্বালাময়। সঙ্গে তাহার মামাতো ভাই পরেশনাথ। নিষ্কর্ম্মা পরেশনাথ পূর্ব্বে তরুবরেরই অন্ন ধ্বংস করিত, আর চায়ের দোকানে-দোকানে আড্ডা জমাইত। লতিকা তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। অনেক চেষ্টায় তাহাকে সে এ বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছিল। আজ তরুবর তাহাকে লইয়াই গৃহে ফিরিল। আসিয়াই হাতের ছাতাটা টান মারিয়া একধারে ফেলিল, জুতো-জোড়া বারান্দার কোণে ছুড়িয়া দিল। দালানের দড়িতে লতিকার একখানা ভালো শাড়ী শুকাইতেছিল, ফড়-ফড় করিয়া সেখানে ছিঁড়িয়া তাহারি একটা ফালি দিয়া মুখের ঘাম মুছিল; তার পর পরেশনাথের উদ্দেশ্যে কহিল—"পরেশ, খিচুড়ী য়্যাণ্ড মাংস। লে আও মুরগী, পেঁয়াজ, আদা য়্যাণ্ড এট্‌সেটরা।"

বলিয়া তাহার হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়া সারা বাড়ীময় বীরদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেলা প্রায় একটার সময় দু'জনের খিচুড়ী য়্যাণ্ড মাংস ভোজন হইয়া গেলে তরুবর বলিল—"এইবার 'পতি-সংশোধনী সমিতি'র শ্রাদ্ধ করতে হবে। আয় পরেশ।"

অতঃপর সমিতি-ঘরের তালা ভাঙ্গা হইল এবং আলমারী, র‍্যাক, টেবিল, কাগজ-পত্র ইত্যাদি সব তচ্-নচ্ করা হইল।

পরেশ কহিল—"এ সব নষ্ট না করে আসুন না দাদা, এইখানে আমরা একটা সমিতি বসাই। ঠাট্-বাট্ সব তৈরী।"

"ঠিক বলেছিস পরেশ! আমরা এখানে 'স্ত্রী-সংশোধনী সমিতি' বসাবো। আজ থেকেই বসাবো। স্ত্রীদের একেবারে জব্দ করতে হবে।"

এই সময় এক জন আগন্তুক জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই ঘরেই কি 'পতি সং···"

পরেশ কহিল—"এখন আর পতি-সং নয়, এখন স্ত্রী-সং।"

তরুবর ভদ্রলোকটিকে সাদরে আহ্বান করিয়া ভিতরে আনিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এঁদের কর্ত্তা হলেন কে?"

"কর্ত্তা নয়—কর্ত্রী। তাঁর নাম হলো শ্রীমতী সুরবালা দাসী। চেনেন না কি?

"বিশেষ ভাবে। চোখে সোনার চশমা আছে তো? বাঁ চোখের ভুরুর পাশে একটা তিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

একটু হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"তিনি এই অধমেরই অর্দ্ধাঙ্গিনী।"

"তাই না কি?"

তখন প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া তরুবর ও অচিন্ত্য বাবুর মধ্যে বহু কথা, বহু আলোচনা, বহু পরামর্শ হইল। উভয়ের আনন্দ আর ধরে না!

অচিন্ত্য বাবু আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে কহিলেন—"তা' হলে শুভ কাজে বিলম্ব উচিত নয়। আসুন, আজ থেকেই আমাদের

'স্ত্রী-সংশোধনী' সুরু করা যাক্! ঐ সব খাতা-পত্রেই কাজ চলবে। আজ হলো রবিবার, ওঁরা আজ আর আসবেন না। কাল এসেই দেখবেন যে······"

"কিন্তু সাইনবোর্ডখানা বদ্লাতে হবে যে।"

পরেশ কহিল—"তার জন্য আর ভাবনা কি! আমার চেনা লোক আছে। এখনি তাকে আমি ডেকে আনচি।"

পরেশ তখনই বাহির হইয়া গেল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রং, তুলি প্রভৃতি সমেত সাইন্‌বোর্ডওলাকে ধরিয়া আনিল।

বোর্ডখানা দেখিয়া সে বলিল—"আজ আর কি করে হয়! ওটা খুলে নামাতে হবে, তার পর পোঁচ্‌ড়া টেনে নতুন একটা জমি করে নিয়ে শুকোতে হবে; তার পর তার ওপর লিখতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি করলেও হু'টো দিনের কমে হবে না, বাবু।"

মহা মুস্কিল!

সকলেরই মন খারাপ হইয়া গেল। তরুবর বলিল—"তাই তো, কি করা যায়! তেঽস্পর্শ-যোগে আজকেই কাজ সুরু করতে পারলে বড় ভালো হতো।"

হঠাৎ অচিন্ত্য বাবু লাফাইয়া উঠিলেন—"আজকেই হবে, এক্ষুনি হবে। দেখ বাপু, এক কাজ করো। তোমায় বোর্ড নামাতে হবে না, জমিও করতে হবে না, নতুন করে কিছু লিখতেও হবে না। তুমি শুধু আমাদের জুতোর 'হীল্'-য়ে একটা পেরেক ঠুকে দাও।"

লোকটা অবাক্ হইয়া অচিন্ত্য বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বুঝতে পারলে না? সব যেমন আছে, তেমনি থাকবে। শুধু—'পতি'র 'ত'য়ের নীচে একটা 'ন' জুড়ে দাও, আর 'ি'-কারে একটা পোঁচ্‌ড়া দিয়ে 'ত্ন'য়ের পাশে একটা 'ী' বসিয়ে দাও। তা'হলেই কাম ফতে! একেবারে 'পত্নী-সংশোধনী সমিতি'। ও স্ত্রী আর পত্নী একই কথা। বুঝলে না?"

সাফল্যের আনন্দে তখন তরুবর ও অচিন্ত্য বাবু ঘরের বাতাসকে তোলপাড় করিয়া একটা বিকট কোলাহল তুলিল।

তৎক্ষণাৎ একটা মই আসিয়া পড়িল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই 'পতি-সংশোধনী সমিতি' 'পত্নী-সংশোধনী সমিতি'তে পরিণত হইয়া জল্ জ্বল্ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'পত্নী-সংশোধনী'র উদ্বোধন-কার্য্য চলিল। তার পর অচিন্ত্য বাবুর দিকে চাহিয়া সহাস্যে এবং জোড় হাতে তরুবর কহিল—"একটি সবিনয় নিবেদন!"

"অনুমতি করুন।"

"আজকের শুভদিনে এইখানে একটু ভোজনের আয়োজন······"

তেমনি হাসিতে হাসিতে অচিন্ত্য বাবু কহিলেন—"কোন আপত্তি নেই।"

তৎক্ষণাৎ পরেশকে বাজারে ছুটিতে হইল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"এ-বেলা তা হলে কি হবে, বলুন?"

"ও-বেলা হয়েচে খিচুড়ী য়্যাণ্ড মাংস, সুতরাং এ-বেলা হোক—পোলাও ধ্বংস। যাও, জোগাড় করে ফেল।"

পরদিন প্রাতে পথিকেরা সমিতির নূতন সাইনবোর্ড দেখিয়া সচকিতে দাঁড়াইয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে কে এক জন বলিল—"এ নিশ্চয়ই ভূতুড়ে কাণ্ড! রাতারাতি ভূতের আমদানী হয়েচে!"

দেখিতে দেখিতে এ-পাড়া হইতে, ও-পাড়া হইতে, সে-পাড়া হইতে বহু ভদ্রলোক আসিতে আরম্ভ করিল এবং দেখিতে দেখিতে বহু পতি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল।

'পতি-সংশোধনী'র নূতন সভ্যা তিন জন—মৌমাছি, নিশীথিনী ও অভাগিনী—তাহাদের নূতন উৎসাহের জন্য সে দিন বেলা একটার পূর্ব্বেই সমিতিতে যোগদান করিবার জন্য আসিয়া দেখে, তাহাদের সাইনবোর্ডস্থ 'পতি' বোর্ড ত্যাগ করতঃ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে এবং সকলে মিলিয়া বিষম হট্টগোল সুরু করিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া তিন জনে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া অদূরবর্ত্তী এক বকুলতলার ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইল। কিছু পরে আরও পাঁচ-সাত জন সভ্যা আসিল। তাহাদের সঙ্গে আসিল মীনাক্ষী। তা'দেরও গিয়া বকুলতলায় আশ্রয় লইতে হইল। তাহার পর আসিল সুরবালা। সুরবালা আসিয়া দেখিল, ঘরের সম্মুখে ভীড় জমিয়াছে এবং ভিতরে মহা হট্টগোল! সেই হট্টগোলের মধ্যে অচিন্ত্য বাবু উচ্চ গলায় বলিতেছেন—"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিনী গৃহমুচ্যতে'—এই কথাটাকে আমাদের গ্রন্থ থেকে একেবারে বাদ দিতে হবে, আর গভর্ণমেন্টের কাছে 'ডেপুটেসান্' পাঠিয়ে অনুরোধ করতে হবে যে, যেহেতু, পত্নীদের পতিনিন্দা ছাড়া আর দ্বিতীয় কাজ নেই, সেহেতু, উহাদের 'এ-আর-পি'তে নিযুক্ত করা হোক্।"

একবার উর্দ্ধদৃষ্টিতে সাইন্‌বোর্ডখানার দিকে চাহিয়া সুরবালাও বকুলতলায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে তাহার বুকের মধ্য হইতে একটা সুগভীর নিশ্বাস বাহির হইয়া বকুলতলার বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল।

মীনাক্ষী কহিল—"সুরোদি, এই ভীষণ অত্যাচার সামনে দেখেও নেহাৎ অবলারই মত এই বকুলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে?"

"কি করবো?"

"কি করবে! এখনো ভয়ে-ভয়ে থাকা? আজ বাদে কাল যখন ডিভোর্স য়্যাক্ট' পাশ হতে যাচ্ছে, তখনো তুমি···"

"পারবে তোমরা?" উৎসাহিত হইয়া সুরবালা কহিল—"পারবে তোমরা, ওই ভূত-প্রেতের দলকে গলাধাক্কা দিয়ে সমিতি-ঘর থেকে দূর করে দিতে পারবে?"

সকলে সমস্বরে বলিল—"পারবো, নিশ্চয় পারবো।"

তখন অপূর্ব্ব ভঙ্গী এবং বীরত্বের সঙ্গে সকলে সমিতি-ঘরের দিকে ধাবমান হইল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন জৈন সমাজে নারীর স্থান

আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধে 'বৌদ্ধ সমাজে নারীর স্থান' সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিয়াছি। এবার জৈন সমাজে নারীর কথা বলিব। জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় সমাজই হিন্দু সমাজের আত্মজ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর রাজা পরীক্ষিতের এবং রাজা জনমেজয়ের কথা কিছু জানা যায়। তাহার পরই ভারতের ইতিহাস তিমিরাবগুণ্ঠিত। জনমেজয়ের পর হইতে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের দশা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে অনুমানে মনে হয়, ঐ সময় হিন্দুধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব কথঞ্চিৎ ম্লান হইয়া প্রায়শঃ আড়ম্বর-বহুল যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানে পূর্ণ হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের রক্ষক ঋষি-তপস্বীদিগের তিরোধান ঘটিয়াছিল। সেই সময় কলির প্রবেশ হয়, পুরাণে এ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাণহীন ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ কতকগুলি মহাপুরুষ হিন্দুধর্ম্মমতের সহিত কতকটা ভিন্নমত হইয়া নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। তন্মধ্যে জৈন এবং বৌদ্ধ-মতই প্রধান। বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিবার কিছু পূর্ব্বে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, পার্শ্বনাথ খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি জৈনদিগের ২৩ম তীর্থঙ্কর বা জীন। ইঁহার পরেই জৈনধর্ম্মে চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বা জীবন মহাবীরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইনি বৈশালী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মগধের রাজা বিম্বিসারের সহিত তাঁহার কুটুম্বিতা ছিল। ইনি পার্শ্বনাথের অনেক মত সমর্থন করেন। পার্শ্বনাথের কতকগুলি শিষ্য ইঁহার মত গ্রহণ করেন। কিন্তু কি পার্শ্বনাথ, কি মহাবীর, কেহই জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন না। জৈনধর্ম্মের আদি তীর্থঙ্করের নাম ঋষভ বা বৃষভ। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতির পুত্র ছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, জৈনধর্ম্ম অত্যন্ত প্রাচীন। কারণ, কোন্ স্মরণাতীত যুগে ঋষভের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা এখন আর নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই নাই। বৌদ্ধ-জাতক প্রভৃতির ন্যায় জৈনদিগের পুরাণ অধিক নাই। কাজেই, ঋষভ বা বৃষভ ওরফে আদিনাথের সময় হইতে পার্শ্বনাথের আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত জৈন-ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইঁহাদের অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণক, ছেদসূত্র, মূলসূত্র ও সূত্র প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ বিদ্যমান। উহা অর্দ্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত।

প্রাচীন জৈনরা পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তবে ইঁহারা আত্মিক শক্তি স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে সকল বস্তুই সচেতন। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া ইঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন হিন্দুদিগের গার্হস্থ্য জীবন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ হইয়াছে। কারণ, ভগবানে বিশ্বাস মানুষের জীবনধারাকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, ভগবানে অবিশ্বাস ঠিক সে ভাবে মানব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'প্রাচীন জৈন সমাজে নারীর স্থান' সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উহা হিন্দু সমাজে নারীর স্থান হইতে কিছু ভিন্নরূপ ছিল। জৈন সমাজে যে সকল কাহিনী দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, রাজমহিষীরা রাজসভায় উপস্থিত হইতেন। তবে তাঁহারা যবনিকার অন্তরালে থাকিতেন। এখন দেখা যায় যে, জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী মাড়োয়ারী মহিলারা প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইয়া মহিলাদিগের ন্যায় বাহির হন না। মস্তক অনেকটা অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া তবে পথে বাহির হন। দোহদ বা গর্ভধারণ কালে নারী-দিগের মনে যে বাসনার উদয় হইত, প্রাচীন যুগের জৈন স্বামী তাহা যথাসাধ্য পূর্ণ করিতেন। জৈনদিগের উপপাঠিকা গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে, যাহাতে ঐ সময়ে নারীদিগের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য স্বামী কত দূর স্বাধীনতা দিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শালাটবী নামক দস্যুগ্রামের অধিপতি বিজয়ের মহিষীর নাম ছিল স্কন্দশ্রী। গর্ভধারণ কালে স্কন্দশ্রীর সাধ হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সমস্ত সহচরী, সখী ও আত্মীয়-কুটুম্ব নারীর সহিত সৈনিক এবং সেনানী পুরুষদিগের ন্যায় পোষাক ও সাজসজ্জা করিয়া সমস্ত শালাটবী নগরী পরিক্রমণ করিবেন। রাজা বিজয় রাণীর সেই বাসনার কথা জানিতে পারিয়া তিনি সে বিষয়ে রাণীকে তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে রাণী তাঁহার সখী, সহচরী, দাসী এবং আত্মীয়া কুটুম্বিনী-দিগকে লইয়া পুরুষ-যোদ্ধাদিগের ন্যায় সামরিক বেশ পরিধানপূর্ব্বক সামরিক বাদ্যভাণ্ড লইয়া সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন (উপ, ৪১)। স্ত্রীর সাধ পূরণের জন্য কোন হিন্দু গৃহস্থ বা রাজা এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ কাহিনী কুত্রাপি পাওয়া যায় না। জৈন নারীরা পুরুষ-রক্ষকশূন্য হইয়াও বাটীর বাহিরে দূরে গমন করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত জৈন-পুরাণগ্রন্থে পাওয়া যায়। পলাসপুর গ্রামে এক কুম্ভকার বাস করিত। তাহার নাম সজ্জালপুত্র। তাহার স্ত্রী অগ্নিমিত্রা একটি মাত্র দাসীকে সঙ্গে লইয়া বহু দূরস্থ মহাবীরের নিকট গো-শকটে করিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা কোনরূপ ভয় করিতেন না। প্রাচীন জৈনদিগের মধ্যে রাজা-রাজড়াদিগের অন্তঃপুর ছিল। সেই অন্তঃপুরে বহু কুব্জপৃষ্ঠ, খর্ব্বাকার, বিকৃতাকার ও কদাকার নারী এবং নানা জাতীয় বিদেশী নারী থাকিত। যুদ্ধে যাহাদিগকে রাজা বন্দিনী করিতেন, তাহারাই অন্তঃপুরে স্থান পাইত বলিয়া মনে হয়। দাস-দাসীরা প্রায় কদাকার হইত। এ সকল কথার মধ্যে কিছু অতিরঞ্জিত থাকিতে পারে। সাধারণ লোকের গৃহে অন্তঃপুরে কদাকার বা কুব্জ দাসদাসী থাকিত বলিয়া মনে হয় না।

জৈনদিগের মধ্যে আর একটা বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখন তাহা ঐ সমাজে প্রচলিত আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। কোন মড়ঞ্চে পোয়াতির ছেলে হইলে সেই ছেলেকে প্রসূতি বাড়ীর আঁস্তাকুড়ে বা জঞ্জাল-স্তূপে ফেলিয়া দিয়া আবার তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া সযত্নে প্রতিপালন করিতেন। টিপাকসূত্রে বর্ণিত আছে যে, বাণিজ গ্রামের শ্রেষ্ঠী বিজয়মিত্রের পত্নী সুভদ্রার সন্তান হইয়া বাঁচিত না। একবার তাঁহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি উহাকে গোপনে জঞ্জাল-স্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে তাহাকে তথা হইতে কুড়াইয়া লইয়া আসিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া লালনপালন করিতে থাকিলেন। পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজেও কেহ কেহ এইরূপ করিতেন। ইহার কারণ, লোকের বিশ্বাস, ঐরূপ করিলে আর তাহাকে যমে ছুঁইবে না। সাহঞ্জনী গ্রামের বণিক্ সুভদ্রের পত্নী সুভদ্রার সন্তান হইলে মরিয়া যাইত। কিছুতেই বাঁচিত না। একবার তাহার একটি

মালবাহী শকটের নিম্নে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। এখন কেহ ঐরূপ করে কি না, জানি না। তবে নিম্ন-শ্রেণীর লোকের মধ্যে কেহ কেহ ঐরূপ করিতেও পারে। উহাদের বিশ্বাস এই যে, শকটের নিম্নে পড়িলে শিশুর মৃত্যু হইবেই, তবে তথায় ফেলিয়া দিলে তাহার সে রিষ্টি কাটিয়া যাইবে। অধুনা আমাদের দেশে যেমন মৃতবৎসা প্রসূতির সন্তান হইলে তাহার নাম নিসি, নিসিন্দী, গুয়ে প্রভৃতি রাখে, প্রাচীন জৈন-সমাজেও মৃতবৎসা প্রসূতির ঐরূপ নাম রাখা হইত। মৃতবৎসা প্রসূতির পুত্রদিগের নাম এখনও কুড়ুনে, কুড়ানী, বেচা, কেনা, হারাণে প্রভৃতিও রাখা হয়। প্রাচীন কালেও তাহা হইত। জৈন গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। হিন্দু সমাজেও এইরূপ এখনও আছে।

বিবাহ

বিবাহ ব্যাপারে প্রাচীন জৈন সমাজের প্রথা হিন্দু সমাজের প্রথা হইতে কিছু স্বতন্ত্র লক্ষিত হয়। আবার অনেক বিষয়ে হিন্দু সমাজের সহিত উহা একই প্রকারের ছিল। হিন্দু সমাজের ন্যায় জৈন সমাজে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ একই দিনে বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। সাধারণ গৃহস্থরাও একাধিক বিবাহ করিতেন। বাঙ্গালায় কুলীনের সন্তানগণ যেমন কিছু দিন পূর্ব্বে বহুবিবাহ করিতেন, জৈন সমাজে গৃহস্থগণ সেইরূপ কেহ কেহ অধিক সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। রাজগৃহের মহাশ্বগ নামক এক জন বণিকের তেরটি গৃহিণী ছিল। ইনি মহাবীরের নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন বলিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবীরের নিকট ইনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ইনি আর অধিক বিবাহ করিবেন না। ইহাতে মনে হয়, মহাবীর অধিক বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বহু বিবাহের যুগে সপত্নী-বিদ্বেষ যে অতিশয় প্রবল ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজগৃহের মহাশ্বগ নামক শ্রেষ্ঠীর তেরটি পত্নী ছিল, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহার প্রধানা পত্নীর নাম ছিল রেবতী। একদা নিশীথে নিদ্রাভঙ্গের পর রেবতী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার দ্বাদশটি সপত্নীর জন্ম দাম্পত্য সুখ সম্পূর্ণ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। ক্রমে তিনি ছয় জন সপত্নীকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট ছয় জনকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা হইতে সপত্নী-কলহ ও বিদ্বেষ কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা বুঝা যায়।

বিবাহ সম্বন্ধে জৈনগ্রন্থে কতকগুলি বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণিত আছে। চম্পা নগরে এক বৈশ্য বাস করিতেন, তাঁহার এক কন্যা ছিল, তাহার নাম সুকুমারিকা। একদা ঐ নগরের জিনদত্ত নামক আর এক জন ধনাঢ্য বৈশ্য রাজপথ দিয়া গমনকালে সুকুমারিকাকে তাহাদের বাড়ীর ছাদে খেলা করিতে দেখিতে পাইলেন। জিনদত্ত সুকুমারিকার সৌন্দর্য্য দর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র সাগরের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। সুকুমারিকার পিতা কহিলেন, তিনি তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, সুতরাং তাহাকে পরগৃহে পাঠাইবেন না। তবে যদি সাগর তাঁহার গৃহে আসিয়া গৃহ-জামাতারূপে বাস করেন, তাহা হইলে তিনি জিনদত্তের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত আছেন। জিনদত্ত গৃহে আসিয়া তাহার পুত্র সাগরকে সকল কথা বলিলেন। সাগর 'মৌন সম্মতি' দিল, নির্দ্দিষ্ট দিনে উভয়ের বিবাহ হইল। বরযাত্রিগণ ভোজনান্তে যে যাহার গৃহে গমন করিল। সাগর বাসরঘরে গমন করিল। কিন্তু সুকুমারিকার সন্নিহিত হইলে তাহার বোধ হইয়াছিল, তাহার গাত্রমাংস যেন ক্ষুর দ্বারা কর্ত্তিত হইতেছে। যে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকিল। কিন্তু ক্ষণপরে বধূ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সাগর গৃহের অন্য স্থানে গিয়া শয়ন করিল। তাহার পর নিদ্রাভঙ্গে সুকুমারিকা দেখিল, তাহার পতি তাহার নিকটে নাই। সে সেই শয্যা হইতে উঠিয়া পতি যেখানে শুইয়াছিল, সেই-খানে তাহার পার্শ্বে যাইয়া শয়ন করিল। আবার বধূর সান্নিধ্য-হেতু বরের গাত্রে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। একটু পরে সুকুমারিকা নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সাগর সেই বাসরগৃহ হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে যখন কন্যার জননী তাঁহার দাসীদিগকে কন্যার এবং জামাতার মুখ-প্রক্ষালনের দ্রব্যাদি দিয়া আসিতে বলিলেন, তখন দাসীরা আসিয়া দেখিল, জামাতা তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে, কন্যা বিষণ্ণ মনে একাকিনী তথায় বসিয়া আছে। কন্যার পিতাকে সেই কথা জ্ঞাপন করা হইল। তিনি উহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ হইয়া জিনদত্তের গৃহে গমন করিয়া জামাতার এই ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। জিনদত্ত পুত্রকে সেই কথা বলিলে সাগর সমস্ত কথা বলিয়া বলিল যে, সে প্রাণান্তেও আর শ্বশুর-গৃহে যাইবে না। জিনদত্ত তাঁহার বৈবাহিককে সেই কথা জ্ঞাপন করিলেন। তখন কন্যার পিতা লজ্জিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক কন্যাকে কহিলেন যে, অতঃপর তিনি তাহার জন্য এমন একটি পাত্র দেখিবেন যে, পাত্র তাঁহার কন্যাকে ভালবাসিবে। কিছু দিন পরে কন্যার পিতা একটি ভিখারীকে ধরিয়া আনিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। ভিখারীও কন্যার সন্নিহিত হইলে গাত্রে ঐরূপ তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া বাসর-ঘর হইতেই প্রাণভয়ে চম্পট দিল। তখন কন্যার পিতা হতাশ হইয়া কন্যাকে রন্ধনশালার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। সুকুমারিকা তখন রন্ধনশালার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। পরে তিনি এক জন মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ পাইয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন।*

এই বিবরণ অনেকের নিকট অপ্রাকৃত মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি কিছুকাল পূর্ব্বে এক মার্কিনী সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, কোন কোন নারীর দেহে এরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে যে, কেহ তাহার সন্নিহিত হইলে তাহার দেহে যেন সূচ ফুটাইবার মত জ্বালা ধরে। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই ঘটনার অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিবাহ হইলে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কন্যার জৈন সমাজে পুনরায় বিবাহ দেওয়া যাইত। নতুবা সুকুমারিকার পিতা তাহার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিলেন কি করিয়া? ইহাতে অনুমান হয়, প্রাচীন জৈন সমাজে বহুবিবাহের মত বিধবা-বিবাহও প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিধবা-বিবাহের ব্যাপার অধিক ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বহু-বিবাহ প্রচলিত থাকায় সংসারে অনেক কলহ, বিবাদ এবং অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিত, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে রাজা-রাজড়ারা সেই জন্য বহুবিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহার ফলে অনেক স্থলে অনেক অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ডও অনুষ্ঠিত হইত। বিপাকশ্রুত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের রাজা সিংহসেনের পাঁচ শত মহিষী ছিল। কিন্তু তন্মধ্যে তিনি শ্যামা নাম্নী মহিষীকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং অন্য রাণীদিগের কোন সংবাদই লইতেন না। ঐ সকল রাণীর জননীরা যখন তাঁহাদের কন্যার এই দুঃখের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং যে কোন উপায়ে শ্যামাকে হত্যা করিবেন

---

* জ্ঞাতাধর্ম্ম কথা।

বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। শ্যামা সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া রাজা সিংহসেনকে সে কথা জানাইলেন। রাজা অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ইহার পর তিনি নগরের বাহিরে একটি পর্ব্বতাকার সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সৌধে অনেক দাহ্য পদার্থ ছিল। পরে তিনি তাঁহার সকল শ্বশ্রূমাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই সৌধে আনয়ন করেন এবং কয়েক দিন ধরিয়া তথায় তাঁহাদিগকে ভূরিভোজন করাইতে থাকেন। কিছু দিন পরে একদা গভীর রজনীযোগে রাজা জনকয়েক অনুচর লইয়া যাইয়া সেই সৌধের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। অগ্নি দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং রাজার সমস্ত শাশুড়ীগুলিই তাহার মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। বিপাকশ্রুত গ্রন্থে এই কাহিনী বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য এরূপ নৃশংস অত্যাচার অতি অল্পই অনুষ্ঠিত হইত। পাষণ্ড সকল সমাজেই আছে, অহিংসা ধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ জৈন সমাজে এরূপ হত্যাকারী পাষণ্ড অল্পই ছিল এবং আছে; তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কোন সমাজ যে একেবারে পাষণ্ড-বর্জ্জিত হইবে, তাহা মনে করা বিষম ভুল।

একান্নবর্ত্তী পরিবার

জৈন সমাজে ঠিক একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা প্রচলিত ছিল না। বিবাহের পর অনেক হিন্দুও পৃথগ্‌ভাবে বাস করিতেন। আবার কেহ কেহ একান্নবর্ত্তী থাকিতেন। এ বিষয়ে হিন্দু সমাজের সহিত জৈন সমাজের বিশেষ মিল ছিল। জৈনদিগের 'জ্ঞাতাধর্ম্ম কথা'য় বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন কালে চম্পা নগরে তিন ব্রাহ্মণ-ভ্রাতার বাস ছিল। তাঁহারা সকলেই সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা একান্নভুক্ত ছিলেন না। তাঁহাদের তিন জনের স্ত্রীর নাম ছিল যথাক্রমে নাগশ্রী, ভূতশ্রী, আর যক্ষশ্রী। একদা তিন ভ্রাতা কথাপ্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এখন যখন তাঁহাদের কোন অভাবই নাই, তখন তাঁহারা সস্ত্রীক পালাক্রমে এক এক জনের বাড়ীতে সকলে ভোজন করিবেন। তাঁহারা তাহাই করিতে থাকিলেন। এক বার নাগশ্রীর পালা পড়িলে নাগশ্রী বহু ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন অনেক ঘৃত, তৈল এবং মশলা দিয়া রন্ধন করিলেন। রন্ধনের পর তিনি স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য দেখিলেন, উহা অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়াছে। ভ্রাতাদিগের উপহাস-শঙ্কায় তিনি তাহা সরাইয়া রাখিয়া আবার নূতন করিয়া উহা রন্ধন করেন। সকলে খাইয়া চলিয়া গেল। কয়েক দিন পরে ধর্ম্মরুচি নামক জনৈক যতী ভিক্ষার্থ নাগশ্রীর গৃহে আসিয়াছিলেন। নাগশ্রীর তখন সেই পর্য্যুষিত ব্যঞ্জনের কথা মনে পড়িল। তিনি তাহা ধর্ম্মরুচিকে দিলেন। ধর্ম্মরুচি উহা তাঁহার মঠাধ্যক্ষকে দেখাইলেন। মঠাধ্যক্ষ কহিলেন, উহা অভক্ষ্য, উহা ফেলিয়া দাও। ধর্ম্মরুচি উহা বাহিরে ফেলিয়া দিতে যাইয়া দেখিলেন যে, কয়েকটি পিপীলিকা উহা ভোজন করিয়া মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মরুচি ভাবিলেন যে, তিনি যদি উহা ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে অনেক পিপীলিকা এবং মক্ষিকা উহা খাইয়া মরিবে। অতএব তিনি স্বয়ং উহা ভোজন করিলেন। ভোজনমাত্র তিনি সেইখানে মরিয়া পড়িয়া রহিলেন। সেই কথা ক্রমে প্রকাশ পাইল। ভ্রাতা তিন জন সেই কথা শুনিয়া নাগশ্রীকে প্রহারপূর্ব্বক বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-ভ্রাতৃত্রয় জৈনদিগের ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নাগশ্রী এবং যক্ষশ্রী নাম দেখিয়াই অনুমিত হয়। ভিক্ষাদান ব্যাপারে এইরূপ অপরাধ অমার্জ্জনীয় ছিল।

ধনাঢ্য সমাজে বেশ্যার আদর ছিল। বণিজ গ্রামের বেশ্যা কামধ্বজাকে সহস্র মুদ্রা দিলে পাওয়া যাইত। সে রাজার ন্যায় মস্তকে ছত্র ধরিত এবং বাহির হইলে তাহাকে চামর দ্বারা বীজন করা হইত। সে নানা বিদ্যায় নিপুণা ছিল। উজ্ঝটিক নামক জনৈক বণিক্-পুত্র কামধ্বজার প্রণয়ী ছিল: কিন্তু বণিজ গ্রামের রাজা মিত্রের মহিষী শ্রী অত্যন্ত পীড়িত হওয়াতে রাজা উজ্ঝটিককে কামধ্বজার গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন। উজ্ঝটিক গোপনে কামধ্বজার নিকট গমন করিতেন। রাজা উভয়কে এক সঙ্গে ধরিয়া ফেলেন এবং উজ্ঝটিকের প্রাণসংহার করেন। এইরূপ অনেক কাহিনীই জৈন-পুরাণে পাওয়া যায়।

ইহা ভিন্ন যুবকগণ বেশ্যালয়ে গোষ্ঠী (club) স্থাপন করিয়া তথায় সম্মিলিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। রাজা এই সকল গোষ্ঠী গঠনে অনুমতি দিতেন। ইহাতে যুবকদিগের অভিভাবক বা আত্মীয়গণ আপত্তি করিতে পারিতেন না। এই সকল গোষ্ঠীর অতি সুন্দর নামকরণ করা হইত। তৎকালীন হিন্দু সমাজেও এইরূপ গোষ্ঠী ছিল। বাৎসায়ন তাঁহার কামসূত্রে এইরূপ গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন (কামসূত্র ১।৪।৮)। মদ্যপানও সে কালে সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। জৈন-গ্রন্থে অনেক প্রকার মদ্যের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মদ্যপান হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভারতে যে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এবং মহাবীর উহা অনেক সংশোধন করিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজ বা জৈন সমাজে তাহার প্রভাব পতিত হইয়াছিল।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সময়ে প্রাচীন গ্রীসে ঠিক এইরূপ দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসে এইরূপ বারনারীর গৃহেই বিদ্বজ্জন-সমাজের সমাবেশ হইত। ফ্রিইনে (Pheryne) নামক বারবনিতার মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রাক্সাইটেলস 'ভিনাস' দেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন। এই বারবনিতাকে এথেন্সের যুবকদিগের চরিত্রহানি করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইলে,—ইনি ইহার দেহের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। গ্লাইসেরা নাম্নী ফুলওয়ালীর সৌন্দর্য্য-কাহিনী গ্রীসের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। পেরিক্লিসের প্রণয়িনী এস্‌পেসিয়ার গৃহে এথেন্সের বিদ্বজ্জন-সমাজের সকলেই সমবেত হইয়া অনেক গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। সক্রেটিসও ঐ এস্‌পেসিয়ার গৃহস্থ-গোষ্ঠীর প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। প্রকাশ, এস্‌পেসিয়াই পেরিক্লিসকে বাগ্মিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এস্‌পেসিয়ার গৃহস্থিত গোষ্ঠীতে এথেন্সের বড় বড় চিত্রকর, কবি, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক সমবেত হইতেন। লিয়ন্‌টিয়াম নাম্নী বেশ্যা এপিকিউরাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাময়ী শিষ্যা ছিল, তাঁহার গৃহেও বহু প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের সমাবেশ হইত। স্মির্ণার প্যাসাথিয়াসের কথাও ইতিহাস-বিশ্রুত। ইনি লুসিয়াস ভেরাসের উপপত্নী ছিলেন। গ্রীক্ লেখক লুসিয়ান ইহার অনেক পরে আবির্ভূত হইলেও ইঁহার সৌন্দর্য্য, মনীষা, উদারতা, এমন কি, ইঁহার শ্লীলতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভারতের কামধ্বজা, সুদর্শনা, দেবদত্তা, লক্ষহীরা প্রভৃতির প্রভাব যে সাহিত্যিক-সমাজে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং তাহাদের গৃহে যে বহু বিদ্বানের সমাবেশ হইত, ইহা বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

কথাশিল্পীর হত্যারহস্য

[উপন্যাস]

প্রথম পল্লব

সহোদর-যুগল

জন ও ডেভিড গারসাইড সহোদর ভ্রাতা হইলেও উভয়ের স্বভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ডেভিড ভয়ঙ্কর মাতাল, তাহার স্বভাব সংশোধনের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না ; তথাপি 'সন' নামক দৈনিক পত্রিকায় তাহার চাকরী দীর্ঘকাল হইতেই চলিতেছিল ; কারণ, সে যতই মাতাল হউক, লণ্ডনের অপরাধি-সমাজের বিবিধ অপকার্য্যের নিখুঁত সংবাদ প্রকাশে আর কোন সাংবাদিকের সেরূপ দক্ষতা ছিল না।

ডেভিড জনের সহিত দেখা করিবার জন্য 'বুল' নামক প্রসিদ্ধ ভোজনাগারে (chop-house) উপস্থিত হইয়াছিল। জন ডেভিডকে যথেষ্ট স্নেহ করিলেও মাতলামির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, ডেভিড কিছু টাকা ধার করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু ডেভিড জনের সম্মুখে বসিয়া উৎসাহভরে পুনঃ পুনঃ মদ্যপান করিতে থাকিলেও টাকার কথা বলিল না।

জন সংবাদপত্রের সেবায় কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিলেও সাত বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই ব্যবসায়ে সাফল্য-লাভের জন্য দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিলেও ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই ; আদালতে তাঁহার পসার হয় নাই।

ডেভিড আর এক গ্লাস মদ এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "জন আজ রাত্রে আমি কি উদ্দেশ্যে তোমাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি, তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পার নাই, এখন তোমাকে সেই কথাই বলিতেছি শোন। তুমি বোধ হয় জান না, লণ্ডনের দস্যু-তস্করদলের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সে জন্য আমার পদোন্নতি হওয়ায় আমি এখন বার্ষিক বার শত পাউণ্ড বেতন পাইতেছি। সংবাদপত্রের সেবায় মাসিক এক শত পাউণ্ড বেতন পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। তুমি 'সন' পত্রিকায় আমার সেই সকল প্রবন্ধের কোনটি কি কোন দিন পাঠ করিয়াছ ?"

জন বলিলেন, "হাঁ ডেভিড, ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার ধারণা, এ সম্বন্ধে ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পূর্ব্বে কোন দিন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই।"

ডেভিড উৎসাহভরে বলিল, "ধন্যবাদ জন! ঐ সকল প্রবন্ধের কোন কোনটি আমার নিজেরও ভাল লাগিয়াছিল। আমার বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি ; কারণ, আমি—কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই, তুমি কি কোন দিন প্রেমে পড়িয়াছ ? নারী-প্রেমের মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছ কি ?"

ডেভিড এ কথা সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেও জন এই প্রশ্নে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন ; কারণ, তিনি ওলিভিয়া ডেন নাম্নী যুবতীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি ওলিভিয়ার নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলে ওলিভিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিয়াছিল, "দুঃখের সহিত তোমাকে বলিতে হইতেছে—তোমার প্রেমের স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা নাই ; তবে জানিয়া রাখ, আমাদের পরস্পরের সদ্ভাবের কখন অভাব হইবে না। আশা করি, আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ।"

ওলিভিয়ার এই কথা জন কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই, এবং দুই-এক বার ভিন্ন এই দীর্ঘকালে তাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎও হয় নাই ; কিন্তু ওলিভিয়ার প্রতি তাঁহার প্রেম অক্ষুন্ন ছিল।

ডেভিডের কথা শুনিয়া জন বিরক্তিভরে আসন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন ; ডেভিড মাতাল হইয়া তাঁহার অপমানের উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলিয়াছিল, এরূপ মনে করা যে তাঁহার ভ্রম, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু ডেভিড তাঁহাকে এই প্রকার বিচলিত দেখিয়া বলিল, "জন, আমার কথায় তুমি কি রাগ করিলে ? তুমি কখন প্রেমে পড়িয়াছ কি না, এ কথা তোমাকে বিশেষ কোন কারণেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আমার কথা শুনিয়া বোধ হয়, আমাকে পাগল মনে করিয়াছ! বস্তুতঃ, আমার মত নরাধম কাহারও প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করিবে, ইহা কি সত্যই অনধিকার-চর্চ্চা নহে ? কিন্তু কথা এই যে, একটি তরুণীর সহিত সংপ্রতি আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় পৃথিবী আমার পক্ষে স্বর্গে পরিণত হইয়াছে।"

জন বলিলেন, "তাহা হইলে এখন তুমি কি করিবে ?"

ডেভিড বলিল, "না, না, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি তাহাকে বিবাহ করিব না ; কারণ, আমার প্রেম সেরূপ স্বার্থ-কলুষিত নহে। আমার জন্য তাহাকেও কোনরূপ ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে সে শান্তিতে কাল যাপন করিতে পারে, এ জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। সে ভবিষ্যতে যে ফ্ল্যাটে বাস করিবে, তাহা তাহার নিজস্ব হইবে, কেহই তাহাকে তাহাতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, এবং আমি যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিব, তাহা তাহারই জন্য রাখিয়া দিব, যেন দুর্দ্দিনে তাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে না হয়।"

ডেভিডের কথা শুনিয়া জন সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। কারণ, এই উচ্ছৃঙ্খল মাতালের মুখ হইতে এরূপ বাণী প্রকাশ হইতে পারে—ইহা তিনি কোন দিন ধারণা করিতে পারেন নাই।

অতঃপর ডেভিড্ কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা করিবে, জন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যদি ডেভিড তাঁহার নিকট কিছু টাকা ধার চাহিয়া বসে—তাহা হইলে তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না, কারণ, তখন তাঁহার হাতে টাকা ছিল না।

জন মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমি এখন চলিলাম ডেভিড!"

ডেভিড বলিল, "এখনই যাইও না জন! তোমার সঙ্গে আমার

আরও কিছু কথা আছে। মাস-খানেকের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, এ জন্য—"

ডেভিডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একটি দীর্ঘ-দেহ, গম্ভীর-প্রকৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়স প্রায় ষাট্ বৎসর বলিয়া ধারণা হয়।

তাঁহাকে দেখিয়া ডেভিড জনকে নিম্ন-স্বরে বলিল, "বিচারপতি মিঃ স্বার্থডেলকে দেখিতেছি যে!"

এই বিখ্যাত জজের নাম শুনিয়া জন গারসাইড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শী প্রবীণ বিচারক তাঁহার সুপরিচিত; কারণ, অনেক হত্যাকাণ্ডের খ্যাতনামা আসামিগণের অপরাধের বিচারভার তাঁহারই হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। লণ্ডনের ব্যবহারাজীবগণের ধারণা ছিল—বিচারপতি স্বার্থডেল নানা কৌশলে আড়ম্বরপূর্ণ জটিল মামলাগুলির বিচার-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইত। তিনি নরহত্যার জন্য অভিযুক্ত আসামিগণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন; বস্তুতঃ, তাহাদিগকে চরম দণ্ডদানের জন্য তাঁহার আগ্রহের সীমা ছিল না। এ জন্য তিনি 'দণ্ডানুরাগী বিচারক' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

ডেভিড জনকে বলিল, "তোমাকে বোধ হয় উহারই হাতে পড়িতে হইবে। তুমি কোন খুনের মামলায় উহার এজলাসে বিচার-প্রার্থী হইলে তোমাকে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সেই মামলা চালাইতে হইবে। যে সকল কৌঁশুলী উহার এজলাসে মামলা আরম্ভ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে না পারেন, তাঁহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না।"

ডেভিডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আর এক জন ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। তিনি ডেভিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গারসাইড, অবিলম্বেই তোমাকে আফিসে উপস্থিত হইতে হইবে; এ জন্য তোমাকে তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে আসিলাম। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেন্টন হঠাৎ নিহত হইয়াছেন, জনরব—তাঁহার সেক্রেটারীই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। তাঁহার এই সেক্রেটারী একটি তরুণী—তাহার নাম ওলিভিয়া ডেন। মর্টন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে 'সন'এর সম্পাদককে এই সংবাদ জানাইয়াছেন; তাঁহারই আদেশ তোমাকে শুনাইলাম!"

জন গারসাইড এই সংবাদে বিচলিত হইয়া আগন্তুককে ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ কি বলিতেছ? যে তরুণীর কথা বলিলে—তাহার নাম কি সত্যই ওলিভিয়া ডেন?

নবাগত সাংবাদিক ডেভিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই সংবাদ শুনিয়া জনের এরূপ ব্যাকুল হইবার কারণ কি? উনি কি তোমার বন্ধু, ডেভিড?"

ডেভিড বলিল, "হাঁ, আমার ভাই।—জন, ওলিভিয়ার সঙ্গে সত্যই কি তোমার বেশ একটু মাথামাখি হয় নাই? তোমাদের ঘনিষ্ঠতার কথাই আমার মনে পড়িতেছে!"

সাংবাদিক এবার ব্যস্ত ভাবে ডেভিডকে বলিলেন, "এ সকল খোসগল্প বন্ধ রাখিয়া শীঘ্র আফিসে চল। বুড়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

ডেভিড আর কোন কথা না বলিয়া সাংবাদিকের সঙ্গে 'সন' নামক সংবাদপত্রের আফিসে চলিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া 'সনের' বৃদ্ধ সম্পাদক হেক্টর ওয়্যারবর্টনকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখিলেন। সম্পাদক ডেভিডকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "যে সময় আফিসে তোমার উপস্থিত থাকা দরকার, সেই সময় এখানে তোমার দেখা পাই না, ইহার কারণ কি? এ জন্য আমি অত্যন্ত—"

ডেভিড তাঁহার কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মর্টন ফোনে আপনাকে সংবাদ দিয়াছে?"

সম্পাদক তাঁহার ডেস্কের উপর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া রাখিয়াছি! আজ রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ট্রেন্টনের উপন্যাসের প্রকাশক কার্সন এণ্ড ম্যালরি কোম্পানীর অংশীদার ম্যালরি ট্রেন্টনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; কারণ, ট্রেন্টন তাঁহাদিগকে একখানি নূতন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠাইতে অত্যন্ত বিলম্ব করায় তাহার কারণ জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল! ট্রেন্টন যে কক্ষে বাস করিতেন, সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। ম্যালরির সাড়া পাইয়া একটি যুবতী দ্বার খুলিয়া দিল; এই যুবতীর নাম ওলিভিয়া ডেন,—সে ট্রেন্টনের সেক্রেটারী। ম্যালরি ওলিভিয়াকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিলেন। ম্যালরি কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে ট্রেন্টনের সঙ্গে সেখানে দেখা করিতে যাইতেন; এ জন্য ওলিভিয়া তাঁহাকে চিনিত। ওলিভিয়া তখন এতই বিহ্বল হইয়াছিল যে, সে তাঁহাকে যে সকল কথা বলিল, তাহা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন—অর্থহীন। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারায় ম্যালরি ট্রেন্টনের বাস-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল! ট্রেন্টন পায়জামা ও গাউন মাত্র পরিয়া মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন; একখান ভূজালি তাঁহার বক্ষঃস্থলে আমূল প্রোথিত! দেহ নিস্পন্দ, প্রাণহীন।

ম্যালরি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া টেলিফোনে পুলিশকে এই সংবাদ জানাইলেন। পুলিশ সেখানে উপস্থিত হইয়া ওলিভিয়ার নিকট প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিলে ওলিভিয়ার হঠাৎ মূর্চ্ছা হইল, সে কোন কথাই বলিতে পারিল না।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করিল, "ওলিভিয়াকেই অপরাধিনী বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ কি?"

সম্পাদক বলিলেন, "মর্টনের এইরূপই ধারণা; আমরা তাহার কথায় নির্ভর করিতে পারি। যাহা হউক, এখন আমাদের সেই ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করাই উচিত। যদি তুমি আমাকে এই দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে আমি এই মাত্র বলিতে পারি—ট্রেন্টন এই যুবতীকে কুপথগামিনী করিয়া অবশেষে তাহার সংস্রব অসহ্য হওয়ায় তাহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। ওলিভিয়া তাহার ব্যবহারে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহার প্রণয়ীকে প্রতিফল দানের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান! ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই।"

ডেভিড বলিল, "সেই যুবতী এখন কোথায়?"

সম্পাদক বলিলেন, জেরা করিবার জন্য তাহাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। মর্টন শেষ পর্য্যন্ত সকলই জানিতে পারিবে।

এখন তুমি এই হত্যা-কাহিনী আমাদের দৈনিকে প্রকাশের জন্য লিখিয়া দাও।

ডেভিড বুঝিতে পারিল—ট্রেন্‌টনের হত্যা-কাহিনী 'সন' পত্রিকার পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে। কথা-শিল্পী পিটার ট্রেন্‌টনের বয়স আটত্রিশ বৎসর হইলেও তিনি উপন্যাস-রচনায় যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ ঔপন্যাসিকগণের কল্পনাতীত! অতি অল্পসংখ্যক উপন্যাস-লেখক এরূপ অল্প বয়সে এই প্রকার যশস্বী হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ ঔপন্যাসিক হইলেও তাঁহার নৈতিক চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল না; সকলেই বলিত, তাঁহার সুপরিচিত কোন রূপবতী নারীই তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত না। ডেভিড গারসাইড সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিল, তিন বৎসরের মধ্যে দুইটি পত্নী পিটার ট্রেন্‌টনের সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি আর বিবাহ না করিয়া একটির পর একটি এই ভাবে অনেকগুলি যুবতীকে তাঁহার সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন! তাহাদের মধ্যে দুই জন অঙ্গীকার-ভঙ্গের দাবীতে (**for breach of promise**) তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ আদায় করিয়াছিল।

ট্রেন্‌টনের বাস-কক্ষে তদন্ত করিতে করিতে ডেভিড অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিল, তাহার মনে হইল—এই হত্যাকাণ্ড তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণ, তাহার ভ্রাতা জন হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তা যুবতীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, এই সংবাদ তাহার অজ্ঞাত ছিল না। তাহার ধারণা হইয়াছিল—জন ওলিভিয়া ডেনকে তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। এই জন্যই ওলিভিয়ার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ শুনিয়া জন অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন; তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল।

৭০৯ নং কার্জ্জন ষ্ট্রীটস্থ ফ্ল্যাট হইতে পিটার ট্রেন্‌টনের দেহ স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই ডেভিড গারসাইড সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। এক জন পুলিশম্যান সেই ফ্ল্যাটের বহির্দ্বারে পাহারায় নিযুক্ত ছিল; গারসাইড তাহাকে পুলিশের অনুমতি-পত্র প্রদর্শন করায় ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার কোন অসুবিধা হয় নাই।

ডেভিড ট্রেন্‌টনের ফ্ল্যাটে এক জন ডিটেক্টিভ্-সার্জ্জেণ্টকে দেখিতে পাইল,—তাহার নাম মরফি। তাহার সহিত ডেভিডের পরিচয় ছিল। ডেভিড মরফিকে ট্রেন্‌টনের গুপ্ত-হত্যা সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করিলে মরফি দৃঢ় স্বরে বলিল, "প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নাই। ট্রেন্‌টন গ্রন্থকার ছিল, সে নভেল লিখিত; কিন্তু তাহার স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল—তাহা বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে; কোন রূপবতী তরুণী তাহার নজরে লাগিলে সে বেচারার পরিত্রাণ লাভ করা কঠিন হইত। ওলিভিয়ার বয়স অল্প, এবং সে রূপবতী। তাহাকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া ট্রেন্‌টন যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ছুঁড়িকে সহজে রাজি করিতে পারে নাই। কাল তাহাদের ভয়ঙ্কর কলহ হইয়াছিল; চাকরদের কেহ কেহ তাহা শুনিয়াছিল। ছুঁড়িটা রাগ সামলাইতে না পারিয়া ট্রেন্‌টনকে ভয় দেখাইয়াছিল। আজ রাত্রে ট্রেন্‌টনের দুই জন চাকর কাজ শেষ করিয়া ফ্ল্যাট ত্যাগ করিলে ওলিভিয়া সুযোগ বুঝিয়া ট্রেন্‌টনের সঙ্গে দেখা করে এবং তার এক দফা ঝগড়া শুরু করে। কিন্তু বাহিরে গিয়াছিল; কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া দেখে, ট্রেনটন ছোরার আঘাতে নিহত হইয়াছে! তাহার এই জবাব শুনিয়া কি মনে হয়?"

ডেভিড বলিল, "ছোরাখানা কোথা হইতে আসিল?"

মরফি বলিল, "সেখানি ইটালিয়ান ভুজালি। ট্রেনটন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু ট্রেনটন কোথায় উহা রাখিয়াছিল, ওলিভিয়া তাহা জানিত। অধিকাংশ সময় উহা তাহার লিখিবার টেবিলের দেরাজের ভিতর থাকিত। ঐ সেই টেবিল।"

মরফি সেই কক্ষের বাতায়ন-প্রান্তে সংস্থাপিত টেবিলের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল। তাহার পর ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিল, "ওলিভিয়ার মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই—এ কথা আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি।"

ডেভিড সেই কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলে মরফি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ?'

ডেভিড ফিরিয়া-দাঁড়াইয়া বলিল, "এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমি একটি বৃহৎ গল্প লিখিব স্থির করিয়াছি। 'সনে'ই তাহা প্রকাশিত হইবে। এ জন্য এখন আমার কিছুকাল চিন্তা করিবার প্রয়োজন!"

ডেভিড নিহত ব্যক্তির শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলে মরফি বলিল, "ঐ কক্ষের কোন জিনিস স্পর্শ করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছি।"

ডেভিড তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া প্রায় কুড়ি মিনিট সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া সেই ফ্ল্যাট ত্যাগ করিল।

সেই সময়ে বিচারপতি হোরেসিও স্বার্থডেলের আহার প্রায় শেষ হইয়াছিল; এক জন পরিচারক তাঁহার জন্য পনীর আনিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ধারের টেবিলে যিনি খাইতে বসিয়াছিলেন, তিনি কি 'সন্' পত্রিকায় আসামীদের অপরাধের বিবরণ 'রিপোর্ট' করেন না?"

জজ সাহেব তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিয়াছেন, তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সে সোৎসাহে বলিল, "হাঁ হুজুর, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমি উঁহাদের কথা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছিলাম। মিঃ গারসাইডকে অফিসে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটা জম্‌কাল গল্প লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। শুনিলাম, মে-ফেয়ারে মিঃ ট্রেন্‌টন নামক এক জন ভদ্রলোককে খুন করা হইয়াছে; সেই গল্পই তিনি লিখিবেন। সেই ভদ্রলোকটি না কি কেতাব লিখিয়া খাইতেন।"

বিচারপতি বলিলেন, "এ সব নোংরা কাজ! তা' আর কোন কথা শুনিয়াছ?"

ভৃত্য বলিল, "তা আবার শুনি নাই হুজুর! কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। অন্য এক জন রিপোর্টারের সঙ্গে মিঃ গারসাইডের কথা হইতেছিল তাহাও শুনিয়াছি। সেই রিপোর্টার বলিতেছিলেন—পুলিশের বিশ্বাস, ট্রেন্‌টনের সেক্রেটারীই তাহাকে খুন করিয়াছে। একটি তরুণী—মিস্ ওলিভিয়া ডেন তাহার সেক্রেটারী ছিল।"

বিচারপতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "উইল্‌কিন্স, তুমি বড়ই অদ্ভুত কথা বলিলে! আশা করি, এই তরুণীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।"

বিচারপতি স্কার্থডেল নৈশ ভোজন শেষ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আশা হইল, এই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের হত্যাকাণ্ডের বিচার-ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলে বিচার-কার্য্যে খ্যাতি লাভ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার-ফল জানিবার জন্য জনসমাজের আগ্রহ ও কৌতূহল লক্ষিত হয়, বিচারপতি স্কার্থডেলকে সেই সকল মামলার বিচার করিতে দেখা যাইত। এই রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের বিচারভার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল।

পরদিন প্রভাতে এই মামলা-প্রসঙ্গে চতুর্দ্দিকে আন্দোলন আরম্ভ হইল। 'সন' পত্রিকায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। ডেভিড গারসাইড 'সন' পত্রিকায় তিন স্তম্ভব্যাপী এক প্রবন্ধে এই মামলার আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

"এই মামলার ঘটনাচক্র অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ; কিন্তু এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেনটনের হত্যাকাণ্ডের জটিল রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে যে সকল ঘটনার বিবরণ পাঠকসমাজ জানিতে পারিবেন, সেরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ ঘটনাবলী বর্ত্তমান কালের কোন রহস্যোপন্যাসে প্রকাশিত হয় নাই।"

দ্বিতীয় পল্লব

বৌ-ষ্ট্রীটের কারাকক্ষে

বৌ-ষ্ট্রীট-কারাগারের স্থূলকায়া প্রবীণা ওয়ার্ডেস (wardress) হত্যাপরাধে অভিযুক্ত মিস্ ওলিভিয়া ডেনের কারাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কোমল স্বরে বলিল, "একটি ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন বাছা!"

এ কথা শুনিয়া ওলিভিয়া চমকিয়া উঠিল। কোন্ ভদ্রলোক সেই কারাকক্ষে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন? তিনি কি কোন সংবাদপত্রের রিপোর্টার? সেই দিন প্রভাতে বহু ভদ্রলোক তাহাকে দেখিবার জন্য পুলিশ-আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সকলেই গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিম্ন স্বরে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সকল অপ্রীতিকর মন্তব্য শুনিয়া ওলিভিয়ার মন ক্ষোভ ও বিরাগে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তখনই তাহার আশা হইল—কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশের রিপোর্টারগণকে হলওয়ে কারাগারে আসিয়া তাহার জেরা করিতে অনুমতি দিবেন না।

কিন্তু আগন্তুক ওলিভিয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সে বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিল।

আগন্তুক জন গারসাইড!—তিনি প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে তাহার নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব করিলে সে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিল। তাহার পক্ষে অবিবেচনার কার্য্য হইলেও ইহা সঙ্গত বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল।

ওলিভিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "জন, তুমি?"

জন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন মাত্র। তাহার পর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ওলিভিয়া, আমি তোমাকে সাহায্য করিবার চেষ্টায় এখানে আসিয়াছি। কিন্তু আমার অবসর অত্যন্ত অল্প হইলেও বিষয়টি এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে, আমি আশা করি, তুমি আমার কোন কথায় বাধা না দিয়া ধীর ভাবে সকল কথাই শুনিবে। তুমি যে মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছ, তাহাতে আমি আদালতে তোমার পক্ষ-সমর্থনের জন্য তোমার সম্মতি লইতে আসিয়াছি। তোমার সম্মতি পাইলে বিচারকালে আমি তোমার অনুকূলে কাজ করিব। তবে আমার আরও কিছু বলিবার আছে, আশা করি, তাহা শুনিতে তোমার আপত্তি নাই। ওকালতি ব্যবসায়ে আমি তেমন প্রতিষ্ঠাপন্ন নহি; কিন্তু আমি বিশেষ যত্ন সহকারে ফৌজদারী আইন অধ্যয়ন করিয়াছি; বিশেষতঃ, আমার বিশ্বাস, আমি গভীর নিষ্ঠার সহিত এই মামলা চালাইতে পারিব। তদ্ভিন্ন, তুমি নিরপরাধ বলিয়াই আমার সুদৃঢ় ধারণা; তুমি এই কার্য্য কর নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

ওলিভিয়া বলিল, "না, আমি করি নাই।"

জন বলিলেন, "তোমার নিকট আপাততঃ ইহার অধিক আর কিছুই আমার জানিবার নাই; তবে পরে তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইবে বটে। কিন্তু তোমাকে এ কথা বলিতে বাধা নাই যে, এই মামলায় জন-সমাজে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই জন্য অনেক বিখ্যাত উকিল আদালতে তোমার পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিবে, কোন কোন খ্যাতনামা উকিল সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে তোমার সমর্থন করিবে, অনেকে খ্যাতিলাভের আশায় তোমার অনুকূলে দাঁড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে; কারণ, তাহারা জানে, তুমি তাহাদের চেষ্টায় নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিলাভ করিলে—তাহাদের পসার বাড়িবে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য স্থির করিবার পূর্ব্বে তোমার ভাবিয়া দেখা উচিত।"

ওলিভিয়া বলিল, "জন, তোমার মহত্ত্ব প্রশংসনীয়; তুমি আমার ধন্যবাদভাজন; ইহার অধিক আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

জন বলিলেন, "তবে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত? আদালতে আমাকে তোমার অনুকূলে মামলা চালাইতে দিতে রাজী আছ ত?"

ওলিভিয়া বলিল, "হাঁ জন, আমি আনন্দের সহিত তোমার এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতেছি।"

জন এবার আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "ইহার প্রতিদানে আমি এই মাত্র বলিতে পারি—তুমি যে পর্য্যন্ত নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিলাভ না করিবে—সে পর্য্যন্ত আমি এই চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিব না। আশা করি, আমার এই অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া তুমি আশ্বস্ত হইতে পারিবে। তুমি মুহূর্ত্তের জন্য ভগ্নোৎসাহ হইও না।"

ওলিভিয়া বলিল, "না জন, আমি ভগ্নোৎসাহ বা হতাশ হইব না। আমি সত্যই নিরপরাধ। পিটার ট্রেন্টনকে আমি হত্যা করি নাই।"

এই সময় কারাগারের ওয়ার্ডেস্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জনকে বলিল, "আপনাদের আলাপের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে মহাশয়! আপনাকে বাহিরে যাইতে হইবে।"

* * * *

এই সময় এই কারাগারের কয়েক মাইল দূরে স্থানান্তরে যে দৃশ্য লক্ষিত হইতেছিল—তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার!

ডেভিড গারসাইড সেই সময় এজওয়ার রোডের পার্শ্ববর্ত্তী ৫নং ফ্ল্যাটের একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া সে সেই কক্ষের অধিবাসিনী একটি

খর্ব্বকায়া তরুণীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আদরের স্বরে বলিল, "দশ মিনিটের অধিক কাল এখানে আমার থাকিবার উপায় নাই প্রিয়ে! তুমি ভাল আছ কি না, তাহাই জানিবার জন্য আমাকে আসিতে হইল, জুনি।"

তরুণী জুনির মুখে কথা ফুটিল না; কিন্তু তাহার হর্ষোজ্জ্বল চক্ষুতে মনের ভাব পরিস্ফুট হইল। ডেভিড সসম্ভ্রমে তাহাকে চুম্বন দান করিল।

এই সময়ের এক মাস পূর্ব্বে ফ্লীট ষ্ট্রীটের কোন সুপরিচিতা মহিলা-সাংবাদিক (a woman journalist) ভোজের যে মজলিস করিয়াছিলেন, সেই মজলিসেই জুন মেরিফের সহিত ডেভিডের পরিচয় হইলে সে তৎক্ষণাৎ এই তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ডেভিড তাহাকে সেই অসার গল্পের মজলিস হইতে নিভৃত পল্লীপ্রান্তে লইয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া বলিয়াছিল, "তোমার মত কোমল-প্রকৃতি তরুণীর এখানে থাকিবার অধিকার নাই। চল, আমরা দূরে চলিয়া যাই, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

ডেভিড তাহাকে সোহো পল্লীর উপকণ্ঠস্থিত রোলিনোর ভোজনাগারে লইয়া গিয়াছিল, সেই স্থানটি নির্জ্জন; আহারের পর সেখানে গল্প করিবার সুযোগ ছিল।

রোলিনোর ভোজনাগারে খাদ্যসামগ্রীর ফরমাস দিয়া ডেভিড জুনিকে বলিল, "প্রথমে তোমার নিজের কথা বল, তাহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

জুনি তাহাকে সরল ভাবে নিজের জীবনের কথা বলিলে ডেভিড জানিতে পারিল—জুনির বয়স তখন চব্বিশ বৎসর। ছয় মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে পল্লীগ্রামে বাস করিয়াছিল। তাহার পিতা পাদরী ছিলেন, কিন্তু তাহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। জুনির ইচ্ছা ছিল, সাহিত্য-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে। সে তাহার পিতার মৃত্যুর পর যৎসামান্য অর্থের অধিকারিণী হইয়াছিল; তাহাই লইয়া সে লণ্ডনে আসিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

জুনির এই সকল কথা শুনিয়া ডেভিড বলিল, "এখন তোমাকে আমার কথা বলিতেছি, তাহা শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইতে পারে। একটি বিষয় ভিন্ন অন্য সকল বিষয়েই আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমার ধারণা হইয়াছিল, কঠোর সাধনা-ফলে আমি ঔপন্যাসিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, এই কার্য্য অত্যন্ত কঠিন, এ জন্য অবশেষে আমাকে সাংবাদিকের ব্রত গ্রহণ করিতে হইল। সংবাদ-পত্রের সেবকগণ সাহিত্যের ক্রীতদাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় হইতে মদ্যপানে আমার আসক্তি অত্যন্ত প্রবল হইল, তাহার ফলে আজ আমি ভীষণ মাতাল, অসংযত মাতাল বলিয়া ভদ্র-সমাজের ঘৃণার পাত্র। যদি আমি এই কদভ্যাস ত্যাগ করিতে না পারি, তাহা হইলে আর দশ বৎসরও আমি বাঁচিব কি না, সন্দেহের বিষয়।"

ডেভিড ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জুনির মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "কিন্তু তুমি আমাকে অনুমতি দান করিলে আমি তোমার কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারিতেছি—তোমার অনাহারের কষ্ট অসহ্য হইয়াছে। তুমি যে সকল ছোট গল্প লিখিয়াছ, তাহাদের গ্রাহক নাই; কেহই তাহা ক্রয় করে না। তোমার উপন্যাসের রচনা শেষ হইলে যদি কোন প্রকাশক তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তুমি ত্রিশ পাউণ্ডের অধিক পাইবে—এরূপ আশা করিতে পার না; কিন্তু আমি তোমার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড প্রদান করিতে পারিব। তদ্ভিন্ন আমি মধ্যে মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া তোমার সংবাদ লইয়া যাইব—এ জন্য তোমার সম্মতি প্রার্থনা করি।"

এই সকল কথা শুনিয়া জুনি নীরব থাকিলেও তাহার চক্ষুতে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তাহার কল্যাণের জন্যই পরমেশ্বর তাহাকে সেখানে প্রেরণ করিয়াছেন। ডেভিড ভয়ঙ্কর মাতাল বটে, কিন্তু জুনির ধারণা হইল, তাহাকে সে অনায়াসে বিশ্বাস করিতে—তাহার উপর নির্ভর করিতে পারে। এ জন্য সে প্রস্তুত হইল।

উক্ত ঘটনার পরদিন ডেভিড ব্যাঙ্ক হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া জুন মেরিফের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইল, এবং তাহার নামে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া সেই স্থানে তাহার বাসের বন্দোবস্ত করিল। সে জুনিকে বলিল, "এই ফ্ল্যাট এখন তোমার; আমি জীবিত থাকিতে ইহা হস্তান্তরিত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

জুনি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "তুমি আমার এত উপকার করিলে, ইহার প্রতিদানে আমার কিছুই কি করিবার নাই? আমার ইচ্ছা—"

ডেভিড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "না জুনি, আমি তোমার নিকট কিছুই লইতে চাহি না; আমি কোন কোন সময় এখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিলেই সুখী হইব।"

জুনি ডেভিডের এই কথা শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইল; সে বুঝিতে পারিল—ডেভিডের মনের ভাব বুঝিবার জন্য তাহাকে আরও কিছু কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

ডেভিড একখান আরাম-কেদারায় বসিয়া সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করিলে জুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার কি করিবার আছে?"

ডেভিড বলিল, "একটা নোংরা ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেন্টনের হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত ব্যাপার।"

জুনি বলিল, "তাহার সেক্রেটারী সম্ভবতঃ এ কাজ করে নাই।"

ডেভিড বলিল, "তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি?"

জুনি বলিল, "তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ? যাহার মুখ ঐরূপ সরলতার আধার, সে কখন নরহত্যা করিতে পারে না। তাহাকে কোন দিন দেখিয়াছ কি?"

ডেভিড বলিল, "কেবল কি দেখা? বো-ষ্ট্রীটের কারাগারে আজ সকালে তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিয়াছি।"

জুনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আহা বেচারা! তাহাকে কি অত্যন্ত কাতর দেখিলে? তাহার হাতে টাকা-পয়সা কিছু আছে কি?"

ডেভিড বলিল, "সম্বল কিছু আছে বলিয়া মনে হইল না; তবে তাহার পরিধানে পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিলাম বটে।"

জুনি বলিল, "টাকার অভাবে তাহার দুর্গতির যে সীমা থাকিবে না! তাহার মামলা চালাইবার জন্য উকিল-ব্যারিষ্টারদের টাকা দিতে হইবে ত? সে টাকা কোথা হইতে আসিবে?"

ডেভিড বলিল, "হাঁ, তাহার অনুকূলে মামলা চালাইতে বিস্তর টাকার প্রয়োজন ; কিন্তু কথাটা আমি তোমাকে গোপনে বলিয়া রাখি—'সন' নামক দৈনিক পত্রিকার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে। এই পত্রিকার পক্ষ হইতে স্থির করা হইয়াছে, পিটার ট্রেন্‌টনের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত মিস ওলিভিয়া ডেনের সমর্থনের জন্য বিখ্যাত কৌন্সিলী সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবিকে নিযুক্ত করা হইবে। ফৌজদারী মামলা পরিচালনে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ।

জুনি বলিল, 'সন্' কি কারণে মিস্ ওলিভিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবে ? ইহাতে তাহার স্বার্থ কি ?"

ডেভিড বলিল, "ওলিভিয়া ডেনের সহিত ইহার এইরূপ চুক্তি হইয়াছে যে, ওলিভিয়া যদি তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচারে মুক্তিলাভ করে—তাহা হইলে এই ব্যাপারের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ—ইহার আনুপূর্বিক বিবরণ সে একমাত্র 'সন্' পত্রিকায় প্রকাশ করিবে ; অন্য কোন সংবাদপত্রে তাহার তাহা প্রকাশের অধিকার থাকিবে না। বর্ত্তমান কালে সংবাদপত্র-পরিচালনে এইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়।"

সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত ডেভিড গারসাইড তাহার আফিসে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার নামে প্রেরিত একখানি টেলিগ্রাম দেখিতে পাইল। এই সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামে লিখিত ছিল,—

"আমি ওলিভিয়া ডেনের পক্ষ সমর্থন করিতেছি—জন।"

জনের টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া ডেভিড প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া কি চিন্তা করিল। প্রথমে তাহার ধারণা হইল—জন মক্কেল-মহলে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের আশায় এই মামলা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া এই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য উৎসুক হইয়াছেন, নতুবা এই তুচ্ছ সংবাদ ডেভিডকে জানাইবার কি প্রয়োজন ছিল ?

ডেভিড কিছু কাল চিন্তার পর তাহার টাইপ-রাইটারের নিকট বসিয়া যে কথাগুলি টাইপ করিল তাহা এই,—

ট্রেন্‌টন হত্যাকাণ্ডের মামলা—

মিঃ জন গারসাইড আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেন। 'সন্' পত্রিকা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেন্‌টনের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ওলিভিরা ডেনের বিচারকালে মিঃ জন গারগাইড তাহার পক্ষ সমর্থন কারবেন। 'সন' পত্রিকার সম্পাদক ওয়ারবর্টন যে কক্ষে বসিয়া অফিসের কাজকর্ম্ম করিতেন, ডেভিড সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া টাইপ-করা কাগজখানি তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলে সম্পাদক মুখ না তুলিয়াই তাহা দেখিতে লাগিলেন।

উহা নিস্তব্ধ ভাবে পাঠ করিয়া তিনি নীরস স্বরে বলিলেন, "আমাদের কাগজে ইহা ছাপা হইবে না।"

ডেভিড তাঁহার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "সর্ব্বসাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক এরূপ জরুরি বিষয় আমাদের পত্রিকায় প্রকাশের সম্পূর্ণ যোগ্য ; বিশেষতঃ, অন্য কোন সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশ করিতে দেওয়া হইবে না। আমার ভাই ইহা আমার নিকট পাঠাইয়াছে। ইহা কিরূপ মূল্যবান্ সংবাদ, তাহা কি তাহার ধারণা করিবার শক্তি নাই ?"

সম্পাদক বলিলেন, "সে শক্তি তাঁহার আছে। কারণ, এই ভাবে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জনই তাঁহার লক্ষ্য।"

গারসাইড এই মন্তব্যে অত্যন্ত অপমান বোধ করিল, এই সম্পাদক কর্ত্তৃক সে বহু বার নানা ভাবে অপমানিত হইয়াছিল, কিন্তু এই অপমান অসহ্য বলিয়াই তাহার মনে হইল।

গারসাইড সক্রোধে বলিল, "ওয়ারবর্টন, তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বলিও না, এই সংবাদ যে-কোন শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের পক্ষেও কিরূপ মূল্যবান্, তাহা কি তোমার বুঝিবার শক্তি নাই ?"

ডেভিড গারসাইড 'সনের' অন্যতম রিপোর্টার মাত্র, উহার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বজ্ঞান ও সম্মান অনেক অধিক ; ডেভিডের অশিষ্টতায় তিনি বিচলিত হইয়া চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, এবং হাতের নীল পেন্সিলটি ত্যাগ করিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ সংবাদ আমরা কাগজে ছাপিতে পারিব না ; একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া তোমাকে সতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। অভিযুক্তা তরুণীর পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রসিদ্ধ কৌঁশুলী সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবিকে নিযুক্ত করা হইবে, আমরা এইরূপই স্থির করিয়াছি। তবে এই যুবতী বিনাদণ্ডে মুক্তিলাভ করিবে—ইহা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়।"

গারসাইড আর কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষের দ্বারের নিকট অগ্রসর হইল, তাহার পর পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "তুমি এই সংবাদ প্রকাশ না করিলে আমি চাকরী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তুমি আমার ইস্তফানামা গ্রহণ করিও, আমি অবিলম্বেই তাহা পাঠাইয়া দিব।"

ডেভিডের কথা শুনিয়া ওয়ারবর্টন স্তম্ভিত হইলেন ; নিরুপায় ডেভিড পদত্যাগ করিবে—ইহা তাঁহার কল্পনাতীত ! তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি তোমার কথার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছ ?"

ডেভিড বলিল, "না বুঝিয়া কোন কথা বলিবার অভ্যাস আমার নাই। আমি তোমাকে এরূপ একটি মূল্যবান্ সংবাদ আনিয়া দিলাম—যাহা অন্য কোন সংবাদপত্রের প্রকাশের অধিকার নাই। কিন্তু তুমি উহা প্রকাশে অসম্মত ! উত্তম, আমি উহা অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি ; কিন্তু তোমার মূঢ়তা অমার্জ্জনীয়।"

ডেভিড কাগজখানি লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে ওয়ারবর্টন বলিলেন, "এক মিনিট অপেক্ষা কর। যদি মত-পরিবর্ত্তন করিতে চাও—তাহা হইলে এখনও তাহা করিতে পার ; সে জন্য আধ মিনিট মাত্র সময় দিতে প্রস্তুত আছি।"

ওয়ারবর্টন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ডেভিডকে যাহাই বলুন, তিনি ইহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ওলিভিয়া ডেন তাহার যে রহস্যপূর্ণ কাহিনী 'সন্' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লিখিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া 'সনের' কুড়ি লক্ষ পাঠক আনন্দে ও কৌতূহলে অভিভূত হইবে ; অথচ অন্য কোন সংবাদপত্রের তাহা প্রকাশের অধিকার থাকিবে না। কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকের পক্ষেই এই প্রলোভন উপেক্ষার যোগ্য নহে। ডেভিড কোন্ সাহসে 'সনে'র সম্পাদককে স্পর্দ্ধাভরে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই ; কিন্তু তিনি তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই জন্য তিনি বলিলেন, "হয় তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, না হয় আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।"

ডেভিড দৃঢ় স্বরে বলিল, "উত্তম, আমি তোমাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি ; আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইবার নহে !"

ডেভিড সম্পাদকের আফিস ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল ; পরে সে এই সংবাদ 'অয়ার' (Wire) নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে তাঁহার কাগজে প্রকাশের জন্য প্রদান করিল ; এ জন্য সে এই পত্রিকার নিকট কোন পারিশ্রমিকের দাবী করে নাই। [ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গাছের গায়ে অস্ত্রোপচার

গাছের ব্যাধি সারাইয়া গাছকে দীর্ঘজীবী করিবার শক্তি-সামর্থ্যে মার্কিণ উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞেরা আজ সমৃদ্ধ। ব্যাধির ভারে বড় বড় গাছ
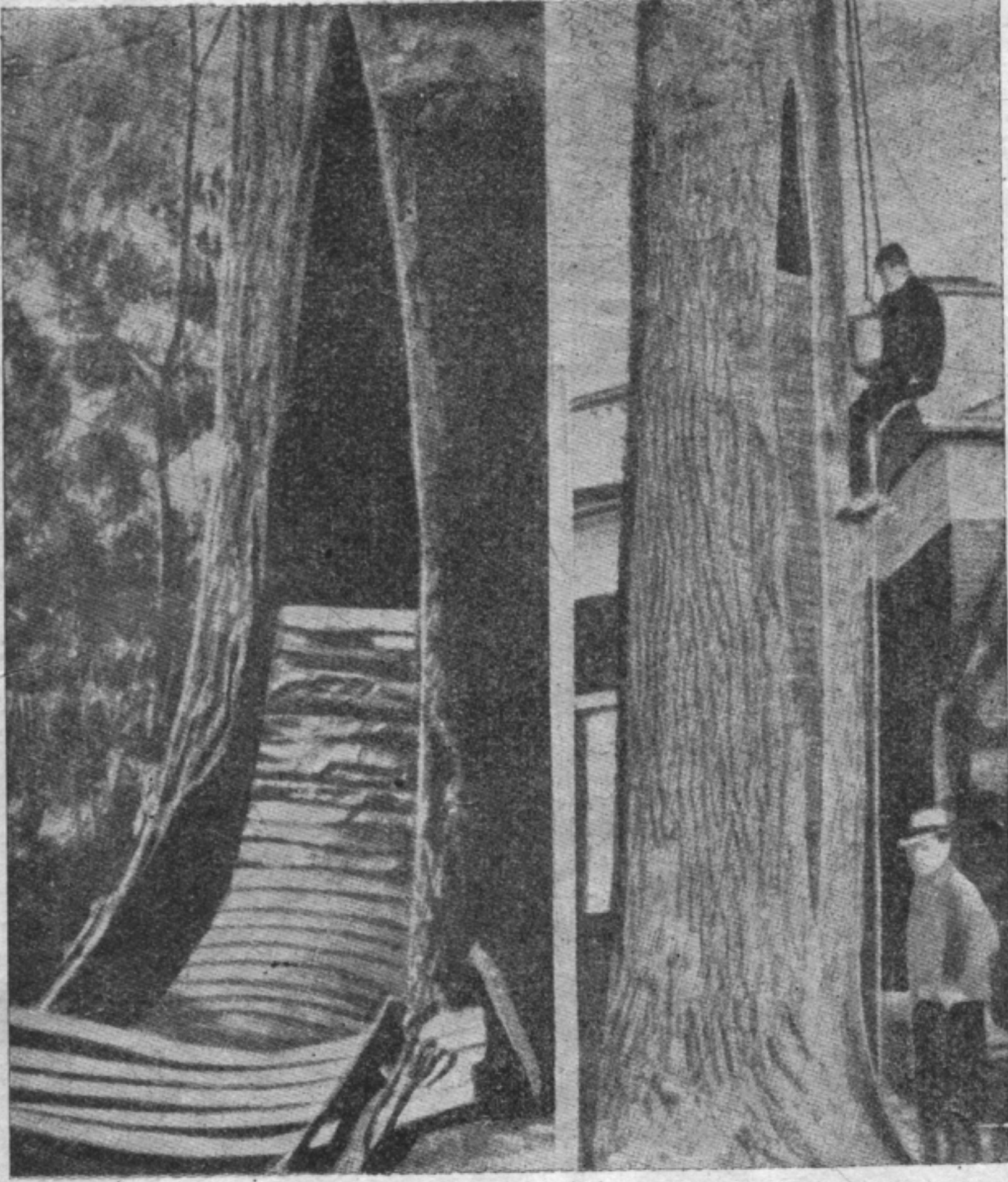
রবারে ভরাট করা

শুকাইয়া ফোঁপরা হইয়া গেলে সমাজের ক্ষতি বড় অল্প হয় না! সেই ক্ষতি-পূরণের জন্য তাঁরা আজ এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ওক এল্‌ম্ প্রভৃতি দামী গাছের গায়ে অস্ত্রোপচার করিয়া তাদের সম্পূর্ণ নীরোগ ও সুস্থ করিয়া তোলা হইতেছে! 'উরগক্ষত অঙ্গুলির' মত তাঁরা গাছের রোগ-দুষ্ট বা জীর্ণ অংশ কাটিয়া চাঁছিয়া ফেলিয়া দিতেছেন; তার পর সেই কাটা চাঁছা অংশ রৌদ্র, বৃষ্টি বা ধূলির স্পর্শে জীর্ণ হইয়া না মরিয়া যায়, এ জন্য ঐ কাটা চাঁছা অংশ তাঁরা রবার দিয়া ভরাট করিতেছেন! গাছের সমস্ত আর্দ্রতা এই রবার শুষিয়া লয়, তার ফলে গাছ নুইয়া বা বাঁকিয়া পড়ে না, 'ছিনা পড়িয়া' খাটো হয় না! রবারের স্থিতিস্থাপকতা-গুণে গাছ বাতাসে হেলিলে-দুলিলে যেমন কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটে না, তেমনি তার বাড়েও এতটুকু বাধা থাকে না! রবার এখন দুষ্প্রাপ্য, তবু ফাটা টিউবের রবার লইয়া আমাদের এ দেশে এখনো বোধ হয় এ ভাবে গাছের পরিচর্য্যা চলিতে পারে।

—

কাঠ মজবুত করা

আমেরিকার মাডিশন ফরেষ্ট ল্যাবরেটরীতে সর্ব্ব-প্রকার কাঠকে মজবুত করিয়া তোলার ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে। এ ব্যবস্থায় কাঠের জান্ প্রায় লোহা-ইস্পাতের মত অজর-অমর হয়। গাছ হইতে সদ্য কাটিয়া আনা ডালপালা ও গুঁড়িকে এই ল্যাবরেটরীতে বিশেষ ভাবে বিরচিত লবণ-দ্রাবকে দু'-এক মাস কাল ভালো করিয়া ভিজাইয়া রাখা হয়। এ ভাবে ভিজাইয়া রাখিবার ফলে কাঠের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লবণ প্রবেশ করে। তার পর কাঠকে শুকাইবার জন্য ইটের পাঁজায় আগুন দিয়া সেই আগুনের তাপে এক সপ্তাহ কাল রাখা হয়।
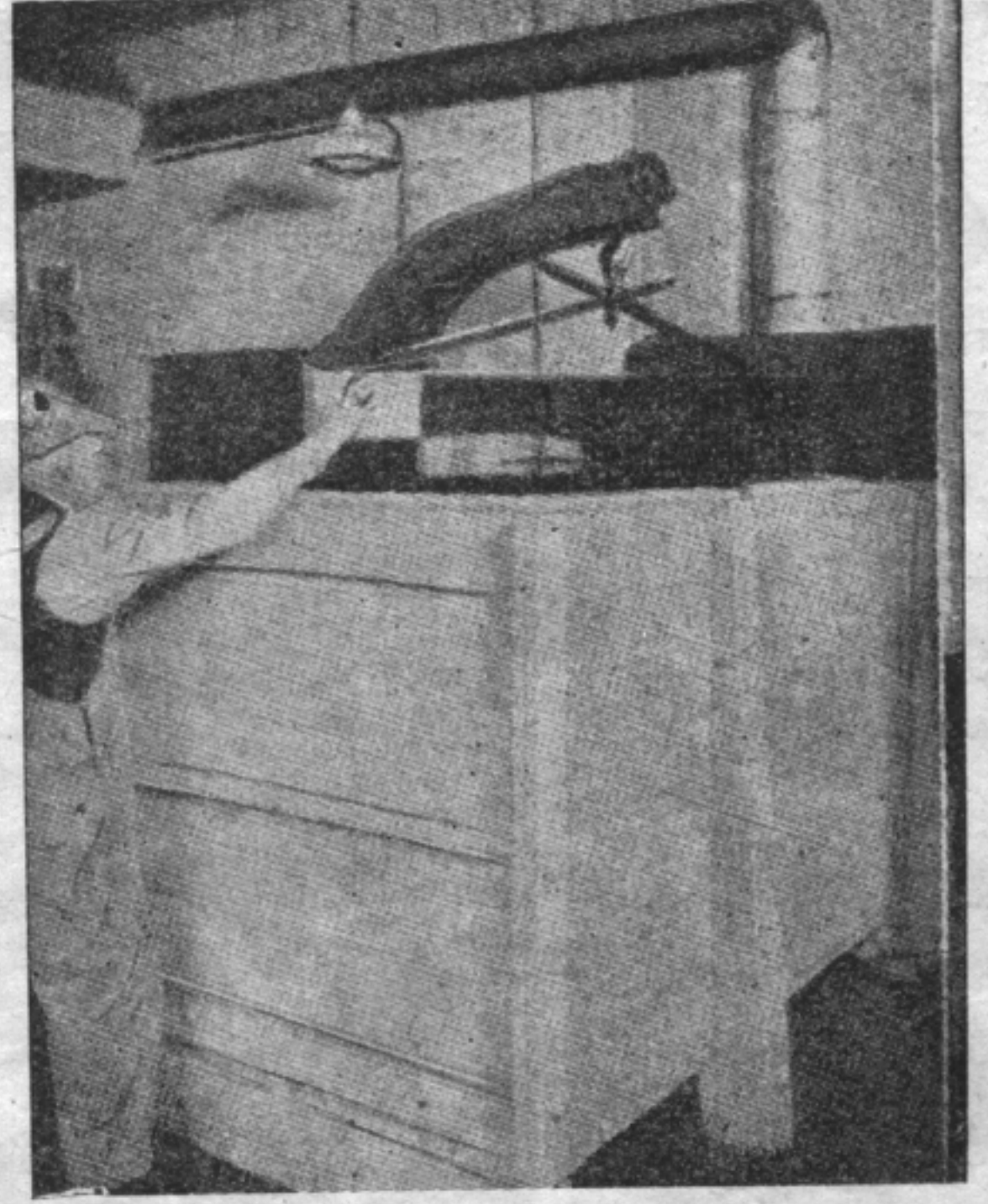
লবণ-দ্রাবকে কাঠ ডুবানো

এই ভাবে তাপ দিবার ফলে ভিতরকার সমস্ত আর্দ্রতা ঝরিয়া কাঠ একেবারে খটখটে শুষ্ক হইয়া ওঠে। এ কাঠ চটিতে জানে না, ফাটিতে জানে না—এমন মজবুত ছাঁদে গড়িয়া ওঠে!

—

পায়ের দস্তানা

পা ঘামে? ভয় নাই! মার্কিণ শিল্পীরা যুদ্ধের এই বিপর্য্যয় কোলাহলের মধ্যেও ঘর্ম্মাক্ত শ্রীচরণের কথা ভোলে নাই!

রাঙা পায়ের সজ্জা

পায়ের জন্য তারা মিহি স্বচ্ছ আর্দ্রতা-নিবারক (ওয়াটার-প্রুফ) দস্তানা তৈয়ারী করিয়াছে। এক-এক প্যাকেটে আট জোড়া করিয়া দস্তানা কিনিতে পাইবেন। পায়ে মোজার পরিবর্ত্তে এই দস্তানা

আঁটিলে পা ঘামিবে না ; পায়ের স্বাস্থ্যও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইবে না। মার্কিণ শিল্পীরা বলিতেছেন, যাঁরা মাছ ধরেন, শীকারে বাহির হন—তাঁরা এবং পুলিশ ও দমকলের কর্ম্মচারীরা এ চরণ-দস্তানা পায়ে আঁটিলে উপকার ও আরাম পাইবেন। রূপসী বিলাসিনীদের চরণে স্থান পাইলে তাঁদের রাঙা চরণযুগলকে আরাম দিয়া দস্তানা কৃতার্থতা লাভ করিবে নিশ্চয় !

—

আগাছার জঙ্গল

"জঙ্গল সাফ করো"—"ফশল ফলাও—আরো ফশল !" এ চীৎকারে আমেরিকা শুধু আকাশ-বাতাস ফাটাইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না ; কথার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যত আগাছার জঙ্গল আছে, কাটিয়া সাফ করিয়া সে সব জঙ্গলাকীর্ণ জমিতে মৈ দিয়া তাহারা চৌরস্ করিতেছে, সে সব জমিকে উর্ব্বর করিয়া তার বুকে ফশলের বীজ বপন করিতেছে। এ সব কাঁটা-বন-জঙ্গল সাফ করিবার জন্য কালিফোর্ণিয়ার শিল্পী উইলিয়াম টুশার যে অতিকায় ট্রাক্টর তৈয়ার করিতেছেন, তার শক্তি অমোঘ। এই একটি ট্রাক্টরে এক দিনে একশো জনের কাজ সম্পন্ন হয়। এক জন মাত্র ব্যক্তি ট্রাক্টর চালনা করে। সামনের দিকে আছে ধারালো দীর্ঘ ব্লেড। সে ব্লেডের স্পর্শে জঙ্গল কাটিয়া নির্ম্মূল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক্টরের বালতিতে তাহা উঠিয়া পড়ে। তার উপর ঝাঁটাইয়া নোড়া-নুড়ি সাফ এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটী দলিয়া চোস্ত করা—সকল কাজই একসঙ্গে নিষ্পন্ন হয়।
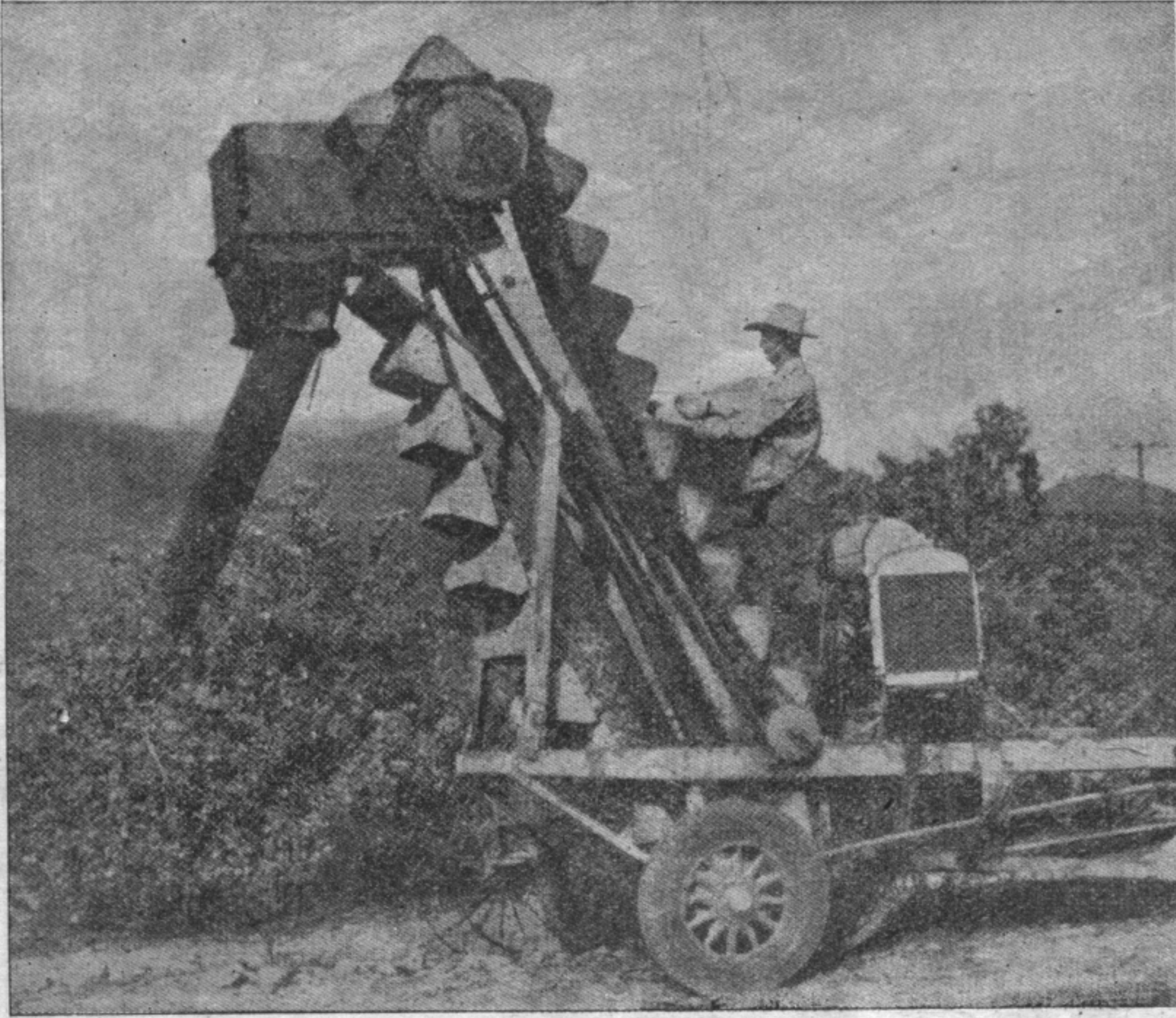
জঙ্গল-সাফ্ ট্রাক্টর

—

বমার-দূত

শত্রুর বমার আসিতেছে কি না, তার পাহারাদারী করিবার জন্য বহু স্ত্রী-পুরুষ প্রহরী নিযুক্ত আছে। এ সব প্রহরীর অঙ্গে যে পোষাক, সে পোষাকে শুধু লজ্জা ও শীতাতপ নিবারণ হয় না—সে পোষাকের জোরে বমারের অস্তিত্ব-নিরূপণ হয়। প্রহরীর মাথায় যে-টুপি, ঐ টুপির সঙ্গে সংলগ্ন আছে শব্দ-যন্ত্র,—দূর-আকাশের গায়ে বমারের আবির্ভাব ঘটিবামাত্র এই শব্দযন্ত্রে তার স্পন্দন আসিয়া লাগে। টুপির সঙ্গে যে শ্রুতিযন্ত্র (earphone) আছে, সে যন্ত্রে স্পষ্ট শুনা যায় দূরাগত বমারের অস্পষ্ট ক্ষীণ রব ! শুনিবামাত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া ঠিক করিয়া লয়, কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে ! শব্দ নিরূপণ হইবামাত্র স্কন্ধে-ঝুলানো টিউবে-সংলগ্ন মাইক-যন্ত্র-মারফৎ প্রহরী সে-বার্ত্তা বেতার-ষ্টেশনে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে 'সাজ-সাজ' রব ওঠে ! প্রহরীর কাছে গ্যাস-মাস্ক প্রভৃতি বর্ম্মাদি থাকে—কাজেই তাহার পক্ষে নিরাপদ থাকা অসম্ভব হয় না !

বমার-দূত

—

বিদ্যুৎ-গতি এঞ্জিন

সুদীর্ঘ রেল-পথকে আমেরিকা আজ একেবারে চকিতে অতিক্রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে ! এ কাজ সিদ্ধ হইয়াছে নব নির্ম্মিত ডিশেল-পাওয়ার এঞ্জিনের জোরে। কলিকাতার পাতিপুকুর হইতে ট্যাক্সি শ্রীপুরে
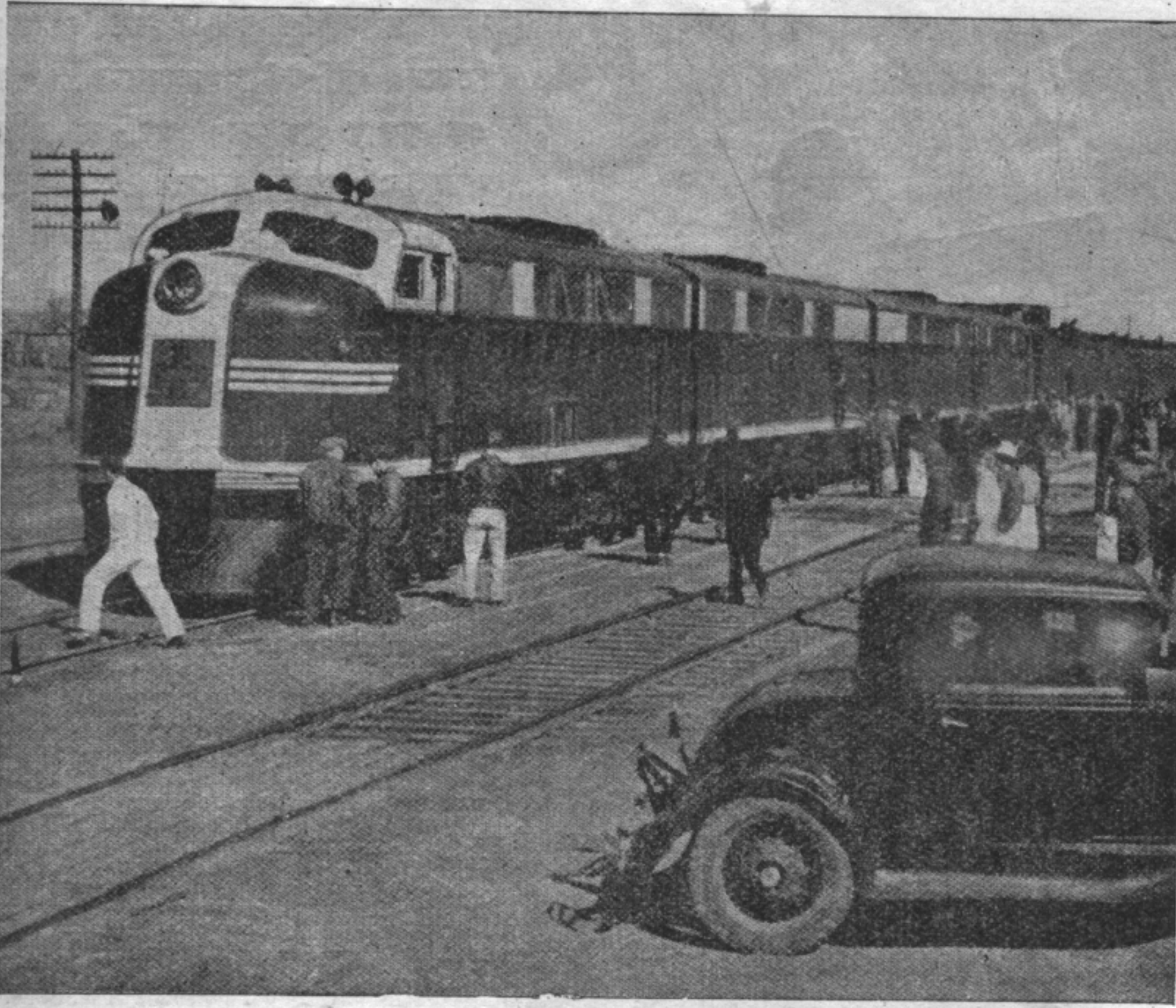
ডিশেল-এঞ্জিনে টানা গাড়ী

মার্টিনের যে রেল-পথ, সে পথেও আজ ডিশেল-পাওয়ার এঞ্জিনে ট্রেণ চলিতেছে; তবে মার্টিনের লাইন সরু, গাড়ী ছোট, তার এঞ্জিনে তেমন অতিকায় শক্তি নাই! আমেরিকার শান্তা ফে রেলোয়ে লাইনে সমতল ও পাহাড়ে-চড়াই-পথ বহিয়া ট্রেণ চলিয়াছে দৈত্য-শক্তিসম্পন্ন অতি-কায় ডিশেল-পাওয়ার এঞ্জিনের জোরে! এ এঞ্জিনের শক্তি ৫৪০০ অশ্ব-শক্তির সমান। এ এঞ্জিনের সঙ্গে ৬৪খানি গাড়ী জোতা থাকে; এবং সেই ৬৪খানি গাড়ীর ভার বহিয়া ডিশেল এঞ্জিন আজ ন'খানি বাষ্পীয় এঞ্জিনের কাজ সম্পাদন করিতেছে। ইহাতে বহু গুণ সময় এবং অর্থ বাঁচিতেছে।

—

খবর্দ্দার!

যুদ্ধে যেমন লড়ায়ে-ফৌজ আছে, তেমনি মার্কিণ রণ-বিভাগে এক দল ফৌজ আছে,—তাদের কাজ শত্রুর আগমনের পথে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এই বাধা রচনায় বৈচিত্র্য আছে। এক রকমের বাধা—কাঁচি-প্যাটার্ণে মোটা গুঁড়ি-বাঁধা দু' ফুট উঁচু বেড়া; তাছাড়া মাটীর নীচে গভীর গহ্বর—গহ্বরের উপরে ডাল-পালার মাচা তৈয়ারী করিয়া সেই মাচার উপরে মাটী সমতল করিয়া রাখা। এ দলে কাফ্রীর সংখ্যা অত্যধিক। শিক্ষার গুণে ইহারা এমন পটুতা লাভ করিয়াছে যে, শত্রু কোন্ পথে আসিতেছে, সংবাদ পাইবামাত্র দু' দেড় ঘণ্টার মধ্যে সে পথের মাঝখানে খানা খুঁড়িয়া গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া এমন বাধা রচিয়া তোলে যে, শত্রুর সাধ্য থাকে না, সে-পথে পা বাড়াইয়া অগ্রসর হইবে। এ দলের শক্তি-চাতুর্য্যে বিপক্ষ বারে-বারে পরাভূত এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদিসমেত জীবন্ত সমাধি লাভ করিয়াছে।

পদে পদে বাধা

—

পদাতিকের অস্ত্র-বল

আজ আকাশ-পথে বমার এবং এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্ট্ কামান বন্দুকের বজ্র-হুঙ্কারে অনেকের হয়তো ধারণা, এ যুদ্ধে পদাতিক

মারণাস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছে। পদাতিকদের এ্যা ন্টি-ট্যাঙ্ক কামানের গোলায় এক হাজার গজ দূরে অবস্থিত অতি-কঠিন বর্ম্ম-শস্ত্রাদি নিমেষে যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, তেমনি ৮১ মিলিমীটার কামানে মিনিটে-মিনিটে যে শেল্ ছোটে, তার মুখে দু'-হাজার গজ দূরস্থিত অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্ম-চর্ম্ম জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়!

এ্যা ন্টি-ট্যাঙ্ক কামান

বমার-বাহিনী

যে-সব ব্রিটিশ ও মার্কিণ বমারু-প্লেন বোমা-বর্ষণে বাহির হয়, সে সব প্লেনের প্রত্যেক টিতে লোক থাকে ন'জন করিয়া। দু'জন রেডিয়ো-ম্যান ও গানার; এক জন বম্বার্ডিয়ার গোলন্দাজ; দু'জন এঞ্জিনিয়ার ও গানার; এক জন পাইলট; এক জন ন্যাভিগেটর বা পরিচালকে; এক জন সহযোগী পাইলট; এবং এক জন পুচ্ছ-গানার। ইনি থাকেন প্লেনের সব পিছনকার আসনে। ইঁহাদিগের প্রত্যেককে এমন ভাবে কার্য্যপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, একের সহায়তা ভিন্ন অপরে যেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন না, তেমনি আবার মিলিত ভাবে কাজ করিতেও কাহারো এতটুকু বাধে না। কাজ ভাগ করা থাকিলেও সকলেই সব কাজে সুনিপুণ। একের অসমর্থতায় অপরে তার কাজের ভার স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করিতে পারে, এমন নিখুঁত সকলের শিক্ষা।

এ কামানে মিনিটে-মিনিটে শেল্ ছোটে

বমারের নব-গ্রহ

ফৌজের কাজ-কর্ম্ম কিছু নাই! সে ধারণা ঠিক নয়। আকাশ-পথে ফৌজ চলিলেও জল-পথে নৌশক্তি এবং স্থলপথে পদাতিকের বল-বৃদ্ধি এবং এ দুই শক্তিকে দুর্দ্ধর্ষ করিতে আমেরিকা এতটুকু ঔদাস্য রাখে নাই! পদাতিক দলকে নূতন নূতন এ্যা ন্টি-ট্যাঙ্ক কামান এবং বিবিধ মেশিন্-গান্ ও

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

দেহ-বন্ধ

মেয়েদের রূপশ্রী বা সৌন্দর্য্য গায়ের ফর্শা রঙে নয়—সৌন্দর্য্য নির্ভর করে দেহের সুকুমার বাঁধ-ছাঁদের উপর। দেহের বাঁধ-ছাঁদ বলিতে বুঝায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণ গঠন.।

বিধাতা আমাদের সুন্দর করিয়া গড়িয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন—নিসর্গ-বিধি মানিয়া চলিলে আমাদের গঠনের সে সুকুমার ছাঁদে বৈলক্ষণ্য ঘটিবার কথা নয়! কিন্তু সুশ্রী সুন্দর দেখাইবে বলিয়া কেহ লন নানা রকম কৃত্রিমতার আশ্রয়, কেহ আবার বিধাতার দেওয়া সৌন্দর্য্য-সুষমার দাম না বুঝিয়া দেহের গঠন সম্বন্ধে অলস, উদাস বা নির্লিপ্ত থাকেন। তাহার ফলে আমাদের দেহের গঠনে এত রকমের বিকৃতি ঘটে।

রূপ, সৌন্দর্য্য-সুষমা—কে না চায়? সে জন্য মুখ এবং গায়ের চামড়া ঘষা-মাজা করিয়া কিম্বা তার উপর নানা রকম রঙের প্রলেপ লাগাইয়াই আমরা দায়ে খালাশ হই! তার ফলে কিন্তু নিজেদের আরো কদর্য্য এবং অসুস্থ করিয়া তুলি! এ কথা বুঝি না যে, beauty is more than skin deep—অর্থাৎ ফর্শা রঙে কাহারো সুষমা-শ্রী খোলে না। দেহের পেশী, হৃদ্‌যন্ত্র, লিভার, ফুশ্‌ফুশ্‌ এবং রক্ত—এ-সবের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উপরই সৌন্দর্য্যের বিকাশ! নিত্যদিন মুখে ক্রীম বা পাউডার মাখিলে সৌন্দর্য্য সুষমাকে পাওয়া যাইবে না; সৌন্দর্য্য-সুষমা পাইবেন ভালো স্বাস্থ্যে, নিয়মিত ও সংযত আচার-অভ্যাসে। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত পুষ্টিকর আহার, নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশ্রাম ও নিদ্রা, মুক্ত আলো-বাতাসে থাকা বা বেড়ানো—তাছাড়া দুশ্চিন্তা ও কুচিন্তাকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলা। তা যদি পারেন, আপনার দেহে যৌবন এবং সৌন্দর্য্য-সুষমা চিরদিন অটুট থাকিবে।

অনেকের ধারণা, সন্তানের জননী হইলেই দেহের লাবণ্য এবং গঠনের সুষমা-ছাঁদ নষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নিয়মিত ভাবে যদি ব্যায়াম-সাধনা এবং স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া চলেন, তাহা হইলে বয়স যতই বাড়ুক, মুখে কোঁচ পড়িবে না, গায়ের চামড়া লোল, গলা দো-ভাঁজ হইবে না! চোখের কোণে কালি পড়া, দেহে মেদ জমা, মাথার চুল ওঠা বা অকালে পাকিয়া যাওয়া—এ-সব উপসর্গ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাময় রাখিতে পারিবেন।

এক জন সৌন্দর্য্য-তত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন—জন্মক্ষণেই সুস্থ শিশুর পানে চাহিয়া দেখুন, তার ঐ ননীর মত কোমল অঙ্গ, বর্ণে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্পষ্ট রেখা—শিশুকে কি সৌন্দর্য্য-সুষমাতেই না ভরিয়া রাখে! অঙ্গের এই কোমলতা ও কান্তি, চামড়ার এই স্বচ্ছ মসৃণতা—বয়স বাড়িবার সঙ্গে এ-সবে যে বঞ্চিত হইতে হয়, তার কারণ শুধু সভ্য সমাজের গড়া কৃত্রিম আচার-রীতির দাস্য!

খাওয়া-পরা চলা-ফেরা বসা-দাঁড়ানো—প্রতি কাজে আমরা নিসর্গ-বিধি ত্যাগ করিয়া নকল বিধি শিরোধার্য্য করি। হিম-রৌদ্র-ধূলা হইতে আমাদের অঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্য দেহের উপর আবরণ বা আচ্ছাদন চাই, সত্য। কিন্তু এই আবরণ বা আচ্ছাদন রচনা করিতে যদি স্বাস্থ্যের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া জাঁক-জমকের দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহা হইলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যই শুধু নষ্ট হইবে না, তার স্বাভাবিক গঠনেও আমরা বহু বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া তুলিব। ব্যায়ামে বা নড়াচড়ায় আমাদের দেহের সকল পেশী সুস্থ; দেহের রক্তচলাচল-ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ব্যায়ামে এবং নড়া-চড়ার কাজে যদি আমরা বিধি-নিয়ম মানিয়া চলিতে পারি, তাহা হইলে বয়স বাড়ার সঙ্গে আমাদের গলা হাত মুখ বেছাঁদে পরিণত হইতে পারিবে না; গায়ের চামড়াতেও কদর্য্যতার ছোঁয়াচ লাগিবে না! দেহের স্বাস্থ্য ভালো থাকে পরিচ্ছন্নতায়, দেহে রক্ত-চলাচল-ক্রিয়ার সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে, অনলস ব্যায়াম-সাধনায় এবং দেহ-যন্ত্রে তৈল-প্রয়োগে!
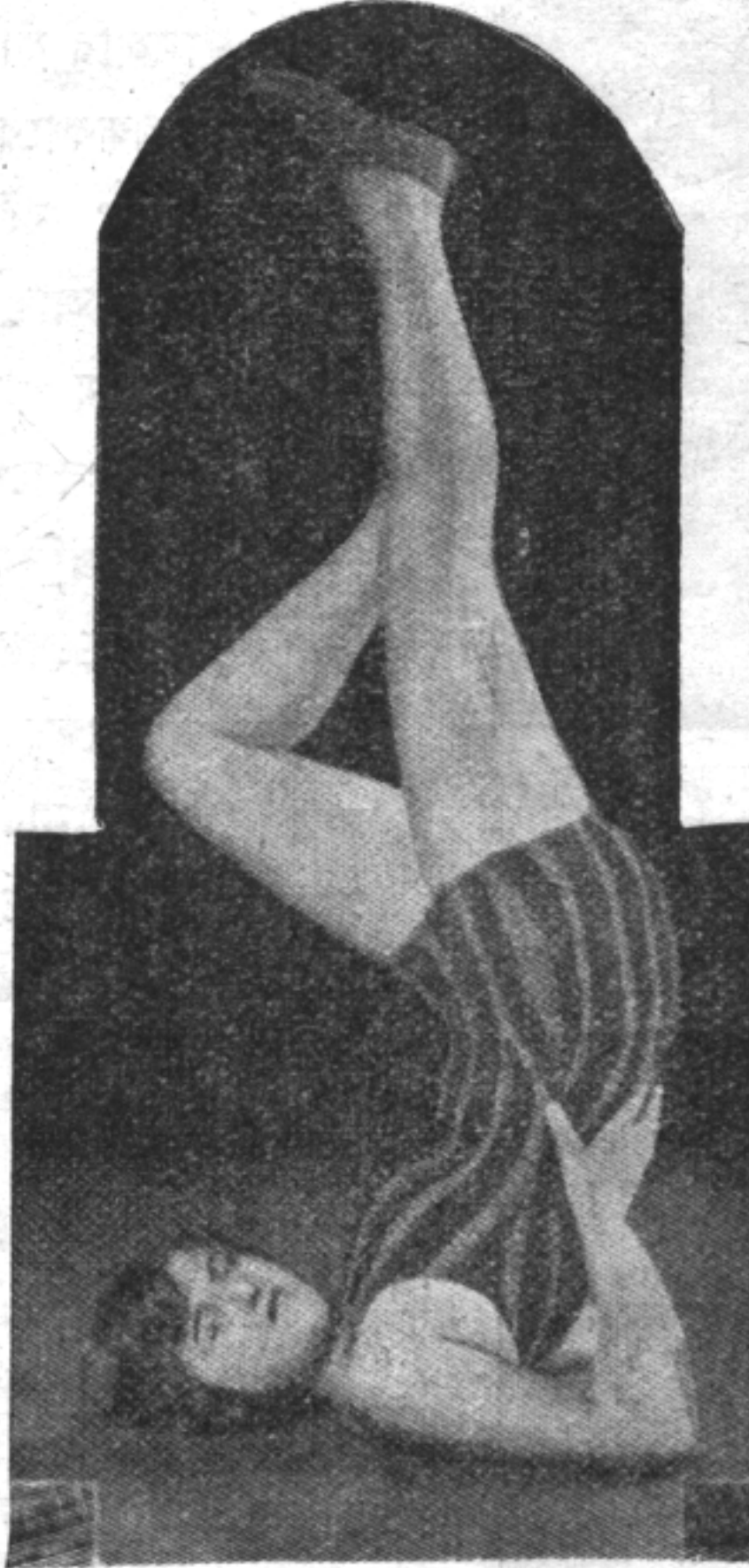
১। বাইসিক্‌ল্ চালাইবার ভঙ্গীতে

২। ডান হাত নীচে, বাঁ হাত উৰ্দ্ধে

দেহযন্ত্রে তৈল-প্রয়োগ কি, সে কথা বারান্তরে বলিব। আজ অনলস ব্যায়াম-সাধনার কথা বলিতেছি।

১। চিৎ হইয়া শুইয়া দুই পা উর্দ্ধে তুলুন। এবার দুই হাত দিয়া কোমরের দু'দিক বেশ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ১ নং ছবির মত দুই পা নাড়িতে থাকুন বাইসিকেল চালাইবার ভঙ্গীতে। যখন বাঁ পা মুড়িবেন, ডান পা তখন থাকিবে সিধা উর্দ্ধে প্রসারিত; আবার ডান পা মুড়িবার সময় বাঁ পা থাকিবে সিধা উর্দ্ধে প্রসারিত। দু' পা এমনি ভাবে বেশ দ্রুত-তালে নাড়িতে হইবে—প্রায় আট-দশ মিনিট।

২। এবার সিধা হইয়া দাঁড়ান। দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবেন (২ নং ছবি দেখুন)। ঐ ২ নং ছবির মত ডান হাত

নীচের দিকে প্রসারিত করিয়া হাতের আঙুল দিয়া মেঝে স্পর্শ করুন —বাঁ হাত থাকিবে সিধা ঊর্দ্ধ দিকে প্রসারিত। মুখ সামনের দিকে ফিরাইতে হইবে। তার পর বাঁ হাত নামাইবেন এবং ডান হাত তুলিবেন; এবার মুখ ফিরাইতে হইবে পিছন দিকে। বেশ দ্রুততালে দুই হাত এমনি ভাবে উঠাইতে-নামাইতে হইবে, এ ব্যায়াম করিবেন দশ মিনিট।

৩। এবার পায়ে-পায়ে মিলাইয়া সিধা খাড়া দাঁড়ান—দুই হাত দু' পাশে ঝুলানো থাকিবে। এবার ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত যত-খানি সম্ভব উর্দ্ধে প্রসারিত করুন; সঙ্গে সঙ্গে বুক চিতাইয়া মাথা পিছন দিকে হেলাইবেন। তার পর সবেগে হাত নামাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও সিধা ভাবে খাড়া রাখিবেন। দুই হাত নামানোর সময় বুক চিতাইয়া রাখিবেন না—বুক থাকিবে স্বাভাবিক সিধা ভাবে। তার পর দু' হাত তুলুন—বুক চিতাইয়া মাথা পিছন দিকে হেলান্। এ ব্যায়াম অন্ততঃ পাঁচ মিনিট করা চাই।

৩। দু'হাত যত দূর সম্ভব উর্দ্ধে

৪। দু' পায়ে মিলাইয়া সিধা খাড়া দাঁড়ান! এবার ৪নং ছবির ভঙ্গীতে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সামনের দিকে নোয়াইয়া অর্থাৎ ঝুঁকিয়া দুই হাত দিয়া দু' পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। করিয়া এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত গুণুন। তার পর বেগে দু' হাত উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া সিধা খাড়া দাঁড়ান। সিধা খাড়া দাঁড়াইবার পর আবার পাঁচ অবধি গণিয়া প্রথম বারের মত কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত নোয়াইয়া দু' হাত দিয়া পায়ের আঙুল ছোঁওয়া চাই। এ ব্যায়ামও বেশ দ্রুতবেগে করা চাই অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ মিনিট।

৪। সাম্‌নে ঝুঁকিয়া

এ কয়টি বিধি-পালনে দেহের ছাঁদ সুকুমার হইবে এবং স্বাস্থ্য থাকিবে সর্ব্ব দিক দিয়া অটুট, মজবুত্!

ঘর-কর্ণার কথা

শীতের পরে গরম জামা-কাপড় শাল-আলোয়ান-লেপ—এ সব আমরা তুলে রাখি। তুলে রাখবার সময় যদি বিশেষ কতকগুলো বিধি না মানি, তাহলে পোকা-মাকড়ের আক্রমণে সে-সব নিরাপদ থাকবে না।

বাড়ী-ঘর যতই পরিষ্কার রাখি না কেন, কাপড়ের পোকা বা বইয়ের পোকার আক্রমণ থেকে বাড়ী-ঘর নিরাপদ রাখা প্রায় অসম্ভব। অন্ধকার কোণে প্রায়-অদৃশ্য দেহে তারা এমন ভাবে আত্মগোপন করে থাকে যে, খালি চোখে তাদের দর্শন মেলে না! এ সব দুষ্ট পোকা-মাকড় কোথায় থাকে, জানেন? দেওয়ালের বা দরজা-জানলার ফাটলে, টেবিল-চেয়ার ও আলমারি-বাক্সের পিছনে। রাত্রির অন্ধকারে গোপন-আস্তানা থেকে বেরিয়ে এরা জামা-কাপড় এবং বইয়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে আসে; আশ্রয় নিয়ে ধ্বংস-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। এ সব পোকা-মাকড়ের এক-একটিতে ডিম পাড়ে প্রায় একশো! পশমী কাপড়, লেপ-তোষক, গদি, র‍্যাগ, কার্পেট, সতরঞ্চি, সোফার কাপড়, গরম পোষাক —এ সব জিনিষ হলো এই সব পোকা-মাকড়ের ডিম পাড়বার এবং সে ডিমের লালন-পরিচর্য্যার পক্ষে নিরাপদ আস্তানা! এ জন্য আমাদের উচিত, মাসে এক দিন করে' বাড়ীর সমস্ত র‍্যাগ-কার্পেট, বিছানা, পোষাক-পরিচ্ছদ, সোফা-কৌচ ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে সাফ করা—ঝেড়ে সাফ করে সেগুলিকে রোদে দেওয়া। গরম কাপড়-চোপড় এবং বই—এ সব ঝেড়েঝুড়ে মাসে একবার করে' যদি রোদে দেন, তাহলে পোকা-মাকড়ের হাত থেকে সেগুলি নিরাপদ থাকবে।

শীতের শেষে গরম কাপড়-চোপড় যখন তুলে রাখবেন, তখন সেগুলি যে ক্ষেত্রে সম্ভব কাচিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে তবে আলমারিতে বা ট্রাঙ্কে তুলবেন। যেখানে কাচা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে ব্রাশ দিয়ে ধুলা-ময়লা ঝেড়ে রোদে দিয়ে তার পর তুলবেন! ময়লা কাপড়-চোপড়ে চট্ করে পোকা ধরে। তুলে রাখবার সময় কাপড়-চোপড়ের ভাঁজে ভাঁজে কিছু ন্যাপথিলিন রাখবেন। ন্যাপথিলিনের গন্ধ অনেকের বিশ্রী লাগে—তাঁরা ন্যাপথিলিনের বদলে রাখবেন প্যারাডাইক্লোরোবেন্‌জিন। এ জিনিষের দাম একটু বেশী। তবে ন্যাপথিলিন প্রভৃতি দিলেও জানবেন যত দিন এদের গন্ধ থাকবে উগ্র, তত দিনই তাতে পোকা-মাকড়ের ধ্বংস অনিবার্য্য। গন্ধ উবে গেলে পোকা-মাকড়কে ঠেকিয়ে রাখবার সামর্থ্যও এদের সেই সঙ্গে চলে যাবে।

কোনো কাপড়-চোপড় এলো রাখবেন না। ছোট যে-সব জিনিষ, অর্থাৎ মোজা, দস্তানা, কম্ফর্টার, ছেলেমেয়েদের ফ্রক, পেনি, গেঞ্জি—এগুলি রাখবেন ষ্টীল-ট্রাঙ্কে; কাঠের বাক্সে নয়; এবং রাখবেন বেশ টাইট্ করে পুঁটলিতে বেঁধে। পুঁটলি যে বাঁধবেন

—ময়লা কাপড়ে নয়, ধোপদোস্ত কাপড়ে বাঁধবেন। গরম স্যুট, কোট, ওভার-কোট—এ সব জিনিষ প্রথমে বড় কাগজের প্যাকেটে টাইট করে বেঁধে তার পর পুঁটলি-জাত করবেন। মোদ্দা ন্যাপথিলিন দিতে ভুলবেন না। কাগজের প্যাকেটগুলি আঠা-মাখানো ফিতে দিয়ে শীল্ করে দেবেন—কোথাও ফাঁক না থাকে! এ সব জিনিষ প্যাক্ করার জন্য খপরের কাগজ উপযোগী। কারণ, ছাপার কালির গন্ধ এ-সব পোকা-মাকড়ের যম! আলমারির এবং তোরঙ্গর মধ্যে তামাক-পাতা রাখতে পারেন—তামাকের গন্ধে এ সব পোকা-মাকড় এক নিমেষ বাঁচতে পারে না। আলমারিতে রাখবার আগে আলমারির কাঠে ফাঁক বা ফাটল আছে কি না দেখবেন। থাকলে কাঠের পটি মেরে সে ফাটল বা ফাঁক বেমালুম বুজিয়ে দিতে হবে। কাঠের আলমারিতে বা বাক্সে ফাঁক এবং ফাটল থাকলে জামা-কাপড় রাখবার জন্য তা নিরাপদ হতে পারে না, এ কথা ভালো করে মনে রাখবেন।

জামা-কাপড়, র‍্যাগ-কার্পেটে পোকা-মাকড় বাসা বাঁধলে বুঝবেন ডিমও তারা পেড়েছে অজস্র এবং সে সব ডিম ফুটলে র‍্যাগ-কার্পেট নষ্ট হবে! পোকা-মাকড় ধ্বংস করে র‍্যাগ-কার্পেট প্রভৃতি বাঁচাবার উপায় হলো কড়া ব্রাশ বা ঝাঁটা দিয়ে জোরে জোরে সেগুলি ঝেড়ে নেওয়া; তার পর এ্যামোনিয়ায় ব্রাশ ডুবিয়ে কীট-আক্রান্ত র‍্যাগ-কার্পেট প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গ ধুয়ে মুছে নেওয়া। তার পর রৌদ্রে মেলে দিয়ে মোটা লাঠি দিয়ে সেগুলিকে সজোরে পিটতে হবে।

এখন ন্যাপথিলিনের দাম এত বেশী যে, সকলের পক্ষে তা সংগ্রহ করা কঠিন। ন্যাপথিলিনের বদলে কিছু কালো-জিরা ছড়িয়ে দিলেও জামা-কাপড় প্রভৃতি পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারবেন।

আমাদের দেশের শালওয়ালারা বলে, শাল-আলোয়ান তুলে রাখবার সময় সেগুলি ভাঁজ করে নতুন মল্মল্-কাপড়ে পুটলি বেঁধে তুলে রাখলে তাতে পোকা-মাকড় আস্তানা পাততে পারবে না। এমন ভাবে প্যাক করা চাই, যেন তার কোথাও একটু ফাঁক না থাকে।

সোফা-কৌচে পোকা হলে তখনি সোফা-কৌচের মিস্ত্রী ডাকিয়ে এনে পরিচর্য্যা করবেন—না হলে সোফা-কৌচকে রক্ষা করা দায় হবে।

তেরশ' পঞ্চাশ সাল

মহাকাল বর্ষচক্রে খুলে দিল ধরণীতে দ্বার—
এল ঐ তের শত পঞ্চাশ এবার।
পিছনেতে কত বর্ষ উল্লাসেতে দুঃখে হেসে কেঁদে
পড়ে রয় তপ্ত ধূলিতলে,
তারি কঙ্কালের 'পরে বজ্র-করে অশ্বে কশা বাঁধি,
মানুষের মহাপাপে দুই চোখে রোষে অগ্নি জ্বলে,
তেরশ' পঞ্চাশ এল গর্জ্জি' বারে বার;
অট্টহাসি হেসে কাল নিজ হস্তে খুলে দিল দ্বার।
সহে না একটু ত্বরা হুঙ্কারিয়া ডাকে বারে-বারে,
—পাপমগ্ন নর-নারী যাত্রা-পথে হুঁশিয়ার!
কিম্বা আজি খাড়া হও মৃত্যু বরিবারে!
সহস্র বৎসর ধরি' জমিয়াছে পাপের পাহাড়,
মহাকাল আছে সাক্ষী তার।
মিথ্যা কথা, হিংসা আর প্রতারণা ভ্রাতায়-ভ্রাতায়,
আত্মসুখে পরদ্বেষে এই বসুধায়
স্নিগ্ধ মাটি তপ্ত হলো প্রতিদিন প্রকাশ্যে-গোপনে,
রক্তভরা কল্লোলিত তার ইতিহাস টগবগ করে সদা মনে।
কত না লজ্জার বাণী গুপ্ত হয়ে কাঁদে নিশিদিন,
সেই সব পাপ দিয়া বাজাইয়া বীণ,
উল্লাসে নাচিয়া চলে ভদ্রবেশী বর্ব্বরের দল,
ধনিকের বণিকের পাপে বিশ্ব করে টলমল,—
গির্জ্জায় মন্দিরে মঠে পণ্যশালে প্রাসাদের তলে,
নিত্য নাচি পাপস্রোত চলে।
ধরিত্রী বহিতে আর পারে নাকো এ পাপের ভার—
তাই আজি মহাকাল অট্টহাসি হেসে

সেই বর্ষ-দ্বার দিয়া তেরশ' পঞ্চাশ এল
যুগান্তের সে যে মহাদূত,
সম্মুখে প্রলয় তার, পশ্চাতে সৃষ্টির জ্যোতি—
হাহাকার আর্ত্তনাদ দুইটি নকীব ফুকারিছে সঙ্গে অদ্ভুত।
মানবের নবজন্ম মরণের মহাসন্ধি আজি,
পঞ্চাশী বৈশাখ সাথে এল তাই দুর্ভিক্ষ মড়ক,
লোল জিহ্বা করে লক্লক্!
অগ্রসঙ্গী মহারণ রক্ত দিয়া ধৌত করে দ্বার,
গর্জ্জিতেছে অনশন ঊর্দ্ধে-নিম্নে হাঁকে দৈবরোষ,
রক্ষা নাই, রক্ষা নাই আর!
চারি দিকে ঘিরে তার আধিব্যাধি দৈন্য মহামারী
হুঙ্কারিছে সর্ব্বনাশা ভয়,
সকল নিগ্রহ আর সমস্যার রুদ্র সমাধান—
তারি অগ্নিকুণ্ডে দহি হইবে নিশ্চয়।
তার পর?—পড়ে' রবে দগ্ধ কোটি নরের কঙ্কাল—
স্তূপাকার ভস্ম-অবশেষ!
সেই মহাভস্ম 'পরে বিশ্বে যারা মহা-ভাগবত,
তাহারা বাজাবে বীণ,
তাহারা রচিবে পুনঃ ধরণী নবীন,
গঠিবে নূতন করি নর-নারী নব পুণ্যদেশ।
এস তবে নমো নমো তেরশ' পঞ্চাশ সাল,
ধ্বংসের কুঠার দিয়া ভাঙ্গি এই পাপ-রাজ্য রুদ্র আশীর্ব্বাদে
ভাবী পুণ্য ধরণীর পথ তুমি করো এসে সুরু!
হে রুদ্র, বিরাট ঘায়ে সাফ্ করো সকল জঞ্জাল—
সেই পথে আসিবেন ত্রাণ-বার্ত্তা নিয়ে ত্রাণগুরু!

পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখ

গত বৎসর বড়দিনের সময় কলিকাতার বিভিন্ন অংশে বোমা পড়িলে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় অনেকেই কলিকাতা-ত্যাগের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে কলিকাতা-বাস আদৌ নিরাপদ নহে মনে করিয়া বৈবাহিক-মহাশয় তাঁহার কন্যা ও নাতিনীগুলিকে নিরাপদ পল্লীভবনে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কোন আত্মীয়কে আমার বাসায় পাঠাইলে পরিবারবর্গকে আমি তাহার সঙ্গে পাঠাইতে প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু তাহাদিগকে দূরে পাঠাইয়া অন্তিম কালে জীর্ণ দেহে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে একাকী কলিকাতায় বাস করিতে আমার সাহস হইল না, সুতরাং আমাকেও অগত্যা তাহাদের সহগামী হইতে হইল।

গন্তব্য-স্থান রাণাঘাট। রাণাঘাটে যাইবার জন্য যে ট্রেণে উঠিয়াছিলাম, বিভিন্ন ষ্টেশন হইতে বহু যাত্রী সংগ্রহ করিয়া এক ঘণ্টারও অধিক কাল পরে তাহা নৈহাটি ষ্টেশনে পৌঁছিলে শুনিলাম উহা কাঁচড়াপাড়া হইতে শিয়ালদহে ফিরিবে, রাণাঘাটে যাইবে না! অগত্যা আমাদিগকে সেখানে নামিয়া রাণাঘাটগামী ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতে হইবে! কিন্তু কখন সেই ট্রেণ আসিবে, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না! সুতরাং কাঁচড়াপাড়ায় নামিলে রাত্রিকালে বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় আমরা নৈহাটি ষ্টেশনেই নামিয়া পড়িলাম এবং এক মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত কোন আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় লইয়া তাঁহার অতিথি হইলাম।

তার পর ট্রেণের সংবাদ পাইবামাত্র ষ্টেশনে আসিলাম! আসিয়া দেখি, কোন কামরায় স্থান নাই—অবশেষে একখানি কামরায় একটু ফাঁক দেখিয়া সকলে সেখানে উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু বসিবার স্থান পাইলাম না। উহা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী। গাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার, একটি আলোও জ্বলিতে দেখিলাম না। রাত্রিকালে ট্রেণের কোন গাড়ীতে আলো নাই, পূর্ব্বে কোনও দিন এরূপ দেখিতে পাই নাই! মিতব্যয়িতার নিখুঁত দৃষ্টান্ত!

যাহা হউক, ঘণ্টাখানেক পরে রাণাঘাট ষ্টেশনে নামিয়া আমাদের চক্ষু স্থির! প্ল্যাটফর্ম্মে এবং ষ্টেশনের ভিতরে ও বাহিরে যেন জন-সমুদ্র! শুনিলাম, বহু লোক কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে পায়ে হাঁটিয়া রাণাঘাট ষ্টেশনে আসিয়াছে; এখানে ট্রেণে চাপিয়া তাহারা পূর্ব্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গে তাহাদের গন্তব্য স্থানে যাইবে বলিয়া ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু অনেকে দুই-তিন দিনের চেষ্টাতেও গন্তব্য স্থানের টিকিট সংগ্রহ করিতে পারে নাই! ট্রেণে স্থান ছিল না, এ জন্য অনেকেই দীর্ঘকাল অনাহারে সেখানে পড়িয়া ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্য অনেকে একটু দুধও সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

আমরা বহু কষ্টে সেই জনতা ভেদ করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলাম। এই ষ্টেশনেও কুলির অভাব; এ জন্য সুটকেসগুলি ট্রেণ হইতে নামাইয়া ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিতে আড়াই টাকা কুলি-ভাড়া দিতে হইল। শুনিলাম, কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ট্রেণে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারায় কলিকাতায় বাস ভাড়া করিয়া সপরিবারে রাণাঘাটে আসিয়াছেন, এ জন্য তাঁহাদিগকে পঞ্চাশ-ষাট টাকা বাসের ভাড়া দিতে হইয়াছে। রেলের ও বিভিন্ন কারখানার অনেক কুলি-মজুর প্রাণভয়ে তাহাদের সকল সম্বল—এমন কি গো-মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক কুলির স্কন্ধে সদ্যঃপ্রসূত গো-বৎস দেখিলাম। অনেকের গো-শকটে মাটীর হাঁড়ী চালের জালা হইতে ঢেঁকি খাটিয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থালীর সকল দ্রব্য স্তূপীকৃত! সারি সারি বলদ, তাহাদের পিঠের দুই দিকে প্রসারিত কুলিদের মাল-বোঝাই বস্তা। কুলিদের মাথায় জ্বালানী কাঠের বোঝা, কাঁধে বোঁচকা।

রাণাঘাটে আসিয়া যে গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, সেটি চূর্ণী নদীর ফেরি-ঘাটের অদূরে অবস্থিত। নদীতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত ঐ পথটির নাম "ফেরি ফণ্ড রোড।"

এই ফেরি ফণ্ড রোডের পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকার খোলা বারান্দায় বসিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় যান-বাহন ও গো-মহিষাদির গমনাগমন লক্ষ্য করিতাম। অদূরবর্ত্তী খেয়া-ঘাটে প্রত্যহ অসংখ্য গাড়ী, ঘোড়া ও গো-মহিষাদি পার হইয়া থাকে। শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার ইহাই প্রধান পথ। এই পথের ধারে ঘোড়ার গাড়ীর কয়েকটি আস্তাবল আছে, কিন্তু কোচম্যানের দল বিভিন্ন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করে। তাহারা প্রভাতে নদীপার হইয়া অপর-পারে পথের ধারে শিকারের প্রতীক্ষা করে এবং অদূরবর্ত্তী বিভিন্ন পল্লীগ্রাম হইতে যে সকল ফল-মূল ও তরি-তরকারী স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের জন্য আনীত হয়, তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহারা ঝোড়া বা বস্তাসহ স্ব স্ব আস্তানায় লইয়া যায়, এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া কলিকাতায় রপ্তানী করে। এ জন্য স্থানীয় বাজারে ঐ সকল দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য। প্রত্যহ প্রভাতে দেখিতাম—তাহারা উচ্ছে, কাঁচকলা, বেগুন, পটোল, শিম, লাল আলু, কুল, মূলা, পেঁয়াজ, পালংশাক, পুঁইশাক, শশা, কুমড়া প্রভৃতি নানা প্রকার ফলমূল তরকারী বস্তাবন্দী করিয়া তাহার উপর বালতি-বালতি জল ঢালিত। এই জন্যই সেগুলি শীঘ্র শুকাইয়া নীরস হইত না। তাহারা যে সকল কুল আমদানী করিত, তাহাদের অধিকাংশ অপক্ব সবুজ বর্ণ; কলিকাতার বাজারে উহা সুপক্ব বলিয়া বিক্রয়ের জন্য চটে ঢালিয়া দুই-এক দিন রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তাবন্দী করা হইত; বস্তার সমস্ত কুল পাকিয়া লাল হইত। কলিকাতার ক্রেতারা মনে করিত, উহা গাছ-পাকা কুল। পরিপুষ্ট নোনা-আতাগুলিও এই ভাবে দুই-তিন দিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইলে তাহাতে রঙ্গ ধরিত এবং একটু নরম হইত; তখন তাহাদের বোঁটার কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিলে মনে হইত, অর্দ্ধ-পক্ব নোনাগুলি গাছ হইতে পাড়িয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল বেল এই ভাবে কলিকাতায় রপ্তানী হয়, তাহা গাছ-পাকা বেল—এই ধারণায় সেখানে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু ঐ সকল অপক্ব বেল পাকাইবার জন্য যে কৌশল অবলম্বিত হয়, তাহার মৌলিকতা কৌতূহলোদ্দীপক! ঐ সকল ব্যাপারী চূর্ণী নদীর অপর-পারস্থ পল্লীগ্রামসমূহে গমন করিয়া পরিপুষ্ট বেলগুলি নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে, অর্থাৎ শতকরা এক টাকার অধিক মূল্য দিতে হয় না। তাহারা বেলগুলি পাড়িয়া বস্তাবন্দী করিয়া স্ব স্ব আস্তানায় লইয়া আসে এবং উঠানে একটি বৃহৎ গর্ত্ত কাটিয়া তাহার ভিতর এক রাশি আস্তাওড়ার (দাঁতনের) পাতা রাখে, তাহার পর সেই পাতার উপর বেলগুলি পর-পর সাজাইয়া গর্ত্তের পাশে একটি মাটীর হাঁড়ি প্রোথিত করে। সেই হাঁড়ি শুষ্ক কাঠখড়ি দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে

তাহারা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া একটি বাঁশের নলের সাহায্যে হাঁড়ি হইতে উত্থিত ধূমরাশি বেলপূর্ণ গর্ত্তের ভিতর সঞ্চালিত করে। এই ভাবে দীর্ঘকাল ধূমে আচ্ছন্ন থাকায় বেলগুলির সবুজ খোলা লোহিতাভ হয় এবং তাহার ভিতরের শাঁসও কিঞ্চিৎ নরম হইয়া থাকে। অতঃপর বেলগুলি গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া এক দিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে গাছ-পাকা বেল বলিয়াই অনভিজ্ঞ ক্রেতার ধারণা হয়। তাহারা এক একটি বেল চার-পাঁচ পয়সা বা ততোধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া সুপক্ক বেল আস্বাদনের আনন্দ উপভোগ করে। পরিপুষ্ট কাঁচা আমও আস্‌শ্যাওড়ার পাতা দিয়া ঢাকিয়া কয়েক দিন জাগ দিলে গাছপাকা আম বলিয়াই প্রতীতি হয়। গাড়ী গাড়ী কাঁঠালও রৌদ্রোত্তাপে নরম করিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়; পল্লীগ্রামে একটার মূল্য ছয় পয়সা হইলেও কলিকাতায় তাহা ছয় আনায় বিক্রয় হয়, বস্তুতঃ পুষ্টপ্রায় কাঁঠালগুলি এই ভাবেই পাকাইয়া বিক্রয় করা হয়। 'কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইবার' প্রবচনটি সত্য নহে।

কলিকাতার অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য ভেজাল-মিশ্রিত, ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। দুগ্ধে নানা কৌশলে এরূপ ভেজাল মিশাইয়া তাহা বিক্রয় করা হয় যে, দুগ্ধ-পরীক্ষার যন্ত্রেও (ল্যাক্টোমিটারে) তাহা ধরা পড়ে না। কলিকাতায় টাকায় তিন সের দুগ্ধও ভেজাল-বর্জ্জিত নহে। সম্মুখে গাভী দোহন করা হইয়াছে, সে দুগ্ধও 'জলবৎ তরলং'—স্বাদগন্ধ-বিহীন! কিন্তু আমাদের পল্লীগ্রামে দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য হইলেও আট আনায় আড়াই সের দুগ্ধ মুসলমান দুগ্ধ-বিক্রেতার নিকট ক্রয় করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে অল্প জ্বাল দিলেও পুরু চটের মত সর পড়ে; তাহার স্বাদ ও গন্ধ অতুলনীয়। পল্লীগ্রামের বহু স্থানেই পেঁপের গাছ আছে; সেই সকল গাছে সুপক্ক পেঁপের অভাব নাই। সহরবাসী চতুর 'ফড়ে' বা পাইকারের দল সেই সব গ্রামে গমন করিয়া প্রচুর পরিমাণে পাকা পেঁপের বীজ নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে এবং বেণেরা তাহা গোল-মরিচের সহিত মিশাইয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে। আমরা যে গোলমরিচ রন্ধন-কার্য্যে ব্যবহার করি—তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পাকা-পেঁপের বীজ!

কলিকাতার উৎকৃষ্ট মাখনে পাকা কলা ও সুসিদ্ধ আলু মিশাইয়া ভেজাল দেওয়া হইত। এখন আলুর মূল্য চড়া, পাকা কলাও দুর্ম্মূল্য; পাকা কলা ও আলু ছাড়া দোমালা নারিকেলের নরম শাঁস, ভিজা আতপ চাউল ও কাঁচা কলাইয়ের খোসাবিহীন ভিজা ডাল শীলে পিষিয়া মাখনের সহিত মিশাইয়া তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইত! এখন এ সকল ভেজাল মিশাইয়া লাভ করা যায় না—তাহার প্রয়োজনও নাই। এখন 'ট্যালো' বা চর্ব্বি মিশাইয়া ভালো গব্যঘৃত ও জল-সংযোগে ফেনাইয়া তাহা মাখনে রূপান্তরিত হইয়া কলিকাতার বাজারে বেশ চলিতেছে। 'ভেজিটেবল্ প্রোডাক্টস্' নামে যে ঘৃত সম্প্রতি 'বনস্পতি' নামে সাধারণ্যে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছে, তাহার উপরেও উচ্চহারে সরকারী-ডিউটির শীল-মোহর পড়িয়াছে, কাজেই "ঋণং কৃত্বা ঘৃত" সেবনের পথও রুদ্ধপ্রায়! যাঁহারা কলের ময়দার রুটি বা লুচি দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেন, তাঁহাদিগকে কি পরিমাণ সাদা পাথর-চূর্ণ জীর্ণ করিতে হইত, ইয়ত্তা ছিল না! এখন ময়দা-আটা গল্প-কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার তামাক-

অধিক পরিমাণে কোৎরা গুড় মিশাইয়া যথেষ্ট লাভ করে। অহিফেনে খয়েরের ভেজাল চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর নহে!

দীর্ঘকাল পরে রেল-ষ্টেশনের প্রায় দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া মনে হইল, যেন কোন নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছি! কেবল সুদূর আকাশের এক প্রান্তে উড্ডীয়মান এরোপ্লেনের 'ঘ্যানর ঘ্যানর' শব্দ ক্ষণকালের জন্য মনে কলিকাতায় বোমা-বর্ষণের অপ্রীতিকর স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আরোহিপূর্ণ বাস যখন আমাদের গ্রামের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল, তখন পথ-প্রান্তবর্ত্তী সহকার-কুঞ্জের মুকুল-ভারাবনত শাখা-পল্লব হইতে নব-প্রস্ফুটিত মুকুলের মধুর সৌরভ নব-বসন্তের সমীরণ-প্রবাহে সঞ্চালিত হইয়া প্রবাস-প্রত্যাবৃত্ত গ্রামবাসিগণকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। শ্যামল শাখাপত্রের অন্তরাল-সংগুপ্ত কোকিল কুহু-স্বরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া বসন্তের সমাগমবার্ত্তা বিঘোষিত করিল, এবং বংশকুঞ্জের উচ্চ শাখায় উপবিষ্ট ঘুঘু আলস্য-বিজড়িত করুণ স্বরে দিবাবসান-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ঘুঘুর সেই বিষাদাপ্লুত স্বর শুনিয়া পল্লীগ্রামের বৃদ্ধারা বলেন—ঘুঘু বলিতেছে—"কৃষ্ণ হে, উঠ, উঠ, উঠ।" কত কাল পরে এ কথা মনে পড়িয়া গেল! পথের অন্য দিকে সমুচ্চ অশ্বত্থ-শাখায় বসিয়া পাপিয়ার দল সমস্বরে কূজন করায় কবির 'পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা' পল্লীবাটের কথা স্মরণ হইল। কিছু দূরে আমাদের গ্রাম-প্রান্তস্থ বাগানের উন্নতশীর্ষ বৃক্ষশ্রেণী গগনপ্রান্তবর্ত্তী ধূসর মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

বহু কাল পরে গ্রামে প্রবেশ করিলাম, যেন কোন অপরাধী দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী নির্ব্বাসন-দণ্ডের অবসানে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল! পাড়ার বালক-বালিকাগণ পথের দুই ধারে দাঁড়াইয়া কৌতূহল-বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের অধিকৃত 'হাওয়া গাড়ী'র দিকে চাহিয়া ছিল। কোন বালিকার পরিহিত শাড়ীর এক প্রান্ত পথে লুটাইতেছে, কোন উলঙ্গ বালক এক খণ্ড ইক্ষুদণ্ড লইয়া মহা উৎসাহে চর্ব্বণ করিতেছে, ইক্ষুরসে বালকের বক্ষস্থল প্লাবিত। অবশেষে নারিকেলকুঞ্জ-পরিবেষ্টিত পল্লীভবনের সম্মুখে আসিয়া বাস হইতে অবতরণ করিলাম।

কিন্তু আমার রুদ্ধ গৃহ অন্ধকার। যে সুপ্রশস্ত অট্টালিকার প্রতি কক্ষ আমার গৃহবাসী বালক-বালিকাদলের কলহাস্যে নিত্য মুখরিত হইত, তাহাদের কেহই এখন জীবিত নাই! পরিজনবর্গের চিরপরিচিত মুখ একটিও দেখিতে পাইলাম না। তাহাদের সকলকেই একে একে প্রবাসে বিসর্জ্জন দিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। শূন্য-হৃদয়ে সজল-নেত্রে নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলাম। এখন যাহারা আমার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের কেহই পূর্ব্বে কোন দিন আমাদের এ বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই। তাহারা যেন এক হোটেল হইতে বহু দূরবর্ত্তী অন্য এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিল! আমার গৃহসংলগ্ন বিভিন্ন গৃহবাসী যে সকল আত্মীয়-স্বজনের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারা আমার গৃহদ্বারে আসিয়া আমাদের বিষাদ-মলিন মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, তাহাদের পিতামাতার বিবাহের পূর্ব্বে আমরা গৃহত্যাগ করিয়া একমুষ্টি উদরান্নের আশায় প্রবাসে যাত্রা করিয়াছিলাম, সুতরাং তাহাদের সকলেরই মুখ আমার নিকট নূতন! যেন অপরিচিত নবীন অতিথিগণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি! আমার গৃহপ্রান্তবর্ত্তী উদ্যানে যে সকল নারিকেল বৃক্ষ

এখন স্থুল ও বার-চৌদ্দ হাত দীর্ঘ হইয়াছে, প্রত্যেক বৃক্ষেই কাঁদি কাঁদি নারিকেল ফলিয়াছে,—দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। কথিত আছে, কৃতী পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থ এবং স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষের ফল ভোগ করা সৌভাগ্যের নিদর্শন; ভগবান্ এই বার্দ্ধক্যে আমাকে প্রথমটিতে বঞ্চিত করিলেও অন্যটি সম্বন্ধে আমার প্রতি কৃপণতা করেন নাই দেখিয়া আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। দেখিলাম, আমার রোপিত আমের কলমগুলির শাখাপত্র রাশি রাশি মুকুলে ঢাকিয়া গিয়াছে; কেবল যাহাদের ভোগের জন্য এই সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম, তাহাদের কেহই আজ জীবিত নাই! আমার গোশালা শূন্য পড়িয়া আছে! যে গোঁজে দড়ি দিয়া দুগ্ধবতী গাভী বাঁধিয়া রাখা হইত, সেই গোঁজ ও দড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও সেখানে পড়িয়া আছে। গৃহপ্রান্তবর্ত্তী কূপের জল তুলিবার দড়া অবজ্ঞাত ভাবে অদূরে ধূলায় লুটাইতেছে, জীর্ণ হইলেও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। বাসগৃহের এক কোণে সংরক্ষিত কাঠের দীপগাছায় তৈলহীন মৃৎপ্রদীপ প্রতিদিন সায়ংকালে যাহাদের কোমল করস্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই সকল প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই! মাথার চুল বাঁধিবার গুছিগুলি ঘরের কলুঙ্গীতে যেমন পড়িয়াছিল, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের উপর প্রচুর ধূলা সঞ্চিত হইয়াছে। যাহারা উহা কেশের বেণী রচনার জন্য সঞ্চয় করিয়াছিল, আজ তাহারা সকল কামনার অতীত! ইহলোক হইতে অপসৃত!

বহু কাল পরে অনিচ্ছার সহিত আমার নির্জ্জন শোকস্মৃতিপূর্ণ পল্লীভবনে আসিতে বাধ্য হইলেও কয়েক দিন এখানে বাস করিয়া কলিকাতার সহিত পল্লীগ্রামে বাসের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। সন্ধ্যাকালে গৃহপ্রান্তে ঝিল্লীর অশ্রান্ত তান, রাত্রিকালে অদূরবর্ত্তী বনের ও ঝোপের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন দলবদ্ধ শৃগালের সমস্বরে গান, সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইলে পাড়ায় পাড়ায় মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে পল্লীবাসিগণের হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও উষা-কীর্ত্তন কেবল যে পল্লীগ্রামের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে এরূপ নহে, পল্লীগ্রামে জীবন-যাপনের মাধুর্য্য অনুভব করিতেও বিলম্ব হয় নাই। কলিকাতায় যে সকল ভেজাল-মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য আহারের অযোগ্য বলিয়া স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হইত না, এখানে সেই সকল কদর্য্য ভেজালের অত্যাচার নাই। এখানে ঘোষাণী প্রতিদিন প্রভাতে গাঢ় দধি মন্থন করিয়া ননী তুলিয়া লইয়া যে টাট্‌কা ঘোল প্রস্তুত করে, তাহা সুপেয়, এবং 'জলবৎ তরলং' নহে। পূর্ব্বে প্রতি সেরের মূল্য দুই পয়সা ছিল, এখন দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য হওয়ায় এক সের এক আনায় কিনিতে হইতেছে। কলিকাতার মাখন-তোলা দুধের চিনিপাতা দৈ এই ঘোলের তুলনায় স্পর্শেরও অযোগ্য। গো-দুগ্ধ কিছু দিন পূর্ব্বেও টাকায় দশ সের ছিল, এখন গাভীর খাদ্যদ্রব্য খৈল, ভুষি, বিচালী প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য হওয়ায় তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিলিতেছে না; এ জন্য গাভীর দুগ্ধ কমিয়া গিয়াছে বলিয়া খাঁটি দুধ টাকায় পাঁচ সেরের বেশী পাইবার উপায় নাই। গোয়লারা যে দুগ্ধ টাকায় আট সের দরে বিক্রয় করিতেছে, তাহার অর্দ্ধেক জল। তিন পোয়া দুধে এক পোয়া জল দিয়া তাহারা যে 'নির্জ্জলা দুধ' বিক্রয় করে, তাহার দর টাকায় ছয় সের। কিন্তু যদি তাহাদের নিকট সত্যনারায়ণের পূজার জন্য দুগ্ধের বরাত দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই দুগ্ধ তাহারা টাকায় চার সেরের অধিক দিতে সম্মত হয় না; কারণ তাহাদের ধারণা, দেবতার পূজার দুধে একবিন্দু জল দিলে তাহাদের গোয়ালের গাভীগুলি একযোগে প্রাণত্যাগ করিবে! এই ধারণায় মুসলমান দুগ্ধ-বিক্রেতারা দুধে জল দিতে সাহস করে না। ধর্ম্মভয়ে না হইলেও তাহাদের এই ভয় প্রবল। ঘোষাণীরা দধি হইতে ননী তুলিয়া যে টাট্‌কা ঘি জ্বাল দিয়া আনে, তাহার স্বাদ ও গন্ধ কলিকাতার মাখন হইতে প্রস্তুত ঘৃতের স্বাদ ও গন্ধ অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট। উভয়ের তুলনা হয় না। এখন তাহার মূল্য প্রতি সের তিন টাকা। যে সকল ঘৃত-ব্যবসায়ী 'ফাড়' বিভিন্ন গ্রাম হইতে গাওয়া-ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গৃহস্থ-বাড়ীতে বিক্রয় করে, সে ঘৃতও ভেজাল-বর্জ্জিত, কিন্তু জ্বালে কাঁচা বলিয়া তেমন সুস্বাদ নহে এবং তাহা সৌরভহীন; তাহার মূল্য প্রতি সের আড়াই টাকা।

আমাদের এই কৃষিপ্রধান গ্রামেও এক সের গম সংগ্রহ করিবার উপায় নাই! এ জন্য ময়দা প্রতি সের বার আনায় কিনিতে হইতেছে। গম কিনিয়া জাঁতায় পিষিয়া লইলে খরচ কিছু কম পড়ে, এখন নূতন গম উঠিতেছে, কিন্তু তাহাও কেবল দুর্ম্মূল্য নহে, দুষ্প্রাপ্য। গোধূম-ব্যবসায়ী অবাঙ্গালীরা ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরিয়া উহা কাটাই-মাড়াই হইবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতি-মণ ১৬ টাকা দর ধার্য্য করিয়া চাষীদের হাতে বায়নার টাকা গছাইয়া দিতেছে, দরিদ্র চাষীদের পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা কঠিন। এ দিকে জিলার সরকারী কর্ম্মচারীরা মহকুমার প্রত্যেক গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে নোটিস দিয়া আদেশ করিয়াছেন, তাহাদের এলাকায় যত গোধূম উৎপন্ন হইবে, তাহার কিছুই যেন তাঁহাদের অনুমতি ভিন্ন বিক্রয় করা না হয়, অর্থাৎ সরকার তাহা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করিবেন; সুতরাং গ্রামবাসীদের তাহা সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। অথচ সরকার তাহার কি মূল্য দিবেন, তাহা প্রকাশ নাই; এ জন্য চাষীরা উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছে। তাহারা জানে, ভারতরক্ষা আইনে তাহাদের হাত-পা বাঁধা।

আমাদের গ্রামের কিছু দূরে একাধিক চিনির কল থাকিলেও বার আনা সের চিনি কিনিতে হইয়াছে, এখন আট আনা সের দরে কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসর টাকায় পাঁচ সের মধু বিক্রয় হইয়াছে, এখন প্রতি-সের দশ আনায় কিনিতে হইতেছে। মাঘ ফাল্গুন মাসে উহার মূল্য আরও অধিক ছিল; কিন্তু উনিশ টাকায় চাউলের মণ কিনিয়া দশ-বার আনা মূল্যে এক সের মধু কিনিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? মধু-বিক্রেতারা বলিতেছে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে মৌচাকের অভাব নাই, বড় বড় মৌচাকে আধ মণ পঁচিশ সের মধু পাওয়া যায়, কিন্তু যখন এক সের চাউল দশ বার পয়সায় মিলিত, তখন টাকায় পাঁচ সের মধু বিক্রয় করিয়াও তাহাদের অন্নাভাব হইত না, কিন্তু এখন বেতের সেরের এক সের 'গুমোচাল' (ওজনের সেরের দেড় সের) এগার আনায় কিনিতে হইতেছে—এ জন্য দশ আনায় এক সের মধু বিক্রয় করিয়াও তাহারা এক সের চাল মিলাইতে পারিতেছে না। কিন্তু 'মধ্বভাবে গুড়ং দত্তাৎ'—এই প্রবচনও অচল হইয়া উঠিয়াছে। খেজুরে গুড়ের 'বাইনে' পূর্ব্বে যে নূতন গুড় প্রতি-সের চারি পয়সায় বিক্রয় হইত, এবার তাহার মূল্য তিন আনা চৌদ্দ পয়সা। নূতন আখের গুড় উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য আরও অধিক। কারণ, আখের গুড় শীঘ্র অব্যবহার্য্য হয় না।

কিছু দিন পূর্ব্বে মজুরের দৈনিক মজুরী তিন আনা ছিল, এখন তাহা আট আনা। ঘরামীর মজুরী চারি আনা স্থলে বার আনা।

যে বাঁশ টাকায় বারখানা পাওয়া যাইত, এখন তাহা টাকায় চারখানা কিনিতে হইতেছে। গ্রামবাসীদের বেড়-বাতার রাখা অসাধ্য হইয়াছে। অনেকে মাষকলাই ছোলা মসুর সিদ্ধ করিয়া খাইয়া তদ্দ্বারা অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করিতেছে; কিন্তু তাহাও দুষ্প্রাপ্য। অনেক চাষী অতি কষ্টে এক আধ সের চাউল সংগ্রহ করিয়া তাহা এক হাঁড়ি জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ ও লঙ্কা-মরিচ সহযোগে পরিবারস্থ চার-পাঁচ জনে মিলিয়া আহার করিতেছে। কিন্তু এবার কাঁচা লঙ্কার সের পাঁচ আনা, পূর্ব্বে উহা তিন-চারি পয়সায় কিনিতে পাওয়া যাইত! আর কিছু দিন পরে অনেক গ্রামবাসী খাদ্যাভাবে শুকাইয়া মরিবে। ভিন্ন জিলা হইতে চাউল আমদানী করাও অসাধ্য হইয়াছে। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা ভিন্ন জিলায় তাঁহাদের এলাকা হইতে চাউল রপ্তানি করিতে দিতেছেন না। কাজেই ক্ষেত হইতে ফসল চুরি হইতেছে, ধানের গোলা লুঠ হইতেছে। যাহারা লুঠ করিয়া ধরা পড়িতেছে, তাহারা বলিতেছে, জেলে যাইতে তাহাদের আপত্তি নাই, সেখানে অনাহারে থাকিতে হইবে না; সুতরাং শান্তিরক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট অল্পমূল্যে প্রত্যেক গৃহস্থকে নির্দ্দিষ্ট দিনে দুই সের চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু সকলে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। অনেকে কাঁদিতে কাঁদিতে রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরিয়া উপবাস করিতেছে। গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ মহকুমার হাকিমের নিকট কেরোসিন তেলের 'কুপন' বা ছাড়পত্র পাইয়াছে. তাহা দেখাইয়া প্রত্যেকে চার দিন অন্তর এক পোয়া কেরোসিন তেল কিনিতেছে, অর্থাৎ প্রত্যহ এক ছটাক তৈলে পলতে ভিজাইয়া অন্ধকারে তাহাদিগকে রাত্রি যাপন করিতে হইতেছে। এ জন্য চুরির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বহু দরিদ্র পল্লীবাসী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পাকা আম কাঁঠাল খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। কিন্তু এবার আম-কাঁঠালের অত্যন্ত অভাব, নারিকেল তেলের এক সেরের মূল্য পাঁচ শিকা, এবং যে নারিকেলের জোড়া ছয় পয়সায় কিনিতে পাওয়া যাইত, তাহার মূল্য ছয় আনা হইয়াছে, অথচ প্রত্যেক গৃহস্থের ডাব-গাছে কাঁদি কাঁদি ডাব!

বাজারে তরি-তরকারি এতই দুর্ম্মূল্য যে, এক আঙ্গুল প্রশস্ত এক টুকরা কুমড়ার মূল্য এক পয়সা। শিম ও বেগুন প্রতি সেরের মূল্য এখনও ছয় পয়সা! গত বৎসর এ সময় পয়সায় দুই সের বেগুন মিলিত। রুই মাছের প্রতি সেরের মূল্য চার আনা স্থলে এখন বার আনা। নূতন সর্ষপ উঠিলেও এখনই তাহার তৈলের মূল্য বার আনা। আমার বয়স যখন দশ-এগার বৎসর, সেই সময় একদিন ঠাকুর-দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি দুই টাকার তেল কিনিয়া বাবার অন্নপ্রাশনের ভোজ সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, দুই টাকার তেলের ভোজে সমারোহটা কি রকম হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, ওরে মুখ্‌খু, এখন টাকায় পাঁচ সের তেল, তখন যে দু' টাকায় বত্রিশ সের তেল কিনিয়াছিলাম! বলা বাহুল্য, সে এক শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমার কাকার বহু দিনের পুরাতন চিঠি-পত্রের ফাইলে ঠাকুরদাদার একখানি পত্র পাওয়া যায়, সেই পত্রে তিনি কাকাকে লিখিয়াছিলেন, চাউলের মণ শীঘ্রই পাঁচ সিকা হইতে দেড় টাকা সাত সিকা হইবার আশঙ্কা আছে, এ জন্য কয়েক মণ চাউল সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত, আর বাঙ্গালার বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তার আমলে চাউল টাকায় দুই সেরে দাঁড়াইয়াছে! ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হউক!

আশা করিতেছি, কেরোসিন তেলের অভাবে শীঘ্রই আবার সে কালের মত মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহকক্ষ আলোকিত করিতে হইবে এবং উপাদানের অভাবে যখন কাঠি গণিয়াও দিয়াশলাই কিনিতে পাওয়া যাইবে না, তখন পুনর্ব্বার সেই সনাতন ইস্পাতের ঠুকনী, সোলা ও চকমকির পাথরের প্রবর্ত্তন হইবে, এবং পাকাঠির কাঠিতে গন্ধক সংযুক্ত করিয়া তাহার সাহায্যে দীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে গন্ধক কি কিনিতে পাওয়া যাইবে? সুতরাং জীবন-সংগ্রামের জন্য যে সকল সমস্যা দিন দিন জটিল হইতেছে, কি উপায়ে তাহার সমাধান হইবে? নগরবাসিগণ তখন নিরুপায় হইয়া (back to village) পল্লীগ্রামেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিবেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রামেশ্বরের শিবায়ন

আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যসেবিগণের জীবনী লিখিবার উপাদানের একান্ত অভাব। প্রাচীন যুগের এমন অনেক বাঙ্গালা পুস্তক অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের রচয়িতার জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। কারণ, সে যুগের বঙ্গভাষাসেবিগণ জীবনী রচনার দিকে তেমন মনোযোগ দিতেন না।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গল-কাব্যের সমৃদ্ধির সীমা নাই। দেব-দেবীকে অবলম্বন করিয়া বহু কবি বহু কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। শিবায়ন এ সব কাব্যের অন্যতম। শিবায়নের কবির নাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সৌভাগ্যের বিষয়—মুকুন্দরামের মত কবি রামেশ্বরও তাঁহার রচনার মধ্যে স্বপরিচয়াত্মক যে ভণিতা দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার বংশের এবং সমকালবর্ত্তী সমাজের অনেক তথ্য জানিতে পারি।

কবি রামেশ্বর ছিলেন ভটনারায়ণের বংশধর। তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় কেশর কণির সন্তান। উদ্ধৃতাংশ দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহার বংশলতিকা এইরূপ ছিল—

নারায়ণ চক্রবর্ত্তী
|
গোবর্দ্ধন
|
লক্ষ্মণ = রূপবতী
|
রামেশ্বর = { ১। সুমিত্রা, ২। পরমেশ্বরী } | শম্ভুরাম | পার্ব্বতী | গৌরী | সরস্বতী

সম্ভবতঃ, কবি রামেশ্বরের সন্তানাদি ছিল না; থাকিলে তাঁহাদিগের নাম কবির ভণিতা-মধ্যে দেখিতে পাইতাম; কারণ

ভণিতা-মধ্যে কবি সকলেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গাচরণাদি তাঁহার ছয় ভাগিনেয় ছিল এবং এক ভাগিনেয়ী-পুত্রের নাম ছিল কৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহা ছাড়া কবির যে দুই বন্ধু ছিলেন, কবি তাঁহাদিগেরও নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের নাম ছিল পরমানন্দ, তিনি ছিলেন কর্ণগড়ের সেনাপতি; অপর বন্ধুর নাম হৃদয়রাম বসু, তিনি ছিলেন কর্ণগড়ের দেওয়ান এবং কবি। ইঁহারা দুই জনেই মহামায়া দেবীর সাধক ছিলেন। কবি রামেশ্বরের দুই বিবাহ দেখিয়া মনে হয়—প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণ করেন।

কবি রামেশ্বরের পূর্ব্ব-বাস ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বরদা পরগণাস্থ যদুপুর গ্রামে। এই যদুপুর গ্রাম বর্ত্তমান ঘাটাল হইতে অদূরে অবস্থিত। হিম্মৎ সিংহ নামক জনৈক তৎকালীন রাজ-কর্ম্মচারী কবির সেই যদুপুরের গৃহ ভাঙ্গিয়া দেয়। এইরূপে হিম্মৎ সিংহের অত্যাচারে পর্য্যুদস্ত হইয়া কবি পরিশেষে কর্ণগড়ের বদান্য রাজা রামসিংহের নিকট আশ্রয় লাভ করিয়া কাঁসাই* নদীর তীরে বসবাস আরম্ভ করেন।

এই সব উদ্ধৃতাংশ হইতে আরও দেখিতে পাই, কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে ঐ সকল পরিচয়াত্মক ভণিতা দ্বারা শুধু যে নিজের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, গৃহহারা হইয়া যে সদাশয় গুণগ্রাহী রাজা রামসিংহের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, সেই রাজারও বিস্তৃত বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, এবং সেই রাজার এবং বংশের গুণকীর্ত্তন করিতে বহুমুখ হইয়াছেন। সর্ব্বধ্বংসী কাল কত বড় বড় রাজা-মহারাজার কীর্ত্তি লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সামন্ত রাজা রামসিংহ যদুপুরের নির্য্যাতিত কবি রামেশ্বরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া কবি তাঁহার কালজয়ী কাব্য দ্বারা আশ্রয়দাতার নাম বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামসিংহ-সুত যশোবন্ত নরনাথ,
তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর। পৃঃ—৪৮

শিবায়ন কাব্যের রচনা-কাল বা কবির জন্ম-মৃত্যুর সময় অবধারণ করিবার সুবিধাজনক কোন ভণিতা কাব্য-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গের অনেক প্রাচীন কবি গ্রন্থ-শেষে গ্রন্থ-সমাপ্তির শক বা সন-সম্বলিত ভণিতা যোজনা করিয়াছেন। সেই সেই ভণিতা বেশ স্পষ্টার্থক হইলে সময়-নির্দ্ধারণের খুবই সুবিধা হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রামেশ্বরের শিবায়নে রচনা-কাল নির্দ্ধারণোপযোগী কোন স্পষ্টার্থক ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র পুঁথির মধ্যে কাব্য-রচনার কাল-নির্ণয়াত্মক পংক্তি এই কয়টি মাত্র দৃষ্ট হয়—

শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা। পৃঃ—১১৩

কিন্তু উক্ত শ্লোককে কান মতে স্পষ্টার্থক বলা যাইতে পারে না। কষ্টকল্পিত অর্থ গ্রহণ করিলে ইহা হইতে একাধিক সন নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু মনে হয়, তাহা করা শুধু নিজ নিজ বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রদর্শন করা মাত্র; কবির মনে ঐ সকল কষ্টকল্পিত অর্থের মধ্যে কোনটি ছিল কি না সন্দেহ। সুতরাং এ স্থলে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুধু উদ্ধৃত করিলাম —"আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও এই শ্লোক হইতে স্পষ্টরূপে কোন শক বাহির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, উক্ত রচনায় লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ পাঠ-ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে। মুদ্রিত পুস্তকে ঐ শকের স্থলে অঙ্ক দ্বারা ১৬৩৪ শক নিবেশিত আছে। উহা অতি কষ্ট-কল্পনায় সঙ্গত করা যাইতে পারে। যাহা হউক, অগত্যা উহাই স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু এ বিষয়ে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে ১৬৫৬ শকে (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে) এই যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নায়েব-নবাব সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি খালিব আলির সহিত দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। * * * যশোবন্ত ১৬৫৬ শকে দেওয়ান হইয়াছিলেন, এবং মুদ্রিত পুস্তকের গণনানুসারে শিব-সঙ্কীর্ত্তন ১৬৩৪ শকে সমাপ্ত হয়—এই ২২ বৎসরের অন্তর ধর্ত্তব্যের-মধ্যে নহে। যেহেতু, যশোবন্তের দেওয়ান হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খৃঃ অব্দে) শিব-সঙ্কীর্ত্তন রচনা শেষ হওয়া অসম্ভব নহে। * * * ফলতঃ, 'শিব সঙ্কীর্ত্তন' মহাভারতের পরে এবং কবিরঞ্জনের পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"*

অতএব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে শিবায়নের রচনাকাল ১৬৩৪ শক (১৭১২ খৃষ্টাব্দ)। তাহা হইলে কবির জন্মকাল অনুমান করা যায় ইহার ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে; অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে।

এই সময়ে দেশে অরাজকতা, দস্যুর উৎপাত, নবাবের উৎপীড়ন, জমিদারের নির্য্যাতন পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। অরাজকতার বর্ণনা আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যেও দেখিতে পাই। (যদিও মুকুন্দ-রাম বহু পূর্ব্বের কবি ছিলেন।) কবি রামেশ্বর এই অরাজকতার সময়ে নানা প্রকারে নিপীড়িত হইয়া বরদা পরগণার অন্তর্গত স্বীয় জন্মভূমি যদুপুর গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া কর্ণগড়ের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কর্ণগড়ের বিখ্যাত মন্দিরের তোরণ-দ্বার-দেশে "যোগী-ঘোপা" বা যোগ-মণ্ডপ নামে এক প্রস্তরময় ত্রিতল বাটী আছে; মহামায়ার মন্দিরে এক পঞ্চমুণ্ডী† আসন আছে। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ যোগাসনে বসিয়া কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অধুনা ঐ কর্ণগড় নাড়াজোল-রাজের সম্পত্তি।

সিদ্ধপুরুষ রামেশ্বরের দেহাবসানে ঐ মন্দিরের নিকটে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। কবির সমাধি-মন্দিরের নিকটেই রাজা যশোবন্ত সিংহের সমাধি-মন্দির আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতা দ্বারা কবি স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, যশোবন্ত সিংহ এক জন সাধুপুরুষ ছিলেন। কবির পিতামহ নারায়ণ চক্রবর্ত্তীও "যতি"-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ছিলেন।

* সম্ভবতঃ কবি "কাঁসাই"কে "কৌশিকী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর একটি ক্ষীণতোয়া "কৌশিকী" আছে—তাহা হুগলী জেলার অন্তঃপাতী হরিপালের নিকট দিয়া প্রবাহিত।

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'—পৃঃ—১৪৬

† বানর, শৃগাল, পেচক, বাদুড়, কুম্ভীর (কাহারও মতে শার্দ্দূল) এই পঞ্চ জন্তুর মস্তক প্রোথিত করিয়া তদুপরি যে আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাকেই পঞ্চমুণ্ডাসন বলে।

কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে বহু বার আপন আশ্রয়দাতার কল্যাণ কামনা করিয়াছেন—

যশোবন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।

অন্যত্র— যশোবন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।

প্রভু পূর্ণ কর নরেন্দ্রের অভিলাষ। পৃঃ ৯৬

গ্রন্থান্তিমেও কবি বহুমুখী হইয়া রাজা যশোবন্তের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন— যশোবন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।

সে রাজসভায় হৈল সঙ্গীত প্রকাশ।
বিদগ্ধ বসুধাপতি অতি বিচক্ষণ।
শক্রসম সভা শোভা করে সুধীগণ।

রামেশ্বর যে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্য হইতেই পাওয়া যায়; হিন্দী এবং পারসী ভাষাতেও তিনি যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহাও তাঁহার সত্যনারায়ণের পুঁথি দৃষ্টে জানিতে পারি।

অন্যান্য ধর্ম্ম-কাব্য-প্রণেতৃগণের গ্রন্থ-পাঠে মনে হয়, তাঁহারা স্ব স্ব কাব্যের দেবতাকেই বড় করিবার জন্য সমূহ কবিত্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন; অপর দেব-দেবীকে উচিত মত প্রাধান্য দেন নাই। কিন্তু রামেশ্বর তাহা করেন নাই, তিনি তাঁহার কাব্যে শুধু যে হরি-হরে অভেদ দেখাইয়াছেন, তাহা নহে; সকল দেবতার প্রতি সমান আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—

অভেদ এ তিন দেবে এ মতি যত্তপি সেবে
তবে ভবার্ণবে হবে পার।

শিবায়ন কাব্যে কবি "হরি-হরে ঐক্য" প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন; সত্যনারায়ণের ব্রতকথায় তিনি বলিয়াছেন—

রাম রহিম দুই নাম ধরে একে নাথ।

এই পুঁথিতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগম শাস্ত্র মত।
ভক্তি মুক্তি লভিতে অনেক আছে পথ।

কবির সত্যনারায়ণের পুঁথি দৃষ্টে মনে হয়—এই পুঁথির রচনা-কালে তাঁহার ধর্ম্মমত আরও উদার হইয়াছিল; ইহার রস-ঘন রচনা দেখিয়া আরও মনে হয়—সত্যনারায়ণের পুঁথি কবির পরবর্ত্তী রচনা। পূর্ব্বে রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের কথা খুব প্রচলিত ছিল; কিন্তু রামেশ্বরের পুঁথি অতি দীর্ঘ; এখন খাটোর যুগ; মহিলারা মস্তকের দীর্ঘকেশ ছাঁটিয়া এখন খাটো করিতেছেন; মেমেরা ঘাগরার ঝুল খাটো করিতেছেন; পুরোহিত মহাশয়েরাও অন্য কবি-রচিত সত্যনারায়ণের কথা সংক্ষিপ্তাকারে পাইয়া এখন তাহাই পাঠ করিয়া থাকেন। রামেশ্বরী পুঁথি এখন কদাচিৎ পঠিত হইতে শুনা যায়। সত্যনারায়ণের পুঁথির ভণিতায় কবি যদুপুরের নাম উল্লেখ করা হেতু পণ্ডিত রামগতি ইহাকেই কবির "প্রথম রচনা" বলিয়াছেন। ভণিতা মধ্যে পাই—

পরে সত্যপীর বন্দি কহে কবি রাম।
সাকিন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥

ইহাকে কিন্তু রচনার পূর্ব্বত্ব প্রতিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। কবি ঐ ভণিতায় পূর্ব্ববাসও তো উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারেন।

এইবার শিবায়ন কাব্যের অনুশীলন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এইখানে একটি কথার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন কবিরঞ্জনের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু রামেশ্বরের

শাঁখারী সুন্দর শুন শাঁখারী সুন্দর।
কি নাম তোমার কহ কোন্ গাঁয়ে ঘর॥ পৃঃ—৯৯

প্রভৃতি শ্লোক দেখিয়া মনে হয়, কবি তাঁহার শিবায়ন রচনার পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া থাকিবেন; যদিও কাহারও কাহারও মতে ভারতচন্দ্রের কাব্য কবিরঞ্জনের কাব্যের পরবর্ত্তী রচনা। তবে যদি ধরা যায়, অনুপ্রাস-যমকাদি অলঙ্কার তখনকার সকল কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর কিছু বলিবার থাকে না। রামেশ্বরের কাব্য অনুপ্রাস-বহুল; এবং এই অনুপ্রাসযোজনা দুই-চারি স্থল ব্যতীত অনেক স্থলেই শ্রুতিমধুর হইয়াছে এবং কবির সংস্কৃত জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দুই-চারিটি মাত্র পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

ঠাকুরাণী ঠেলিতে ঠাকুর ঠেকা হ'ল।
* * *
শিব বলে শক্র কিছু চক্রবক্র আছে।
খন্দ হ'লে ক্ষেতে তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে।
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাখানি পেলে পরিণাম শুল্ক হয়। পৃঃ—৭০
সূর্য্য-সুত সাদরে শিবের সেবা করে।
* * *
কৃতকৃত্য কৃত্তিবাস কুমুদার কাছে। পৃঃ—৭১
* * *
ধর্ম্ম কর ধূর্জ্জটিকে ধান্য দেহ ঋণ। পৃঃ—৭৩
* * *
জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা। পৃঃ—৭৪
* * *
ভব্য সয্যা সব্য হস্ত দিব্য জলে ধুইলা। পৃঃ—১০৪

প্রসঙ্গক্রমে কবি রাম-নামের মাহাত্ম্য, শবর উপাখ্যান, রুক্মিণী-হরণ, বাণ রাজার উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান কাব্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। শিবের উপাখ্যান অবলম্বনে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় অনেক কাব্য আছে। কবি রামেশ্বর পূর্ব্বসূরিগণের কাব্য হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁর কাব্য মৌলিকতা-শূন্য নহে। মাঝে মাঝে কবি বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে স্বকপোল-কল্পিত ছোট ছোট বহু উপাখ্যান সংযোজিত করিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। শিবের চাষ আরম্ভ, ভগবতীর বাগ্দিনীবেশে শিবকে ঠকানো, শাঁখারী বেশে হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক ভগবতীকে শিবের শাঁখা পরান—ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান কবির নিজের কল্পনা-প্রসূত; এগুলি বেশ কবিত্বপূর্ণ এবং প্রীতিকর। এইগুলি এবং এই প্রকার আরও বহু ক্ষুদ্র উপাখ্যান পরম নৈপুণ্যে নিজ কাব্য মধ্যে

সন্নিবেশিত করিয়া কবি নিজের প্রচুর কবিত্ব-শক্তির তথা উদ্ভাবন-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। বাগ্দিনীর পালা ও শাঁখা পরিধানের বৃত্তান্ত ডম্বরুর তালে গান করিয়া পূর্ব্বে ভিক্ষুকেরা ভিক্ষার্জ্জন করিত; অধুনা তাহার প্রচলন কিছু কমিয়া গেলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। পিতাপুত্রের ভোজন, হরগৌরীর কোন্দল প্রভৃতি অংশগুলিও বেশ সুললিত। বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালার কাজ বর্ণন, নাম-মাহাত্ম্যের সাহায্যে ত্রিশূল নরম করা—প্রভৃতি বর্ণনেও কবি অল্প কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই।

কবি ভণিতা-মধ্যে

স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বরিয়া পুরাণ পাঠে

লিখিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি রাজ-ভবনে শুধু যজমানী পুরাণ-পাঠক ছিলেন না। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হইতে পারে। তাঁহার বর্ণিত শাঁখা পরানোর গল্প দেখিয়া এখনও অনেক হিন্দু মহিলা ৺দুর্গাপূজার সময়ে শাঁখা পরিয়া থাকেন, এবং মা দুর্গাকে শঙ্খ প্রদান করেন।

স্বর্ণথালে গঙ্গাজলে শঙ্খ তুলে ধুয়ে।
অথবা গঙ্গাজলে গিরিশ গৌরীর ধুয়ে হাত।

ইত্যাদি কবিতা দ্বারা রামেশ্বর স্পষ্টই বলিয়াছেন—শুদ্ধাচারে শঙ্খ পরিতে হয়। শঙ্খ-পরিধান স্ত্রীলোকদিগের একটি মাঙ্গলিক পর্ব্ব। পরিধানের পূর্ব্বে শঙ্খকে ধান্যদূর্ব্বা দিয়া গঙ্গাজলে ধুইয়া লইতে হয়; তদনন্তর ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া হয় রাধিকাকে নয় দুর্গাকে তাহা উৎসর্গ করতঃ পরিধান করিতে হয়। রামেশ্বরের এই শঙ্খ পরিধানের পালা সরস, প্রাঞ্জল ও উপভোগ্য।

প্রথম দিবসীয় নিশাপালার শেষ ভাগে পৃথিব্যাদির উৎপত্তি বর্ণন-কালে সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র প্রভৃতির নাম কবি বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়া থাকিবেন। ঊষা ও অনিরুদ্ধের মিলন এবং বিহার পড়িলে ভারতের বিদ্যাসুন্দরের কথা মনে পড়ে। কোচনীদের বর্ণনেও কবি প্রাচীন কবিগণের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। গৌরীর আটুল বাঁটুল খেলা প্রভৃতি বাল্য-ক্রীড়া বর্ণন বেশ উপভোগ্য। মাঝে মাঝে কবি স্বল্প কথায় সাংসারিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন;—জামাতার নিকট শাশুড়ীর প্রার্থনা—

আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত।

* * *

অন্যত্র—পুত্র হতে পৌত্রকে প্রচুর স্নেহ হয়।

গৌরীর কৈলাস-গমন-কালে—

স্বামী-ঘরে কন্যা থাকে, ধন্য তার বাপ মাকে,
অভাগার ঘরে থাকে ঝি।

কবির ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত যথা—

পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

পূর্ব্বেই রামেশ্বরের সংস্কৃত জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিবায়নের মধ্যে কালিদাসের কুমারসম্ভবের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। কোথাও বা অবিকল অনুবাদের মত মনে হয়। নিম্নে তাহার দু' একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল—

উত্তরে করিয়া স্থিতি, আছেন নগাধিপতি,
হিমালয় দেবাত্মা প্রচণ্ড।
পয়োনিধি পূর্ব্বাপরে, বিভাগ করিল তারে,
যেন পৃথিবীর মানদণ্ড॥

দেবর্ষি নারদ আসিয়া গিরিরাজকে জানাইয়া দিলেন—

তোমার দুহিতা হবে হর-অর্দ্ধ-তনু। পৃঃ—১৮

রতি-বিলাপে দেখিতে পাই—

পদ্মহীন সরো যেন শশিহীন নিশি। পৃঃ—২০

বালিকা-বয়সের গিরিরাজ-সুতার গহনার যে দীর্ঘ ফর্দ্দ দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অলঙ্কারসমূহের নাম জানিতে পারা যায়। অতঃপর গৌরীর খেলাঘরে কবি যে সকল তরকারির নাম করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মুকুন্দরামের তরকারির দীর্ঘ ফিরিস্তির কথা মনে পড়ে। কবির যুগে প্রচলিত বহু প্রকার ধান্যের নাম আমরা জানিতে পারি শিবায়ন কাব্যের শেষ ভাগ হইতে।

গ্রন্থারম্ভে চৈতন্য-বন্দনা-কালে কবি চৈতন্যদেবের পিতার নাম পুরন্দর মিশ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

মিশ্র পুরন্দর পিতা পরম বৈষ্ণব।

সৃষ্টের কথারম্ভে রামেশ্বর লিখিয়াছেন—

মূল হৈতে বলি শুন পুরাণের সার।
মধুকৈটভের মাংসে মহীর সঞ্চার।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—

মধুকৈটভয়োরাসীন্মেদসৈব পরিপ্লুতা।
তেনেয়ং মেদিনী দেবী প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।

মধুকৈটভের "মাংসে" মেদিনী তৈয়ারী হওয়ার কথা কবি কোথায় পাইলেন বুঝিতে পারিলাম না!

আর একটি কথার উল্লেখ এখানে আবশ্যক মনে হয়; পৃথিব্যাদির উৎপত্তি-বর্ণন-কালে কবি রামেশ্বর বলিয়াছেন—

হিমাদ্রি দক্ষিণ দিকে ক্ষীরোদ উত্তরে।
সমস্তে ভারতবর্ষ বলেন এহারে।

ইহাও পৌরাণিক বর্ণনা হইতে বিচ্যুতি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার সঙ্গত অর্থ করিতে পারিলাম না। বিভিন্ন কবি-বর্ণিত পৃথিবী প্রভৃতির উৎপত্তি বর্ণনে অল্পবিস্তর বৈসাদৃশ্য থাকিলেও রামেশ্বরের এ বিবৃতি অন্য কোন কবি কর্ত্তৃক সমর্থিত হইতে দেখি নাই।

কবি রামেশ্বরের ভাষা সরস, সরল ও প্রাঞ্জল; মাঝে মাঝে সংস্কৃত-বহুল হইলেও সহজবোধ্য। কবিত্ব-শক্তি রামেশ্বরে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়; সৃজনী-শক্তি বা কলা-নৈপুণ্যও তাঁহার কাব্যে অপ্রতুল নহে। অনেক সময়ে স্বল্প কথায় এবং সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় কবি যেরূপ সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট এবং সংসারের নানাবিধ চিত্র অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়!

শ্রীজহরলাল বসু (বি-এল)।

দুগ্রহ

[গল্প]

প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারী করি। মাইনের যা বহর, তাতে ভদ্র ভাবে কলকাতায় বাস করা চলে না। তার ওপর যুদ্ধের হিড়িক। জিনিষপত্তরের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে অথচ মাইনে বাড়বার কোনও লক্ষণই নেই! উল্টে চাকরীটি যাতে বজায় থাকে, তার জন্য প্রত্যহ সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে, কাজ থাকুক না থাকুক, দেখা হোক না হোক, ধর্ণা দিয়ে জুতো এবং সময় ক্ষয় করি! মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান মাইনে-লব্ধ অর্থে হয় না বলে রিপুকর্ম্ম অর্থাৎ টুইশনিও করতে হয়। তার উপর আজকাল বাজার করা মানে, দু'-তিন ঘণ্টার দায়ে নিশ্চিন্ত। অনেক দিন শুধু হাতেই ফিরতে হয়। অভাব নিত্য লেগে আছে। পয়সার,—চাল, ডাল, চিনির এবং সময়ের!

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কারুর বাড়ী যেতে পারি না সময়ের অভাবে! সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করতে পারি না পয়সার অভাবে! বিদেশ থেকে আত্মীয়-স্বজনের চিঠিপত্র আসে, এ সময়ে কলকাতায় আছি, তাঁদের উদ্বেগের সীমা নেই! তাঁরা খরচের জন্য আকুল হয়ে আছেন। রবিবারে বসে সে-সব চিঠির জবাব একসঙ্গে দিয়ে ফেলি। ক'বছর মাষ্টারী করে বাঁধা বুলি আওড়ে আওড়ে এমন জীব বনেছি, যাদের সাক্ষ্য আদালতে গ্রাহ্য হয় না। ভেবে-চিন্তে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কথা লেখবার মত মাথা ও ক্ষমতা, ধৈর্য্য ও সময় থাকে না। তাই অনেক কষ্টে একখানি চিঠি লিখে বাকীগুলি সম্পর্ক-মাফিক শিরোনামা এবং তলদেশ বদল করে নকল করে দিই। এক দিন রবিবারে এমনি খান-দশেক চিঠি লিখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলুম।

পূজনীয় (বা কল্যাণীয়)

······মার শরীর ভাল। বাজারে চাল নাই। প্রাণ বাঁচান দায়। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। কত দিন এ ভাবে কাটবে একমাত্র ভগবানই জানেন।······

বশম্বদ

শ্রীঅনাদিকুমার ঘোষ দস্তিদার।

দিন-চারেক পরে সকালে ছোট ভগ্নীপতির টেলিগ্রাম পেলুম। লিখেছেন, "বৃহস্পতিবার রাত্রে পৌঁছিব। মা কেমন আছেন?" টেলিগ্রাম পড়ে অবাক হয়ে গেলুম! অর্থ বুঝতে পারলুম না! খেয়ে দেয়ে স্কুল যাচ্ছি, এমন সময় আর এক টেলিগ্রাম। দাদা লিখেছেন, "শুক্রবার ভোরে পৌঁছিব। মার শরীর কেমন?" আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলুম। মার সম্বন্ধে সকলের কৌতূহল এক সঙ্গে এমন বেড়ে উঠলো কেন?

যাই হোক, স্কুলে গেলুম। ক্লাস নিচ্ছি, এমন সময় বেয়ারাসহ এক জন পিয়ন ক্লাসের দরজায় এসে হাজির। টেলিগ্রাম এসেছে। বাইরে গিয়ে দস্তখৎ করে টেলিগ্রাম নিলুম। পিসতুতো ভাই ভোঁদা লিখেছে—"সস্ত্রীক শুক্রবার 2d Down-এ পৌঁচুচ্ছি! মামীমা কেমন আছেন?"

কি হচ্ছে এ সব! সকলে দল বেঁধে আমাকে fool তৈরী করছে। ক্লাসে আবার ঢুকছি, কানে এল ছেলেরা বলাবলি করছে—"ওরে, স্যারের ছেলে হয়েছে। তাই টেলিগ্রাম এসেছে।" নাঃ, সকলে দেখছি আমায় পাগল পেয়েছে! ক্লাস ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম। আগুনের মত হু-হু করে ছড়িয়ে গেল খপর—আমার না কি ছেলে হয়েছে! সকলকে বোঝাতে এবং টেলিগ্রাম দেখাতে দেখাতে ওষ্ঠাগত! বিকেল পাঁচটা নাগাদ আবার একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির। জ্যেঠতুত বোন বুঁচি লিখেছে—"বৃহস্পতিবার রাত্রে পৌঁছুব। কাকীমার কি হয়েছে?" আমি যেন পাগল হবো! একই রকম এই সব টেলিগ্রাম আসবার কারণ কি? মার শরীর খারাপ—এ কথা তো আমি কাকেও লিখিনি। বাড়ী পৌঁছে আরও চারটে এবং রাত্রে ঘুম থেকে উঠিয়ে দু'টো টেলিগ্রাম। ওদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকে এবং শুক্রবার সমস্ত দিন ধরে ছেলে-পিলে, দলবল সহ আত্মীয়-স্বজন গত রবিবারে যাঁদের চিঠি দিয়েছি, সকলেই এসে হাজির! সকলেই মহা খাপ্পা! ব্যাপার কি? এ ঠাট্টার অর্থ? আমার মার শরীর মোটেই খারাপ নয়। আমিও চটেছি! সত্যি, কি ব্যাপার? এ ঠাট্টার অর্থ? মার শরীর খারাপ—এ কথা আমি কবে কাকে লিখলুম? সকলে এই মারে তো এই মারে! লেখোনি? তবে কি আমরা অনর্থক এত পয়সা খরচ করে কলকাতায় বেড়াতে এসেছি! এই বলে সকলে আমার লিখিত পত্র বার করে দেখালেন।

"পূজনীয় (বা কল্যাণীয়)···

······মার শরীর ভাল নাই * * * প্রাণ বাঁচান দায়! যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। কত দিন এ ভাবে কাটবে একমাত্র ভগবানই জানেন।······ বশম্বদ

শ্রীঅনাদিকুমার ঘোষ দস্তিদার

দেখলুম। কি করে এমন হ'লো জানি না! দোষ তাঁদের নয়। এ চিঠি পড়ে কার না প্রাণ উতলা হয়! আমিও অমন চিঠি পেলে ছুটে যেতুম। দোষ কিন্তু আমারও নয়। আসলে আমি কি লিখেছিলুম তা তাঁদের বললুম। শুনে তাঁরা খুব একচোট হাসলেন। মা এবং তাঁরা সকলেই শেষ পর্য্যন্ত বললেন—"যাক্, ভালই হলো। ভুলের হিড়িকে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেল। যা দূরে-দূরে সব ছড়িয়ে পড়েছি, দেখা তো হয় না।"

ঠিক হলো যার যে ক'দিন ছুটি, আমার এইখানেই কাটাবেন।

উচিত এবং অত্যন্ত সন্তোষজনক ব্যবস্থা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভুলের মাশুল দিতে আমার প্রাণ যায়। খাদ্যদ্রব্য জোগা করতে সমস্ত দিন কেটে যায়—তার পর যা মেলে, তাও পর্য্যাপ্ত নয়। নিজে আর মা—চালে ডালে সিদ্ধ, ভাতে ভাত চালাতুম। এখন দু-বেলা মাছ মাংস ডিম চলছে! ছেলেপিলে সহ দশ জন আত্মীয় আসাতে খরচ পঞ্চাশ গুণ বেড়ে গেছে।

কিছু চাল কেনা ছিল, হয়তো তাতে আমাদের দিন-সাতেক চলে যেতো। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের পল্টন এক দিনেই ভাঁড়ার ফাঁক করে ছেড়ে দিলে! তাতেও অনেকের পুরো-পেট হলো না। রাত্রি

তিনটের সময় পাড়ার সরকার-নির্দ্দেশিত মুদিখানায় দাঁড়াতে গেলুম। গিয়ে দেখি, তখনই প্রায় শ'খানেক লোক লাইন করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি চালের থলেটা পেতে রাস্তার ফুটপাথে বসে পড়লুম। ছ'টা নাগাদ বৌবাজারের দোকানের সামনে থেকে আরম্ভ করে লাইন কলুটোলা পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে। দোকান খোলবার সময় হয়ে এসেছে, এমন সময় এক জন গুণ্ডার মত লোক এসে জোর করে আমাদের সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি মাষ্টার-মানুষ, মারামারি করা শোভা পায় না। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে এই অত্যাচার দেখতে এবং সহ্য করতে লাগলুম। কিন্তু মাষ্টার ছাড়া লাইনে আরও তো লোক ছিল। সকলেই কিছু স্বাস্থ্যহীন বি-এ বি-টি নয়! সুতরাং দেখতে দেখতে একটা খণ্ড-যুদ্ধ বেধে গেল। ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি পিছন দিকে সরে গেলুম। দু'-এক ঘা আমার ঘাড়েও পড়লো, কিন্তু আমি প্রভু যীশুখৃষ্টের মতাবলম্বী! এক গালে চড় পড়লে অন্য গাল ফিরিয়ে দিই! তাই মার খেলুম, কিন্তু মারলুম না! যাক, ততক্ষণে দোকান খুলেছে, কিন্তু আমি অনেক পিছনে পড়ে গেছি। রাত তিনটে থেকে এসে ধর্ণা দেওয়া সত্ত্বেও যখন আমার টার্ণ এলো, বেলা তখন প্রায় ন'টা। আর পেলুম মাত্র এক সের চাল। তাতে কি হবে! শেষে অধিক—দ্বিগুণেরও বেশী মূল্য দিয়ে আরও সের দুই চাল ভিখিরীদের কাছ থেকে জোগাড় করে যখন বাড়ী ফিরলুম, তখন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। নাইবার খাবার সময় নেই,—অগত্যা না নেয়ে না খেয়েই স্কুল যেতে হলো। ঘাড়ে বেশ ব্যথা হয়েছে, ক্ষিধেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে—সুতরাং ভালো করে পড়াতে পারলুম না। ওদিকে সহকর্ম্মীদের ঠাট্টা! "কি হে অনাদি, চোখ-মুখ শুকনো, চান হয়নি, রাত্রে ঘুমোও নি—মনে হচ্ছে! ব্যাপার কি হে?"

ব্যাপার আর কি বলবো! একেবারে চরম! টিফিনের সময় দু'পয়সার মুড়ি খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করলুম। বিকেলে বাড়ী ফিরতেই মা বললেন,—"হ্যাঁ রে অনাদি, বলি, তোর আক্কেলটা কি রকম। বাড়ীতে এতগুলো ছোট ছেলেমেয়ে। চিনি নেই, দুধ খাবে কি করে?"

কাপড়-জামা ছেড়ে সেই মুখেই চিনি আনতে বার হচ্ছি, এমন সময় জ্যেঠতুতো বোন বুঁচির ছেলে নেংটী ধরে বসলো—"মামা, আমিও যাবো।" আমি তখন একটু রেগেই ছিলুম। রাগ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া সকালের ঘটনা তখনও স্মৃতিপটে অত্যন্ত সুপরিস্ফুট ছিল। তাই বললুম—"না, না, ছোট ছেলের ঐ ভীড়ে কণি য়োজ নেই।"

গলার স্বর নিশ্চয় একটু চড়া রকমের হয়েছিল। বুঁচি কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলের পিটে সজোরে এক চড় মেরে বললে—"অসভ্য ছেলে, কখনও বাজার দেখনি না কি?" নেংটী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। কান্নার কি ভলিউম! গলা সাধলে কালে এক জন বড় গাইয়ে হতে পারবে! মা ছুটে এলেন—"কি হয়েছে দাদা?" 'দাদা' ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে উত্তর দিলেন—"মামা আমাকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছে না দিদি, তাই মা আমাকে মে-রে-ছে···।" টানটা বেশ ওস্তাদি। মা বুঁচিকে বললেন, "ছি বুঁচি, ছেলেকে মারতে নেই।" আমাকে বললেন—"যা না ওকে সঙ্গে নিয়ে। ছেলেমানুষ, যেতে চাইছে।"

অগত্যা নেংটীর হাত ধরে চিনির উদ্দেশ্যে বার হয়ে পড়লুম। এ সীনের এন্‌কোর সহ্য হবে না!

নেংটী-সহ চিনির দোকানে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে সেই সকালের মত ভিড় আর লাইন। সজোরে নেংটীর হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়লুম। অপেক্ষা করছি তো করছিই, কখন্ নেংটীর হাত ছেড়ে গেছে, লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ দেখি, নেংটী পাশে নেই। চিনি কেনা মাথায় উঠে গেল। খোঁজ-খোঁজ! কিন্তু কোথায় নেংটী? হন্যে হয়ে চার ধারে ছুটোছুটী করতে লাগলুম।

ঘণ্টা দু'য়েক নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর খালি হাতে বাড়ী ফিরে সকলকে যখন এই দুঃসংবাদ শোনালুম, তখন সকলেই চটে লাল! মহিলাদের কান্নার রোলে আর পুরুষদের তর্জ্জন গর্জ্জন যেন প্রলয়ের সূচনা লাগলো। বুঁচি ঠেস দিয়ে বললে—"আমি জানতুম, এই রকম একটা কিছু ঘটবে।"

থানায় থানায় খবর দেওয়া হলো। সমস্ত রাত ধরে রিক্স ভাড়া করে রাস্তায় রাস্তায় খোঁজ চললো। ভোরের বেলায় মুচিপাড়া থানা থেকে শ্রীমানকে উদ্ধার করা গেল, কিন্তু আমার হৃত মানের আর উদ্ধার হলো—না, যদিও আমি তাকেই খুঁজে বার করলুম!

যে ক'দিন সকলে রইলেন, উঠতে বসতে আমাকে অপদার্থ, জন্তু-বিশেষ ইত্যাদি বিশেষণে জর্জ্জরিত করতে থাকলেন! সকলের মুখেই অসন্তোষের ভাব—মনোমত তোয়াজ হচ্ছে না! গরীব স্কুল-মাষ্টারের দুঃখ কেউ বোঝে না! আমার কি ইচ্ছা হয় না সকলকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করি? কিন্তু রেস্ত? ট্রামে করে এক দিন জু, এক দিন হাওড়ার পোল, এক দিন থিয়েটার, এক দিন সিনেমা—কিছুই বাদ থাকে না। কিন্তু সব ঐ এক দিন করে মাত্র। কারুরই তাতে মন ওঠে না, কিন্তু আমার ভিটেমাটী ওঠবার জো! এক-একটা দিন যায়, ঋণের পরিমাণ হুশ্-হুশ্ করে' ফেঁপে ওঠে! অর্থ-চিন্তা এবং বাক্য-যন্ত্রণায় প্রায় পাগল হবার উপক্রম! মা বলেন—"অনেক দিন পরে এসেছ, আরও কিছু দিন থেকে যাও। রেল-ভাড়া দিয়ে সব সময় তো আসা-যাওয়া চলে না।" কথাটা ঠিক—কিন্তু ভীত হয়ে পড়ি। তাঁরা বলেন—"ছুটী নেই, তাছাড়া আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে।" এ কথাও ঠিক এবং শুনে আশ্বস্ত হতে হয়। আর কিছু দিন থাকলে,···যাক্, শেষ অবধি আমি শেষ হবার আগে ছুটী শেষ হলো! তাঁরা চলে গেলেন। কিন্তু আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়ে গেলেন!

মা খুব খুশী। অনেক দিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা হ'লো। কিন্তু ছেলেকে যে কি শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হয়েছে, তা তিনি বুঝলেন না! বোঝাবার চেষ্টাও করলুম না! কারণ, বুঝতে তিনি পারবেন না! বাজারে দেনার যা পরিমাণ, তাতে তিন মাস না খেয়ে গাছতলায় দিগম্বর সেজে কিংবা ছেঁড়া কাপড় পরে থাকলে হয়তো তা শোধ করা সম্ভব। কিন্তু সে উপায়ও নেই। স্কুলে পড়াই। মোটা ফর্শা ধুতি-পাঞ্জাবী, পায়ে এক জোড়া জুতো, আরও আনুষঙ্গিক অনেক সব খরচ-পত্র আছে। এ সব না করলে ছেলেরা না কি মানবে না! সেক্রেটারীর খিঁচুনী সহ্য করতে হবে! ছেলেদের কাছে মান ও সেক্রেটারীর মন রাখতে গিয়ে কাবলীওয়ালার মন আর রাখতে পারছি না—রোজ সকালে-বিকেলে তাগাদা দিচ্ছে। আর একটা প্রাইভেট টুইশনি খুঁজছি। আপনাদের সন্ধানে থাকলে একটা খবর দিয়ে কৃতার্থ করবেন!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন

চতুর্থ প্রস্তাব

এই তাম্রশাসনখানি সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য মাসিক বসুমতীর ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় তিন প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই সকল তথ্যের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

এই তাম্রশাসনখানি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায়, কাপাসিয়া থানার অধীন রাজাবাড়ী আফিস-লাইব্রেরীর এক কাঠের সিন্দুকে উহা বিস্মৃত অবস্থায় প্রায় শতাব্দকাল পড়িয়া থাকে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিচিত্র উপায়ে পুনরাবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গালার বর্ত্তমান গভর্ণর সার জন হার্বার্টের সহিত উহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে ফিরিয়া আসে। এসিয়াটিক সোসাইটির আহ্বানে সোসাইটির পত্রিকায় বিস্তৃত প্রবন্ধে (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধে) ইংরেজী ভাষায় আমি উহার সম্পাদন করিয়াছি। বসুমতীর পাঠকগণের জন্য সেই প্রবন্ধের মর্ম্ম স্থানে স্থানে বিস্তৃততর, স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ততর করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি।
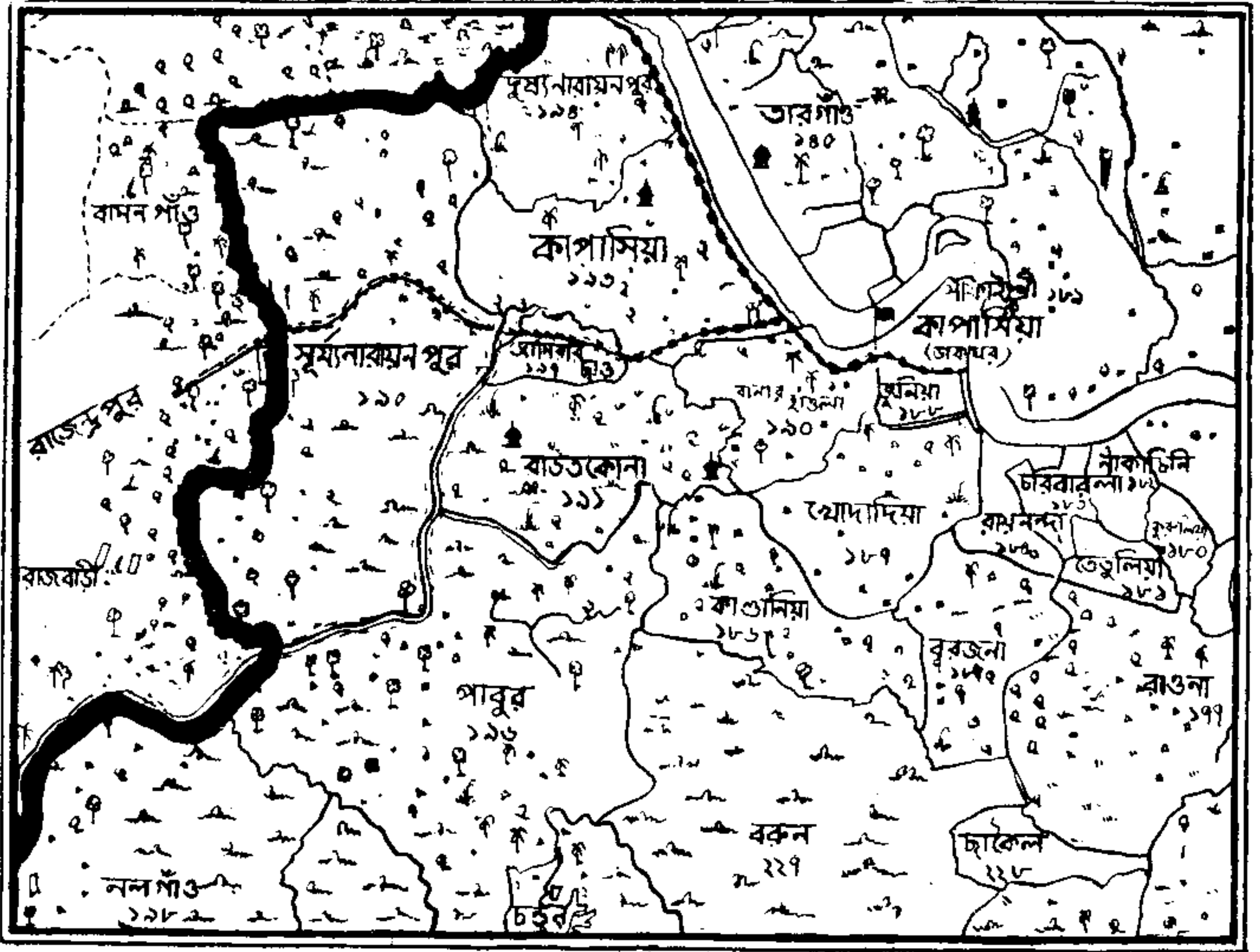
তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান রাজাবাড়ী গ্রাম এবং শাসনপ্রদত্ত ভূমির সংস্থান ১´ = ১ মাইলের কিছু বেশী

গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। ভাওয়ালের জমীদার লোকনারায়ণ রায় উহা হস্তগত করেন এবং লোকনারায়ণের পুত্র গোলোকনারায়ণের নিকট হইতে ঢাকার তদানীন্তন মেজিষ্ট্রেট ওয়াল্টারস্ সাহেব উহা সংগ্রহ করেন। কোর্টপণ্ডিত ভৈরব তর্কালঙ্কারের মংগড়া পাঠসহ উহা কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন সেক্রেটারী ডক্টর উইলসন তিন জন পণ্ডিতের সাহায্যে শাসনখানির বিশুদ্ধতর পাঠ প্রস্তুত করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখের অধিবেশনে উহার একটি বিবরণ প্রকাশিত করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাইবার কালে শাসনখানি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এবং ইণ্ডিয়া

তাম্রশাসনখানি ১২″ × ১৩¾″ ইঞ্চি একখানা তামার পাতের উপর খোদিত। উহার মস্তকাকৃতি ঊর্দ্ধাঙ্গে রাজকীয় মুদ্রা একটি ক্ষুদ্র সদাশিব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্বপ্রাপ্ত ছয়খানা তাম্রশাসনের মধ্যে পাবনা জেলার চলন বিলের পূর্ব্বে মাধাই-নগর গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের সহিত এই ভাওয়াল তাম্র-শাসনের পদ্যাংশে অবিকল মিল আছে। শাসনের আরম্ভে বিবিধ ছন্দে রচিত ত্রয়োদশটি শ্লোক উভয় শাসনেই এক। প্রথম শ্লোকে পঞ্চাননের বন্দনা। দ্বিতীয়ে সেনবংশের আদি-পুরুষ চন্দ্রদেবের। তৃতীয়ে চন্দ্রবংশে বীরগণের জন্ম বর্ণিত। চতুর্থে এই বংশে জাত পুরাণ-কীর্ত্তিত বীরসেনের বংশে সামন্তসেনের জন্ম

বর্ণিত। পঞ্চমে সামন্তের পুত্র হেমন্ত বর্ণিত। ষষ্ঠে হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন বর্ণিত। সপ্তমে বিজয়সেনের ত্রিভুবনব্যাপী যশঃ বর্ণিত। অষ্টমে বিজয়পুত্র বল্লাল বর্ণিত। নবমের বক্তব্য, বিজয়সেন চালুক্য-রাজকন্যা রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দশমে বিজয়সেন ও রামদেবী হইতে লক্ষ্মণসেনের জন্ম বর্ণিত। একাদশে লক্ষ্মণসেনের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত। দৃপ্ত গৌড়েশ্বরের শ্রী হরণ করা ছিল তাঁহার কৌমারকেলি। পরাজিত কলিঙ্গরাজ সর্ব্বদা যুবতী উপহার দিয়া যৌবনে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেন। কাশীরাজকে তিনি সমরক্ষেত্রে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভীরু প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ তাঁহার চরণ-ধূলির বলে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। দ্বাদশের বক্তব্য দিক্‌পতিগণ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশের বক্তব্য, যে ভূমি রাজগণ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসনের মস্তকে রাজকীয় লাঞ্ছন
সদাশিব মূর্ত্তি

মনে করেন, লক্ষ্মণসেন শত শত গ্রামরূপে সেই ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন।

শাসনের গদ্যাংশে দেখা যায়, মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন তাঁহার রাজত্বের ২৭শ বৎসরে ৬ই কার্ত্তিক তারিখে ধার্য্যগ্রাম নামক নূতন রাজধানী হইতে মহাদেবী শূন্যা দেবী ও মহাদেবী কল্যাণ দেবীর মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি কামনায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বাগুন আবৃত্তির বসুশ্রী চতুরকে অবস্থিত মাদিসাহংস ও বসুমণ্ডণ গ্রামের অংশ এবং বানার নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত আরও চারিটি খণ্ডক্ষেত্র, সর্ব্বসাকুল্যে বাৎসরিক ৪০০ শত কপর্দ্দক-পুরাণ আয়ের ভূমি মৌদ্গল্য গোত্রের এবং ঔর্ব্বাদি পঞ্চ প্রবরের কুম্ভদেবের প্রপৌত্র জয়দেবের পৌত্র, মহাদেবের পুত্র পাঠক পদ্মনাভ দেবশর্ম্মাকে দান করিতেছেন।

এই শাসনে লক্ষ্মণসেনের প্রতি প্রযুক্ত দুইটি বিশেষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, তিনি নিজভুজমন্দর দ্বারা ভীমবেগে বিষম সমরসাগর মথিত করিয়া গৌড়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি বীরগণরূপ কমল সমূহের বিকাশে ভাস্কর সদৃশ ছিলেন।

এই শাসন ও মাধাইনগর শাসনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্য পাঠকগণকে পূর্ব্বের তিনটি প্রস্তাব পুনরায় পড়িতে হইবে।

নিম্নে তাম্রশাসনখানির মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

প্রথম পৃষ্ঠ

ছত্র ১। ওঁ নমো নারায়ণায় ॥
যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরীপ্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিং সমাশ্রিতমভূত্তস্যাতি

ছত্র ২। চিত্রং বপুঃ।
দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানো মুখং
দেবস্ত্বাং স নিরস্তদানবগজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ ॥ [১]
স্বর্গ্গ

ছত্র ৩। ঙ্গাজলপুণ্ডরীকমমৃতপ্রাঘারধারাগৃহম্
শৃঙ্গারদ্রুমপুষ্পমীশ্বরশিখালঙ্কারমুক্তামণিঃ।
ক্ষীরাম্ভোনিধিজী

ছত্র ৪। বিতং কুমুদিনীবৃন্দৈকবৈহাসিকো
জীয়ান্মন্মথরাজ্যপৌষ্টিকমহাশান্তিদ্বিজশ্চন্দ্রমাঃ ॥ [২]
ত্রিভুবন জয়শম্ভু

ছত্র ৫। তালুক্লুপ্তৈঃ
ক্রতুভিরবারিতসত্রিণোঽমরাণাম্।
অজনিষত তদন্বয়ে ধরিত্রী-
বলয়বিশৃঙ্খলকীর্ত্তয়ো নরেন্দ্রাঃ ॥ [৩]

ছত্র ৬।
পৌরাণিভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণগণে বীরসেনস্য বংশে।
কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি-কুল-শিরোদাম

ছত্র ৭। সামন্তসেনঃ।
কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমপি ন তরাং তৃপ্যতা নাকনদ্যাং
নির্ন্নিক্তো যেন যুধ্যত্রিপুরুধিরকণা

ছত্র ৮। কীর্ণধারঃ কৃপাণঃ ॥ [৪]
বীরাণামধিদৈবতং রিপুচমুমারাঙ্কমল্লব্রত-
স্তস্মাদ্‌বিস্ময়নীয় শৌর্য্যমহিমা

ছত্র ৯। হেমন্তসেনোঽভবত্।
ক্ষীরোদাধরবাসসো বসুমতীদেব্যা যদীয়ং যশো
রত্নস্তেব সুমেরুমৌলিমি

ছত্র ১০। লিতং ক্ষৌমশ্রিয়ং পুষ্যতি ॥ [৫]
অজনি বিজয়সেনস্তেজসাং রাশিরস্মাত্
সমরবিস্ময়রাণাং ভূভৃতামে

ছত্র ১১। কশেষঃ।
ইহ জগতি বিষেহে যেন বংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥ [৬]

ভূচক্রং

ছত্র ১২। কিয়দেতদাবৃতমভূত্ত্বদ্ধামনস্তাংঘ্রিণা

নাগানাং কিয়দাস্পদং যদুরসা লঙ্ঘয়ন্তি গূঢ়াজ্ঘ্রয়ঃ।

একাহ্না

ছত্র ১৩। ত্বদনূরুরঞ্চতি কিয়ন্মাত্রং তদপ্যম্বরং

যস্তেতীব যশো হ্রিয়া ত্রিভুবনং ব্যাপ্যাপি নো তৃপ্যতি॥ [৭]

তস্মাদশেষ

ছত্র ১৪। ভুবনোৎসবপার্ব্বণেন্দু-

র্ব্বল্লালসেনজগতীপতিরুজ্জগাম।

যঃ কেবলং ন খলু সর্ব্ব নরেশ্বরাণা-

মেকঃ স

ছত্র ১৫। মগ্রবিদুষামপি চক্রবর্ত্তী॥ (১) [৮]

ধরাধরান্তঃপুর-মৌলি-রত্নং

চালুক্যভূপালকুলেন্দু-লেখা।

তস্য প্রিয়াভূ

ছত্র ১৬। দ্বহমান ভূমি-

র্ল্লক্ষ্মী পৃথিব্যো-রপি রামদেবী॥ [৯]

এতাভ্যাং বসুদেবদেবকসুতাদেহান্তরাভ্যামিব

শ্রীমল্ল

ছত্র ১৭। ক্ষ্মণ-সেনমূর্ত্তিরজনি ক্ষ্মাপালনারায়ণঃ।

চক্রে যন্ময়জন্মনিসৃসহ মিলন্নিদ্রাস্তুবন্ধচ্ছলাত্

ক্ব—

ছত্র ১৮। ক্ষেনাধিপয়োধিকঞ্চুকমিব ত্যক্ত্বা প্রমুগ্ধং বপুঃ॥ [১০]

দৃপ্যদ্গৌড়েশ্বর শ্রীহঠহরণকলা যস্য কৌমা

ছত্র ১৯। র-কেলিঃ

কালিঙ্গৈনাঙ্গনাভিঃ প্রতিপদমুপদাশ্চক্রিরে যস্য যূনঃ।

যেনাসৌ কাশিরাজঃ সমর-

ছত্র ২০। ভুবি জিতো যস্য নিস্ত্রিংশধারা

ভীরুঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষেন্দ্রশ্চরণজ-রজসা-নির্ম্মমে কার্ম্মণানি॥[১১]

আকৌ

ছত্র ২১। মারং সমরজয়িনা কুর্ব্বতোর্ব্বীমবীরা-

মেতেনামী কথমিব দিশামীসিতারো (২) বিমুক্তাঃ

যুদ্ধোদ্দীপ্তে ব

ছত্র ২২। পুষি কলয়া তস্য তেষ্টৌ প্রবিষ্টাঃ

প্রহ্বীভূতে প্রভবতি নহি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ॥ [১২]

যত্রারামক্রমদলক্ব

ছত্র ২৩। চা শৈবলিন্যুর্দ্ধগঙ্গা

শস্য (৩) ব্যাজাজ্জয়পদগুণৈর্যেষু রোমাঞ্চিতা ভূঃ।

প্রাণান্মুঞ্চন্ত্যবনিপতয়ো

ছত্র ২৪। নো পুনর্য্যাননেন

গ্রামাস্তেতে সপদি দদিরে কোটিশঃ শাসনানি॥ [১৩]

(১) মূলে চক্রবর্ত্তি পাঠ আছে।

(২) ঈশিতারো পঠিতব্য।

(৩) মূলে সস্য।

তে খলু ধার্য্যগ্রামপরিসরস

ছত্র ২৫।

মাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত্ পরমেশ্বর-পরমসৌর

পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লা-

ছত্র ২৬।

ল সেনদেবপাদানুধ্যাতনিজভুজমন্দরা-মন্দরপ্রমথিতা

সীমসমর-সাগরসমাসাদিতগৌড়লক্ষ্মী-বীর

ছত্র ২৭।

সকলকুশেশয়বিকাশ (১)বাসরংকর-গৌড়েশ্বর-পর-

মেশ্বরপরমনারসিংহপরমভট্টারক মহারা

ছত্র ২৮। জাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদা বিজয়িনঃ।

সমুপগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণক রা

ছত্র ২৯।

জপুত্ররাজামাত্যমহাপুরোহিতমহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহা

সান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃ

ছত্র ৩০।

তান্তরঙ্গ বৃহদুপরিকমহাক্ষপটলিকমহাপ্রতীহার

মহাভোগিক মহাপীলুপতি মহাগণস্থ দৌঃ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ

ছত্র ১।

সাধিকচৌরোদ্ধরণিকনৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদি

ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশি

ছত্র ২।

ক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদিন্ অন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবি-

নোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তি—

ছত্র ৩।

তান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্

ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়ন্তি বোধ

ছত্র ৪।

য়ন্তি সমাদিশন্তি চ মতমস্ত ভবতাম্ যথা শ্রীপৌণ্ড্-

বর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বাওণাবৃত্যন্তর্গ্গত বসুশ্রীচতু—

ছত্র ৫।

রকে পূর্ব্বে পোঞ্চেসাদাণ্ডিসীমা দক্ষিণে জলদাণ্ডিসীমা

পশ্চিমে মজনদীসীমা উত্তরেপি তথা

ছত্র ৬।

সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নং কবিল্কী চুঞ্চলী গাণ্ডোলী

দেহিয়া খণ্ডক্ষেত্র সমেত বাস্তু

ছত্র ৭।

মণ্ডণগ্রামকিয়দেকদেশঃ পূর্ব্বে গুড়হাস সম্বন্ধিভূসূত্রদ্বয়ং

সিংহজাবিল্কী তথা কেমতগ্রাবাটী পশ্চিমকা

ছত্র ৮।

ণ্ডিস্তথা জলদাণ্ডিসম্বন্ধীয়চতুঃসূত্রভ্রষ্টজলনির্গ্গম

জাণঃসীমা দক্ষিণে জলদাণ্ডি-সীমা

(১) মূলে কুশেষয় এবং বিকাস।

ছত্র ৯।
পশ্চিমায়াঞ্চ জলদাণ্ডি সীমা উত্তরে বানহার নদঃ
সীমা। ইত্থঞ্চতুঃসীমাবচ্ছিন্নো মা

ছত্র ১০।
দিসাহংসগ্রামকিয়দেক-দেশঃ ইত্থমেতাবুপরি-
লিখিতভূসীমাবচ্ছিন্নৌ দ্বাবিংশতিহস্ত

ছত্র ১১।
পরিমিতনলেন তলবর্ত্তসমেত কাকিন্যষ্টাবিংশতি ষষ্ট্য-
ধিকপাটেকো (১) সমেত দ্রোণৈকান্বিত

ছত্র ১২।
সমুদয়ভূপাটকাত্মকাঃ সম্বত্সরেণ কপর্দ্দক পুরাণশত
চতুষ্টয়োৎপত্তিক খণ্ড-ক্ষেত্র চতুষ্টয় স (২)

ছত্র ১৩।
সমেতাবাস্থমণ্ডণমাদিসাহংশকিয়দেকভূভাগৌ
সঝাটবিটপৌ সজলস্থলৌ সগর্ত্তো

ছত্র ১৪।
ষরৌ সগুবাক-নারিকেলৌ সহৃদশাপরাধৌ পরিহৃ
সর্ব্বপীড়াবচট্টভট্টপ্রবেশাবকিঞ্চিৎ প্র

ছত্র ১৫।
গ্রাহ্যৌ তৃণপূর্ত্তিগোচরপর্য্যন্তৌ কৃষ্ণদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌ-
ত্রায় জয়দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় মহাদেব

ছত্র ১৬।
দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় যোদ্ঘাল্য সগোত্রায় ঔর্ব্বচ্যবনভার্গবগব
জামদগ্নআপ্নুবান্প্রবরায় সামবেদকৌথুম

ছত্র ১৭।
শাখাচরণাবধায়িনে পাঠকশ্রীপদ্মনাভদেবশর্ম্মণে পুণ্যে
অহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগব—

ছত্র ১৮।
ন্তং শ্রীমন্নারায়ণ-ভট্টারকমুদ্দিশ্য মহাদেবী শৃয়া দেবী
মহাদেবী কল্যাণদেব্যাঃ ভূতি পৌষ্টি নি

ছত্র ১৯।
মিত্তং বাস্তগোচরাভ্যাং সম্বর্ষ্বেন শতচতুষ্টয়োৎপত্তি-
কাং ভূমিমুত্সৃজ্যাচন্দ্রার্ক-ক্ষিতিসমকালং যাবৎ

ছত্র ২০।
ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্বা প্রদত্তা অস্মাভিঃ।
তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যাঃ ভাবি

ছত্র ২১।
ভি রপি ভূপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াত্ পালনে
ধর্ম্ম-গৌরবাত্ শাসনমিদং পালনীয়ম্। ভব

ছত্র ২২।
ন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। ভূমিং যঃ
প্রতি-গৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্য-
কর্ম্মাণৌ নি

ছত্র ২৩।
য়তং স্বর্গ-গামিনৌ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ
সগরাদিভিঃ যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা

ছত্র ২৪।
ফলং। আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ,
ভূমিদাতা কুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি। ষ

ছত্র ২৫।
ষ্টিম্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চা
মন্তা চ তান্যেব নরকে বসেত্। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো

ছত্র ২৬।
হরেত বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ
পচ্যতে॥ ইতি কমলদলাম্বু-বিন্দু-লোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য

ছত্র ২৭।
মনুষ্য-জীবিতঞ্চ সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি
পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ অরিরাজমদ

ছত্র ২৮।
নশঙ্করনরপতিরকরোন্মহিশতমুখ্যং। শঙ্কর ধরমিহ
দূতং গৌড়মহাসান্ধি-বিগ্রহিকং॥

ছত্র ২৯।
শ্রীনি মহাসাং নি। শ্রীমদ্রাজ নি। শ্রীমদন শঙ্কর নি।
শ্রীমত্সাহসমল্ল নি। সং ২৭। কা দি নে ৬

বঙ্গানুবাদ

সিদ্ধ হউক (১)। ওঁ নারায়ণকে নমস্কার।

যাঁর অঙ্কোপরি প্রিয়া গৌরী যায় দেখা।
শারদ মেঘের বুকে যেন তড়িল্লেখা॥
অর্দ্ধদেহে সমাশ্রিয়া হরি [নীল কায়]।
বিচিত্র চিত্রিত দেহ যার শোভা পায়॥
প্রদীপ্ত সূর্য্যের তেজে জ্বলে ত্রিনয়ন।
সেই তেজে ঘোররূপ যাঁহার বদন॥
নিরন্তদানব-গজ দেব পঞ্চানন।
সে দেব করুন তব মঙ্গল বর্দ্ধন॥ ১॥
সুরনদী জলে যেই পুণ্ডরীক প্রায়।
যাহা হ'তে সুধা-ধারা নিয়ত চুয়ায়॥
প্রেমের বিটপি-শাখে কুসুম আকার।
হরশিরে যেই মুক্তা মণি অলঙ্কার॥
ক্ষীরোদসাগরে যেই লভিল জনম।
আনন্দে পূরায় যেই কুমুদী মরম॥
মন্মথরাজার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি তরে।
দ্বিজরাজ যেই মহাশান্তিযজ্ঞ করে॥
[দেবের প্রধান] সেই সে দেব চন্দ্রমা।
দিনে দিনে বাড়ুক সে দেবের মহিমা॥ ২॥

---

(১) পাটক পঠিতব্য। (২) অতিরিক্ত স বর্জ্জয়িতব্য।

(১) স্বস্তিক চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত। ইহা শুণ্ডাকার একটি চিহ্ন। গণেশের শুণ্ডের প্রতীক।

ত্রিলোকজয়ান্তে যাঁরা যজ্ঞ অনুষ্ঠিয়া।
অমরধামের দ্বার ফেলিল খুলিয়া॥
ধরা বুকে বাধা হীন ধায় কীর্ত্তিরাশি।
হেন রাজগণ সেই বংশে জন্মে আসি॥ ৩॥
পুরাণ-কাহিনী যার ঘোষে গুণগণ।
সেই বীরসেন-বংশে লভিলা জনম॥
কর্ণাট হইতে যত ক্ষত্র আসিলেন।
শিরোমাল্য তাঁহাদের শ্রীসামন্ত সেন॥

সুমেরু-মৌলিতে পরে [করি কত প্রীতি]।
হেমন্তের যশোরাশি যেন মণিদ্যুতি॥ ৫॥
তেজোরাশি শ্রীবিজয় জন্মে হ'তে সেই।
দিগ্বিজয়ী রাজগণে শেষ রাজা যেই॥
রাজশব্দ নাম্ সহ শুধু সহি যায়।
নিজ বংশ আদি বলি মাত্র চন্দ্রমায়॥ ৬॥
ভূচক্র গরব আর করে কি লইয়া।
বামনের পদে যারে ফেলে আচ্ছাদিয়া॥
পাতালে যে নাগলোক তাও তুচ্ছ লাগে।
লঙ্ঘে যারে বুকে হাঁটি পদহীন নাগে॥
আকাশের মহিমা বা গাহিব কি আর।
এক দিনে লঙ্ঘে যারে উরু নাই যার॥
এমতি ভাবিয়া তাঁর মহা যশোরাশি।
ত্রিভুবন ব্যাপিয়াও না হইল খুসি॥ ৭॥
তাঁ'হতে বল্লালসেন জন্মে জগদিন্দ্র।
অশেষ ভুবনোৎসব পার্ব্বণের চন্দ্র॥
নরেশ্বর চক্রবর্ত্তী নহে শুধু যেই।
পণ্ডিতগণেও হয় চক্রবর্ত্তী সেই॥ ৮॥
সে রাজার অন্তঃপুর মুকুটের মণি।
চালুক্য রাজার কুলইন্দুলেখা খানি॥
হইল তাঁহার প্রিয়া, রামদেবী নাম।
ধরা লক্ষ্মী [সতীনেরও] বহুমান ধাম॥ ৯॥
বসুদেব-দেবকীর দেহ হতে যথা।
জনম লভিয়াছিল নারায়ণ, তথা॥
এই দুই জন হ'তে ভূপালতনয়।
লক্ষ্মণসেনের মূর্ত্তি হইল উদয়॥
ক্ষীরোদসাগরে রাখি নিদ্রামুগ্ধ কায়।
সিন্ধুজলে ছলে ত্যক্ত কঞ্চুকের প্রায়॥
কৃষ্ণ সেই ধরাধামে হইলা উদয়।
লক্ষ্মণসেনের রূপে বল্লাল তনয়॥ ১০॥
দৃপ্ত গৌড়েশ্বর লক্ষ্মী স্ববলে হরণ করি
খেলিল যে কৈশোরের খেলা।
প্রতিবারে দিব্য নারী উপহারে তোষে যারে
কলিঙ্গরাজায় যুব-বেলা॥
সমর-অঙ্গনে যেই কাশীরাজে পরাজিল।
যাঁহার অসির ধার ভয়ে।

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন—প্রথম পৃষ্ঠ

পৃথ্বীতল বীরশূন্য করিয়াও যাঁর।
তৃপ্তির উদয় হৃদে না হইল আর
ধাইল সে বীর তাই সুরধুনী-তীরে।
শত্রুরক্তকীর্ণ অসি ধুইবার তরে॥ ৪॥
শ্রীহেমন্তসেন জন্মে সেই বীর ঘরে।
দেবতা বলিয়া যারে বীরগণ বরে॥
তার শৌর্য্য-মহিমায় লাগয়ে বিস্ময়।
মল্লব্রত জীবনের রিপু-চমূ ক্ষয়॥
ক্ষীরোদসাগর যার অধোবাসখানি।
সেই বসুমতী দেবী ক্ষৌম শোভা মানি॥

ভীরু প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ মন্ত্রঃপূত রক্ষা রচে
যাঁহার চরণধূলি লয়ে॥ ১১॥
আকৌমার জয়ী রণে, নিঃশেষিল বীরগণে,
তাই সে জিজ্ঞাসা জাগে মনে।
দিক্-অধিপতি যারা অব্যাহতি লভে তারা
কেমনে এ মহাবীর রণে॥
সেই অষ্ট দিক্‌পাল বিস্তারি কৌশল-জাল
যুদ্ধোদ্দীপ্ত পশে দেহে তার।
বিহ্বল অবশ যারা ক্ষত্রিয়ের অসিধারা
নাহি করে তাদের সংহার॥ ১২॥

আরামবিটপীদলরুচির প্রভায়।
যথায় তটিনীগুলি অৰ্দ্ধগঙ্গা প্রায় ॥
যথা বসুধার সদা জয়গানে মন।
শস্য ছলে বুকে তাহে জাগে শিহরণ ॥
পরাণ সঁপয়ে, তবু হেন ভূমিখানি।
নাহি ছাড়ে নৃপতিরা [মহারত্ন মানি] ॥
এই রাজা সেইভূমে শত শত গ্রাম।
[ব্রাহ্মণে] শাসন করি দিল অবিরাম ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন—দ্বিতীয় পৃষ্ঠ

ধার্য্যগ্রাম-পরিসর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার (= রাজধানী) হইতে পরমেশ্বর, পরমসৌর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেবের পাদানুধ্যানকারী সেই রাজা, যিনি নিজ ভুজমন্দর দ্বারা ভীম বেগে অসীম সমরসাগর সংমথিত করিয়া গৌড়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; যিনি বীরগণরূপ কমলবৃন্দের বিকাশে ভাস্কর-সদৃশ ছিলেন ; সেই গৌড়েশ্বর, পরমেশ্বর, পরমনরসিংহভক্ত, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীলক্ষ্মণসেনদেবপাদ বিজয়যুক্ত আছেন।

সমবেত অশেষরাজ, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, মহাপুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ, বৃহত্‌পরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃসাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌ—বল—হস্তী—অশ্ব—গো—মহিষ—অজ—অবিক (= মেষ) ইত্যাদির অধ্যক্ষ, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি এবং অধ্যক্ষপ্রচারে (=সরকারী রাজকর্ম্মচারীর তালিকায়) উক্ত, কিন্তু এই স্থানে অনুল্লিখিত সকল রাজকর্ম্মচারী এবং চট্ট ভট্ট জাতীয় অধিবাসিগণ, ক্ষেত্রকর (=কৃষক)গণ, ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণেতর সমস্ত অধিবাসিগণকে [রাজা] যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক জানাইতেছেন এবং আদেশও করিতেছেন যে [নিম্নলিখিত ব্যাপারে] আপনাদের মত হউক।

যথা,—শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাত বাগুন আবৃত্তির অন্তর্গত বসুশ্রী চতুরকে—

[চৌহদ্দি]

পূর্ব্বে পোক্ষেষাদাণ্ডিসীমা।
দক্ষিণে জলদাণ্ডিসীমা।
পশ্চিমে মজা নদীর সীমা।
উত্তরেও সেই সীমা।

এই চতুঃসীমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন কবিল্কী, চুঞ্চলী, গাণ্ডোলী এবং দেহিয়াস্থিত খণ্ডক্ষেত্রচতুষ্টয় সমেত বাসুমণ্ডন গ্রামের কিয়দংশ।

পূর্ব্বে গুড়হাস সম্বন্ধীয় ভূস্ত্রদ্বয়।
সিংহজাবিল্কী, কেমতগ্রাবাটি, পশ্চিমকাণ্ডি এবং জলদাণ্ডির চতুঃস্ত্র
ভ্রষ্ট জলনির্গম জাণের সীমা।
দক্ষিণে জলদাণ্ডি সীমা।
পশ্চিমেও জলদাণ্ডি সীমা।
উত্তরে বানহার নদ সীমা।

এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মাদিসাহংস গ্রামের কিয়দংশ।

উপরের লিখিতমত সীমাবচ্ছিন্ন দুইটি ভূখণ্ড তলবর্ত্তসমেত বাইশ হাত নলের মাপে ৬ পাটক ১ দ্রোণ ২৮ কাকিনী—সম্বৎসরে যাহা হইতে চারি শত কপর্দ্দকপুরাণ আয় হয়, এমনি চারিটি খণ্ডক্ষেত্র সমেত বাসুমণ্ডন ও মাদিসাহংস গ্রামের কিয়দংশ,—ঝোপঝাড় ও গাছপালা সহ, জলস্থল সহ, গর্ত্ত ও পতিত ভূমি সহ, সুপারি ও নারিকেল গাছ সহ, সমস্ত দায় মুক্ত করিয়া, দশবিধ অপরাধেও বাজেয়াপ্ত হইবে না, এই ব্যবস্থা করিয়া, চটভট্টগণের অপ্রবেশ্য করিয়া, সম্পূর্ণ করমুক্ত করিয়া, [এমন কি] জঙ্গলা তৃণ পুঁই ইত্যাদি পূর্ণ গোচরজমী সহ কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র জয়দেব শর্ম্মার পৌত্র মহাদেব দেব-শর্ম্মার পুত্র, মৌদ্গল্য গোত্রীয়, ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন আপ্নুবান্ এই পঞ্চ প্রবর, সামবেদের কৌথুম-শাখাচরণাবধায়ী পাঠক শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মাকে পুণ্য দিনে, বিধি অনুসারে জলাঞ্জলি সহ, ভগবান শ্রীনারায়ণ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মহাদেবী শূয়াদেবী এবং

মহাদেবী কল্যাণ দেবী মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য সম্বৎসরে চারি শত [কপর্দ্দক পুরাণ] আয়ের বাস্তু গোচরাদি ভূমি, যত দিন চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবী আছে, তত দিনের জন্য, ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুসারে উৎসর্গ পূর্ব্বক তাম্রশাসন করিয়া আমাদের দ্বারা প্রদত্ত হইল।

আপনাদের সকল কর্তৃক [এই দান] অনুমোদিত হউক। পালনে ধর্ম্ম-গৌরব এবং অপহরণে নরকপাতভয় হেতু ভাবী নৃপতিগণেরও এই শাসন পালনীয়।

এই স্থানে [নিম্নলিখিত] ধর্ম্মানুশংসী শ্লোকসমূহ কথিত হয়।

ভূমি যে দান করে এবং যে ভূমিদান গ্রহণ করে, সেই পুণ্যকর্ম্মা উভয় ব্যক্তিই নিরত স্বর্গে গমন করে।

সগরাদি বহু রাজগণ পূর্ব্বে ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। যে যখন সেই ভূমির মালিক হয়, দানফল তখন তাঁহারই প্রাপ্য হয়।

পিতাগণ বাহ্বাস্ফোট করেন এবং পিতামহগণ আনন্দে নৃত্য করেন (এই বলিয়া, যে) আমাদের কুলে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে আমাদের পরিত্রাণকর্ত্তা হইবে।

ভূমিদাতা ষাট্ হাজার বৎসর স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করেন। যিনি সেই দান নষ্ট করেন বা নষ্ট করার অনুমোদন করেন, তিনি সেই পরিমাণ কাল নরকে বাস করেন।

নিজের বা পরের দত্ত ভূমি যিনি হরণ করেন, তিনি বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিয়া মরেন।

এইরূপে সমৃদ্ধি এবং মনুষ্য-জীবন কমলপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, ইহা চিন্তা করিয়া, উপরে কথিত বিষয়গুলি বুঝিয়া কোন মানবের পরকীর্ত্তি বিলোপ করা উচিত নহে।

শত দেশে প্রধান বলিয়া স্বীকৃত গৌড়রাজ্যের মহাসান্ধিবিগ্রহিক শঙ্করধরকে অরিরাজ মদনশঙ্কর নরপতি (লক্ষ্মণসেন) এই শাসনের দূতক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রী (ভগবান কর্ত্তৃক) সাক্ষ্যকৃত। মহাসান্ধিবিগ্রহিক কর্তৃক সাক্ষ্যকৃত। শ্রীমদ্রাজা কর্ত্তৃক সাক্ষ্যকৃত। শ্রীযুক্ত মদনশঙ্কর কর্ত্তৃক সাক্ষ্যকৃত। শ্রীমৎ সাহসমল্ল কর্ত্তৃক সাক্ষ্যকৃত। সং ২৭। কার্ত্তিক দিনের ৬।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ডমহোৎসব

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অর্থাৎ নদীসকল যেমন সর্ব্বদা পরিপূর্ণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগসকল যাঁহাকে আশ্রয় করে, তিনিই শান্তি লাভ করেন; ভোগার্থী ব্যক্তি সে শান্তি পাইতে পারেন না।

রঘুনাথের চিত্ত ভোগ-কামনায় বিক্ষুব্ধ ছিল না, তথাপি স্থিতধীর যে ধৈর্য্য, তাহা এত দিন তাঁহার অধিগত ছিল না বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের এই উপদেশ। বিষয় যে চাহে না, বিষয় আসিয়া তাহাতে উপসন্ন হয় কেন? শ্রীধরস্বামী ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি" অর্থাৎ "সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, ভোগের দ্বারা অবিকৃতচিত্ত হওয়াতেও সেই সকল ভোগ প্রারব্ধ কর্ম্মাবলীর দ্বারা উপনীত হইয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীব্র ভক্তির দ্বারাই প্রারব্ধ ক্ষয় হইতে পারে এবং প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই এই ভোগ-প্রবাহের গতি রুদ্ধ হয়, এই জন্যই শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে 'অন্তর্নিষ্ঠার' উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। রঘুনাথ এখন কায়মনোবাক্যে সেই ইষ্টনিষ্ঠাই অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং বাহিরে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে বিষয়ী সাজিলেন।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারেরও যথেষ্ট শত্রু ছিল। এই সপ্তগ্রাম মুলুক বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পূর্ব্বে এক মুসলমান চৌধুরী এই মুলুকের অধিকারী ছিলেন। তিনি মুসলমান আমীর বলিয়া যথাসময়ে গৌড়ের বাদশাহের রাজস্ব সরবরাহ করিতেন না; এ জন্য তিনি মুলুকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মুলুকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও গৌড়ের রাজ-সরকারের নব-নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব অল্প ছিল না। পূর্ব্বে এই অধিকারীর সহিত হিরণ্য দাসেরও সৌহৃদ্য ছিল; এই অধিকারী মনে করিয়াছিল যে, হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস মুলুকের অধিকারী হইলে সে-ও মুলুকের উপস্বত্ব হইতে কিছু অংশ পাইবে। কিন্তু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন তাহাকে কিছুই দিলেন না। ইহাতে সে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া গৌড়ের রাজ-সরকারে অভিযোগ করিল যে, হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস সপ্তগ্রাম মুলুক হইতে বহু রাজস্ব আদায় করেন, কিন্তু সরকারে অতি অল্পই হিসাব দিয়া থাকেন। উজীরকে এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়া গৌড়েশ্বর অপরাধিগণকে শাস্তি দিতে বলিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সপ্তগ্রামে ফৌজদারি থাকায় সেখানে কারাগারও ছিল। মুসলমান কর্ম্মচারী আসিয়া হিরণ্য দাসকে বা গোবর্দ্ধন দাসকে ধরিতে পারিলেন না—তাঁহারা উভয়েই মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু রঘুনাথ পলাইলেন না—এই জন্য মুসলমান কর্ম্মচারী তাঁহাকে ধরিয়া কারাগারে রাখিল। বলা বাহুল্য যে, এই উজীর বা মুসলমান কর্ম্মচারী সপ্তগ্রামের পূর্ব্ব-অধিকারী চৌধুরীর বন্ধু। চৌধুরী

এই আশায় প্রত্যহ রঘুনাথকে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিত, কিন্তু রঘুনাথের সুন্দর অথচ বিনীত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত, সে কিছুতেই অত্যাচার করিতে পারিত না। রঘুনাথ এই অশান্তিকর বৈষয়িক ঘটনার একটি শান্তিময় মীমাংসা করিতে অভিলাষী হইলেন। এক দিন তিনি চৌধুরীকে প্রণাম করিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি তোমার পুত্রের তুল্য। আমার পিতা ও পিতৃব্য তোমার দুই ভ্রাতার ন্যায়! ভাই-ভাইয়ে আজ হয়ত বিরোধ হইয়াছে, আবার হয়ত কাল মিলন হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার নিজের পুত্র-তুল্য আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমার কোনও মতে উচিত নহে।" রঘুনাথের এই কথা শুনিয়া চৌধুরী মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার হৃদয় রঘুনাথের প্রতি স্নেহে উদ্বেলিত হইল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। রঘুনাথকে তিনি বলিলেন—"আমি অদ্যই উজীরকে বলিয়া কোনও ছলে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি, তোমার পিতা ও জ্যেঠার বিরুদ্ধে আর কোনও অভিযোগ যাহাতে না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতেছি। কিন্তু তোমার জ্যেঠা ও পিতাকে বলিয়া আমিও যাহাতে তোমাদের উদ্বৃত্ত অর্থের কিছু পাই, তাহার ব্যবস্থা কর। আমি তোমার জ্যেঠা ও পিতার উপরেই নিষ্পত্তির ভার দিলাম। তাঁহারা যাহা সঙ্গত মনে করেন, আমাকে যেন তাহাই দেন।" এই প্রকারে মুসলমান চৌধুরী বন্ধু উজীরকে বলিয়া রঘুনাথকে মুক্তিদান করিলেন এবং রঘুনাথও তাহার জ্যেঠা ও পিতাকে বলিয়া উজীরকে যথোচিত "সওগাত," এবং মুসলমান চৌধুরীকেও কিছু বার্ষিক দিবার ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথের বৈষয়িক কৌশলেই সমস্ত বিপদের নিষ্পত্তি হইল। এই ব্যাপারে রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য রঘুনাথের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। *

এই সময়ের পূর্ব্বেই "আকর মল্লিক" বা শ্রীরূপ গোস্বামী গৌড় রাজ-সরকারের রাজস্ব-সচিবের পদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাহার কিছু দিন পরেই বাদশাহ হুসেন শাহ উড়িষ্যায় অভিযানে বাহির হইয়াছেন। বোধ হয়, এই সময়ের নব-নিযুক্ত মুসলমান উজীরই—যাহার উপর ঐ সময় শাসন-ভার বা রাজস্ব-বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল—সপ্তগ্রাম মুলুকের পূর্ব্ব-অধিকারীর পরামর্শে সপ্তগ্রামের হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্যই এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরে উভয়ে উৎকোচ-স্বরূপ অভীষ্ট অর্থ লাভ করিয়া হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাসকে সমস্ত অভিযোগ হইতে মুক্তি দান করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী এই ঘটনার বর্ণনা করিয়া তাহার পরেই লিখিতেছেন—

"এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেলা।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈলা॥"

১৪৩৬ শকে শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের সময় পথে শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে যখন অবস্থান করেন, তখনই রঘুনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি রঘুনাথকে উপদেশ ও আশ্বাস দান করেন। উহার পর-বৎসরেই শারদীয়া বিজয়া দশমীর পরেই মহাপ্রভু বন-পথে বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ও ঐ বৎসরই মাঘ মাসের শেষে প্রয়াগে গমন করেন। প্রয়াগে কয়েক দিন অবস্থানের পরেই তিনি ৺কাশীধামে আসিয়া দুই মাস অবস্থান করেন। অতএব ১৫৩৮ শকাব্দের প্রথমেই তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাপ্রভুর কথামত রঘুনাথ ভাবিলেন, মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন এই বার আমি নীলাচলে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে অবস্থান করিব। ইহা ভাবিয়া তিনি এক দিন রাত্রিকালে উঠিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। পিতা ও পিতৃব্য লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে অনেক দূর হইতে ধরিয়া আনিলেন। তখন রঘুনাথের মাতা বলিলেন যে, "রঘুনাথ পাগল হইয়াছে, উহাকে এখন হইতে বান্ধিয়া রাখ।" কিন্তু পিতা হতাশ হইয়া উত্তর করিলেন—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে যাহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে?"

—চৈঃ-চঃ, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের ভার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপর অর্পিত হইয়াছিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজ পরিকরবর্গের সহিত সেই সময়ে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি ঐ সময়ে পানিহাটীতে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া রঘুনাথ পিতা-মাতার আদেশ লইয়া তাঁহার দর্শন-লাভের জন্য পানিহাটীতে আগমন করিলেন। পানিহাটীতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কোটিসূর্য্যসমপ্রভ শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটীর গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ-মূলে বেদীর উপর নিজ পরিকরবর্গের সহিত বসিয়া আছেন। রঘুনাথ দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভুর সম্মুখে পড়িয়া থাকিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর সেবক—"রঘুনাথ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে" বলিয়া রঘুনাথকে চিনাইয়া দিল।

* সপ্তগোস্বামীর লেখক পরম শ্রদ্ধেয় ৺সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দিন হুসেন শাহই রঘুনাথকে বন্দী করিয়া গৌড়ে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিতই রঘুনাথের এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং হুসেন শাহই শেষে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথকে মুক্তি দান করেন। কিন্তু এই ঘটনার মূল আকর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। উহা পড়িলেই গৌড়ের বাদশাহের সহিত রঘুনাথের যে কথোপকথন হয় নাই, পরন্তু চৌধুরীর সহিত হইয়াছিল; এবং চৌধুরীই যে উহা পাইয়া পরে শান্ত হইয়াছিলেন; এবং চৌধুরীর চক্রান্তে যে এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ইহা সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। চরিতামৃতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৪৩৭ শকে সনাতন গোস্বামী যখন কারাগার হইতে পলায়ন করেন, তখন হুসেন শাহ উড়িষ্যায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। অতএব ঐ সময় হুসেন শাহের এই সকল করিবার অবকাশ ছিল না।

"শুনি প্রভু কহে—'চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোয় করিমু দণ্ডন'॥
প্রভু বোলায় তিঁহো নিকট না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ॥"

শ্রীচৈতন্য-প্রেমধন হৃদয়ে গোপন করিয়া বা চুরি করিয়া রাখিয়া রঘুনাথ বাহিরে বিষয়ী সাজিয়াছেন, এই জন্য পরম-দয়াল প্রেমভক্ত শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে "চোরা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিই গৌড়ে ধর্ম্মপ্রচারের ও প্রেমদানের ভার দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অগোচরে রঘুনাথ সেই প্রেম-সম্পত্তি লাভ করার জন্যও তাঁহাকে "চোরা" বলা হইতে পারে। যাহা হউক, অতিশয় কৃপা করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে অপূর্ব্ব দণ্ড-দানের আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "এত দিন আমার নিকট না আসিয়া তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার দণ্ডস্বরূপ তুমি আমার পরিকরবর্গকে ও সমাগত ভক্তবৃন্দকে দধি-চিঁড়া ভোজন করাও।"

রঘুনাথ প্রভুর এই কৃপাদেশ পাইয়া তখনই মহোৎসবের আয়োজন করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইলেন। বহু লোক যাইয়া গ্রাম হইতে ভারে ভারে দধি, দুগ্ধ, চিনি, চিঁড়া ও কলা লইয়া আসিল। প্রকাণ্ড মহোৎসব হইবে, এই কথা প্রচার হওয়ায় পশারীরা বহু সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইল। রঘুনাথ সমস্তই ক্রয় করিয়া লইলেন। ছোট, বড়, মাঝারি—বহু মৃৎপাত্র স্তূপীকৃত করা হইল। বড় বড় মাটীর জালায় করিয়া গঙ্গাজলে চিঁড়া ভিজান হইল। ঐ স্থানে সমাগত প্রত্যেক লোককেই দু'-তিন-চারিটি করিয়া পাত্র দেওয়া হইল। তাঁহারা এক পাত্রে চিঁড়া, অপর পাত্রে দধি, অন্য পাত্রে কলা, দুগ্ধ, ও পাত্রান্তরে চিনি ও অন্য পাত্রে জল লইয়া প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেলেন। ঐ সময়ে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার পরিকরবর্গ অর্থাৎ রামদাস ঠাকুর, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব কবিরাজ, পুরন্দর, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, গৌরিদাস পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস হোড়, উদ্ধারণ দত্ত-প্রমুখ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাদের সকলকেই নিজের চতুষ্পার্শ্বে বেদীর উপর বসাইলেন। যে সকল ভট্টাচার্য্য-ব্রাহ্মণাদি উৎসবের কথা শুনিয়া আগমন করিলেন, প্রভু তাঁহাদিগকেও পরম সমাদরে বেদীর উপরে বসাইলেন। অসংখ্য লোক বেদীর নীচে গঙ্গাতীরে বসিল। স্থানাভাবে কেহ কেহ জলে দাঁড়াইয়া সেই স্থানেই চিঁড়া ভিজাইয়া লইল। প্রত্যেককেই এক পাত্রে চিঁড়া ও দধি ও অপর পাত্রে চিড়া ও দুগ্ধ, চিনি, কলা ইত্যাদি দেওয়া হইল। বিশ জন লোকে পরিবেষণ-কার্য্যের ভার লইলেন। ঐ সময় শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মধ্যাহ্নের ভোগ প্রস্তুত করিয়া প্রসাদ-গ্রহণের জন্য সপরিকর নিত্যানন্দ প্রভুকে সন্ধান করিতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি মধ্যাহ্নের ভোগ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাও নিবেদন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত অন্নভোগ আমরা রাত্রিতে তোমার গৃহে যাইয়া গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া রাঘব পণ্ডিতকেও মহোৎসবের প্রসাদ পাইতে বসাইয়া দিলেন। রাঘব পণ্ডিতও নিজ গৃহে যে সকল নিসকড়ি প্রসাদ ছিল, তাহা ব্রাহ্মণের দ্বারা সেই স্থানে আনয়ন প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"সকল লোকের চিঁড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিঁড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিঁড়া এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥
এই মত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহো নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন্ ভাগ্যবানে॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অনন্তর নিত্যানন্দ প্রভু নিজের আসনের দক্ষিণ দিকে চারিটি মৃৎখুণ্ডিকাতে ভোগদ্রব্য আনাইয়া দিয়া নিজ আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। নিজের দক্ষিণ দিকে এইরূপে মহাপ্রভুর আসন দিয়া তিনি সকলকে "হরি হরি" ধ্বনি করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। সেই বিরাট জনসঙ্ঘের হরিধ্বনিতে আকাশ ও বাতাস পূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে গোপবালকগণকে লইয়া যেরূপ আনন্দে পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই মনে হইল। অতঃপর মহাপ্রভুর পাত্রে যে ভোগ ছিল, ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহা ভক্তগণকে পরিবেষণ করা হইল। অতঃপর হরি হরি ধ্বনির মধ্যে পরমানন্দে এই পুলিনভোজের স্মৃতি-উদ্দীপক মহামহোৎসব শেষ হইল—পরিবেষক ব্রাহ্মণগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন—গলায় পুষ্পমাল্য পরাইলেন এবং সেবকে তাম্বুল আনয়ন করিল। তখন তাহা গ্রহণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু নিজ হস্তে অবশিষ্ট মালা, চন্দন ও তাম্বূল সমাগত সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রামের পর নিত্যানন্দ প্রভু সপরিকরে রাঘব পণ্ডিতের মন্দিরে আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণসহ সেই অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিয়া রঘুনাথ চক্ষু সার্থক করিলেন। সকলেই সকল ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া এই সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,—

"ভক্তগণ সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে—প্রেমে জগৎ ভাসায়॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্যজন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে?

নৃত্যের অবসানে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু যখন বিশ্রাম করিতেছেন, তখন রাঘব পণ্ডিত প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মনোমত নানা উপচারে রাঘব পণ্ডিত ঠাকুরের ভোগ দিয়াছেন; নিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত পরমানন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। রাঘব পণ্ডিত নিজ হাতেই পরিবেষণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে আহার করাইলেন, অনন্তর রঘুনাথকে সেই পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ দান করিলেন। রঘুনাথকে প্রসাদ দিয়া রাঘব বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্, তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে বাস করিয়া থাকেন। আজিও তাঁহার উদ্দেশে যে ভোগ নিবেদন করা হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পাত্রাবশেষ তোমাকে দিয়াছি। তুমি যখন পরম ভক্তিভরে এই প্রসাদ গ্রহণ করিতেছ, তখন ইহাতেই তোমার সকল বন্ধন খণ্ডিত হইল।"

পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাতীরের সেই বটবৃক্ষরাজের নিম্নে বেদীর উপর সপরিকরে উপবেশন করিলেন। অতি বিনীত রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন; নিজে কিছু বলিতে পারিলেন না—অশ্রুজলে তাঁহার চক্ষু ভাসিয়া গেল—বাক্য রুদ্ধ হইল। তিনি রাঘব পণ্ডিতের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-পদে নিবেদন জানাইলেন—

"অধম পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাব চৈতন্য-চরণ॥
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়॥
যত বার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতামাতা দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া॥
তোমার কৃপা বিনে কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়॥
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি! হইয়া সদয়॥
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাও' কর আশীর্ব্বাদ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের এই প্রার্থনা শুনিয়া সকল ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন—"ইহার ইন্দ্রের ন্যায় বিষয়সুখ বিদ্যমান, তথাপি শ্রীচৈতন্য-কৃপাতে ইহার তাহাতে সুখ বোধ হয় না। তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যচরণ লাভ করিতে পারে।" বলা বাহুল্য, ভক্তগণ সকলেই প্রিয়দর্শন রঘুনাথকে অকপটে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু অতঃপর প্রণত রঘুনাথের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি যে এই পুলিনভোজন করাইয়াছ, ইহাতে কৃপা করিয়া মহাপ্রভু নিজে আগমন করিয়াছেন এবং নিজে কৃপা করিয়া দুগ্ধ-চিপিটকাদি ভক্ষণ করিয়াছেন, তিনি নিজে ভক্তগণের নৃত্য দেখিয়া রাত্রিকালে ঠাকুরের প্রসাদ ভোজন করিয়াছেন, তোমাকে কৃপা করিয়াই তিনি এইরূপে অলৌকিক ভাবে এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন। তোমার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তুমি শীঘ্রই মহাপ্রভুর শ্রীচরণ লাভ করিবে এবং তিনি তোমাকে নিজের নিকটে রাখিয়া তোমার ভার তাঁহার অভিন্নহৃদয় স্বরূপ গোস্বামীর উপর ন্যস্ত করিবেন।" অনন্তর রঘুনাথ সকল ভক্তকে বন্দনা করিলেন এবং পরম-করুণ নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে সমস্ত ভক্তের দ্বারা আশীর্ব্বাদ করাইলেন।

রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্য প্রণামী-হিসাবে এক শত মুদ্রা ও সাত তোলা সোণা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভাণ্ডারীর নিকট অতি গোপনে সমর্পণ করিলেন। পাছে প্রভু তাহা জানিয়া অসন্তুষ্ট হন, এই জন্য এই ব্যাপার এখন গোপন রাখিয়া তিনি গৃহে ফিরিলে পরে তাহা জানাইতে বলিলেন। অতঃপর রাঘব পণ্ডিত এই পরমভক্ত বিষয়-বিরক্ত রঘুনাথকে আদর করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যাইয়া পথে খাইবার জন্য তাঁহাকে প্রচুর প্রসাদ দান করিলেন। রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "আমি ভক্তগণের প্রত্যেককে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা-অনুসারে বিশ, পঞ্চদশ, দশ, ছয় ও পাঁচ মুদ্রার দ্বারা পূজা করিতে চাহি"—এই বলিয়া হিসাব-মত মুদ্রা তাঁহার নিকট অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভজনে নিরত নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতকে এক শত মুদ্রা ও দুই তোলা সুবর্ণ দিয়া পূজা করিলেন। রঘুনাথের এই ভক্তপূজাই তাঁহার বিষয়িরূপে শেষ লীলা। কৃপা-লাভের জন্য ভক্তের এইরূপ আকুল আগ্রহ দেখিলে ভগবান্ কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি কপিলরূপে নিজেই বলিয়াছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

—শ্রীভাগবত, ৩।২৫।২৪

অর্থাৎ সাধুজনের সঙ্গলাভ ঘটিলেই আমার গুণাভিব্যঞ্জক হৃদয়ের ও কর্ণের তৃপ্তিকর কথার আলোচনা হইয়া থাকে। তাহার সেবার দ্বারাই অতি শীঘ্র মোক্ষদানকারী আমার প্রতি যথাক্রমে শ্রদ্ধা, আসক্তি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

শাস্ত্রের অন্যত্রও বলা আছে—

"মহৎ-সেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেঃ"—ভাঃ, ৫।৫।২

মহৎসেবাকেই বিশেষরূপা মুক্তি বা ভক্তিলাভের দ্বার বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই মহৎসেবার ফলে অচিরেই রঘুনাথের সংসার-বন্ধন ক্ষয় হইল।

[ক্রমশঃ

অর্থের অনর্থ ও অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা

বাঙ্গালা ১৩৪৯ সাল, তথা সরকারী ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দ, অনন্ত কালের অতল অতীতে বিলীন হইয়াছে ; রাখিয়া গিয়াছে—অসংখ্য মৃত্যুর এবং অসীম ধ্বংসের তীব্র তীক্ষ্ণ স্মৃতি এবং জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পুঞ্জপ্রমাণ কঠোর ও কঠিন সমস্যা—রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক। আমরা এই প্রবন্ধে অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহের আলোচনা করিব ।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের প্রধান ও প্রচণ্ড সমস্যা—অন্ন-বস্ত্রের অভাব বিমোচন। ইহার মূলে অর্থ ও সামর্থ্যের প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন আছে। অর্থ ও সামর্থ্য থাকিলে অন্ন-বস্ত্রের অভাব-প্রশমন অসম্ভব নয়। কিন্তু আমরা পরাধীন—জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্দ্বয় আমাদের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। তাই আমাদের পেটে অন্ন নাই ; অঙ্গে বসন নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, যুদ্ধারম্ভের পর হইতে, যুদ্ধের বিবিধ প্রয়োজনে, যুদ্ধোপকরণ সৃষ্টি ও সরবরাহের তাগিদে তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। সম্প্রতি মোটা চাউলের মণ কুড়ি হইতে ত্রিশ এবং মোটা ধুতি-সাড়ীর জোড়া দশ হইতে পনেরো টাকায় অত্যূর্দ্ধ গতিলাভ করিয়াছিল ! ফলে অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত, উলঙ্গ এবং অর্দ্ধ-উলঙ্গ নর-নারীর আর্ত্তনাদে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ—বিশেষতঃ বাঙ্গালা পরিপূরিত।

ভারতের অর্থ-সচিব তাঁহার বাজেট-বক্তৃতা-প্রসঙ্গে, মনোরম না হউক, মোলায়েম করিয়া ভারতের যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহার সহিত শতকরা নিরানব্বই জন ভারতবাসী অপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলিয়াছেন,—"আমাদের বহিঃস্থ সম্পদ্ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং আমাদের বহিঃস্থ ঋণ পরিশোধ দ্বারা ভারতের আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির উপর স্থায়ী প্রভাবের সূচনা ঘটিয়াছে। বহু লোকের কর্ম্মপ্রাপ্তির সহিত অধিকতর উপার্জ্জন, কৃষিপণ্যের মূল্য-বৃদ্ধির ক্ষতি পূরণ করিয়াছিল, রায়তের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রাপণীয় উৎপাদন শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা ক্রম-বর্দ্ধমান চাহিদার সরবরাহ ঘটিয়াছিল।" অর্থ-সচিব আরও বলিয়াছেন যে, "কৃষিপণ্যের মূল্য-বৃদ্ধি যদি আর কিছু না করিয়া থাকে, তথাপি স্পষ্টতঃ কৃষি-ঋণের গুরুভার লাঘব করিয়াছিল। এই কৃষি-ঋণই ভারতীয় কৃষককুলের অধিকাংশ গুরুতর আধি-ব্যাধির মূলীভূত কারণ। শ্রমিকেরা অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, এবং যদি তাহাদের অতিরিক্ত আয়কে যুদ্ধের স্থিতিকালে অনাবশ্যক দ্রব্যাদির অযথা ক্রয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সংরক্ষণ-ঋণে গচ্ছিত রাখা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের আপদ-বিপদের বিরুদ্ধে একটি অতি প্রয়োজনীয় সংস্থানের সংস্থিতি ঘটিবে।" কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দীন-দরিদ্র কৃষককুলের দুর্ব্বিসহ ঋণভার লঘুতর না হইয়া গুরুত্বে প্রবৃদ্ধ হইতেছে, এবং অপরিসীম দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধি হেতু শ্রমিকের অতিরিক্ত উপার্জ্জন কর্পূরের ন্যায় নিমিষে উপিয়া যাইতেছে !

অর্থ-সচিবও সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "গত বারো মাসে অনুকূল অবস্থার সহিত প্রতিকূল উপসর্গগুলিও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।" অর্থ-সচিবের ভাষা অতি চমৎকার ! "It would be idle to pretend that in the last twelve months the unfavourable factors have not gained relatively to the favourable." পরিচ্ছিন্ন সত্যকে সুন্দর উদাহরণ ! তিনি বলিয়াছেন, "সমীপবর্ত্তী প্রদেশ শত্রুকরতলগত হওয়ার ফলে আমরা খাদ্য সরবরাহের একটি প্রকৃষ্ট অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি এবং যান-বাহন চলাচলের বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছে। প্রসারণ সত্ত্বেও যুদ্ধের চাহিদা আমাদের শিল্পোৎপাদন শক্তি খর্ব্ব করিয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের প্রবল হ্রাস-হেতু প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অনটন ঘটিয়াছে এবং অতিলোভী অর্থ-গৃধ্নু ব্যবসায়ীকে ক্রেতার ঘাড় ভাঙ্গিবার সুযোগ দিয়াছে ! আমাদের খাদ্য-সামগ্রীর অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সিংহলকে সাহায্য করিতে হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের নিমিত্ত গতাগতির সুগমতা ব্যাহত হইয়াছে এবং বহু লোককে স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক অধিক খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চিত রাখিবার প্রবৃত্তি দিয়াছে। দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রবৃদ্ধ আর্থিক আয় সদ্যঃ-প্রাপ্তব্য স্বল্পতর দ্রব্য-সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হইতেছে।"

আংশিক ভাবে ইহা সত্য বটে ; কিন্তু এই পরিস্থিতির আদিম নিদান কি ? ইহার মূল উৎস কোথায় ? সকলেই জানেন যে, গত বারো মাসে দ্রব্যমূল্য অপরিসীম বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসী এই অকস্মাৎ অতিরিক্ত মূল্য-বৃদ্ধির নিদারুণ পীড়ন সহ্য করিতেছেন। কলিকাতার শঙ্কু-সংখ্যা (Calcutta Index Number) ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১১৫ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ২৩৮-এ উর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিল। বোম্বাই-এর খুঁট অঙ্ক ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১০৯ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ২২৯-এ উর্দ্ধমুখী হইয়াছিল। ভারতের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টার দপ্তর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যের শঙ্কু-সংখ্যা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের তুলনায় ১০০ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ১৬৪.৩ সংখ্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আমরা সকলেই জানি যে, কোন কোন দ্রব্যে আমাদিগকে এই খুঁট অঙ্ক অপেক্ষাও অধিকতর মূল্য দিতে হয়, বিশেষতঃ আমদানী-পণ্যে, যাহার অভাব প্রচণ্ডতম। এমন কি, কোন কোন স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের নিমিত্ত আমাদিগকে স্বাভাবিক গড়-মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক দিতে হয়।

যদিও নিত্য-ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যের আপেক্ষিক অনটনের হেতু বিদ্যমান, তথাপি সাধারণ ভাবে সর্ব্ববিধ দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির নিদান, একমাত্র অভাব-অনটন নহে। পরিণত-পণ্যের আমদানী প্রধানতঃ যুদ্ধোপকরণে নিবদ্ধ। বর্ম্মা হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ এবং কোন কোন খাদ্যসামগ্রীর রপ্তানী দেশাভ্যন্তরে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব-অনটন প্রখরতর করিয়াছে সত্য ; এবং মাল-চলাচলের বাধা-বিঘ্নও তাহার প্রবল আনুষঙ্গিক কারণ। কিন্তু সর্ব্ববিধ দ্রব্য-মূল্যমানের দ্রুত অথবা অতিরিক্ত বৃদ্ধির মূল কারণ অপরিমিত মুদ্রা বৃদ্ধি। এই মুদ্রা-বৃদ্ধির মাত্রা উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিমাণ হইতে বহু গুণে অধিক। স্বভাবতঃই আমাদের দেশে উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা দুষ্কর ; এবং শান্তিকালে যাহা দুষ্কর, যুদ্ধ-সময়ে তাহা দুঃসাধ্য। সংখ্যা-সংগ্রহের উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থার অভাবই এই মুস্কিলের প্রধান কারণ। যাহা হউক, এ বিষয়ে যথাশক্তি প্রচেষ্টার ফলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে উৎপাদন শতকরা কুড়ি কিংবা বড় জোর পঁচিশ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত-কারেন্সি-নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২৫০ অংশ এবং

১৫০ অংশ। ফলে, প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণের এই অপরিসীম বৃদ্ধি সমসাময়িক উৎপাদন-বৃদ্ধি দ্বারা কোন প্রকারেই সমর্থিত হইতে পারে না। অবশ্য, কাগজের নোটের বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ কম; ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১১৫ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২৩০; এবং আংশিক ভাবে যথার্থ অভাব-অনটন হেতু।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যুদ্ধারম্ভে প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ যুদ্ধ-প্রয়োজনের নিমিত্ত উপযুক্ত ছিল না। প্রাথমিক মুদ্রাবৃদ্ধি, চাহিদা ও সরবরাহের সমতা রক্ষাকল্পে অনুকূল ছিল; কিন্তু তাহা স্বল্প-কালের নিমিত্ত। দিন দিন মুদ্রা-বৃদ্ধি অধিক হইতে অধিকতর হইতেছিল। কারেন্সি-নোটের প্রচলন ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ১৭৯ কোটি হইতে বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ৯ই তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের শেষে ৬৭২ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। যুদ্ধের স্থিতিকালে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অবশ্য এই বৃদ্ধির কিয়দংশ উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়-সঞ্চয় হেতু, অর্থাৎ তাহাদের নিজেদের অধিকারে কিংবা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকা প্রযুক্ত, প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার প্রশ্রয় দিবে না। কিন্তু সে অতি ক্ষুদ্র অংশ। মোটের উপর, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ প্রয়োজন অপেক্ষা বহু গুণ বেশী। ফলে, মুদ্রা-প্রকরণের প্রতি এককের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে; এবং তদনুপাতে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ, ডবল পয়সা এখন নিম্নতম একক অর্দ্ধ-পয়সার স্থলাভিষিক্ত; সুতরাং দ্রব্য-মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

Inflation অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির মুস্কিল এই যে, একবার আরম্ভ হইলে, শুধু দ্রুত নহে, প্লুত (gallop) গতিতে প্রতি ধাপে ক্রম-বর্দ্ধনশীল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যাতালিকা দিলাম।

কারেন্সি নোটের প্রচলন-বৃদ্ধি

খৃষ্টাব্দ	ক্রোর টাকা
১৯৩৯-৪০	৪৯'৪৫
১৯৪০-৪১	১৯'১১
১৯৪১-৪২	১৫২'৪৭
১৯৪২-৪৩	২৬০'১৫

এই কারেন্সি-নোট বৃদ্ধির সহিত আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্রশক্তি ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিতেছেন, তাহার মূল্য ষ্টার্লিং-এ ব্যাঙ্ক-অব-ইংলণ্ডে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের তরফে জমা হয়। রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক ভারতে সেই ষ্টার্লিং-সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে নোট ছাপিয়া মিত্র-সঙ্ঘের দেনা পরিশোধ করেন; নিম্ন-লিখিত সংখ্যা-তালিকা হইতে এই প্রক্রিয়ার প্রগতি উপলব্ধ হইবে।

	নোটের একুন পরিমাণ ক্রোর টাকা	বাজারে চলতি নোট ক্রোর টাকা	ষ্টার্লিং-সঞ্চয় সংস্থিতি ক্রোর টাকা
আগষ্ট, ১৯৩৯ (মোট)	২১৬'৭৮	১৭৮'৮৯	৫৯'৫০
১৯৩৯-৪০ (গড়)	২২৭'৭৫	২০৮'৮৬	৭৮'৩২
১৯৪০-৪১ "	২৫৮'৭৭	২৪১'৬২	১২৯'৯৭
১৯৪১-৪২ "	৩২০'৬৩	৩০৮'৪৬	১৬৫'৪৮
এপ্রিল, ১৯৪৩ (মোট)	৬৭১'৯৬	৬৬৩'১৯	৪৬৭'৬৩

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের কয়েক বৎসরে নোটের সংখ্যা অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ষ্টার্লিং-সঞ্চয় বৃদ্ধি হেতুই এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

মিত্রসঙ্ঘের প্রয়োজনে, রৌপ্য-মুদ্রা সংগ্রহের দুইটি প্রধান উপায়। প্রথম, ঋণের দ্বারা প্রচলিত অর্থের সংগ্রহ; এবং দ্বিতীয়, ষ্টার্লিং-সংস্থিতির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নোট-প্রচলন। এই দ্বিতীয় উপায়ের পরিণাম অযথা মূল্যবৃদ্ধি (Inflation)। ষ্টার্লিং-সংস্থিতির কিয়ৎ পরিমাণ অবশ্য সঞ্চিত (Reserve) রাখা যায়, কিন্তু এই সঞ্চয় নির্ভর করে ভারতে বৃটীশ-সরকারের ব্যয়ের পরিমাণের উপর। সামরিক সরকারী-হুণ্ডীর (Treasury Bills) বিরুদ্ধেও নোট বৃদ্ধি করা যায়। রাজস্ব আদায়ের পূর্ব্বে চলতি-ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সরকার এই উপায় অবলম্বন করেন। ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য বৃদ্ধিজীবিগণ (Investors) স্বল্প সময়ের নিমিত্ত এই হুণ্ডি ক্রয় করেন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এই হুণ্ডি গ্রহণ করেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নোট প্রচলিত করেন, তাহা হইলে, সরকারের সাময়িক হুণ্ডির বিরুদ্ধে সরকারের ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি করেন। ফলে, অযথা মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া—দ্রব্যমূল্যের অযথা বৃদ্ধি। এইরূপে অর্থ-সংগ্রহের প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল। কারণ, ইহা অতি সহজ-সাধ্য এবং ইহার নিমিত্ত নোট ছাপিবার কাগজের মূল্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যয় নাই। এইরূপ নোট প্রচলন অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন Inflation। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একটি জরুরী আইন (Ordinance) জারি হইয়াছিল।

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-জমাখরচের উদ্বৃত্ত জমার অঙ্কও এই পরিস্থিতিকে অধিকতর জটিল করে। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হইলেই উদ্বৃত্ত-জমার অধিকারী হওয়া যায়। সর্ব্বজাতিই বহির্ব্বাণিজ্যে এইরূপ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে চায়। ইহা উত্তমর্ণ পদমর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য। বহির্ব্বাণিজ্যে গত কয়েক বৎসর আমাদের বে-সরকারী পণ্যের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী নিম্নলিখিত-ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর আধিক্য

খৃষ্টাব্দ	ক্রোর টাকা
১৯৩৮-৩৯	১৬'৮৪
১৯৩৯-৪০	৪৮'২৯
১৯৪০-৪১	৪১'৮৮
১৯৪১-৪২	৭৯'৬০
১৯৪২-৪৩ (প্রথম ছয় মাস)	৩৯'৬৬

১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা প্রকাশিত হইলে দেখা যাইবে যে, তাহা পূর্ব্ব-বৎসরের অঙ্ককে অতিক্রম করিবে। সাধারণতঃ, ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক, এবং ইহার অধিকাংশ কাঁচামাল। পূর্ব্বে আমরা এই উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে বিলাতে প্রদেয় দায় (Sterling charges) পরিশোধ করিতাম। এখন এই অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অধুনা ষ্টার্লিং-ঋণ পরিশোধের ফলে বিলাত হইতে আমাদের অর্থপ্রাপ্তির পালা। এই প্রসঙ্গে আমাদের আমদানী অপেক্ষা অধিকতর রপ্তানীর—অনিষ্টকর না হউক, একটি অস্বাস্থ্যকর দিক্ আছে। আমাদের রপ্তানীর অধিকাংশই

চাউল, গম, যব, কলাই, আটা, ময়দা, চিনি, চা প্রভৃতি। গত কয়েক বৎসরের সংখ্যা-তালিকা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর আধিক্য

খৃষ্টাব্দ	খাদ্য-দ্রব্য
১৯৩৯-৪০	৬'৭১ ক্রোর টাকা
১৯৪০-৪১	১১'৪০ "
১৯৪১-৪২	৩৪'৮০ "
১৯৪২-৪৩ (প্রথম ছয় মাস)	২২'৬৫ "

এই অঙ্ক বে-সরকারী পণ্যের। যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকারের তরফ হইতে বহু খাদ্যসামগ্রী এই কয়েক বৎসর ভারতের বহির্ভাগে প্রেরিত হইতেছে। সে অঙ্ক প্রকাশ নিষিদ্ধ। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব-অনটনের একটি কারণ এই বর্দ্ধনশীল রপ্তানী। এই রপ্তানীর আতিশয্য, যাহা এ দেশে অভাব বৃদ্ধি করে, তাহা মূল্যস্ফীতি এবং অপ্রচুর ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের মূল্যাতিশয্যের নিদানভূত। অপরিমিত মুদ্রাবৃদ্ধিও এক প্রকার কর। সরকার প্রাত্যহিন নূতন নূতন কারেন্সি-নোট দ্বারা বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। এই নূতন অর্থ প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং পূর্ব্ব-প্রচলিত মুদ্রার সহিত প্রতিযোগিতা-পরায়ণ হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল—মূল্যস্ফীতি। সরকারের নূতন অর্থের বিনিময়ে প্রজাবৃন্দের খাদ্যসামগ্রী সরকারের হস্তে গিয়া পড়ে, ফলে জনসাধারণের খাদ্যাভাব ঘটে এবং এই অভাব-অনটনের অভিঘাত দরিদ্রের উপর কঠোর ভাবে আপতিত হয়। মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র, তাহাদের যৎসামান্য আয়, প্রয়োজন ও দ্রব্যমূল্যের উচ্চতার অনুপাতে স্বল্পতর ও ক্ষীয়মাণ বোধ করে। ধনী উচ্চমূল্যে তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়; কারণ, যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ-কার্য্যে তাহারাই অধিকতর লাভবান্ হয়। মুদ্রাস্ফীতির অবশ্যম্ভাবী ফলে দ্রব্য-মূল্যের স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধগতির সহিত মুদ্রা-প্রকরণের এককগুলি ধাপে ধাপে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। পরিণামে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপর্য্যয় ঘটে। কিছু দিনের নিমিত্ত সম্প্রদায়, অথবা পরিবার, অথবা ব্যক্তিবিশেষ ধনাঢ্য হয় বটে; কিন্তু, অধিকাংশের দারিদ্র্যে এবং মুদ্রা-মূল্যের অযথা ক্রমবর্দ্ধনশীল হ্রাস-হেতু প্রকৃতির প্রতিশোধের ন্যায় অর্থনীতির মূল ভিত্তি শিথিল হইয়া ধনী এবং নির্ধন উভয়েরই সুখ, শান্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

উত্থানের পর পতন অবশ্যম্ভাবী। মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতির পশ্চাতে উভয়ের মানের হ্রাস অপরিহার্য্য। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে য়ুরোপে Inflationএর পশ্চাতে Deflation আসিয়া প্রভূত বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পরে ইংলণ্ডও এইরূপ বিপর্য্যয়ের পরিণাম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। জার্ম্মাণীর দুর্দ্দশার কথা কাহারও অবিদিত নাই। এই নিমিত্ত সর্ব্ব জাতিই অধুনা মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতি পরিবর্জ্জন করিতে সর্ব্বপ্রকারে প্রযত্নশীল। এই উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমান যুদ্ধে কি নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রণিধান-যোগ্য। যুক্তরাজ্যে ১৯৩৯-৪০ হইতে ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একুন রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬,৯৩৪ মিলিয়ন পাউণ্ড, অর্থাৎ ঐ তিন বৎসরের নির্দ্ধারিত একুন ব্যয় ১৫,৬৪৮ মিলিয়ন পাউণ্ডের শতকরা ৪৪ অংশ। করধার্য্য, বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ করবৃদ্ধি দ্বারা এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, যাহাতে শেষোক্ত বৎসরে রাজস্ব জাতীয়-ব্যয়ের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ বহন করিতে পারে। বর্ত্তমানে সেখানে কোন ব্যক্তিগত আয়, কর প্রদান করিয়া, বার্ষিক ৬,০০০ পাউণ্ডের অতিরিক্ত হইতে পারে না। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নিট্ আয় সেখানে ৪,০০০ পাউণ্ড হইতে পারে। সঞ্চয় অভিযান (Savings campaign) এবং গুরু পরিমাণ বিক্রয়-কর দ্বারা ভোগ্য বস্তুর ব্যবহার লাঘব (Reduction of consumption) করিয়া, প্রতি সপ্তাহে ৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া যুদ্ধ-ঋণে প্রযুক্ত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মূল্য-শাসন এবং ভোজ্য ও ভোগ্য দ্রব্যের নিয়মিত ও পরিমিত পরিবেষণ দ্বারা স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের অত্যাবশ্যক জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত সরবরাহ হইতেছে। মজুরী এবং বেতনও যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা হইয়াছে; কিন্তু যাহাতে বর্দ্ধিত-আয়, অসামরিক জনমণ্ডলীর ভোগ্য বস্তু-ক্রয়ের শক্তি হইতে, প্রগতিশীল হারে, তাহাদের প্রচলিত-একুন-মূল্য অতিরিক্ত না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রেও কর-নির্দ্ধারণের মাত্রা যথাসম্ভব উচ্চ স্তরে রক্ষিত হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত আয়েরও একটি মাত্রা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উৎসাহ দ্বারা সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধি পূর্ব্বক সঞ্চিত অর্থ যুদ্ধকার্য্যে নিয়োগ করিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় পাদে স্ফীতি-বিরোধী (Anti-Inflation) আইন প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ঐ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মজুরী, বেতন এবং দ্রব্য-মূল্যের যে নিরিখ ছিল, তাহাই বহাল রাখিতে সমর্থ। কিন্তু ভারতের ব্যবস্থা বিভিন্ন। যুদ্ধের ব্যয় ভারত অপেক্ষা যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে অত্যধিক; তথাপি তাহাদের মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতি নিবারণ-প্রচেষ্টা কিরূপ ফলবতী হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত তুলনামূলক শঙ্কু-সংখ্যা (Index Number) হইতে বিশদ হইবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির খুঁট অঙ্ক (একক = ১০০)

খৃষ্টাব্দ	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	ভারতবর্ষ	কলিকাতা
১৯২৯	১০০'০	৯৫'৩	...	১৪১
১৯৩২	৮৭'৮	৬৪'৮	...	৯১
১৯৩৮	৯৫'২	৭৮'৬	...	৯৫
১৯৩৯	৯৬'২	৭৭'১	১২১'১	১০৮
১৯৪০	১১৩'১	৭৮'৬	১১৯'৬	১২০
১৯৪১	১২১'৪	৮৭'৩	১২৯'৭	১৩৯
১৯৪২—				
জানুয়ারী	১২২'০	৯৬'০	১৪৩'৭	১৫৫
ফেব্রুয়ারী	১২২'০	৯৬'৭	১৪৫'০	১৫৩
মার্চ্চ	১২১'৩	৯৭'৬	১৪৪'২	১৫৩
এপ্রিল	১২২'০	৯৮'৭	১৪৬'১	১৫৭
মে	১২১'৩	৯৮'৮	১৪৮'৪	১৬৯
জুন	১২২'০	৯৮'৬	১৫৫'২	১৮২
জুলাই	১২২'৬	৯৮'৭	১৫৯'৯	১৮২
আগষ্ট	...	৯৮'৯	১৬০'০	১৯২
সেপ্টেম্বর	...	৯৯'৩	১৬৪'৩	১৯৮

যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় যুক্তরাজ্যে যুদ্ধের ব্যয় বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচুর পরিমাণে আরম্ভ হইয়াছিল; তথাপি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের জুলাই পর্য্যন্ত প্রায় তুল্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে তাহা খুঁট অঙ্কের নিয়ে ছিল; এখন অবশ্য তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। এই দুই দেশে অপরিসীম অর্থ ব্যয় হইতেছে, তথাপি দ্রব্য-মূল্যকে যথেচ্ছ বৃদ্ধি হইতে দেওয়া হয় নাই। জাতীয় বার্ষিক আয় দ্বারা যুদ্ধ-ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার যুক্তিসিদ্ধ প্রচেষ্টাই ইহার মুখ্য কারণ। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ, "সীমাবদ্ধ লভ্যাংশ" (Limitation of Dividends) এবং "বিলম্বিত বেতন" (Deferred pay) প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং বিদেশে নিবদ্ধ মূলধনকে মুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা বিদেশ হইতে উপকরণ-উপাদান ক্রয় পূর্ব্বক দেশাভ্যন্তরে প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণকে অযথা চাপ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। ফলে, অসঙ্গত মুদ্রা-প্রসারণের প্রয়োজন ঘটে নাই। সঙ্গে সঙ্গে মূল্য-শাসন এবং ভোজ্য ও ভোগ্য দ্রব্যের বিধিসঙ্গত পরিবেষণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জাতীয় মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত স্বাধীনতা-গৌরবে গরীয়ান্ জনসাধারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়কগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রচুর ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক, অর্থ-সামর্থ্য-বিদ্যা-বুদ্ধি এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতেছে। কারণ, দেশ তাহাদের—রাষ্ট্র তাহাদের; ধন-জন-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত। তাহারাই শাসক—তাহারাই শাসিত। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই একই উদ্দেশ্য—একই নীতি; বরং যুক্তরাজ্য অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে মূল্য-শাসন কঠোরতর ও সম্পূর্ণতর।

পক্ষান্তরে, পরাধীন ভারতে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী শিথিল-প্রযত্ন ও অসমঞ্জস্ বিধি-ব্যবস্থার ফলে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের শেষে মূল্যমানকে ২৩৮ সংখ্যা পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে দেওয়া হইয়াছিল। এই অঙ্কও সঠিক নহে; কারণ, সরকারী সেরেস্তা চোরা-বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের ফলাফলের প্রতি নিরুদ্ধদৃষ্টি। যত দিন যথেচ্ছ মুদ্রা-স্ফীতি-নীতি এই দুর্ভাগ্য দেশে অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত থাকিবে, তত দিন মূল্য-শাসন-প্রচেষ্টা বৃথা ও বিফল হইবে। মূল্য-শাসনের ব্যর্থ-প্রচেষ্টা যথার্থ দায়ীর স্কন্ধ হইতে স্কন্ধান্তরে দায়িত্বের বোঝা চাপাইবার নিরর্থক প্রয়াস মাত্র। আমাদের মূল্য-শাসন কাগজে কলমে নিবদ্ধ,—বাস্তবের সহিত সম্পর্কবিচ্যুত। কিছু দিন পূর্ব্বে তদানীন্তন বাণিজ্য-সচিব এই ব্যর্থতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু বাণিজ্য বিভাগের সহিত অর্থ-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত দরিদ্রের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান অসম্ভব। অর্থ-সচিব তাঁহার বাজেট-অভিভাষণে অসঙ্গত মুদ্রাস্ফীতির যাথার্থ্য দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণ স্বল্প পরিমিত ক্ষীয়মাণ অসামরিক ভোগ্যদ্রব্যের উপর অযথা চাপ প্রয়োগ করিতেছে। এই দুর্দ্দৈব নিরাকরণ প্রকল্পে ভারত সরকার বাণিজ্য-সচিবের অধীনে একটি খাদ্য বিভাগ খুলিয়াছেন। উদ্দেশ্য—প্রচার এবং প্ররোচনা দ্বারা প্রাথমিক উৎপাদককে অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিবার প্রবৃত্তি প্রদান, এবং উৎপন্ন শস্যের গোপন-সঞ্চয় নিবারণ পূর্ব্বক সমস্ত ফসলের অকুণ্ঠিত বাজার-বিক্রয় এবং সর্ব্বপ্রকার পণ্য-দ্রব্যের অবাধ চলাচল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এক প্রদেশের উদ্বৃত্ত শস্য অন্য প্রদেশের অভাবপূরণার্থ প্রেরিত হইবে এবং সরকারের গোমস্তা কর্ত্তৃক সংগৃহীত শস্য যাহাতে যুক্তি-সঙ্গত মূল্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট পৌঁছে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইবে। খাদ্য-দ্রব্য-ক্রয়ের নিমিত্ত বর্ত্তমান ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় হইবে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। যথাসময়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির নিকট হইতে ইহা আদায় করিবেন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে নয়া দিল্লীতে যে দ্বিতীয় নিখিল ভারত খাদ্য-বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার সুপারিশ অনুযায়ী বৃটিশ-ভারতে ও দেশীয় রাজ্যে কয়েকটি প্রাদেশিক খাদ্য-তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ভারত সরকারের এক জন খাদ্য-উপদেষ্টাও নিযুক্ত হইয়াছেন। বিলাত হইতে খাস-আমদানী এই বিশেষজ্ঞের নাম মিঃ ভিগর। "ভিগর" শব্দের অর্থ—শক্তি। শক্তির সহিত স্বাস্থ্য দৃঢ় নিবদ্ধ। অতএব মিঃ ভিগর যদি "ভিগরাসলি" অর্থাৎ জোরের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে হয় ত দরিদ্র ভারতবাসীর নিদারুণ খাদ্যাভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের নিষ্ঠুর দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত এই সৎ ও সাধু প্রচেষ্টার অঙ্কুরে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। নব-নিযুক্ত খাদ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে খাদ্য পরিবেষণের সামঞ্জস্য বিধানের সহিত কেন্দ্রীয় সরকার অধিকতর খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদনের প্রযত্নশীল প্রচেষ্টার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই নিমিত্ত বর্ত্তমান বর্ষের বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে এবং সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকতর অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু খাদ্যোৎপাদন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে। ইতিমধ্যে অধিকাংশ প্রদেশে, বিশেষতঃ "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" বঙ্গভূমির গৃহে গৃহে অন্নাভাবে এবং বস্ত্রাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দূরদৃষ্টি দ্বারা নিকটবর্ত্তী সঙ্কটের সূচনায়, প্রশমন-প্রতিবিধানের অভাবে আজ আমরা দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। বাঙ্গালার দুরদৃষ্টক্রমে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম পর্ব্বে যে দ্বৈতশাসন মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবে আত্ম-বিকাশ করিয়াছিল, দ্বিতীয় পর্ব্বে তাহা শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রিযূথের মধ্যে গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে, উভয় পক্ষের আত্ম-প্রতিষ্ঠার্থ বিষম দ্বৈরথ-যুদ্ধে দরিদ্র অন্নহীন, বস্ত্রহীন প্রজার স্বার্থ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছিল। প্রবলের সঙ্ঘর্ষে দুর্ব্বলের ক্ষয় ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালায় আজ সেই উৎকট সঙ্ঘর্ষের বিকট প্রতিক্রিয়া প্রকট।

সমগ্র দেশকে এই অর্থ নৈতিক অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে অযথা মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে। বাণিজ্য বিভাগ খাদ্যসংগ্রহ, সরবরাহ ও পরিবেষণের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু অর্থ-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ অপরিমিত মুদ্রাবৃদ্ধির দ্বারা অপরিসীম মূল্য-বৃদ্ধি নিবারণ না করিলে, খাদ্য বিভাগের সকল প্রচেষ্টাই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক হিসাবপত্র বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাহার কোন লক্ষণই দেখিতে পাই না। বিপরীত প্রক্রিয়াই প্রগতিশীল।

যুদ্ধের সময়ে কারবারী ও শিল্পী সরকারকে যুদ্ধ-প্রয়োজনে বহুবিধ দ্রব্য সরবরাহ করিয়া প্রভূত অর্থ লাভ করেন। এই অর্থ হইতে অতিরিক্ত কররূপে সরকারও যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হন। অতিরিক্ত কর প্রদান করিয়াও ধনী অধিকতর ধনী হইতে থাকেন এবং এক শ্রেণীর নূতন ধনিকের আবির্ভাব ঘটে। নূতন এবং পুরাতন উভয় শ্রেণীর ধনিক বেশ খুশী হয়েন এবং মনে করেন যে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিই তাঁহার সমৃদ্ধির মূল। তিনি ভাবিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদের অতিরিক্ত আয় মাত্র কাগজ-কলমের আয়; কারণ, যদিও তিনি অধিক টাকা রোজগার করেন, ক্রমান্বয় মূল্যবৃদ্ধি-হেতু সে টাকার মূল্য ক্রমাগত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সংখ্যায় অধিক হইলেও মূল্যে কম হয়।

বহু লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে যে, উচ্চমূল্যের ফলে বিলাত হইতে আমরা অধিকতর ষ্টার্লিং লাভ করিব। এই কাল্পনিক সুবিধা আসলে কিন্তু অসুবিধা। তাঁহারা বুঝেন না যে, ষ্টার্লিং যত বৃদ্ধি হইবে, কারেন্সি-নোটের সংখ্যাও তত বাড়িবে এবং প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ-বৃদ্ধির সহিত দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এবংবিধ কূট-চক্রের আবর্ত্তনে-বিবর্ত্তনে সামাজিক বিপ্লব অপরিহার্য্য। অধিকন্তু, যুদ্ধান্তে এই অসঙ্গত ও অসমঞ্জস্ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ারূপে আবির্ভূত মন্দার প্রকোপে টাকার বিনিময়-হার রক্ষাকল্পে ষ্টার্লিং-সংস্থিতি কর্পূরের ন্যায় উপিয়া যাইবে!

অপরিমিত মুদ্রাবৃদ্ধি-প্রসূত দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধি যদি জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির কারণ হইত, তাহা হইলে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রযত্নে মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতি প্রতিরোধকল্পে কঠোর বিধি-বিধান অবলম্বন এবং দ্রব্য-মূল্যের ও মজুরীর উচ্চতার সীমা নির্দ্দেশ করিতেন না। ফলতঃ, মুষ্টিমেয় ধনিকের শ্রীবৃদ্ধি জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির নিদর্শন নয়। এই নিমিত্ত দেশের ধনিক ও বণিক এবং শিল্পী ও সরবরাহকারী সকলেরই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—যাহাতে উৎপাদন-বৃদ্ধি দ্বারা মুদ্রা ও মূল্যের অসঙ্গত ও অসমঞ্জস্ বৃদ্ধি না ঘটে। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ ও মিত্রশক্তিগণকে সমরোপকরণ সরবরাহ করিবার অর্থনীতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ষ্টার্লিং-এ মূল্য গ্রহণ ভারতের পক্ষে ক্ষতির কারণ। মিত্রশক্তির নিমিত্ত রৌপ্য মুদ্রা সরবরাহ ভারত সরকারের দায়িত্বে হওয়া সঙ্গত নয়—এ দায়িত্ব মিত্রশক্তি-সঙ্ঘের। অর্থ-সচিব তাঁহার বাজেট-বক্তৃতায় এই নীতির অনুকূলে যে যুক্তি-জালের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বেই তাহার খণ্ডন করিয়াছি। এ দেশে অর্জ্জিত বৃটিশ-সম্পত্তির বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহই সমীচীন।

আন্তর্জ্জাতিক নীতি অনুযায়ী ভারত হইতে প্রেরিত দ্রব্যাদির মূল্য ভারতে স্বর্ণ অথবা বহুকাল-স্থায়ী সম্পত্তি (Durable assets) প্রেরণ দ্বারা পরিশোধ কর্ত্তব্য। এবং কারেন্সি-নোট অযথা বৃদ্ধি না করিয়া দীর্ঘস্থায়ী বণিজ-সম্পত্তির প্রতিদানে বে-সরকারী উৎস (Private sources) হইতে রৌপ্য-মুদ্রা বিনিয়োজন (Rupee investments) প্রয়োজন। জাহাজ, বিমান, হাওয়া-গাড়ী এবং বৃহৎ এঞ্জিন প্রভৃতি মূল ও স্থূল শিল্পের কারখানার উপযোগী যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও কলকব্জা সরাসরি ভারতে স্থানান্তরিত করা দুষ্কর হইলেও, অসম্ভব নয়। রাশিয়ার পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারতের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর। অর্থের অনর্থ এবং অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের তাহাই একমাত্র উপায়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসন্ত-বিদায়

অবশেষে এক দিন বৈশাখের খর রৌদ্র-তাপ
চঞ্চল বসন্ত দিনে রুদ্র রোষে ছিল অভিশাপ।
বল্লভ পল্লব-ঘেরা নিকুঞ্জ-কুটিরে, ম্লান মুখে,
সে শুধু কি শেষ দিনে দিয়ে গেল তার দু'টি চোখে
বিদায়ের কাতরতা, অশ্রু-ভেজা নির্ব্বাক-মিনতি,
যেন "মনে রেখো" বলে আর্ত্তকণ্ঠে অন্তিম কাকুতি?
পরিচয়, নাম তার নাই তবু হায়! সে মৌন বেদনা
পাতা-ঝরা নিখিলের মর্ম্ম মাঝে আনে তো চেতনা।
যে সঙ্গীত-রসধারা একদা উচ্ছল মধু-রাতে,
অশোক বকুল গন্ধে অন্ধ অলি পাখী-জাগা প্রাতে,
মধ্যাহ্নে শ্যামল গোষ্ঠে তন্দ্রা-লাগা রাখালের বাঁশী,
ক্লান্তপদ পথিকের বেলা-শেষে কথা, গান, হাসি,
নব বধূ সন্ধ্যাতারা সঙ্গোপনে ভীরু-চোখে চাওয়া,
কবরী-ফুলের গন্ধে অকারণে চমকিত হওয়া,
তারা সবে ভিড় করি হে বসন্ত, তোমার বিদায়ে
চায় কিছু অভিজ্ঞান—ওগো সখা, কিছু যাও দিয়ে!

বাসরের বাসি মালা শীর্ণ শুষ্ক অতি তুচ্ছতম,
সর্ব্বহারা দুখ-রাতে ক্ষণিকের সুখ-স্বপ্ন সম,
নিয়ে তাই এক দিন এ মধু মাধবী-রাত্রি পারে,
বরষা শরৎ শেষে হিমানীর কুহেলী-দুয়ারে,
আঁখিনীরে বিষণ্ণ নিশ্বাস-তপ্ত এই দিনগুলি,
মনে হবে—আজি যারা স্বপ্ন-সম চিত্তে ওঠে দুলি,
তারা কভু মিথ্যা নয়, এক দিন দূরে, বহু দূরে,
শেফালি-রজনীগন্ধা সুবাসিত অতীতের পারে,
লঘুপদ অভিসারে, দক্ষিণের বাতায়ন-পথে,
দোলা-লাগা মধু-রাতে প্রেমে-ভরা লিপিখানি হাতে,
যৌবন-নিকুঞ্জ-বনে—উচ্ছ্বসিত মদির ভুবনে,
ভালোবেসে এসেছিল পথহারা মধুর লগনে!
সে দিন মরমবাণী মুখরিত হলো তরু-শাখে
ভীরু প্রেম কথা কয়! লজ্জা-রক্ত-রাগ দু'টি চোখে!
আজি সব শেষ হলো! শুধু তব যাবার বেলায়
মিলনের মালাখানি রেখে গেলে মরণ-দোলায়!

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চট্টরাজ।

ছায়া ও কায়া

[রূপকথা]

এক বছর সময় বড় অল্প নয়। ভয়ে দিনের বেলা বার হই না। একান্ত দরকার হলে গাড়ীতে চ'ড়ে যাই. আর চলে আসি। সঙ্গে আমার প্রিয় ভৃত্য কানাই থাকে। সে এখন আর ভৃত্য নয়। সে আমার বিশ্বস্ত এবং একমাত্র বন্ধু। রাত্রে চাঁদ উঠিলে হোটেলের ঘর থেকে বার হ'তে সাহস হয় না। কখন কে দেখতে পাবে, আমার ছায়া নেই। কিন্তু এ রকম করে দিন-রাত একটা ঘরে বন্দী হয়ে মানুষ কত দিন বেঁচে থাকতে পারে! কানাইয়ের পরামর্শ মত আজবপুর থেকে অনেক দূরে কল্পনাগড় নামক একটা মহাল কিনে ফেললুম। তারই তত্ত্বাবধানে সেখানে এক বিরাট্ প্রাসাদ গড়ে উঠল—"স্বপ্নপুরী"। কানাই এখন আমার পার্শ্বচর, তাই আর একটি চাকর বহাল করতে হয়েছে। ছোকরা দেখতে ভাল। কোন বড় বংশের ছেলে বলে মনে হয়। কিছু লেখাপড়াও জানে। নাম অনন্ত মণ্ডল। এক দিন শুভক্ষণে হোটেলের দেনা-পাওনা মিটিয়ে সদ্যঃক্রীত একটা সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়ী করে আমি, কানাই এবং অনন্ত কল্পনাগড় রওয়ানা হলুম।

দু'দিন পথে কেটে গেল। তৃতীয় দিন বেলা দশটা নাগাদ আমার জমীদারীর সীমান্তে পৌঁছলাম। অদূরে অনেক লোক-জন দাঁড়িয়ে। সুমধুর বাদ্য-গীতধ্বনি কানে এল। কানাইকে প্রশ্ন করলুম—"ব্যাপার কি?" সে হেসে উত্তর দিলে,—"আপনার জমীদারীর লোকেরা আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে। এখানে আপনার নূতন নামে পরিচয় দিতে হবে।" আশ্চর্য্য হয়ে জিগ্যেস করলুম—"নূতন নামে কেন?" কানাই উত্তর দিলে—"আমি এদের বলেছি, আপনি আসলে কলিঙ্গ দেশের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেনাদিত্য বর্ম্মা—শরীর সারাবার জন্য ছদ্মবেশে এখানে কিছু দিন বসবাস করবেন।" ততক্ষণে আমরা তাদের কাছে পৌঁছে গেছি। ভীড়ের সামনে গাড়ী দাঁড় করাতে হল। গ্রামের মোড়ল একটি সুলিখিত প্রশস্তি পাঠ করলেন। তার পর আমার সুখ্যাতি করে সুললিত কণ্ঠে একটা গীত হ'ল। ধন্যবাদ দেবার জন্য আমি গাড়ী থেকে নামতে যাচ্ছি, এমন সময় কানাই বাধা দিয়ে নিজে নেমে বললে—"আপনাদের এই অভ্যর্থনার জন্য মহারাজ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ, তাই নিজে নেমে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারলেন না।" এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন। "মহারাজের জয় হউক" ধ্বনিতে চারি দিক্ মুখরিত হ'ল। আমি যুক্তহস্তে সকলকে অভিবাদন করলুম। মোড়ল মহাশয় বললেন—"পথ দাও। মহারাজের শরীর অসুস্থ। রৌদ্রে ওঁর কষ্ট হচ্ছে।" জনতা পথ ছেড়ে দিতেই আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হ'ল। পথে কানাই বললে, "এই রৌদ্রে আপনি নামতে যাচ্ছেন দেখে আমি বাধা দিয়েছিলুম।" কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে আমি বললুম, "তুমি আমাকে খুব বিপদ থেকে রক্ষা করেছ। সত্যই, এই রৌদ্রে গাড়ী থেকে নামলেই সকলে জানতে পেরে যেত আমার ছায়া নেই।"

নির্ব্বিঘ্নে প্রাসাদে পৌঁছুলুম। আমার জন্য কানাই আগে থেকেই একটা খুব বড় ঘর ঠিক করে রেখেছিল। ঘরের জানালাগুলি খুব উচ্চ। চারি ধারে এমন ভাবে আলো জ্বালা যে, মানুষের ছায়া না পড়তে পারে। সেই ঘরের পাশেই আমার শোবার ঘর। তাতেও পূর্ব্ববৎ কৌশল। কানাই আমাকে বললে—"দেখুন, আপনি রাজা। সকলের সঙ্গে দেখা না করলেও খুব খারাপ দেখাবে না। সাধারণ লোকের সঙ্গে আমিই দেখা করে তাদের যা বক্তব্য, আপনাকে জানাব। যদি একান্তই কাঁরো সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয় তো এই ঘরে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন। তাহলে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। দিনে বার হবেন না। লোকে জানে, আপনার শরীর অসুস্থ। সন্ধ্যার পর গাড়ীতে বেরুবেন। আমি সর্ব্বদাই আপনার সঙ্গে থাকব, কিছু ভাববেন না।"

নতুন জায়গায় স্থিতি হতে দু'-চার দিন লাগল। অনেক দাস-দাসী চাকর-বাকরের বন্দোবস্ত হল, কি করে একটা ছায়া জোগাড় করা যায়, সেই চিন্তাই আমায় পেয়ে বসেছিল। এক দিন কানাই পরামর্শ দিলে—"দেখুন, ছায়া যদি কায়া থেকে খুলে নেওয়া যায়, তবে আবার জুড়ে দেওয়াই বা যাবে না কেন? কোন এক জন ভাল চিত্রকরকে দিয়ে একটা ছায়া আঁকিয়ে নিলে কেমন হয়?" কথাটা আমার মনে লাগল। তখনই তাকে দিয়ে এক জন বিখ্যাত চিত্রকরকে ডাকিয়ে আনালুম। সব লোক-জনকে সরিয়ে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁকে বললুম—"দেখুন, আপনার নাম এবং খ্যাতি অনেক দিন থেকেই শুনছি। আপনাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই—অবশ্য পয়সার জন্য ভাববেন না। আপনি যা চাইবেন, আমি তাই দিতে প্রস্তুত।" চিত্রকর বললেন—"আপনার কথা শুনে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান্ মনে করছি, কিন্তু কি কাজ না জানলে আমার সামর্থ্যে কুলোবে কি না, বলতে পাচ্ছি না।"

আমি বললুম—"কাজ যে কি, তা ত বলবই, কিন্তু কথাটা খুব গোপনীয়। আশা করি, আর কাউকে আপনি সে কথা বলবেন না।" চিত্রকর উত্তর দিলেন—"আপনি নিঃসঙ্কোচে আমায় বলতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি, তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণে এ কথা উঠবে না।" একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বললুম—"আমার এক জন অতি নিকট-আত্মীয় হঠাৎ দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর ছায়া হারিয়ে ফেলেছেন। আপনি যদি বেশ ভাল দেখে একটা কৃত্রিম ছায়া এঁকে দেন, তবে তিনি বড়ই উপকৃত হন। অবশ্য পয়সা যা লাগবে আমি দেব।"

বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন—"কি ভয়ানক কথা, ছায়া হারিয়ে ফেলেছেন?" আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলুম। চারি দিকে চেয়ে দেখলুম, না, ভয়ের কোন কারণ নেই। কানাইয়ের আলোক নিয়ন্ত্রণে ছায়া কোথাও পড়ে না। সাহসে ভর করে বললুম—"হ্যাঁ। আপনাকে একটি জুতসই ছায়া এঁকে দিতে হবে। বেচারা ছায়ার অভাবে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন।"

বিস্মিত এবং অবিশ্বাসের সুরে তিনি বললেন—"ছায়া হারিয়ে ফেলেছেন? কি ক'রে?" এই রকম খুঁটিনাটি প্রশ্নে আমি একটু বিরক্ত এবং ভীত হলুম। অসহিষ্ণু ভাবে বললুম—"যে রকম ক'রে হারান—হারিয়েছেন। এইটাই আসল কথা।" তার পর ভাবলুম—না, একে চটান ঠিক হবে না। তাই মিষ্টি করে বললুম—"কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে ঠাণ্ডায় এক দিন তাঁর ছায়া মাটীর সঙ্গে জমে [illegible]

তিনি এমন মুখভঙ্গী করলেন যে, তাতে স্পষ্ট বুঝলুম, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। অতঃপর তিনি উত্তর দিলেন—"আমায় ক্ষমা করবেন। ভগবান-প্রদত্ত নিজের ছায়া যিনি হারাতে পারেন, তাঁকে ছায়া এঁকে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তাঁর মত অসাবধানী লোকের ছায়া না থাকাই ভালো। সূর্য্যের আলোয় না বেরিয়ে অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে থাকলেই তিনি বেশী বুদ্ধির পরিচয় দেবেন।" এই বলে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই একটা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি দুঃখে, অপমানে ম্রিয়মাণ হ'য়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলুম।

কতক্ষণ এ ভাবে বসেছিলুম জানি না, কানাইয়ের আগমনে আমার চমক ভাঙ্গল। আমার মুখের দিকে দেখে সে ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করলে—"আপনার শরীরটা কি খারাপ লাগছে ?" আমি ধরা-গলায় উত্তর দিলুম—"এ সংসারে কেবল তুমিই আমার বন্ধু, কানাই! সকলে আমায় ঘৃণা করে, কিন্তু তুমি সব জেনেও আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো। তুমি না থাকলে কবে আমি আত্মহত্যা করে বসতুম।" তার পর চিত্রকরের সঙ্গে যা যা কথা-বার্ত্তা হয়েছিল, সে সব তাকে বললুম। কানাই বললে—"আর কিছু দিন আপনি অপেক্ষা করুন! একটা বছর! একটা বছর শেষ হলেই এর হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।" কানাইএর কথায় মনে অনেকখানি সান্ত্বনা পেলুম।

মোড়ল শ্রীপদ বাবু লোক ভালো। প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা ললিতাও আসেন। আমিও দু'-এক বার বেশ মেঘলা দিন দেখে কানাইকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ওখানে গেছি। ললিতা মেয়েটিকে আমার ভালোই লাগে এবং শ্রীপদ বাবুও আমাকে বিলক্ষণ পছন্দ করেন। এক দিন কানাইকে আমার মনের ইচ্ছা জানালুম। সে সানন্দে উত্তর দিলে—"এ ত খুব ভাল কথা। আমি শীঘ্রই এর একটা বিহিত করছি।" এই কথোপকথনের কয়েক দিন পরে শ্রীপদ বাবু এসে আমাকে বললেন—"অনেক দিন থেকেই তোমাকে একটা কথা বলব-বলব মনে করছি, কিন্তু বলে উঠতে পারছি না!—যদি রাগ না করো ত বলি!" আমি বুঝলুম, এ সব কানাইএর কারসাজি। স্মিত হাস্যে বললুম, "কি বলবেন বলুন! রাগ করব কেন?" তিনি বললেন—"ললিতা বড় হয়েছে, ওর এইবার বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন।" আমি বললুম—"তার ভাবনা কি ? আপনার কন্যা দেখতে শুনতে ভালো।" তিনি বললেন—"মনোমত পাত্র পাওয়া শক্ত, তবে এক জনকে আমাদের সকলেরই খুব পছন্দ হয়েছে।" উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে আমি বললুম, "কে?" তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—"তোমার কথাই বলছি। তুমি ত ললিতাকে দেখেছ!" আমি লজ্জায় মাথা নীচু করলুম। মৌন থাকাই সম্মতির লক্ষণ, তাই কিছু বললুম না। তিনি বললেন—"তোমার এ বিবাহে আপত্তি নেই তো ?" আমি সলজ্জ ভাবে বললুম—"আজ্ঞে না। আমারও মনে এই ইচ্ছাই ছিল। তবে সাহস করে বলতে পারিনি।"

"তা হলে বিবাহের দিন দেখা যাক্"—এই বলে তিনি তখনকার মত বিদায় নিলেন।

কানাইকে সব কথা খুলে বলতে সে বললে—"ভালোই হলো! কিন্তু একটা কথা আছে।" আমি ভীত ভাবে বললুম, "কি কথা? ওদের তো সকলেরই মত রয়েছে।" সে বললে—"আমি বলছিলুম কি, বিয়েটা কিছু দিন পেছিয়ে দিলে ভালো হয়।"

বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলুম, "কেন বল ত?" সে একটু কাঁচুমাচু করে উত্তর দিল—"বছরটা শেষ হয়ে গেলে ভাল হ'ত। কখন তারা জানতে পেরে যাবে—তখন একটা কেলেঙ্কারী!" কথাটা সত্য! কানাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম—"ঠিক বলেছ, এ কথা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম।"

পরদিন মোড়ল মহাশয় এসে বললেন—"আজই বিয়ের একটা খুব ভালো দিন পাওয়া গেছে।" বাধা দিয়ে আমি তাঁকে বললুম—"দেখুন, কিছু মনে করবেন না। বিয়েটা আপাততঃ এ বছরটার জন্য স্থগিত রাখতে হবে।" ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তিনি বললেন—"কেন? তোমার কেন আপত্তি?" বিনীত ভাবে উত্তর দিলুম—"আপত্তি আমার মোটে নেই বরং আগ্রহই আছে। কিন্তু এই বছরের গোড়ায় মাতা-ঠাকুরাণী স্বর্গলাভ করেন। কাল-অশৌচ।" শুনে বিরস বদনে তিনি বললেন—"অবশ্য এর ওপর কথা চলে না। তবে কথাটা পাকা রইল ত? আমি অন্য কোন সম্বন্ধ দেখব না।" আমি ব্যগ্র কণ্ঠে বললুম—"না, না। এ পাকাপাকি বন্দোবস্ত! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" তিনি স্মিতহাস্য সহকারে বললেন—"বেঁচে থাক, সুখে থাক বাবা! তোমার মুখের কথাই আমাদের যথেষ্ট।"

তিনি বিদায় নিলেন। আমি ছায়া-অপহরণকারী বৃদ্ধের কথামত এক বৎসর কবে পূর্ণ হবে, তার হিসাবে মনোনিবেশ করলুম। সিন্দুকের পর সিন্দুক মোহর ভর্ত্তি করে আমি সেই প্রৌঢ়ের আগমনের জন্য উদ্গ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলুম। বর্ষ-শেষ দিনে আমার মানসিক চাঞ্চল্য ভয়ানক রকম বেড়ে গেল। সমস্ত রাত জেগে কাটলো। রাত্রি বারটা বাজল। বর্ষ শেষ হলো। আমি ঘড়ির দিকে চেয়ে ভোরের আলোর প্রতীক্ষায় বসে রইলুম! ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না—ঘুম ভাঙ্গল আমার ঘরের দরজার বাহিরে কোলাহল শুনে। তবে কি সে এসে পড়েছে? তড়াক্ করে শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লুম। কানে এল অনন্তর কণ্ঠস্বর। চীৎকার করে বলছে—"আমি কোন বাধা শুনব না। এখনি দেখা করব।" আর কানাই তাকে বোঝাচ্ছে—"একটু অপেক্ষা কর। তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন।" ভয়ানক চটে গেলুম। দড়াম করে দরজা খুলে রাগত ভাবে বললুম—"কি ব্যাপার! এত চেঁচামেচি কিসের?" অনন্ত সেই রকম উদ্ধত ভাবে জবাব দিলে—"আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, কিন্তু কানাই বাবু দেখা করতে দিচ্ছেন না।" আমি কঠোর স্বরে বললুম—"বেশ, ঘরে এসে শান্ত ভাবে তোমার যা বলবার বলে আমার বাড়ী থেকে প্রস্থান কর। তোমার মত লোককে আমি আর রাখব না।" কানাই এবং অনন্ত দু'জনেই ঘরে ঢুকলো। আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললুম—"কি বলতে চাও, বল।" অনন্ত বললে—"আমি আপনার ভৃত্য। ইচ্ছে করলে আপনি তাড়াতে পারেন। যাবার আগে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে। দয়া করে ঘরের বাহিরে এসে আপনার ছায়াটি দেখালে আমি কৃতার্থ হব।"

আমি স্তম্ভিত হলুম। সেই সময় ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও এত বিস্মিত হতুম না: ধাক্কা সামলাতে বেশ একটু বেগ পেতে হ'ল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললুম—

"ভৃত্য হয়ে মনিবকে—" অনন্ত কথা শেষ করতে দিলে না। বললে—"ভৃত্য স্বীকার করছি, কিন্তু ভৃত্যেরও একটা আত্মমর্য্যাদা আছে ত। ছায়াহীন প্রভুর সেবা করতে আমি রাজী নই। আপনি জবাব দিয়ে দিয়েছেন—আমি চলে যাচ্ছি।" ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লুম! কি করা যায়? এ ত এখনি আমার গোপনতম কথা সকলের সামনে প্রকাশ করে দেবে। খুব নরম মিষ্টি গলায় বললুম—""বাবা অনন্ত, রাগের মাথায় যা বলেছি, তাই নিয়ে কি কিছু মনে করতে আছে? তোমায় আমি কত স্নেহ করি, জান ত'? তোমার মাহিনা আমি দ্বিগুণ করে দেব। কিন্তু এ রকম আজগুবি ধারণা তোমার মাথায় এল কোত্থেকে?" সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললে—"আপনার ছায়া না দেখালে আমি এখানে থাকব না। যার ছায়া থাকে না, সে মানুষ নয়। হয় ছায়া দেখান, না হয়—" কানাই এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার দিকে ইসারা করতে আমি অনন্তকে বললুম—"বাবা অনন্ত, এই কি স্নেহের প্রতিদান! এমন করে কি মনিবের সঙ্গে তর্ক করে? তোমার কত টাকা চাই বল, এক্ষুণি দিচ্ছি।" বাধা দিয়ে অনন্ত বললে—"ছায়াবিহীন লোকের কাছ থেকে আমি এক কপর্দ্দকও নিতে রাজী নই।" এই বলে সে গটমট করে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি স্থাণুর মত বসে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে কানাই বললে—"আপনি ভাবছেন কেন? আজই ত বর্ষ পূর্ণ হয়েছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।"

ঠিক কথা! সেই প্রৌঢ় এলে তাঁর কাছ থেকে ছায়া ফেরত নেব। কানাইয়ের কথায় মনে অনেকটা শান্তি পেলুম।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে অস্থির চিত্তে প্রৌঢ়ের আগমন-আশায় বসে আছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মোড়ল শ্রীপদ বাবু এসে হাজির। হাতে একটা চিঠি। ঘরে ঢুকেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—"মহারাজ নৃপেনাদিত্য বোধ হয় শম্ভুনাথ বাবুকে চেনেন?" শম্ভুনাথ আমারই আসল নাম। ভীত ভাবে বললুম—"কেন বলুন তো?" তিনি শ্লেষপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন—"শুনেছি, শম্ভুনাথ বাবু অনেক গুণের গুণনিধি!" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আমি বললুম—"ধরুন, যদি আমিই শম্ভুনাথ বাবু—" শাণিত কণ্ঠে তিনি বললেন—"সেই গুণনিধিটি নিজের ছায়া হারিয়ে ফেলেছেন। দয়া করে আপনার ছায়াটা যদি দেখান!" আমি কি উত্তর দেব? একেবারে থ' হয়ে ব'সে রইলুম। তিনি বলে চললেন—"নিরীহ ভদ্রলোকের সঙ্গে এ-রকম শাঠ্য করতে আপনার লজ্জা হলো না! না হয় পয়সাই আছে, কিন্তু আপনি কি মানুষ! কোন মানুষের ছায়া নেই, এ কথা ত জীবনে কখনও চোখে দেখিনি, কানে শুনিনি। ছিঃ ছিঃ!" ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম—"একটা তুচ্ছ ছায়ার জন্য এতটা রাগারাগি করছেন কেন? ছায়ার কি মূল্য আছে, বলুন?" শ্রীপদ বাবু গর্জ্জে উঠলেন—"তা হ'লে স্বীকার করছেন, আপনার ছায়া নেই?" বিনীত ভাবে বললুম, —"অস্বীকার করবো কেন? কিন্তু আপনি আমাকে দু'দিন সময় দিন। ছায়াকে যদি আপনি এত মূল্যবান্ মনে করেন, আমি সেটা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করব।"

"বেশ, দু'দিন সময় দিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার পর কেবল যে আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে দেব না তা নয়, সমস্ত দেশে রটিয়ে দেব আপনার ছায়া নেই! আপনি আমাদের মত মানুষ নন!" এই বলে তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শোকে আমি মুহ্যমান হয়ে পড়লুম। দু'দিন মাত্র সময়! এর মধ্যে ছায়ার জোগাড় না হলে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে, মনুষ্য-সমাজে আর বাস করতে পারব না! কেন মরতে অর্থের লোভে ছায়া দিতে গেছলুম! ভাবতে ভাবতে আমি যেন পাগলের মত হয়ে গেলুম। শেষে পকেটে কিছু মোহর এবং যত নষ্টের গোড়া থলেটা নিয়ে কানাইকে না জানিয়ে মহা-অনর্থকারী সেই প্রৌঢ়ের খোঁজে নিজেই বার হলুম।

ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীমোহন কর।

বিনা-ক্যামেরায় ফটো

তোমরা ভাবো, ক্যামেরা না থাকিলে কি করিয়া ফটো তুলিব? কিন্তু ক্যামেরা না থাকিলেও ফটোগ্রাফ তোলা যায়। কি করিয়া, তাই বলি।

পাশের ছবি দেখিতেছ,—দীঘির জলে বোট ভাসিতেছে! ২ নম্বরে দেখিতেছ একটি মেয়ের মুখের ছবি। এ ছবি দু'খানি তুলিতে ক্যামেরার প্রয়োজন হয় নাই। ছবি দু'খানি তুলিতে সময় লাগিয়াছে আধ ঘণ্টা—তুলিতে খরচ যা পড়িয়াছে, তা অতি সামান্য।
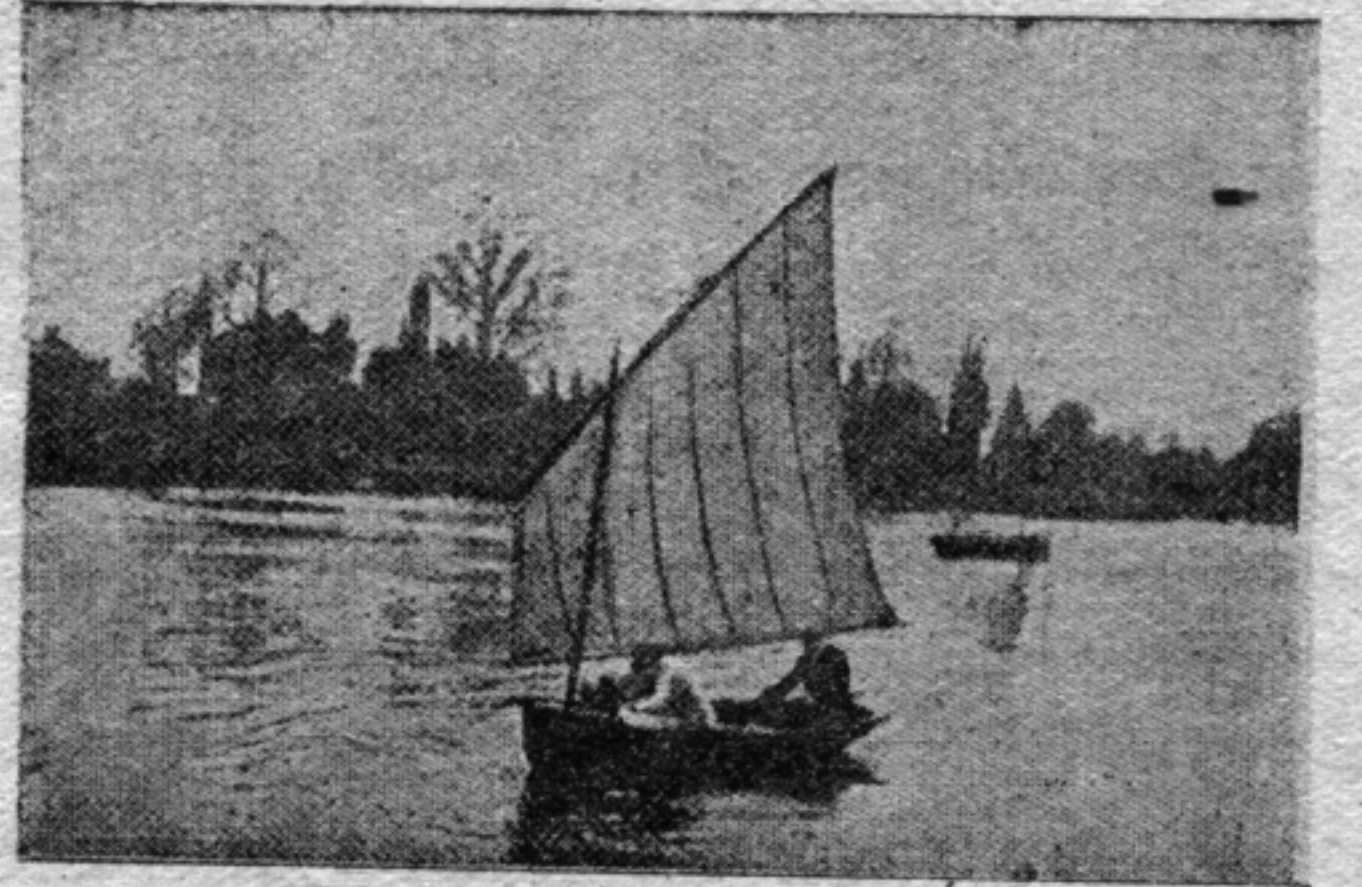
১। দীঘির জলে বোট

বিনা-ক্যামেরায় ছবি তুলিতে চাহিলে তার জন্য আলাদা কাগজ চাই। এ কাগজের নাম "সেল্ফ্-টোনিং পেপার (self-toning paper)। ফটোগ্রাফারের দোকানে এ কাগজ কিনিতে পাওয়া যায়। দাম বেশী নয়! এক-প্যাকেট কিনিলে বারোখানি বড়-সাইজের ফটোগ্রাফ তুলিতে পারিবে—ছোট ছবি তোলা যাইবে আটচল্লিশখানি। সেল্ফ্-টোনিং কাগজের সঙ্গে কিনিতে হইবে আধ সের হাইপো। হাইপোর দামও বেশী নয়। এ দু'টি জিনিষ হইলেই ব্যস্, মনের আনন্দে ফটোগ্রাফ তোলো—নাই বা রহিল ক্যামেরা!

২। একটি মেয়ে

সেল্ফ্-টোনিং কাগজের এক পিঠ বেশ মসৃণ, ঝক্‌ঝকে হয়।

প্যাকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া তার এক-টুকুরা কাটিয়া বাহিরে দিনের আলোয় যদি মেলিয়া ধরো, দেখিবে, কাগজের ঐ ঝক্‌ঝকে দিক্‌টুকু কালো হইয়াছে। আলোয় যত রাখিবে, ততই সে কালো রঙ্‌ হইবে গাঢ়, ঘন। কাগজের যে-অংশটুকু আঙুল দিয়া চাপিয়া থাকিবে, আলো না লাগার দরুণ সেটুকু কালো হইবে না।

৩। পত্র-পল্লব

এ কাগজের এই অদ্ভুত গুণ—দিনের আলো লাগিলে ঝক্‌ঝকে দিক্‌ হইবে মিষ্‌মিশে কালো—আর আলো না লাগিলে যেমন ঝক্‌ঝকে, তেমনি ঝক্‌ঝকে থাকিবে।

এ গুণের পরিচয় পাইলে তো,—এ বারে এ কাগজে বিনা-ক্যামেরায় ছবি তোলো।

গাছের পাতা কিম্বা ছোট একটি ফুল ছিঁড়িয়া এই কাগজের ঝক্‌ঝকে দিকের উপর রাখো—রাখিয়া ঐ ফুলপাতা-সমেত কাগজখানি আলোয় খানিকক্ষণ মেলিয়া রাখো,—দেখিবে, যে-অংশের উপর ফুল বা পাতা রাখিয়াছ, কাগজের সে-অংশে তার প্রতিলিপি হুবহু ছাপা হইয়া গিয়াছে। ৩ নম্বরে যে-ছবি দেখিতেছ, ও ছবিখানি ঠিক এমনি ভাবেই লওয়া হইয়াছে।

অবশ্য কাগজের উপর ফুল বা পাতা রাখিবার সময় সেগুলিকে চাপিয়া কাগজের সঙ্গে সমতল ভাবে রাখিতে হইবে—ফুল ও পাতা যেন কাগজের গায়ে আটকাইয়া থাকে। তাহা থাকিলে তবেই কাগজে সে ফুল-পাতার ফটো ভাঁজে-ভাঁজে রেখায়-রেখায় নিখুঁত হইবে!

চাপিবার জন্য পুরু এক-টুকুরা কাচ ব্যবহার করিবে। ছবির কাচ হইলেই ভালো হয়। ফুল-পাতা না সরিয়া যায়, এ জন্য কাগজের উপর-পিঠে কাচ এবং নীচের পিঠে মোটা কার্ড-বোর্ড দিয়া রবারের ব্যাণ্ড দিয়া দু'দিক্‌ আটকাইয়া লইলেই ভালো হয়। তাহা করিলে ফুল-পাতা ও কাগজের আর "নড়ন-চড়ন" ঘটিবে না।

ফটো তুলিবার সময় প্রথমে পাতা বা ফুল লইয়া কাচের উপরে রাখো; তার পর কাচের উপরে চাপাও মাপে কাটা সেল্‌ফ-টোনিং কাগজ; এবং কাগজের উপরে চাপাও কার্ড-বোর্ড—তার পর একসঙ্গে রবারের ব্যাণ্ড আঁটিয়া ক'টির মিলনকে করো সুদৃঢ় টাইট্‌। কাগজের চক্‌চকে-দিক্‌ পাতার গায়ে লাগিয়া থাকিবে—এ-কথা ভালো করিয়া মনে রাখিও।

তার পর দিনের আলোয় এটিকে রাখো বাহিরে—কাচের উপরে আলো লাগিবে, এমন ভাবে রাখিবে। কাচের মারফৎ আলো লাগিয়া কাগজের যে-অংশে ফুল বা পাতা চাপানো নাই, সে-অংশ মিষ কালো হইবে—পাতা-ফুল চাপানো অংশটুকুতে ভাঁজে-ভাঁজে ফুল-পাতার ছাপ মসৃণ চক্‌-চকে থাকিবে।

৪। পাতার নেগেটিভ্‌

এবারে আলো হইতে আনিয়া হাইপো-মেশানো জলের পাত্রে কাগজখানি ফেলিয়া দাও! দশ মিনিট ফেলিয়া রাখা চাই।

হাইপোর জলের ব্যবস্থা,—মাটীর গামলায় কিম্বা চীনা-মাটীর বড় পাত্রে খানিকটা জল ঢালিয়া তাহাতে কিছু হাইপো ছাড়িয়া দাও। হাইপো গলিয়া জলে মিশিয়া গেলে তবেই সে পাত্রের জলে ছবি ছাড়িবে।

হাইপোর জলে দশ মিনিট রাখিবার পর সে-পাত্র হইতে ছবি তুলিয়া পরিষ্কার-জলে বেশ করিয়া তাহা ধুইয়া লইবে। ধুইয়া দু'ঘণ্টা পরিষ্কার জলে রাখিবে। তাহা হইলে ফুল-পাতার ফটো অর্থাৎ প্রতিলিপি কাগজে সুস্পষ্ট সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত থাকিবে।

হাতের লেখা বা ছাপা-ছবিও ঠিক এমনি প্রণালীতে ক্যামেরার সাহায্য না লইয়া যেমন খুশী ছাপিতে পারিবে। লেখার বা ছবির ছবি তোলা মানে, যে লেখার বা ছবির ফটো তুলিতে চাও, ফুল-পাতার বদলে কাগজের উপর সেই ছবি বা লেখা রাখিয়া ঠিক এমনি ভাবেই ছবি তোলা যায়। তবে ছবির ছবি তুলিতে দু'খানি ফটো লইতে হইবে। কারণ, এ প্রণালীতে ছবির প্রথম যে প্রতিলিপি পাইবে, তাহাতে আমাদের প্রার্থিত ছবি হইবে কালো—মিষ কালো। এই প্রথম প্রতিলিপিটি হইবে নেগেটিভ। এই নেগেটিভ হইতে ঠিক ঐ প্রণালীতেই আর একখানি কাগজে তার প্রতিলিপি তুলিলে দ্বিতীয় প্রতিলিপিখানি হইবে ফটোগ্রাফ। মনোযোগ দিয়া কাজ করিলে ক্যামেরায়-তোলা ফটোগ্রাফের মতই এ প্রতিলিপি সর্ব্বাংশে নিখুঁৎ হইবে।

বিস্ময়

[কার্লাইল্‌]

বিজ্ঞান. দর্শন সবই আয়ত্ত করিয়া যার
জাগে না বিস্ময়,
পুঁথি যন্ত্র তন্ত্র ছাড়ি কখনো ভাবে না যেবা
স্রষ্টার বিষয়,

অবাক্‌ হইয়া যেবা চাহে না বিশ্বের পানে
হায় কোন দিন,
তাহারে জানিও শুধু দূর-বীক্ষণের মত
যন্ত্র প্রাণহীন।

শ্রীকালিদাস রায়।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

৮

কৌমুদীর মামা সত্যবান বাবু সাব-জজ। এখন আছেন মজঃফর-পুরে। চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বিবাহে তিনি আসিতে পারেন নাই; স্ত্রী উমাশশী আসিয়াছেন ছেলেমেয়েদের লইয়া। রাজীব চাকরি করে সত্যবানের কাছে। উমাপ্রসন্ন বাবুর যখন মৃত্যু হয়, সত্যবান তখন হাজারিবাগে মুন্সেফী করিতেছিলেন। উমাপ্রসন্নর আশ্রয়-নীড় ভাঙ্গিলে রাজীব আসিয়া আশ্রয় লয় সত্যবানের গৃহে। বিশ্বাসী পুরানো এমন লোক একালে আর মেলে না—উমাপ্রসন্ন বাবুর গৃহে সত্যবানের যাতায়াত ছিল; কাজেই রাজীবের পরিচয় তিনি ভালো রকম জানিতেন।

বিবাহ চুকিল রাত্রি প্রায় বারোটায়। দিলু-নীলু তখনো পরি-বেষণের কাজে মাতিয়া আছে। গৌরী ঠাকুরাণী দু'জনকে পাকড়াও করিয়া বলিলেন—ব্যাপার কি দিলু? দু'জনে সমানে ছুটোছুটি করছো! মুখে কিছু পড়েনি নিশ্চয়!

উচ্চ হাস্যে দিলু বলিল—এই যে পিশিমা, এই ব্যাচ্‌টা হয়ে গেলে ঐ সব চাকর-বাকর-ড্রাইভারের দল···ব্যস্‌, তাদের খাওয়া চুকলেই ছুটী মিলবে!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—সে কাজ অপরে করবে'খন! তোমরা এসো দু'-ভাইয়ে আমার সঙ্গে। ওদিকে মেয়ে-খাওয়ানোর ঝামেলা নিয়ে আমি নড়বার ফুরসৎ পাইনি, মন কিন্তু পড়ে আছে তোমাদের দুই ভাইয়ের উপর। কাকেই বা বলি! কে ডেকে দেয়! এখন হাত খালি হতে এই ছাদের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি তোমাদের ধরবো বলে'! ঢের হয়েছে, এসো···

বলিয়া তিনি দিলুর হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন। দিলুর হাতে কালিয়ার বালতি।

হাসিয়া দিলু বলিল—এ ব্যাচ্‌টা সেরেনি পিশিমা···

পিশিমা বলিলেন,—না,···পরিবেষণের জন্য অতগুলো বামুন রাখা হয়েছে, সে হতভাগারা করছে কি?···হ্যাঁ রে, ও কেশব···

সত্যবানের কে আত্মীয়—এই কেশব। কেশব হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া আসিতেছিল ছাদ হইতে নামিয়া—তার হাতে ফ্রাইয়ের চ্যাঙারি। গৌরী ঠাকুরাণীর আহ্বানে কেশব বলিল—আমায় বলছেন?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—হ্যাঁ। আমি বলছি, দশ-বারোটা বামুন আনা হলো যে পরিবেষণের জন্য···সব ষণ্ডা-ষণ্ডা জোয়ান··· তাদের কারো টিকি দেখতে পাচ্ছি না, আর তোমরা বাড়ীর ছেলেরা একেবারে খেটে হিমশিম্‌ হচ্ছো!

কেশব বলিল,—তারা বললে, মেয়েরা খেতে বসেছে··· দোতলায়···সেই দিকে কাজ করছে পাঁচ জন।

গৌরী ঠাকুরাণী ভ্রূ বাঁকাইলেন। ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—পাঁচ জন না, পঞ্চাশ জন! একটা পিলে-রোগা সিড়িঙ্গে ঠাকুরকে ওদিকে ঠেকিয়ে দেছে···ডাল আনতে সে চাটনি আনে, ভাত চাইলে পাঁপরের চ্যাঙারি নিয়ে আসে,···মেয়েদের ওদিকে পরিবেষণ করছি তো আমরাই! সত্যবানের দুই মেয়ে উৎপলা আর চপলা···ভাগ্যে তারা ছিল, তাই মেয়েরা খেতে পেলে!···আহা, বেচারীরা বিয়ে দেখতে পেলে না গো···

কেশব ছুটিতে ছিল, হঠাৎ ক'জন বরযাত্রী পটল-ভাজার জন্য ক্ষেপিয়াছে···ফ্রাই খাইবে না, তাদের আবার পটল-ভাজা চাই··· সেই জন্য।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—আচ্ছা, যাচ্ছো, যাও—কিন্তু ওদের সর্দ্দার-রসুইকর ঐ ইন্দ্রমণিকে ডেকে দিয়ো বাবা···লক্ষ্মীটি!

—দেবো ডেকে···বলিয়া কেশব ছুটিল পটল-ভাজা আনিতে।

দিলু বলিল—আমায় ছাড়ুন পিশিমা···

পিশিমা বলিলেন,—নীলু কোথায়?

দিলু বলিল,—তাকে দেওয়া হয়েছে জলের ভার। জাগ্‌ নিয়ে সে উপরে আছে···সকলকে জল দিচ্ছে।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—বেশ, তাকেও একবার ডেকে দিয়ো। বলো, পিশিমা ডাকছে!···আর তুমি···

গৌরী ঠাকুরাণীর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া মৃদু হাস্যে দিলু বলিল,—আমাকে ছেড়ে দিন···বালতি আমার হাতে···ওপরের জন্য বেছে বেছে কতকগুলি চিংড়ী আনতে হবে···বড় বড় চিংড়ী! সব চেঁচামেচি করছে!

—বেশ, ছাড়চি···কিন্তু চিংড়ী মাছ পরিবেষণ করেই আমার কাছে আসবে। নীলুকে ডেকে নিয়ে আসবে···আমি এইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

দিলুকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন···মাছের বাল্‌তি লইয়া দিলু ছুটিল নীচের তলায় ভাঁড়ারে···গৌরী ঠাকুরাণী সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজীব উপরে উঠিতেছিল, গৌরী ঠাকুরাণী তাকে ডাকিলেন,— রাজীব···

রাজীব বলিল,—ডাকছেন পিশিমা?

—হ্যাঁ বাবা, তোমার কোনো বিশেষ কাজ আছে?

রাজীব বলিল,—চুরুটের বাক্স চাই···মার কাছে আছে কি-না···

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—বেশ, তোমার মার কাছ থেকে চুরুটের বাক্স নিয়ে নীচেয় দাও গে···দিয়ে আমার একটি কাজ করতে হবে তোমায়।

—বলুন, পিশিমা···

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—ভেন্‌কর্‌-বামুনরা এনেছে একপাল লোক···পরিবেষণ করবে বলে। তাদের কারো টিকি দেখতে পাচ্ছি না ···অথচ বাড়ীর ছেলেগুলো খেটে নাকাল হয়ে গেল! তা দিয়ো তো বাবা একবার ডেকে ওদের সর্দ্দারকে···তার নাম বুঝি ইন্দ্রমণি। ডাকা নয়···তুমি তাকে নিয়ে এসো বাবা আমার কাছে···আমি এইখানে আছি, বুঝলে?

রাজীব বলিল,—তাকে আমি এখনি নিয়ে আসছি পিশিমা···

রাজীব গেল উমাশশীর কাছে চুরুটের বাক্স সংগ্রহ করিতে।

ইন্দ্রমণি আসিল···গৌরী ঠাকুরাণী তাকে ধমক দিলেন। বলিলেন,—একপাল লোক এনেছো পরিবেষণ করবে বলে'···কোথায় তারা ? কি করছে, বলো তো ইন্দ্রমণি ?

আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া ইন্দ্রমণি জানাইল, সে নিজে আছে খোলায় ···লুচি ভাজাইতেছে···তার উপর কচুরি বুঝি ফুরাইয়া আসিয়াছে··· আবার লেচি কাটিয়া কচুরি করানো ইত্যাদি···

গৌরী ঠাকুরাণীর আদেশে ইন্দ্রমণি জানাইয়া গেল, এখনি সে বামুনদের ঘাড় ধরিয়া পরিবেষণের কাজে লাগাইয়া দিবে, সে সম্বন্ধে পিশিমার অভিযোগ বা চিন্তার আর এতটুকু কারণ থাকিবে না !···

সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দইয়ের হাঁড়ি হাতে দিলুকে তিনি আবার গ্রেফতার করিলেন ; এবং গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের হাঁড়ি কাড়িয়া সেই-হাঁড়ি তখনি তিনি তুলিয়া দিলেন গদাই বামুনের হাতে। নীলুকেও আনানো হইল···এবং তার হাতের জলের জাগ্ কাড়িয়া কেষ্ট ঠাকুরের হাতে দিয়া ছ'-ভাইকে সঙ্গে করিয়া গৌরী ঠাকুরাণী তাদের আনিলেন দোতলায় বাথ-রুমের সামনে।

বলিলেন,—তোমাদের ট্রাঙ্ক থেকে কাপড় আর গেঞ্জি বার করে আনি···ঢোকো দিকিনি ছ'জনে একে-একে বাথ-রুমে। এত রাত্রে মাথায় জল ঢেলো না। তবে সাবান দিয়ে বেশ করে গা-হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে এসো।

হাসিয়া দিলু কি বলিতে যাইতেছিল, গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন, —মা এখানে পাঠিয়েছে আমার ভরসায়···খাওয়া-দাওয়া রইলো পড়ে···শেষে একটা অসুখ করুক, তার পর মা মরবে কপাল চাপড়ে ! তার আর কি সম্বল আছে, বাবা ?

শেষের দিকে গৌরী ঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর আবেগে বিজড়িত হইল।

তিনি বলিলেন—বাথ-রুমে সাবান আছে, জল আছে, তোয়ালে আছে···নীলু আগে ঢোকো···আমি এখনি কাপড়-গেঞ্জি আনছি।

তিনি চলিয়া গেলেন···দিলু-নীলু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ;

হাসিয়া নীলু বলিল—পিশিমা যেন আমাদের চোর ধরেছেন,— না দাদা ?

দিলুর মন কিসের ভারে ভরিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে ! দিলু বলিল,—মা ছাড়া আর কেউ আমাদের এমন ভালোবাসে না, নীলু !

নীলুর ছুই চোখ দাদার কথায় হঠাৎ কেমন আর্দ্র হইয়া উঠিল··· নীলু শুধু বলিল—হুঁ···

৯

মুখ-হাত ধোয়াইয়া দিলু-নীলুকে সঙ্গে লইয়া গৌরী ঠাকুরাণী আসিলেন দোতলার একটা ঘরে। সামনে যাকে পাইলেন, তাকে দিয়া আসন আনাইলেন এবং নিজে গিয়া ছ'জনের জন্ম খাবার সাজাইয়া আনিলেন।

বলিলেন—বসো, খেয়ে নাও। তার পর এই ঘরে খাটে ঐ যে বিছানা, ঐ বিছানায় ছ'ভায়ে শোবে, বুঝলে ! কোনো দিকে আর যাবে না !

গৌরী ঠাকুরাণীর কথায় "না" বলিবে, এমন ছেলে তারা নয়। ছ'জনে আসনে বসিল,—গৌরী দেবী সামনে বসিয়া তাদের খাওয়াইতে লাগিলেন।

বাহিরে বিপর্য্যয় কলরব।—কানাই, ওরে ও বংশী···গরম লুচি খানকতক নিয়ে আয় পচা, শীগ্‌গির···এমনি ভীম-ভৈরব চীৎকারের সঙ্গে সানাইয়ের বাদ্য, পাশের ঘরে রমণী-কণ্ঠে চড়া পর্দ্দায় হাস্য-ভাষ্য, আলো বাঁশী ফুল গান—সমস্ত মিলিয়া যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে !

দিলু-নীলু অবাক হইয়া গেছে ! একটা বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এমন অজস্র অর্থব্যয় ! অথচ এই অর্থের কণা মাত্র পাইলে কত ক্ষুধাতুর কত রোগাতুর বর্ত্তাইয়া যায় ! দিলু ভাবিতেছিল, ইহাকেই বলে সম্পদ ! এ সম্পদ সত্যই সার্থক হয়, যদি ইহার জোরে আত্মীয় অনাত্মীয় এত লোককে ডাকিয়া উৎসবের আনন্দকে মানুষ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে ! নীলু ভাবিতেছিল, কেহ ছ'টো টাকা রোজগার করিতে পারে না, আবার কেহ-বা টাকার উপর টাকা জমাইয়া টাকার পাহাড় গড়িয়া তোলে ! এত টাকা মানুষ রোজগার করে কি করিয়া ?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—শুতে যাবার আগে একবারটি বাসরে গিয়ে বর-কনে দেখে এসো। সেই কৌমুদী···সে আজ বিয়ের কনে ! ···কৌমুদী তোমাদের কথা বলছিল। মা আসতে পারলে না, সে জন্য কত দুঃখ তার ! সুপ্রসন্ন বললে, বিয়ের পরে জোড়ে বর-কনে ফিরলে ছ'জনকে বাসন্তীতে নিয়ে যাবে ! সেখানে ঠাকুর-নমস্কার আছে, তোমার মাকে জামাই দেখানো—মেয়ে-জামাই তাঁকে নমস্কার করবে গিয়ে···আশীর্ব্বাদ নেবে···

এমনি কথার আর শেষ নাই। সে সব কথায় গভীর স্নেহের সহস্র পরিচয় হীরার অজস্র কুচির মতো যেন ঝিকঝিক্ করিতেছে !

এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঘরে আসিলেন উমাশশী···সত্যবানের স্ত্রী। আসিয়াই বড় আলমারি খুলিলেন। গৌরী ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, —কি চাই রে ?

উমাশশী বলিলেন—ফর্শা তোয়ালে ! বার করে রেখেছিলুম··· কারা তাতে তরকারী-মাখা হাত মুছে নোংরা করে রেখেছে। সে-তোয়ালে কি নতুন জামাইকে দেওয়া যায়, দিদি ?

—সত্যি তো ! মানুষের আক্কেলও এমনি ! চিরজন্ম দেখে আসছি উমা, বিয়ে-বাড়ীতে নেমন্তন্ন এলেই সবাইয়ের মেজাজ যেন গরম হয়ে ওঠে ! একটু আগে দেখলুম, তোমাদের পাড়ার কোন্ বাড়ীর গিন্নী এসেছিলেন···সবাই খেতে বসলো···তাঁকে বসতে বলা হলো, তিনি বললেন, ভুঁয়ে থেব্‌ড়ে থুব্‌ড়ে বসে খেতে পারেন না···বাড়ীতে নাকি চেয়ার-টেবিলে খান !···শেষে সত্যবানের সেই চেয়ার-টেবিল আনিয়ে জায়গা করে দিলুম। মেম-গিন্নী তবে বসলেন তিন মেয়ে নিয়ে খেতে। পরের বাড়ীতে এসে এমন কথা মানুষ বলে কি করে, তাই ভাবি !

উমাশশী তোয়ালে বাহির করিয়া আলমারি বন্ধ করিলেন এবং দিলু-নীলুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ ছ'টি ছেলে ?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—সেই যে বিকেলে বলছিলুম আমাদের ওখানকার মাষ্টার-মশায়ের বাড়ীর কথা ! চমৎকার ছেলে ছ'টি ! রত্ন ! এটি বড়···পাশ করে জলপানি পেয়েছে, কিন্তু মাথার উপর পড়লো সংসারের ভার—হাসি-মুখে জানকী বাবুর কারখানায় ঢুকলো মিস্ত্রীর কাজ শিখতে। ছ' পয়সা রোজগার হবে, সে-পয়সায় ছোট ভাই ছ'টি মানুষ হবে। এ-বয়সে এ রকম বুদ্ধি-বিবেচনা···অনেক জোয়ান মদ্দ মানুষেরও থাকে না !

উমাশশী বলিলেন,—ও···বুঝেছি!···তার পর তিনি দিলু-নীলুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—তোমাদের সঙ্গে জানাশুনা হলো না বাবা, গোলমালের বাড়ী, কাল বর-কনে চলে গেলে আলাপ করবো।···আমি হলুম কৌমুদীর মামীমা···দিদির কাছে তোমাদের কথা শুনেছি···তোমার মার কত সুখ্যাতি করলেন দিদি। মাকে গিয়ে বলো, কৌমুদীর মামীমা কত দুঃখ করছিলেন, মার সঙ্গে দেখা হলো না, আলাপ হলো না বলে'···বলবে তো?

উমাশশীর পানে নীলু চাহিয়াছিল এক-দৃষ্টে···উমাশশীর কথায় মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া জানাইল, এ কথা বাড়ী গিয়া মাকে বলিবে।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—ছেলে দু'টি বেশ···না উমা?

উমাশশী কোন জবাব দিলেন না; সস্মিত দৃষ্টিতে গৌরীর পানে চাহিলেন। তার পর বলিলেন,—তুমি ওদের খাওয়াও দিদি। বরের খাওয়া হলো···এবার কৌমুদীকে খাইয়ে দি। তার পর বর-কনে নিয়ে মেয়েগুলো বাসরে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করুক!

এ কথা বলিয়া উমাশশী চলিয়া গেলেন।

আহারাদি সারা হইলে গৌরী ঠাকুরাণী তাদের লইয়া বাসরের সামনে আসিলেন। বরাসনে অর্দ্ধশায়িত ভাবে সমাসীন বর···তাকে ঘিরিয়া সুবেশী ক'জন তরুণী রঙ্গিণী···বরকে লইয়া হাসি-গল্প করিতেছে। কৌমুদী বাসরে নাই···উমাশশী তাকে খাওয়াইতে লইয়া গিয়াছেন।

দিলু-নীলুকে গৌরী বলিলেন,—এবার আর কোন কথা নয়···শোবে চলো। তোমাদের শুইয়ে আমি অন্য কাজে যাবো! কাল সকালে আবার দেখা হবে।

তিন জনে আসিতেছিলেন···যে-ঘরে দিলু-নীলু শুইবে সেই ঘরের দিকে···সামনে হঠাৎ দেখা জয়ার সঙ্গে।

গৌরী ঠাকুরাণী কি বুঝিলেন, তা জানেন অন্তর্যামী···

তিনি বলিলেন,—প্রণাম করো দিলু-নীলু···

দিলু-নীলু যেন কাঠ।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—চেনো না? তোমাদের পিশিমা···আপন-পিশিমা···কামাখ্যা সাহেবের স্ত্রী···জয়া।

দিলু-নীলু যন্ত্র-চালিতের মতো জয়ার সামনে ভূমিষ্ঠ হইয়া জয়াকে প্রণাম করিল···পায়ের ধূলা লইতে গেল···জয়া দু'পা হঠিয়া সরিয়া গেল। বলিল,—থাক থাক, পায়ের ধূলো নিতে হবে না আর!

জয়া দেখিল দু'জনকে। গৌরী ঠাকুরাণী হাসিলেন। হাসিয়া তিনি বলিলেন,—একালে মাসি-পিশির পা কি আর আছে যে ছেলেরা পায়ের ধূলো নেবে! মাসি-পিশির পা এখন জুতোয় ঢাকা!···জুতো পায়ে দেবে না কি? দেবে নিশ্চয়। কিন্তু এই সময়টায় আমার কেমন বিশ্রী লাগে জয়া···সত্যি ভাই, ছেলেমেয়ে পায়ের ধূলো নেবে, এ তো ভাগ্যের কথা!

জয়ার মুখে কথা নাই···কাঠ! চোখের দৃষ্টি কিন্তু দিলু-নীলুর উপর নিবদ্ধ···সরিতে চায় না!···দিলুকে দেখিয়া মনে পড়িতেছিল···মহেন্দ্রর কথা। অবিকল সেই মুখ! মনে হইতেছিল, মাঝখানকার এতগুলা বৎসর ঠেলিয়া সেই অতীত দিনের কিশোর-মূর্ত্তিতে মহেন্দ্র আসিয়া আবার যেন তাঁর সামনে দাঁড়াইয়াছে!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জয়া বলিল—তোমাদের নাম?

দিলু-নীলু নাম বলিল।

জয়া বলিল—তোমরা তো বাসন্তীতেই আছো? না?

দিলু বলিল—হ্যাঁ।

জয়া বলিল—শুনেছি···তবে নানান্ ঝঞ্ঝাটে দিন যে করে' কাটে, আপনার জনের খপর নেবো, তাও পারি না।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তুমি কেন খপর নিতে যাবে? ছেলেরা ডাগর হয়েছে, খপর নেবে ওরা। দূর-সম্পর্ক নয়, শুনেছি! পিশিমা···পিশিমার কাছে যাবে বৈ কি। যেয়ো এবার থেকে মাঝে-মাঝে পিশিমার কাছে, নিজেদের পিশিমাকে চিনলে তো···বুঝলে দিলু···বুঝলে নীলু···

দিলু-নীলু মাথা নাড়িল। দিলু বলিল—যাবো···

জয়া চলিয়া গেল···মুখে এ-কথা বলিতে পারিল না যে 'আসিয়ো'! কে যেন জয়ার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল!

পরের দিন সকালে বর-কন্যা বিদায় হইয়া গেলে গৌরী ঠাকুরাণী আবার দু'-ভাইকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন—আজ আর বাড়ী যায় না বাবা। বড্ড খাটুনি গেছে কাল, আজ জিরোও। তাছাড়া কলকাতায় এসেছো, সব ছাখো-শোনো···তার পরে যেয়ো! কেমন?

সুপ্রসন্ন কাছে ছিলেন···তিনিও বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ···বুঝলে দিলু, মাকে বরং তাই লিখে দাও।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—ঠিক কথা বলেছো সুপ্রসন্ন। ছেলেদের ছেড়ে কখনো থাকেনি···আহা! আমাদের কাছে পাঠালেও মন কেমন করবে বৈ কি! ছেলেদের এই প্রথম ছেড়ে দেছে!

বৈকালে সিনেমা দেখিতে যাওয়ার কথা উঠিল···নিমন্ত্রিতের দল বায়না ধরিয়াছে।

সুপ্রসন্ন বলিলেন—বেশ!

দিলু-নীলু গেল না। বলিল—ভালো লাগে না।

পাশ দিয়া যাইতেছিল পিনাকী-দেবকী···সজ্জিত বেশ···কথাটা কাণে গেল। সিনেমা দেখিতে ভালো লাগে না? জানোয়ার! তাচ্ছল্যের হাসি-ভরা দৃষ্টি ছিটাইয়া তারা চলিয়া গেল।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—গেলে না কেন? এঁ্যা···

দিলু বলিল—আমার ও-সখ নেই পিশিমা। নীলু কেন গেল না, জানেন?

নীলু চাহিল দাদার পানে···সে-দৃষ্টিতে অনেকখানি কাকুতি! গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—কেন রে?

দিলু বলিল—ছোট ভাই মোহন বাসন্তীতে আছে···সে দেখবে না কি না, তাই!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—ও···তা দু'জনে কি করবে এখন?

দিলু বলিল,—বেড়িয়ে আসি। সেই ইড্‌ন্ গার্ডন, গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত···

গৌরী ঠাকুরাণী কহিলেন,—তাহলে সাবধানে যেয়ো···আর ট্রামের ভাড়া নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে।

দিলু যেন চমকিয়া উঠিল! বলিল,—না, না পিশিমা, ট্রামে কেন? হেঁটে যাবো। না হলে আর বেড়ানো হলো কি!···তাছাড়া ট্রামে গেলে কিছুই তো দেখা হবে না···হু-হু করে যাওয়াই সার!

সন্ধ্যার পর দোতলার দালানে মেয়েদের মজলিশ বসিয়াছে···সে মজলিশে উমাশশী, গৌরী ঠাকুরাণী হইতে সুরু করিয়া জয়া এবং বাসন্তীর নিমন্ত্রিতার দলও আছে।

গৌরী ঠাকুরাণী হঠাৎ বলিলেন—আমি যা বলেছি উমা···আমার কথা ভেবে দেখো। তোমার উৎপলার জন্য পাত্র খুঁজছো···আমি বলি, দিলুর সঙ্গে বিয়ে দাও! পয়সা-কড়ি নেই···কিন্তু যে-মানুষের ছেলে আর যে-শিক্ষা পেয়েছে···আমি বলে রাখছি, ও এক জন মানুষের মতো মানুষ হবে পরে, দেখে নিয়ো!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, তার পর আবার বলিলেন, —বংশও ভালো। অজানা নয়। এই জয়াকে দেখছো···কামাখ্যা-সাহেবের স্ত্রী···জয়া হলো···ছেলেটির বাপ ছিলেন মহেন্দ্র বাবু···সেই মহেন্দ্র বাবুর বোন!

উমাশশী বলিল—ছেলেটিকে দেখে মন ভরে যায় দিদি। তবে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে—তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সে কথা কয়ো ভাই। ওঁরা পুরুষ-মানুষ···কত দিক দেখেন, বোঝেন মেয়ের জন্য পাত্র ঠিক করতে, পাত্রের যোগ্যতা পরখ করতে! তবে ওঁরও বড়-মানুষের দিকে ঝোঁক নেই। বলেন, মেয়ের জন্য বড়-মানুষ পাত্র কোনো দিন খুঁজবো না গো, খুঁজবো শুধু মানুষের মতো মানুষ!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

অকস্মাৎ বিশ্ব-মানচিত্রে উত্তর-আফ্রিকার যে অখ্যাত পার্ব্বত্য অঞ্চল অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখন ক্রমেই স্তিমিত হইতেছে। সমগ্র বিশ্ববাসীর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি টিউনিসিয়ার ক্ষুদ্র রণাঙ্গনে নিবদ্ধ ছিল। উত্তর-আফ্রিকার এই পাদভূমি হইতে অক্ষ-শক্তিকে দ্রুত বিতাড়িত করিয়া এই বৎসর গ্রীষ্মকালে একই সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ হইতে তাহাকে আঘাত করাই সম্মিলিত পক্ষের পরিকল্পনা। টিউনিসিয়া-যুদ্ধের ফলাফলের সহিত ভূমধ্য সাগরের ভাগ্য গ্রথিত। ভূমধ্য সাগরে সম্মিলিত পক্ষের প্রভুত্ব স্থাপনেই প্রাচ্য অঞ্চলে তাঁহাদের সমরায়োজন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে। তখন ভারত মহাসাগরে বৃটিশ নৌবহর সন্নিবিষ্ট হওয়া সম্ভব এবং সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের পরিকল্পনাও বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। সাফল্যজনক ব্রহ্ম-অভিযানের পর চীনে সাহায্য প্রেরণ এবং জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাতের কল্পনা।

টিউনিসিয়া-যুদ্ধ—

টিউনিসিয়া-যুদ্ধের শেষ অঙ্কে এখন যবনিকা পাত হইতেছে। সুদীর্ঘ ছয় মাস আশা ও উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হইবার পর গত ৭ই মে সম্মিলিত পক্ষের টিউনিস্ ও বিজার্টা অধিকারে আফ্রিকায় অক্ষশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে। বন্ অন্তরীপের নিকট যে সামান্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ এখন চলিতেছে, তাহার পরিসমাপ্তির আর বিলম্ব নাই। এই অঞ্চলে ১ লক্ষ ২২ হাজার অক্ষশক্তির সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ইহাদিগকে কোনপ্রকারে দক্ষিণ-য়ুরোপে অপসারণই এখন অক্ষশক্তির উদ্দেশ্য। সম্মিলিত পক্ষও এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য জলপথে ও আকাশপথে ভূমধ্য সাগরের এই অপ্রশস্ত অঞ্চলে মনোনিবেশ করিয়াছেন। অক্ষশক্তির "দ্বিতীয় ডান্‌কার্ক" সৃষ্টির প্রয়াস যদি বিফল হয়, তাহা হইলেই আফ্রিকায় তাহার পরাজয় সম্পূর্ণ হইবে।

টিউনিসিয়া হইতে অক্ষশক্তিকে বিতাড়িত করিবার পর দক্ষিণ-য়ুরোপে তাহাকে আঘাত করাই সম্মিলিত পক্ষের পরিকল্পনা। য়ুরোপ অভিযানের এই প্রাথমিক সর্ত্ত এখন পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু টিউনি-সিয়া হইতে অক্ষশক্তি বিতাড়িত হইবার পর য়ুরোপ অভিযানের ইতঃপূর্ব্বেই গোপনে এই অভিযানের আয়োজন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই উদ্যোগপর্ব্বে যে সময় লাগিবে, তাহাতে জার্ম্মাণী বিশেষ উপকৃত হইতে পারে; এই সুযোগে পূর্ব্ব-য়ুরোপে তাহার আঘাত প্রবল হওয়া সম্ভব।

রুশ-রণাঙ্গন—

গত এক মাসে রুশ-রণাঙ্গনে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; এই সময়ে উভয় পক্ষই গ্রীষ্মকালীন সংগ্রামের জন্য প্রাণপণ শক্তিতে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালীন সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাঁটী অধিকারের উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণী পুনঃ পুনঃ উত্তর-ডোনেৎস্ অতিক্রমণের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল এবং কুবানে অগ্রসর হইতে প্রয়াস করিয়া বিফলকাম হইয়াছিল। এইবার পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে কেবল জার্ম্মাণীই আক্রমণরত হইবে বলিয়া মনে হয় না; সোভিয়েট রুশিয়াও এবার আক্রমণাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। কোন্ দিকে কাহার আক্রমণ আরম্ভ হইবে, তাহা এখন নিশ্চিত বলা যায় না। তবে ককেসাস্ অঞ্চলের প্রতিই জার্ম্মাণীর লক্ষ্য অত্যন্ত অধিক; এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন অভিযান পরিচালনের উদ্দেশ্যে কুবানের স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্রকে সে এত দিন প্রাণ-পণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে। গত বৎসর জার্ম্মাণী দক্ষিণ অঞ্চলের ৫ শত মাইল রণাঙ্গনেই তাহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া-ছিল; মস্কৌকে পার্শ্বে রাখিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই বৎসর তাহার সমর-নীতির পরিবর্ত্তন হওয়াই সম্ভব; সম্ভবতঃ, সে এক দিকে ক্রিমিয়া হইতে ককেসাস্ অঞ্চলে এবং অন্য দিকে ওরেল্ অঞ্চল হইতে মস্কৌ অভিমুখে আক্রমণ প্রসারিত করিবে। জার্ম্মাণীর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার জন্য সোভিয়েট সমর-নায়ক-গণও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; ইতোমধ্যে তাঁহারা কুবান অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়া নভরোসিস্কের উত্তর-পূর্ব্বে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংসন ক্রিমস্কায়া অধিকার করিয়াছেন। ইহাতে ককেসাস্ অঞ্চলে জার্ম্মাণীর সম্ভাবিত অভিযানে প্রথম বাধা সৃষ্ট হইল, বলা যাইতে পারে। সোভি-য়েট সেনা এখন নভরোসিস্কের ৫ মাইলের মধ্যে উপনীত হইয়াছে।

এইবার গ্রীষ্মকালেই পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর শেষ অভিযান হইবে; এই অভিযানের ফলাফলের উপরই চরম জয়-পরাজয়

তাঁবেদার শাসকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি সকল দিক্ হইতে সর্ব্বপ্রকারে শক্তি অর্জ্জন করিয়া পূর্ব্ব-য়ুরোপে চরম আঘাত হানিবার আয়োজন করিতেছেন। তবে এই বৎসর জার্ম্মাণীর গ্রীষ্ম-কালীন অভিযান পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের অভিযানের ন্যায় প্রবল আকার ধারণ করিবে কি না, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। গত শীতকালীন অভিযানে জার্ম্মাণীর প্রায় ১২ লক্ষ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে, তাহার ৬ হাজার বিমান এবং ১০ হাজার ট্যাঙ্ক বিনষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মাণীর সমর-শক্তিতে এই ক্ষতির সুদূর-প্রসার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহা ব্যতীত পশ্চিম ও দক্ষিণ-য়ুরোপেও জার্ম্মাণীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীরও আর পূর্ব্বের সে আত্মবিশ্বাস নাই; নর্ডিক্ জাতি যে অপরাজেয় নহে, তাহা রুশ-রণাঙ্গনেই সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সম্মিলিত পক্ষে সংশয় ও জিরো-দ্য গলে মতানৈক্য—

এখন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর সমর-কৌশল সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলা যাইতে পারে; সে নিজের ইচ্ছা-অনুযায়ী য়ুরোপের বিভিন্ন রণ-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছে। রুশ-রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর আজ দুই বৎসরের মধ্যে সম্মিলিত পক্ষের য়ুরোপ আক্রমণে অসামর্থ্য তাহাদের বিশাল পরাজয়েরই সমান। হিট্‌লার এক সময় সদম্ভ উক্তি করিয়াছিলেন—কাইজারের কৃত ভুল তিনি করিবেন না, তিনি কখনও একই সময়ে দুইটি রণক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। হিট্‌লারের এই দম্ভ চূর্ণ করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই; জার্ম্মাণীকে দুইটি রণাঙ্গনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে সম্মিলিত পক্ষ অসমর্থ হইয়াছেন। কেবল সাময়িক অসুবিধাই এই অসামর্থ্যের কারণ নহে; রাজনীতিক বিষয়ে সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ইহার অন্যতম কারণ।

ইহা এখন সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সম্মিলিত পক্ষের সেনা য়ুরোপে অবতরণ করিবামাত্র বিভিন্ন অঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থান হইবে। সম্মিলিত পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দান করিলেও য়ুরোপের এই গণ-অভ্যুত্থানকে তাঁহারা ভীতির চক্ষে দেখেন। এই অভ্যুত্থানের সুযোগে ধনিকতন্ত্র-বিরোধী বলশেভিকবাদ যাহাতে প্রসারিত না হয়, অক্ষশক্তির অধিকৃত অঞ্চলের বিপ্লবী নেতৃবর্গ যাহাতে ঐ সুযোগে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহার জন্য এই শ্রেণীর উৎকণ্ঠা অত্যন্ত অধিক। এই রাজনীতিক সন্দেহ ও আশঙ্কার জন্য য়ুরোপে জার্ম্মাণীকে আঘাতের জরুরী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে আক্রমণের ব্যবস্থা হয় নাই। জার্ম্মাণী এই সুযোগে পূর্ব্ব-য়ুরোপে দুই বার প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে এবং এখন তৃতীয় ও শেষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। টিউনিসিয়া হইতে অক্ষশক্তি বিতাড়িত হইবার পরও এই রাজনীতিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ফলে য়ুরোপ-অভিযান অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইবে কি না, কে বলিবে!

য়ুরোপ-অভিযানের রাজনীতিক ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য জিরো-দ্য গলে সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত মীমাংসা হওয়া উচিত ছিল। জেনারল দ্য গলে অকৃত্রিম ফ্যাসিস্ত-বিরোধী; অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থাতেও তিনি বিপ্লবীরা তাঁহাকে মানিয়া লইয়াছে; সোভিয়েট রুশিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সম্মিলিত পক্ষ বহুরূপী দার্লঁার সহিত দহরম-মহরম করিয়াছিলেন। শুনা গিয়াছিল যে, সামরিক কারণে ইহার প্রয়োজন হয়। জেনারল কাট্রু প্রভৃতি অবশ্য বলেন যে, ঠিক সামরিক কারণেই দার্লঁাকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত নহে। সে যাহা হউক, দার্লঁার মৃত্যুর পর সামরিক কারণেই হয় ত জেনারল জিরোকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। জেনারল জিরো ফ্রান্স-সম্পর্কিত রাজনীতিক সমস্যাগুলি আপাততঃ চাপা দিতে চাহিতেছেন। এই বিষয়েই তাহার সহিত জেনারল দ্য গলের মতবিরোধ। জেনারল জিরোর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নহে; ফ্রান্স মুক্ত হইবার পর বিপ্লবীদিগকে দমন করিবার জন্য ভিসির ফ্যাসিস্ত দালালদিগের সহিত মিলিত হইবার প্রয়োজন হইতে পারে, সুতরাং এই বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে তিনি মীমাংসা করিবেন কেমন করিয়া? গত ৩রা মে জিরো এক বক্তৃতায় ফরাসী জাতিকে আন্দোলনকারীদিগের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং ফ্রান্সের বাহিরের কাহারও নিকট হইতে নির্দ্দেশ লইতে নিষেধ করিয়াছেন। আন্দোলনকারী বলিতে তিনি স্পষ্টতঃই ফরাসী কম্যুনিষ্টদিগের কথা বলিয়াছেন। "ফ্রান্সের বাহিরের" —অর্থাৎ সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে সতর্ক হইতেই তিনি উপদেশ দিয়াছেন। য়ুরোপে অভিযান আরম্ভ করিতে হইলে যুদ্ধরত ফ্রান্সের রাজনীতিক বিষয়ে ঐকমত্য একান্ত প্রয়োজন। অথচ বৃটিশ ও মার্কিণী রাজনীতিকদিগের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে কোনরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। এই মতবিরোধ জাগাইয়া রাখিয়া ফ্রান্সের বিপ্লবীদিগকে দমনের কোন পরিকল্পনা গোপনে রচিত হইয়াছে কি না, কে বলিবে?

পোল-সোভিয়েট বিরোধ—

সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে রাজনীতিক অনৈক্যের আর একটি দৃষ্টান্ত পোল-সোভিয়েট বিরোধ। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন্ এই বিরোধ সম্পর্কে সকল দোষ জার্ম্মাণীর স্কন্ধে চাপাইতে প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস আছে, পোল-সোভিয়েট বিরোধ তাহারই কুৎসিত বহিঃপ্রকাশ; সুচতুর গোয়েবেল্‌স্ ইহাতে উপলক্ষ। তিনি এই বিষয়কে স্বীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র।

গত শীতকালে সোভিয়েট বাহিনী যখন বিজয়-গর্ব্বে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন য়ুরোপ ও আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তি-গণের অন্তর্দাহ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ এই ব্যক্তিদিগের প্ররোচনাতেই বৃটিশের আশ্রিত রাজ্যহারা পোল্ সরকার ঐ সময় ধুয়া তুলেন—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রুশিয়া পোলাণ্ডের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় পোলাণ্ডকে তাহা অর্পণ করিতে হইবে। এই দাবীর সমর্থনে আটলাণ্টিক সনদেরও দোহাই দেওয়া হয়। পোল্ সরকারের দাবীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; য়ুরোপে প্রাগ্-যুদ্ধের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনই যে আটলাণ্টিক সনদের উদ্দেশ্য, এই কথা তখন তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া লইতে চাহেন। সোভিয়েট সরকার এই

অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসী বিলো-রাশিয়ানদিগকে সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাঁহাদের আছে; ঐ জাতির বিনা-সম্মতিতে উক্ত অধিকৃত অঞ্চল ফিরাইয়া লইবার অধিকার কাহারও নাই। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ জানান—কোন জাতির অসম্মতিতে তাহাদিগকে রাষ্ট্রবিশেষের অন্তর্ভুক্ত করা আটলান্টিক সনদের মূলনীতির বিরোধী। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের উত্তর সুস্পষ্ট ও সুযুক্তিপূর্ণ; ইহার উত্তরে পোল-ধুরন্ধরদিগের আর বলিবার কিছু ছিল না। তাই তাঁহারা তখন প্রকাশ্য বাদানুবাদে ক্ষান্ত হইয়া লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে ও ওয়াশিংটনের ওয়াল ষ্ট্রীটে কাঁদুনী গাহিয়া বেড়াইতে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট সেনা প্রথমে পোলাণ্ডের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল, পরে তাহার কতকাংশ পরিত্যক্ত হয়। গত মহাসমরের সময় ব্রেস্‌লিটভস্ক সন্ধির অসঙ্গত সর্ত্তে রুশিয়া যে অঞ্চল হারাইয়াছিল, বিলো-রাশিয়ান্ জাতি-অধ্যুষিত সেই অঞ্চলই কেবল রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে—বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পোলাণ্ডে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল, উহার বহিরাকৃতি গণতান্ত্রিক হইলেও প্রকৃত পোলাণ্ডে মার্শাল স্মীগলী রীজের একনায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় পোলাণ্ডে দারিদ্র্য ও অসন্তোষ অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয়। একনায়কের শাসনে ও অসহনীয় দারিদ্র্যে প্রপীড়িত পোলাণ্ডের বিলো-রাশিয়ানরা তখন সোভিয়েট-শাসিত স্বজাতীয়দিগের সুখশান্তির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিত। ঘটনাচক্রে এই স্বজাতীয়দিগের সহিত স্বীয় ভাগ্য গ্রথিত হওয়ায় তাহারা আনন্দিতই হইয়াছিল। তাই আজ সোভিয়েট সরকার সঙ্গত ভাবেই আশা করিতেছেন, বিলো-রাশিয়ানরা কখনও তাহাদের সোভিয়েট স্বজাতীয়দিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় পোল্ অছিদিগের শাসন ও শোষণের অধীন হইতে চাহিবে না।

সম্প্রতি জার্ম্মাণ-প্রচার বিভাগ এই পোল-সোভিয়েট মন-কষাকষির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং পোল-ধুরন্ধরগণ অর্ব্বাচীনের ন্যায় গোয়েবল্‌সের তালে নাচিতে আরম্ভ করে। কিছু দিন পূর্ব্বে গোয়েবল্‌সের উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত কাহিনী প্রচারিত হয়—সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে স্মলেন্‌স্কে ১০ হাজার পোল্ কর্ম্মচারীকে হত্যা করেন; জার্ম্মাণী আজ সাড়ে তিন বৎসর পরে এই সকল কর্ম্মচারীর অবিকৃত মৃতদেহ ও দেহগুলির সহিত সমাহিত পরিচয়-পত্র আবিষ্কার করিয়াছে। পোল্ সরকার এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া এতই আত্মহারা হন যে, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে গোয়েবল্‌সের টোপ গিলিয়া ফেলেন এবং সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষকে কোন কথা না জানাইয়া আন্তর্জ্জাতিক রেড ক্রস্‌কে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার দেন। সোভিয়েট রুশিয়া এখন যে জার্ম্মাণীর সহিত যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে, সেই জার্ম্মাণীই পোলাণ্ডকে শ্মশান করিয়াছে! অথচ এই শত্রুর স্বভাবসিদ্ধ কৌশলী প্রচারকার্য্যে পোল্ সরকার এতই বিভ্রান্ত হন যে, ঐ প্রচারের সত্যাসত্য সম্বন্ধে মিত্র রাষ্ট্রকে একবার জিজ্ঞাসার প্রয়োজনও বোধ করিলেন না। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পোল-সোভিয়েট মিত্রতায় পূর্ব্ব হইতে ঘুণ ধরিয়াছিল। সোভিয়েট সরকার এই শিথিল মৈত্রীবন্ধন টানিয়া চলিতে অস্বীকার করিয়াছেন; পোল্-সোভিয়েট কূটনীতিক সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দিক্ হইতে তিরস্কার শ্রবণ করিয়া পোল্ সরকার এখন সুর বদলাইয়াছেন। তাঁহারা এখন কেবল রুশিয়ায় অবস্থিত পোলদিগকে ফিরাইয়া চাহিতেছেন। ইতোমধ্যে আন্তর্জ্জাতিক রেড্ ক্রস্ সমিতি কর্ত্তৃক পোল্ সরকারের অনুরোধ রক্ষায় অসুবিধা জ্ঞাপনে ঐ বিষয়টি চাপা পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পোল্ সরকারের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধ দূর করিবার প্রয়াস হইতেছে। কারণ, সম্মিলিত পক্ষের এই ভাঙ্গনে যুদ্ধ-পরিচালনে অসুবিধা সৃষ্ট হইবে। অক্ষশক্তির অধিকৃত দেশগুলির বাহিরে ঐ সকল রাষ্ট্রের যে সেনা-বল আছে, তাহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিবার জন্য সম্মিলিত পক্ষের সহিত ঐ সকল রাষ্ট্রের মিত্রতার সামরিক প্রয়োজন আছে।

পোলাণ্ডের সহিত রুশিয়ার স্থায়ী সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইলে যুদ্ধোত্তর-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঐ দুই দেশের সরকারের ঐকমত্য স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কেবল সামরিক প্রয়োজনে জোড়াতালি দিলে স্থায়ী ফল পাওয়া যাইবে না। মঃ ষ্ট্যালিন্ লণ্ডন 'টাইম্‌সে'র প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—রুশিয়া পোলাণ্ডকে শক্তিশালী ও স্বাধীন দেখিতে চাহে। পোলাণ্ডের সহিত দৃঢ় ও মিত্রতাসূচক মৈত্রী-সম্বন্ধ স্থাপনই রুশিয়ার উদ্দেশ্য; পোল্-জনসাধারণ যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে পোলাণ্ড ও রুশিয়ার পারস্পরিক সাহায্য দানের চুক্তিও হইতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয়—মঃ ষ্ট্যালিন্ "পোল্-জনসাধারণ" কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন; প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন সরকার দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতে কথা বলিবার অধিকার দাবী করিতে পারেন না। যুদ্ধের পর বৃটিশের আশ্রিত পোল্ সরকার ঐ দেশের জন-সাধারণের আস্থা-ভাজন থাকিবেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদের নিজেদের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই জন্য মঃ ষ্ট্যালিনের আশ্বাসে সিকোরিস্কি-র‍্যাক্‌সিস্কি কোম্পানী শুষ্ক হাসি হাসিলেও রুশিয়ার পোল্ প্রবাসী-দিগকে ফিরাইয়া পাইবার দাবী ত্যাগ করেন নাই; নিজেদের সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই সকল পোল্‌কে ফিরাইয়া পাওয়া তাঁহাদের একান্ত প্রয়োজন।

সুদূর প্রাচী—

অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে জাপানের সমরায়োজন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে জাপান ২ লক্ষ সৈন্য মজুত করিয়াছে; প্রচুর বিমান-সন্নিবেশ করিয়াছে; সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে জাপানের সাবমেরিণ-বহরও অত্যন্ত তৎপর হইয়াছে। পোর্ট ডারুইনে সম্প্রতি জাপানের এক বিমান-আক্রমণে সম্মিলিত পক্ষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতির কৈফিয়তে বলা হয় যে, এই আক্রমণে জাপানের উৎকৃষ্ট বৈমানিকগণ নিযুক্ত হইয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে জাপানের এই সমরায়োজনে উৎকণ্ঠিত হইয়া অষ্ট্রেলিয়ান্ রাজনীতিকগণ পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত পক্ষকে অধিকতর সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছেন। তাঁহাদের উক্তিতে প্রায়ই অভিযোগের সুর শুনা যায়। এই অভিযোগ প্রধানতঃ মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। কিছু কাল পূর্ব্বে সমর-পরিচালন সম্পর্কে বৃটেনে ও

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চলগত দায়িত্ব বণ্টিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে সুদূর প্রাচীতে অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব্ব দিকে সমগ্র অঞ্চলের দায়িত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, অষ্ট্রেলিয়ান্ রাষ্ট্রনায়কগণ জাপানের আক্রমণাশঙ্কা সম্পর্কে যে সকল উক্তি করেন, মার্কিণী রাজনীতিকগণ প্রায়ই তাহাতে লঘুত্ব আরোপের চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই অপ-চেষ্টার প্রতিবাদে অষ্ট্রেলিয়ার সমর-সচিব মিঃ ফোর্ড গত ১লা মে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—উত্তরাঞ্চলে জাপান ২ লক্ষ সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছে; টিমর হইতে রবাউল্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাহার যে সকল বিমান-ঘাঁটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে দেড় হাজার বিমান আশ্রয় পাইতে পারে। জাপানের সাবমেরিণ-তৎপরতাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই, কেবল মূর্খরাই বলিতে পারে যে, "বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। জাপানীরা যত দিন অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমের সমুদ্রাংশে প্রভুত্ব করিবে, তত দিন বিপদের মাত্রা হ্রাস পাইবে না।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—২১শে এপ্রিল মার্কিণী সমর-সচিব মিঃ ষ্টিমসন্ বলিয়াছিলেন, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী সৈন্যের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা এখন দূরীভূত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, জাপান যে এখন অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি বিশেষ ভাবে অবহিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে প্রত্যক্ষ অভিযানের দ্বারা দ্বৈপায়ন মহাদেশটি অধিকার করিতে চাহে, কি উহাকে সংযোগ-বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করা তাহার উদ্দেশ্য, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, সম্মিলিত পক্ষ যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিতে না পারেন, তাহার জন্য জাপান চরম চেষ্টা করিবে।

জাপান যদি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার নৌবহরের বিশাল অংশ মুক্তিলাভ করিবে। শক্তিশালী নৌবাহিনীর সহযোগে ব্রহ্মদেশে জাপানের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিতে পারে। সম্মিলিত পক্ষের পরিকল্পনা—টিউনিসিয়া-যুদ্ধের পর ভূমধ্যসাগর নিষ্কণ্টক হইবে; দুই একটি নৌ-যুদ্ধে ইটালীয় নৌবাহিনীও পঙ্গু হইতে পারে। তখন বৃটিশ নৌবাহিনীর একটি বিশাল অংশ ভারত মহাসাগরে স্থানান্তরিত হইতে পারিবে এবং ব্রহ্ম-অভিযান সম্ভব হইবে।

টিউনিসিয়ার যুদ্ধ এখন যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহরের প্রভুত্ব স্থাপন অসম্ভব নহে। এইরূপ অবস্থায় জাপান আর বিলম্ব করিতে পারে না; প্রশান্ত মহাসাগর হইতে তাহার নৌবহরের কতকাংশ সত্বর ভারত মহাসাগরে স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচ্য অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের প্রধান আক্রমণ-ঘাঁটী অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইয়া সে নৌবাহিনী স্থানান্তরিত করিতে পারে না। এই জন্য অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে অতি দ্রুত হিসাব-নিকাশ হওয়া জাপানের একান্ত প্রয়োজন।

নৌবাহিনীর সহযোগ ব্যতীত সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযান অসম্ভব; তেমনি নৌবাহিনীর বিনা সহযোগে ব্রহ্মদেশের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। ভূমধ্যসাগর নিষ্কণ্টক হইবার পর সম্মিলিত-পক্ষ তাঁহাদের নৌবহর প্রাচ্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করিয়া ব্রহ্ম-অভিযানের ব্যবস্থা পূর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের নৌবহরও ব্রহ্মদেশের নিকট-বর্ত্তী সমুদ্রাংশে স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। জাপানী নৌবাহিনী যদি বঙ্গোপসাগরে বৃটিশ নৌবহরকে সজোরে আঘাত করিতে পারে, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষকে আবার বহু দিন রথেডং-বুথিডংএ অগ্র-পশ্চাৎ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে; ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনের শক্তি বৃদ্ধি এবং জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাতের পরি-কল্পনা পুনরায় বহু দিনের জন্য শিকায় উঠিবে। পক্ষান্তরে, বৃটিশ নৌবহর যদি বঙ্গোপসাগরে জাপ-নৌবহরকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রপথে ব্রহ্ম-অভিযান চালাইতে পারে এবং স্থলভাগের অভিযাত্রী বাহিনীকে জলপথে সহযোগিতা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানকে বিতাড়িত করিতে বিলম্ব হইবে না।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি—প্রতীচ্য মিত্রের পরোক্ষ সহযোগের সম্ভাবনা না ঘটিলে জাপানের পক্ষে একাকী ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশ আক্রমণে সাহসী হওয়া স্বাভাবিক নহে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে অভিযান-পরিচালনের জন্যও জাপানের নৌবাহিনী একান্ত প্রয়োজন। কি আক্রমণাত্মক, কি প্রতিরোধমূলক উভয় প্রকার সংগ্রামের জন্যই ভারত মহাসাগরে জাপানের নৌবাহিনী স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক।

আরাকানে তৎপরতা—

মাসাধিক কাল পরে জাপান পুনরায় আরাকান্ অঞ্চলে তৎপর হইয়াছে। ইতোমধ্যে সম্মিলিত পক্ষের সেনা বুথিডংএর উত্তর-পশ্চিমে পশ্চাদ-পসরণ করিয়াছে। বুথিডং হস্তচ্যুত হওয়ায় এবং বুথিডং-মংড রাজ-পথ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এখন মংড রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সম্মিলিত পক্ষ মংড হইতে ডনবেইক্ পর্য্যন্ত যে পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই পথেও জাপানীরা অগ্রসর হইতে পারিবে। বর্ষাকালে সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য মংডয় সম্মিলিত পক্ষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার মজুত রাখিয়াছিলেন। এখন সব ফেলিয়া তাঁহারা কক্সবাজারে ঘাঁটী স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বর্ষার পূর্ব্বে জাপান পুনরায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহে; তাহার এই প্রয়াস বিফল হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। আরাকানে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য ও উৎসাহ বায় আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পর স্থলপথে ঐ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীগুলিতে আক্রমণ প্রসারিত করিবার জন্য জাপান প্রয়াসী হইতে পারে।

বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—(১) ভারতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন ; (২) ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা। প্রথম ভাগ এখনও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই ; দ্বিতীয় ভাগ লইয়া অনেক অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছে। ভারত-শাসন আইন প্রণীত হইবার পূর্ব্বেই প্রাদেশিক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থায় যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল, তাহা গণতন্ত্রানুমোদিত নহে। কতকগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় লইয়া এবং হিন্দুসম্প্রদায়কে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রসারণ ঘটিবে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিশেষ বিলাতের রাজনীতিকগণ স্থির করিয়াছেন—মুসলমানগণ যে সকল প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ, সে সকল প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যা-তুলনায় অতিরিক্ত অধিকার লাভ করিলেও হিন্দুরা যে সকল প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ, সে সকল প্রদেশে অনুরূপ অধিকারে বঞ্চিত হইবেন। প্রকাশ, লর্ড হেলী এ দেশের লোককে স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত রাখিবার উপায়-রূপে এই ব্যবস্থার কল্পনা করিয়াছিলেন।

যখন ভারত-শাসন আইন আমলে আইসে, তখন পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারণানুসারে ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য-নির্ব্বাচন হয়। তখন মন্ত্রীদিগের ক্ষমতার অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকারে অসম্মত হয়েন—অথচ দেখা যায়, অধিকাংশ প্রদেশেই ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যা অধিক।

বাঙ্গালার পরিষদে কেবল যে মুসলমানদিগের সংখ্যা—সেই সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতাহেতু—অধিক তাহাই নহে ; পরন্তু, য়ুরোপীয়দিগের সংখ্যা অকারণ অধিক! সেই অবস্থায়ও নির্ব্বাচন শেষ হইলে দেখা যায়, বাঙ্গালার পরিষদে দল হিসাবে কংগ্রেসী দলই প্রবল! কিন্তু কংগ্রেসের নির্দ্দেশে কংগ্রেসী দলের দলপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বা তাহাতে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। সেই সময় য়ুরোপীয় বণিক্-সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'ক্যাপিট্যাল' লিখেন, সকলেই জানিতেন, খাজা স্যর নাজিমুদ্দীন প্রধান-মন্ত্রী হইবেন ; কিন্তু পটুয়াখালীর নির্ব্বাচনে মিষ্টার ফজলুল হক তাঁহাকে পরাভূত করায় সে ব্যবস্থা আর হইল না। তখন খাজা স্যর নাজিমুদ্দীন মসলেম লীগের প্রতিনিধি এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার "অপরাধে" মিষ্টার হক লীগ হইতে বহিষ্কৃত। ইহার পর মিষ্টার হক প্রধান-সচিব হইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিলেন এবং খাজা স্যর নাজিমুদ্দীনকে স্বরাষ্ট্র-সচিব করিলেন। সে সচিবসঙ্ঘ সর্ব্বতোভাবে মসলেম লীগ-প্রভাবিত ও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট হইল।

এ দিকে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসীরা ব্যবস্থা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় অন্য কোন সচিবসঙ্ঘের পক্ষে কার্য্য-পরিচালন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। বিলাতের সরকার ও ভারত সরকার বুঝিলেন—কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকার না করিলে তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অচল হইবে। অথচ তাঁহারা সমগ্র সভ্য জগতকে বুঝাইতে ব্যাকুল—ইংরেজ ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই জন্য বিলাতে ভারত-সচিব ও এ দেশে বড় লাট ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইলেন—গভর্ণরের ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ—অধিকাংশ কাজই মন্ত্রীরা করিবেন এবং সে সকল কাজে গভর্ণর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

এই বিবৃতি প্রচারের পর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিলেন! তখন আর বাঙ্গালায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্ভব হইল না। কারণ, তখন মুসলমানরা সচিবসঙ্ঘে একযোগে কায করিতেছেন এবং য়ুরোপীয় দল তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছেন। এমন কি—সচিবদিগের সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তাঁহারা বলিলেন, সচিবসঙ্ঘের বহু ত্রুটি তাঁহারা অবগত আছেন বটে, কিন্তু পাছে কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ গঠিত হয়, সেই জন্য তাঁহারা সচিবসঙ্ঘ সমর্থন করিবেন।

এই সচিবসঙ্ঘের সাম্প্রদায়িকতা এত সপ্রকাশ হইল যে, নানারূপ অনাচার ঘটিতে লাগিল। কুলটীতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় সচিবসঙ্ঘ আদালতে বিচার বন্ধ রাখিবার আদেশও দিলেন এবং ঢাকায় যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইল, তাহার ফলে বহু সহস্র হিন্দু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সামন্তরাজ্য ত্রিপুরায় যাইয়া আশ্রয়-গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করা হইতে লাগিল এবং সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্রকে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ-সাহায্য করাও হইল।

এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালার কল্যাণকল্পে উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি স্থির করিলেন, ঐ সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিতে হইবে। মিষ্টার ফজলুল হক ও নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর উভয়কে সেইরূপ সচিবসঙ্ঘে যোগদানে প্ররোচিত করিয়া তিনি হিন্দু-মহাসভার প্রতিনিধি শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও তাহাতে সম্মত করিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন, বিপুল উপার্জ্জন ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করিয়া তিনি মাসিক ৫ শত টাকা মাত্র লইয়া সেই সচিবসঙ্ঘে সচিব হইবেন। মিষ্টার ফজলুল হক, নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর ও শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই ৩ জন সচিবের নাম প্রকাশ করা হইল। স্থির হইল—শরৎ বাবু যে দলের দলপতি, সেই দল হইতে তাঁহার মনোনীত ২ জন ও তিনি স্বয়ং সচিবসঙ্ঘে যোগ দিবেন। কিন্তু সেই সকল নাম প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বদিন শরৎ বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনাবিচারে বন্দী করিয়া রাখা হইল—তাঁহাকে কলিকাতায়—এমন কি বাঙ্গালায়ও রাখা হইল না! শরৎ বাবুর মনোনয়নে শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সচিব হইলেন। মিষ্টার ফজলুল হক প্রধান-সচিব হইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিলেন।

এই সচিবসঙ্ঘ যাঁহার পরিকল্পনা, তাঁহার অভাবে যে তাঁহার পরিকল্পনা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইতে পারিল না, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সচিবসঙ্ঘের কার্য্যে যে সাম্প্রদায়িক বহ্নিদাহে বাঙ্গালার উন্নতি, শান্তি, স্বস্তি ভস্মসাৎ হইতেছিল, বাঙ্গালা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল।

কিন্তু যে সকল কথা প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাতে লোকের মনে করিবার কারণ ঘটিল—সচিবদিগের কার্য্য সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে হইতেছে না ; তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। হয়ত যুদ্ধে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সেইরূপ হস্তক্ষেপের সুযোগও ঘটিয়াছে !

প্রথমে অর্থ-সচিব শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করিলেন। পদত্যাগ করিয়া তিনি প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিলেন, বাঙ্গালায় সচিবসঙ্ঘের মধ্যে অন্য এক সঙ্ঘ আছে—সেই সঙ্ঘ গভর্ণরকে কেন্দ্র করিয়া স্থায়ী কর্ম্মচারীদলে গঠিত এবং কোন কোন বিষয়ে সচিবগণ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বিবৃতিতে স্বীকৃত ক্ষমতা সম্ভোগ করিতে পারিতেছেন না। প্রধান-সচিব মিষ্টার ফজলুল হকও গভর্ণরকে জানাইলেন—ধান্য ও চাউল ক্রয়ে, নৌকাপসারণে, সৈনিকদিগের ব্যবহারে—সচিবদিগের পরামর্শ গ্রহণ করা ত পরের কথা, তাহার অপেক্ষাও রাখা হয় নাই।

বাঙ্গালায় খাদ্য-সমস্যা দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল—চাউল দুষ্প্রাপ্য হইল। তাহা লইয়া সচিবসঙ্ঘের সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইল, কিন্তু মসলেম লীগের দল ও য়ুরোপীয় দল একযোগেও সচিবসঙ্ঘের পতন ঘটাইতে পারিলেন না। তাঁহারা যে সময় আবার সেই চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় ২৮শে মার্চ্চ গভর্ণর প্রধান-সচিবকে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে—স্বাক্ষর-জন্য রক্ষিত পদত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর দিতে বলিলেন। তিনি সহসচিবদিগের সহিত পরামর্শ করিবার সময় চাহিলে তাহাও পাইলেন না। তাঁহাকে বলা হইল, তিনি আপনিই বলিয়াছেন, তিনি সকল দলের প্রতিনিধিদলে গঠিত সচিবসঙ্ঘের পক্ষপাতী—সেইরূপ সচিবসঙ্ঘ গঠনের জন্যই তাঁহাকে পদত্যাগ করান হইল। ২৯শে মার্চ্চ তখন ব্যবস্থা পরিষদে প্রকাশ পাইল, মিষ্টার হক পদত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন এবং পূর্ব্বরাত্রিতেই গভর্ণর জানাইয়াছেন—সে পত্রে তিনি সম্মতি দিয়াছেন। তখন সচিবসঙ্ঘ নাই বলিয়া পরিষদের সভাপতি পরিষদের অধিবেশন ১৫ দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেন।

পরিষদে তখনও বাজেট গৃহীত হয় নাই ! গভর্ণর, বড় লাটের সম্মতি লইয়া ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করিয়া সমগ্র শাসন-ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বাজেট "পাশ" করিলেন এবং তাহার পর অর্থবিলগুলিও আইনে পরিণত করিলেন।

তখনই বুঝা গেল, যদি সচিবসঙ্ঘ গঠন সম্ভব হয়, তবে গভর্ণর সেই সচিবসঙ্ঘকে পরিষদে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের সম্মুখীন হইতে দিবেন না এবং সেই জন্য পরিষদের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করিবেন।

এ দিকে গভর্ণর ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মসলেম লীগ দলের দলপতি খাজা সার নাজিমুদ্দীনকে সচিবসঙ্ঘ গঠনে তাঁহাকে সাহায্য করিতে আমন্ত্রিত করিলেন—এ বার আর সর্ব্বদলের সচিবসঙ্ঘের কথা রহিল না—কেবল সচিবসঙ্ঘ গঠনের কথাই বলা হইল। কারণ, গভর্ণর জানিতেন—পরিষদে খাজা সার নাজিমুদ্দীনের সমর্থক দল সংখ্যালঘিষ্ঠ—তখনও মিষ্টার হকের দলের সংখ্যা অধিক। মিষ্টার ফজলুল হক গভর্ণরকে লিখিলেন,—

গঠনের সম্ভাবনা বুঝিয়া তাঁহাকে জানাইতে ভার দিয়াছেন, সে ভার অসঙ্গত—কারণ, তাহা নিয়মানুগ নহে।

৩০শে চৈত্র খাজা সার নাজিমুদ্দীন এক বিবৃতি প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন, তিনি আল্লার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার গভর্ণরের সচিবসঙ্ঘ গঠনে সাহায্য করিবার আহ্বানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কার্য্যের নীতি বিবৃত করেন—বলেন, বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবস্থা করিবেন :—

(১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
(২) সভা করিবার স্বাধীনতা
(৩) রাজনীতিক কারণে গ্রেপ্তার, আটক ও মামলা
(৪) রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকে মুক্তিদানের অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের বিষয় বিবেচনা
(৫) রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের খাদ্যাদি
(৬) রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের পরিবারের ভাতা
(৭) ভারত-রক্ষা নিয়মের ও অর্ডিনান্সের প্রয়োগ
(৮) পাইকারী জরিমানা

৪ঠা বৈশাখ পর্য্যন্ত খাজা সার নাজিমুদ্দীন—"বর্ণ হিন্দু" সদস্য না পাওয়ায় সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু ঐ দিন জানা গেল, কংগ্রেসী বলিয়া পরিচিত কয় জন হিন্দু সদস্য দল ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল ২ জনের নাম উল্লেখযোগ্য—

শ্রীবরদাপ্রসন্ন পাইন
শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী

আর সকলে উল্লেখের অযোগ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না।

পরদিন তুলসীচন্দ্র ঐ কয় জনের পক্ষে এক বিবৃতি প্রচার করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন—

(১) খাজা সার নাজিমুদ্দীন যে সহযোগ চাহিয়াছেন, তাঁহাকে তাহাতে বঞ্চিত করা তাঁহারা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না।

(২) তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগের কারারুদ্ধ নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহাদিগের কার্য্য সমর্থন করিবেন।

অবশ্য তাঁহারা খাজা সার নাজিমুদ্দীনের সহযোগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবেন কি না, তাহা তাঁহাদিগের বিবেচ্য। কিন্তু তাঁহারা শরৎ বাবুর কথা না বলিলেই শোভন হইত। কারণ, শরৎ বাবুর অনুমতি বা অনুমোদন তাঁহারা পান নাই, পাইবার কথাও নহে।

২৩শে এপ্রিল গভর্ণর ঘোষণা করিলেন, খাজা সার নাজিমুদ্দীনের সাহায্যে বাঙ্গালায় সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বড় লাটের সম্মতি লইয়া ২৫শে হইতে বাঙ্গালায় ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা বাতিল করিলেন।

প্রথমে শুনা গিয়াছিল, ঐ দিনই সচিবদিগের নাম প্রকাশিত হইবে ; কিন্তু তাহা হইল না। শুনা গেল, তৃতীয় "বর্ণ হিন্দু" দলত্যাগী—শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় তখনও আসরে দেখা দেন নাই—সাজঘরে ছিলেন এবং তাঁহার দলের (জাতীয় দলের) দলপতিকে না কি বলিতেছিলেন—তিনি সচিব হইবেন না !

শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী
শ্রীবরদাপ্রসন্ন পাইন
শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়
"বর্ণ হিন্দু" ৩ জন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু
শ্রীপ্রেমহরি বর্ম্মণ
শ্রীপুলিনবিহারী মল্লিক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

এই ৩ জনের সহিত ৭ জন মুসলমানও একযোগে সচিবসঙ্ঘে বহাল হইলেন।

যে দিন সচিবসঙ্ঘ গঠিত হইল, সেই দিন অপরাহ্নে কলিকাতা টাউন হলে সার হালিম গজনভীর সভাপতিত্বে গভর্ণরের সচিবসঙ্ঘ গঠন-কার্য্য নিয়মানুগ নহে বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করা হইল। প্রতিবাদ-সভায় মিষ্টার ফজলুল হক প্রধান বক্তা ছিলেন এবং সেই দিন হইতে গভর্ণর কর্ত্তৃক তাঁহাকে পদত্যাগ করাইবার রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে বহু সভায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন।

প্রথম সভায় তিনি বলেন—

(১) কিছু দিন হইতেই বাঙ্গালায় মসলেম লীগ প্রভাবিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছিল।

(২) গভর্ণর তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, তিনি (মিষ্টার হক) বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালায় সর্ব্বদলের প্রতিনিধিতে গঠিত সচিবসঙ্ঘ চাহেন এবং সে জন্য, প্রয়োজন হইলে পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। এখন তিনি পদত্যাগ করুন। সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠিত হইবে—এই কথায় তিনি পদত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর দেন। অথচ এখন যে সে সর্ত্ত পালিত হইতেছে না, তাহা অন্যায়।

(৩) মেদিনীপুরের ও ঢাকা জেলের ব্যাপারে তাঁহার সহিত সরকারের স্থায়ী কর্ম্মচারীদিগের প্রবল মতভেদ ঘটিয়াছে।

ঐ সভায় শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—তাঁহারা সকল দলের প্রতিনিধিতে গঠিত সচিবসঙ্ঘের সমর্থক। কিন্তু খাজা সার নাজিমুদ্দীন মসলেম লীগ ব্যতীত অন্য কোন দলের মুসলমানের সহিত একযোগে কায করিতে অসম্মত।

দ্বিতীয় সভায় মিষ্টার হক বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন :—

বাঙ্গালায় চাউলের অভাব হইয়াছে। বাঙ্গালায় যে চাউলের প্রয়োজন তাহার এক-চতুর্থ-ভাগও নাই। চাউল কোথায় গেল? চাউল কি ব্যবসায়ীরা ও গৃহস্থগণ বাঁধাই করিয়াছেন? না তাহা রপ্তানী হইয়াছে? বাঙ্গালা হইতে চাউল রপ্তানী হওয়াই আজ এই অভাবের কারণ। মূল্য বাড়িয়াছে এবং আগামী ফসল সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে মূল্য-হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নাই। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা ও স্বয়ং গভর্ণর মেদিনীপুরের ও ঢাকা জেলের ব্যাপারে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, মেদিনীপুরে অনাচারের অভিযোগ যখন ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হয়, তখন প্রধান-সচিবরূপে মিষ্টার ফজলুল হক অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্বন্ধে নানা কথা শুনা গিয়াছে এবং শুনা গিয়াছে যে, যে ঝটিকায় ও জলোচ্ছাসে মেদিনীপুরের কল্পনাতীত ক্ষতি হইয়াছে এবং যাহার সংবাদ বহু দিন প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল, সেই ঝড়ের ঐ পথে গমন-সম্ভাবনার বিষয় আবহ বিভাগ হইতে জানিয়াও কোন বা কোন-কোন রাজকর্ম্মচারী লোককে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করেন নাই! যদি সে অভিযোগ সত্য হয়, তবে তাঁহারা কি প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও, পরোক্ষ ভাবে, বহু প্রাণনাশের জন্য দায়ী নহেন? যিনি তৎকালে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে সে দিন হাইকোর্ট যে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার পর কি তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ তদন্ত করা হইবে?

মিষ্টার হক বলিয়াছেন, গত বৎসর এপ্রিল মাসে এক দিন বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহাকে নৌকাদি অপসারণ বিষয়ে ভারত সরকারের মত জানাইলে, তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সেই দিনই তাঁহাকে সরকারী কাযে দিল্লী যাত্রা করিতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া তিনি জানেন, বাণিজ্য বিভাগের সচিবের সহিতও পরামর্শ না করিয়া গভর্ণরের আদেশে কতকগুলি স্থান হইতে চাউল অপসারণ আরম্ভ হইয়াছে। গভর্ণর এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, সে কাযের জন্য উপযুক্ত ঠিকাদার বাছিয়া লইবার সুযোগও পাওয়া যায় নাই। আর যাঁহাকে ঠিকা দেওয়া হয়, তাঁহার নিকট হইতে দলিল পর্য্যন্ত না লইয়া তাঁহাকে ২০ লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। ঐ বিষয়ে সরকারের ব্যবহারাজীবদিগের মতও গৃহীত হয় নাই এবং তাঁহারা ঐ কাযের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। শেষে আরও কয় জন ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা যখন সরকার-দত্ত ক্ষমতা লইয়া মফঃস্বলে ধান্য ও চাউল ক্রয় আরম্ভ করেন, তখন লোকের সর্ব্বনাশ সূচিত হয়—বাঙ্গালার অর্থনীতিক ব্যবস্থা ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়। তাঁহাদিগের কেহ কেহ ৩ টাকা মণ দরে ধান কিনিয়া কলিকাতায় ১৪ টাকা মণ দরে বিক্রয় করেন।

এই অবস্থায় আবার নৌকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় লোকের আরও দুরবস্থা অনিবার্য্য হয়। আমরা জানি, কোন কোন স্থানে কোন কোন কর্ম্মচারী সোৎসাহে নৌকা পুড়াইয়াও দিয়াছিলেন। এই নিয়ন্ত্রণ-ফলে লোকের অসুবিধার একশেষ হয়।

মিষ্টার হক বলিয়াছেন, যে রাজকর্ম্মচারীটি যান-নিয়ন্ত্রণের কায করেন, সচিবদিগকে তাঁহার কাযে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল।

নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যের জন্য যে কয় জনকে গভর্ণর বাছাই করিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিয়োগের ও কার্য্যের দায়িত্ব সচিবদিগের নহে। এক ব্যক্তির নিয়োগ-সম্পর্কে ভারতীয় বণিক্ সমিতিসমূহ যখন এক জন ভারতীয়কে নিযুক্ত করিতে বলেন, তখন সচিবদিগের সে বিষয়ে প্রদত্ত অভিমত গভর্ণর অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন—বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কাযে সচিবরা যেন কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন। মিষ্টার হক বলিয়াছেন, তিনি গভর্ণরকে বলিয়াছিলেন—তাঁহার (গভর্ণরের) ঐরূপ কার্য্য নিয়মানুগ নহে।

আজ বাঙ্গালায় যে অন্নাভাব ঘটিয়াছে, তাহার জন্য ভূতপূর্ব্ব সচিবসঙ্ঘ দায়ী নহেন। কে বা কাহারা দায়ী, তাহা মিষ্টার হক প্রকাশ করিয়াছেন। গভর্ণরের পক্ষ হইতে কি তাঁহার উপস্থাপিত অভিযোগের প্রতিবাদ করা হইবে?

আর এক সভায় মিষ্টার হক তৎকালীন ডিরেক্টার অব

সিভিল সাপ্লাইজের সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরু অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন :—

তিনি না কি শিল্পকেন্দ্রসমূহে চাউলের জন্য সমস্ত চাউল মেসার্স শা ওয়ালেস কোম্পানীকে দিয়াছিলেন এবং তাহাতে য়ুরোপীয়েরাই উপকৃত হইয়াছে। তখন কলিকাতার লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছিল। আর সেই কোম্পানীরই এক জন ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছিলেন—সচিবসঙ্ঘ খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই!

আর এই য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের সমর্থনই খাজা সার নাজিমুদ্দীন ও তাঁহার সচিবদিগের প্রধান সম্বল!

বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অবস্থা যে শোচনীয়, তাহা নূতন প্রধান-সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীনও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—নূতন সচিবসঙ্ঘের সাফল্য খাদ্য-দ্রব্য সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভর করিবে। বাঙ্গালায় চাউল ৩৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। অথচ মধ্য-শ্রেণীর দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারের মাসিক আয় ৩৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা; আর শ্রমিকের মাসিক আয় ১৮ টাকা। "ইহারা যে (চাউলের দর ৩৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা মণ হওয়ায়) কিরূপে বাঁচিয়া আছে, তাহা ভগবানই জানেন!"

মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন, খাদ্য-সমস্যার বর্ত্তমান অবস্থা বাঙ্গালা হইতে চাউল রপ্তানীর এবং ধান ও চাউল সরানর জন্যই ঘটিয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে মিষ্টার হকের মতেরই সমর্থন করেন।

খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন বটে, তিনি যে সচিব-সঙ্ঘ গঠিত করিয়াছেন, তাহা প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, সে সচিব-সঙ্ঘে মুসলমানদিগের মধ্যে যেমন মসলেম লীগ দল ব্যতীত অন্য কোন দলের কেহই নাই, তেমনই আবার :—

(১) বর্ণ হিন্দুদিগের মধ্যে যে দল শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন, সে দলের ২ জন দলত্যাগী সদস্য ব্যতীত আর কেহ নাই; এবং

(২) জাতীয় দলের যিনি সচিবসঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন, তিনি না কি সচিব হইবার ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্বেও তাঁহার সচিবত্ব স্বীকারের কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং তিনি দল হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন!

(৩) জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মাতাব ও মহারাজ শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী সচিবসঙ্ঘে যোগ দিতে সম্মত হয়েন নাই।

(৪) কৃষক-প্রজা দলের কোন প্রতিনিধি সচিবসঙ্ঘে নাই।

সর্ব্বোপরি কথা—সচিব হইবার পর খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন, তাঁহারা মসলেম লীগের কার্য্যকরী সমিতির ও কাউন্সিলের আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

যদি বাঙ্গালার রাজনীতিক কার্য্য—কেবল বাঙ্গালার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলের স্বার্থে লক্ষ্য রাখিয়া—কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান-নিরপেক্ষ হইয়া করা সম্ভব না হয়, তবে বাঙ্গালার—অন্যান্য সম্প্রদায় ও দল কখনই এই সচিবসঙ্ঘের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানের দাবী মানিয়া লইবে না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

হিন্দু উত্তরাধিকার বিধির সংস্কার

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সরকার হিন্দু-সমাজের সংস্কার-কল্পে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। হিন্দু সমাজের উত্তরাধিকার বিধির সংস্কার, বিশেষতঃ হিন্দু-নারীগণের দায়াধিকার দানই সরকারের বিবৃত উদ্দেশ্য। প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা নিরূপণ করা অতি দুঃসাধ্য।

মহামান্যা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল—বৃটিশ সরকার কোন দিন হিন্দু ও মুসলমানের দায়াধিকার ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এত দিন প্রায় সেই মত কার্য্যও হইয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি এই নীতির আমূল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সর্দ্দা-আইনে হিন্দু বালিকাদিগের বিবাহের বয়স ন্যূনকল্পে ১৪ বৎসর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে সনাতন হিন্দুসমাজভুক্ত সকল লোকই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। ব্রাহ্ম, ইউরোপীয় শিক্ষিত প্রগতি-মতাবলম্বী সম্প্রদায় ও কতিপয় শ্রেণীর লোকের সাহায্যে ও উদ্যোগে ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। সরকার-পক্ষে ভোটাধিক্য হওয়ায় উহা সম্ভবপর হয়, আর শক্তিমান্ সরকারের পক্ষে ভোট সংগ্রহ করা যে কিরূপ সহজসাধ্য ব্যাপার, তাহা বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস-অনুধাবনকারী লোকমাত্রই অবগত আছেন।

সম্প্রতি হিন্দু স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার-নিরূপণে এবং স্ত্রীলোকদিগকে স্বামী বা পিতার সম্পত্তিতে অত্যধিক অধিকার দিবার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা অকারণে এবং সনাতন হিন্দুসমাজের নর-নারীর বিনা-আবেদনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন; এবং সেই কমিটির অনুমোদন-অনুসারে এই আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতিতে পেশ করিয়াছেন। আইনটি সমিতির অনুমোদিত হইলে ফল দাঁড়াইবে এই যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের সম্পত্তির উইল না করিয়া পরলোক গমন করেন, তবে তাঁহার কন্যারাও পুত্রদিগের সহিত তাঁহার সম্পত্তির অংশভাগিনী হইবেন। এই প্রস্তাব লইয়া ভারতের নানা স্থানে আন্দোলন চলিতেছে ও কয়েক জন শিক্ষিতা মহিলা পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাঁহাদের ন্যায়তঃ অধিকার দাবী করিতেছেন। এবং তাঁহাদের এই আন্দোলন যে সরকারের অনুমোদন, সমর্থন ও সাহায্য পাইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্র-মতে পুত্র থাকিতে কন্যার পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ লইবার কোন বিধান পাওয়া যায় না। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারগণকে অন্যায়দর্শী ও হিন্দু নারীদিগের দায়াধিকার-বিরোধী বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। হিন্দু সমাজের মৌলিক নীতি অন্যান্য

সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হিন্দু-মতে সম্পত্তি মাত্রই কুলজাত ব্যক্তিদিগের ভরণ-পোষণ ও জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই সম্পত্তির ভোগ-দখলের ব্যবস্থা ছিল এবং পিতৃ-পিতামহের পিণ্ডদান, কুলগৌরব-রক্ষা, পিতৃ-পিতামহের ঋণশোধ ও সামাজিক কর্ত্তব্য-পরিপালনের ভার পুত্রদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। এযাবৎ এই নীতিতেই হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে।

এইরূপ নীতি সত্ত্বেও কন্যাদিগকে হিন্দুশাস্ত্রকার একেবারে বঞ্চিত করেন নাই। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এবং "পুত্রেণ দুহিতা সমা" ইহাও মনু স্মৃতিকারের মত। পুত্রহীন পিতার সম্পত্তি পোষ্যপুত্রাভাবে কন্যার ভোগ্য এবং কন্যাদিগের জীবনান্তে এই সম্পত্তি সম্পূর্ণ দৌহিত্রগামী হইবে, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের মত। যৌবন-প্রারম্ভে কন্যার বিবাহ দেওয়া ও যথাসাধ্য অলঙ্কারা-ভরণ দান করিয়া কন্যাকে শিক্ষিত কুলশীলবান্ বরের হস্তে সমর্পণ করার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। কন্যা ভিন্নগোত্র-গামিনী হইবেন ও স্বামীর শ্বশুরকুলের ধনে অধিকার লাভ করিবেন, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল। কন্যার বিবাহে যথাসাধ্য ব্যয় আজিও ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে করিয়া থাকেন এবং ইহার ফলে অধিকাংশ গৃহস্থ ও মধ্যবিত্ত লোক সর্ব্বস্বান্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন, ইহাও সকলে অবগত আছেন। ইহা ভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রকার বহু প্রকারের স্ত্রীধনের উল্লেখ করিয়াছেন। পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, বন্ধুদত্ত ও স্বোপার্জ্জিত ধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে। এক সময়ে ইংলণ্ডে নারীরা নিজ-নামে ধনাধিকারিণী হইতে পারিতেন না। কেহ নিজের কন্যাকে কোন সম্পত্তি বা অর্থ দিতে ইচ্ছুক হইলে কোন পুরুষকে উহা দান করিতেন, তিনি ঐ নারীকে উক্ত সম্পত্তির আয় দিতে স্বীকৃত হইতেন। নারীরা নিজের নামে মোকদ্দমায় বাদী বা প্রতিবাদী হইতে পারিতেন না; কেন না নারী Femme covert বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বহু আন্দোলনের পর স্ত্রীলোকদিগের ঐ সকল নৈতিক বাধা (Legal disabilities) বিদূরিত হয়।

ইংরেজ এবং মুসলমান নারীর বর্ত্তমানে যে সকল অধিকার আছে, সেইরূপ অধিকার হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে দিবার চেষ্টা হইতেছে।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন—যাঁহারা বলেন যে, বিলাতের আদর্শে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃত হইলেই ভারতীয় লোকের উন্নতি হইবে এবং ভারত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবে! ইঁহারা ভারত-ললনাকে জাগাইবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন! কিন্তু এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজের যে কি ঘোরতর ক্ষতি হইবে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না। আমাদের ধারণা, এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে নিম্নলিখিত কুফল ঘটিবার সমধিক আশঙ্কা আছে।

১। হিন্দু বিশেষতঃ সনাতনী হিন্দুর সমস্ত অধিকার পদদলিত হইবে। অহিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, ব্রাহ্ম, শিখ প্রভৃতির সাহায্যে সরকার হিন্দু-দলনে আরও উদ্যোগী হইবেন। সনাতনী হিন্দুর কি কর্ত্তব্য, তাহা অহিন্দু মাত্রেই নির্দ্দেশ করিতে থাকিবে। জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজ আরও দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে। মুসলমান সমাজের বহু-বিবাহ-নিষেধে সরকার সাহসী হন না, কিন্তু হিন্দুর সর্ব্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ বিপর্য্যস্ত করিতে চাহেন! বলা বাহুল্য, সম্প্রতি সরকার সমগ্র ভারতের হিন্দু নারীর প্রতিনিধিরূপে এক জন ব্রাহ্ম-মহিলাকে রাষ্ট্রীয় সমিতিতে মনোনীত সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যদি জনমত ও ডিমোক্রেসী মানিতে হয়, তবে ইহার সঙ্গে অন্ততঃ লোকসংখ্যার অনুপাতে অন্যূন ২০০০০ হিন্দু মহিলার মত গ্রহণ করুন বা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে সভ্য করুন!

২। হিন্দু সমাজ ও হিন্দু পরিবারগুলির মধ্যে নূতন কলহের সৃষ্টি হইবে। ভ্রাতা ও ভগিনীতে প্রত্যেক পরিবারে মনোমালিন্য হইবে এবং বাহিরের লোক—জামাতা প্রভৃতি আসিয়া প্রত্যেক পরিবারে কলহের সৃষ্টি করিবে। একবার মামলা আরম্ভ হইলে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে ও অনেক টাকা উকিল, ব্যারিষ্টার, এটর্নী ও আদালতের পেয়াদারা খাইবে। ষ্ট্যাম্প প্রভৃতিতে সরকার অবশ্য অনেক টাকা লাভ করিতে পারিবেন।

৩। যৌথ পরিবার একেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই আইন পাশ হইলে উহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। দেশে দারিদ্র্য বাড়িবে। গৃহস্থ-পরিবারের একেই তো অভাব-অনটনের সীমা নাই, তখন সেই অবস্থা আরও ভীষণতর হইয়া উঠিবে।

৪। এই আইনের কার্য্য নিবারণের জন্য এখন প্রত্যেক লোক-কেই মধ্য-বয়সে উইল করিতে হইবে এবং উহাতেও সরকার এবং উকিল-শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা হইবে।

৫। সর্ব্বশেষ হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পিতৃ-সম্পত্তিতে নিগূঢ় স্বত্ব স্থাপিত হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতা-স্রোত আরও প্রবলতর হইবে। পিতৃ-সম্পত্তিশালিনী কন্যার বর বা অনুরাগী পুরুষের অভাব হইবে না। এই আইন প্রবর্ত্তনের ফলে অনেক যুবতী হয়তো Civil marriage এ আবদ্ধ হইতে পারেন।

৬। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, হিন্দু মাত্রেই এই আইনের বিষময় ফল উপলব্ধি করুন এবং একযোগে দেশব্যাপী প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হউন। আগামী জুন মাসে Select committee র অধিবেশন হইবে। ইহার পূর্ব্বেই হিন্দু সমাজের সকল সম্প্রদায় হইতে প্রতিবাদ দিল্লীতে পৌছান উচিত। এই ঘোর দুর্দ্দিনে লোক যখন প্রাণরক্ষার চিন্তায় আকুল ও লোকের অন্নচিন্তা ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে, তখন সরকারের এই আইন করিবার কোন যুক্তিযুক্ত অধিকার নাই। উপস্থিত (যত দিন যুদ্ধ না মিটে) এই আইনের আলোচনা স্থগিত থাকুক এবং ভবিষ্যতে যখন এই ব্যাপারের পুনরালোচনা হইবে, তখন কেবলমাত্র হিন্দুদিগের মত লইয়া আইন সংস্কারের চেষ্টা হউক। তখন হিন্দু দুহিতা, বিধবা, পুত্রবধূ প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ বা অভাব না হয়, এই ভাবে চিন্তা করিয়া প্রচলিত আইনের সংস্কার করা কর্ত্তব্য। অহিন্দুর দ্বারা হিন্দু সমাজ-সংস্কার ন্যায় ও নীতি-বিগর্হিত। সকলেই এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহার যথাশক্তি প্রতিবাদ করুন। আশা করি, হিন্দু মহাসভাও এই মর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইবেন এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে হিন্দু সমাজের স্বার্থানুযায়ী পন্থা অবলম্বন করিবেন।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ, বি-এল, অধ্যাপক)।

স্থান পূরণ

গান্ধীজীর উপবাস উপলক্ষে বড়লাটের সহিত মতানৈক্য বশতঃ সদস্য-পদে অধিষ্ঠিত মিষ্টার এম, এস, এনি, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং মিষ্টার হোমি মোদি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন সেই তিন জন সদস্যের স্থানে সার মহম্মদ আজিজুল হক, সার অশোককুমার রায় এবং ডক্টর এন্, বি, খারে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা বড়লাটের সভাশোভন হইবেন। সার আজিজুল হক প্রতিভাশালী বাঙ্গালী। সার অশোকও তাহাই; ব্যবহার-শাস্ত্রে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীযুত নারায়ণভাস্কর খারে কংগ্রেসের লোক। ইনি এখন ভারত সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য হইলেন। ইঁহারা যোগ্য ব্যক্তি। তবে ইঁহারা যে ভাবে শাসন পরিষদে নিযুক্ত হইলেন, সে ভাবে সদস্য নিয়োগের পক্ষপাতী আমরা নহি। যেখানে **A breath can make them as a breath has made,** যেখানে এক নিশ্বাসে উত্থান-পতন,—সেখানে কি কেহ নির্ভীক ভাবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া কাজ করিতে পারেন? যেখানে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে এত টাকা দিয়া সদস্য-নিয়োগের সার্থকতা কোথায়?

বে-আইনী আইন

৮ই বৈশাখ ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় ফেডারাল কোর্টের বিচারপতি সার মরিস গাইয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারত-রক্ষা আইনের ২৬ ধারা যে আকারে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, সে আকারে তাহা প্রবর্ত্তন করা অবৈধ। এখন প্রায় ৮ হাজার লোক মায় মহাত্মা গান্ধীজী এই বে-আইনী আইনের জালে আবদ্ধ হইয়া বহু দিন আটক রহিয়াছেন। এ স্থলে আইনের তর্ক নিষ্প্রয়োজন। ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির রায় পড়িয়া নয়া দিল্লীতে এবং বিলাতের হোয়াইট হলে বিশেষ চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হইয়াছে। ভারতীয় ঐ আট হাজার ব্যক্তিকে সরকার আইনী ভাবে অথবা বে-আইনী ভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, এখন সে বিচার তাঁহারা করিতে চাহেন না; কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিয়াছেন, সে-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষ ঐ বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিতে সম্মত নহেন,—তবে ঠাট্-বজায় রাখিয়া কি উপায়ে অর্ডিনান্সে জোড়াতালি দিয়া তাহাকে সচল রাখিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছেন। শাসন বিভাগের রাজপুরুষদিগের ইচ্ছায় সঙ্কটকালে বিশেষ কঠোর আইন সময়ে সময়ে প্রণয়ন করিতে হয় সত্য, কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক দেশে শাসন বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে নাগরিক-দিগের মূল স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় না। ম্যাগনা কার্টা প্রণীত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বিলাতে নাগরিকদিগের অধিকার এইরূপ স্বৈরিতার সহিত কখনও ক্ষুণ্ণ করিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কিন্তু ভারতে উহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোথায় আইন দ্বারা শাসন হইতেছে, কোথায় স্বৈরিতার দ্বারা শাসন হইতেছে, তাহা বুঝিতে লোকের আর বাকি থাকে না। আবার কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিশেষ আদালতে বসিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন যে, অর্ডিনান্সের অন্তর্ভুক্ত ৫, ১০, ১৪ এবং ১৬ ধারা স্বকীয় ক্ষমতা লঙ্ঘন করিয়া প্রণয়ন করা হইয়াছে। আইন এখন যেমন-তেমন ভাবে প্রণীত হইতেছে! বিশেষ আদালত যে ভাবে বিচারকার্য্য সমাধা করিতেছেন, তাহাতে নিয়মতান্ত্রিকতা দেশ ছাড়িয়া পলাইতে বসিয়াছে, স্বেচ্ছাচারেরই জয়-জয়কার!

সাক্ষাতে আপত্তি

মার্কিণী প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি মিষ্টার ফিলিপস্ এদেশ দেখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন যে, গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং কথা কহিবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল,—তিনি ঐ বিষয়ে উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সে অনুমতি দেন নাই। এই ব্যাপার লইয়া মার্কিণের এবং বিলাতের সংবাদপত্র মহলে বিলক্ষণ আলোচনা হইতেছে। ওয়াশিংটন পোষ্ট প্রভৃতি বলিতেছেন যে, মিষ্টার ফিলিপস্কে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ এবং আলাপ করিতে না দিয়া ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ভুল করিয়াছেন। গান্ধীজীর সহিত যদি মিষ্টার ফিলিপস্ দেখা করিবার সুযোগ পাইতেন,—তাহা হইলে আকাশ ভাঙ্গিয়া শাসকবর্গের মাথায় পড়িত না,—সামরিক আয়োজনেও বিপর্য্যয় ঘটিত না। তবে তাঁহাকে মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল না কেন? ওয়াশিংটন পোষ্টের লেখক বলিয়াছেন যে, পাছে ভারতবাসীরা মনে করে যে, মার্কিণ ভারতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন এই শঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ ফিলিপস্কে গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে দেন নাই। এটা নিতান্তই অজ্ঞতার কথা। ভারতবাসীরা তত অজ্ঞ নহে। যাহাদের মনে পাপ আছে, তাহারা ঝোপে-ঝাপে ভূত দেখে এবং সামান্য ব্যাপারেই আতঙ্কিত হয়!

স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞাপত্র

২৫শে চৈত্র ওয়ার্দ্ধায় দায়রা জজ মিষ্টার মধোলকারের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞাপত্র নিকটে থাকিলে তাহাতে অপরাধ হয় না। দুই জন ছাত্র এবং দুইটি নারী স্থানীয় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহাদের নিকট স্বাধীনতার অঙ্গীকার-পত্র ছিল বলিয়া অভিযুক্ত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দিয়াছিলেন। দায়রা জজের নিকট ঐ মামলার আপীল হয়। বিচারপতি বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া বলেন যে, ঐ স্বাধীনতার অঙ্গীকারপত্রে বৃটিশ সরকারকে বিপর্য্যস্ত করিবার মত কোন কথাই নাই। প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী এই প্রতিশ্রুতি পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু সে জন্য কাহাকেও অভিযুক্ত করা হয় নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সরকার উহা নিষিদ্ধ করেন নাই। অতএব উহা কাছে থাকা দোষের নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যরূপ কেন বুঝিলেন, তাহা বুঝা গেল না। সূর্য্যতাপ অপেক্ষা প্রতপ্ত বালুকা যে অধিক অসহনীয় হয়,—ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ!

লীগ সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান নহে

১৪ই বৈশাখ দিল্লী সহরে যে মোমিন সম্প্রদায়ের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত সম্মেলন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মিষ্টার জিন্না নিখিল ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, এ কথা কোন মতেই

বলিতে পারেন না। নিখিল ভারতে যে দশ কোটি মুসলমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাড়ে চারি কোটি মুসলমান মোমিন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা মোমিন সম্মেলনকেই কেবল তাঁহাদের মুখপাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়াই জানেন এবং মানেন। অন্য কাহারও নেতৃত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না। মিষ্টার জিন্না এবং তাঁহাকে যাঁহারা উচ্চ মঞ্চে চড়াইয়াছেন—তাঁহারা এ সব কথা কাণেই তুলেন না! কারণ, যাহার জবাব দেওয়া অসম্ভব, তাহা কাণে না তোলাই মস্ত রাজনীতিক চাতুরী। মোমিন সম্প্রদায় মিষ্টার জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনার ঘোর নিন্দা করিয়াছেন। উক্ত সম্মেলনে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। ভারতকে বিভক্ত করিলে সকল সম্প্রদায়েরই ঘোর অসুবিধা ঘটিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আজাদ সম্মেলনও পাকিস্থানের পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সিয়া সম্প্রদায়ও ইহার পক্ষপাতী নহেন। ভারতের দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় ৯ কোটি প্রকাশ্যে এবং অন্তরে পাকিস্থানের বিরোধী। তথাপি মিষ্টার জিন্না নাছোড়বান্দা! ইহাতে তিনি কাহার বা কাহাদের ইঙ্গিতে চালিত হইতেছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না!

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালায় সত্য সত্যই এবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রকাশ, বাঙ্গালায় বহু স্থানে লোক অনাহারে মরিতেছে। চাউলের মূল্য মফঃস্বলে দিন দিন অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে—কাজেই বহু লোক অন্নাভাবে কদন্নভোজন করিয়া উদরাময় প্রভৃতি রোগে মরিতেছে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয় প্রধান-সচিব মৌলভী ফজলুল হক ২১শে বৈশাখ দেশপ্রিয় পার্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন—"চাষীরা ক্ষুধার তাড়নায় বীজ-ধান খাইয়া ফেলিয়াছে, ঘাস খাইয়া মরিতেছে। 'অন্ন চাই অন্ন চাই' রবে চারি দিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। যে সকল জিলায় অধিক পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, সেই সকল জিলার দুর্গতি বর্ণনাতীত। কোথাও কোথাও লোক মরা গরু, ভেড়া প্রভৃতি খাইয়া কোন প্রকারে জঠরের তীব্র জ্বালার উপশান্তি করিতেছে। ইহা অপেক্ষা ভীষণ অবস্থা আর কি হইতে পারে?" সার জন হার্ব্বার্ট নিজ প্রভুত্ব-বলে এই সময়ে লীগদলকে সচিবত্বের গদী দিলেন, কিন্তু এখন যদি সচিবসঙ্ঘ এই দারুণ সমস্যার সমাধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ত' আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না! অন্ন-সমস্যার সমাধানে অসমর্থ বলিয়া যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব সচিবসঙ্ঘের বিরুদ্ধে বার বার আস্থাহীনতার প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যে এখন আপনাদের কথায় আপনারাই দোষী হইতেছেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী সে দিন ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যালের উক্তির প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, "কৃষকগণ, বিশেষতঃ সম্পন্ন কৃষকগণ—বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের শস্য বাজারে বিক্রয় করিতেছে না। উহার কতকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, তাহারা দেখিতেছে যে, খাদ্যশস্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।" এ কথা কিছু সত্য হইতেও পারে। কিন্তু এইরূপ চাষী কয় জন? এবং তাঁহারা কত চাউলই বা গোপন করিয়া রাখিয়াছে? আমাদের মনে হয়, চাষীদিগের হাতে এখন আর এত অধিক ধান নাই, যাহা বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিলে চাউলের মূল্য বিশেষ ভাবে কমিয়া যাইবে। মিষ্টার সুরাবর্দ্দী আরও বলিয়াছেন যে, তিনি যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ধানের মূল্য হ্রাস পাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। এরূপ অবস্থায় এ সময়ে ঐ সকল কৃষকের ধান বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করা উচিত। আমরাও সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু যদি তিনি প্রভূত পরিমাণে ধান বা চাউল বাঙ্গালায় উপস্থিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই স্বর্ণ-প্রসূ বাঙ্গালায় অচিরে উৎকট দুর্ভিক্ষের নরকঙ্কাল-চিহ্নিত বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে। সত্য বটে, বাঙ্গালার অনেক স্থানে সরকার নৌকা-চালনায় বাধা অপসারিত করিয়াছেন, কিন্তু এখন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নৌকাযোগে আর ধান্য প্রেরণ নিরাপদ নহে। বহু স্থানে নৌকা হইতে ধান্য ও চাউল লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ১৬ই বৈশাখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে বাঙ্গালায় নানা স্থান হইতে চারি শতেরও অধিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। খাদ্য-শস্যের অভাবের জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, এত ডাকাতি ত' পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। ইহা ভিন্ন চাউল চুরি, তরকারী চুরি, এমন কি ভাত চুরি পর্য্যন্ত হইতেছে। সরকার শেষে নৌকা সে-ই ছাড়িয়াই দিলেন,—কিন্তু সময় থাকিতে দেন নাই! সম্মুখে এখন ঘোর দুঃসময়। সচিবমণ্ডলের এখন সর্ব্বাগ্রে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত; নতুবা এবারকারের এই দুর্ভিক্ষের ভীষণত্ব ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে ছাপাইয়া যাইবে।

শুধুই কি গর্জ্জন?

বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের সাধারণ সরবরাহ বিভাগের সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ডাক দিয়া বলিতেছেন যে, বাঙ্গালায় যেরূপ উচ্চমূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে, তাহা হওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। প্রধান-সচিব সার নাজিমউদ্দীন সচিবের তথ্য পাইয়াই বলিতেছেন, বাঙ্গালায় চাউল ত্রিশ হইতে চল্লিশ টাকা মণ বিকাইতেছে, ইহা সত্য; কলিকাতার উপকণ্ঠে ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে মোটা চাউল ত্রিশ টাকা মণ দরেও পাওয়া যাইতেছে না! বাজারে চাউল অল্পই আছে। ইতোমধ্যেই লোকে না খাইতে পাইয়া মরিতেছে শুনা যাইতেছে। অতএব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী—যথার্থই যদি উপকার করিতে চান—তবে ভাঁওতা ছাড়িয়া সত্বর প্রতিকারের সুব্যবস্থা করুন। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। উহার ফল অত্যন্ত ভীষণ হইবে।

দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ—বাঙ্গালায় চাউলের দর—মণ ৩২ টাকা ৭ আনা; আর পূর্ণিয়ায় (বিহার) ১৩ টাকা, বেরিলীতে ১০ টাকা ৪ আনা ৯ পাই, রায়পুরে ৮ টাকা ৬ আনা; বেজাওয়াদায়—৭ টাকা ১১ আনা ১ পাই, কটকে ৬ টাকা ৮ আনা, সিন্ধুতে ৬ টাকা ৪ আনা। এই বৈষম্যের কৈফিয়ৎ সত্বর প্রয়োজন।

বার্ণার্ড শ'য়ের পরামর্শ

মিষ্টার জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' বিলাতের এক জন বিখ্যাত চিন্তাশীল মনীষী, সুলেখক। তাঁহার বয়স এখন ৮৭ বৎসর। সুতরাং প্রবীণত্বের হিসাবেও ইনি সুধী সমাজের অগ্রগণ্য। 'হিন্দু'র দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন যে, ইঁহাকে ভারতীয় সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলেন, অবিলম্বে সম্রাটের গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া এবং যে সচিবমণ্ডল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছেন,—তাঁহাদের বুদ্ধিহীনতার জন্য ত্রুটি স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন না! প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক এবং ঐতিহাসিক মিষ্টার ওয়াল্টার কেন্‌স্ হলও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বড়লাটকে ফিরাইয়া লইয়া আইস এবং সম্মিলিত জাতিগুলির মধ্যস্থতায় ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার দাবী পূর্ণ করিতে হইবে। 'কারেণ্ট রিভিউ' নামক বিখ্যাত মার্কিনী পত্রে তিনি এই সম্বন্ধে সন্দর্ভ

লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি আইসে যায়? যতক্ষণ ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী উইনষ্টন চার্চ্চিল এবং আমেরী ভারতের ভাগ্যস্থানে বক্র-গত শনি-রূপে বিরাজ করিতেছেন, ততক্ষণ কিছুই হইবে না! অতীতে এমন ভুলের ফল অত্যন্ত সুদূরগামী হইয়াছে। স্বার্থান্ধ যুক্তিতে তাঁহারা যদি তাহা না দেখেন, তাহা হইলে দেখাইয়া দিবে কে?

কাগজের বাজার

ভারত সরকার শতকরা ১০ ভাগ কাগজের পরিবর্ত্তে ৩০ ভাগ কাগজ এ দেশের লোকদিগকে দিবেন বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার ফলে ত কাগজের মূল্য কমিল না, কাগজও মিলিতেছে না! কাগজের মূল্য ক্রমেই বাড়িতেছে! ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিষ্টার এন, আর, পিলেই যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আসল কথা বুঝা যাইতেছে না। ভারত সরকার কি পরিমাণ কাগজ ভারত হইতে বিদেশে পাঠাইতেছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন না কেন? তাঁহারা বলিতেছেন, কাগজের চালান অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝিব? সরকারই বা কত কাগজ গ্রাস করিতেছেন, তাহাও বলিতেছেন না! এ সকল বিষয়ের সংবাদ-দানে সরকারের এত সঙ্কোচ কেন? শত্রুপক্ষ ঐ সংবাদ পাইলে কি কাগজ লইয়া লড়াই করিবে? সবই অদ্ভুত! এ দিকে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া যে বন্ধ হইয়া গেল!

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের স্বার্থ-বিরোধী আইন

দক্ষিণ আফ্রিকায় য়ুনিয়ন সরকার তথায় তিন বৎসরের জন্য ভারতবাসীদিগের স্বার্থের ঘোর-বিরোধী এক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ আইন অনুসারে ভারতবাসীদিগের ন্যায্য অধিকার বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইল। উহাতে ঐ দেশ-প্রবাসী ভারতবাসীর বসতি-স্থান, জমি-গ্রহণ এবং ব্যবসায় করিবার অধিকার যথেষ্ট সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। আইনটি আপাততঃ তিন বৎসরের জন্য প্রণীত হইবে সত্য,—কিন্তু উহা আইন-পুস্তক হইতে যে কস্মিনকালে অপসারিত হইবে, এরূপ আশা আমাদের মনে জাগে না। ব্যবসায়ে তুল্যভাবে প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবাসীকে দিতে চাহেন না। এই আইন সম্বন্ধে জোহান্সবার্গের ডীন (পাদ্রী) রেভারেণ্ড পামার বলিয়াছেন, "ইহা হিটলারী মতবাদের ন্যায় ময়লাযুক্ত।" এক জন য়ুরোপীয় এক সময় বলিয়াছিলেন যে, রুশিয়ানদিগকে আঁচড়াইলেই তাহার ভিতর হইতে তাতারের মূর্ত্তি বাহির হইবে। আমরাও তেমনই এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে করি, ব্যক্তিগত সামান্য স্বার্থে আঘাত করিলেই অধিকাংশ য়ুরোপীয় হিটলারী মূর্ত্তি ধারণ করে! সেনাপতি স্মাট্স সে দিন গণ-শাসন এবং ন্যায্য ব্যবহারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই আইন রচিত হইল,—ইহা দেখিয়া কি মনে হয়? মনে হয়, য়ুরোপীয়েরা ন্যায্যই হউক আর অন্যায্যই হউক, সকল প্রকার স্বার্থ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের জনপ্রিয় সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেনের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রগণ মিলিয়া কলেজ-ভবনে বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ভূপতিমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম স্থায়ী ভারতীয় অধ্যক্ষ। দ্বাদশ বৎসর তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষতায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি এখানকার এম-এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে ইংলণ্ডে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "সিনিয়র র‍্যাঙ্‌লার"রূপে খ্যাতি এবং কেমব্রিজের দুর্লভ সম্মান "স্মিথস্ প্রাইজ" অর্জ্জন করেন। তাঁহার মত প্রতিভাবান্ শিক্ষাব্রতী কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও সৎশিক্ষা-বিস্তারে আত্ম-নিয়োগ করিবেন, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

রামানন্দ-জয়ন্তী

আগামী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ 'প্রবাসী', ও 'মডার্ণ রিভিউ'র স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মদিন। ঐদিন তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে বাঙ্গালার সাংবাদিকগণ তাঁহার জয়ন্তী করিবার মনস্থ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ নির্ভীক ভাবে দীর্ঘকাল নিষ্ঠাসহকারে রাজনীতিক সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালার গৌরবের বিষয়। আমরা তাঁহার দেশহিতৈষণা ও জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

অবসর গ্রহণ

যে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে থাকিয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন, শ্রীযুত কালীনাথ রায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি প্রায় ২৫ বৎসরের অধিক কাল লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদকতা করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার লেখা যে সারগর্ভ, তাহা ইংরেজ ও ভারতবাসী নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। বিলাতে লর্ড লোথিয়ান যখন ভারতীয়দিগের পক্ষ সমর্থন করেন, তখন তিনি কালীনাথ বাবুর কতকগুলি লেখা চাহিয়া লইয়াছিলেন। এখন পরিণত বয়সে কালীনাথ বাবু কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। জীবনের সায়াহ্নে, শান্তিলাভের অবসরেও যেন তাঁহার নিপীড়িত স্বদেশবাসীর কল্যাণ সাধনে তিনি বিরত না থাকেন, ইহাই আমাদের কামনা।

জিন্নার আহ্বান

মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না কি প্রকৃতির লোক, তাহা ভারতের জাতীয়তাবাদী জনগণের অবিদিত নাই। তিনি এক সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা দাদাভাই নৌরোজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং সার ফিরোজ সাহের পদতলে বসিয়া রাজনীতিক পাঠশালে হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন! তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা তাঁহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে—তাহা তাঁহার ভারতীয় জনগণকে, হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ধর্ম্মাবলম্বীকে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ফতোয়া দেওয়াতেই সুপ্রকাশ! ভারতবাসীদিগকে এরূপ বিভেদ করিয়া বিরোধ জাগাইয়া রাখা কাহাদের প্রদত্ত শিক্ষার ফল, তাহা বিদিত ভুবনে! দাদাভাই নৌরোজী বা গোপালকৃষ্ণ গোখলে কেহই এই দুই ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীকে কস্মিনকালে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা একটা ফুটা পয়সার দামে নিজ বিচার-বুদ্ধি স্বার্থবাদীদিগের পদতলে কখনও বিকাইয়া দেন নাই! এহেন সর্ব্বজন-বিদিত মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না ৮ই বৈশাখ দিল্লী

সহরে মুস্লিম লীগের অধিবেশনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি খুব গরম গরম বুলি ঝাড়িয়া এবং থিয়েটারী বীরের ভঙ্গীতে বাক্য বলিয়া লোককে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই বিচিত্র! তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে সারগর্ভ কোন কথাই ছিল না,—ছিল কেবল কংগ্রেস এবং গান্ধী-বিদ্বেষ। এই কথাগুলি বলিবার জন্ম তিনি তাঁহার মুরুব্বীদিগের সম্মতি নিশ্চয়ই লইয়াছিলেন! তিনি চাহেন পাকিস্থান! তিনি চাহেন জাতীয়তাবুদ্ধি বর্জ্জন! মহাত্মা গান্ধীর উক্তি হইতে বিক্ষিপ্ত ভাবে কতকগুলি কথা তুলিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, গান্ধী ভারতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। যাহার বুদ্ধি নাই, তাহার সহিত তর্ক করিতে যাওয়াই ঘোর বিড়ম্বনা! তিনি মৌলভী ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। সে-সব কথা এমন হাস্যোদ্দীপক যে তাহার উল্লেখ বা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানের কল্পনায় সকলে সম্মত হইলে আর কি? একেবারে হাতে হাতে স্বরাজ! "অতএব সকলে সম্মিলিত হও এবং ইংরেজদিগকে তাড়াও।" আমরা ইংরেজদিগকে তাড়াইতে চাহি না;—ইংরেজের সহিত শত্রুতাও কামনা করি না। আমরা চাহি জাতীয় ভাবে ভারতের শাসন-যন্ত্র পরিকল্পিত এবং পরিচালিত করিতে। মিঃ জিন্না ত' বলিতেছেন যে, পাকিস্থান কার্য্যে পরিণত না হইলে মিলন হইবে না! কিন্তু সাড়ে চারি কোটি মোমিন কয় দিন মাত্র পূর্ব্বে ঐ দিল্লী সহরে যে সম্মেলন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাও ত' পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আজাদ মুসলমান সম্মেলনও পাকিস্থানের সমর্থক নহেন বরং বিরোধী। তবে জিন্নার দলে থাকিল কে? লীগ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন যে, "যদি পাকিস্থান বর্জ্জন করিয়া কোনরূপ রাষ্ট্র সংগঠন করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, ভারতের মুসলমানগণ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাতে বাধা দিবে! ফলে দ্বন্দ্ব, রক্তপাত ও দুর্গতি ঘটিবে এবং তাহার দায়িত্ব কেবল বৃটিশ সরকারেরই হইবে।" কি বীর-দাপটই দেখাইতেছেন! এ বুলি কে শিখাইয়াছে, তাহা কি ভারতবাসী বুঝে না? সমস্ত ভারতীয় মুসলমান হইতে মোমিন, আজাদ, অহ্‌রর সম্প্রদায় বাদ গেল। বাকী থাকিল ক'টি লোক? মিষ্টার জিন্নাকে 'আক্কেল' দিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা! বিধাতা না দিলে মানুষকে আর কেহ 'আক্কেল' দিতে পারে না!

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের খসড়া

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে হিন্দুদিগের দায়াধিকার সম্বন্ধে রাও কমিটী কর্ত্তৃক রচিত বিলখানি উভয় পরিষদের সম্মিলিত কমিটীর নিকট বিবেচনার্থে প্রেরণ করিবার জন্ম ভারত সরকারের ব্যবস্থা-সচিব মিষ্টার সুলতান আমেদ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যে সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তির পূর্ব্বাধিকারী উইল করিয়া কোন ব্যবস্থা না করিয়া মারা যাইবেন, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই কৃষিজাত সম্পত্তি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে এই পাণ্ডুলিপি-কল্পিত ব্যবস্থা খাটিবে, ইহাই হইতেছে সাব কমিটীর মূল কথা। এই পাণ্ডুলিপির তিনটি প্রধান কথা এই যে, (১) কৃষি সম্পর্কিত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এই আইন খাটিবে, (২) সাধারণতঃ হিন্দু নারীদিগের সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে যে কতকটা অক্ষমতা আছে, তাহা দূর করা এই আইনের উদ্দেশ্য; এবং (৩) এই আইন দ্বারা হিন্দু নারীদিগের সীমাবদ্ধ সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থা তিরোহিত করা হইবে। আমরা এই আইনের সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। স্যার সুলতান আমেদ অবশ্য হিন্দু আইন-কর্তাদিগের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এ কথা সত্য যে, হিন্দু আইন-কর্ত্তারা যে নারীদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার গূঢ় অর্থ আছে। হিন্দু আইন-কর্তাদের মতে বিবাহিতা নারী তাঁহার শ্বশুরের পরিবারভুক্তা। শ্বশুর-কুলের সমস্ত নিয়ম-কানুন বার ব্রত তাঁহাকে পালন করিতে হয়। সুতরাং তিনি শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ঘোষিত হইবার যোগ্যা। আজ এই ধর্ম্মহীনতার যুগে অনেকে হয় ত' বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বাড়ী হইতে রাস্তায় তাড়াইয়া দিতেছেন—ইহার অবশ্য সত্বর প্রতিকার হওয়া উচিত। হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের আমলে এরূপ ধর্ম্মহীন ব্যবহার কল্পনাতীত ছিল; কাজেই তাঁহারা এ বিষয়ে আইন-কানুন কিছু করিয়া যান নাই। এখন তাহার প্রতিকার কর্ত্তব্য হইয়াছে। সেই জন্য বিধবা পুত্রবধূর এবং ভ্রাতৃবধূর জন্ম কিছু ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহা না করিয়া এইরূপ পারিবারিক বিদ্বেষ-বর্দ্ধক আইন রচিবার ফল কি? উইল করিয়া বিধবা পুত্র-কন্যাহীনা নারীকে বঞ্চিত করা যাইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সন্তানবিহীনা নারীকে অপরিমিত সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া কোন লাভ নাই, উহা অনর্থের কারণ হইতে পারে!

পরলোকে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২৪শে বৈশাখ, রাঁচীতে লেফটেনান্ট-কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, ডি, উপাধি লইয়া এ দেশে সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করেন ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া কিছু দিন কলিকাতায় ডাক্তারী করিবার পর পুরুলিয়ায় যাইয়া বাস করেন। তিনি হিন্দু-সংস্কৃতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের উপায় চিন্তায় সমাহিত হইয়া, সুধীজন সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া বরণীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতি'—'এ ডাইং রেস' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার সমাজকল্যাণ চিন্তা ও অধ্যয়নের সুফল।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

সংবাদপত্র—২৭শে চৈত্র—কাশীর 'আজ' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত বিদ্যাভাস্কর গ্রেপ্তার। ২৯শে—নাগপুরের মারাঠী সাপ্তাহিক পত্র 'ভবিতব্যের' প্রতি সরকারের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধাজ্ঞা। ৩০শে, সুরাটের 'দেশমিত্র' প্রেসের মালিক শ্রীযুত মগনলাল ভানমলিদাসকে মুক্তি দানের পর ভারতরক্ষা বিধি বলে পুনরায় গ্রেপ্তার। মৌলভী বাজারের (আসাম) 'অভিযান' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত গোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ৮ই বৈশাখ, দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইম্সের' প্রতি সংবাদাদি সরকার দ্বারা পূর্ব্বে পরীক্ষা করাইয়া লইবার আদেশ প্রত্যাহার। ২২শে বৈশাখ—কটকের 'মুক্তি যুদ্ধ' সম্পাদকের উপর জামানত বাজেয়াপ্তের নোটিশ।

কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী—২৬শে চৈত্র—তমলুকে মেদিনীপুরের ১১ জন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী গ্রেপ্তার। ৩০শে—কাণপুরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের সহকারী সম্পাদক কমরেড এস, জি, সার্দ্দেশাহ, কাণপুর মজদুর-সভার সভাপতি কমরেড এস, এস, ইউসফ ও সম্পাদক কমরেড এস, সি কাপুর ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে

গ্রেপ্তার, ময়মনসিংহের সমাজতন্ত্রী কর্ম্মী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদারের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ৭ই বৈশাখ—শ্রীহট্টের কম্যুনিষ্ট দলের দেবব্রত ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার ও নীরেন্দ্র দেব দণ্ডিত। মুর্শিদাবাদ জিলার কম্যুনিষ্ট দলের সম্পাদক সনৎকুমার রাহা ও অপর কয়েক-জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ১৯শে—সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দুই জন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী গ্রেপ্তার।

কলিকাতা—২১শে চৈত্র গোয়েন্দা পুলিস কর্তৃক ৫ স্থানে তল্লাসী—কয়েক জন আটক। ৩০শে—কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের নিকট ৫।৬ খানি ট্রামের ট্রলির দড়ি ছিন্ন, হ্যারিসন রোড ও শ্যামবাজার লাইনের ট্রাম চলাচল বন্ধ। ছয় স্থানে তল্লাসী। ২রা বৈশাখ চারি স্থানে তল্লাসী। ৮ই, দুই স্থানে তল্লাসী, পলাতক বলিয়া বর্ণিত দুই জনকে গ্রেপ্তার। ফেডারাল কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতরক্ষা বিধির ২৬ ধারা অনুসারে ধৃত ১৮ জনকে ১লা বৈশাখ এবং ২ জনকে ১৩ই বৈশাখ মুক্তিদান। শ্রীরামপুর মিউনিসি-প্যালিটির ভূতপূর্ব্ব কমিশনার শ্রীযুত শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর দুই জন গ্রেপ্তার। ১৪ই বৈশাখ গোয়েন্দা পুলিস কর্তৃক কয়েকটি বোমা, একখানি ছোরা প্রাপ্তি, এ সম্পর্কে ১২ জন গ্রেপ্তার। পরদিবস উত্তর কলিকাতার কোন গৃহে তল্লাসী করিয়া ৮টি বোমা, ১খানি ছোরা কতকগুলি আপত্তিকর দ্রব্য প্রাপ্তি, ৯ জন যুবক গ্রেপ্তার। ১৯শে—স্কট লেনের এক ডাষ্টবীনে ৫।৭টি বোমা প্রাপ্তি, একটি বোমা বিস্ফোরণ। রাত্রি ১০টায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট শ্রীনাথ দাস লেনে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুত ইন্দ্রভূষণ বিদের বাটী-সম্মুখে বোমা বিস্ফোরণ।

ঢাকা—২৬শে চৈত্র—থাসারা গ্রামে এক গোয়েন্দা কনষ্টেবল কর্তৃক রাজনৈতিক কারণে আত্মগোপনকারী শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার। জনতা কর্তৃক কনষ্টেবল প্রহৃত ও বন্দী উদ্ধার। সশস্ত্র পুলিশ কর্তৃক গ্রামের কয়েক গৃহে তল্লাসী, ৫০ জন যুবক গ্রেপ্তার। ২৭শে, বোলঘর গ্রামের (মুন্সীগঞ্জ) অধিবাসীদের উপর ৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য।

যশোহর—২২শে বৈশাখ—জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভবন সরকার কর্তৃক দখল।

বর্দ্ধমান—২৬শে চৈত্র—সশস্ত্র পুলিশ দল কর্তৃক রায়না থানার বেরোগ্রাম হইতে শ্রীদুর্গাপদ হাজরা ও শ্রীবিমল হাজরাকে গ্রেপ্তার, ধামাশ গ্রামে হানা দিয়া শ্রীদাশরথি তা, কার্ত্তিক সামন্ত, গঙ্গারাম হাজরা ও গৌরচন্দ্র হাজরার বাড়ী ঘেরাও।

২৪ পরগণা—১১ই বৈশাখ বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের বুভুক্ষু-গণকে ডায়মণ্ড হারবারের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধানের দাবী উত্থাপন করিতে উত্তেজিত করিবার অভিযোগে কংগ্রেস-কর্ম্মী ভূপাল কর্ম্মকার ও সরোজ মজুমদার ৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

নোয়াখালী—২রা বৈশাখ পরশুরাম থানার বাস্তুড়া গ্রামে জেলে আটক শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরীর গৃহে তল্লাসী।

ফরিদপুর—৩১শে চৈত্র ভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক বন্দী শ্রীযুত সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার আটক বিধি অমান্যের জন্য মাদারীপুরে গৌরাঙ্গচন্দ্র দাস ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

ময়মনসিংহ—১৫ই বৈশাখ, একখানি বাজেয়াপ্ত পুস্তিকা প্রাপ্তির সম্পর্কে টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটীর অবসর প্রাপ্ত ওভার-সিয়ার শ্রীযুত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস, সপরিবারে গ্রেপ্তার।

মুর্শিদাবাদ—২৬শে চৈত্র সাগরদীঘির কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীরেবতী-নাথ দে ভারতরক্ষা বিধি বলে গ্রেপ্তার। ৩০শে বহরমপুর মিউনিসি-প্যালিটীর কমিশনার শ্রীযুত সন্তোষ ভট্টাচার্য্যকে মুক্তি দান। সোনাতিকুড়ির নিকট ডাক লুঠ।

হুগলী—২৬শে চৈত্র ভাণ্ডারহাটি ডাকঘর এবং য়ুনিয়ন বোর্ড আক্রমণের অভিযোগে ১০ জন দণ্ডিত।

বরিশাল—২৪শে চৈত্র সহরের কয়েক স্থানে তল্লাসী। কতিপয় ছাত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত।

বোম্বাই—২০শে চৈত্র এক সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিবার সময় নিখিল ভারত খৃষ্টান সম্মিলনের সংগঠন সম্পাদিকা মিসেস ভায়ওলেট আলভা গ্রেপ্তার। সুরাটে শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে ৩ জন মহিলা দণ্ডিত; পুলিসের চৌকীতে অগ্নিদানের অভিযোগে একজন গ্রেপ্তার, "বিদেশী আশ্রমের" সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। বেলগাঁওএ তাভাগের কলাইয়া স্বামীর মঠের গুরু চন্দ্রাইয়া স্বামী ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার, গোকক তালুকে ৫০ জনকে ঘেরাও করিয়া ২০ জনকে আটক, এক বরযাত্রী দলকে ঘেরাও করিয়া বরকে গ্রেপ্তার; আকতাদির হল্লে তল্লাসীর পর কয়েক জন গ্রেপ্তার। নাসিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে শ্রীযুক্তা ইন্দিরাবাই চন্দাত্রি দণ্ডিত, আপত্তিকর পুস্তিকা রাখিবার অভিযোগে ছাত্রী কর্ম্মী শ্রীমতী বীণা রাণাড়ে দণ্ডিত। ৩০শে—আমেদাবাদে জনতার উপর লাঠি চালন, ৬ জন গ্রেপ্তার। ৩১শে—আমেদাবাদে ভারতরক্ষা বিধি বলে ৪ জন গ্রেপ্তার। ৫ই বৈশাখ—একখানি ট্যাক্সিতে ১২ হাজার আপত্তিকর ইস্তাহার প্রাপ্তির অভিযোগে ট্যাক্সিখানি বাজেয়াপ্ত, এক জন আরোহীর অর্থদণ্ড। ২৩শে—১ মাস পর আমেদাবাদে সান্ধ্য আদেশ প্রত্যাহার।

বিহার—২৯শে চৈত্র বিহার সরকারের চীফ এঞ্জিনিয়রের ভবনে এক রহস্যজনক ব্যক্তির আবির্ভাব, তাড়া করিলে রিভলভার হইতে গুলীবর্ষণ করিতে করিতে পলায়ন। ইহার প্রায় এক ঘণ্টা পর পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কন্ট্রোলারের গৃহে একই প্রকার ঘটনার পুনরভিনয়। ৩রা বৈশাখ—দানাপুর জেল হইতে পলাতক ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মী শ্রীযুত অনন্ত মিশির গ্রেপ্তার। ১৬ই—বাঙ্গালার গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক কলিকাতায় বিহার ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী স্পীকার অধ্যাপক আবদুল বারি গ্রেপ্তার। পুলিস কিছু দিন যাবৎ তাঁহার সন্ধান করিতেছিল। ছাপরা জেলের নবনিযুক্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খান সাহেব আনোয়ার আলির গৃহে বোমা নিক্ষেপ, এক জন আহত।

যুক্তপ্রদেশ—৩১শে চৈত্র—কাণপুর ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীদলপৎ সিং, খদ্দর ভাণ্ডারের কর্ম্মী শ্রীগিরিধর সেন্ট্রাল ষ্টেশনে বিস্ফোরণ সম্পর্কে গ্রেপ্তার। ৪ঠা বৈশাখ—ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে নৈনী জেল হইতে স্বাস্থ্যের কারণে বিনাসর্ত্তে মুক্তিদান। ১৯শে বৈশাখ—ফেরার বলিয়া ঘোষিত বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ গিরুলাকে দিল্লী ষ্টেশনে গ্রেপ্তার। ভারতীয় ইতিহাস পরিষদের সম্পাদক পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার।

দিল্লী—২৭শে চৈত্র নূতন ও পুরাতন দিল্লীর কয়েক স্থানে তল্লাসী, ৫ জন গ্রেপ্তার, কাজী হৌজের নিকট ৭ জন গ্রেপ্তার। ৩০শে—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সম্পাদক মিঃ সাদেক আলি গ্রেপ্তার। ৩১শে—নয়াদিল্লীর বাবর রোডে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী দময়ন্তীকে গ্রেপ্তার।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ললিতে কলাবিধৌ

[শিল্পী—শ্রীব্রজেন্দ্র আচার্য্য

রস

১৬

কোন কোন প্রাচীন আলঙ্কারিক অদ্ভুত-রসকেই অপর সকল রসের উৎস-স্বরূপ বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ রসের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'রসলোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণ' অর্থাৎ অলৌকিক চমৎকারই রসের প্রাণস্বরূপ (১)। 'চমৎকার' বলিতে বুঝায়, চিত্তের বিস্তার—যাহার নামান্তর 'বিস্ময়' (২)। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজ বৃদ্ধ-প্রপিতামহ সহৃদয়-গোষ্ঠী-গরিষ্ঠ কবি-পণ্ডিত-মুখ্য শ্রীমন্নারায়ণপাদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধর্ম্মদত্তও স্বগ্রন্থে নারায়ণের মত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—চমৎকার (অর্থাৎ বিস্ময়) রসের সার—সকল রসেই ইহা অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব, চমৎকার (বা বিস্ময়) যাহার সার (অর্থাৎ স্থিরাংশ), সেই অদ্ভুত-রসই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই হেতু কৃতী আলঙ্কারিক নারায়ণ অদ্ভুতকেই একমাত্র রস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৩)। আর এই কারণেই দশ-রূপকের প্রকৃতি-স্থানীয় (type) শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রূপক যে নাটক, তাহার উপসংহারে অদ্ভুত-রসের স্ফূর্ত্তি প্রয়োজন—এই কথা আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন। এ অদ্ভুত-রস কেবল কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশেই জন্মিতে পারে না। লোকোত্তর চমৎকারের (অর্থাৎ অনন্যসাধারণ রমণীয়তার aesthetic thrill) উদ্রেক ব্যতীত যথার্থ সরসভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে না। নারায়ণের উপরি-লিখিত মত দর্শনে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি অলৌকিক-চমৎকার-সারস্বরূপ রসের অখণ্ডতা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন; পারিভাষিক-অদ্ভুতরসকেই একমাত্র রস বলেন নাই।

মহর্ষি বলিয়াছেন—অদ্ভুত-রস বিস্ময়-স্থায়িভাবাত্মক। দিব্যজন-দর্শন, ঈপ্সিত ও মনোরথের প্রাপ্তি, উপবন, দেবকুল প্রভৃতি স্থলে গমন, সভা, বিমান, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিভাব হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নয়ন-বিস্তার, অনিমেষ প্রেক্ষণ, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বেদ, হর্ষ, পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ-প্রদান, পুনঃ পুনঃ (পারিতোষিকাদি) দান, হাহাকার, বাহু-বদন-বস্ত্র-অঙ্গুলি-ভ্রমণ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা এই অদ্ভুত-রসের অভিনয় কর্ত্তব্য (৪)। স্তম্ভ-অশ্রু-স্বেদ-গদ্গাদ-রোমাঞ্চ-

---

(১) "লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ"—সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ। অর্থাৎ অলৌকিক বিস্ময়-ভাব যাহার সার বা স্থিরাংশ।

(২) "চমৎকারশ্চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপর্য্যায়ঃ"—সাঃ দঃ ৩য় পরিঃ; "তৎপ্রাণত্বং চমৎকারসারত্বং, সারঃ স্থিরাংশঃ "—রাম-তর্কবাগীশ-টীকা।

(৩) "তৎপ্রাণত্বঞ্চাস্মদ্‌বৃদ্ধপ্রপিতামহ-সহৃদয়গোষ্ঠী-গরিষ্ঠ-কবি-পণ্ডিত-মুখ্য-শ্রীমন্নারায়ণপাদৈরুক্তম্। তদাহ ধর্ম্মদত্তঃ স্বগ্রন্থে —

"রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ ॥
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্" ।

—সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ।

বস্তুতঃ, রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের যেখানে যেখানে অনুভব হইবে, সেই সেই স্থলেই শৃঙ্গার প্রভৃতি বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইবে; অন্যথা রত্যাদি বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থায়িভাবের অনুভূতি না হইলে কেবল সাধারণভাবে বিস্ময়ের অনুভবহেতু অদ্ভুত-রসেরই প্রকাশ হইবে। "চমৎকারসারত্বে চমৎকারস্থায়িভাবত্বে। তস্মাৎ সর্ব্বত্রাদ্ভুতরসসম্ভবাৎ। বস্তুতস্তু রত্যাদ্যংশস্যানুভূয়মানত্বে যথাযথং শৃঙ্গারাদিব্যপদেশস্তস্যানুভবেঽদ্ভুতব্যপদেশ ইতি মন্তব্যম্।

—রাম-তর্ক-টীকা।

চমৎকার—চিত্তবিস্তার, বিস্ময়, aesthetic thrill.

(৪) দিব্যজন—গন্ধর্ব্বাদি; "দিব্যাঃ গন্ধর্ব্বাদয়ঃ" (অভিনবভারতী, নাঃ শাঃ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩০, বরোদা সং)। "Heavenly

প্রাপ্তিরূপচয়নম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩০; অর্থাৎ যে বিষয় পাওয়া সম্ভব, তাহাকে 'ঈপ্সিত' বিষয় বলা হয়. তদতিরিক্ত বিষয় মনোরথ —যাহা কেবল মনেই থাকে, কোন দিন বাস্তব জগতে লব্ধ হয় না। Dr. Mukherjee এ বিভেদ করেন নাই—"the attainment of much longed for desires." দেবকুল—মন্দির, চলিত বাঙ্গালায় 'দেউল'। এই সকল দেবকুল প্রভৃতি স্থানে যেরূপ অপূর্ব্ব সরোবরাদির সন্নিবেশ থাকে, তাহা সচরাচর অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, এই কারণে এই সকল স্থানকে অদ্ভুত-রসের হেতুভূত বিভাব-স্থানীয় বলা হইয়াছে "তস্যাদ্ভুতবিভাবো যেন তত্রত্যং সরঃসন্নিবেশাদি ন ক্বচিদ্ দৃষ্টম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩১। সভা—গৃহবিশেষ (অঃ ভাঃ); "assemblies" (M). বিমান—দিব্যরথ (অঃ ভাঃ); "air" (M). মায়া—রূপ-পরিবর্ত্তনাদি (অঃ ভাঃ); "enchantment" (M), ইন্দ্রজাল—মন্ত্র-দ্রব্যাদিগুণে অসম্ভব বস্তু প্রদর্শন (অঃ ভাঃ); "sorcery" (M). হর্ষ—হর্ষের অনুভাব বুঝিতে হইবে (অঃ ভাঃ)। মূলে আছে—"হর্ষসাধুবাদদানপ্রবন্ধহাহাকার…"—হর্ষশব্দেন তদনুভাবাঃ। সাধ্বিতি বদনং সাধুবাদঃ। দানং ধনাদেঃ। "প্রবন্ধং সততং কৃত্বা হা-হা-শব্দস্য করণম্" (অঃ ভাঃ)। Dr. Mukherjee 'সাধুবাদ' ও 'দান' দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার না ধরিয়া 'সাধুবাদ-দান' একটি ব্যাপার বলিয়া ধরিয়াছেন—"by gladness, by repeated appreciative exclamations, by cries of "ha" "ha". মূলে আছে "চেলাঙ্গুলিভ্রমণাদিভিঃ"—"চেলস্যাঙ্গুলেশ্চ ভ্রমণম্" (অঃ ভাঃ)। চেল—বস্ত্র। ইহার পাঠান্তর আছে—"করচরণাঙ্গুলি- ভ্রমণাদিভিঃ"। Dr. Mukherjee এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন—"by agitating the fingers of the hands or the toes etc."

আতিশয্যবিশিষ্ট বাক্য, শিল্প বা কর্ম—মূলে আছে—"যত্ত্বতিশয়ার্থযুক্তং বাক্যং শিল্পং চ কর্ম্মরূপং বা"। অন্য অপেক্ষা যে বিষয়ের আতিশয্য দেখা যায়, তাহাই 'অতিশয়ার্থ'—অপরাপর বাক্য-শিল্প-কর্ম্ম হইতে যাহা উৎকৃষ্টতর। "অতিশেতে ইত্যতিশয়োঽন্যাপেক্ষয়া যোঽর্থ উৎকৃষ্টস্তেন বাচ্যভূতেন যুক্তং যদ্বাক্যং যচ্চ শিল্পং কর্ম্মরূপং কর্ম্মাত্মকং "প্রশংসায়াং রূপম্" (প, ?)—"অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩১। Dr. Mukherjee ইংরাজী করিয়াছেন—"what ever is exaggerated, words and arts or actions and forms." কর্ম্মরূপং—ইহাকে অভিনবগুপ্ত 'কর্ম্মাত্মক' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। Dr. Mukherjeeর অনুবাদে দাঁড়াইয়াছে দুইটি পৃথক্ পদ 'কর্ম্ম' ও 'রূপ'।

(৫) স্পর্শগ্রহ—ইহার লক্ষণ অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের দ্বাবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত নেত্র ও ভ্রূক্ষেপ সহকারে স্কন্ধ ও গণ্ডদেশ স্পর্শ—"স্পর্শগ্রহশব্দেন তদ্বিভাবতয়াভিনয়ো লক্ষ্যমাণো লক্ষ্যতে—"কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে নেত্রে কৃত্বা ভ্রূক্ষেপমেব চ। তথাংসগণ্ডয়োঃ স্পর্শাৎ স্পর্শমেবং বিনির্দ্দিশেৎ" ॥ (নাঃ শাঃ ২২।৮০) বরোদা সংস্করণে দ্বাবিংশ অধ্যায় এখন পর্য্যন্ত ছাপা হয় নাই। কাশী-সংস্করণের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে 'বৃত্তি'-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উক্ত শ্লোকটির সন্ধান পাওয়া যায় না।

উল্লুকসন—আহ্লাদবশে গাত্রের ঊর্দ্ধ কম্পন—"গাত্রস্যোর্দ্ধং সাহ্লাদং ধূননমুল্লুকসনম্" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩১)। Dr. Mukherjee পাঠান্তর ধরিয়াছেন—"স্পর্শপ্রহরণোল্লসনৈঃ"—by touching, slapping, rejoicing."

(৬) "অতিলোকৈঃ পদার্থৈঃ স্যাদ্বিস্ময়াত্মা রসোঽদ্ভুতঃ ॥ ৭৮॥ কর্ম্মাস্য সাধুবাদাশ্রুবেপথুস্বেদগদ্গদাঃ। হর্ষাবেগধৃতিপ্রায়া ভবন্তি ব্যভিচারিণঃ" ॥ ৭৯ ॥—দশরূপক। "লোকসীমাতিবৃত্তপদার্থবর্ণনাদিবিভাবিতঃ সাধুবাদাদ্যনুভাবপরিপুষ্টো বিস্ময়স্থায়িভাবো হর্ষাবেগাদিভাবিতো রসোঽদ্ভুতঃ"—দশরূপকাবলোক। দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণে ভবভূতির মহাবীরচরিত হইতে শ্রীরামচন্দ্র-কর্ত্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ-কালে লক্ষ্মণের বিস্ময়-ব্যঞ্জক একটি শ্লোক অদ্ভুত-রসের উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে—"দোর্দ্দণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দ্দণ্ড…"।

(৭) "বিস্ময়শ্চিত্তবৈচিত্র্যং স ত্রিধা ত্রিগুণাত্মকঃ।……বিবিধং স্যাৎ স্ময়ো হর্ষ ইতি বিস্ময়তেঽথ বা ॥ বিস্মাপ্যতে স্বয়ং কশ্চিদ্বিস্মাপয়তি বা ভবেৎ"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ৩৫, দ্বিতীয় অধিকার।

(৮) "বিচিত্রাকৃতিবেষাশ্চ বিচিত্রাচারবিভ্রমাঃ। অদ্ভুতালম্বনা ...

(অর্থাৎ স্থা...

ইহার ব্যভিচারী (৬)।

ইহার পর শারদাতনয়-কৃত ভাবপ্রকাশনের বিশ্লেষণ। বিস্ময়-স্থায়িভাব হইতে অদ্ভুত-রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'বিস্ময়' অর্থে চিত্তের বৈচিত্র্য। উহা ত্রিগুণাত্মক—ত্রিধা বিভক্ত। বিবিধরূপ স্ময় (অর্থাৎ হর্ষ) যাহাতে, তাহাই বিস্ময়। যাহা হইতে কেহ স্বয়ং বিস্ময় অনুভব করে, অথবা যাহা দ্বারা অপরকে বিস্মিত করায়, তাহাই বিস্ময়কর (৭)।

হর্ষ-গর্ব্ব-স্মৃতি-মতি-শ্রম-ধৃতি-মদ-তর্ক-বিবোধ-চিন্তা-রোমাঞ্চ-স্তম্ভ-বেপথু-স্বেদ—এইগুলি অদ্ভুতরসের ব্যভিচারিভাব। বিচিত্র আকার, বিচিত্র বেশ, বিচিত্র আচার, বিচিত্র বিভ্রম (শোভা) প্রভৃতি যুক্ত মালা-লীলা-বিলাসী প্রাণিগণ অদ্ভুতের আলম্বন (৮)।

বীভৎসরস

অদ্ভুতরস

ভয়ানকরস
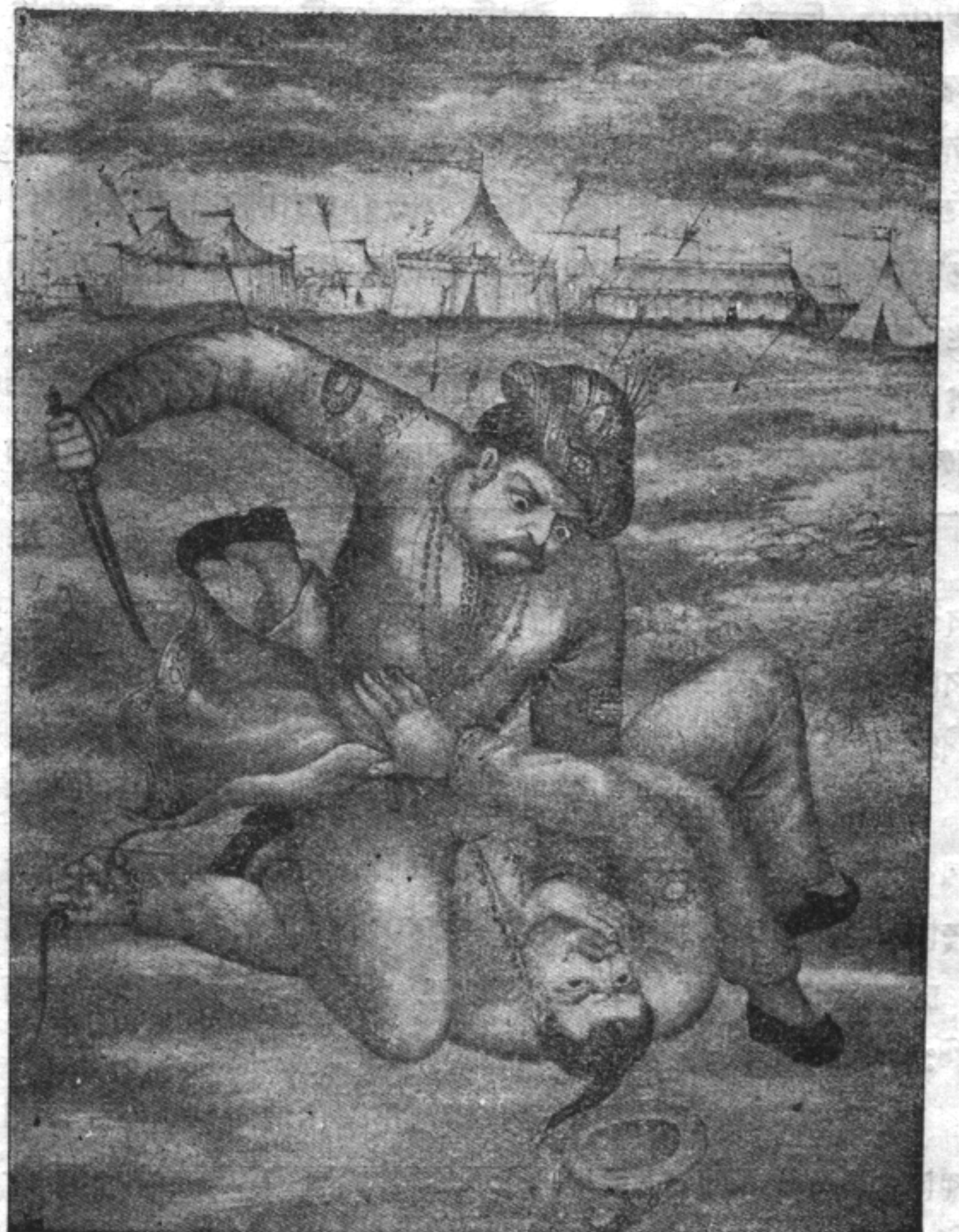
বীররস

[রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বহুব্যয়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত দুষ্প্রাপ্য চিত্রের প্রতিচ্ছবি।

অদ্ভুতের উদ্দীপন বিভাবগুলির পারিভাষিক সংজ্ঞা 'চিত্র'। যে সকল ভাব হৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়া বৈচিত্র্যের জনক হইয়া থাকে, তাহাদিগের নাম 'চিত্র' বিভাব—উহারা অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের জনক (৯)।

এই সকল চিত্র বিভাব যখন যথোচিত সাত্ত্বিক ভাবাদি সহ অনুকূল অভিনয়ে আশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবে (বিস্ময়ে) অবস্থান করে, তখন প্রেক্ষকগণের মন রজঃসত্ত্বোজ্জ্বল ও বুদ্ধিযুক্ত (অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিযুক্ত) অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ দশাগ্রস্ত অন্তঃকরণের যে বিকার, তাহাই অদ্ভুত-রস (১০)।—ইহা বাসুকি-মত।

নারদমতে—বাহ্য বিষয়ে সঙ্গত মন যখন অহঙ্কার-রজঃ-সত্ত্বযুক্ত, তখন তাহার বিকারই বীররস। আর উক্ত প্রকার অন্তঃকরণ রজোগুণ ও অহঙ্কার বর্জ্জিত হইলে তাহা হইতে অদ্ভুত উৎপন্ন হয় (১১)। অতএব, নারদ-মতে অদ্ভুতোৎপত্তি-কালে অন্তঃকরণে কেবল সত্ত্বগুণ বিদ্যমান—রজোগুণ নাই।

'অদ্ভুত'-শব্দের নির্ব্বচন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—'অথ'-ধাতুর অর্থ বৈচিত্র্য। এই ধাতু হইতেই 'অদ্ভুত' পদের ব্যুৎপত্তি। যাহার দর্শনে বিচিত্র চিত্তবৃত্তির প্রকাশ হয়, তাহাই অদ্ভুত (১২)।

অদ্ভুত-রসের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—যখন ব্রহ্ম-সভায় ভরতগণ-কর্ত্তৃক ত্রিপুরমর্দ্দনের অভিনয় সম্যগ্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তখন ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে সাত্বতী বৃত্তি ও উহা হইতে বীর-রসের উৎপত্তি হয়। এই বীর-রস হইতে অদ্ভুতের নিষ্পত্তি। 'ত্রিপুর' বলিতে বুঝাইত দৈত্যগণের তিনটি পুরী। উহাদিগের একটি লৌহময়—অপরটি রজত-নির্ম্মিত ও তৃতীয়টি হিরণ্ময়। উহাদিগের মধ্যে প্রথমটির (লৌহময় পুরীর) রক্ষার্থ শত-সহস্র (এক লক্ষ) কোটি-সংখ্যক অতিশয় ক্ষিপ্রকারী ও বলবান অসুর স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টির রক্ষার্থ উহার দ্বিগুণ, ও তৃতীয়টির রক্ষার নিমিত্ত তাহার দ্বিগুণ অসুর-সেনা স্থাপিত ছিল। এই সকল অসুরের শরবর্ষণ স্মিত-মুখে সহ্য করিতে করিতে অসিতাপাঙ্গী অম্বিকা দেবীকে কটাক্ষে অবলোকন-পূর্ব্বক যখন স্মরহর দেবদেব একাকী একটি মাত্র শরপ্রয়োগে তিনটি পুরীই যুগপৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন, তখন ত্রিভুবনের সকল শ্রেণীর প্রাণিবর্গের নিকটই উহা অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। আর এই কারণেই বলা হয়—বীর-রস হইতেই অদ্ভুতের উদ্ভব (১৩)।

অদ্ভুতের বিভাবাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—অদ্ভুত বিস্ময়াত্মক (অর্থাৎ বিস্ময়-স্থায়িভাবাত্মক)—সমপ্রকৃতি (অর্থাৎ—উত্তম-প্রকৃতি বা অধম-প্রকৃতি নহে)। নরগণের কর্ম্মের আতিশয্য-বশতঃ, ঈপ্সিত বিষয়ের সংগ্রহে, মনোরথ-ফলপ্রাপ্তি-হেতু, দিব্য ভাব (পদার্থ) অবলোকন-দ্বারা, বিমান-উদ্যান-ভবন-সভা-আরাম প্রভৃতি দর্শনে, বিরুদ্ধ পদার্থসমূহের পরস্পরের অবিরুদ্ধ ভাবে সমাগম-বশে, অসম্ভব বিষয়ের সম্ভব ও উৎপত্তি দর্শনে, অভীষ্ট বিষয়ের অননুকূল দেশে ও কালে অচিন্তিত ভাবে প্রাপ্তিবশতঃ ও এতাদৃশ অন্যান্য বিভাব হইতে অদ্ভুত-রস জন্মিয়া থাকে। স্তম্ভ-বেপথু-রোমাঞ্চ-স্বরভঙ্গ-অশ্রুনির্গম ও শৃঙ্গারানুকূল ব্যভিচারিভাব-সমূহ ইহার সঞ্চারী।

মানস-আঙ্গিক-বাচিক-ভেদে অদ্ভুত-রস ত্রিবিধ। ধ্যান, নয়ন-বিস্তার, নয়ন ও বদনের প্রসন্ন ভাব, আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, অনিমেষ অবলোকন প্রভৃতি মনের অনিশ্চলত্বের কারণ। অতএব, এই বিকারগুলি মানস অদ্ভুতের সূচক। চেল (বস্ত্র) বা অঙ্গুলির ভ্রমণ, উঠিয়া উঠিয়া লম্ফ প্রদান (বল্গন), সতত দান, নটন (নৃত্য), পরস্পর আলিঙ্গন (আশ্লেষ), পরস্পর বাহু ও করতলের আঘাত—এই সকল বিকার আঙ্গিক অদ্ভুত সূচিত করে। হাহাকার, সাধুবাদ, কপোলের (গণ্ডদেশের) আস্ফালন-ধ্বনি (গণ্ডবাদ্য), উচ্চ হাস্য, হর্ষ, ঘোষ (গম্ভীর নিনাদ), গীত, উচ্চাবচ (উঁচু-নীচু) বাক্য—ইত্যাদি বিকার বাচিক অদ্ভুতের সূচক।

অদ্ভুতের অধিদেবতা ব্রহ্মা। সাহিত্যদর্পণ-কারের সহিত শারদাতনয়ের এই স্থলে ভেদ। দর্পণকারের মতে গন্ধর্ব্ব অদ্ভুতের দেবতা। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের অনুবর্ত্তনে শারদাতনয় ব্রহ্মাকে অদ্ভুতের অধিদেবতা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি অতি সমীচীন। অদ্ভুতের অধিষ্ঠান (বা আশ্রয়) হইতেছে নানা-শিল্পাত্মিকা ধী। এইরূপ নানা-শিল্পকুশল-বুদ্ধি একমাত্র আদিস্রষ্টা প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মারই আছে। অতএব, তিনিই ইহার অধিপতি হইবার যোগ্য (১৪)।

আর অদ্ভুতের বর্ণ পীত।

শারদাতনয়ের অদ্ভুত-রস-বিশ্লেষণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

---

(৯) "স্থিরাশ্চিত্রা বিভাবা যে তে বীরাদ্ভুতয়োঃ ক্রমাৎ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ৪। "সদানুভূয়মানা যে হৃদি বৈচিত্র্যকারিণঃ। ভাবাশ্চিত্রা ইতি জ্ঞেয়াস্তেঽদ্ভুতৈশ্বর্য্যভাবকাঃ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ৫।

(১০) "যদা চিত্রা বিভাবাস্তু ভাবৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সহ। স্বাশ্রয়াভিনয়ৈর্যুক্তা বর্ত্তন্তে স্থায়িনি স্বকে॥ তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং রজঃসত্ত্বোজ্জ্বলং ভবেৎ। বুদ্ধিযুক্তঞ্চ তত্রত্যো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে॥ স চাদ্ভুতরসাখ্যাং তু লভতে রস্যতে চ তৈঃ"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৪।

(১১) "অহঙ্কাররজঃসত্ত্বযুক্তাদ্বাহ্যার্থসঙ্গতাৎ। মনসো যো বিকারস্তু স বীর ইতি কথ্যতে॥ তস্মাদেবাদ্ভুতো জাতো রজোঽহঙ্কারবর্জ্জিতাৎ"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৭।

(১২) "অথ বৈচিত্র্য (?) ইত্যস্য ধাতোরদ্ভুতনির্বহঃ। বিচিত্রা যস্য ভবতি চিত্তবৃত্তিস্ততোঽদ্ভুতঃ"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ পৃঃ ৪৮-৪৯।

(১৩) "যদাভিনীতং ভরতৈঃ সম্যক্ ত্রিপুরমর্দ্দনম্। সাত্বতী বৃত্তিতো জজ্ঞে বীরো দক্ষিণতো মুখাৎ॥......পুরাণি ত্রীণি ঘটিতান্যয়োরজতকাঞ্চনৈঃ। একৈকস্য তু রক্ষার্থমসুরাণাং তরস্বিনাম্। কোট্যঃ শতসহস্রাণি স্থাপিতানি ততস্ততঃ। দ্বিগুণোত্তরবৃদ্ধানি বলান্যতিবলানি চ। অম্বিকামসিতাপাঙ্গীমপাঙ্গেনাবলোকয়ন্। বিষহ শরবর্ষাণি স্ময়মানঃ স্মরান্তকঃ। শরেণৈকেন তান্যেকো ভস্মসাদকরোদ্ যদা॥ তদা সমস্তভূতানামদ্ভুতং যদভূন্মহৎ। তস্মাদদ্ভুতনিষ্পত্তি বীরাদেবেতি কথ্যতে"।—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৫৭-৫৮।

(১৪) "মহেন্দ্রদৈবতো বীরস্ত্বদ্ভুতো ব্রহ্মদৈবতঃ॥...অদ্ভুতস্যাধিষ্ঠানং নানাশিল্পাত্মিকৈব ধীঃ॥ ব্রহ্মণঃ সেয়মস্তীতি সোঽয়মস্যাধিদৈবতম্"—ভাব প্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৮।

মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে অদ্ভুতের যে দৃষ্টান্ত-শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নোক্তরূপ—কি বিচিত্র! কি আনন্দ! এই নবাবতারটি কি অদ্ভুত! এরূপ কান্তি (আর) কোথায় (দেখিতে পাওয়া যায়)! (ইঁহার গমন-উপবেশন প্রভৃতির) ভঙ্গী কি অভিনব! কি অলৌকিক ধৈর্য্য! অহো কি (অদ্ভুত) প্রভাব! কি (অপূর্ব্ব) আকৃতি! এই সৃষ্টিটি নূতন (অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি নহে) (১৫)!

বামনকে দেখিয়া দৈত্যরাজ বলি ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। এ স্থলে 'বিচিত্র' প্রভৃতি শব্দগুলি বামনের লোকোত্তর মহিমার প্রতিপাদক মাত্র—বিস্ময়ার্থক নহে। কারণ, বিস্ময় এ স্থলে স্থায়ি-ভাব। বাক্যে উহা প্রকাশিত হইলে বাচ্যতাদোষ জন্মিবার সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে বামন আলম্বন। কান্তি-গুণ প্রভৃতির আতিশয্য (লোকোত্তরত্ব) উদ্দীপন। বামনের স্তুতি প্রভৃতি অনুভাব। মতি-ধৃতি-হর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী—ইহাই নাগোজীভট্টপাদের অভিমত (১৬)।

গোবিন্দ ঠক্কুর তাঁহার প্রদীপে বিস্ময়ের লক্ষণ দিয়াছেন—বস্তুর মাহাত্ম্যদর্শনে চিত্তের যে বিস্তার, তাহাই বিস্ময়। তাহা হইতে উৎপন্ন রস অদ্ভুত (১৭)।

কাব্যপ্রকাশের অদ্ভুত-রস-বিবরণও এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নাট্যদর্পণে বলিয়াছেন—দিব্যজন-ইন্দ্রজাল-রম্যবিষয় প্রভৃতি দর্শনে, অভীষ্ট সিদ্ধি প্রভৃতি বিভাব হইতে অদ্ভুত-রসের উৎপত্তি। শ্লাঘা-রোমাঞ্চ-হর্ষ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য।

'দিব্য' বলিতে বুঝায় ইন্দ্র প্রভৃতি। ইন্দ্রজাল—মন্ত্র-দ্রব্যগুণ বা হস্তলাঘব প্রভৃতি দ্বারা অসম্ভব বস্তু প্রদর্শন। রম্য বিষয়—আতিশয্য-বশতঃ হৃদ্য বিষয়, যথা—শিল্পকর্ম্ম-রূপ-বাক্য-গন্ধ-রস-স্পর্শ-নৃত্য-গীত প্রভৃতি। 'দর্শন'-পদ হইতে স্বয়ং কীর্ত্তন বা শ্রবণও সংগ্রহণীয়। অভীষ্ট—অত্যন্ত ঈপ্সিত; তাহার 'সিদ্ধি' অর্থে প্রাপ্তি অথবা নিষ্পত্তি। পূর্ব্বোক্ত বিভাবগুলি হইতে বিস্ময়-স্থায়ী অদ্ভুত-রসের উদ্ভব হয়। হর্ষাদি অনুভাব। নয়ন-বিস্তার-গাত্রোল্লুকসন (গাত্রের শিহরণ)-অনিমিষ-প্রেক্ষণ-চেলাঙ্গুলি-ভ্রমণ-গদ্গদ-বচন-বেপথু-স্বেদ প্রভৃতি অনুভাবও যথাযোগ্য গ্রহণীয়। আবেগ-জড়তা-সম্ভ্রম-স্তম্ভ-অশ্রু-গদ্গদ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে নাট্যশাস্ত্রেরই সারার্থ প্রদত্ত হইয়াছে—অদ্ভুত বিস্ময়-স্থায়িভাব হইতে উদ্ভূত। প্রাসাদ-উদ্যান-শৈলাদিতে গমন, দিব্যজনের দর্শনলাভ, সভা-বিমান-মায়া-ইন্দ্রজাল-শিল্প প্রভৃতির দর্শন, ইন্দ্রিয়ের ঈপ্সিত বস্তুর লাভ প্রভৃতি বিভাব-সমূহ হইতে অদ্ভুতের উৎপত্তি। দন্ত ও লোচনের বিস্তার, প্রাসাদ-গমন, রোমাঞ্চ-স্বেদ-হর্ষ-অশ্রু-সাধুবাদ প্রভৃতি অনুভাবের সাহায্যে এই রসের অভিনয় কর্ত্তব্য। স্তম্ভ-অশ্রু-স্বেদ-রোমাঞ্চ-গদ্গদ-আলাপ-সম্ভ্রম-জড়তা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

শিঙ্গভূপাল রসার্ণব-সুধাকরে নূতন বিশেষ কিছু বলেন নাই। বিস্ময়-স্থায়িভাব স্বযোগ্য বিভাব অনুভাব-ব্যভিচারিভাব-সংযোগে পুষ্ট হইয়া সদস্যগণের আস্বাদনযোগ্য হইলে অদ্ভুত-রসে পরিণত হইয়া থাকে। ধৃতি-আবেগ-জাড্য-হর্ষ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী। আর ইহার চেষ্টা (অনুভাব)—নেত্র-বিস্তার-অশ্রু স্বেদ-পুলক প্রভৃতি।

অদ্ভুত-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

অতঃপর ভরত-নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি ষষ্ঠ রসের এক প্রকার অভিনব অবান্তর বিভাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন—এইরূপ ভেদ-প্রদর্শন-চ্ছলে মহর্ষি প্রধানভূত বিভাবের অনুগুণ ভাবের প্রতিপাদন করিয়াছেন (১৮)।

শৃঙ্গার ত্রিবিধ—(১) বাক্য-গত, (২) নেপথ্য-গত ও (৩) ক্রিয়াগত (১৯)। রতিভাব সূচক বাক্যপ্রয়োগে বাচিক শৃঙ্গারের অভিব্যক্তি। উজ্জ্বল-বেশ-ধারণে নৈপথ্যজ শৃঙ্গারের প্রকাশ। আর ক্রিয়াগত শৃঙ্গার ত সুস্পষ্ট!

হাস্য-রস ত্রিবিধ—(১) আঙ্গিক, (২) নেপথ্যজ ও (৩) বাক্যগত। বিদূষকের বিকৃত আকৃতি বা হাস্যকর অঙ্গ-ভঙ্গী আঙ্গিক হাস্যরসের জনক। বিদূষকাদির বেশও হাস্যোদ্রেক-কর। আর পরিহাস-জনক বাক্য বাচিক হাস্যের উৎস।

রৌদ্র-রসও আঙ্গিক-বাচিক-নেপথ্যজ-ভেদে ত্রিবিধ। উদ্ধত-প্রকৃতি নায়কাদির অঙ্গ-ভঙ্গীতে আঙ্গিক রৌদ্রের অভিব্যক্তি। ক্রুর-কর্ম্মের উপযোগী বেশধারণ নেপথ্যজ রৌদ্রের জনক। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—বাক্য-রৌদ্রই স্বভাব-রৌদ্র বলিয়া ব্যবহৃত থাকে—কারণ, বাক্য স্বভাবানুগামী (২০)।

করুণ ত্রিবিধ—(১) ধর্ম্মোপঘাতজনিত, (২) অর্থাপচয়-কৃত ও (৩) শোকহেতুক। এ স্থলে 'ধর্ম্ম' বলিতে বুঝাইতেছে ধর্ম্মানুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানযোগ্য ধর্ম্মক্রিয়া, যথা—অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি। ধর্ম্মোপঘাত হইতেও করুণের উৎপত্তি হইতে পারে—এ কথা কেন বলা হইল, তাহা বুঝাইতে যাইয়া অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—সাধারণতঃ করুণ-রস স্ত্রীগত বা মধ্যমাধম-প্রকৃতি-গত হইয়া থাকে। উত্তম-প্রকৃতি যাঁহারা, তাঁহারা শোকবশ নহেন; এ কারণে তাঁহাদিগের শোকজ করুণ-রসের উদ্রেক হয় না। তবে ধর্ম্মের বিরোধ দেখিলে তাঁহাদিগেরও চিত্তে দুঃখ জন্মে। এ কারণে, উত্তম-প্রকৃতির পক্ষে ধর্ম্মোপঘাত করুণ-রসের শোভন হেতু বলিয়া গণ্য হইতে পারে (২১)।

---

(১৫) "চিত্রং মহানেষ বতাবতারঃ ক কান্তিরেষাভিনবৈব ভঙ্গিঃ। লোকোত্তরং ধৈর্য্যমহো প্রভাবঃ কাপ্যাকৃতির্নূতন এষ সর্গঃ।"—কাব্যপ্রকাশ (৪র্থ উল্লাস)

(১৬) "ইয়ং বামনমুদ্দিশ্য বলেরুক্তিঃ। অত্র চিত্রাদিশব্দাঃ··· লোকোত্তরমহিমত্বপ্রতিপাদকাঃ, নতু বিস্ময়ার্থাঃ। তস্যাত্র স্থায়িত্বয়া বাচ্যতাদোষাপত্তেঃ।······অত্র বামন আলম্বনম্। কান্তিগুণাতিশয়াদি উদ্দীপনম্। স্তবাদয়োঽনুভাবাঃ। মতিধৃতিহর্ষাদয়ো ব্যভিচারিণঃ।"—নাগোজী, প্রদীপোদ্দ্যোত।

(১৭) "বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তারো বস্তুমাহাত্ম্যদর্শনাৎ। তৎকৃতিকোঽদ্ভুতঃ।"—গোবিন্দ ঠক্কুর, প্রদীপ।

(১৮) "অথ প্রধানভূতবিভাবানুগুণভাবপ্রতিপাদনং ভেদপ্রদর্শনব্যাজেন করোতি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬৩২।

(১৯) "শৃঙ্গারং ত্রিবিধং বিদ্যাদ্বাঙ্‌নেপথ্যক্রিয়াত্মকম্"—নাঃ শাঃ, ৬।১৭ (বরোদা সং)।

(২০) "বাক্যরৌদ্রো হি তত্র স্বভাবরৌদ্র ইতি ব্যবহরিষ্যতে, স্বভাবানুসারিত্বাদ্বাক্যস্য"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬৩২।

(২১) "ধর্ম্মোপঘাতজ···উত্তমানামপি শোভনহেতুত্বাৎ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৬৩২।

মহর্ষি বলিয়াছেন—ব্রহ্মার মতে বীর-রস ত্রিবিধ—(১) দানবীর, (২) ধর্ম্মবীর ও (৩) যুদ্ধবীর।

ভয়ানকও ত্রিবিধ—(১) ব্যাজহেতুক, (২) অপরাদ্ধহেতুক ও (৩) বিত্রাসিতক। ব্যাজ বলিতে বুঝাইতেছে—কৃতক বা কৃত্রিম। 'অপরাদ্ধ' অর্থে যাহারা অপরাধী—চৌরাদি। অপরাধ করার ফলে তাহারা সদাই সন্ত্রস্ত থাকে। বিত্রাসিতক—বিশেষরূপে যাহারা ত্রাস পায়—অর্থাৎ বালকাদি। স্বভাবতঃ ত্রস্তহৃদয় স্ত্রী-বালকাদি একটি তৃণ কম্পিত হইতে দেখিলেও ভয় পাইয়া থাকে—ইহাই স্বাভাবিক ভয় (২২)।

বীভৎস দ্বিবিধ—(১) ক্ষোভণ বা শুদ্ধ ও (২) উদ্বেগী বা অশুদ্ধ। রুধিরাদি দর্শন-জনিত বীভৎস ক্ষোভণ (মনঃ-ক্ষোভ-কর); ইহা বিভাব (রুধিরাদি) শুদ্ধ বলিয়া ইহাও শুদ্ধ। আর বিষ্ঠা-ক্রিমি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন উদ্বেগী (মনের উদ্বেগজনক)। ইহার বিভাব (বিষ্ঠাদি) অশুদ্ধ বলিয়া তৎসঞ্জাত বীভৎসও অশুদ্ধ (২৩)।

অদ্ভুত-রসও দ্বিবিধ—(১) দিব্য ও (২) আনন্দজ। দিব্যজন বা বস্তু (সভা-বিমানাদির) দর্শনে উৎপন্ন দিব্য। আর মনোরথ-প্রাপ্তি-নিবন্ধন হর্ষ হইতে উদ্ভূত যে অদ্ভুত, তাহাই আনন্দজ।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(২২) "ব্যাজাদিতি কৃতক ইত্যর্থঃ। অনেনানুভাবমার্দ্দবং দর্শিতম্। অপরাধস্তীত্যপরাদ্ধাশ্চৌরাদয়ঃ। যত্তু স্বভাবত্রস্তহৃদয়ানাং স্ত্রীবালাদীনাং তৃণেঽপি কম্পমানে ভয়ং তদ্বিত্রাসিতকম্। বিশেষেণ ত্রাস্যত ইতি বিত্রাসিতো বালাদিঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩২।

আচার্য্য অভিনবগুপ্তের মতে—ভয় সাধারণতঃ স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতির নিকটই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেন না, 'ভয়' বলিতে বুঝায় বিনাশের আশঙ্কা—উহা উত্তম-প্রকৃতিতে সম্ভব নহে। এ কারণে যাঁহারা বলিয়া থাকেন—গুরু-রাজা প্রভৃতির নিকট অপরাধ হেতু উত্তম-প্রকৃতিরও যথার্থ ভয় জন্মিতে পারে, তাঁহাদিগের উক্তি যুক্তিহীন। "গুর্ব্বাদ্যপরাধাৎ পরমার্থতোঽপ্যুত্তমানাং ভয়াবেগ ইতি ত্বসৎ। ভয়ং হি বিনাশশঙ্কাত্মকং নোত্তমেষু সম্ভবতি, তথা চ ভয়ং নাম স্ত্রীনীচপ্রকৃতিকমিতি সামান্যেন লক্ষ্যতে"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩২।

(২৩) "রুধিরান্ত্রাদিদর্শনাদ্ যো বীভৎসঃ স ক্ষোভণত্বাচ্ছুদ্ধঃ। যস্তু বিষ্ঠাদিভ্য উদ্বেগী হৃদয়ং চলয়তি, সোঽশুদ্ধঃ, অশুদ্ধবিভাবকত্বাৎ। উপাধ্যায়স্ত্বাহ—বীভৎসস্তাবদ্বিভাববিশেষাদ্ যত্র তু সংসারনাট্যনায়করাগ-প্রতিপক্ষতয়া মোক্ষসাধনত্বাচ্ছুদ্ধঃ, যদাহুঃ—"শৌচাৎ স্বাঙ্গং জুগুপ্সতে" ইতি। তথা "বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্" (যোগসূত্র ২।৩৩) ইতি। তেন সোঽপি পরমার্থতস্ত্রিবিধ এব। দ্বিতীয়ক ইত্যনেন তস্য দুর্লভত্বেন প্রাচুর্য্যং সূচয়তি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩২। অর্থাৎ আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলেন যে, প্রাচীন আচার্য্যগণ এই দ্বিবিধ বীভৎস ব্যতীত আর এক প্রকার শুদ্ধ পারমার্থিক বীভৎস-রসের উল্লেখ করিয়াছেন। সংসারে বৈরাগ্যবশতঃ যে বিষয়ভোগের প্রতি জুগুপ্সার উদ্রেক হয়, ইহা তজ্জনিত। তবে এই শ্রেণীর বীভৎস অতি দুর্লভ।

হে রাজন্

পশ্চিম আকাশ-কোণে বেলা ডুবে যায়!
হে রাজন্ চেয়ে দেখ তোমা পানে কেহ আজ ফিরে না তাকায়।
যাত্রী তুমি একা—
সঙ্গিহীন চলিতে হইবে পথ এই তব অদৃষ্টের লেখা।

কোথা তব বন্ধু-পরিজন?
কোথা আজ সভাসদগণ?
কোথা সে ময়ূর-পক্ষী-আঁকা সেই তব স্বর্ণ-সিংহাসনখানি,
করিতে যেথায় বসে নিত্য কানাকানি,

ভাঙ্গিবারে গড়িবারে নব নব দেশ?
হায় কত পিপাসা অশেষ!
নাহি তব সৈন্যদল, নাহি আজ বিজয়ের বিপুল উল্লাস,
স্তিমিত নিস্তব্ধ আজ হৃদয়-উচ্ছ্বাস।

নিবে গেছে প্রাসাদের গর্ব্বিত সে আলো
চারি দিকে ঘনাইয়া কালো।
হের সাজ মৃত্যুময় সব,
ক্ষান্ত ওই সম্মুখেতে অর্থহীন স্তুতি-কলরব।
যাত্রী তুমি একা—
সঙ্গিহীন চলিতে হইবে পথ এই তব অদৃষ্টের লেখা।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল

প্রভু ও ভৃত্য

ভৃত্য চাই! লোক এলো। প্রভু কহে তারে,
—কহ বাপু পরিচয়, কে চিনে তোমারে!
শেষ কাজ কোথা ছিল? ঠিক আগে তার?
সে চাকরি গেল কেন? সব সমাচার
না জেনে চাকর রাখা—বোকামির কাজ!
ও-সব বৃত্তান্ত তুমি দিয়ে যাও আজ,
কাল এসে দেখা করো। আজ খোঁজ করি!
তারা যদি বলে, ভালো,—মিলিবে চাকরি।

ভৃত্য কহে, আমারো যে ওই নিবেদন।
আমিও জানিতে চাই, মনিব কেমন!
এ বাড়ীতে আগে কাজ করে গেছে যারা—
মাহিনা পেয়েছে? না কি খেয়ে গেছে তাড়া?
দেখেছেন তাদের কি মানুষের মতো?
কিম্বা হীন জানোয়ার, দীন পদানত?
চলে গিয়ে আপনার যশ তারা গায়?
অথবা ঈশ্বরে ডাকি নালিশ জানায়?
মনিব মানুষ কি না—জানা চাই আগে!
না জেনে চাকরি নিতে ভারী ভয় লাগে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

টিউনিসিয়া

এবারকার কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে টিউনিসিয়ায় মিত্র-শক্তির এই যে বিজয়-লাভ, এ-বিজয়ে তাহার পক্ষে সম্মুখ-সমরের পথ সুপ্রশস্ত হইয়াছে! এ বিজয়-লাভের ফলে মিত্র-শক্তি আজ ভূমধ্য-সাগরকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়া জার্ম্মাণী এবং ইতালীকে যেমন মাথা তুলিবার অবকাশ দিবে না, তেমনি ভূমধ্য-সাগরে মিত্র-শক্তির জাহাজ-চলাচলেও বাধা থাকিবে না। তুরস্কের অবস্থান দুর্ভেদ্য হইল এবং মিত্র-শক্তির পক্ষে জার্ম্মাণি-আক্রমণের বাধা-বিঘ্নও অনেকখানি কাটিয়া গেল। রণ-নায়কগণ এখন কি করিবেন, শান্তিকামী প্রত্যেক নর-নারী সাগ্রহে তাহারি প্রতীক্ষায় আছে।

জিব্রাল্টার এবং সুয়েজের মধ্যপথে টিউনিসিয়ার অবস্থান। সিসিলিকে লইলে মনে হয়, টিউনিসিয়া যেন ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের মাঝখানে দেওয়ালের আড়াল তুলিয়া রাখিয়াছে। এ-যুগের রাজনৈতিক এবং অর্থনীতিক সমস্যার সমাধানে সাগর-কূলে প্রায় ১০০ মাইলব্যাপী টিউনিসিয়ার মূল্য বড় অল্প নয়।

টিউনিসিয়ার শাসন-ভার নামেই শুধু 'বে' বা রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল; ফরাসী রিপাব্লিক ছিল টিউনিসিয়ার আসল মালিক। শাসন সুবিধার জন্য টিউনিসিয়াকে ১৯টি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করিয়া ফরাসী-গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য এক জন করিয়া গবর্ণর নিযুক্ত করিত! গবর্ণররা জাতে টিউনিসিয়ান এবং 'কাইয়াদ্' নামে অভিহিত। প্রত্যেক গবর্ণরের অধীনে ছিল কাহিয়া বা 'মেয়র' এবং 'সেখ' বা গ্রাম্য মোড়ল। গবর্ণরদের উপরে এক জন গবর্ণর-জেনারেলের আসন। ফরাসী মিনিষ্ট্রী অফ ফরেন এ্যাফেয়ার্স এই গবর্ণর-জেনারেল নিয়োগ করিয়া টিউনিসিয়ায় পাঠাইত। আলজিরিয়া যেমন ফ্রান্সের উপনিবেশ এবং তাহারি অংশ-স্বরূপ, টিউনিসিয়া তেমন ছিল না। টিউনিসিয়া ছিল ফ্রান্সের প্রোটেক্টরেট বা অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য।

ইতালী হইতে টিউনিসিয়ার দূরত্ব খুব সামান্য; এ জন্য কয়েক শত বৎসর হইতে বহু দরিদ্র ইতালীয়ান টিউনিসিয়ায় আসিয়া আস্তানা পাতে। এখনো টিউনিসিয়ায় ইতালীয়ান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। তারা গরীব,—জন-মজুরীর কাজ করে। টিউনিসিয়ার মুসলমান-অধিবাসীরা এই সব ইতালীয়ানকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। কয়েক ঘর ইতালীয়ান অবশ্য জমিদারী ফাঁদিয়া বিত্তশালী হইয়াছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে মেনার্ড ওয়েন উইলিয়াম্স্ নামে এক জন মার্কিন সুধী টিউনিসিয়া-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। টিউনিসিয়ার সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—ওদিকে সাহারা মরুভূমি, এদিকে ভূমধ্য-সাগর তাহারি মধ্যে টিউনিসিয়া অবস্থিত। টিউনিসিয়া এক দিন ছিল গৌরব-স্মৃতির মন্দিরের মত। চারি দিকে বিরাট্ স্বপ্নময়তা! এখনকার টিউনিসিয়া আর স্বপ্নপুরী নয়—অস্ত্র-ঝঞ্ঝনায় টিউনিসিয়ার আকাশ-বাতাস মুখরিত রহিয়াছে। প্রধান সহর টিউনিস। সেখানে ইতালীয়ানের দল চাহিয়া আছে ইতালীর দিকে—ইতালী হইতে যুদ্ধের কি খবর আসে, তাহারি প্রত্যাশায়। আর ৩৩০০০ ফরাসী লক্ষ্য করিতেছে জার্ম্মাণীর কূর্ম্ম-গতি! পথে-ঘাটে মোটর-ট্রাক চলিয়াছে—তৈল আর খাদ্যশস্যাদি লইয়া। এই তৈল আর খাদ্যের

ও-পারে য়ুরোপ—এ-পারে আফ্রিকা

ভার তারা লিবিয়া হইতে ত্রিপোলির দিকে লইয়া চলিয়াছে।

জাহাজ হইতে টিউনিস বন্দরে নামিয়া প্রথমেই পড়ে য়ুরোপীয় বাজার, তার পর দেশী পল্লী। দেশী পল্লীর বাহিরে কাথিড্রাল; ভিতরে মসজেদ। পথের সর্ব্বত্র এখন ফৌজের আস্তানা পড়িয়াছে—থরে-থরে মেশিন-গান সাজানো। এই পল্লীতে পূর্ব্বে ছিল বিরাট বাঁদী-বাজার,—এখন সে বাজার শুধু গল্প-কথায় পর্য্যবসিত।

বার্বার জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী। বিদেশী কোন জাতিকে তারা ত্রিপোলিতে ও টিউনিসিয়ায় প্রবেশ করিতে দিত না। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে 'ফিলাডেলফিয়া' নামে একখানি মার্কিন জাহাজ ত্রিপোলির কাছে চড়ায় আবদ্ধ হইলে জাহাজের মার্কিন যাত্রী উইলিয়াম ইটন ত্রিপোলিতে নামেন এবং মিষ্ট ব্যবহারে ত্রিপোলির বেকে তুষ্ট করিয়া বের সাহায্যে লিবিয়া পর্য্যন্ত ৬৮০ মাইল পথ তিনি পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। এবং এই ঘটনার পর মার্কিন জাতির উপর ত্রিপোলি এবং টিউনিসিয়ার বার্বার

ব্যাব্ সুইকা মহল্লা—টিউনিস্
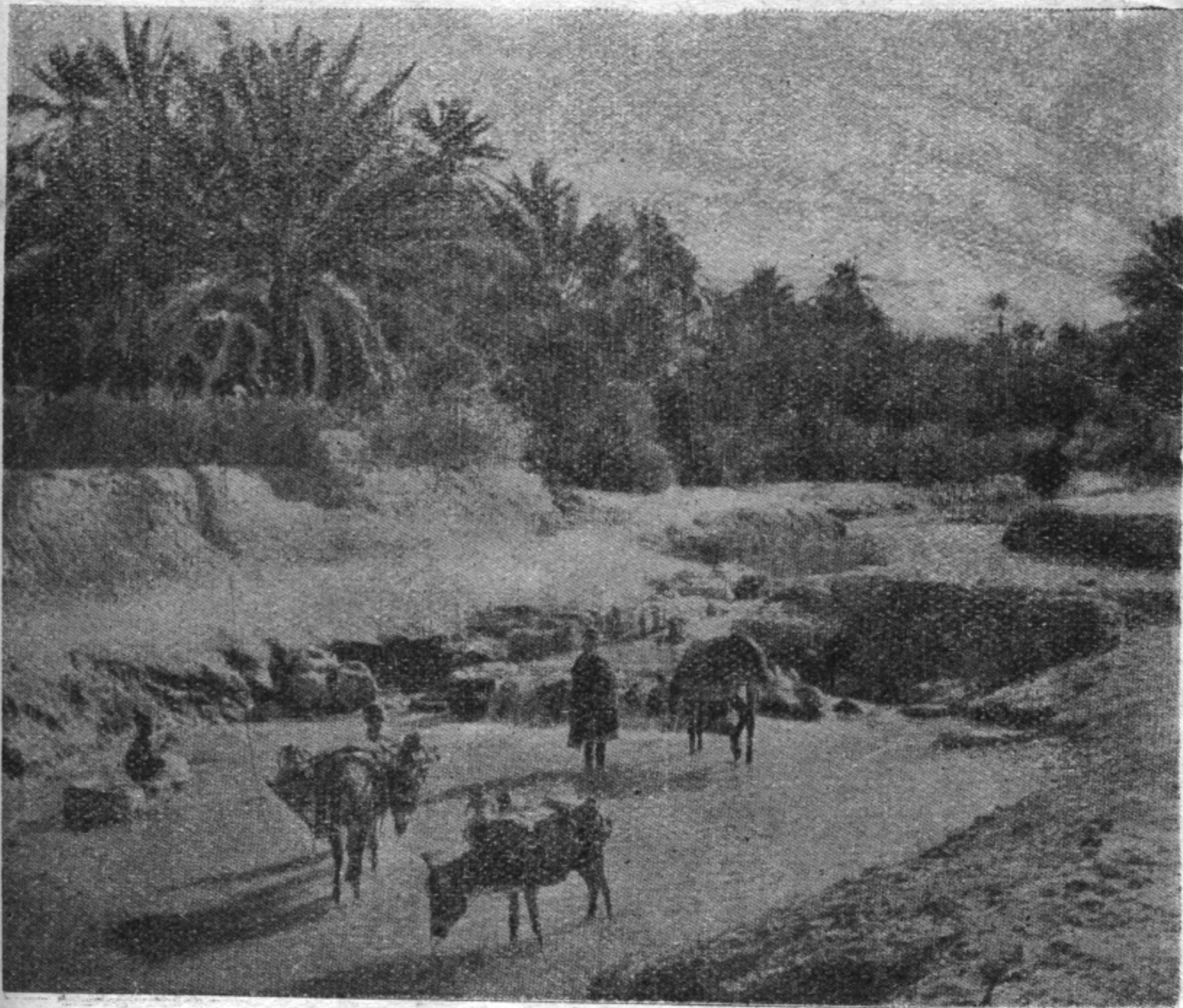
এল্ জেম্ এ্যাম্পি-থিয়েটার

জাতির ঘৃণা-বিদ্বেষের ভাব অন্তর্হিত হয়। তাহার ফলে রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া টিউনিসিয়ায় আমেরিকা এক জন কন্‌শল্ রাখিবার ব্যবস্থা করে। মার্কিন কবি জন হাওয়ার্ড পেইন্ আমেরিকার কন্‌শল্ হইয়া সত্তর-আশী বৎসর পূর্ব্বে এই টিউনিসে বাস করিতেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৫ জানুয়ারি তারিখে টিউনিসে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁর দেহ এখানকার ব্যাব্ স্যুইকা মহল্লায় সমাহিত করা হয়; পরে এখান হইতে সে দেহ তুলিয়া ওয়াশিংটনে পাঠানো হয় সেখানকার ওক্‌হিল সেমেটেরিতে সমাহিত করিবার জন্য। Home sweet Home নামে সুবিখ্যাত সঙ্গীতটি এই কবি-কন্‌শল্ পেইনের লেখা।

লেখক লিখিয়াছেন—

টিউনিসের বাহিরে লে বার্দ্দো সহর। এখানে বে'র মস্ত প্রাসাদ আছে। রমজানের সময় বে আসিয়া এই প্রাসাদে বাস করেন; তখন এখানে মহা-সমারোহে উপাসনাদি চলে। উপাসনার আসরে সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী এবং আমীর-ওমরাহেরা নিমন্ত্রিত হন্। টিউনিসিয়ান ও পদস্থ ফরাশী রাজ-কর্ম্মচারীর দল আসিয়া বে'কে সম্মান জ্ঞাপন করেন।

প্রাসাদের বেগম-মহলে এখন আর বেগমদের ঘোমটা-ওড়না-ঘাগরা-পেশোয়াজ দেখা যায় না—সে-মহলে এখন হইয়াছে আলাউই মিউজিয়ম। এ মিউজিয়মে বহু প্রাচীন যুগের পিউনিক, রোমান্, ক্রীশ্চান এবং আরব শিল্প-কলার এত নিদর্শন আজো সযত্নে সংরক্ষিত আছে যে, সে সব অনুশীলন করিতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের হয়তো এক-একটা জন্ম কাটিয়া যায়!

লে বার্দ্দোর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রাচীন সহর কার্থেজ। টিউনিস্ হইতে মোটরে বা ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণে চড়িয়া যাইতে হয়। কার্থেজ খুব প্রাচীন সহর। কার্থেজ আজো স্মরণীয়

গিরি-নির্ঝরিণী—তোজুর

বে'র প্রাসাদ—লে বার্দো

হইয়া আছে, সে শুধু কবি ভার্জ্জিল এবং কথা-শিল্পী গুস্তাভ্ ফ্লোবেয়ারের কল্যাণে।

রেলোয়ে-ষ্টেশনের গায়েই ডেইজি এবং জিরানিয়াম পুষ্পে ভূষিত ছোট একটি বাগান। এই বাগানে সালাম্বোর অমর লেখক

ফৌজের কুচ-কাওয়াজ। পিছনে প্রাচীন মসজেদ। কাইরওয়ান্

কুম্ভকারদের হাতের তৈয়ারী সাধারণ কুঁজা

আধুনিক ইহুদী মন্দির—জের্বা

ফ্লোবেয়ারের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। ফ্লোবেয়ারের লেখায় কার্থেজের যে-ছবি আমরা পাই, সে ছবির সঙ্গে এখনকার কার্থেজের কোনো মিল নাই। কার্থেজের সেই সব প্রাচীন পাষাণ-দুর্গ ও মন্দিরের ধ্বংস-স্তূপের উপর আধুনিক-রীতির গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।
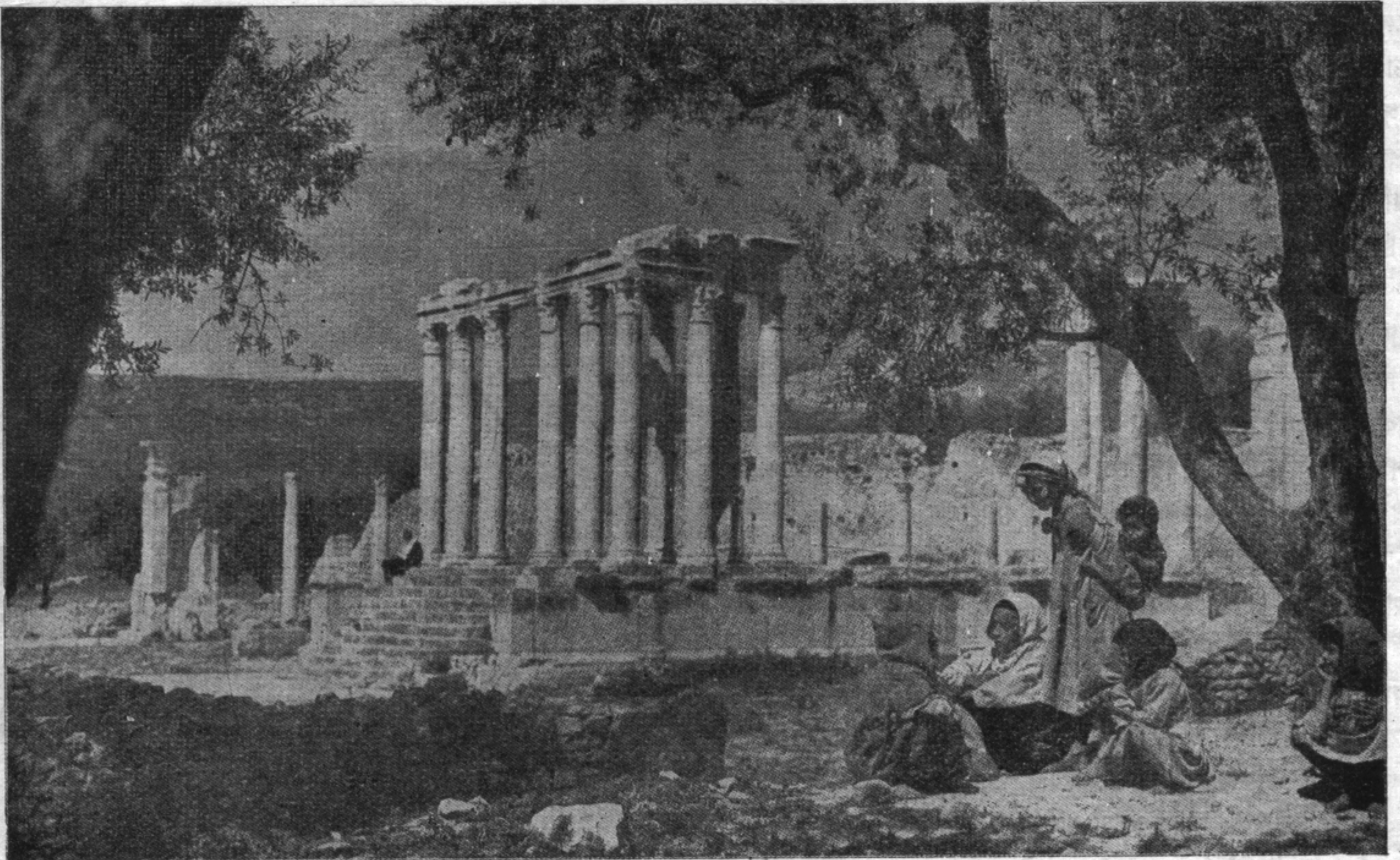
প্রাচীন রোমান্ মন্দির—দুগ্‌গা

ফ্লোবেয়ারের সালাম্বোর এখনো এখানে এমন আদর যে, টিউনিস্ হ্রদের তীরে লা গুলেতে বাস বা ট্যাক্সি ছাড়িবার সময় কণ্ডাক্টারদের চীৎকার শুনা যায়—"কে যাবে সালাম্বো? এ গাড়ীতে আসুন"। কার্থেজের পরিবর্ত্তে 'সালাম্বো' নাম শুনিয়া বিদেশী পর্য্যটকগণের বিস্ময়-চমকের সীমা থাকে না!

তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে টায়ার হইতে নির্ব্বাসিত রোমানের দল এবং ফিনিশিয়ান্—এই উভয় জাতি মিলিয়া কার্থেজ সহরের পত্তন করে। ভূমধ্য-সাগরবর্ত্তী প্রত্যেকটি প্রদেশের সহিত তারা বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল; এবং তাদের বাণিজ্য-তরণী কার্থেজে ফিরিত অসংখ্য দাস-দাসী এবং স্বর্ণ-মণির বিপুল সম্ভার বহিয়া। নানা দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কার্থেজের রোমান্ ও ফিনিশিয়ান অধিবাসীরা দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছিল; তাদের শৌর্য্যে রোম-গ্রীসও একদা কম্পমান হইত। তাদের প্রধান দেবতা ছিল মোলক (কুবের?) ও মেলকার্থ। এ দুই দেবতার উদ্দেশে বহু মন্দির ও উদ্যান বিরচিত হইয়াছিল। আজ সে সবেয় চিহ্নও নাই। মোলক এবং মেলকার্থ—এ দু'টি দেবতার নাম শুধু আজ কাব্য-গল্পে রহিয়া গিয়াছে!

এই কার্থেজ ছিল প্রাচীন যুগে আফ্রিকার কূলে প্রধানতম বন্দর এবং দুর্গ। এ দিকে ক্রমে চড়া পড়িয়া টিউনিস-উপসাগর সরিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে বন্দর ও দুর্গ-হিসাবে কার্থেজের প্রতিপত্তি এবং সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। ফরাশীরা পরে চড়া কাটিয়া কার্থেজের সঙ্গে টিউনিস্-উপসাগরের যোগসূত্র আবার নূতন করিয়া রচিয়া দিয়াছে।

প্রাচীন কালে কার্থেজের উপর রোমের আক্রোশের সীমা ছিল না। বহু দিগ্বিজয়ী রোমান্ কার্থেজকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিলেও পরবর্ত্তী-কালে সীজার এবং অগষ্টাস কার্থেজকে শোভায় সমৃদ্ধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন; বারিহীন পথে বহু কূপ খনন করাইয়াছিলেন। সে সব কূপের স্মৃতি কঙ্কাল-মূর্ত্তিতে এখনে দাঁড়াইয়া আছে।

আরো পরবর্ত্তী কালে রোমান্ সম্রাট্ হাড্রিয়ান জাঘুয়ান পর্ব্বতের নির্ঝর-ধারাগুলিকে বাঁধিয়া সেই জলাধার হইতে নলযোগে কার্থেজে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সে জলের গুণে শুষ্ক মরু-বক্ষ উর্ব্বর হইয়া ওঠে। হাড্রিয়ান-বিরচিত সেই নির্ঝর-বন্ধ হইতে সেই সব নলযোগেই আজ টিউনিস সহরে জল সরবরাহ করা হইতেছে!
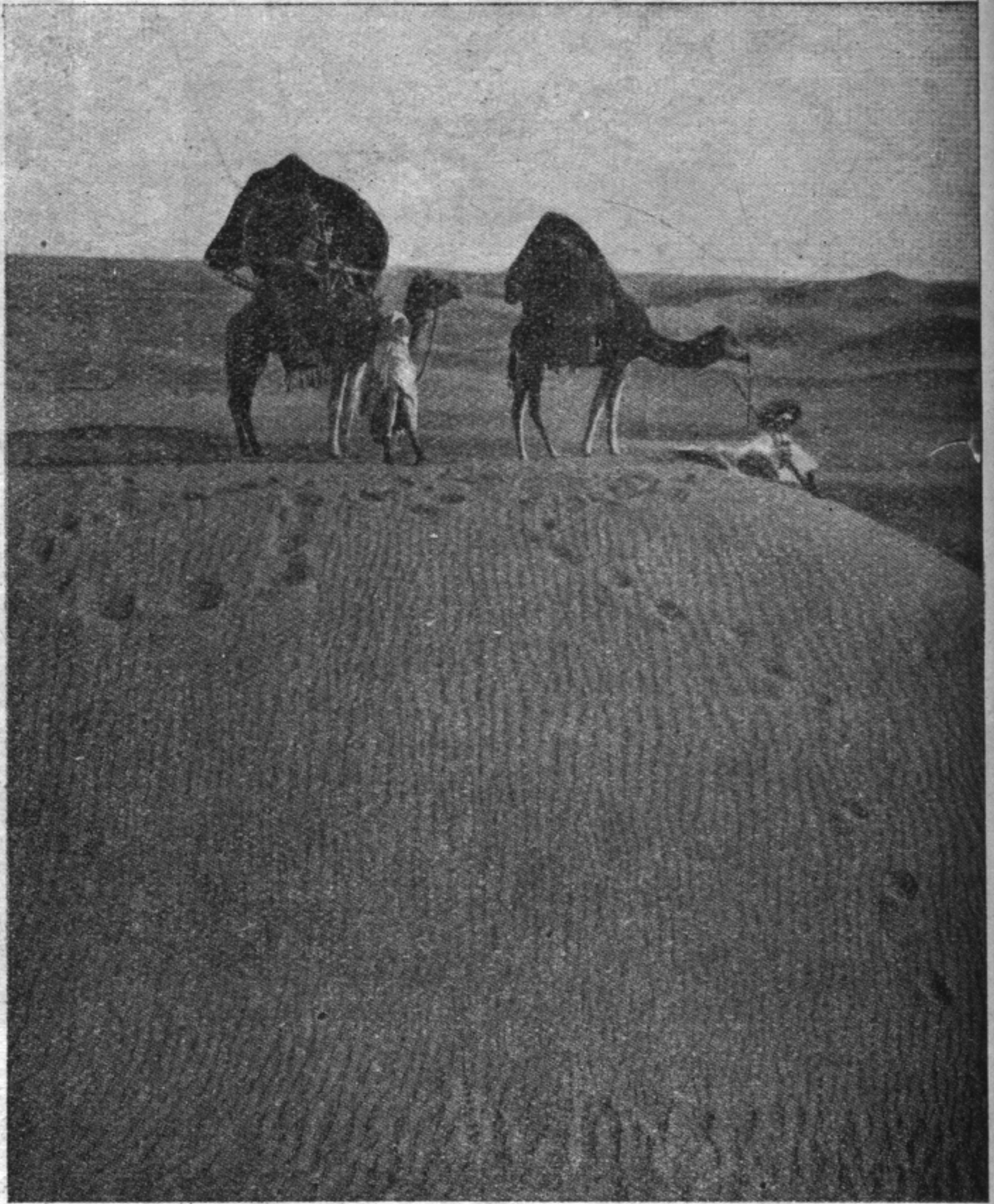
সাহারা-বক্ষ

তালীবনে ঘেরা আরাম-নীড়—জের্বা দ্বীপ

সপ্তম শতাব্দীতে লিবিয়ার মরু পার হইয়া দিগ্বিজয়ী আরবের দল আসিয়া টিউনিসিয়া আলজিরিয়া এবং মরক্কো অধিকার করে।

সাত-তলা বাড়ীর সিঁড়ি

বার্বার-বালিকা—গেবিশ

তখন টিউনিসিয়ান, আলজেরিয়ান, কার্থেজিয়ান, রোমান, ভাণ্ডাল এবং বাইজানতাইন সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে আরব সভ্যতা-সংস্কৃতি বিজড়িত হইয়া ওঠে। আরব বা প্রাচীন সারাশেন্ জাতি আসিয়া কার্থেজ হইতে ত্রিশ মাইল দূরে রহস্যময় কারিওয়ান নগরের প্রতিষ্ঠা করে। এই কারিওয়ানের আবহাওয়ায় টিউনিসিয়ার সৌভাগ্য-সম্পদ্ আবার নূতন রূপে প্রদীপ্ত হয়।

য়ুরোপ যখন মূঢ়তার অন্ধ তিমিরে আচ্ছন্ন, টিউনিসিয়া-আলজেরিয়ায় আরব জাতি তখন জ্বালিল জ্ঞানের শিখা! টিউনিসিয়ার রাজার সভায় কবি-শিল্পীর তখন সমাদর চলিয়াছে, গীতে-বাদ্যে নব নব শিল্পীর গুণের পরিচয় জাগিয়া উঠিতেছে! তার পর গোঁড়া মুসলমানের শাসনে কাব্য-দর্শন-বিজ্ঞান পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; কোরাণ ভিন্ন অপর গ্রন্থের অনুশীলন বন্ধ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আরব সংস্কৃতির স্বর্ণ-যুগেরও অবসান ঘটিল।

তার পর বহু শতাব্দী ধরিয়া সারা উত্তর-আফ্রিকা ব্যাপিয়া বিরোধ-যুদ্ধ-বিগ্রহের আর অন্ত রহিল না! নানা য়ুরোপীয় শক্তির সহিত সংগ্রাম সুরু হইল। তার কারণ শিক্ষা-সংস্কৃতির অভাবে আফ্রিকার সহিত ভূমধ্য-সাগরের কূল-প্রদেশগুলি দস্যু-তস্করের আস্তানায় পরিণত হইয়াছিল। নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়া ফরাশী জাতি শেষে টিউনিসিয়া এবং আলজেরিয়া অধিকার করে। অধিকার করিয়া ফরাশীরা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল না—সারা প্রদেশের উন্নতি-কল্পে মনোযোগ অর্পণ করিল। যথাসাধ্য শান্তি-শৃঙ্খলা-স্থাপনা, রেলওয়ে-লাইন প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা-ব্যবস্থা—সর্ব্ব-দিকে ফরাশী জাতির লক্ষ্য পড়িল। ভূমধ্য-সাগরের তীর হইতে আলজেরিয়া টিউনিসিয়া ভেদ করিয়া সুদূর সুদান পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা নির্ম্মিত হইল। প্রাচীন রোমানের হাতে এক দিন যেমন টিউনিসিয়ার শ্রী ফিরিয়াছিল, ফরাশীর হাতেও তেমনি আবার যেন তাহারই পুনঃ-প্রবর্ত্তন ঘটিল। ফরাশীর হাতে টিউনিসে ও গাফশায় ফশফেটের খনি আবিষ্কৃত হইল। এ যুদ্ধের পূর্ব্বেও এ সব খনিতে হাজার-হাজার আরব শ্রমিক কাজ করিত।

প্রাচীন সহর টিউনিস বিপুল বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। টিউনিসিয়ার আতরের বাজার যেন স্বর্গের নন্দন-কানন! এখানকার

আকাশ-বাতাস সারা-ক্ষণ পুষ্প-গন্ধে আচ্ছন্ন হইয়া আছে! এখানকার কম্‌লা, গোলাপ এবং ভার্বিনার আতর—পৃথিবীতে তার আর তুলনা নাই! আতরওয়ালারা বলে, তারা সম্ভ্রান্ত মুর-বংশজাত—পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাদের পূর্ব্বপুরুষরা স্পেন হইতে বিতাড়িত হইয়া টিউনিসিয়ায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

পূর্ব্বে কাইরওয়ান সহরের প্রসঙ্গে বলিয়াছি,—রহস্যময় নগর। তার কারণ, মুসলমানের কাছে এ নগর পুণ্যময়। কাই-রওয়ানকে অনেকে বলেন "আফ্রিকার মক্কা"। রোমের তৈয়ারী হর্ম্ম্য-মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া আরব জাতি তাহারি পাষাণ-শিলা লইয়া কাইরওয়ান সহর নির্ম্মাণ করে। মার্কিণ লেখক উইলিয়াম্‌স্ লিখিতেছেন, টিউনিসিয়া জলপাইয়ের দেশ। টিউনিসিয়ায় যে জলপাই-য়ের তৈল (olive oil) হয়, সে তৈলে সমস্ত পৃথিবীর অলিভ তৈলের অভাব পরি-পূরণ হইতে পারে।

টিউনিসিয়ার পূর্ব্ব-কোণে সুশে এবং স্ফাক্স—বেশ বড় সহর। এ দু'টি সহরে য়ুরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী। প্রাচীন যুগে এই সুশের নাম ছিল হাড্রুমেতাম। কার্থেজিয়ান্ বীর হানিবল যখন রোম-সম্রাট্ সিপিয়োর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তখন এই হাড্রুমেতাম-ফৌজ ছিল তাঁর প্রধান সহায়।

স্ফাক্সে ফশফেটের বহু খনি আছে। তাছাড়া এ জায়গাটি হইল স্পঞ্জের বিরাট্ আড়ং। এখানে সমুদ্র-জলে অক্টোপাশ মেলে প্রচুর। সুশ এবং স্ফাক্সের মাঝামাঝি প্রাচীন রোমান্ সহরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে—এল জেমের এ্যাম্পি-থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। বহু দূর হইতে এ ধ্বংস-স্তূপ দেখা যায়। এ স্তূপ এক বার দেখিলে তাহার মনোরম বৈচিত্র্য জীবনে ভোলা যায় না।

অষ্টম শতাব্দীতে বার্বার-রাণী কাহেনা টিউনিসিয়া হইতে আরবদের বিতাড়িত করিবার জন্য যে সমরায়োজন করিয়াছিলেন, সে আয়োজনে এল জেমের এই এ্যাম্পি-থিয়েটারকে তিনি করিয়াছিলেন তাঁর প্রধান দুর্গ। এই এ্যাম্পি-থিয়েটারে ষাট্ হাজার দর্শক বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে বসিয়া ক্রীড়া-রঙ্গ দেখিতেন—ইহার আয়তন এমন বিরাট্!

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্রোহী টিউনি-সিয়ানরা এই এ্যাম্পি- থিয়েটারের

ঘোর্ফা গৃহ। উটের পিঠে ফশলের মোট
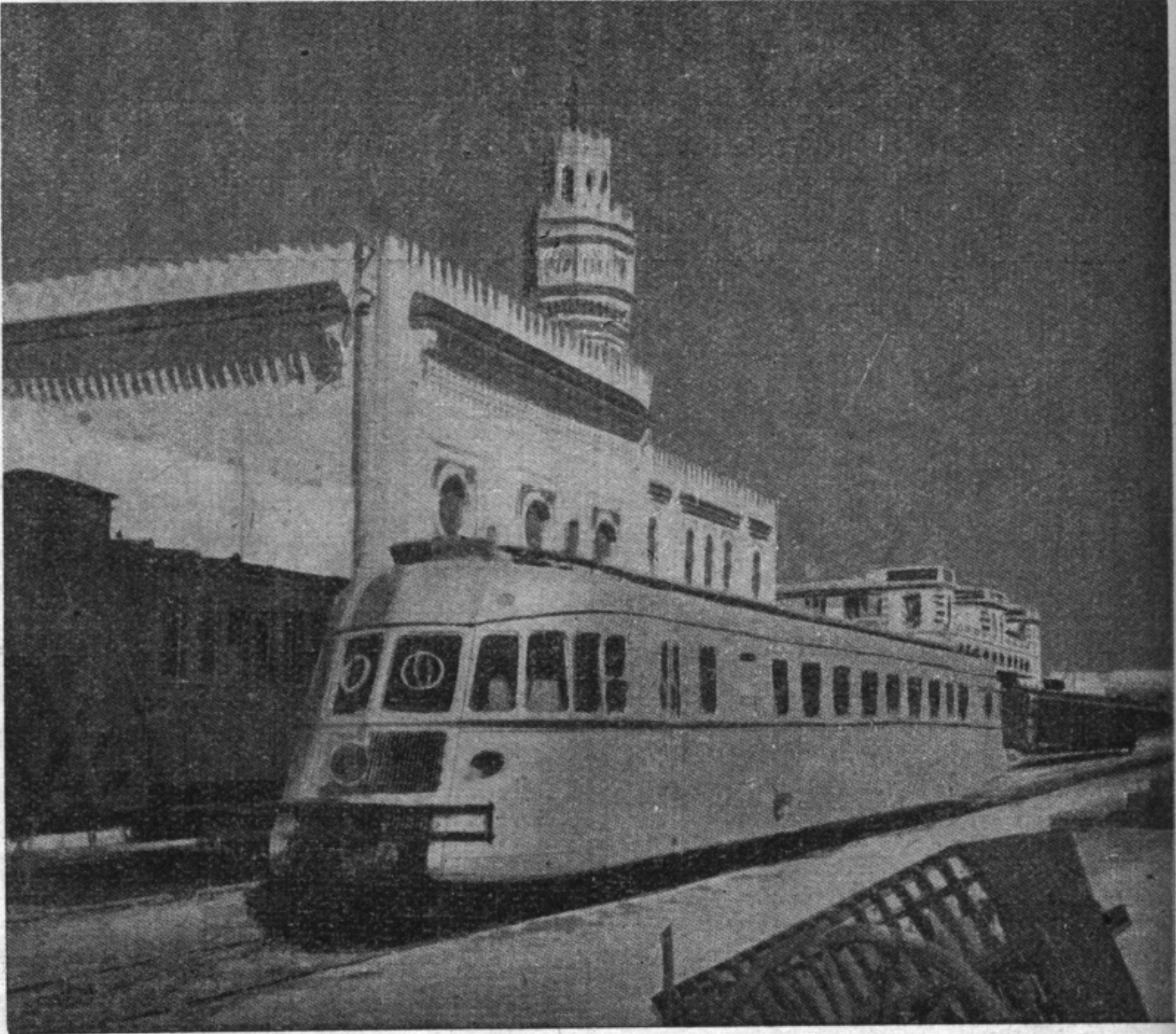
ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ—টিউনিস হইতে বাইজার্ট যাতায়াত করে

ইহুদী স্কুল—গুরুমশায় ও ছাত্রদল
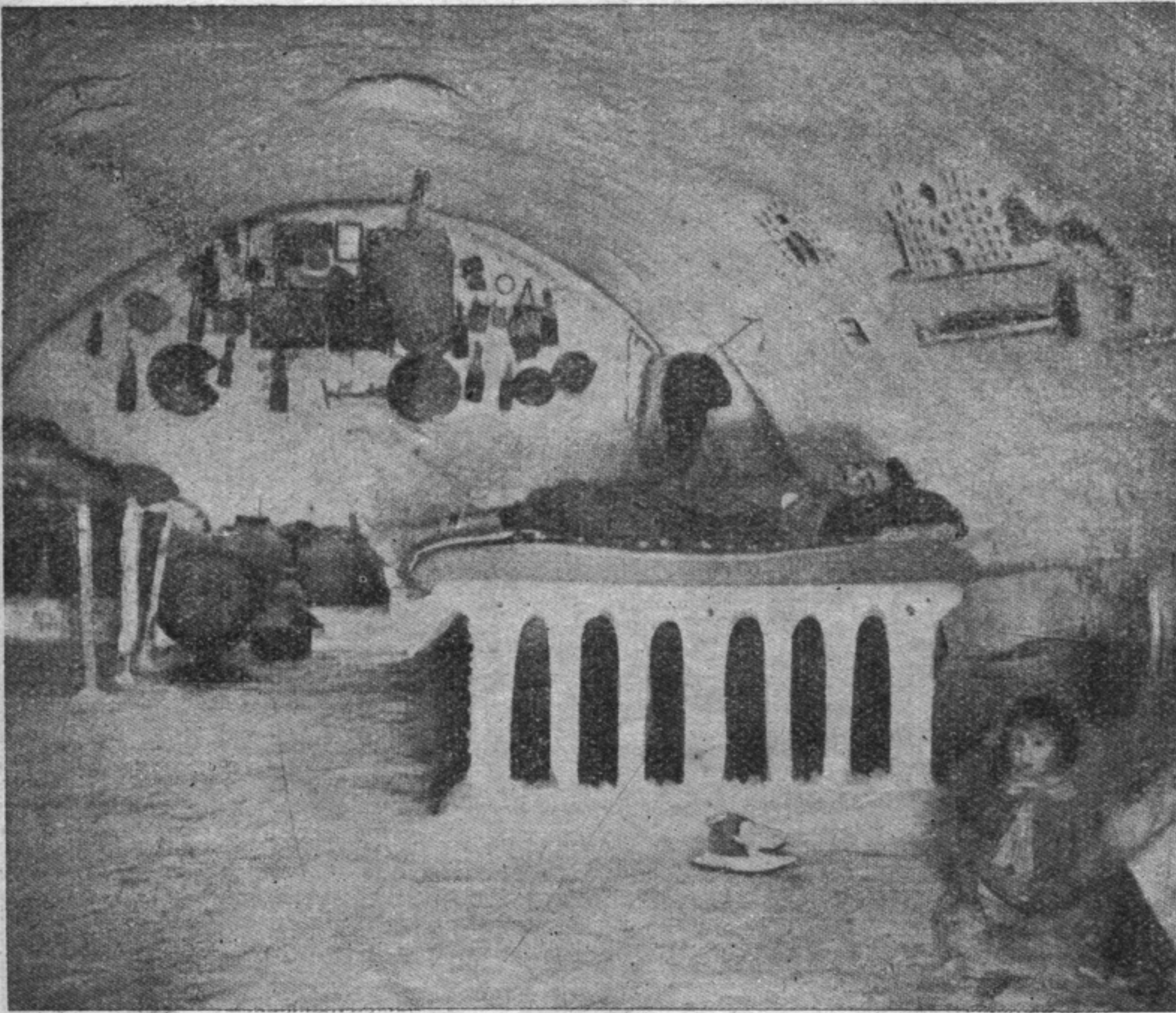
গুহাগৃহ—মাৎমাতা

ধ্বংসরাশির মধ্যে নিরাপদে আত্মগোপন করিয়াছিল!

গেবিশ—তালীবন-কুঞ্জবন মরুদ্যান। এখানে ছোট একটি পাহাড়ে-নদী আছে। এ নদীতে সালঙ্কারা পল্লী-নারীরা সারা-দিন কাপড়-চোপড় কাচে, তাল-কাঠের সালতিতে চড়িয়া নদীর বুকে বিচরণ করে। তাদের পোষাকের বর্ণবৈচিত্র্য মনোজ্ঞ।

লেখক লিখিতেছেন,—এই সব নগর ও গ্রাম দেখিয়া আমরা মরু-দর্শনে চলিলাম! মাৎমাতা পাহাড়ের কোলে ছিল বিস্তীর্ণ মরুভূমি। মাটীর নীচে গুহা রচনা করিয়া সেই সব গুহার মধ্যে লোকে বাস করে। বাসগৃহগুলি পিপীলিকার বিবর নয়, বেশ বুদ্ধিকৌশলে নির্ম্মিত। এ সব গৃহে খাট-বিছানা, তৈজসপত্র, এমন কি, গৃহপালিত ছাগল, উট প্রভৃতি রাখিবার চমৎকার ব্যবস্থা আছে। গৃহগুলির অভ্যন্তরে স্নিগ্ধ শীতল বাতাস আসে; গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য নাই; এবং মশামাছি কীট-পতঙ্গাদির উৎপাত নাই। পাহাড়ের অদূরে ক্ষেত আছে। উর্ব্বর ক্ষেত। সারা-দিন ক্ষেতে কাজ করিয়া মাৎমাতার লোক-জন সন্ধ্যায় গুহাগৃহে আসিয়া আশ্রয় লয়।

মাৎমাতা পাহাড়ের পর তুজেন পার হইয়া আমরা আসিলাম মেতাম্মুর এবং মেদেনাইনে। এখানে পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া সাত-তলা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লোকে সেই গৃহে বাস করে। এ সব গৃহের নাম 'ঘোর্ফা'। উপর-তলায় উঠিবার জন্য সিঁড়ি ভাঙ্গার অভ্যাস না থাকিলে সে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া চলাফেরা করা দারুণ ব্যাপার! এ সব গৃহে টাকাকড়ি ও অলঙ্কার নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা আছে! চোর-ডাকাত আসিয়া লুঠ করিবে, সে উপায় নাই।

আজ সাহারার উপর দিয়া মোটর গাড়ী চলিয়াছে, এরোপ্লেন চলিয়াছে—তবু মামুলি বাহন উট এবং গাধার আদর এতটুকু কমে নাই।

দক্ষিণে গেবিশ উপসাগরের বুকে ছোট দ্বীপ দ্য জের্বা। এ দ্বীপটিকে য়ুরোপীয়ানরা বলে, কমল-বিলাসীর (lotos-eaters') দ্বীপ। এখানে পদ্ম হইতে যে সুরা তৈয়ারী হয়, সে সুরা-পানে না কি মনে দারুণ বিস্মরণীর সঞ্চার হয়! জের্বানরা ব্যবসা-বাণিজ্যকল্পে

সারা জীবন দেশ ছাড়িয়া পয়সা রোজগারের চেষ্টায় বাহিরে কাটায়, তার পর শেষ-বয়সে দেশে ফিরিয়া আসে। দেশে ফিরিয়া তালীবনকুঞ্জে ঘেরা আরাম-নীড় রচনা করে। সে নীড়ে বাস এবং প্রয়োজন মত ইতস্ততঃ বিচরণের জন্য বাহনস্বরূপ রাখে একটি উট। এই ঘর ও একটি উঠ—ইহা ছাড়া জের্বানদের জীবনে অন্য কোনো বড় কামনা নাই।

জের্বায় একটি নর-কপাল-স্তম্ভ আছে—(Tower of skulls)। ষোড়শ শতাব্দীতে মুশলিম, সিশিলিয়ান এবং স্পানিশদের মধ্যে যখন ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল, তখন তোরগাদ বা দ্রাগাৎ নামে এক জন জলদস্যু এমন দুর্দ্ধর্ষ শক্তিমান্ হইয়া ওঠে যে, বারবারেশা তাকে অধীশ্বর বলিয়া মানিয়া লয়। স্পানিশরা এই দ্রাগাৎকে ভীষণ ঘৃণা করিত। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই জের্বায় স্পানিশদের পরাস্ত এবং বহু শত বন্দী খৃষ্টানকে দ্রাগাৎ নিহত করে। তাদের মুণ্ড লইয়া নর-কপাল-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। এই নর-কপাল-স্তম্ভটি প্রায় তিনশো বছর বিদ্যমান ছিল। তার পর ফরাশীরা সেটিকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

জের্বায় কুম্ভকারদের কাজ দেখিবার মত। নরম কাদার তাল লইয়া শুধু হাতের নানা ছাঁদে চকিতে কলসী কুঁজা ফুলদানী প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে তারা সুনিপুণ।

লেখক লিখিতেছেন—সেতু নির্ম্মাণ করিয়া রোমানরা জের্বার সহিত টিউনিসিয়ার সংযোগ সাধন করিয়াছিল।

ওয়েলালা দেখিয়া এনা ক্যস্তারায় ষ্টীমারে চড়িয়া সাগর পার হইয়া আমরা চলিলাম জার্শিসে। জার্শিস হইতে সাহারা-যাত্রার ব্যবস্থা।

কার্থেজ—আধুনিক রূপ

জার্শিস হইতে ফুম তাতাহুইন্ এবং দুই রাৎ পার হইলেই সাহারার প্রবেশ-দ্বার! বিচরণে আর তেমন কষ্ট নাই—বালির বুকে এখন মোটর-ট্রাক চলিয়াছে। আমরা লিবিয়া-সীমান্তে আসিয়া বেন গার্ডেন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

অন্য সময়ে বেন-গার্ডেন সামান্য সহর—চারি-ধারে হাট-বাজার! কিন্তু রণ-দামামা-নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এখন কড়াক্কড় পাহারার বন্দোবস্ত।

বেন গার্ডেন হইতে বালুবক্ষ ভেদ করিয়া আমরা গেবিশে ফিরিলাম। তার পর কেবিলি, ছোট জেরিদ, তোজুর ও নেফতা মরুদ্যান। কেবিলির গায়ে বিশাল হ্রদ জেবেল তেবাগা—লবণাক্ত ভারী জলে পরিপূর্ণ। এই হ্রদটি যেন ডেড-শীর যমজ-ভাই! এখানে পাহাড় এবং মালভূমি—সর্ব্বত্র প্রচুর ফশ্‌ফেট্ আছে! সে জন্য বাতাস সব সময়ে ভীষণ তপ্ত!

তোজুর মরুদ্যানটি দৃশ্য-বৈচিত্র্যে পরম রমণীয়। চারি-দিকে তাল-বন, মাঝখানে গিরি-নির্ঝর। এ অঞ্চলে বৃষ্টি কি, তাহা সকলের
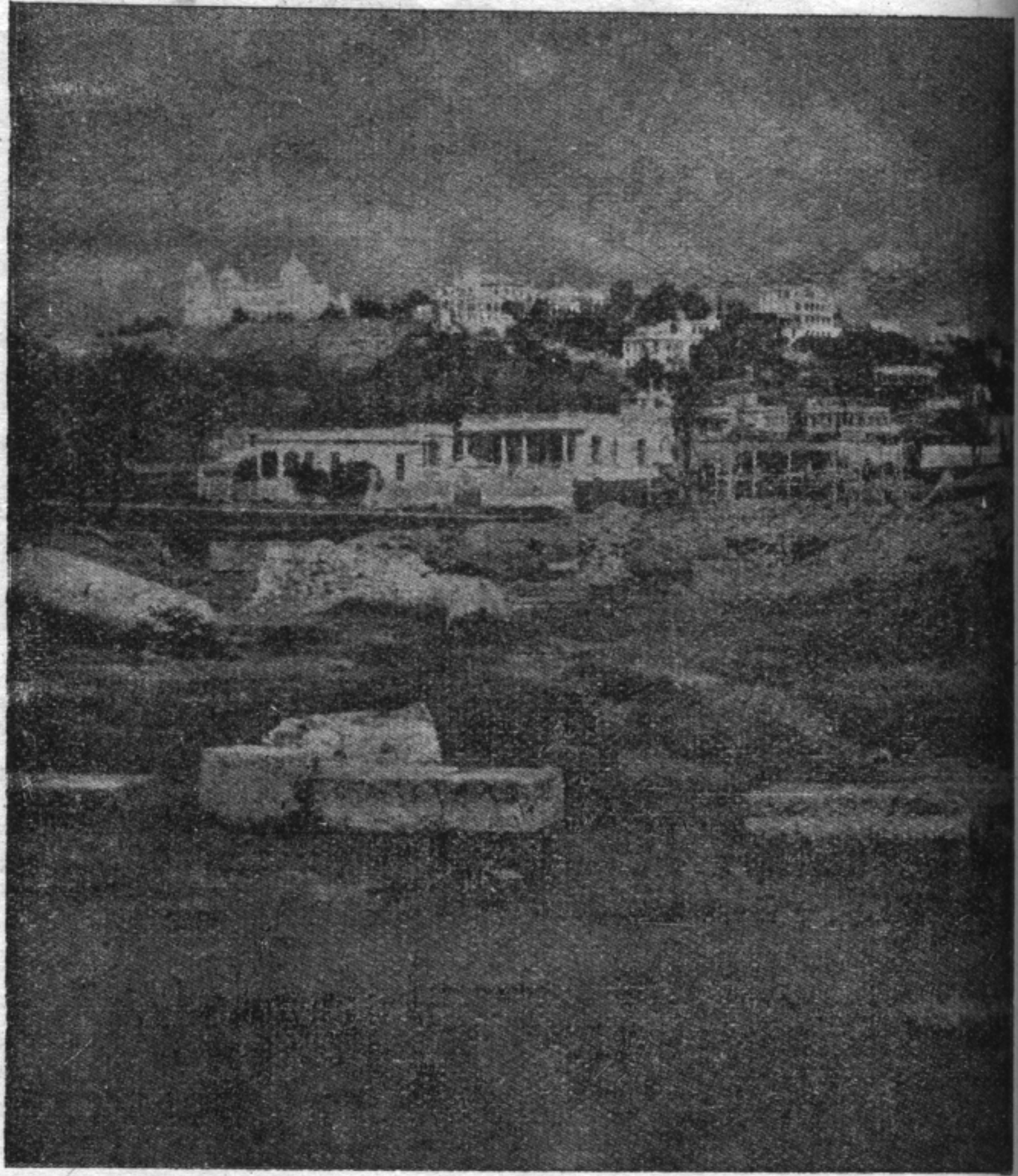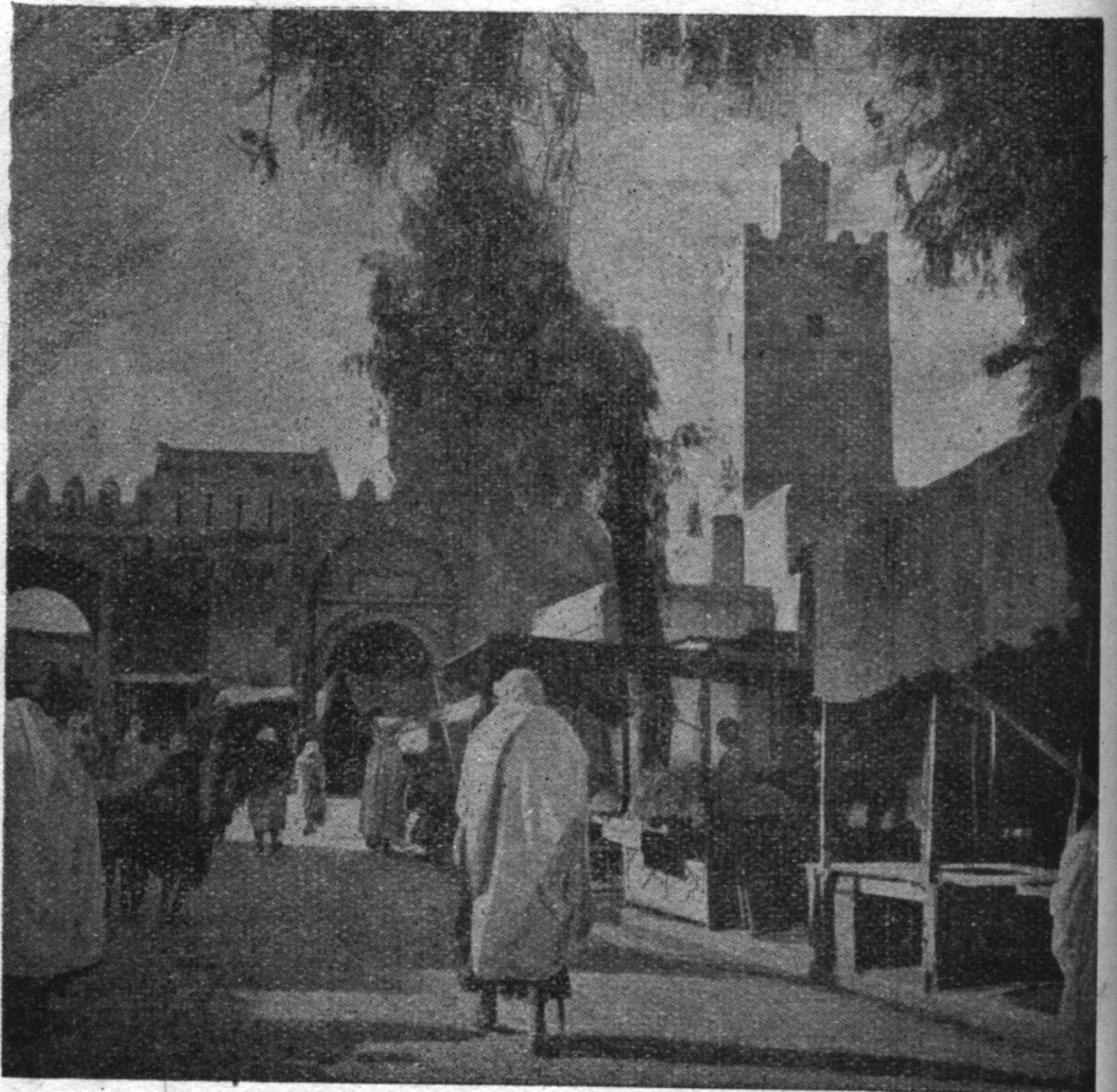
কাইরওয়ানের বাজার
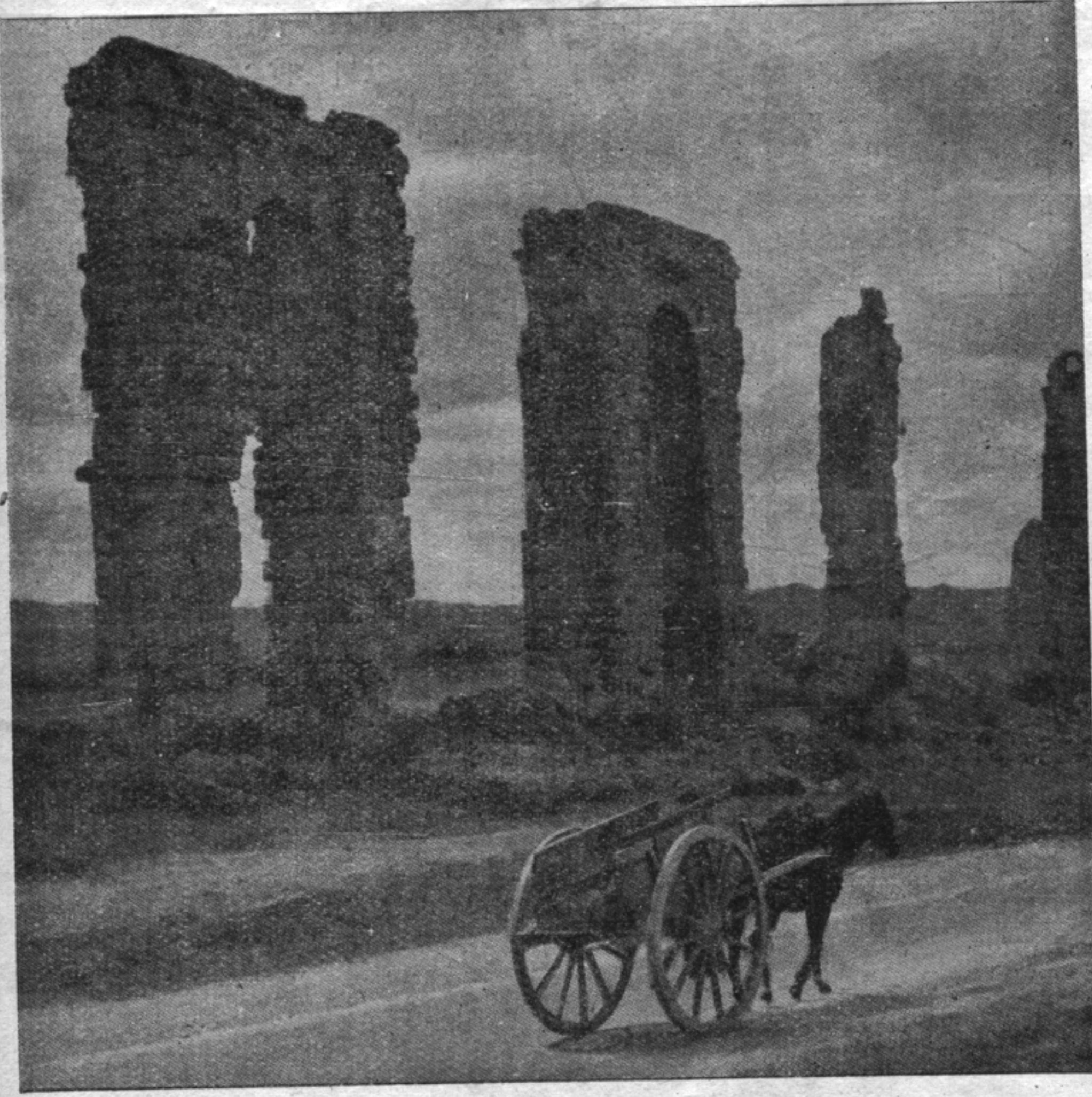
হাড্রিয়ানের আমলের কূপ
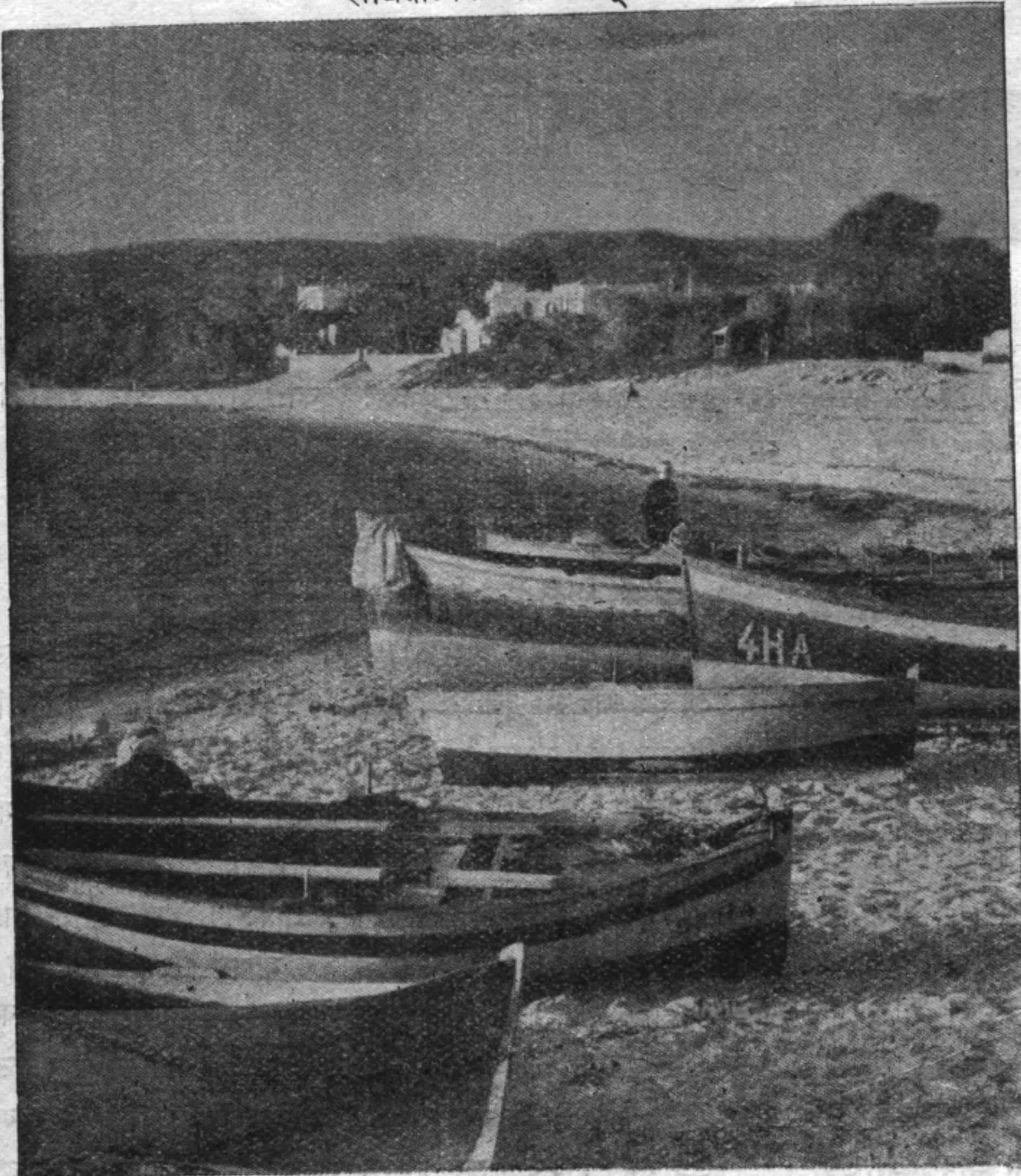
ভূমধ্য-সাগর কূলে

অবিদিত। নির্ঝরে অবিরাম জল ঝরিতেছে। সেই জল নিজ-গতিচ্ছন্দে বহিয়া চলিয়াছে। এখানকার অধিবাসীদের অধিকার নাই, নির্ঝরের স্বাভাবিক গতিবেগ ঘুরাইয়া দিয়া নিজেদের সুখ-সুবিধা করিয়া লইতে। তাছাড়া কাহারো জমিতে যদি জলাশয় বা নালা থাকে, সে জলাশয় বা নালা হইতে মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে অপরে জল লইতে পারে না। লইলে জল-চুরির দায়ে তাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়।

জমি কেনা-বেচার ব্যাপারেও এখানে বেশ বৈচিত্র্য আছে। কাহারো জমিতে জলাশয় আছে—জলাশয়ের স্বত্ব নিজে রাখিয়া শুধু জমিটুকু যেমন সে বেচিতে পারে, তেমনি আবার জমি রাখিয়া জলাশয়ের জল-স্বত্ব বেচিবার অধিকারও তার আছে। বেওয়ারিশ জল-ভাগের মালিক গভর্ণমেণ্ট। তাছাড়া সেখানে গাছের উপর ট্যাক্স-আদায়ের ব্যবস্থা আছে!

তোজুরের মরূদ্যানে যে নির্ঝর, তাহাতে প্রতি সেকণ্ডে ২৫০০ গ্যালন পরিমিত জল জমিতেছে। এ জলাশয়ে জল আসিতেছে ১৯৪টি মোহনা দিয়া। এখানে তাল গাছের সংখ্যা প্রায় দু' লক্ষ।

নেফতা ও তোজুর হইতে জল লইয়া গাধার পিঠে সে-জলের পশরা তুলিয়া জলওয়ালারা সেই জল সুদূর গ্রামে-নগরে বেচিয়া বেড়ায়।

লেখক বলিতেছেন,—নেফতা ও তোজুর হইতে আমরা চলিলাম গাফশা ও শ্বেইটলার অভিমুখে। সেনাজার এবং মেৎলাউইর পাশ দিয়া পথ। এই মেৎলাউইয়ে ফিলিপ টমাশ নামে ফৌজ-বিভাগের পশু-চিকিৎসক ফশ-ফেটের বিপুল খনি আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। সে খনি হইতে বছরে আজ বিশ লক্ষ টন ফশফেট মিলিতেছে।

শ্বেইটলারে রোমান-আমলের বিজয়-তোর-ণের ধ্বংসস্তূপ আজও বিরাজমান দেখিলাম। তোরণের পরে পাশাপাশি তিনটি মন্দির—ভেনাসের মন্দির।

লেখক লিখিতেছেন,—এদিক্‌কার পাড়ি শেষ করিয়া উত্তরাভিমুখে দুগগা। দুগগা রোমান-সমৃদ্ধির অতীত স্বপ্নের মতো পড়িয়া আছে! বড় বড় শিলাস্তূপ—তার আর কোনো সীমা-পরিসীমা নাই। এখানকার প্রত্যেকটি শিলাখণ্ডে রোমান শৌর্য্য-বীর্য্যের শত স্মৃতি

কাহিনী বিজড়িত আছে। দুগগার ঈষৎ পূর্ব্বে মাজাশ। রোমান সম্রাট্ অগষ্টাস্ এ নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে জুপিটারের বিরাট্ বিগ্রহ-মূর্ত্তি-সম্বলিত মন্দির ছিল। মূর্ত্তিটি এখন বার্দ্দোয় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটুকু পড়িয়া আছে। এ ধ্বংসাবশেষও মৃত্তিকা-সমাধি লাভ করিয়াছিল। বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবসানে জার্ম্মাণ বন্দীদের দিয়া মৃত্তিকাগর্ভ হইতে ফরাশী বৈজ্ঞানিকেরা সে ধ্বংসাবলীর পুনরুদ্ধার করিয়াছেন।

লেখক লিখিতেছেন,—টিউনিসিয়ার আকাশে-বাতাসে যেন রোমান্সের মাদকতা লক্ষ্য করিয়াছি! এই জলপাই আর আঙ্গুর আর তাল-বনের দেশ—আজো কি বিপুল মায়া-বিভ্রমে ভরিয়া আছে, টিউনিসিয়ায় যিনি পদার্পণ না করিয়াছেন, তাঁকে তাহা বুঝানো সম্ভব নয়।

পথ চলিতে কখনো দেখিয়াছি উটের পর উটের সার চলিয়াছে—তাদের পিঠে কত রকমের যাত্রী! যাযাবর বেদুইন নর-নারীর ভিড়—কার্থেজে মরু-যাত্রীর দল, কাইরওয়ানে পুণ্যকামী তীর্থ-যাত্রী, দুর্গে ফরাশী বাহিনী! যে মরুভূমির নাম শুনিলে আমাদের কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়, প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে, সেই মরুবক্ষে দেখিয়াছি মানুষের আরাম-নীড়! সে সব নীড়ে আনন্দ-কলরবের বিরাম নাই! তেমনি আবার দেখিয়াছি সহজ জীবন-যাত্রার পাশে বার্বার দস্যু-তস্করের নৃশংস হিংসাবৃত্তি! ভূমধ্য-সাগরের তীরে য়ুরোপের ও-পারে—এত যুগের এত জাতির সংস্পর্শ সত্ত্বেও টিউনিসিয়ায় নানা জাতির জীবন-ধারা এত কাল ধরিয়া এখনো অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গিয়াছে! মুসলমানের কঠিন অবরোধ-প্রথা, তার পাশে ইহুদী ও য়ুরোপীয়ান জাতির অবাধ মুক্ত স্বাধীনতা—এ দু'য়ে আজো সংঘর্ষ বাধিল না! স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আজো সেই চিরপুরাতনের জের চলিয়াছে! দীর্ঘকাল টিউনিসিয়া-বিচরণে মনে যে শান্তি, নয়নে যে তৃপ্তি পাইয়াছি, সারা আমেরিকা-পর্য্যটনে তার একাংশ পাই নাই, এ কথা অকপটে স্বীকার করিব।
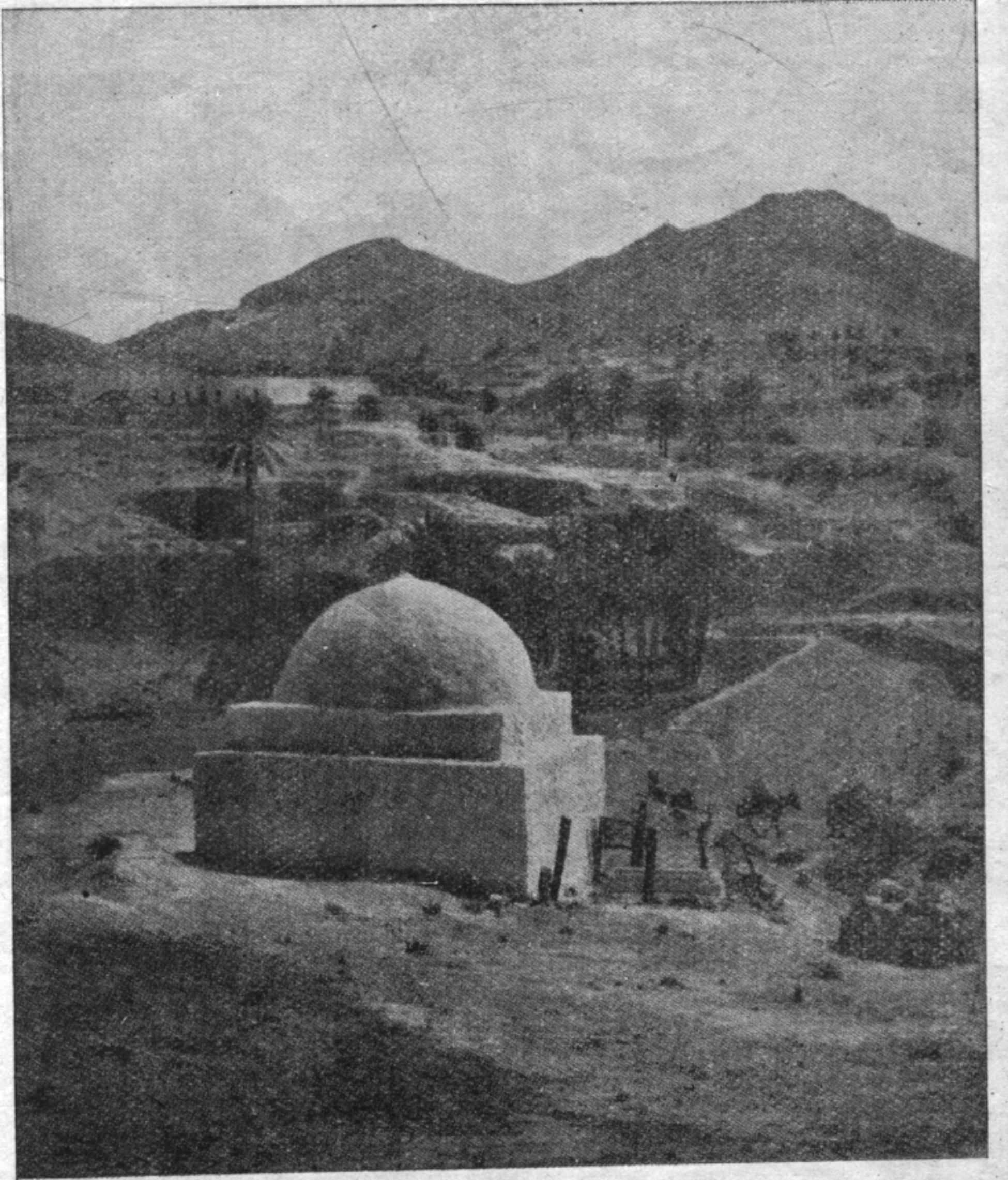
মাৎমাতা—বিদেশী পুরুষদের ও-দিকে যাইবার উপায় নাই—জেনানার গণ্ডী!

ইতিহাসের অনুসরণ

মিহিরকুল ও বালাদিত্য

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হূণ নামক একটি অসভ্য জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চল আক্রমণ করিয়াছিল এবং কিছু দিনের জন্য গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই হূণ জাতি মোঙ্গলগোষ্ঠীয়। মধ্য-এশিয়ার কশ্যপ হ্রদের তীরে ছিল ইহাদের বাস। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই জাতি মধ্য-এশিয়া হইতে য়ুরোপ আক্রমণ করিয়াছিল। এই জাতির জনৈক আট্টিলা সমস্ত রোম সাম্রাজ্য, জার্ম্মাণ দেশ এবং গণদেশে অশান্তির সঞ্চার করিয়াছিল। ইহারা যেমন দস্যু তেমনি নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী ছিল। য়ুরোপীয়েরা এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ঐ হূণ জাতির একটি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া গুপ্তরাজ্য কতকটা বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। যাহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা শ্বেতবর্ণ হূণ বলিয়া য়ুরোপীয়দিগের অনুমান। স্কন্দগুপ্ত ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দলবল লইয়া তাহার কিছু দিন পরেই ইহারা পুনর্ব্বার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তোরমান এই দলের নায়ক ছিল। এই হূণ দলপতি তোরমানের পুত্র মিহিরকুল পঞ্চনদ প্রদেশের শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন এবং সমুদয় পঞ্চনদ প্রদেশ ও মালয় দেশের কিয়দংশ দখল করিয়া হিন্দুদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। অতিরিক্ত অত্যাচারে সহিষ্ণু হিন্দুদিগেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারা মিহিরকুল বা মিহিরগুলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে।

এই সময় মালবরাজ্যে দশপুর বা মান্দাশোয় জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্ম এবং মগধে গুপ্তবংশীয় বালাদিত্য নামক দুই জন রাজা অনেকটা প্রবল

হইয়া উঠিয়াছিলেন। খান্দাশোর লিপিতে লিখিত আছে যে, জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মদেব হিমালয় হইতে পূর্ব্বঘাট পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন। অনেকেই এই জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মকে সংবৎ প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য ভাবিয়া ভুল করেন। সে কথা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব। ঐ দার্যদ অনুশাসনে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, এই রাজা যশোধর্ম্মার গমন-পথে বহু রাজাই নানারূপ নজর দিতেন; এমন কি, তাঁহার হস্তদ্বয় সজোরে মিহির মস্তক অবনমিত করাতে মিহিরকুলের ললাটে বেদনা জন্মে, ইত্যাদি। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, মিহিরকুল সম্মুখ সংগ্রামে জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিলেন (১)। এই দার্যদ লিপিটি মিহিরকুলের সমকালীন; সুতরাং ইহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মা হূণরাজ মিহিরকুলকে নিজ বাহুবলে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইহা এই সমসাময়িক অনুশাসন হইতে জানা যায়।

কিন্তু কেবলমাত্র মালবের অধিপতি যশোধর্ম্মদেবের বাহুবলেই কি সেই অতি দুর্দ্দান্ত হূণরাজ মিহিরকুল পরাজিত এবং ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন? যে সময়ে হূণরাজ পরাভূত হন, সে সময় মালব রাজ্য বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ কোন নিশ্চিত প্রমাণ ভারতীয় ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় না। কেবল কতকগুলি আধুনিক য়ুরোপীয় এবং তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী এদেশীয় ঐতিহাসিক বলেন যে, এই জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মাই বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সংবৎ অব্দের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন! অথচ ইনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ের সহিত সংবতের গণিত-সময় মিলে না। জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মা যে কস্মিন্ কালেও 'বিক্রমাদিত্য' এই অভিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রমাণই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অথচ তিনি একটি জাল অব্দ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা য়ুরোপীয়ানরা প্রথমে বলেন, পরে ভারতীয় ঐতিহাসিক যশঃকামীরা গতানুগতিক ভাবে তাঁহাদের মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

সুতরাং সহজ-বুদ্ধিতে বুঝা যায় যে, যশোধর্ম্মদেবের বাহুবলেই কেবল দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ হূণ রাজা মিহিরকুল পরাজিত হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন—এ কথায় স্বতঃই মনে কেমন একটা সংশয় আসে। হূণেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত জাতি ছিল। তাহাদের প্রতাপে সরযূতীর হইতে য়ুরোপ জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল! তোরমান সেই হূণ জাতির শ্বেত শাখার সর্দার বা দলপতি। সুতরাং তাঁহার বাহুবল ও সৈন্যবল যে প্রবল ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই তোরমানের পুত্র মিহিরকুলকে এক জন সদ্য-উত্থিত মালয়-নৃপতি আচম্বিতে এমন ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, তিনি একেবারে ভারতের বাহিরে নির্ব্বাসিত হন্—ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অথচ বহু নৃপতি সম্মিলিত হইলে তাহার সম্ভাবনা বিচিত্র নয়। কিন্তু সেরূপ সম্মিলনের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মিহিরকুলের ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসনের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আরও কোন কথা অপ্রকাশিত আছে,—অথবা বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! খান্দাশোরের একমাত্র শিলালিপি দেখিয়াই এই বিষয়ে হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। ঐ শিলা-লিপি হইতে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, যশোধর্ম্মদেব সম্মুখ সংগ্রামে অপরাজেয় মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে পরাজয়ের গভীরতা কতখানি ছিল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। সুতরাং এ সম্বন্ধে অন্য কোন কাহিনী বা কিম্বদন্তী, গল্প বা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে কি না, এবং তাহাদের উপর কতখানি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহাও সন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সকলেই কিছু তাম্রশাসন বা শিলালিপি রাখিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। অনেক তাম্র-শাসন বা শৈলশাসন, হয়ত এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিম্বা অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া আছে কি না তাহা বলাও কঠিন। হয়ত কোন শুভ মুহূর্ত্তে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। তখন আবার সমস্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঢালিয়া সাজিতে হইবে। সেই জন্য এই সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

আজ কয়েক বৎসর হইল, এ বিষয়ে একটি প্রাচীন জনশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে। পাষাণ বা তাম্রশাসনের ন্যায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে সত্য,—কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অবহেলা করা যায় না। যে সময় মিহিরকুল ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায় শতাধিক বৎসর পরে (৬২৯—৪৫ খৃঃ) হুয়েন্থসাং নামধেয় জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ১৫ বৎসর কাল ভারতে ছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তিনি অনেক বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে মিহিরকুলের পরাজয় এবং ভারত হইতে নির্ব্বাসন-কাহিনী অতি বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এখন অনেক ইংরেজ এবং জার্ম্মাণ ঐতিহাসিকই ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বতন সিদ্ধান্তের আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছেন। বৃত্তান্তটি সুন্দর। সুতরাং এখানে তাহা বিস্তৃত ভাবে বলা যাইতে পারে। অধ্যাপক এইচ, হেরাস্ ইহার যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বৃত্তান্ত লিখিত হইল:—

মগধের মহারাজ বালাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়মাবলী অতীব ভক্তি-সহকারে পালন করিতেন এবং তাঁহার প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। যখন তিনি মিহিরকুলের অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশগুলি সুদৃঢ় করতঃ মিহিরকুলকে কর দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার এই ঔদ্ধত্য দমন করিবার জন্য মিহিরকুল সেনাবল বৃদ্ধি করিলেন। বালাদিত্য মিহিরকুলের প্রতাপ এবং প্রভাব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার মন্ত্রীদিগকে কহিলেন—আমি শুনিতে পাইতেছি যে, ঐ তস্করের দল আসিতেছে। আমি উহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে সমর্থ হইব না। আমার মন্ত্রিগণের অনুমতি লইয়া আমি জলায় এবং জঙ্গলে আমার জীর্ণ দেহকে লুকাইয়া রাখিব। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পর্ব্বতে এবং মরুস্থলীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজা ছিলেন বলিয়া তাঁহার বহু প্রজা তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল। তাহারাও সংখ্যায় বহু লক্ষ হইবে। তাহারা সাগরস্থ দ্বীপ-বক্ষে আত্মগোপন করিয়া থাকিল।

(১) Fleet. Gupta Inscription.

এ দিকে রাজা মিহিরকুল তাঁহার সৈন্যদিগকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া স্বয়ং বালাদিত্যকে শাস্তি দিবার জন্য নৌকারোহণে সাগরস্থ দ্বীপের দিকে যাত্রা করিলেন। রাজা বালাদিত্য সঙ্কীর্ণ গমনপথগুলি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার লঘু অস্ত্রধারী বাহির হইয়া মিহিরকুলকে সংগ্রামে লিপ্ত হইবার জন্য উত্ত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মিহিরকুল একটু অগ্রসর হইলেই বালাদিত্যের কাঞ্চনময় রণ-ঢক্কা বাজিয়া উঠিল; আর দেখিতে দেখিতে চারি দিক্ হইতে অগণিত সৈন্য যেন যাদুমন্ত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। মিহিরকুল এই আচম্বিত আক্রমণে পরাজিত হইয়া শত্রুসৈন্যহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে অক্ষত শরীরে বালাদিত্যের দরবারে উপস্থিত করিয়া দিল।

সংগ্রামে পরাজিত মিহিরকুল লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার পরিচ্ছদ দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বালাদিত্যের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বালাদিত্য মন্ত্রিমণ্ডল-পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার এক জন মন্ত্রীকে বলিলেন যে, তিনি মিহিরকুলের সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তিনি তাঁহার মুখাবরণ উন্মোচন করুন। এই কথা শুনিয়া মিহিরকুল উত্তর করিলেন—"পূর্ব্বে যিনি রাজা ছিলেন, তিনি এখন প্রজা ও বন্দী হইয়াছেন; আর যিনি প্রজা ছিলেন, তিনি এখন রাজা হইয়াছেন। শত্রুরা পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কোন ফল হইবে না। আর কথাবার্ত্তা কহিবার সময় আমার মুখ দেখিয়াই বা কি লাভ হইবে?"

এই উত্তর শ্রবণ করিয়া বালাদিত্য রাজা তিন বার তাঁহার আদেশ মিহিরকুলকে বলিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন বালাদিত্য মিহিরকুলের পাপের কথা ঘোষণা করিয়া দিবার আদেশ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—"ধর্ম্মক্ষেত্রে ত্রিবিধ পুণ্যের লক্ষ্য জনসাধারণের আশীর্ব্বাদ লাভ করা, কিন্তু তুমি অরণ্যচর পশুর ন্যায় উহা বিপর্য্যস্ত এবং বিনষ্ট করিয়াছ। তোমার পুণ্যের ক্ষয় হইয়াছে। তুমি এখন পুণ্য দ্বারা অরক্ষিত হইয়াই আমার বন্দী। তোমার পাপের মার্জ্জনা নাই। অতএব বধদণ্ডই তোমার শাস্তি।"

বালাদিত্য রাজার জননী ছিলেন বিখ্যাত বিদুষী। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল এবং তিনি কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি শুনিলেন যে, মিহিরকুলের প্রাণদণ্ড হইবে। তখন তিনি বালাদিত্য রাজাকে কহিলেন—"আমি শুনিয়াছি যে, মিহিরকুল অত্যন্ত সুদর্শন। তাহার জ্ঞানের গভীরতা অত্যন্ত অধিক। আমি একটি বার তাহাকে দেখিতে চাহি।" এই কথা শুনিয়া বালাদিত্য মিহিরকুলকে রাজপ্রাসাদে তাঁহার মাতার সম্মুখে আনিবার আদেশ দিলেন।

বালাদিত্যের জননী তখন মিহিরকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মিহিরকুল! লজ্জা করিও না। সকল পার্থিব জিনিষই নশ্বর। অবস্থা-ভেদে জয় এবং পরাজয় ঘটে। আমি তোমাকে আমার পুত্র এবং আমি তোমার মা বলিয়াই মনে করি। তোমার মুখাবরণ খুলিয়া ফেল এবং আমার সহিত কথা কও।"

মিহিরকুল উত্তর করিলেন—"কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমি বিজয়ী রাজ্যের রাজা ছিলাম। এখন আমি বধদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী। আমি আমার রাজ্য-সম্পদ্ সমস্তই হারাইয়াছি, আমি এখন আমার ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারি না। এখন আমার পূর্ব্বপুরুষের এবং প্রজাদিগের নিকট মুখ দেখাইবার উপায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি সকলের নিকট লজ্জায় অধোবদন হইয়া আছি। আমি আমার উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি না। সেই জন্য আমি আমার আলখাল্লার দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছি।"

এই কথার উত্তরে রাজমাতা কহিলেন—"সময়-অনুসারে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য ঘটে। সুখ, দুঃখ, লাভ এবং ক্ষতি পর্য্যায়ক্রমে আইসে। যদি তুমি ঘটনার চাপে ভাঙ্গিয়া পড়, তাহা হইলে তুমি প্রনষ্ট হইবে, কিন্তু যদি তুমি অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পার, তাহা হইলে তুমি আবার উন্নতি করিতে পারিবে। আমার কথা শুন। ভাগ্যের উপর কর্ম্মফল নির্ভর করে। তোমার মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া আমার সহিত কথা বল। হয়ত আমি তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারি।"

মিহিরকুল রাজমাতাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন—"আমি আমার পিতৃপুরুষের নিকট হইতে একটি রাজ্য লাভ করিয়াছিলাম সত্য,—কিন্তু আমার রাজ্যলাভের উপযুক্ত গুণ না থাকাতে আমি লোককে শাস্তি দিবার সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করাতে আমার রাজ্য হারাইয়াছি। যদিও আমি এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী, তথাপি এক দিনের জন্য আমি জীবন পাইলেও সন্তুষ্ট হই। আপনি আমাকে যে নির্ব্বিঘ্নতায় আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি মুখের আবরণ খুলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

এই বলিয়া মিহিরকুল তাহার আলখাল্লা দ্বারা আচ্ছাদিত মুখের আবরণ মোচন করিয়া রাজ-জননীকে তাঁহার মুখ দেখাইলেন। তদ্দর্শনে রাজমাতা কহিলেন—"তাঁহার পুত্র দেখিতে সুদর্শন বটে। তাহার কাল পূর্ণ হইলে সে মরিবে।" তৎপরে তিনি বালাদিত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"পূর্ব্বজগণের নির্দ্ধারিত বিধি-অনুসারে পাপীকে মার্জ্জনা করা উচিত এবং জীবন রক্ষা করিবার জন্য প্রীতি থ কা আবশ্যক। সত্য বটে, মিহিরকুল অনেক পাপ সঞ্চয় করিয়াছে, তথাপি তাহার পুণ্য ক্ষয় পায় নাই। তাহার পুণ্যের কিছু অবশেষ এখনও আছে। তুমি যদি এই লোকটিকে হত্যা কর, তাহা হইলে ইহার বিবর্ণ মুখমণ্ডল তোমার মানস-নয়নের সম্মুখে সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়াইবে। উহার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, সে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হইবে। উত্তর-অঞ্চলে তাহাকে কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর করা হউক।"

মাতৃভক্ত বালাদিত্য রাজা মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিলেন না। সেই রাজ্যহীন রাজার প্রতি তাঁহার অনুকম্পার উদয় হইল। তিনি মিহিরকুলের সহিত এক কুমারীর বিবাহ দিলেন এবং তাহার সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতে থাকিলেন। তাহার পর তিনি যে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই সম্মিলিত করিয়া এবং মিহিরকুলকে কিছু রক্ষি-সৈন্য দিয়া সেই দ্বীপ হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মিহিরকুলের ভ্রাতা নিজ রাজ্যে গিয়া রহিলেন। মিহিরকুল কিছু দিন দ্বীপে এবং মরুমণ্ডলীতে গোপনে থাকিয়া উত্তর-অঞ্চলে গমন এবং কাশ্মীর রাজ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন (২)।

---

(২) Beal—Records of the Ancient World vol I. pages 163—171.

ইহাই হইল হুয়েন্থ সাং (মা ড'য়ান চোয়াং) প্রদত্ত মিহিরকুলের পরাজয়ের বিবরণ। এই ব্যাপার লইয়া বিলক্ষণ বাদ-বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। যশোধর্ম্মদেবের দার্যদ-লিপি মিহিরকুলের জীবদ্দশায় উৎকীর্ণ। হুয়েন্থ সাংএর বিবরণ মিহিরকুলের পরাজয়ের শতাধিক বর্ষ পরে লিখিত। সেই জন্য এক শ্রেণীর লোক মনে করেন যে, খন্দশোরের শিলালিপির কথাই সমধিক গ্রাহ্য। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, হুয়েন্থ সাং পঞ্চদশ বর্ষ কাল ভারতের নানা স্থানে থাকিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যখন বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে, তখন এই কাহিনীটি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। বিশেষ শতবর্ষ এত দীর্ঘ কাল নহে—যাহার মধ্যে অতি আজগুবি অনেক গল্প রচিত এবং প্রচারিত হইতে পারে। এই বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গিয়াছেন, —তিনি বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রয়াগে মহারাজ হর্ষের পঞ্চবার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি একবার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ একেবারে হুবহু মিথ্যা ও ভিত্তিশূন্য হইবে ইহা মনে করা ভুল। অধুনাতন ঐতিহাসিকরা হুয়েন্থ সাংএর বিবরণ একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। হোর্ণেল এবং মোদি চীন পরিব্রাজকের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও হুয়েন্থ সাংএর প্রদত্ত বিবরণ অগ্রাহ্য করা যায় না। ফ্লিট (Fleet) প্রভৃতি বলেন যে, উভয় বৃত্তান্তই ঠিক। মিহিরকুল পূর্ব্ব দিকে বালাদিত্য রাজা কর্ত্তৃক এবং পশ্চিম দিকে মালবরাজ যশোধর্ম্মদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাভূত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, মিহিরকুলের শেষ পরাজয় ঘটে মালব রাজ্যের অধিপতির হস্তে। এ কথা কোন মতেই আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দশপুর বা খন্দশোর (খন্দসর) শিলালিপিতে মিহিরকুলের পরাজয়-বার্ত্তা লিখিত আছে, —কিন্তু তাঁহার ভারত ত্যাগ করিয়া গমনের কথা,—অথবা রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কথা কিছুই নাই। তিনি মালয়রাজ জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিলেন ; কেবল ইহাই লিখিত আছে। তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সুদূর কাশ্মীরে ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও দশপুরের দার্যদ-লিপিতে নাই। সুতরাং উহা বালাদিত্যের হস্তে মিহিরকুলের পরাজয়ের একটা ঘটনা মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য—এই বালাদিত্য রাজা কে ছিলেন ? ইঁহার অস্তিত্বের কি প্রমাণ এ পর্য্যন্ত মিলিয়াছে ? আধুনিক ঐতিহাসিকরা অনেক তথ্য দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইনি মগধের গুপ্তবংশীয় রাজা নরসিংহ গুপ্ত। ইঁহার উপাধি ছিল বালাদিত্য। ইনি পুরগুপ্তের পুত্র। ইঁহার জননীর নাম ছিল শ্রীবৎসা দেবী। এই শ্রীবৎসা দেবী বিশেষ বিদুষী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে নিপুণা ছিলেন। বালাদিত্য নাম নহে—উপাধি মাত্র। এলান-প্রমুখ ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যই হুয়েন্থ সাং-কথিত বালাদিত্য রাজা। ইঁহার পিতার উপাধি ছিল প্রকাশাদিত্য (৩)। সুতরাং বালাদিত্য নামধেয় কোন রাজা ছিল না বলিয়া যাঁহারা হুয়েন্থ সাংএর বিবরণ অগ্রাহ্য করিতে চাহেন,—তাঁহারা ভ্রান্ত। মিহিরকুলের শেষ পরাজয় ঘটে গুপ্তবংশীয় নৃপতি নরসিংহ গুপ্তের হস্তে।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই পরাজয় ঘটিয়াছিল কোথায় ? সমস্যা কঠিন। মগধে না আছে সমুদ্র না আছে দ্বীপ। তবে বর্ত্তমান বিহার প্রদেশকে প্রাচীন মগধরাজ্য বলিয়া মনে করিলে বিষম ভুল হইবে। প্রাচীন মগধ সময়ে সময়ে (অনেক সময়ে) গৌড় ও বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। এই সময়ে বঙ্গদেশে অনেকগুলি দ্বীপ ছিল ; উহার মধ্যে মধ্যে ছিল সমুদ্র এবং খাড়ি। বালাদিত্য সম্ভবতঃ এই সকল দ্বীপের কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলেন। মিহিরকুল ঐ দিকে তাঁহার অনুসরণে গিয়াই বন্দী হইয়াছিলেন। একসঙ্গে যশোধর্ম্মদেব এবং নরসিংহ গুপ্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়াছিলেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে না। সুতরাং মিহিরকুলের শেষ পরাজয় ঘটে নরসিংহ গুপ্তের হাতে।

দ্বিতীয়তঃ, মিহিরকুল নরসিংহ গুপ্তের হাতে পরাজিত হইবার পর আর নিজ রাজ্যে গমন করেন নাই। তিনি কিছু কাল দ্বীপে ও জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ইহা হুয়েন্থ সাং তাঁর বিবরণে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন। পরে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে গিয়া সেখানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহা সঠিক ভাবে বলা যায় না।

তোরমানের পুত্র মিহিরকুল বা মিহিরগুল ঠিক কোন সময়ে ভারতের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে অনুমিত হয় যে, ৫০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী এবং কঠোর-কর্ম্মা ছিলেন। সেই পাপেই তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। চৈনিক পরিব্রাজক-প্রদত্ত কাহিনীর সহিত খন্দসর-শিলালিপির কোন বিরোধ নাই। চৈনিক পরিব্রাজকের প্রদত্ত কাহিনী সরল এবং সুন্দর ভাবে বর্ণিত। হুয়েন সাং ঐ কাহিনী ভারতের নানা স্থানে এবং নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। সুতরাং আমরা ঐ বিবরণই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। গুপ্তরাজগণ এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের ক্ষমতা ক্ষীণ হইলেও নরসিংহ গুপ্তের পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়া মিহিরকুলকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। নরসিংহ গুপ্ত যে মিহিরকুলের সমকক্ষ ছিলেন না, ইহা তিনি জানিতেন এবং সেই জন্যই তিনি মন্ত্রীদের হস্তে রাজ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরের বক্ষে নবোত্থিত জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। কাজেই ইহা লইয়া বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নয়।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

---

(৩) Allan "Gupta Coins."

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে

[গল্প]

মা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন্ রজত, আজ আবার চৌধুরী এসেছিল। মেয়ের বিয়ে নিয়ে একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছে। চুপ করে থাকলেও নিস্তার নেই। একে দিয়ে তাকে দিয়ে পিছনে লেগেই আছে।"

রজতের ছোট ভাই প্রবাল নিকটে ছিল। সে বলিয়া উঠিল, "চৌধুরী মশায়ের পাঁচ বছরের আশা। এত সহজে কি ছাড়তে পারেন মা? মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বড়ই বিব্রত হয়ে উঠেছেন। তোমার আগ্রহে দাদার অপেক্ষায় মেয়েকে ওঁরা বড় করে রেখে অত লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। এখন তোমাদের বিয়ে ভাঙ্গা ঠিক হবে না।"

চিন্তান্বিত ভাবে মা উত্তর দিলেন, "ছেলে-মেয়ে থাক্‌লে বিয়ের কথা অমন হয়, ভাঙ্গে। তা ধরে থাকলে সংসার চলে না। স্বদেশী-মেলায় মেয়ের মা'র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে বিয়ের কথা উঠেছিল মাত্র। সে মেয়ে আমি দেখিনি, পাকা কথাও কিছু দিইনি। লোভে পড়ে মেয়েকে যারা ডাগর করেছে, এখন তার বিয়ের দায় তাদেরই।"

সহাস্যে রজত কহিল, প্রবালের সঙ্গে ওই মেয়েটির বিয়ে দাও না কেন মা, তাহলে তো সব ল্যাঠা চুকে যায়! প্রবালের ওকালতিও সার্থক হয়। আমার বাপু ও-সবে পোষাবে না। আমি চাই প্রচুর টাকা, আর বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আমার বিলেতের খরচ সুদে-আসলে আদায় না করে ফাঁদে পা দিচ্ছি না। তোমাদের চৌধুরীর দশ-বিশ হাজারে আমার চলবে না।"

অপ্রতিভ প্রবাল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে জবাব দিল, "ও-কথা বলো না দাদা, আমি তোমার মত বিলেতেও যাইনি, সাহেবও বনিনি। কাজেই তোমার সঙ্গে যাঁর বিয়ের কথা উঠেছিল, তিনি আমার মাননীয়া! আমাদের জমিদারের ঘর হলেও তিন দিদির বিয়ে নিয়ে সোজা বেগ পেতে দেখিনি। আজ-কাল পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সমস্যা হলো মেয়ের বিয়ে। সেই জন্যই বল্‌ছিলাম—নইলে আমার আবার ওকালতি কিসের?" বলিতে বলিতে প্রবাল রাগ করিয়াই উঠিয়া গেল।

মা বিরস মুখে বলিতে লাগিলেন, "প্রবালের কথা ছেড়ে দে রজত। একে ওর মন নরম, তায় চৌধুরীর মিষ্টি কথায় গলে রয়েছে। সে মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে পারি নে, বয়সে প্রায় সমান-সমান—তায় মেয়ে আবার লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ। ছেলের লেখাপড়ায় তেমন ধার নেই। লোকে বলবে কি? থাক গে, আজে-বাজে কথা ছেড়ে এখন আমাদের কাজের কথা হোক। তা হলে নন্দনপুরের রাজ-কন্যাকেই ঠিক করে ফেলি, কি বলিস তুই? ওদের সব ভালো, এক দোষ বাড়ীতে লেখাপড়ার রেওয়াজ নেই। তা না থাক্‌লেও আমরা শিখিয়ে নিতে পারবো। মায়ের অনেকগুলো মরে-হেজে ওই একটি-মাত্র আছে তাই বড় আদরের। তোর মাসীর বাড়ী মেয়েটিকে আমি দেখেছি। গায়ের রং দিব্যি ফরসা। মাথায় বেশ চুল, তবে একটু রোগা। আমি না দেখলেও লোকের মুখে শুনেছি, চৌধুরীর মেয়ে না কি মোটা, কালো, মাথায় চুল কম। থাকার মধ্যে আছে মেয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আর বাপের নাম।"

তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া রজত কহিল, "পাণ্ডিত্য থাকে, মাষ্টারী করুক্ গে। আমরা নামের কাঙ্গাল নই। আমাদেরও নাম আছে। তোমায় সত্যি বলছি মা, বিয়ে করতে আমার এতটুকু ইচ্ছা নেই। তোমাদের উৎপাতেই বিয়ে করা। তাই করতেই যদি হয়, তবে রাজকন্যাই ভালো। তাদের অন্য কিছু না থাকলেও উঁচু মন থাকে। রাজকন্যা আর কোটাল-কন্যা সমান হয় না। বিশেষ যে রাজকন্যা বাপের উত্তরাধিকারিণী!"

পুত্রের সম্মতিতে মা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার গৃহ যে প্রকৃত রাজকন্যার উপযুক্ত স্থান, তাঁহাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী, নাম-প্রতিপত্তি—ছেলেও হিসাব-বিভাগের পরীক্ষায় সম্মানের সহিত কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সাধারণ সম্পন্ন গৃহস্থ-ঘরে তিনি তো এমন দুর্লভ রত্নকে বিকাইয়া দিতে পারেন না। শিক্ষার মোহ, নামের মোহ রাজকন্যার ঐশ্বর্য্যের নীচে তলাইয়া যায়। ছোট ছেলে প্রবালের 'অধম-তারণ' প্রকৃতিতে মা তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। বড় রজতের বিষয়-বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত মেঘরেখা নিঃশেষে মিলাইয়া গেল।

* * * *

কর্তা নামে কর্তা হইলেও কথাটা তাঁহার কাণেও উঠিল। তিনি কোন কিছুরই ধার ধারিতেন না। বিষয়-সম্পত্তির ভার বিশ্বস্ত অনুগত দেওয়ানের উপর ছাড়িয়া দিয়া, সংসারের ভার সুযোগ্যা গৃহিণীকে অর্পণ করিয়া তিনি পূজা-অর্চনা লইয়া সময় কাটাইতেন। রাজকন্যা চৌধুরী-কন্যা কাহারও প্রতি তাঁহার আগ্রহ বা আসক্তির লেশমাত্র ছিল না। যে বিবাহ করিবে, তাহার মত—যিনি ঘরকন্না করিবেন, তাঁহার মত—ইহার চেয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি প্রসন্ন হইয়া প্রীত হইয়া শুভ-বিবাহের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন।

বিবাহের দিন স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। দুই পক্ষই প্রবল প্রতাপশালী, কাজেই হাতী সাজিল, ঘোড়া সাজিল, বাজনা বাজিল, আলো জলিল। আত্মীয়-কুটুম্বে গৃহ ভরিয়া মুখরিত হইল।

পূর্ব্বে তিন মেয়ের বিবাহ হইলেও পুত্রের বিবাহ এই প্রথম। তাই রজতের মা মনের ক্ষোভ মিটাইয়া উৎসবের আয়োজন করিলেন। কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিল না। উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া চৌধুরীর নামেও তিনি বিবাহের আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইলেন।

* * * *

মহাসমারোহে নববধূ রাজবালা শ্বশুর-বংশ ধন্য করিয়া জমিদার-ভবন আলো করিতে আসিল। রাজবালার বয়স কম-নয়। শিক্ষা-হীন পল্লী-জীবন-যাপনের ফলে মেয়েটি অকালপক্কতা লাভ করিয়াছিল। গ্রামের সরলতা সরসতা তাহার প্রকৃতিতে ছিল না। সহরের সভ্যতা ভদ্রতা শিখিবার সুযোগও সে লাভ করে নাই। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বহুকাল পূর্ব্বে কোন সৎকার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ সরকার হইতে 'রাজা' খেতাব পাইয়াছিলেন। বাঁশবনে শেয়াল রাজার মত সেই "রাজা" উপাধি বংশের শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। শূন্যগর্ভ নদীর মত—নামে নদী থাকিলেও তাহার

তলায় সুশীতল সলিল-প্রবাহের চিহ্নও নাই! যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহার দৈনিক নিলাম বন্ধ করিতেই প্রাণান্ত!

দান-সামগ্রী এবং নববধূর গহনার স্বল্পতায় রাজবাড়ীর গোপন রহস্যের চাবি হঠাৎ খুলিয়া গেল। রাজত্বের মরীচিকা মায়ামৃগের মত ছলনা করিয়া পলায়ন করিল। সংসারে যাহারা বেশী জিতিতে চায়, পরাজয়ের গ্লানি তাহাদেরই সবচেয়ে বেশী ভোগ করিতে হয়। হতাশ দৃষ্টিতে মা চাহিলেন ছেলের দিকে, ছেলে চাহিল মায়ের পানে। উভয়ের মর্ম্ম-বেদনা উভয়ে উপলব্ধি করিলেন; কিন্তু বাক্যে কেহ তাহা প্রকাশ করিলেন না।

বিবাহের গোলযোগ মিটিলে জমিদার-গৃহে পুরাতন প্রবীণ শিক্ষকের ডাক পড়িল। পূর্ব্বে ইনিই জমিদার-কন্যাদের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। স্কুল-কলেজে না পড়িলেও রজতের ভগিনীদিগকে কেহ অশিক্ষিতা বলিতে পারিত না। কিন্তু শিক্ষকের আগমন সফল হইল না। অবাধ্য দুষ্ট ঘোড়ার মত নববধূ রাজবালা ঘাড় বাঁকাইয়া শাশুড়ীর মুখের উপর জবাব দিল, "পারবো না আমি লেখাপড়া শিখ্‌তে। আমার ঠাকুমা পিসিমা বলে, সরস্বতীর সেবা করলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। সেই ভয়ে আমাদের রাজবাড়ীতে লেখাপড়ার চলন নেই। মেয়ে দূরের কথা, সেখানে ব্যাটা ছেলে পর্য্যন্ত ভয়ে কেতাব ছোঁয় না! আমার দিয়ে সে সর্ব্বনেশে কাজ কেউ করাতে পারবে না। ও-সবের পাঠ আমাদের নেই।"

"সেখানে না থাকুক, এখানে আছে। তোমার বাবা-কাকারা সরস্বতীর পূজো করেননি বলেই তাঁদের লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে। আমার এখানে মূর্খ হয়ে থাকলে তোমার চলবে না।" বলিয়া গৃহিণী উদ্গত রোষ-বহ্নি দমন করিলেন!

চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া বধূ বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "ওগো ঠাকুমা, ওগো মাগো, তোমরা আমায় এ কোথায় পাঠিয়েছ? আমাদের যা করতে নেই, কেউ কক্ষনো করেনি, এরা আমায় তাই করতে বলে।"

রাজবালার খাসমহলের খাস দাসী যামিনী তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। রাজুর করুণ ক্রন্দনে যামিনী বিগলিত হৃদয়ে কাংস্য কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ছেলেমানুষ মেয়েটার ওপর তোমাদের এ কি জোর-জুলুম মা! এমন-ধারা অনাসৃষ্টি কাণ্ড কোথাও দেখিনি। রাজকন্যেকে বলছো লেখা-পড়া করতে, গান-বাজনা শিখতে! শেলাই নিয়ে বসতে! মাগো, শুনে আমি লজ্জায় মরি! যাদের শেলাই করে দরজী, বাইওয়ালি এসে গান-বাজনা শোনায়, তারা কিসের দুঃখে ছোটনোকের কাজ শিখতে যাবে মা?"

গৃহিণী জলদ-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব যদি ছোটলোকের কাজ, তা হলে এতখানি বয়স পর্য্যন্ত সেখানে কি রাজকাজ শেখা হয়েছে বল্‌তে পারো?"

"তা পারবো না কেনে মা? এঁনারা খেতেন, শুতেন, ঘুমুতেন। ইচ্ছে হ'লে আমাদের সাথে কড়ি খেল্‌তেন। সেখানে কড়ি-খেলার কি ধুম! ঘর-ঘর কড়ির ছক—দিবে-আত্রি কড়ি খেলা। দিদি রাণী কড়ি খেল্‌তে ভালবাসে বলে রাণীমা এক থলি ভর্ত্তি কড়ি দেছে, ছক দেছে। পই-পই করে আমারে বলে দেছে, "যামিনী, তুই সাথে রইলি, বাছারে কড়ি খেলিয়ে ভুলিয়ে রাখিস্‌। মনমরা হতে দিস্‌ নে।"

লজ্জায় ঘৃণায় গৃহিণীর কণ্ঠ রোধ হইল। ক্রন্দনরতা বধূর প্রতি তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু পুত্রের শুষ্ক ম্লান মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। শাসন-তাড়ন আদর-সোহাগ কিছুতেই রাজবালার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সে অক্ষরের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া পিতৃকুলের অকল্যাণ করিতে পারিবে না।

দিবারাত্রি অনুযোগ-অভিযোগ অসন্তোষ-অভিমানের মধ্য দিয়া ধীর-মন্থর গতিতে সময়ের স্রোত বহিয়া চলিল।

*　*　*

বিবাহের মাস ছয়েক পরে রজতের বড়দিদি মুক্তার পত্রে জানা গেল, তাহার অধ্যাপক দেবর বিজয়ের বিবাহে নিদারুণ অনিচ্ছা সহসা ইচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। তাহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-কারিণী অপর কেহ নয়,—চৌধুরী-তনয়া মণিমালা।

কোন্ রেল ষ্টেশনে মণিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিজয় চির-কৌমার্য্যের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছে।

মুক্তা লিখিয়াছে—"এ বিবাহে তোমাদিগকে আসিতেই হইবে মা। প্রবাল বাবার সঙ্গে পুরীতে আছে; তাহার আসা সম্ভব নয়। রজত আর রাজুকে লইয়া তুমি অবশ্য অবশ্য আসিবে। তোমরা না আসিলে আমার শাশুড়ী খুব দুঃখিত হইবেন। আমিও রাগ করিব, মনে রাখিও।"

চিঠি পড়িয়া মা ক্ষোভের নিশ্বাস মোচন করিলেন। মর্ম্মান্তিক দুঃখ-পরিতাপের মধ্যেও মনের নিভৃত কোণে একটু কৌতূহলের ঝরণা গুহায়-আবদ্ধ গিরি-নদীর মত ঝির-ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। যাহাকে তিনি অবজ্ঞা তাচ্ছিল্যভরে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছেন—সে কি বস্তু, স্বচক্ষে একবার প্রত্যক্ষ না করিলে মনে যেন অনেকখানি অস্বস্তি জমিয়া থাকিবে!

যাহার প্রতি এক দিন আগ্রহের অন্ত ছিল না, উৎসাহের অন্ত ছিল না; রাজা-রাজকন্যার নামের মোহ-কালিমায় সেই কল্পিত ছবি ক্ষণকালের জন্য মলিন হইলেও তাঁহার হৃদয়ের পটভূমি হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। রাজবালার আশে-পাশে আজ-কাল অহরহ সেই কল্পনার মূর্ত্তিখানি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী বেশে উঁকি দেয়!

রজতের নৈরাশ্যকাতর মুখ মা সহিতে পারেন না। ছেলের ইচ্ছায় তিনি যে ভাঙ্গাগড়ার কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন, এখন তাহাও মনে পড়ে না। মায়ের সুকোমল শান্ত হৃদয়ে অনুশোচনার আগুন অপরাধের আগুন সত্যভঙ্গের ঝটিকা প্রবেলবেগে বহিতে থাকে। কোন দিক হইতেই সান্ত্বনার স্নিগ্ধ-প্রলেপ মেলে না। এমন অশান্তি উদ্বেগ লইয়া ইচ্ছা করিয়া কেহ লোকালয়ে যাইতে চায় না। যাইবার প্রবৃত্তি হয় না।

সেই জন্যই মা অনেক ওজর-আপত্তি দেখাইয়া বিজয়ের বিবাহে যোগ দিবার আহ্বান খণ্ডন করিয়া মুক্তাকে চিঠি লিখিলেন।

কিন্তু নিজেকে লুকাইতে চাহিলেই লুকানো যায় না! সংসার, সমাজ, স্বজন তাহাদের দাবী ছাড়ে না। আশাহত বেদনাতুর সন্তাপের পাশে নিভৃত নীড় রচনা করিয়া লইলেও সময়-সময় সে নির্জ্জনতাও লোক-সমাগমে সচকিত হয়।

সে-দিন প্রভাতে মা রজতের সামনে চায়ের সরঞ্জাম ধরিয়া দিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। রাজবালা তখনো শয্যালগ্না।

এমন সময় তাঁহাদের মাঝখানে বিজয়ের মা আসিয়া উপনীত হইলেন।

নব-পরিণীত পুত্র এবং বধূর নূতন সংসার সাজাইয়া-গুছাইয়া দিবার জন্য বিজয়ের মা যে আসিয়াছেন, গৃহিণী ইহা জানিলেও না জানিবার ভাণ করিয়া বেয়ানকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন, "দিদি, আজ আমার সুপ্রভাত দেখছি। কি ভাগ্যি, কবে এলেন? কেমন আছেন?"

"তিন-চার দিন হলো এসেছি বোন। নতুন বৌমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হলেও ছেলেমানুষ তো! তাই ওদের একটু গুছিয়ে দিতে এসেছি। ফাঁকি দিয়ে বিয়েয় গেলে না বলে আমাকেই তোমার কাছে আসতে হলো বৌ নিয়ে দেখাতে। আজ তোমাদের ছাড়ছি নে। দুপুরে রজতকে নিয়ে বৌমাকে নিয়ে বিজয়ের বাসায় যেতে হবে। মণিমার হাতের রান্না খেতে হবে। আজকের রান্না-বান্না যা কিছু সমস্তই মণিমা নিজের হাতে করবে। আমাদের এ বাড়ীর বৌমা কোথায়? তাকে দেখছি না!"

গৃহিণী কুণ্ঠার সহিত কহিলেন, "এখানেই আছে। শরীর তেমন ভাল নয় বলে শুয়ে রয়েছে। আপনি বসুন দিদি, বৌমাকে আমি ডেকে নিয়ে আসি।"

রজতের বিবাহে আসিয়া বিজয়ের মা রাজবালার স্বরূপ জানিয়া গিয়াছিলেন, তাই বেয়ানের হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না, থাক, ডাকতে হবে না। খানিক বাদে তো আমার কাছে যাচ্ছে। তখন দেখবো! শরীর ভালো নেই—একটু শুয়ে থাকুক। আমারও এখন বেশীক্ষণ বসবার সময় নেই, বোন! বিজুর দু'টি বন্ধুকে বলতে যাবো। আছি ক'দিন, এর মধ্যে এক দিন এসে সারা দুপুর কাটানো যাবে। চা আর খাবো না, খেয়েই বেরিয়েছি। কোন্ সাত-সকালে উঠে মণিমা আমায় চা করে দিয়েছে। কৌটো ক'রে পান সেজে দিয়েছে। এমন বৌ পাওয়া ভাগ্যের কথা বোন! আশীর্ব্বাদ করো, ওরা বেঁচে থাকুক, সুখে থাকুক।

"রজত, তোমরা কিন্তু দেরী করো না বাবা, সকাল-সকাল সবাইকে নিয়ে যেয়ো। দেরী করে গেলে আমি আর এখানে আসবো না। মুক্তোমাকেও পাঠাবো না। চাবি-কাঠি আমার হাতে আছে, মনে রেখো।" এ কথা বলিয়া বিজয়ের মা হাসিতে হাসিতে বিদায় লইলেন।

* * * *

গৃহিণী বধূর শয়ন-গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বৌমা বেলা না দুপুর, এখনো তোমার ঘুম ভাঙ্গলো না। মুক্তোর শাশুড়ী এলেন গেলেন, সাড়া পেয়েও তুমি বিছানা ছাড়লে না?"

যামিনী রাজবালার শাড়ী কোঁচাইতেছিল, সে খন্‌-খন্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি আবার কি বলছো মা, এত সকালে রাজবাড়ীর কাক-পক্ষীও যে বাসায় থেকে ভুঁইয়ে পা দেয় না। যার যা চেরকালের অভ্যাস তা না করলে ব্যামো হবে যে!"

"ব্যারাম হলে চিকিৎসা করাবো। এটা রাজবাড়ী নয়, এখানে রাজার কায়দা খাটবে না। ওকে তুলে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে চুল শুকিয়ে দাও। মুক্তোর দেওরের ওখানে যেতে হবে। নেমন্তন্ন আছে।" বলিয়া গৃহিণী চলিয়া আসিলেন।

দালানে চায়ের টেবিলে রজত তখনো বসিয়াছিল। মায়ের আদেশ-পালনের কোন লক্ষণ না দেখিয়া রজত উঠিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল।

রাজবালা বিছানায় শয়ন করিয়াই যামিনীর কাছে তীব্র ভাষায় শাশুড়ীর সমালোচনা করিতেছিল। স্বামীর অপ্রত্যাশিত আগমনে সবিস্ময়ে সে চুপ করিল, কিন্তু উঠিল না। যামিনী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ক-স্বরে রজত কহিল, "মা ডেকে গেলেন তবু শুয়ে রয়েছ! মার কথা গ্রাহ্য হলো না বুঝি! খানিক বাদে নেমন্তন্নে যেতে হবে, শুনতে পাওনি?"

ঝাঁজিয়া রাজবালা উত্তর করিল; "শুনতে আর পাবো না কেন! কাণের মাথা এখনো খাইনি। দুপুরবেলা পরের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাওয়া আমার বাপু পোষাবে না। খেয়ে উঠে পান গালে দিয়ে তখুনি ঘুমানো আমার চিরকালের অভ্যাস। না হলে আমি থাকতে পারি না, মাথা ধরে।"

"ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রতা রাখতে গিয়ে যদি মাথা ধরে, তাহলে অমন মাথা না রাখাই ভালো।"

বধূ সগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বললে? তোমার মাথা, তোমার যে যেখানে আছে তাদের মাথার ব্যবস্থা করে' তার পরে আমার মাথার বিধান দিয়ো। রাজকন্যাকে ভদ্দরতা শেখাতে হবে না। আমরা বাড়ীতে লোক ডেকে খেতে দিই। কারুর বাড়ীতে পাত চাটতে যাই না। দিন-রাত মোটরে চেপে টো-টো করে বেড়ানো হয়, কৈ, কখনো তো সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে দেখি না! আজ একেবারে ভারী দরদ দেখছি যে!"

"কাকে নিয়ে বেড়াবো? লোকের কাছে বের করতে লজ্জায় মরে যাই। এ সব কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না। তবু যে বলি, ও মা'র দুঃখে।"

দূর হইতে মা ডাকিয়া কহিলেন, "মা'র দুঃখের কথায় তোর কাজ নেই রজত, যার বুদ্ধির দোষে বিবেচনার দোষে তুই দুঃখের সমুদ্রে ডুবেছিস, তার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তুই বেরিয়ে এসে চট করে চান সেরে নে। যে যাবে না, তাকে আর কিছু বলিস্ নে। চল, আমরা দু'জনেই আমাদের কাজ সেরে আসি।"

রজত আর কোন কথা না বলিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিল।

* * * *

অপরাহ্নে পুত্রের সহিত মাতা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। রাজবালা তখন দিবানিদ্রা সারিয়া দাসী যামিনীকে লইয়া মহা কলরবে 'দশ-পঁচিশ' খেলিতেছিল। সে-দিকে না চাহিয়া মা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

রজত আশ্রয় লইল বাহিরের বৈঠকখানায় ঢালা ফরাসের উপর। তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল—জ্ঞানে প্রদীপ্ত বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল সুন্দর একখানি সুকুমার মুখ! সে মুখের প্রীতি-প্রসন্ন হাসি! সরল সৌন্দর্য্য অকৃত্রিম আতিথ্য অকপট ব্যবহার। তাহাদের অনুরোধে এবং বিজয়ের মা'র আদেশে সেই কমল কণ্ঠের একটি গানের কলি—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!"

রজতের মুদিত আঁখিপল্লব বহিয়া বেদনার দু' ফোঁটা অশ্রু উপাধানে ঝরিয়া পড়িল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

বিপদে সম্পদ্

১

যে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিল এক দিন মানুষের, গৃহপালিত পশুর ও পক্ষীর প্রাণদ ও ভূমি শস্যসম্পদ্‌শালী করিবার কারণ ছিল, সেই পুষ্করিণীর যখন এমন অবস্থা ঘটে যে, তাহাতে ঘটী ডুবাইবার মত জলও থাকে না, তখনও যেমন তাহার তীরস্থিত তালতরুর জন্য তাহার "তালপুকুর" নাম তাহার পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি জাগাইয়া রাখে, তেমনই এখন বাঙ্গালায় শরতে দেবীপূজার আগ্রহ ও উৎসব না থাকিলেও "দেবীপক্ষের" সমাদৃত নাম বাঙ্গালার সমৃদ্ধিকালের স্মৃতি বহন করিতেছে। শরতের যে শুক্লপক্ষ দেবীপক্ষ নামে অভিহিত, সেই পক্ষে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান পূজা—দুর্গোৎসব গ্রাম মাতাইয়া রাখিত, আর সেই পক্ষের শেষে—পূর্ণিমায় ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর পূজা। সে পূর্ণিমা কোজাগরী-পূর্ণিমা নামে অভিহিত। সেই পক্ষের জের পরপক্ষ পর্য্যন্ত চলে—সেই পক্ষের শেষে—অমাবস্যায় শ্যামাপূজা ও লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী পূজা।

এখন স্থানে স্থানে সর্ব্বজনীন পূজার প্রচলন হইয়াছে—কোন কোন প্রতিষ্ঠানেও পূজা হয়। কলিকাতার একটি প্রতিষ্ঠানে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে কালীপূজা হইয়াছিল। "আশ্রমটি" যে ব্যক্তির তিনি ব্রাহ্মণ; কোন ভক্ত শিষ্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া নবভাবের কেন্দ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া আশ্রম-স্বামী হইয়া বসেন। সেই আশ্রমের কালীপূজার উৎসব—যে ভাড়া বাড়ীতে আশ্রম ছিল, তাহারই পার্শ্বে খালি জমিতে হোগলার মেরাপ বাঁধিয়া তাহাতে অনুষ্ঠিত হয়। সে কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে—হালসীবাগানে।

পূজার পরদিন সেই ঘরে যখন ব্যায়াম—গান প্রভৃতির আয়োজন হইয়াছিল এবং কাযও চলিতেছিল, সেই সময় সহজদাহ্য উপকরণে কোথায়—কোনরূপে অগ্নিযোগ হইল। আশ্রমের পক্ষ হইতে লোককে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টার অভাব হয় নাই বটে, কিন্তু আকৃষ্ট নর-নারী-বালক-বালিকার নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার আবশ্যক চেষ্টা হয় নাই। হোগলার চালায় অগ্নিযোগ হইলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার ব্যবস্থা ছিল না—নর-নারী যাহাতে দ্রুত বাহির হইয়া যাইতে পারে, এমন পথ রাখা হয় নাই—এক কথায় ব্যবস্থার নামে অব্যবস্থাই বিরাজিত ছিল।

লোককে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা বিশেষ ভাবেই ফলবতী হইয়াছিল। নিকটস্থ দরিদ্র পল্লীগুলি যেন শূন্য করিয়া নর-নারী সমবেত হইয়াছিল—এক একটি বস্তীতে যত লোক বাস করে, তাহা না দেখিলে অনুমান করাও দুঃসাধ্য। পল্লীর মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ও ধনীরাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার মত বিরাট্ সহরে যে সব অঞ্চলে লোক দিবারাত্রি গৃহেই বদ্ধ থাকে, সে সব অঞ্চলে লোকের পক্ষে এইরূপ সুযোগে বাহিরের অবস্থার সহিত পরিচয় লাভের প্রলোভন সম্বরণ করা দুষ্কর হয়। কাযেই মণ্ডপ জনাকীর্ণ হইয়াছিল—আগন্তুকদিগের মধ্যে বালক-বালিকার সংখ্যাই অধিক—তাহাদিগের জন্য তাহাদিগের অভিভাবকদিগকেও আসিতে হইয়াছিল। মণ্ডপ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। একে ত পথের সঙ্কীর্ণতা ও জনতার অনুপাতে স্বল্পতা কেহ লক্ষ্য করে নাই, তাহার উপর আবার মণ্ডপ পূর্ণ হইলে—স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছিল।

এই অবস্থায় মণ্ডপের বাহির হইতে "আগুন! আগুন!" রব উত্থিত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক—এ উহাকে ঠেলিয়া—পতিতকে দলিত করিয়া—আত্মরক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টায় সেই মৃত্যু-গৃহ হইতে বাহির হইতে ব্যস্ত হইল। পুরুষদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশের পথ রুদ্ধ-দ্বার ছিল না—সেই পথে জলস্রোতের মত জনস্রোতঃ বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু মণ্ডপের যে অংশে স্ত্রীলোকরা ছিলেন, সে অংশের অবস্থা অন্যরূপ। সেই অংশের সঙ্কীর্ণ পথে দ্বার পর্য্যন্ত আগমনই জনতার পক্ষে দুঃসাধ্য; তাহার পর সে পথের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ ছিল; যাহারা সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাতে চাবী লাগাইয়াছিল, তাহারা কে কোথায় ছিল—সন্ধান পাওয়া গেল না। জনতার চাপে যখন সেই রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, তখন মৃত্যু তাহার ধ্বংসলীলা শেষ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রথমেই আকাশে অগ্নিশিখা দেখা দিয়াছিল—সহজদাহ্য উপকরণ দেখিতে দেখিতে দগ্ধ হইয়া নিম্নে জনতার উপর পতিত হইয়া চারি দিকে মৃত্যু ব্যাপ্ত করিয়াছিল। তাহার পর ধূমে চারি দিক্ অন্ধকার—সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় করিয়াছিল; বাতাসে দগ্ধ মাংসের দুর্গন্ধ; আর সমগ্র পল্লীতে শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা সব বাধা লঙ্ঘন করিয়া কোনরূপে পুরুষদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশে যাইতে পারিয়াছিলেন—তাঁহারাই কেহ কেহ বাহির হইতে পারিয়াছিলেন—মৃতের মধ্যে সেই জন্যই স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা-তুলনায় অনেক অধিক।

২

অল্পক্ষণের মধ্যেই দমকল আসিয়া পড়িল এবং ধূমায়িত বহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য জল দিতে লাগিল। কিন্তু দমকল আসিবার পূর্ব্বেই পল্লীস্থ যুবকগণ বালতী-বালতী জল ঢালিয়া ও ষ্টীরাপ-পাম্প ব্যবহার করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া লোকের উদ্ধার-সাধন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। জাপানের সহিত বৃটেনের যুদ্ধের জন্য যে সকল বে-সামরিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল—সেই সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ও শিক্ষিত যুবকগণ সোৎসাহে কায আরম্ভ করিয়াছিল এবং পল্লীর "পারুল পুরীর" অধিকারী রায় বাহাদুর গগনচন্দ্র চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয়চন্দ্র—কোন দলের না হইলেও—তাহাদিগের নেতৃত্ব করিতেছিল।

তাহারা মৃতের শব ও অর্দ্ধ-মৃতের অথবা অচেতনদিগের দেহ বহন করিয়া "পারুল পুরীতে" আনিতেছিল এবং তথায় ডাক্তারের ও যানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কলিকাতায় আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থানে আবশ্যক আলোকের অভাবে কে মৃত, কে জীবিত, তাহা বুঝা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

ডাক্তার ও যান আসিলে ডাক্তাররা পরীক্ষা করিয়া যাহাদিগকে মৃত স্থির করিলেন, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে পাঠাইয়া, যাহারা জীবিত, তাহাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল।

ডাক্তার, যান, পুলিস, উদ্ধারকারী দল সব ব্যবস্থা হইবার পর—পুলিসই ঘটনাস্থলে আলোকের ব্যবস্থা করিল এবং তখন আর কাহাকেও "পারুল পুরীতে" না আনিয়া সরাসরি যাহাকে যে স্থানে পাঠাইবার, তথায় প্রেরণের কায চলিতে লাগিল।

"পারুল পুরীতে" যাহাদিগকে আনা হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে চারি জনকে ডাক্তাররা হাসপাতালে পাঠাইবারও প্রয়োজন নাই, মত প্রকাশ করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে সেই চারি জনের তিন জনের স্বজনগণ আসিয়া তাহাদিগকে যে যাহার গৃহে লইয়া যাইলেন। এক জনকে লইতে কেহ আসিল না। সে "পারুল পুরীর" সম্মুখস্থ পথের অপর পারের গৃহের অধিকারী নিবারণ বাবুর দৌহিত্রী—নন্দরাণী। নিবারণ বাবু মৃত ও অর্দ্ধ-মৃতের স্তূপমধ্যে কন্যার ও দৌহিত্রীর সন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নন্দরাণীকে তথায় পায়েন নাই। কারণ, উদ্ধারকারীরা তাঁহার তথায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সংজ্ঞাশূন্যা নন্দরাণীকে "পারুল পুরীতে" লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু পুলিস আসিয়া আলোকের ব্যবস্থা করিলে তিনি কন্যার শব বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ—বিশেষ পৃষ্ঠ দগ্ধ হইয়া অঙ্গারবৎ হইয়াছিল—মুখ অবিকৃত ছিল। মাতা ও পুত্রী যে স্থানে পতিতা ছিলেন, তাহা মণ্ডপের এক প্রান্তের স্থান—তাঁহাদিগের উপর প্রজ্বলিত চালার অংশ পতিত হয় নাই—কিন্তু অগ্নির শিখা সে পর্য্যন্ত তাপ বিকীর্ণ করিয়াছিল। দেখিলেই বুঝা যায়, মা—মাতার সহজাত সংস্কারবশে কন্যাকে রক্ষা করিবার আগ্রহে আপনার দেহ দিয়া তাহাকে অন্তরালে রাখিয়াছিল—আপনি দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও মৃত্যুবাহী তাপ আপনিই সহ্য করিয়াছিলেন। সেই কন্যাই বিধবার স্নেহের সম্বল।

নিবারণ বাবু যখন কন্যার শব ও সেই শবের অবস্থা লক্ষ্য করিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তিনি দৌহিত্রীর সন্ধানের অবসরও পাইলেন না। তিনি কিছু দিন—কয় বৎসর হইতে হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন; তাহা তাঁহার বাল্যকালে বাতদুষ্ট জ্বরভোগের ফল—জরা যে সময় দেহের সব গুপ্ত দৌর্ব্বল্য প্রবল করে, সেই সময় জামাতার মৃত্যুশোক জরার সহায় হইয়া তাঁহার সেই রোগের বৃদ্ধি করিয়াছিল। তিনি কন্যার শব দেখিয়াই হৃদয়ের পীড়া-বৃদ্ধি অনুভব করিয়া সঙ্গী ভৃত্যের স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত করিলেন; সে তাঁহাকে কোনরূপে তাঁহার গৃহে লইয়া গেল এবং ডাক্তারকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যাইয়া শ্মশানভূমিতে পরিণত পূজাপ্রাঙ্গণ হইতে নন্দরাণীর মাতার শব আনিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল।

ডাক্তার আসিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেন বটে; কিন্তু তখন আর ঔষধের ক্রিয়া হইবার সময় ছিল না। কন্যার মৃত্যুশোকের প্রথম আঘাতই পিতার জীবনান্ত ঘটাইল। নন্দরাণী সংসারে সব হারাইল।

যে বৃদ্ধা দাসী নিবারণ বাবুর মৃতা পত্নীর কাছে ছিল এবং নন্দরাণীর মাতাকে পালন করিয়াছিল, সে-ই সেই মৃত্যুক্ষেত্রে নন্দরাণীর সন্ধানে ছুটাছুটি করিবার সময় শুনিল, কতকগুলি লোককে মৃত বা অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় উদ্ধারকারীরা "পারুল পুরীতে" লইয়া গিয়াছিল ও যাইতেছে। শুনিয়াই সে তথায় গিয়া দেখিল—অজয় তাহার গৃহের প্রবেশ-দালানের শ্বেত মর্ম্মরাস্তৃত মেঝের উপর নন্দরাণীকে রক্ষা করিল; যেন উদ্ভেদোন্মুখ কুসুমসম্পন্না লতিকা প্রবল বাত্যায় আশ্রয়দণ্ডচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইল। সে ব্যস্ত হইয়া যাইয়া নন্দরাণীর মস্তক আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইল। তাহা দেখিয়া গগনচন্দ্রই একটি উপাধান আনিয়া দিলে সে তাহা নন্দরাণীর মস্তকের নিম্নে দিল। তখন সে কান্দিয়া উঠিল। এক জন ডাক্তার তখন নন্দরাণীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "চুপ কর—বেঁচে আছে।" তিনি নন্দরাণীর দেহে সূচি প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিবার ঔষধ দিলেন। জ্ঞানশূন্যা কিশোরীর দেহ-কম্পন দেখা গেল। দাসীর বিশ্বাস হইল, সে বাঁচিয়া আছে। সে ব্যস্ত হইয়া প্রভু-গৃহে যাইয়া নন্দরাণীর জন্য শয্যা আনিল এবং সংবাদ আনিল—নন্দরাণীর মাতা জীবিতা নাই; নিবারণ বাবুও অজ্ঞান হইয়া আছেন। নিবারণচন্দ্র যে তখন মৃত, তাহা সে জানিত না।

সেই কথা শুনিয়া অজয় তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার গৃহে গেল।

তখন সে দিক্ লোকে লোকারণ্য—পুলিস জনতা সরাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। যখন বহু লোক বিপদে অভিভূত, তখনও কেহ কেহ পরস্বাপহরণপ্রয়াসী।

অজয়, নিবারণ বাবুর গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজ গৃহের প্রবেশ-দালানে দণ্ডায়মান পিতাকে বলিল, নিবারণ বাবুরও মৃত্যু হইয়াছে।

রায় বাহাদুর বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "বল কি ?"

৩

সেই সময় যাঁহার নামে গৃহের "পারুল পুরী" নামকরণ হইয়াছিল তিনি—রায় বাহাদুরের প্রৌঢ়া পত্নী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন দিন তাঁহার কুসুমের সৌন্দর্য্য-কোমলতা ছিল কি না, সে বিষয়ে গবেষণা করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, তাঁহার ডাকনাম "পারুল" তাঁহার পিতামহী যখন রাখিয়াছিলেন, তখন তিনি পিতা-মাতার সাত পুত্রের পর জন্মগ্রহণ করায় পিতামহী আদর করিয়া পরিচিত ছড়াটির আবৃত্তি করিতেন—

"সাত ভাই চম্পা জাগ রে।
কেন বোন পারুলী, ডাক রে ?"

তাহার পর তাঁহার জগদম্বা, জগত্তারিণী বা ঐরূপ কোন গুরুগম্ভীর নাম হইয়াছিল; কিন্তু পিত্রালয়ে সকলে যেমন, স্বামীও তেমনই তাঁহাকে পারুল নামেই ডাকিতেন। তাঁহার পিতা সাত পুত্র ও এক কন্যা প্রত্যেককে সম্পত্তির সমান অংশের অধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। সেই জন্য পিত্রালয় হইতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মাসিক আয় আড়াই শত টাকা ছিল। তিনি যে জমিদারের কন্যা ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী, তাহা তিনি কেবল যে সর্ব্বদা মনে রাখিতেন তাহাই নহে, পরন্তু, তাহাতে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপও করিতেন। স্বামী কখন কখন তাঁহাকে সে গুরুত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্তি ত্যাগ করাইবার জন্য হেমচন্দ্রের উক্তি শুনাইতেন :—

ডেপুটীর ভার্য্যা কন—আমাদের তিনি
চৌকিদারী কাজে পটু, মফঃস্বলে 'গিনি'।
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার !"

কিন্তু গৃহিণী তাহাতে বলিতেন, ও সব ঈর্ষ্যার কথা—ঈশপের উপকথায় শৃগাল দ্রাক্ষাফল পাড়িতে না-পারিয়াই তাহা টক বলিয়াছিল। তিনি কঠোর ভাবে পরিবার শাসন করিতেন—সকলেই

তাঁহাকে ভয় করিতেন। স্বয়ং রায় বাহাদুরও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয় তাঁহাকে ভয় করিত না; এমন কি, মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে তিনি সেই জিদী ছেলেকে ভয় করিতেন। গগন বাবু যখন মফঃস্বলে চাকরীস্থলে থাকিতেন, তখন সে যেমন সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিলিত—সরকারের বড় চাকরীয়ার পুত্রত্বের ভাব তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারিত না, তেমনই গগন বাবু রায় বাহাদুর হইয়া চাকরী হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৈত্রিক গৃহে ভ্রাতাদিগের অংশ কিনিয়া তাহা কতকটা সংস্কৃত ও কতকটা পুনর্গঠিত করিয়া তাহার প্রাঙ্গণে মনোরম উদ্যান রচনা করিয়া তাহার "পারুল পুরী" নামকরণ করিবার পর অজয় পল্লীর তরুণদিগের সকল অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিত। সে দিন সে যখন "আগুন! আগুন!" রব শুনিয়া ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহার মাতা তাহাকে নিবারণ করিবার জন্য ডাকিতে ডাকিতে গৃহের বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলেও সে ফিরে নাই এবং সে যখন দগ্ধ ও অর্দ্ধদগ্ধ ব্যক্তিদিগকে গৃহে আনিয়াছিল, তখন তাহাতে বিরক্তি বোধ করিলেও তিনি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই,—পাছে পুত্র রাগ করে।

গৃহিণীর বিরক্তির কারণ একাধিক। প্রথম—তিনি কোনরূপ ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে চাহিতেন না—স্বামীর সঙ্গে নানা স্থানে একাই থাকিয়া তাঁহার সেই ভাব অনুশীলন-হেতু অভ্যাস যেমন স্বভাবে পরিণত হয়, তেমনই তাঁহার ধাতুগত হইয়াছিল। দ্বিতীয়—পরিচ্ছন্নতার আদর তাঁহার পক্ষে সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল—এতটুকু ধূলিও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না—দগ্ধ ও অর্দ্ধদগ্ধ মানুষকে গৃহে আনা তিনি অসহ্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

তিনি মনে করিয়াছিলেন—ততক্ষণে যে যাহার স্বজনদিগের শব বা দেহ লইয়া গিয়াছে, তিনি দালানটি ধৌত করাইয়া মুছাইয়া ফেলিবেন। সেই জন্য তিনি মনে অপ্রসন্ন ভাব ও মুখে তাহার বিকাশ লইয়াই আসিয়াছিলেন।

তাঁহার মুখ দেখিয়াই রায় বাহাদুর শঙ্কানুভব করিয়াছিলেন। তিনি কেবল যে স্ত্রীর এইরূপ ব্যাপারে স্বাভাবিক বিরক্তির বিষয় অবগত ছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু নিবারণ বাবুর পরিবার সম্বন্ধে তাঁহার মতও জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। সেই মত আর যাহাই কেন হউক না—প্রীতিস্নিগ্ধ নহে। পল্লী হইতে অদূরে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যে স্থানটি মুক্ত রাখিয়াছিলেন—প্রতিদিন প্রাতে নিবারণ বাবু ও রায় বাহাদুর উভয়ে তথায় বেড়াইতে যাইতেন। সেই সূত্রে প্রতিবেশিদ্বয়ের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। নিবারণ বাবুই এক দিন রায় বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন, তিনি বিপত্নীক, তাঁহার হৃদ্‌রোগ আছে—মানুষের কখন কি হয় বলা যায় না, তিনি সব বিবেচনা করিয়া তাঁহার সব সম্পত্তি এক মাত্র সন্তান কন্যার নামে করিয়া দিয়াছেন—কন্যার একমাত্র সন্তান নন্দরাণী পাইবে; জামাতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি কন্যাকে কাছে রাখিয়াছেন—এখন তাহার কন্যাটিকে সুপাত্রে দিয়া যাইতে পারিলেই নিশ্চিত হইয়া মরিতে পারেন। এই সব কথার পর তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন—তাঁহার কন্যার ইচ্ছা অজয়ের সহিত নন্দরাণীর বিবাহ দেন—রায় বাহাদুর তাহাতে সম্মত হইবেন কি? তিনি গৃহিণীর নিকট সে প্রস্তাব করিলে গৃহিণী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিয়াছিলেন, "মেয়ে সুন্দর স্বীকার করি; হয় ত দাদা মহাশয়ের দৌলতে কিছু পা'বেও—সে'ও মা মরবার পর; কিন্তু যা'র তিন কুলে কেহ নাই, তা'র সঙ্গে আমি ছেলের বিবাহ দিব না—ছেলের আদর-যত্ন হবে না। আর ঘরও পরিচয় দিবার মত নহে।" গৃহিণীর মনের ভাব—নিবারণ বাবুর প্রস্তাব বামনের চাঁদ ধরিবার আশার মত। রায় বাহাদুর নন্দরাণীকে বহু বার দেখিয়াছিলেন। নিবারণ বাবুর প্রস্তাব তিনি কোনরূপে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু গৃহের যে বিভাগে পুত্রবধূকে আসিতে হইবে, সে বিভাগে গৃহিণীর ইচ্ছাই যখন আইন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে আর "না উকীল, না দলিল, না আপীল"—তখন আর সে কথার উত্থাপন করেন নাই।

নিবারণ বাবু কিন্তু রায় বাহাদুরকে আর সে কথা বলেন নাই। তাহাতে রায় বাহাদুর বিস্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার কারণ তিনি অনুমান করিতেও পারেন নাই। এক জন ঘটকী ঐ প্রস্তাব রায় বাহাদুরের গৃহিণীর নিকট আনিয়াছিল এবং সে-ও ঐ উত্তর শুনিয়া যাইয়া তাহাই নন্দরাণীর মাতার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল। শুনিয়া নন্দরাণীর মাতা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "উনি বড় মানুষ—তা'তে ছেলের মা, উনি বল্‌তে পারেন। কিন্তু যা'র কপাল পুড়েছে, তা'র মেয়ের কি বিবাহ হয় না?" সে কথা শুনিয়া নিবারণ বাবু কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই দুঃখ করিস্ না। তোকে আমি হাভাতের ঘরে দিই নাই—অযোগ্য পাত্রেও দিই নাই। তুই যে সব ইচ্ছায় দেওরদের দিয়ে এসেছিস্, সে সব অনেক গৃহস্থের নাই। ভগবান্ যদি করেন, তবে আজ তুই যেমন ঐ ছেলেকে জামাই ক'রতে চেয়েছিস্, ওঁরা তেমনই এক দিন তোর নন্দরাণীকে বৌ করবার জন্য ব্যস্ত হবেন—হয়ত তোর মেয়ে আরও ভাল ঘরে বরে পড়বে।"

গৃহিণীর মুখ দেখিয়া রায় বাহাদুর আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তিনি হয়ত কোন অপ্রিয় উক্তি করিবেন। তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, "অজয় জেনে এসেছে, নিবারণ বাবু মারা গেছেন।"

কিন্তু রায় বাহাদুর সে কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহিণীর মুখভাবের অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি যাহাকে আপদ বা বিপদ মনে করিয়াছিলেন—তাহাতে সহসা অপ্রত্যাশিত সম্পদ্ মনে করিয়া বলিলেন, "আহা, মেয়েটি এখানে প'ড়ে আছে! বাঁচবে ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "আশা ত করি। তবে এখন যা'তে অজ্ঞান থাকে, সেই জন্য ঔষধ দিলাম।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন, "পাশের ঘরে শুইয়ে দিতে হ'বে; আমি চাকরদের ও ঘরে ছোট খাট এনে বিছানা ক'রে দিতে বলছি।"

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

তিনি পার্শ্বের ঘরে খাট আনাইয়া—খাটে বিছানা করিয়া দিয়া নন্দরাণীকে তাহাতে তুলাইয়া দিলেন।

তাহার ব্যবহারে তাঁহার স্বামীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ানুভব করিলেন।

তিনি জানিতেন না, তাঁহার গৃহিণী তথায় আসিয়া একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাঁহার বিরক্তি বেদনার তাপে করুণায় পরিণত হইয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র কন্যা সুধারাণী প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। চিকিৎসা ও

শুশ্রূষা, মাতার স্নেহ কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই অথচ বাঁচিবার জন্য তাহার কি আগ্রহ! জীবনে যে কেবল সুখই লাভ করিয়াছে, সে কি মরিতে চাহে? তাহাকে ঔষধ-প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া কাটিয়া সন্তান বাহির করা হইয়াছিল। আর তাহার জ্ঞান হয় নাই। সে-ও এমনই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। সেই কন্যার সহিত নন্দরাণীর যে এত সাদৃশ্য—তাহা তিনি কখন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, হয়ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই। হয়ত মৃত্যুর ছায়া এই ভাবেই বৈষম্যের মধ্যে সাদৃশ্য আনিয়া দেয়।

গৃহিণীর মনে আশঙ্কা হইতেছিল—এ-ও কি বাঁচিবে না? তিনি স্বামীকে বলিলেন, "ডাক্তার বাবুকে বল, জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি যেতে পারিবেন না: টাকা যা' চাহিবেন তা'-ই পাবেন।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণীর মনে বেদনার সঙ্গে আপনার কার্য্যের জন্য পরিতাপ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল—এক দিন তিনি এই মেয়েটির সম্বন্ধে কি কথা বলিয়াছিলেন! তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধের প্রতীকার—প্রায়শ্চিত্ত তিনি কিরূপে করিতে পারেন?

৪

দুর্ঘটনার পর এক দিন অতীত হইল—দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে নন্দরাণীর ঔষধ-সৃষ্ট—অজ্ঞান-অবস্থা আংশিক দূর হইল। সে চক্ষু উন্মীলিত করিল—যেন অকালজলদোদয়ের পর বর্ষণে ও বাত্যায় ম্লান কমলকোরক প্রভাত-সূর্য্যকর স্পর্শে প্রস্ফুটিত হইল। সে চাহিয়া সেই অপরিচিত পরিবেষ্টনে কিছুই চিনিতে পারিল না; কেবল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—তাহার কাছে পরিচিত—বৃদ্ধা দাসী। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেই এক অপরিচিতা তাহার জ্ঞানোন্মেষ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি ঘুমাও, মা।" তিনি তাহাকে একটু ঔষধ ও পানীয় দিলেন।

নন্দরাণী আবার ঘুমাইয়া পড়িল। এ বার তাহার নিদ্রা গাঢ় নহে—সে যেন মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

পরদিন নন্দরাণীর ঔষধপ্রসূত আচ্ছন্ন ভাব দূর হইল। সে গৃহে ফিরিতে ও সব সংবাদ পাইতে ব্যস্ত হইল। তখন ডাক্তার বলিলেন—তাহার জীবনের আর আশঙ্কা নাই।

রায় বাহাদুরের গৃহিণী তাহাকে পুনঃ পুনঃ ব্যস্ত হইতে ও গৃহে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু নন্দরাণীর স্বাভাবিক ব্যস্ততা কেবলই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে তাহার মাতার মৃত্যু অনুমান করিয়াছিল; কিন্তু মাতামহের মৃত্যু তাহার কল্পনাতীত ছিল। উভয় সংবাদই সে শুনিল। সে বুঝিল, সংসারে তাহার আপনার বলিবার আর কেহ নাই—সে একা—সে একা। অনেক ক্ষেত্রেই বিপদ তাহার সঙ্গে বিপদ সহ্য করিবার ক্ষমতা লইয়া আইসে, সেই জন্য মানুষ বিপদে পিষ্ট হইয়াও বাঁচিয়া থাকে। নন্দরাণীর তাহাই হইয়াছিল। নহিলে তাহার অবস্থা বুঝিয়াও সে সেই অবস্থা সহ্য করিতে পারিত না।

সে কেবলই গৃহে—তাহার শূন্য গৃহে ফিরিতে ব্যস্ত হইতে লাগিল। রায় বাহাদুরের গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এক দিন যখন বৃদ্ধা দাসী নন্দরাণীকে বলিল, "এ বাড়ীর গিন্নী-মা যে যত্ন করেছেন, তা' অসাধারণ। তিনি জিদ্ করছেন, আরও সুস্থ না হয়ে তুমি বাড়ী যা'বে।"—তখন নন্দরাণী তাহাকে বলিল, "মাসী, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। তুমি কি জান না, ওঁর কথা শুনে মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন? আজ সত্যই আমার তিন কুলে আর কেহ নাই; কিন্তু আমি কেন পরের গলগ্রহ হয়ে থাকব?" বলিতে বলিতে দুঃখে ও অভিমানে নন্দরাণীর মন এবং অশ্রুতে তাহার দুই চক্ষু পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধা দাসী বলিল, "সবই জানি, মা। সে দিন বাবা বলেছিলেন, ভগবান্ যদি করেন, তবে এঁরাই হয়ত এক দিন তোমাকে পা'বার জন্য ব্যগ্র হ'বেন—হয়ত তোমার আরও ভাল সম্বন্ধ আসবে। কিন্তু আজ যে অদৃষ্ট সব আশাই ছাই ক'রে দিলে!" সে চক্ষু মুছিল।

নন্দরাণী দৃঢ় ভাবেই বলিল, "মাসী, মা ত প্রায়ই বলতেন, অদৃষ্টের বাহিরে পথ নাই। তবে আর সে পথ সন্ধান করা কেন? অদৃষ্ট যা'র সব আশা ছাই ক'রে দিয়াছে, সে ছাই ছাড়া আর কোথায় যা'বে? কি পা'বে? আমি কালই বাড়ী যা'ব! তুমি আপত্তি ক'র না।"—

এই সময়ে অজয় কি লইবার জন্য, সাড়া দিয়া, কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কথা আর অগ্রসর হইল না। বৃদ্ধা দাসীর দুশ্চিন্তা নন্দরাণী, বোধ হয়, অনুমান করিতেও পারে নাই। গৃহে ফিরিতে তাহারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তথায় কে প্রাপ্তবয়স্কা নন্দরাণীর অভিভাবক হইয়া থাকিবে? দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া নিবারণ বাবুর কোন কোন আত্মীয় তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই নন্দরাণীর অভিভাবকত্বের ভার গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কে তাঁহাদিগকে সে ভার দিতে পারে? আর লোক নিশ্চয়ই বলিবে—তাঁহারা স্বার্থের আকর্ষণে আসিয়াছেন—অথচ স্বার্থসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, নিবারণ বাবুর সর্ব্বস্ব এখন নন্দরাণীর। নন্দরাণীর পিতৃকুলের যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঐরূপ ভাবই দেখাইয়াছিলেন; কেবল এক পিসীমা বলিয়াছিলেন, "মেয়েটা কি ভেসে যা'বে? আমার ভাইয়ের মেয়ে ত! আমি ওর কাছে থাকতে পারি; কিন্তু আমার সংসারেও এক বৌ—তা'কে ফেলে আমিই বা ক'দিন থাকব?" তবে তিনি তখনও সেই শূন্য গৃহে ছিলেন—নন্দরাণীকে শান্ত করিয়া তবে যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তিনি কয় বার নন্দরাণীর কাছে রায় বাহাদুরের গৃহেও আসিয়াছিলেন।

পরদিন যখন নন্দরাণী রায় বাহাদুরের গৃহিণীকে বলিল, সে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে, তখন তিনি বলিলেন, "কেন, মা, তোমার কি কোন কষ্ট—কোন অসুবিধা হচ্ছে?"

নন্দরাণী বলিল, "আপনার যত্নের যেমন দয়ার তেমনই অন্ত নাই। কিন্তু আমি কত দিন আপনার গলগ্রহ হ'য়ে থাকব?"

"সে কি কথা, মা? তুমি ত আমার গলগ্রহ নও, তোমাকে পেয়ে আমি আমার মেয়েকে যেন ফিরে পেয়েছি।" তাঁহার মন স্মৃতিজাত বেদনায়—ও চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল।

নন্দরাণী তাঁহার ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইল না। সে বলিল, "আমার সবই গিয়াছে—তবুও ঐ বাড়ীই আমার আশ্রয়—দাদামহাশয়ের দান—মা'র স্মৃতিঘেরা মন্দির। সুখে না হ'লেও দুঃখে আমার ঐ বাড়ীই আশ্রয়। আপনি আর আমাকে বাড়ীতে ফিরিতে বারণ করবেন না।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী নন্দরাণীর যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি নন্দরাণীকে যত কাছে টানিতে চাহিতেছেন, সে তত দূরে যাইতে চাহিতেছে। তাহাকে কাছে রাখিবার অধিকার ত তাঁহার নাই। এক দিন নিবারণ বাবুই তাঁহাকে সে অধিকার দিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যে গর্ব্বে তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, তাঁহার সে গর্ব্ব শোক চূর্ণ করিয়া দিয়াছে—তিনি কন্যার শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন—পূর্ণ করিতে পারিতে-ছিলেন না। কন্যার অভাব পুত্রগণও পূর্ণ করিতে পারে না—তাহারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দূরস্থ হয়-মা'র অভাব তাহারা আর তেমন অনুভব করে না। তাঁহার মনে হইতেছিল, হয়ত নন্দরাণীকে পাইলে তাঁহার কন্যার অভাব, অন্ততঃ আংশিকরূপে পূর্ণ হইত! এক দিন তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি অনুশোচনা অনু-ভব করিতেছিলেন!

কিন্তু পরদিন যখন নন্দরাণী তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল, তখন রায় বাহাদুরের পত্নী আর তাহাকে নিবৃত্ত করিবার অধিক চেষ্টা করিলেন না; কেবল বলিলেন, সে আহার শেষ করিলে তিনি সঙ্গে যাইয়া তাহাকে রাখিয়া আসিবেন।

তাহাই হইল। রায় বাহাদুরের পত্নীর আশঙ্কা ছিল, নন্দরাণী তাহার সেই শূন্য গৃহে প্রথম প্রবেশ করিলে মাতার ও মাতামহের জন্য শোকে অভিভূতা হইয়া পড়িবে। সেই জন্য তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু নন্দরাণীর দৃঢ়তায় তিনি বিস্মিতা হইলেন। সে, জ্ঞান হওয়া অবধি, কয়দিন কেবলই আপনার অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়াছিল—ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়াছিল। সেই জন্য সে আপনার পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত আপনার মনের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইল না।

কেবল তাহার পিসীমা যখন তাহাকে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং বৃদ্ধা দাসী তাঁহার সেই আর্ত্তনাদে যোগ দিল, তখন এক বার সে যেন মনে করিল—সে তাহার নূতন অবস্থায় অভিভূতা হইয়া পড়িবে। তখন রায় বাহাদুরের পত্নী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। নন্দরাণী অল্প সময়ের মধ্যেই আপ-নার অভিভূত ভাব জয় করিল। তবে তাহার মনকে সত্য সত্যই শান্ত করিতে বিলম্ব অনিবার্য্য হইল। সে জন্য তাহাকে সমধিক চেষ্টায় চেষ্টিত হইতে হইল এবং সে তাহার সেই চেষ্টা সফল করিল।

রায় বাহাদুরের গৃহিণী কিন্তু আপনার গৃহে ফিরিবার সময় পথে অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে যাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্বামী সহানুভূতিসিক্ত ভাবে বলিলেন, "দেখছি, মেয়েটি তোমাকে খুবই মায়ায় জড়িয়েছে!"

স্ত্রী বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছিল যেন, আমার সুধা ফিরে এসেছিল।"

সে কথায় স্বামীর চক্ষুও অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। যে বয়সে স্ত্রী সকল বিষয়ে স্বামীর সাহচর্য্য লাভ করিতে চাহে, সে বয়স অতিক্রান্ত না হইলে গৃহিণী তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিতেন—তিনি কেন নন্দরাণীকে পুত্রবধূ করেন নাই; তাহা হইলে সে কখনই পূজা-প্রাঙ্গণে যাইত না; সে না যাইলে তাহার মাতাকেও যাইতে হইত না—এ সর্ব্বনাশ হইত না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিস্ত্রীর আর পূর্ব্বভাব থাকে না—সংসারে যে যাহার কার্য্যক্ষেত্র লইয়া ব্যস্ত থাকেন। সেই জন্য রায় বাহাদুরের পত্নী আর স্বামীকে সে কথা বলিলেন না।

সে কথা রায় বাহাদুরেরও মনে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে কথা উত্থাপিত করিতে চাহিলেন না—হয়ত তাহা গৃহিণীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইবে না।

৫

নন্দরাণী গৃহে ফিরিয়া মনে যত বেদনা অনুভব করিতে লাগিল, ততই সে বেদনা অনিবার্য্য বুঝিয়া তাহা সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

পিসীমা এক পক্ষ কাল তাহার কাছে রহিলেন। কিন্তু তিনি নন্দরাণীর ব্যবহারে বিসর্জ্জনের ভাব লক্ষ্য করিতে না পারিলেও আবাহনের কোন চিহ্নও পাইলেন না। নন্দরাণী তাঁহাকে তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ ও একমাত্র পৌত্রকে লইয়া তাহার নিকটে আসিয়া থাকিতে বলিবে, এমন আশা তিনি করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া তিনি সে আশার অবকাশ না পাইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাবে নন্দরাণী বলিল, সে তাঁহাকে আর কত দিন থাকিতে বলিবে—তাঁহার সংসারে তাঁহার প্রয়োজন অধিক।

পিসীমা চলিয়া যাইবেন—সে প্রস্তাবে কিন্তু বৃদ্ধা দাসীর ভাবনার অবধি রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, কে নন্দরাণীর অভিভাবক হইয়া থাকিবে—কে-ই বা পিতৃমাতৃহীনার বিবাহের ব্যবস্থা করিবে? সে সে কথা পিসীমা'কে বলিলে তিনি বলিলেন, "যেতে আমারই কি কম কষ্ট হচ্ছে? কিন্তু কি করি, বল—উপায় যে নাই। আমি ভাইদের লিখব আর নিজেও চেষ্টা করব—যা'তে যত শীঘ্র সম্ভব নন্দর বিবাহ হয়ে যায়। তা' না হ'লে আমিই কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব?" যাইবার সময় পিসীমা নন্দরাণীকে বলিলেন, "মা, যাচ্ছি বটে, কিন্তু মন তোমার কাছে পড়ে থাকবে। যখনই কোন দরকার হ'বে, আমাকে সংবাদ দিও। কাকের মুখে সংবাদ পেলেও আমি ছুটে আসব।"

বৃদ্ধা দাসী ব্যতীতও এক জন নন্দরাণীর ভাবনা ভাবিতেছিলেন। তিনি রায় বাহাদুরের পত্নী। তিনি দিনান্তে অন্ততঃ এক বার নন্দ-রাণীকে দেখিতে যাইতেন এবং বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন; কিন্তু কিছুতেই এক দিন যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন; তাহা উত্থাপিত করিতে পারিতেছিলেন না। হয়ত তিনি আশা করিয়াছিলেন; বৃদ্ধা দাসীই আবার সে প্রস্তাব করিবে। কিন্তু তাঁহার সে আশা যদি থাকিয়া থাকে, তবে তাহা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। দাসী ঘটকীর প্রস্তাবে তাঁহার উত্তরও শুনিয়াছিল এবং নন্দরাণীর মনোভাবও জানিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য সে আর সে কথা বলিতে পারিত না।

নন্দরাণী আপনার অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবার দুরাশা মনে পোষণ করিত না—সেই জন্য সে অবস্থার সহিত তাহার ব্যবস্থার সামঞ্জস্য-সাধনের প্রয়াস করিতেছিল।

এক দিন যখন এক ঘটকী নন্দরাণীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিলে বৃদ্ধা দাসী তাহাকে পিসীমা'র ঠিকানা দিয়া তাঁহার নিকট

যাইবার জন্য কয় আনা পয়সা দিল, তখন—তাহা দেখিয়া—নন্দরাণী তাহাকে বলিল, "মাসী, তুমি কেন ঐ সব ঝঞ্ঝাট করছ ?"

বৃদ্ধা দাসী তাহাকে বলিল, "ঝঞ্ঝাট কি ? আজ যদি দিদিমণি বা বাবা বেঁচে থাকতেন, তবে কি তুমি এ কথা বলতে পারতে ?"

নন্দরাণীর মনে হইল, বলে—তাঁহারা যখন নাই, তখন আর সে কথা কেন ? কিন্তু আপনার বিবাহের কথার আলোচনা করিতে সে, তাহার শিক্ষা ও সংস্কারহেতু, লজ্জানুভব করিল। আর দাসীও তাহাকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বলিল, "কি যে হ'ল, বলতে পারি না—দিদিমণি ও বাড়ীর ঐ বড় ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ! ঘটক ঠাকরুণ এসে যা' বললেন, তা'তেই সে কথা আর উঠল না। দিদিমণি যে অভিমানী ছিলেন ! কিন্তু ঘটক ঠাকরুণ সত্য বলেছিলেন কি মিথ্যা বলেছিলেন, তা ভগবানই জানেন ; ও বাড়ীর গিন্নীর ব্যবহার দেখে ত তা' সত্য বলে মনে হয় না। তোমাকে কি যত্নই করেছেন ! এখনও দিনে এক বার তোমাকে না দেখে থাকতে পারেন না। ব্যবহার ত মা'র মতই করেন। আর দিদিমণির পসন্দ বটে ! কি ছেলে ! যেন হীরার টুকরা—চাঁদে কলঙ্ক আছে, তবুও ছেলের দোষ নাই। সেই কাল রাত্রিতে কি করল ! দমকলের লোকরা পরিশ্রমে হাঁপাতে লাগল ; ছেলের বিশ্রাম নাই ; আপনার দিকে দৃষ্টি নাই—লোককে উদ্ধার করতে হ'বে। যা'র শক্তি-সামর্থ্য না থাকে, সে আবার পুরুষ কি ? তোমাকে নিয়ে বাড়ীতে এল, যেন মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হ'লে সতীকে নিয়ে গেলেন। ধন্য ছেলে বটে !"

নন্দরাণী দাসীর কথা শুনিল ; তাহাতে বিরক্তি বোধ করিল না —বরং সে কথা তাহার কাছে সত্য বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

দাসীর কথা শেষ হইলে সে কেবল বলিল, "মাসী, আর ও কথায় কায নাই।"

দাসী বলিল, "তা' কি কখন হয় ?"

দাসীর মত রায় বাহাদুরের গৃহিণীও সংস্কার বশে মনে করিতেছিলেন—নন্দরাণীর বিবাহের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই দিনই অপরাহ্নে তিনি যখন নন্দরাণীকে দেখিতে আসিয়া স্বগৃহে ফিরেন, তখন দাসী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং বলিল, "একটা কথা বলি, আপনি ত নন্দকে বাঁচিয়ে তুললেন—এই বার ওর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করুন।—এক জন কেহ না দাঁড়া'লে ত তা' হ'বে না !"

রায় বাহাদুরের পত্নী বলিলেন, "সে কথা আমিও ভাবছি ; তবে বলতে সাহস করি নাই।"

"দেখুন, মেয়ে ত দেখেইছেন ; আর ওর বাপের সব টাকা আর বাবার বাড়ী, টাকা সবই ত ও পা'বে। ওর মা নাই ব'লে কি ভাল পাত্র পাওয়া যা'বে না ?"

"কেন যা'বে না ? আমি দেখব, ওর উপযুক্ত সম্বন্ধ হয়।"

"তা'-ই করবেন। ওর কেহ নাই ; ওকে নিজের মেয়ে মনে করে দয়া করবেন।"

"আমি ওকে নিজের মেয়ের মতই মনে করব।"

"আর আপনাকেই দাঁড়িয়ে সব ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

"তা'-ই হবে।"

"মা জগদম্বা আপনার মঙ্গল করুন"—বলিয়া বৃদ্ধা দাসী বিদায় লইয়া নন্দরাণীর কাছে ফিরিয়া গেল।

রায় বাহাদুরের গৃহিণী দাসীকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আন্তরিকতা-প্রণোদিত। কিন্তু তিনি কিরূপে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সে বিষয়ে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই ভাবনা বাড়িতে লাগিল। যে উপায় অবলম্বন করিলে সহজেই সে সমস্যার সমাধান হইতে পারিত, তাহা তাঁহার মনে হইলেও তিনি কতকটা আপনার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া কুণ্ঠাহেতু কতকটা বা তাহাই একমাত্র উপায় কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহহেতু সেই উপায় অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে প্রায় পক্ষকাল অতীত হইল ; রায় বাহাদুরের গৃহিণী কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না—সে বিষয়ে স্বামীর পরামর্শও গ্রহণ করিলেন না।

৬

নন্দরাণীর দাসী "মাসীর" সঙ্গে রায় বাহাদুরের গৃহিণীর কথা হইবার পর যে পক্ষকাল অতীত হইল, তাহার মধ্যে নিবারণ বাবু যে সম্পত্তি কন্যাকে দানপত্রে দিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যার শ্বশুরালয়ের যে অর্থ ছিল উভয়েই নন্দরাণীর আইনতঃ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল। রায় বাহাদুরই সে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং নন্দরাণী তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে বলায় যে এটর্ণীর আফিসে অজয় শিক্ষানবিশী করিতেছিল, তিনি তাঁহাকেই সে কাযের ভার দিয়াছিলেন। সেই কাযের জন্য অজয়কে বহু বার নন্দরাণীর গৃহে যাইয়া কাগজপত্র লইতে ও তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল। প্রথম কয় বার সে তাহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তাহার পর হইতে আর সকল সময় তাহার সুবিধা হয় নাই—তাহাকে একাই যাইতে হইয়াছিল। সে যথাসম্ভব তৎপরতা সহকারে সে কায শেষ করিয়া দিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল এবং যে সকল প্রশ্নে নন্দরাণীর মনে স্মৃতিজাত বেদনার উদ্ভব সম্ভব মনে করিয়াছিল, সে সকল প্রশ্ন—চিকিৎসক রোগীর দেহে যে স্থানে বেদনা সেই স্থান যে ভাবে পরীক্ষা করেন,—সেই ভাবে—করিয়াছিল। তাহার প্রশ্ন করিবার পদ্ধতিতে নন্দরাণী তাহার দয়াসঞ্জাত বিবেচনার পরিচয় বুঝিতে পারিত—যত্নের পরিচয় পাইত। আর বৃদ্ধা দাসী তাহার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া বলিত, "কি মিষ্ট কথা !" দুর্ব্বলের প্রতি সবল তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে, অজয় যেন নন্দরাণীর সম্বন্ধে সেই ধারণাই পোষণ করিত। কিন্তু তাহার যে আরও একটি কারণ ছিল, তাহা অজয় ব্যতীত আর কেহই মনে করিতে পারে নাই। তাহার গৃহে সে তাহার সহিত নন্দরাণীর বিবাহের প্রস্তাবে তাহার মাতার কথা —নন্দরাণীর সহিত তাহার দাসীর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া—জানিতে পারিয়াছিল এবং জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখানুভব করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, মানুষকে মানুষ তুচ্ছ ভাবে কেন ? তাহার সেই দুঃখ নন্দরাণীর সম্বন্ধীয় ব্যবহার প্রভাবিত করিয়াছিল।

পক্ষকাল পরে এক দিন প্রাতঃকালে অজয় যখন স্নান করিতে যাইতেছিল, তখন অভয় আসিয়া বলিল, "দাদা, আজ তুমি বেলা ৪টার মধ্যে আফিস হ'তে ফি'রে এস। বাবা তোমাকে বলতে বললেন।"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"শুনলাম, এক মেদিনীপুররাজার সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। মেয়েটি 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।' তাঁ'র বাবা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় এসেছেন।"

"তা'র পর ?"

"তিনি তাঁ'র শালার বাড়ীতে উঠেছেন। বাবা বেলা ৩টার সময় মেয়ে দেখতে যা'বেন। মেয়ে যদি তাঁ'র পসন্দ হয়, তবে কন্যাপক্ষ বেলা ৪টার সময় তোমাকে দেখতে আসবেন।"

"তা' ত হ'বে না।"

"তুমি বাবাকে বা মা'কে ব'লে এস।"

"না। তুমি তাঁ'দের কাহাকেও ব'লে দিও—বাবা যেন এ কাযে অগ্রসর না হ'ন। আমি তাঁ'কে বলতে পারব না।"

"কেন ?"

"প্রথম কথা, আমি এখন বিবাহ করব না। দ্বিতীয়, আমি যুদ্ধ বিভাগে একটা চাকরীর চেষ্টা করছি—আজ বেলা ৩টায় সে জন্য আমাকে দেখা করতে যেতে হ'বে।"

"সবই যে যুদ্ধের দুই ক্ষেত্রে—সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সাফল্যের সংবাদের মত রহস্যময়! ব্যাপারটা কি বল ত? তুমি বিবাহ করবে না ?"

"কখন করব না, এমন কথা সাহস ক'রে বলতে পারি না। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় যে করব না, তা' বলতে পারি।"

"আর হঠাৎ যুদ্ধের বিভাগে চাকরী !"

"এটর্ণীগিরীর পরিশ্রম—বহুদিনব্যাপী; স্বাবলম্বী হওয়া সময়সাপেক্ষ।"

"তাড়াতাড়ি স্বাবলম্বী হ'বার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন ?"

"আমি জমিদারের দৌহিত্র ও রায় বাহাদুরের পুত্র—দু' দফা দায়িত্বভার বহন করতে অক্ষম। তুমি অভয়—ভয় না ক'রে তা' করতে পার।"

"ব্যাপারটা কি বল ত, দাদা ?"

"অত্যন্ত সহজবোধ্য। বিবাহ যদি করতে হয়, তবে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করতে হ'বে সঙ্কল্প ক'রেই তা' করতে হয়। আমাদের লোকাচারে যে ছেলে বিবাহ করতে যা'বার সময় ব'লে 'মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি' সেই ভাবটাই আমি অন্যায় ও স্ত্রীর সম্বন্ধে অবিচার ব'লে মনে করি।"

অভয় হাসিয়া বলিল, "দাদা, দাসী আনতে যাওয়া একটা কথার কথায় পর্য্যবসিত হয়েছে। কেহ মনে করে না, ওটার কোন সার্থকতা আছে। তোমার ইচ্ছা না হয়, তুমি, না হয়, ও কথা ব'ল না।"

অজয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "অন্যান্য বাড়ীতে হয়ত ও কথার কোন গুরুত্ব নাই; কিন্তু এ বাড়ীতে আছে।"

"কেন ?"

"কারণ, মা মনে করেন, এ বাড়ীর লোকরা আর সব বাড়ীর লোকের তুলনায়, অনেক উচ্চে অবস্থিত।"

"কেন, দাদা ?"

"মা'র যে আভিজাত্য গর্ব্ব আছে, তা' তুমিও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। কিন্তু তা'তে যে মানুষকে তাচ্ছিল্য করা'তে পারে, তা' আমিও আগে জানতাম না।"

"কিসে তা' জানলে ?

"তোমাকে তা' বলছি। নিবারণ বাবুর যে নাতিনীকে আগুনের দুর্ঘটনার পর আরও ক' জনের সঙ্গে আমিই বাড়ীতে এনেছিলাম, তা'র সঙ্গে যে নিবারণ বাবু কখন আমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন, তা' আমি জানতাম না। কিন্তু মেয়েটি যে জ্ঞান হ'বার পর হ'তেই এ বাড়ী ত্যাগ করতে ব্যস্ত হয়েছিল, তা'র কারণ—সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সময় মা এমন কথা বলেছিলেন যে, তা'তে সে আর মুহূর্ত্তমাত্র তাঁ'র বাড়ীতে থাকতে চাহিতেছিল না।"

অভয় জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, ঐ মেয়েটির সঙ্গে বিবাহে কি তোমার ইচ্ছা ছিল ?"

"আমার সেরূপ কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু আমার অভিসন্ধি থাকা বা না থাকার সঙ্গে লোককে তুচ্ছ করবার কি কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে, অভয় ?"

দাদার কথায় অভয় লজ্জিত হইল, বলিল, "তা নহে, দাদা। আমি ভাবছি, যদি তা'ই হয়ে থাকে, তবে ত আমারও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।"

"সে বিষয়ে আমি তোমাকে কিছু বলব না। কারণ, মা'র সম্বন্ধেও আমাদের কর্ত্তব্য আছে; আমি যদি চ'লে যাই, তবে তোমাকে একাই সে কর্ত্তব্য পালন করতে হ'বে।

অভয় ভাবিতে লাগিল।

অজয় বলিল, "তুমি বাবাকে ব'ল, তিনি যেন আমার বিবাহ সম্বন্ধে অগ্রসর না হ'ন। আমি তাঁ'কে অপদস্থ করতে পারব না—তাঁ'র মনে কষ্ট দিতেও চাহি না।"

অজয় যখন অফিসে যাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল, তখন গগন বাবু তাহাকে বলিলেন, "অজয়, আজ তুমি বেলা চারটার মধ্যে বাড়ীতে এস।"

"অভয় আমাকে বলেছে। আপনি তা'র কাছে শুনবেন। আমি আসতে—" বলিয়াই অজয় একটু দ্রুত চলিয়া গেল।

কৌতূহলী হইয়া গগন বাবু অভয়কে ডাকিলেন। সে তাঁহার নিকটেই আসিতেছিল।

অজয় তাহাকে যাহা বলিতে বলিয়াছিল, অভয় তাহা পিতাকে বলিল।

শুনিয়া গগন বাবু চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহার প্রশ্নের পর প্রশ্নে অভয় তাহার দাদার নিকট হইতে যে সকল কথা শুনিয়াছিল, সবই পিতাকে বলিল। গগন বাবুর চিন্তা আশঙ্কায় পরিণতি পাইতে বিলম্ব হইল না। কারণ, তিনি পুত্রের প্রকৃতি অবগত ছিলেন; সে স্বভাবতঃ শিষ্ট ও শান্ত; কিন্তু আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে যেমন যে উত্তাপ সঞ্চিত থাকে, তাহা ধ্বংসে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তেমনই তাহার অন্তরে যে ভাব নিহিত, তাহা দৃঢ় সঙ্কল্পে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে—তাহার সে সঙ্কল্প নিবারণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। তিনি অতঃপর কর্ত্তব্য কি, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

৭

গগন বাবু কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর পুত্রকে বলিলেন, "অভয়, তোমার মা'কে এক বার ডাক ত।"

অভয় চলিয়া গেল। তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

গৃহিণী কখন আসিয়াছিলেন, তাহা গগন বাবু জানিতেও পারেন নাই। সেই জন্য গৃহিণী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে ডাকছ?"—তখন তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন।

গগন বাবু বলিলেন, "হাঁ। নিবারণ বাবু যখন তাঁ'র নাতনীর সঙ্গে অজয়ের বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তা' শুনে তুমি আমাকে যা' বলেছিলে, সে কথা কি আর কাউকে বলেছিলে?"

সেই কথাটা গৃহিণী কয় দিন মনে তোলাপাড়া করিয়াছেন; বলিলেন, "হাঁ, এক ঘটকী এসেছিল, তা'কেও বলেছিলাম।"

গগন বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বলিলেন, "ওঃ!"

গৃহিণী বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কি হয়েছে।"

গগন বাবু অভয়কে বলিলেন, "তোমার মা'কে সব বল।"

গৃহিণী পুত্রকে বলিলেন, "কি অভয়?"

অভয় বলিল, "দাদাকে আজ বেলা চারটার মধ্যে বাড়ী ফিরতে বলবার জন্য বাবা বলে দিয়াছিলেন। কারণ শুনে দাদা বললেন—তিনি বিবাহ করবেন না।"

"কেন?"

"তুমি মানুষকে মানুষ মনে কর না ব'লে।"

"সে কি?"

তখন অভয় অজয়ের নিকট শ্রুত কথা বলিল।

তাহার কথা শেষ হইলেই গগন বাবু বলিলেন, "তা' ছাড়া সে যুদ্ধের কাযে যাচ্ছে।"

গৃহিণী দাঁড়াইয়া ছিলেন—একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "আমি যেতে দিব না। অভয়, তুমি গাড়ী ক'রে গিয়ে এখনই তা'কে ডেকে লয়ে এস।"

গগন বাবু বলিলেন, "অমন কাযও ক'র না। সে যদি এক বার 'বেঁকে বসে' তবেই সর্ব্বনাশ। বরং অভয়, তুমি ট্যাক্সী নিয়ে আমার যাঁ'দের বাড়ীতে মেয়ে দেখতে যা'বার কথা, তাঁ'দের ব'লে এস, আজ আমি যেতে পারব না—তাঁ'রাও যেন না আসেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে যদি যুদ্ধের কাযে যায়?"

"আজ কেবল দেখা করতে যা'বার কথা। সে এলে বুঝিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে হ'বে।"

অভয় পিতার নিকট হইতে গন্তব্য স্থানের নির্দ্দেশ লইলে তাহার মাতা তাহাকে বলিলেন, "খেয়ে যাও।"

অভয় বলিল, "কাযটা সেরেই আসি।"

সে চলিয়া গেল।

গৃহিণী ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিয়া যাইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অজয় এ কথা কিরূপে জানিল? তবে কি নন্দরাণী তাহাকে সে কথা বলিয়াছে? কখন বলিল? যখন সে আফিসের কাযে নন্দরাণীর গৃহে গিয়াছিল, সেই সময়? তবে কি ব্যাপারটা অনভিপ্রেত পথে অগ্রসর হইয়াছে? ছেলের সম্বন্ধে সে বিশ্বাস তিনি মনে স্থান দিতে পারিলেন না। নন্দরাণীকে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাহার সম্বন্ধেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না যে, সে অজয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ঐ কথা বলিয়াছে। তবুও তাঁহার মন হইতে সন্দেহ দূর হইতেছিল না।

সন্দেহ ভঞ্জনের অভিপ্রায়ে তিনি নন্দরাণীর বৃদ্ধা দাসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সে আসিলে তাহাকে বলিলেন, "নিবারণ বাবু এক দিন কর্ত্তার কাছে অজয়ের সঙ্গে নন্দরাণীর বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু তা'র পর আর কখন সে কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাঁ'র কি সে 'সম্বন্ধে' কোন আপত্তি ছিল? তুমি কি কিছু জান?"

দাসী বলিল, "জানি। মাসীমা'র জন্য সম্বন্ধ অনেকেই এসেছিল; কিন্তু দিদিমণির যেন কোন সম্বন্ধই পসন্দ হচ্ছিল না। তিনি আপনার বড় ছেলের সঙ্গে মাসীমা'র বিবাহ দিবেন, এই ইচ্ছাই তাঁ'র ছিল। বাবারও সেই মত হয়েছিল। কিন্তু এক ঘটক ঠাকরুণ বললেন, আপনি তাঁ'র কাছে ও কথায় মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলেন—মেয়ের তিন কুলে কেহ নাই, আর ঘরও পরিচয় দিবার মত নহে—আপনি ও সম্বন্ধে অসম্মত। সেই কথা শুনে দিদিমণি আর ও কথা বলেন নাই।"

শুনিয়া রায় বাহাদুরের গৃহিণী কেমন অন্যমনস্কা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দাসী বলিল, "বিপদের সময় আপনি যে যত্ন করেছেন, এখনও মাসীমা'কে যে স্নেহ করেন, তা'তে ঘটক ঠাকরুণের কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু—"

সহসা রায় বাহাদুরের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দরাণীও কি সেই কথা শুনেছিল?"

"শুনেছিল। কখন শুনেছিল, তা' আমি জানি না। তবে আপনার দয়ায় আর আশীর্ব্বাদে একটু সুস্থ হয়েই মাসীমা যখন বাড়ীতে ফিরতে ব্যস্ত হ'ল, আর আপনি বারণ করলেন, তখন আমিও আর দু' দিন এখানে থেকে যেতে বলেছিলাম; কারণ, আমি তখন যেন সামনে অপার সমুদ্র দেখছিলাম। তা'তে মাসীমা আপনার সেই কথার উল্লেখ ক'রেছিল। সেই সময় আপনার বড় ছেলে কি নিতে সাড়া দিয়া ঘরে আসায় সে কথা আর অগ্রসর হয় নাই; আমিও আর সে কথার উত্থাপন করি নাই।"

শুনিয়া রায় বাহাদুরের গৃহিণীর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল বটে কিন্তু সে ভয় মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। কারণ, তিনি বিশ্বাস করিয়ে চাহিতেছিলেন না যে, নন্দরাণী তাঁহার সম্বন্ধে অজয়ের নিকট কোন অভিযোগ করিয়াছে এবং অজয় তাহা শুনিয়াছে। সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ দাসীর কথায় অপনীত হওয়ায় তিনি মনে তৃপ্তি অনুভবই করিলেন।

তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দাসী বলিল, "আমি তবে আসি।"

শুনিয়া রায় বাহাদুরের গৃহিণী বলিলেন, "চল, আমি এক বার নন্দরাণীকে দেখে আসি।"

তিনি প্রায় প্রতি দিনই এক বার নন্দরাণীকে দেখিতে যাইতেন—কিন্তু সে অপরাহ্নে। সেই জন্য তাঁহার কথায় দাসী বিস্মিতা হইল; তবে কোন কথা বলিল না। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, তাহা সে অনুমানও করিতে পারে নাই!

নন্দরাণীর গৃহে যাইলে নন্দরাণী তাঁহাকে প্রণাম করিলে গৃহিণী বলিলেন, "মা, আমি আজ আমার ত্রুটির জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি—না এসে থাকতে পারলাম না।"

নন্দরাণী তাঁহার কথায় অত্যন্ত বিস্মিতা ও কেমন যেন শঙ্কিতা হইল। সে বলিল, "আপনি ও কি বলছেন? আপনার দয়া আমি কখন ভুলতে পারব না।"

দাসী বলিল, "ওকে অমন কথা বলবেন না; ওতে যে ওর অকল্যাণ হ'বে।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি। মা, তোমার সব অকল্যাণ দূর হয়ে যা'বে। অজয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাবে আমি যা' বলেছিলাম, শুনেছ—তা' মিথ্যা নহে। আমি অন্যায় করেছিলাম; যে দর্পে ভ্রান্ত হয়েছিলাম—দর্পহারী মধুসূদন আমার সে দর্প চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। এখন আমি ভিখারীর অধম। তুমি আমার মেয়ে—আমি মা হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি।"

বলিতে বলিতে রায় বাহাদুরের গৃহিণীর কণ্ঠস্বর গাঢ় ও আর্দ্র হইয়া আসিল—তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া নন্দরাণী আপনার ব্যবহারে শঙ্কানুভব করিল—তাহার চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে চেষ্টা করিয়া আপনার উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ সংযত করিয়া বলিল, "আমি যে আপনার দয়ায় আর স্নেহেও পূর্ব্বকথা ভুলতে পারি নাই, সে আমার অপরাধ। আপনি মা'র স্নেহে আমার সে অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী নন্দরাণীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন; বলিলেন, 'তোমার কথায় আমার বুকের ভার দূর হ'ল। তুমি যদি কাল সকালে আমার কাছে যাও আর আমার কাছে থাক তবেই আমি বুঝব, তুমি আমার কথা ভুলতে পেরেছ। কাল আমার বড় দুর্দ্দিন—ঐ দিনেই সুধা আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল।"

বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইলেন।

তখন অভয় মেদিনীপুরের ভদ্রলোকটিকে সংবাদ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে সে সংবাদ দিতেছিল। শুনিয়া ভদ্রলোকটি কি বলিয়াছেন, তাহা রায় বাহাদুরের গৃহিণী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন না; পুত্রকে বলিলেন, "অভয়, তোমার বিলম্ব হয়ে গেছে—চল খেয়ে নিবে।"

অভয় বলিল, "খাবার দিতে বল; কলেজে যা'ব না ভেবেছিলাম; অবশ্য কাযও বিশেষ নাই; তবে যখন বাবার সঙ্গে যেতে হ'ল না, তখন কলেজে ঘুরে আসি।"

গৃহিণী যাইয়া পাচককে স্বামীর ও পুত্রের আহার্য্য দিতে বলিলেন এবং তাহা দেওয়া হইলে—অন্যান্য দিনেরই মত—তাঁহাদিগের আহারের স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগের আহার পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

তাঁহাদিগের আহার শেষ হইলে তিনি পাচককে বলিলেন, তিনি কিছু আহার করিবেন না—তাহারা সকলে আহার শেষ করুক।

শুনিয়া পাচক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খাবেন না, মা?"

"ভাল লাগছে না"—বলিয়া গৃহিণী যাইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এক জন ভৃত্য যাইয়া সে সংবাদ রায় বাহাদুরকে দিল।

অভয় তখন কলেজে যাইবার জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল; ভৃত্যের কথা শুনিয়া পিতার কাছে আসিয়া ভৃত্যকে বলিল, "মা কি বললেন?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "বললেন ভাল লাগছে না।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ঘরে শুয়েছেন?"

"ছোট ঘরে।"

শুনিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, "কাল সুধার মৃত্যু-দিন—আজ সেই কথা মনে পড়ছে।"

সেই ঘরেই কন্যার পূর্ণাবয়ব চিত্র রক্ষিত ছিল। গৃহিণী সেই ঘরেই থাকিতে ভালবাসিতেন—বুঝি তাহাতে একটু তৃপ্তি পাইতেন।

রায় বাহাদুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অভয় কিছু বলিল না বটে, কিন্তু কলেজে যাইবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিল।

৮

অপরাহ্নে অজয় গৃহে ফিরিলেই অভয় তাহাকে বলিল, "দাদা, মা আজ সারাদিন অভুক্ত আছেন।"

অজয় একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? মেদিনীপুরজার শোকে নহে ত?"

অভয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমার সব কথা আমি মা'কে বলেছি। শুনে তিনি এক বার নিবারণ বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন—দেখলাম, কাঁদ্তে কাঁদ্তে ফিরলেন। তা'র পরে আমাদের খাইয়ে তিনি শয্যা নিয়েছেন। বোধ হয়, তোমার কথা শুনবার আগেই মা'র মনটা ব্যথিত ছিল।"

"কেন?"

"কাল সুধার মৃত্যুদিন।"

অজয়ের মুখের হাসি অন্তর্হিত হইল—সে গম্ভীর হইল, যেন নির্মেঘ আকাশে সহসা মেঘসঞ্চার হইল। কারণ, ভগিনীর সম্বন্ধে উভয় ভ্রাতারই বিশেষ স্নেহজ দৌর্ব্বল্য ছিল। পিতা স্বভাবতঃ গম্ভীর, চাকরীর কাযে অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিতেন, বিশেষ সংসারের সব কাযে তিনি গৃহিণীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া পারিবারিক জীবনে অশান্তি-সম্ভাবনা এড়াইয়া চলিতেন। মা সংসারের পরিচালন ও শাসনকার্য্যে এবং স্বামীর পদের গৌরব-রক্ষায় সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন; পুত্রদিগের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ কখন তাঁহার শাসন শিথিল করিতে পারে নাই। অজয় ও অভয় উভয়ের স্নেহ ভগিনীতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

অজয় বেশ-পরিবর্ত্তন না করিয়া বলিল, "চল—মা'কে দেখে আসি।"

অজয়কে দেখিয়া তাহার মাতা বলিলেন,—"এখনও কাপড় ছাড় নাই?"

অজয় বলিল, "কেমন ক'রে ছাড়ি বল। আসতেই অভয় সংবাদ দিল, তুমি জলস্পর্শ কর নাই।"

মা অভয়কে বলিলেন, "অভয়, মানুষ যখন শ্রান্ত হয়ে আসে, তখন কি তাকে ব্যস্ত করতে আছে?"

সে উপদেশ অজয় ও অভয় উভয়েই মাতার নিকট হইতে বহু বার পাইয়াছে। কিন্তু আজ অভয় সে উপদেশ পালন করিতে পারে নাই। সে কোন কথা বলিল না।

মা বলিলেন, "অজয়, যাও কাপড় বদলে হাত-মুখে ধুয়ে খাবার খেতে যাও।"

তিনি অজয়কে খাবার দিবার জন্য পাচককে ডাকিলেন, "ঠাকুর?"

অজয় বলিল, "সে হ'বে না, মা। তুমি খেলে তবে আমি খা'ব—নহিলে নহে।"

"পাগলামী করতে নাই।"

"তুমি ত জান, আমি বাজে কথা বলি না।"

সে কথা সত্য। অজয় কোন কথা বলিলে যে তাহাকে "না" বলান দুষ্কর, মা তাহা জানিতেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যুদ্ধে যা'বে ?"

বিষয়টি লঘু করিবার অভিপ্রায়ে অজয় বলিল, "না তুমি বুঝি মনে করেছ, আমি 'তাড়াতাড়ি ঘোড়া চড়ি'—'সমরে চলিনু হামি, হামে না ফিরাও' বলতে বলতে যুদ্ধে যা'ব ? সমর বিভাগে চাকরী—যুদ্ধে যেতে হ'বে না।"

"বিদেশে যেতে ত হ'তে পারে।"

"তা পারে।"

"তোমার আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবার কি প্রয়োজন হ'ল ?

"দেখ, মা, এটর্ণী হয়ে কত দিনে কিছু উপার্জ্জন করতে পারব, তা' বলা দুষ্কর।"

"যদি বিলম্বই হয়, তা'তে ক্ষতি কি ? তোমার কি এতই অভাব ?"

"নিজে উপার্জ্জন করা কি ভাল নহে ?"

"বাপ-মা'কে ফেলে রেখে যাবার কোন প্রয়োজন তোমার নাই। আমাদের যা' আছে, সে কি তোমাদের দুই ভাইয়ের নহে ?"

"কিন্তু মানুষের পক্ষে—"

বাধা দিয়া মা বলিলেন, "অজয়, আজ যদি সুধা বেঁচে থাকত, তবে কি তুমি যেতে পারতে ?"

তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিল।

যে স্থানে বেদনা থাকে, সেই স্থানে আঘাতে যেমন হয়, মা'র এই কথায় অজয়ের তেমনই হইল; সে পরাজয় মানিল—বলিল, "তোমাদের যদি এত আপত্তি থাকে, আমি না হয় যুদ্ধের কাযে যা'ব না। কিন্তু, মা, আমি যেমন তোমার একটা কথা রাখলাম, তেমনই তোমাকে আমার একটি কথা রাখতে হ'বে।"

"কি কথা অজয় ?"

"আমাকে বিবাহ করতে বলতে পা'বে না।"

"কেন ?"

অজয় সে প্রশ্নে উত্তর দিল না।

তাহার মাতা বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ নিশ্চয়ই করে-ছলাম; তা'র ফলে এ জন্মে সন্তানের মৃত্যু-শোক সহ্য করতে হচ্ছে। এ জন্মে কি অপরাধ করেছি যে, শেষ বয়সে সেবা-শুশ্রূষাতেও বঞ্চিত হ'ব ?"

"সেবা-শুশ্রূষা কি তোমার ছেলেদের চাইতেও তোমার বৌরা ভাল ক'রে করবে ?"

"তা' করবে। তোমরা সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য সৃষ্ট হও নাই; তাই তা' পার না; সে মেয়েদের কায।"

"সে জন্য তোমাকে ভাবতে হ'বে না। বিশেষ, মা, আজ কাল ত আর বৌরা সেকালের বৌ নহে।"

"কেন, অজয় ? আমি যা'কে মেয়ে মনে করতে পারব, সে আমাকে মা'র মতই মনে করবে।"

"সে কি হ'তে পারে ?"

"পারে,—তুমি দেখবে—পারে।"

অজয় আর তর্ক না করিয়া বলিল, "মা, তুমি আমাকে ঐ কথাটি ব'ল না।"

মা বলিলেন, "তুমি যে ভয় করছ, কাল আমি তোমাকে দেখিয়ে দিব, সে ভয়ের আর কোন কারণ নাই।"

অজয় বলিল, "কাল যা' হ'বে—সে কাল হ'বে; আজ তুমি উঠ। আমি বলছি, তুমি না খেলে আমি কিছু খা'ব না।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া রায় বাহাদুরের গৃহিণীকে উঠিতে হইল—পুত্র কিছু খাইবে না, ইহা মাতা সহ্য করিতে পারেন না।

অজয় কোনরূপে মা'কে শান্ত করিল বটে, কিন্তু তাহার দুশ্চিন্তার অবসান হইল না—বরং তাহা বর্দ্ধিতই হইল। যুদ্ধের কোন চাকরীতে যাইতে যে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, তাহা নহে—কেবল নানা কারণে বিরক্ত হইয়া সে পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়াছিল। কাযেই সে চাকরীতে যাইবার সঙ্কল্প-বর্জ্জনে তাহার দুঃখ হইল না। কিন্তু মা'র দ্বিতীয় প্রস্তাবই তাহাকে চিন্তিত করিল। মা'র কথা যেন কেমন রহস্য-কুহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়া তাহার মনে হইল। তিনি যদি একান্ত জিদ করেন, তবে যে তাহাকে পিতামাতার মতের ও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইতে হইবে, তাহা সে বুঝিল। কিন্তু পরদিন ভগিনীর মৃত্যু-দিন—সে দিন মা'র মনে কষ্ট দিতে অনিচ্ছা-হেতু সে সে বিষয়ে আর অধিক কিছু বলে নাই। সে অবস্থায় তাহাকে যখন—দুই দিন পরে হইলেও—মাতার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, তখন তাহার পক্ষে সংসার অশান্তিময় করিয়া তাহাতে বাস কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। কাযেই তাহার পক্ষে স্বাধীন ও শান্ত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করাই অভি-প্রেত হইবে। অথচ তাহার যে সহজ উপায় সে পাইয়াছিল, তাহা সে ত্যাগ করিল—যুদ্ধের যে চাকরী সে পাইতে পারে তাহা ত্যাগ করিল বলিয়া মা'কে জানাইল! সে কি ভুল করিল না? মা নন্দরাণীর সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাব যে যুক্তি দিয়া, যে উক্তিতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহাতে সে কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, সংসারে বর্ত্তমান অবস্থায় সে বিবাহ করিলে স্ত্রীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে।

এইরূপ দুশ্চিন্তায় অজয় সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। সে যত ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার ভাবনা বাড়িতে লাগিল। অথচ সে ভাবিয়া কোন উপায়ের সন্ধান পাইল না। তাহাতেই তাহার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

৯

পরদিন প্রভাতে রায় বাহাদুরের গৃহিণী উৎসুক ভাবে নন্দরাণীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে সুস্থ হইয়া স্বগৃহে যাইবার পর তিনি এত বার তাহাকে দেখিতে গিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কোন দিন—তাঁহার গৃহে আইসে নাই। তিনিও তাহাকে আসিতে বলেন নাই—সে না আসায় তাহার প্রতি অভিমানও করেন নাই; কারণ, স্নেহ নিম্নগামী।

বেলা যখন সাড়ে আটটা হইল, তখন রায় বাহাদুরের গৃহিণী আপনার দাসীকে নন্দরাণীর দাসীর নিকট তাহারা কখন আসিবে, সে সংবাদ আনিতে পাঠাইলেন। দাসী যখন নন্দরাণীর গৃহে উপনীত হইল, তখন সে তাহার "মাসীর" সঙ্গে রায় বাহাদুরের গৃহে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল।

নন্দরাণী তাঁহার গৃহে আসিলেই রায় বাহাদুরের গৃহিণী তাহাকে সাদরে যে ঘরে তাহার মৃতা কন্যার প্রতিকৃতি ছিল, সেই ঘরে লইয়া

যাইতে যাইতে বলিলেন, "আমি ভাবছিলাম, বুঝি মা'র রাগ দূর হয় নাই—তা' হ'লে আমাকে আবার যেতে হ'বে।"

বিপদের মত শিক্ষক আর নাই। অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ নন্দরাণীকে তাহার অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছিল—সে ভাবিয়া তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে শিখিয়াছিল। পূর্ব্বদিন রায় বাহাদুরের গৃহিণী তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার আন্তরিক ভাবের অভিব্যক্তি, তাহাতে তাহার সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাঁহার অশ্রুতে বুঝি তাহার মনের সঞ্চিত অভিমান দূর হইয়া গিয়াছিল। সে কেবলই তাঁহার কথা ও তাঁহার সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্যের বিষয় চিন্তা করিয়াছিল। সেই জন্য সে বলিল, "আপনি ও কথা ব'লে আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমার বিপদের সময় আপনি আমাকে যে যত্ন করেছেন—যে প্রাণ রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই তা'-ও যে যত্নে রক্ষা করেছেন, তা'তে মাসী বলেছে, বোধ হয়, আমরা যে কথা শুনেছিলাম, তা' সত্য নহে। আমিও যেন সেই কথাই মনে করছিলাম; আপনার মুখে সে কথা না শুনলে হয়ত তা'-ই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু তা'র পর আপনি যা' ব'লে এসেছেন, তা'তেও কি আর আমার মনে কোন ক্ষোভ থাকতে পারে?"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী বলিলেন, "তা'-ই বল, মা। আমি অপরাধী কি না, তা'-ই তোমার আসতে দেরী দেখে আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারলে না।"

নন্দরাণী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাহার "মাসী" রায় বাহাদুরের গৃহিণীকে বলিল, "আসবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, আপনি বয়সে মা'র বড়—অত স্নেহ করেন, আপনাকে কি বললে ভাল দেখায়?"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী বলিলেন, "তা'র উত্তর আমি দিচ্ছি। তোমার মা নাই—আমি তোমার মা; আমার মেয়ে গেছে—তুমি আমার মেয়ে। আমরা মা আর মেয়ে, কেহ কাহাকেও আর ছাড়ব না। আজ আমার বড় দুঃখের দিনে আমি তোমাকে পেয়েছি, মা।" বলিতে বলিতে কন্যার কথা স্মরণ করিয়া তিনি অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অশ্রু সংক্রামক। তাহার দুঃখও অল্প নহে—নন্দরাণীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না।

সেই সময় রায় বাহাদুরের গৃহিণীর দাসী আসিয়া বলিল, "বাবা কি বলতে এসেছেন।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান স্বামীর উদ্দেশে বলিলেন, "কি বলবে—এস। এ যে আমার নন্দরাণী—আমার বিপদের সম্পদ্।"

গগন বাবুর কিন্তু—তিনি যে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন—নন্দরাণীর সম্মুখে তাহা বলিতে তাঁহার সঙ্কোচ অনুভূত হইতেছিল। গৃহিণী পুনরায় তাঁহাকে তাহা বলিতে বলায় তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মেদিনীপুরের ভদ্রলোকটি আজ এসেছেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "বেশ ত, তুমি অজয়কে সঙ্গে ক'রে দেখে এস।"

গগন বাবুর—তাঁহার পত্নীর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ ঘটিল। অজয় তাঁহার সহিত মেয়েটিকে দেখিতে যাইবে! কিন্তু সে সময়ে আর সে কথা বলা তিনি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তুমি যদি দেখিতে চাহ—এখন ত তা' হয়।"

"ভাল। তুমি স্থান স্থির কর; আমি নন্দরাণীকে সঙ্গে লয়ে কাল যেতে পারি। আমাদের সেকালের চোখে আর নির্ভর করা যায় না। আর ওর ছোট বোনটিকে ও-ই পসন্দ করবে।"

গগন বাবু স্ত্রীর মস্তিষ্ক সুস্থ নাই ভাবিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া—যাইবার সময় কেবল বলিলেন, "অজয় কি যা'বে?"

গৃহিণী বলিলেন, "যা'বে। আমি তা'কে বলছি। তুমি তা'কে পাঠিয়ে দাও।"

গৃহিণীর স্বর কোমল হইলেও তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব-ব্যঞ্জক দৃঢ়তা ছিল। গগন বাবু আর কিছু না বলিয়া যাইয়া অজয়কে তাহার মাতার কাছে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাকে পাঠাইবার সময় তিনি তাহাকে বলিয়া দিলেন, সে যেন তাহার মাতার কথা মনোযোগ সহকারে শুনে—কারণ, তিনি তাঁহার কথায় অসংলগ্নতা লক্ষ্য করিয়াছেন।

ভাবিতে ভাবিতে অজয় মাতা যে কক্ষে ছিলেন, তাহার দ্বারে আসিয়া বলিল, "মা, আমায় ডেকেছ?"

মা বলিলেন, "হাঁ। মেদিনীপুর হ'তে একটি ভদ্রলোক মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য মেয়ে দেখাতে এসেছেন। তিনি আগেই ওঁকে পত্র লিখে ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলেন। আজ তিনি এসেছেন; তুমি ওঁর সঙ্গে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এস। ভদ্রলোকের মেয়ে বার বার দেখা আমি ভালবাসি না। যদি তোমাদের পসন্দ হয়, আমি কাল নন্দরাণীকে সঙ্গে ক'রে গিয়ে দেখব।"

অজয়ের নিকটেও মাতার কথা অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইল। সে বিস্মিত ভাবে বলিল, "আমি যা'ব কেন, মা?"

"একালের পসন্দ আর সেকালের পসন্দ একরূপ নহে। সেই জন্য আমি যেমন নন্দরাণীকে সঙ্গে করে যা'ব—তেমনই তোমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে বলছি।"

অজয় বলিল, "না, মা, আমি যা'ব না।"

মাতা বলিলেন, "অভয়ের জন্য মেয়ে দেখতে ত আমি তা'কে যেতে বলতে পারি না, অজয়। তোমাকেই যেতে হ'বে।

অজয় কতকটা স্বস্তি অনুভব করিল। সে মনে করিল, সে বিবাহ করিব না বলায় মা অভয়ের বিবাহ দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

কিন্তু তাহার সে বিশ্বাস যে ভুল, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তাহার মাতা বলিলেন, "তোমার বিবাহ আমি নন্দরাণীর সঙ্গে দিব—তা'র পরেই অভয়ের বিবাহ দিলে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয়।"

তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত কথায় নন্দরাণী ও অজয় উভয়েরই মুখে লজ্জায় রক্তাভা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু অজয়ের মুখ তাহার পরেই পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তবে সে যাহা বলিতে চাহিল, স্থানকাল বিবেচনা করিয়া তাহা বলিতে পারিল না—নন্দরাণী তথায় ছিল। সে কেবল বলিল, "মা, আমার একটা কথা তোমাকে শুনতে হ'বে।"

তাহার মাতা বলিলেন, "অজয়, আমি তোমার মা। আজ আমার বড় দুঃখের দিন—এ দিন তুমি আমার কথায় 'না'—ব'ল না; আমি তোমার কাছে—মা হয়ে ছেলের কাছে—এই ভিক্ষা চাহিতেছি।"

অজয় ইহার পর আর কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহার সেই ভাব ঘুচাইয়া তাহার মাতা বলিলেন, "তুমি যে ভয় করছ, তা'র আর কোন কারণ নাই। আমি এক দিন যে ভুল করেছিলাম, তা'র জন্ম অনুতপ্ত হয়ে নন্দরাণীর কাছে ক্ষমা চেয়েছি; সে ক্ষমা যে আমি পেয়েছি তা' নন্দরাণী আজ আমার কাছে এসে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নন্দরাণী যা ভুলতে পেরেছেন, তা' কি তুমি ভুলতে পারবে না?"

অজয় আর কিছু বলিতে পারিল না—বুঝি বলিতে চাহিল না—বলিবার আর কিছু ছিল না।

তাহার মাতা বলিলেন, "অজয়, তুমি যাও—ওর সঙ্গে কথা ব'লে তোমরা কখন যা'বে স্থির ক'রে ভদ্রলোকটিকে ব'লে দাও। বেলা হয়েছে—তাঁ'কে আর অপেক্ষা করান ভাল হ'বে না! নন্দরাণীকে আজ আমি যেতে দিব না। মানুষ যে বিপদের মধ্যেও সম্পদ্ পেতে পারে—আমি আজ তা'ই অনুভব করছি।"

অজয় চলিয়া গেল; যাইবার সময় নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল,—সে তখন দৃষ্টি নত করিয়া আছে। সে বুঝি কান্দিতেছিল। সে ক্রন্দনে দুঃখ ও সুখ উভয়ই কি অভিব্যক্ত হইতেছিল?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে

এই দণ্ডমহোৎসবের পর রঘুনাথ নিজ গৃহে গমন করিলেন বটে, কিন্তু নিশ্চিত বুঝিলেন, এই বার তিনি প্রাণের পরমারাধ্য দেবতার চরণ লাভ করিলেন। বিষয়-বিভব ও যুবতী সহধর্ম্মিণীর সঙ্গ কিছুই আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি আর অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিতা-মাতা ও পিতৃব্য তাঁহার এই ভাব দেখিয়া দুর্গা-মণ্ডপেই উপযুক্ত প্রহরীর ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথ যেখানে যাইতেন, দুই চারি জন প্রহরী সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। দিবারাত্রির মধ্যে কখনও নিকটে কখনও বা দূরে থাকিয়া তাহারা তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিত—কখনও চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দিত না।

রঘুনাথ দাসের বিবাহ হইয়াছিল এইমাত্র পরিচয়। তাঁহার স্ত্রী "অপ্সরার" ন্যায় সুন্দরী, ইহাও জানিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীর কি নাম, বা তিনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বা রঘুনাথ দাসের গৃহ-ত্যাগের পর কি ভাবে তিনি জীবন নির্ব্বাহ করিতেন, সে সকল কিছুই জানা যায় না। সমসাময়িক গ্রন্থকার রঘুনাথ দাসের মর্ম্মী শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী হয়ত ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ জানাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনিও সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। রঘুনাথের দুর্গা-মণ্ডপে অবস্থানের দ্বারা পত্নীসঙ্গ-বর্জ্জনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। বিবাহের পরে শাক্যসিংহ (যিনি ভবিষ্যতে গৌতমবুদ্ধ হইয়াছিলেন) কিছু দিন পত্নীপ্রেমে নিমজ্জিত হইয়া কাল-যাপন করিয়াছিলেন—তাঁহার রাহুল নামে একটি পুত্রও জন্মিয়াছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের মর্ম্মী ভক্ত তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারী, বৈরাগ্যের প্রকটমূর্ত্তি রঘুনাথ—সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বন্ধন সুন্দরী যুবতী পত্নীর প্রণয়েও উদাসীন। দণ্ড-মহোৎসব হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার এই বৈরাগ্য আজ্যসমিদ্ধ অগ্নির মত আরও প্রবল ভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

এই সময়ে শ্রীভগবৎকৃপায় তাঁহার গৃহত্যাগের একটি সুযোগ মিলিয়া গেল। দীক্ষাগুরু অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য মজুমদারের গৃহে পৌরোহিত্যের কাজ করিতেন। কাজেই রঘুনাথের গৃহ-দেবতার সেবার ব্যবস্থার ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত। আচার্য্য নিজে পুরোহিত-রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সর্ব্বকালীন সেবার ভার যদুনন্দন আচার্য্যের এক জন ব্রাহ্মণ-শিষ্যের উপর ন্যস্ত ছিল। যদুনন্দন আচার্য্য বাসুদেব দত্তেরও অতিপ্রিয় এবং শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের উপদেশে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে উপাস্য বলিয়া অবগত ছিলেন। রঘুনাথ তাঁহার প্রিয়শিষ্য। এক দিন রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড থাকিতে আচার্য্য হিরণ্যদাসের বহির্ব্বাটী—যেখানে দুর্গা-মণ্ডপে রঘুনাথ অবস্থান করিতেন—সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন—"দেখ! যে-ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সেবা করিত, সে সেবার কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু সেবা করিতে পারে, এমন উপযুক্ত ব্রাহ্মণও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব তুমি তাহাকে অনুরোধ করিয়া যত দিন যোগ্য ব্রাহ্মণ পাওয়া না যায়—তত দিন যাহাতে সে সেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা কর।" যদুনন্দন আচার্য্য দুর্গামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র রঘুনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। এখন আচার্য্যের আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি আচার্য্যের কথা অনুসারে সেই সেবক ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিবার জন্য আচার্য্যের সহিত বাহিরে আসিলেন। দৈবক্রমে রঘুনাথের রক্ষকগণও ঐ সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। রঘুনাথ ভাবিলেন, পলাইবার এই তো উপযুক্ত সুযোগ। তিনি গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া—তাঁহার নিকট যেন পূর্ব্বোক্ত সেবক ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিতে যাইতেছেন—এই ভাবে ছলক্রমে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই সেবক ব্রাহ্মণের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ঠাকুর-সেবার কথা বলিয়া নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বেই শিবানন্দ সেন গৌড়ের ভক্তগণকে লইয়া রথযাত্রার প্রাক্কালে পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-কামনায় যাত্রা

করিয়াছেন। রঘুনাথ সে পথেও যাইতে পারেন না—পাছে ধরা পড়েন। পিতা ও পিতৃব্য তাঁহার পলায়নের সংবাদ পাইলেই লোকজন ও প্রহরীদের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিবেন। এই জন্য তিনি নীলাচলে যাইবার প্রসিদ্ধ পথে না গিয়া বনপথে বা অপ্রশস্ত পথে চলিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রথম দিন একরূপ দৌড়াইতে দৌড়াইতেই ১৫ ক্রোশ বা ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রঘুনাথ এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগ্যবান্ গোয়ালা দুগ্ধের দ্বারা সে রাত্রে এই অতিথির সেবা করিল। দুগ্ধ পান করিয়া ও বাথানে কোনরূপে রাত্রি-যাপন করিয়া রাত্রি শেষ না হইতেই তিনি আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে পূর্ব্বদিকে গিয়া তথা হইতে দক্ষিণ মুখে চলিলেন। পরে ছত্রভোগ পার হইয়া বহু অপ্রসিদ্ধ গ্রাম দিয়া তিনি সত্বানে উপস্থিত হইলেন। এই ভাবে রঘুনাথ বারো দিনে শ্রীপুরুষোত্তমধামে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন। এই দ্বাদশ দিনের মধ্যে মাত্র তিন দিন আহার জুটিয়াছিল—এইরূপ বেগে আসিতেছিলেন বলিয়া শিবানন্দ সেনের অধিনায়কত্বে গৌড়ীয় যাত্রীদল পূর্ব্বে যাত্রা করিলেও তাহারা নীলাচলে পৌছিবার পূর্ব্বেই রঘুনাথ নীলাচলে আসিয়া পৌছিলেন।

এ দিকে প্রাতঃকাল হইতে রঘুনাথের রক্ষীরা রঘুনাথকে না দেখিয়া তাঁহার গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্যের নিকট অনুসন্ধানে গেল। যদুনন্দন আচার্য্য বলিলেন—"রাত্রি থাকিতেই রঘুনাথ মধ্যপথে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক আমার আদেশ পাইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।" রক্ষীরা তখন ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্যকে তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইলে তাঁহারা ভাবিলেন যে, শিবানন্দ সেনের সহিত যে যাত্রীদল যাইতেছে, রঘুনাথ তাহাদেরই সঙ্গে পুরী যাইবে বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে! এ জন্য তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া শিবানন্দ তাঁহাদের একমাত্র পুত্রকে যাহাতে ফিরাইয়া দেন, এই ভাবে মিনতিপূর্ণ এক পত্র লিখিয়া রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য দশ জন অশ্বারোহী পাইককে গৌড়ীয় যাত্রীদলের সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাহারা নীলাচলে যাইবার পথে ঝাঁকরাতে আসিয়া গৌড়ীয় যাত্রীদলের সাক্ষাৎ পাইল। শিবানন্দ সেন পত্রোত্তরে হিরণ্য দত্ত গোবর্দ্ধন দাসকে জানাইলেন যে, রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গে আসে নাই বা তাঁহাদের সহিত রঘুনাথের সাক্ষাৎও হয় নাই। এই পত্র লইয়া পাইকগণ কৃষ্ণপুরে ফিরিয়া আসিল। রঘুনাথের পিতা, মাতা ও পিতৃব্য রঘুনাথ কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহার জন্য চিন্তিত রহিলেন।

নীলাচলে কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপাদি ভক্তগণসহ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ উপস্থিত হইয়া দূর হইতে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সে সময়ে মুকুন্দ দত্ত ঐ স্থানে ছিলেন, তিনি 'রঘুনাথ আসিয়াছে' এই সংবাদ মহাপ্রভুকে জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে নিকটে আহ্বান করিলে রঘুনাথ গিয়া মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করিলেন। মহাপ্রভু তখনই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া রঘুনাথ স্বরূপ-প্রমুখ ভক্তগণকে পাদগ্রহণ-পুরঃসর দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যদিও তাঁহারা রঘুনাথকে চিনিতেন না, তথাপি রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর অনুগ্রহ দেখিয়া তাঁহারাও জনে জনে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপাই তোমাকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।" রঘুনাথ অতি বিনীত—তিনি মনে মনে বলিলেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণকে জানি না—তোমাকেই জানি। তোমার কৃপাবলেই আমি বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম, ইহাই আমি সত্য বলিয়া মনে করি।" তখন মহাপ্রভু সপ্তগ্রামের অধিকারী হিরণ্য মজুমদারের ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের পরিচয় ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া কৌতুকভরে বলিলেন—"আমার মাতামহ শ্রীপাদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বন্ধু বলিয়া তোমার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে আমি মাতামহ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। অতএব আমি তাঁহাদিগকে পরিহাস করিয়া বলিতেছি। তাঁহারা দুই জনেই বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট, তাঁহারা মহাবিরক্তিজনক বিষয়ের পীড়াকেই সুখ বলিয়া মনে করেন। যদিও তাঁহারা নিজেরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণভক্ত ও অর্থাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা বৈষ্ণবের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন। বিষয়ের স্বভাবই এইরূপ বিষয়-বিভব লোককে অন্ধ করিয়া ফেলে। তাহারা অহিতকে হিত মনে করিয়া যে কর্ম্মের দ্বারা সংসার-বন্ধনের উদ্ভব হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এ হেন মহা মোহজনক বিষয়ের হস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণ তোমায় উদ্ধার করিলেন, অতএব কৃষ্ণ-কৃপার সুমহৎ মহিমার কথা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।"

গুরু পথশ্রমে রঘুনাথকে কৃশ ও মলিন দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে স্বরূপ-দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন—

"এই রঘুনাথে আমি সোঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় আমার স্থানে।
'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি হৈতে ইহার নামে॥"

অতঃপর মহাপ্রভু নিজ ভৃত্য গোবিন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ উপবাস করিয়া পথক্লেশে কৃশ হইয়াছে, অতএব কিছু দিন ইহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া ও পরিচর্য্যা করিয়া যাহাতে এ সুস্থ হইতে পারে, তাহার উপায়বিধান কর।" বলা বাহুল্য, স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ উভয়েই মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। স্বরূপ রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে স্নানাদি করাইয়া গোবিন্দের দ্বারা মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের পাত্রাবশেষ দানে রঘুনাথকে পরম পরিতৃপ্ত করিলেন। রঘুনাথ এই অবধি "স্বরূপের রঘুনাথ" নামে পরিচিত হইলেন।

স্বরূপ-দামোদরের পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। ইঁহার পিতার নাম পদ্মগর্ভ আচার্য্য। পদ্মগর্ভ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুলের শ্রেষ্ঠ কুলীন। কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ এগারসিন্দুরের নিকটস্থ ভিটাদিয়া গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। পদ্মগর্ভ যৌবনের প্রারম্ভে ভিটাদিয়া হইতে অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপ আগমন করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য, রূপ ও বংশপরিচয়ে পরিতুষ্ট হইয়া নবদ্বীপবাসী জয়রাম চক্রবর্ত্তী ইঁহার অধ্যয়নের অবস্থাতেই ইঁহাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া ইঁহাকে নবদ্বীপস্থ নিজালয়ে রাখিয়া অধ্যয়ন করান। এখানেই জয়রাম চক্রবর্ত্তীর তনয়ার গর্ভে ইঁহার প্রথম পুত্র পুরুষোত্তম আচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। পুরুষোত্তম আচার্য্য অল্প বয়স হইতেই অধ্যয়নে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়াদি ষড়্দর্শন, বিশেষতঃ

বেদান্তের বৈষ্ণবভাষ্যে ও রসশাস্ত্রে ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ইনি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া বারাণসীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখিয়া ইঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষার গুরু চৈতন্যানন্দ ইঁহাকে কাশীধামে গিয়া বেদান্ত অধ্যাপনা করিতে বলেন; কিন্তু ইনি তাহা না করিয়া এবং গুরুর স্থানে যোগপট্ট গ্রহণ না করিয়াই ব্রহ্মচারী অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে অবস্থান করিবেন জানিতে পারিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের পদে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সময়ে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া পুরুষোত্তমধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি সাদরে ইঁহাকে নিজের নিকটে রাখিয়া দিলেন। পুরীধামে ইনি মহাপ্রভুর অদ্বিতীয় সহায় ও সঙ্গী ছিলেন। ভাব ও তত্ত্ব-বিচারে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহার উপর মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাবের মর্ম্মজ্ঞ এমন আর কেহ ছিলেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ অবস্থায় গম্ভীরা লীলায় ইনি এবং শ্রীল রামানন্দ রায়ই তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গিরূপে সতত তাঁহার সহিত অবস্থান করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, ইনি তখনই স্বকণ্ঠে সেই ভাবানুরূপ গীত গাহিয়া তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেন। ইনি সত্য সত্যই মহাপ্রভুর দ্বিতীয় "স্বরূপ"।

এই স্বরূপের হস্তে রঘুনাথের সমস্ত ভার অর্পিত হইল। এই স্বরূপদামোদর গোস্বামী দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে যাপন করিতেন এবং মহাপ্রভুর অন্তরের ভাবানুযায়ী সঙ্গীত শ্লোকে ও আলোচনায় তাঁহার সেবা করিতেন। অবসর সময়ে তিনি এই অন্তরঙ্গ-সেবার বৈশিষ্ট্য রঘুনাথকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রঘুনাথও স্বরূপের সঙ্গে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান করিয়া নাম-জপ ও ব্রজলীলার অষ্টকালীন স্মরণ-মননে অভ্যস্ত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সাক্ষাদ্ভগবদ্ভাবের সেবা শ্রীশ্রীরাধাভাবময় বৈশিষ্ট্য সহকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে প্রকট দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই সুদুর্লভ অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার পাইয়াও তিনি প্রথমে এক দিন স্বরূপের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট সাক্ষাৎ ভাবে উপদেশপ্রার্থী হইলেন। যথা—

"প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে—
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে—
কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে কর উপদেশ॥
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—
তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহা স্থানে।
আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্য তবে করিহ নিশ্চয়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাইবে বিশেষ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ *
"এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন॥
পুন সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে যে উপদেশ দিলেন, বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য—বৈষ্ণবের বাহ্য ও অন্তরঙ্গ সাধনের উপদেশ এত অল্প কথায় আর কোথাও প্রদত্ত হয় নাই। গ্রাম্যকথায় আলোচনার পর্ব্ব পরচর্চ্চা মাত্র লাভ—আর ইহাতে বিষয়াসক্তিই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; গ্রাম্য-বার্ত্তা শ্রবণেও ঐ ফল। অথচ ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বপ্রকার বিষয়াসক্তি-শূন্য করিয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। এই জন্য বাহ্যভোগ ও বিষয়াসক্তিরূপ আন্তর ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই বৈষ্ণব-সাধনার মূল ভূমি।

আর্য্যসাধনার দুইটি পথ। একটি ব্যতিরেক-মুখে সর্ব্বপ্রকার বিষয়াসক্তি ত্যাগ, আর একটি অন্বয়-মুখে ইষ্টবস্তুতে অভিনিবেশ। ব্যতিরেক-মুখে আহার ও বেশ-বিন্যাসে অভিনিবেশ ত্যাগ ও অন্তরে বিষয়াসক্তি ত্যাগ। অন্বয়-মুখে ইষ্টবস্তুতে আসক্তিলাভ। ভোজনাগ্রহত্যাগ ও বেশবিন্যাসের চেষ্টা ত্যাগ—ব্যতিরেক-মুখের এই সাধনা "ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে"—এই কথার দ্বারা তাহারই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "গ্রাম্যকথা না কহিবে ও গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনিবে" ইহার দ্বারা অন্তরের বিষয়াসক্তি বর্জ্জনের উপদেশ দেওয়া হইল। অতঃপর অমানী মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণের দ্বারা বৈষয়িক ও ব্যবহারিক অহঙ্কারের মূল উচ্ছেদ করিয়া "অহং অভিমানী" জীবকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির অন্বয়মুখীন সাধনে নিযুক্ত করা হইল। ইহাতেই জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাসে পরিণত করা হইল। সাধনভূমির এই কৃষ্ণদাসত্বই সিদ্ধ অন্তরঙ্গ সেবায় পরিণত হইলেই সিদ্ধদেহে মানসে রাধাকৃষ্ণ সেবা লাভ হয়। এই জন্যই মহাপ্রভু

---

* এই শ্লোকের অর্থ চরিতামৃতকার অন্ত্যলীলায় শেষ পরিচ্ছেদে করিয়াছেন, যথা—

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

রঘুনাথকে মানসে ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণসেবা করিবার উপদেশ দান করিলেন।

শ্রীল মহাপ্রভুর এই উপদেশে সর্ব্বপ্রকার সাধনার সার নিহিত। রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকট যে উপদেশ লাভ করিলেন, সমস্ত জীবন ধরিয়া অতি সাবধানে তাহার অনুষ্ঠান করিয়াই তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া "শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী"তে পরিণত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ শুদ্ধ যে এই উপদেশ পাইলেন তাহা নহে, এই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে যিনি এই উপদেশ-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—আদর্শরূপে সেই মহাপ্রভুর অভিন্নাত্মা শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীকেও শিক্ষাগুরু-রূপে প্রাপ্ত হইলেন। আর সাক্ষাৎ ভাগবত-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকেও প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বহু জন্মের সুকৃতির ফলস্বরূপ রঘুনাথ যে সম্পদ্ লাভ করিলেন, তাহার তুলনায় তাঁহার অতিসমৃদ্ধ বিষয়ভোগ তুচ্ছ হইয়া গেল। তিনি বাহিরের ও অন্তরের পরিপূর্ণতম সম্পদ্‌লাভে কৃতার্থ হইলেন—তাঁহার চিরপোষিত বাসনা এত দিনে সফল হইল। এই সাধনের ক্রমানুসারে রঘুনাথের জীবন কিরূপে উন্নীত হইয়াছিল—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা অতঃপর তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে আগমন করিবার পর শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে পথক্লেশে কৃশ ও দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁহার প্রিয় সেবক গোবিন্দের দ্বারা তাঁহাকে মহাপ্রসাদ দিবার ব্যবস্থা করেন। রঘুনাথ মাত্র পাঁচ দিন এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাহার পরেই এইরূপে মহাপ্রসাদ গ্রহণ তাঁহার সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। তিনি দিনান্তে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান থাকিতেন। পুরীধামে এইরূপ নিয়ম আছে যে, যাঁহারা সর্ব্বকাল নামকীর্ত্তনাদিরূপ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা জীবিকা-নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য মন্দিরের সিংহদ্বারে অবস্থান করেন। শ্রীল জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণ পসারীর দ্বারা ইঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। রঘুনাথ এই ভাবেই জীবিকার জন্য রাত্রিকালে সিংহদ্বারে ভিক্ষার দ্বারা উদরান্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। মহাপ্রভু এই সকল জানিতে পারিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন—"ভজনশীল বৈরাগী সর্ব্বদা নাম-সংকীর্ত্তন করিবে এবং ভিক্ষা করিয়া কোনওরূপে জীবন রক্ষা করিবে। বৈরাগী যদি জিহ্বার পরিতৃপ্তির জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহার চিত্ত বিষয়-রসের বশীভূত হইয়া পড়ে। তাহাতে তিনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরাধীন হন এবং সর্ব্ববিষয়ে ভগবানের উপরে নির্ভর করা রূপ যে ধর্ম্ম তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সেই পরমার্থের হানি ঘটে। জিহ্বার লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য যে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সেই শিশ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তির কখনই শ্রীকৃষ্ণ লাভ হয় না।

এই অবস্থায় রঘুনাথের আর এক বাধা উপস্থিত হইল। গৌড়ের ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া গেলে রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য তাঁহাদের নয়নের মণি রঘুনাথের এই কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া পুনরায় যখন গৌড়ীয় ভক্তগণ দলবদ্ধ হইয়া রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরীধামে আগমন করেন, তখন এক জন ব্রাহ্মণকে ভৃত্য সঙ্গে দিয়া ও চারি শত মুদ্রা দিয়া নীলাচলে পাঠাইলেন। ইঁহারা আসিয়া রঘুনাথকে ভিক্ষা ত্যাগ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। ইঁহারা যখন কিছুতেই ছাড়িবেন না, তখন রঘুনাথ ইঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতি মাসে মহাপ্রভুকে দুই বার মহাপ্রসাদের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় দুই বৎসর ধরিয়া এই ভাবে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার পর রঘুনাথের হৃদয়ে নির্ম্মল বুদ্ধির আবির্ভাব হইল। তিনি ভাবিলেন—"আমি এই প্রকারে নিমন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষ ভাবে শ্রীচৈতন্যদেবকে বিষয়ীর অন্ন ভোজন করাইয়া কষ্ট দিতেছি! প্রভু মহাপ্রভু আমার ন্যায় মূঢ় ব্যক্তি যাহাতে মনে কষ্ট না পায়, তজ্জন্য এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া থাকেন—কিন্তু এইরূপ নিমন্ত্রণে কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হওয়া সম্ভবপর নহে।" ইহা মনে করিয়া রঘুনাথ পিতৃ-প্রেরিত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ বন্ধ করিলেন এবং মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করাও বন্ধ করিয়া দিলেন।

দুই মাস মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ না করার পরে তিনি শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর স্বরূপের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি বলিলেন—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন ছিল।
ভাল হৈল জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল॥"

—চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

এইরূপে রঘুনাথের ভজন-পথের এ বিঘ্ন দূর হইল।

রঘুনাথ কিছু দিন পরেই সিংহদ্বারে ভিক্ষা ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীল পুরুষোত্তমধামে সহৃদয় ভক্তগণ—বহু দেবালয়, মঠও স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল স্থানে ভিক্ষুক সাধুগণকে ভিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। রঘুনাথ এই সকল সত্রে ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দের নিকট হইতে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর বলিলেন যে, "রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা করা দুঃখজনক মনে করিয়া এখন মধ্যাহ্নকালে সত্রে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আহার করিতেছে।" শ্রীচৈতন্যদেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন—

"—ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥

তথাহি কিমর্থম্? অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি, অনেন দত্তম্ অয়মপরঃ সমেত্যয়ং দাস্যতি, অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতীত্যাদি।"

এইবার শ্রীচৈতন্যদেব দেখিলেন যে, রঘুনাথের সমস্ত অভিমান ত্যাগ হইয়াছে। এইবার তাঁহাকে তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া মনে করিলেন।

শ্রীল শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক জন সন্ন্যাসী শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধনের এক খণ্ড শিলা ও তৎসহ এক ছড়া গুঞ্জামালা আনয়ন

করিয়া উহা শ্রীচৈতন্যদেবকে উপহার দেন। শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে গোবর্দ্ধন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপগণের যে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞের অন্নকূট উৎসবে স্তূপীকৃত অন্নাদি ভোজন করিয়াছিলেন, শ্রীভাগবতে ইহা বর্ণিত আছে। এই জন্য ভক্তগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন এবং এই জন্য পাদস্পর্শ ভয়ে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে আরোহণ করেন না। পরন্তু, শালগ্রামে যেরূপ নারায়ণ জ্ঞান পূর্ব্বক পূজাদি করা হইয়া থাকে, বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ডকেও শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে সেইরূপ সেবা-পূজাদি করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই গোবর্দ্ধনশিলাকে প্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে সেবা ও পূজাদি করিতেন এবং সময়ে সময়ে ঐ শিলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইতেন। এইরূপে এই গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীচৈতন্যদেবের অতিশয় প্রিয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব এই শিলাকে 'কৃষ্ণ-কলেবর' নামে অভিহিত করিতেন এবং স্মরণের কালে গুঞ্জামালা গলদেশে ধারণ করিয়া এই শিলাকে নয়ন-জলে অভিষিক্ত করিতেন। মহাপ্রভুর পরমাদরের এই দুই অপূর্ব্ব শক্তিশালী বস্তু এইবার তিনি রঘুনাথকে দান করিলেন। কি প্রকারে এই শিলাকে সেবা ও পূজা করিতে হইবে, তাহার বিধানও তিনি রঘুনাথকে বলিয়া দিলেন। যথা—

> প্রভু কহে—এই শিলা "কৃষ্ণের বিগ্রহ"।
> ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
> এই শিলায় কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন।
> অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন॥
> এক কুজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী।
> সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ ভাবে করি॥
> দুই দিগে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
> এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি।
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের স্বহস্ত-প্রদত্ত এই প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি অতিশয় আনন্দভরে এই গোবর্দ্ধনশিলার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী এক বিতস্তি প্রমাণ দুইখানি বস্ত্র, একখানি পিঁড়ি ও জলের জন্য একটি কুজা সংগ্রহ করিয়া দিলে রঘুনাথ সাত্ত্বিক সেবার উপকরণ জ্ঞানে ইহার দ্বারাই পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজাকালে তিনি এই শিলাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিতে পাইতেন। "প্রভু নিজে এই শিলার সেবা করিতেন এবং তিনি স্বহস্তে আমাকে এই দুই দ্রব্য দান করিয়াছেন" ইহা মনে করিয়া রঘুনাথের হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রঘুনাথ এখন কপর্দ্দকহীন বিরাগী, ইহা দেখিয়া স্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দকে বলিয়া প্রতিদিন পূজা দিবার জন্য অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অবশেষে এই প্রকার প্রেমপূর্ণ সাত্ত্বিক সাধনে রঘুনাথের প্রতীতি হইল—

> "শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
> গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে॥"

এই প্রতীতির আনন্দে সেবাকালে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মৃতি ঘটিত এবং তিনি সিদ্ধদেহে তাঁহার অভীষ্টদেবের সঙ্গ লাভ করিতেন। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে এই যে নিয়ম অবলম্বন করিলেন—জীবনে আর তাহা ত্যাগ করেন নাই! সমস্ত দিবসের আট প্রহর কালের মধ্যে—সেবা, পূজা, স্মরণে ও নামসঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার সার্দ্ধসপ্ত প্রহরকাল কাটিয়া যাইত, মাত্র চারি দণ্ড কালের মধ্যে তিনি আহার ও নিদ্রা শেষ করিয়া লইতেন। সত্রে গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতেও তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত—এই জন্য অবশেষে তিনি তাহাও ত্যাগ করিলেন। এইবার তিনি এক অপূর্ব্ব উপায়ে জীবন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যাহারা প্রসাদ বিক্রয় করিত, তাহাদের যে সমস্ত অবিক্রীত প্রসাদ থাকিত, তাহা পচিয়া উঠিলে পসারীরা তাহা সিংহদ্বারে গাভীদিগকে খাওয়াইবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিত। কিন্তু তখন পচা গন্ধে গাভীরাও উহা খাইতে পারিত না—তখন রঘুনাথ ঐ প্রসাদান্ন সংগ্রহ করিয়া তাহা জলে ধুইয়া উহার ভিতর যে মাজিভাত পাইতেন, লবণ মিশাইয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন। রাজপুত্র তুল্য রঘুনাথের এই অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের সত্যই তুলনা নাই। এই ভাবে তিনি স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গিরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সেবায় সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসরকাল নিযুক্ত থাকিয়াও মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলা দর্শন করিলেন। রঘুনাথ দাসের এই অনুপম বৈরাগ্য ও সাধনার কথা কহিতে কহিতে আত্মহারা হইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় নিষ্কিঞ্চন সাধকও বলিয়াছেন—

> "তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
> সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥"

স্বরূপ-দামোদর ক্রমে রঘুনাথ দাসকে এইরূপ ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া নিজে এক দিন রঘুনাথের নিকট হইতে ঐ অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ চাহিয়া লইয়া ভক্ষণ করিলেন। তিনি এই প্রসাদের অপূর্ব্ব আস্বাদে মুগ্ধ হইয়া রঘুনাথকে বলিলেন যে, "তুমি এই অমৃত সম প্রসাদ আস্বাদ করিতেছ, কিন্তু ইহা আমাদিগকে দেও না কেন?" পরে শ্রীচৈতন্যদেব এক দিন রঘুনাথের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ইহার এক গ্রাস আস্বাদন করিলেন এবং দ্বিতীয় গ্রাস লইবার কালে স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার হাতে ধরিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। মহাপ্রভু এই প্রসাদ আস্বাদন করিয়া বলিলেন—

> "—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
> ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই।"

এই প্রকারে রঘুনাথের বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেবও রঘুনাথের উপর পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

কথাশিল্পীর হত্যা-রহস্য

(উপন্যাস)

তৃতীয় পল্লব

পিতা ও পুত্রী

সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে ওলিভিয়ার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ডেভিড গারসাইড কারা-কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে ওলিভিয়া এমন বিহ্বল হইয়া পড়িল যে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আত্মসংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। সে সেই নিভৃত কারা-কক্ষের কড়ি-বরগার দিকে চাহিয়া কত কথাই চিন্তা করিতে লাগিল!

ওলিভিয়া আপনাকে অত্যন্ত অসহায় ও বিপন্ন মনে করিত। সে তাহার পিতা জিওফ্রি ডেনের উপর নির্ভর করিতে পারিত না; তাহার সততায় ওলিভিয়ার আস্থা ছিল না। এক দিন সে বোমন্ট রেস্তোরাঁয় বসিয়া হঠাৎ শুনিতে পাইল—দুইটি রমণী তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। এক জন তাহার সঙ্গিনীকে বলিল, "ও বেচারাকে দেখিলে সত্যই আমার মনে করুণার উদ্রেক হয়। উহার বাপ যে পাকা চোর, এ কথা উহার জানা আছে বলিয়া তোমার মনে হয় কি?"

দ্বিতীয় রমণী বলিল, "এ সংবাদ উহার জানা না থাকিলেও উহা জানিতে অধিক বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পুলিশ যে কোন মুহূর্ত্তে জিওফ্রি ডেনকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। সে পুলিশের চক্ষুতে অনেক দিন হইতে ধূলা দিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এক দিন উহাকে জেল খাটিতেই হইবে। সে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাহার কি সংখ্যা আছে? জিমি মাষ্টার্স আমাকে তাহার যে সকল গুণের কথা বলিতেছিল—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ওলিভিয়া একটি রমণীকে তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করিল। সেই রাত্রেই সে তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "বাবা, তোমার সঙ্গে আমার দুই একটা কথা আছে। শুনিলাম, কোন অপরাধজনক কার্য্যেই তোমার কুণ্ঠা নাই! এ কথা কি সত্য?"

তাহার পিতা ক্রূর হাস্যে বিদ্রূপ-ভরে বলিল, "এরূপ স্পষ্ট ভাষায় আমাকে অপরাধী বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিলে না। ইহা পিতৃভক্তির নিদর্শন বটে!"

ওলিভিয়া এ কথায় বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া বলিল, "কিন্তু আমি সত্য কথা জানিতে চাই। বহু দিন হইতেই তোমার সম্বন্ধে আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা বাধিয়াছে। সর্ব্বদা আমার মনে হয়, অন্যান্য লোকের সহিত তোমার চরিত্রগত পার্থক্য অনেক অধিক।"

পিতা বলিল, "হাঁ, তোমার এ অনুমান সত্য। যদি আমাকে অন্যান্য লোকের মত সাধু ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত, তাহা হইলে এত দিন আমি অনাহারে শুকাইয়া মরিতাম। কিন্তু আমি ইচ্ছামত চলায় এই ফ্ল্যাট ভাড়া লইয়া সুখে বাস করিতেছি এবং তোমাকেও বেশ সুখে রাখিয়াছি। স্বচ্ছন্দে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। এ জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতার আশা করি না; কিন্তু কৃতজ্ঞ না হইলেও তুমি আমাকে অপরাধী বলিয়া বিদ্রূপ করিবে কেন?"

ওলিভিয়া বলিল, "যাহা শুনিয়াছি—তাহা তবে সত্য?"

জিওফ্রি ডেন বলিল, "সত্য কি না তাহা শীঘ্রই তুমি জানিতে পারিবে।"—ওলিভিয়াকে সে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিল; কিন্তু ওলিভিয়া না বসিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "বাবা, আমি আর কোন কথা শুনিতে চাহি না। আমি বড়ই লজ্জা বোধ করিতেছি!"

জিওফ্রি তাহাকে ধরিয়া বসাইবার জন্য হাত বাড়াইল; কিন্তু ওলিভিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ইহা আমার অসহ্য!"

জিওফ্রি ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "তবে কি আমার সংস্রব ত্যাগ করাই তোমার ইচ্ছা?"

ওলিভিয়া বলিল, "হাঁ। ইহা ভিন্ন আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করিতে পারো? আজ রাত্রে তোমার সম্বন্ধে যে কথা শুনিয়াছি—তাহা সত্যই আতঙ্কজনক।"

জিওফ্রি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তোমার কথা অসঙ্গত নহে বটে, কিন্তু এখন তুমি কি করিবে তাহা শুনিতে চাই। আমার একমাত্র কন্যার স্বার্থরক্ষার জন্য আমার আগ্রহের অভাব নাই,—ইহা তোমার স্মরণ রাখা উচিত।"

ওলিভিয়া বলিল, "আমি সাধু ভাবে জীবিকার্জ্জন করিব;—এই উদ্দেশ্যে তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি বাবা!"

ওলিভিয়া অতঃপর তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া জিনিস-পত্র গুছাইতে লাগিল। তাহার পিতা পরদিন প্রভাতে চা-পান করিবার পূর্ব্বেই সে সেই ফ্ল্যাট ত্যাগ করিল; তাহার পর সে ব্লুমস্‌বারিতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিল। ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে দুইটি স্বর্ণাঙ্গুরী ও মুক্তার একছড়া কণ্ঠমালা বাঁধা দিতে হইল।

অতঃপর তিন মাস কোন বিদ্যালয়ে সে সেক্রেটারীর কার্য্য শিক্ষা করিল। তিন মাসেই সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী নগরের একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে তাহার চাকরীর জন্য সুপারিশ করিলেন। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের যুবক পুত্র তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিল। তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ওলিভিয়া অধ্যক্ষের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে যুবকটি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোমার ত ভারী তেজ দেখিতেছি! তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে—কে তোমার প্রকৃত মনিব।"

পরদিন প্রভাতে ওলিভিয়ার মনিব তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তুমি আমার ছেলেকে তোমার রূপে ভুলাইয়া কুপথগামী করিবার চেষ্টা করিতেছ; আমি তোমাকে চাকরীতে রাখিতে পারিব না, তুমি এক মাসের বেতন লইয়া চলিয়া যাও। তুমি আমার নিকট প্রশংসা-পত্র পাইবে না।"

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সার জোসেফের মুখে এ কথা শুনিয়া ওলিভিয়া স্তম্ভিত হইল। সে বলিল, "আপনার পুত্রের কত গুণ, তাহা আপনি জানেন না সার জোসেফ! যাহা হউক, আপনি স্বেচ্ছায় আমাকে বিদায় না দিলেও আপনার পুত্রের ব্যবহারে আমি

স্বয়ং আপনার অফিস ত্যাগ করিতাম। এখানে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চাকরী করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

ওলিভিয়া এখানে চাকরী করিয়া কার্য্যদক্ষতার পরিচয়স্বরূপ কোন প্রশংসাপত্র না পাওয়ায় স্থানান্তরে স্থায়ী চাকরী সংগ্রহ করা তাহার অসাধ্য হইল। দীর্ঘকাল পরে পিটার ট্রেনটন এক জন ভাল সেক্রেটারীর জন্য তাহার শিক্ষয়িত্রীকে অনুরোধ করিলে তিনি ওলিভিয়ার জন্য সুপারিশ করিলেন।

ওলিভিয়া পিটার ট্রেনটনের রচিত কোন কোন উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল, তাহার উপন্যাসের সমালোচনাও দেখিয়াছিল; কিন্তু তাহার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে ওলিভিয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। সে পিটার ট্রেনটনের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই জন গারসাইডের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইয়াছিল।

জন গারসাইডের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় ওলিভিয়া তাঁহার প্রণয়ের আকর্ষণ বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু উভয়ের ঘনিষ্ঠতা হইবার পর এক দিন রাত্রিকালে জন তাহাকে তাঁহার গাড়ীতে থিয়েটার হইতে তাহার গৃহে লইয়া যাইবার সময় বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ অনুরোধ করিলে ওলিভিয়া এই প্রস্তাবে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু সে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিল না; কারণ, সে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিবার পর তাহার কোন সংবাদ পায় নাই; বিশেষতঃ, তস্করের কন্যা হইয়া কিরূপে সে কোন ভদ্রলোককে বিবাহ করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে? এই জন্য সে তাঁহাকে বলিল, "না জন, আমাদের বিবাহের কোন সম্ভাবনা নাই; আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়াই মনে করিব। আশা করি, আমাদের এই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

দুই দিন পরে ওলিভিয়া সংবাদ পাইল, তাহার পিতা কোন অবৈধ কার্য্য করিয়া ধরা পড়ায় পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছে। কিন্তু ওলিভিয়া এই সময় পিটার ট্রেনটনের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হওয়ায় নূতন বিপদে পড়িল! সে চাকরী আরম্ভ করিলে পিটার প্রথম দিন তাহার মুখের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তোমার নামটি বড়ই মধুর, এ জন্য আমি তোমাকে ওলিভিয়া বলিয়াই ডাকিব। আশা করি, ইহাতে তোমার আপত্তি নাই!"

ওলিভিয়া লজ্জা-বিজড়িত স্বরে বলিল, "ইচ্ছা হইলে আপনি আমার নাম ধরিয়াই ডাকিবেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই ওলিভিয়া এই নির্লজ্জ লম্পটের ব্যবহারে বিব্রত হইয়া উঠিল! ট্রেন্টন তাহার হাত হইতে কাগজ-পত্র লইবার সময় তাহার হস্ত স্পর্শ করিবার সুযোগ ত্যাগ করিল না। তাহার ব্যবহারেও অত্যন্ত উদারতা প্রকাশ পাইতে লাগিল! এক দিন ট্রেনটন আমেরিকা হইতে তার পাইয়া জানিতে পারিল—নিউ ইয়র্কে তাহার একখানি উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ দুই হাজার পাউণ্ডে বিক্রয় হইয়াছে। সেই দিনই ট্রেনটন ওলিভিয়াকে একখানি দশ পাউণ্ডের নোট উপহার দান করিতে উদ্যত হইলে ওলিভিয়া তাহা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিল।

ট্রেনটন বলিল, "তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বলিতেছ। সাহিত্য-সেবায় তুমি আমার অংশীদার—ইহা কি তুমি অস্বীকার করো? আমি এ পর্য্যন্ত অনেক যুবতীকে সেক্রেটারী রাখিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা আমি অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি ওলিভিয়া!"

অগত্যা চক্ষুলজ্জা বশতঃ তাহাকে সেই দশ পাউণ্ড গ্রহণ করিতে হইল। সে তখন অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল; এই টাকায় সে কোন উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইল।

ইহার পর এক মাসের মধ্যে ওলিভিয়া ট্রেনটনের ব্যবহারে আপত্তির কোন কারণ পাইল না; কিন্তু এক মাস পরে সে ওলিভিয়ার সাহায্যে একখানি উপন্যাস লিখাইতে লিখাইতে হঠাৎ থামিয়া বলিল, "তোমার কাজকর্ম্মে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ওলিভিয়া! তোমার ন্যায় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ লেখিকা পূর্ব্বে কোন দিন পাই নাই; এ জন্য তোমার কোন অভাবই আমি অপূর্ণ রাখিব না। গুণের পুরস্কার দেওয়া আমি কর্ত্তব্য মনে করি।"

ওলিভিয়া বলিল, "ও সকল কথা থাক, লেখাটা এখন শেষ করুন।"

ট্রেনটন বলিল, "উত্তম! কিন্তু আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

তাহার পর পাঁচ মাস সে ওলিভিয়াকে নানা ভাবে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; কিন্তু তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য ট্রেনটনের জিদও ক্রমশঃ প্রবল হইল।

কিছু দিন পরে ওলিভিয়া ট্রেনটনের আফিসে বসিয়া একখানি পত্র পাইল; সেই পত্রের লেফাফায় সে তাহার পিতার হস্তাক্ষর দেখিয়া বিস্মিত হইল। পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় ট্রেনটন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "উহা কি কোন পুরুষের পত্র?" ট্রেনটনের কথা শুনিয়া ওলিভিয়া বুঝিতে পারিল—সে মদ্যপান করিতে করিতে তাহার নিকট উঠিয়া আসিয়াছে। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ; সে ওলিভিয়ার ঘাড় ধরিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "হাঁ, পুরুষেরই হস্তাক্ষর দেখিতেছি। কোন পুরুষ মানুষ তোমাকে পত্র লেখে—এরূপ আমার ইচ্ছা নয়। যদি তুমি আমাকে ভাল না বাস, তাহা হইলে অন্য কোন পুরুষের প্রতি তুমি আসক্ত হইতে পারিবে না! না, আমি তাহা সহ্য করিব না। ঐ পত্র তুমি কাহার নিকট হইতে পাইয়াছ ওলিভিয়া?"

এই কথা বলিয়াই ট্রেনটন ওলিভিয়ার হাত হইতে পত্রখানি ছিনাইয়া লইয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিল!

ওলিভিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল, তাহার সঙ্কট ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। ট্রেনটন পত্রখানি পাঠ করিয়া উৎসাহভরে বলিল, "তোমার পিতা অপরাধী বলিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে! কিন্তু তোমার চেহারা দেখিয়া কখন মনে করিতে পারি নাই—তুমি তস্করের কন্যা! যদি তোমাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে এই পত্র পুলিশের হাতে দিতে পারিতাম—ইহা কি বুঝিতে পারিয়াছ? কিন্তু সে কাজ আমি করিব না; তবে আমি বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষে প্যারিসে যাইব, তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ওলিভিয়া বলিল, "আমার চিঠিখানা আমাকে ফেরত দিন—মিষ্টার ট্রেনটন!"

ট্রেনটন বলিল, "ইহা তুমি নিশ্চয় ফেরৎ পাইবে, কিন্তু

আমি তোমার পিতার বর্ত্তমান ঠিকানা লিখিয়া রাখিব,—তাহাতে পরে সুবিধা হইতে পারে। এই পত্রে তোমার পিতা তোমাকে কিছু টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছে, কিন্তু তোমার কিছু সম্বল আছে বলিয়া মনে হয় না! এ জন্য তোমাকে আমি কুড়ি পাউণ্ডের একখান চেক দিতে পারি—যদি তাহাতে তোমার কোন উপকার হয়।"

ওলিভিয়া বুঝিতে পারিল, তাহাকে নিঃসম্বল দেখিয়া ট্রেনটন তাহাকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই লজ্জাজনক প্রস্তাব শুনিয়া তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি ভদ্রলোক হইলে এ ভাবে আমাকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করিতে না।"

ট্রেনটন সক্রোধে বলিল, "কি! আমি ভদ্রলোক নহি? তুমি আমার মনের ভাব আমার অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পার?—বেশ, তোমার পত্র ফেরত লও, আজ আর কোন কাজ হইবে না। তুমি বাড়ী ফিরিয়া তোমার জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে আমার সঙ্গে দেখা করিবে। আমাদিগকে রাত্রির ট্রেণ ধরিতে হইবে!"

ওলিভিয়া তাহার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "তুমি জানো—আমি সেখানে যাইব না, তথাপি কেন এ অনুরোধ করিতেছ?"—সক্রোধে সে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

পিটার ট্রেনটনকে একাকী প্যারিসে গমন করিতে হইল। সেখানে সে কি কারণে গমন করিল—ওলিভিয়া তাহা জানিতে পারিল না। কিন্তু ট্রেনটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। স্বদেশে ফিরিয়া সে ওলিভিয়াকে স্পষ্ট ভাবে জানাইল—সে তাহাকে চায়, না পাইলে তাহার মন স্থির হইবে না।

এই ঘটনার দশ দিন পরে ওলিভিয়া তাহার অনুরোধে একখানি সংবাদপত্র কিনিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল—একখানি ইটালীয় ছোরা তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হওয়ায় সে নিহত হইয়াছে! অতঃপর ওলিভিয়াকেই তাহার হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত হইতে হইল।

চতুর্থ পল্লব

অভিযুক্তা তরুণী ও বিচারপতি

জুন মেরিকের নিকট ডেভিড গারসাইড যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহা অবিলম্বেই পালন করিল। সেই রাত্রিতেই সে সোহো পল্লীতে উপস্থিত হইয়া একটি সাধারণ ভোজনাগারে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্টিভ সার্জ্জেণ্ট বেন মরফির সহিত সাক্ষাৎ করিল।

সেই ভোজনাগারের ইটালিয়ান অধ্যক্ষ দ্বিতলের একটি কক্ষ তাহাদের পরামর্শের জন্য ছাড়িয়া দিলে সেই কক্ষে গারসাইড, মরফি, এবং অন্য এক জন লোক গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই তৃতীয় ব্যক্তির নাম সোয়ামেস। এই ব্যক্তি ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেনটনের পরিচারকের পদে নিযুক্ত ছিল।

ডেভিড প্রথমেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চুরির অভিযোগে মিষ্টার ট্রেনটন কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছিলে?"

সোয়ামেস বলিল, "হাঁ, এ কথা সত্য।"

ডেভিড বলিল, "মিস্ ডেনের সহিত মিষ্টার ট্রেনটনের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাই তোমার নিকট জানিতে চাই। তুমি সকল কথা খুলিয়া বলো। মিস ডেন তাহার সেক্রেটারী ছিল, কিন্তু তাহারা কি পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল?"

সোয়ামেস দৃঢ় স্বরে বলিল, "হাঁ, তাহারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ট্রেনটন সুন্দরী যুবতী দেখিলে লোভ সংবরণ করিতে পারিত না, তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত।"

ডেভিড বলিল, "তোমার কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু তুমি কি ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছিলে? আমার মনে হয়, তুমি অনুমানে নির্ভর করিয়াই এ কথা বলিতেছ!"

সোয়ামেস বলিল, "আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এবং নিজের কাণে যাহা শুনিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার অন্য কোন প্রমাণ নাই। ট্রেনটন সম্বন্ধে আমার যতখানি অভিজ্ঞতা আছে, অন্য কোন ব্যক্তির তাহা নাই বলিয়াই আমার ধারণা। আমি সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাল তাহার অধীনে চাকরী করিয়াছিলাম, এ কথা স্মরণ রাখিবেন। এই সময়ের মধ্যে আমি কত যুবতীকে তাহার নিকট আসিতে ও বিদায় লইতে দেখিয়াছি। তাহারা সাধারণতঃ এক মাসের মধ্যেই তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িত। সে যুবতীদের বশীভূত করিয়া আমার নিকটেও সে জন্য গর্ব্ব করিতে কুণ্ঠিত হইত না;···"

ডেভিড বলিল, "লোকটা কি সত্যই এত দূর নির্লজ্জ ছিল?—শূকরেরও অধম?"

সোয়ামেস বলিতে লাগিল, "আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন—তাহা হইলে আমি অসঙ্কোচে বলিব, মিস্ ডেনই তাহাকে খুন করিয়াছে। কেন সে তাহাকে হত্যা করিল—তাহাও আপনাকে বলিতে পারি। আমি ট্রেনটনের চাকরী হইতে বরখাস্ত হইবার দুই দিন পূর্ব্বে একখানি পত্র লইয়া তাহাদিগকে কলহ করিতে শুনিয়াছিলাম।"

"সে পত্র কাহার নিকট হইতে আসিয়াছিল?"

সোয়ামেস বলিল, "তাহা আমি জানি না; কিন্তু পত্রখানি কোন পুরুষ-মানুষের লেখা, উহা মিস্ ডেনের নামে প্রেরিত হইয়াছিল। আমি ইহা জানিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, মিস্ ডেন যে ঘরে বসিয়া লেখা-পড়া করিত, সেই ঘরে আমিই তাহা লইয়া গিয়াছিলাম। মিস্ ডেন সেই পত্রের লেফাফা খুলিবার পূর্ব্বেই ট্রেনটন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—সে তাহার নিজের চিঠিপত্র, বিশেষতঃ, কোন পুরুষের লেখা চিঠি কি জন্য সেখানে লইয়া আসে?"

ডেভিড বলিল, "মিস্ ডেনকে সে এই কথা বলিল? এ যে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

সোয়ামেস বলিল, "কিন্তু সে তখন ঐ কথা বলায় তাহাকে দায়ী করা যায় না। কারণ, সে তখন মদে চুর হইয়া মিস্ ডেনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া মিস্ ডেন তাহাকে বলিয়াছিল—যদি সে পুনর্ব্বার তাহার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করে—তাহা হইলে তাহাকে খুন করিবে।"

ডেভিড এ কথা শুনিয়া চেয়ারে ঠেশ দিয়া বসিয়া বলিল, "মিস্ ডেনের মত তরুণী তাহাকে ঐ রকম কথা বলিবে—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

সোয়ামেস বলিল, "বিশ্বাস করিতে পার বা না পার, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।"

ডেভিড ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তুমি আড়ালে থাকিয়া আর কোন্ কথা শুনিয়াছিলে সোয়ামেস ?"

সোয়ামেস বলিল, "মিস ডেন তাহার পত্র ফেরত চাহিলে ট্রেনটন তাহাকে পত্র ফেরত দিয়াছিল। তাহার পর ট্রেনটন ঝড়ের মত বেগে সে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া যায়! আমিও ধরা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলাম।"

সোয়ামেসের নিকট আর কোন কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া ডেভিড তাহাকে বিদায় দান করিল।

সোয়ামেস সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে ডেভিড ডিটেক্টিভ সার্জ্জেন্টকে জিজ্ঞাসা করিল, "সোয়ামেসের কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হয় ? তাহার কথা সত্য ?"

মরফি বলিল, "সে কথা বলা কঠিন। তবে পরে আমি উহাকে জেরা করিলে রহস্য ভেদ হইতে পারে।"

* * * *

জন গারসাইড ওলিভিয়াকে দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "এখন আমার নিকট তোমার সত্য কথা প্রকাশ করা উচিত। আমার এক ভাই আছে, সে সংবাদপত্রে অপরাধীদের কুকার্য্যের সংবাদ প্রকাশ করে। গত রাত্রে সে ট্রেনটনের এক জন ভৃত্যের জবানবন্দী লইয়াছিল। ট্রেনটনের সেই ভৃত্যের নাম সোয়ামেস। সে আমার ভ্রাতার নিকট স্বীকার করিয়াছিল—সে চুরি করায় ট্রেনটন কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইবার দুই দিন পূর্ব্বে সে তোমাকে বলিতে শুনিয়াছিল—ট্রেনটন যদি পুনর্ব্বার তোমার প্রতি মন্দ ব্যবহার করে—তাহা হইলে তুমি তাহাকে হত্যা করিবে! এই কথা বলিয়া তুমি ট্রেনটনকে ভয় দেখাইয়াছিলে। এ কথা সত্য ?"

"না।"

জন বলিলেন, "সে দিন কি তুমি ট্রেনটনের সহিত কলহ করিয়াছিলে ?"

ওলিভিয়া বলিল, "হাঁ! ট্রেনটন একটা অমার্জ্জনীয় কাজ করিয়াছিল। সে আমার হাত হইতে একখান পত্র কাড়িয়া লইয়া আমার অসম্মতিতে তাহা পাঠ করিয়াছিল।"

জন বলিলেন, "সেই পত্র তুমি কাহার নিকট হইতে পাইয়াছিলে, জানিতে পারি ?"

ওলিভিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "সে কথা তোমাকে বলিতে পারিব না জন! তবে আমি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে পারি যে, পিটার ট্রেনটনের মৃত্যুর সহিত সেই পত্রের কোন সংস্রব ছিল না। আমার এই কৈফিয়ৎই কি যথেষ্ট নহে ?"

জন বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট বলিয়া আমার মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তোমার এই কৈফিয়তে অন্য সকলে সন্তুষ্ট হইবে কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তোমাদের এই বিবাদের কথায় আলোচনা করিয়া ফরিয়াদী পক্ষের কৌশুলী কিরূপ সিদ্ধান্ত করিবে, তাহা চিন্তা করিয়াছ কি ? আর তাহা জুরিদের মনেও কিরূপ প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য।"

ওলিভিয়া এ কথা শুনিয়া কেবল বলিল, "যাহা সত্য, তাহাই তোমাকে বলিলাম। আমি পিটার ট্রেনটনকে হত্যা করি নাই,—ইহার অধিক আর কিছুই আমার বলিবার নাই!"

জন বলিলেন, "কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া তোমার মনে হয় ?"

ওলিভিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি কাহাকেও সন্দেহ করিতে পারি নাই; এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়াই আমার মনে হয়।"

জন গারসাইড অতঃপর নিরুৎসাহ চিত্তে কারা-কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, ওলিভিয়া তাঁহাকে সত্য কথাই বলিয়াছে; কিন্তু কিরূপে এই রহস্য ভেদ হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

অতঃপর তিনি হেনরী কোজেনের অফিসে উপস্থিত হইয়া ওলিভিয়ার (আসামীর) সহিত তাঁহার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার গোচর করিলেন। হেনরী কোজেন সকল কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এই যুবতী যদি তাহার মনের সকল কথা সরল ভাবে প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আমরা কিছুই করিতে পারিব না। সে যদিও শপথ করিয়া বলিতেছে সে নিরপরাধ, কিন্তু জুরীরা বা স্বার্থডেলের মত দন্তানুরাগী জজ তাহার এ কথায় নির্ভর করিবে বলিয়া মনে হয় না। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, স্বার্থডেলই এই মামলার বিচার-ভার গ্রহণ করিবে। আরও এক কথা—আমি আজ স্বার্থডেল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি—ট্রেনটনের সহিত তাহার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল।"

জন গারসাইডকে তাঁহার এই এটর্ণী বন্ধু বলিলেন, "যদি আমি বিচারালয়ে হত্যাপরাধে অভিযুক্তা এই আসামীর সমর্থন করিতাম—তাহা হইলে স্বার্থডেলের মত জজের এজলাশে তাহার মামলার বিচার হওয়া প্রার্থনীয় মনে করিতাম না।"

"স্বার্থডেল তাহার বন্ধুর হত্যাপরাধে অভিযুক্তা আসামীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, তাহার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। স্বার্থডেলই যে এই মামলার বিচার-ভার গ্রহণ করিবে—মিস্ ডেনকে কি এ কথা জানাইয়াছ ?"

গারসাইড বলিলেন, "না। কারণ, তোমার নিকট অল্পকাল পূর্ব্বেই আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। বিশেষতঃ, মিস্ ডেনকে এ কথা জানাইয়া লাভ ?"

হেনরী কোজেন বলিলেন, "এ কথা শুনিলে সে হয়ত তাহার মনের সকল কথা খুলিয়া বলিত। ট্রেনটন স্বার্থডেলের বন্ধু ছিল কি না।"

গারসাইড বলিলেন, "সে কথা শুনিয়াছি; কিন্তু ইহা হইতে তুমি কি সিদ্ধান্ত করিতে চাও, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

মিষ্টার কোজেন এ কথায় একটু হাসিয়া নিরুত্তর রহিলেন।

কিন্তু বাহিরের গোপনীয় সংবাদ কারাগারেও প্রবেশ করে। এক দিন কারাগারের প্রবীণা 'ওয়ার্ডেস' ওলিভিয়াকে জানাইল—জজ হোরেসিও স্বার্থডেলের হস্তে তাহার বিচার-ভার অর্পিত হইয়াছে।

এ সংবাদ শুনিয়া ওলিভিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া সদয়-হৃদয় ওয়ার্ডেস্ তাহাকে বলিল, "বিচারপতি স্বার্থডেল তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের

বিচার-ভার গ্রহণ করিবেন শুনিয়া তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমার বিশ্বাস, অন্যান্য আসামীর মত তুমিও তাঁহার নিকট সুবিচার পাইবে।"

সে বিচারপতি স্বার্থডেলের নিকট সুবিচার পাইবে! হয়ত মিষ্টার স্বার্থডেল সুবিচারই করিবেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ওলিভিয়ার যে অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্মরণ হওয়ায় তাহাকে মিষ্টার স্বার্থডেলের নিকট সুবিচার-লাভের আশা ত্যাগ করিতে হইল।

পিটার ট্রেনটনের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। বন্ধুবর্গের মধ্যে কয়েক জন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ছিলেন; বিচারপতি স্বার্থডেল তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহাদের বন্ধুত্ব কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, ওলিভিয়া কোন দিন তাহা জানিতে পারে নাই। এক দিন রাত্রিকালে ট্রেনটন ওলিভিয়াকে তাহার ইচ্ছার প্রতিকূলে 'মে-ফেয়ার পার্টিতে' যোগদান করিতে লইয়া গিয়াছিল। সেই স্থানে মিষ্টার স্বার্থডেলের সহিত তাহার পরিচয় হয়। ট্রেনটন ওলিভিয়াকে বলিয়াছিল, "ইনি আমার বন্ধু বিচারপতি মিষ্টার স্বার্থডেল। তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিবে। কারণ, যদি তুমি কোন দিন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হও, তাহা হইলে উনি তোমাকে কারাগারে পাঠাইতে পারেন।"

ওলিভিয়ার তখন মনে হইয়াছিল, মিষ্টার ট্রেনটন পরিহাস-ছলেই তাহাকে ঐ কথা বলিয়াছিল।

যাহা হউক, ওলিভিয়া কোন দিন বিচারপতি স্বার্থডেলের মনোরঞ্জনে ত্রুটি করে নাই; তাহাদের বন্ধুত্বের বন্ধনও কোন দিন শিথিল হয় নাই।

এক দিন ট্রেনটন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় মিষ্টার স্বার্থডেলের গৃহে যাইতে পারে নাই, ওলিভিয়া একাকী সেখানে গমন করিয়াছিল। এবং ওলিভিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য উৎসুক হইলে মিষ্টার স্বার্থডেল তাঁহার নিজের গাড়ীতে তাহাকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন। ওলিভিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে দ্বিধা বোধ করিল না।

ওলিভিয়া তখন দুই কামরাবিশিষ্ট একটি সঙ্কীর্ণ ফ্ল্যাটে বাস করিত। মিষ্টার স্বার্থডেলের মোটর-কার ফুলহাম-রোডের দিকে চলিতে চলিতে যখন শ্লোন স্কোয়ারের নিকট উপস্থিত হইল, সেই সময় ওলিভিয়ার পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বার্থডেল হঠাৎ এক অদ্ভুত কার্য্য করিলেন।

তিনি ওলিভিয়ার হাত ধরিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "তোমাকে বড়ই বিমর্ষ দেখাইতেছে! তুমি কি কোন সঙ্কটে পড়িয়াছ—মাই ডিয়ার!"

ওলিভিয়া প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "না, আমি কোন সঙ্কটে পড়ি নাই, আমার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

ওলিভিয়া জানিত, বিচারপতি স্বার্থডেল তাহার মনিব ট্রেনটনের পরম বন্ধু; সুতরাং ট্রেনটন তাহাকে ক্রমাগত কি ভাবে জ্বালাতন করিতেছিল, তাহা তাহার নিকট প্রকাশ করা সে সঙ্গত মনে করিল না।

কিন্তু স্বার্থডেল তাহার কথা শুনিয়াও তাহার হাত ছাড়িলেন না; উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া ওলিভিয়া বিরক্তিভরে মুখ সরাইয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "মহাশয়ের ব্যবহার ভদ্রোচিত বটে!"—সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁহার মুখের উপর অগ্নিময় দৃষ্টি বর্ষণ করিল।

ওলিভিয়ার ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্বার্থডেলের মুখ-ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আশা করি, তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। ক্ষণকালের জন্য আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

ওলিভিয়া মাথা হেলাইয়া তাঁহাকে জানাইল—তিনি তাঁহার ব্যবহারের জন্য যে ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন—তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু সে তাহার ফ্ল্যাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আর একটি কথাও বলিল না, নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহার পাশে বসিয়া রহিল। অতঃপর মিষ্টার স্বার্থডেলের মোটর-কার তাহার বাসগৃহের সম্মুখস্থ কার্সিটার রোডে আসিয়া থামিলে ওলিভিয়া তাঁহাকে 'গুড নাইট' বলিয়া নামিয়া গেল, কিন্তু মিষ্টার স্বার্থডেলের চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। তাঁহার সেই ক্রোধ-প্রদীপ্ত দৃষ্টি সে এত দিনেও ভুলিতে পারে নাই! সে-দৃষ্টি যেন দিবারাত্রি তাহার অনুসরণ করিতেছিল!

ওলিভিয়া এখন নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত, এবং এই ব্যক্তিরই হস্তে তাহার বিচার-ভার অর্পিত! [ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

দূর ও নিকট

সুদূর বিমান-কক্ষে নক্ষত্র রহিয়া
পৃথিবীতে আলোরশ্মি করে বিকিরণ;
মানবের ধরণীরে ভালোবাসা দিয়া
ঘিরিয়া রয়েছে গ্রহ-উপগ্রহগণ!

প্রতিবেশী মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ
দূরত্বের শত ক্রোশ করেছে সৃজন;
হিংসা-দ্বেষ লোলুপতা করি' অবরোধ
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রচে সহস্র যোজন।
দূর যারে মনে হয় সে তো দূর নয়—
নিকটস্থ আত্মীয়ের নহে পরিচয়।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল)।

দুখ-নিশি মোর হবে না কো ভোর—

পিয়াল-বনের পাখী
জানি তুমি আসিবে না, তবু চেয়ে থাকি।
'বসে থাকি বাতায়নে
জল নামে দু' নয়নে
মোর দুখ-নিশি কভু পোহাইবে না কি!

ভালোবেসেছিনু তাই দিলে এত জ্বালা
ফুল নিয়ে রেখে গেলে কণ্টকের মালা!
মোর মধু রাতি হায়,
ছেয়ে গেল আঁধিয়ায়
ঝড়ের আঁধারে মরে 'পিউ কাঁহা' ডাকি।

বন্দে আলী মিয়া।

দাবীদার

অনেক দিন আগেকার কথা। তখন ক'বছর মাত্র নূতন দিল্লীর পত্তন হইয়াছে। আজিকার এই সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি-শোভিত নূতন দিল্লী তখন ছিল না! জনবিরল পথ, পথের দু'পাশে অধিকাংশ জমিই ছিল অসমতল অনুর্ব্বর রুক্ষ। কয়েকটি মাত্র স্কোয়ার তখন তৈয়ারী হইয়াছে।

ক্লার্কস্ কোয়ার্টার্স ছাড়াইয়া সরকারী অফিসের দিকে যে পথ গিয়াছে, তাহারই এক দিকে সতেরো আঠারো বৎসর বয়সের এক তরুণী দিগ্‌ভ্রান্ত ভাবে পথ চলিতেছিল। মেয়েটির গায়ের রং ফর্সা!—মুখ নিখুঁত না হইলেও এমন মাধুরীমাখা যে চাহিলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না! তরুণীর দু'চোখে ভীতা হরিণীর মত ত্রস্ত দৃষ্টি।

মাঘ মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে দু'-এক পশলা বৃষ্টি হইতেছিল, মেয়েটির কাপড়ের সবটাই প্রায় ভিজা—শীতে বিবর্ণ ওষ্ঠ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে!

তরুণী পথ হারাইয়াছে। কতক্ষণ এমন ঘুরিতেছে ঠিক নাই,—পথে লোকজনের চিহ্ন নাই! একেই এ দিকে দ্বিপ্রহরে পথে লোক দেখা যায় না, তাহার উপর এমন দুর্য্যোগ।

অনেকক্ষণ পরে আপাদমস্তক বর্ষাতি মুড়ি দেওয়া এক জন হ্যাট-কোটধারীকে দেখিতে পাইয়া তরুণী কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—আপনি বাঙ্গালী?

পথিক দাঁড়াইল! বলিল,—হাঁ। কেন বলুন ত।

মেয়েটি নতমুখে বলিল,—আমি পথ হারিয়েছি। আমায় বাড়ীটা দেখিয়ে দেবেন?

পথিক আগ্রহ-সহকারে বলিল,—কেন দেখিয়ে দেবো না? আপনি কোথায় যাবেন?

—এডওয়ার্ড স্কোয়ারে।

—কি সর্ব্বনাশ! সে যে অনেক দূর! কখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন?

ধীরা বলিল,—অনেকক্ষণ। বেলা তখন এগারোটা।

হাতের উপর হইতে বর্ষাতি সরাইয়া ঘড়ি দেখিয়া পথিক বলিল, আর এখন আড়াইটে। এই সাড়ে তিন ঘণ্টা আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

কথা বলিতে বলিতে দু'জনে অগ্রসর হইতে লাগিল। ধীরা বলিল,—হাঁ। কি করবো! কোন ভদ্রলোককে দেখতে পাইনি। দু'-একটা ছোট জাতের লোক দেখলুম, তাদের কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা হলো না। কি জানি, কোন্ পথ দেখিয়ে দেবে। যা নির্জ্জন,—বড্ড ভয় কচ্ছিল!

অদূরে একখানা খালি টাঙা দেখিয়া পথিক বলিল,—টাঙাটা ডাকি। আপনি বড্ড ভিজে গেছেন। যেতে হবে অনেকটা পথ।

ধীরা ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বলিল,—তাতে আমার কিছু কষ্ট হবে না। তবে আমাকে পৌঁছে দিতে আপনাকে অনেকখানি অকারণ হাঁটতে হবে।

সুরেশ চকিতের জন্য তাহার মুখের পানে চাহিল; চাহিয়া বলিল,—আপনি মেয়েছেলে, আপনি পারবেন, আর আমি পারবো না? বেশ, চলুন হেঁটেই যাওয়া যাক্।

একটু অগ্রসর হইয়া সুরেশ বলিল,—আপনি এখানে নতুন এসেছেন বুঝি? আপনার বাবা এখানে কাজ করেন?

নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরা বলিল, বাবা নেই। কাকার সঙ্গে এসেছি। কাকা এখানে বদলী হয়ে এসেছেন। প্রায় তিন মাস আছি। এখানকার কথা এখনও কিছু বুঝি না।

সুরেশ বলিল—আমি প্রায় পাঁচ বছর হলো সিমলা-দিল্লী কচ্ছি, কিন্তু শুদ্ধ-হিন্দী আজও বলতে পারি না! পরের ভাষা অভ্যাস করতে সময় লাগে। আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন?

ধীরা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। ইচ্ছা হইল, সুরেশকে তাহার বাড়ীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করে! কিন্তু অশোভন হইবে ভাবিয়া নীরব রহিল।

সুরেশ নিজেই বলিল—আমাদের বাড়ী রামকৃষ্ণপুরে। কোথাকার মানুষ কোথায় রয়েছি।

ধীরা বলিল, রামকৃষ্ণপুর! ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে রামকৃষ্ণপুর যেতুম। এখনও ছবির মত মনে পড়ে।

সুরেশ বলিল,—রামকৃষ্ণপুরে যেতেন? কোথায় বলুন ত? কাদের বাড়ী?

ধীরা বলিল,—নাম বললে চিনবেন হয়ত—তিনি আগেকার এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁর নাম ছিল পরমেশ রায়।

—পরমেশ রায়? তিনি আমার বাবা। সুরেশ বিস্মিত কণ্ঠে বলিল।

মেয়েটি সর্পাহতের মত চমকিয়া তাহার বিশাল চক্ষু সুরেশের মুখে নিবদ্ধ করিয়া অতর্কিতে দু'পা পিছাইয়া গিয়া বলিল,—আপনি পরমেশ বাবুর ছেলে! সুরেশ বাবু?

সুরেশ তাহার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল,—হাঁ। কেন বলুন ত?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ধীরা বলিল, আমি প্রমথ চৌধুরীর মেয়ে—ধীরা! বাবাকে চিনতেন বোধ হয়!

তাহার কণ্ঠের শ্লেষটুকু সুরেশ অনুভব করিতে পারিল। নিঃশব্দে দু'-চারি পা যাইবার পর সুরেশ ডাকিল,—ধীরা!

চোখ তুলিয়া ধীরা চাহিল। তাহার সমস্ত মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

দৃষ্টি নত করিয়া সুরেশ বলিল,—সাত-আট বছর পরে দেখে তোমাকে চিনতে পারিনি, কিন্তু চিনে আর তোমায় আপনি বলতে পারবো না, সে জন্য কিছু মনে করো না!

তার পর একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—তোমার মা ছিলেন না? তিনি এখন কোথায়?

ধীরা মুখ না তুলিয়াই বলিল, মা মেজ কাকার কাছে ঢাকায়, আর আমি সেজ কাকার কাছে ঝি হয়ে আছি।

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পথাতিবাহন করিতে লাগিল। ইহার পর দু'জনেই নির্ব্বাক্। পরে নম্বর দেখিয়া দ্বার ঠেলিবার পূর্ব্বে ধীরা কুঞ্চিত ভ্রূর উপর যুক্ত কর উঠাইয়া বলিল,—আজ আপনি যে উপকার করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। নমস্কার!

২

বাড়ী ঢুকিতেই সেজ কাকিমা তার-স্বরে গালাগালি সুরু করিয়া দিলেন। এবং বহু জন্মের পাপে যে পরের বোঝা বহিয়া মরিতে হইতেছে তাহার জন্ম নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ধীরা মৌন-মুখে ভিজা কাপড় ছাড়িয়া উনানে আগুন দিতে গেল।

দোষটা কাকিমার এবং একবার দেখিয়া পথ চিনিবার অক্ষমতা ধীরা বারে বারে জানাইয়াছিল। তথাপি তাঁর নিকট প্রচণ্ড ধমক খাইয়া যে ধীরাকে কাকিমার বান্ধবীর বাড়ী যাইতে হইয়াছিল, সে-কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবার সাহস ধীরার ছিল না; তা ছাড়া আজ তার মনের অবস্থাও শোচনীয়। কাকিমার ছেলেমেয়েদের লইয়া ধীরা শয়ন করে, পাশের ঘরে কাকিমা থাকেন। আজ ভাই-বোনগুলি ঘুমাইয়া পড়িলে ধীরা জাগিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল—সুরেশ আজ তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছে!

চির দিন ধীরার অবস্থা এমন ছিল না। সে ছিল পিতার শেষ বয়সের সন্তান। তাহার অনেকগুলি ভাই-বোনের পর সেই মাত্র অতি কষ্টে বাঁচিয়াছিল। ধনীর কন্যা না হইলেও অভাব তাহার কোন দিন ছিল না। পিতা পেন্সন পাইতেন, ছোট একখানি বাড়ী এবং কিছু টাকা ছিল ভরসা। পরমেশ রায় ছিলেন পিতার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে কোন বিশেষ প্রয়োজনে তিনি টাকার জন্ম বন্ধুর শরণাপন্ন হন, বন্ধুও কাহাকেও কিছু না জানাইয়া নগদ টাকা তুলিয়া এবং বাড়ী বন্ধক দিয়া একুনে উনিশ হাজার টাকা পরমেশ বাবুকে দেন। কথা ছিল, এক মাসের মধ্যেই পরমেশ বাবু টাকাটা ফেরৎ দিবেন। কিন্তু টাকা লইয়াই পরমেশ বাবুর রূপ বদলাইয়া গেল। এক মাস পরে স্বচ্ছন্দে তিনি বলিয়া দিলেন, এটা গাঁজার আড্ডা নয় ভাই, বন্ধু বন্ধুর মত থাকো, টাকাকড়ির ল্যাঠা বাধিয়ো না। টাকা যে দিয়েছো বলছো, তার লেখাপড়া কি আছে, দেখাও দিকিন্!

লেখাপড়া সত্যই ছিল না। প্রমথ বাবু বজ্রাহতের মত ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর আরও অনেক বার হাঁটাহাঁটি করিয়াও কোন ফল হইল না। বৃদ্ধ বয়সে টাকার শোক তাঁহার বড় বেশী বাজিল, বিশেষ একমাত্র কন্যা তখন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিতেছে। দুশ্চিন্তায় তিনি শয্যা লইলেন। কথাটা ক্রমে পত্নী, কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনের কানে উঠিল। আত্মীয়-স্বজন তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্ম ছি-ছি করিতে লাগিল। প্রমথ বাবুর শরীর আরও ভাঙ্গিয়া গেল। কন্যার চিন্তায় তিনি দিশাহারা হইলেন। কোন উপায় না পাইয়া পরমেশ বাবুকে অনুনয় করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া সুরেশের সহিত ধীরার বিবাহ দিয়া অন্তিম সময়ে পরমেশ বাবু তাঁহাকে চিন্তামুক্ত করুন।

বলা বাহুল্য, পরমেশ বাবু সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। ইহার পর প্রমথ বাবু আরও ছয়-সাত মাস রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে মুক্তি পাইলেন। বাড়ী বিক্রয় হইয়া গেল। চারি দিক্‌কার ধার-দেনা শোধ দিয়া মাত্র কয়েক শত টাকা বাঁচিল,—সে টাকায় এ কালে কন্যার বিবাহ হয় না!

সেই সব কথা ভাবিয়া ধীরার বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতে লাগিল।

দিন পনেরো পরে এক দিন সকালে ধীরা একখানি পত্র পাইল। শিরোনামা অপরিচিত পুরুষ-হস্তের। বিস্মিত হইয়া পত্র খুলিল। পত্রে লেখা ছিল—

কল্যাণীয়াসু

ধীরা, তোমার সঙ্গে সে দিন আশ্চর্য্য ভাবে দেখা হয়েছিল। তোমার সঙ্গে যে আমাদের একটা অপ্রিয় সম্বন্ধ আছে তা জানতুম, কিন্তু বিশ্বাস করো, সঠিক ব্যাপার জানতুম না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই সে দিন পথের মাঝে পরিচয় হতে। আমার খুব সন্দেহ হয়েছিল—আমি তোমার শ্লেষটুকু ভুলতে পারিনি। কয়েক দিনের ছুটী নিয়ে দেশে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে সন্ধান নিয়ে যা জানতে পেরেছি, তাতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে! তোমার যে ক্ষতি আমরা করেছি, তাতে তুমি আমাদের ক্ষমা করতে পারবে না বলেই মনে হয়। পারবে ধীরা? তবে তোমায় একটি সংবাদ দিচ্ছি—আমার পিতাও আজ পরলোকে। আজ দু'বছর হলো, তাঁর মৃত্যু হয়েছে,—যদি পারো, মৃত আত্মার প্রতি প্রতিহিংসা ভুলে তাঁর আত্মাকে ক্ষমা করো।

আমি বাবার উত্তরাধিকারী। আমার ইচ্ছা, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একটা ব্যবস্থা করবো। তুমি আমার সঙ্গে এক বার দেখা করবে কি? যদি করো, তাহলে কোথায় দেখা হতে পারে, জানিও।

আর একটা কথা আমি জানতে পেরেছি, দেখা হলে বলবো। ইতি

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

পত্রখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ধীরা বার কয়েক পড়িল। সুরেশ কি কথা জানিতে পারিয়াছে, তাহা বুঝিতে ধীরার বিলম্ব হইল না! নিজের অজ্ঞাতেই বুকের মধ্য হইতে একটা গভীর নিশ্বাস বাহির হইল এবং চোখের পলকে মনে পড়িল, সে দিনের সেই অচেনা পথিকের বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি!

দু'-তিন দিন সে ভাবিতে লাগিল—সুরেশের পত্রের উত্তর দেওয়া উচিত কি না। কাকিমাকে কোন কথা জানাইতে সাহস হইল না। অবশেষে ধীরা পত্রোত্তর দেওয়াই সমীচীন বোধ করিল। নিজের জন্ম না হোক, বৃদ্ধা মায়ের কষ্ট সহ্য হয় না! যদি কোন ব্যবস্থা হয়, মায়ের কষ্ট কমিবে।

রাত্রে নির্জ্জনে বসিয়া সে পত্র লিখিল। লিখিল—

মান্যবরেষু

আপনার পত্র পাইলাম। কিছু বক্তব্য থাকিলে সেজ-কাকাকে বলিতে পারেন। ইতি ধীরা

৩

তৃতীয় দিন রাত্রে ধীরা স্কোয়ারের দিকের জানলা খুলিয়া বসিয়া ছিল। শীত একটু কমিলেও এখনও হাড়-কাঁপানো বাতাস বহিতেছে—তথাপি জানলায় মাথা দিয়া ধীরা বসিয়াছিল। ক' দিনের অবিরাম চিন্তা তাহাকে যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে! তাই এই শীতল বায়ু-প্রবাহ তাহার সারা শরীর কাঁপাইয়া দিলেও মাথায় বেশ আরাম বোধ হইতেছিল। ঘরে কাকিমার ছেলেমেয়ে ঘুমাইতেছে, পাশের ঘরে কাকা-কাকিমাও বোধ হয় নিদ্রামগ্ন। এই রাত্রি দশটার মধ্যেই

সারা পল্লী ঘুমে অচেতন! ক্বচিৎ কোন শিশুর ক্রন্দন সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, নচেৎ আর সব নীরব। পথ জনমানব-শূন্য।

জানলার বাহিরে লঘু পদশব্দ শুনিয়া ধীরা ত্বরিতে মাথা তুলিল। যাহা দেখিল, দেখিয়া বিস্মিত হইল। জানলার বাহিরে সুরেশ দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের বিজলী-বাতির আলো তাহার মুখে পড়িয়াছে। এক-মুহূর্ত্ত ধীরার মুখে কথা ফুটিল না।

সুরেশ বলিল,—কালও এখানে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত ঘুরে গেছি —যদি একটিবার তোমায় দেখতে পাই, এই প্রত্যাশায়!

বিস্ময়-বিমূঢ় স্বরে ধীরা বলিল,—কেন? আমি ত আপনাকে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলুম।

সুরেশ বলিল,—বলেছিলে বটে, কিন্তু আমার মনে হলো, তোমার সঙ্গে কথা বলাই আমার সবচেয়ে প্রয়োজন। কারণ, তোমারই ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হয়েছে—আর পিতৃ-শত্রুকে ক্ষমা করা তোমারই সবচেয়ে কঠিন।

ধীরা নিরুত্তর রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, যখন এ ঘটনা হয়, আমি তখন সবে চাকরীতে ঢুকে সিমলায় গেছি। এত ব্যাপার আমি জানতুম না— শুধু জানতুম, কোন কারণে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বাবার মনোমালিন্য হয়েছে। সেটা যে টাকার ব্যাপারে, তা একটু-আধটু শুনেছিলুম। এ বারে গিয়ে খোঁজ নিতে সত্য কথা জানতে পারি।

সুরেশের কণ্ঠে গভীর লজ্জা ও বেদনা ঝঙ্কৃত হইল। একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—ক্ষমা চেয়ে প্রহসন করার ইচ্ছে আমার নেই, তবে একটা বক্তব্য আছে।

ধীরা দৃষ্টি উন্নত করিয়া সুরেশের দিকে চাহিল, তাহার নির্ভর-যোগ্য কণ্ঠস্বর ও সরল মুখ ধীরাকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিল। মনে হইল, পরমেশ বাবু, সেই প্রবঞ্চক—তিনি ইঁহারই পিতা!

সুরেশ বলিল,—তুমি যদি টাকা ফেরৎ চাও, তাহলে তাই দেবো, নাহলে তোমাদের বাড়ী বাবা বেনামীতে কিনেছিলেন, সে বাড়ী ফিরিয়ে দেবো। কি ভাবে তুমি নিতে চাও, বলো?

ধীরা জবাব দিল না। তাকে নীরব দেখিয়া সুরেশ পুনরায় বলিল,—তুমি বিশ্বাস করছো না ধীরা? আমি সত্য কথাই বলছি। কি ভাবে তুমি নেবে—এখনি না বলতে পারো, বেশ, দু'-চার দিন ভেবে দ্যাখো। আজ সোমবার,—শুক্রবার রাত্রে আমি এইখানে এসে তোমার কাছ থেকে জেনে যাবো।

ধীরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার দিকে চাহিয়াছিল, মৃদু কণ্ঠে বলিল,— কষ্ট করে কেন মিছে আসবেন! আমি কিছু নেবো না। কিছু আমি চাই না।

সুরেশ বলিল,—কেন? তোমার নিজের জিনিস, তুমি নেবে না কেন?

ধীরা হয়ত এ কথা ভাবিয়া রাখে নাই, কিন্তু মুখ দিয়া ফস্ করিয়া বাহির হইয়া গেল,—ওতে বাবার শেষ নিশ্বাস মিশে আছে! রক্তমাখা! ওই শোকেই তিনি মারা গেছেন।

সুরেশ মুখ নীচু করিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পরে বলিল,— এ ছাড়া আর একটা কথা জেনে এলুম, তুমি সে কথা জানো কি না, জানি না।···বলিয়া সে এক মিনিট থামিয়া পরে বলিল,—এই অপদার্থের হাতে জ্যাঠামশাই তাঁর একমাত্র অবলম্বনকে দান করতে চেয়েছিলেন। তার পর আবার একটু নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল —এ কথা তুমি জানতে?

ধীরা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। লজ্জায় ধীরার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

সুরেশ মুগ্ধনেত্রে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া আগ্রহপূর্ণ স্বরে বলিল,—তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব নয়?

ধীরার মনশ্চক্ষের সম্মুখে পিতার রোগপাণ্ডুর মুখ ভাসিয়া উঠিল। তাহার সারা অন্তর বেদনায় টনটন করিতে লাগিল। দৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়িয়া মৃদু স্বরে ধীরা বলিল,—না।

ক্ষণকাল মৌন-নত মুখে থাকিবার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশ বলিল,—কিন্তু যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তাকে শাস্তি দেওয়া কি উচিত, ধীরা?

—শাস্তি! সে আবার কি! বলিয়া ধীরা স্থির দৃষ্টিতে সুরেশের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সুরেশ সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কি তা নিজেই এখনো ভালো বুঝতে পাচ্ছি না, তোমায় কি করে বোঝাবো! তবে একটা অনুরোধ করছি,—মাঝে মাঝে ঘরে আলো জেলে এই জানলায় দয়া করে একটু বসো, সেইটুকুই আমার যথেষ্ট হবে। কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল। মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশব্দে সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

৪

ধীরা অনেক ভাবিয়া মাকে সকল কথা জানানোই স্থির করিল। ঐ সঙ্গে সুরেশের পত্রখানি পাঠাইয়া দিল। তৃতীয় দিনে ধীরা সুরেশের আর একখানি পত্র পাইল। কাকিমা কাছাকাছির মধ্যেই কোথায় ছিলেন বলিয়া সে পিয়নের নিকট হইতে পত্র লইয়া জামার মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। আহারান্তে কাকিমা ঘুমাইলে সে পত্র খুলিল।

সুরেশ লিখিয়াছে—

স্নেহের ধীরা, তোমায় শত ধন্যবাদ, কাল জানলা খুলে বসেছিলে!···সে দিন তোমায় বলেছিলুম বটে, যে ওই আমার যথেষ্ট হবে, কিন্তু মনে হচ্ছে তা নয়। অ-দেহী প্রেম কাব্য-উপন্যাসে যথেষ্ট গৌরব পেয়ে এলেও সত্যিতে তাকে নিয়ে বাঁচা যায় না। আমি তোমায় চাই,—তোমার ওই দূরের ছবিতে আমার তৃপ্তি হয় না! তুমি কি পূর্ব্ব-কথা ভুলে আমাদের ক্ষমা করতে পারবে না ধীরা? আমি অধীর হয়ে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রইলুম। জ্যাঠাইমাকে সব কথা জানিয়েছ? তাঁর ঠিকানা আমাকে জানিয়ো, আমি তাঁর কাছে মার্জ্জনা চেয়ে চিঠি দেবো। কবে উত্তর দেবে? যদি বুধবার পর্য্যন্ত উত্তর না পাই, তা হলে বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটা নাগাদ তোমার দুয়ারে উপস্থিত হবো। তার পর? অন্য কিছু হয়ত বিশ্বাস না করতে পার, তাই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিয়ে চিঠি শেষ করলুম। ইতি সুরেশ।

ধীরার হাত কাঁপিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! সুরেশ এমন দুঃসাহসী! কাকিমার হাতে যদি এ চিঠি পড়িত! কি বলিতেন তিনি? কুমারী মেয়ে, তাহার পক্ষে এক জন যুবকের সহিত পত্র-ব্যবহার অন্যায়! ধীরা ভ্রূ কুঞ্চিত

করিল। পিতার মুখ স্মৃতি-পথে উদিত হইল, সে দৃঢ় ভাবে আপন মনেই ঘাড় নাড়িল,—না, না, ক্ষমা সে করিবে না। সুরেশের পিতার প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা সে ভুলিতে পারিবে না, সুরেশের শত সোহাগেও না! বাহিরে ভক্তি দেখাইতে গেলে তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না। না, মিথ্যা অপবাদ না কিনিয়া এখনই সুরেশকে সাবধান করিয়া নির্ম্মম হস্তে এ রঙীন ফানুশ ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু চিঠিখানা সে কি জানি কেন, ছিঁড়িতে পারিল না,—অত্যন্ত যত্নে কাপড়ের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিল, যেমন করিয়া লোকে সযত্নে মহামূল্য বস্তু গোপনে তুলিয়া রাখে।

রাত্রে সে সুরেশকে পত্র লিখিল—

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পত্রের আশীর্ব্বাদটুকু ছাড়া আর সমস্তই আমি প্রত্যাখ্যান করিলাম। মায়ের ঠিকানা দিবার কোন আবশ্যক বোধ করিলাম না; কারণ, আমার মন ক্ষুদ্র, পূর্ব্ব-কথা আমি ভুলিতে পারিব না। আপনি আসিবেন না। কারণ, শীত কমিয়াছে, পাড়া আর তত নিশুতি থাকে না, হয়ত কাহারও চোখে পড়িতে পারেন। অযথা কথার সৃষ্টি না হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। ধীরা।

পত্রখানি ডাকে দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু স্বস্তি পাইল না। দিবানিশি মনের মধ্যে কি যেন একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে কি তাহার নিষেধ গ্রাহ্য করিবে? কেন করিবে? রাজপথে বেড়াইবার অধিকার তাহার নিশ্চয় আছে। সে ধীরার আজ্ঞাবহ নয়।

কিন্তু সত্যই সুরেশ আর আসিল না। মায়ের পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন, সুরেশের হাতে তোমায় দেবার ইচ্ছা তাঁর শেষ জীবনে অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল জান ত, এ সুযোগ হারাইও না। তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে। তাকে বলো, সেজঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করে যেন আমায় চিন্তামুক্ত করে। আমি তোমার পত্রের আশায় রইলুম।

ধীরা মায়ের চিঠি খামে পুরিতে পুরিতে গভীর নিশ্বাস ফেলিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, আর সে আসবে না মা, সে পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

বৈশাখ মাসের গোড়ার দিকে এক দিন সুরেশের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। ভাই-বোনদের লইয়া সে কাকিমার বান্ধবী-গৃহে যাইতেছিল। ছোট ছেলেমেয়ে পথে বাহির হইলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে, পথ জনমানবশূন্য দেখিয়া ধীরা বিশেষ নিষেধ করে নাই, অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে দেখিয়া উচ্চস্বরে ডাকিল,—ওরে দাঁড়া, অত ছুটিস্‌নি! পিছন হইতে কে বলিল,—ডেকো না ধীরা, একটু এগিয়েই যাক্ ওরা।

সচমকে ঘাড় ফিরাইতেই পাশে সুরেশকে দেখিয়া ধীরা কুণ্ঠিত হাস্যে বলিল, আপনি?

সুরেশ বলিল, হাঁ। কাল সিমলা যাচ্ছি। অবুঝ মন, বোঝে না ধীরা, আজ আট দিন—সময় নেই অসময় নেই তোমার বাড়ীর আসে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, একটি বার দেখতে পাবার আশায়। আজও হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলুম! ভাবলুম, দেখা আর হলো না! কিন্তু ঈশ্বর দয়া করলেন।

ধীরার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, কি উত্তর দিবে, ঠিক করিতে না পারিয়া সে মৌন হইয়া রহিল।

সুরেশ বলিল,—ছ' মাসের মত যাচ্ছি। ফিরে এসে যদি ঐ বাড়ীতেই থাকো হয়ত আবার দেখতে পাবো, না হলে এই শেষ দেখা,—কি বলো?

ধীরা মৃদু স্বরে বলিল,—হাঁ।

সুরেশ বলিল,—কিন্তু কেন শেষ দেখা হবে ধীরা? তুমি এ বিষয়ে ভেবে দেখেছ? তোমার মন বদলালো না? জ্যাঠামশায় তোমাকে আমায় দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন, আজ যদি তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাতে তিনি খুশী ভিন্ন বিরক্ত হবেন না, নিশ্চয়ই।

ধীরা নিরুত্তরে পথ চলিতে লাগিল। মনে বিদ্বেষ সত্যই মন্দা হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি আজ স্বমুখে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা জাগিল, এবং মর্য্যাদার দোহাই দিয়া মনকে মিথ্যা আঁখি ঠারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ছিল,—গভীর শ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আশীর্ব্বাদটাকে যখন সত্য বলে নিয়েছ, তখন তাই তবে করে যাই, সুখী হয়ো, সকলকে সুখী করো। কি আর বলবো, আর যদি মনে পড়ে, এ অভাগাকে এক-এক বার স্মরণ করো।

৫

ইহার পর দীর্ঘ দু'বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ধীরার মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ধীরা কাকার কাছে ছিল, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া ধীরা বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, শেষ-সময়ে একমাত্র সন্তানকে দেখিতে না পাইয়া তিনি কত মনঃকষ্টেই না প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—তাহা মনে করিয়া তাহার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। এক এক বার মনে পড়িত সুরেশকে, যদি তখন আত্মবুদ্ধির উপর নির্ভর না রাখিয়া সে তাহাকে মায়ের ঠিকানা দিত! তাহা হইলে আজ হয়ত মা মৃত্যুকালে দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় লইয়া চক্ষু মুদিতেন না! আর সে নিজেও এমন স্নেহলেশহীন সান্ত্বনা-বিহীন জীবন যাপন করিত না! এই দুই বৎসরের মধ্যে সুরেশের আর কোন সন্ধান সে পায় নাই! মাত্র এক দিন দেখিতে পাইয়াছিল একটি কীর্ত্তনের আসরে। সুরেশ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। কারণ, সে কাকিমার সহিত চিকের আড়ালে বসিয়াছিল। কীর্ত্তনীয়া যখন বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছিল,—

> কোমল কিশোর শ্যামচাঁদ মোর,
> নবনী-গঠিত দেহ!
> এ বাহু-বন্ধনে লো পরাণ সখি,
> আর না বাঁধিব তেঁহ?
> মোর ললাটের লিখা,
> আঁখি-লোরে হায়, বসন তিতিল
> হৃদয়ে আগুন-শিখা!

তখন কি জানি কেন অনাহূত অশ্রুজলে ধীরার কপোল ভাসিয়া গিয়াছিল। দেখিয়া কাকিমা পাশের বান্ধবীকে বলিলেন,—মেয়ের আদিখ্যেতা দেখেছ! আমরা কীর্ত্তন শুনে কাঁদলুম না, উনি কেঁদে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন!

বান্ধবী হাসিয়া বলিলেন,—কি করে জানলে বাপু যে ভগবানের নামেই কাঁদলে! রাধিকার মত মনের ভাব হতে পারে তো!

কাকিমা সগর্ব্বে বলিলেন,—থাম্, আমার চোখ এড়িয়ে একটা পিঁপড়ে যাবার যো নেই, ও সব আমার কাছে চলবে না, তা হলে কবে গলা টিপে দূর করে দিতুম। মেয়েটা এদিকে খাঁটি।

ধীরা চোখের জল মুছিয়া চিকের বাহিরে সুরেশের প্রশান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। ছাই-রংয়ের গরম পাঞ্জাবীর উপর সাদা হাঁসিয়াদার শালখানি জড়ানো, শুধু ডান হাত ও মুখখানি দেখা যাইতেছিল। তথাপি ধীরার মনে হইল, উহার সর্ব্ব-অবয়ব যেন তাহার চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে।

সে বার কাকিমার বড় মেয়ে অচলা সন্তান-সম্ভাবিতা হইতে অসুস্থতার জন্য মাকে যখন সেখানে গিয়া কিছু দিন তাহার কাছে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন কাকিমা বলিলেন,—ঘর-সংসার ফেলে আমি কি করে যাবো? ধীরা যাক।

কাকা বলিলেন,—সেটা কি ভালো দেখাবে? আইবুড় মেয়ে—ওকে পাঠানো কি উচিত হবে?

কাকিমা বলিলেন,—আইবুড়ো ছাড়া এখুনি ওঁর কোন্ রাজপুত্র জুটছে? পাঁচ জনের করবে না ত করবে কি? আমি কি করে যাবো? আর ছেলেপুলে, সেয়ানা মেয়ে, সব ফেলে কি জামাইবাড়ী পড়ে থাকতে যাবো?

কাকা বলিলেন,—ঘী আর আগুন, বুঝে দেখো। মেয়েটা শেষে অশান্তির কারণ না হয়!

তাচ্ছিল্যভরা সুরে কাকিমা বলিলেন, হুঁ—সে ভয় করো না। অচলা আমার পেটের মেয়ে, একটু উনিশ-বিশ দেখলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে। সে ভয় তুমি করো না।

কাকা আর কথা বলিলেন না, ধীরা কিন্তু শুনিয়া প্রমাদ গণিল। তাহার উপর ভগিনীপতিটির যে বিশেষ আকর্ষণ আছে, ধীরা তাহা জানিত। সেই ভগিনীপতির ঘরে অসুস্থ অচলাকে বৃথা আড়াল রাখিয়া সে যে নিরাপদ থাকিতে পারিবে না, তাহা সে ভাল করিয়াই বুঝিতে ছিল,—তাছাড়া এখন যাওয়ার অর্থ, দীর্ঘ দিন সেখানে তাহাকে থাকিতে হইবে, অচলা সূতিকাগারে যাইবে,—তখন তাহাকে একেবারে একা থাকিতে হইবে, ভগিনীপতির সান্নিধ্য এড়াইবার উপায়টুকু পর্য্যন্ত থাকিবে না!

কাকিমাকে সে নিজের অনিচ্ছা জানাইল। কাকিমা জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—কেন বলো ত? তুমি কি সন্দেশ না রসগোল্লা যে মোহিত তোমায় গালে ফেলে জল খাবে? বারো মাস ভাত-কাপড় দিয়ে পুষছি, আমার একটা উপকারের বেলা তুমি মুখ বাঁকালে চলবে না'ত। তোমায় যেতেই হবে। ওঁর শরীর খারাপ—আমি যাই কি করে? বুড়ো ধাড়ি মেয়ে—বয়সের গাছ-পাথর নেই। না হয় বরই জুটলো না, তা বলে আক্কেল-বিবেচনা থাকবে না?

ইহার পর নিরুপায়! কাকাকে বলিলেও কোন ফল হইবে না, বরং হিতে বিপরীত হইবে, ধীরা তাহা জানিত! তাই শুধু নিজের অসহায় অবস্থা ভাবিয়া চোখের জলে ভাসিয়া যাত্রার আয়োজনে সে ব্যাপৃত হইল।

মোহিত আসিয়া যখন শুনিল, শাশুড়ীর পরিবর্ত্তে ধীরা যাইতেছে, তখন তাহার মনে এমন আনন্দ ফুটিয়া উঠিল যে, তাহার আভাস পাইয়া ধীরা শিহরিয়া উঠিল। কাতর হইয়া মনে মনে সে বলিতে লাগিল, হে লজ্জারক্ষক ভগবান্, তুমি দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করেছিলে, আমার লজ্জাও রক্ষা করো। আমি অসহায়, আমি নিরুপায়!

পরদিন অঝোরে কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরা ট্রেণে উঠিল। মোহিত একেবারে আহ্লাদে আটখানা! সে বলিল,—দিদি, এত কাতর হচ্ছেন কেন বলুন ত? আমরা কি আপনার পর না কি? আর এখানে মায়ের কাছে কি অযত্নেই আপনি আছেন! সেখানে মনে করবেন আপনার সব! আপনার ঘর, আপনার সংসার! আমি আপনার গোলাম—আপনি যা করবেন তাই হবে।

কথাটা হয়ত নিষ্পাপ, কিন্তু ধীরার কানে বেসুরো লাগিল! সে মৌন হইয়া একান্ত ভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল।

মোহিত বলিল,—আমি যখন আপনাকে দেখি, তখন ঈশ্বরের বিচার দেখে অবাক্ হয়ে যাই। আপনার এমন রূপ এত গুণ, অথচ আপনি যেন কত অবহেলার পাত্রী! আপনার সিকির সিকি রূপ যাদের নাই,—আর গুণ ত আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না, তারাও সংসারে কেমন মর্য্যাদা আর সম্মান পেয়ে রয়েছে। অচলার কথাই ধরুন। আপনার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, অথচ—

বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে ধীরা বলিল,—আমার ছোট বোনের নিন্দে করলে আমি আনন্দ পাবো না মোহিত। ও আলোচনা রাখো!

মোহিত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুপ করিল।

খানিকটা গিয়া বলিল,—গাড়ীতে তেমন ভীড় নেই, এই একট সুবিধে। দু'জনেই বেশ ঘুমুতে পাবো। এত বড় কামরা—ওদিকে ওরা তিন জন, আর এদিকে আমরা দু'টি প্রাণী, বেশ আরামে যাওয়া যাবে। এসে বিছানাটা পাতছি। বলিয়া সে শৌচাগারের দিকে গেল।

ও কোণে যে লোকটি বসিয়াছিল, সে এতক্ষণ এক দৃষ্টে ধীরার দিকে চাহিয়া ছিল, মোহিত ভিতরে প্রবেশ করিলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সে বলিল,—ধীরা না?

ধীরার মনে হইল, বুঝি, তাহার আর্ত্ত আহ্বান শুনিয়া পরিত্রাতা ভগবান্ সুরেশের রূপ ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলিল, হ্যাঁ। আপনি!

সুরেশ বলিল—কোথায় যাচ্ছো?

রুদ্ধ স্বরে ধীরা বলিল,—যমের বাড়ী!

সুরেশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—তাই না কি? সঙ্গে ওটি?

ধীরা বলিল,—যমদূত।

সুরেশ বলিল,—চট্ করে বলো না, ব্যাপার কি? ও লোকটা কিছু এক ঘণ্টা ওখানে থাকবে না ধীরা!

ধীরা চোখ মুছিয়া বলিল, কাকার জামাই। কাকার মেয়ের অসুখ, তাই আমায় সেখানে যেতে হচ্ছে। আমার ওপর এর বড্ড দরদ! আমার মাথা খাবার চেষ্টায় আছেন!

এক সেকেণ্ড ভাবিয়া সুরেশ বলিল, এক দিন ফিরিয়ে দিয়েছিলে, আজ নিতে রাজী আছ? অভিভাবকশূন্য মেয়ে কত অসহায় দেখছ ত? কি বলো?

দ্বিধা না করিয়া ধীরা বলিল,—তোমারই হাতে বাবা আমায় দিয়ে গেছেন, তুমি সে দাবী ছাড়লে কেন?

—বাঃ! উল্টো চাপ! বলিয়া তৃপ্তির হাসিতে মুখ ভরিয়া সুরেশ ধীরার পাশে বসিয়া বলিল,—ওদিকে পিঠ করে আমার দিকে তুমি ঘুরে বোস। যা বলতে হয়, আমি বলব। ওঁর নাম কি? সে ধীরার দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

লজ্জারক্ত মুখে ধীরা বলিল,—ওঁর নাম মোহিত বাবু। ছি ছি, তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও, মোহিত বাবু কি মনে করবেন।

সুরেশ বলিল, না, ছাড়বো না। ট্রেণে না হলে এর চেয়ে আরও কাছে এনে—মোহিত বাবুকে আমার দাবীর পরিমাণ জানিয়ে দিতুম—যাতে আগামী আট-দশ দিনের মধ্যে তোমার দিকে আর হাত বাড়াতে সে সাহস না করে! ভেবো না, ফাল্গুন মাসের ৯ই দিন আছে।

মোহিত বাহির হইয়া হতবুদ্ধির মত সুরেশের দিকে চাহিয়া আছে—দেখিয়া সুরেশ হাসিমুখে বলিল,—আসুন মোহিত বাবু, পরিচয় নেই বটে, তবে আমরা খুব ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব!

মোহিত কাছে আসিয়া সুরেশের হাতে ধীরার হাত দেখিয়া যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল! তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

সুরেশ বলিল,—দাও না গো, তোমার ভগিনীপতির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে—ভদ্রলোক যে শিঁটিয়ে গেলেন! ওঁকে বলো, আমি তোমার কে!

তৃপ্তিতে ধীরার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। ব্রীড়ানম্র মুখে সে বলিল, আঃ, কি করো! মোহিত বোকা নয়! তুমি কে, ও তা বুঝেছে। পথের লোক আমার কাছে বসতে সাহস করবে না, মোহিত তা জানে।

মোহিত এতক্ষণে কথা বলিল। গলার জড়তা কাটাইয়া বলিল,—কিন্তু উনি যে পথের লোক ছাড়া অন্য কেউ,—তার কোন পরিচয় আমি জানি না। আপনার কাকাকে আমি কি জানাবো?

সুরেশ বলিল,—ঠিক কথা। তাকে লিখবেন, ৺পরমেশ রায়ের ছেলে সুরেশ রায়ের সঙ্গে ৯ই ফাল্গুন ধীরার বিবাহ হবে। আপনারা সবান্ধবে আসবেন। বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর বলিল,—জানেন মোহিত বাবু, ছ' বছর আগে এঁর বাবা এঁকে আমার হাতে দান করে গেছেন। কিন্তু ইনি এমন লুকিয়ে ছিলেন যে, ওঁর কোন পাত্তা পাইনি এত দিন। এ বার আর পালাতে পাচ্ছো না ধীরা—মনে থাকে যেন, আমি দাবীদার।

মৃদু কণ্ঠে ধীরা বলিল,—আমি কি তা অস্বীকার করেছি? বলো!

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

শূকর-চরিত

[ইভান ক্রাইলড (১৭৬৮-১৮৪৪) রুশ লেখক। ঈশপের মতো তিনি রুশ-ভাষায় ছোট-ছোট অসংখ্য কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ এবং ঈশপের গল্পের মতোই সেগুলিতে শাশ্বত-সত্যের অমর বাণী গাঁথা আছে। ক্রাইলডের অসংখ্য ছন্দ-কাহিনীর মধ্য হইতে একটির মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিতেছি]

ধনীর প্রাসাদে রাত্রে আসিল শূকর।
উঁকি দিয়া দেখে তার প্রত্যেকটি ঘর—
শয়ন-বৈঠকী-কক্ষ, হেঁশেল-ভাঁড়ার,
বারান্দা—কিছুই বাকী রাখিল না আর!
ভালো লাগিল না কিছু! খিড়কীর পারে
এসে দেখে, আঁস্তাকুড়! উচ্ছিষ্টের ভারে
ডাঁই হয়ে আছে! কাদা, ভ্যাট্‌ভেটে পাঁক—
মশা-মাছি কৃমি-কীট কি তাদের জাঁক!
মাতে শূকরের প্রাণ। পাঁকে দেয় ডুব।
গান গায় ঘোঁৎ-ঘোঁৎ—মনে খুশী খুব!
সারা গায়ে পাঁক মেখে মহানন্দ জিনি
শূকর ফিরিল গৃহে। কহে শূকরিণী—
"ধনি-গৃহে সত্য খুব বিলাস-বিভব?"
হাসিয়া শূকর কয়,—"মিছে কথা সব।
দেওয়ালেতে নক্সা আঁকা; পাথরের মেঝে;
সোফা-কৌচ; তৈজস রাখা ঘষে-মেজে;
বিজলী-বাতির ঝাড়; দুগ্ধফেন শয্যা;
আসবাব, ছবি,—আরো রকমারি সজ্জা!
হেঁশেলে পোলাও-কারি, চপ-কাটলেট;
বাথরুমে গন্ধ-তেল, টয়লেট-শেট!
লোক-মুখে এ-সবের কি-সুখ্যাতি জাগে!
কিছু না, কিছু না, ফাঁকি! মনে নাহি লাগে!
হ্যাঁ, তবে ফিরিতে দেখি কিছু থাকে যদি—
বাড়ীর খিড়কীতে বটে, আহা, পঙ্ক-নদী!
মাখনের মতো পাঁক—এঁটো-কাঁটা-ভরা—
মশা-মাছি-কৃমি-কীটে কিল্‌বিল্‌-করা!
তাহে অবগাহি মোর সব দুঃখ দূর!
না হলে হতাশ-ভারে প্রাণ হতো চুর!

কবি কহে, এ শূকর—এর মতো লোক
সমাজে-সংসারে আছে—যার দুই চোখ
ভালো না দেখিতে পায় কোনো-কিছুতেই—
খুঁৎ খুঁজে, দোষ খুঁজে নাচে থেই-থেই!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ছোটদের আসর

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ছায়া ও কায়া

[রূপ-কথা]

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে চলেছি, মাথার ওপর যে এখনও সূর্য্যদেব রয়েছেন সে খেয়াল নেই। হঠাৎ কয়েকটি লোকের সমবেত চীৎকারে চিন্তাজাল ছিন্ন হলো। কানে গেল, তারা বলছে—"ওরে দেখ দেখ, লোকটার ছায়া নেই।" আমি দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে যে দিকে চক্ষু যায় ছুটতে লাগলুম। কতক্ষণ ঐ ভাবে ছুটেছি, বলতে পারি না। যখন থামলুম, তখন বেলা পড়ে এসেছে, আর আমি পৌছে গেছি সহরের প্রান্ত অতিক্রম করে এক জঙ্গলের মধ্যে। বহু দিন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিলুম। দিনান্তে এক-আধ বার যখন বেরোতুম—গাড়ীতেই। কাজেই হাঁটার অভ্যাস ছিল না। ছুটোছুটিতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। পা দু'টো থর-থর করে কাঁপছিল, সেইখানেই থপ করে মাটীতে বসে পড়লুম। উত্তেজনা ও শ্রান্তিতে মাথা ঘুরছিল। কখন্ যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম, বুঝতেও পারিনি। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন ভোর হয়ে গেছে। পাখীরা মনের আনন্দে গান করছে। উঠতে চেষ্টা করলুম, পারলুম না। সর্ব্বশরীরে বেদনা, প্রবল জ্বর। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে! ঠিক করলুম, লোকালয়ে আর ফিরে যাব না। অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে জলের সন্ধানে আরও গভীর বনের মধ্যে চলে গেলুম। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করবার পর একটি ছোট্ট নদীর ধারে উপস্থিত হলুম। আঁজলা ক'রে জল খেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে সেইখানেই আবার শুয়ে পড়লুম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লুম।

প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে ঘুম ভাঙ্গল। ক্ষুধার জ্বালায় এবং জ্বরের প্রকোপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলুম। মনে হতে লাগল যেন মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। একটু চোখ লেগে এসেছে, এমন সময় বিকট একটা আওয়াজে চমকে উঠলুম। দেখি সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট্ এক বাঘ। ভয়ে বুকের রক্ত পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। উঠতে চেষ্টা করলুম, পারলুম না। প্রকাণ্ড হাঁ করে বাঘটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বুঝলুম, মরণ নিশ্চিত! ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলুম! কিন্তু এ কি! বাঘটা হঠাৎ স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লেজ তুলে দে ছুট। কিছুই বুঝলুম না। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলুম, সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যাঁর খোঁজে আমি হন্যে হয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে এসেছি। তাঁকে দেখেই আমার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। মনে হ'ল, এর চেয়ে বাঘের মুখে প্রাণ হারানো ভাল ছিল! তিনি কিন্তু একগাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন—"আপনি অনর্থক এত কষ্ট পেলেন শম্ভু বাবু। এক দিন অপেক্ষা করলে আমি নিজেই আপনার প্রাসাদে গিয়ে হাজির হতুম। আমার আজ আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল।" আমি রাগত স্বরে বললুম—"আজ মানে? আপনার কথা-মত কাল এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে।" তিনি উত্তর দিলেন—"আপনার ভুল হয়েছে। এটা লীপ ইয়ার। অন্য বছরের চেয়ে এক দিন বেশী।" তাই তো, কি রকম ভুল। উত্তেজনার বশে এ কথা আমার মনেই পড়েনি। ভয়ানক অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। তিনি বলে চললেন—"অশান্তিতে এবং শ্রান্তিতে আপনার দেখছি জ্বর হয়ে গেছে। দেখি যদি আপনাকে সুস্থ করতে পারি।" এই বলে তিনি আমার কপালে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ প্রবাহিত হলো—আর কি আশ্চর্য্য! শরীর একেবারে সুস্থ সবল হয়ে উঠল। কোথায় জ্বর, কোথায় ক্লান্তি! আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি হেসে বললেন—"এখন বেশ ভাল মনে হচ্ছে তো?" অস্বীকার করতে পারলুম না। তিনি তখন বললেন—"এইবার আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা হোক। আপনি ছায়ার বিরহে দেখছি ভয়ানক কাতর হয়ে পড়েছেন। আপনাকে ছায়া ফেরত দিতে রাজী আছি, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে—" তবে কি থলেটা ফিরিয়ে দিতে হবে? মনটা দমে গেল। তাড়াতাড়ি বুক-পকেটে হাত দিলুম—সেই পকেটে থলেটা ছিল। তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে এক-গাল হেসে বললেন—"না, না, থলেটা ফেরত দিতে হবে না। উপযুক্ত ব্যক্তির হাতেই দিয়েছি। আমি বলছিলুম—যদি রাগ না করেন তো বলি—" এই পর্য্যন্ত বলে জিজ্ঞাসু-নেত্রে আমার দিকে চেয়ে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি ঠিক করেছিলুম, এই লোকটির সঙ্গে আর কোন কারবার করব না। থলেটা দিয়ে ছায়া ফেরত নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। কিন্তু কি জানি কেন থলেটা ফেরত দিতে মন চাইল না। অথচ ছায়ার আমার বিশেষ প্রয়োজন। তাই বললুম—"আপনার কি বক্তব্য বলুন! রাগ করব কেন?" তিনি যেন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আমি বললুম—"বলুন না। যদি অসম্ভব কিছু না হয় তবে তা দিয়ে তার পরিবর্ত্তে ছায়া ফেরত পেতে আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।" তিনি বললেন—"আমি বলছিলুম, আপনি ছায়াটা ফেরত নিয়ে তার পরিবর্ত্তে যদি কায়াটা দেন!"

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললুম—"কি বলছেন আপনি? কায়া দিলে আমার থাকবে কি? আমি তো মরে যাব।" তিনি বললেন—"কায়া দেবেন বটে, কিন্তু কায়ার আদরাটা আপনারই থাকবে। অর্থাৎ আপনার শরীর কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যাবে। উলঙ্গ অবস্থায় আপনাকে কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু কাপড়-জামায় আবৃত থাকলে আকার পরিষ্কার বোঝা যাবে এবং আপনার গায়ে হাত দিলে অনুভবও করা যাবে।" বুঝলুম, ছায়াদানের চেয়ে কায়াদান ব্যাপারটা আরও বেশী গোলমেলে। ও সবের মধ্যে আর না যাওয়াই ভাল। তাই বললুম—"না, আপনার কথায় আমি রাজী হতে পারলুম না। আমি কায়াও দেব না, ছায়াও চাই না। লোকালয়ের বাহিরে বনের মধ্যেই আমি পড়ে থাকবো।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বললেন—"যথা অভিরুচি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে আপনাকে বলতে পারি না।" একটু থেমে আবার বললেন—"আচ্ছা, আপনার ললিতাকে একবার দেখবার ইচ্ছা হয় না।" ললিতার কথা এতক্ষণ প্রায় মনেই ছিল না, নামটা শুনতেই মনটা ভয়ানক উতলা হয়ে উঠল। দেখবার

প্রবল ইচ্ছা জাগল। নিজেকে দমন করতে পারলুম না। বললুম —"ইচ্ছে আছে, কিন্তু যেতে সাহস হয় না। ছায়া নেই—ভয়ানক অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।" তিনি বললেন—"সে জন্য ভাববেন না, সে ভার আমার। আমরা দু'জনে অদৃশ্য হয়ে সেখানে যাব, কেউ দেখতে পাবে না।" আমি উত্তর দিলুম—"কেউ যদি আমায় দেখতে না পায়, তবে সেখানে যেতে আমার আপত্তি নেই।" তিনি তখন পকেট থেকে একটি টুপী বার করে বললেন—"এটি হ'ল অদৃশ্যকারী টুপী। আমি মাথায় দিচ্ছি দেখুন।" এই বলে তিনি টুপীটা মাথায় পরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই কি আশ্চর্য্য—কোথায় যে মিলিয়ে গেলেন! আমি চারিধারে অবাক হয়ে দেখছি, এমন সময় পিছন দিক্ থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর কাণে এল—"কি, আমার কথা বিশ্বাস হ'লো?" তাড়াতাড়ি সেই দিকে ফিরলুম, কিন্তু কই—কাউকে দেখতে পেলুম না। তখন তিনি মাথা থেকে টুপী খুলে ফেললেন। দেখলুম তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমাকে হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন—"কেমন, দেখলেন তো? এবার আর মোড়লমশাইয়ের বাড়ী যেতে নিশ্চয় কোন আপত্তি নেই, কি বলেন?" আমি আগ্রহ সহকারে বললুম—"এখনই যেতে প্রস্তুত।"

অতঃপর আমরা দু'জনে দু'টো অদৃশ্যকারী টুপী মাথায় দিয়ে দ্রুতপদক্ষেপে সহরের দিকে চললুম এবং কিছুক্ষণ পরে শ্রীপদ বাবুর বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হলুম। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, শ্রীপদ বাবু ও আমার পলায়িত ভৃত্য অনন্ত কথা কইছে! অনন্ত বলছে—"আপনি কিছু ভাববেন না। শম্ভুনাথ বাবু ছায়ার শোকে বিরাগী হয়ে গেছেন আর কানাই তাঁকে খুঁজতে চলে গেছে। সুতরাং বাড়ী এবং টাকা সবই আমার। কানাই যদি ফিরে আসে তাকে মেরে ভাগিয়ে দেব আর ছায়াহীন অবস্থায় শম্ভু বাবু লোকালয়ে আসতে সাহস করবেন না।" শ্রীপদ বাবু উত্তর দিলেন—"তা বাবা, রূপে গুণে তুমি মন্দ নও, আমার পছন্দও হয়েছে তবে বাড়ীতে একবার পরামর্শ না করে কোন উত্তর দিতে পারছি না। তুমি যদি কাল আস তবে—" একগাল হেসে হাত জোড় করে অনন্ত বললে—"বিলক্ষণ! পরামর্শ করবেন বই কি। আমি না হয় কাল এই সময় আসব।" শ্রীপদ বাবু বললেন—"বেশ, বেশ, সেই ভাল।" অনন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অনন্তকে আচ্ছা করে মার দেবার জন্য আমার হাত নিসপিস করছিল। সেই প্রৌঢ় সঙ্গী আমার হাত দৃঢ় ভাবে ধরে কানে-কানে বললেন—"কোন কথা কইবেন না, কিংবা মারধরের চেষ্টা করবেন না। ধরা পড়ে যাবেন। এখন আমার সঙ্গে চলে আসুন। পরে এই সবের ব্যবস্থা হবে।" মনের রাগ মনে চেপে সঙ্গীর হাত ধরে সেই স্থান পরিত্যাগ করলুম। সহরের বাহিরে পৌঁছে দু'জনেই টুপী খুলে ফেললুম। প্রৌঢ়টি বললেন—"নিজের চোখেই সব দেখলেন তো। এখন আপনার কি ইচ্ছা! এর একটা প্রতিকার করা কি উচিত মনে করেন না! অনন্ত যে কত বড় পাজী বুঝতে পারছেন তো! ওকে শাস্তি দেবেন না? ঐ রকম একটা বদমায়েস লোকের হাতে পড়ে ললিতার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, আপনি তাতে বাধা দেবেন না?" অনন্তর ওপর আমি আগে থেকেই রেগে ছিলুম, তাঁর কথা শুনে যেন ক্রোধাগ্নিতে পূর্ণাহুতি পড়ল। বললুম—"নিশ্চয়ই, সে ব্যাটাকে আচ্ছা করে জব্দ না করতে পারলে আমি মনে কিছুতেই শান্তি পাব না। আমায় কি করতে হবে বলুন।" তিনি বললেন—"বেশী কিছু করতে হবে না। একবার অনুমতি দিলেই কায়াটা নিয়ে আপনাকে ছায়াটা ফেরত দিতে পারি; অধিকন্তু, এই অদৃশ্যকারী টুপীটাও আপনাকে উপহার দিতে রাজী আছি।" অন্য সময় হলে হয়তো প্রৌঢ়ের প্রস্তাবে রাজী হতুম না, কিন্তু তখন অনন্তকে তার কৃতকর্ম্মের প্রতিফল দেবার আগ্রহ, ললিতাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা এবং অদৃশ্য-কারী টুপীটা পাবার লোভ আমাকে পাগল করে তুলেছিল। নইলে এমন প্রস্তাবেও মানুষ রাজী হয়! বললুম—"আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী আছি, কিন্তু একটা কথা রয়েছে—" স্মিতহাস্যে তিনি বললেন—"কি কথা বলুন।" আমি বললুম—"সমস্ত দেহটা যদি স্বচ্ছ হয়ে যায়, তবে লোক-সমাজে বার হব কি করে? কাপড়-জামার মধ্যে থেকে হাত, পা ও মাথা তো বেরিয়ে থাকবেই। লোকে দেখবে কন্ধকাটা হস্ত-পদবিহীন একটা মনুষ্য-মূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে।" তিনি বললেন—"তাই তো এ কথা তো আমার মাথায় আসেনি। বেশ, এক কাজ করছি। আপনার ঘাড় পর্য্যন্ত মাথা ও মুখ, কনুই পর্য্যন্ত হাত ও হাঁটু পর্য্যন্ত পা অবিকৃত অবস্থায় থাক। বাকী শরীর কাচের মত স্বচ্ছ হলে তো আপনার কোন আপত্তি নেই? কাপড়-জামা পরে থাকলে কেউ জানতেও পারবে না।" আমি বললুম—"তবে আর আপনার প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নেই।" এক-গাল হেসে তিনি বললেন—"এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা।" এই বলে পকেট থেকে বহু-আকাঙ্ক্ষিত হারানো ছায়াটি বার করে তিনি আমার পায়ের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। আমি রৌদ্রে এদিক্ ওদিক্ ঘুরে ফিরে ছায়াটি পরখ ক'রে এমন খুশী হলুম যেন বহু দিন পরে অতি প্রিয়বন্ধু অথবা আত্মীয়ের সন্ধান পেয়েছি। তিনি তখন আমার হাতে টুপীটা দিয়ে বললেন—"এই নিন অদৃশ্যকারী টুপী। এইবার আপনার কায়াটা আমি নিচ্ছি।" সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, কথা-মত স্থানগুলি বাদে বাকী সমস্ত দেহটা স্বচ্ছ হ'য়ে গেল। গায়ে হাত দিয়ে তবে বুঝতে হ'ল গা আছে কি-না। অতঃপর তিনি কি ভাবে অনন্তকে জব্দ করতে হ'বে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—"শীঘ্রই আবার দেখা হবে—কবে এবং কোথায় তা এখন বলতে পারছি না।" তার পর তিনি হন্-হন্ করে বনের দিকে চলে গেলেন। আমিও ধীরে ধীরে সহরের দিকে পা বাড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে নিজের প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছুলাম। ছায়া সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে, সুতরাং পথে কোন বিপদই হ'ল না। প্রাসাদে প্রবেশ করেই মাথায় টুপীটা পরে ফেললুম। তার পর নিজের ঘরে ঢুকলুম। ঢুকে দেখি, আমার বিছানায় দিব্য আরাম করে শুয়ে আমারই ভৃত্য অনন্ত তামাক খাচ্ছে। মেজাজটা একেবারে গরম হয়ে গেল। সোজা গিয়ে তাকে এক চড় বসিয়ে দিলুম। সে গালে হাত বুলাতে বুলাতে হতভম্বের মত ঘরের চারি দিকে চাইতে লাগল, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলে না; কারণ, আমার মাথায় অদৃশ্যকারী টুপী। মনের ঝাল মেটাবার জন্য মাথায় গায়ে পিঠে ঘাড়ে যেখানে পারলুম দুমদাম করে কিল চড় মারতে লাগলুম। সে ভীত বিস্মিত ভাবে এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটি করতে লাগল! তার রকম-সকম দেখে আমি আর হাসি চাপতে পারলুম না, হো-হো করে হেসে উঠলুম। আমার গলার স্বর চিনিতে পেরে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়িয়ে

পড়ল। একটু সামনে ঢোক গিলতে গিলতে বললে—"আপনি শম্ভু বাবু!" ধরা পড়ে গেলে সব মজা নষ্ট হয়ে যাবে, ভেবে আমি কথার উত্তর দিলুম না। তার বদলে পিঠে এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলুম। সে "ওরে বাপ" বলে একেবারে এক ছুটে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। ফিরে দেখবার সাহস পর্য্যন্ত হ'ল না।

টুপীটা খুলে পকেটে রেখে একটা আরাম-চৌকিতে চুপ করে বসে পড়লুম। খালি মনে হতে লাগল, "আহা, এই সময় যদি কানাই থাকতো!" হঠাৎ দেখি এক-মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ী-গোঁফ উস্কো-খুস্কো চুল নিয়ে এক জন লোক ঘরে ঢুকল। আমি তার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম—এ আবার কে? সে কিন্তু আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠল—"আপনি ফিরে এসেছেন! কি সৌভাগ্য!" কণ্ঠস্বরে চিনলুম আগন্তুক কানাই। কি আশ্চর্য্য! দু'দিনে মানুষের এমন আমূল পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে! তার পর দু'জনে অনেক কথা হ'ল। দু'টো দিন যেন দু'টো যুগ—এত ঘটনা ঘটে গেছে। সে বললে—"চলে যাবার পর আমি সমস্ত রাত জেগে বসেছিলুম। সকালেও ফিরলেন না দেখে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে আপনার খোঁজে বার হলুম। দু'দিন চারি দিকে দিবারাত্রি খোঁজ করে যখন হতাশ হয়ে সহর-প্রান্তে বনের ধারে একটা গাছতলায় বসে আছি, সেই সময় একজন বৃদ্ধ এসে বললে—'বাড়ী ফিরে যাও। শম্ভু বাবু এইমাত্র বাড়ী গেলেন।' সেই শুনেই আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলুম। এসেই দেখি, আপনি।" আমি তখনই বুঝতে পারলুম, সেই বৃদ্ধটি কে। আমিও ঘুরে বেড়ান ও ছায়া পুনরুদ্ধারের ইতিবৃত্তান্ত তাকে খুলে বললুম, কিন্তু ছায়ার পরিবর্ত্তে যে কায়াদান করতে হয়েছে, সে কথার কোন উল্লেখ করলুম না। অনন্তর বদ-মায়েশীর কাহিনীটাও শোনালুম এবং কি উপায়ে তাকে উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া যায়, সে সম্বন্ধে পরামর্শ করলুম। তার পর আমি বললুম—"এইবার কিছু খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত কর, আর আমার জন্য বেশ মোটা দেখে জামা ও আলখাল্লা-কোট কিনে আন। দু'দিন হিমে রৌদ্রে বুকে সর্দ্দি বসে গেছে। কবিরাজ বলেছে, সব সময় বুক পিঠ-পেট যেন ভাল ভাবে ঢাকা থাকে।" সে তখনই আমার কাছ থেকে দু'-এক মুটো মোহর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে সে দিন রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন সকালে যে সময় অনন্তর শ্রীপদ বাবুর বাড়ী যাবার কথা ঠিক, সেই সময় আমরাও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বাহিরে থেকে শুনতে পেলুম, অনন্ত বলছে—"তার পর কি ঠিক করলেন?" শ্রীপদ বাবু বললেন—"আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু গৃহিণী বলছেন, চাকরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে—" অনন্ত বাধা দিয়ে বললে—"চাকর কিসের? এখন আমিই তো সর্ব্বেসর্ব্বা। এটা বুঝতে পারছেন না?" শ্রীপদ বাবু উত্তর দিলেন—"আমি তো বুঝতে পারছি, কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। তাছাড়া গৃহিণীকে যদি-বা কোন মতে রাজী করাতে পারি, মেয়ে তো এ বিবাহে কোন মতেই সম্মতি দিচ্ছে না। বলছে—'তোমার চিঠির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা!'" রাগত স্বরে অনন্ত বললে—"মিথ্যা! কি বলছেন! আপনি তো তাঁর ছায়া দেখতে চেয়েছিলেন, তিনি পেরেছিলেন দেখাতে? বরং ভয়ে তিনি শেষ পর্য্যন্ত দেশ ত্যাগ করলেন।" শ্রীপদ বাবু শান্ত ভাবে বললেন—"শম্ভুকে এ কথাও বলেছিলুম তাতে সে বললে,—'ঐ রকম একটা বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন করলে যে কোন ভদ্রলোক অপমানিত বোধ করবেন! আর দু'দিন যখন তাঁকে সময় দিয়েছেন, তখন আজকের দিনটা অপেক্ষা না করে কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এমনও তো হতে পারে—কোন বৈষয়িক কাজে তিনি বিদেশে গেছেন।'" তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে অনন্ত বললে—"কাজ না ছাই! ভয়ে পালিয়েছেন! ছায়া নেই, আসবেন কোন্ সাহসে? আপনি দোমনা না করে আজই আমায় একটা সঠিক উত্তর দিয়ে দিন। তার আশায় ব'সে থাকলে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বসেই থাকতে হবে। আজ তো দু'দিন হ'ল, কই তিনি এলেন না।" উপযুক্ত সময় বুঝে আমি ও কানাই ঘরে ঢুকে পড়লুম। আমাকে দেখবামাত্রই অনন্তর মুখ একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। আমি যেন কিছুই জানি না, এমন ভাব দেখিয়ে আমি বললুম—"কি শ্রীপদ বাবু, কেমন আছেন?" শ্রীপদ বাবু আমাকে এ সময় দেখবেন আশা করেননি, তাই একটু হকচকিয়ে গিয়ে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি হেসে জিগ্যেস করলুম—"কি দেখছেন?" তিনি আমার হাত ধরে অনুতপ্ত স্বরে বললেন—"আমায় মাপ করো বাবা। আমি একটা পাষণ্ড মিথ্যাবাদীর কথায় বিশ্বাস করে তোমায় যা নয় তাই বলেছি।" তার পর ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠে অনন্তকে বললেন—"তুমি বেইমান্, জোচ্চোর, পশুর অধম। এক জন ভদ্রলোক, তায় তোমার মনিব, তার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে তুমি তারই কিনা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে—" রাগে তাঁর মুখ থেকে আর কথা বার হ'ল না। তিনি ঘুষি পাকিয়ে অনন্তের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে ফেললুম! তিনি বললেন—"না, শম্ভুনাথ, আমায় ছেড়ে দাও! ওকে আমি মাপ করব না, যে যেমন ছোট লোক তাকে তেমনি শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। ওকে জেলে দেব।" আমি কৃত্রিম সহানুভূতি দেখিয়ে বললুম—"যাক, যাক, ছেড়ে দিন। ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করবেন না!" তিনি বললেন—"বেশ, তোমার কথায় ওকে না হয় জেলে দেব না, কিন্তু মাথা নেড়া করে এক গালে চূণ আর এক গালে কালী মাখিয়ে বাড়ীর বার করে দেব। বেটা বলে কি না, শম্ভু বাবুর ছায়া নেই! এই তো দিব্যি ছায়া রয়েছে।" তখন আমরা তিন জনে মিলে অনন্তকে জোর করে ধরে মাথা নেড়া করে গালে চূণ-কালি মাখিয়ে আচ্ছা করে মার দিয়ে ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বার করে দিলুম।

তার পর শ্রীপদ বাবু বললেন—"আজ সকালে বাবা তোমরা এইখানেই খাবে, কি বল? কোন আপত্তি নেই তো?" আমি বললুম—"আজকে ক্ষমা করতে হবে। আমার শরীরটা বড্ড খারাপ, আর এক দিন এসে খেয়ে যাব।" তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—"কি হয়েছে বাবা?" আমি উত্তর দিলুম—"বিশেষ কিছু নয়, বুকে-পিঠে সর্দ্দি বসেছে, কবিরাজ দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন, কয়েক দিন ভাল ভাবে আবৃত থাকলেই সেরে যাবে।" তখন তিনি বললেন—"এবার তবে বিবাহের কথাটা—" আমি কানাইয়ের দিকে চাইলুম। কানাই বললে—"বেশ তো, একটা ভাল দিন দেখে বন্দোবস্ত করে ফেলুন।" তিনি বললেন—"কালই লগ্ন রয়েছে, যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে, অসুবিধা না হয়!" কানাই বললে—"না, না, অসুবিধা আপত্তি কিসের? ঐ কথাই রইল। লগ্নটা কখন জানিয়ে দেবেন।" তিনি আনন্দিত কণ্ঠে বললেন—"নিশ্চয়ই।

এখনই পুরুত মশাইকে ডেকে সব ঠিকঠাক করে আপনাদের খবর পাঠাচ্ছি।" সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা বাজারে গেলুম। নিজের জন্য এক ডজন পুরো-হাতা গেঞ্জি ও পা পর্য্যন্ত আণ্ডারউয়ার কিনলুম। অন্য সব কেনা কাটার ভার কানাইকে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরে গেলুম।

পরদিন যথাসময়ে আমি কানাইকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীপদ বাবুর বাড়ী গেলুম। কানাইকে দিয়ে আগেই বলে পাঠিয়েছিলুম, এ বিবাহে বেশী ধুমধাম হবে না; কারণ, আমি ছদ্মবেশে রয়েছি। জানাজানি হওয়াটা আমার পক্ষে ক্ষতিকর। তবে তত্ত্ব পাঠিয়েছিলুম খুব উঁচু দরের। হার, টায়রা, চুড়ী, ইয়ারিং, শাড়ী সব যেমন দামী তেমনি সুদৃশ্য। কন্যাপক্ষীয়রা খুবই সন্তুষ্ট হলেন।

বিবাহ-সভায় বসে আছি। আমার রূপ ও অর্থের খ্যাতি সকলের মুখে। মনটা বেশ খুসীতে ভরে উঠেছে। একটু পরে ডাক পড়ল। কানাইকে সঙ্গে করে নিয়ে ভিতরে গেলুম। পুরোহিত বললেন—"কাপড়-জামা ছেড়ে এই নব পট্টবস্ত্র পরিধান করুন।" মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। শুধু-গা হব কি করে? কানাইয়ের শরণাপন্ন হলুম। কানাই বললে—"এঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ। শুধু-গায় থাকা একেবারে বারণ।" পুরোহিত মহাশয় আপত্তি করলেন—"কিন্তু বিবাহের অনুষ্ঠান তো মানতে হবে।" কি করি! ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লুম। উদ্ধার করলেন শ্রীপদ বাবু। বললেন—"গেঞ্জি আণ্ডারউয়ার থাক, কি বলেন?" ততক্ষণে কানাই পুরোহিতের হাতে দু'টো মোহর গুঁজে দিয়েছে। তিনিও বললেন —বেশ! শরীর খারাপ হলে আপত্তি করবার কিছু নাই। শাস্ত্রেই বলেছে 'শরীরং খারাপং যস্য তস্য জন্য শাস্ত্রং পরিবর্ত্ততে।' অর্থাৎ যার শরীর খারাপ তার জন্য শাস্ত্র একটু বদলে নিতে হয়।" আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। পাশের ঘরে গিয়ে নতুন কাপড় পরে এলুম। পিঁড়েতে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় পক্ককেশ-শ্মশ্রু এক জন ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"এ কি অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। বরের বাড়ীর গেঞ্জি পরে কখনও বিয়ে হ'তে পারে না।" অনেকেই তাঁকে সমর্থন করলেন। বুকের রক্ত জল হ'য়ে গেল। এখন উপায়! কানাই বললে—"ওঁর শরীর খারাপ—" সেই বৃদ্ধ বললেন—"বেশ তো, গায়ে একটা শাল ঢাকা দিয়ে বসুন।" আমার আসল রহস্যটা তো কানাইকে জানাইনি। সে সরল প্রাণে বললে— "এতে অবশ্য আমাদের কোন আপত্তি নেই।" হায়! হায়! তীরে এসে বুঝি তরী ডুবল! আপত্তি বিলক্ষণ আছে, কিন্তু কানাই তার বিন্দু-বিসর্গও জানে না! আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে সেই নাছোড়বান্দা বৃদ্ধ বললেন—"শম্ভুনাথ বাবুর আপত্তির কারণ জানতে পারি কি?" কি বিপদ! এ যে আমার নাম পর্য্যন্ত জানে! লোকটা কে? ভয়ে হাত-পা যেন বুকের ভিতর সেঁদিয়ে যাবার উপক্রম। এক জন প্রশ্ন করলেন—" শম্ভু বাবু আবার কে? তিনি উত্তর দিলেন—" মহারাজের আসল নাম শম্ভু বাবু। এখানে এসে রাজা সেজেছেন।" মানুষ মাত্রেরই একটা অভ্যাস পরনিন্দা পরচর্চ্চা পেলে আর কিছু চায় না। চারিধার থেকে প্রশ্ন—"কি ব্যাপার!" "এ তো ভারী মজার কথা।" "ছদ্মবেশের কারণ?" ইত্যাদি। আমি বুঝলুম এইবার হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গবে! এক-মনে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করতে লাগলুম। শ্রীপদ বাবু তাড়া দিয়ে বললেন—"এই সব বাক্‌বিতণ্ডায় লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। আপনারা যদি অনুমতি দেন—" বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে উঠলেন—"বলেন কি শ্রীপদ বাবু? এ রকম রহস্যপূর্ণ পাত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ কি করে সম্ভব হতে পারে। শোনা যায়, কিছু দিন আগে শম্ভু বাবু নিজের ছায়াহীন ছিলেন। কি করে ছায়া হারিয়েছিলেন এবং কি ভাবে তা পুনরুদ্ধার করেছেন তা অবশ্য আমরা জানি না। পুরানো ব্যাপারে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, উনি এলো গা হতে আপত্তি করছেন কেন?" শ্রীপদ বাবু বললেন—"বাবাজী, তোমার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম কথা বলেন। আমি জানি, সবই বাজে কথা এবং এ সব অপ্রিয় মন্তব্যের মূলে আছে হিংসা। তোমার ছায়ার ব্যাপার থেকেই তা বুঝতে পেরেছি। এরা যখন জেদ করছেন তখন আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি আর আপত্তি না করে এলো গায়ে, না হয় একটা গরম শাল গায়ে দিয়ে বসো।" বুঝলুম, এবার আর নিস্তার নেই। তবু এক বার শেষ চেষ্টা করে বললুম—"কবিরাজ আমাকে এলো গা করতে বার-বার করে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, করলে জীবন নিয়ে—" কথা আর শেষ হ'ল না। সেই দেড়েলটা এসে জোর করে আমার গেঞ্জি ধরে টানাটানি করতে লাগল। ফলে আমার গা থেকে গেঞ্জিটা ঈষৎ সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে হতবিস্ময়ে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন। বুঝলুম, আমার গোপনতম কথাটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। কানাই আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে আমার জামাটা ছিনিয়ে নিয়ে পকেট থেকে অদৃশ্যকারী টুপী বার করে মাথায় পরে ফেললুম। সকলের বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই আমি অদৃশ্য হয়ে পড়লুম। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! যেন ভোজবাজী, ভানুমতীর খেলা! গেঞ্জির তলায় আমার কায়া নেই দেখেই তারা বিলক্ষণ অবাক্ হয়ে গিছল, তার ওপর চোখের সামনে থেকে জলজ্যান্ত মানুষ কর্পূরের মত উবে যেতে সকলে স্তম্ভিত হয়ে রইল। বিস্ময়ের চোটে বৃদ্ধের হাত দু'টো ঝুলে পড়েছিল, আমিও ছাড়ান পেয়ে সেই সুযোগে পা টিপে টিপে অন্য এক ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়লুম।

চারি দিকে খোঁজ খোঁজ, কিন্তু কি করে আমাকে খুঁজে পাবে! তাই টুপি মাথায় আমি এখন অদৃশ্য! সকলে কানাইকে ধ'রে বসল—"কোথায় শম্ভু বাবু, বার কর।" কানাই ভীত ভাবে বললে— "আজ্ঞে, আমি কি ক'রে জানবো বলুন। আপনারা যেখানে, আমিও সেইখানে।" ক' জন যুবক কানাইকে এই মারে তো এই মারে! শ্রীপদ বাবু তাদের ক্ষান্ত ক'রে বললেন—"ওকে কিছু ব'লে অযথা অনর্থক গণ্ডগোল ক'রে তো লাভ নেই। এদিকে যে বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমার উপায় কি হবে?" মেয়ে-মহলে ওদিকে বর-বিভ্রাটের খবর পেয়ে কান্নার রোল উঠেছে। চারি ধারে বিপর্য্যয় বিশৃঙ্খলা! সেই ফাঁকে কানাই নিঃশব্দে স'রে পড়েছে। বরের জন্য সকলেই চিন্তিত, এমন সময় সেই বৃদ্ধটি এগিয়ে গিয়ে দাড়ী-গোঁফ খুলে ফেলে বললে—"বরের জন্য ভাবছেন কেন শ্রীপদ বাবু? আমার সঙ্গেই তো বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছিল। আমিই বিবাহ করব।"

বিস্মিত হ'য়ে দেখলুম, সে ছদ্মবেশী বৃদ্ধ—অনন্ত। রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। উপস্থিত সকলেই তার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। শ্রীপদ বাবু তার হাত ধ'রে বললেন—"আমি বুড়ো মানুষ, যা বলেছি সব ভুলে যেও, ক্ষমা কোরো বাবা।"

অনন্ত অতি বিনয়-সহকারে শ্রীপদ বাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে —"আজ্ঞে, কি বলছেন আপনি ! সে সব কথা ছেড়ে দিন।" পিঁড়েয় সে বসতে যাবে, আমি তখন আর থাকতে পারলুম না—হাতের কাছে ছিল মাটির থালি ভাঁড় সেইটে তুলে ছুড়ে মারলুম তার মাথায়। চারি দিকে হুলস্থুল প'ড়ে গেল। ব্যাপার কি! বরকে মারলে কে! অনেকে বললেন—"মেয়েকে নিশ্চয় কোন অপ-দেবতা ভর করেছে তাই এমন গণ্ডগোলের সৃষ্টি!" কেউ বললেন—"এ বিবাহ বন্ধ থাক্।" কিন্তু তা কি করে সম্ভব! ললিতার জীবনটা নষ্ট হয়ে যায় দেখে বিকৃত কণ্ঠে আমি বললুম—"পাত্রীকে ভর করিনি মশায়, ভর করেছি অনন্তকে। আমি শম্ভু বাবুর প্রেতাত্মা। অনন্তর সঙ্গে বিবাহ দিলে আমি সকলের সর্ব্বনাশ করবো।" অতঃপর পাড়ারই আর এক জন যুবকের সঙ্গে ললিতার শুভ বিবাহ হ'ল। আমি আর সে দৃশ্য দেখতে না পেরে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করলুম।

সহরের বাহিরে জনহীন অরণ্যে এক নদীর ধারে উদাস ভাবে গিয়ে বসলুম। জীবনে ধিক্কার ধরেছে! অর্থের জন্য ছায়া বিক্রয় করলুম, ছায়ার পরিবর্ত্তে কায়া বিক্রয় করলুম, কিন্তু সুখ কই! অর্থ প্রচুর হ'ল, কিন্তু সুখ-শান্তি তো পেলুম না। মাঝখান থেকে মানুষের মধ্যে অমানুষ বনে রইলুম! নদীর জলে এ জীবন বিসর্জ্জন দেবো! এই ঠিক করে নদীতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন কাঁধের উপর হাত রাখলে! চমকে ফিরে চেয়ে দেখি, সেই আলখাল্লা-পরা প্রৌঢ়। তাকে দেখে আমি ভয়ঙ্কর চটে উঠলুম। তার গলা চেপে ধরে বললুম—"তোমার জন্য আজ আমার এই অবস্থা! সুখ-শান্তি আমার সব গেছে।" অবলীলাক্রমে আমার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে যেন কিছু হয়নি, এমনি ভাবে হেসে বললেন—"আমার জন্য বলবেন না, নিজের লোভের দোষে বলুন।" আমি রাগত স্বরে উত্তর দিলুম—"কিন্তু এ লোভ আপনিই দেখিয়েছেন!"

সেই ভাবেই হেসে তিনি বললেন—"লোভ দেখানোই আমার পেশা। কিন্তু সে কথা যাক্। আপনি অনর্থক আমার উপর রাগ করছেন। আপনার কায়া এই মুহূর্ত্তে আমি ফেরত দিতে রাজী আছি এবং সেই সঙ্গে এই অঙ্গুরীটি উপহার দেব। আগে যে সব জিনিষ দিয়েছি তাও ফেরত চাইব না। এই অঙ্গুরীর অপূর্ব্ব শক্তি। এ অঙ্গুরী হাতে প'রে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন। নিন্, পরখ করে দেখুন।" আমার তখন ভয়ানক ক্ষিধে পেয়েছে। আংটীটা হাতে পরেই বললুম—"খাবার চাই।" অমনই নির্জ্জন অরণ্যে রূপার থালায় থরে থরে সাজান রাজভোগ এসে উপস্থিত। পেট ভরে খেয়ে নিলুম। মনটা অনেকখানি হাল্কা হলো। আংটীটা হস্তগত করবার লোভ হলো প্রবল। প্রশ্ন করলুম—"বিনিময়ে কি দিতে হবে?"

তিনি স্মিত হাস্যে বললেন—"বলতে গেলে কিছুই নয়। আপনি এই আংটী এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার কায়াও ফেরত পাবেন, যদি অঙ্গীকার করেন—" এই বলে তিনি একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কি এমন অঙ্গীকার, যার পরিবর্ত্তে কায়া এবং এই অমূল্য রত্নলাভ করবো—জানবার জন্য দারুণ কৌতূহল হলো। বললুম,—কি অঙ্গীকার বললেন—"এমন কিছু নয়! আপনি মারা গেলে আপনার আত্মার উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে এই অঙ্গীকার করুন।" অদ্ভুত প্রার্থনা। মনে একটু ভয়ও হলো। আবার কোন নতুন বিপদ উপস্থিত হবে না তো? জিজ্ঞেস করলুম—"আমার মামাও কি এইরূপ অঙ্গীকার করেছিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়ই! এক কথাতেই তিনি আত্মা বিক্রয় করেছিলেন বলে আমি তাঁর ক্রীতদাস হয়ে ছিলুম। কাল রাত্রে তিনি মারা গেছেন। এই দেখুন তাঁর আত্মা!" এই কথা বলে পকেট থেকে মামার মৃত আত্মা তিনি বার করে দেখালেন। কালো চিম্‌সে-পড়া বুড়ো আঙ্গুলের মাপের বীভৎস এক বামন-মূর্ত্তি। দেখে আমার হৃৎকম্প হলো। ভয়ে গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ থেকে বার হ'ল—"এই পরিণাম!" অট্টহাস্য হেসে তিনি উত্তর দিলেন—"পার্থিব সুখের প্রলোভনে বিবেক আর আত্মাকে যে বিক্রয় করে, তার এই পরিণাম।" আমার হাত-পা যেন হিম হ'য়ে গেল। বুকের রক্ত জমাট বাঁধলো। ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম—"আপনি কে?" তিনি হেসে উত্তর দিলেন—"আমি শয়তান। সকল পার্থিব সুখ আপনার আয়ত্ত হবে, যদি আমার কাছে আত্মবিক্রয় করেন!" আমি প্রাণপণ শক্তিতে হৃতবল সঞ্চয় করে চীৎকার ক'রে উঠলুম—"চাই না আমি অর্থ, চাই না সুখ। ছায়া-কায়া কিছু আমি চাই না! আত্মবিক্রয় আমি করব না।" তার পর দ্রুতপদে সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু হাত ধ'রে উৎকট হাস্য সহকারে সে বলে উঠল—"যখন এতখানি এগিয়েছেন, তখন ছাড়ছি না।" দু' জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলতে লাগল। আমি কোন মতে হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিলুম।...

শ্রীযামিনীমোহন কর (অধ্যাপক)।

গজরাজ

হাতীর শক্তি এবং বুদ্ধি প্রভৃতির সম্বন্ধে আমরা যে সব গল্প-গাথা পড়িয়াছি, সে সব না কি ভুল! মার্কিন পশুতত্ত্ববিদ্ এডি এলেন আজ প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া পশু-চরিত্রের অনুশীলন করিতেছেন,—জন্তু-জানোয়ারকে শিক্ষা দিয়া বশ করিতে তাঁর জোড়া না কি নর-লোকে আর কেহ নাই। তিনি বলেন, ছেলেবেলায় পাঠ্যগ্রন্থে হাতীর সম্বন্ধে নানা বৃত্তান্ত আমরা পড়িয়াছি; যথা, হাতীর স্মরণ-শক্তি না কি বিরাট্ রকমের অদ্ভুত—কেহ অনিষ্ট বা অপমান করিলে হাতী সে কথা জন্মে কখনো ভোলে না; এবং সুদীর্ঘ বৎসর পরেও সে-অপমানের শোধ লইয়া ছাড়ে! তাছাড়া হাতী না কি ভীষণ ধূর্ত্ত—কেহ তার অমর্য্যাদা করিলে তখনকার মত সে-অপমান সে সহিয়া থাকে; এবং ভীষণ রকমের প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ সন্ধান করে! এ সব কথা—এডি এলেন বলেন, আগাগোড়া ভুয়া,—ভিত্তিহীন।

বিশ বৎসর যাবৎ গজ-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি যে-তথ্য নির্ভুল বলিয়া জানিয়াছেন, তাহার বিবরণ গল্প-কথার মত সরস এবং মনোজ্ঞ। পারো তো, এগজামিনার যদি হাতীর সম্বন্ধে এগজামিনে প্রবন্ধ রচনা করিতে দেন তো উত্তর-পত্রে তোমরা এডি এলেনের বর্ণিত বৃত্তান্ত লিখিয়া দিতে পারিবে।

এডি এলেন বলেন, অনেকের বিশ্বাস, হাতী না কি তামাক 'খাইতে' ভালোবাসে; তামাকের নেশায় হাতী একেবারে গোলামের মত

বশীভূত হয়! এ কথা ঠিক নয়। তামাক পাইলে হাতী তার অনাদর করে না, তবে বখাটে ছেলের মত তামাকের উপর তার ঝোঁক নাই! খেয়ালবশে একবার তিনি তাঁর পোষা হাতী 'বেবে'র মুখে জ্বলন্ত চুরুট গুঁজিয়া দিয়াছিলেন,—চুরুটের আগুনে এবং ধোঁয়ায় বেব খুব বেশী রকম আতঙ্ক এবং বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। তার পর চুরুট অভ্যাস করাইলেও 'বেব' ঐ খেলাচ্ছলে মাত্র মুখে জ্বলন্ত চুরুট রাখিত, খেলার পালা শেষ হইবামাত্র সে-চুরুট "দুত্তোর" বলিয়া ফেলিয়া দিত!

তার পর হাতীর স্মৃতি-শক্তি। এডি এলেন বলেন, এ-শক্তিও হাতীর আর পাঁচ-জাতের জন্তু-জানোয়ারের মত। অর্থাৎ নিত্যকার রুটিন-বাঁধা কাজ হাতী করিতে পারে—অন্য জন্তু-জানোয়ারের মত। তার বেশী নয়! আর ঐ মনে রাগ পুষিয়া রাখিয়া-সুযোগ খুঁজিয়া ঝাল ঝাড়া—এডি এলেন বলেন, বাজে কথা। এডি এলেন বলেন,

চশমা-চোখে গুরুগম্ভীর!

বাঁধা রুটিনে হাতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে—সে দিক্ দিয়া তার শিক্ষা সার্থক হয়। তবে কাহারো কোনো কাজে মেজাজ যদি বিগড়ায় তো সে মেজাজ হাতী চাপিয়া রাখিতে পারে না; তৎক্ষণাৎ তপ্ত মেজাজের জ্বালা বর্ষণ করিয়া ছাড়ে! তাঁর একটি হাতী ছিল—তার নাম উইলি। খেলার প্রাঙ্গণে উইলিকে তার মাহুত বুঝি খোঁচা দিয়া চাবুক মারিয়াছিল। দলে ছিল আরো পাঁচটা হাতী—দলের সামনে এত বড় অপমান! উইলি ছাড়িল না! মাহুত যেমন দু'-পা নড়িয়াছে, অমনি উইলি করিল কি, না, মাহুতের দিকে আগাইয়া আসিয়া শুঁড়ে তাকে আচ্ছা করিয়া পাক দিয়া জড়াইয়া উর্দ্ধে তুলিল এবং ধাঁইসে দিল আছাড়! মাহুতের দেহ নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এই উইলি-দস্যু সাত-সাত জন মাহুতকে আক্রোশ-ভরে মারিয়া মেজাজের জ্বালা শান্ত করিয়াছিল!

আর একটি গল্প চলিত আছে যে, ইঁদুরকে না কি হাতী যমের মত ভয় করে! তার কারণ, ইঁদুর হাতীর শুঁড়ের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে এবং ইঁদুরের এ অনধিকার-প্রবেশে হাতীর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ঘটে! এডি এলেন বলেন, এ ব্যাপার ঘটা সম্ভব নয়। তার কারণ, হাতীর শুঁড়টি বিধাতা এমন ভাবে তৈয়ারী করিয়াছেন—শুঁড়ে প্রায় চল্লিশ হাজার শিরা-উপশিরা আছে; এবং এতগুলি শিরা-উপশিরা থাকিবার জন্য শুঁড়ের ডগায় মশা-মাছি বসিবামাত্র হাতী তাহা তখনি বুঝিতে পারে এবং শুঁড় নাড়িয়া তাদের তাড়াইয়া দেয়! তাছাড়া ঐ চল্লিশ হাজার শিরা-উপশিরা থাকার দরুণ শুঁড়টি আক্রান্ত হইবামাত্র হাতী চকিতে শুঁড়ের মুখ-বিবর বন্ধ করিয়া দিতে পারে। বন্ধ করিলে শুঁড়ের মুখে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না—মশা-মাছি তো ছার!

অনেকে বলেন, হাতীর চামড়া খুব পুরু এবং গণ্ডারের চামড়ার মত দুর্ভেদ্য! এ কথাও ঠিক নয়। হাতীর চামড়া তেমন পুরু নয়; তবে কঠিন বলিয়া যে মনে হয়, তার কারণ চামড়ার নীচে অসংখ্য পেশী আছে! হাতীর চামড়ার অনুভূতি-শক্তি এত প্রখর যে একটা মাছি যদি গায়ে বসে, হাতী তখনি তাহাতে বিচলিত হয়। এবং এই কারণেই মশা-মাছির আক্রমণে অস্বস্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সর্ব্বক্ষণ ধূলা-কাদা ও জল ছিটাইয়া হাতী তার দেহের আচ্ছাদন ঐ চামড়াখানিকে অমন ক্লেদযুক্ত করিয়া রাখে।
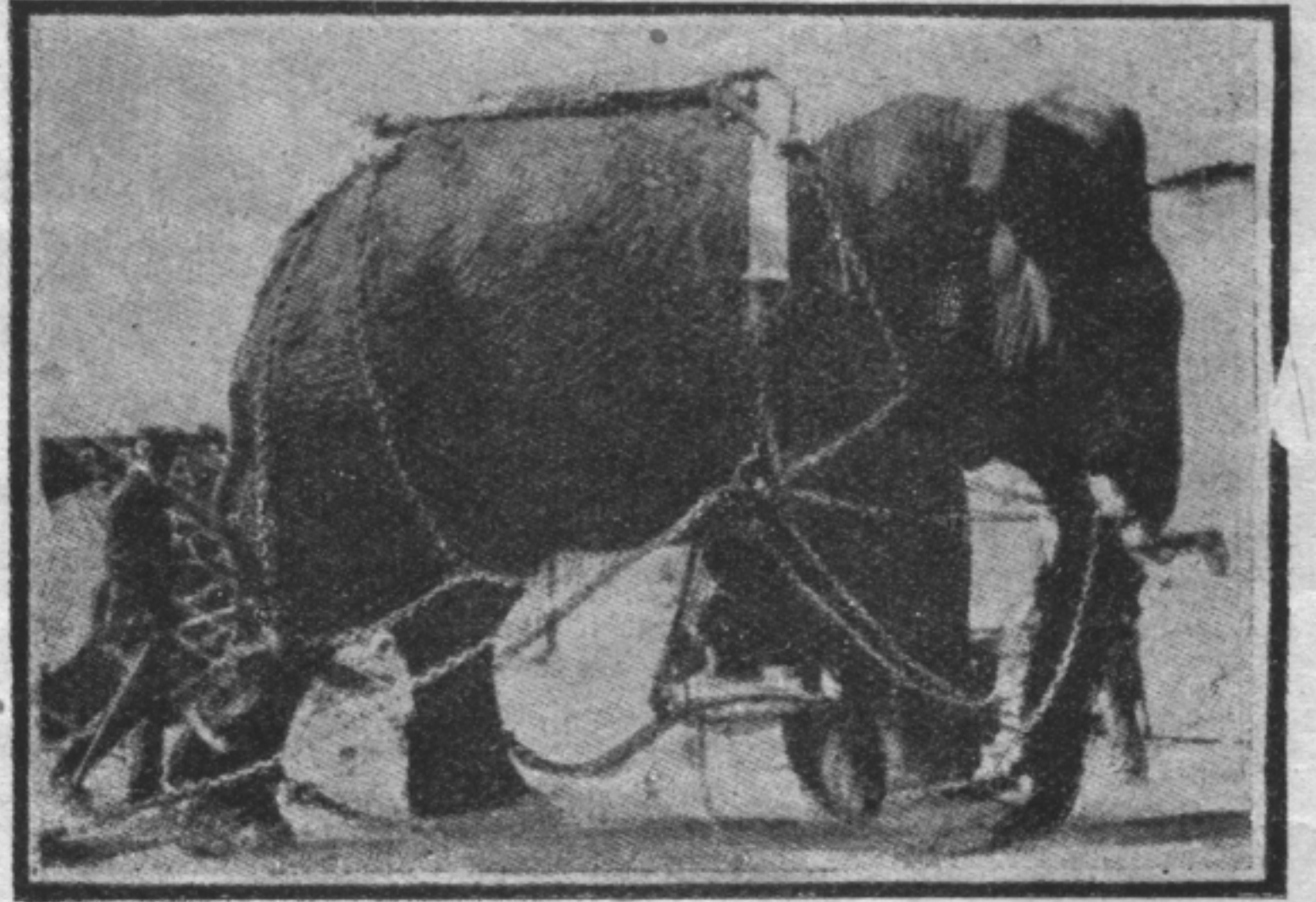
শিক্ষায় হাতী শিকলের এ বাঁধন খুলিতে পারে!

হাতীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু শ্রুতিশক্তি অসাধারণ রকমের। চকিত-শব্দে হাতী ভয় পায়; কিন্তু অভ্যাসে শব্দ বা উচ্চ কলরব প্রভৃতি তার বেশ সহিয়া যায়।

ঝড়ের আগে হাতী বুঝিতে পারে ঝড়ের আসন্নতা। বাতাসে কি গন্ধ পায়! এবং শুঁড় তুলিয়া হাতী বাতাসে আর্দ্রতার আভাস অনুভব করে। ঝড়কে হাতী রীতিমত ভয় করে। ঝড় উঠিলে সে একেবারে ক্ষেপিয়া মত্ত মাতঙ্গ হইয়া ওঠে!

আর পাঁচটা জন্তু-জানোয়ারের ঘেঁষ হাতী সহিতে পারে না। এ জন্য তাদের সঙ্গে একত্র রাখিয়া হাতীকে পাঁচটা জন্তু-জানোয়ারের ঘেঁষ-সহানো অভ্যাস করাইতে হয়। পরিচয় হইয়া গেলে তাদের সঙ্গে হাতী তখন বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ মনে খেলাধূলা করে, রঙ্-তামাসা করে।

এডি এলেন বলেন—মমতায় হাতী যত শীঘ্র বশ হয়, এমন আর কোনো জানোয়ার নয়। বশ হইলে হাতী তোমার সব কথা মানিয়া চলিবে। তবে সাবধান, শাস্তি দিলে বা বিরক্ত করিলে হাতী মমতা ভুলিয়া সে অপমানের শোধ তুলিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবে না—তা তোমার সঙ্গে তার যত ভাবই থাকুক! এ জন্য সব সময়ে হাতীর মেজাজ বুঝিয়া চলা চাই। নহিলে সেই ভূত পুষিলে ভূতের হাতে মৃত্যুর কথা যেমন চলিত আছে, তেমনি পোষা হাতীকে রাগাইলে তার হাতে মৃত্যুও—প্রায় বিধাতার লিখনের মত অমোঘ!

বিজ্ঞান-জগৎ

মুখ রক্ষা

আমেরিকায় দুহিতা-জায়ার দল আজ যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারীর কাজে কায়-মন জীবন-যৌবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এ কাজে বহু বিপদের

মুখোশ-আঁটা রূপসী

আশঙ্কা—ধাতু-চূর্ণ ধূলি-কণা প্রভৃতি নাসারন্ধ্র দিয়া প্রতিক্ষণে ফুশ-ফুশে প্রবেশ করিয়া যক্ষাদি দুষ্ট ব্যাধির সৃষ্টি করিবে,—তার উপর চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে; এবং নারীর যা সম্পদ, অর্থাৎ যৌবনশ্রী এবং রূপলাবণ্য—তাহাও রক্ষা করা চলিবে না! এ সব বিপদ হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ মিলিবে এই উদ্দেশ্যে মার্কিণ রণ-বিভাগ সম্প্রতি প্লাষ্টিকের বিচিত্র মুখোশ তৈয়ারী করিয়াছে। এ মুখোশের সঙ্গে একাধারে সংলগ্ন আছে চোখ ঢাকিবার গগ্‌ল্, নিরাপদ শ্বাস-গ্রহণের উপযোগী নাসাচ্ছাদন প্রভৃতি। মুখোশটির ছাঁদ কিন্তু এমন বেয়াড়া যে দেখিলে আতঙ্ক হয়! উপরের ছবিতে মুখোশ-আঁটা যে মুখ দেখিতেছেন, ও-মুখ ভূতের নয়—রূপসী তরুণী মার্কিন-কর্ম্মিণীর।

সার্শি-জানলা সাফ্

সার্শি-জান্‌লার কোণে যে ধূলা জমিয়া থাকে, সে ধূলা সাফ করিবার একমাত্র উপায়—সাবান-জলে পেইণ্ট ব্রাশ ডুবাইয়া
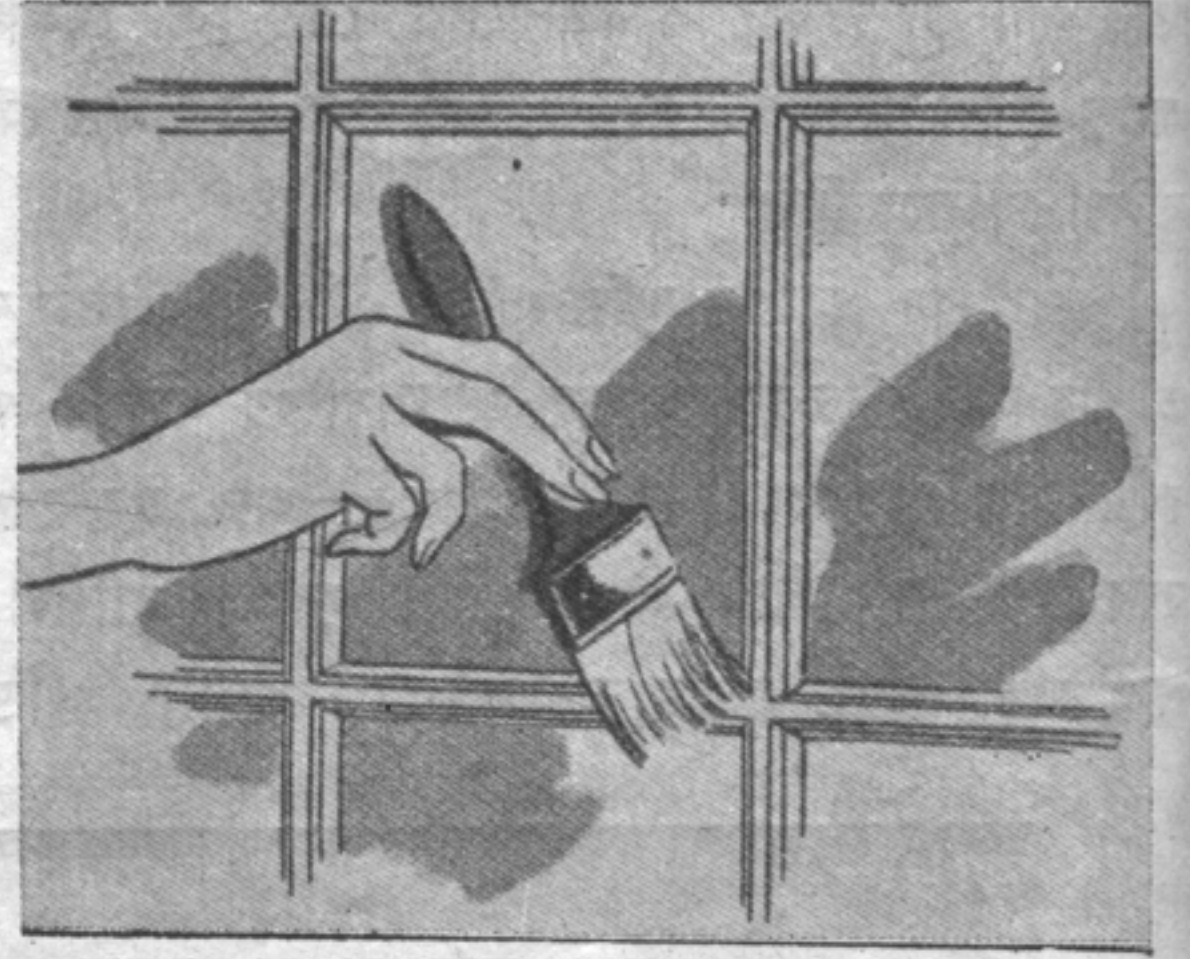
কোণের ধূলা সাফ

তাহা দিয়া সার্শি-জান্‌লার কোণগুলি ঘষিয়া লইবেন।

মশা-যুদ্ধ

ম্যালেরিয়া-রোগে পৃথিবীতে বছরে প্রায় চব্বিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতেছে এবং এই ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তি ঐ এ্যানোফিলিশ জাতীয় মশা হইতে! এ মশক-বংশ ধ্বংস করিতে পারিলে তবেই ম্যালেরিয়া হইতে মুক্তি! বৈজ্ঞানিকের দল তাই নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে এ জাতের মশার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন—এ্যানোফিলিশ জাতের মশা-বংশের উচ্ছেদ-কল্পে। এ যুদ্ধের বিবরণ জানা ভালো—যুদ্ধ-প্রণালী জানিলে আমরাও এ্যানোফিলিশ মশা মারিয়া জীবনকে খানিকটা সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখিতে পারিব। প্রথমে
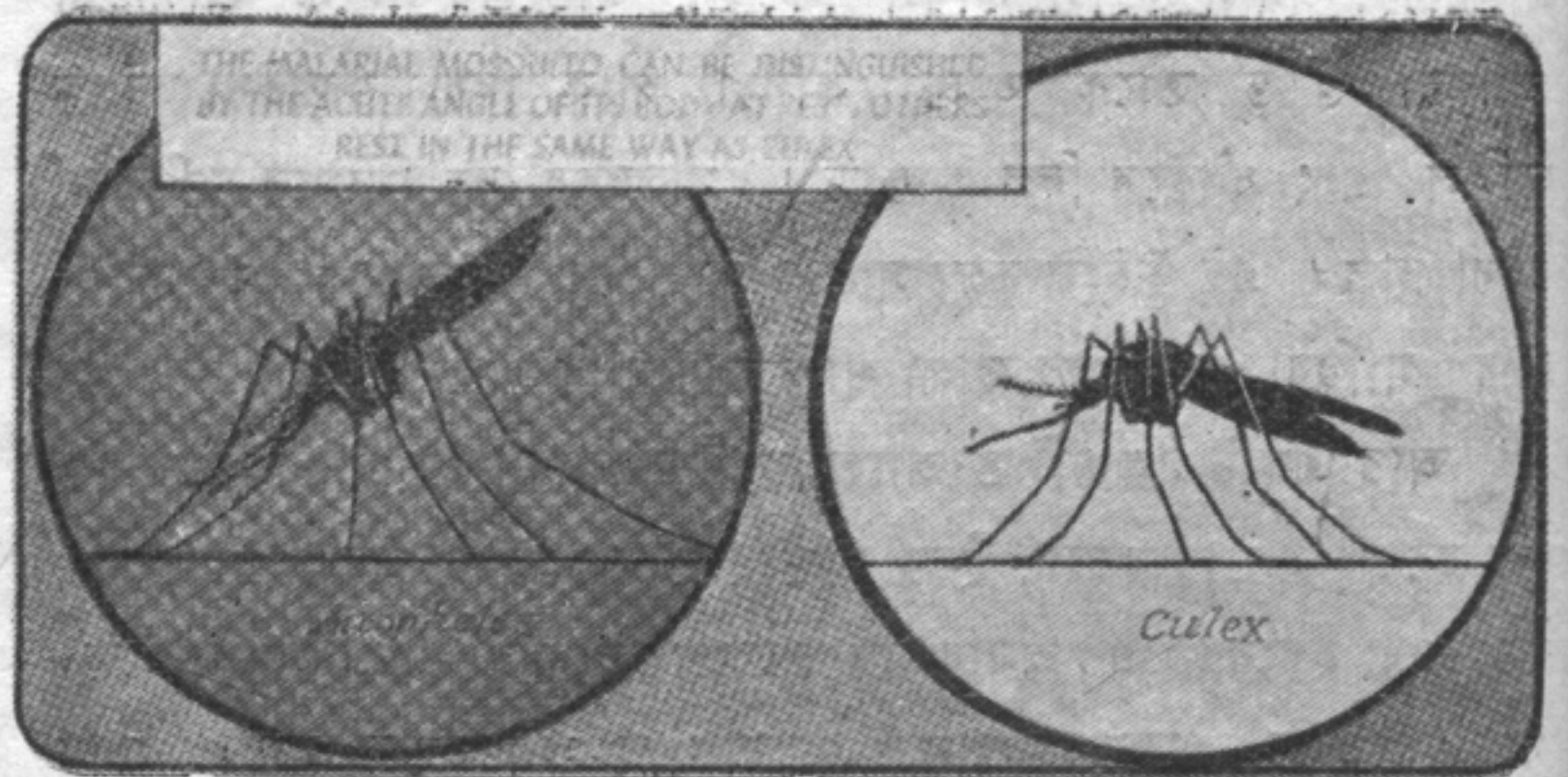
এ্যানোফিলিশ্ মশা | অপর-জাতের মশা

দেখুন—এ্যানোফিলিশ মশার গড়ন। দাঁড়াইলে এ-মশার দেহখানি থাকে এমনি বঙ্কিম ঠামে,—অর্থাৎ মাথা নীচের দিকে, এবং পুচ্ছ

ঊর্দ্ধদিগ্-অভিমুখী! অন্য জাতের মশার চাল অন্য রকম—২নং ছবির মত! ভোরে এবং সন্ধ্যার দিকেই এ-মশাকে ভয় বেশী,—ঐ দুই সময়েই ইহাদের হিংসা জাগ্রত এবং শক্তি বেশী হয়। তাই বলিয়া অন্য সময়ে নির্বিষ থাকে, এমন কথা মনে করিবেন না! মশা মারিবার জন্য নালায়-নর্দ্দামায় জলায়-পুকুরে ঝোপে-ঝাপে পিচ্‌কারী-ধারায় দু'বেলা কেরোসিন তৈল বর্ষণ করিবেন—হোজ-পাইপে করিয়া কেরোসিন ছিটাইয়া জলা-জঙ্গল সর্ব্বদা সাফ করিবেন। তার উপর চাই কুইনিন সেবন! আমাদের দুর্ভাগ্য, কুইনিন এবং কেরোসিন—দু'টি জিনিষই আজ দুষ্প্রাপ্য! অতএব এখন উপায়?

কূল-রক্ষা

সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রদেশে বিপক্ষ আসিয়া বোমা ফেলিয়া বোমার আগুনে গ্রাম-নগর ছাই করিয়া দিতে পারে,—সে অগ্নিকাণ্ড-নিবারণ-কল্পে আমেরিকা কূলরক্ষক অনল-তরী (ফায়ার-বোট) তৈয়ারী করিয়াছে। এ বোটে চারটি করিয়া পাম্প আছে—সে পাম্পের এমন শক্তি যে, প্রত্যেকটি হইতে মিনিটে ৭০০ গ্যালন জল তীরে বর্ষণ করা চলে। সাগর-বক্ষে বোট রাখিয়া সে বোট হইতে এই পাম্প-যোগে প্রায় পাঁচ-সাত মাইল দূরবর্ত্তী তীর-প্রদেশে জল বর্ষণ করা যায়। কাজেই এ জলে বোমার আগুন চকিতে নিবানো সম্ভব হইয়াছে। এক-এক জন লোক এক একটি পাম্প অনায়াসে চালাইতে পারে।
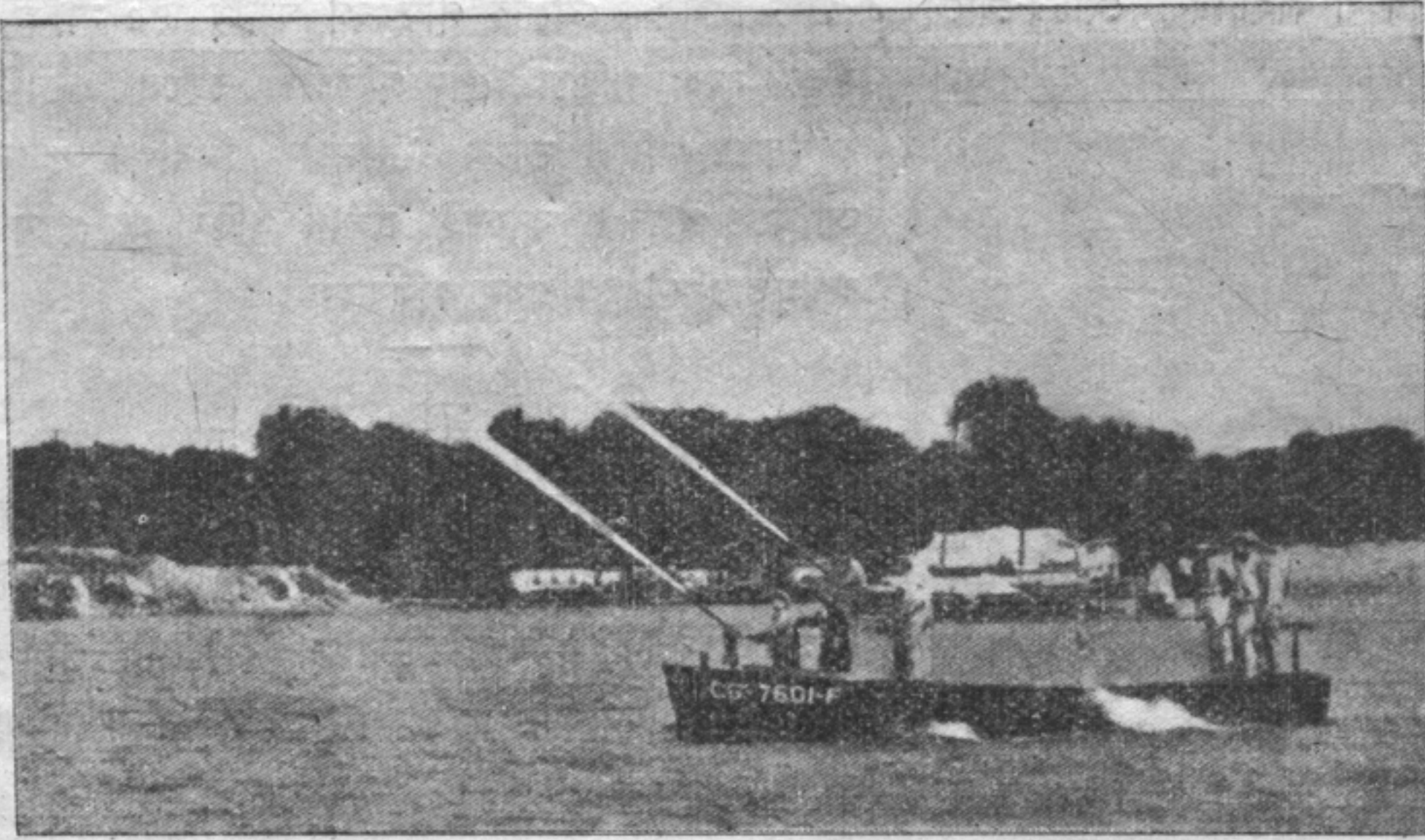
ফায়ার-বোট্

আঁধারে দৃষ্টি

আলো হইতে অন্ধকার-ঘরে ঢুকিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়—মনে হয়, যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছি! সিনেমা-ঘরের মধ্যে অন্ধকার—ছবি দেখানো সুরু হইয়াছে, সে সময় সিনেমা-ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র এমনি অন্ধতা-বিভ্রম ঘটে। এবং অন্ধকারে খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিবার পর তবে সে-অন্ধকারে আমাদের চোখের দৃষ্টি খোলে—আব্‌ছা-ভাবে ঘরের মধ্যে আমরা সব-কিছু তখন দেখিতে পাই! সিনেমা-ঘরে চোখ দু'টিতে আঁধার সহানোর জন্য প্রতীক্ষা করা চলে, কিন্তু এই বোমা-ফাটা যুদ্ধের বাজারে রাত্রির অন্ধকারে পাইলট কি করিয়া গতি-নির্দ্ধারণ করিবে—আঁধার ভেদ করিয়া কোন্ দিক হইতে শত্রু আসিতেছে, কি করিয়া বুঝিবে? রণতত্ত্ববিদ্‌রা বহু গবেষণা এবং পরীক্ষার পর এ বিষম সমস্যার নিরাকরণ করিয়াছেন। দু'টি উপায়ে অন্ধকারে দৃষ্টি-পরিচালনা কঠিন হইবে না। প্রথম উপায়, একটি চোখের উপর যদি আমরা কালো রঙের পটি বা প্যাচ আধঘণ্টা-কাল আঁটিয়া রাখি, তাহা হইলে আধ ঘণ্টা পরে ঐ পটি বা প্যাচ খুলিবামাত্র যে-চোখে পটি ছিল, সেই চোখে অন্ধকারের মধ্যেও সব আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইব। দ্বিতীয় উপায়, লাল রঙের কাচের গগ্‌ল-চশমা চোখে আঁটিলে দু' চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে এতটুকু ক্ষীণ বা ব্যাহত হইবে না। তবে এই লাল রঙ যেন ফিকা বা খুব-ঘন না হয়, এবং এ গগ্‌ল যেন চোখে-নাকে বেশ টাইট-ফিট্ করে।
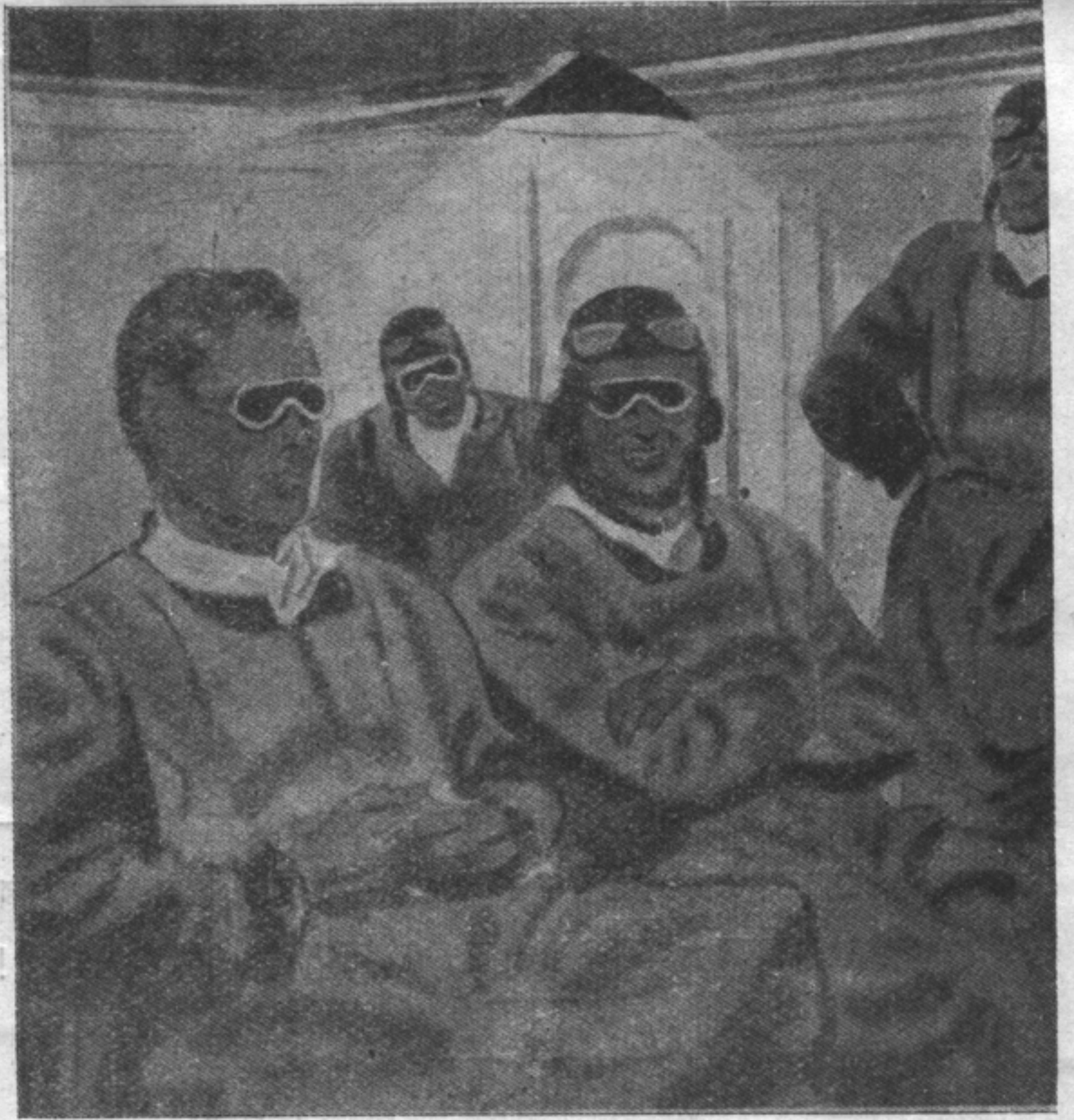
লাল গগ্‌ল

আঁধার-পথে রক্ষা-মণি

ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে সন্ধ্যার পর পথ চলায় প্রাণের ভয় আজ অনেক গুণ বাড়িয়াছে। চলন্ত বাস এবং মোটরের ধাক্কা বাঁচাইয়া ঘরে ফিরিতে পারিলে মনে হয়, "আজিকার মত ফাঁড়া কাটিয়াছে! কিন্তু এমন করিয়া ভয়ে ভয়ে পথ চলা যায় না! আমেরিকার এক জন শিল্পী রেমণ্ড টাস্ক এ-বিপদে জীবন-রক্ষার সহায় হইবে বলিয়া স্প্রিং-দেওয়া এক রকম ক্লিপ্, তৈয়ারী করিয়াছেন; সে ক্লিপ জামায় আঁটিয়া

জীবন-দ্যুতি

সন্ধ্যায় বা রাত্রির অন্ধকারে পথে বাহির হইতে পারেন নিরাপদে—মোটর বা বাসের আলো পড়িবামাত্র ঐ ক্লিপে উজ্জ্বল লাল আলোর ছটা ঝিক্‌ঝিক্ করিবে—এমনি বিচিত্র এ ক্লিপের নির্ম্মাণ-কৌশল!

—

উড়ন-কেল্লা

শত্রুর চাতুরী এবং লালসা-হিংসার উচ্ছেদ এবং আত্মরক্ষা—এ দুই ব্যাপারে সিদ্ধিলাভের জন্য আমেরিকা যে সর্ব্বাঙ্গীণ বমার বা ফাইটার প্লেন নির্ম্মাণ করিয়াছে, তার অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই ফাইটার প্লেনের নাম ফ্লাইইং ফোর্ট্রেশ বা উড়ন কেল্লা। এ প্লেনের সরঞ্জামপত্রে এতটুকু ত্রুটি নাই। এ প্লেন রক্ষা করিতে অন্য পাহারা-প্লেনের যেমন প্রয়োজন নাই, তেমনি যে-কোনো অবস্থান হইতে এ প্লেন শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ। এ প্লেন হইতে এক-হাজার মাইল দুর-সীমানায় বোমা ফেলিলেও তার আঘাত হয় অব্যর্থ। ছোটখাট পাড়িতে এ-প্লেনে বহুসংখ্যক বোমা বহন করা চলে; সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব-অবস্থায় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার দিকেও এতটুকু অসুবিধা ঘটে না।
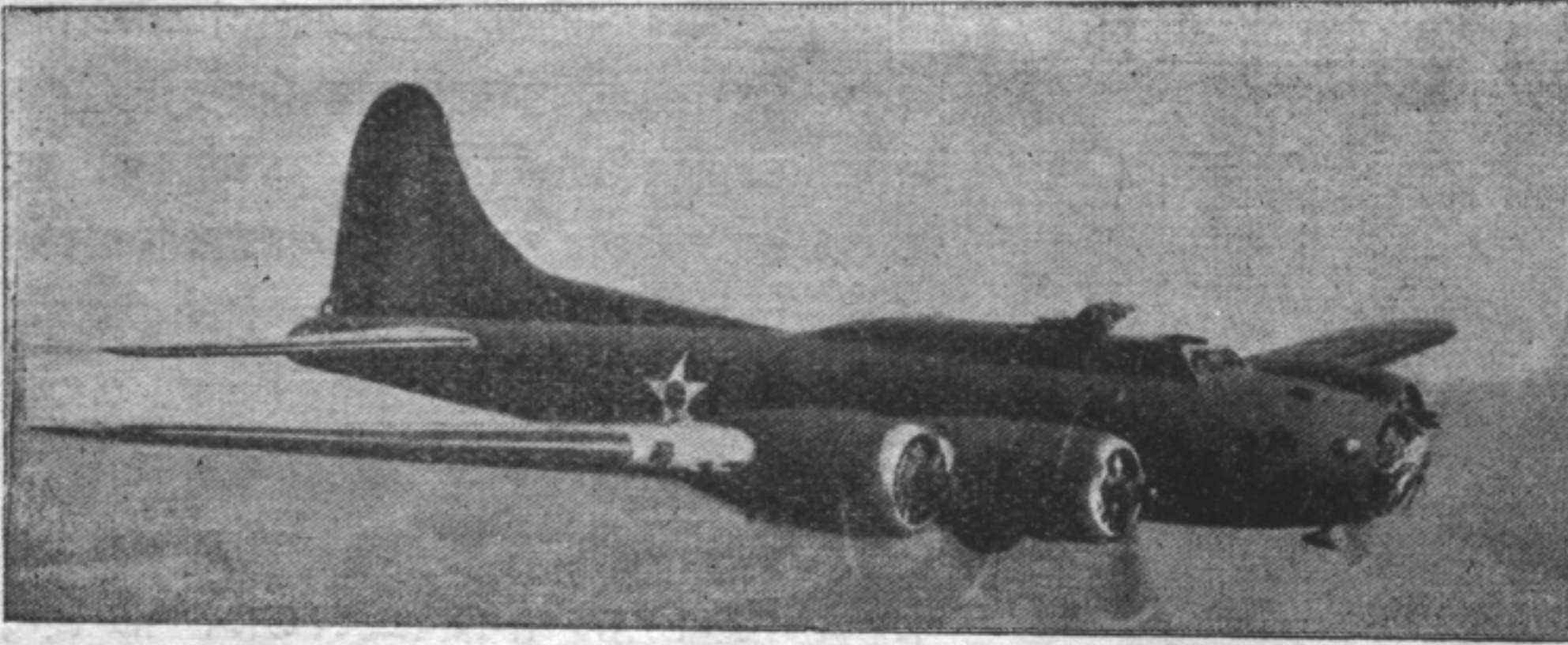
ফ্লাইইং ফোর্ট্রেশ
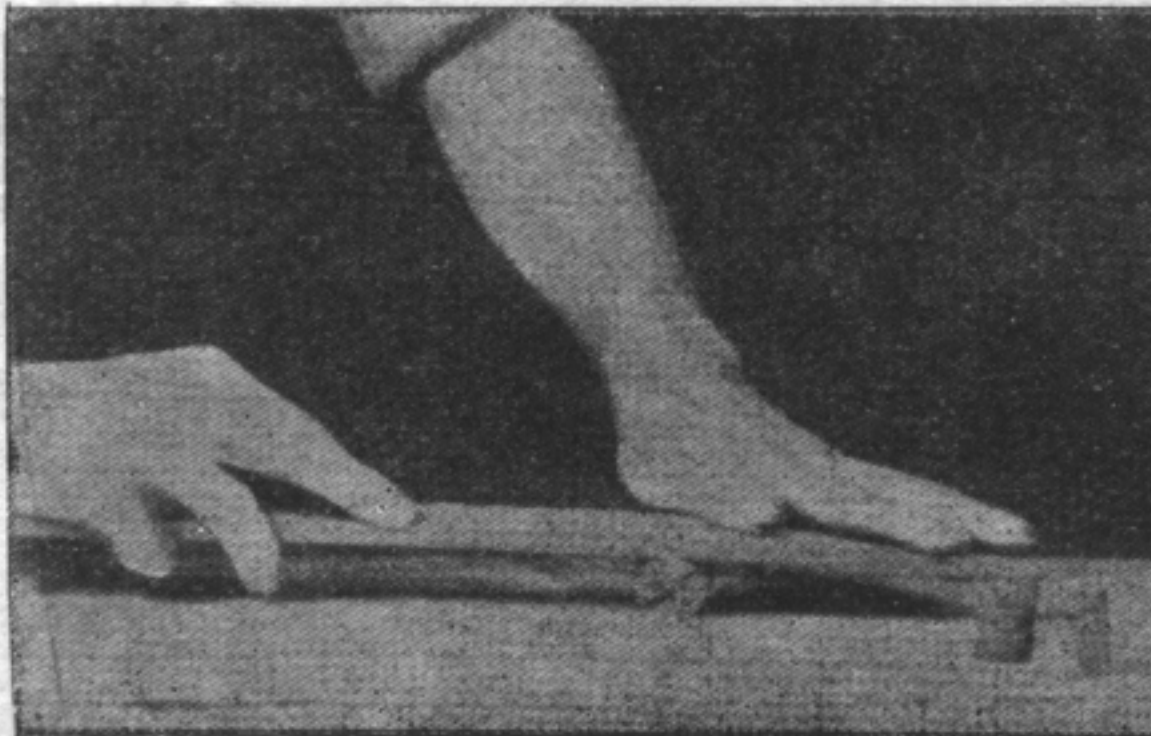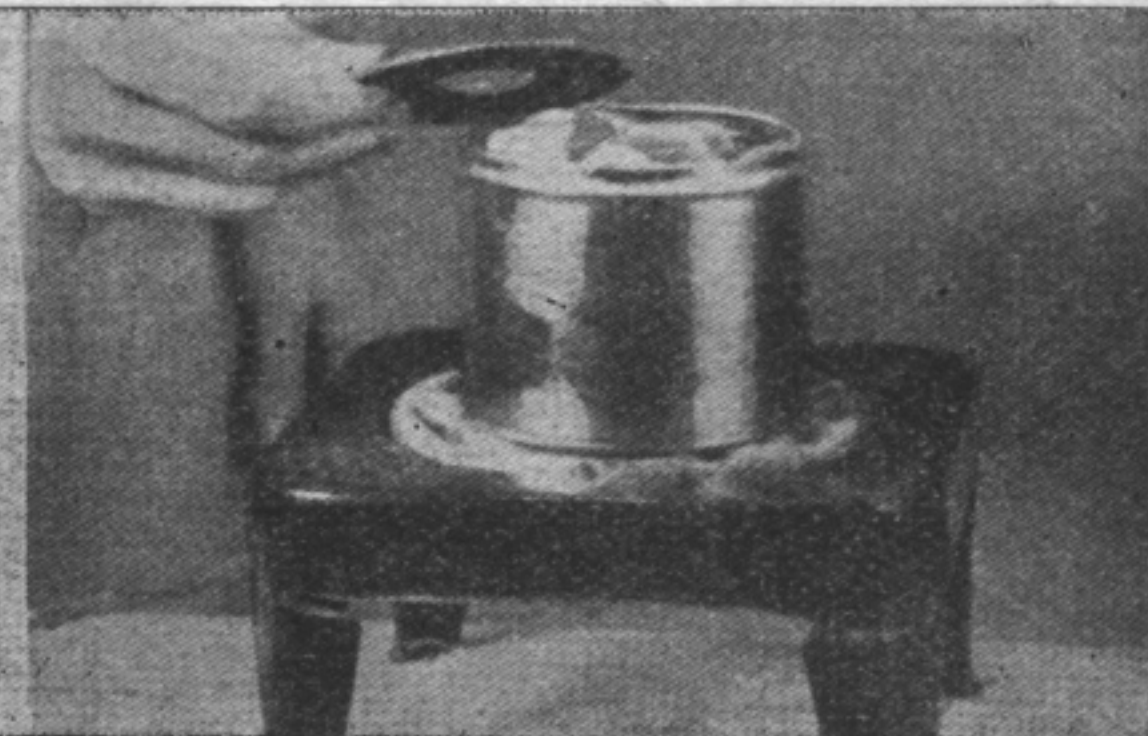
জলা-বন্ধে মুক্তি

নানা কারণে যুদ্ধ-প্লেন জলায় পড়িয়া সমাধি লাভ করিতেছিল—সে দায়ে পরিত্রাণ-কল্পে মার্কিণ নেভি তৈয়ারী করিয়াছে 'সোয়াম্প-গ্লাইডার' নামে এক-জাতের বোট। ২০ ইঞ্চি পরিমিত গভীর জলেও এ-বোট অনায়াসে পাড়ি দিতে পারে। বৈদ্যুতিক মোটর-যোগে এ-বোট চলে। বোটের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৫ মাইল। জলার বুকে পড়িয়া প্লেন গতিহারা হইলে এ-বোট অনায়াসে গিয়া তাকে টানিয়া নিরাপদ স্থানে আনিতে পারে। কাজেই জলায় পড়িয়া যুদ্ধ-প্লেনের অপমৃত্যুর আশঙ্কা এখন কমিয়াছে।
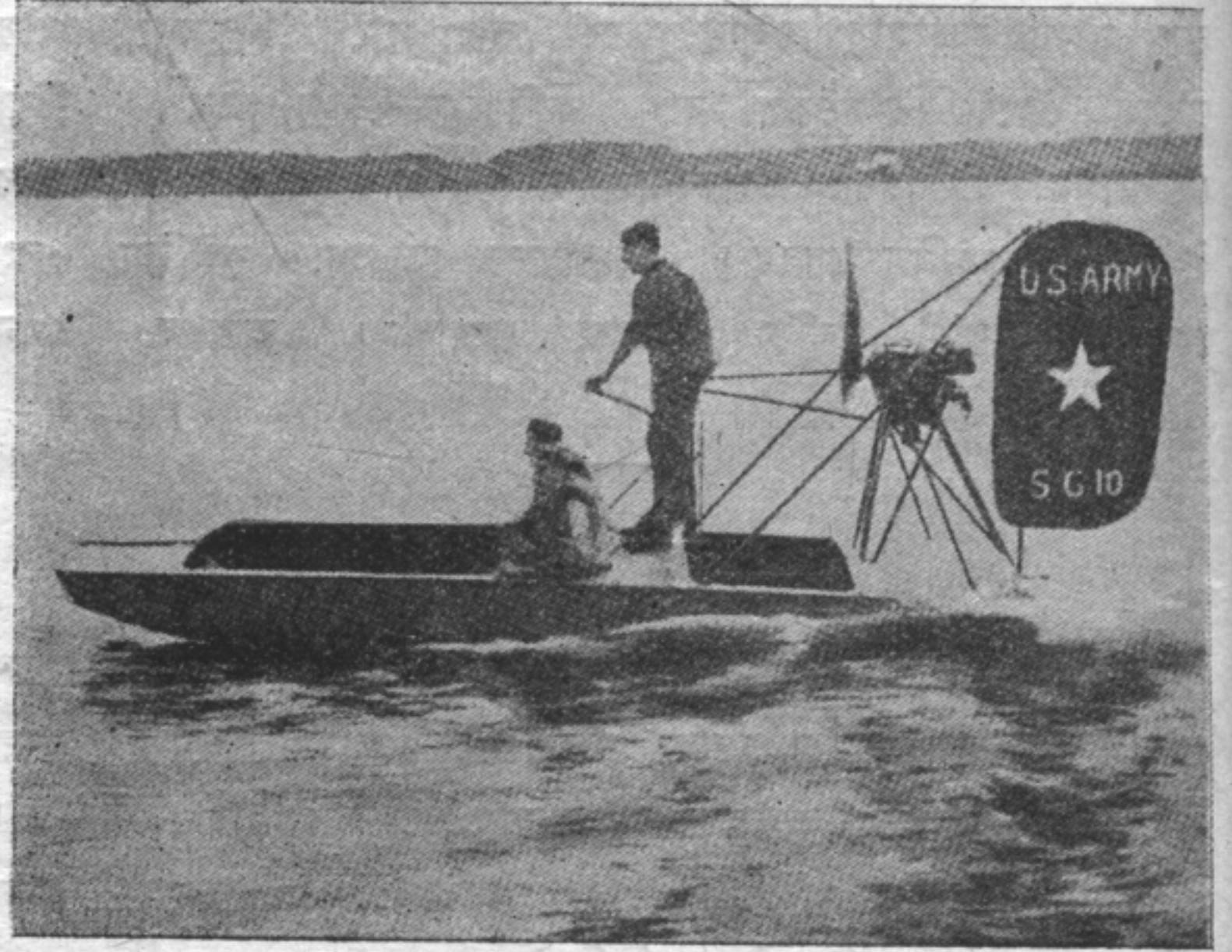
জলের বুকে বন্ধু

—

ছিপির মার নাই!

পুরানো ছিপি ব্যবহারে মলিন জীর্ণ হইলে রুলার কিম্বা এক পীশ তক্তার চাপ দিবেন,—তার পর ছিপিটি জলে তিন-চার ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিবেন—ছিপি আবার নবজীবন লাভ করিবে। বিশ্রী ময়লা বা নোংরা হইলে জলে তিন-চার বার করিয়া ছিপি সিদ্ধ করিয়া লইবেন। ছিপির সঙ্গে এক পীশ ভারী লোহা বাঁধিয়া জলে ফেলিবেন, নহিলে ছিপি ভাসিয়া উঠিবে। এ প্রক্রিয়ায় ছিপি দিব্য কান্তিতে নব কলেবর লাভ করিবে।

ছিপির উপর কাঠের চাপ

গরম জলে ছিপি

আকাশের রূপকথা

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস রূপকথার চেয়েও মনোজ্ঞ—যেমন বিস্ময়কর তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ! কোন ক্ষেত্রে অতি আকস্মিক ভাবে প্রকৃতি তার মনের কথা বলে ফেলে,—বৈজ্ঞানিকের সাধনাও অমনি সার্থক হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে রহস্যময়ী চির-চঞ্চলা প্রকৃতি মানিনীর মত বসে থাকে, শত সাধ্য-সাধনাতেও গোপন কথা প্রকাশ করতে চায় না। অনিশ্চয়তার জন্যই আবিষ্কারের নেশা এমন চিত্ত-মত্তকারী। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এলফ্রেড নোবেল নাইট্রো-গ্লিসারিণ নামক অতি-উগ্র বিস্ফোরক আবিষ্কার করে বহু দিন পর্য্যন্ত তার ক্ষিপ্রতা-নিয়ন্ত্রণের তিনি চেষ্টা করেন; কারণ, বিনা-নিয়ন্ত্রণে অমন উগ্র বিস্ফোরক ব্যবহার করায় বিপদের সীমা নেই। কিন্তু শত চেষ্টাসত্ত্বেও কোন সুবিধা তিনি করে উঠতে পারেননি। হঠাৎ এক দিন সেই বিস্ফোরক ঘরের মেঝের উপরে পড়ে গেল, কিন্তু বিস্ফোরণ হলো না! অমনি নিয়ন্ত্রণকারী দ্রব্যের সন্ধান মিললো। মেঝের উপর "কিসেল ঘর" নামক এক প্রকার পদার্থ ছিল, তারই সাহায্যে তিনি নাইট্রো-গ্লিসারিণকে নিপুণ ভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হলেন। ফলে ডিনামাইটের সৃষ্টি হলো, যার হাতে বিশ্ব প্রায় ধ্বংস হতে বসেছে! ঘটনাটি আকস্মিক, কিন্তু এই ঘটনায় তাঁর বহু-বর্ষব্যাপী সাধনা সাফল্য-মণ্ডিত হলো।

সাধারণ আকারের দূরবীণে-দেখা পূর্ণচন্দ্র

বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেই মানুষ ক্ষান্ত হয় না—সেই সত্যকে উপযোগী কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। আকাশে আজ বড় বড় গ্যাসে-ভরা বেলুন উড়ছে; কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন বিস্ফোরণ অথবা আগুন লাগবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। কি উপায়ে বাতাসের চেয়ে হাল্কা অথচ দাহ্য নয়, এমন গ্যাস আবিষ্কৃত হলো, সে কাহিনী সত্যই চমকপ্রদ।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লকইয়ার নামক এক জন বৈজ্ঞানিক পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণের সময় সূর্য্যের চারিধার দিয়ে যে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, স্পেক্‌ট্রোস্কোপের* সাহায্যে তার পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় তিনি হাইড্রোজেনের অনুরূপ লিখন পান। সেই লিখন দেখে তিনি বোঝেন যে, সে-গ্যাস পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাত। তার পর আটাশ বছর কেটে গেল। সকলেই মনে করতে লাগলো, এ গ্যাস আমাদের পৃথিবীতে জন্মাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। এমন সময় সার উইলিয়ম র‍্যামজে য়ুরানাইট নামক পদার্থ থেকে একটি নূতন গ্যাস আবিষ্কার করলেন। টেষ্ট-টিউবে ভরে বৈদ্যুতিক-প্রবাহের সাহায্যে সেই গ্যাসকে তিনি গরম করেন। গ্যাস থেকে যে আলো নির্গত হয়, স্পেক্‌ট্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার লিখন—সূর্য্যগ্রহণের সময় লকইয়ার সূর্য্য-রশ্মিতে যে লিখন পেয়েছিলেন, তারই অনুরূপ। সূর্য্যের গ্যাস পৃথিবীতে তাহলে জন্মালো। কিছু দিন পরে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করলেন, রেডিয়াম থেকে যে গ্যাস নির্গত হয়, তার লিখনের সঙ্গে লকইয়ারের লিখনের আশ্চর্য্য মিল আছে। ক্যাডি নামক এক জন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে বললেন যে, গ্যাসটি জড়বৎ (inert)। পাথুরে কয়লায় যে শ্লেট-পাথর থাকে তা যেমন দাহ্য শক্তিকে কমিয়ে রাখে, সাধারণ গ্যাস সমূহের মধ্যে এর কাজও তদনুরূপ। নূতন এই শিশুর

---

* প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে অথবা সাধারণ বেলোয়ারি-কাচের মধ্য দিয়ে সাদা রঙের আলো গেলে বিভিন্ন রঙের আলোয়, সে-আলো বিভক্ত হয়ে যায়। সূর্য্যের আলো সাতটি রঙে বিভক্ত হয়। রামধনুর রঙ সাতটি—তার বৈজ্ঞানিক নাম স্পেকট্রাম। স্পেক্টোস্কোপ যন্ত্রের মধ্যভাগে একটি প্রিজম্ এবং এক দিকে একটি দূরবীণ থাকে ও অপর দিকে আলোক-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নল থাকে। এই যন্ত্র দ্বারা বর্ণালীর (spectrum) ছবি গ্রহণ করা হয়।

নাম হলো—"হিলিয়াম"। তখন থেকে বেলুনে হিলিয়াম ভরা হতে লাগলো। বিস্ফোরণের ভয় নেই! দাহ্য নয়! এমন কি গুলী লাগলেও তাতে আগুন ধরবে না! এই নূতন গ্যাসের সন্ধান দিলেন সূর্য্য!
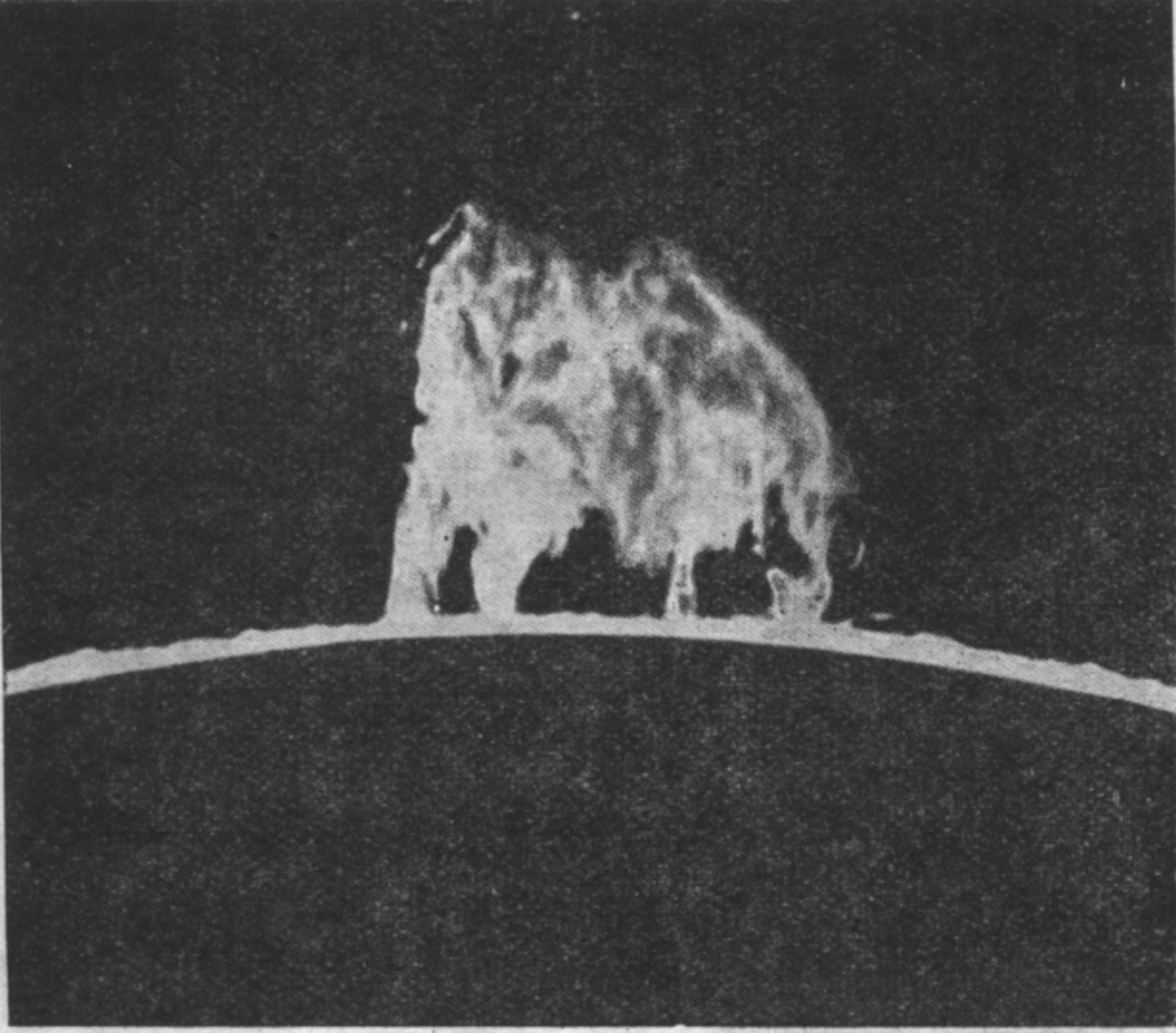
সূর্য্য-খশা অগ্নিশিখা! যেন একটি মেঘ!

এখন বিদ্যুতের যুগ। বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করতে প্রয়োজন কয়লার ও তেলের। পৃথিবীতে যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং খনিতে কয়লা ও তেল যে পরিমাণে কমছে, তাতে মনে হয়, কিছু দিনের মধ্যেই কয়লা আর তেল দুষ্প্রাপ্য হবে। তখন উপায়? জ্যোতিষ্কবিদ সূর্য্যের তাপ মাপলেন ঠিক আমরা যেমন জলের অথবা
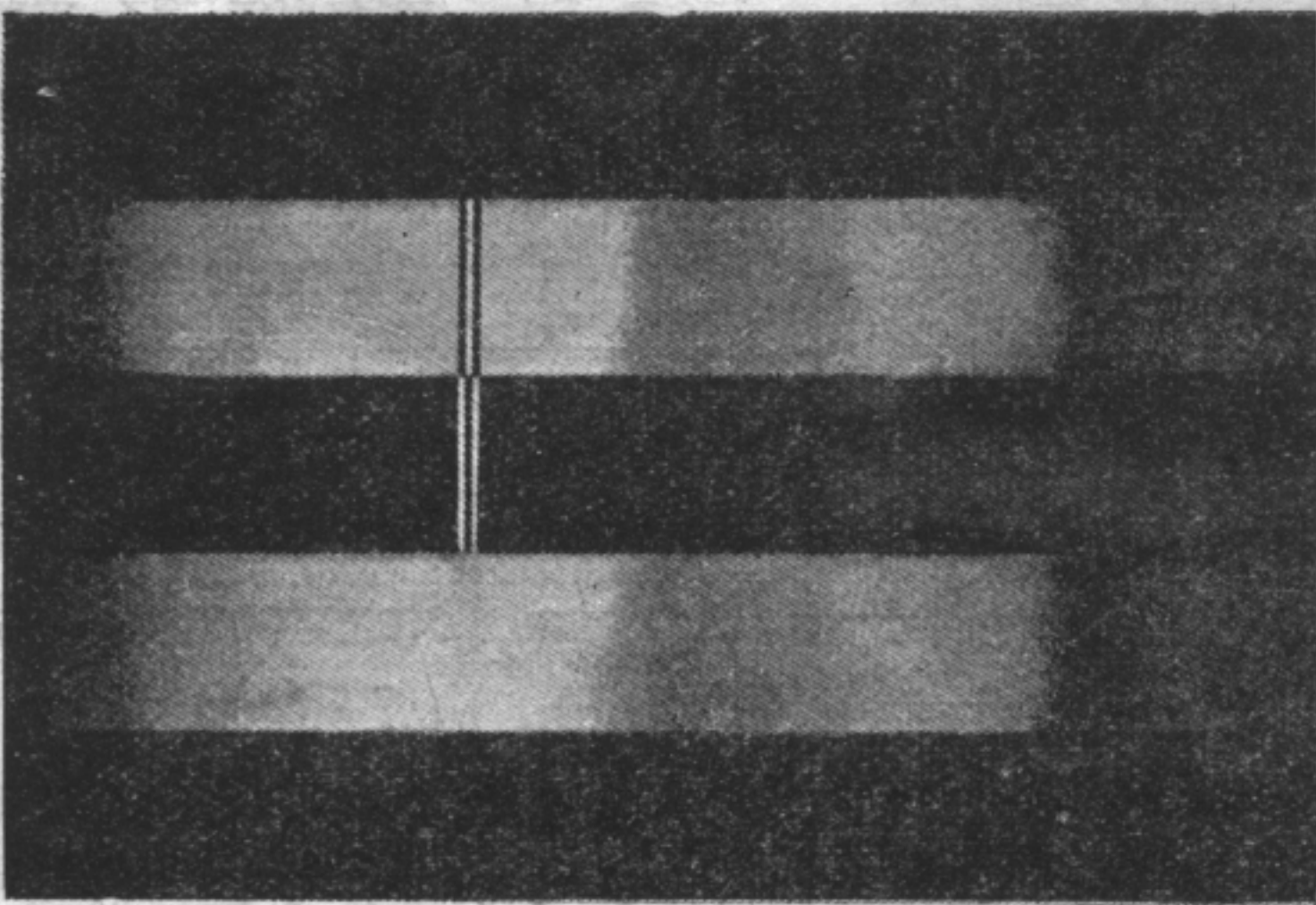
স্পেকট্রা—নক্ষত্রের লিখন-পত্রী

শরীরে তাপ মাপি, তেমনি ভাবে। নর্ডম্যান নামক এক জন বৈজ্ঞানিক বললেন, সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় ২৬৫,০০০,০০০ অশ্বশক্তি-তুল্য শক্তি আসছে। সেই শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা চলেছে।

পূর্ব্বে ধারণা ছিল, আলোর রশ্মি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যেতে মোটেই সময় নেয় না। বৃহস্পতি-গ্রহের চন্দ্রগ্রহণ থেকে রোমার প্রমাণ করলেন, এ ধারণা ভুল। আলোর গতি-বেগ সেকণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। ম্যাক্সওয়েল বললেন, যখন আলোর গতি-বেগ এত বেশী, তখন নিশ্চয় আলোয় ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক তড়িৎ ও বৈজ্ঞানিক গুণ আছে; এবং এমন অনেক তরঙ্গ আছে যা চোখে ধরা না পড়লেও তাদের অস্তিত্ব আছে। সেই তরঙ্গ-সাহায্যে আজ রেডিও-বেতার প্রভৃতি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আলোক-রশ্মির গতি—এই সবের গোড়াকার কথা রোমার আবিষ্কার করেছিলেন বৃহস্পতির-গ্রহের (Jupiter) চন্দ্র-গ্রহণ থেকে!
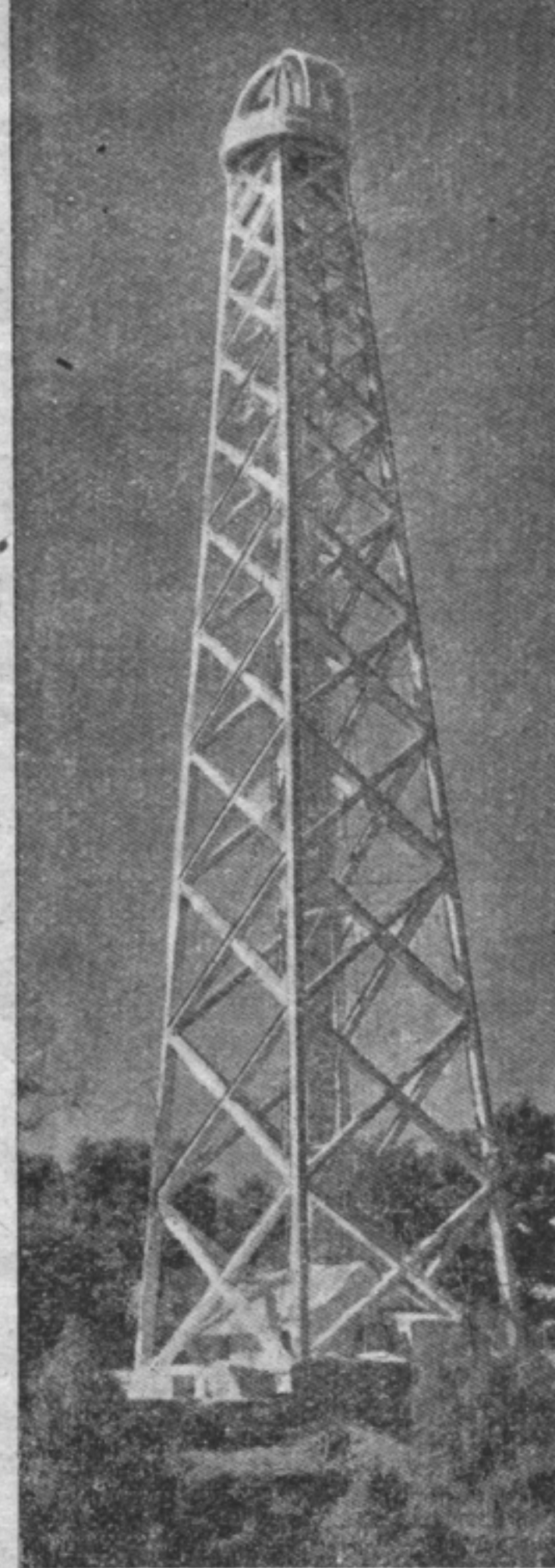
"টাওয়ার" বা "মঞ্চ"।* এখানে বসিয়া উইলশন্ সূর্য্যানুশীলন করতেন

এত দিন লোকে জানতো, আলোর রশ্মি বস্তু নয়, তরঙ্গ মাত্র এবং আলো সরল রেখায় চলাচল করে॥ আইনষ্টাইন প্রমাণ করলেন, সে ধারণা ভুল। আলো জড় পদার্থের মতই স্থূল জিনিষ। আলোর রশ্মি যদি সূর্য্যের পাশ দিয়ে ছুটে যায়, তবে আকর্ষণের জন্য সে সূর্য্যের দিকে হেলে পড়বে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যগ্রহণের সময় ছবি নিয়ে দেখা গেল, তাঁর এ-মত সত্য।

স্পেকট্রোস্কোপিক রেখার সাহায্যে বস্তুর প্রকৃতি এবং উপাদান (constitution) জানা যায়, আকাশ-পথে নক্ষত্রদের চলাচলের বেগ নিরূপণ করা হয় এবং তাদের উত্তাপ নির্দ্দিষ্ট করা চলে। বৈদ্যুতিক আলো জ্বাল্‌লে বাল্‌বের ভিতরকার তার (filament) তপ্ত হয়ে ওঠে; তা থেকে আলো নির্গত হয়। কিন্তু আসলে

* মহাপ্রাণ স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার ১৪৭ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট বাড়ীতে ঠাকুর-দালানের ছাদের উপর ষ্টীলের ফ্রেমে পাঁচ তলার সমান উঁচু এমনি একটি মঞ্চ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। প্রত্যহ নিশীথ-রাত্রে এই মঞ্চ হইতে স্পেকট্রোস্কোপের সাহায্যে তিনি নক্ষত্র-পুঞ্জের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং নক্ষত্রাদির ফটো তুলিতেন। মঞ্চের উপরে বসিয়াই তিনি মোটর-এঞ্জিনের সাহায্যে মঞ্চটিকে প্রয়োজনানুরূপ ঘুরাইতেন-ফিরাইতেন। এক দিন মধ্যাহ্নে প্রবল ঝড়ে সেই মঞ্চটি উড়িয়া যায়। তাহার কিছু দিন পরেই ঠাকুর-দালানের ঐ-অংশের ছাদটিও পড়িয়া যায়। বিজয়চন্দ্রের বহু-ব্যয়ে-প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা হইতেই মাসিক বসুমতী প্রকাশের সূচনা। উক্ত দৈব-দুর্ঘটনার পরেই বিজয়চন্দ্রের মুদ্রাযন্ত্রটি স্থানান্তরিত করিয়া বসুমতীর মুদ্রাযন্ত্রের সহিত সম্মিলিত করা হয়।

—মাসিক-বসুমতী সম্পাদক

ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। বাল্‌বের একটি তারে কোটি-কোটি পরমাণুর (atoms) সমষ্টি আছে। এর পরমাণুর প্রত্যেকটি যেন এক একটি সৌরমণ্ডল। মাঝখানকারটি সূর্য্য পরমাণু-কোষ (nucleus); এবং তার চারিধারে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রদক্ষিণ করছে গ্রহের দল—ইলেকট্রনস্‌। হাইড্রোজেন পরমাণুর সৌরমণ্ডলে মাত্র একটি গ্রহ আছে। * এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে লজ্ঘনের ফলে ইথরে (ether) তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য—লজ্ঘনের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভরশীল। স্পেক্‌ট্রোস্কোপিক ছবি সেই সৃজিত তরঙ্গের শ্রেণী নির্দ্দেশ করে। আকাশ-পথ বেয়ে যে আলোর রশ্মি আমাদের কাছে আসছে, তার পরমাণুর মধ্যেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটছে। ইলেকট্রনের কক্ষচ্যুতির ব্যাপারে অল্প-দৈর্ঘ্যের লজ্ঘন বেশী এবং ছবিতে তাদের রেখা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সমধিক দৈর্ঘ্যের লজ্ঘন বিরল এবং ছবিতে তাদের লিখনও অস্পষ্ট।

স্পেক্‌ট্রা তিন প্রকার। যখন কোন প্রতপ্ত ঘন বস্তু থেকে আলো নির্গত হয়, তখন স্পেক্‌ট্রোস্কোপে রামধনুর মত ছবি ওঠে। জ্বলন্ত গ্যাসের যে আলো, সে আলোর ছবি নিলে দেখবো, একটা কালো স্থূল রেখার (band) মধ্যে কয়েকটি সাদা সাদা রেখা রয়েছে। আবার যখন জ্বলন্ত ঘন বস্তুর আলো শীতল গ্যাসের মধ্য দিয়ে যায়—যেমন সূর্য্যের আলো—তখন সাত রঙের স্থূল রেখার (band) মধ্যে কালো কালো রেখা পাই। এই ছবি যেন স্বাক্ষর—প্রত্যেক পদার্থ নিজের পরিচয় অভ্রান্ত ভাবে তাতে লিখে দেয়।

বৈজ্ঞানিক যখন কোন নক্ষত্রের স্পেক্‌ট্রোস্কোপিক ছবি তোলেন, তখনই সেই স্বাক্ষর অর্থাৎ রেখা দেখে তিনি নির্ণয় করেন, সে নক্ষত্রে কি কি পদার্থ আছে। যদি কোন নূতন রেখা দেখতে পান, তখনই নূতন পদার্থের সন্ধান মেলে। লকইয়ারও এমনি নূতন লিখন দেখতে পেয়ে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করেন এবং তার পর বহু গবেষণায় হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয়। ধরুন, ডবল-লাইন রেল-পথে একটি ট্রেণ আসছে আর-একটি যাচ্ছে। নিজের ট্রেণের গতিবেগ জানলে শব্দের পার্থক্য থেকে ট্রেণযাত্রী বৈজ্ঞানিক বলে দিতে পারেন অপর ট্রেণটি কত জোরে চলেছে। তেমনি যে-নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে আসছে, তার আলোর ছবির মধ্যে রেখাগুলি বেশী-থাকের (pitch) দিকে ভীড় করবে, আর যে-নক্ষত্র দূরে সরে যাচ্ছে, তার রেখাগুলি কম-থাকের (pitch) দিকে সরে যাবে। এই রেখাগুলির সরে যাওয়ার পরিমাণ নক্ষত্রের গতিবেগের উপর নির্ভর করে। এই স্পেক্‌ট্রোস্কোপিক ছবিকে নক্ষত্রদের স্পীডোমীটার বললে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের (axis) উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব দিকে প্রায় সাড়ে তিন সেকণ্ড সময়ে এক মাইল ঘোরে। পৃথিবীবাসী আমরা বুঝতে পারি না যে, পৃথিবী ঘুরচে। আমরা মনে করি, আকাশবাসীরা অর্থাৎ নক্ষত্রদের দল পৃথিবীর উল্টো দিকে মানে পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। পৃথিবীকে পূরো একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকণ্ড। যে-ঘরে বসে বৈজ্ঞানিক নক্ষত্রদের পর্য্যবেক্ষণ করেন, তার নাম অবজারভেটরী। খুব উঁচু পাহাড়ের উপর লোহার ফ্রেমের তৈরী এক বিরাট মঞ্চের উপর ডোমওয়ালা ছাদ দেওয়া সেই ঘর। সে ঘরটা পৃথিবীতে অবস্থিত, অতএব পৃথিবীর সঙ্গে সেটাও ঘুরছে।

সুতরাং কোন এক নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের দিকে দূরবীণ কষে ছবি তুলতে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবী অন্য দিকে ঘুরে যাবে; অতএব নক্ষত্রটিও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হবে। তাই দূরবীণ এবং

হুকার দূরবীন্‌ (১০০ ইঞ্চি)—উইলশন অবজার্ভেটরি

* পরমাণুর জাতিভেদে এই গ্রহ-সংখ্যার কম-বেশী হয়। পরমাণুর ওপর শক্তির আবেশ হলে বাহিরে ইলেকট্রন-স্তর থেকে এক, দুই বা ততোধিক কণা পরমাণু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিতাড়িত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পরমাণুর ওপর রঞ্জন-রশ্মি আপতিত করে অথবা অতি দ্রুতগামী কোন তড়িৎ-কণাকে (electron) পরমাণুতে প্রহৃত করে এই ব্যাপার সংসাধিত হয়।

বৈজ্ঞানিক সহ সমস্ত ঘরটা ইলেক্‌ট্রিক সেটারের সাহায্যে পৃথিবীর গতির উল্টো দিকে যে-বেগে পৃথিবী ঘুরছে, ঠিক সেই বেগে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে নক্ষত্র আর দূরবীণ ছেড়ে পালাতে পারে না, দৃষ্টিপথে আবদ্ধ থাকে। কারণ, নক্ষত্র যে-বেগে সরে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, অবজারভেটরী সেই বেগে তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে,—ঘোরানো হচ্ছে। তখন আর ছবি তোলবার কোন অসুবিধা হয় না। মানুষের চোখে যে সূক্ষ্মতম তথ্য ধরা পড়া সম্ভব নয়, ছবিতে আপনা থেকেই নক্ষত্র তা এঁকে দিয়ে যায়।

আলোর গতিবেগ সেকণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। এমন বহু নক্ষত্র আছে যার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে একুশ বছর সময় লাগে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তারা ১৮৬,০০০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ × ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এ দূরত্ব কল্পনার অতীত! হয়তো বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্ব-বৃক্ষমূলে বসে তপস্যা করছিলেন, সেই সময় কোন এক নক্ষত্রের কতকগুলি পরমাণুর (atoms) তড়িৎকণা (elctrons) নিজ-কক্ষ (orbit) থেকে অন্য কক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। মিনিটে প্রায় এক কোটি শতদশ লক্ষ মাইল দৌড়ে সেই তরঙ্গ আজ এসে হানা দিল বৈজ্ঞানিকের স্পেক্‌ট্রোস্কোপে এবং শুধু সেই অতীত যুগের নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ খবরই সে নিয়ে এলো না, কতখানি পথ বেয়ে সে এসে উপস্থিত হয়েছে তাও দিল জানিয়ে!

চিলি-সান্তিয়াগো। পাহাড়ের বুকে লিক্ অবজার্ভেটরি (কালিফোর্ণিয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ের)

তারার রেখায়-লেখা তারার গতিবেগ

নক্ষত্রদের দূরত্ব জানতে গেলে শুধু স্পেক্‌ট্রাল্ রেখা বা আলোর তারতম্য জানলেই চলবে না, তার একটা মাপকাঠিরও প্রয়োজন। যেখানে যাওয়া সম্ভব নয়, এঞ্জিনীয়াররা এমন স্থানের দূরত্ব একটি নির্দ্দিষ্ট ভূমি (base) নিয়ে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে নিরূপণ করেন। আকাশের ঐ সব নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে হলে তেমনি ভূমি বা base-এর প্রয়োজন। নিকটতম গগনচারী চন্দ্রের দূরত্ব নিরূপণ করতে বৈজ্ঞানিকেরা ভূমির দৈর্ঘ্য নেন আমেরিকা থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত। কিন্তু পৃথিবীর কোন ভূমি নিয়েই নক্ষত্রদের দূরত্ব বার করা যায় না। কারণ, নক্ষত্ররা এত দূরে যে সে দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর আকার একটি বিন্দু মাত্র! এই পৃথিবীর বার্ষিক গতি-পথের ব্যাসকে ভূমি-হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। আজ একটি নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র দেখে ত্রিকোণের এক কোণ মাপা হলো। ছ' মাস পরে আবার সেই নক্ষত্র দেখা হলো, তখন আর একটি কোণ মাপা হলো। তার পর নক্ষত্রের দূরত্ব বার করা হলো ত্রিকোণমিতির সাহায্যে। পৃথিবীর এই দুই পোজিশনের মধ্যে যে দূরত্ব (১৮৬,০০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ সূর্য্যের চারিধারে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-পথের ব্যাস—এই দূরত্ব হলো ত্রিকোণের ভূমি।

এই উপায়ে দূরত্ব নিরূপণ যেমন জটিল ও কষ্টকর, তেমনই সময়-সাপেক্ষ। ইয়র্কস্ অবজারভেটরিতে এক নূতন উপায় আবিষ্কৃত হলো। চোখের সম্মুখে আট ইঞ্চি দূরে একটা পেনসিল ধরে দেওয়ালে-টাঙানো একটা ছবির দিকে ডান চোখ বুজে বাঁ চোখ খুলে দেখে তার পর যদি বাঁ চোখ বুজে ডান চোখ দিয়ে দেখা যায়, তবে দেখবেন পেনসিলটি যেন ছবির একধার থেকে আর একধারে সরে যাচ্ছে! এখন যদি আকাশে অবস্থিত দূরবর্ত্তী নক্ষত্রকে এই উপায়ে ছবি এবং কোন নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রকে পেনসিল হিসাবে ধরে নেওয়া হয় এবং ত্রিকোণের ভূমি অর্থাৎ পৃথিবীর গতিপথের ব্যাস-স্থান দুই চোখের মধ্যকার দূরত্ব বলে ধরা যায়, তবে সেই হিসাব ধরে ছ' মাস অন্তর দু'টি ফটো নিলে দেখা যাবে যে, ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর নিকট-বর্ত্তী নক্ষত্র দূরবর্ত্তী নক্ষত্র থেকে সরে গেছে! এই সরে যাওয়ার পরিমাণ থেকে নক্ষত্রদের দূরত্ব নিরূপণ করা হয়; এবং এই উপায়ে

৩৭৩০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০ মাইল দূরত্ব অবধি মাপা সম্ভব হয়েছে !

এই ভাবে ফটোগ্রাফিক প্লেটের সাহায্য-গ্রহণ এখন জ্যোতিষ্ক-শাস্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। চোখে যা ধরা পড়ে না, প্লেটে তার লেখা ফুটে ওঠে। এই লেখাই নক্ষত্রদের ইতিহাস। রেকর্ডগুলি জমিয়ে রাখলে যুগ যুগ ধরে যে সব ছবি উঠবে, তার তুলনা-মূলক গবেষণা থেকে নক্ষত্রদের দেশের নিয়ম-কানুনও জানতে পারা যাবে। এইরূপ গবেষণা থেকেই ধরা পড়েছিল যে, পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-পথ পরিবর্ত্তনশীল এবং মেরুদণ্ডের হেলানও (inclination) এক থাকে না। এর নাম বিষুবের অয়ন, চলন ও অক্ষ-বিচলন।

যদি আলোর রথে চড়ে অর্থাৎ সেকণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল গতিতে আকাশে ওড়া সম্ভব হতো, তবে চাঁদে পৌঁছুতে আমাদের সময় লাগতো এক সেকণ্ড, সূর্য্যে যেতে আট মিনিট এবং নেপচ্যুন-গ্রহে হাজির হতে চার ঘণ্টার চেয়ে একটু বেশী। নিকটতম
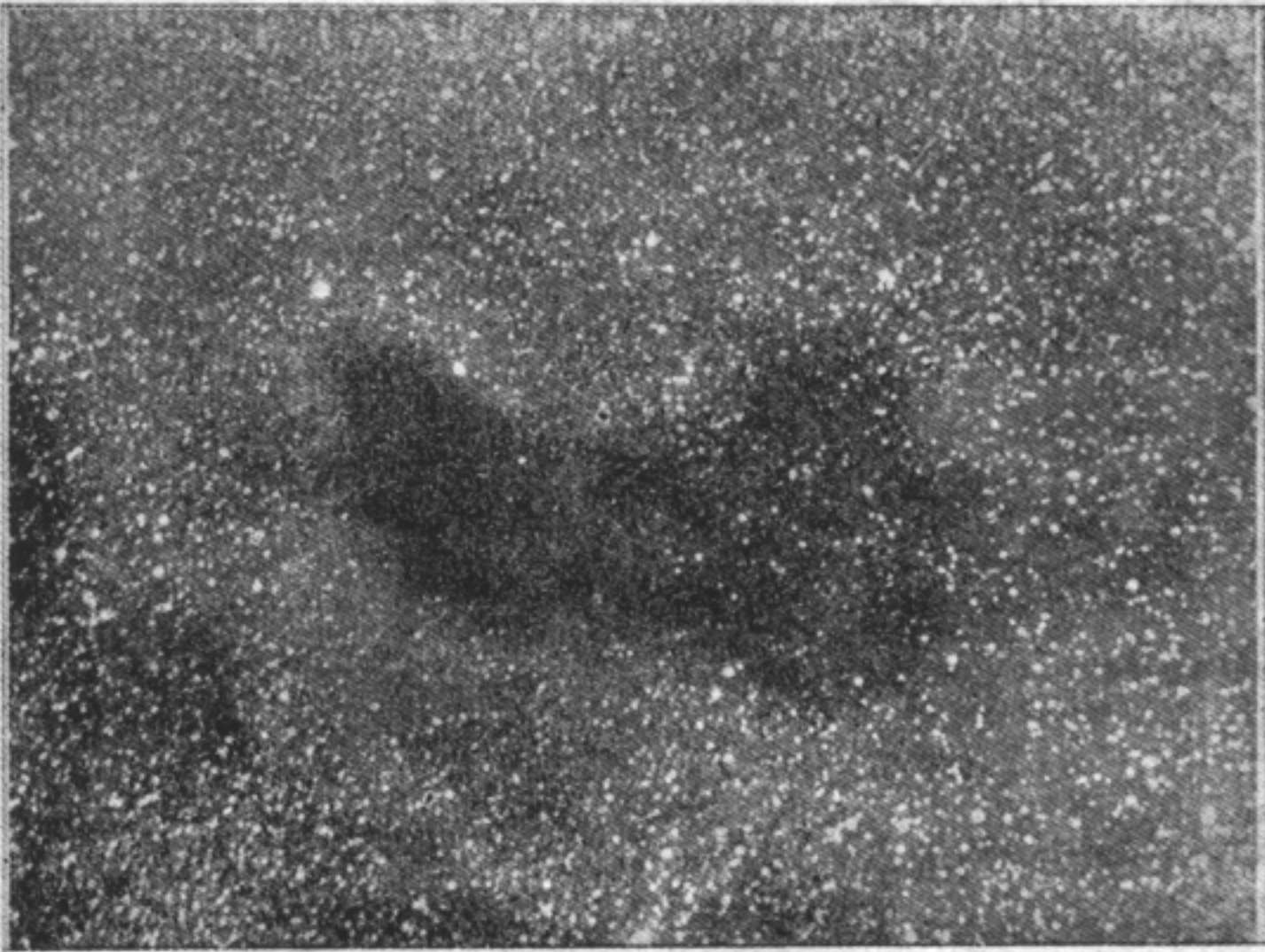
এ্যাকুইলায় কালো ছায়া

তারকা অ্যালফা সেণ্টরীতে যেতে হলে চার বৎসর অবিরাম উড়তে হবে এবং সিরিয়াসে (লুব্ধক) পৌঁছুতে হলে আট বৎসর। সেখানে গিয়ে দেখবো টিম্‌টিম্-করা সামান্য জোনাকীর মত সিরিয়স—সূর্য্যের সমানই উজ্জ্বল। ভেগা (অভিজিৎ) এবং আর্কটরাসে পৌঁছুতে সময় লাগবে ত্রিশ বৎসর এবং সেখানে গিয়ে বুঝতে পারবো যে, তারা আমাদের সূর্য্যের চেয়ে আশী গুণ প্রখর এবং উজ্জ্বল। ক্যাপেলায় উপস্থিত হবো সাতচল্লিশ বৎসর পরে এবং গিয়ে অবাক হয়ে দেখবো যে, ক্যাপেলা যুগ্ম-তারা এবং সূর্য্যের চেয়ে এক শত গুণ উজ্জ্বল। কালপুরুষ (orion)-স্থিত রিগেলে যেতে সময় লাগবে পাঁচশ' বছর, আর গিয়ে দেখবো যে, আমাদের সূর্য্যের মত ১৩,০০০ সূর্য্য মিলেও তার সমান উজ্জ্বল হতে পারবে না। এ সব বৃত্তান্ত স্পেক্‌ট্রোস্কোপিক ছবি থেকে পাওয়া গেছে।

এই সব দূরত্ব দেখে বিস্মিত হয়ে থাকতে হয়! পাঁচ শত আলোক-বর্ষ অর্থাৎ ৫০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ × ১৮৬,০০০ মাইল! অসীম আর কাকে বলে? কিন্তু এমন অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ আছে—যার তুলনায় এই বিরাট্ দূরত্বও কিছু নয়! স্পেক্‌ট্রোস্কোপ ছবি থেকে জানা গেছে যে, হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জ সেকণ্ডে ১৯৫ মাইল গতিতে আমাদের দিকে আসছে। আকারে তারা দশ লক্ষ সূর্য্যের সমান! এমন নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, যার আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসে কুড়ি লক্ষ বর্ষে অর্থাৎ তার দূরত্ব হলো ২০০,০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ × ১৮৬,০০০ মাইল! কল্পনার অতীত, কিন্তু হিসাবে তাও ধরা পড়ছে!

তারকার জন্ম-বৃত্তান্ত যেন একটা চমকপ্রদ রূপকথা! আকাশে কালো কালো দাগ অথবা ঝাপ্‌সা আলোর মত অনেক স্থান আছে। পৃথিবীর ওপর আলোর চাপ এত কম যে, সে একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। উত্তাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই চাপ বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব জুড়ে ধূলির মত সংখ্যাতীত মুক্ত পরমাণু সঙ্গীর আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—এত লঘু যে, তার উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পড়ে না! তার পর তারা
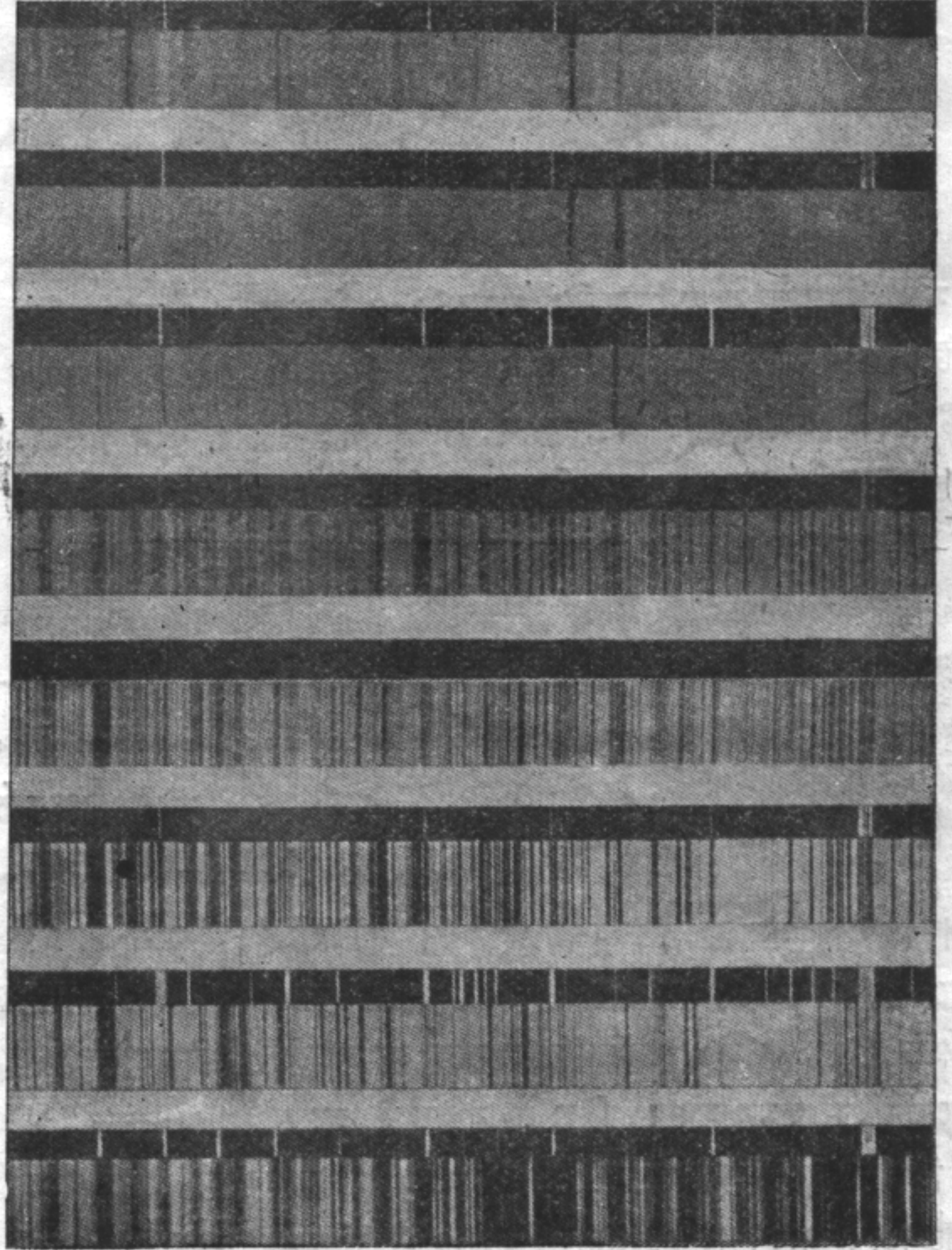
আলোর রেখায় সূর্য্য, আর্কটরাস্ প্রভৃতি অষ্ট নক্ষত্রের কাহিনী

দলবদ্ধ হলো। সেই দলটি যদি কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে জোটে, তবে জ্বলন্ত মেঘের মত দেখায়, আর যদি বহু দূরে থাকে, তবে অন্ধকার-পিণ্ডের মত মনে হয়। এই নক্ষত্র-ধূলি জমাট বেঁধে বেঁধে যেই একটু ভারী হয়, অমনি মাধ্যাকর্ষণ তাদের টেনে একত্রিত করে দেয়। তারা চলতে চলতে ধাক্কা-ধাক্কি করে, উত্তাপ সৃষ্টি করে, গরম হয়ে ওঠে; কখনও লাল, কখনও পীত, কখনও সাদা, কখনও বা নীলবর্ণ ধারণ করে। যত ঘনীভূত হয়, উত্তাপ ততই বৃদ্ধি পায়। যখন এই প্রক্রিয়া চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন রিগেল জাতীয় সূর্য্যের চেয়ে ১৩,০০০ গুণ উজ্জ্বল তারকার জন্ম হয়। এই হলো তারকার শৈশব অবস্থা। অত্যন্ত চাপ এবং প্রচণ্ড উত্তাপে সকল বস্তু ভেঙ্গে-চুরে একেবারে আদিম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কোন পরমাণুই নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। ফলে শিশু-তারকার মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ থাকা সম্ভব হয় না।

তার পর শিশু-তারকা বড় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তাপও

কমে আসে। ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। তাদের ঘড়ির একটি সেকণ্ড আমাদের কোটি বৎসরের সমান। শুভ্র উজ্জ্বল নক্ষত্র আকারে ছোট হয়ে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন উত্তাপ ও চাপের হ্রাস-হেতু হাইড্রোজন ও হিলিয়াম পরমাণু ক্রমেই
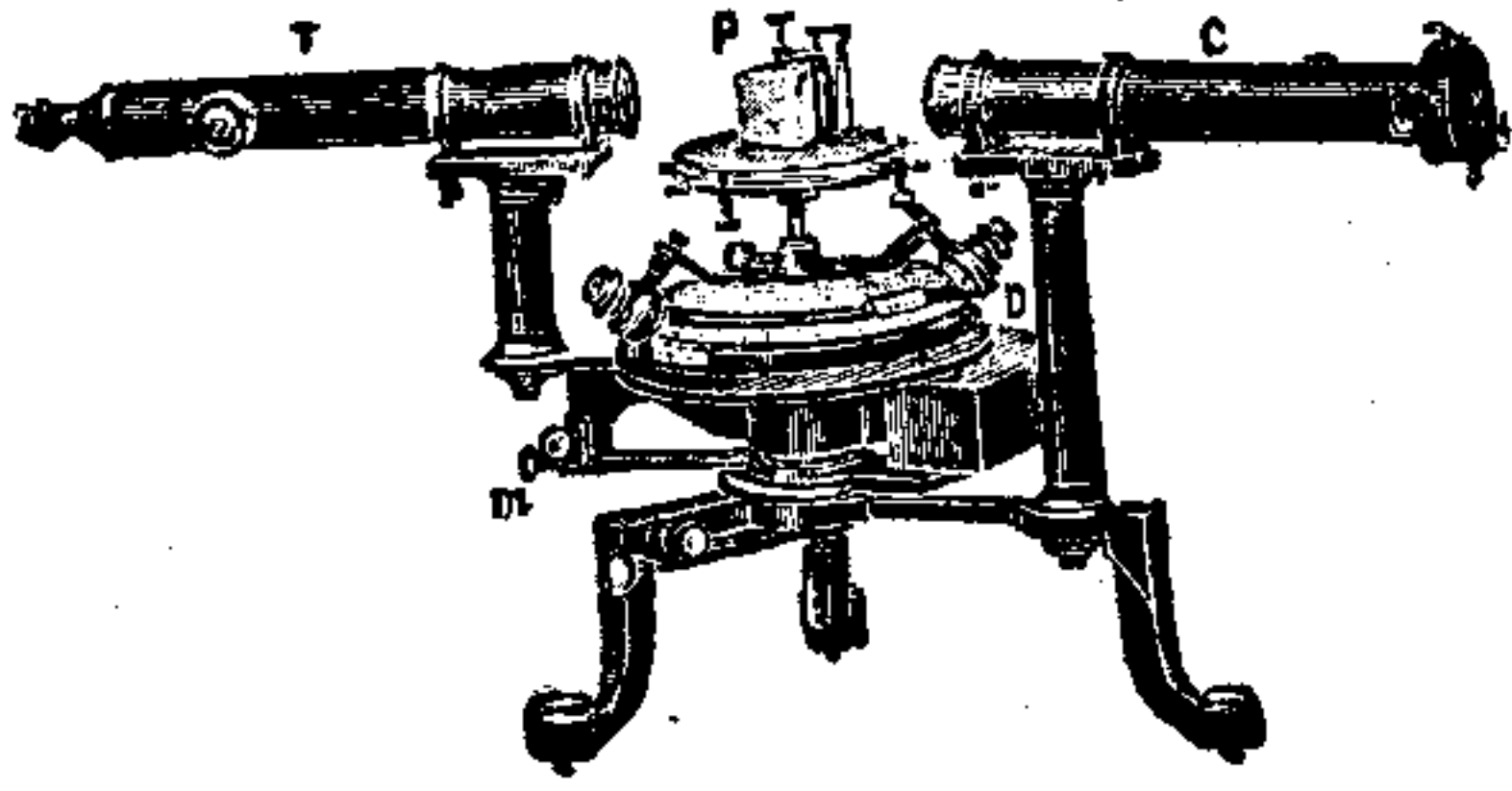
স্পেক্‌ট্রোস্কোপ্‌

রকমারী মিলনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করে। আরও দিন কেটে যায়। শিশু অবস্থার বৃহৎ রক্তবর্ণ তারকা যৌবনে আকারে ছোট একটি শুভ্র নক্ষত্র হয়, বার্দ্ধক্যে আবার উত্তাপ কমে যাওয়ার দরুণ রক্তবর্ণ ধারণ করে কিন্তু পূর্ব্বের আকার আর ফিরিয়ে পায় না, অনেকখানি ছোট হয়ে যায়। তার পর আরও উত্তাপ কমে, ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে। তখনই তারকার মৃত্যু হয়।

এক-সময় আমাদের সূর্য্যও অণ্টারেসের মত সুবৃহৎ ও রক্তবর্ণ ছিল। যত দিন গেল, সূর্য্য আকারে ছোট এবং ঘনীভূত হতে লাগল এবং তার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ বাড়তে লাগল। শেষে রিগেল জাতীয় নীলাভ-শুভ্র তারকায় পরিণত হলো, এখনকার সূর্য্যের তুলনায় তখনকার সূর্য্যের আকার ছিল ১৩,০০০ গুণ বড়। তার পর ধীরে ধীরে ছোট, আরও ছোট হতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপও কমতে লাগলো। এখনও সূর্য্য পৃথিবীর মত জমাট বাঁধেনি, তখনকার তো কথাই নেই। সে সময়ে হয়তো কোন তারকা ঘুরতে ঘুরতে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ফুটন্ত সূর্য্যের দেহে জোয়ার-ভাঁটা খেললো। তারকার আকর্ষণে একটা জোয়ারের ঢেউ এত উঁচু হয়ে উঠলো যে, তার কয়েক ফোঁটা সূর্য্যের দেহ ত্যাগ করে দূরে নিক্ষিপ্ত হলো। সেই দ্রবীভূত নিক্ষিপ্ত পদার্থ থেকে ভেঙ্গে-চুরে গ্রহের সৃষ্টি হলো। তারকা চলে যাবার সময় তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। সেই থেকে তারা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তারকা সূর্য্য সৌরমণ্ডলে পরিণত হলো!

অনন্ত পুরুষের অসীম সৃষ্টি, বিশাল বিশ্ব! অনন্ত কালব্যাপী জীবন-মরণ, ভাঙ্গা-গড়া! ক্ষুদ্র মানবের কতটুকু সামর্থ্য যে, বিরাটের সৃষ্টি-প্রলয়ের হিসাব রাখে অথবা তার কারণ নির্ণয় করে!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

সর্পগন্ধা

সর্পগন্ধা আজ সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বনে-জঙ্গলে যেখানে-সেখানে অযত্ন-সম্ভূত ছোট একটি গুল্ম যে মানুষের এত কাজে লাগিতে পারে, এ কথা কয়েক জন মাত্র জানিলেও চিকিৎসা-জগতে এ বনৌষধির তেমন সমাদর ছিল না বলিলেই হয়।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে ছোট চাঁদড় বলিয়া একটি বনজ গুল্ম কয়েক জন বিশিষ্ট চিকিৎসকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কি ভাবে ইহার ব্যবহার করা চলে, আয়ুর্ব্বেদ বা অন্য চিকিৎসাগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে কি না, সে বিষয়ে খ্যাতনামা চিকিৎসকগণও মনে প্রচুর সন্দেহ পোষণ করিতেন। এমন বহু বনৌষধির নাম চরকাদি গ্রন্থে আছে—তাহার স্বরূপ কি, কি ভাবে সেগুলিকে কাজে লাগান যায়, সে সম্বন্ধে কোন সন্ধান আর পাওয়া যায় না! কি ভাবে এই সব বনৌষধির গূঢ় রহস্য মানুষের প্রথম অধিগত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লইলে জানিতে পারি, বনচারী ব্যাধকে আশ্রয় করিয়াই ইহার প্রথম প্রকাশ। সর্পগন্ধা সে দিক্ দিয়া অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ মনে হয়।

আমরা শুনিয়া আসিয়াছি, নেউল সাপের দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া কোন একটি বনৌষধি-মূল আহরণ করিয়া সাপের বিষক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করে। অবশ্য সাপ-নেউলের চির-শত্রুতার কথা সর্ব্বজনবিদিত ও আত্মরক্ষার উপায় তাহার অধিগত করানো প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা! প্রাচীন শাস্ত্রে নাকুলি নামক বনৌষধির উল্লেখ আছে। নাকুলি এবং গন্ধ-নাকুলির কথা রাজনির্ঘণ্টুতে ও ভেল-সংহিতাতে লিখিত আছে। উন্মাদ রোগে মহাপৈশাচিক ঘৃতে ইহার ব্যবহার হইয়াছে। রাজনির্ঘণ্টুকার মাত্র নাকুলির উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহার সর্পগন্ধা, নাগগন্ধা, অহিভুক্, সর্পাদনী, ব্যালগন্ধা, রক্তপত্রিকা ইত্যাদি দশটি নামের উল্লেখ করিয়াছেন, আবার গন্ধনাকুলি নামক অপর একটি বনৌষধির সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দ্দনিকা, অহিমর্দ্দিনী, মহাহিগন্ধা, অহিলতা প্রভৃতি বারোটি নামের উল্লেখ করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয় প্রকার বনৌষধির গুণ প্রথমোক্ত বনৌষধির তুলনায় কিছু শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উভয় বনৌষধিই তিক্তস্বাদ, বিপাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক এবং অনেক বিষবিধ্বংসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নকুলের সহিত এই বনৌষধির সম্বন্ধ—বিষনাশক গুণের বর্ণনা, বিশেষতঃ, সর্পের নাম আশ্রয়ে সর্পবিষনাশকতার উল্লেখ থাকিলে ইহা কোন্ বনৌষধি, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ বটে। সর্পের চক্ষুর সহিত কোন সাদৃশ্য ইহার কোন-না-কোন অংশের আছে, ইহাও সর্পাক্ষী নাম হইতে অনুমান করা চলে। ওয়াট মহোদয় সমগ্র পৃথিবীর বনৌষধি-সমুদ্র মন্থন করিয়া Economic products of India নামক যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই পুস্তকে দেখিতে পাই, তিনি Ophiorrhiza Mungos এবং Rauwolfia serpentina নামক যে বনৌষধি দুইটির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি Ophiorrhiza Mungosকে mongoose plant নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহার সংস্কৃত নাম সর্পাক্ষী; বাংলা নাম গন্ধনাকুলী; এবং বাংলা, আসাম, ব্রহ্মদেশ,

টেনাসেরিম, আন্দামান, নিকোবর, সিংহল, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি স্থানে উহা জন্মায়। ইহার পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—এই বনৌষধির মূল তিক্তাস্বাদ এবং উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। সিংহলে সর্পবিষ-প্রতিষেধক বলিয়া ইহার ব্যবহার আছে। নকুল সর্পদষ্ট হইয়া এই বৃক্ষের সন্ধান করে। কিম্‌ফার মহোদয় (Koempfer) তাঁহার **Aemenitates Exoticae** নামক গ্রন্থে দূষিত জ্বরে ইহার ব্যবহারের কথা এবং অন্যান্য দূষিত রোগে ও কুকুরের দংশনজনিত ক্ষেত্রে মানুষ ও পশুর মধ্যে ব্যবহারের সাফল্য বর্ণনা করিয়াছেন। হর্সফিল্ড মহোদয় এই বৃক্ষের গুণের তেমন উৎকর্ষ নাই বরং **Rauwolfia serpentina** নামক ভেষজের গুণ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শেষোক্ত বনৌষধি ছোট চাঁদড় নামে এ দেশে পরিচিত বলিয়া ওয়াট বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই বনৌষধির সংস্কৃত নাম সর্পগন্ধা; তেলেগু ভাষায় ইহা পাতাল-গারুড়ি নামে খ্যাত। প্রথমোক্ত বনৌষধি যে সকল স্থানে পাওয়া যায়, সেই সকল স্থানে ইহাও সুলভ বটে। ভারতে এবং মালয় উপদ্বীপে সর্পবিষ-প্রতিষেধক ভেষজরূপে ইহার খ্যাতি আছে। অধিকন্তু, বোল্‌তা, ভীম্‌রুল প্রভৃতি কীট-দংশনজাত বিষ-ক্রিয়াতে বা দূষিত জ্বর-নাশে আভ্যন্তর-প্রয়োগে ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে। পাতা ও মূল পিষিয়া বাহ্য প্রলেপরূপে মূলের ক্বাথ যে কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনজনিত বিষ নাশ করে। দূষিত জ্বর নাশে, আমাশয় বা অন্ত্রপ্রদাহজনিত যে কোন রোগে, এমন কি, গোখ্‌রো বা কেউটে সাপের বিষ-নাশ করিতে ইহার বিশেষ সাফল্য আছে বলিয়া রামফিয়ান মহোদয় বর্ণনা করিয়াছেন। নকুল সর্পদষ্ট হইয়া এই বৃক্ষের সন্ধান করে; ইহাও তাঁহার বিশ্বাস। সার উইলিয়াম জোনস্‌ কিম্‌ফার মহোদয়-বর্ণিত সর্পগন্ধার সহিত রামফিয়ান মহোদয়-বর্ণিত সর্পগন্ধার সাদৃশ্য বর্ণনা করিলেও কোনটি প্রকৃত সর্পগন্ধা, সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। রক্‌সবরা মহোদয় বলিয়াছেন—মাদ্রাজের তেলেগু চিকিৎসকগণ জ্বর-নাশক ভেষজরূপে যে-কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনজনিত বিষনাশে এবং প্রসূতির সুখ-প্রসবের জন্য ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ঔষধের বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া হর্সফিল্ড মহোদয়ও মনে করেন। ডিমক্‌ বলেন, কনকান্‌ প্রদেশে আমাশয় ও অতিসারে শ্রমজীবিগণ ইহার বহুল ব্যবহার করেন। মোটের উপর ছোট চাঁদড় মূল নাকুলি, তাহাও পূর্ব্বকথিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারা যায়। বড় চাঁদড় মূলের ব্যবহার তেমন নাই।

ইদানীং এই বনৌষধি ভারতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই বনৌষধি সম্বন্ধে গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, গত পঞ্চাশ বৎসর উন্মাদ রোগের বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা এক জন চিকিৎসক উন্মাদের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রধান উপাদানরূপে ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। এই ঔষধ বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এখনও বিক্রীত হয়। পাটনার একটি সুবিখ্যাত মুসলমান-পরিবার এই মূল ।•—।৶ মাত্রায় ৶• আনা গোলমরিচ-চূর্ণ সহ পিষিয়া উন্মাদ-রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। বাজারেও এ ঔষধের খ্যাতি আছে। কলিকাতায় স্বর্গীয় স্বনামধন্য কবিরাজ ৺বিজয়রত্ন সেন মহাশয় উন্মাদরোগে ইহা ব্যবহার করিতেন। শিষ্য-পরম্পরায় উন্মাদ রোগে বিভিন্ন নামে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। **Blood Pressure** রোগে (যাহা চরকে বিধিশোণিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং যে ক্ষেত্রে রক্তপিত্তহরী চিকিৎসার উল্লেখ আছে)—ইহার ব্যবহার আছে। উত্তর-বঙ্গের এক জন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী সর্পদষ্ট রোগীকে এক তোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় দিয়া তাহার জীবন দান করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কলিকাতায় কয়েকটি ঔষধ-প্রতিষ্ঠান আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরাসার (**Rectified Spirit**) সাহায্যে ইহা হইতে নব-ধারার ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। বর্ত্তমানে **School of Tropical Medicine** নামক নব্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। এই ভাবে এই অযত্ন-

সর্পগন্ধা

সম্ভূত বনৌষধি আজ রোগী ও চিকিৎসক সকলের নিকট সমাদরের বস্তু হইয়াছে। বিশেষতঃ, নব্য বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক কথিত **Blood Pressure** রোগ—যাহা রক্তের বিষক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয় এবং যাহা ক্ষেত্রবিশেষে শিরোঘূর্ণনাদি রক্তভেদ বা রক্ত-বমনাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং যান্ত্রিক পরীক্ষায় রক্তের স্বাভাবিক গতিবিধির অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে রক্তের গতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে এই মূলচূর্ণ ৶• আনা হইতে ।• আনা মাত্রায় সেবন করিলে নিদ্রাকর্ষণ ও তৎসহ রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়। বহু উন্মাদ-রোগীকে এ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগমুক্ত করা গিয়াছে। রক্তের চাপ কম বা বেশী, উভয় ক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ চলে। আভ্যন্তর বিষক্রিয়া যে কোন কারণে সংঘটিত হইলে ইহা প্রয়োগ করা চলে। বিছার দংশনে বা ভীমরুলের দংশনে ইহার পাতা ও মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার আশু উপশম হয়। পল্লীগ্রামে স্ব স্ব বাস্তুভূমিতে এই অতি-প্রয়োজনীয় বনৌষধি বৃক্ষ রোপণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে কোন বিষ-চিকিৎসায় ইহার উপযোগিতা যখন প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, তখন সর্পবিষনাশে ইহার উপযোগিতা থাকা খুবই সম্ভব। মোটের উপর, এই বনৌষধি সম্বন্ধে গভীরতর এবং ব্যাপকতর গবেষণার বা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (এম, এ)।
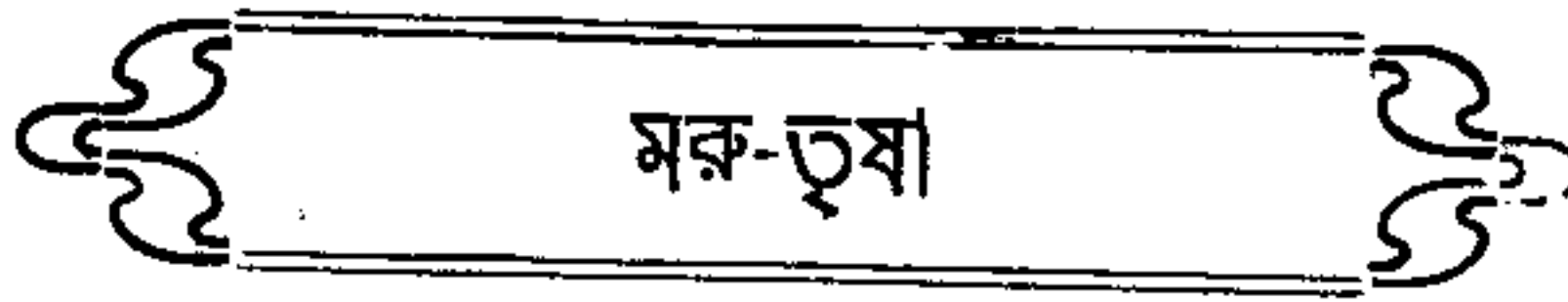
মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

৮

অমিয় বসিয়া রত্নার সহিত গল্প করিতেছিল।

সকালে চা-পানের পর্ব্ব চুকিয়াছে। গোস্বামী-সাহেব ঢুকিয়াছেন অফিস-কামরায়, মাকে লইয়া অনিল বাজারে বাহির হইয়াছে, বাড়ীতে শুধু রত্না ও অমিয়। নিরবচ্ছিন্ন অবসর-ভরা পৌষের সকাল-টুকুকে উপভোগ করিতেছে। বারান্দার গোল-টেবিলের সামনে একখানা চেয়ারে বসিয়াছে অমিয়, আর তার সামনের চেয়ারে বসিয়াছে রত্না। সার্শির রঙিন কাচ দিয়া সোণালী রৌদ্র-কিরণ বিচিত্র বিভায় রত্নার শাড়ীতে, পদতলে, অনাবৃত বাহুমূলে পড়িয়া পরীর মত তাকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। অমিয় রত্নাকে বুঝাইতেছিল,—আশার যেমন অন্ত নেই, মানুষকে বড় করে তোলবার মত এত-বড় প্রেরণাও তেমনি আর কিছুতে নেই। তবু মানুষ বলে, আশাই দুঃখের মূল! কিন্তু এই দুঃখেই মেলে সুখের সন্ধান!

রত্না মৃদু হাসিল। কহিল,—আশা পূর্ণ না হলে মনে যখন আমরা বেদনা পাই, তখন বার বার আশা করে শুধু কষ্ট বাড়ানো সার হয়! তাতে সুখের পথ তৈরী হয় কি না জানি না—কিন্তু দুঃখের মাত্রা বাড়ে! তাই কোনো-কিছুর আশা না করাই ভালো নয় কি?

—না, সে কি করে হতে পারে! যার আশা নেই, জানবে তার মৃত্যু ঘটেছে! আশাই আমাদের প্রাণের উৎস। সংসারে আমরা সব কিছুরই আশা করতে পারি। পাওয়া না পাওয়া—ভাগ্য, না হয় পুরুষকার!

স্থির নেত্রে রত্না অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বুকের মধ্যে অকস্মাৎ একটা তরঙ্গ উঠিয়াছিল। তাহারই অদম্য বেগ দমন করিতে রত্নার কর্ণমূল হইতে ললাট পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

কথার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া অমিয় কহিল,—ও কি, একদম চুপ! কি ভাবছেন?—বলিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে সে রত্নার মুখের পানে তাকাইল।

রত্না কহিল,—কি জবাব দেবো খুঁজে পাচ্ছি না।

—ও, আচ্ছা, ও-তর্ক তাহলে থাক। আসুন, আমরা একটু গল্প করি। সেখানে অর্থাৎ আমার কুমিল্লার বাংলাতে এমন সময়ে কি করি, জানেন?

সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রত্না কহিল—কি?

—স্নানের পর প্রসাধন-ক্রিয়া অর্থাৎ পোষাক পরা! সে এক ভীষণ ব্যাপার!

—কেন, আপনার বেয়ারা তো সব গুছিয়ে রাখে!

—হ্যাঁ, চাপরাশি আবদুল সব গুছিয়ে রাখে, সত্যি! কিন্তু আমি নিজেই যে মূর্ত্তিমান্ বেগোছ! বিশেষ রুমাল-সংক্রান্ত ব্যাপারে। সে বেচারার দোষ নেই, আমি বুঝি! তবু রাগ হয় বিষম এবং তাকে দি বকুনি।

—হাকিম কি না! রত্না হাসিল।

অমিয়ও হাসিল। কহিল,—ঠিক কথা বলেছেন। আমাদের মত লোকের বিচার এমনি বটে! বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—আমার এই বিদ্‌কুটে ভুলের জন্য মার কাছে ছেলেবেলায় কম বকুনী খেয়েছি! কিন্তু মাতামহের স্বভাব বিসর্জ্জন দিই কি করে? গদীর নীচে দলিল রেখে তিনি পুলিশে চুরির ডায়রী করাতেন। তাঁর নাতি তো!

রত্না হাসিতে হাসিতে কহিল,—খুব ভালো মানুষ ছিলেন বুঝি! কিন্তু অত বড় জমিদারী চালাতেন কি করে?

—বুদ্ধির তো অভাব ছিল না!

পরিহাস-মাখা সুরে রত্না কহিল,—যেমন আপনার!

—আমার! তা ঠিক বলেছেন! কিন্তু আমায় এমন করে এ্যানালাইজ্ করলেন কেন বলুন তো?

রত্নার মুখ সিঁদূরের মত রাঙা হইয়া উঠিল। লজ্জানত চক্ষে কি বলিতে গিয়া সে থামিল। অনিল কক্ষে প্রবেশ করিল। রত্নার লজ্জা-রাঙা মুখ এবং অগ্রজের সকৌতুক হাস্য-রেখা অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে নিমেষে সে দেখিয়া লইল।

সহোদরকে দেখিয়া অমিয় কহিল,—মার্কেটটা উজাড় করে আনলে না কি?

হাসিয়া অনিল কহিল,—ইচ্ছে থাকলেও ব্যাগের সে সামর্থ্য ছিল না।

—ইস্! থাকলে তাহলে সর্ব্বনাশ হতো! আপনি ভারি উড়নচণ্ডী মানুষ—বলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে রত্না অনিলের পানে চাহিল।

—তা কি করবো! ভালো জিনিষের উপর আমার ভয়ঙ্কর লোভ! বলিয়া সে রত্নার মুখের দিকে চাহিল।

অমিয় হাসিয়া কহিল—সেইটেই মস্ত বিপদ! এক জন খুব কড়া হুঁসিয়ার মানুষ চাই তোমার আগলাতে!

অনিল হাসিল। কহিল,—কড়া মানুষ! না, তেমন কড়া আমার প্রয়োজন নেই! এমন মানুষ আমি চাই, যাকে আমার অদেয় কিছু থাকবে না।

এ সভ্য সমাজ। রহস্যালাপ এখানে নূতন ধরণের! এখানকার আদব-কায়দায় চাল-চলনে রত্নার যতখানি চমক লাগে, বিস্ময় লাগে তার চেয়ে অনেক বেশী! তবু এ সব তার খুব ভালো লাগে! ইহাতে সে আমোদ পায়!

খপ্ করিয়া রত্না কহিল,—তাহলেই মুস্কিল! তেমন লোক আপনি খুঁজে পাবেন কোথায়? আর পেলেও তার নাগাল পাবেন কি করে?

কৌতুক-ভরা কণ্ঠে অনিল কহিল;—হয়তো খুঁজে পেয়েছি! কিন্তু নাগাল পাইনি। চাঁদকে তো হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না, চোখে শুধু দেখাই যায়। বলিয়া চকিতে সে জ্যেষ্ঠের দিকে চাহিল। দেখিল, টেবলের আস্তরণের সূচী-কার্য্যটি সহসা সে নিরীক্ষণ করিতে মনোযোগী হইয়াছে।

মিসেস্ গোস্বামী আসিলেন! কহিলেন,—এই যে অমি রয়েছে! আমি ভাবলুম, এতক্ষণে মোটর নিয়ে কোন্ বন্ধুর বাড়ী পাড়ি দিয়েছে।

অমিয় কহিল,—না, উঠি-উঠি করে আর উঠতে পারলুম না! হঠাৎ মিস্ বোসের সঙ্গে একটা তর্ক লাগলো।

তর্ক নাম শুনিয়াই মিসেস্ গোস্বামী মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ তুলিয়া কহিলেন,—তর্ক জিনিষটা ভয়ঙ্কর বিশ্রী! ও ফিলজফি পড়ার রোগ! বলিয়া পরক্ষণেই কহিলেন,—কিন্তু অমি, মিস্ বোস্ বলছো কাকে? রত্নাকে?

অমিয় হাসিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—না, না, সঙ্কোচ কিসের? আমি অতটা খেয়াল করিনি! রত্নার তুমি নাম ধরো না কেন? ওকে রত্না বলেই ডেকো। অনিল রত্না বলে।

অভিযোগ তুলিয়া অনিল কহিল,—কিন্তু মা, রত্না আমাদের 'আপনি' বলে কেন? তুমি ওকে আপনি বলতে মানা করো!

মিসেস্ গোস্বামী হাসিলেন। সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন,—তা ঠিক! ভায়েদের সঙ্গে 'আপনি' বলে সঙ্কোচ সৃষ্টি করো না রত্না! 'তুমি' বলেই কথা কয়ো। লজ্জা কিসের? বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন,—এসো অমি, জিনিষ দেখবে।

অমিয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। এবং রত্নাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল,—তুমিও চলো, রত্না। মা কি আলাদা করে তোমায় ডাকবেন?

সহাস্যে অনিল কহিল,—রত্না তাই ভাবে।

সকলে আসিয়া ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল।

বেয়ারা তখন সদ্যঃ-ক্রীত জিনিষগুলা টেবলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছিল।

একখানা শাড়ী তুলিয়া সপ্রশংস-নেত্রে দেখিতে দেখিতে অমিয় কহিল,—প্রেটি নাইস্ কলার! বেশ দামী। কত পড়লো শুনি!

সগর্ব্বে অনিল কহিল,—একশো পঁচিশ! ভেলভেট্ সিল্ক। বাবার বার্থ-ডেতে রত্নাকে দেওয়া হবে বলে কিনলুম।

—বেশ করেছিস! শাড়ীখানা তোমার কেমন লাগছে রত্না?

সলজ্জ হাস্যে রত্না কহিল,—আপনাদের পছন্দর কাছে—

অনিল বলিল,—কেন, তোমার পছন্দই বা আমাদের উপর যাবে না কেন? আর আপনি বলছো কাকে?

পুলকিত কণ্ঠে রত্না কহিল,—আমার খুব ভালো লেগেছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—আগে এই ছবির বইখানা ভাখো। এইখানা থেকে উর্ব্বশীর নাচের ড্রেস করাতে হবে। অনিল দর্জ্জিকে ফোন করেছো?

—হ্যাঁ। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে এসে পড়বে।

অমিয় কহিল,—রমেশ বাবুকে বাবা চিঠি লিখেছেন?

মা বলিলেন—হ্যাঁ, কাল ওঁকে দিয়ে সে কাজ করিয়েছি; উনি তো তাঁকে আসতে নিমন্ত্রণ করেছেন। মোদ্দা একটা কথা অমি, অনিল গানের স্বরগুলো দিয়ে দিচ্ছে, তুমি সব পার্ট ঠিক করে দেবে।

অমিয় কহিল,—কাকে কোন্ পার্ট দেওয়া হবে, তুমি তো ঠিক করেছো!

—মোটামুটি ঠিক করেছি! তুমি সেটা দেখো। অনিল ইন্দ্র সাজবে। তুমি অর্জ্জুন! উর্ব্বশীর পার্ট দিচ্ছি রত্নাকে। চিত্রলেখা, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা—আমার স্কুলের চারটি মেয়েকে দিয়েছি! বঙ্কু সাজবে ভরত। অলক বরুণ। শচীর পার্টটা ঠিক হচ্ছে না! কাকে দি?

অমিয় কহিল,—সে আমি এক জনকে দেবো। সুশীল চ্যাটার্জ্জির বোন কল্পনা চ্যাটার্জ্জি। বলিয়া রত্নার পানে চাহিয়া অমিয় কহিল,—তোমার সঙ্গে পড়ে না?

কল্পনা নামটা কাণে আসিতে রত্নার মন বিরস হইয়া গেল। সংক্ষেপে সে কহিল,—হ্যাঁ।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কল্পনা মেয়েটি কেমন?

অমিয় কহিল—মন্দ নয়! চলে যাবে! রাণী সাজবার ঝোঁক তার খুব। সার চাটার্জ্জির মেয়ে তো! অনিল, তুমি ভাখোনি কচ-দেবযানীতে সে দেবযানী সেজেছিল?

অনিল কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি! দেখেছি আমি তাকে। নিউ এম্পায়ারে তো? পারবে সে? ভালো কথা মনে পড়েছে—ক'খানা টিকিট পাওয়া গেছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কিসের টিকিট?

—ওই যে 'মন্দির' হবে এম্পায়ারে। সাধনা বোস মধু বোসের দল। চলো না আজ।

বিস্ফারিত নেত্রে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—আমি যাবো 'মন্দির' দেখতে, আর আমার অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর কি ব্যবস্থা হবে? তাছাড়া দর্জ্জি! এই পর্য্যন্ত বলিয়া জ্যেষ্ঠ সন্তানকে তিনি কহিলেন,—তুমি এখনি ফোন্ করো। কল্পনাকে আসতে বলেছো অমি? সুশীলও যেন আসে। এইখানেই সব চা খাবে। বুঝলে!

—দিচ্ছি আমি ফোন্ করে।

—দিচ্ছি নয়। আগে উঠে ফোন্ করো। কি জানি, কোথায় কি নিমন্ত্রণ নিয়ে ফেলবে।

অমিয় আদেশ পালন করিতে উঠিয়া গেল।

বেয়ারা আসিয়া জানাইল, ওস্তাগর।

—আসতে বল্। অনিল তুমি ওকে কাজটা বুঝিয়ে দাও।

বেয়ারার পশ্চাতে বাঙালী মুসলমান দর্জ্জির প্রবেশ। মিসেস্ গোস্বামীকে সেলাম করিয়া সাহেবদের সে অভিবাদন জানাইল।

অনিল কহিল,—কাজটা তোমাকে সাত দিনের মধ্যে দিতে হবে করিম।

—আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিন হুজুর।

—নাচের পোষাক। বেনারসী আর অরগাণ্ডি মিশিয়ে করতে হবে। মানে, তোমরা যেমন করো তেমন নয়, এই বইটা থেকে দেখে করতে হবে। জিনিষটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলিয়া রূপচিত্রের বইখানা অনিল খুলিল।

অমিয় আসিল, কহিল—কল্পনাকে নিয়ে সুশীল বিকেলে তিনটের সময় আসবে। মহা খুশী—তুমি নিমন্ত্রণ করেছো শুনে!

দুই ভাইয়ে এইবার দর্জ্জিকে নাচের পোষাক সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সুরু করিল। মাঝে মাঝে মিসেস্ গোস্বামীও ওস্তাগরকে একটু আধটু বাতলাইয়া দিতে লাগিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—রত্না, তোমার মাপটা করিমকে দাও।

হাতের ফিতা লইয়া ওস্তাগর রত্নার সামনে আসিল। রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। অমিয় অনিল এবং মিসেস্ গোস্বামী রত্নার কোন্খানের মাপটা কেমন হইবে, তাহার আলোচনা করিয়া দর্জ্জিকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

৯

অমলা বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন, রমেশ আসিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন,—ওগো, শুনেছো ?

মুখ তুলিয়া অমলা কহিল,—কি ? হাতে ও কলকাতার চিঠি বুঝি ?

—হ্যাঁ ! রত্নাকে নিয়ে সেখানে হৈ-চৈ পড়ে গেছে একেবারে।

চমকিত কণ্ঠে অমলা কহিল,—কেন ? কি করেছে সে ? মুখ তাঁহার পাংশু।

—হুঃ ! তোমার কেবলি ভয় ! বলি, মেয়ে তোমার ক্ষণ-জন্মা গো ! শাপভ্রষ্টা সরস্বতী !

অমলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল,—কি হয়েছে ?

—চিঠিখানা পড়ে ছাখো, সত্যপ্রসাদ কি লিখেছে ! মেয়ের পরিচয়েই আজ আমাদের পরিচয় !

সে-কথায় সাড়া না দিয়া অমলা কহিল,—খুকী আছে কেমন ? বড়দিনের ছুটীতে যে তাকে আসতে লিখেছিলুম—

রমেশ বিরক্ত হইলেন, কহিলেন,—কেন ? তোমার বড়ি দিতে ? না, ঘুঁটে দিতে ? তাঁহার স্বরে শ্লেষ !

স্বামীর এ কথায় অমলার রাগ হইল। ঝাঁজালো স্বরে তিনি কহিলেন,—দোষ কি ? তার মা যে কাজ করতে পারে, তার তাতে লজ্জা কিসের ?

—খুব—খুব লজ্জা আছে ! মা তো আর মেয়ের মত রূপ-গুণ নিয়ে জন্মায়নি !

—রূপ-গুণ নিয়ে জন্মালে কি করতো শুনি ? যাত্রা ? না, থিয়েটার ? এ কথার প্রচ্ছন্ন খোঁচা রমেশ আমলেই আনিলেন না; উৎসাহের স্বরে কহিলেন,—নিশ্চয় থিয়েটার। রত্না করবেও তাই ! সত্যপ্রসাদ সেই কথাই লিখেছে।

বিমূঢ় স্বরে অমলা কহিলেন,—পাগল হয়েছো না কি তোমরা ! গেরস্ত-ঘরের মেয়ে থিয়েটার করবে কি ?

কৃপা-দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিয়া মৃদু হাস্যে রমেশ কহিলেন,—সাধে বলতে হয়, কূয়োর ব্যাঙ কি সমুদ্দুরের খবর রাখতে পারে !

স্বামীর উপমা শুনিয়া অমলার ভয়ানক রাগ হইল। না হয় মেয়ে দু'পাতা ইংরেজী পড়িয়াছে, পিতৃ-আকৃতির বর্ণ-বর্ণ পাইয়া সুঠাম প্রতিমায় সরস্বতী হইয়াছে ! তাই বলিয়া তিনি গর্ভধারিণী ! প্রতি পদে কথার রূঢ় আঘাতে খর্ব্ব হইয়া শেষে কূয়োর ব্যাঙে পরিণত হইবেন ! কেন ?

বিরস কণ্ঠে অমলা কহিলেন,—সমুদ্দুর তো চোখে দেখিনি কখনো ! তার ডাক শোনবার দরকারই বা কি ! মিছে আপশোষ থেকে যাবে।

পাটীর আসনখানা রোয়াকে পাতিয়া রমেশ উপবেশন করিলেন। কহিলেন,—খালি ঝগড়া করবে ? না, চিঠি শুনবে ? স্বর তাঁহার নরম।

কিন্তু অমলার মনের ক্রোধ তখনও শান্ত হয় নাই। উষ্ণ কণ্ঠেই তিনি কহিলেন,—মুখ্যু মানুষ, তোমার হোমরা-চোমরা মেয়ের চিঠি আমি আর কি শুনবো ! বলিয়া বড়ি-দেওয়া হাতটা পাশের গামলার জলে ধুইতে লাগিলেন।

পত্নীকে তুষ্ট করিবার জন্য রমেশ কহিলেন,—হার মানচি গো ! ফল দেখেই মানুষ গাছ চেনে। তুমি বুদ্ধিমতী না হলে কি আর তোমার মেয়ে এমন বীণাপাণি হতে পারতো ! ঠাট্টা করে আমোদ করে যদি একটা কথা বলে থাকি, তাতে এমন গোঁসা !

এমনি বাক্য-বিন্যাসে স্বামি-স্ত্রীতে সন্ধি হইয়া গেল। পত্নী কহিলেন—সত্যপ্রসাদ বাবু কি লিখেছেন ?

—বাবু নয় ! সাহেব। রত্নার খুব সুখ্যাতি করেছেন। সত্যর জন্মদিনে একটা নাটিকার অভিনয় করাবেন ! রত্নাকে তিনি উর্ব্বশী সাজাতে চান, তাই আমার সম্মতি চেয়েছেন।

—থিয়েটার করবে রত্না ! পাঁচ জনে দেখতে আসবে ?

—তা না তো কি দোরে খিল দিয়ে থিয়েটার করবে ! তোমরা যেমন ছোটবেলায় বউ-বউ খেলতে গো ! তা সে হলো সহর কলকাতা, সেখানে ও-সব বাছ্-বিচার চলে না ! তারা হলো সব সভ্য, শিক্ষিত !

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অমলা কহিলেন,—তারা সভ্য বলে কি বাপ-মা ভাই-বোন—অচেনা পুরুষ বিচার করবে না ? সোমত্ত মেয়েরা সেজে-গুজে নাচবে সকলের চোখের সামনে বাইজীর মত ?

—কি তাতে দোষ শুনি। আমাদের পুরাণে নেই ? বেহুলা যে ইন্দ্রের সভায় নেচেছিল ! তোমার মেয়ে যদি নাচে তো সে তার ভাগ্য বলে জেনো !

অমলা উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—চললে যে !

—ও-দিকে কাজ আছে। এ তো সাহেবের বাড়ী নয় যে বেয়ারা-খানসামা ঘুরছে। গৃহস্থের সংসার ! বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নে আহার সারিয়া রোয়াকে মাদুর পাতিয়া তাকিয়া লইয়া রমেশ বিশ্রাম করিতে বসিলেন। অমলা পাণ-দোক্তা মুখে পুরিয়া কাছে আসিয়া বসিল। সকালে যে চাপা কলহে দু'জনের মন তিক্ত হইয়াছিল, এখন ভোজন-পর্ব্বের পর অবসর-মুহূর্ত্তে তাহার কোন চিহ্নও ছিল না।

রমেশ হাসিতে হাসিতে গোস্বামি-গৃহের সম্পদ-বিভবের অপূর্ব্ব কাহিনী পত্নীর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিলেন। এবং হৃষ্ট চিত্তে রূপকথা শোনার মত মুগ্ধ বিস্ময়ে অমলা সেই বহুবার-শ্রুত প্রত্যেক কথাটি মনে গাঁথিয়া লইতেছিল।

রমেশ কহিলেন—সোজা কথা ! সত্যর এক ছেলে হাকিম, আর এক ছেলে ব্যারিষ্টার—সত্যরই সে জুনিয়ার।

অমলা কহিল,—ভগবান্ যাকে দেন, সবই ভালো দেন। এ তো আমাদের মত হতভাগার অদৃষ্ট নয় !

মাথা চুলকাইয়া রমেশ কহিলেন,—তা বটে ! দেখ না ওরা বামুন, আমরা কায়েত—এ এক মস্ত ব্যবধান ! না হলে—যাক্‌গে, এই তিন আঙুল জমিই সব ! বলিয়া নিজের কপালে হাত দিলেন। কহিলেন,—একটা কথা কি ভাবি, জানো ? বলিয়া চারি পাশে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—ওখানে সব ঘর-আনা ঘরের রুই-কাতলারা আনাগোনা করে ! রত্নাকে সত্য নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসে, যদি তার একটাকে গেঁথে দিতে পারে ! আমার মেয়ের রূপ কেমন—যদি এই পাড়াগাঁয়ে আনি, তাহলে কি আর তা হবে ? তুমি কি বলো?

ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ-গৃহিণী কহিলেন,—তা বটে। তা তোমার সাহেব কি লিখেছে? মেম-সাহেবই বা কি লিখেছেন!

—সেই আমার উর্ব্বশী সাজার দুর্দ্দশার কাহিনী। সত্য স্ত্রীর কাছে সে গল্প করেছে। সে ভয়ানক জিদ ধরেছে, সত্যর জন্মদিনে অর্জ্জুন উর্ব্বশীর অভিনয় হবে—তাতে রত্নাকে সাজতে হবে উর্ব্বশী। ওর ছেলেরাও নামবে! আমাকে ভরত-মুনি সাজতে অনুরোধ করেছে! লিখেছে, ভয় নেই, গুরুজনরা থাকবেন না, দুর্দ্দশার কোনো সম্ভাবনা নেই!

পুরানো দিনের সকল কথা অমলার মনে পড়িল। হাসিয়া সে কহিল—তুমি যাচ্ছো তাহলে?

—না। ইচ্ছা ছিল, যাই। কিন্তু ঘটে উঠবে না। ইস্কুল ইনস্পেকসনে আসবে, খবর এসেছে। যাই কি করে?

হাসিতে হাসিতে অমলা কহিল—ভরত-মুনি সাজলে দেখাতো ভালো—দাড়ি-চুল তো কিছু কম নেই!

—হাঁা গো হাঁা, ঠাট্টা! আমি যদি নামতুম, দেখতুম, তুমিই সত্যকারের মুনি ভেবে পায়ের গোড়ায় টিপ্‌ করে পেন্নাম করতে!

—না হয় এখনই পেন্নাম করছি। সে দুঃখ আর থাকে কেন!

রমেশ হাসিয়া কহিল—তোমাদের শুধু পায়ের ধূলো নিয়ে পাদোদক খেয়ে ভক্তি করা। কিন্তু ওরা জানে, যাকে ভালোবাসি, তাকে কি করে আনন্দ দিতে হয়। সত্যি লেখাপড়া না শিখলে মানুষ ভালোবাসতে পারে না।

অমলার প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল। নীরস কণ্ঠে কহিল,—তাদের ভালোবাসা তারাই বোঝে! আমরা তেমন শিক্ষা-দীক্ষা পাইনি—আর আমাদের স্বামী দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করে আনলো না তো! অল্প যা আনে, তাতে দিন-গুজরান করতেই আমাদের দিন কাটে, এতেই আমরা সুখী! এই পর্য্যন্ত বলিয়া অমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর কহিল,—সুখ কিছুতেই নেই গো, সুখ মানুষের মনে। যাই, দেখিগে বড়িগুলো।

পত্নী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। রমেশ তাকিয়াতে হেলান দিয়া গায়ের কাপড়খানা ভালো করিয়া গায়ে টানিয়া দিয়া চক্ষু মুদিলেন—নিদ্রার চেষ্টায়।

১০

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। পল্লীবধূর শঙ্খরোল কুয়াশা-ভরা আকাশকে চঞ্চল করিয়া থামিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা সরিয়া গেলেও পিছনে চাঁদের আলো নাই,—নিবিড় অন্ধকার।

গায়ের র‍্যাপারখানা মুড়ি দিতে দিতে রমেশ কহিল,—একবার হরিশের ওখানে যাচ্ছি বড়-বৌ।

ঠাকুর-ঘর হইতে অমলা কহিল,—কেন, সকালে গেলে হতো না? যে রকম ঠাণ্ডা পড়েছে।

—না, বেশ করে মুড়ি দিয়েছি। এই কাণ-ঢাকা টুপি কিনলুম কেন? ঘুরে এখুনি আসছি। বলিয়াই রমেশ ভ্রাতৃ-উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া হরিশ ছেলে-মেয়েদের পড়াইতে বসিয়াছিল। অকস্মাৎ জ্যেষ্ঠের কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া ব্যস্ত স্বরে উত্তর দিলেন—কে? দাদা!

রমেশ উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছিল,—হরিশ ওপরে না কি?

হরিশ ত্রস্তে বারান্দায় বাহির হইলেন। কহিলেন—এখনি নীচে যাচ্ছি!

—না, না, আসতে হবে না, আমিই উপরে যাচ্ছি। বলিয়া রমেশ উঠিয়া আসিলেন।

মণি তখন এ্যালজেবরা খুলিয়া অঙ্ক কষিতেছিল। জ্যেঠতাতকে দেখিয়া অঙ্ক ভুলিয়া অবাক হইয়া চাহিল।

রমেশ কহিল,—আঁক কষছিস্! দ্যাখো হরিশ, রত্নাকে সন্ধ্যেবেলা বসে পড়াতুম—তাই এ সময়টা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। ভাবি, এখানে আসি,—এদের একটু—

হরিশ যেন বর্ত্তাইয়া গেছে এমনি আগ্রহে কহিল,—তোমায় কষ্ট করে আসবার দরকার কি দাদা! এরাই তোমার ওখানে যাবে!

মণি কহিল,—জ্যাঠামণি, তুমি তো রত্নাদিকে পড়াতে, তাই সে কুড়ি টাকা করে—

—হাঁা মা, তবে রত্নার কথা আলাদা!

হরিশ কহিল,—নিশ্চয়! রত্নার সঙ্গে কার তুলনা হয়?

রমেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধ করি এমনি একটা প্রসঙ্গের অবতারণাই তিনি চাহিতেছিলেন। উৎসাহিত কণ্ঠে কহিলেন,—কিছু মিথ্যে বলিস্‌নে ভাই! এই কলেজেই দেখ্‌ না, প্রিন্সিপাল কি রকম ওকে ভালোবাসে! আরো কত মেয়ে তো রয়েছে!

বিস্মিত স্বরে হরিশ কহিল,—তাই না কি! আহা, দাদা, ও যদি তোমার ছেলে হয়ে জন্মাতো, তাহলে আমাদের বংশের একটা নাম রাখতো।

রমেশ অন্তরে ঈষৎ আহত হইলেন। তাচ্ছল্য স্বরে কহিলেন,—ছেলে-মেয়ের তফাৎ আমি মানি না! এই তফাৎ-বোধে কত ক্ষতি হয়, জানো?

অগ্রজের মনের দুর্ব্বলতা কোন্‌খানে—হরিশ তাহা ভালো করিয়াই জানেন। তাই সে তর্ক ছাড়িয়া নিরীহের মত কহিলেন,—সে তো নিশ্চয় দাদা, আমাদের সমাজের ওই একটা মস্ত দোষ! গোড়া থেকেই ছেলে-মেয়েতে তফাৎ করে।

রমেশ কহিলেন,—তাই তো আমি তোমার বৌদির ঘ্যানঘ্যানানি কাণে না তুলে ওকে কলেজে পড়তে পাঠালুম! কলকাতার সমাজে তাকে নিয়ে কি রকম হুলস্থুল পড়ে গেছে আজ।

বিমূঢ় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হরিশ অগ্রজের পানে চাহিল।

রমেশ বলিয়া চলিলেন,—এখন হাইকোর্টে সব চেয়ে বড় ব্যারিষ্টার হচ্ছেন গোস্বামী-সাহেব।

হরিশ কহিল,—সুকুমারী পিসির ছেলে না?

মাথা নাড়িয়া রমেশ কহিলেন,—হাঁা! আমার সঙ্গে কি ভাবটাই তার ছিল! তাই তো সত্যপ্রসাদকে রত্নার গার্জ্জেন করে এসেছি।

অবাক হইয়া হরিশ কহিল,—এ্যা, তিনি তোমায় চিন্‌তে পারলেন?

—পারবে না? বলে, বল্টু বলতে সে অজ্ঞান! রত্নাকে কি রকম ভালোবাসে। ওর স্ত্রী তাকে নিজের মেয়ের মতই দেখেন! আমার সঙ্গেই ছিল ছোট-বেলার সত্যপ্রসাদের সব কিছু গল্প,—ভাবটা আমাদের কম ছিল না তো।

হরিশ হাঁ করিয়া রত্নার প্রসঙ্গ গিলিতে ছিল। প্রত্যেকটি শব্দ-বর্ণ—সমস্ত যেন মনের মধ্যে গাঁথিয়া লইতেছিল। রমেশ থামিতে সে কহিল,—এত দিন বলতে হয় দাদা, তা হলে আফিসের লোকের কাছে গল্প করতুম। এত বড় কৌঁশুলী আমার দাদার ফাষ্ট ফ্রেণ্ড—আমার ভাইঝী তাঁর পুষ্যি-মেয়ের মত মানুষ হচ্ছে।

—নিশ্চয়! পুষ্যি মেয়ে ছাড়া আর কি বলতে পারা যায়! ত্তাখো না, সত্য চিঠি লিখেছে—তার জন্মদিনে অর্জ্জুন-উর্ব্বশী প্লে হবে—রত্নাকে উর্ব্বশী সাজতেই হবে। ওঁর ছেলেরাও নামবে। এক ছেলে আই, সি, এস; বুঝলে রমেশ,—আর এক ছেলে ব্যারিষ্টার।

মাথা নাড়িয়া হরিশ কহিল,—একেই বলে ভাগ্য, দাদা! রত্না ভুল করে আমাদের ঘরে জন্মেছে—সে ওর চেহারাতেই মালুম,—তার পর বিদ্যাবুদ্ধি!

কথাটা রমেশের মনঃপূত হইল না! মুখের চেহারাতেই তাহা বুঝা গেল! কহিলেন,—না হরিশ, ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে জানা চাই।

—সে তো ঠিক কথা! হাত চাই, হাতিয়ারও চাই। হাঁ দাদা, ছুটিতে তা হলে রত্না এখানে আসবে না?

রমেশ কহিলেন,—না। কি করে আসবে? সত্যর বার্থ-ডে পড়ছে! আমাকেও যাবার জন্য সত্য নিমন্ত্রণ করেছে!

—তোমাকেও নিমন্ত্রণ করেছে! তা দেখ দাদা, তুমি যদি যাও, এ-সব ধুতি-পাঞ্জাবী পরে যেয়ো না।

—রামচন্দ্র! তারা একদম সাহেব—বাড়ীতে ঢুকলে বোঝে কার সাধ্যি যে বাঙালীর বাড়ী, কি ইংরেজের বাড়ী!—কিন্তু সত্যর আসল মেজাজটা দেখলুম একটুও বদলায়নি।

সে কথায় কাণ না দিয়া হরিশ কহিলেন,—ওখানে আলাপ রাখতে গেলে এক-প্রস্থ স্যুটের দরকার।—তা আমায় টাকা দিলে আপিসের ফেরৎ চাঁদনীর চক্ হতে সস্তা দেখে তোমার কোট-প্যাণ্ট-সার্ট সব আনবো।

সঙ্কুচিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—কিন্তু এটা শীতকাল—গরম স্যুট চাই তাহলে। আবার ওভার-কোট। আমি আবার ছাই টাই বাঁধতে জানি না যে!

—ও সব কিছু ভাবনা নেই। বাঁধা টাই পর্য্যন্ত চাঁদনীর বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের আপিসে সব দেখি তো, পরে আসচে! আমি সব কিনে আনবো ঠিক!

—হাঁ, সে জানি, হরিশ! কিনতে যদি হয় তুমিই ভালো পারবে। আমার আবার রুমাল থেকে পায়ের সু অবধি চাই কি-না— টাকা কিছু বেশী পড়বে। মেয়েটার জন্য অত খরচ—তাছাড়া আমার আয় তো তোমার অবিদিত নয়!

হরিশ মাথা চুলকাইয়া কহিলেন,—কিন্তু আয়ের হিসেব দেখে সব সময় ব্যয় করা চলে না দাদা। মাঝে মাঝে চোখ-কাণ বুজে কিছু দমকা খরচ করতে হয় বই কি! না হলে বড়লোকের সঙ্গে ভাব রাখা যায় না!

মাথা নাড়িয়া সমর্থনের সুরে রমেশ কহিলেন,—যুক্তিটা ঠিক! আর ওরা যেমন করে চিঠি লিখেছে—চিঠিখানা যে ফেলে এলুম, ছাই!

মণি নীরবে পিতার এবং জ্যেষ্ঠতাতের কথা শুনিতেছিল। সাগ্রহে কহিল,—যাবো জ্যাঠামণি? চিঠিখানা আনবো?

—যাবি?—তা যা! আচ্ছা, রোস্, দেখি বুক-পকেটটা! বলিয়া সযত্নে রক্ষিত পত্রখানা পকেটের মধ্যে হাত দিয়া অনুভব করিয়া কহিলেন,—না রে, চিঠিখানা এই যে রয়েছে। তোকে আর যেতে হবে না! বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

চিঠিখানা যে হরিশের দু'টি চক্ষুকে সার্থক করিয়া দিবার জন্ম তিনি আনিয়া ছিলেন, হরিশ তাহা বুঝিতে পারিলেও রমেশের এ ছলনাটুকু মণির চোখে ধরা পড়িল না। আগ্রহ-সহকারে সে কহিল,— দেখি, অত-বড় ব্যারিষ্টারের হাতের লেখা!

রমেশের হাত হইতে হরিশ চিঠি লইয়া খুলিবামাত্র পিতাপুত্রে একসঙ্গেই হারিকেনের আলোর সামনে আনত হইলেন।

মণি কহিল,—এঁ্যা, এমনি হাতের লেখা! আজ সকালেই বিশ্রী হাতের লেখার জন্ম মণি বাপের কাছে ধমক খাইয়াছিল।

আক্ষেপের সুরে হরিশ কহিল,—বড় হওয়া কপাল! আমরা ছোটবেলা হাতের লেখা ভালো করবার জন্ম কি বকুনিই খেতুম—তাই মরছি কেরাণীগিরি করে—

রমেশ কহিলেন,—সে যুগ গেছে রে ভাই,—চিঠিখানা চেঁচিয়ে পড়তো, সবাই শুনি! আচ্ছা, আমিই পড়ছি। ও হাতের লেখা তুই ভাল পড়তে পারবি না! বলিয়া রমেশ বহুবার-পড়া চিঠি আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

প্রিয় সুহৃদ্

রত্না-মার এই ছেলের জন্মদিনে উর্ব্বশী-নাটক অভিনয় হবে, মিসেস্ গোস্বামীর বিশেষ ইচ্ছা, রত্না সাজবে উর্ব্বশী। আমিও তাহলে খুব আনন্দিত হই। অপেক্ষা শুধু তোমার অনুমতির, আর সেই প্রতীক্ষাতেই রইলুম! আর আমার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ পত্রযোগে তোমায় জানাচ্ছি। বন্ধু, এসো, ভারী খুশী হবো। সে দিন তোমার উর্ব্বশী সাজার দুর্দ্দশার গল্প এঁদের কাছে করেছিলুম। হাসির তোড়ে আমার ড্রইং-রুমে শিলিংগুলো অবধি কেঁপে উঠেছিল। মিসেস্ গোস্বামী তোমাকে ভরতমুনি আর আমাকে নারদ ঋষি সাজাবেন, বলছেন। ওঁর হাতে পড়ে আমাকে বেহাল না হতে হয়। বন্ধু তুমি সহায় হতে এসো। হরিপদ গাঙ্গুলীর খোঁজ নিয়ো। সুরেন অধিকারীকে তো আর পাবো না।

আশা করি, তোমার সব ভাল। আমারও সমস্ত কুশল। ইতি

তোমার

এস, পি।

তাহারই নীচে ছোট অক্ষরে লেখা মিসেস্ গোস্বামীর লেখা কয়েক ছত্র।

হাসিতে হাসিতে রমেশ কহিলেন,—শোনো, তার স্ত্রী কি লিখেছে। বলিয়া পড়িলেন,—

"গুরুজনরা থাকিবেন না! নির্ভয়ে বন্ধু-যুগলে অভিনয় করিয়া আমাদের নয়ন-মন সার্থক করুন। সত্বর আসুন।"

হরিশ কহিল,—এরা তোমায় যেমন খাতির করে দাদা, তেমনি ভালোও বাসে। একটা কথা বলো তো—

সহর্ষ কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—বল্ না, কি কথা!

—ইনসিওর কোম্পানীর একটা বড় চাকরী খালি আছে। শুনেছি, উনি বললেই হয়। বেশ মোটা মাহিনা। যদি—

সবটা শুনিবার প্রয়োজন হইল না। রমেশ কহিলেন,—নিশ্চয়

বলবো, না হয় রত্নাকে দিয়ে জেদ করিয়ে তোকে দেওয়াবোই ও চাকরি। আমি কথা দিচ্ছি তোকে !

১১

গভীর রাত্রে অমলা স্বপ্নের ঘোরে কাঁদিয়া উঠিল। রমেশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পত্নীকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিলেন, কহিলেন,—ও বড়-বৌ, কি স্বপ্ন দেখছিলে ? চোর এসেছে ?

—এঁ্যা ! বলিয়া অমলা চোখ চাহিল। রমেশ গায়ে হাত দিয়া কহিল,—ইস্, ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে ! ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে যা এঁটে ঘরের ছ্যাঁদা অবধি বুজিয়ে শোয়া—জানলা খুলে দিই—ঘরটা ঠাণ্ডা হোক। বলি, কি স্বপ্ন দেখছিলে ?

—খারাপ স্বপ্ন।

হাসিয়া রমেশ কহিলেন,—কি ? আমি মরে গেছি ?

—কি কথার ছিরি !

—তবে ? আমি আর একটা বিয়ে করেছি ?

—করে থাকো, করেছো। তাতে আমার কি !

—আঃ, বলো না, তবে কি ? ও, বুঝেছি, লজ্জা হচ্ছে ! সত্যর হাত ধরে তুমি চলে যাচ্ছ—আর তোমার বুকের মধ্যে বসে সতী-নারী অঝোরে কাঁদছে !

অমলা ফুঁসিয়া উঠিল—মরি মরি, কি কল্পনা ! নিজে যেমন বন্ধুর ঐশ্বর্য্য-বিভব দেখে মুগ্ধ, ভাবো সকলেই তেমনি !

—অয়ি সুলোচনে, অর্থের মোহিনী-শক্তি মাদকতা তুমি জানো না—তাই তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছো, কিন্তু সে মহা-বস্তু !

—হয়েছে গো হয়েছে। দেখ, রত্নাকে তুমি থিয়েটার করতে দিয়ো না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমেশ কহিলেন,—কেন ?

—আমি বড্ড বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।

গম্ভীর কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—কি স্বপ্ন ? মুখে তাঁহার বিরক্তির চিহ্ন।

মিনতির স্বরে অমলা কহিল,—দেখ, যত মুখ্যুই হই, আমি তার মা। আমার চেয়ে তার মঙ্গল-চিন্তা আর কারু বড় হতে পারে না !

বাধা দিয়া রমেশ কহিলেন,—আমি তার বাপ বড়-বৌ। শুধু বাপ বললেই কথা বলা হলো না। জগতে আমার যা কিছু—আমার মরা-বাঁচা—সব ওই রত্নার উপর নির্ভর করছে ! আর বড়-বৌ, আমার মত রত্নাকে তুমি পারো ভালোবাসতে ?

—না, সে কথা আমি বলিনি ! আমি স্বপ্ন দেখছিলুম—

তাচ্ছল্যের ভবে রমেশ কহিলেন,—স্বপ্ন চিরকালই মিথ্যা হয়। তাই লোকে বলে, যা বাস্তব নয়, তাই স্বপ্ন ! আচ্ছা বলো, তবু কি স্বপ্ন, শুনি।

—বলছি। দেখ, স্বপ্ন দেখলুম, রত্না থিয়েটার করছে—কি চমৎকার তার পোষাক—তেমন পোষাক স্বর্গের মেয়েরাই পরে ! কি সুন্দর সে নাচছে—কত লোকে তাকে ঘিরে রেখেছে—সে কি বাহবা পাচ্ছে—সকলে অজস্র ফুল দিচ্ছে, মালা দিচ্ছে, তোড়া দিচ্ছে—

সাগ্রহে রমেশ কহিলেন,—তার পর ?

অশ্রুসিক্ত স্বরে অমলা কহিল,—কে বলবে, সে আমার মেয়ে ! তারা সকলে রত্নাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি রত্নাকে কত ডাকচি—কিন্তু সে এমন মাতোয়ারা যে আমার ডাক শুনতেই পাচ্ছে না !

হাসিয়া রমেশ কহিলেন,—এ তো আনন্দের স্বপ্ন !

—আনন্দ কি গো ? স্বপ্নে মা ছেড়ে চলে-যাওয়া খারাপ !

রমেশ কহিলেন,—তার চেয়ে বলো তোমার মাথা খারাপ। এটুকু বুঝতে পারলে না বড়-বৌ, রত্না তোমার গর্ভে জন্মালেও সে এসেছে অপ্সরা-লোক থেকে। আমার মুখে গল্প শোনোনি, নূরজাহান মরুভূমিতে জন্মালেও শেষে হয়েছিলেন ভারত-সম্রাজ্ঞী ! তোমার এই মেয়েও তাই ! না হলে সত্য তাকে এত স্নেহ করবে কেন ?

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অমলা কহিলেন,—তাই—

কথা শেষ হইল না।

মাথার দিকে নিম-গাছে একটা পেচক হঠাৎ কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

মাটি ও ফুল

দেহ চায় দেহ হ'তে উৎসারিতে প্রেমের কমল
সম্ভোগের রূপে-রসে দিতে চায় স্থান ;
প্রেম চায় বন্ধ হোক্ অবারিত গতি
দেহ হতে দেহাতীতে অনন্ত প্রয়াণ !
তনু চায় আভরণে সাজাতে নিজেরে
অপরূপ আবরণে আবরিতে লাজ ;
প্রেম চায় খুলে দিতে সর্ব্ব-আভরণ,
আছাড়ি ভাঙ্গিতে চায় ভূষণের সাজ।
দেহ চায় বাহু দিয়ে বাঁধিতে প্রেমেরে
দেহের অতলে তারে রাখিতে লুকায়ে,—
প্রেম চায় প্রতি-বারে প্রতিটি পরশে
প্রতিটি চুম্বনে তারে ফেলিতে চুকায়ে !

মাটি চায় আকাশেরে ধরিয়া রাখিতে
বাঁধিবারে আপনার সীমারেখা-মাঝে ;
অনন্ত অসীম ঊর্দ্ধ হেসে কয় তারে—
কোথায় আকাশ ? আজো খুঁজে পেলি না যে !
ফুল চায় গন্ধটুকু রাখিতে ধরিয়া
চিরকাল আপনার বুকের কোরকে ;
গন্ধ চায় দ্বার খুলি বাহিরে আসিয়া
আনন্দে পাইতে ছাড়া মুক্তির আলোকে !
যে কমল ফুটে ওঠে পঙ্কতল হতে
ধরণীর মাটি তারে পিছে হতে টানে ;
মূল রাখি মৃত্তিকায় ফুল ফোটে দূরে—
পঙ্ক শুধু বৃথা কাঁদে গন্ধের সন্ধানে !

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়।

সংসার-খরচ

অনেক সংসারে দেখি, স্বামি-স্ত্রীতে মনের সম্পর্ক বেশ প্রীতিমধুর হলেও পয়সা-কড়ির ব্যাপারে স্বামী একেবারে সরকারী-অডিটরের মত কঠিন রুক্ষ! স্ত্রীর উপর সংসার-পরিচালনার ভার, অথচ পাঁচ পয়সার জায়গায় সাত পয়সার মশলা খরচ হলে স্বামীর কৈফিয়ৎ-তলবে স্ত্রীর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ঘটে! আমরা এমন পরিবারের কথা জানি—শিক্ষিত এবং কালচার্ড পরিবার—সংসারে চাল-ডাল নুণ-তেলের বাইরে পোষাকী খরচপত্রের বেলায় স্ত্রীকে স্বামীর কাছে হাত পেতে পয়সার প্রত্যাশী হয়ে দাঁড়াতে হয়! স্বামী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, অথচ এ সব পোষাকী খরচের বেলায় লক্ষ জেরায় স্ত্রীকে জর্জ্জরিত করে' তবে স্বামী তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করেন। কখনো বা এ খরচের জন্য স্ত্রী যদি পঞ্চাশ টাকা চান তো জেরায় পরাস্ত করে স্ত্রীর হাতে স্বামী দেন চল্লিশটি টাকা! এ যেন কৌন্সিলের সেই (cut-motion) 'কাট্-মোশন্'!

সে দিন আমাদের পরিচিতা এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলা সখেদে বলছিলেন, স্বামী খরচ-পত্রের টাকা তাঁর হাতে নিঃসঙ্কোচে নিঃসংশয়ে তুলে দেন, কিন্তু হিসাবের খাতাখানি দেখেন নিত্যদিন সন্ধ্যার পর—অফিসের বড় সাহেব এ্যাকাউন্টান্টের হিসাব যে ভাবে পরীক্ষা করেন, ঠিক তেমনি ভাবে। অথচ উড়নচণ্ডী বলে ঘরে-বাহিরে এ মহিলাটির এতটুকু দুর্নাম নেই!

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, স্বামী তাঁর রোজগারের কড়ির সবটুকু স্ত্রীর হাতে ধরে দেন—তা থেকে স্ত্রী দেন স্বামীর ইনসিওরেন্সের টাকা এবং হাত-খরচার টাকা। স্বামীর যদি অন্য কোন ব্যাপারে টাকার দরকার হয়, তাহলে স্বামী এসে স্ত্রীর কাছে সে-টাকা চেয়ে নেন। বাজে খরচ মনে হলে স্ত্রী টাকা দেন না! এ সংসারে টাকা-কড়ির অনটন যেমন ঘটে না, তেমনি সংসারে শৃঙ্খলা এবং শান্তিও সুরক্ষিত থাকে। দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ার দরুণ বহু উড়নচণ্ডী স্ত্রীর উড়নচণ্ডী-ব্যাধি সেরেছে এবং সংসারে তাঁরা শৃঙ্খলা স্থাপিত করতে পেরেছেন বলে আমরা জানি!

মাসিক বসুমতীতে 'এই পৃথিবী' উপন্যাসে পড়ছিলুম, ভাটিয়া শাড়ীওয়ালাদের কাছ থেকে মাস-কিস্তীর বন্দোবস্তে দামী পোষাকী শাড়ী কেনার কথা। এ নীতি অবলম্বন করে অনেকে তাল রাখতে পারেন না—ঋণভারে জড়িয়ে পড়ে সংসারে দুঃখ-কষ্ট অশান্তির সৃষ্টি করেন। এ বন্দোবস্তে দু'-একখানা শাড়ী কিনতে চান, কিনুন—কিন্তু গৃহস্থের আয়-ব্যয়ের দিকে নজর রেখে কিনবেন। এ পথে যদি তাল সামলাতে পারেন, তবেই মঙ্গল। নচেৎ ধারে হাতী কিনে আত্মঘাতী হওয়া কোনো মতে বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। আয় বুঝে ব্যয় করা চাই। যে সংসারে আয় হয়তো একশো টাকা,—সে সংসারের গৃহিণী যদি একশো টাকা দামের শাড়ী কিনতে চান—তা সে মাসিক কিস্তীতে হোক বা অন্য উপায়েই হোক্—তাহলে তাঁর সে খেয়ালকে কোনো দিক্ দিয়ে সমর্থন করা চলে না। তাঁরা হয়তো বলবেন, দামী শাড়ী চাই! না হলে সমাজে মর্য্যাদা থাকবে না! কিন্তু ধার-করা টাকায় শাড়ী-গয়না মিললেও তাতে মর্য্যাদা মিলতে পারে না, শান্তি বা স্বস্তিও দেশ-ছাড়া হয়। সংসারের আয় ও দায় দেখে তবে শাড়ী-গহনার ব্যবস্থা! না হলে পেটে খেতে অন্ন জুটছে না, ও-দিকে জর্জ্জেট শাড়ীর বাহার—লোকে তাতে হাসে! ঘৃণা করে!

কিন্তু এক কথা থেকে অন্য কথায় এসে পড়ছি। যা বলছিলুম মানে, টাকা-পয়সার ব্যাপারে স্বামি-স্ত্রীর অধিকারের কথা। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ধরা-বাঁধা বিধি-নিয়ম চলে না। তবে মোটামুটি বলতে পারি, স্বামী এবং স্ত্রী সংসারের মালিক! সংসারের সব দায়িত্বই দু'জনের উপরে ন্যস্ত! জীবনে দু'জনের লক্ষ্য এক। কাজেই আয় বুঝে দু'জনে একযোগে ব্যয়ের ব্যবস্থা করবেন। স্বামীর আছে সিগারেটের নেশা, স্ত্রীর আছে সিনেমা দেখার নেশা! ছেলেরা চায় ফুটবল-ম্যাচ দেখতে, মেয়েরা চায় গান-বাজনা শিখতে। অর্থাৎ চার তরফা সৌখীন খরচ! অথচ সকলের সখ মেটাবার সংসারের আয়ের পরিমাণ হয়তো অনুকূল নয়! এক্ষেত্রে রফা করতে হবে। সকলে 'দশ-ভুজা' হয়ে সখের পিছনে পয়সা খরচ করলে চলবে কেন? হাতে কিছু সঞ্চয় সব সময়ে রাখা প্রয়োজন। সঞ্চয়ের সে পয়সা একেবারে আলাদা করে শীল-প্যাকেটে মুড়ে রাখুন। তার পর সকলের স্বার্থে কিছু-কিছু কাটকুট করে সখ মেটাবার উপায় করুন! মানুষ 'মেশিন্' নয়! শুধু খাওয়া-দাওয়া আর কর্ত্তব্য সাধন করে মানুষ বাঁচতে পারে না—তাতে জীবনে মরচে ধরে। সখ্ চাই,—তবে আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে!

সে জন্য সব দিক্ দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে আমাদের মনে হয়, রোজগার করে রোজগারের টাকা স্বামী এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেই ভালো হয়। কারণ, মেয়েরা স্বভাবতঃ বুঝে-সুঝে সংসার-চালনায় নিপুণ। দু'-এক জন লক্ষ্মীছাড়া উড়নচণ্ডী আছেন মানি, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হবে অন্যরকম। মেয়েদের হাতে টাকা-কড়ির ভার থাকলে খরচে তাঁরা সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারবেন। কর্ত্তার আয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে মেয়ে-জাতের হাত ব্যয়-সম্বন্ধে দরাজ হয়। সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে মেয়েরা যেমন বুঝে-সুঝে সংসার চালনা করতে পারবেন, এমন আর কেউ নয়। পুরুষ-মানুষ রোজগার করতে পারে, কিন্তু রোজগারের টাকায় গুছিয়ে সংসার চালানো পুরুষের ধাতে পোষায় না।

এই সঙ্গে আর একটি কথা না বললে আমাদের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

স্বামী রোজগার করে রোজগারের টাকা এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন—স্ত্রী সে টাকা খরচ করছেন সংসারে সকলের সুবিধা-কল্পে—এ খুব ভালো কথা! কিন্তু ধরুন, সংসারে আছেন স্বামীর বিধবা মা, স্বামীর ভাই-বোন—তাঁরা নির্ভর করছেন ঐ স্বামীর উপর! এ ক্ষেত্রে বহু সংসারে দেখি, স্ত্রী শুধু স্বামীর এবং ছেলেমেয়েদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই লক্ষ্য রাখেন—শাশুড়ী এবং ননদ-দ্যাওর যেন গলগ্রহ! যে-বাড়ীর গৃহিণীর মনোভাব এমন, সে গৃহের কর্ত্তা স্ত্রীর হাতে যথাসর্ব্বস্ব তুলে দিলে সংসার হবে অভিশাপ-গ্রস্ত। বিধবা মা দ্বাদশীর দিনে একটা ডাব পাচ্ছেন না, অথচ গৃহিণী তাঁর স্বামি-পুত্রের জন্য কেক্-বিস্কুটের ডালিতে ঘর ভরিয়ে রেখেছেন। আপাততঃ আরাম ভোগ করলেও এমন সংসারে ছেলেমেয়ের মন উদার ভাবে গড়ে উঠতে পারে না! বিধবা শাশুড়ীকে যে স্ত্রীলোক অগ্রাহ্য করেন,

জাওর-ননদকে দূর-ছাই করেন, সে-স্ত্রীলোক সংসারের দায়িত্ব নেবার যোগ্য নন! এমন স্ত্রীলোকের হীন-মনের প্রভাবে মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়—সংসার উৎসন্ন যায়। অতএব এমন সংসারে কর্ত্তাকে ধরতে হবে সংসার-তরণীর হাল, নাহলে বানপ্রস্থ নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

——

রূপ-সাধনা

দিনে দিনে আমাদের দেশের মেয়েরা যে রূপ-লাবণ্যে বঞ্চিত হইতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! অল্প বয়সেই রক্তহীন বিবর্ণ মুখ! গায়ের চামড়ার মসৃণতা বা দীপ্তি নাই! মুখে ও গায়ে আঁচিল! গলার নীচে ভাঁজ পড়িতেছে,—ঘাড় ও গলা যেন কাঠের মত! চোখের কোণে কালি! মুখে কেমন নিস্পৃহ অনাসক্ত ভাব—কোনো মতে যেন বাঁচিয়া থাকা! দুঃখ-দারিদ্র্য বা দুশ্চিন্তাই ইহার একমাত্র কারণ হইতে পারে না। দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-দুশ্চিন্তা চির-যুগ সংসারে আছে, তবু বিশ বৎসর পূর্ব্বে সংসারের লক্ষ্মীরা লাবণ্য-দীপ্তিতে এতখানি বঞ্চিতা হন নাই তো!

বৈশাখ মাসের মাসিক বসুমতীতে বলিয়াছি, প্রকৃতির বিধি-নিয়ম যদি মানিয়া চলেন, তাহা হইলে রূপ-লাবণ্য হইতে মেয়েদের বঞ্চিত হইবার কথা নয়! আহারে-বিহারে অনিয়ম; স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔদাস্য; এবং সভ্যতা রাখিতে গিয়া কৃত্রিম আচার-ব্যবহারের দাস্য—এ কয়টি যেন রূপ-লাবণ্যের যম! তেলে-জলে শরীর বলিয়া যে-কথা এ দেশে চলিত আছে, সে কথা না মানিয়া চলিবার ফলেই মেয়েদের আজ এতখানি দুর্ভোগ! যন্ত্রে তেল দিলে যন্ত্র যেমন স্বচ্ছন্দ-সক্রিয় এবং মসৃণ-উজ্জ্বল থাকে, দেহ-যন্ত্রেও তেমনি তৈল-দানের প্রয়োজন। আজ সেই তৈল-দানের কথা বলিতেছি।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে skin of velvety smoothness. আমাদের দেশের কথা—নবনীত জিনি তনু। এ কথার অর্থ, কোমল মসৃণ তনু—হাড়ের মালার উপর রং-করা চামড়ার আচ্ছাদন মাত্র নয়! এই নবনী-কোমল তনু কি করিলে পাওয়া যায়? চামড়ায় কোঁচ পড়িবে না—গায়ের বর্ণে কালির ছোপ লাগিবে না—সংসারের কাজকর্ম্ম, লেখাপড়া, রোদে-জলে ঘোরা,—এ যুগে এ সব উপসর্গ মেয়েদের আষ্টে-পৃষ্ঠে ধরিয়াছে—এ-দিক্ বজায় রাখিয়া লাবণ্য-দীপ্তি ও কোমলতা কি করিয়া রক্ষা করা যায়?

কাজ-কর্ম্ম করিতেই হইবে। আলস্যে স্বাস্থ্য-হানি এবং তার ফলে রূপশ্রীর বিসর্জ্জন—এ-কথা ভালো করিয়া মনে রাখিবেন।

১। ঠোঁট থেকে রগ

২। চিবুক পর্য্যন্ত

৩। ডান কাণ থেকে

৪। ঘাড়ের দু'দিক্

৫। চিবুকের নীচে

৬। কপালে

সে-কালে সকালে তেল মাখিয়া স্নান—স্নানের সময় ভিজা গামছা গায়ে ঘষিয়া গাত্র-মর্দ্দন—এ ঘর্ষণে massageএর কাজ হইত।

ঘষিয়া ঘষিয়া গায়ে তেল মাখিবার ফলে গায়ের চামড়াকে মসৃণ কোমল রাখা যায়। আজ-কাল সাবানের রেওয়াজ হইয়াছে। সাবান মাখা দোষের নয়। ঘষিয়া ঘষিয়া গায়ে সাবান মাখিলে তাহাতেও massageএর ফল পাওয়া যায়। শুধু দেখিবেন, বাজে সাবান গায়ে মাখিবেন না। বাজে সাবানে গায়ের তেলা-ভাব উবিয়া যায়, গায়ের চামড়া রুক্ষ শুষ্ক কঠিন হয়! নোংরা জলে স্নান করাও দোষের। আমাদের গায়ের চামড়া যে হাড়-মাসের উপর রমণীয় আচ্ছাদন মাত্র, এ কথা ভাবিবেন না! এই চামড়ার অজস্র লোমকূপ দিয়া আমাদের দেহের মধ্যে অহর্নিশি বাতাস প্রবেশ করিতেছে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্ডো ভিঞ্চির মডেলের সর্বাঙ্গে সোনালি প্রলেপে ঢাকিয়া দিবার ফলে বেচারীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল! হিম, রৌদ্রের তাপ, বৃষ্টির ছাট, ধূলা, ঝড়—এ সবের আক্রমণ হইতে আমাদের গায়ের চামড়াকে সযত্নে রক্ষা করা চাই। কারণ, ও-সবে চামড়ার তেলা মসৃণ ভাব নষ্ট হয়, রূপশ্রী মলিন হয়।

মুখ, হাত, পা, গা সুস্থ ও লাবণ্যদীপ্ত রাখিতে হইলে ক্রীম ব্যবহার করা চাই। বাজে ক্রীম কিনিবেন না। যে ক্রীম বেশ হাল্কা এবং তৈলাক্ত (oily)—গায়ে দিবামাত্র গায়ের তাপে গলিয়া যায়, এমন ক্রীম মাখিবেন। ভালো এবং উপযোগী ক্রীম মাখিলে গায়ের ও মুখের চামড়ার ধূলা-ময়লা মুছিয়া যাইবে। গলা, ঘাড়, হাত, মুখ—সর্ব্ব-অঙ্গে ক্রীম লাগাইয়া মৃদু-ঘর্ষণে ক্রীমটুকু অঙ্গমধ্যে বিলীন করিতে হইবে। তার পর massage বা দলন-মলনের জন্য চাই বিশেষ বিধি-পালন।

এ বিধি পালন করিতে চাই ধীরে ধীরে অঙ্গ চাপড়াইবার জন্য 'প্যাটার'। ছবি দেখুন। গোল করিয়া একটু রবার কাটিয়া একটি হ্যাণ্ডেলে আঁটিয়া লইবেন। তাহারি নাম প্যাটার।

প্যাটার কি ভাবে ব্যবহার করিবেন, সে কথা জানিবার আগে আর একটা কথা বলি। আমাদের চামড়ার ঠিক নীচেই দেহ-মধ্যে আছে জালের মত বিছানো অসংখ্য রক্ত-থলি (blood vessels)। অঙ্গে প্যাটার দিয়া মৃদু ভাবে নিয়মানুগ আঘাত করিলে সেই থলিসমূহের রক্ত চপল স্রোতে দেহমধ্যে তরঙ্গায়িত হইবে—দেহের কোনো স্থানই রক্ত-প্রবাহ হইতে বঞ্চিত থাকিবে না। যে অঙ্গে রক্ত-স্রোত পৌঁছায় না, সে অঙ্গ জড়বৎ অলস হইয়া থাকে এবং তার ফলে হয় বাত, পক্ষাঘাত এবং এমনি বহু ব্যাধি। সুতরাং রক্ত-চলাচল-ক্রিয়া কোনো দিক্ দিয়া ব্যাহত না হয়, তাহার জন্য চাই পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যায়াম।

ট্যাপার ভিন্ন এ ব্যায়াম অন্য উপায়ে চলিবে না, তা নয়! আঙুল টিপিয়াও ট্যাপারের অনুরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

১। প্রথমে রগের কাছে আঙুল টিপিয়া ট্যাপার দিয়া ঠোঁটের পাশ দিয়া রগ পর্য্যন্ত মৃদু আঘাত করুন। চক্রাকারে এ আঘাত সম্পাদন করিতে হইবে—ডান দিক্ ও বাঁ দিক্—পর্য্যায়ক্রমে সারিয়া লইবেন। (১নং ছবি)

২। তার পর ২নং ছবির ভঙ্গীতে ঠোঁট হইতে চিবুক পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশে ট্যাপারের মৃদু আঘাত—মুখের দুই দিকে পর্য্যায়ক্রমে আঘাত করা চাই।

৩। এবার ৩নং ছবির ভঙ্গীতে ডান কাণের পাশ হইতে ও-দিকে বাঁ কাণের নীচে পর্য্যন্ত—চিবুকাস্থি ধরিয়া ট্যাপারের আঘাত।

৪। ৪নং ছবি দেখিয়া ঘাড়ের দু'দিক্; ৫নং ছবির ভঙ্গীতে চিবুকের তলা; এবং ৬নং ছবির ভঙ্গীতে ললাটদেশে ট্যাপারের আঘাত।

এ ব্যায়ামের নিত্য-নিয়মিত সাধনায় মুখের কোথাও বিকৃতি ঘটিবে না; চামড়া থাকিবে মসৃণ কোমল এবং লাবণ্যদীপ্ত।

আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-সমন্বয় পরিকল্পনা

যুদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ-বিস্তার-সৌকর্য্যার্থে যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-প্রকরণকে একটি বিশিষ্ট সার্ব্বভৌম শীর্ষ মুদ্রাতে শৃঙ্খলিত করিবার জল্পনা-কল্পনা কিছু দিন হইতে প্রগাঢ় ভাবে চলিতেছে। সম্প্রতি উভয় দেশেই এই পরিকল্পনা বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। আপাততঃ মিত্র-শক্তি-সঙ্ঘকে লইয়াই এই পরিকল্পনা পরিপুষ্ট। শান্তি-সমাগমে সন্ধি-সংস্থাপনের সহিত বর্ত্তমানে শত্রু-পর্য্যায়-ভুক্ত দেশ-সমূহকেও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। যুক্তরাজ্যের কর্তৃত্বাধীন ভারতবর্ষও অবশ্য এই পরিকল্পনার সহিত দৃঢ় ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের টাকা ষ্টার্লিংএর লেজুড় মাত্র।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে বিলাতের প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিল একটি বেতার-বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"যাহারা কঠোর ভাবে প্রচলিত মুদ্রা-শাসন-নীতির পক্ষপাতী, আমি তাহাদের দলভুক্ত নহি। তথাপি আমি বলি, মানুষের সহিত মানুষের এবং ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত দশ হইতে পনের বৎসর পর্য্যন্ত মূল্য-মানের (values) একটি ন্যায্য এবং সুদৃঢ় অবিচ্ছিন্নতা (continuity) রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধকালে দর-দাম আমরা দৃঢ় রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। যুদ্ধান্তেও আমরা সর্ব্ব-প্রযত্নে এই দৃঢ়তা অবিচলিত রাখিতে ইচ্ছুক। যুদ্ধের শেষে কর-ভার এখনকার অপেক্ষা অধিকতর ভারী হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যম ও উৎসাহপ্রসূত প্রবর্ত্তন-প্রচেষ্টা যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ অথবা খর্ব্ব না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর-নির্দ্ধারণ ও কল্পনাকে আকার প্রদান করিব।"

যুক্তরাজ্যে কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সম্ভব, সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু পরাধীন ভারতে জাতীয় সর্ব্বজনীন স্বার্থই প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে। অন্য একদেশদর্শী প্রবল ও প্রচণ্ড স্বার্থের সহিত ইহার নিত্য বিরোধ—নিয়ত সঙ্ঘর্ষ। এই নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে মিষ্টার হুসেন ভাই লালজী বিনিময় এবং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-প্রকরণের ভবিষ্যৎ-নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত মিত্র-সঙ্ঘের আলাপ-আলোচনার সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ-স্থাপনের

উদ্দেশ্যে একটি মুলতুবী প্রস্তাব (Adjournment proposal) উত্থাপিত করিয়াছিলেন। অর্থ-সচিব এ আলোচনার অভিনবত্ব অস্বীকার করেন এবং আশ্বাস দেন যে, "কোন প্রকার নূতন রীতি-নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পরিষদে তাহার বিচার-বিতর্কের অবসর ও সুযোগ দেওয়া হইবে। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-বিষয়ক-ব্যবস্থার সহিত আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং ভারতবর্ষও এই জল্পনা-কল্পনার প্রাথমিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।" প্রস্তাবটি কি, তাহাই এখন আমাদিগকে প্রণিধান করিতে হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সৌকর্য্যের মূল ভিত্তি —মুদ্রা-বিনিময়ের একটি নির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারিত হার। আদান-প্রদানে মুদ্রা-বিনিময়-হার স্থিতিশীল না হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ অন্তরায় ঘটে। বিনিময়-হারের উত্থান-পতন এবং দ্রুত অথবা বিলম্বিত পরিবর্ত্তন ব্যবসায়-বাণিজ্যের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে অতি অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি করে। বিনিময়-হার স্থির থাকিলে, অল্প অথবা অধিকতর হউক, বণিক্‌ ও ব্যবসায়ী এবং তাহাদের পশ্চাতে শিল্পী ও প্রাথমিক উৎপাদক লাভের অঙ্ক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। যুদ্ধান্তে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেনা-পাওনার একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্য উপায় প্রবর্ত্তনই এই আন্দোলন ও আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। একতরফা যদৃচ্ছা মুদ্রা-মানের পরিবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে যাহাতে একটি আন্তর্জ্জাতিক নির্দ্দিষ্ট বিধান-অনুযায়ী সর্ব্ব-দেশের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের নিয়ন্ত্রণ সম্পাদিত হয়, তাহাই সর্ব্বজাতির কাম্য। সামরিক অসুবিধায় বিপন্ন কোন জাতির বৈদেশিক দায় মিটাইতে অত্যধিক ক্লেশ না ঘটে, অথচ যথাসম্ভব সত্বর ঐ বিপন্ন জাতি তাহার আর্থিক স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এই সকল বিধি-বিধানের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য,—আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও অবাধ প্রসার এবং এই পরিকল্পনার অংশভাগী দেশ-সমূহে জাতীয় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উন্নততর ধারার প্রবর্ত্তন।

এই শুভ এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্তরাজ্যের তরফ হইতে সেখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ্‌ লর্ড কীনেস্‌ একটি আন্তর্জ্জাতিক খালাস-নিষ্পত্তি-বিধায়ক সম্মিলনী (International Clearing Union) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। যুদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান-হেতু এই প্রতিষ্ঠান হইবে প্রাথমিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রী ব্যাঙ্কগুলির মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জ্জাতিক হিসাব-নিষ্পত্তির যোগসূত্র সংস্থাপিত করিবে। অনেকেই জানেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে সুইজারল্যাণ্ড দেশের বেস্‌ল (Basle) সহরে একটি আন্তর্জ্জাতিক হিসাব-নিষ্পত্তি ব্যাঙ্ক (Bank of International Settlements) স্থাপিত হইয়াছিল। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সকলকেই প্রস্তাবিত আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি-সম্মিলনীর সভ্য হইতে হইবে। শত্রুপক্ষীয় কোন রাষ্ট্রকে সভাসদ্‌ করিতে হইলে তাহার প্রতি বিশেষ নিয়মের বিধান নিহিত হইবে।

লর্ড কীনেস্‌ যে মুদ্রা-প্রকরণের বিধান দিয়াছেন, তাহার নাম হইবে (ব্যাঙ্কর প্রকরণ) (Bancor Currency)। ইংরেজী অর্থ-শাস্ত্রে Banco শব্দ বিশেষজ্ঞের সুপরিচিত। বণিক্‌ সম্প্রদায়ে সুবিদিত এই "ব্যাঙ্কো" একটি নির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারিত মূল্যের আদর্শ অঙ্কমুদ্রা। ইহার দ্বারা ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের হিসাব রক্ষা করে এবং ইহা স্থানীয় চল্‌তি মুদ্রা হইতে স্বতন্ত্র। এই Banco হইতেই লর্ড কীনেস্‌ Bancor শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। "ব্যাঙ্কর" আন্তর্জ্জাতিক চল্‌তি মুদ্রা হইবে এই হিসাবে যে, ইহা হইবে বিনিময়-হারের পরিমাপক অর্থাৎ নির্দ্ধারক একক। যে কোন ব্যাঙ্কার অথবা ব্যবসায়ী তাহার বৈদেশিক কারবার পাউণ্ড-ষ্টার্লিং, ডলার অথবা ফ্রাঙ্কে পরিচালন করিতে পারিবে; এবং তাহার শাসনতন্ত্র-সম্মিলনী হইতে "ব্যাঙ্কর" ধার করিতে সমর্থ এই অধিকার তাহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারিত হারে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করিবে,—এ সুবিধা সে অন্য কোন প্রকারে লাভ করিতে পারিত না। ফলে দৈব-বাণিজ্য (speculation) সঞ্জাত সর্ব্বপ্রকার বিনিময়-হারের অযথা ও অবৈধ হ্রাস-বৃদ্ধি বিদূরিত হইবে।

বৃটিশ পরিকল্পনানুযায়ী "ব্যাঙ্কর"-একককে প্রথমতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট ওজনের সুবর্ণে সীমান্বিত (defined) করা হইবে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রয়োজন অনুভূত হইলে এই মানের (weight) পরিবর্ত্তন চলিবে। প্রত্যেক দেশই স্বর্ণের বিনিময়ে সম্মিলনী হইতে "ব্যাঙ্কর" পাইবেন; কিন্তু "ব্যাঙ্করের" বিনিময়ে সুবর্ণ পাইবেন না। কোন দেশই জাতীয় মুদ্রা-প্রকরণ-অনুযায়ী নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে, দেশাভ্যন্তরে অথবা বৈদেশিক আদান-প্রদানে স্বেচ্ছানুযায়ী অল্প অথবা অধিক সুবর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবেন। স্বর্ণের বর্ত্তমান অত্যুচ্চ মূল্য এবং কোন কোন উদ্দেশ্য-সাধনার্থ ইহার উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই পরিকল্পনা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাকে জগতের স্বর্ণ-সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকোপ হইতে মুক্ত রাখিবে। অধিকন্তু, স্বর্ণের পৃষ্ঠপোষকতাই (Gold backing) যে এই মুদ্রা-মানের একমাত্র ভিত্তি-ভূমি, সে ধারণাও দূর করিবে। সম্মিলনীর শাসক-মণ্ডলীতে (Governing body) প্রত্যেক সভ্য-দেশের প্রতিনিধি থাকিবে এবং তাহারাই "ব্যাঙ্করের" মূল্য নির্দ্ধারিত করিবে। সম্মিলনী হইতে ঋণ লইবার এবং সম্মিলনী-পরিচালনার দায়িত্বেরও একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রের পক্ষে নির্দ্ধারিত থাকিবে। এই পরিকল্পনা-রচয়িতার বিশ্বাস, জগতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক শাসন-তন্ত্রের মেরুদণ্ড হইবে—এই সম্মিলনী।

যুক্তরাষ্ট্রের খাজাঞ্চীখানার অধ্যক্ষ মিষ্টার মর্গেনথো-পরিকল্পিত মুদ্রা-স্থৈর্য্য-সম্পাদক সঙ্কল্পের লক্ষ্য-বস্তু ছয়টি। এইগুলি বিনিময়-হারকে স্থিতিশীল করিবে। বিভিন্ন সভ্য-দেশের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের মূল্যকে স্থিতিশীল করিবার নিমিত্ত মিঃ মর্গেনথো একটি স্থায়িত্ব-সম্পাদক ভাণ্ডার (International Stabilisation Fund) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন। বিভিন্ন সভ্য-দেশের মুদ্রা-প্রকরণের ক্রয়-বিক্রয়-মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে এই ভাণ্ডার। কোন জরুরী পরিস্থিতি সমুপস্থিত হইলে মণ্ডলীর অনুমতি লইয়া বিনিময়-হারের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক মন্ত্রণা ব্যতীত বিনিময়-হারের পরিবর্ত্তন ঘটিবে না, সুতরাং সভ্য-দেশ সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস (Currency depreciation) সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সভ্য-দেশের বৈদেশিক দায়-ভার মণ্ডলী যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায়

সহিত মিটাইয়া দিবেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ প্রত্যেক সভ্য দেশকে পাঁচ হাজার মিলিয়ন ডলার চাঁদা দিতে হইবে এবং ইহার অর্দ্ধেক স্বর্ণমুদ্রা এবং সরকারী-খৎ (Government securities) দ্বারা দিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্য-দেশের স্বর্ণ-সঞ্চয়, বৈদেশিক-বিনিময়, জাতীয়-আয় এবং উদ্বৃত্ত জমা অথবা পাওনা অঙ্কের (Balance of Payments Positions) উপর সেই সেই দেশের চাঁদার পরিমাণ নির্ভর করিবে। এই চাঁদাই অবশ্য ভাণ্ডারের সম্পদ্। তৃতীয়তঃ, বিনিময়-শাসনের (Exchange controls) অপসারণ। এই সকল ব্যবস্থার ফলে দেশ-বিশেষের পক্ষে বিনিময়-শাসন পরিচালনার প্রয়োজন তিরোহিত হইবে। মূলধনের অবাঞ্ছিত গতি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন দেশই নূতন বিনিময়-শাসন-বিধি অবলম্বন করিতে পারিবে না, এবং এরূপ বিধানের প্রয়োজন হইলে ভাণ্ডারের অনুমতি লইতে হইবে। ভাণ্ডারের অনুমোদন ব্যতীত বহুবিধ মুদ্রা-প্রকরণ ব্যবহারের ফিকির (Multiple currencies devices) এবং দুই পক্ষের মধ্যে বিনিময়-নিষ্পত্তি-বন্দোবস্ত (Bi-lateral exchange clearing arrangements) নিষিদ্ধ হইবে। যে ক্ষেত্রে যুদ্ধে সমুদ্ভূত অর্থের অবরুদ্ধ অবশিষ্টের অবরোধ মোচন, দেশাভ্যন্তরে ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পারে, ভাণ্ডার সে ক্ষেত্রে তাহার মুক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবে।

ভাণ্ডারের ক্ষমতার পরিসর চতুর্থ বিবেচ্য বিষয়-বস্তু। ভাণ্ডার স্বর্ণমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারী হইবে এবং সভ্যদেশ সমূহের অনুমোদন-অনুযায়ী তত্তৎ দেশের খৎ প্রভৃতি (securities) বিকি-কিনি করিতে পারিবে। ভাণ্ডার যে-কোন দেশের অনুমতি লইয়া সেই দেশের চলতি-মুদ্রা কর্জ্জ করিতে পারিবে। সভ্য তালিকাভুক্ত দেশ-সমূহের সরকারী-খাজাঞ্চীখানা, কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক, কিংবা তাহাদের রাজস্ব সম্বন্ধীয় গোমস্তা এবং তাহাদের অধিকার-ভুক্ত আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত মাত্র ভাণ্ডারের কাজ-কারবার চলিবে। ভাণ্ডারের পঞ্চম বিচার্য্য বিষয়, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-একক। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জ্জাতিক শীর্ষ-একক স্বর্ণমুদ্রার নাম "ইউনিটাস্" (Unitus); ইহার মান দশ ডলারের মূল্য। এই মুদ্রার অঙ্কেই ভাণ্ডারের হিসাব রক্ষিত হইবে। ভাণ্ডার "ইউনিটাস্" নামক কোন মুদ্রা অথবা নোট প্রচলিত করিবে না; কিন্তু সভ্য দেশ-সমূহ ভাণ্ডারে স্বর্ণ জমা দিলে "ইউনিটাসের" অঙ্কে তাহার মূল্যাধিকার (credit) পাইবেন এবং স্বর্ণের আকারেই তাহার পুনরুদ্ধার সাধন পূর্ব্বক বিভিন্ন সভ্য দেশ-সমূহের মধ্যে তাহার আদান-প্রদান চালাইতে পারিবেন। ভাণ্ডারের পরিচালনা, ষষ্ঠ বিচার্য্য-বস্তু। ভাণ্ডার সভ্যশ্রেণীভুক্ত দেশ-সমূহের প্রতিনিধি-গঠিত একটি পরিচালক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক দেশ তৎপ্রদত্ত চাঁদার অনুপাতে ভোটের অধিকার পাইবেন, কিন্তু কেহই মোট ভোটের শতকরা ২৫ অংশের অধিক ভোট পাইবেন না। সাধারণতঃ পরিচালক-মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অধিক-সংখ্যক ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে চার-পঞ্চমাংশ ভোটের প্রয়োজন হইবে। ভাণ্ডারের দৈনিক কার্য্যাবলী পরিচালক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক নিযুক্ত কার্য্যকরী-সমিতি ও কর্ম্মাধ্যক্ষ পরিচালক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে।

(এখন আমরা এই দুইটি পরিকল্পনার পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।) প্রথমেই আমরা দেখিতেছি যে, যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রচুর মজুত স্বর্ণের অধিকারী হেতু স্বর্ণকেই প্রাধান্য দিয়াছে। "ইউনিটাস্"কে স্বর্ণ কিংবা যে কোন মুদ্রা-প্রকরণে পরিবর্ত্তনীয় করিয়া যুক্তরাষ্ট্র একটি যথাসম্ভব কঠোর স্বর্ণ-মানের (Gold standard) পুনঃপ্রবর্ত্তন প্রয়াসী। পক্ষান্তরে, যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনায় "ব্যাঙ্কর", আন্তর্জ্জাতিক খালাস-নিষ্পত্তি সম্মিলনীর সম্মতি ব্যতীত, স্বর্ণে পরিবর্ত্তনীয় নহে। সুতরাং স্বর্ণের সহিত ইহার সম্পর্ক তত দৃঢ় নহে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় সভ্য-দেশ সমূহের চাঁদার পরিমাণ মজুত স্বর্ণ, উদ্বৃত্ত জমা অথবা পাওনা (Balances of payments) এবং জাতীয় আয়ের উপর নির্ভরশীল; কিন্তু লর্ড কীনেসের পরিকল্পনায় চাঁদার হিস্যা (Quotas) যুদ্ধ-পূর্ব্ব বাণিজ্য-জমা-খরচের উদ্বৃত্ত জমার অঙ্কের উপর অধিষ্ঠিত। দশ ডলারের মূল্যের সমান বলিয়া "ইউনিটাস্" যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে ডলার-মান কিংবা স্বর্ণ-মানের মর্য্যাদা প্রদান করে না। যত দিন পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের খাজাঞ্চী-খানা বিক্রয়ার্থ প্রদত্ত স্বর্ণ (Gold offerings) একটি নির্দ্দিষ্ট হারে ক্রয় করিতে সম্মত থাকিবে, তত দিন "ব্যাঙ্কর" কিংবা অন্য কোন স্বর্ণ-এককের (Gold unit) একটি নির্দ্দিষ্ট ডলার-মূল্য থাকিবে। মোটের উপর দশটি ডলারের মূল্যের সমতুল একক সুবিধাজনক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় সভ্য-দেশ সমূহের চাঁদার অংশ মজুত স্বর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ভোটের অধিকার অধিকতর হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা যদি শতকরা ২০ অংশের অধিক হয়—বস্তুতঃ, ইহা সর্ব্বোচ্চ শতকরা ২৫ অংশেও পরিণত হইতে পারে—তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের ভোটের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বপ্রধান হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় আন্তর্জ্জাতিক ভাণ্ডারের সংগঠন-ব্যবস্থা কিয়দংশে জাতীয় আধিপত্যের হানিকারক। বৃটিশ পরিকল্পনা আন্তর্জ্জাতিক পরামর্শের অধীন; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বিনিময়-হারের নির্দ্ধারণ কিংবা পরিবর্ত্তন-ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে সভ্য-দেশ সমূহের আয়ত্ত-বহির্ভূত হইবে। যুক্তরাষ্ট্র বিনিময়-শাসন-পরিহারের পক্ষপাতী অর্থাৎ বৈদেশিক বিনিময়-বাজারের পুনরভ্যুদয়ের সমর্থক। সভ্য-দেশ-সমূহ স্ব স্ব চলতি-হিসাব-সম্পর্কিত কারবারের অন্তরায় দূর করিবার ক্ষমতা লাভ করিবেন বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ভাণ্ডার যথেষ্ট প্রতিপত্তির সহিত তাহার অসম্মতি অথবা আপত্তি নিবেদন করিতে পারিবে। পরন্তু, ভাণ্ডারের সম্মতি ব্যতীত নূতন কোন প্রতিবন্ধক প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না। যে-কোন আন্তর্জ্জাতিক কার্য্যকরী-পরিকল্পনা কোন সভ্য-বিশেষের স্বতন্ত্র নির্দ্ধারণ খর্ব্ব করিতে বাধ্য; কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা সমূলে পরিহার করিতে হইলে ভাণ্ডারের সংগঠন যথার্থই আন্তর্জ্জাতিক হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। এ কথা স্বীকার্য্য যে, স্থূলভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা বহু-তরফা খালাস-নিষ্পত্তি (Multi-lateral clearing) প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের পক্ষপাতী। ইহার চাঁদার হিস্যা কার্য্যতঃ ভাগীদারী মূলধন। ভাণ্ডারের বিভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্রে বৈদেশিক বিনিময়-বাজারের প্রচলন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাণ্ডার প্রত্যেক বৈদেশিক বিনিময়-বাজার অপেক্ষা অধিকতর খালাস-নিষ্পত্তিমূলক (clearing) প্রতিষ্ঠান হইবে না। বিনিময়-বাজারগুলিকে যদি দৈব-বাণিজ্য (speculation) প্রবৃত্তি এবং

বিশৃঙ্খলতা-মূলক স্বল্প-মেয়াদী (short-term) মূলধনের গতিবিধি হইতে মুক্ত রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহাদের সহিত যুক্ত-রাষ্ট্রের পরিকল্পনার যান্ত্রিক পার্থক্য উপেক্ষণীয় বলিয়াই অনুমিত হইবে।

মূলধনের অনধিকারমূলক গতিবিধি নিবারণার্থ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পরের জাতীয় বৈদেশিক সম্পদ্ সম্বন্ধে সংবাদ আদান-প্রদানের যে ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যাঙ্কার ও তাহার খরিদদারগণের (customers) মধ্যে হিসাব সংগোপনের যে চিরাচরিত প্রথা আছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে। অবশ্য যুদ্ধের অভিঘাতে এই সম্পর্কের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন উদ্‌বৃত্ত অর্থের অধিকারী দেশকে তাহার কোন বিশিষ্ট খাতকের প্রচলিত মুদ্রা গ্রহণ করিতে হইতে পারে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে ভাণ্ডারের সাধারণ বণ্টন তহবিলের উপর তাহার দাবীর অধিকার থাকিবে না। ইহাতে কোন স্পষ্টতঃ দুর্ব্বল ক্রেতার নিকট স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অতিরিক্ত রপ্তানী নিবারিত হইবে বটে, কিন্তু বিনিময়-ক্ষতি সম্ভাবনাহেতু ব্যবসায়ের হানি ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে, কোন সদস্য-দেশ-বিশেষের মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিকালে, ভাণ্ডারের সংস্থিতির স্বর্ণ-মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে, বিনিময়-ক্ষতির সম্ভাবনাকে লঘু করা যাইবে। কিন্তু এই সকল খুঁটিনাটি পার্থক্যের বহু উর্দ্ধে, বহু গুণে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের বিষয়,—চলতি-হিসাব সম্পর্কে একটি সাম্যাবস্থা-সম্পন্ন বিনিময়-তন্ত্র (Exchange system) সংস্থাপন সঙ্কল্পে বৃটিশ ও মার্কিণ উভয় পরিকল্পনার ঐকান্তিক উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য। এই সাধু উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার জাতীয় ক্ষমতার কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা অবশ্যম্ভাবী। উভয় পরিকল্পনার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য এই যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সঙ্কল্পে দৃঢ় উদ্‌বৃত্তের অধিকারী দেশগুলিকে স্বচ্ছলতা-বিহীন দেশ-সমূহ হইতে পণ্যে এবং কর্ম্মে (service) প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এই নিমিত্ত, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বাণিজ্য-শুল্কের (Tariff) কোন উল্লেখ নাই; অথচ এইরূপ শুল্ক আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিধানের সাফল্যের জন্য মুখ্য-প্রয়োজন। বিশেষতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-শুল্ক যুদ্ধোত্তর জগতের সমস্যার বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-শুল্কের এক-মাত্র প্রশমন,—বিদেশে বিশিষ্ট ঋণ-দান। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ এবং বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্ত্তিকালের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আদৌ ভরসা-প্রদ নহে। যুদ্ধান্তেও যদি স্বর্ণের আদানই যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র কাম্য হয়, তাহা হইলে যুদ্ধোত্তর-জগতের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। যুক্তরাষ্ট্র যদি তাহার দেশ-বহির্ভূত উদ্‌বৃত্ত জমা কিংবা পাওনার অঙ্কের সহিত স্বীয় অর্থনৈতিক নীতির সামঞ্জস্য বিধান না করেন, তাহা হইলে কোন আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র কার্য্যকারী হইবে না।

(এই সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে যুক্তরাজ্য ও যুক্ত-রাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা প্রয়োজন।) যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র একাভিসন্ধি হইয়া কার্য্য করিলে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নীতিকে যথেচ্ছ পরিচালন করিতে পারে; কিন্তু অন্যান্য বিশেষতঃ মিত্র-দেশের স্বার্থ এবং তাহাদের নিজেদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে যুক্তরাজ্যের রপ্তানী-বাণিজ্যে অবনতি ঘটিয়াছিল, এবং তাহার ফলে উদ্‌বৃত্ত জমা অথবা পাওনার অঙ্ক অধোগতি লাভ করিয়াছিল, আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার হ্রাস ঘটিয়াছিল এবং রপ্তানী-শিল্পে বিষম বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের অবসানে এই সকল সমস্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিবে। আন্তর্জ্জাতিক অর্থনিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্ররূপে লণ্ডন অতি অল্প সময়ের মধ্যে টাল্ সামলাইয়াছিল; কিন্তু ষ্টার্লিংএর দুর্ব্বলতা এবং জাতীয় অর্থ-বিধানের মন্দা সহজে তিরোহিত হয় নাই। স্বর্ণমান পরিবর্জ্জন এবং বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের কল-কৌশল মুস্কিল প্রশমন করিয়াছিল মাত্র,—দূর করিতে পারে নাই। যুক্তরাষ্ট্রাভিমুখে স্বর্ণের অবাধ গতি আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-শক্তিকে বিপন্ন করিয়াছিল এবং রপ্তানী বাণিজ্যের অন্তরায় হেতু স্বর্ণের বিহিত বিতরণ প্রতিবিদ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের অবসানে যুক্তরাজ্যে স্বর্ণের স্বল্পতা প্রখররূপে প্রকট হইবে। এই হেতু বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্‌গণ যুদ্ধান্তে বৃটেনের রপ্তানী-বাণিজ্য-বিস্তার সাধনের উপায়-উদ্ভাবনে ব্যাপৃত আছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিলাত হইতে স্বর্ণ যেমন নির্গত হইতেছে, মার্কিণে স্বর্ণ তেমনি পুঞ্জীভূত হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামাল আমদানী করিতে বৃটেন ব্যগ্র। মার্কিণের প্রচেষ্টা—যাহাতে বিদেশ হইতে সস্তা পণ্য আসিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-শক্তিকে খর্ব্ব না করে। প্রভূত স্বর্ণের অধিকারী মার্কিণের প্রচেষ্টা—আন্তর্জ্জাতিক অর্থবিধানে যাহাতে স্বর্ণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। বৃটেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা—স্বর্ণের অভাবে যাহাতে স্বল্প-স্বর্ণের অধিকারী দেশ-সমূহের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত না হয়। এইখানেই উভয়ের উদ্দেশ্যের বৈষম্য। তথাপি উভয়েরই ঐকান্তিক বাসনা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে যথাসম্ভব বাধাবিঘ্ন-বিমুক্ত করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করা।

সঙ্কীর্ণ পরিসরে স্বর্ণের অবস্থিতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অসঙ্গত অসামঞ্জস্য ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের আরও দুইটি বিষম অন্তরায়,—অত্যধিক বিনিময়-শাসন এবং অযথা মুদ্রামূল্য-হ্রাস-প্রতিযোগিতা। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিপর্য্যয় প্রধানতঃ, আন্তর্জ্জাতিক উৎপাদন-তৎপরতার তারতম্য অনুযায়ী ঘটে। এই তৎপরতার বিধিসঙ্গত বণ্টন প্রয়োজন। বিধিসঙ্গত বণ্টনের মূলে অবশ্য অর্থ-সামর্থ্য-সঙ্গতি নিহিত। কাঁচামাল ও শ্রমিকের প্রাচুর্য্যের সহিত উপযুক্ত সময়ে যথোপযুক্ত অর্থ-সরবরাহের প্রয়োজন। আন্তর্জ্জাতিক অর্থবিধানের সহিত জগতের শিল্প ও বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আন্তর্জ্জাতিক অর্থবিধানে স্বর্ণের মর্য্যাদা অবিসম্বাদী। স্বর্ণ সম্পদ্-বিহীন হইলে, অথবা স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, যে-কোন দেশ উদ্‌বৃত্ত জমা অথবা পাওনার অধিকারীর প্রাপ্য মর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হয়। আর্থিক সামর্থ্যে প্রবল জাতি দুর্দ্দিন ও দুর্দ্দশা কোনরূপে অতিক্রম করিতে পারে; কিন্তু দুর্ব্বলকে বাঁচিবার অধিকার না দিলে, আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-বাণিজ্যে এবং অর্থ-বিধানে স্বাস্থ্যকর সাম্যাবস্থা সম্ভবপর হয় না। অতএব (আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিধানকে কেবল আন্তর্জ্জাতিক খালাস-নিষ্পত্তি-মূলক করিলে চলিবে না, তাহাকে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ও শিল্প-বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ-মূলক করিতে হইবে।)

এক-তরফা প্রচেষ্টা দ্বারা মুদ্রা-মূল্য-হ্রাস প্রতিষেধ বিষয়ে বৃটিশ ও মার্কিণ উভয় পরিকল্পনাই এক-মত। কিন্তু বৃটেন, মার্কিণের ন্যায়, বিনিময়-শাসন ও জাতীয় আধিপত্য পরিহারের পক্ষপাতী নহে। এই নিমিত্তই কীনেস্ পরিকল্পনায় দুর্ব্বল দুঃস্থ দেশের ঋণ, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত হুণ্ডী-বরাদ্দ (overdraft) অতিক্রম করিলেই, আন্তর্জ্জাতিক পরামর্শের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। বৃটিশ অভিমতের ধারা এই যে, যদি জাতীয় আধিপত্য পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক যথার্থ ই আন্তর্জ্জাতিক হইবে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের গঠন বিষয়ে উভয়ের মতভেদ। বৃটিশ-বিধানে সদস্য দেশ-সমূহের চাঁদার পরিমাণ নির্ভর করিবে যুদ্ধ পূর্ব্ব-বাণিজ্য জমা-খরচের উদ্‌বৃত্ত-জমার অঙ্কের উপর; আর মার্কিণ বিধানে চাঁদার ভিত্তি হইবে সঞ্চিত স্বর্ণ, উদ্‌বৃত্ত জমা অথবা পাওনা এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণ। বৃটেন আন্তর্জ্জাতিক নিকাশ-নিষ্পত্তি মারফতে উত্তমর্ণ দেশসমূহে স্বর্ণের অত্যধিক গতি-স্থিতি নিবৃত্তির পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে, মার্কিণ এমন একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করেন, যাহা বিনিময়-শাসন দূর করিয়া, নিরঙ্কুশ খালাস-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিবে। উভয়েরই উদ্দেশ্য,—যুদ্ধান্তে স্ব স্ব দেশে যেরূপ পরিস্থিতির উৎপত্তি ঘটিবে, তাহারই জাতীয় স্বার্থানুমোদিত প্রতিবিধান। বৃটেন যুদ্ধান্তে জাতীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উচ্চ ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অভিলাষী। মার্কিণের অভিপ্রায়—মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস নিবারণ পূর্ব্বক, জগতের বাণিজ্য-বাজারে আত্ম-প্রতিপত্তির প্রসার সাধন।

ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থ-সামর্থ্যের নিয়ন্ত্রণ যুদ্ধোত্তর বৃটেনের শক্তি-সামর্থ্য পরিস্থিতির সহিত দুশ্ছেদ্য বন্ধনে নিবদ্ধ। বর্ত্তমানে বৃটিশ ও মার্কিণ পরিকল্পনার দৌড় যতটুকু আমরা অনুধাবন করিতে পারি, তাহাতে অন্ততঃ কোন কোন অবস্থায়, ইহা ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে বলিয়াই মনে হয়! জাতীয় অর্থ-নীতির অনুশীলনে ও পরিচালনায় ভারত যদি পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারে এবং বর্ত্তমান পরাধীন-পরিস্থিতি অনুযায়ী মাত্র কাঁচা মাল কিনিবার এবং পরিণত পণ্য বিক্রয় করিবার ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিণ পরিস্থিতির ফলে যুদ্ধান্তেও আমাদের অর্থ-নৈতিক নিকৃষ্ট অবস্থা এবং জাতীয় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের অতিশয় হীন ও হেয় ধারা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব।

যুদ্ধান্তে সর্ব্বজাতি কর্ত্তৃক আকাঙ্ক্ষিত নবযুগে, নবভাবে, সুস্থ ও সবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সর্ব্ব জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার উৎপাদন-তৎপরতার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, যাহাতে পরার্থ-পীড়কে অবৈধ স্বার্থ-সাধন (Unfair exploitation) এবং অর্থ-নৈতিক পর-পীড়নের (Economic aggression) পরিবর্ত্তে আন্তর্জ্জাতিক পণ্য-বিনিময় ন্যায়সঙ্গত-বিনিময়ে (Fair exchange) পর্য্যবসিত হইতে পারে। আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিলে, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমবিভাগের এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে সাম্য-মৈত্রী-সংস্থাপনের নূতনতর যোগসূত্র এবং ভিত্তিভূমির অধিকার অসম্ভব হইবে না। পরন্তু, জাতি-বিশেষের শোষণ-মূলক দারিদ্র্যের অবসান ঘটিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের অপরিসীম আভ্যন্তরীণ সম্পদ্, অসামান্য মূলধন-সংস্থান এবং অনন্যসাধারণ উৎপাদন-বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য তাহাকে সর্ব্বপ্রকার নীচাশয় প্রলোভনের অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিত করিয়াছে। যদি যুক্তরাষ্ট্র সহৃদয়তার সহিত একটি যুক্তিসিদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-বিভাগের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রতি অবহিত হন, এবং জগতের সমস্ত জাতিকে প্রচুর পরিমাণে ইজারা-ঋণ দানে মুক্তহস্ততাহেতু অর্জ্জিত অসামান্য অধিকার ও প্রতিপত্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বত্র ক্রয়-বিক্রয়-বাজারের নীচ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ-প্রণোদিত হিংসা-দ্বেষ ও বিবাদ-বিরোধ বিদূরিত করিয়া একটি সুসঙ্গত, সুসমঞ্জস্, সুসম্বদ্ধ জাগতিক অর্থবিধান ও নিয়ন্ত্রণ-তন্ত্রের সত্ত্বর সমুত্থান গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে, যথার্থ ই নববিধানের আবির্ভাব ঘটিবে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে বিজেতার ক্ষতি-পূরণার্থে বিজিতের প্রতি আর্থিক উৎপীড়ন জগতের অর্থ-বিধানকে পঙ্গু করিয়াছিল। এই নিমিত্ত যুক্তরাজ্য বর্ত্তমান যুদ্ধকালে প্রদত্ত ইজারা-ঋণ সাহায্যের পরিশোধ, যুদ্ধান্তে অর্থের পরিবর্ত্তে পণ্যে ও কর্ম্মে গ্রহণ করিবেন। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ মহত্তর অর্থনৈতিক মূলতত্ত্ব জগতে দুর্লভ। ইহা স্বর্ণের জয় নহে—তত্ত্বের জয়। স্বর্ণ নিমিত্ত মাত্র। লর্ড কীনেস্-প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব-প্রচলিত বৃটেনের হিরণ্য-স্বল্পতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার রপ্তানী-বাণিজ্যের আয়তন ও পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। গত কয়েক বৎসরে স্বকীয় বিপুল স্বর্ণ-সঞ্চয়কে বাধ্য হইয়া সমুদ্রপারে বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের লক্ষ্য এখন আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিধানে স্বর্ণের স্থান ও মানের প্রতি নিবদ্ধ নহে। ঈসপের গল্পের দ্রাক্ষাফল-লুব্ধ শৃগালের ন্যায় স্বর্ণ এখন তাহার আয়ত্ত-বহির্ভূত, সুতরাং কটু। ভারতের দৃষ্টি এখন উৎপাদন-তৎপরতার ন্যায়-সঙ্গত আন্তর্জ্জাতিক বণ্টনের প্রতি দৃঢ় সম্বদ্ধ।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিধানের মূল ভিত্তি বাণিজ্য-সম্পর্ক। এই বাণিজ্য-সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে উৎপাদন-তৎপরতার যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের উপর। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর অর্থ-বিধান ও মুদ্রা-সমন্বয় পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা বাণিজ্য-সম্পর্কের গুপ্ত ও গূঢ় সমস্যা-সঙ্কটে বিপর্য্যস্ত হইবার প্রকৃষ্ট সম্ভাবনা। ভারত এ ক্ষেত্রে স্রষ্টা—দ্রষ্টা নহে; কিন্তু বিশিষ্ট ভোক্তা; দুর্ভোগই তাহার চিরন্তন নিরবচ্ছিন্ন নিয়তি!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্মী ও নিষ্কর্ম্মা

মৌমাছি নিয়ত কর্ম্ম-নিরত,
মুখে মৃদু গুঞ্জন;
ভোমরার নাই কোন কাজ, তাই
চীৎকার সারাখন্।

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)।

[উপন্যাস]

১০

দশ-বারো দিন পরের কথা।

দিগঙ্গনার এক সম্বন্ধ আসিয়াছে। পাত্রটি মুঙ্গোড়া কোল-কোম্পানির অফিসে মাইনিং-এঞ্জিনিয়ার। দিগঙ্গনার পিতা রামহরি সান্যালের সঙ্গে পাত্রের পিতা এক-সময়ে এক-কলেজে সহাধ্যায়ী ছিলেন। ছেলে এ-চাকরিতে দেড়শো টাকা মাহিনা পায় এবং থাকিবার জন্য ফ্রী-কোয়ার্টার্স। কোম্পানির মালিক সিদ্ধেশ্বর বাবু ছেলেটিকে সুনজরে দেখেন, কাজেই ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

রামহরি বলিল,—পরশু রবিবার পাত্র নিজে আসবে গো, তোমার মেয়েকে দেখতে।

দিগঙ্গনার মা প্রিয়ম্বদা বলিল,—কতগুলি দিতে হবে?

রামহরি বলিল—বেশী চাইতে পারবে না। জানা-শোনার ভেতর।

—বেশ!

রবিবার সকালে দিগঙ্গনাকে বলা হইল,—কোথাও বেরুস নে, তোকে আজ দেখতে আসবে!

দিগঙ্গনা যেন কাঠ! দেখিতে আসিবে! এতখানি স্বাধীনতার তাহা হইলে···

মা বলিল,—অবাক হয়ে রইলি যে!

দিগঙ্গনা বলিল—বিয়ে দেবে না কি আমার?

মা বলিল—দিতে হবে না? ডাগর হয়েছো···তোমার বয়সে যে আমি তোমার মা হয়েছি।

দিগঙ্গনা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল—তোমাদের সেকালের কথা ছেড়ে দাও। আমি এখন বিয়ে করবো না!

—বিয়ে করবি না! তার মানে?

—মানে আবার কি! যেখান থেকে যাকে হোক ধরে আনবে, আর···আমার বিয়ে করবার ইচ্ছা নেই!

মা বিরক্ত হইল, কহিল,—তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা দেখলে তো চলবে না। বড় হয়েছো···তোমার বিয়ে দেওয়া এখন আমাদের কর্ত্তব্য।

দিগঙ্গনা বলিল—তোমাদের কর্ত্তব্য বলে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পায়ে চেপে গুঁড়িয়ে দিতে হবে! মজা মন্দ নয়!

মা বলিল—ধেড়ে মেয়ে হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়ানো—এতে ভারী পৌরুষ···না?···ছেলে ভালো···জানা ঘর···যেচে আসছে। তা ছাড়া মুঙ্গোড়ার কোল-মাইনে ছেলে কাজ করছে—এঞ্জিনিয়ার। দেড়শো টাকা করে এখন পাচ্ছে—তাছাড়া থাকবার বাঙ্‌লা!

দিগঙ্গনার ভ্রূযুগ আরো বেশী কুঞ্চিত হইল। কোনো জবাব না দিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মুঙ্গোড়ার মাইনিং এঞ্জিনীয়ার প্রবোধ লাহিড়ী আসিয়া রামহরি সান্যালের গৃহে দেখা দিল, বেলা তখন বারোটা। অভ্যর্থনায় ত্রুটি হইল না। বন্ধুর ছেলে···তার উপর ভাবী জামাতা!

এই বাড়ীতেই সে স্নানাহার করিল।

রামহরি বলিল—আজই রাত্রের গাড়ীতে ফিরতে হবে না কি?

প্রবোধ বলিল—ছুটী শুধু এক দিনের। বাবা চিঠি লিখলেন কাশী থেকে—আজই এখানে আসবার জন্য!

রামহরি বলিল—তোমার বাবা আমাকে লিখেছেন, রবিবারে তুমি এখানে আসবে। তাই তিনি তোমাকেও লিখে জানিয়েছেন। আমি ভেবেছিলুম, একটা দিন অন্ততঃ থাকবে।

প্রবোধ কহিল,—থাকবার উপায় নেই! সদ্য একটা পিটে কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই যে এসেছি, সিধু বাবু বললেন, এত বড় ব্যাপার···'যেয়ো না' বলতে পারি না! তবে এক দিনের বেশী দেরী করো না।

রামহরি বলিল—বিয়ে যদি হয়?

প্রবোধ কহিল—তাহলে ছুটী দেবেন বৈ কি।

আরো বহু কথা হইল।

ছেলেটি খুব সপ্রতিভ। নিজের বিবাহের ভার নিজেই লইয়াছে। মা-বাপ মাথার উপরে আছেন, যেটুকু না মানিলে নয়! পাত্রী পছন্দ, দেনাপাওনা—সে সম্বন্ধে নিজে যাহা স্থির করিবে, তাহাই হইবে! বাপ ঠিক করিয়াছিলেন, তাঁর ছেলেবেলাকার কে মজুমদার বন্ধু, তার মেয়ের সঙ্গে প্রবোধের বিবাহ দিবেন! কিন্তু সে-মেয়ে একেবারে সেকেলে প্রথায় মানুষ—ইংরেজীর এ-বি সি-ডি জানে না, একালে তেমন স্ত্রী লইয়া সংসার করা চলে না। অন্ততঃ প্রবোধের যে ষ্টাণ্ডার্ড! তাই বাবা বলিলেন, বেশ, বাসন্তীতে রামহরির মেয়ে আছে···জানাশুনা ঘর···মেয়েটি লেখাপড়ায় ভালো··· গান-বাজনা জানে! আর একালের মেয়ের···যেমন স্মার্টনেশ, চাও, তাই। কথায় কথায় প্রবোধ সব কথাই রামহরিকে খুলিয়া বলিল। স্পষ্ট বলিল—নিজে দেখিয়া বিবাহ করিতে চাই আমি। মেয়ের বংশ আর গায়ের রঙ কিম্বা শ্বশুরের দেওয়া যৌতুক লইয়া নয়! মানে, সে চায় স্মার্ট ওয়াইফ্! জীবনে এ্যাম্বিশন্ আছে! বেশ ফ্রী এ্যাণ্ড ইজি! সাহেব-সুবার সঙ্গে মেলামেশা করা···তাহাতেই উন্নতির সম্ভাবনা! তার সঙ্গে পার্টিতে যাইতে পারিবে! সংসারের ঘানিক্ষেত্রে নিজেকে জুতিয়া দিয়া নারী-জন্মকে কৃতার্থ মনে করিবে না, এমন স্ত্রী! নহিলে সেকালের মতো জড়ভরত জবড়জং স্ত্রী··· এ যুগে অচল!

আহারাদি চুকিতে বেলা দু'টা বাজিয়া গেল। প্রবোধ বলিল,—এবারে আসল কাজটুকু সেরে ফেললে হয় না···যে জন্য আমার আসা?

রামহরি বলিল—এখন একটু জিরোও, তার পর বিকেলে রোদ পড়লে মেয়ে দেখো।

প্রবোধ কহিল—মানে, আমার কি ইচ্ছা, জানেন?

রামহরি বলিল—বলো!

প্রবোধ কহিল—আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, অবশ্য··· মানে, তাঁকে দেখে একটু আলাপ-পরিচয় করা উচিত! লাইফ সম্বন্ধে তাঁর views কি, তাঁর টেষ্ট এ্যাণ্ড টেম্পারামেণ্ট···এগুলো বিশেষ ভাবে জানা দরকার! কথাবার্ত্তায় সে পরিচয় পাওয়া যাবে নিশ্চয়! তার পর···অর্থাৎ আমি নিজেই তো দেখছি, আমাদের সমাজ-সংসার এখন যে সেই আগেকার ধারা মেনে চলবে,···ইম্পশিবল্!

পাত্রের মুখের কথায় এ যুগের যে-ছবি ফুটিতে লাগিল, সে ছবি দেখিয়া রামহরি সান্যাল হতভম্ব! নিজের সম্বন্ধে রামহরির ধারণা ছিল, সে খুব আপ-টু-ডেট! কিন্তু মুঞ্জোড়া কোলিয়ারীর এই নব্য মাইনিং এঞ্জিনীয়ারের পাশে নিজেকে মনে হইল, কিছু না! তবে এটুকু রামহরি ভালো করিয়াই জানে, একালে সব দিকে দারুণ পরিবর্ত্তন···এটা পরিবর্ত্তনের যুগ···এবং তার উপর কন্যাকে পরের হাতে দিতে হইবে। সে-দানে যতখানি সুযোগ-সুবিধা করা যায়, ছাড়া উচিত নয়।

রামহরি বলিল—এখনি তাহলে দেখতে চাও?

—মিথ্যা সময় নষ্ট করে লাভ কি!

—তা বেশ। আমি তাকে নিয়ে আসি।

রামহরি আসিল অন্দরে। প্রিয়ম্বদাকে বলিল—অঙ্গনা? ও এখনি মেয়ে দেখতে চায়!

প্রিয়ম্বদা বলিল—মেয়ে বেড়াতে বেরুলেন! খেয়ে উঠে মেয়ে বললেন, আমার একটু কাজ আছে···এখনি আসছি।

—বাড়ী নেই?

—না।

রামহরি বিরক্ত হইল, বলিল—কোথায় আবার গেল এখন? আঃ!

প্রিয়ম্বদা বলিল—কোথায় গেছে, জানি না। আমাকে বলে যায়নি তো!

—খপর রাখতে পারো না? পাত্র উপস্থিত মেয়ে দেখবার জন্য! আজো তাঁর পাড়া বেড়াতে না গেলে চলতো না! বারণ করলে না কেন?

প্রিয়ম্বদা বলিল—বারণ করলেই তোমার মেয়ে শুনতো কি না! সে-শিক্ষা দিয়েছো তাকে!

রামহরি বলিল—কিন্তু তা নিয়ে এখন তর্ক করলে চলবে না তো! ঢাখো, কোথায় গেছে···ডাকিয়ে পাঠাও। ছেলে বলছে, এখনি দেখবে!

প্রিয়ম্বদা বলিল—তাও বলি বাবু, ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে এসেছে না কি! দেখা তো পালিয়ে যাচ্ছে না···ছেলে তো কাল সকাল পর্য্যন্ত এখানে আছে।

—আছে, জানি। কিন্তু যে জন্য এসেছে···নাও, নাও, খোঁজ করে অঙ্গনাকে ডাকাও। আমি গিয়ে ওকে বলি, মেয়ে আসছে।

রামহরি আসিল বাহিরে; এবং অতীত দিনের নানা কথা ফাঁদিয়া কোনো মতে সময়ক্ষেপের ব্যবস্থা করিল।

ঘড়িতে চারিটা বাজিল। দিগঙ্গনার তখনো দেখা নাই! পাত্র প্রবোধ বলিল—ওদিকে একবার দেখুন দয়া করে। আমি আবার একটু বেরুবো···সন্ধ্যার আগে। এলুম এত দূর···বাসন্তীর এত নাম শুনেছি দূর থেকে, সেই বাসন্তীতে এলুম···একবার দেখে যাবো না? অন্ততঃ একটা বার্ডস্-আই ভিউ···

রামহরিকে উঠিতে হইল। কম্পিত বক্ষে আবার অন্দরে প্রবেশ। আসিয়া দেখে, সামনে দিগঙ্গনা! আঃ, যে-বুক দশ হাত নামিয়া গিয়াছিল, সে-বুক আবার যেন পাহাড়ের মতো উঁচু হইল!

প্রিয়ম্বদা কহিল—মেয়ে এসেছেন! কিন্তু উনি পণ করেছেন, কনে দেখার মধ্যে উনি নেই।

—নেই! তার মানে? ও তো তোমাকে দেখতে আসেনি! রামহরির দুই চোখ কপালে উঠিল!

প্রিয়ম্বদা বলিল—তোমার মেয়ে বিয়ে করবেন না···স্বাধীন জেনানা হবেন।

—স্বাধীন জেনানা! মেয়ের নিকুচি করেছে! আয় আমার সঙ্গে ···কথাটা বলিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া রামহরি সজোরে টানিল।

—উঃ! বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া মেয়ে কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

ঘর-বাড়ী চকিতে সব যেন সরিয়া গেল···রামহরির চোখের সামনে তরঙ্গোচ্ছ্বসিত অকূল সমুদ্র!

প্রিয়ম্বদা বলিল—বলছি, বেশ বাপু, করিস নে বিয়ে···ভদ্রলোকের ছেলে এসেছে কত দূর থেকে···একবারটি গিয়ে দেখা দিয়ে আয়। তাতে তোমার মেয়ে জবাব দিলেন, আমার মর্য্যাদা নেই বুঝি?··· নাও, মেয়ের মর্য্যাদা যেমন বাড়িয়েছো, এখন সে মর্য্যাদার পায়ে পড়ে মাথা কোটো!

রামহরি চাহিল মেয়ের পানে···দু'চোখে অগ্নিদৃষ্টি ভরিয়া। ···দিগঙ্গনা দাঁড়াইয়া আছে বিদ্রোহী বন্দীর মতো! সে মূর্ত্তি দেখিয়া রামহরির ভয় হইল। বুঝিল, রাগ করিয়া লাভ নাই! তর্জ্জন-গর্জ্জনের সুর যদি ও-ঘরে গিয়া পৌঁছায়! তার চেয়ে···

নরম হইয়া রামহরি বলিল,—ঘাট হয়েছিল আমার! তোমার মত না নিয়ে ওকে আসতে বলে আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু এ কাজ করে ফেলেছি যখন, আমার মান রাখতে একটি বার দয়া করে এসে দেখা দাও। বিয়ে তোমায় করতে হবে না···যে-দিব্যি করতে বলো, করছি। এখন এসো, একটি বার দেখা দিয়ে আমাকে অপমান থেকে বাঁচাও···আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হবেন!

দিগঙ্গনার কি মনে হইল, সে বলিল,—বেশ, আমি যাবো, কিন্তু সাজতে-গুজতে পারবো না!

কৃতাঞ্জলি-পুটে রামহরি বলিল—তোমার যেমন অভিরুচি। তাই চলো। আমাকে বাঁচাও! মানে, যদি একটুও কৃতজ্ঞতা বোধ করো···

দিগঙ্গনা আসিল।

সামনের চেয়ার দেখাইয়া প্রবোধ বলিল—বসুন।

দিগঙ্গনা বসিল।

প্রবোধ বলিল···

অনেক কথা বলিল। নাটকে-নভেলে জীবনকে উপভোগ এবং সার্থক করিয়া তোলার সম্বন্ধে যে সব কথা লেখা থাকে···যে সব কথা পড়িতে-শুনিতে চমৎকার লাগে, অথচ যে সব কথার মানে বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না, এমনি সব কথা! বিবাহে বিরাগ থাকিলেও কথাগুলা দিগঙ্গনার মন্দ লাগিল না।

এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরিয়া এমনি কথার স্রোত বহিল; তার পর সে স্রোতে ভাঁটা পড়িলে প্রবোধ কহিল—দু'একখানা গান যদি···

দিগঙ্গনা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

প্রবোধ লক্ষ্য করিল। বলিল,—আচ্ছা, রাত্রে শুনবো। রাত্রে আছি তো এখানে।

দিগঙ্গনা বলিল—আমার তাহলে ছুটি ?

প্রবোধ কহিল—বেশ, আসুন।

দিগঙ্গনা চলিয়া গেল।

মা জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম দেখলি রে ?

মেয়ে কোনো জবাব না দিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। তার পর দিব্যবেশে সাজিয়া তখনি বাহির হইয়া গেল। মা বলিল—কোথায় চললি ?

মেয়ে বলিল—বেড়াতে।

রামহরি আসিল অন্দরে, প্রিয়ম্বদা বলিল,—মেয়ে দেখে কি বললে ?

—বোধ হয়, পছন্দ হয়েছে ! কথার ভাবে মনে হলো। বললে, আপনারা কি-রকম খরচপত্র করবেন ? আমি বললুম, সামর্থ্য তেমন নেই ! তবে মেয়ের গুণ আছে···আপ-টু-ডেট্···শিক্ষা পেয়েছে···আই-সি-এস্ পেলে সে-স্বামীর সঙ্গেও তাল রাখতে পারবে ! ঐটুকুর উপরেই যা ভরসা ! চুপ করে শুনলো, তার পর বেরুলো। বললে, ঘুরে একবার চারিধার দেখে আসি।

১১

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার সময় প্রবোধ আসিল পার্ল সিনেমার সামনে ! কাথরিণ হেপবার্ণের ছবি চলিতেছে···টিকিট কিনিয়া প্রবোধ গিয়া ফার্ষ্ট ক্লাশ সীটে বসিল।

ইনটারভালের সময় আলো জ্বলিলে চারি দিকে চাহিয়া দেখে, চার-আনার আট-আনার সীট একেবারে ভর্ত্তি। পিছনে ক'খানা বক্স···একটি বক্সে···

মনে হইল, স্বপ্ন দেখিতেছে না কি ? কিন্তু স্বপ্ন নয় ! দিগঙ্গনা ! সদ্য দেখিয়া আসিয়াছে···মুখখানা এখনো যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে ! তবে দিগঙ্গনা একা নয়···তার সঙ্গে সাহেবী পোষাক-পরা এক জন তরুণ ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মুখে সিগারেট···দিগঙ্গনার সামনে সে চকোলেট ধরিয়াছে !

প্রবোধের মনখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল ! দিগঙ্গনাকে তার পছন্দ হইয়াছে। কথা কম কহিলেও প্রবোধ বুঝিয়াছিল, মেয়েটির বুকের মধ্যে মন বলিয়া-পদার্থ টুকু আছে ! সজীব মন। তার কথায় দিগঙ্গনা শুধু প্রতিধ্বনি তোলে নাই···দু'-একটা বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করিয়াছিল। সে মতবিরোধ প্রবোধের ভালো লাগিয়াছে ! এমন স্ত্রী সে চায় না, যে-স্ত্রী সে-কালের প্রথায় স্বামীর কথায় 'ডিটো' বলিয়া সায় দিয়া যাইবে ! কিন্তু···

যার সঙ্গে বেলা পাঁচটায় সাক্ষাৎ সারিয়া মনে খানিকটা রঙ লাগাইয়াছে, এখানে সন্ধ্যা সাতটায় তাকেই দেখিবে তরুণ বন্ধুর সঙ্গে সিনেমার বক্সে···এটুকু ছিল তার কল্পনাতীত। তরুণ মেয়ের তরুণ বন্ধু থাকা বিচিত্র নয় ! তাই বলিয়া এতখানি অন্তরঙ্গতা···প্রবোধের মনে বিদ্রোহের সুর দেখা দিল !

দিগঙ্গনা যদি বলিত, সন্ধ্যায় তার এনগেজমেণ্ট আছে এক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখিবার জন্য···তাহা হইলে প্রবোধের মনে হয়তো এতখানি বিপ্লব দেখা দিত না। একবার ভাবিল, দেখা করিবে না কি ?···তার পর মনে হইল, উচিত হইবে না। সে কোথাকার কে ? ও বন্ধুটি পরম-অন্তরঙ্গ !···দুম করিয়া যদি বলিয়া বসে, হু আর ইউ ?

সত্যই তো ! তার স্ত্রী নয় দিগঙ্গনা···বিবাহের জন্য সে দেখাশুনা করিতে আসিয়াছে মাত্র।

উদ্গত বাসনাকে সবলে দমন করিয়া প্রবোধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—বক্সের পানে আর চাহিল না।

তার পর সুরু হইল ছবির ক্রম-গতি। পর্দ্দার বুকে সে ছবির সচল গতিটুকুই শুধু দেখিল, সে গতি-ছন্দে কাহারা আসিয়া কি কথা কহিয়া কি ঘটনা পর্দ্দার পটে আঁকিয়া গেল, সে দিকে তার খেয়ালও রহিল না।

রাত্রি আটটায় ছবি শেষ হইল। সিনেমা ভাঙ্গিল। প্রবোধ কৌতূহল দমন করিতে পারিল না···কে ও ভদ্রলোক ?

বাহিরে অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া দেখিল, দু'জনে আসিল···হাসিতে হাসিতে হাত-ধরাধরি করিয়া। সামনে ক'খানা সাইকল-রিক্শ। তাহারি একটায় দু'জনে চড়িয়া বসিল। ঘণ্টায় ঠুং ঠুং রব তুলিয়া রিক্শওয়ালা সাইকেলের প্যাডলে চাপ দিয়া গাড়ী চালাইয়া দিল।

সিনেমার লোকদের প্রশ্ন করিতে জবাব মিলিল—উনি বাসন্তী সিণ্ডিকেটের ম্যানেজার চ্যাটার্জ্জী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিনাকী চ্যাটার্জ্জী।

সঙ্গিনীকে প্রবোধ জানে, কাজেই সে পরিচয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিল না। প্রশ্ন সে না করিলেও সিনেমার টিকিট-বাবু বলিল—ও মেয়েটি ওঁর সঙ্গে প্রায় আসে সিনেমায়। অন্য মেয়েরাও আসে···পিনাকী চ্যাটার্জী এ-সিনেমার মস্ত পেট্রন···তাঁর লেডি-ফ্রেণ্ডের সংখ্যা অল্প নয় !

এ কথার প্রয়োজন ছিল না···কিন্তু টিকিট-বাবুর মনের কোণে হয়তো লুকাইয়া ছিল হিংসার বিন্দু ! বয়সে সে-বেচারা এখনো প্রবীণ হয় নাই, চেহারা মন্দ নয়, সাজপোষাক কেতা-মাফিক, সিনেমা-গৃহে ফ্রী পাশ-বিতরণে তার অধিকার আছে···যে-কোনো আসনে···তার ভাগ্যে লেডি-ফ্রেণ্ড জুটিল না···আর ঐ পিনাকী চ্যাটার্জী ! তাও ট্যাক্সি বা মোটরে করিয়া বান্ধবীদের আনে না—আনে ঐ সস্তার সাইকল-রিক্শয় চড়াইয়া !

প্রবোধ আর দাঁড়াইল না···সেও একখানা সাইকল-রিক্শ ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল। বলিল, খুব খানিকটা ঘুরাইয়া আমাকে নামাইয়া দিবে এখানকার সিণ্ডিকেটের এ্যাকাউনটাণ্ট সান্যাল বাবুর গৃহে। রিক্শওয়ালা বলিল—একটি টাকা লিবো বাবু। হাঁ।

প্রবোধ কহিল—বেশ !

চারি দিকে পরিষ্কার জ্যোৎস্না। সহর ছাড়িয়া খোলা পথে চলিল সাইকল-রিক্শ। পথের দু'ধারে বন-বাগান ক্ষেত-ময়দান···দূরে বসতির রেখা স্বপ্নপুরীর মতো আভাসে দেখা যায়। চমৎকার লাগিতেছিল। প্রবোধ থাকে কোলিয়ারী-সহরে—রাত্রে পথ চলিতে সেখানে দেখে কোথাও খনি-গর্ভ হইতে আগুনের জ্বলন্ত শিখা লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে, দৈত্যের লোলুপ লাল রসনার মতো···কোথাও বা মিষ কালো কয়লার ধোঁয়ায় দুনিয়ায় দিগন্তব্যাপী কালির পাথার !

প্রবোধের মনে অনেক কথার উদয়াস্ত চলিয়াছে···

হঠাৎ রিক্শওয়ালা বলিল—পাশে পার্ক। জানকী বাবু করিয়ে দেছেন। যাবেন ?

প্রবোধ বলিল—পার্কে দেখবার কিছু আছে ?

রিক্‌শওয়ালা বলিল—দেখবার কিছু নেই। বাবুরা হাওয়া খেতে আসেন। ছেলেমেয়েরা বেড়াতে আসে, পার্কে খেলা করে।···ভিতর দিয়ে পথ আছে···হুই পীরপাড়ায় গিয়ে পড়বো।

প্রবোধ কহিল—পীরপাড়ায় যাবার দরকার নেই বাপু, তবে বলছো, পার্ক···বেশ, চলো।

পার্কের মধ্যে ঢুকিল প্রবোধের সাইক্‌ল্-রিক্‌শ। ছোট একটি হট-হাউস, ঝর্ণা, সিমেণ্টে বাঁধানো বসিবার আসন, লতাকুঞ্জ···

প্রবোধ জানে, শুধু এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটি নয়, বন কাটিয়া বাসন্তী সহরটাকেই গড়িয়া তুলিয়াছেন জানকী বাবু! সহর গড়িয়া তোলার অর্থ বুঝা যায়। ব্যবসায়ীর মাথা···সে দিকে কোনো ত্রুটি রাখেন নাই! খরচ করিয়া সহর গড়িলে তার দাম উঠিয়া আসিবে! তাই বলিয়া সে সহরে আবার এমন পার্ক! ব্যবসা-বুদ্ধির কোথাও একটু রন্ধ্র এবং সে রন্ধ্রে ছিট না থাকিলে সহরে কেহ পার্ক গড়িয়া দেয় না··· কারণ, এ খরচের এক পয়সা উশুল হইবার নয়!

তাল-খেজুরের কেয়ারি-করা পথের ধারে সীমেণ্টে বাঁধানো বেদীর উপরে সে বসিল। মাথায় শত চিন্তা যেন মাকড়শার জাল রচনা করিতেছে! বাবা-মা ধরিয়াছেন, বিবাহ করিতে হইবে। তার নিজেরো কোনো আপত্তি নাই! তবে পাঁচখানা বইয়ে যেমন পড়ে··· কলিকাতা পাঠ্যাবস্থায় যেমন দেখিয়াছে, বাঙালীর মেয়ে···জড়োসড়ো ভাবের আড়াল ভাঙ্গিয়া মুক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহারিণীর মূর্ত্তিতে তার সুচারু বিকাশ! দেখিলেই নয়ন-মন আশায় আনন্দে ভরিয়া ওঠে! নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকিতে গিয়া এমনি একটি তরুণী-মূর্ত্তি বার-বার স্বপ্নের মাঝে কেন্দ্রিত হইয়া ওঠে! দিগঙ্গনাকে দেখিয়া মনের সে স্বপ্ন সফল হইবে ভাবিয়া আনন্দ হইয়াছিল অনেকখানি। সিনেমায় তাকে দেখিয়া সে আনন্দ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবার জো! গুটি ভাঙ্গিয়া যে সুন্দর প্রজাপতি বাহির হইল, সে প্রজাপতি এমনি করিয়া···

মন বলিল, তা কেন ? বন্ধুর সঙ্গে যদি একটু মেলামেশা করে ? নিজের কথা মনে পড়িল। মুঙ্গোড়ায় সেও তো দু'-চারিটা অনাত্মীয় পরিবারে মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সে সব পরিবারে দিগঙ্গনার মতো কুমারী মেয়েদের সঙ্গে পিকনিকেও বাহির হইয়াছে ···পিকনিকে প্রমোদ-বিচরণের সে আনন্দে কালির রেখা আছে বলিয়া কখনো মনে হয় নাই!

তবু···

মন বলিল, হায় রে, পুরুষের মনে চিরকাল সংশয়-বিষের বাষ্প···এ বাষ্প কোনো দিন সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না!···

হঠাৎ ও-দিক হইতে একটা চীৎকার এবং আস্ফালন···দু'জন ছোকরা-বয়সী ভদ্রলোক নেশা করিয়া জড়িত বচনে প্রতিপত্তি জাহির করিতেছে···সেই সঙ্গে চৌকিদারের ঠ্যালা এবং গালিগালাজ!

প্রবোধ ভাবিল, সহরের এত দূরে বাসন্তী···সহরের ভালো-মন্দ সবই এখানে আছে!

চৌকিদারের সঙ্গে কলরব করিতে করিতে তারা চলিয়া গেল। একটা কথা শুধু প্রবোধের কানে আসিয়া লাগিল তীক্ষ্ণ ভাবে···মাতালরা বলিতেছিল,···চ্যাটার্জ্জী সাহেব কা লেড়কা! মজা দেখে গা!

চ্যাটার্জ্জী সাহেব! সিনেমায় শুনিয়াছে, সেই সৌখীন ভদ্রলোক চ্যাটার্জ্জী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র! এটিও তাঁর পুত্র ?

রাত্রে প্রবোধ আর রামহরি সান্যালের বাসায় ফিরিল না· সোজা গেল রেলওয়ে-ষ্টেশনে। ষ্টেশনে বসিয়া রামহরি সান্যালের নামে একখানি চিঠি লিখিয়া রিকশওয়ালার মারফৎ পাঠাইয়া দিল। রিকশওয়ালাকে বলিল,—আমার সুটকেশ আর বিছানা সে বাড়ীতে আছে, তাহা লইয়া ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিবি। চিঠি দিলাম···এ জন্য দু'টাকা আলাদা ভাড়া মিলিবে।

রিকশওয়ালার পুরা তিন টাকা লাভ!···খুশী-মনে সে গাড়ী লইয়া রামহরি স্যান্যালের গৃহে ছুটিল।

১২

চিঠি পড়িয়া রামহরির চক্ষুস্থির! মেয়েদের কঠিন শাসনে দাবিয়া রাখার সে পক্ষপাতী নয়। তাদের স্বাধীন বিচরণে আপত্তির কোনো হেতুও সে দেখে না! তালা-চাবি কিম্বা লগুড়ের ভয় দেখাইয়া মানুষকে ঠিক রাখা যায়, আর তাহার ব্যতিরেক হইলে সর্ব্বনাশ ঘটে—এ কথা রামহরি মানে না! কিন্তু চিঠিতে যে কথা পড়িল···

পিনাকীর সঙ্গে মেয়ে সিনেমায় যাইতে চায়, যাক···কিন্তু বাড়ীতে বলিয়া গেল না কেন ?

প্রিয়ম্বদাকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, মেয়ে কোথায় যায়, তাকে তা বলিয়া যায় না!

রামহরির কথায় প্রিয়ম্বদা ডাকিল দিগঙ্গনাকে, বলিল—সন্ধ্যার সময় কোথায় গিয়েছিলি, শুনি!

দিগঙ্গনা বলিল,—ওদের বাড়ী।

—ওদের বাড়ী!···কাদের বাড়ী ?

দিগঙ্গনা বলিল,—সামন্ত বাবুর মেয়েরা এসেছে।···ডেকেছিল। তাই···

রামহরি ছিল অন্তরালে। মেয়ের এ-কথায় সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। আগুনের হলকার মতো তার কণ্ঠে কথা বাহির হইল—মিথ্যা কথা! তুই গিয়েছিলি সিনেমায় চ্যাটার্জ্জী সাহেবের ছেলে ঐ পিনাকীর সঙ্গে।

মেয়ের দু'চোখে ভ্রূকুটি-রেখা···মেয়ে বলিল—জানো যদি তো জিজ্ঞাসা করো কেন ? হ্যাঁ, তাই গিয়েছিলুম। বেশ করেছিলুম, গিয়েছিলুম! বন্ধু হয়···সে আমায় নেমন্তন্ন করেছিল!

রামহরি সান্যাল বলিল—বাড়ীতে সে কথা বলে গেলেই তো পারতে! তাছাড়া গিয়েছিলে যদি তো তোমার মাকে এ মিথ্যা জবাব দেবার মানে ?

মেয়ে বলিল—তোমরা যদি পছন্দ না করো! তাছাড়া এতে দোষ কি ? সে বন্ধু!

প্রিয়ম্বদা বলিল—বন্ধু! বলতে লজ্জা করছে না ?

রামহরি বলিল,—বড়লোকের ছেলে! সে তোমার বন্ধু কি রকম! কি নিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ? তাছাড়া সে পুরুষ-মানুষ···তুমি ডাগর মেয়ে,···তোমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে না···কিছু না···

দু'চোখে আগুন ভরিয়া দৃষ্টির সে-আগুন মা-বাপের উপর বর্ষণ করিয়া দিগঙ্গনা বলিল—এ বন্ধুত্ব তোমাদের বোঝবার কথা নয়···

সেকালের নোংরা মন নিয়ে তোমরা করো মানুষের বিচার !···তোমরা ভেবেছো কি, শুনি ? আমাদের এ বন্ধুত্বে there is nothing wrong.

প্রিয়ম্বদা বলিল—তা নেই, সে যেন আমরা বুঝলুম ! কিন্তু যারা তোমায় চেনে না, জানে না···তোমার মনের শিক্ষা বোঝে না··· তাদের চোখে বিশ্রী লাগে তো !

ঝঙ্কার দিয়া দিগঙ্গনা বলিল—লোকের কথা আমি গ্রাহ্ন করি না। আমি নিজে যা ভালো বুঝবো, তা করবো···এতে লোক কি, তোমরাও যদি দোষ ধরো I would not care.

কথাটা বলিয়া দুম্‌দুম্ করিয়া বিজয়-গর্ব্বে মেয়ে গিয়া ঢুকিল নিজের ঘরে।

রামহরি এবং প্রিয়ম্বদা একেবারে থ !

রামহরি কিন্তু এইখানেই থামিল না—দাউ-দাউ জ্বলন্ত আগুনের মতো তখনি গিয়া পড়িল কামাখ্যা সাহেবের উপর।

কামাখ্যা সাহেবের মেজাজ তিক্ত···এইমাত্র থানার অফিসার আসিয়াছিল পুত্র দেবকীর বিরুদ্ধে মাতলামির কেস্ লইয়া চুপি-চুপি তার হেস্তনেস্ত করিতে। সন্ধ্যার সময় পীরপাড়ায় তাড়ির দোকানে গিয়া পেট ভরিয়া তাড়ি খাইয়াছে—তার পর তাড়িওয়ালা দাম চাহিতে তাড়িওয়ালার অন্দরে ঢুকিয়া হৈ-হৈ ব্যাপার···তাড়িওয়ালা শেষে চৌকিদার ডাকিয়া চৌকিদারের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে।

তাড়িওয়ালার ভাঁড় ভাঙ্গিয়া কলসী ভাঙ্গিয়া কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া তার প্রায় ষোল-সতেরো টাকা লোকসান করিয়া আসিয়াছে ! ···সেই টাকাটা দিয়া ছেলেকে কোনো মতে আদালতের বাহির হইতেই মুক্ত করিয়া কলঙ্কের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন ! সে ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে আবার রামহরি !

রামহরি পিনাকীর নামে নালিশ জানাইল, পাত্র প্রবোধ আসিয়াছিল মেয়ে দেখিতে—মেয়েকে পছন্দও করিয়াছিল। তার পর সিনেমার বক্সে মেয়েকে পিনাকীর সঙ্গে দেখিয়া বিবাহের কথা কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে রামহরি বলিল, এ তো শুধু সম্বন্ধ ভাঙ্গা নয়—মুখে-মুখে এ কথা প্রচার হইলে তার মেয়ের বিবাহের উপায় কি বা কি করিয়া হইবে !

রামহরির কথা শুনিয়া কামাখ্যা সাহেব পিনাকীকে ডাকাইয়া আনিল। বলিল—কাল তুমি এঁর মেয়ে দিগঙ্গনাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলে ?

বাপের কণ্ঠ এমন কঠিন রুক্ষ যে পিনাকী অস্বীকার করিতে পারিল না···চোরের মতো ভীরু কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ।

—ওঁদের বাড়ীতে বলে তাকে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলে ?

পিনাকী বলিল—আমার ফ্রেণ্ড হয়। সে প্রায় আমায় বলে, সিনেমা দেখাতে হবে। তাই দেখাই। বন্ধু···

কামাখ্যা সাহেব হাঁকিল,—বন্ধু ! আমাদের সমাজ এ বন্ধুত্ব মানবে ? তোমাদের মতো বয়সের young man and young girl ! এই দ্যাখো চিঠি···ওঁর মেয়েকে কাল একটি পাত্র এসেছিল দেখতে। সিনেমায় সে তোমাদের এক-বক্সে দেখে ওঁকে এই চিঠি লিখে বিয়ের কথা কেটে দিয়ে চলে গেছে।

বলিয়া চিঠিখানা সে দিল পিনাকীর হাতে।

পিনাকী বলিল—এ চিঠি ! আমি···

কামাখ্যা সাহেব জোর গলায় বলিল—হ্যাঁ, এ চিঠি তোমাকে পড়তে হবে। পড়ো

চিঠি পিনাকীকে পড়িতে হইল। পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে—

এত বড় মেয়ে কোথাকার এক জনের সঙ্গে সিনেমা দেখতে চলেছে ! আপনার তরফ থেকে কোনো লোক তার সঙ্গে নেই ! দেখে আমার ভয় হয়, এ মেয়েকে বিবাহ করে সুখের প্রত্যাশা অসম্ভব !

আরো অনেক কথা লেখা ছিল।

চিঠি পড়া হইলে পিনাকী চিঠি দিল কামাখ্যা সাহেবের হাতে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এঁর মেয়ের যে ক্ষতি করেছো এ অবিবেচনায়, সে ক্ষতি তোমাকে পূরণ করতে হবে !

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিনাকী চাহিল কামাখ্যা সাহেবের পানে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এই মেয়েকে তুমি বিবাহ করবে··· বুঝলে ! উনি বারেন্দ্র, আমরা রাঢ়ী—তবু।

পিনাকীর মুখে উত্তর নাই।

কামাখ্যা সাহেব বলিল,—রাজী আছো ? বলো···

পিনাকী বলিল—না !

না ! কামাখ্যা সাহেব জ্বলিয়া উঠিল। বলিল,—না ! তার মানে ? তোমার তো বন্ধু হয় এঁর মেয়ে···তুমি বললে ! তবে ?

পিনাকী বলিল—বন্ধু হতে পারে, তা বলে বিয়ে করে তাকে করবো স্ত্রী ! অসম্ভব !

অসম্ভব ! কামাখ্যা সাহেব গর্জ্জন করিল,—তাকে নিয়ে সিনেমায় যেতে পারো, আমোদ-প্রমোদ করতে পারো, আর তাকে স্ত্রীর সম্মান দিতে পারবে না ! This is the way you mean to treat your lady friends !

তার পর চাহিল রামহরির পানে, বলিল,—পিনাকীর মতো রাস্কেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে, এমন কথা তোমাকে বলতে পারি না। তবে বিবাহের জন্য পাত্র দ্যাখো···মেয়ের যৌতুক হিসাবে পিনাকী আমার কাছ থেকে যা পাবে···টাকা-কড়ি আমি মারা গেলে···ওর সে-টাকার অংশ থেকে কেটে নিয়ে আমি দেবো দু' হাজার টাকা···ড্যামেজ ! পিনাকী মাষ্ট সাফার এ্যাণ্ড পে কম্‌পেন্‌সেশন্ ! তোমার মেয়ের মর্য্যাদার দাম ওকে দিতে হবে এই দু' হাজার টাকা !

যেন বাজ পড়িয়াছে ঘরে···এমনি স্তব্ধতা ! পিনাকী নিঃশব্দে সরিয়া পড়িতেছিল, কামাখ্যা সাহেব বলিল—একটি ছেলে তাড়ি খেয়ে মাতলামি করে এসেছেন···আর একটি কুলধ্বজ !

তার পর চাহিল রামহরির পানে, বলিল—মেয়েকে পিনাকীর সঙ্গে আর মিশতে দিয়ো না। এর পর যদি কোনো কিছু ঘটে, আমি দায়ী হবো না রামহরি···beware !

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব-রণাঙ্গনে ভূমধ্যসাগর-বক্ষের গুরুত্বই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অসংখ্য রণ-বিমানের অবিরাম ঘর্ঘর শব্দে এবং কামান ও মেসিন্ গানের বজ্রনির্ঘোষে ভূমধ্যসাগরের জল, জলরাশি-পরিবেষ্টিত ভূমি-খণ্ডগুলি ও দিগন্তব্যাপী আকাশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যে বিঘোষিত উদ্দেশ্যের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানরূপে জলে ও অন্তরীক্ষে এই তৎপরতা, তাহার বাস্তব প্রকাশ দেখিবার জন্য এখন উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা চলিতেছে। পূর্ব্ব-য়ুরোপের রণাঙ্গনে যে প্রাকৃতিক অবস্থায় অক্ষশক্তি আক্রমণ চালাইয়া থাকে, সেই অবস্থা এখন পরিপূর্ণরূপে বিকশিত। চরম সজ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উভয় পক্ষ সেখানে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুতও বটে; আসন্ন সজ্ঘর্ষের ক্ষেত্র নির্ম্মাণের জন্য উভয় পক্ষের বিমান-তৎপরতাও আরম্ভ হইয়াছে। এখন কোন্ মুহূর্ত্তে কে কোথায় কি ভাবে আঘাত করিবে—তাহার জন্যই সাগ্রহে সুযোগের সন্ধান! প্রাচ্য অঞ্চলে জাপানের মনোভাব এখনও অস্পষ্ট। সম্মিলিত পক্ষ তাহাকে প্রত্যাঘাতের যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহা কোন্ দিকে কি ভাবে প্রকাশ পাইবে, উহা এখনও সুস্পষ্ট নহে!

আসন্ন "দ্বিতীয় রণাঙ্গন"—

উত্তর-আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষ এখন প্যান্টেলেরিয়া, সিসিলি ও সার্দ্দিনিয়া দ্বীপে এবং ইটালীতে প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ চালাইতেছে। এই অঞ্চলে তাহাদের নৌবাহিনীর তৎপরতাও সময় সময় প্রকাশ পাইতেছে; বৃটিশ নৌবহর ইতোমধ্যে কয়েক বার প্যান্টেলেরিয়ায় গোলা বর্ষণ করিয়াছে। অন্যান্য দ্বীপের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও গোলা বর্ষিত হইয়াছে। স্পষ্টতঃই, উত্তর-আফ্রিকা হইতে যে দ্বীপমালা ইটালীতে পৌঁছিবার সোপান-স্বরূপ, সম্মিলিত পক্ষ এক একটি করিয়া তাহা অধিকারে প্রয়াসী; ভূমধ্যসাগরপথ নির্ব্বিঘ্ন করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে, য়ুরোপে অভিযানের জন্যও ঐ সকল দ্বীপে অধিকার-প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য। সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণে বাধা-দানের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ ভাবে ইটালী ও তাহার অধিকৃত অঞ্চলের আকাশে প্রাধান্য স্থাপনের জন্যও এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের এই প্রবল বিমান-তৎপরতা।

টিউনিসিয়ার যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র য়ুরোপ অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সম্মিলিত পক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার মুহূর্ত্ত আজ সমাগত। রুশিয়া আকুল আগ্রহে ভূমধ্য-সাগরের দিকে চাহিয়া আছে, রুশ জনসাধারণ যেন ধরিয়া লইয়াছে—এবার আর দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া সম্ভব হইবে না; অতি সত্বর ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে জার্ম্মাণ সমর-শক্তির কতকাংশ প্রত্যাহৃত হইবেই। সম্মিলিত পক্ষের আয়োজন দেখিয়াও মনে হইতেছে যে, তাঁহারা এ বার প্রত্যক্ষ ভাবে নাৎসী ফ্যাসিষ্ট শক্তির কেশাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইবেন; কেবল পাঁয়তারা কষিয়াই দায়িত্ব এড়াইবার প্রয়াস করিবেন না।

এখন প্রশ্ন—কোন্ দিক্ হইতে কি ভাবে এই অভিযান আরম্ভ হইবে? উত্তর-আফ্রিকায় এবং পশ্চিম এশিয়ায় সম্মিলিত পক্ষ এখন যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে একই সময়ে কয়েকটি স্থান হইতে তাঁহাদের আক্রমণ প্রসারিত হওয়া সম্ভব। প্যান্টেলেরিয়া ও সিসিলির পথে দক্ষিণ-ইটালীতে এবং সর্দ্দেনিয়া হইতে মধ্য-ইটালীতে আক্রমণ চলিতে পরে; সার্দ্দিনিয়া-কর্সিকা হইতে দক্ষিণ-ফ্রান্সে আঘাত করা সম্ভব; সাইপ্রাস্ হইতে ডোডেকেনীজের পথে স্যালোনিকায় এবং তথা হইতে বল্‌কান অঞ্চলে আক্রমণ প্রসারিত হওয়াও অসম্ভব নহে; ক্রীট্ অধিকৃত হইলে গ্রীসেও আঘাত করা যাইতে পারে। ইটালীতে অভিযান কিছু দূর অগ্রসর হইলে হয় ত আড্রিয়াতিক সাগর অতিক্রম করিয়া আল্‌বেনিয়াতেও আঘাত করা যাইবে। তবে, প্রথমেই যুগোশ্লোভিয়ায় আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব নহে; কারণ, ডাল্‌মেসিয়ার উপকূল পর্ব্বত-সঙ্কুল ও দুর্গম। আর, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে উত্তর ও পশ্চিম-য়ুরোপে আঘাতের সুবিধা ত আছেই। ঐ অঞ্চলেও এখন প্রবল বিমান-তৎপরতা চলিতেছে। দক্ষিণ-য়ুরোপে অভিযানের আয়োজন ও আস্ফালনের দ্বারা শত্রুকে বিভ্রান্ত করিয়া উত্তর ও পশ্চিম য়ুরোপেও অভিযান আরম্ভ হইতে পারে।

ইঙ্গ-মার্কিণ সমর-নায়কগণ যদি সত্যই অক্ষশক্তিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে চাহেন, তাহা হইলে বিভিন্ন দিক্ হইতে তাঁহাদের আক্রমণ পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। কেবল দক্ষিণ-ইটালীতে আঘাত করিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে অসামর্থ্যের অপবাদ ঘুচান যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করা সম্ভব হইবে না। ইটালীর কতকাংশ যদি ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের দ্বারা মথিতও হয়, তাহা হইলেও জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপে তাহার সমরায়োজন হ্রাস করিবে না; সে জানে—এইবার গ্রীষ্মের কয়েকটি মাসেই পূর্ব্ব-য়ুরোপে তাহার শেষ সুযোগ।

এখন প্রশ্ন—ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকগণ কি সত্যই প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া অবিলম্বে রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করাইতে অভিলাষী? এখনও সোভিয়েট রুশিয়ার সংগ্রাম-শক্তি আছে, তাহার যতই শক্তিক্ষয় হউক না, এখন তাহার আঘাতে জার্ম্মাণীর রক্ত-মোক্ষণের সম্ভাবনা দূরীভূত হয় নাই। কাজেই, এখনই যদি য়ুরোপের অন্যত্র অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট বাহিনীর পক্ষেও শত্রুকে প্রবল প্রত্যাঘাত করা সম্ভব হইবে; হয় ত অতি সত্বর সোভিয়েট সেনা তাহাদের স্বদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মধ্য য়ুরোপেও প্রবেশ করিবে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সৈন্য অন্য দেশে প্রবেশ করিলে উহাতে তথায় সুদূরপ্রসারী রাজনীতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কগণ যদি এখনই য়ুরোপ অভিযানের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে এই সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই তাঁহাদিগকে উহা করিতে হইবে। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে—য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রশ্নের সহিত রাজনীতিক সমস্যা বিশেষ ভাবে জড়িত; সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকদিগের পরিপূর্ণ আস্থা না থাকিলে স্বভাবতঃ তাঁহারা পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করাইয়া রুশ সেনার মধ্য-য়ুরোপে প্রবেশের সম্ভাবনা ঘটাইবেন না। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার রুশিয়ায় আরও শক্তিক্ষয় এবং জার্ম্মাণীর আরও রক্তমোক্ষণের পর নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে শেষ আঘাত করিয়া একসঙ্গে বিজয়ের কৃতিত্ব অর্জ্জন এবং বলশেভিক মতবাদের প্রসার-নিবারণের জন্য প্রতীক্ষা করিবেন।

ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কদিগের সাম্প্রতিক উক্তিতে এবং তাঁহাদের আয়োজনে মনে হইতেছে যে, ব্যাপক ভাবে হউক, আর নামমাত্রই হউক, তাহারা শীঘ্রই য়ুরোপের শত্রুকে আঘাতের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত ৮ই জুন মিঃ চার্চিল বৃটিশ কমন্স সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যাপক ভাবে জটিল ও বিপৎসঙ্কুল "উভচর যুদ্ধ" আসন্ন! কিন্তু এই উভচর যুদ্ধ প্রচণ্ড ভাবে চালাইয়া পূর্ব্ব দিক্ হইতে রুশিয়ার এক

দক্ষিণ দিক্ হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের চাপে অক্ষশক্তিকে অবিলম্বে চূর্ণ করিবার প্রয়াস হইবে কি না, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ এখনও আছে। কি কারণে এই সন্দেহ, তাহার সন্ধান করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না।

য়ুরোপের যুদ্ধের সহিত আমেরিকার প্রত্যক্ষ স্বার্থ-সম্বন্ধ অল্পই। অক্ষশক্তি আজ পরাজিত হউক, আর দুই বৎসর পরে পরাজিত হউক, তাহাতে আমেরিকার বিশেষ আসিয়া যায় না। তবে, অক্ষশক্তির পরাজয় আমেরিকার আকাঙ্ক্ষিত; কারণ, অক্ষশক্তির শাসিত দেশের দাস-শ্রমিক দ্বারা উৎপন্ন স্বল্প মূল্যের পণ্যের সহিত আমেরিকা কখনই প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে না। মার্কিণী শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান হ্রাস করাইয়া অক্ষশক্তির সহিত সমান তালে চলিবার প্রয়াসও কার্য্যতঃ অসম্ভব। তবে, অক্ষশক্তির পরাজয়ে কিছু বিলম্ব ঘটিলে তাহার ক্ষতি নাই; অক্ষশক্তির পরাজয়ের পর য়ুরোপের অর্থের বাজার আমেরিকার পক্ষে উন্মুক্ত থাকিবার নিশ্চয়তা পাইলেই সে সন্তুষ্ট। কিন্তু বৃটেনের অবস্থা স্বতন্ত্র; যুদ্ধোত্তর কালে য়ুরোপের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃটেনের আগ্রহ আমেরিকার অপেক্ষা অল্প না হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধ অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত চলিতে দিলে তাহার প্রত্যক্ষ বিপদের সম্ভাবনা আছে। যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব কারণে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অক্ষশক্তির সমর-যন্ত্রের আঘাতে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। বৃটিশ রাজনীতিকদের পক্ষে এই সম্ভাবিত বিপদকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিতে প্রয়াসী হওয়া স্বাভাবিক।

এইরূপ অবস্থায়, য়ুরোপে প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া দ্রুত অক্ষশক্তির পরাজয় সাধনে বৃটেন ও আমেরিকার আগ্রহ যদি সমান না হয়, তাহা হইলে উহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। আমেরিকার এক শ্রেণীর মধ্যে এখন য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি না করিয়া জাপানের প্রতি মনোযোগ প্রদানের কথা বলা হইতেছে। সেনেটর বার্টন্ হুইলার স্পষ্টই বলিয়াছেন—রুশিয়া যখন কম্যুনিজম্ প্রচারে বিরত থাকিবার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয় নাই, জাপ-বিরোধী যুদ্ধেও সহযোগিতার কথা দেয় নাই, তখন য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি না করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। এই উক্তি এক জন মার্কিণী সেনেটরের ব্যক্তিগত অভিমতমাত্র নহে—এক শ্রেণীর মার্কিণী রাজনীতিকের মনোভাব ইহাতে প্রতিভাত। ঠিক এই সময় জাপান কর্ত্তৃক আমেরিকা আক্রমণের পরিকল্পনা আবিষ্কার, চীনের প্রতি দরদের আতিশয্য প্রভৃতি য়ুরোপ অপেক্ষা সুদূর প্রাচীর গুরুত্ব অধিক প্রতিপন্ন করিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটাইবার সুকৌশলী প্রয়াস কি না, তাহা কে বলিবে? আমেরিকায় কয়লার খনিতে যে বিরাট্ ধর্ম্মঘট হইয়া গেল, তাহার সহিত কোন কোন মার্কিণী ধনকুবেরের গোপন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। ঠিক এই সময়ে কয়লা-শিল্প পঙ্গু করিয়া আমেরিকার সমরোপকরণ উৎপাদনে বিঘ্ন-সৃষ্টির প্রয়াসকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্য্য মনে করা অসঙ্গত নহে। কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর দালালরূপে শ্রমিক নেতা লুইস রুজভেল্ট-চার্চ্চিল পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইবার দূরবর্ত্তী উদ্দেশ্য লইয়া যে আসরে অবতীর্ণ হন নাই, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি অবিশ্বাস হেতু দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে এই দ্বিধা ব্যতীত, বিশ্ব-সংগ্রামের কৌশল হিসাবেও এই বিষয়ে আপাততঃ ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়ার আঘাতে জার্ম্মাণীর বহু শক্তি ক্ষয় হইয়াছে, আরও শক্তিক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে, জাপান এখনও অটুট-শক্তি; নব-লব্ধ সাম্রাজ্যের রস আহরণে তাহার শক্তি ক্রমে বৰ্দ্ধিতও হইতেছে। কাজেই, ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কগণ জাপানের জন্য তাঁহাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে আগ্রহান্বিত হইতে পারেন; জনমতের দাবীতে য়ুরোপে নামমাত্র "দ্বিতীয় রণাঙ্গন" সৃষ্টি করিয়া জার্ম্মাণীকে আরও দুর্ব্বল করিবার প্রকৃত দায়িত্ব এখনও সোভিয়েট রুশিয়ার স্কন্ধে ফেলিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। জার্ম্মাণীকে শেষ আঘাত হানিবার সুযোগ যাহাতে না যায়, আবার অধিক শক্তিও যাহাতে ক্ষয় না হয়, সেই ভাবে তাঁহারা সুকৌশলে অগ্রসর হইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরিকল্পিত য়ুরোপ অভিযানের সহিত সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধের অবস্থা বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট; সরবরাহ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ না হউক, উহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উন্নতি না হইলে য়ুরোপ অভিযান সম্ভব হইবে না। মিঃ চার্চ্চিল আশার বাণী শুনাইয়াছেন—সাবমেরিণের উপদ্রব বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে; এই উপদ্রব নিবারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, মার্কিণী নৌ-সচিব কর্ণেল নক্স বলিয়াছেন—মে মাসে সাবমেরিণের উপদ্রবের স্বল্পতা জুন মাসে উহার প্রাবল্য বৃদ্ধির আভাস হইতে পারে; এই বিষয়ে অত্যধিক আশান্বিত হইয়া উচিত নহে। বস্তুতঃ, সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে আমেরিকা হইতে সময় সময় আশঙ্কা প্রকাশিত হয়; আর বৃটিশ রাজনীতিকগণ উহাতে লঘুত্ব আরোপের প্রয়াস করেন। আটলাণ্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, মেরুসাগর, ও ভারত মহাসাগরের পূর্ব্বাঞ্চল নিরাপদ রাখিবার দায়িত্ব বৃটেনের। কাজেই, মার্কিণী রাজনীতিকগণ এই নিরাপত্তায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া পরোক্ষে বৃটেনের বিরুদ্ধেই অযোগ্যতার অভিযোগ করিয়া থাকেন। বৃটেন্ ও আমেরিকার পারস্পরিক ব্যবহারে অন্যের প্রতি এই দোষারোপের চেষ্টা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ নহে। ইহা ব্যতীত, সমুদ্রবক্ষের নিরাপত্তায় এই সন্দেহ প্রকাশ য়ুরোপে ব্যাপক অভিযান পরিচালনে অসামর্থ্যের পরোক্ষ কৈফিয়ৎ নহে ত?

আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল—

সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া দিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিশ্বের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গত মহাযুদ্ধের পর রুশিয়ায় কম্যুনিষ্ট-বিপ্লব সফল হইলে—১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল বা "কমিণ্টার্ণ" গঠিত হয়। এই দলের প্রধান কেন্দ্র মস্কোয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও রুশ সরকারের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ—অন্ততঃ প্রকাশ্য সম্বন্ধ ছিল না। মঃ ষ্টালিন কিছু দিন পূর্ব্বে রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দলের রুশ-শাখার সেক্রেটারী ছিলেন। রুশিয়ার শাসন-ব্যবস্থার সহিত মঃ ষ্টালিনের তখন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না; কাজেই, তিনি রুশ কম্যুনিষ্ট দলের সেক্রেটারী থাকায় "কমিণ্টার্ণের" সহিত রুশ সরকারের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় নাই। কমিণ্টার্ণের সহিত রুশ সরকারের সম্বন্ধ প্রকাশ্যে স্বীকৃত হইত না বলিয়াই রুশ-জার্ম্মাণ অনাক্রমণ-চুক্তি ও রুশ-জাপান নিরপেক্ষতা চুক্তি সম্ভব হইয়াছে। জার্ম্মাণী ও জাপান কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তির স্বাক্ষরকারী। নানকিং সরকারের সহিত জাপানের চুক্তিতে কমিণ্টার্ণের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

কমিণ্টার্ণের সহিত রুশ সরকারের প্রকাশ্য সম্বন্ধ না থাকিলেও এই প্রতিষ্ঠানটি যে রুশ সরকারের সাহায্যপুষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রতিষ্ঠান এক দিকে যেমন বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে মার্কসবাদ

প্রচার করিত, অন্য দিকে তেমনই কম্যুনিষ্ট রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী হইত। এই শেষোক্ত কারণে কমিণ্টার্ণকে আন্তর্জ্জাতিক সোভিয়েট-সুহৃদ্ প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে।

কম্যুনিজম্ আন্তর্জ্জাতিক মতবাদ; ইহা সমগ্র মানব-সমাজকে সমান অধিকারসম্পন্ন বিরাট্ পরিবারে পরিণত করিতে চাহে। কম্যুনিষ্টরূপে লেনিন ও ষ্ট্যালিনের উদ্দেশ্যও ইহাই। তবে এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ট্রটস্কির ন্যায় তাঁহারা অবিলম্বে মুক্ত অসি লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতে চাহেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস—কম্যুনিজম্ রপ্তানী করিবার পণ্য নহে। লেনিনের নির্দ্দেশে ষ্ট্যালিন এমন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার বহিরাকৃতি জাতীয় (national) এবং আভ্যন্তরীণ গঠন সমাজতান্ত্রিক (socialistic) হইবে। এই রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণ অনুপ্রাণিত হইবে, এই রাষ্ট্রও গণ-স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রয়াস করিবে। এই রাষ্ট্রের সাহায্যে ও নির্দ্দেশে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল বিভিন্ন দেশের নিপীড়িত জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করাইতে সচেষ্ট হইবে; জনগণ যখন শোষক শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইবে, তখন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিবে। স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও চীন সম্পর্কে এই নীতির অকপট অনুসরণ দেখা গিয়াছে। আবার, কম্যুনিষ্ট রুশিয়া যে সত্যই জোর করিয়া কাহাকেও কম্যুনিজম্ গিলাইতে চাহে না—কম্যুনিজম্ রপ্তানী করিবার দুর্ব্বুদ্ধি যে তাহার সত্যই নাই, তাহাও পরাজিত ফিন্ল্যাণ্ডের প্রতি তাহার ব্যবহারে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

কমিণ্টার্ণের নেতৃবৃন্দ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিজম্ প্রচারের এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার অপরিহার্য্যতায় তাঁহারা নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহা বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন হইল যে, শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই আজ সাম্রাজ্যবাদের শেষ আশ্রয় ফ্যাসিষ্ট মতবাদ নিশ্চিহ্ন হইবার সম্ভাবনা অদূরবর্ত্তী। রুশিয়ার প্রচণ্ড সমর-যন্ত্র যদি জার্ম্মাণীর গতিরোধ না করিত, তাহা হইলে দুই বৎসর পূর্ব্বেই পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশে ফ্যাসিজম্ সুপ্রতিষ্ঠিত হইত।

বর্ত্তমানে সোভিয়েট রুশিয়াকে বাঁচাইয়া রাখাই পৃথিবীর সকল কম্যুনিষ্টের কাম্য; সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ নূতন রূপ ফ্যাসিজমের উচ্ছেদ সাধনই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। বর্ত্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। কাজেই, ঐ সকল রাষ্ট্রের জাতীয় উদ্দেশ্যের সহিত কম্যুনিষ্টদিগের আশু লক্ষ্যের আর কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং, ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামরত রাষ্ট্রগুলিতে যে কম্যুনিষ্ট দল আছে, তাহাদিগকে আশু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আর কোন নির্দ্দেশ দিবার প্রয়োজনও নাই; ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী জাতীয় নীতিই কম্যুনিষ্টদিগের অনুসরণীয়। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্টরাও তাহাদের এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এইরূপ অবস্থায় আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দলের অস্তিত্বের আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই। তাই, সম্প্রতি কমিণ্টার্ণের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এই দল ভাঙ্গিয়া দিতে সুপারিশ করিয়াছেন। অতঃপর বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট দল তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিবে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গের রাজনীতিক দূরদর্শিতাও প্রকাশ পাইয়াছে। রুশিয়ার প্রতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সন্দেহের কারণ—রুশিয়া কম্যুনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী; কম্যুনিজম্ আন্তর্জ্জাতিক মতবাদ। আর কমিণ্টার্ণই আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিজম্ প্রচারের যন্ত্র; রুশ সরকার এই যন্ত্রের চালক। কমিণ্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দিয়া কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ আজ এই কথা বলিলেন যে, তাঁহারা কম্যুনিজম্ রপ্তানী করিতে চাহেন না; সুতরাং, "হে ইঙ্গ-মার্কিণ ধুরন্ধরগণ! তোমরা এই মিথ্যা অজুহাতে আর দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিও না। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি অবিশ্বাস ত্যাগ কর।"

মিঃ চার্চ্চিলের সফর—

মিঃ চার্চ্চিল সদলবলে মে মাসের শেষভাগে আট্লাণ্টিকে পাড়ি দিয়াছিলেন। এক পক্ষকাল ওয়াশিংটনে বসিয়া সমর-নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল প্রকার নীতির আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া তিনি আকাশপথে আলজিয়ার্সে আসেন। তথায় বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন্ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর, তাঁহারা যুগলে উত্তর-আফ্রিকায় রণক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া, সেনাপতিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং ভোজসভায় সকলকে আপ্যায়িত করিয়া জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন!

আলোচনারত মিঃ চার্চ্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

মিঃ চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে কোন্ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন, তাহা স্বভাবতঃই অপ্রকাশিত আছে। ঠিক এই সময় পত্রবাহক মিঃ ডেভিস্ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কোন্ বিষয়ে লিখিত পত্র লইয়া মঃ ষ্ট্যালিন-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং রুশ প্রধান-মন্ত্রীর কি উত্তর লইয়া আবার ওয়াশিংটনে ফিরিয়াছেন, তাহাও প্রকাশিত হয় নাই।

মিঃ চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয়—একই সময় য়ুরোপে ও জাপানের বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ পরিচালনের প্রতিশ্রুতি। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান-মন্ত্রী মিঃ কার্টিনের বিবৃতি হইতে পরে জানা গিয়াছে যে, একই সময় সুদূর প্রাচীতে ও য়ুরোপে সমান বিক্রমে সংগ্রাম পরিচালিত হইবার প্রতিশ্রুতি তিনি পাইয়াছেন; রুজভেল্ট-চার্চ্চিল সম্মিলনের অন্যতম সিদ্ধান্ত ইহাই। মিঃ চার্চ্চিলের ওয়াশিংটনের বক্তৃতায় জাপান অপেক্ষা জার্ম্মাণীর প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদানের কৈফিয়ৎ ছিল; তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল—জার্ম্মাণীর পরাজয়েই জাপানের পরাজয়, কিন্তু জাপানের পরাজয় জার্ম্মাণীর পরাজয় নহে। মিঃ চার্চ্চিলের উক্তি শ্রবণ করিয়া মনে হইয়াছিল—আমেরিকার জনমত যেন তাঁহার বিরুদ্ধে জাপানকে উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মাণীর প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদানের অভিযোগ করিয়াছে; আর তিনি অভিযোগকারীর সমক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। মিঃ চার্চ্চিলের সেই বক্তৃতা আমেরিকার মনোভাব সম্পর্কে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মন্তব্যের পরোক্ষ সমর্থক বলা যাইতে পারে। লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অতি সত্বর জলে ও স্থলে তৎপরতার আভাস আছে। ইহাই তাঁহার বক্তৃতার একমাত্র

উল্লেখযোগ্য বিষয় হইলেও ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই ; এই তৎপরতার প্রাবল্য কিরূপ হইবে, জার্ম্মাণীকে এই বৎসরই চরম আঘাত হানিবার প্রয়াস হইবে কি না, বক্তৃতায় তাহা সুস্পষ্ট নহে।

রুশ-রণাঙ্গন—

মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—রুশিয়ার ২ হাজার মাইল রণাঙ্গনে ১১৮ ডিভিসন জার্ম্মাণ সৈন্য এবং তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ২৮ ডিভিসন সৈন্য সন্নিবিষ্ট। টিউনিসিয়ার রণাঙ্গনে কেবল ১৫ ডিভিসন অক্ষশক্তির সৈন্য ছিল ; তাহাদিগকে পরাজিত করিতে ৫০ হাজার বৃটিশ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। এই হিসাব হইতে রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর আয়োজনের ব্যাপকতা উপলব্ধি হইবে এবং রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করাইবার জন্য য়ুরোপের অন্যত্র সম্মিলিত পক্ষের আঘাত কিরূপ প্রচণ্ড হওয়া প্রয়োজন, তাহাও বুঝা যাইবে।

রুশ-রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা এখন সৃষ্ট হইয়াছে ; উভয় পক্ষ জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তথায় প্রস্তুত। স্থলভাগে তৎপরতার প্রারম্ভিক পর্ব্ব—প্রবল বিমান-আক্রমণও আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ৫ শত জার্ম্মাণ বিমান কুরস্ক সহর নিশ্চিহ্ন করিতে উদ্যত হইয়া ব্যর্থকাম হয়। সোভিয়েট বিমানবাহিনী ইহার প্রত্যুত্তরে ওরেলে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল। রুশ-রণাঙ্গনে সাম্প্রতিক বিমান-তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়—সোভিয়েট রুশিয়ার বিমান-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মাণীর বিমান-আক্রমণ-প্রচেষ্টা পুনঃ পুনঃ বিফল হইতেছে ; সোভিয়েট বিমানবাহিনী শত্রুকে আঘাতও হানিতেছে।

রুশ-রণাঙ্গনে কোন্ অঞ্চলে এবার প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, সাধারণ ভাবে দক্ষিণ-রুশিয়ায় পুনরায় জার্ম্মাণীর আঘাত পতিত হইবার সম্ভাবনা ; ঐ সময় মস্কো অঞ্চলেও তাহার আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে। আঙ্কারার জনরব—মস্কো অধিকারের উদ্দেশ্যে হিট্‌লার ১০ লক্ষ সৈন্য মজুত করিয়াছেন।

রুশ-রণাঙ্গনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়—জার্ম্মাণী যেন এবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ আরম্ভ করিতে পারিতেছে না। গত বৎসর মে মাসের মধ্যভাগে জার্ম্মাণীর আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও তাহার আক্রমণ আরম্ভ হয় নাই। মিঃ চার্চ্চিল প্রকাশ করিয়াছেন—ধৃত জার্ম্মাণ সেনাপতিদিগের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, টিউনিসিয়ার প্রতিরোধ আগামী আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত চলিবে বলিয়া হিট্‌লার আশা করিয়াছিলেন। টিউনিসিয়া যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত দ্রুত অবসানে জার্ম্মাণ সেনানায়কদিগের পরিকল্পনায় বাধা উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে ; রুশ-রণাঙ্গনে আক্রমণ-পরিচালনে বিলম্বের ইহা অন্যতম কারণ হইতে পারে।

সুদূর প্রাচী—

মধ্য-চীনে জাপ-সৈন্যের পরাজয় এবং উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণী সেনা কর্ত্তৃক আলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আট্টু দ্বীপ অধিকার সুদূর প্রাচীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সম্প্রতি ইয়াংসী নদীর তীরে ইচাংএর নিকটবর্ত্তী স্থানে আড়াই লক্ষাধিক জাপ-সৈন্য আক্রমণরত হইয়াছিল। ইয়াংসী নদীতীরে ইচাংই পশ্চিম দিকে জাপানের শেষ অধিকৃত স্থান ; গত তিন বৎসর এই স্থানটি জাপানের অধিকারভুক্ত আছে। জাপান কি উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এই আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা দুর্ব্বোধ্য। এই অঞ্চলের ধান্যক্ষেত্রগুলি বিধ্বস্ত করিয়া চীনের জনগণের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে ; চুংকিং অঞ্চলের প্রতিরোধ-শক্তির পরীক্ষাও তাহার উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব। যে উদ্দেশ্যেই এই আক্রমণ পরিচালিত হউক, জাপ-সেনা বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়াছে এবং তাহাদের ৩০ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ তীরে ইচাংএর বিপরীত দিক্ হইতে টাং টিং হ্রদ পর্য্যন্ত অঞ্চলে চীনা সৈন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; ইচাংএও তাহাদের আক্রমণ চলিতেছে।

মধ্য-চীনের সাম্প্রতিক যুদ্ধ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আজ ৬ বৎসর জাপানের সহিত অসম যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিবার পরও চীনের সংগ্রাম-শক্তি অটুট আছে। এই যুদ্ধে চীনা সেনা বিমান-বাহিনীর সহযোগ লাভ করিয়াছিল। বিমানবাহিনীর সহযোগে চীনা সৈন্য কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে, তাহাও এই যুদ্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তাহার পর, মার্কিণী সৈন্যের আট্টু দ্বীপ অধিকার। উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থিতি সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন ; গত বৎসর জুন মাসে জাপান এই দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাপান হাওই দ্বীপপুঞ্জকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। নৌ ও বিমানবাহিনীর সহযোগে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্ব-বিস্তারের পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটী হইতে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে আঘাত করাও সম্ভব। পক্ষান্তরে, আলিউসিয়ান্ অঞ্চল হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে জাপ-অধিকৃত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপসমষ্টিতে আঘাত করা যায় ; তথা হইতে দূর-পাল্লার বিমানের সাহায্যে জাপানে প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালিত হওয়া সম্ভব। আলিউসিয়ানের আট্টু ঘাঁটী মার্কিণী সৈন্য ইতোমধ্যে অধিকার করিয়াছে ; কিস্কার উদ্দেশ্যে তাহাদের অভিযান আসন্ন।

মিঃ চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জাপানে বিমান-আক্রমণ-প্রচেষ্টার আভাস দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বিবৃতিতে তিনি এই কথাও বলেন যে, জাপানের সহিত যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য রুশিয়ার সহযোগিতার কথা তিনি ভাবিতে পারেন না। জাপানের বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণে রুশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের ঘাঁটী যদি ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য কেবল পূর্ব্ব-চীনের চেকিয়াং ও ফুকিয়েন্ প্রদেশের ঘাঁটীগুলিই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু অবরুদ্ধ চীনের এই অঞ্চলে জাপানে ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনের উপযোগী বিমান, বিভিন্ন প্রকারের বোমা, মেসিন্ গান ও গোলাগুলী সঞ্চিত হইতে পারে কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। তবে, দূর-পাল্লার মার্কিণী বিমানগুলি আলিউসিয়ান্ অঞ্চল হইতে বহির্গত হইয়া জাপানে বোমাবর্ষণের পর চেকিয়াং ও ফুকিয়েন্ প্রদেশের ঘাঁটীতে আশ্রয় লইতে পারে। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে মিঃ চার্চ্চিলের আশ্বাসের সহিত আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণী সেনার তৎপরতার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হইবে।

১।৬।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত কাঁকুড়গাছির "শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান" এত দিন পরে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে জানিয়া আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্রের কন্যা ও উত্তরাধিকারিগণের সম্মতিক্রমে যোগোদ্যান-পরিচালক স্বামী যোগবিমল গত ৪ঠা বৈশাখ ট্রাষ্ট-ডীড সম্পাদন করিয়া যোগোদ্যান এবং তৎসম্পর্কিত সম্পত্তি বেলুড় মঠে সমর্পণ করিয়াছেন। অতঃপর কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী এই মঠ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণের নিয়ন্ত্রণে সুপরিচালিত হইবে জানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসম্প্রদায় তৃপ্তি লাভ করিবেন।

সার গুরুদাস শতবার্ষিকী

বাঙ্গালার সুসন্তান দেশপূজ্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম-শত-বার্ষিকী স্মৃতি-পূজার উদ্দেশ্যে নারিকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে গুরুদাস শতবার্ষিকী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনীষী গুরুদাসের শত-বার্ষিকী স্মৃতিরক্ষা ও তাঁহার উচ্চ আদর্শের প্রচার-কল্পে বাঙ্গালার বিভিন্ন সংস্কৃতিকেন্দ্রে উৎসব অনুষ্ঠান করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। সার গুরুদাসের মহান্ আদর্শদীপ্ত জীবনের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করিয়া স্মারক-গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনাও হইয়াছে। আমরা আশা করি, সহৃদয় দেশবাসী কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

কুইনাইনের নিদারুণ অভাব

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতিষেধক কুইনাইন দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। যাভা হইতে ভারতে প্রচুর কুইনাইন আমদানী হইত, কিন্তু যাভা এখন জাপানী-অধিকারে। যাভার শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়িগণের স্বার্থহানির আশঙ্কায় সরকার ভারতে সিনকোনার চাষ-প্রচলনের সুব্যবস্থা করেন নাই। এ দেশে যথেষ্ট সিনকোনা গাছ উৎপন্ন হইতে পারিত—কিন্তু কুইনাইন প্রস্তুত করিবার উপযোগী সিনকোনা গাছ উৎপন্ন হইতে ৮ বৎসর সময়ের প্রয়োজন। ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইয়া দরিদ্র গ্রামবাসীরা যদি বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, তবে এই ৮ বৎসর পরে সুলভ মূল্যে কুইনাইন সেবন করিয়া ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন! দক্ষিণ-আমেরিকায় সিনকোনার আবাদ হয়—সমুদ্রপথ এখন অনেকটা নিরাপদ। ভারত সরকার কি দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে সুলভ মূল্যে পর্য্যাপ্ত কুইনাইন আনাইয়া দিতে পারেন না? কেবল কুইনাইন নহে, বহু ঔষধই দুষ্প্রাপ্য—দুর্ম্মূল্যতার জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। সরকার অনায়াসেই ত' তাহা আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত জার্ম্মাণীর মার্কের কারখানা হইতে আনাইয়া দিতে পারেন।

রেজকি দুষ্প্রাপ্য

৩রা জ্যৈষ্ঠ ভারতের অর্থসচিব সার জেরেমি রেইসম্যান বলিয়াছেন এখন ভারতের টাকশালগুলিতে যত রেজকি প্রস্তুত হইতেছে—এত রেজকি কোন দুই বা তিনটি দেশেও প্রস্তুত হইতেছে না। অথচ কলিকাতা ও মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই রেজকির নিদারুণ অভাব। ট্রামে-বাসে—ষ্টেশনে-ডাকঘরে—ব্যাঙ্কে-দোকানে—বাজারে কোথাও রেজকির দেখা মিলে না। ভাঙ্গানীর অভাবে হাট-বাজার করা দায় হইয়াছে! তামার পয়সা মিউজিয়মের দর্শনীয় বস্তু হইয়াছে—ফুটা পয়সারও অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। ভারতের টাকশালে প্রস্তুত এত রেজকি-পয়সা কোথায় উড়িয়া যাইতেছে? ইহা কি প্রস্তুত হইবার পর টাকশালেই মজুত থাকিতেছে? না, শত্রুপক্ষের লোকেরা ইংরেজ-শাসনের প্রতি অসন্তোষ জানাইবার জন্য এত রেজকি-পয়সা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে!

অতঃপর এই সকল 'ফাঁপা' টাকা ভাঙ্গাইয়া কিছু খরচ করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া সরকার একটি নূতন অর্ডিনান্স জারী করিলেই ত' রেজকি-সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হইতে পারে।

সম্পাদক-সম্বর্দ্ধনা

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সুযোগ্য প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ শরীরে শায়িত অবস্থায় ৯ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে সাংবাদিক-সঙ্ঘের অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছেন। রামানন্দ বাবু প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল নির্ভীক নিরপেক্ষ ভাবে রাজনীতিক ব্যাপারের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি আরও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জাতীয় কল্যাণ সাধন করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

লুই ফিসার

মিষ্টার লুই ফিসার মার্কিণের প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সুলেখক। সম্প্রতি মার্কিণের সংবাদপত্রে এবং বহু সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই এ দেশের সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই সে সকল পাঠ করিয়াছেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লী হইতে কেন্দ্রী সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত সরকারের প্রধান মুদ্রাযন্ত্র-সম্পর্কিত পরামর্শদাতার অনুমোদন ব্যতিরেকে ভারতের কোন সংবাদপত্র তাঁহার বক্তৃতার বা লেখার কোন অংশ উদ্ধৃত বা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তাঁহার বক্তব্যের কতকাংশ প্রকাশের পর ভারত সরকার আচম্বিতে এই প্রকার আদেশ কেন জারি করিলেন, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! গত বৎসর মিষ্টার ফিসার ভারতে আসিয়া সেবা-গ্রামে মহাত্মা গান্ধীর সহিত কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক কথাই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা বা কথা এ দেশে প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং মার্কিণে তাহা প্রকাশ করিলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কিণের অধিবাসীদের অনেক ধারণাই পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। সান্ ফ্রান্সিস্কো টাউন-হলে

তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ভারতের অনেক সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচনা প্রকাশে বাধা দিয়া ভারত সরকারের বিশেষ কি লাভ হইবে বুঝা কঠিন! বিলাতের বার্মিংহামের বিশপ ডক্টর বার্ণেস, 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশান', 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জেন' পত্র, মনীষী বার্ণার্ড স, ব্রেলস্‌ফোর্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভারত সম্বন্ধীয় যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন, মিষ্টার ফিসারের কথায় তাহা অপেক্ষা বিশেষ-কিছু আপত্তিকর আছে বলিয়া ত মনে হয় না। তবে মিষ্টার ফিসার একটা কথা বলিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী জাপানের পক্ষপাতী—এ ধারণা একেবারেই ভুল! সেই জন্যই কি তাঁহার উক্তিতে ভারত সরকার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন?

—

মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দাও!

মনীষী বার্ণার্ড স মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভারত সরকারকে বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ঐ কার্য্যের দ্বারা ভারত সরকার ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রে সম্প্রতি তাঁহার ঐ উক্তি বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

—

ডক্টর বার্ণেসের উপদেশ

বার্মিংহামের বিশপ ডক্টর বার্ণেস্ গত মার্চ্চ মাসে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় প্রেমের দ্বারা ভারতবাসীকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। পশুবলের দ্বারা তাহা সংসাধিত হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন—সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে এমন কি অমৃতসরের ঘটনার পর হইতে সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসীর একটা বিশিষ্ট সভ্যতা আছে। তাহারা এই পার্থিব জনসমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে চায়। ভারতের জনসংখ্যা সমধিক এবং নেতৃবর্গও বিচক্ষণ; কাজেই পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ভারতবর্ষও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন—খৃষ্টধর্ম্ম প্রাচী হইতে প্রতীচীতে আসিয়াছে। সুতরাং য়ুরোপীয় অপেক্ষা মহাত্মা গান্ধী খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অনেক মূলতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝেন। খৃষ্টধর্ম্মে যে য়ুরোপীয়দিগের অনুসৃত গুণসমূহ আছে, তাহাও যেমন আমরা দেখাইতে পারি, ভারতবর্ষের লোক তেমনি খৃষ্টধর্ম্মের গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা ভাল ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু ডক্টর বার্ণেসের ঐ কথা সাম্রাজ্যবাদীরা কি মানিতে পারিবেন?

—

অতিরিক্ত লাভ-কর

ভারত সরকার সম্প্রতি দুইটি অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। একটি অতিরিক্ত লাভ-কর-সম্পর্কিত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬নং অর্ডিনান্স। সরকার বলিতেছেন—এই অর্ডিনান্স মুদ্রার স্ফীতি-নিবারণের জন্য পরিকল্পিত। দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ অর্ডিনান্স দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফলে আর কিছু হউক আর না হউক, দেশের শিল্প এবং বাণিজ্য যে বিশেষ বাধা পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রচলিত আইন অনুসারে অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৬৬⅔ অংশ আয়-কর সরকার লইতেন। ইহা ব্যতীত শতকরা ১৩⅓ আয়-কর (Income tax) এবং অতিরিক্ত কর (Super tax) দিতে হইত। ইহাতে ব্যবসায়ীদিগের হাতে শতকরা ২০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত লাভ থাকিত। নূতন অর্ডিনান্সে ব্যবস্থা করা হইল যে, অতিরিক্ত লাভের ঐ যে ২০ টাকা শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীরা পাইতেন, তাহা হইতে আবার শতকরা ১৩⅓ অংশ সরকারের হাতে দিতে হইবে। সুতরাং কারবারীদের পক্ষে অতিরিক্ত লাভ যাহা হইবে, তাহা কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল হইল! ঐ শতকরা ৬⅔ লভ্যাংশ হইতে কারবারীরা অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ এবং লাভ দিবেন। অর্ডিনান্সে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক ভাবে যে লভ্যাংশ জমা দেওয়া হইবে, তাহার ঐ শতকরা ২০ অংশের সুদ শতকরা ২ টাকা হিসাবে সরকার দিবেন। ঐ ২০ অংশের মধ্যে যে শতকরা ১৩⅓ অংশ সরকারের কাছে জমা থাকিবে, ব্যবসায়ীরা যুদ্ধ শেষ হইবার বার মাস পরে অথবা ঐ গচ্ছিত টাকা রাখিবার দুই বৎসর পরে তাহা ফেরৎ পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার তিন বৎসর পরে সরকার ঐ টাকা ফেরৎ দিবেন। সরকার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মুদ্রা-মূল্যের স্ফীতি-সাধনের প্রতিরোধ-কল্পে এই অর্ডিনান্স জারি করিলেন। কারণ, ইহার দ্বারা সরকারের হাতে এক শত কোটি টাকা আমানত হইবে। ইহার ফলে টাকার বাজারে টান পড়িবে; সুতরাং মুদ্রার স্ফীতি-সাধনেরও প্রতিকার হইবে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহার নিয়মগুলি অতি ভীষণ। প্রথমে ত' সরকারী এসেসাররা প্রায় কখন যথাযথ ভাবে আয়ের অনুমান করেন না। আয়-কর-এসেসারদের নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সাধারণের এটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের কৃত আয়ের অনুমান—প্রকৃত আয়ের অতিরিক্তই হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহা হইবে না, এমন বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ীরা যে মাত্র শতকরা ৬⅔ অংশ পাইবেন, তাহাতে তাঁহাদের কার্য্য-পরিচালনায় কোন উৎসাহ থাকিবে না। ইহাতে কেবল তাঁহাদের 'ভূতের বেগার' খাটাই সার হইবে! সকল দেশের লোকই যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত কিছু লাভ করিতেছিলেন। সেই অতিরিক্ত লাভের দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের দেশে যুদ্ধের পর শিল্প-বাণিজ্যের পুনর্গঠনকল্পে অর্থনিয়োগ করিয়া থাকেন। এই অর্ডিনান্সের দ্বারা ভারতবাসীর সে পথ রুদ্ধ করা হইল। ইহা যে দেশের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সেই জন্য দেশে এতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে! মুদ্রার স্ফীতি-সাধনের জন্য মুদ্রামূল্যের হ্রাস হইয়াছে—এ কথা সরকার এ পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। এবার এই অর্ডিনান্স দ্বারা কার্য্যতঃ মুদ্রা-মূল্যের হ্রাসের (inflation) কথা তাঁহারা স্বীকার করিয়া ফেলিলেন এবং সেই অজুহাতে ৭৫ হইতে ১০০ কোটি টাকা এই দেশ হইতে আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন! আমরা কোন মতে সরকারের এই নীতির সমর্থন করিতে পারিলাম না। ইহার দ্বারা ভারতের প্রভূত অনিষ্ট হইবে এবং যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তথাপি সরকার যদি এই অর্ডিনান্স জারি করেন, তাহা হইলে দেশে বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

—

দ্বিতীয় অর্ডিনান্স

দ্বিতীয় অর্ডিনান্সটি আরও ভীষণ। ইহা ভারত-রক্ষার নূতন বিধি। দেশে যাহাতে নূতন যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহার জন্যই যেন ইহা পরিকল্পিত! ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকারের সম্মতি ব্যতীত কেহ কোন প্রকার মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন না; বৃটিশ-শাসিত ভারতে কেহ কোন প্রকার ঋণপত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন না; কেহ কোন কারবারের অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিয়া অংশ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। আসল কথা এই যে, ভারত সরকারের অনুমতি ব্যতীত কেহ কোন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না! কেন্দ্রী সরকার কেবল কার্য্যতঃ সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইহার ফলে দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনের আর উপায় থাকিবে না। শিল্প-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন বিষয়ে সরকারের এইরূপ ঘোর স্বৈরতাপূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে কখনই শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব হইবে না। এইরূপ স্বৈরতাপূর্ণ ব্যবস্থা অন্য দেশে আছে কি না, জানি না। সম্ভবতঃ নাই। সরকার বলিতেছেন যে অতিরিক্ত আয়ের প্রায় সমস্তটাই গ্রাস করিয়া তাঁহারা মুদ্রার স্ফীতিসাধন অর্থাৎ মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস খর্ব্ব করিতেছেন। কিন্তু অন্য দিকে তাঁহারা দেশের মূলধন দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করিতে না দিয়া দেশে যে অতিরিক্ত অনিয়োজিত অর্থ রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে মুদ্রার স্ফীতি কিছুতেই কমিবে না। আমরা সরকারের এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়াছি। ইহাতে সরকার মুখে যাহা বলিতেছেন, কাজে তাহা প্রকাশ পাইতেছে না। আমরা এই দুই অর্ডিনান্সেরই তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। যুদ্ধের পর এ দেশে এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনে যদি বাধা দেওয়া হয় এবং বিদেশ হইতে ভূরি পরিমাণে পণ্য এদেশে আমদানি হয়, তাহা হইলে ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা কস্মিন্ কালে সম্ভব হইবে না। ইহাতে ভারতে আর্থিক বিষয়ে অধীনতা অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ভারতবাসীকে কেবল কাঁচা মালের উৎপাদনে এবং চির-দারিদ্র্যেই আবদ্ধ রাখা হইবে!

বস্ত্রের মূল্য

১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে সরকার ক্রমাগত বস্ত্রের মূল্য হ্রাস এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাহির করিবার আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন। মধ্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় দুই-এক জোড়া না কি বাজারে দেখা গিয়াছিল! তাহাতে বাঙ্গালার জন-সাধারণের বস্ত্রের দুঃখ কিছুমাত্র কমে নাই—দিন দিন এ দুঃখ বাড়িয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের কর্ত্তাদের সহিত বোম্বাই কার্পাস-কলওয়ালাদের সস্তায় কাপড় যোগাইবার একটা চুক্তি হইয়াছে, শুনিলাম। এরূপ কথা বার বার শ্রবণে কান ঝালা-পালা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে নিখিল ভারতে ৭০০ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন ছিল। তাহার মধ্যে ভারতীয় কলগুলি ৪০০ কোটি গজ, তন্তুবায়েরা ২০০ কোটি গজ এবং বিলাত ও জাপান ৭০ কোটি গজ কাপড় দিত। শুনা যায়, ভারত সরকার সামরিক প্রয়োজনের জন্য মিলের উৎপন্ন কাপড়ের শতকরা ৩০ ভাগ লইতেছেন। এইরূপ অবস্থায় যদি ভারতীয় কলগুলি সূতা যোগাইতে পারিত, তাহা হইলে ভারতীয় তাঁতীরা এই বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইত। ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালারা এবং ভারত সরকারের পরামর্শদাতারা এই সহজ পথ অবলম্বন না করিয়া ভিন্ন পথ কেন ধরিলেন, বুঝা কঠিন! আমাদের বিশ্বাস, বোম্বাই কলওয়ালাদের সহিত সরকারের এই পরামর্শ যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে, তাহা বলা যায় না। এ বার দেখিতেছি, অন্ন, বস্ত্র এবং ঔষধের অভাবে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে! সরকারের আশ্বাস যেরূপ ভাবে ব্যর্থ হইতেছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই।

সরকারের আদেশ

সম্প্রতি বঙ্গীয় সরকার ধান-চাউল সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—লোকের ঘরে ঘরে অতিরিক্ত ধান-চাউল সঞ্চিত আছে কি না—তাহার অনুসন্ধান করিবেন। কিন্তু এই কার্য্য পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন; নিরীহ লোক অকারণে যাহাতে উৎপীড়িত না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামে দলাদলি, রেষারেষি প্রভৃতির ফলে অনেক সময় এরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে। সে জন্য এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে সমালোচনার পথ মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালায় খাদ্যসঙ্কট

বাঙ্গালায় কি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহা লইয়া ইদানীং ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের অনুমোদনে বঙ্গীয় সরকার ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার উৎপন্ন খাদ্যশস্যের একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ হিসাব যে সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা সরকার বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালায় ৬৯ লক্ষ টন চাউল জন্মিয়াছে; আর গত বৎসরে ১০ লক্ষ টন চাউল মজুত ছিল। হিসাবের এই পরিমাণ অত্যন্ত অধিক করিয়া ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা ভিন্ন ভারত সরকারও কিছু চাউল, আটা, গম প্রভৃতি দিয়াছেন। ফলে বাঙ্গালায় ৮৭ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য বর্ত্তমানে আছে। অতএব মা ভৈঃ! বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই! তবে লোকে চাউল বাঁধি করিয়া রাখিয়াই যত গোল ঘটাইতেছে! বলা বাহুল্য, এই হিসাব দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। হিসাবে দেখা যায়, গত বৎসর বাঙ্গালায় কিছু কম পৌনে ১৯ কোটি মণ চাউল জন্মিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বৎসর সরকারের প্রকাশিত হিসাব দেখিলে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালায় ২৬ হইতে ২৭ কোটি মণ চাউল জন্মায়। তবে গত বৎসর ধান যে কম জন্মিয়াছিল, এতদ্দারা তাহা সরকার স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালায় যে ধান জন্মায়, তাহার সমস্তই ধান্যোৎপাদক কৃষীবল এবং ক্ষেত্রস্বামীরা বাজারে আনিয়া বিক্রয় করে না। অনুমান—অন্যান্য বৎসর ৫ কোটি মণ চাউল বাজারে বিক্রয়ার্থে আসে; অবশিষ্টাংশ চাষী ক্ষেত্রস্বামীদের কেহ কেহ আপনাদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেয়। গত বৎসর ধান যখন কম জন্মিয়াছিল, তখন বাজারে অপেক্ষাকৃত অল্প

চাউলই বিক্রয়ার্থে আসিয়াছিল। কারণ, কৃষকরা আপনাদের খোরাকী এবং বীজ-ধান না রাখিয়া বিক্রয় করে না। এখন জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালায় কি পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন? ছয় কোটি বাঙ্গালীর জন্য অন্ততঃ ৩০ কোটি মণ চাউলের প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গালায় চাউল জন্মিয়াছে, সরকারী হিসাবেই, কিছু কম ১১ কোটি মণ। সম্প্রতি এক জন বিশেষজ্ঞ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এবার বাঙ্গালায় ৯৪ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন, অর্থাৎ ২৫ কোটি ৬১২ লক্ষ মণ। সুতরাং চাউলের অভাব হইবেই। তদ্ভিন্ন ভারত সরকারের অনুমোদন-ক্রমে বঙ্গীয় সরকারের প্রকাশিত হিসাবে ১০ লক্ষ টন চাউল মজুত ছিল, এ হিসাব একেবারেই হাস্যজনক! ইহার অর্দ্ধেক চাউলও মজুত ছিল কি না সন্দেহ! আমাদের মনে হয়, গত বৎসরের চাউল ৪ লক্ষ টনের বেশী মজুত ছিল না। বরং কম হইতে পারে। ইহা ভিন্ন সরকারী হিসাবে এ প্রদেশ হইতে যে পরিমাণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে, তাহার কোন হিসাব দেখিলাম না! বরং ভারত সরকার ৮০ হাজার টন খাদ্যশস্য দিয়াছেন তাহার উল্লেখ আছে। এই প্রকারে হিসাবে ফাঁকি প্রকট হইলে লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে না। সরকার এবং এখানকার বিদেশী সদাগররা বাঙ্গালা হইতে বিদেশে কত চাউল রপ্তানী করিয়াছেন, তাহার হিসাব এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় নাই। আন্দাজে আমরা কি বলিব? গত বৎসর হইতে উদ্বৃত্ত যে পরিমাণ চাউল পাওয়া গিয়াছিল, সেই পরিমাণ চাউলই বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ইহা ধরিলে বাঙ্গালায় মোট সরকারী হিসাবে পৌণে উনিশ কোটি মণ চাউল পাওয়া গিয়াছে, ধরিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালার প্রয়োজন অন্ততঃ পক্ষে ২৫ কোটি ৬১ লক্ষ মণ। অবশিষ্ট ৬ কোটি ৯২ লক্ষ মণ অর্থাৎ কিছু কম ৭ কোটি মণ চাউলের অভাব পড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পরিমাণ চাউলের সংস্থান না করিলে বাঙ্গালার খাদ্য-সঙ্কটের অবসান ঘটিবে না। হিসাবে অনেক বিষয়ই প্রমাণিত বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় গোঁজামিল দিয়া বোকা বানানো সম্ভব! আসল কথা, বাঙ্গালায় এবার চাউলের অভাব স্পষ্টই প্রকাশমান।

নাজিমুদ্দীনের সচিব-মণ্ডলীর অসাফল্য

প্রায় আড়াই মাস পূর্ব্বে মিষ্টার ফজলুল হকের সচিব-মণ্ডলী পদত্যাগ করিয়াছেন। দেড় মাস কাল নাজিমুদ্দীন-সচিব-মণ্ডলী সচিবের গদী দখল করিয়া আছেন। তাঁহারা গদী পাইয়াই আশ্বাসের লম্বা লম্বা বহু বাণী দিতেছেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের সে আশ্বাস-বাণী বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে! তাঁহারা বলিতেছেন, বাঙ্গালায় খাদ্য-শস্যের অভাব নাই। আবার বলিতেছেন, বাঙ্গালী চাউলের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু অর্থাৎ আটা, যোয়ার, বাজরা, ছোলা, ভুট্টা প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করুক! তাহা হইলে তাহারা পরাক্রমশালী পালোয়ান হইয়া দাঁড়াইবে! কিন্তু সেই আটা প্রভৃতিও বাজারে তাঁহাদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গালীর এখন পালোয়ান হইবার বাসনা অপেক্ষা প্রাণ-বাঁচানোর বাসনাই বলবৎ। খাদ্যশস্যের মূল্য এখনও দিন দিন বাড়িতেছে। অনেক সময়ে চাউল মিলিতেছে না। যদি বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে থাকিত, তাহা হইলে সুরাবর্দ্দী সাহেব বাঙ্গালীকে তাহাদের দুষ্পাচ্য বাজরা, ভুট্টা খাইবার সুপরামর্শ অবশ্যই প্রদান করিতেন না! ও দিকে ডক্টর গুহ বাঙ্গালীকে ঘাসের চপ অর্থাৎ বড়া খাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সে বড়া ভাজিবার জন্য সরিষার তৈল বা কোথায় মিলিবে? চাউলের প্রাচুর্য্যই যদি থাকিবে, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে ঘাস খাইবার পরামর্শ দেওয়া হইবে কেন? ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার এক জন ছোটলাট বাঙ্গালীকে তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে কেশুর খাইবার পরামর্শও দিয়াছিলেন। যথারীতি পারিশ্রমিক দিয়া সে দিন এক জন অধ্যাপক-মারফৎ রেডিও আসর হইতে কচুসিদ্ধ, ওলসিদ্ধ, রাঙাআলু সিদ্ধ খাইবার সৎপরামর্শও বিতরিত হইয়াছে! ইঁহারা মনে করেন যে, বাঙ্গালী সব খাইয়াই হজম করিতে পারে! ইতোমধ্যে নাজিমুদ্দীন সচিব-মণ্ডলী মফঃস্বলে দুই-এক স্থানে কণ্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রিত দোকান খুলিয়া নির্দ্ধারিত মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতেছিলেন। ব্যক্তি-পিছু এক পোয়া করিয়া চাউলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচ ছয় দিন যাইতে না যাইতে সে চাউল ফুরাইয়া গেল! যে অতি দরিদ্রদিগকে ঐ চাউল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দেওয়া হইতেছিল, তাহাদের সকল আশা নৈরাশ্যের অকূল পাথারে বিলীন হইল! ইহাতে কি এ প্রদেশে চাউলের প্রাচুর্য্য প্রমাণিত হয়? সুতরাং সকল দিক্ দিয়াই তাঁহারা নিজেদের বিফলতাকেই বিকট ভাবে ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছেন! আটা ময়দা—তাহাও ত পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া গুপ্ত ধান্য ও চাউল বাজারে আনিয়া দাখিল করিবেন বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন! এবং সে জন্য অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাও চাহিতেছেন! কিন্তু ইহাতেও যদি চাউলের মূল্য তাঁহারা কমাইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এ লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে কোথায়? আবার শুনিতেছি, এবার বোরো ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মানয় ময়মনসিংএ চাউলের মূল্য মণকরা তিন-চার টাকা কমিয়া গিয়াছে। আর আউস ধান্য হইলেই বাঙ্গালায় না কি আর কোন ভাবনা থাকিবে না! ভাদ্র মাসের পূর্ব্বে ত আউস ধান্য হইবে না, হইলেও সকলে উহা খাইয়া হজম করিতে পারিবে না। লোকে অনাহারে না মরিয়া উদরাময়ে মরিবে! অতএব সচিব মহাশয়েরা রসনা সংযত করিয়া হাতে-হাতিয়ারে তাঁহাদের কার্য্যের ফল প্রদর্শন করুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ!

মুক্তির প্রহসন

ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস্ গাওয়ার এই মর্ম্মে রায় দিয়াছিলেন যে, ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা বর্ত্তমানে যে আকারে রচিত রহিয়াছে, তাহা অবৈধ। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও বিশেষ আদালতে বসিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ অর্ডিনান্সের ৫, ১০, ১৪ এবং ২৬ ধারাগুলি অবৈধ। তদনুসারে কলিকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস্ কর্পাশ্ আইন অনুসারে শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ নয় জন সিকিউরিটি বন্দীকে মুক্তি দিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। এই মামলার বিচারের জন্য বিচারপতি মিষ্টার মিত্র, মিষ্টার খোন্দকার এবং মিষ্টার সেনকে লইয়া বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছিল। মামলার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে

তিন জন একমত হইতে পারেন নাই। বিচারপতি মিত্র এবং সেন একমত হইয়া বন্দীদিগকে মুক্তির আদেশ দেন। বিচারপতি খোন্দকার ভিন্ন-মত প্রকাশ করেন। তদনুসারে হাইকোর্টে ২০শে জ্যৈষ্ঠ বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার পর তাঁহারা বিচার-কক্ষ হইতে বারান্দায় আসিবামাত্র পুলিস ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। এই ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি! আইন অনুসারে গঠিত আদালত মুক্তি দিতে বলিলে যদি বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়, তাহা হইলে আদালতের সে আদেশের মূল্য কি? ইংরেজের শাসনে আইনের মর্য্যাদা সর্ব্বদা রক্ষিত হয়, এ ধারণা মোটের উপর এ দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল। আইনের দ্বারা শাসকগণ নিয়ন্ত্রিত—ইহাই লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এইরূপ ব্যাপারে সে ধারণা এবং সে বিশ্বাস বিশেষ ভাবে বিচলিত হইয়াছে। ইহাতে আদালতের মর্য্যাদাহানি হইয়াছে কি না এ স্থলে এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনা করিব না। কুমারী মীরা দত্তগুপ্তার আবেদন অনুসারে উহা একটি স্বতন্ত্র মামলার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এ মামলা এখন বিচারাধীন; সুতরাং সে সম্বন্ধে এখন কোন মন্তব্য প্রকাশ করা চলে না। কিন্তু এরূপ ভাবে যদি আদালতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়, তবে স্বতঃই ইহা মনে হয় যে, এখন ভারতে বৃটিশ শাসনে আইন এবং আদালতের আদেশ অপেক্ষা শাসকগণের স্বৈরিতাপূর্ণ আদেশই বলবত্তর। লোকের মনে এরূপ ধারণা জন্মিতে দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। ইহাই যদি শাসনকর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এত টাকা খরচ করিয়া এই বিশাল ভারতে আদালত ও ব্যবস্থা পরিষদ রাখিবার সার্থকতা কি?

---

৩ নম্বর

যখন পঞ্জাবে লালা লজপত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংহকে—স্বদেশী আন্দোলনের সময়—১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনের বলে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করা হয়, তখন তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি উহাকে "মরিচা ধরা তরবার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। উহা যে বর্ত্তমানের উপযোগী ব্যবস্থা নহে, তাহাই তাঁহার মত ছিল। কিন্তু তাহার পর এ দেশে সরকার বহু বার সেই রেগুলেশন ব্যবহার করিয়া লোককে বিচারে বঞ্চিত করিয়াছেন। এ বার যখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে যাঁহাদিগকে ভারতরক্ষা নিয়মের ২৬ ধারায় আটক রাখা অসিদ্ধ বলা হয়, সরকার তাঁহাদিগকে আদালত গৃহেই এই রেগুলেশনের বলে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়াছেন, তখন—সেই কার্য্য আদালতের অপমান কি না, তাহা বিবেচনাকালে অনেক প্রশ্নই আদালতের বিবেচ্য হইবে, সন্দেহ নাই। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল ঐ রেগুলেশন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ঐ বিধি অনুসারে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে হইলে সপার্ষদ বড় লাটের নির্দ্দেশে কেন্দ্রী সরকারের কোন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীকে ওয়ারাণ্ট জারি করিয়া তাহা যে কর্ম্মচারীর অধীনে ধৃত ব্যক্তিকে রাখা হইবে, তাঁহাকে দিতে হয়। তাহার পূর্ব্বে—যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইবে, তাঁহাকে আটক করিবার যথেষ্ট কারণ আছে কি না এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আটক রাখা সঙ্গত কি না, সে সব সপার্ষদ বড় লাটকে বিবেচনা করিতে হইবে।

সপার্ষদ বড় লাটের এই ক্ষমতা তিনি কোন প্রাদেশিক গভর্ণরকে বা প্রাদেশিক সরকারকে হস্তান্তরিত করিতে পারেন কি না, তাহা প্রথম বিবেচনার বিষয়। যদি বড় লাটের হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে কলিকাতা হাইকোর্ট তাঁহাদিগকে মুক্তিদানের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাদিগকে ঐ বিধিবলে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আদেশ করিবার পূর্ব্বে সপার্ষদ বড় লাট তাঁহাদিগের অপরাধ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া এ বিধিই প্রযোজ্য এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন কি না? আর যে ওরারেণ্ট বলে জন কয়েক পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে তাহাতে ভারত সরকারের কোন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর স্বাক্ষর ছিল কি না এবং কাহার অধীনে তাঁহাদিগকে রাখা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল?

তাহার পর প্রত্যেকের জন্য যে ব্যয় (ভাতা) নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা কি হাইকোর্ট বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়া দিতে পারেন না?

যে ভাবে কলিকাতা হাইকোর্ট যাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ৩ নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আজ আমরা এই সকল বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি।

আমরা এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলেই দমনমূলক বিধিসমূহের প্রত্যাহার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে সমিতি রাষ্ট্রীয় পরিষদ কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতি এই ৩ নং রেগুলেশন বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া কেবল সামন্ত রাজ্য ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন। সার তেজ বাহাদুর সপরু সেই সমিতির সভাপতি এবং কেন্দ্রী সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সদস্য সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট সেই সমিতির সদস্য ছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার অদ্যাপি সেই পরিবর্ত্তন করেন নাই। কি ভাবে তাঁহারা ইহা প্রযুক্ত করিতেছেন, তাহা আমরা এ বারও দেখিতে পাইতেছি। পরিবর্ত্তন না করায় কি রাষ্ট্রীয় পরিষদের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে?

লর্ড মিণ্টো বড় লাট হইয়া যখন এই রেগুলেশনের প্রয়োগে বাহুল্য করিয়াছিলেন, তখন অগত্যা তাহাতে সম্মতি দিলেও তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি বলিয়াছিলেন:—

(১) যাঁহাকে ঐ রেগুলেশনে নির্ব্বাসিত করা হইবে, তাঁহার যত্নসহকারে পরিকল্পিত কার্য্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইলে তিনি রেগুলেশন প্রয়োগ সমর্থন করিবেন না।

(২) এক বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ দিতেছেন—কোন ক্ষেত্রে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান না হয়।

আমরা মিষ্টার আমেরীর নিকট হইতে অবশ্যই লর্ড মর্লির মনোভাবের ও মনুষ্যত্বের পরিচয়-প্রাপ্তি আশা করিতে পারি না। কারণ, লর্ড মর্লির মত ছিল—

(১) ইংরেজ অবশ্যই ভারতে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। কিন্তু অতিরিক্ত কঠোরতায় শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না—তাহাতে অনাচার উদ্ভূত হয়।

(২) যে সকল উপায় পূর্ব্বে সমর্থনযোগ্য ছিল, সে সকলই বর্ত্তমানে প্রযোজ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

আজ আমরা কেবল মনে করিতে পারি—আমাদিগকে হয়ত অনেক স্বৈরশাসনদ্যোতক কায সহ্য করিতে হইবে। কারণ, আমরা যে দেশে বাস করি, সে দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল নহে—তাহা পরাধীন।

আল্লাবক্সের হত্যাকাণ্ড

সিন্ধুপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার মহম্মদ উমার আল্লাবক্স গুণ্ডার হস্তে গত ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদে ভারতের সর্ব্বত্রই ঘোর বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ—যে স্থানে তাঁহাকে হত্যা করা হয়, তাহার নিকটে এক দল পুলিসের লোক ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া পলাইবার সময় ঐ গুণ্ডাকে ধরিবার জন্য পুলিস কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ পায় নাই! যেখানে এক দল পুলিসের লোক ছিল, সেখান হইতে খুনী গুণ্ডা পলাইতে পারিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! আল্লাবক্সের আততায়ীকে ধরিবার জন্য পুলিস দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে সত্য, কিন্তু আততায়ী এখনও ধরা পড়ে নাই। সিন্ধু ব্যবস্থাপক পরিষদে ইতঃপূর্ব্বে আরও দুই জন সদস্য গুণ্ডার হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেও পুলিস ধরিতে পারে নাই। সিন্ধু ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিষ্টার পামনাল্ এবং শীতল দাসকে যাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহারাও এ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। সিন্ধু প্রদেশের পুলিসের এই লজ্জাজনক অসাফল্য চিরকাল ইতিহাসের পৃষ্ঠা কালিমা-লাঞ্ছিত রাখিবে। সিন্ধু প্রদেশকে স্বতন্ত্র করিবার পর মিষ্টার আল্লাবক্স দুই বার সেখানকার প্রধান সচিব-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সাধনে তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে স্বাধীন মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের ভেদ-নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রুর সমিতিতে এক জন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। আল্লাবক্স যত দিন প্রধান-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তত দিন মুসলিম লীগ মুসলমান-প্রধান সিন্ধুপ্রদেশে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। খাঁ বাহাদুর এবং ও, বি, ই উপাধি ত্যাগ করিয়া বড় লাটকে পত্র লেখার জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সিন্ধুপ্রদেশে মুসলিম লীগের সচিবত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আল্লাবক্সের পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। মুসলমান সমাজের এক জন বিশিষ্ট এবং স্মরণীয় ব্যক্তি বলিয়া যে তিনি সম্মানিত থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আল্লাবক্স

তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে

মুঙ্গেরের জনকল্যাণব্রত প্রবীণ ব্যবহারাজীব তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৭৭ বৎসর বয়সে ২০শে জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তারাভূষণ বাবু আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা—সম্পদ—সম্মান অর্জ্জন করিয়াই নিরস্ত হন নাই; স্বদেশী শিল্পের উন্নতি-বিধানে বিহারে তিনি চিনির কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্র-অনুশীলনেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত মুঙ্গেরে কয়েকটি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া তিনি বিপন্নদিগকে চাউল, বস্ত্র ঔষধাদি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী আজও বিদ্যমান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক—নাট্যকার—বোম্বাইয়ে ফিল্ম ডিরেক্টার। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণকে সমবেদনা জানাইতেছি।

তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তার সার নীলরতন সরকার পরলোকে

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর স্বনামধন্য ডাক্তার সার নীলরতন সরকার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ৮২ বৎসর বয়সে গিরিডিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ডায়মণ্ড হারবারের ন্যাতড়া গ্রামে দরিদ্র পরিবারে নীলরতনের জন্ম। ছাত্র-জীবনেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ সূচিত হইয়াছিল। তিনি বৃত্তি পাইয়া এণ্ট্রাস ও এফ-এ

পাশ করেন। কিছু দিন ক্যাম্পবেলে ডাক্তারী পড়িবার পর মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। বি-এ পাশ করিয়া তিনি চাতরা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেয়ো হাসপাতালের হাউস সার্জ্জেন হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এম-এ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি হন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। তিনি ভারতীয় চিকিৎসকগণের শ্রেষ্ঠ স্থান সগৌরবে অধিকার করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি য়ুরোপে গমন করিলে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'এল, এল, ডি'—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি, পি, এল' উপাধি প্রদান করেন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পোষ্টগ্রাজুয়েট আর্টস্ ও সায়েন্স বিভাগের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ইহাতেই সার নীলরতনের সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক নব নব যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইবামাত্র যতই ব্যয়সাধ্য হউক, তিনি তাহা সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করিতেন। তিনি স্বদেশী শিল্পের উন্নতি বিধান ও সংগঠন প্রয়াসে চামড়ার কারখানা এবং ন্যাশন্যাল সোপ ইণ্ডাষ্ট্রী প্রভৃতি স্থাপন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া অগাধ উপার্জ্জন সত্বেও বিশেষ কিছু সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

ডাক্তার সার নীলরতন সরকার

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হইয়া বিভিন্ন শাখার সম্পাদকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'নাইট' হন। ১৯১২—১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের সভাপতি এবং ১৯১৮ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত মেডিকেল কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

সার নীলরতনের কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে। দরিদ্র সন্তান যে আত্মশক্তি-বলে স্বাবলম্বী হইয়া সাধনা-প্রভাবে শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে পারেন, তাঁহার মহান্ জীবন তাহার সমুজ্জ্বল আদর্শ। উদ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালী সে আদর্শ অনুসরণে আশান্বিত—উদ্দীপিত হইবেন।

—

ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে

আমাদের বাল্যবন্ধু প্রতিভাবান্ ঐতিহাসিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল ৫২ বৎসর বয়সে ৭ই জ্যৈষ্ঠ সহসা সন্ন্যাসরোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। নারায়ণচন্দ্র তাঁহার পিতা রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মে পরম নিষ্ঠাবান্—হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি রক্ষা-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রণীত কৌটিল্য অর্থনীতি ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 'মাসিক বসুমতীতে' পূর্ব্বে ও সম্প্রতি বৈশাখ সংখ্যায় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজের আগমন-কালে বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ অনুশীলনে তথ্য সঙ্কলন করিয়া তিনি গ্রন্থ-রচনায় সমাহিত ছিলেন। আমরা তাঁহার অকাল-বিয়োগে বন্ধু-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গৌরীশঙ্কর

[শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

মাসিক বসুমতী

২২শ বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৫০ | ৩য় সংখ্যা

সংস্কৃত নাট্যে প্রহসন

২

কি দার্শনিক-চিত্তে—কি কবি-হৃদয়ে দুঃখবাদের প্রভাব বড় কম নহে। বিশ্বের বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে দুঃখময় চিত্র—কবি ও দার্শনিকদের এতই আকর্ষণ করে যে, অধিকাংশ কাব্য ও দর্শন—দুঃখের কথা লইয়াই পরিপূর্ণ হইয়া আছে।

শুধু বেদান্ত-দর্শনে যেমন চরমে এক পরম আনন্দের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে, দশরূপকের মধ্যেও একমাত্র প্রহসনে নিরাবিল আনন্দধারার উৎস প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রহসনে দুঃখ-বেদনা বা অশান্তিকর আবেগ-উদ্বেগময় ভাবের স্থান নাই। এ জন্য 'ভগবদজ্জুকীয়ম্' নামক প্রহসনের প্রস্তাবনায় সূত্রধার-মুখে কবি বলিতেছেন—অথ তু নাটক-প্রকরণোদ্ভবাসু ঈহামৃগডিমসমবকারব্যায়োগভাণ-সল্লাপবীথ্যুৎ-সৃষ্টিকাঙ্কপ্রহসনাদিষু দশজাতিষু নাট্যরসেষু হাস্যমেব প্রধানমিতি পশ্যামি। তস্মাৎ প্রহসনমেব প্রয়োক্ষ্যামি।

অর্থাৎ আমি দেখিতেছি—'নাটক প্রকরণ হইতে উদ্ভূত ঈহামৃগ প্রভৃতি দশ জাতির মধ্যে—নাট্যরসে হাস্যই প্রধান, সুতরাং প্রহসন-প্রয়োগ অভিনয় করিব।'

নাট্যরসের মধ্যে হাস্যকে প্রধান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—প্রহসন-অভিনয় দর্শনে যে অবিমিশ্র আনন্দলাভ করা যায়, তাহা অন্য রসের অভিনয় অপেক্ষা বিজাতীয়, ইহাই যেন 'ভগবদজ্জুকীয়ম্' প্রহসন লেখকের অভিপ্রায়।

সাধারণতঃ বলা যায় বটে যে, কবি যখন প্রহসন লিখিতেছেন,—তখন প্রহসনকে বড় করিবার জন্যই হাস্যরসকে প্রধান বলিয়াছেন; যেমন বেদব্যাস যখন শৈবপুরাণ লিখিয়াছেন, তখন শিবকেই পরম দেবতা বা ব্রহ্মরূপে বলিয়াছেন; আবার যখন বৈষ্ণব-পুরাণ লিখিয়াছেন, তখন বিষ্ণুকেই পরমেশ্বররূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—এই যুক্তিতে প্রহসন অভিনয়-প্রসঙ্গে হাস্যরসকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ আলঙ্কারিকগণের দৃষ্টিতে শৃঙ্গার-রসই আদি বা প্রধান রস, হাস্যরস কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে না।

এ বিষয়ে একটু বিচার্য্য আছে। শৃঙ্গাররসের দুইটি ভেদ আছে—একটি সম্ভোগ-শৃঙ্গার, দ্বিতীয়টি বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। এই বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সহিত করুণরসের অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় শ্রোতৃবৃন্দের অশ্রুপাতাদি বিকার ঘটিয়া থাকে। উভয়ের পার্থক্য এই যে, করুণ-রসে—শোক হইল স্থায়িভাব এবং বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে রতি স্থায়িভাব, কিন্তু শৃঙ্গারেও দুঃখ-দৈন্য-বৈবর্ণ্য-অশ্রুপাত প্রভৃতি সম্ভবপর বলিয়া শ্রোতৃচিত্তে করুণ-রসের মতই বিকার বিশেষ উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং শৃঙ্গার ও করুণরসে চিত্ত যে ভাবে দ্রবীভূত হয়, হাস্যরসের অভিনয়ে সেরূপ কোন বিকার ঘটে না। রৌদ্র, বীভৎস—ভয়ানক রসের অভিনয়ে চিত্তের যেরূপ অস্থিরতা ও উদ্বেগের অনুভূতি আসে, হাস্যরসে তাহাও হয় না। এই বিজাতীয় আনন্দ—হাস্যরস হইতেই শ্রোতৃ-চিত্তে সম্ভবপর হয় বলিয়া, মনে হয় 'ভগবদজ্জুকীয়ম্' নামক প্রহসন রচয়িতা হাস্যরসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। যদিও আলঙ্কারিকগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—

> করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
> সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।

করুণ, বীভৎস, ভয়ানক প্রভৃতি রসেও যে পরম আনন্দ উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে সহৃদয়দিগের অনুভবই একমাত্র প্রমাণ।

> 'কিন্তু তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ'

যদি উক্ত রসে দুঃখ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কেহই সেই সমস্ত রসের অভিনয়-দর্শনের জন্য উন্মুখ হইত না। কে ইচ্ছা করিয়া আত্মদুঃখ বরণ করে? লৌকিক জগতের দুঃখ—কাব্যজগতে চিত্রিত হইলেই তাহা অলৌকিক আনন্দময় হইয়া উঠে, নতুবা আজও শত শত শ্রোতা রামের বনবাস বা হরিশ্চন্দ্র-চরিত অভিনয় দর্শনের জন্য

ব্যাকুল হয় কেন ? মোটের উপর সমস্ত রসের অভিনয়েই যে আনন্দ-সম্ভোগ হয়, এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই (১)। তথাপি, হাস্যরসের অভিনয়ে বিক্ষেপরহিত একটি বিজাতীয় নির্ম্মল আনন্দ উদ্ভূত হয়, ইহাও সহৃদয়-হৃদয়বেদ্য। প্রহসনের অভিনয়ে যে প্রাণ-খোলা হাসির উদয় হয়, তাহা অন্যবিধ নাট্যাভিনয়ে অনুভূত হয় না।

শান্তরসে চিত্তের বিক্ষেপ বা উদ্বেগসৃষ্টি করে না, হাসির উল্লাসও হয় না, এ জন্য শান্তরসের দ্বারা প্রহসনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

প্রহসন কেবলমাত্র হাস্যোল্লাসের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য না হইলেও হইতে পারে, হাস্যরসের মধ্যে কোন একটি বিশিষ্ট আদর্শ প্রদর্শিত হইলে তাহাকে dignified বা উচ্চাঙ্গের প্রহসন বলা যায়। সে ভাবে বিচার করিলে—'ভগবদজ্জুকীয়ম্' এক অপূর্ব্ব রচনা, ইহাতে শান্তরসের সহিত হাস্যরসের মিশ্রণে—চাপল্যরহিত এক গভীর হাস্যরস সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার টীকাকার গূঢ়ার্থ নামক যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহাতে শিষ্যের হাস্যরসের মধ্যেও অন্তঃস্রোতা তত্ত্ববার্ত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব্বপ্রবন্ধে এই প্রহসনের উপাখ্যান-ভাগ প্রদত্ত হইয়াছে ; এক্ষণে রচনা-প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি—

পরমযোগী পরিব্রাজক গভীর বেদান্ততত্ত্বগুলি সরস ও শান্তভাবে উপদেশ করিতেছেন, শিষ্য প্রশ্নের ছলে হাস্যরস সৃষ্টি করিতেছে। যেমন,—পরিব্রাজক বলিলেন,—'বৎস ! রাগদ্বেষ হইতে উদাসীন হওয়ার নাম অসঙ্গতা'। এই কথায় শিষ্যের নিজের বেদনার কথা মনে হইল, অধ্যয়ন না করিলে গুরু মধ্যে মধ্যে প্রহার করিয়া থাকেন, প্রহার যিনি করেন, তিনি অবশ্যই দ্বেষের বশীভূত, ইহা মনে করিয়া শিষ্য বলিল—'অসঙ্গতা কি কোথাও আছে ?' গুরু—'অসদ্বস্তুর কি নাম থাকে ? (অসঙ্গতা—এরূপ শব্দ যখন আছে, তখন ইহার অস্তিত্বও আছে, ইহাই তাৎপর্য্য। টীকাকার এখানে দেখাইয়াছেন যে,—শশবিষাণ প্রভৃতি শব্দের যে অস্তিত্ব আছে, তাহার কারণ শশ পদার্থ এবং বিষাণ পদার্থ উভয়ই প্রসিদ্ধ এবং তাহাদের সম্বন্ধও পৃথগ্‌রূপে অপ্রসিদ্ধ নহে)'।

শিষ্য বলিল,—অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা কি (practice) করা যায়—এ কথা আপনি বলেন ?

গুরু। তাহাতে সংশয় কি ?

শিষ্য। ইহা অলীক, অলীক, (শিষ্য উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গুরুর এই ধারণা যে অলীক, তাহা ঘোষণা করিল)।

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ?

শিষ্য। ভগবন্—আপনি আমার উপর কুপিত হ'ন কেন ?

গুরু। তুমি পড় না, এজন্য।

শিষ্য। আমি পড়ি বা না পড়ি, আপনি মুক্ত (পুরুষ)—আপনার তাহাতে কি ?

গুরু। ও কথা ব'লো না। শিষ্যের শিক্ষার্থ তাড়ন করা বিধেয়, এজন্য কুপিত না হইয়াই আমি তোমায় তাড়না করিয়া থাকি।

শিষ্য। আশ্চর্য্য ! কোপ নাই—অথচ আমাকে প্রহার করেন ? শিষ্য আর সুবিধা না পাইয়া বলিল—এ কথা ছাড়িয়া দিন, ভিক্ষার সময় যে বহিয়া যায় !

গুরু বলিলেন,—মূর্খ, এখনও মধ্যাহ্ন হয় নাই, ইহা পূর্ব্বাহ্ণকাল, যখন মুষল ভূতলে পড়িয়া থাকিবে, অগ্নিনির্ব্বাণ হইবে, সকলের আহার সমাপ্ত হইবে, তখন আমাদের ভিক্ষার সময়—ইহাই উপদেশ, সুতরাং বিশ্রামের জন্য চল যাই—ঐ উদ্যানে প্রবেশ করি।

শিষ্য এইবার মজা পাইল এবং বলিয়া উঠিল—হা ! হা ! এইবার আপনার প্রতিজ্ঞাহানি হইয়াছে।

গুরু। কেমন করিয়া ?

শিষ্য। আপনার পক্ষে ত' সুখ-দুঃখ দুই-ই সমান। (তবে, আবার বিশ্রাম চা'ন কেন ?)

গুরু। হাঁ, আমার আত্মা সমদুঃখ-সুখ ; কিন্তু কর্ম্মাত্মা বিশ্রাম চায়।

শিষ্য উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—এই আত্মাই বা কে ? আর ঐ কর্ম্মাত্মাই বা কে ?

গুরু। শুন,—সুষুপ্তি কালে যিনি আকাশবৎ (ব্যাপক এবং উপাধিশূন্য) হ'ন, তিনিই আত্মা ; আর কর্ম্মফলবশে যিনি দেহধারণ করিয়া নরনামে বা অন্যনামে কথিত হ'ন, তাঁহাকে কর্ম্মাত্মা বলা হয়। এই কর্ম্মাত্মাই বিশ্রামসুখ-ভাজন হইয়া থাকে।

শিষ্য একটু কথাটা ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—যিনি অজর, অমর, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য তিনি আত্মা ; আর যিনি স্বয়ং হাসেন, অপরকে হাসান, শয়ন, ভোজন করেন ও বিলীন হ'ন—তিনি কর্ম্মাত্মা,—এই ত' ?

গুরু ইহাতে খতকটা সম্মতি প্রদান করিবামাত্র শিষ্য বলিল—প্রভু, এইবার—স'রে পড়ুন,—নতুবা আমার কাছে ধরা প'ড়ে যাবেন (অর্থাৎ নিগ্রহস্থানের বিষয় হইবেন)

গুরু। কিরূপে শুনি।

শিষ্য। যিনি আত্মা তিনিই ত' এখন কর্ম্মাত্মা। শরীর ব্যতীত আর ত' কিছুই নাই।

(কর্ম্মাত্মার অস্তিত্বস্বীকার করিলে শরীরভেদে আত্মার ভেদ স্বীকার করিতে হয়, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত তাহা নহে)

গুরু। আরে—ইহা লৌকিক ভাবে বলিয়াছি। জীবভেদে দেহভেদ, ইহাও ত' শাস্ত্র হইতে শুনা যায়—তাই এইরূপ বলিয়াছি।

শিষ্য তখনও জিদ্ ছাড়িল না, জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা সব থাক্—আপনি কে—বলুন দেখি ?

গুরু। আমি প্রাণিধর্ম্মবিশিষ্ট কোন একটি পদার্থ, পাঞ্চভৌতিক সচল দেহ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়-সমন্বিত—নরনামধারী।

শিষ্য। হা ! হা ! এমনি ভাবে নিজেকেই জানেন না, আবার পরমাত্মা জানিবেন কিরূপে ? (২)—ভগবন্—এই ত' উদ্যান।

গুরু। আগে প্রবেশ কর, আমরা ত' শূন্য গৃহ বা অরণ্যে থাকিতেই চাহি।

---

(১) হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ।
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ॥
(সাঃ দঃ ৩ পরিঃ, ৬৭)।

(২) নিজেকে পরমহংস বলিয়া প্রকাশ না করায়, সাধারণ সকল মানুষের মত নিজেকে মনে করায়—শিষ্য বুঝিল, গুরু নিজেকেই জানেন না।

শিষ্য। প্রভো, আপনিই আগে চলুন, আমি পিছনে পিছনে যাইতেছি।

গুরু। কি জন্য ?

শিষ্য। আমার মা—এক জন পৌরাণিক, তাঁর মুখে শুনিয়াছি, অশোক-পল্লবের অন্তরালে বাঘ বাস করে। তা' আপনিই আগে যা'ন—আমি পিছনে আছি।

গুরু। বেশ।

শিষ্য। (পিছু পিছু যাইতে যাইতে) গেলাম গো! আমায় বাঘে ধরেছে! বাঘের মুখ হ'তে আমায় রক্ষা কর। অনাথের ন্যায় আমি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হ'লাম। কণ্ঠদেশ হ'তে রক্ত পড়ছে যে!

গুরু। শাণ্ডিল্য! ভয় নাই, ভয় নাই; এটা ময়ূর।

শিষ্য। সত্য ময়ূর ?

গুরু। হাঁ, সত্যই ময়ূর।

শিষ্য। যদি ময়ূর হয়, তাহা হইলে এইবার চোখ খুলি ?

গুরু। স্বচ্ছন্দে।

শিষ্য। ওরে! বেটা বাঘ আমার ভয়ে ময়ূররূপ ধ'রে পলাইল!

অজ্ঞ শিষ্যের পূর্ব্ব সংস্কারবশে অলীক ব্যাঘ্রভীতি এবং গুরুর দৃঢ়তাসহকারে তাঁহার অপনোদন—ইহা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনই কৌতুকাবহ (৩)।

সেই উদ্যানে প্রবেশের পর—গুরু-শিষ্য উপবেশন করিলে উভয়ের মধ্যে তত্ত্বকথার আলোচনা চলিতে লাগিল। শিষ্য উদরচিন্তায় বিভোর, গুরু তখনও সদুপদেশদানে বিমুখ নহেন। কিয়দ্দূরে এক গণিকা গান ধরিল—

> মধুমাসজাতদর্পঃ
> কন্দর্পঃ কামিনীকটাক্ষসখঃ।
> অপি যোগিনামিহ মনো
> বিধ্যতি ফুল্লৈরশোকশরৈঃ॥

শিষ্য এই গানশ্রবণে গুরুকে বলিল—কণ্ঠ হইতে মধুবর্ষণ হইতেছে—ভগবন্, একটু শুনুন।

(৩) টীকাকার এখানে এক গূঢ় ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—অশোকপল্লব মনোহর বলিয়া ইহা বিষয়স্বরূপ, ব্যাঘ্র হিংস্র বলিয়া বিষয়াভিলাষ-তুল্য এবং বিষয়ের দোষদর্শন হইলে তাহা ময়ূরের মতই মৃদুলস্বভাব হইয়া যায়।

ভগবদজ্জুকীয়ম্ 'প্রহসন'খানি সমস্তই যে রূপকের উপর কল্পিত, তাহা টীকাকার ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনটি শ্লোক উল্লেখ করিয়া রূপকটি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

> অস্মিন্ নাট্যরসে নিসর্গগহনে যোগীন্দ্রশিষ্যাবুভা-
> বাত্মানৌ পরজীবশব্দকথিতাবন্যা তথৈবাজ্জুকা।
> মূলাধারসমুদ্গতা সসুষিরা নাড়ী সুষুম্নাহপরে
> চেটৌ চোভয়পার্শ্বগে সসুষিরে নাড্যাবিড়াপিঙ্গলে॥
> অবিদ্যা গণিকামাতা মহান্ রামিলকো মতঃ।
> বৈদ্যৌ বিকল্পসঙ্কল্পৌ কালস্তু যমপুরুষঃ॥
> এবং প্রেক্ষাময়ং যোগং যুঞ্জন্ নর্ত্তকতাপসঃ।
> প্রত্যক্ষমচ্যুতং সত্ত্বঃ সাক্ষাৎকৃত্য সুখী ভবেৎ॥

গুরু। শুধু শব্দ গ্রহণ করিবার জন্যই বর্ণের প্রয়োজন, ইহাতে আসক্তি রাখিব না।

শিষ্য। আসক্তিও আসিত, যদি পয়সা থাকিত।

গুরু। আঃ! (গুরুর সহিত) উচিত ব্যবহার শিক্ষা কর।

শিষ্য। আপনি রাগ করিবেন না। সন্ন্যাসীদের রাগ করা ঠিক নহে।

এই ভাবে শিষ্য-কথায় হাস্যরসের দ্যোতনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অবিশ্বাসী বিক্ষিপ্তচিত্ত শিষ্য গুরুকে ছলে, কৌশলে নিগৃহীত করিতে চাহিতেছে; আর গুরু তাঁহার অনন্ত মহিমায় শিষ্যের সমস্ত ধৃষ্টতা সহ্য করিয়া আপনার যোগশক্তি দেখাইয়া—তাহাকে বিশ্বাসী ও ভক্ত করিলেন। প্রহসনের মধ্যেও এমন শিক্ষা প্রদান সাহিত্য-জগতে স্বল্পই দেখা যায়। এই জন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে ইহা বরং Comedy—ঠিক্ farce নহে এই প্রহসনের ভাষা-ভাব ও কল্পনা, চাতুরী—সমস্তই অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ইহার নিকটে 'লটকমেলকম্' প্রভৃতি প্রহসন নিতান্ত বালক্রীড়া বলিয়া মনে হইবে। তথাপি কালভেদে রুচিভেদ হইয়া থাকে, দ্বাদশ শতাব্দীর কবি শঙ্খধর তাৎকালিক কান্যকুব্জ সমাজের কতিপয় অনাচার চিত্রিত করিয়া তাহার সহিত নিজ কল্পনা কৌশলে যে প্রহসন-সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ভাষার সৌষ্ঠব আছে, ভাবের লালিত্য আছে—উদ্ভটকল্পনাও আছে। লটকমেলকের কতিপয় শ্লোক প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত হইয়াছে।

উপাখ্যানাংশে এই প্রহসনের কোন বিশেষত্ব নাই বা আকর্ষকত্ব নাই। ইহাতে চাপল্যের চিত্রই অধিক। ফলে এই অভিনয় দর্শনে হাস্যলহরী উঠিতে পারে—বহু দুর্জ্জনের নানাবিধ দুশ্চরিত চিত্র দেখিয়া হাস্যোল্লাস উপভোগ করা যাইতে পারে, এই মাত্র। ইহাতে দুইটি অঙ্ক—একটির নাম লজ্জাবিক্রয়, দ্বিতীয়টির নাম দন্তুরা-পরিণয়।

দন্তুরা একটি পরিণত-বয়স্কা বেশ্যা, নামেই তাহার রূপের পরিচয়। তাহার একটি যুবতী কন্যা আছে—তাহার নাম মদনমঞ্জরী। এক দিন এই দন্তুরার গৃহে সভাসলি নামক এক মূর্খ উপাধ্যায়—সঙ্গে কুলব্যাধি উভয়ে উপস্থিত হইল। সভাসলি এক জন বৈদিক মার্গের প্রতিকূল বামাচারী পঞ্চমকার সাধনার নামে কখনও বেশ্যাবাড়ীতেও থাকে, আবার অন্য প্রণয়িনীও রাখে। কুলব্যাধির নামেই পরিচয়, কুলের ব্যাধিস্বরূপ। সভাসলি যখন দন্তুরার গৃহে মদনমঞ্জরীর জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছে, তখন কুলব্যাধি সভাসলির অন্য প্রণয়িনী কলহপ্রিয়ার বিষয় প্রকাশ করিয়া দিল। কলহপ্রিয়ার সহিত সেই দিনই না কি সভাসলি উপাধ্যায়ের দন্তাদন্তি, নখানখি, হাতাহাতি, লাথালাথি হইয়া গিয়াছে! শেষে কলহপ্রিয়া হাতার বাড়ি মারিয়া, আঙ্গরা ছুড়িয়া, পীড়ি ফেলিয়া শেষে হাঁড়ীর ঘায়ে—সভাসলিকে বিতাড়িত করিয়াছে। সভাসলিও উপস্থিত বুদ্ধি মত বলিল যে, তাহারও সেই জন্য নির্বেদ হইয়াছে—তাই এই বেশ্যাগৃহে আগমন। দন্তুরাই বা ছাড়িবে কেন? সে-ও বলিল, আপনি আপনার মত মহাপণ্ডিতের উচিত কার্য্যই করিয়াছেন। দন্তুরার পায়ে একটা ঘা ছিল, সভাসলি তাঁহা দেখিবামাত্র বেশ সহানুভূতির স্বরে কারণ জিজ্ঞাসা করিল—দন্তুরা বলিল কে রাউত্তরাজ সংগ্রাম-বিসর একটা কুকুর বন্ধক দিয়া গিয়াছিল, সেই কুকুর আমাকে কামড়াইয়াছে। রাউত্তরাজের নাম সংগ্রামবিসর,

সংগ্রাম হইতে সরিয়া পড়াই যাহার কার্য্য, সভাসলি তৎক্ষণাৎ মহাবৈদ্য জন্তুকেতুকে ডাকাইবার ব্যবস্থা করিল। জন্তুকেতু সগর্ব্বে আত্ম-পরিচয় দিল যে, আমি তদ্বির করিলে ব্যাধি রোগীর দেহে পোষ মানিয়া থাকে, আমার হাতের অমৃত বিষ হয়, আর আমি রোগীর সম্মুখে থাকিলে যমেরও প্রয়োজন নাই আর কোন ঔষধেরও কার্য্য থাকে না। জন্তুকেতুর ঔষধ চমৎকার!

যস্য কস্য তরোর্ম্মূলং যেন কেন চ পেষয়েৎ।
যস্মৈ কস্মৈ প্রদাতব্যং যদ্বা তদ্বা ভবিষ্যতি॥

যে কোন গাছের মূল যার তার দ্বারা পেষণ করাইবে, যাকে তাকে তাহা দিবে; তাহা হইলেই যা হয় তা হয় একটা হইবে। আর চক্ষুরোগের ব্যবস্থা এই,—

অর্কক্ষীরং বটক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তথৈব চ।
অঞ্জনং তিলমাত্রেণ পর্ব্বতোঽপি ন দৃশ্যতে॥

আকন্দর আটা, বটের আটা, মনসার আটার একটুখানি অঞ্জন চোখে লাগাইলে পর্ব্বতও আর দেখা যাইবে না।

জন্তুকেতু আবার শিশু-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ (specialist), কেন না, অনেক সময়ে এরূপ চিকিৎসককে অন্তিম কৃত্য করিতে হয়, শিশু হইলে বিশেষ কষ্ট হয় না, বয়স্ক রোগী হাতে পড়িলেই—খাটিয়া মাথায় করিতে হয়—এজন্য জন্তুকেতু সাধ করিয়া শিশু-চিকিৎসা ধরিয়াছিল।

চিকিৎসা বিষয়ে এইরূপ আলোচনা হইতেছে—এমন সময়ে এক দিগম্বর (জৈন) নাম জটাসুর আসিয়া উপস্থিত হইল; কারণ এই যে, তাহার নিরপরাধ ছাগীটাকে তপস্বী অজ্ঞানরাশি হত্যা করিয়াছে। ইহার বিচার করিবে উপাধ্যায় সভাসলি। এ দিকে তপস্বী অজ্ঞানরাশিও আসিয়া পড়িল। সভাসলির নিকট বাদী দিগম্বর অভিযোগ উপস্থিত করিল। অজ্ঞানরাশি উত্তরে বলিল যে,—আমার ফুলবাগানে ছাগী চরিতেছিল, তাই হত্যা করিয়াছি। সভাসলি অনেক বিচার করিয়া বলিল যে,—যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ছাগী হত্যা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার মূল্য দিতে হইবে, নতুবা কিছুই হইবে না।

অজ্ঞানরাশি বলিল—আমি ছাগী বলিয়া মোটেই বুঝিতে পারি নাই—আমি বাছুর ভাবিয়া মারিয়াছি।

সভাসলি বলিলেন—ওঃ, তাহা হইলে ত' অজ্ঞানরাশির জয়! এই জয়পত্র (ডিক্রী) লও।

সভাসলি তপস্বী অজ্ঞানরাশিকে প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিল—জটা ও কুলটার এমন মিলনক্ষেত্র যেখানে—সেখানে ত' জয় হইবেই।

অজ্ঞানরাশি এই প্রশংসাকে উপহাস মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সভাসলিকে গালি দিল। সভাসলিও তাহার উপরে গালি চড়াইল। সেই অশ্লীল গালি শুনিয়া দন্তুরা বলিল—তোমরা কি লজ্জা বিক্রয় করিয়া এখানে আসিয়াছ?

কিন্তু মদনমঞ্জরীর দিকে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট। সভাসলি, দিগম্বর ও অজ্ঞানরাশি তিন জনই তাহাকে চাহে। দিগম্বর একটু সুবর্ণের লোভ দেখাইতেই মদনমঞ্জরী যেন অন্যমনস্কা হইল, আর দন্তুরাও সময় বুঝিয়া বলিল যে, এখান হইতে কুরূপ মলিন ব্যক্তি দূর হইয়া যাও, আমার মেয়ের মন খারাপ হইতেছে।

দিগম্বর তাড়াতাড়ি একগাছি লাঠি লইয়া অন্য সকলকে তাড়াইয়া দিল। প্রথমাঙ্কের এইখানেই সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অঙ্কে—দৃশ্য—দন্তুরার গৃহ।

কুকুর-বন্ধকদাতা সংগ্রামবিসর এক জন বীর পুরুষ, মদনমঞ্জরীকে মনে হওয়ায় যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে! আসিয়া কুকুরটার সন্ধান লইয়া জানিল যে, সেই কুকুরটা শিকল ছিঁড়িয়া আর দন্তুরাকে কামড়াইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এখন বন্ধকের জিনিষ চলিয়া গেল, অথচ ঋণের টাকা শোধ হইল না, উপায় কি? সঙ্গে ছিল তাহার এক বন্ধু, নাম বিশ্বাসঘাতক। তাহাকে বলিল, তুমি দন্তুরাকে বুঝাইয়া বল যে, এই কুকুরটা এক শত টাকায় কেনা ছিল, আর কি শিকারী। এত দিন আমার বাপের মত আহার যোগাইয়াছে। সুতরাং জিনিষটা যাওয়াতে আমারও ক্ষতি হইয়াছে। বিশ্বাসঘাতক দন্তুরার কাণে কাণে বলিল—ঐ কুকুরটা বেচিলে পাঁচ কড়াও দাম হইবে না। তবে সংগ্রামবিসরের একটা সোণার ঘড়া আছে, সেইটা তুমি হাতাও দেখি, তার পর আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া ওকে এখান থেকে তাড়াইয়া দিলেই হইবে। দেখ, ওর মতলব ভাল নহে, মদনমঞ্জরীকে চুরি করিয়া লইতে চায়।

দন্তুরা বলিল—তোমাদের এই গুণেতেই ত' আমার মেয়ে মজিয়া আছে।

সংগ্রামবিসর তখন তাহার বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া আসিয়া বলিল যে, কুকুরের পরিবর্ত্তে এই বুড়ীমাকে বন্ধক রাখ, তোমার বাড়ীতে দাসীর কার্য্য করিবে। কটকসার নামে এক জন ধনী আসিয়া বলিল—সংগ্রামবিসর! কুকুরের কড়ি শোধ দিতে যদি না পার ত' মাকে বেচিয়া সেটা শোধ কর না? সংগ্রামবিসর তাহাতে স্বীকৃত হইলেও ঋণ করিতে যেরূপ নিয়মবন্ধন করিতে হয়, তাহাতে তাহার ভয় হইল। দন্তুরাও বুঝিল যে, কেহ এক পয়সা দিবে না, শুধু মদনমঞ্জরীকে উপহাস করিতেছে!

তখন মিথ্যাশুক্ল অভয় দিতে দিতে প্রবেশ করিল—অন্য দিকে ফুক্কটমিশ্র (কেহ কেহ 'কুক্কুটমিশ্র' এইরূপ নাম দিয়াছেন) আসিলেন। তৎপরে মিথ্যাশুক্ল ও ফুক্কটমিশ্রের বিচার, ঐ বিচার হইতে কনৌজ প্রদেশের তাৎকালিক মনোভাব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। মীমাংসাচার্য্য প্রভাকর-মতের উপর বিদ্বেষ এবং বাঙ্গালায় প্রভাকর-মতের আদর হওয়াতে তাহার উপর কটাক্ষ। শঙ্করের অদ্বৈত মতেও কিঞ্চিৎ অনাদর প্রদর্শন এবং মীমাংসার ভট্টপাদের মতবাদে আস্থার বিষয় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ফুক্কটমিশ্র শুষ্ক বিচার হইতে বিরত হইয়া মদনমঞ্জরীর স্বস্ত্যয়নার্থ যে তাহার আগমন, ইহাই মিথ্যাশুক্লকে বলিলে—তাহার দৃষ্টি মদনমঞ্জরীর উপর পতিত হইল। উভয়েই মদনমঞ্জরীর প্রতি লোভ বশতঃ ঈর্ষান্বিত হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইল। মিথ্যাশুক্ল ফুক্কটমিশ্রকে তাড়াইয়া দিল।

এই সময়ে প্রবেশ করিল—এক বৌদ্ধ, নাম—ব্যসনাকর। ব্যসনাকরকে দেখিয়া দিগম্বর (জৈন) ফিরিয়া আসিল, উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইল। ব্যসনাকর এক রজকী-বিরহে বেদনাতুর, তাহা জানিয়া দিগম্বর তাহাকে রজকী জাতির স্পর্শে দূষিত বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিল। ব্যসনাকর বলিল—জাতিই নাই—সমস্ত ভাবপদার্থ ক্ষণিক, আত্মাও স্থিরবস্তু নহে, (ক্ষণে ক্ষণে যদি বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহা হইলে জাতিই থাকিতে পারে না) সুতরাং আমার রজকী স্পর্শে কোন দোষই ঘটে নাই।

এ দিকে সভাসলি ইহাদের বিচার শুনিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু দিগম্বর ব্যসনাকরকে মদনমঞ্জরীর প্রতিস্পর্দ্ধী প্রণয়ী মনে করিয়া তাড়াইল। শেষে দিগম্বর বুঝিল মদনমঞ্জরীর প্রতি সভাসলির লোভ আছে—সভাসলিকে তাড়ানও কঠিন কাজ, আমার একটি নারী চাহি, সুতরাং আমি দন্তুরাকে বিবাহ করি। তাই সে সভাসলিকে অনুরোধ করিল যে, দন্তুরার সহিত তাহার বিবাহ ঘটাইয়া দেও; আর তুমি মদনমঞ্জরীকে গ্রহণ কর। সভাসলি তখন হৃষ্ট হইয়া দন্তুরাকে বলিল—তুমি নব্বুই বৎসরের নব্যা যুবতী, তোমাকে দিগম্বর বিবাহ করিতে চাহে, তুমি সম্মতা হও। দন্তুরা একটু লজ্জার সহিত বলিল—যদি তোমাদের মত হয়, আমার আপত্তি নাই। তখন চতুর্ব্বেদ নামক জঙ্গম সম্প্রদায়ের এক পুরোহিতকে ডাকাইয়া জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে—শনিযুক্ত ধন্বুর্লগ্নে বিবাহের ব্যবস্থা হইল। আকন্দ ফুলের মালা পরাইয়া দিগম্বরের বরবেশ রচনা হইলে পুরোহিত ফুল ও আলোচাল লইয়া আশীর্ব্বাদ করিল—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

পুরোহিত দক্ষিণা চাহিলে—দিগম্বর দুইটি হরীতকী প্রদান করিল। পুরোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—আমি অনেক ব্রতনিয়ম করিয়াছি, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী শুক্ল মহাব্রাহ্মণ; আমার দক্ষিণা লোপ করিলি—তুই নির্লজ্জ, নগ্ন দিগম্বর! আমি এই দন্তুরাকে লইয়াই চলিলাম। তখন পুরোহিত ও যজমান সেই দন্তুরাকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল, এ দিকে কুলব্যাধি আসিয়া তখন নৃত্য করিতে লাগিল। প্রহসন এখানেই সমাপ্ত হইল। এই প্রহসনের প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে যে,

'চিত্রং চরিত্রং স্খলিতব্রতানাং
শীলাকরঃ শঙ্খধরস্তনোতি।'

কবি শঙ্খধর—স্খলিতব্রত—অর্থাৎ ভ্রষ্টদিগের বিচিত্র চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের পরিচয়ে লিখিয়াছেন—"শীলাকরঃ", সৎস্বভাবযুক্ত। কবি যে সকল চরিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে নিজভাবের প্রতিবিম্ব কবিরচনায় আসিয়া পড়ে, ইহা সাধারণের ধারণা, এ জন্য কবি যে ঐরূপ ভ্রষ্টভাবের পরিপোষক নহেন, তাহা প্রথমেই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভ্রষ্টদিগের স্বরূপ দ্বিবিধ—(১) স্বভাবতঃ (২) কর্ম্মবশতঃ, লটকমেলক প্রহসনে দ্বিবিধ ভ্রষ্টের চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। বেশ্যা, বেশ্যাদুহিতা, কামলোলুপ দিগম্বর, বৌদ্ধ ব্যসনাকর প্রভৃতি—কবি-দৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণির অন্তর্গত। আর বামাচারচ্ছলে কদাচারপরায়ণ সভাসলি, মূর্খ ব্রাহ্মণকুমার কুলব্যাধি, নিরক্ষর চিকিৎসা-ব্যবসায়ী জন্তুকেতু, কাপালিক অজ্ঞানরাশি দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্গত। এই সকল দুর্জ্জনের মিলন হইয়াছে বলিয়া এই প্রহসনের নাম হইয়াছে 'লটকমেলক'।

কবি শঙ্খধরের সময়ে—মীমাংসার কুমারিল ভট্টপাদের সম্প্রদায় ও প্রভাকর সম্প্রদায়ে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের তখন পতন হইয়াছে। তান্ত্রিক কুলাচার কনোজ সমাজে প্রবেশ করিলেও তাহা নিন্দিত হইয়া আছে। জঙ্গম নামক শৈব সম্প্রদায়ও তখন নিন্দিত কার্য্যে ব্যাপৃত। এই জঙ্গম বেশ্যার বিবাহে আসিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়াছিল যে, সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইয়া আসাতে সন্ধ্যোপাসনা ভুলিয়া গিয়াছিল। এবং এটা যে ভাল হয় নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপে একটি শ্লোক তুলিয়াছে—

যথা চাহ ভগবান্ ব্যাস :—

স্বকার্য্যব্যাপৃতেনাপি ধর্ম্মঃ কার্য্যোঽন্তরান্তরা;
দাম্না বদ্ধোঽপি হি ভ্রাম্যন্ ঘাসগ্রাসং করোতি গৌঃ॥

ভগবান্ ব্যাস বলিয়াছেন যে,

নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেও মাঝে মাঝে ধর্ম্ম করিবে—রজ্জু দ্বারা বদ্ধ থাকিলেও গোরু যেমন ঘুরিতে-ঘুরিতে ঘাস খাইয়া লয়। এই জঙ্গমের নাম—চতুর্ব্বেদ, দন্তুরার সহিত দিগম্বরের বিবাহে—এই ব্যক্তিই পৌরোহিত্য করে।

মিথ্যাশুক্লের স্বভাবের পরিচয় এইরূপ—

পরাপকারশূন্যো যঃ ক্ষণার্দ্ধমপি তিষ্ঠতি।
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥

যে ব্যক্তি পরের অপকার না করিয়া অর্দ্ধক্ষণও থাকে—সে কামারের হাফরের মত বায়ুগ্রহণ করিলেও তাহাকে জীবিত বলা যায় না।

ফুক্কটমিশ্র বা কুক্কুটমিশ্র—লটকমেলকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র, ইহা বহু সাহিত্যিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার পরিচয়-শ্লোকটি চমৎকার—পাঁচ দিনে মীমাংসার প্রভাকর গ্রন্থ, তিন দিনে বেদান্ত পাঠ করিয়া—আর ন্যায়শাস্ত্রের গন্ধমাত্র গ্রহণ করিয়া পূজ্যপাদ ফুক্কটমিশ্র আসিতেছেন। উভয়ের যখন মিলন হইল, তখন প্রণত শুক্লকে ফুক্কটমিশ্র জিজ্ঞাসা করিল—'কিসের ব্যাখ্যান হইতেছে?' মিথ্যাশুক্ল বলিল—"চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ"—এই সূত্রের দ্বারা ধর্ম্মনির্ণয় করিয়াছি—তৎপরে "অষ্টাকপালং হবির্নির্বপেৎ স্বর্গকামঃ" এই যুক্তি দ্বারা সাধনাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছি।

এখানে প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা হাস্যোদ্দীপক সন্দেহ নাই!

ইহা শুনিয়া ফুক্কটমিশ্র বলিল—বৎস মিথ্যাশুক্ল, তুমি মহামহোপাধ্যায় হইয়াছ।

তোমার ব্রাহ্মণ্য না থাকিলেও খুব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এইরূপ রাঢ় দেশের প্রসিদ্ধি যে,—ব্যাকরণ জানা নাই, কাব্যে শ্রম করা হয় নাই, কুমারিল ভট্টকৃত বার্ত্তিক গ্রন্থ শুনিলে আচমন করে, তাদৃশ গ্রন্থে যাহারা বিদ্বান্, তাহাদের স্পর্শ করিলে স্নান করে, তর্কপটু নৈয়ায়িকদের চাণ্ডালের মত মনে করে, অথচ সেই রাঢ়বাসিগণ হর্ষগদ্গদচিত্তে প্রভাকরের গ্রন্থ পাঠ করে।

এই রাঢ়দেশ বলিতে বাঙ্গালার কথাই সম্ভাবনা করা যায়। কেন না—বাঙ্গালাদেশে—মীমাংসাচার্য্য প্রভাকর মত বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। শুধু কনোজ কেন—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মিথিলায়ও প্রভাকর মতের খণ্ডন চলিয়াছিল। নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে বলিয়াছেন যে,—আমি প্রভাকর মত জ্ঞাত হইয়া তাহাকে পূর্ব্বপক্ষরূপে এই আন্বীক্ষিকী (ন্যায়শাস্ত্র) প্রণয়ন করিতেছি। *

এই প্রহসনে—প্রভাকর মতের উপর খুবই আক্ষেপ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ (অধ্যাপক)

* 'অন্বীক্ষানয়মাকলয্য গুরুভির্জ্ঞাত্বা গুরূণাং মতম্' ইত্যাদি (তত্ত্বচিন্তামণি—২ পৃঃ)।

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

১২

পোষাকের মাপ লইয়া ওস্তাগর চলিয়া গেল। মায়ের পানে চাহিয়া অনিল বলিল,—তুমি তা হলে যেতে পারবে না! কণ্ঠে ক্ষোভের সুর।

মা কহিলেন,—কি করে হবে! সুশীল আসবে। কল্পনা আসবে, তাদের আবার চা খেতে বলেছি।

—তবেই তো মুস্কিল! বলিয়া অনিল ঊর্দ্ধে কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল। যেন সমস্যার সমাধান সেইখানে লেখা আছে!

অমিয় রত্নাকে কহিল,—তোমার সঙ্গে কল্পনার বোধ হয় আলাপ আছে?

কুণ্ঠিত স্বরে রত্না কহিল,—তেমন নেই!

—তা হলে আজ আলাপ হবে! কল্পনা বেশ ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তাই না কি? আর ও বড়লোকের মেয়ে—জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জী কম লোক ছিলেন না—ওর কথাই আলাদা!

রত্নার চোখ-মুখ নিমেষে আরক্ত হইয়া উঠিল। মিসেস্ গোস্বামী পরিচয়-হিসাবে যে কথাগুলা বলিলেন, সেগুলা রত্নাকে আঘাত করিল। রত্নার উপর মিসেস্ গোস্বামীর যে স্নেহ-মমতা—রত্নার মনে হইল, সে শুধু কৃপা-করুণা!

ঠিক সেই সময়ে অনিল তাহার আশু অর্থহানি নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল। মাকে বলিল,—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? রত্না আজ চলুক। আর একখানা যা টিকিট রইলো, সেখানাতে—

সংশয়-পীড়িত কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—একা যাবে?

—বাঃ। একা কোথা! আমি যাচ্ছি। শচীনরা যাবে। না হলে অতগুলো টাকা নষ্ট হবে?

মিসেস্ গোস্বামী দ্বিধায় পড়িয়া অনুমতি দিলেন, কহিলেন,—তবে যাও, উপায় যখন নেই।

উৎফুল্ল মুখে অনিল কহিল,—আর বুঝেছো মা, সাধনা বোসের নাচটা একবার দেখা উচিত।

মিসেস্ গোস্বামী মাথা নাড়িলেন।—তা সত্যি, রত্না তুমি তবে যাও।

অমিয়র পানে চাহিয়া সঙ্কুচিত ভাবে রত্না কহিল,—আপনি? সঙ্গে সঙ্গে জিভ্ কাটিল, জিভ্ কাটিয়া কহিল,—তুমি যাবে না?

অমিয় হাসিল। ঔদাস্য-সহকারে কহিল,—আপনি—তুমি,—না, আমি—আমার আজ যাওয়া হবে না। কি করে যাবো? বাড়ীতে অতিথি আসচে।

—তা বটে! বলিয়া রত্না চুপ করিল।

অনিল কহিল,—অতিথি বলে অতিথি! সম্ভ্রান্ত অতিথি। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। বলিয়া অগ্রজের পানে চাহিয়া কহিল,—কল্পনা চ্যাটার্জ্জিকে তো এখন হামেসা আসতে হবে। তার সঙ্গে অন্য এক দিন আলাপ করলেই হবে—কি বলো?

অমিয় ফুলদানীর গোলাপগুলা দেখিতেছিল,—কনিষ্ঠের কথায় মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল,—সেই ভালো। আজ তোমরা বেরিয়ে পড়ো, টাইম আর নেই।

মিসেস্ গোস্বামী রত্নার পানে চাহিয়া কহিলেন,—যাওয়া যখন স্থির, তখন মিছে দেরী করা কেন! যাও রত্না, উঠে পড়ো, তৈরী হয়ে নাও। সভ্য সমাজের রীতি—ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা।

রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ গোস্বামীর উপদেশ দেওয়া স্বভাব; এবং রত্নাকে পাইয়া তাকে মানুষ করিবার সব ভার নিজের হাতে লইয়া সে-ভারকে মস্ত দায়িত্বের মত দেখেন। তাই প্রতি পদক্ষেপে সকল কাজে তালিম দিয়া তাকে বুঝাইতেছেন,—কেতাদুরস্ত সমাজে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা করিতে কি কি প্রয়োজন! রত্না দ্বিধাহীন চিত্তে সকল উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলে। ইহাতে মিসেস্ গোস্বামী যেমন প্রীতিলাভ করেন, অন্য দিকে এই একান্ত অনুগতা তরুণীর প্রশংসা-কীর্ত্তনেও তিনি সহস্রমুখ হন। রত্না এবার তেমন সরল চিত্তে এ কথাগুলা গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা ভরিয়াই মিসেস্ গোস্বামী তাহাকে এ কথাগুলা বলিলেন।

নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া কৌচের উপর রত্না চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বেশভূষা করিবার প্রবৃত্তি রহিল না। অহেতুক একটা অভিমান জ্বলন্ত অঙ্গারের মত মনের মধ্যে রি-রি করিয়া জ্বালা দিতে লাগিল। মানস-নেত্রে সে যেন সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিল, ঘড়িতে তিনটার ঘরে ছোট কাঁটাটা পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতার সহিত কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! মিসেস্ গোস্বামী মহানন্দে তাহাদের সম্ভাষণ করিতেছেন। অমিয় সেই মহামান্য ভ্রাতা-ভগিনীর আদর-আপ্যায়নে ব্যাকুল-অধীর! সম্ভ্রান্ত অতিথির সম্মুখে নিজের কোন ত্রুটি না ঘটে, মাতা-পুত্রের সে দিকে সতর্কতার সীমা নাই! সুশীল চ্যাটার্জ্জির সহোদরা, জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জির কন্যা—তাহাকে পিয়ানোর টুলে বসাইতে অমিয় হয়তো কৃতার্থ নেত্রে কল্পনার মুখের পানে চাহিতেছে! এ তো রত্না নয়!

পোষাক পরিয়া অনিল রত্নার ঘরের বাহিরে আসিয়া পর্দ্দার ওদিক্ হইতে কহিল,—মে আই কাম্?

সচকিতে রত্না কহিল,—ইয়েস্।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া রত্নার পানে চাহিয়া অনিল হতভম্ব হইয়া গেল! বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—এ কি, এমন চুপচাপ জুজুবুড়ীর মত বসে আছো! যাবে না?

রত্না অনিলের মুখের পানে চাহিল, ত্রস্ত কণ্ঠে কহিল,—তোমার হয়ে গেছে?

অনিল কহিল,—আমি তো তোমার মত কুড়ে নই! চট্‌পট কাজ করা আমার স্বভাব! পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, তুমি এখনও চুলে চিরুণী দাওনি, মাটীর ডেলার মত বসে আছো!

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি! তুমি বসো। আমি এলুম বলে! বলিয়া রত্না পাশের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

অনিল কহিল,—আমি এই ঘড়ি খুলে রইলুম। পাঁচ মিনিটের

এক সেকণ্ড যেন বেশী না হয়! তাহলে ভয়ঙ্কর বকুনি খাবে—বুঝেছো।

রত্না কোন সাড়া দিল না। এমন পরিহাস অনিলের এই প্রথম বা নূতন নয়! কৃত্রিম শাসন-বাক্য-প্রয়োগে নিজের আধিপত্য বিস্তারের দাবী জানাইতে সে খুব পটু। এবং এ-সকলের উত্তরে রত্না শুধু সলজ্জ একটু হাসি হাসে।

আজও তেমনি রহস্যচ্ছলে অনিল বকুনি শব্দটা ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু রত্নার কাণে সেটা এখন মিষ্ট লাগিল না।

মন তার সহজ ভাবে এ শাসনটুকু গ্রহণ করিল না! সত্যকারের শাসনের তীক্ষ্ণতাই যেন তাহাকে বিঁধিয়া মনকে তিক্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে রত্না যখন আবার এ ঘরে আসিল, তখন তাহার সুসজ্জিত মনোরম তনুর দিকে চাহিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে অনিল কহিল,—বাঃ! চমৎকার!

রত্নার কর্ণমূল অবধি আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল,—কি চমৎকার? যে এমন চমকে উঠলে!

—সে তুমি বুঝবে না! গোলাপ জানতে পারে না বাগানের সে কতখানি শোভা! দর্শকের সে কতখানি আনন্দ!

—না, তা জানে না! জানে কেবল তার ডালে কাঁটা আছে।

অনিল হাসিল। কহিল,—ঠিক বলেছো! কিন্তু গোলাপ যে তুলতে জানে, কাঁটা সে গ্রাহ্য করে না। হাতে ফোটে, রক্ত ঝরে, ব্যথা পায়, তবু গোলাপকে চায়! কথাটা বলিয়া রত্নার মুখের পানে অনিল তাকাইল।

রত্না কহিল,—খুব হয়েছে! তোমার গোলাপ ফুলের ব্যাখ্যা মোটরে বসেও হতে পারে!

—নিশ্চয় পারে! ওঃ তুমি আমাকে উল্টে বকুনী দিচ্ছ! চলো। সত্যি আর দেরী নয়!

গাড়ীতে বসিয়া অনিল কহিল,—তোমার কোট আনোনি!

অপ্রতিভ ভাবে রত্না কহিল,—ভুলে গেছি! আনছি,—বলিয়া নামিতে উদ্যত হইল।

অনিল হাত ধরিয়া বাধা দিল, কহিল,—পাগল হয়েছো! আচ্ছা পাল্লায় পড়া গেছে! বেয়ারা যাক না কোটটা আনতে। না হয় আমি যাচ্ছি! বলিয়া সোফারের দিকে চাহিয়া কহিল,—ভূষণ, মিস্ বোসের কোটটা আয়ার কাছ হতে আনো তো!

ভূষণ আদেশ পালন করিতে গেল।

রত্নার দিকে চাহিয়া অনিল কহিল,—আমি গাড়ী চালাবো। মুখে তাহার মৃদু হাসি!

রত্না কহিল,—তুমি কেন চালাবে? ভূষণ?

—না, আমিই চালাবো। অনিল রত্নার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কৌতুক কণ্ঠে কহিল,—আমাদের যাত্রা-পথে ভূষণকে আবার কেন!

—যাত্রা-পথে!

—হ্যাঁ! যদি অনির্দ্দিষ্ট পথে পাড়ি দি? অনিলের দৃষ্টি উজ্জ্বল।

ভীত কণ্ঠে রত্না কহিল,—কি বলছো তুমি! না, না, ও কি ঠাট্টা!

ভূষণ আসিয়া কোট দিয়া সোফারের দরজা খুলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

অনিল কহিল,—এস্প্লানার!

গাড়ী ছুটিল। রত্না ও অনিল নীরব। রহস্যের মাঝে হঠাৎ যেন উদ্ভট সত্য আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে! দু'জনে তাই স্তব্ধ!

কিছুক্ষণ পরে অনিল মুখ ফিরাইল। এ নীরবতা লজ্জার আকারে তাহাকে পীড়ন করিতেছিল! তাই সেই স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ফিরাইতে সে রত্নার মুখের দিকে তাকাইল। দেখিল, রত্না তখনও গম্ভীর মুখে পথের দিকে চাহিয়া আছে।

মৃদু হাসিয়া অনিল ডাকিল,—রত্ন!

মুখ না ফিরাইয়া রত্না কহিল,—কেন?

—রাগ হলো! না, ভয় পেলে! ভাবলে, সত্যি বুঝি নিজের আত্মীয় সমাজ সব ছেড়ে তোমাকে নিয়ে পালাবো! না রত্না, যত লোভনীয়ই তুমি হও, সে দুর্ব্বুদ্ধি আমার কখনো হবে না।

রত্নার অন্তর আহত হইল। অনিলের কথাগুলা যেন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। সে নির্ব্বাক্ বসিয়া রহিল।

অনিলের এই অনুনয়ে রত্না কিন্তু আগেকার মত হাসিল না! শুধু মৃদু কণ্ঠে কহিল,—আমি—আমি গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে! রত্নার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল।

—ইস্! এখনও রাগ। না গো না, সত্যি রত্না, তোমায় নিয়ে আমি উড়ে যাবো না ওই মেঘের বুকে নীড় বাঁধতে! বোকা মেয়ে, ঠাট্টা বোঝো না?

অনিলের কথায় এবার মুখ তুলিয়া রত্না সভয়ে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল, স্তরে-স্তরে মেঘ জমিয়া অস্তমিত দিবালোককে আড়াল করিয়াছে।

১৩

পরের দিন অমিয়র সঙ্গে রত্নার দেখা হইতেই অমিয় কহিল,—কি রকম! তুমি না কি কল্পনা চ্যাটার্জ্জিকে চেনো না!

শুষ্ক মুখে রত্না কহিল,—চিনি না বলিনি তো, তবে তেমন ভাব নেই।

—ও—তোমাদের ঝগড়া! অর্থাৎ ও তোমার এ্যান্টিপার্টি, তা বলতে হয়!

রত্না হঠাৎ ফুঁশিয়া উঠিল! কহিল,—কেন, কল্পনা বলেছে না কি যে তার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে? আমি তার এ্যান্টিপার্টি?

—কেন? তাহলে কলেজে গিয়ে তুমি তাকে বিধিমত শিক্ষা দেবে? অমিয় সকৌতুকে হাসিতে লাগিল।

মিসেস্ গোস্বামী আসিয়া দর্শন দিলেন। কহিলেন,—কল্পনা এসেই কাল তোমায় খুঁজলো রত্না,—বললে, বড্ড আশা করেছিলুম,—তাকে পাবো।

'কেকে' একটা কামড় দিয়া অনিল কহিল,—নৈরাশ্যের ব্যথা তাকে বেশী দিন ভোগ করতে হবে না! আজও তিনি আসছেন!

অনিলের এই বাক্যটুকুর অর্থ রত্না বোধ করিতে পারিল না! শুধু অনিলের দিকে এক বার চাহিয়া দেখিল।

—হ্যাঁ, আজ তিনটের সময় তাদের আসবার কথা। তুমি সে সময় অনিল থেকো। আমার ইস্কুলের মেয়েদের আনতে বাস যাবে

বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী পুনশ্চ কহিলেন,—কি বলো অমি, কল্পনা আমার সিলেক্‌সনের সুখ্যাতি তো ?

—তোমার সিলেক্‌সনের কে ভুল ধরতে পারে মা ! তুমি যে রত্নাকে উর্ব্বশীর পার্ট দিয়েছো, এতে কেউ 'না' বলতে পারবে না।

হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—আমাদের ষ্টাফ চমৎকার হয়েছে। তার পর, কাল 'মন্দির' কেমন দেখলে রত্না ?

রত্না বলিল,—চমৎকার।

অমিয় সহাস্যে কহিল,—সাধনা বোসের নাচের মধ্যে কোন্‌টা ভালো লাগলো ?

অনিল কহিল,—ডেথ্-ডান্সটা। পুরোহিত আয়ুধের সঙ্গে ক্লাইমাক্স-সীনটা—সত্যি চমৎকার। দেবদাসী মঞ্জুলার দুঃখে রত্নার দু'চোখে জলধারা বয়েছিল।

সহাস্যে মিসেস্ গোস্বামী বলিলেন,—সত্যি ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রত্না বলিল—খুব ভালো অভিনয় করেছিল সাধনা বোস্। শুধু আমি কেন, সকলেই খুব সুখ্যাতি করেছে।

সকলে নিঃশব্দে চা পান করিতে লাগিলেন।

তার মধ্যে সহসা মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন—কাল লক্ষ্য করেছিস্ অমিয় ? গাড়ীর কথায় কল্পনা বললে,—গাড়ী পাঠাতে হবে না মাসিমা, আমাদের বুইকে আমি আসবো নিজেই ড্রাইভ করে' ! মোটর চালাতে ওরা জানে—লাইসেন্স আছে !

অমিয় রত্নার পানে চাহিল, কহিল,—রত্না তোমাকেও ও-বিদ্যায় কল্পনা চ্যাটার্জীর সমান করবো। আমি তোমাকে গাড়ী চালাতে শিখিয়ে দেবো।

সায় দিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন—তা দিয়ো ! শিখতে পারে ও খুব শীগগির। তুমি ওর পিয়ানো শোনোনি অমিয় ! রত্নার হাত ভারি মিষ্টি। চমৎকার বাজায় ও। অনিলের কাছে এত অল্প দিনে শিখেছে যে আমাকে অবাক্ করে দেছে !

বিস্ময়ে অমিয় কহিল,—তাই না কি ! রত্না, তুমি ছবি আঁকতে পারো ?

মাথা নাড়িয়া সলজ্জ মুখে রত্না কহিল,—না।

—কল্পনা বেশ আঁকতে পারে—ড্রইংএ ওর হাত আছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কল্পনা পেন্টিং শিখেছে—রত্নাকে তো শেখানো হয়নি। শেখালে ও নিশ্চয় ভালো পারবে !

সায় দিয়া অনিল কহিল,—তা পারবে ! বিদ্যাকে আয়ত্তে আনবার শক্তি ওর আছে ! তা না হলে দাদা, তুমি যদি আগেকার রত্নাকে দেখতে !

কৌতুকে অমিয় কহিল,—কি রকম ?

অনিল কহিল,—তবে শোনো সে-কাহিনী ! বলিয়া আড়ম্বর সহকারে আরম্ভ করিল,—প্রথম দিন থেকেই বাবা রত্নার উপর পার্শিয়াল। রত্নাকে বাবা বললেন,—চা করতে জানো মা ? মাথাটা একেবারে এক দিকে হেলিয়ে রত্না জানিয়ে দিলে,—জানে। তার পর হাতের কসরতিতে কি করে যে পেয়ালা-সমেত চামচে লেগে গড়িয়ে বাবার কোলে চা পড়লো—সে শুধু রত্নাই বলতে পারে !

রত্নার লজ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া অমিয় হাসিতেছিল, কহিল,—অনিল তোমায় ভারি খেলো করে দিচ্ছে রত্না। আচ্ছা, আমিও ওর ছোটবেলার ইতিহাস বলছি, শোনো।

উৎসাহ-দীপ্ত কৃষ্ণ-তারকাযুগল অমিয়র মুখের উপর স্থাপিত করিয়া রত্না কহিল,—বলুন তো—সত্যি !

অমিয় কহিল,—কলেজ-ষ্টুডেণ্ট—শীকার শেখবার ঝোঁক হলো—বন্দুকের টিপ্ প্র্যাক্‌টিস্ কচ্ছে—কিন্তু অদ্ভুত কেরামতি ! এম্ ছিল একটা গ্লোব। ওয়ান্, টু, থ্রী বলে ফায়ার করে ওড়ালো নিজের বুড়ো আঙুল ! তুমি বুঝি ওর পায়ের বুড়ো আঙুলটা ভাখোনি ?

তাচ্ছল্যভরে অনিল কহিল,—বাঃ, সে এমন কি দোষ ! সে আমার বন্দুকে প্রথম হাত—একদম যাকে বলে আনাড়ি। কিন্তু রত্নার তো তা নয়—হাতা, বেড়ী, খুন্তী নাড়তে পোক্ত ও !

রত্নার মুখ পলকে ম্লান হইল। চকিতে সে দৃষ্টি নমিত করিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তা হোক, তখন এখানে রত্না যা-কিছু দেখতো সবই ওর নতুন ঠেকতো ! তোমার বন্দুক ধরার মত চায়ের সাজানো টেবল দেখে ও ভড়কে গিয়েছিল ! কিন্তু এখন কি ও আর সে-রকম আছে ?

ফোন্ বাজিল। বেয়ারা আসিয়া জানাইল,—চ্যাটার্জ্জি মিসি-বাবা বড় সাহেব-কো সেলাম্ দিয়া।

মিসেস্ গোস্বামী পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন,—কল্পনা ফোন্ করছে।

অমিয় উঠিয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কল্পনা মেয়েটি বেশ—দেখতে শুন্‌তেও ভালো।

রত্নার চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল, কহিল,—আমি উঠি মাসিমা—খান-দুই চিঠি লিখতে আছে।

—যাও ! তোমার বাবার চিঠির জবাব এখনও পেলুম না কিন্তু ! জবাব না দিয়ে বোধ হয় তিনি সশরীরে হাজির হবেন। তা হলে কিন্তু বেশ হয়।

রত্নাকে নিজের ঘরে যাইতে হইলে যে-ঘর ও বারান্দা পার হইতে হয়, তাহার শেষ প্রান্তে টেলিফোন। রত্নাকে যাইতে দেখিয়া অমিয় হাত তুলিয়া তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল।

রত্না স্থাণু হইয়া রহিল। কল্পনার কথাগুলা শুনিতে পাইল না, অমিয়র কথা শুনিল। অমিয় বলিতেছিল, না, লেট্ মোটেই নয় ! বেশ, ওই কথাই রইলো ! নমস্কার ! বলিয়া রিসিভার রাখিতে রাখিতে কহিল,—ঘরে যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ, খানকতক চিঠি লিখতে হবে।

—দেশে ? অমিয় জিজ্ঞাসা করিল।

নত মুখে রত্না কহিল,—হ্যাঁ।

—বেশ, চট্ করে সেরে নাও। বিকেলে চারটের সময় কল্পনা আসবে,—দুপুরে আমি গাড়ী নিয়ে বেরুবো।

বিস্মিত দৃষ্টিতে রত্না কহিল,—তার সঙ্গে আমার—

—তোমাকে গাড়ী চালাতে শেখাবো ! দেখবো তোমার ডেক্সটারিটি !

—কল্পনার চেয়ে ? অসম্ভব ! বলিয়া রত্না কেমন থতমত খাইয়া গেল।

অমিয় হাসিল। কহিল,—না, না, কল্পনাকে তোমার ভয় নেই, সে বড়লোকের মেয়ে হলেও ভগবানের দেওয়া জিনিষ তোমাকেই বেশী।

রত্না চকিত হইয়া দৃষ্টি উন্নত করিয়া অমিয়র পানে তাকাইল। অধরে কৌতুকের মৃদু হাসি!

রত্না কহিল,—মাসি-মা অনুমতি দেবেন?

—তাঁর বিনা অনুমতিতে আমি তোমায় নিয়ে যাবো কেন? তোমার নিজের অনিচ্ছা আছে?

ব্যগ্র কণ্ঠে রত্না কহিল,—না, না! কোথাও যেতে পেলে আমার ভারী আহ্লাদ হয়! সত্যি বলছি,—আমায় যদি নিয়ে যান, খুব খুশী হবো।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বসিবার ঘরে সকলে বিশ্রামালাপে বসিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি তাহলে একটু সকাল সকাল ফিরো অমি!

অনিল সহাস্যে কহিল,—রত্নার তাক্ লেগে যাবে! কাল নিউ এম্পায়ারে গিয়ে ভারী খুশী হয়েছিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তাই আমি কিছু বলি না! না হলে আজকের যাওয়া আমি মানা করতুম।

ঔদাস্য-সহকারে অমিয় কহিল,—তবে আজ থাক্ মা।

—না, না, তুমি তো বাড়ী থাকবে না। গাড়ী নিয়ে বেরুবেই। শিখুক না ও! কোন বিদ্যা কেউ শিখতে চাইলে তাতে আমি না বলতে পারি না।

ছেলেরা হাসিল।

রত্না আসিল।

রত্নাকে সজ্জিত দেখিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—এই যে রত্না তৈরী হয়ে এসেছে!

অনিল কহিল,—ওর তর সয় না মা! বলিয়া কপট গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিল,—কিন্তু আজ তোমার যাওয়া হতে পারে না রত্না। দাদাকে এখনি যেতে হবে মিস্ চ্যাটার্জ্জির ওখানে।

আগুনের তাপ-লাগা জবাফুলের মত পলকে রত্নার মুখ ম্লান হইয়া গেল! চকিতে সে অমিয়র মুখের পানে চাহিয়া হতাশ নয়নে মিসেস্ গোস্বামীর পানে চাহিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—না না, ও দুষ্টুমি করছে। ওর কথা তুমি বিশ্বাস করো না!

অনিল হাসিয়া উঠিল।

রত্নাও হাসিল।—মা গো, এমন সব বলতে পারো! দেখুন মাসিমা, আমি কুঁড়ের টিপি, আর অমি-দা বসে আছে একেবারে অচলায়তন! রত্নার কণ্ঠস্বরে একরাশ অভিমান উপ্‌ছাইয়া পড়িল।

অনিল কহিল,—রত্নার নালিশ, ওকে কাল কুঁড়ে বলেছিলুম বলে। কিন্তু সত্যি কথাই বলেছিলুম, ছাখো, কল্পনা তোমার চেয়ে কত বেশী স্মার্ট! হাউ ভেরি কুইক্!

রাগ করিয়া রত্না কহিল,—বেশ তো, আমি তো বলিনি যে আমি কল্পনার চেয়ে ভালো—যে আমাকে খোঁটা দিচ্ছ!

ভালো মানুষের মত অনিল কহিল,—না, সে তোমার এ্যান্টিপার্ট কি না!

কৃত্রিম রোষে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কেন বাপু ওর সঙ্গে অমন করছো!—অমি, তুমি যদি ওকে গাড়ী চালাতে শেখাবে তো উঠে পড়ো বাপু।

মায়ের কথায় অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

১৪

গাড়ী ছুটিতেছিল। রত্না-অমিয় পাশাপাশি বসিয়া—অমিয় মাঝে মাঝে গাড়ী চালানো সম্বন্ধে রত্নাকে উপদেশ দিতেছিল। গভীর আগ্রহে রত্নাও তাহার প্রত্যেকটি কথা মনের মধ্যে গাঁথিয়া লইতেছিল।

গাড়ীর গতির কম-বেশী ঘুরানো-ফিরানো, কল-কব্জার কূট-কৌশল—এ সব বুঝাইতে বুঝাইতে হঠাৎ অমিয় মুখ ফিরাইতেই রত্নার মুখে তার মুখ ঠেকিল। শুনিবার আগ্রহে রত্না অমিয়কে ঘেঁষিয়া এতখানি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল,—যে তাহার এই স্পর্শে সম্বিৎ পাইয়া অরুণ-রাঙ্গা আকাশের মত রক্তিম মুখে সে ঈষৎ সরিয়া বসিল।

অমিয়র কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না,—সে তখন কোন্ কল টিপিয়া কোন্ প্যাঁচ ঘুরাইয়া গাড়ীকে কি ভাবে হাতের ক্রীড়নক করিতে হয়, কেমন করিয়া জড়পদার্থকে বিদ্যুৎগামী করিয়া আজ্ঞাবাহী করিতে হয়, সেই রহস্য বুঝাইতে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পরে রত্না জিদ ধরিল—অমি-দা আমার হাতে গাড়ী দাও।

অমিয় মাথা নাড়িল—পাগল! তুমি আরো দু'দিন জেনে নাও—সব দ্যাখো, বোঝো!

—সে সময়ে নেবো! কিন্তু এখন একটিবার দাও!

—বাপ্‌রে, এই রাস্তার ভীড়ে হয় না। আগে মাঠে যাই!

ময়দানের পথে গাড়ী আসিতেই রত্না মিনতি-ভরে অমিয়র কাঁধে হাত রাখিল, বলিল,—অমি-দা এইবার!

—পারবে? না, শেষে একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট—

অধীর কণ্ঠে রত্না কহিল,—না, না, এ্যাকসিডেণ্ট করবো না। এই তো বেশ ফাঁকা পথ—কেউ নেই,—আমায় গাড়ী দাও! রত্না অমিয়র হাত ধরিল, কহিল,—তুমি আমার সীটে এসো।

অমিয় কহিল,—যখন ছাড়বে না, নাও। বলিয়া উভয়ে আসন বদল করিয়া বসিল।

অমিয় কহিল,—খুব হুঁশিয়ার। নাও, ষ্টিয়ারিং ধরে বসো। আচ্ছা, লেফট্ সাইডেই গাড়ী চালাও! হ্যাঁ, ষ্টিয়ারিং ঘোরাও রাইট্ সাইডে। আচ্ছা, নাও, ষ্টপ্ করো—'রিভার্স গিয়ার' টিপে গাড়ী ব্যাক করাও। অমিয় বলিয়া চলিল।—হ্যাঁ—এবার ফার্ষ্ট গিয়ার, সেকণ্ড গিয়ার,—থার্ড! এই ছাখো গাড়ী কি রকম রান্ করছে। গিয়ার দেখে নাও।

রত্না মহা-উৎসাহে এ্যাকসিল্যারেটার পা দিয়া চাপিয়া ধরিল। বাম হাতে সে গিয়ার-বেঞ্চ চাপিয়া আছে।

অমিয় হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—থাক! থাক! করছো কি! বলিয়া রত্নার দিকে নত হইয়া হাত দিয়া সে তাহার পা সরাইয়া দিল। অমিয়র দেহের দক্ষিণ-অংশটুকু রত্নার অঙ্গের উপর পড়িয়া তাহার কুমারী-বক্ষে সহসা একটা দোলন দিল।

অমিয়র সে দিকে হুঁশ ছিল না—তাহার দেহের স্পর্শ যে এক-জনের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বহাইয়া দিল! আনন্দের শিহরণ তুলিয়া বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে সহসা দ্রুত করিল, কিছুই সে জানিল না। সোজা হইয়া বসিয়া হাসিমুখে অমিয় কহিল,—বিপদ আর কি! ভারী দুষ্টু তো! নতুন চালাতে বসেই এতখানি স্পীড্ বাড়ায়!

হাসিমুখে রত্না কহিল,—ঝড়ের মত আমি উড়ে যেতে চাই!

—ব্রেভ্ গার্ল! বলিয়া অমিয় হাসিল! কহিল—শেখো আরো ভালো করে! বলিয়া সে রত্নার শিক্ষকতা করিতে লাগিল।

শিক্ষা যখন দেওয়া যায়, তখন শিক্ষিতের সে শিক্ষা-গ্রহণে পটুত্ব ও আয়ত্তের কুশলতা দেখিলে দাতার আনন্দ যেমন বাড়ে, নিঃশেষে বিদ্যা-দানে আগ্রহও তেমনি জাগে। তাই দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্রগুলি দান করিয়াছিলেন।

রত্নার শিক্ষা-নৈপুণ্যে অমিয় যেমন বিস্মিত পুলকিত হইতেছিল, তেমনি প্রীতির রসে অজ্ঞাতে তার অন্তরও সিঞ্চিত হইতেছিল।

অমিয় স্বল্পভাষী-গম্ভীর প্রকৃতি। তাহাদের সমাজের তরুণীর দল যখনই গায়ে পড়িয়া আলাপে হাস্য-পরিহাসে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে আসে, তার মনে তখনই কেমন বিরূপতা জাগে! তাই বলিয়া কোন দিন সে রূঢ় বা অশিষ্ট আচরণে কাহাকেও ক্ষুন্ন করে নাই! তাহার স্বভাব ভদ্র—মানুষের সহিত সদ্ব্যবহারে চির দিন সে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই মানুষটি আজ রত্নার সহিত হাস্যালাপে চপল হইয়া উঠিল। হঠাৎ পথের ধারে গাড়ী যখন থামিয়া গেল, কি হইল বলিয়া অমিয় বিগড়ানো-গাড়ীকে দেখিতে রত্নার হাত ধরিয়া কহিল,—খুব হয়েছে! এখন এদিকে এসো তো!

রত্না উঠিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিল। এবং এটা ঘুরাইয়া সেটা নাড়িয়া গাড়ী হইতে নামিয়া এঞ্জিনটা দেখিয়া-শুনিয়া অমিয় ঠিক করিল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই রত্না গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া কহিল,—কি হয়েছিল?

অমিয় রত্নার মুখের দিকে চাহিল! একটু হাসিয়া কহিল,—বিকল! তোমার স্পর্শে গাড়ী কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

লজ্জা-রাঙা মুখে রত্না কহিল,—যাও—কেবলই ঠাট্টা!

আবার গাড়ী চালানোর কাজে শিক্ষানবীশি আরম্ভ হইল। অপরাহ্ণ সায়াহ্নে আসিয়া মিশিল, মাঠের চারি দিকে ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলা জ্বলিয়া উঠার সঙ্গে হঠাৎ দু'জনের গৃহে ফিরিবার কথা মনে পড়িল।

অমিয় কহিল,—মাটী করেছে!

সভয়ে রত্না কহিল,—মাসিমা খুব রাগ করবেন! চারটের মধ্যে ফেরবার কথা ছিল।

—তা কি করা যায়! যা দেরী হবার হয়েছে! কিছু না খেয়ে তো আর পাচ্ছি না! ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে।

অবাক হইয়া রত্না কহিল,—এই মাঠে-ময়দানে কি খাবে! খাবার তো কিছু আনা হয়নি। না, না, বাড়ী চলো, কল্পনা এসে বসে আছে। ভয়ানক রেগে যাবে সে!

—ইস্! কল্পনার রাগের ভয়ে আমি একেবারে কাঁটা!

—মাসিমা?

—স্পষ্ট বলে দেবো, রত্না ভুলিয়ে রেখেছিল, ওকে বকো।

—আমি ভুলিয়ে রেখেছিলুম?

—নিশ্চয়। এখন সাধু সাজলে চলবে কেন! রেগেছিলে তো তুমি ভুলিয়ে! চলো, খেতে যাই।

—কোথায় খেতে যাবে?

—আশ্চর্য্য! সামনে ঐ নীল আলোগুলো দেখতে পাচ্ছো না? ফিরপোয়!

১৫

—হ্যালো, মিষ্টার গোস্বামী! গুড্ ইভ্নীং!

অমিয় ও রত্না ফিরপোর ডাইনিং রুমে চা খাইতেছিল। দ্বারদেশ হইতে আহ্বান-ধ্বনি আসিতেই অমিয় সচকিতে মুখ ফিরাইল। ঈষৎ হাস্যে মাথা নাড়িয়া কহিল,—গুড্ ইভ্নীং মিষ্টার ডাট।

ডাট আসিয়া অমিয়র পাশে দাঁড়াইল। রত্নাকে দেখিয়া সকৌতুক দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে তাকাইল; চাপা গলায় কহিল,—বিউটীফুল! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অমিয় কহিল,—কি হয়েছে?

—বিশেষ কিছু নয়। অভিনন্দন জানাচ্ছি! ঠিক সময়ে যেন উপস্থিত হতে পারি।

রত্নার সমস্ত মুখে অদৃশ্য হাতে কে যেন এক কৌটা লাল আবীর ছড়াইয়া দিল! ব্রীড়া-নত দৃষ্টি সামনের টেবলে আঁটিয়া গেল।

ব্যগ্রকণ্ঠে অমিয় কহিল,—আরে, কাকে কি বলছো! রত্না—মিস্ বোস—আমার নিকট-আত্মীয়!

—হ্যাঁ, আরো নিকটতম অভিন্ন হোন্—আমরা কামনা করি। বলিয়া নত-মুখী রত্নার দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া ডাট কহিল,—মিস্ বোস, আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো, অন্তরের আনন্দ জানাবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি আমার বন্ধুর কঠিন কৌমার্য্য-ব্রত ভঙ্গ করেছেন, এ আশ্বাস আমরা এত দিনে পেলুম! বলিয়া ডাট হাসিতে লাগিল।

রত্নার চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল। অমিয় উঠিয়া পড়িল। কহিল,—কি বাজে বকছো! বলিয়া বন্ধুর দিকে হাত বাড়াইয়া করমর্দ্দন করিয়া কহিল,—আমার একটু তাড়া আছে, ভাই!

অমিয়র এই অপ্রতিভ ভাবটুকু ডাটকে আনন্দ দিতেছিল। হাসিতে হাসিতে সে কহিল,—নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিরবচ্ছিন্ন অবসর, একান্ত নির্জ্জনতাই এখন পরম কাম্য!

—আঃ, তবু ঐ বাজে কথা! আচ্ছা, আসি। এসো রত্না—বলিয়া অমিয় রত্নার হাত ধরিল।

কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হইতেই বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। ধর-দম্পতি একেবারে সম্মুখে। মিসেস্ ধর কহিল,—অমন করে চোরের মত পালাচ্ছেন যে আমাদের দেখে!

সিনেমা হইতে ফিরিয়া সব ফিরেপোয় উঠিয়াছিল। সুজিত মল্লিক অমিয়র কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—ভেরী বিউটীফুল লেডী!

ধর সাহেব কহিলেন,—আমাদের কবে নিমন্ত্রণ অমিয়?

কথাটা ঘুরাইয়া অমিয় কহিল,—বাবার বার্থ-ডেতে।

মিসেস্ ধর কহিল,—সে দিন না বাড়ীতে কি একটা নাটক অভিনয় হবে, শুনছি।

—হ্যাঁ, অর্জ্জুন-উর্ব্বশী।

মিষ্টার ধর চাহিল রত্নার দিকে। দৃষ্টিতে অনেকখানি প্রশংসা ফুটিয়া উঠিল।

মিসেস্ ধর কহিলেন,—উর্ব্বশী বোধ করি ইনি সাজবেন!

ধর সাহেব কহিল,—তোমার বাক্‌দত্তা বধূর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দাও।

—পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি! কিন্তু ভুল বলছেন! ইনি মিস্ বোস—আমার আত্মীয়!

মিসেস্ ধর হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—হাকিম সাহেব নিজের কথাতেই বেসামাল! বোস্ বলছেন! আত্মীয় বলছেন!

—না, ব্লাড-রিলেসন নয়! মিস্ বোস আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে।

মিসেস্ ধর রত্নার পানে চাহিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল,—আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আপনাকে দেখে আমাদের খুব আনন্দ হলো।

একটু হাসিয়া সরম-রাঙা মুখে রত্নাও অভিবাদন করিল।

মিষ্টার ধর অমিয়র কানের কাছে মৃদু স্বরে কহিল,—কলেজ গার্ল?

—হ্যাঁ, এ বছর আই, এ দেবে।

সহাস্যে সুজিত কহিল,—সাফল্য কামনা করি।

—ধন্যবাদ! মিস বোস্ ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ হোল্ড করেছেন; এবারও ওর কলেজ আশা রাখে···

মিসেস্ ধর সহাস্যে কহিল,—এত দিনে একটি জীবন্ত সরস্বতী পেলেন!

অমিয় রত্নাকে লইয়া মোটরে উঠিল। নিজেই সে চালকের আসন গ্রহণ করিল।

পথের বিজলী-বাতি অমিয়র মুখে পড়িতেই রত্নার মনে হইল, অমিয় কেমন যেন অন্যমনস্ক! ঈষৎ বিস্মিত হইয়া রত্না কহিল,—এমন জায়গায় আমায় নিয়ে গেলেন কি বলে অমি-দা!

গাড়ী চালাইতে চালাইতে অমিয় উত্তর দিল,—কে জানে আজ সব এসে জুটবে! চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল, তাই! অমিয়র স্বরে যেন জবাবদিহির ভাব!

একটু চুপ করিয়া রত্না কি ভাবিল। তার পর কহিল,—তুমি চির-কুমার থাকবার প্রতিজ্ঞা করেছিলে কেন অমি-দা? রত্নার অধরে কৌতুকের হাসি।

অমিয় মুখ ফিরাইল; রত্নার মুখের দিকে তাকাইল, কহিল,—ওই তোমাদের স্বভাব! ভারী কৌতুহলী তোমরা। তোমাদের সব কথায় জবাব দিতে হবে! না দিলে এমন সব কথা ভেবে বসো; যার চেয়ে খুলে বলাই ভালো!

মুখ টিপিয়া ভালো মানুষের মত একটু হাসিয়া রত্না কহিল,—আমিও তাই বলি, লক্ষ্মী ছেলের মত বলো আমায়! কাউকে আমি বলবো না! বলিয়া সে অমিয়র দিকে সরিয়া বসিল। উভয়ের গায়ে গা ঠেকিল।

হাসিয়া অমিয় কহিল,—কি ভালো-মানুষটি! আহা! কিন্তু আমার গল্পের মধ্যে মজা নেই! আমি কারুর কাছে কখনো বলে বেড়াইনি যে আমি বিয়ে করবো না!

—তবে ওঁরা যে বল্লেন! রত্নার দৃষ্টি কৌতুকে উজ্জ্বল।

অমিয় কহিল,—বত্রিশ বছর বয়স অবধি যে বিয়ে করিনি তাই থেকে ওরা ধরে নিয়েছে, ও কাজটা আমি কখনো করবো না!

—এখন? রত্নার মাথায় কেমন দুষ্ট-বুদ্ধি জাগিল।

—এখন কি?

—না, বলছি, এত দিন কেন বিয়ে করোনি? আচ্ছা, মাসিমা কোনো তাগিদ দেননি?

—তাগিদ হয়তো কিছু হয়েছিল, কিন্তু আমি যে কাউকে খুঁজে পাইনি!

—কখনো কাউকে পাওনি? রত্নার কৃষ্ণ-তারকা সহসা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অমিয় কহিল,—একেবারে না বললে মিথ্যে হবে। হয়তো কাউকে পেয়েছি! মনে হয়, যাকে জীবনসঙ্গিনী পেলে আনন্দ হয়! কিন্তু মনকে শাসন করি—সে হবার নয়! এ দুর্লভ কামনাকে মন থেকে বার করে দেবার চেষ্টা করি!

অমিয়র কাঁধের উপর হাত রাখিয়া রত্না কথা কহিতেছিল, এখন হাত নামাইয়া একটু সরিয়া বসিল।

গাড়ী চালাইতে চালাইতে অমিয় কহিল,—কি হলো?

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে-মুখে রত্না কহিল,—কিছু না। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

ছায়ালোক

আমার মনের কামনার রঙে নেয়ে জাগিয়াছে শুধু রিক্ত বালুর চর,
ওরা আসিয়াছে প্রেমের তরণী বেয়ে, ফিরে চলে গেছে নীরব নিরুত্তর।
নিবিয়াছে দীপ, ছিঁড়িয়া গিয়াছে মালা,
শুকায়েছে ফুল, ভরেছি শূন্য ডালা;
সোনার স্বপনে রাঙানো ফসল দিয়ে ভরিয়া তুলেছি ওদের কমল-কর!
ওরা আসিয়াছে প্রেমের তরণী বেয়ে, ফিরে চলে গেছে নীরব নিরুত্তর।

ওদের পরশ-শিহরণে বুঝি হায়, মনের কিনারে বেজেছে ঢেউয়ের গান,
ছায়ালোক নামে গোধূলি ঝরিয়া যায়, মেটেনি দুরাশা কামনা অনির্ব্বাণ।
আঁধার ঘনায় মুখর বনের কোলে
তারার দৃষ্টি ঢেউয়ের বক্ষে দোলে,
যারা আসিবে না তাহাদেরই পথ চেয়ে,
স্বপন-বিলাসে কাঁদে তটিনীর চর।
ওরা শুধু আসে প্রেমের তরণী বেয়ে, ফিরে চলে যায় নীরব নিরুত্তর।

ব্যথার বেণুতে নামিল কি ঘুমঘোর, কি সুর বাজালি ওরে ও পাগল কবি?
বুকের রক্তে ভিজালি যে তুলি তোর,
রেখা দিয়ে তার আঁকিলি সে কোন্ ছবি!
আমারই ভুলের আমারই ব্যথার দান—
অশ্রু-রেখায় লিখেছি যে তার গান,
মুছে দিই আজ সোনার স্বপনে আঁকা, রিক্ত ফসল নিঃস্ব দিনের ঘর।
ওরা শুধু আসে প্রেমের তরণী বেয়ে, ফিরে চলে যায় নীরব নিরুত্তর।

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী।

নন্দরাণী

[গল্প]

কিছু দিন আগেও সারা মাঠটা শস্য-সবুজ ছিল। অগ্রাণ মাসে ধান কাটার পর হইতেই সুদূর-প্রসারী মাঠখানা ধূসর বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া খাঁ-খাঁ করিতেছে। এই মাঠের কোলেই সরকারী রাস্তার একধারে পুকুরটা। নামও তাই "মাঠের পুকুর।"

গ্রামের পশ্চিম-পাড়ায় যে কয়-ঘর বামুন-কায়েত ও সদ্‌গোপের বাস, তাহারাই মাঠের পুকুরের নির্ম্মল ও স্বচ্ছ জলের সুবিধাটুকু পায়।

হরকালী মিত্রের বাড়ী পশ্চিম-পাড়ারই এক প্রান্তে। বর্ত্তমানে তিনটি মাত্র প্রাণীকে বুকে ধরিয়া এক-কালের এই বৃহৎ বাড়ীখানা যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে! স্ত্রী হেমাঙ্গিনী এবং ২০।২২ বৎসরের কন্যা নন্দরাণীকে লইয়াই হরকালীর সংসার।

চৈত্রের অপরাহ্ন। হেমাঙ্গিনী উঠান হইতে শুক্‌না-কাঠ কয়খানি রান্নাঘরে তুলিতে তুলিতে কহিল—"কাল বোশেখীর দিন নন্দ। এই বেলা গা ধুয়ে আয়—ঝড়-টড় উঠলে আর হয়তো যেতে পারবি না।"

মায়ের কথায় নন্দরাণী রান্নাঘরের দাওয়া হইতে পিতলের শূন্য ঘড়াটা ও গামছাখানা লইয়া মাঠের পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘাটে তখন জন চার-পাঁচ স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল এবং এবার এ-অঞ্চলে যে ধান হয় নাই, সেই সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনা-আন্দোলন হইতেছিল!

ঘোষাল-গিন্নী কহিলেন—"আসছে বছরও হবে না, এই আমি বোলে রাখচি, তোমরা দেখে নিও। কেন না, 'আমে ধান—তেঁতুলে বান'।"

ঘোষেদের মেজ বউ কহিল—"এবার কি বোলটাই হোয়েছিল খুড়ী, তা আর একটিও নেই!"

"তাই ত বলচি মা, এবার আমও হবে না, সুতরাং ধানও হবে না।"

পাঁচুর মা কহিল—"হবে কোত্থেকে দিদি! পৃথিবী পাপে টলমল করচে, এখন এই রকমই হবে। কলির শেষ কি না! এখন যত অঘটন ঘটবে! লোকে ভাববে এক, হবে আর এক।" তার পর নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া বলিল—"তার সাক্ষী দেখ না কেন, আমাদের এই নন্দ। কত খুঁজে-পেতে বে দিলে, ভাবলে, মেয়েটা সুখী হবে, তা হোল কি না ঠিক তার উল্টো!"

ঘোষাল-গিন্নী কহিল—"কেন, হরু ঠাকুর-পো ত ভাল হাতেই ওকে দিয়েচে। জামাইয়ের রূপ-গুণ, স্বভাব-চরিত্তির সবই ত ভাল; তিন-তিনটে পাশ······"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া পাঁচুর মা কহিল—"পাশ, না ছাই-পাঁশ! তবে আর বলচি কি! রূপও আছে, গুণও আছে, কিন্তু সবই বৃথা হোল। আজ ৫।৭ বছর বে হোয়েচে, তা মেয়েটাকে নিয়ে যেতে পারলে না এখনো। আর নিয়েই বা যাবে কি করে বল, সে-বেচারা নিজের পেটই চালাতে পাচ্ছে না, তা······ তাই ত বলচি, মেয়েটার কি বরাত দেখ!"—বলিয়া আর একবার বক্রদৃষ্টি দিয়া নন্দরাণীর দিকে চাহিল।

এই পাঁচুর মাকে নন্দরাণী যেমন ভয় তেমনি অপছন্দ করিত। তাহার মুখের প্রীতি ও সহানুভূতি যে মিছরীর ছুরির ন্যায়, তাহা সে ভালই জানিত। তাহার মুখের মিছরীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে যে বিষ থাকিত, পাড়ার কাহারো তাহা জানিতে বাকী ছিল না। তাই জলে নামিয়া তাড়াতাড়ি নন্দরাণী তাহার কাজ সমাধা করিল এবং ঘড়াতে জল ভরিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

তাহার মুখ-ভাব দেখিয়া হেমাঙ্গিনী কহিল—"কিছু হোয়েচে না কি রে নন্দ?"

"কি আবার হবে?"

"নিশ্চয় কিছু হয়েচে। শ্যাখ, তুই-ই আমার পেটে হোয়েচিস্, আমি তোর পেটে হইনি! ঘাটে কে ছিল বল্ দেখি।"

"ছিল ওই ঘোষাল-গিন্নী, মিত্তিরদের মেজ বৌ, পাঁচুর মা, কেষ্টর······"

"পাঁচুর মা ছিল ত! তা হোলে নিশ্চয় সেই-ই কিছু বলেচে! কি বলেচে বল্ না।"

যাহা বলিয়াছিল নন্দরাণী তাহা বলিলে হেমাঙ্গিনী কহিল,—"ও আবাগী যমের বাড়ী যাবে কবে! বড্ড নাড়ীর টান কি না, তাই তোর ব্যথা ওর বুকে বিঁধেচে! আমি হোলে মুখের মত জবাব দিয়ে আসতুম। বলি, তুই যে পাড়া-জ্বালানী চিরটা কাল ভাইয়ের ঘরে কাটালি! দু'দিনের জন্যে স্বামীর ঘরও যে তোর ভাগ্যে ঘটেনি! নিজের ঘা দেখতে পায় না, পরের ঘা দেখে বেড়ায়।" তাহার পর খানিক নীরবে থাকিয়া কহিল—"আমার সঙ্গে একবার দেখা হোলে শুনিয়ে দোবো'খন আচ্ছা কোরে!"

কিন্তু হেমাঙ্গিনী পাঁচুর মাকে আর শোনাইতে পারিল না, শোনাইল হরকালীকে। রাত্রে হরকালী আহারে বসিলে হেমাঙ্গিনী আসিয়া সামনে বসিল এবং একটি একটি করিয়া স্বামীর কাছে অনেক কিছুই বলিল। এ সব শুনিয়া হরকালী কহিল—"কি বলব বল, সবই আমাদের ভাগ্য। রূপে-গুণে জামাই করলুম, কিন্তু দেখচি, আমাদের ভাগ্যই খারাপ।···সুপ্রকাশ কি যে কোচ্চে! বি-এ পাশ—একটা চাকরী কেন যে যোগাড় করতে পারচে না! আজকালকার ছেলের মত মোটেই চালাক-চতুর নয়। কত মুখ্যুতে চাকরী জুটিয়ে নিচ্চে, আর ও লেখাপড়া শিখে···সবই ভাগ্য!"

সবই যে ভাগ্য, তাহাতে ভুল নাই। বছর ছয়-সাত পূর্ব্বে হরকালী যখন নন্দরাণীর বিবাহ দেয়, তখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান সুপ্রকাশ বি-এ পড়িতেছিল। পুত্রের বিবাহ দিয়া সুপ্রকাশের পিতামাতা কাশী যায় এবং হঠাৎ উভয়ে বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হইয়া সেইখানেই মারা যায়। ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীখানা যে মহাজনদের কাছে বন্ধক ছিল, তাহাও সুপ্রকাশ জানিত না। সুতরাং বাপ-মায়ের সঙ্গে পৈতৃক বাড়ীখানাও সুপ্রকাশকে হারাইতে হইল। সম্বল রহিল শুধু তাহার বি-এ পাশের সার্টিফিকেটখানা। সেই সম্বলটুকু হাতে করিয়া এ যাবৎ সুপ্রকাশ চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোথাও সুবিধা করিতে পারিতেছে না। সুতরাং সবই যে ভাগ্য, তাহাতে আর ভুল কি!

বর্ত্তমানে সুপ্রকাশ কালীঘাটে এক ভদ্রলোকের তিনটি ছেলেকে দুই বেলা পড়ায়; তাহার বদলে সেইখানেই খায়-দায়, থাকে এবং মাসে পাঁচটি করিয়া টাকা হাত-খরচস্বরূপ পায়। সম্প্রতি সে কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে হাঁটা-হাঁটি করিয়া

একটা স্কুল-মাষ্টারীর আশা পাইয়াছে। বেতন আপাততঃ ৩৫ টাকা, তবে সে গ্রাজুয়েট্ বলিয়া পরে আরও বৃদ্ধি হইবে। এই উদ্দেশ্যেই সে দিন যখন আহারাদির পর সে বাহির হইতেছিল, তখন ডাক-পিয়ন তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। খামখানার আঁকা-বাঁকা ঠিকানা লেখা দেখিয়া বুঝিল, নন্দরাণীর চিঠি। তখনি নিজের ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সে চিঠিখানা পড়িল।

নন্দরাণী লিখিয়াছে—'আমি আর এখানে কিছুতেই থাক্‌ব না। লোকে তোমার ওপর কটাক্ষ কোরে যে দু'কথা বলবে, তা আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। যদি আধ-পেটা খেয়ে এক-বস্ত্রে তোমার কাছে আমি থাকতে পাই, সেই আমার সুখ। তুমি যাতে শীঘ্র আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পার, তার চেষ্টা কর।'

সুপ্রকাশ সেই প্রকৃতির লোক যে, একটুতেই উৎফুল্ল হইয়া ওঠে আবার একটুতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। নন্দরাণীর চিঠি পড়িয়া সে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সে দিন আর তাহার কর্পোরেশন আফিসে বাহির হওয়া হইল না। বালিসের তলায় চিঠিখানা রাখিয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং আকাশ-পাতাল যাহা ভাবিতে লাগিল, তার কোন দিকেই কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না।

* * *

বালীগঞ্জের ওই দিকে কোথায়-এক স্কুলে সুপ্রকাশের সেই চাকুরীটা হইয়াছে। রেল-লাইনের ও-পারে কসবায় এক ভদ্র-গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে সে ৫ টাকায় একখানি ঘর ভাড়া করিয়া নন্দরাণীকে আনিয়াছে।

সকালে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া, চা খাইবার পর, বাজার করিয়া ফিরিতেই বেলা ৯টা বাজিয়া যায়। তাহার পর স্নানাহার সারিয়া দশটার পরই তাহাকে বাহির হইতে হয়। বাসায় ফিরিতে পাঁচটা বাজে। যে দিন ছুটির পর মাষ্টাররা বসিয়া একটু গল্প-গাছা করে, সে দিন তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইয়া যায়। একই কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছেলেদের স্কুলের পাশেই মেয়েদের স্কুল। ও-স্কুলের দিদিমণিরা ছুটির পর মধ্যে মধ্যে যে দিন আবার এ-স্কুলে গল্প করিতে আসিতেন, সে দিন তাহার ফিরিতে আরও বেশী বিলম্ব হইত।

সে দিন ছুটির পর মাষ্টাররা উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় ও-স্কুলের চার জন দিদিমণি আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। একটি তরুণীকে দেখাইয়া হেড্-মিষ্ট্রেস্ কহিলেন—"ইনি আজ থেকে আমাদের এখানে 'জয়েন্' করলেন।"

হেড্-মাষ্টার সহাস্য মুখে কহিল,—"তাই না কি? আপনার কি এই প্রথম য়্যাপয়েন্টমেণ্ট?"

মুখ টিপিয়া মৃদু হাসির সহিত তরুণী কহিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, গোয়ালে এই প্রথম ঢুকলুম।"

সকল মাষ্টারেরই তরুণীর উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

অবিবাহিতা তরুণীর নাম মিস্ লালিমা সরকার। বয়স আন্দাজ ২২।২৩ হইবে। সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু রূপ-চর্চ্চায় এবং বেশ-ভূষার পারিপাট্যে তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল। গলার সরু মফ্-চেনটা বাঁ-হাতের একটা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে মিস্ লালিমা সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া কহিল—"শুনলুম, আমার মত আপনিও এক জন নতুন অতিথি।"

সুপ্রকাশ কহিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ! তবে আপনার মত একেবারে আন্‌কোরা নয়; মাস-খানেকের পুরোনো।"

সে দিন সুপ্রকাশের বাসায় ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইল। নন্দরাণী কহিল—"আজ তোমার এত দেরী হোল কেন আসতে? আমি পাঁচটার পর থেকেই জানালার ধারে বোসে পথের দিকে চেয়ে আছি, কখন্ আস কখন্ আস। চা খাওয়া হয়নি ত?"

"না! মাথাটা বোধ হয় তাই ধরেচে।"

সুপ্রকাশের মুখ-হাত-পা ধোয়া হইলে নন্দরাণী ঘরের মেজেতে একখানা আসন পাতিল এবং নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ থালা তাহার সামনে রাখিয়া কহিল—"বোসো। আমি চা কোরে আনি।"

থালার দিকে চাহিয়া সুপ্রকাশ বিস্ময়ের সহিত কহিল—"ইস্! ব্যাপার কি! এত সব কোত্থেকে এলো?"

"সকালে তাড়াতাড়িতে পেরে উঠিনি, তাই দুপুরবেলা আমি দোকান থেকে আনিয়ে রেখেছিলুম।"

"পয়সা পেলে কোথা?"

"আসবার সময় মা একটা টাকা দিয়েছিলো, তাই দিয়ে আনিয়েছি।"

"তা শুধু-শুধু সে টাকা নষ্ট করে এ সব কেন আনালে, নন্দ?"

"শুধু-শুধু নয়; আজ যে তোমার জন্মদিন।"

"জন্মদিন! আমার?······ওঃ, ঠিকই ত! আজ ত পঁচিশে শ্রাবণ বটে! আমার জন্মদিন, আমারই মনে নেই, কিন্তু তোমার ঠিক মনে আছে দেখচি।"

মৃদু হাসিয়া নন্দরাণী কহিল,—"তোমার জন্মদিন আমার মনে থাকবে না? তোমার সব কথাই আমার মনে গাঁথা থাকে। নাও, খেতে বোসো।" বলিয়া নন্দরাণী চা আনিতে রান্নাঘরে গেল।

জলযোগান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুপ্রকাশ কহিল—"আজ ক্ষিধেটা যেমন পেয়েছিল, তেমনি তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হোল।"

নন্দরাণী গলায় আঁচল দিয়া সুপ্রকাশের পায়ে প্রণাম করিল। সুপ্রকাশ হাসিয়া কহিল—"আজ কি বোলে তোমায় আশীর্ব্বাদ কোরব, বল ত?"

নন্দ উঠিয়া কহিল—"এই বোলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমায় এই রকম তৃপ্তি দিতে পারি, আর যাবার বেলায় যেন এই রকম প্রণাম করে, তোমার পায়ের ধূলো নিয়ে, যেতে পারি!"

পরের দিন সকালে স্কুল যাইবার আগে সুপ্রকাশ কহিল—তোমার পায়ের মাপটা আজ নিয়ে যাবো।"

আশ্চর্য্য হইয়া নন্দরাণী কহিল—"পায়ের মাপ কি হবে?"

"আজ একজোড়া স্যাণ্ডেল্ কিনে আনব তোমার জন্যে।"

স্যাণ্ডেল্ নিয়ে কি করব আমি?"

"কোথাও যেতে-আসতে পরবে।"

"জুতো পায়ে দেবো!"

"কেন, দিতে নেই? আজ-কাল সকলেই দেয়।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দরাণী বলিল—"যারা দেয়, তারা দেয়। দেওয়া দোষের, তা বলচি না। তবে জুতো পায়ে দিয়ে আমি যাবো কোথা? আর তা ছাড়া জুতো পায়ে দিতে আরম্ভ করলেই, তখন মনে হবে, ভাল একখানা সাড়ী পরি; আর সাড়ীর

সঙ্গে নানারূপ ইচ্ছে তখন আসবে,—ব্লাউশ, লেস্, ক্রচ, রিষ্টওয়াচ, স্নো, ক্রীম, পাউডার······আমাদের ঘরে যা আছে, তাই ভাল! যাদের পয়সা আছে, তারা ও-সব করুক গো।"

সুপ্রকাশ দেখে—আজকাল পথে-ঘাটে সকল স্ত্রীলোকের পায়েই জুতা। তার ইচ্ছা, নন্দরাণীও দেয়। কিন্তু আবার ইহাও ভাবে, মেয়ে-মানুষকে জুতো পায়ে দিলে কেমন-যেন পুরুষ-পুরুষ দেখায়, নারীর কোমল ভাবটুকু যেন থাকে না। পরক্ষণেই আবার ভাবে—মেয়েদের শুধু-পায়ে দেখে-দেখেই চোখ অভ্যস্ত হোয়ে গেছে, তাই জুতো পায়ে দেওয়া দেখলেই হয়ত ওই রকম মনে হয়। তবে এ ঠিক যে, জুতো পায়ে দিলে রাস্তার কাঁকর, কাঁটা, কাচ-টাচগুলো পায়ে ফোটে না, আর রাস্তার নোংরাগুলো জুতোর তলাতেই থাকে, পায়ের সঙ্গে সেগুলো ঘরে ঢুকতে পারে না······। সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ভাবে—'না—না, জুতোর সঙ্গেই রাস্তার যত নোংরা এসে ঘরে ঢোকে। তাতে কত রোগের 'ব্যাসিলি' থাকে! খালি পায়ে ঘুরে এসে পা ধুয়ে ঘরে ঢোকবার আমাদের রীতি আছে; তাহলে সেগুলো আর ঘরে ঢুকতে পায় না। নন্দ যা বলেছে তাই ঠিক, জুতো পায়ে দিয়ে সে যাবে কোথা? আর পয়সা হোলে ও-সব অভ্যাস করতে বেশী দেরী হবে না।'

পরের দিন শনিবার। সকাল-সকাল স্কুল হইতে ফিরিয়া সুপ্রকাশ কহিল—"চল, আজ একটু পার্কে বেড়িয়ে আসি।"

নন্দরাণী শ্যামবর্ণা হইলেও তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব অতি সুন্দর। তার মুখাবয়ব অতি সুশ্রী। আর সবচেয়ে সুন্দর কোমলতায় ভরা ভাসা-ভাসা তার চোখ আর সেই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে বিস্ময় ভরিয়া নন্দরাণী কহিল—"পার্কে বেড়াতে? সে আমি পারবো না। আমার ভারি লজ্জা করবে।"

সুপ্রকাশ কহিল—"এ তোমার অন্যায় লজ্জা। গেল রবিবার আমার সঙ্গে কালীঘাটে যেতে ত লজ্জা করলো না।"

"সে যে কালীদর্শনে গিয়েছিলুম। সে যাওয়া যে দেবতার টানে। তোমার কাছে আসতে কি আমার লজ্জা করে?"

"নাঃ—তুমি একেবারে জংলী।"

সুন্দর মুখে সুন্দর এক রকম ভঙ্গী করিয়া নন্দরাণী কহিল, "এই জংলীই ভালো।"

ইহার দিন-পনেরো পরে স্কুলের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদেশ আসিল যে, পরের বুধবার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণকে শিবপুর কোম্পানীর বাগানে অর্থাৎ বোটানিকেল্ গার্ডেনে যাইতে হইবে। যাহাতে আনন্দ-ভ্রমণের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রাকৃতিক পর্য্যবেক্ষণ-স্পৃহা বৃদ্ধি পায়, সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে এইরূপ করা হইত।

বুধবার বেলা ন'টার মধ্যে স্নানাহার সারিয়া সুপ্রকাশ স্কুলে চলিয়া গেল। দু'খানা দোতালা বাস্ শিবপুর যাতায়াতের জন্য 'রিজার্ভ' করা হইয়াছিল। যথাসময়ে তাহাতে করিয়া সকলে কোম্পানীর বাগানে পৌছিল। সেখানে সারাদিনটা সকলের বেশ আনন্দ-উৎসাহে কাটিল। ছেলে-মেয়েরা সারা বাগান ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাষ্টার ও মিষ্ট্রেসরা কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো উন্মুক্ত 'লনে', কখনো সহস্র-ঝুরি সেই অতিবৃদ্ধ বটের ছায়া তলে, কখনো বা কুঞ্জবনের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া গল্প-গাছা ও আলাপ-আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

অদূরে মস্ত বড় একটা লজ্জাবতীর ঝোপ দেখিয়া লালিমা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল এবং পাতার উপর এখানে ওখানে আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিতে লাগিল। একপা-একপা করিয়া সুপ্রকাশও সেখানে গিয়া দাঁড়াইল; কহিল—"জিনিষটা খুবই সাধারণ, কিন্তু কি অসীম বিস্ময় এর ভেতর রয়েছে!"

"সত্যি, ভারি মজার।"

"আচ্ছা, আপনি 'বন-চাঁড়ালে'র গাছ দেখেচেন?"

"দেখা ছেড়ে কখনো নামও শুনিনি" বলিয়া লালিমা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

"সে আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার! তার পাতার কাছে আপনি আঙুলের তুড়ি যদি দেন ত তার সেই পাতাটা তুড়ির তালে-তালে নাচতে থাকবে।"

হাসিতে হাসিতে লালিমা কহিল—"তা হোলে ওদের ভেতরও নাচ-গানের চর্চ্চা আছে বলুন।"

"বাস্তবিক, উদ্ভিদ্-জগতের মধ্যে কত বড় একটা বিস্ময় যে রয়েচে! আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ত ভাল ভাবেই প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, মানুষের মত ওদের সব রকম বোধ-শক্তিই আছে। লজ্জা আছে, ভয় আছে, রাগ আছে, দুঃখ আছে, মান-অভিমান, শীত-গরম ·········ওদের যে শীত লাগে, শীত ছাড়ে, সে কথা ত আমাদের শাস্ত্রের বচনেও আছে:—

অশীতাস্তরবো মাঘে
ফাল্গুনে মৃগপক্ষিণঃ
চৈত্রে জলচরাঃ সর্ব্বে
বৈশাখে নর-বানরাঃ।"

"আপনি দেখচি, উদ্ভিদবিদ্যায় খুব এক জন······"

"না, না, মোটেই না। আমার ইচ্ছে করে বটে, এ সম্বন্ধে একটু জানি-শুনি, একটু······

"আমাদের বাড়ী-ওলা জ্ঞানময় বাবুরও এ-সব বিষয়ে খুব জানা-শোনা। উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাঁর যে কত বই আছে।"

"তাই না কি? তাঁর ওখানে গিয়ে যদি কিছু-কিছু পোড়ে আসি, তাতে তিনি······"

"খুবই সুখী হবেন, তিনি খুব অমায়িক লোক।"

"তাহোলে স্কুলের পর রোজ গিয়ে······আপনাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কি?"

"ঐ লেক-বাজারের কাছে, ৩।২ সাউথ লেন। চা খাবেন সুপ্রকাশ বাবু? আমি ফ্লাস্কে কোরে এনেচি। চলুন, দু'জনের হবে'খন তাইতে।"

কিছু আগে লালিমার সুকোমল অঙ্গুলি স্পর্শে লজ্জাবতীর যে পাতাগুলি লজ্জায় বুজিয়া গিয়াছিল, সেগুলি তখন একে-একে আবার প্রসারিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

* * *

"এ ছবিটা যে দেখচেন, এটা 'বিগোনিয়া'। এর দেহের প্রত্যেক অঙ্গে প্রাণের বীজ। একটা পাতা ছিঁড়ে মাটিতে পুঁতে দিন, দেখবেন তার থেকে শেকড় বেরিয়ে নতুন গাছের সৃষ্টি হোয়েচে।"

"আচ্ছা, বটে!"

"ওটা 'ক্যাক্‌টাস্'—কি সুন্দর ওর ফুল দেখেছেন! অনেক দিনের সঞ্চিত কামনায় ওর বুকের ভেতর থেকে ঐ সৌন্দর্য্য ফুটে বেরিয়েচে! তাকে বাইরের কঠিন হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে ও যেন ওর সর্ব্ব দেহের কাঁটাগুলো ফুলিয়ে বোসে আছে।"

"কিন্তু ভারি সুন্দর ফুল ত!"

"হ্যাঁ! আমাদের এই 'মনসা'র জাত! কিন্তু খুব উঁচু ঘরওয়ানা—অর্থাৎ রাজা-রাজ্‌ড়া।"

তিন-চার মাস পরের কথা। ৩।২ সাউথ লেনের দোতলার একখানা ঘরে বসিয়া জ্ঞানময় বাবু আর সুপ্রকাশ উদ্ভিদ্-বিস্তার আলোচনা করিতেছিল। সামনে একখানা বিলাতী বইয়ের পাতা খোলা।

এই তিন মাস ধরিয়া প্রত্যহ ছুটির পর সুপ্রকাশ এখানে উদ্ভিদতত্ত্ব আলোচনা করিতে আসিতেছে। চারিটার পর লালিমার সঙ্গে আসে এবং নীচের তলায় তাহাদের ঘরে চা খাইয়া, ছ'টা পর্য্যন্ত জ্ঞানময় বাবুর বাড়ীতে কাটায়। তবে এই কাটানোর রুটিনে ক্রমেই একটু রদ-বদল হইয়া আসিতেছে। প্রথম মাসে লালিমাদের ঘরে চা খাইতে তাহার আধ ঘণ্টা লাগিত, বাকী দেড় ঘণ্টা কাটিত জ্ঞানময় বাবুর কাছে। দ্বিতীয় মাসে সময়টা অর্দ্ধেক ভাগা-ভাগি হইয়া গিয়াছিল; অর্থাৎ এক ঘণ্টা লালিমাদের ঘরে, এক ঘণ্টা জ্ঞানময় বাবুর কাছে। এ মাসে জ্ঞানময় বাবুর ঘরে কাটিতেছে আধ ঘণ্টা, আর বাকী দেড় ঘণ্টা কাটে লালিমাদের ঘরে।

সে দিন সন্ধ্যা হয়-হয়, তবু উপরে জ্ঞানময় বাবুর ঘরে না গিয়া সুপ্রকাশ নীচে লালিমাদের ঘরে একখানি আরাম-কেদারায় শুইয়া "বিষবৃক্ষ" পড়িতেছিল। লালিমা পাশের একখানা টুলে বসিয়া পশমের 'পুল্-ওভার' বুনিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্‌খানটায় পড়ছেন বলুন ত, তন্ময়তার হেতু বুঝি।"

পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক ভাবে সুপ্রকাশ কহিল—"যেখানে হরিদাসী বৈষ্ণবী—"

"আর বলতে হবে না, বুঝেছি। সাতাশ-আটাশ বছরের মধ্যে এ সব পড়বার মোটেই অবকাশ পাননি দেখচি। খালি ভাল ছেলে হয়ে স্কুল-কলেজে গেছেন আর বছর-বছর পাশ করে এসেচেন!—যাক, আজ তা হলে আর ওপরে যাচ্চেন না ত?"

"না, ও আর ভাল লাগে না।"

"না-লাগবারই কথা। দুব্বো ঘাস আর বাঁশ যা'তে বলে—একই জিনিষ, সে বিদ্যে না জানাই ভাল।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিতেই লালিমা যখন আলোর 'সুইচ' টিপিয়া দিল, তখন সুপ্রকাশ বই বন্ধ করিয়া রাখিয়া কহিল—"মাথাটা বড্ড ধরেচে।"

একটু হাসিয়া লালিমা কহিল—"বোধ হয় হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান শুনে!"

"শরীরটাও কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করচে।" বলিয়া সুপ্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাসায় ফিরিয়া নন্দরাণীকে কহিল—"দেখ, আজ আর কিছু খাব না আমি। শরীরটা বড় খারাপ লাগচে।" বলিয়া সুপ্রকাশ শয্যায় শুইয়া পড়িল।

নন্দরাণীর মুখখানা চিন্তাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"মাথা ধরেছে?"

"খুব। বোধ হয় জ্বর-টর কিছু হবে।"

নন্দরাণী শিয়রে বসিয়া সুপ্রকাশের মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে সুপ্রকাশ কহিল—"যাও, তুমি রান্না-বান্না করগে।"

"কার জন্য আর রাঁধবো! আমার ত পেট ভার হোয়ে রয়েছে, ক্ষিধে-টিদে কিছু নেই। দু'টি মুড়ি আছে, তাই খাব এখন।"

মধ্যরাত্রে সুপ্রকাশের খুব জ্বর আসিল। পরের দিনও সে জ্বর ছাড়িল না। জ্বরের ঘোরে সারাদিন সুপ্রকাশ বেহুঁসের মত পড়িয়া রহিল! নন্দরাণী কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। দুশ্চিন্তায় ভয়ে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। বিদেশে কোনই অভিভাবক নাই; সে কি করিবে! মনে-মনে সে বার-বার ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিল।

চার দিনের দিন সকালের দিকে সুপ্রকাশের জ্বর অনেকটা নামিল; কিন্তু দুপুর বেলা আবার বেশী করিয়া জ্বর আসিল। বাড়ীওয়ালা-গিন্নী নন্দরাণীকে বলিল—"ডাক্তার এনে দেখাও মা, জ্বরটা বোধ হয় বাঁকা।" নন্দরাণীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় ডাক্তার পাওয়া যায়, আমি ত কিছুই জানি না। আপনারা যদি একটু দয়া কোরে…"

"আচ্ছা, আমার ছেলেকে দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে আনাবো এখন। এখানে ঐ বাজারের কাছে বেশ ভাল ডাক্তার আছে। চার টাকা করে ভিজিট নেয়।"

তার পর নন্দরাণী তাঁহাকে চুপি চুপি কি বলিয়া হাতের দু'গাছা রুলি খুলিয়া দিল। খানিক পরে বাড়ী-ওলা গিন্নী কুড়িটি টাকা আনিয়া নন্দরাণীর হাতে দিয়া গেল।

বিকালের দিকে ডাক্তার আসিল এবং সুপ্রকাশকে দেখিয়া কহিল—"কোন ভয় নেই। তবে জ্বরটা রেমিটাণ্ট টাইপের। খুব শীত পড়েচে—যেন ঠাণ্ডা-টাণ্ডা না লাগে। ওষুধটা আজ এক দাগ খাওয়াবেন, কাল তিন বেলা তিন দাগ।"

তিন-চার দিনেই জ্বর নরম পড়িল। কুইনিন্ দিয়া ডাক্তার বলিলেন—"কালকের দিনটা বাদে পরশু দু'-একখানা সুজির রুটি একটু মাছের ঝোল দিয়ে খেতে পারবেন।"

তের দিন পরে সুপ্রকাশ সুস্থ হইয়া স্কুলে গেলে হেড্‌মাষ্টার হাসিতে হাসিতে কহিল—"ভগবান্ ক'দিন আপনাকে যেমন একটু কষ্ট দিলেন প্রকাশ বাবু, তেমনি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করেচেন।" বলিয়া ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল। সুপ্রকাশ চিঠি পড়িয়া দেখিল, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে এই স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদে উন্নীত করা হইয়াছে। হেড্‌মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর আপনি?"

"আমাকে নেবুতলায় 'ট্রান্সফার' কোরেচে।"

সেই দিন চারিটা বাজিতে-না-বাজিতেই ও স্কুলের মিষ্ট্রেস্‌রা আসিয়া সুপ্রকাশকে ধরিয়া বসিল, সুসংবাদ, সুতরাং তাহাদের সকলকে মিষ্টি-মুখ করাইতে হইবে। হাসিতে হাসিতে সুপ্রকাশ কহিল—"নিশ্চয়। এই শনিবারই তার ব্যবস্থা হবে। দয়া কোরে আপনারা………"

লালিমা হাসিতে হাসিতে কহিল—"দয়া আমরা যথেষ্টই করবো,

কিন্তু এখানে বোসে আমরা কেউ খাব না। আপনার বাড়ী গিয়ে খাব।"

চারখানা করে বাতাসা আর এক কাপ চা খেতে এতটা পথ যাওয়া—আপনাদের মজুরী পোষাবে না!"

"সে কথায় ত আপনার দরকার নেই! সে আমরা বুঝবো।"

পরের শনিবার একটার সময় স্কুলের ছুটি হইলেই মাষ্টার এবং মিষ্ট্রেসরা সুপ্রকাশের বাসায় আসিয়া হাজির হইল।

পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রকাশ তাহাদের জলযোগের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। রান্নাঘরের মধ্যে থাকিয়া নন্দরাণী জলখাবারের রেকাবীগুলা নানাবিধ মিষ্টান্ন-পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিতে লাগিল; আর সুপ্রকাশ এ-ঘরে প্রত্যেকের কাছে তাহা দিয়া যাইতে লাগিল।

হেড্ মিষ্ট্রেস্ কহিল—"এই বুঝি আপনার চারখানা করে বাতাসা, প্রকাশ বাবু?"

সবিনয় মৃদু-হাস্যে সুপ্রকাশ কহিল—"তাছাড়া আর বিশেষ কি, বলুন। আপনারা খান্, আমি চা-টা নিয়ে আসি।"

লালিমা কহিল—"সবই আপনি হাতে কোরে আনবেন? আপনার বাড়ীতে আজ আমরা 'গেষ্ট্'। আপনার স্ত্রী চা এনে না দিলে আমরা কিছুতেই খাব না। কি বলেন সুরেশ বাবু?"

সুরেশ বাবু কহিল—"দেখুন, আমি তাঁর দিক নিয়েই বলি। তিনি সহরের আপ্-টু-ডেট্ স্ত্রীলোক নন, তিনি হলেন গ্রামের··· সুতরাং······"

"ও-সব বাজে কথা কিছুতেই আমরা শুনবো না। তিনি চা পরিবেষণ না করলে আমরা কিচ্ছু খাচ্চি না। আচ্ছা, মিসেস্ রক্ষিত, আপনি বলুন তো।" বলিয়া লালিমা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুপ্রকাশ কহিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। নিশ্চয় তিনি চা পরিবেষণ করবেন।" বলিয়া সুপ্রকাশ রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

নন্দরাণী মনে মনে প্রমাদ গণিল। এরূপ অবস্থায় সে একেবারেই অনভ্যস্ত। শুধু মিষ্ট্রেসরা হইলেও একরূপ হইত। কিন্তু এতগুলি অপরিচিত পুরুষের সামনে সে কেমন করিয়া······

ভয়ে তাহার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। এক দিকে লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, অপর দিকে স্বামীর জেদ। অবশেষে নেহাৎ নিরুপায় হইয়া তাহাকে আট কাপ চা-শুদ্ধ ট্রেখানা দুই হাতে ধরিয়া শোবার ঘরের দিকে আসিতে হইল। কিন্তু ঘরের মধ্যে আর ঢুকিতে হইল না। এদিকে এক হাত ঘোমটা, ওদিকে ভয়ে ও লজ্জায় এই দারুণ শীতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল, হাত-পা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল—সেই অবস্থায় দ্বারের কাছে আসিবা-মাত্র তাহার শিথিল হাত হইতে ঝন্-ঝন্ শব্দে ট্রে-সমেত কাপ-ডিস্ মেজের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। দ্বারের বাহিরে ও ভিতরে চায়ের ঢেউ খেলিতে লাগিল। মূর্চ্ছার হাত হইতে কোনও রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নন্দরাণী একটু আড়ালে সরিয়া গেল এবং দেওয়াল ধরিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

সে দিন নন্দরাণী মূর্চ্ছার হাত হইতে নিজেকে সামলাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর সুপ্রকাশের নিকট হইতে ক্রমাগত যে ধাক্কা আসিতে লাগিল, তাহা সামলাইবার শক্তি আর তাহার রহিল না।

চিরকালের বাতাস হঠাৎ যেন ঘুরিয়া গিয়াছিল! কিছু দিন হইতে সুপ্রকাশ নন্দরাণীর প্রতি কথায়, প্রতি কাজে ভিতরে ভিতরে বিরক্তির ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছে। যে-নন্দরাণীর চিন্তাও তাহার সুখের এবং কাম্য ছিল, এখন স্বয়ং সেই নন্দরাণী তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছে! যে কথা না কহিলে নয়, এখন সেইরূপ দু'-একটা কথা ছাড়া সুপ্রকাশ তাহার সহিত আর কথাই কহে না। যাহা কহে—তাহাও অসন্তুষ্ট চিত্তে; তাহাতে না আছে প্রীতি, না আছে সহানুভূতি,—একটা অন্তর্নিহিত তিক্ততা সে-কথার সঙ্গে-সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে এবং নন্দরাণীর বুকে গিয়া তাহা আঘাত করে। নন্দরাণী অপরাধীর মত নীরবে সকল আঘাত সহ্য করিয়া যায়। সে দিন-রাত একলা বসিয়া ভাবে—তাহার কি দোষ; কোথায় দোষ! কিন্তু ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারে না। এক-এক দিন—যে দিন তাহার তিল-তিল সঞ্চিত দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিত, সে দিন আর সামলাইয়া উঠিতে পারিত না, বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া চোখ-মুখ ফুলাইত।

আজকাল সুপ্রকাশ খুব কম সময়ই বাসায় থাকে। এখন রোজই সে খুব সকাল-সকাল অর্থাৎ ন'টার সময় আহারাদি করিয়া স্কুলে চলিয়া যায়। বাসায় ফিরিতে কোন দিন রাত ৯টা; কোন দিন বা ১০টা হয়। জিজ্ঞাসা করিলে, হেডমাষ্টারী কাজের অজুহাত দিয়া বলে—"তুমি একটা সেকেলে প্যাটার্ণের মুখ্যু মেয়ে-ছেলে, এক জন হেড মাষ্টারের কত কাজ, কত দায়িত্ব, তা তুমি বুঝবে কি করে!"

সে দিন খুব সাহস করিয়া নন্দরাণী বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, আমি কি দোষ করেচি তুমি বল। তুমি আগেকার মত আর আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কও না কেন?"

মুখখানাকে বাঁকাইয়া সুপ্রকাশ কহিল—"কথা কওয়া চলে না বলে।"

"আগে ত কথা কইতে।"

সুপ্রকাশ কোন উত্তর দিল না।

"আমি স্যাণ্ডেল পায়ে দোবো; তুমি আমায় এনে দিও। আর তুমি যদি একটু সকাল-সকাল এসো, তা হোলে রোজ আমি তোমার সঙ্গে 'পার্কে' বেড়াতে যাব। লক্ষ্মীটি, তুমি আমার ওপর এ রকম রাগ করে থেকো না। তুমি আমায় ঠেলে দিলে, এত বড় পৃথিবীতে কার মুখ চেয়ে থাকবো। তোমার সুখেই আমার সুখ, শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ। তুমি যদি বিরূপ হও, আর তখনো যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহোলে সে কঠিন শাস্তি···"

নন্দরাণী আর বলিতে পারিল না। তাহার গলা বুজিয়া গেল, দুই চোখ ভরিয়া জল ঠেলিয়া আসিল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল—"তুমি কি চাও বল, আমি তাই করবো। আমি ভাল লেখাপড়া জানি না বটে, কিন্তু তোমার আনন্দের জন্য আমি সব করতে পারি। এই দেখ আমি কি করেচি"—বলিয়া রান্নাঘর হইতে একখানা 'ফার্ষ্ট বুক' আনিয়া কহিল—"বাজার থেকে কিনে আনিয়ে রোজ দুপুরবেলা বাড়ীওলার মেয়ের কাছে পড়চি।"

সুপ্রকাশ পূর্ব্বের মতই কোন উত্তর না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ছিল রবিবার। স্কুল বন্ধ থাকিলেও দুপুরবেলায় আফিস-ঘরে বসিয়া সুপ্রকাশ আর লালিমার কথা হইতেছিল।

"আচ্ছা প্রকাশ বাবু!"

"কি আজ্ঞা হয়, বলুন।"

"উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনা আপনার শেষ হোয়েচে ত?"

"এক রকম।"

"এবার কোন্ বিদ্যার আলোচনা করবেন?"

"যে বিদ্যা সামনে পাব।"

"কি সর্ব্বনাশ! তাহোলে ত এখন আপনার সামনে থাকা দায়।"

"সামনে না থাকলেও ক্ষতি নেই! সুড়ঙ্গ আর মালিনীর মত কেউ আমার সহায় থাকলেই আমার নিশ্চিত বিদ্যালাভ।"

একটা আনন্দ-ভঙ্গীর সহিত লালিমা কহিল—"রসে দেখচি আপনি ভরপূর!"

"নিশ্চয়। আমি যে সু—অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ। বাজে কথা যাক, আপনার কাণের গোড়ার বীচিটা কেমন?"

"কমে গিয়েচে। দেখুন না হাত দিয়ে।"

সুপ্রকাশ উঠিয়া গিয়া কাণের নীচে একটু টিপিতেই লালিমা বলিয়া উঠিল—"ও কি! বিনা-দোষে আমার কাণ মোলে দিলেন!"

"আমার ছাত্রী হোতেন ত, তাই দিতুম।"

"তাহোলে আমিও রোজ স্কুল পালাতুম। তা এখন উঠবেন কি না, বলুন। চা খাবার সময় হোল যে। মা আপনাকে 'বডি-ওয়ারেণ্ট' কোরে নিয়ে যেতে বলেচেন।"

এখানে একটা কথা বলিবার আছে। ৩।২ সাউথ লেনের নীচের তলার বাসায় লালিমা ও লালিমার মা ছাড়া উহাদের আর কেহ থাকে না। থাকিবার আর কেহ নাই-ও। লালিমার পিতা যদিচ আছেন বটে, কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর সন্ধি-বিচ্ছেদের ফলে স্ত্রী কলিকাতায়, আর স্বামী 'ক্যালিকট্' না 'কালিম্পং'য়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; ব্যাকরণের নিয়মানুসারে উভয়ের মধ্যে আর মিলন ঘটিবার কোন আশা-ভরসাই নাই। তাহা না থাকিলেও লালিমার মা যে অপূর্ব্ব 'সূত্রে' লালিমা ও সুপ্রকাশের মধ্যে মিলন ঘটাইবার আয়োজন করিলেন, তাহা 'মুগ্ধবোধে' নাই, 'কলাপে' নাই, 'সুপদ্ম'য় নাই; এমন কি, 'পাণিনি'র 'অষ্টাধ্যায়ী' খুঁজিলেও পাওয়া যায় না!

বড় বড় বৈয়াকরণিকেরা যে সন্ধির কথা তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিতে পারেন নাই, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা শুধু যে দুঃসাধ্য তাহা নহে, অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এক দিন স্কুলে বসিয়া আনন্দ-আলাপের মধ্যে সুপ্রকাশ যে বিদ্যা-লাভের কথা বলিয়াছিল, তিন মাস পরে বৈশাখের এক শুভদিনে এবং শুভক্ষণে তাহার সেই বিদ্যা-লাভ ঘটিয়া গেল। ৩/২ সাউথ লেনের নীচের তলায় যখন এই শুভ মিলনোৎসব সঙ্গোপনে সম্পন্ন হইতেছিল, ঠিক সেই সময় কসবার ছোট ঘরখানির মধ্যে একা বসিয়া বেচারা নন্দরাণী তাহার 'ফার্ষ্ট-বুক'-খানি লইয়া বৃথা বিদ্যা-লাভের চেষ্টা করিতেছিল আর তাহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব স্বামীর ফিরিবার আশায় মুক্ত গবাক্ষপথে বার-বার পথের দিকে তাকাইতেছিল।

* * * *

সাধের বিবাহের পর দশ মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই দশ মাস কাল নন্দরাণীর কি করিয়া কাটিয়াছে, তাহা নন্দরাণী ও তাহার অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই জানে না। সুপ্রকাশের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপেক্ষা এবং অনাদরের সহস্র আঘাতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। মাসের মধ্যে অধিকাংশ দিনই সুপ্রকাশ রাত্রে বাসায় আসে না। যদিও কৈফিয়ৎ দানের কোন আবশ্যকতা ছিল না, তথাপি সুপ্রকাশ নন্দরাণীকে বুঝাইয়া দিয়াছে, ৫০৲ টাকা আয়ে কলিকাতার খরচ কুলায় না, তাই তাহাকে শ্যামবাজারে তিরিশ টাকায় একটা 'টিউসনি' লইতে হইয়াছে এবং যে দিন পড়াইতে রাত হইয়া যায়, সে দিন সেইখানেই আহারাদি করিয়া তাহাকে শয়ন করিতে হয়।

শ্যামবাজারে না হউক, যে-বাজারে সে পড়ায়, সেখানে নিম্নোক্ত-রূপ পড়াশুনার কাজ চলে—

"তোমার হাত দু'খানা এত নিটোল আর মোলায়েম, মনে হয় যেন ননী দিয়ে গড়া!"

"ও রকম মনে কোরো না, দোহাই বলচি! শেষকালে লোভ সামলাতে না পেরে কবে হয় ত রুটী দিয়ে টোষ্ট্ বানিয়ে খেয়েই ফেলবে।"

"আচ্ছা লালিমা, আমার দিকে কতক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে পার?"

"পারি অনেকক্ষণ, কিন্তু তাতে তুমি হয় ত ভস্ম হোয়ে যেতে পার।"

"ভস্ম হব না! তবে গলে যাবার ভয় আছে।"

"তাই ত চিনির পুতুলকে দিন-রাত আগলে-আগলে রাখি। তবু ফাঁক পেলেই কসবার মাঠে ছুটতে কসুর কর না! হ্যাঁ, ভাল কথা, ডাক্তারে কি স্পষ্টই বোলেচে যে টি-বি?"

সুপ্রকাশ কপালটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া কহিল—"তাই ত বলেচে।"

"রুগী শুনেচে এ কথা?"

"না। সে হোল মুখ্যু জংলী। এ সব বিষয়ে তার কোন ধারণা আছে?"

এই সময় বাহির হইতে লালিমার মাতা ঘরের মধ্যে আসিয়া কহিল—"তা হোলে কি করবে বাবা? সাংঘাতিক রোগ! আমার ভারি ভয় করে, ছোঁয়া-ছুঁয়ি কোরে পাছে আবার তুমি ও-রোগটি এখানে······"

"তাই ত! কি করা যায় বলুন ত?"

"ওকে ওর বাপ-মায়ের কাছে দিয়ে এস। ও বিপদ এখানে রাখতে আছে?"

"আমিও তাই মনে করচি।"

"মনে করা-করি নয় বাবা, ও বিপদ ঘরে পুষে রেখো না। আর বলছিলুম কি বাবা, লালির আমার চুড়ির কত দূর কি হোল? ওর পাঁচটা বন্ধু-বান্ধবের সামনে শুধু হাতে······সে দিন অমিয় বাবুদের টি-পার্টিতে যাবার জন্ত কত কোরে ওকে বলে গেল। কিন্তু শুধু

হাত বোলে ও গেল না। সবাই ওকে কত ভালবাসে! ডাক্তার মৃন্ময় গাঙ্গুলী······"

"চুড়ি ত আজকালই দেবার কথা। আচ্ছা, আমি যত শীগ্‌গির পারি······"

সে দিন রাত্রে বাসায় আসিয়া সুপ্রকাশ নন্দরাণীকে কহিল—"তোমার শরীর কেমন আছে?"

"একটু খারাপ। তবে ও সেরে যাবে, ওর জন্য তুমি ভেবো না। আজ আর বেশী কাসি হয়নি। তুমি কেমন আছ? মাথা ধরেনি ত তোমার? টিপে দেবো একটু!"

"ওষুধ খাচ্চ রোজ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর জন্য তুমি অত ব্যস্ত হোয়ো না। দেখ, আমি টাকাকে পাই করা শিখে ফেলেচি। আর 'ফার্ষ্ট বুক'ও প্রায় শেষ হব-হব।"

নন্দরাণীকে যে কাল-ব্যাধিতে ধরিয়াছে, তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই। সে 'টি বি'র নাম শুনিয়াছে, কিন্তু তাহা যে এই, তাহা সে ভুলিয়াও মনে করে না। তাহার প্রত্যহ ঘুস-ঘুসে জ্বর হয়, সে মনে ভাবে—ম্যালেরিয়া। কাসির সঙ্গে রক্ত অবশ্য এখনো দেখা দেয় নাই। তবে চেহারা যে দিন-দিন ফ্যাকাশে হইয়া যাইতেছে, মনে করে—তাহাকে কলিকাতার 'নোনা' লাগিয়াছে!

সুপ্রকাশ কহিল—"দেখ, দিন-কতক তোমায় দুর্গাপুরে রেখে আসব।

চমকাইয়া উঠিয়া নন্দরাণী কহিল—"কেন?"

"ইংরেজ আর জার্ম্মেণীতে যে যুদ্ধ হোচ্চে, সেই জার্ম্মেণীরা কোলকাতায় এসে বোমা ফেলবে। অনেকেই তাই মেয়ে-ছেলে সব কোলকাতা থেকে সরিয়ে দিচ্চে। তা আসচে শনিবারেই তোমাকে দুর্গাপুরে······"

"আর তুমি?"

"আমাকে ত এখানে থাকতেই হবে, নইলে······"

"না, তা কিছুতেই হবে না। তোমাকে একলা রেখে আমি কিছুতেই যেতে পারব না। তুমি না হয় চাকরী ছেড়ে দাও। সেখানে এক রকম করে চলে যাবেই। পাঁচুর মা যা' বলে বলুক। তোমাকে কিন্তু এখানে ফেলে কিছুতেই যেতে পারব না।"

"আগে তোমাকে রেখে আসি. তার পর আমি না হয় ছ' মাসের ছুটি নিয়ে চলে যাব।"

"হ্যাঁ, তাই কোরো। তা না হোলে তোমার জন্ত ভেবে-ভেবেই আমি মরে যাব।"

আজ নন্দরাণীর মন অনেকটা হাল্কা বলিয়া বোধ হইল। মনে ভাবিল, সে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরকে ডাকিয়াছিল, তারি জন্ত সুপ্রকাশ আজ তাহার সহিত ভাল ভাবে কথা কহিয়াছে। রান্নাঘরে গিয়া সুপ্রকাশের ভাত বাড়িতে বাড়িতে সে মনে মনে স্থির করিল, রোজ ঠাকুরকে সে এমনি ভাবেই ডাকিবে।

পরের শনিবারেই সুপ্রকাশ নন্দরাণীকে দুর্গাপুরে রাখিয়া আসিল! নন্দরাণীর চেহারা দেখিয়া হরকালী ও হেমাঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিল। সুপ্রকাশ গোপনে শ্বশুরকে বুঝাইল—"ডাক্তাররা বলে, মেয়েদের প্রায় এই রোগটা ধরে। তা কোন ভয় নেই, মাস-কতক এখানে থাকলেই আবার সেরে যাবে।"

হরকালীর আর কিছু বলিবার ছিল না; নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

* * *

শ্রাবণের সন্ধ্যা।

আজ সকাল হইতে প্রায় সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সুপ্রকাশের মনের মধ্যেও আজ যেন শ্রাবণের বাদল নামিয়াছে। নীরব গৃহের মধ্যে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আজ ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনের মধ্যে নন্দরাণীর কথা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। তিন মাসেরও অধিক কাল সে তাহাকে দুর্গাপুরে রাখিয়া আসিয়াছে। কেমন আছে কোন খবর লয় নাই। যে খবরের মধুরতার মধ্যে সে এই কয় মাস নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ তাহা তাহার অন্তরকে নিষ্ঠুর ভাবে নাড়া দিয়া উপহাস করিতে করিতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। অনবরত টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। মনের অসুস্থতা কাটাইবার উদ্দেশে সুপ্রকাশ একখানা গল্পের বই খুলিয়া বসিল, কিন্তু যাহা পড়িয়া যাইতে লাগিল, তাহার কিছুই অন্তরে প্রবেশ করিল না! বই বন্ধ করিল। স্কুলের কতকগুলা দরকারী কাজ বাড়ীতে সারিবে বলিয়া বাসায় আনিয়াছিল। সেই কাগজ-পত্র লইয়া বসিল। তাহাও ভাল লাগিল না। অগত্যা সেগুলিও তুলিয়া রাখিল। তখন শয্যার উপর আসিয়া বসিতেই বাহিরে জুতার শব্দ শুনিল।

"কে?"

দরজা ঠেলিয়া লালিমা প্রবেশ করিয়া কহিল—"আমি। মা কোথায়?"

"তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। তুমি সেই সকালে বেরিয়ে এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?"

ছাতাটা দেওয়ালের হুকে ঝুলাইয়া রাখিতে রাখিতে লালিমা কহিল—"নিমা দিদির বাড়ী।"

"নিমা দিদি? কই, এত দিন ত নিমা দিদি বলে কারো নাম শুনিনি! তিনি কে?"

একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে লালিমা কহিল—"তিনি—তিনি।"

"তার মানে?"

"তার মানে 'ডিক্স্‌নারী'তে লেখা আছে, খুলে দেখ"—বলিয়া লালিমা অপ্রসন্ন চিত্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুপ্রকাশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর অনাহারেই সে দিন শুইয়া পড়িল।

বুকের মধ্যে যে দুষ্ট ক্ষত দিনের পর দিন এইরূপে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাতে প্রলেপ দিবার ইচ্ছায় সুপ্রকাশ ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়া এক মাসের ছুটি লইল এবং মধুপুরে এক বন্ধুর গৃহে গিয়া অতিথি হইল। কিন্তু যাহার অন্তর বিকট তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছে, জগতে কোন 'মধু'র সাধ্য নাই, সে-তিক্ততা দূর করে! মধুপুরে গিয়াও সুপ্রকাশ শান্তি পাইল না। বরং কলিকাতায় তাহার স্কুলের কাজ-কর্ম্ম লইয়া অনেকটা সময় অন্যমনস্ক ভাবে কাটিয়া যাইত, কিন্তু মধুপুরে দিন-

জল-হাওয়া বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য তাহার মনে শান্তি দিতে পারিল না। সে-কারণ দিন-আষ্টেক সেখানে কাটাইবার পর, কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছায় এক দিন প্রাতে সুপ্রকাশ ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

সারা দিনের পর অপরাহ্ন সময়ে গাড়ী যখন চন্দননগর ষ্টেসনে আসিয়া থামিল, তখন প্ল্যাট্‌ফরমের উপর এমন-এক দৃশ্য সুপ্রকাশের চোখে পড়িল, যাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া কাঁপিতে লাগিল! প্রথম দিক্‌কার গাড়ীগুলির একখানিতে সে বসিয়াছিল। তাহারি জানালার ফাঁকে সতর্কতার সহিত নিজেকে আড়ালে রাখিয়া সে দেখিল, ডাক্তার মৃন্ময় গাঙ্গুলী আর লালিমা দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া হাসিতে-হাসিতে সেকেণ্ড ক্লাসের কি ইণ্টার ক্লাসের একখানা গাড়ীতে উঠিল।

হাওড়ার প্ল্যাট্‌ফরমে ভাল করিয়া গাড়ী থামিতে-না-থামিতেই খুব তাড়াতাড়ি সুপ্রকাশ নামিয়া পড়িল এবং দরজায় সর্ব্বপ্রথম টিকিট দিয়া বালীগঞ্জগামী একখানা বাসে গিয়া উঠিল।

বাসায় আসিয়া শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল—"লালিমা কোথায়?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া শাশুড়ী কহিলেন—"তুমি এরি মধ্যে চলে এলে যে বাবা!"

"বড্ড অসুবিধে হোল থাকবার। লালিমা কোথায়?"

"সে গেছে তার মেসোমশায়ের বাড়ী।"

"মেসো?"—লালিমার কোন মেসোর কথাই সুপ্রকাশ ইতিপূর্ব্বে শোনে নাই।

"হ্যাঁ বাবা, তার এক মেসোমশাই থাকেন কেষ্টনগরে। অনেক কোরে এসে তাকে আজ একবার সেখানে···ছেলেবেলা থেকে বড্ডই তিনি ওকে ভালবাসেন কি না। কালই হয় ত এসে পড়বে। তুমি হাত-মুখ ধোও, আমি চা কোরে আনি।"

সুপ্রকাশ বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার কিছু পরে বাসার সামনে একখানা ট্যাক্সির শব্দ পাইয়া সুপ্রকাশ জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ফুটপাথের উপরকার লাইটের আলো গাড়ীর ভিতর পড়িয়াছিল; দেখিল—গাড়ীর মধ্যে ডাক্তার মৃন্ময় গাঙ্গুলী আর লালিমা। লালিমাকে নামাইয়া দিয়া ট্যাক্সি চলিয়া গেল। লালিমা বাড়ী ঢুকিল।

ঘরের দরজার সামনে আসিতেই সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল—"এসো।"

"তুমি?···হঠাৎ মধুপুর থেকে?"

"চলে এলুম। তোমার জন্যে বড্ড মন-কেমন করতে লাগলো।"

"মা কোথায়?···তা তুমি···ও কি!···"

"ফ্রেঞ্চ চন্দননগর থেকে বৃটিশ কোলকাতায় এলে, তোমায় একটু অভ্যর্থনা করতে চাই!" বলিয়াই সুপ্রকাশ লালিমার গলাটা ধরিয়া এমন জোরে ঝাঁকানি দিল যে, তাল সামলাইতে না পারিয়া লালিমা মেঝের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সেই অবস্থায় সুপ্রকাশ ছড়ি লইয়া সপা-সপ করিয়া এমন কয়েক-ঘা মারিল যে, লালিমা মুখ গুঁজিয়া পড়িল—উঠিবার শক্তি রহিল না! তার পর ক্ষিপ্তের মত সুপ্রকাশ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"কাঞ্চন ফেলে কাচকে যেমন আমি বুকে নিয়েছিলুম

আঘাতের যাতনায় ক্ষতবিক্ষত লালিমা মেঝেয় পড়িয়া ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল।

আবার মাঠের পুকুর। কিন্তু আড়াই বৎসর পরে। পশ্চিম দিকের সেই দিগন্তপ্রসারী মাঠখানা এখন আর শূন্য অবস্থায় খাঁ-খাঁ করিতেছে না। এখন তাহা শস্যপূর্ণ। অপরাহ্নের মৃদু-মন্দ বাতাসে তাহার শ্যামল তরঙ্গ দিগন্তের কোলে শরতের নীলাকাশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

মাঠের পুকুরে সেই কাঁচা-ঘাটের বালির উপর সকলেরই পায়ের দাগ পড়ে, শুধু নন্দরাণীর আর পড়ে না। অনেক দিন পরে আজ সে শুষ্কপ্রায় লতার মত শীর্ণ দেহে এবং অবশ চরণে ধুঁকিতে ধুঁকিতে ঘাটের একধারে আসিয়া বসিল।

হেমাঙ্গিনী তাহাকে বাটী হইতে বাহির হইতে দেয় না। আজ ও-পাড়ায় মুখুজ্যে-বাড়ীর কি একটা কাজের উপলক্ষে হরকালী ও হেমাঙ্গিনী দু'জনেই সেখানে গিয়াছে। এই ফাঁকে পিতলের ঘড়াটা লইয়া বহুকাল পরে নন্দরাণী মাঠের পুকুরের ঘাটে আসিয়া বসিল। দেখিল, সব ঠিক তেমনি আছে। উত্তর-পাড়ের সেই শেয়াকুল-কাঁটার গাছগুলা, সেই বৈঁচি-ঝোপ, আশে-পাশে সেই বন-যুঁইয়ের চারা, পথের পাশে সেই কাল-কাসুন্দার গাছগুলা—সবই আছে। কোণের তালগাছ কটায় আগেকার মত অনেকগুলা বাবুই পাখীর বাসা এখনো ঠিক তেমনিই দুলিতেছে। ওদিক্‌কার-পাড়ের নীচে যে 'নয়ানজুলি', তাহাতে আগেকার মতই বর্ষার মাঠের জল কল্‌-কল্‌ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নালার মুখে ফকির হাড়ির 'আড়া' পাতা রহিয়াছে। আগেকার দিনের মতই তাহাতে কত শোল, পুঁটি, ল্যাটা, পাঁকাল ঝাঁকে-ঝাঁকে আসিয়া জমিতেছে।

দুর্ব্বল দেহ আর অবসন্ন মন লইয়া নন্দরাণী কত-কি অতীত বর্ত্তমান ভাবিতে লাগিল—ঐ যে বাঁ-দিকে অনেক দূরে যেখানে মাঠ শেষ হয়েচে,—ঐ যে নারকোল ঝাউগাছ—ওইটে ভুরুলগাছ। আগে ওখানে খুব ধুম-ধাম করে 'বারোয়ারী' হোত। একবার ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে ও-গাঁয়ে যাত্রা শুনতে গেছলুম। পালা হোয়েছিল—কংস-বধ। যাত্রা দেখে এসে তার পরদিন হিমুদের চণ্ডীমণ্ডপে কাপড় খাটিয়ে হিমু, ননী, 'দূরের জল' পাঁচি, 'সই', ভানু—সবাই মিলে আমরাও যাত্রা করেছিলুম! ভানু বাঁখারীর তলোয়ার কোরেছিল। ননী 'ধুচুনী'তে রঙ্গীণ কাগজ মেরে মুকুট মাথায় দিয়েছিল! ওঃ! 'দূরের জল'-এর বাবার কি বকুনি তাকে!—আহা, 'দূরের জলকে' কত দিন যে দেখিনি! তার বোধ হয় পর-পর দু'টি ছেলে হয়েচে। তারা পশ্চিমের কোথায় অনেক দূরে গিয়ে পড়েচে—রাওয়ালপিণ্ডি, না কি! 'সই' বেশ কাছে পড়েচে—ধনেখালি। বিয়ের পর শুধু একটি বার তার সঙ্গে দেখা হোয়েছিল। কোথায় যে সব গেল! কা'রো সঙ্গেই আর দেখা হয় না। পাঁচি এখন বোধ হয় কোলকাতায়। কোলকাতা এখান থেকে এই উত্তর-পূব কোণায়। 'কসবা'ও তাই।······খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ নন্দরাণীর সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্য হইতে একটা টানা নিশ্বাস বাহির হইল। বাল্য-সঙ্গিনীদের স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিল—'আমায় একলা ফেলে কোথায় চলে গেলি সব! আমি যে তোর

বিষ্টু বাগ্দী নারাণপুরের হাট হইতে তার খালি গাড়ীখানা লইয়া ফিরিতেছিল। নন্দরাণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"দিদিমণিকে অনেক দিন পরে দেখলুম যে গো। ইস্! তোমার চেহারায় যে আর কিছু নেই দিদিমণি! তোমার অমন নন্দরাণীর মত চেহারা, আহা······"

"কোথায় গিয়েছিলে, বিষ্টু দাদা?"

"ধান নিয়ে হাটে গিয়েছিলুম। মাথার ওপর একখানা শরতের মেঘ এসে জমলো দিদিমণি। যাও, পুকুর-ঘাটে আর একলা থেকো না। তুমি যে এ-রকম হোয়ে গেছ, তা ত জানতুম না। ঘরে যাও দিদিমণি।"

"যাই দাদা।" বলিয়া নন্দরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জলে নামিয়া শূন্য ঘড়াটায় জল ভরিল, কিন্তু কাঁকালে তুলিতে গিয়া কিছুতেই তুলিতে পারিল না। তাহার অজ্ঞাতসারে এক ঘড়া জল তুলিবার শক্তিও যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আজ তাহা সে বুঝিল। নিরুপায় হইয়া পুকুরের জল আবার পুকুরে ঢালিয়া দিয়া, শূন্য কলসী-হাতে ঘাটে উঠিতেই মাথার উপরকার সেই মেঘ হইতে ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল ও তাহার সমস্ত কাপড় ভিজিয়া সারা অঙ্গ বহিয়া স্রোতের মত জল ঝরিতে লাগিল। নিকটে কোথাও দাঁড়াইবারও স্থান ছিল না। তাড়াতাড়ি চলিবার শক্তি নাই। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ক্ষীণ-মন্থর গতিতে নন্দরাণী খিড়কী দিয়া বাড়ী ঢুকিল। ঢুকিয়াই দেখিল—তাহার শয়ন-ঘরের দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া হেমাঙ্গিনী।

হেমাঙ্গিনী কোন কথা না বলিয়া শুধু বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে নন্দরাণীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

"কি দেখচো মা অমন কোরে?"

হেমাঙ্গিনী তথাপি নিরুত্তর।

"বল না, কি দেখচো?"

"নন্দ তুই নিজেও মলি, আমাকেও মারলি!"

"কেন, কি হোয়েচে?"

"আচ্ছা, তোর না বিছানা থেকে ওঠা বারণ! আর তুই এই বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে চান কোরে এলি!"

গামছা দিয়া গা-মাথা মুছিতে মুছিতে নন্দরাণী কহিল—"তা, কি করবো বলো। একলাটি ঘরের মধ্যে চুপ করে থাকা যায় কখনো? তাই একটি বার আস্তে-আস্তে···"

"আস্তে আস্তে এমনি কোরেই তুই প্রাণটাকে বার কোরে দিবি নন্দ!"

"তোমার যত অনাছিষ্টি কথা! একটু ভিজেচি, অমনি প্রাণ বেরিয়ে যাবে! আমি ত সেরে উঠেচি। এই দেখ, হাত-পায়ে আমার কত জোর হোয়েচে"—বলিয়া ব্যায়ামের ভঙ্গীতে নন্দরাণী সজোরে তাহার বাহু-যুগল সামনের দিকে আগাইয়া দিল এবং গুটাইয়া লইল।

হেমাঙ্গিনী ভরা-গলায় কহিল—"শেষ পর্য্যন্ত কি যে তুই ঘটাবি মা, বুঝতে পারচি না। শীগ্গির কাপড় ছেড়ে, কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে পড়্‌গে। গায়ে এক কোঁটা নেই রক্ত, হাড় ক'খানা শুধু ছালে ঢাকা, এক পা চলতে তোর হাঁফ্ ধরে, কাসির সঙ্গে তোর রক্ত···"

মায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নন্দরাণী কাপড় ছাড়িয়া নিজের শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল এবং কি একখানা গানের প্রথম কলিটা গুন্-গুন্ করিয়া গাহিতে-গাহিতে অবসন্ন দেহ-ভার বিছানার উপর লুটাইয়া দিল।

আজ কয় দিন হইতে নন্দরাণীর ঘুস্-ঘুসে জ্বর একটু কম পড়িয়াছিল। সেই রাত্রি হইতে আবার তাহার ঘামের সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। এবার কাসির সঙ্গে বেশ রক্ত আসিতে লাগিল। যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন—"এবার লক্ষণ খুবই খারাপ।"

তাহাই হইল। দিন-দিন এক দিকে যেমন তাহার প্রাণশক্তি ক্ষয় পাইতে লাগিল, অন্য দিকে তাহার কোটরগত চক্ষুর দীপ্তি যেন বাড়িতে লাগিল।

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী। নন্দরাণী সারাদিন ছট্-ফট্ করিয়া কাটাইয়াছে। সন্ধ্যার পর হেমাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, চাঁদ উঠেচে?"

"খানিক পরে উঠবে মা।"

"উঠলে বোলো ত একবার দেখবো। বাবা কোথায় মা?"

"ডাক্তারের কাছে গেছেন। 'হরলিক্' একটু তৈরী কোরে আনবো মা, খাবে?"

"হ্যাঁ, খাবো মা, নিয়ে এস। উঃ!"

হেমাঙ্গিনী চলিয়া যাইবার দুই-চারি মিনিট পরেই দ্বারের সামনে কাহার ছায়া পড়িল।

"কে?"

"আমি।"

"তুমি!" অধীর উৎসাহে নন্দরাণী কহিল—"তুমি এসেছ! এস—এস। আমি ক'দিন ধরে দিন-রাত তোমারই কথা ভাবচি। বোসো। আমার এই মাথার কাছে এসে বোসো।"

"নন্দ!"

"আরো কাছে সরে এসো তুমি! তোমার জন্মদিনে যে আশীর্ব্বাদ আমি চেয়েছিলুম, সে কথা তুমি ভোলনি!"

নন্দরাণী অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া সুপ্রকাশের পায়ের উপর মাথা রাখিল এবং তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। "আঃ! তোমার সঙ্গে আমার কত কথা ছিল। বাবা এখনো ফেরেনি, মা? চাঁদ উঠেছে বোধ হয়···না? উঃ!"

"নন্দ!—নন্দ!"

নন্দরাণী আর সাড়া দিল না।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কথাশিল্পীর হত্যা-রহস্য

(উপন্যাস)

পঞ্চম পল্লব

বেনামী চিঠি

বিভিন্ন দেশের প্রত্যেক প্রধান নগরের কোন কোন সুসভ্য ও শিক্ষিত নগরবাসিগণের অপরিচিত। লণ্ডনেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। লণ্ডনের এই অংশ 'হাউস অফ্ দি এবমিনেবল' নামে পরিচিত। যে সকল ব্যক্তি উক্ত অঞ্চলে বাস বা কার্য্যোপলক্ষে গমন করিত, ইহার গুপ্ত রহস্য কেবল তাহারাই জানিত!

ডেভিড গারসাইড 'ডেভিলস্ কালড্রণ' নামক স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রিত হইলে সেই স্থানে গমন কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা বুঝিতে পারিল। তাহার পথপ্রদর্শক একটি দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া বলিল, "আপনি আসুন ডেভিড, আপনাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে না হয়, সে দিকে আমার লক্ষ্য থাকিবে।"

ডেভিড চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাম্রকূট-ধূমে সমাচ্ছন্ন কক্ষের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে সেখানে একটি দীর্ঘ-দেহ কৃশ ব্যক্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। লোকটির বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর; তাহার পরিচ্ছদ আড়ম্বরপূর্ণ, কেশরাশি শুভ্র, এবং সর্ব্বাঙ্গে দম্ভের পরিচয় সুস্পষ্ট। ডেভিড অল্পকাল পরে সেই স্থান ত্যাগ করিবার সময় তাহার সঙ্গীকে এই লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমি উহার বিশেষ পরিচয় জানি না; তবে এইমাত্র জানি যে, সকলে উহাকে 'কাউণ্ট' নামে সম্বোধন করে। শুনিয়াছি, ভদ্রবংশেই উহার জন্ম। উহার আকার-প্রকার দেখিয়া কি আড়ম্বরপ্রিয় লোক বলিয়া মনে হয় না?"

অতঃপর ডেভিড যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া লোকটির সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতে পারিল, তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়াই তাহার মনে হইল; কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করিল না।

ডেভিড ক্ষুণ্ণ মনে আডেলফি-স্থিত বাসভবনে প্রত্যাগমন করিয়া আলো জ্বালিতে তাহার টেবিলের উপর সংরক্ষিত একখানি পত্র দেখিতে পাইল। পত্রখানির লেফাফায় তাহার যে নাম ও ঠিকানা ছিল—তাহা টাইপ-করা।

পত্রখানির লেফাফা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে ডেভিড এক ফর্দ্দ কাগজ বাহির করিল; তাহা হাতে লইয়া তাহার ধারণা হইল, পত্রখানি তাহার কোন শত্রুর লিখিত। তাহার এই সন্দেহ যে অমূলক নহে, পত্রখানি পাঠ করিয়াই সে তাহা বুঝিতে পারিল।

পত্রখানিতে যাহা লিখিত ছিল, তাহা এই;—

ফ্লীট ষ্ট্রীটের সংবাদপত্রগুলিতে তুমিই লোমহর্ষণ সংবাদসমূহ সরবরাহ করিয়া থাক, এই সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে। তুমি তোমার চক্ষু-কর্ণের ব্যবহারে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করিবে। আমি তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য নিম্নে যাহা লিখিলাম, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়াই লিখিত হইল। করিয়া তোমার ব্যবহারে ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছ। এতদ্ভিন্ন তোমাকে এ কথাও জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যদি তুমি এখনও গোয়েন্দাগিরি পেশা চালাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই অনধিকার-চর্চ্চার জন্য তুমি উপযুক্ত ফলভোগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। কারণ, তোমাকে অতঃপর ঐরূপ অনধিকার-চর্চ্চা করিতে দেওয়া হইবে না। এই পত্র দ্বারা তোমাকে সতর্ক করা হইল। আমি তোমাকে পুনর্ব্বার আর কোন পত্র লিখিব না। আশা করি, এই সতর্ক-বাণীই তোমার চৈতন্য-সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিবে, এবং ইহার অন্যথা করিবে না।"

পত্রখানির নীচে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না। ডেভিড পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রথমে মনে করিল, উহা তাহার কোন প্রতিযোগী সংবাদ-দাতার প্রেরিত পরিহাসপূর্ণ পত্র! কিন্তু পূর্ব্বদিন যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার আদ্যোপান্ত মনে মনে আলোচনা করিয়া সে ভিন্ন-রূপ সিদ্ধান্ত করিতেই বাধ্য হইল। তথাপি উহা পাঠ করিয়া সে সতর্কতা অবলম্বন নিষ্প্রয়োজন মনে করিল; কিন্তু পরে সে বুঝিতে পারিয়াছিল, পত্রখানি ঐরূপ উপেক্ষাযোগ্য নহে!

——

ষষ্ঠ পল্লব

বিচার আরম্ভ

'সেণ্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টের' প্রথম আদালত বেলা দশটার পূর্ব্বেই দর্শকবৃন্দে পূর্ণ হইল। জজ তখনও এজলাসে প্রবেশ করেন নাই।

ডেভিড গারসাইড বেলা ১০টা ২৫ মিনিটের সময় তাহার পরিচয়-পত্র দেখাইলে দুই জন পুলিশ-কর্ম্মচারীর সাহায্যে আদালতের ভীড় ঠেলিয়া রিপোর্টারগণের জন্য সংরক্ষিত আসনে উপবেশন করিল। ডেভিড দৈনিকপত্র 'অয়া'র'এর সম্পাদকের অনুরোধে মিস্ ওলিভিয়া ডেনের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে সম্মত হইয়াছিল। মামলার বিচার তখনও আরম্ভ না হওয়ায় সমাগত দর্শকগণের মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনিতে কক্ষ মুখরিত হইতেছিল।

ডেভিড এজলাসের নীচে ব্যারিষ্টারগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে তাহার ভ্রাতা জনকে আসামীর এটর্নী কোজেনসের সহিত চিন্তাকুল চিত্তে গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে দেখিল। ফরিয়াদী পক্ষের ব্যারিষ্টার সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবিও এজলাসের অদূরে বসিয়া মামলার কাগজপত্র দেখিতেছিলেন।

কিছু দূরে পুরু কাচ দ্বারা পরিবেষ্টিত আসামীর কাঠরা। সেই কাঠরায় একখানি মাত্র চেয়ার স্থাপিত ছিল। অনেক বিখ্যাত অপরাধী সেই চেয়ারে বসিয়া তাহাদের মামলার বিচার শ্রবণ করিয়া-ছিল। ডেভিড বুঝিতে পারিল, মিস্ ওলিভিয়া ডেনকেও যে কোন-মুহূর্ত্তে আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া সেই চেয়ারে উপবেশন

হইয়া ধীরে ধীরে আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিল। সে চতুর্দ্দিকে ভয়বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু তাহার ম্লান মুখে মানসিক চাঞ্চল্য প্রতিফলিত হইল না।

অতঃপর বিচারপতি মিঃ স্বার্থডেল তাঁহার পেস্কারকে সঙ্গে লইয়া গম্ভীর মুখে এজলাসে প্রবেশ করিলে সেই কক্ষের সকল লোক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মিঃ স্বার্থডেল এজলাসে আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিচারালয়কে এবং জুরীগণকে অভিবাদন করিলেন।

সার এডমণ্ড ব্যাটার্স বি এই বার দণ্ডায়মান হইয়া জজ ও জুরী-দলকে মামলা বুঝাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি যে সরকারের অনুকূলে এই মামলা পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। সার এডমণ্ড গম্ভীর ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মাই লর্ড এবং জুরী মহোদয়গণ, দুঃখের সহিত আমাকে জানাইতে হইতেছে যে, আসামীর বিরুদ্ধে এই মামলা পরিচালিত করিবার জন্য অদ্য আমাকে 'পাবলিক প্রসিকিউটার'-রূপে দাঁড়াইতে হইল। আপনারা সকলেই জানেন, মাসাধিক কাল পূর্ব্বে মিঃ পিটার ট্রেন্টন সহসা অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে নিহত হইয়াছিলেন ; কি ভাবে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, আজ আমরা তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।"

অতঃপর তিনি মিঃ ট্রেনটনের আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা (stiletto) মিঃ পিটার ট্রেনটনের বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার জীবনান্ত ঘটিয়াছিল। ঈর্ষ্যাই এই শোচনীয় দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি জজ ও জুরীদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তাঁহার এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা কি ভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহাই বোধ হয় বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার পর তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "এই হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত ঘটনাগুলিতে বিন্দুমাত্র জটিলতা নাই। যে তরুণীকে আমরা এই মামলার আসামিরূপে পাইয়াছি, তাহার কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, যে আফিসের চাকরীতে সে প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই আফিসের মালিকের পুত্রের নিকট কোন গর্হিত প্রস্তাব উত্থাপন করায় তিনি তাঁহার পুত্রকে উহার প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহাকে সেই চাকরী হইতে বিতাড়িত করিতে—"

পাবলিক প্রসিকিউটারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কৌন্সিলীর টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ার পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া আসামীর কৌন্সিলী জন গারসাইড উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাই লর্ড, আমি এই অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। বাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌন্সিলী এই মাত্র আসামীর স্কন্ধে যে অপবাদের বোঝা চাপাইলেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভ্রমপূর্ণ। আমার মক্কেল—"

জজ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "এই মামলা আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আপনি কয়েদীকে আসামীর কাঠরায় দাঁড় করাইতে ইচ্ছুক আছেন কি ?"

"হাঁ, নিশ্চিতই তাহা করাইব মাই লর্ড।"

জজ বলিলেন, "উত্তম। ঐরূপ করা হইলে আপনি আপনার মক্কেলের অনুকূলে জুরীদের সকল কথাই বুঝাইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন।"

সার এডমণ্ড ব্যাটার্স বি অতঃপর ঈষৎ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "জুরী মহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে যে কথা বলিতেছিলাম, তাহা শেষ করিবার পূর্ব্বেই আসামীর পক্ষসমর্থনকারী আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু আমার মুখে থাবা মারিয়া সে কথায় বাধা দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন! কিন্তু আমি আপনাদিগকে এই কথাই বলিতেছিলাম যে, মিঃ ট্রেন্টনের নিকট এই আসামীর কৃতজ্ঞ থাকিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, আসামী যখন তাঁহার নিকট চাকরীর প্রার্থনা করে—সে সময় সে তাঁহাকে সন্তোষজনক প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিতে না পারিলেও তিনি তাহাকে প্রচুর বেতনে দায়িত্ব-পূর্ণ ও সম্মানজনক চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"কিন্তু এই আসামী তাঁহার এইরূপ উদারতা, দয়া ও সুবিবেচনার বিনিময়ে তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? জুরী মহোদয়গণ, গভীর ক্ষোভের সহিত আপনাদিগকে ইহা জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, এই আসামী চাকরী আরম্ভ করিয়াই প্রতি পদে তাঁহাকে অসুবিধায় ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি আশা করি, আপনাদিগের নিকট ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করিতে পারিব যে, এই আসামী যে দিন সর্ব্বপ্রথম মিঃ ট্রেন্টনকে দেখিতে পায়—সেই দিন হইতেই তাঁহাকে উদ্দাম প্রেমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে ; তাঁহাকে প্রণয়ে মুগ্ধ করাই তাহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়ায়! উহার ঐরূপ স্বার্থকলুষিত ব্যবহারে দিনের পর দিন তাঁহার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল।

"এই তরুণী উক্ত চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিত, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জুরী মহোদয়গণ, আমি পুনর্ব্বার আপনাদিগকে জানাইতেছি, উহার মনিব উহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে কোন দিন কার্পণ্য প্রকাশ না করায় উহার মন অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়াছিল।

"কিন্তু এই যুবতী একটি বিষয়ে সাংঘাতিক ভ্রম করিয়াছিল! উহার ধারণা হইয়াছিল—উহার মনিব উহার প্রতি প্রেমের নিদর্শন-স্বরূপ ঐ ভাবে উহার উপকার করিতেন। কিন্তু মিঃ ট্রেন্টন কোন দিন উহার প্রণয়ে প্রশ্রয়-দান করিয়াছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ আপনাদিগকে প্রদর্শন করিতে পারিব না ; বরং উহার প্রতিকূলে আমি এইমাত্র—"

সার এডমণ্ডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে দর্শকগণের গ্যালারি হইতে অসংযত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল ; একটি যুবতী তাহার আসন হইতে সার এডমণ্ড ব্যাটার্স বির দিকে সহাস্য মুখ প্রসারিত করিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "তুমি অতি নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ! তোমার ঐ কথার কোন মূল্য নাই। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, লম্পট ট্রেন্টন কোন রমণীর প্রতি ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল না।"

তাহার এই মন্তব্য শুনিয়া আদালতের এক জন প্রহরী গর্জ্জন করিল, "চুপ রহ।"

জজ স্বার্থডেল সেই রমণীর হাস্যরঞ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া

প্রহরীকে আদেশ করিলেন, "ঐ স্ত্রীলোকটাকে আদালত হইতে বাহির করিয়া দাও। এরূপ ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য।"

এক জন সাংবাদিক ডেভিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকটা ব্যাটার্সবিকে বেশ শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়াছে; জোঁকের মুখে নুণ পড়িয়াছে!"

এই মন্তব্য শুনিয়া সার এডমণ্ডের মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সংযত করিতে সমর্থ হইলেন; তাহার পর বলিলেন, "আমার কথা শুনিয়া আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—ঐরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় মিঃ ট্রেন্‌টন কি কারণে এই নির্লজ্জা স্ত্রীলোকটার সংস্রব ত্যাগ করেন নাই? আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।—এই যুবতীর প্রতি তাঁহার দয়াই ইহার একমাত্র কারণ। তিনি উহার অতীত জীবনের বিবরণ অবগত ছিলেন; তিনি জানিতেন, যদি উহাকে তাঁহার নিরাপদ আশ্রয় হইতে বিতাড়িত করেন, তাহা হইলে এই দুর্ভাগিনী আর কোন স্থানে ভাল চাকরী জুটাইতে পারিবে না, উহার অবশিষ্ট জীবন ব্যর্থ হইবে। এইরূপ করুণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি দীর্ঘকাল নীরবে উহার সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন।

"কিন্তু অবশেষে অবস্থা এরূপ সঙ্কটজনক হইয়াছিল যে, ঐ ভাবে আর অধিক দিন চলিবার উপায় ছিল না। মিঃ ট্রেনটন উহার প্রেমের অভিনয় অসহ্য মনে করিয়া উহার কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য কিছু দিন প্যারিসে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।"

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোন্ সময়, সার এডমণ্ড?"

সার এডমণ্ড বলিলেন, "মাই লর্ড, আমি সংবাদ পাইয়াছি—মিঃ ট্রেনটন যে দিন তাঁহার শয়ন-কক্ষে বক্ষঃস্থলে ছোরা বিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছিলেন,—তাহার ঠিক দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

জজ তাহা লিখিয়া লইয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ।"

কৌন্সিলী বলিল, "মিঃ ট্রেন্‌টন তাঁহার এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে এই আসামীকে ভয়ানক উত্তেজিত দেখা গিয়াছিল। আমার এই উক্তি যে সত্য, তাহা সাক্ষীরাই আপনার নিকট প্রতিপন্ন করিবে। আসামীর মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাহার মনিব আর এক জন স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্যই প্যারিসে গমন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। বস্তুতঃ, উহার মন এই সন্দেহে ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।"

এই সময় দর্শকের গ্যালারি হইতে আর একটি স্ত্রীলোক সার এডমণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আসামীর বিরুদ্ধে মামলাটি ত তোফা সাজাইয়াছ, দেখিতেছি!"

জজের আদেশে এই স্ত্রীলোকটিকেও বিচার-কক্ষ হইতে বিতাড়িত করা হইল।

সার এডমণ্ড মুখ বিকৃত করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "যে রাত্রিতে মিঃ ট্রেনটনের সহিত আসামী ঝগড়া করিয়াছিল, সেই রাত্রিতে একখানি পত্র উহার হস্তগত হইয়াছিল; পত্রখানি কোন পুরুষের লিখিত। মিঃ ট্রেনটনের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যেই আসামী কোন কৌশলে সেই পত্রখানি সেখানে আনাইয়াছিল কি না, তাহা আমার অজ্ঞাত; তবে সে যে পুরুষের লিখিত একখানি পত্র পাইয়াছিল—ইহার প্রমাণ আছে, এবং আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলে ইহাই আমি যথেষ্ট মনে করি। বলা বাহুল্য, আসামী সেই পত্রখানি তাহার মনিবকে দেখিতে দিয়াছিল।"

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই পত্র কি আদালতে দাখিল করা হইবে?"

সার এডমণ্ড বলিলেন, "মাই লর্ড, আসামীর বিজ্ঞ কৌন্সিলী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।"

জজ জন গারসাইডের মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

জন গারসাইড উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মাই লর্ড, আমি জানিতে পারিয়াছি, সেই পত্র নষ্ট করা হইয়াছে।"

জজ বলিলেন, "আপনার আর কি বলিবার আছে বলুন সার এডমণ্ড!"

সার এডমণ্ড বলিলেন, "এই বার আমি উক্ত দুর্ঘটনার রাত্রিতে কি ঘটিয়াছিল তাহারই আলোচনা করিব। জুরী মহোদয়গণ, কয়েকটি জরুরী ঘটনার প্রতি আপনাদিগকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। আমার প্রথম কথা এই যে, সেই রাত্রিতে মিঃ ট্রেনটনের ফ্ল্যাটে আসামীর গমন করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আমি জানিতে পারিয়াছি, সেই দিন অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় মিঃ ট্রেনটন আসামীকে জানাইয়াছিলেন—তিনি সে দিন সন্ধ্যার পর শয়ন করিতে যাইবেন, সুতরাং সে রাত্রে তাহার সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে আমি বিচারপতিকে জানাইতে চাহি যে, যে সময় মিঃ ট্রেনটনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল—সেই সময় তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও গাউন ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদ ছিল না।

"এই স্থলে আমি এ কথার উল্লেখ আবশ্যক মনে করিতেছি যে, মিঃ ট্রেনটন কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলেও আসামী সেই রাত্রিতে তাঁহার কার্জ্জন ষ্ট্রীটস্থ ফ্ল্যাটে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, আসামী রাত্রি পৌনে আটটার সময় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে মিঃ ট্রেন্‌টনকে নিহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

"এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে সেখানে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই; সুতরাং কেহই তাহার সাক্ষী নাই। কিন্তু সেই সময় কি ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝিবার জন্য অধিক কল্পনা-শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। আসামীর নিকট মিঃ ট্রেনটনের ফ্ল্যাটের যে চাবি ছিল, সেই চাবির সাহায্যে সে ফ্ল্যাটের দ্বার খুলিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছিল। সে প্রথমে মিঃ ট্রেনটনকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে, তাহার পর লিখিবার টেবিলের যে দেরাজে ইটালীয়ান ছোরাখানি থাকিত, দেরাজ খুলিয়া আসামী সেই ছোরা বাহির করিয়া লইয়াছিল, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া সেই ছোরার আঘাতে মিঃ ট্রেনটনকে হত্যা করিয়াছিল।

"সেই ছোরার হাতলে আসামীর অঙ্গুলি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাক্ষী দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইবে।"

সরকার পক্ষের কৌন্সিলী এই সকল কথা বলিয়া উপসংহারে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতার পর তাঁহার আসনে উপবেশন করিলে দর্শকগণের মধ্যে পুনর্ব্বার গুঞ্জন-ধ্বনি আরম্ভ হইল। সকলেই অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, "ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্সিলী আসামীর প্রতিকূলে যে-সকল কথা বলিলেন, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে;

এই আসামীই মিঃ ট্রেনটনকে গোপনে হত্যা করিয়াছে। এ অবস্থায় তাহার মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।"

সপ্তম পল্লব

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীর জেরা

অতঃপর সার এড্‌মণ্ড ব্যাটার্সবি ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী মিঃ জর্জ্জ ম্যালরিকে আহ্বান করিয়া সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিতে বলিলেন, তদনুসারে মিঃ ম্যালরি সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া যথানিয়মে হলপ করিলেন।

সার এডমণ্ড বলিলেন, "মিঃ ম্যালরি, আমার বিশ্বাস, মেসার্স কার্সন এণ্ড ম্যালরি নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের আপনিই 'সিনিয়র পার্টনার'।"

"হ্যাঁ, এ কথা সত্য।"

"গত পাঁচ বৎসর হইতে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মৃত মিঃ পিটার ট্রেন্‌টনের উপন্যাস সমূহ প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে?"

"হ্যাঁ, আমরাই তাহা প্রকাশ করিয়াছি।"

সার এডমণ্ড এবার বলিলেন, "গত ৯ই অক্টোবর রাত্রিকালে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আপনি এই আদালতে বিবৃত করিবেন কি?"

মিঃ ম্যালরি বলিলেন, "মিঃ ট্রেনটনের শেষ নভেলখানির পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় আমার দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। তিনি টেলিফোনে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—নির্দ্দিষ্ট দিনে এই নভেলের পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইবে; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় আমার ইচ্ছা হইল, ৯ই অক্টোবর রাত্রিকালে আমি তাঁহার ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিব।"

"মিঃ ম্যালরি, আপনি কি সেইরূপই করিয়াছিলেন?"

"হ্যাঁ, ৯ই অক্টোবর রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমি তাঁহার ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইয়াছিলাম।"

"কে আপনাকে সেই ফ্ল্যাটের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল?"

সাক্ষী আসামীর কাঠরার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মিস্ ওলিভিয়া ডেন। আসামী আমাকে দেখিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিয়াছিল—মিঃ ট্রেনটনের অবস্থা অতি ভীষণ!"

"তাহার পর আপনি কি করিলেন?"

"আমি তাহার পাশ দিয়া বসিবার ঘরে উপস্থিত হইলাম।"

"সেখানে আপনি কি দেখিতে পাইলেন?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বিচারককে বলিলেন, "আমি মিঃ ট্রেনটনকে পায়জামা পরিধান করিয়া পড়িয়া-থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার দেহে প্রাণ ছিল না। তিনি নিহত হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

সার এডমণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "মিস্ ডেন কি ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিল?"

সাক্ষী ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার স্মরণ হইতেছে—আসামী আমাকে বলিয়াছিল, সে কিছু কাল পূর্ব্বে সেই ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইলে মিঃ ট্রেনটন তাহাকে সেই দিনের একখানি সান্ধ্য সংস্করণের দৈনিক আনিতে আদেশ করেন। তদনুসারে সে সেই কাগজ সংগ্রহ করিতে বাহিরে যায়। সে হ্যামিলটন প্লেসের মোড়ে উপস্থিত হইয়াছিল; কারণ সে জানিত এক জন সংবাদপত্র-বিক্রেতা সেই স্থানে সংবাদপত্র বিক্রয় করে। সে তাহার নিকট হইতে একখানি কাগজ কিনিয়া লইয়া মিঃ ট্রেনটনের ফ্ল্যাটে প্রত্যাগমন করে। সে সেখানে ফিরিয়া আসিয়া মিঃ ট্রেনটনকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পায়। একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আমূল প্রোথিত ছিল। সেই আঘাতেই তিনি নিহত হইয়াছিলেন।"

"আপনি কি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সে কতক্ষণ সেই ফ্ল্যাটের বাহিরে ছিল?"

"হ্যাঁ, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আসামী বলিয়াছিল—সে দশ বারো মিনিটের অধিক কাল সেই ফ্ল্যাটের বাহিরে ছিল না।"

এবার সার এডমণ্ড সাক্ষীকে বলিলেন, "মিঃ ম্যালরি, অতঃপর আপনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন আদালতকে তাহা জানাইবেন কি?

সাক্ষী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া দুই-তিন মিনিট কাল আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাহার পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পুলিশকে টেলিফোনে আহ্বান করি।"

জজ এ-কথা শুনিয়া মাথা তুলিয়া বলিলেন, "এই কার্য্য বেশ সঙ্গতই হইয়াছিল মিঃ ম্যালরি!"

ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্সিলী সাক্ষীকে বলিলেন, "তাহার পর পুলিশ আসিলে আপনি এজাহার দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন কি?"

সাক্ষী বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সেইরূপই করিয়াছিলাম।"

সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবি তাঁহার আসনে উপবেশন করিলে আসামী পক্ষের কৌন্সিলী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ ম্যালরি, আপনি যখন সেই ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় আপনি সেখানে কি কোন সংবাদপত্র দেখিয়াছিলেন?"

"হ্যাঁ, কৌচের হাতার উপর কাগজখানি পড়িয়াছিল।"

আসামীর কৌন্সিলী বলিলেন, "যদি বলি, কাগজখানি দেখিয়া আপনার মনে হইয়াছিল তখন পর্য্যন্ত তাহার ভাঁজ খোলা হয় নাই, তাহা হইলে সে কথা কি অসঙ্গত হইবে?"

"না, অসঙ্গত হইবে না।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "তাহা হইলে আসামী যাহা বলিয়াছে—অর্থাৎ সে একখানি সান্ধ্য সংস্করণের কাগজ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট ত্যাগ করিয়াছিল—তাহার এই কথা মিথ্যা—আপনি এরূপ মনে করিবার কোন কারণ পান নাই?"

"না।"

"মিঃ ম্যালরি, আপনাকে আর একটি মাত্র প্রশ্ন করিব। কোন শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না তরুণী সহসা কোন ভীষণ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সম্মুখীন হইলে যেরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িত, উক্ত দৃশ্যে মিস্ ডেনের সেইরূপ বিহ্বল হওয়া কি স্বাভাবিক বলিয়াই আপনার মনে হয় না?"

"হ্যাঁ, স্বাভাবিক বটে।"

জন গারসাইড উপবেশন করিতে উদ্যত হইয়া সাক্ষীকে বলিলেন, "মিঃ ম্যালরি, কেবল ঐ কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল।"

তাঁহার কথা শুনিয়া ডেভিডের ধারণা হইল, জন যদি এই ভাবে মামলাটি শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে পারেন, তাহা হইলে বাদী পক্ষের কৌন্সিলীর জয়লাভের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা অল্প।

*　　*　　*　　*

সার জোসেফ মাইওমে পনীরের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তেমন মাতব্বর লোক বলিয়া মনে হইত না। তিনি সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া হলপ করিলে সার এড্‌মণ্ড ব্যাটার্সবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম সার জোসেফ মাইওমে?"

সাক্ষী খন্‌খনে আওয়াজে বলিলেন, "হ্যাঁ, তাহাই বটে।"

"এই মামলার আসামী কত দিন আপনার নিকট চাকরী করিয়াছিল?'

সাক্ষী বলিলেন, "আসামী ঠিক এক মাস আমার নিকট চাকরী করিয়াছিল। তাহার কাজ-কর্ম্মে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমার নিকট অভিযোগ হইয়াছিল। আমার পুত্রের প্রতি তাহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।"

সরকার-পক্ষের কৌন্সিলী অতঃপর প্রশ্ন করিলেন, "সার জোসেফ, আপনার যাহা বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলুন। আপনি কি বলিতে চাহেন। আসামীর চরিত্রদোষের জন্য আপনার নিকট অভিযোগ করা হইয়াছিল?"

সাক্ষী কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "না, আমি ঠিক সে কথা বলিতে চাহি না। তবে মিস্ ডেন তাহাকে ডিনার খাইতে লইয়া যাইবার জন্য আমার পুত্রকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করিত।"

প্রশ্ন হইল, "আসামীর এইরূপ ব্যবহার আপনার পুত্রের প্রীতিকর হয় নাই?"

"না, নিশ্চিতই প্রীতিকর হয় নাই।"

"আপনার পুত্রের অভিযোগে আপনি তৎক্ষণাৎ উহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন?"

"হ্যাঁ, তাহাই করিয়াছিলাম।"

সাক্ষী অতঃপর সাক্ষীর কাঠরা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময় আসামীর কৌন্সিলী জন গারসাইড উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—

"এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করুন সার জোসেফ!"

সাক্ষী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ গারসাইড বলিলেন, "আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনার চরিত্রবান্ পুত্র মরিসকে শীঘ্রই একটি চুক্তিভঙ্গের মামলার আসামী হইতে হইবে। তাহার বিরুদ্ধে ফিলিস্ সুইনটন নাম্নী একটি নর্ত্তকীর এই অভিযোগ। এ সকল কথা সত্য কি না আপনি বলুন।"

সাক্ষী জজের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

জজ বলিলেন, "আপনাকে নিশ্চিতই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে সার জোসেফ!"

সাক্ষী মৃদু স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, এ কথা সত্য।"

"এবং এ কথাও কি সত্য যে, নয় মাস পূর্ব্বে আপনার পুত্র মরিস্ মাইওমে লণ্ডন হইতে ব্রাইটনের পথে রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় একটি তরুণীর সম্ভ্রমহানির অভিযোগে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিল?"

সাক্ষী জজকে লক্ষ্য করিয়া ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "বিচারপতির নিকট আমার প্রার্থনা—"

আসামীর কৌন্সিলী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর চাই মহাশয়!"

বিচারপতি মিঃ স্বার্থডেন দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে সার জোসেফ!"

সাক্ষী মৃদু স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, এ কথা সত্য।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "অতঃপর আপনার পুত্র লণ্ডনের কোন পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নীত হইলে সেই ম্যাজিস্ট্রেট তাহার কুড়ি পাউণ্ড জরিমানা করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য?"

সাক্ষী অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ সত্য।"—তাঁহার কণ্ঠস্বর সেই কক্ষে উপস্থিত অতি অল্প লোকেরই কর্ণগোচর হইল।

কৌন্সিলী বলিলেন, "আর একটিমাত্র প্রশ্ন সার জোসেফ!—আপনার কার্য্যালয়ে যে সকল তরুণী নানা কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের কেহ কেহ কি আপনার পুত্রের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট অভিযোগ করে নাই? আপনি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলিয়া এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দান করুন।"

সাক্ষী নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া জজ বলিলেন, "আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।"

সাক্ষী ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, ঐরূপ অভিযোগ কখন কখন পাইয়াছি বটে।"

আসামী পক্ষের কৌন্সিলী বলিলেন, "সাক্ষীকে আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই।" তিনি উপবেশন করিলেন। দর্শকগণের গ্যালারি হইতে তাঁহার প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল।

প্রহরী চিৎকার করিয়া বলিল, "চুপ রহ।"

*　　*　　*　　*

পরবর্ত্তী সাক্ষী ভিক্টর সোয়ানেস। ডেভিড গারসাইড কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সোহোর একটি ভোজনাগারে তাহার বক্তব্য সকল কথাই শুনিয়াছিল। সোয়ামেস সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া যথারীতি হলপ পাঠ করিল।

সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবি তাহার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলে দেখা গেল—আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহাকে যেরূপ প্রফুল্ল দেখা গিয়াছিল, তাঁহার সেই প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইয়াছে।

তিনি সাক্ষীকে প্রশ্ন করিলেন, "কত দিন তুমি মিঃ ট্রেনটনের নিকট চাকরী করিয়াছিলে?"

"দুই বৎসরের অধিক কাল।"

"তুমি মিঃ ট্রেনটনের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলে, এ কথা কি সত্য?"

"হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্য, সার এডমণ্ড! আমার মনে হয়, আমি এ

কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, মিঃ ট্রেনটন আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং আমিও তাঁহার অনুরক্ত ছিলাম।"

"সোয়ামেস, এইবার আমি তোমাকে একটি অত্যন্ত জরুরী কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই মামলার আসামী যত দিন তোমার মনিবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় কোন দিন কি তিনি তাহার চরিত্র অথবা ব্যবহার সম্বন্ধে তোমার নিকট কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ?"

"মিঃ ট্রেনটন আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই তরুণী তাঁহাকে প্রণয়ে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এ জন্য তিনি কি করিবেন—তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।"

ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্সিলী তাঁহার ফাইলের কাগজপত্র পরীক্ষার পর মাথা তুলিয়া বলিলেন, "এইবার আমরা গত ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখের রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সেই সকল ঘটনার কথা তোমার স্মরণ হয় কি ?"

সাক্ষী উৎসাহভরে বলিল, "হ্যাঁ, সেই রাত্রির সকল ঘটনার কথা আমার উত্তম স্মরণ আছে।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "তোমার যখন তাহা উত্তমরূপে স্মরণ আছে, তখন সেই রাত্রে সেখানে কি ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি বোধ হয় হাকিমকে খুলিয়া বলিতে পারিবে।"

সাক্ষী বলিতে লাগিল, "সেই দিন বিকালের ডাকে মিস্ ডেনের নামে একখানি পত্র আসিলে সেই পত্রখানি আমিই উহাকে দিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় ফ্ল্যাটের দ্বার বন্ধ থাকায় আমি দ্বারে ধাক্কা দিয়াছিলাম ; কিন্তু তখন আমার মনিবের সঙ্গে মিস্ ডেন এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে ঝগড়া করিতেছিল যে, উহাদের কেহই আমার কথা শুনিতে পায় নাই।"

কৌন্সিলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই সময় আসামী তোমার মনিবকে কি কথা বলিয়াছিল তাহা কি তুমি হাকিমকে বলিবে ? তুমি সেই ঘরে আসিয়া আসামীকে কি কথা বলিতে শুনিয়াছিলে ?"

সাক্ষী বলিল, "আসামী মিঃ ট্রেনটনকে বলিয়াছিল, 'যদি তুমি আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার কর—তাহা হইলে আমি তোমাকে খুন করিব।' আমি মনিবের সম্মতিক্রমেই সেই কামরায় উপস্থিত থাকিয়া আসামীকে এ-কথা বলিতে শুনিয়াছিলাম।"

সাক্ষীর কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল,—যেমন সেই কক্ষে বোমা ফাটিল !

কৌন্সিলী বলিলেন, "এই বিরোধের মূল কারণ কি—তাহা কি তুমি ধারণা করিতে পারিয়াছিলে ?"

"আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, মিঃ ট্রেনটন আসামীকে বলিয়াছিলেন, তিনি প্যারিসে যাইবেন ; তাহা শুনিয়াই আসামী তাঁহার সহিত ঝগড়া করিতেছিল !"

"তুমি যে সময় সেই কক্ষে ছিলে, সে সময় কি আর কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল ?"

"হ্যাঁ, আসামী আমার মনিবকে একখানা পত্র দেখাইয়াছিল।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "তুমি তাহাকে যে পত্র আনিয়া দিয়াছিলে, উহা কি সেই পত্র ? সেই পত্রের লেফাফায় যে নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল—তাহা কি কোন পুরুষের হস্তাক্ষর ?"

"হ্যাঁ, উহা পুরুষের হস্তাক্ষর বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল।"

সরকার পক্ষের কৌন্সিলী উপবেশন করিলে সাক্ষী আসামীর কৌন্সিলীর জেরায় কি বলে তাহা শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

জন গারসাইড সাক্ষীর জেরা আরম্ভ করিলেন ; তিনি বলিলেন, "শোন সোয়ামেস, আমি বলিতে চাহি যে, তুমি ভয়ঙ্কর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছ ! আমার বিজ্ঞ বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ—তোমার মনিব তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, ইহা কি সত্য ?"

সাক্ষী বলিল, "হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্য।"

"তুমি হলপান সাক্ষ্য দিয়াছ যে, যে সময় মিস্ ডেনের সহিত তোমার মনিবের কলহ চলিতেছিল, সেই সময় তিনি তোমাকে সেই কক্ষে থাকিতে দিয়াছিলেন—তোমার এ কথায় কতটুকু সত্য আছে ?"

সাক্ষী বলিল, "আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, সেই সময় আমি সেই কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। ইহা হইতেই আপনি বুঝিতে পারিবেন আমার কথা সত্য কি না।"

"তুমি কি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পার—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের কলহ চলিয়াছিল—ততক্ষণ তুমি সেই কক্ষেই উপস্থিত ছিলে ?"

"হ্যাঁ, তাহাই বলিতেছি। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।"

"কিন্তু এই বিচারালয়ে এখন এরূপ এক ব্যক্তি উপস্থিত আছেন—যিনি হলপ করিয়া বলিতে প্রস্তুত—তুমি তাঁহাকে বলিয়াছিলে, তুমি সত্যই সেই কক্ষে উপস্থিত ছিলে না,—তুমি দ্বারের বাহিরে থাকিয়া আড়াল হইতে সকল কথা শুনিয়াছিলে ! আমার এ কথা শুনিয়া তুমি কি বিস্মিত হইবে না ?"

সাক্ষী উভয় হস্তে সাক্ষীর কাঠরার রেলিং চাপিয়া ধরিয়াছিল, জন গারসাইডের এই প্রশ্নে তাহার হাত দুইখানি কাঁপিতে লাগিল। সে নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

জজ কৌন্সিলীকে বলিলেন, "আপনি কি সেই সাক্ষীর জবানবন্দী লইবেন মিঃ গারসাইড ?"

কৌন্সিলী বলিলেন, "প্রয়োজন হইলে লইতে পারি ; কিন্তু বর্ত্তমান সাক্ষীর জেরা শেষ হইলে সম্ভবতঃ তাহার প্রয়োজন হইবে না।"

অনন্তর কৌন্সিলী সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কারণে মিঃ ট্রেনটনের চাকরী ছাড়িয়াছিলে—হাকিমকে তাহা এখন বলিবে কি ?"

সাক্ষী অনিচ্ছাভরে বলিল, "মত-বিরোধের জন্য আমি তাঁহার চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আমি কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "মত-বিরোধের জন্য চাকরী ছাড়িয়াছিলে ? তবে কি এ কথা সত্য নহে, তোমার চুরি করিবার অভ্যাস থাকায় মিঃ ট্রেনসন তোমাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন ?"

সাক্ষী হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল, "হ্যাঁ, মিঃ ট্রেনটন আমাকে তাড়াইবার জন্য ঐরূপ অছিলাই করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। আমি কোন দিন তাঁহার কোন জিনিষ চুরি করি নাই।"

"কিন্তু সোয়ামেস, তুমি চোর, চুরি করিয়া তুমি জেল খাটিয়াছিলে, এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার ? তুমি চুরি করিয়া কয়েক বার জেল খাটিয়াছিলে—এ কথা কি সত্য নহে ?"

সাক্ষী মাথা চুলকাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, সত্য।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "আর একটা প্রশ্নের উত্তর চাই! তুমি কি এখনও বলিবে, আসামীর সহিত তোমার মনিবের কলহের সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুমি সেই কক্ষে উপস্থিত ছিলে?"

সাক্ষী নির্ব্বাক্। সে মুখ চূণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জজ বলিলেন, "এ প্রশ্নের উত্তর দাও।"

সাক্ষী তথাপি নিরুত্তর।

জন গারসাইড উত্তরের জন্য সাক্ষীকে আর পীড়াপীড়ি না করিয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল।

*   *   *   *

অতঃপর পুলিশের প্রধান সাক্ষী স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর উইলিয়ম মরিসন সাক্ষ্য দিতে উঠিয়া বলিলেন, "দুর্ঘটনার দিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমি উক্ত ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষী মিঃ জর্জ্জ ম্যালরির জবানবন্দী ও আসামীর এজাহার গ্রহণ করিলাম। তৎপূর্ব্বেই আমি আসামীকে যথানিয়মে সতর্ক করিয়াছিলাম। তাহার পর আমি মিঃ ট্রেনটনের মৃতদেহ পরীক্ষা করি। তাঁহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। যে ছোরার ফলা মিঃ ট্রেনটনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ ছিল, তাহা তাঁহারই ছোরা বলিয়া পরে সনাক্ত করা হইয়াছে।"

সরকার পক্ষের কৌন্সিলী পুনর্ব্বার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাক্ষীকে প্রশ্ন করিলেন, "যে ছোরার আঘাতে মিঃ ট্রেনটন নিহত হইয়াছিলেন, আমার বিশ্বাস, তাহা ইটালীয়ান 'ষ্টিলেটো' (Stiletto)। আপনি কি তাহার হাতলে অঙ্গুলি-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ইন্‌স্পেক্টর?'

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন বলিলেন, "আমি সেই ছোরার হাতলে যে অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিয়াছিলাম, আসামীর অঙ্গুলি-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই নাই।"

অতঃপর সে দিন বিচার-কার্য্য বন্ধ করিয়া জজ এজলাস ত্যাগ করিলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

ইতিহাসের অনুসরণ

বামনী না বহমানি ?

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন হাসান গাঙ্গু বামনী দাক্ষিণাত্যের বামনী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-নাম ছিল জাফর খাঁ; কিন্তু দেবগিরি দখল করিয়া তিনি আলাউদ্দীন হাসান গাঙ্গু বামনী এই নাম গ্রহণ করেন। এখন তাঁহার এই গাঙ্গু বামনী নাম লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। কেহ বলেন, তিনি গাঙ্গু পণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন; সেই জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রভুর নামের সহিত নিজের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন। আর এক দল লোক বলেন যে, তিনি পারস্যের সমনী রাজ্যের রাজবংশের বহমন ও ইসফন্দিয়ার বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার নামের সহিত বহমানি নাম সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ কথাটি সত্য, তাহা লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কি বলেন, সেই কথার আমরা আলোচনা করিব।

তারিখ-ই-ফেরিস্তা বলেন যে, হাসান বাল্যকালে গাঙ্গু পণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর ভৃত্য ছিলেন। এই গাঙ্গু পণ্ডিত দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তুঘলকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। গাঙ্গু পণ্ডিতের কৃষিক্ষেত্রে হাসান এক দিন হলচালনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার লাঙ্গলের মুখে একটি লোহার শৃঙ্খল ঠেকিল। বিস্মিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, শৃঙ্খলের উভয় মুখই মাটীর মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে। মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে তিনি একটি তাম্রের কলস পাইলেন। ঐ কলস স্বর্ণে পূর্ণ ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ স্বর্ণ-

এবং সরলতা দেখিয়া গাঙ্গু পণ্ডিত অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি সেই কথা দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তুঘলককে বলেন এবং হাসানকে বাদশাহের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। মহম্মদ তুঘলক তাঁহার সাধুতার কথা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ এক শত অশ্বারোহী সেনার নায়কের পদ প্রদান করিলেন। ইহার পর হাসান সম্বন্ধে গাঙ্গু পণ্ডিত এই ভবিষ্যৎ-বাণী করেন যে, তিনি এক সময়ে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। সেই সঙ্গে তিনি হাসানকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লন যে, তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে গাঙ্গু পণ্ডিতকে তাঁহার রাজস্ব-সচিব করিবেন এবং তাঁহার নামের সহিত গাঙ্গু পণ্ডিতের নাম সংযুক্ত করিবেন। সেই জন্য যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন নাম লইলেন হাসান গাঙ্গু বামনী।

ফেরিস্তা আরও বলিয়াছেন—কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, হাসান পারস্যের সমনী রাজগণের বংশধর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফেরিস্তা এ কথাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে এই বংশধারার কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তাঁহার তোষামোদকারীরা তাঁহার এই বংশধারা রচনা করেন। তাঁহার বংশধারার পরিচয় এইরূপ—"আলাউদ্দীন হোসেন গাঙ্গু বহমানি পিতার নাম কৈকায়ুস্। কৈকায়ুসের পিতার নাম মহম্মদ। মহম্মদের পিতার নাম আলী। আলীর পিতার নাম হাসান। হাসানের পিতার নাম সহস্। সহসের পিতার নাম সিমুন। সিমুন ছিলেন সালমের পুত্র। সালম্ ছিলেন ইব্রাহিমের পুত্র। ইব্রাহিম ছিলেন নসীরের পুত্র। নসীর ছিলেন মনস্থরের পুত্র। মনস্থরের পিতা রোস্তম্। রোস্তমের পিতার নাম কৈকোবাদ। কৈকোবাদের পিতার নাম মিমুচির। মিমুচিরের পিতার নাম

পিতার নাম কৈয়ুমার। কৈয়ুমারের পিতার নাম খুরসিদ ইত্যাদি বংশ-লতা ধরিয়া তাঁহাকে ইসফান্দিয়ারের বহমনের বংশধর ঠিক করিয়াছেন।" ফেরিস্তা বলিয়াছেন—"এই বংশ-লতায় আস্থা স্থাপন করা যায় না।" হাসান সম্বন্ধে তাজকীরাট্-উল্‌মুলুক এইরূপ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এক দিন হাসান ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এই সময়ে এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ মুখে সবুজবর্ণ একটি ঘাস লইয়া তাঁহার দেহ হইতে মাছি তাড়াইতেছিল। তিনি জাগিয়া উঠিবা মাত্র সাপটি মাথা নীচু করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। গাঙ্গু পণ্ডিত এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি এ-ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। হাসানকে তিনি বলিলেন, তোমার ভাগ্যে খুব বড় সম্মান রহিয়াছে। তাহার পর তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক তাহার বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "যখন তুমি রাজা হইবে, তখন আমাকে উচ্চপদ প্রদান করিবে এবং তোমার নামের সহিত আমার নাম সংযুক্ত করিয়া দিবে ;" অর্থাৎ তিনি যখন কোন ফার্ম্মানে স্বাক্ষর করিবেন, তখন তাঁহার নামের সহিত বামনী নামটি জুড়িয়া দিবেন। এই গ্রন্থে হাসান যে গাঙ্গু পণ্ডিতের ভৃত্য ছিলেন এরূপ কথা নাই।

তবকুরাট্-ই-আকবরি নামক গ্রন্থে গাঙ্গু পণ্ডিতের নাম দেখা যায়। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, গাঙ্গু নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, হাসান এক সময়ে রাজা হইবেন। কিন্তু তিনি যে গাঙ্গু পণ্ডিতের ভৃত্য ছিলেন, এমন কথা ঐ গ্রন্থে নাই। কাফি খাঁ তাঁহার মোন্তাখাঁবুল-লুবার গ্রন্থে ফেরিস্তা যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া সহজেই মনে হয় যে, গাঙ্গু পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি সত্য সত্যই হাসানের রাজত্ব-লাভের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু বহু ঐতিহাসিক সম্প্রতি ইহাতে এই আপত্তি তুলিতেছেন যে, হাসান শাহের নামের সহিত ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী এরূপ কথা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রিগস্ সাহেব তাঁহার ফেরিস্তা নামক গ্রন্থে ২১৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে—"**The appellation of Bahmani he (Hasan) certainly took out of compliment to his master Gangu, the Brahman, a word often pronounced 'bahman'** "অর্থাৎ বামনী এই অভিখ্যা তাঁহার প্রভু গাঙ্গুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মণ' এই কথাটি সচরাচর 'বামন' বলিয়া উচ্চারিত হয়।" মিষ্টার ব্রিগসের এই কথার আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৯০ জন লোক ব্রাহ্মণকে বামন বলিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্যে এইরূপ উচ্চারণ হয়, শুনিতে পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহারা প্রায় বামন বলিয়া থাকেন, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকেরা উহা যে বামনই বলিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং হাসানের নামের সহিত ব্রাহ্মণ না থাকিয়া বামন লেখা অস্বাভাবিক নয়। সত্য বটে, ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে ব্রাহ্মণ এই শব্দটি স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এ কথা সপ্রমাণ হয় না যে, 'বামন' এই শব্দটি গাঙ্গু ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থে গৃহীত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, জনৈক মুসলমান রাজা যে তাঁহার উপকারী ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য বামনি বা ব্রাহ্মণী এই নামটি তাঁহার বংশ-ধারার সহিত জুড়িয়া দিবেন, ইহা দেখিলেও প্রত্যয় হয় না। তিনি বড় জোর তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে একটি উচ্চপদ দিয়া সম্মানিত করিতে পারেন। হাসান শাহ যে গাঙ্গু ব্রাহ্মণকে স্বীয় দেওয়ান বা রাজস্ব-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কোন ঐতিহাসিকই সে কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু গাঙ্গু যদি সেই দুঃসময়ে হাসান শাহকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া থাকেন যে, তিনি তাঁহার নামের সহিত গাঙ্গুর নাম সংযুক্ত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে তিনি কেন তাহা করিবেন না, তাহা বুঝিতে পারি না। সকলই যে দুঃসময়ে কৃত প্রতিশ্রুতি সুসময়ে ভুলিয়া যায়, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস—হাসান প্রথমেই গাঙ্গু ব্রাহ্মণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বা তাঁহার বংশধরেরা উহা পরিবর্ত্তন করিয়া বহমানি এই পারস্য অভিখ্যায় পরিণত করেন। সে কথা আমরা পরে বলিতেছি।

সকল মুসলমান ঐতিহাসিক অবশ্য গাঙ্গু ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করেন নাই ; কিন্তু যাঁহারা সে কথা উল্লেখ করেন নাই, তাঁহারাও লিখিয়াছেন যে, দুরবস্থায় পতিত এবং অজ্ঞাত-কুলশীল হাসান শাহ এক সময়ে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবেন, ইহা অনেকেই জানিতেন। বুরহানি মায়াশির নামক গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন যে, মহম্মদ তোঘলকের রাজত্বকালে হাসান দিল্লীতে গমন করেন। তিনি সে সময় যে পারস্যের উচ্চ রাজবংশসম্ভূত, এমন কথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই। তিনি উহা প্রকাশ না করিয়াই মহম্মদ তোঘলকের অধীনে চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি এই সামান্য চাকরী করিতেন, সে সময়ে দিল্লীর স্বনামধন্য নিজামুদ্দীন মহম্মদ তোঘলকের সম্মানের জন্য একটি বড় রকমের ভোজ দিয়াছিলেন। ভোজ-শেষে মহম্মদ তোঘলক চলিয়া যান। তিনি চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরে হাসান নিজামুদ্দীনের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভৃত্য সে কথা শেখ নিজামুদ্দীনকে জানাইয়াছিল। শেখ নিজামুদ্দীন সে কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ এক জন নরপতি চলিয়া গেলেন ; আর এক জন দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে ভিতরে আনো।" এই কথা শুনিয়া ভৃত্য হাসানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শেখ নিজামুদ্দীনের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। নিজামুদ্দীন তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিলেন এবং বলিলেন যে, এক সময়ে তিনি রাজা হইবেন। এই কথায় হাসানের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি যে রাজা হইবেন, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। তিনি মনে মনে উহা সফল করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বুরহানি মায়াশির গ্রন্থের লেখক গাঙ্গু পণ্ডিতের কথা একেবারেই আমল দিতে চাহেন নাই। তিনি হাসান শাহের পারস্যের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত আখ্যায়িকায় এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা পাঠ করিলে তিনি যে আসল তথ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন হয়। প্রথমে শেখ নিজামুদ্দীন এক জন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন না। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের কথার উল্লেখ কোথাও নাই। বিশেষতঃ হাসান শাহ কাহারও নিকট তাহার বংশ-পরিচয়ের কথা আকারে-ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নাই।

এরূপ অবস্থায় হাসান শাহ যে ভবিষ্যতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, ইহা তিনি কিরূপে বুঝিয়াছিলেন ? নিজামুদ্দীন সম্ভবতঃ গাঙ্গু পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ-বাণীর কথাই শুনিয়া থাকিবেন। নতুবা তিনি এক জন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে পরম সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া রাজভোগ খাওয়াইবেন কেন ? দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গাঙ্গু তো কাহারও নাম হয় না। গঙ্গা নাম অনেকের থাকে। সম্ভবতঃ হাসান শাহের প্রাথমিক জীবনের প্রভু গাঙ্গু পণ্ডিতের নাম গঙ্গাধর পণ্ডিত বা গঙ্গাচরণ পণ্ডিত অথবা ঐরূপ গঙ্গাযুক্ত কোন নাম ছিল। লোকে তাঁহাকে গঙ্গা পণ্ডিত বলিত। মুসলমান লেখকগণ এই গঙ্গা পণ্ডিতের নামটি বিকৃত করিয়া গাঙ্গু পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন। সে জন্য গাঙ্গু পণ্ডিতের কোন অস্তিত্ব ছিল না, এ সিদ্ধান্ত কোন মতেই করা যাইতে পারে না। ইহা ভিন্ন মুসলমান-লিখিত কোন কোন ফারসি গ্রন্থে গঙ্গা পণ্ডিতের নাম থাকিলেও হাসান শাহ যে গঙ্গা পণ্ডিতের ভৃত্য ছিলেন, এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া ফেরিস্তা-কথিত কাহিনীই বা অস্বীকার করা যায় কি করিয়া ? মানুষের অবস্থা ভাল হইলে অনেকে তাঁহাদের অতীত জীবনের কথা চাপা দিবার চেষ্টা করেন। অতীত জীবনের দুরবস্থার কথা অনেকে যে চিত্তদৌর্ব্বল্যবশতঃ প্রকাশ করিতে সম্মত হন না, ইহা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এক জন প্রবল-প্রতাপ মুসলমান রাজা এক জন হিন্দু পণ্ডিতের দাসত্ব করিয়াছিলেন, এ কথাও তদানীন্তন আভিজাত্যাভিমানী মুসলমানগণ সহজে স্বীকার করিতে চাহিবেন না, ইহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। হাসান শাহ হাসান গাঙ্গু বামন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন, তাহা বুঝা যায় না। পরবর্ত্তী মুসলমান লেখকগণ গাঙ্গু স্থলে 'কাঙ্কু' এই পারস্য নাম বসাইয়াছেন। তাঁহারা হাসানকে পারস্যের বহমানি রাজবংশসম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে বংশ-তালিকা উপস্থিত করেন, তাহা বিচারসহ নহে, তাহা অনেক মুসলমান লেখকই বলিয়া থাকেন। কোন কোন মুসলমান লেখক এ কথাও বলিয়াছেন যে, এই বংশ-তালিকা সত্য কি না, তাহা ভগবানই জানেন। তাঁহার যে সব বংশ-তালিকা দেওয়া হয়, সেগুলির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ মিল নাই। ফেরিস্তা সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন, হাসান শাহের এই আভিজাত্য কথা কত দূর সত্য, ভগবানই তাহা বলিতে পারেন! ফেরিস্তার কথা আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

তাজকীরাট-উল-মুলুক নামক গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, হাসান শেখ মহম্মদ সিরাজ জুনাইদির নিকট কাজ করিতেন। তিনি তাঁহারই অনুগ্রহে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব-পদ পাইয়াছিলেন। হাসানই সিরাজ জুনাইদিকে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রণোদিত করেন। এই গ্রন্থে হাসান কর্ত্তৃক অনেক অদ্ভুত জয়-লাভের কথা বর্ণিত আছে। উহার একটিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। হাসান হিন্দুদিগের ঘোর বিরোধী ছিলেন না। তিনি যে হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য শেখ মহম্মদ সিরাজ জুনাইদিকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, এই গ্রন্থে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা সত্য নহে। অধিকাংশ কাহিনী বাজার-গুজবের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলেও উহাতে গাঙ্গু পণ্ডিতের কথা বাদ পড়ে নাই।

তবে এ কথা সত্য যে, সিংহাসন লাভ করিবার পর হাসান শাহ তাঁহার বংশের সহিত হিন্দু নাম গ্রথিত করিবার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ, সমস্ত মুসলমান সমাজ তাঁহার এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের এইরূপ তীব্র প্রতিবাদ এবং বিরুদ্ধ ভাব হাসান শাহ কখনই নিরাপদ মনে করেন নাই। সেই জন্য তিনি পরে বাধ্য হইয়া নিজ-নাম আলাউদ্দীন হাসান গাঙ্গু বামন হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়া আলাউদ্দীন হাসান কাঙ্কু বাহমনী নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম সকল গ্রন্থে একরূপ নহে, তারিখ-ই-ফেরিস্তায় তাঁহার নাম আল্লাউদ্দীন হাসান কাঙ্কু বামনী। তাবাকত-ই-আকবরিতে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে আল্লাউদ্দীন হাসান সাধু। বুরহান্-ই-মায়াশিরে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে আলাউদ্দীন হাসান গাঙ্গু বামনী। মুক্তাখাঁবুৎ-তারিখে নাম দেওয়া হইয়াছে আলাউদ্দীন বামন শাহ। এইরূপ বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার বিভিন্ন নাম দেখিয়া মনে স্বতঃই সন্দেহের সঞ্চার হয় যে, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এবং নাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তিনি চেষ্টা করিয়াই তাঁহার নামের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার নাম লইয়া এত বিভ্রাট ঘটিবে কেন ? এবং বামন বা বামনী এই অভিখ্যা ঢাকিবার জন্য নিজেকে পারস্যের বহমন্ এবং ইস্ফান্দিয়ারের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি ঐরূপ উজ্জ্বল বংশের বংশধর এ কথা কেহই জানিতেন না। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি তাঁহার ঐ বংশধারার কথা জাহির করিয়াছিলেন! কিন্তু প্রথমেই তিনি তাঁহার নামের সহিত গাঙ্গু বামনী এই নাম যে সংযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধিকন্তু তিনি গাঙ্গু পণ্ডিত বা গঙ্গা পণ্ডিতকে যে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহাতে মনে হয়, গঙ্গা পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা মিথ্যা নহে। তাঁহার যে বংশ-ধারা প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলিতে ঐক্য নাই। তাঁহার এই 'বামন' উপাধি পারস্য ভাষার 'বহমান' উপাধির অপভ্রংশ কিংবা সংস্কৃত ভাষার 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অপভ্রংশ, তাহা লইয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় লাভ নাই। শেখ আজুরি 'বামন-নামা' নামক কবিতায় বামন-বংশের এক ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখানি 'ফেরিস্তা' এবং 'তবাতবা' গ্রন্থের পূর্ব্বে লিখিত। ইহাতে হাসানকে এবং তাহার বংশধরগণকে বামন বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই সময় হইতেই হাসান শাহের 'বামন' এই উপাধি যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ হইতে গৃহীত উহা ঢাকিবার চেষ্টা হইতেছিল ; কিন্তু সকলে তাহা গ্রহণ করেন নাই।

বামনী বংশের মুসলমান রাজগণ হিন্দুদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। হাসান কতকটা পর-মতসহিষ্ণু ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ তাহা ছিলেন না। হাসান ক্ষিপ্রতার সহিত রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই পশ্চিমে কোঙ্কন হইতে পূর্ব্বে বরঙ্গল এবং উত্তরে বেরার হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী কতকটা স্থান লইয়া বিজয় নগরের হিন্দুরাজাদিগের সহিত প্রায় তাঁহাদের বিবাদ বাধিত।

আলাউদ্দীন হাসান শাহ গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করিয়া তাঁহার রাজ্যটিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া যান। মৃত্যুকালে আলাউদ্দীন হাসান শাহ তাঁহার বংশধরদিগের জন্য যে রাজ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছিল। তিনি ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার বংশধরগণ হিন্দুগণের উপর বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেন না; অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করিতেন। অনেকে বলেন যে, হিন্দু নাম গ্রহণের অপবাদ ঢাকিবার জন্য তাঁহারা হিন্দুদের উপর অত্যধিক নির্য্যাতন করিতেন। ফলে আমাদের যত দূর মনে হয়, 'গাঙ্গু' এই নামটি হাসান শাহ তাঁহার প্রথম জীবনের প্রভুর ভবিষ্যৎ-বাণীর উপর সম্মান দেখাইবার জন্য প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে উহা বাঁচাইয়া অন্যরূপ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যেখানে প্রকৃত তথ্যের অপলাপ করিয়া অন্যরূপ চেষ্টা হয়, সেখানে প্রায় মতভেদ দেখা যায় এবং আসল ব্যাপার বুঝা কঠিন হয়। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিতে চাহি না। মুসলমান-লিখিত গ্রন্থ হইতেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। বামনী রাজবংশের অভিখ্যা ব্রাহ্মণ গাঙ্গু পণ্ডিতের নাম হইতেই গৃহীত হইয়াছে; পারস্যের বহমন রাজবংশ হইতে নয়।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

স্বর্ণমূল্য ও স্বর্ণমান

আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-সমন্বয় সঙ্কল্পে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা সম্প্রতি প্রবল ও প্রগাঢ় হইয়াছে। কারণ, স্বর্ণের ভিত্তিভূমিতে নিখিল জগতের সর্ব্ববিধ প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের আন্তর্জ্জাতিক স্থৈর্য্য-সম্পাদনার্থ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনাদ্বয় অচিরে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে আলোচিত হইবে। এই পরিকল্পনাদ্বয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ পূর্ব্বে আমরা একটি প্রবন্ধে করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য-সাধনার্থ, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রভূত সঞ্চিত-স্বর্ণের অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় স্বর্ণের প্রাধান্য সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ-একক "ইউনিটাস্" (Unitus) স্বর্ণে কিংবা যে কোন প্রচলিত মুদ্রায় পরিবর্ত্তনীয়; সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র সুকঠোর স্বর্ণমানের (Gold standard) পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে আন্তর্জ্জাতিক খালাস-নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠানের (International Clearing House) সম্মতি ব্যতীত যুক্তরাজ্যের শীর্ষ-একক "ব্যাঙ্কর" (Bancor) স্বর্ণে পরিবর্ত্তনীয় নয়। সুতরাং স্বর্ণের সহিত ইহার সংযোগ তত কঠোর নয়। উভয় পরিকল্পনারই ভিত্তিভূমি অবশ্য স্বর্ণ। এই নিমিত্ত সম্প্রতি স্বর্ণের মূল্য অকস্মাৎ অকারণে গগনস্পর্শী হইয়াছিল।

স্বর্ণ একটি বাণিজ্য দ্রব্য (Commodity)। ইহা অর্থের (Money) আকার ধারণ করে, যখন কোন দেশ, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রচলিত জাতীয় মুদ্রা-প্রকরণের বিনিময়ে একটি নির্দ্ধারিত ওজনের স্বর্ণ ক্রয় কিংবা বিক্রয় করিতে আইন-সঙ্গত বাধ্যতা স্বীকার করেন। ফলে, ইহার নির্দ্ধারিত মুদ্রামূল্য (Currency value) নির্ভর করে জাতীয় আইনের (Legislation) উপর; সুতরাং, স্বর্ণের নির্দ্ধারিত মুদ্রা-মূল্য অপ্রকৃত, কল্পিত অথবা কৃত্রিম (Fictitious)। কোন দেশ পূর্ণ-স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে, তাহাকে সর্ব্বদা ইহার প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের কোন ক্ষুদ্রতম এককেকে (Minimum unity) স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত, (Exchange into gold) এবং ঐ প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণে নির্দ্ধারিত-মূল্যে স্বদেশী, অথবা বিদেশী, উভয় পক্ষকে, কিংবা তাহাদের নিকট হইতে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইহার ফলে, আপনা হইতেই, সেই দেশের সমগ্র প্রচলিত মুদ্রা ও অর্থের ক্রয়-মূল্য স্বর্ণের ক্রয়-মূল্যের উত্থান-পতনের সহিত কমে, বাড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্য স্বর্ণমানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও আইনতঃ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে, তথাপি প্রকৃত পক্ষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্য স্বর্ণমান হইতে বিচ্যুত ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে এবং ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাণিজ্য-ব্যবসায়ী দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র যুক্ত-রাষ্ট্রই স্বর্ণমানে দৃঢ় ছিল। ইতিমধ্যে ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণের রপ্তানী বন্ধ করিয়া, স্বর্ণ-মানের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যুক্তরাজ্যে প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের বিষম অনটন ঘটে। তজ্জন্য বৃটিশ সরকার সরকারী নোট (Treasury notes) প্রচলিত করিয়া হাতে হাতে চল্‌তি মুদ্রার অনটন দূর করিয়া জন-সাধারণের আতঙ্ক নিরসন করেন। ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুলাংশে অগ্রিম-বিনিময়-চুক্তি বাজারের (Market for forward exchange) সাহায্যে পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য "স্বর্ণ-বাট মান" (Gold Bullion Standard) অবলম্বন করেন। ইহা পূর্ব্বে প্রচলিত স্বর্ণ-মানের ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপ মাত্র। এই প্রকরণে কাগজের নোট এবং তাহার সঙ্গে চল্‌তি বাজার মূল্য অপেক্ষা কম ধাতু মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব ভাক্ত মুদ্রা নিত্য-প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করে। এই বিধান প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণকে, স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্ত্তে, একটি নির্দ্ধারিত হারে, নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের বাটে পরিবর্ত্তিত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। তথাপি স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি, এবং তদানুষঙ্গিক দ্রব্য-মূল্যের সাধারণ মাত্রার হ্রাস, নিরুদ্ধ হয় নাই। ফলে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যকে পুনরায় এই নূতন মান পরিত্যাগ করিতে হয়। তদবধি অবশ্য ষ্টার্লিং-এর মূল্য স্বর্ণের মূল্যের তুলনায় অধিকতর স্থিতিশীল হইয়াছে।

স্বর্ণ-মানের আর একটি প্রকারান্তর "স্বর্ণ-বিনিময় মান" (Gold Exchange Standard)। এই প্রথাতেও নোট এবং ভাক্ত ধাতব মুদ্রাই প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণের বিশিষ্ট অঙ্গ। এ ক্ষেত্রে

সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইহার বৈদেশিক বিনিময়-হারকে স্বর্ণ-মান-বিশিষ্ট-দেশ সমূহের মুদ্রা-প্রকরণের একটি বিশিষ্ট তুল্য-মূল্য নিরিখের যথাসম্ভব সমীপবর্ত্তী রাখিবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে-কোন-প্রকার স্বর্ণ-মান-বিশিষ্ট দেশের প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণে পরিবর্ত্তনীয় সম্পদ্—যথা স্বর্ণ, বৈদেশিক হুণ্ডী অথবা খৎ (Foreign Bills), ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ (Bank Deposits), কারবারে নিযুক্ত মূলধন (Investments) প্রভৃতি বিদেশে রক্ষা করেন। বহু বৎসর ধরিয়া, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ এই স্বর্ণ-বিনিময় মানে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইংরেজ-শাসিত ভারতে প্রচলিত-মুদ্রা-প্রবর্ত্তন ইতিহাসের সূত্রপাত ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, যখন রৌপ্য-মুদ্রার টাকা মান-মুদ্রা-(Standard Coin)রূপে প্রবর্ত্তিত হয়। বৃটিশ-অধিকৃত ভারতে টাকাই তখন মূল্য-পরিমাণ আদর্শ, অথবা নিরিখ (Standard Measure Value) নির্দ্ধারিত হয়। এই ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, প্রায় ষাট বৎসর, ভারতে "রৌপ্য-মান" (Silver Standard) প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ টাকার বিনিময়-মূল্য নির্দ্ধারিত হইত, টাকার অঙ্গীভূত রৌপ্য-সমষ্টির স্বর্ণ-মূল্যানুযায়ী। ফলে, রৌপ্যের স্বর্ণ-মূল্যের উত্থান-পতনের সহিত টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি য়ুরোপীয় দেশ রৌপ্যকে চল্‌তি অর্থের উপাদান-মূলক মর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত (Demonetisation) করেন এবং দুই-ধাতু-নির্ম্মিত প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের প্রথা (Bi-metallic Standard) পরিত্যাগ করেন। ফলে, রৌপ্য-মূল্যের অনিবার্য্য পতনের সহিত, টাকার বিনিময়-হারের গুরুতর অবনতি ঘটে, এবং বিলাতের নিকট ভারতের আর্থিকদায় (Home charges) মিটাইতে, তদানীন্তন ভারত সরকারকে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এই সঙ্কটে হার্শেল-সমিতির (Harschell Committee) তদন্তের ফলে, রৌপ্য-মুদ্রা-প্রস্তুত করণ খর্ব্ব করিয়া টাকার অস্বাভাবিক অনটনের সৃষ্টি, এবং ১ শিলিং ৪ পেন্সে তাহার বিনিময়-হার নির্দ্ধারণ-নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই প্রচেষ্টার ফলে শেষোক্ত বৎসরে, টাকার বিনিময়-হার ১ শিলিং ৪ পেন্সে উর্দ্ধগতি লাভ করে। এই বৎসর ফাউলার তদন্ত-সমিতির (Fowler Committee) আবির্ভাব। ফাউলার সমিতি টাকার বিনিময়-হার স্বর্ণমূল্যে ১ শিলিং ৪ পেন্স নির্দ্ধারিত করিতে, ১৫ টাকা মূল্যে স্বর্ণমুদ্রা "সভারেণ" প্রস্তুত করিয়া নিরঙ্কুশ ভাবে টাকার বিনিময়ে প্রচলিত করিতে এবং অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে টাকার প্রচলন (Unlimited legal tender) পরিচালন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, ভারতে স্বর্ণ-বিনিময়-মানের প্রতিষ্ঠা ঘটে; এবং কেবলমাত্র ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দ ব্যতীত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত থাকে। টাকার বিনিময়-হার স্বর্ণমূল্যে ১ শিলিং ৪ পেন্সে দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত, ভারত হইতে অর্থ-প্রেরকদিগকে বিলাতে স্বর্ণ-বিনিময়, এবং বিলাত হইতে অর্থ-প্রেরকদিগকে ভারতে রূপার টাকা-বিনিময় দিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, টাকার নিবদ্ধ ছিল। বিনিময়-হারের এই স্থৈর্য্য দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত ভারত সরকারকে বিলাতে স্বর্ণ অথবা ষ্টার্লিং এবং ভারতবর্ষে রূপার টাকা মজুত রাখিতে হইত। এই সময়ে দ্রব্য-মূল্য দৃঢ় ছিল এবং শিল্পের উন্নতি ও প্রসার ঘটিয়াছিল।

ইতিমধ্যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, যুদ্ধ ঘোষণার ফলে ভারতের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ এবং তাহার বিনিময়ের মুস্কিল ঘটে। এ পর্য্যন্ত ভারত সরকার ১৫ টাকা, অর্থাৎ ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং মূল্যে স্বর্ণ দিতেছিলেন। যুদ্ধারম্ভ হইতেই স্বর্ণ প্রদান রহিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বর্ণ-বিনিময় মান চলিয়াছিল, কিন্তু পর-বৎসরের প্রারম্ভেই ইহা পরিত্যক্ত হয়, কারণ, ইতিমধ্যে বিলাতের সহিত বাণিজ্য-জমা-খরচে ভারতের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত-জমার অঙ্ক এত অধিক হইয়াছিল যে, ভারতের উপর প্রদত্ত হুণ্ডীর দাবী মিটাইবার উপযুক্ত রূপার টাকা সরকারের তহবিলে ছিল না। রৌপ্যের মূল্য-বৃদ্ধি এবং আতঙ্কগ্রস্ত ভারতবাসী কর্ত্তৃক স্বর্ণ ও রৌপ্যের গুপ্ত সঞ্চয় হেতু দ্রব্য-মূল্যের ক্রমবৃদ্ধি কালে, ক্রম-বর্দ্ধমান শিল্প-বাণিজ্যের চাহিদা মিটাইতে, রূপার টাকার যোগান অসম্ভব হইয়াছিল। ফলে, ভারতবর্ষকে বাধ্য হইয়া রৌপ্য-মানে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সন্ধি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সরকার পুনরায় স্বর্ণ-বিনিময়-মান অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে, ব্যাবিংটন-স্মিথ্ তদন্ত-সমিতির শুভাগমনে টাকার বিনিময়-হার স্বর্ণ-মূল্যে ২ শিলিংএ স্থিরীকৃত হয়। ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন এবং স্বর্ণ ও ডলারের সম্পর্কে ষ্টার্লিংএর গুরু হ্রাস ঘটে। পক্ষান্তরে, ষ্টার্লিংএর সম্পর্কে ইহার মূল্যাবনতির সঙ্গে, রূপার টাকার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি পায়। ইত্যবসরে রৌপ্য-মূল্য এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, ভারত সরকারকে পুনরায় স্বর্ণ-বিনিময় মান বর্জ্জন করিয়া ঘটনা-স্রোতের উপর নির্ভর করিতে হয়। রূপার টাকা স্বর্ণমূল্যে ২ শিলিং হইতে ২ শিলিং ৮ পেন্সে উর্দ্ধগতি লাভ করে। এই অনুকূল বিনিময়-হারের সুযোগ লইয়া ভারতীয় শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ বহুবিধ পরিণত পণ্যের নিমিত্ত মোটা টাকার ক্রয় চুক্তি করেন। কিন্তু আমদানী বৃদ্ধির অনুকূল বিনিময়-হার রপ্তানী-বৃদ্ধির প্রতিকূল। সুতরাং রপ্তানী বাণিজ্যের বিষম হ্রাস ঘটে। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া,—বিনিময়-হারের অধোগতি। ২ শিলিং ৮ পেন্স হইতে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, বিনিময়-হার ১ শিলিং ৮ পেন্সে এবং পরে মাত্র ১ পেন্সে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে অনতিবিলম্বে ভারতীয় দ্রব্যাদির, বিশেষতঃ কৃষি-পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং টাকার বিনিময়-হার ধীরে ধীরে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে, ১ শিলিং ৬ পেন্সে স্থিতিলাভ করে। এই সময়ে যুক্তরাজ্য পুনরায় স্বর্ণের সহিত তাহার মুদ্রা-প্রকরণের সংযোগ সাধন করেন; এবং ১ শিলিং ৬ পেন্স ষ্টার্লিং অর্থাৎ স্বর্ণমূল্যে, রূপার টাকার বিনিময়-হার ১ শিলিং ৬ পেন্সে দৃঢ় হয়। এই সন্ধিক্ষণে হিল্টন্-ইয়ং রাজকীয় তদন্ত সমিতির আবির্ভাব।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে হিল্টন্-ইয়ং সমিতি তাহাদের তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করেন। টাকার বিনিময়-হার স্বর্ণমূল্যে ১ শিলিং ৬ পেন্সে নির্দ্ধারিত হয় এবং ভারতবর্ষকে স্বর্ণ-বাট মানে (Gold Bullion

ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ হয়। স্থির হয়, এই ব্যাঙ্ক কেবল সরকারের নহে, অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিরও ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিবে। কিন্তু ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের চলতি মুদ্রা ও মুদ্রা প্রস্তুত-করণ আইনে (Currency and Coinage Act of 1927) কিছু ত্রুটি থাকিয়া যায়। ভারত সরকার তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বর্ণবাটের পরিবর্ত্তে ষ্টার্লিং-বিনিময় করিতে পারিতেন। এই ত্রুটি, প্রয়োজন অনুযায়ী ভারত সরকারকে স্বর্ণ-বাট-মানের পরিবর্ত্তে, ষ্টার্লিং-বিনিময়-মান প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার দেয়। এই অধিকারের ফলে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য যখন স্বর্ণ-মান পরিত্যাগ করেন, তখন ভারত সরকার একটি ঘোষণা দ্বারা টাকা এবং নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে অস্বীকার করেন, এবং টাকার বিনিময়-হার ষ্টার্লিং-মূল্যে ১ শিলিং ৬ পেন্সে নির্দ্ধারিত করেন। এই পরিবর্ত্তন লইয়া তদানীন্তন অর্থসচিবের সহিত ভারত-সচিবের মতদ্বৈত ঘটে, শুনা যায়। যাহা হউক, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সহিত টাকার বিনিময়-হারকে ১ শিলিং ৬ পেন্স ষ্টার্লিংএ দৃঢ় রাখিবার ভার ঐ ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তদবধি প্রয়োজন-অনুযায়ী, ষ্টার্লিং অথবা ষ্টার্লিং-বিনিময় ক্রয়-বিক্রয় করিয়া টাকার বিনিময়-হার দৃঢ় রাখিতেছেন। কাগজের নোট-প্রচারের ভারও এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একায়ত্ত।

অধুনা আন্তর্জাতিক মুদ্রা-সমন্বয় সঙ্কল্পে স্বর্ণ-মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তৎপ্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন মানের আপেক্ষিক দোষ-গুণের আলোচনা করিব। বহু অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত এখনও কোন-না-কোন আকারে স্বর্ণমান পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। আবার অনেক বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ী ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান। সাধারণতঃ স্বর্ণ-মানের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয়।

(১) মনুষ্য-সমাজে স্বর্ণ সর্ব্বত্রই মূল্যবান বলিয়া আদৃত।

(২) ইহা সহজে বহনোপযোগী এবং স্থানান্তরকরণোপযোগী।

(৩) স্বর্ণ-মান-প্রচলিত দেশসমূহে দ্রব্যমূল্যের স্তর প্রায় এক-রূপই থাকে।

(৪) স্বর্ণের মূল্য স্থিতিশীল।

(৫) কোন দেশের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ কোন প্রকার স্বর্ণ-মানে দৃঢ়বদ্ধ না থাকিলে, ঐ দেশের শাসনতন্ত্র সহজেই অযথা মুদ্রা-স্ফীতি (Inflation) ঘটাইতে পারেন, এবং রপ্তানী বাজারের সাহায্যার্থ বিনিময়-হারকে যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন।

(৬) স্বর্ণমান আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পোষকতা করে, যদিও ঐরূপ বাণিজ্যের নিমিত্ত ইহার প্রয়োজন সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় না।

আমরা একে একে এই যুক্তিগুলির সারবত্তা বিচার করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ, স্বর্ণ সর্ব্বত্র সমাদৃত সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার মূল্যের তারতম্য ঘটে। স্বর্ণমান জাতীয় প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণে স্বর্ণের মূল্য নির্দ্ধারণ করে। সুতরাং একটি মাত্র পণ্য, অর্থাৎ স্বর্ণ, যোগান ও চাহিদার মূলগত নিয়মকে ব্যাহত করে। দ্বিতীয়তঃ, সহজে বহনোপযোগী এবং স্থানান্তর-করণোপযোগী বলিয়া, বিনিময়-উদ্দেশ্যে স্বর্ণের সমাদর সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রাচীন কালে এই উপযোগিতা অত্যাবশ্যক ছিল; কিন্তু অধুনা অর্থের আদান-প্রদানের বিভিন্ন প্রকার সহজসাধ্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক মূলধন সংশ্লিষ্ট সম্পদ্ (Investments) ক্রয়-বিক্রয় এখন নিত্য অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইতেছে; এবং এই সুগমতা ও তৎপরতা বিনিময়ের উপর স্বর্ণের আমদানী-রপ্তানীর সদৃশ-ফল প্রদান করে। তৃতীয়তঃ, স্বর্ণমান-সমন্বিত দেশ সমূহে আন্তর্জ্জাতিক পণ্য ও পরিচর্য্যা-মূল্যের (Prices of international goods and services) কিঞ্চিৎ সমতা রক্ষিত হয় বটে, কিন্তু স্বর্ণ-মানই তাহার একমাত্র উপায় নয়। বিনিময় পরিস্থিতিকে দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত স্বর্ণের আমদানী-রপ্তানী এবং ধরাট ও সুদের হারের পরিবর্ত্তন (Changes of discount and interest rates) আন্তর্জ্জাতিক মূল্য সম্পর্কেও যোগান এবং চাহিদার অর্থনৈতিক ক্রিয়া-শক্তিকে খর্ব্ব ও বিলম্বিত করে। স্বর্ণ-শাসিত দেশসমূহেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দ্রব্য-মূল্যের নিদারুণ হ্রাসের ফলে দুঃখ-দুর্দ্দশা, বেকার-বৈগুণ্য, লভ্যাংশের হানি এবং সুদ ও অন্যান্য আর্থিক দায় মিটাইবার অসামর্থ্য প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। ফলে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে নহে, দেশান্তর্গত ব্যবসা-বাণিজ্যেও মন্দা ঘটিয়াছিল এবং সর্ব্ব দেশেই বহির্বাণিজ্য অপেক্ষা অন্তর্বাণিজ্য অধিকতর মূল্যবান। একটিমাত্র পণ্য স্বর্ণের উত্থান-পতনে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-বিপর্য্যয় কোন প্রকারেই স্পৃহণীয় নহে। আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনে, স্বর্ণ-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত, আভ্যন্তরীণ মজুরী ও বেতন, এবং সুদ এবং অন্যান্য নির্দ্ধারিত আয়ের ক্রয়-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে; আভ্যন্তরীণ পণ্য, পরিচর্য্যা ও অর্থ-সামর্থ্যের যোগান ও চাহিদার অপেক্ষা রাখে না।

চতুর্থতঃ, স্বর্ণের মূল্য কদাচ দৃঢ়রূপে স্থিতিশীল নহে। স্বর্ণের নিরিখে স্বর্ণের মূল্য স্থিতিশীল হইতে পারে, এমন কোন চলতি মুদ্রার মারফতে যাহার অঙ্গীভূত স্বর্ণের ওজনের মূল্যে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্বাধীন ভাবে, অন্য কোন পণ্যের সংস্রবে আসিলেই, ইহার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বিগত মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণের নিরিখে (In terms of gold) পণ্যমূল্য অধোগতি লাভ করিয়াছিল এবং পণ্যের নিরিখে (In terms of commodities) স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, আভ্যন্তরীণ চলতি মুদ্রা-প্রকরণের নিমিত্ত স্বর্ণ আবশ্যক, কিংবা সর্ব্বোত্তম মূল-ভিত্তি নহে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য—যে স্বর্ণের নিগড়ে বদ্ধ না থাকিলে, শাসনতন্ত্র কর্ত্তৃক অযথা মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা সমধিক। কিন্তু ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পরে, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চলতি মুদ্রা স্বর্ণে পরিবর্ত্তনীয় নহে বলিয়াই যে এইরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। কোন শাসন-তন্ত্রের অপরিমিত নোট ছাপিবার অবাধ ক্ষমতা থাকিলে, ঋণ পরিশোধার্থ কর ধার্য্য কিংবা সুদ-পরিবাহী ঋণের পরিবর্ত্তে, মুদ্রাস্ফীতি নীতি অবলম্বিত হইতে পারে। শাসনতন্ত্রের অমিতব্যয়িতা এবং আয়-ব্যয়ের সমতা-বিবর্জ্জিত বাজেটের ফলেও এরূপ ঘটিতে পারে। ব্যাঙ্কের বিচক্ষণতাহীন কাজ-কারবারেও মুদ্রাস্ফীতি অসম্ভব নহে। স্পষ্টতঃ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের নিমিত্ত আবশ্যক না হইলেও, উন্নতির মুখে স্বর্ণ-মান-বিশিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সুকর হয়, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই; কিন্তু এই সৌকর্য্য উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হয়। স্বর্ণমান গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বাণিজ্যশীল দেশ সমূহের, এবং ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী

কালের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, স্বর্ণমান বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্ত অত্যাবশ্যক নহে। কারণ, স্বর্ণমান-বিচ্যুত দেশ সমূহ, স্বর্ণমান-বিশিষ্ট দেশ সমূহের সম-সময়ে প্রচুর বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে। স্বর্ণমান-বিচ্যুত দেশ সমূহের সহিত বাণিজ্য ব্যপদেশে আমদানী ও রপ্তানী-বণিক্‌কে বিনিময়-হারের সম্ভাব্য পরিবর্তনের প্রতিকার হেতু কোন নির্দ্দিষ্ট চল্‌তি-মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া, ভবিষ্য-দায়-গ্রহণকারী বিনিময় বাজারের (Forward Exchange markets) শরণ লইতে হয়। এই প্রথা বাণিজ্যকে অনেক সময় সঙ্কটজনক করে বটে, কিন্তু এরূপ সঙ্কট অনতিক্রমণীয় নহে।

পক্ষান্তরে, পণ্য ও পরিচর্য্যার উপর স্বর্ণ-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের হানি ঘটে। ফলতঃ, স্বর্ণমানই জগতের তেজী ও মন্দা পরিস্থিতির নিমিত্ত দায়ী। স্বর্ণের মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিলে দ্রব্য-মূল্যের হ্রাস ঘটে, সুতরাং মন্দার সৃষ্টি করে। কোন দ্রব্য-মূল্যের স্থৈর্য্য তাহার চাহিদা ও যোগানের সমতার উপর নির্ভরশীল। খনি হইতে উত্তোলনের বাধা-বিপত্তি ও হ্রাস-বৃদ্ধি এবং কোন জাতি অথবা ব্যক্তিবর্গের গুপ্ত-সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উপর স্বর্ণের সরবরাহ নির্ভর করে। জগতের উৎপাদন শক্তি এবং অর্থ-প্রয়োজনে প্রাপ্তব্য স্বর্ণের পরিমাণ সর্ব্বদেশের শাসন-শক্তির আয়ত্ত-বহির্ভূত। স্বর্ণের চাহিদা ও যোগানের সহিত আন্তর্জ্জাতিক পণ্য এবং পরিচর্য্যার চাহিদা ও যোগান সম্পর্ক-শূন্য। সুতরাং স্বর্ণের ব্যবহার ব্যতীতও অর্থনৈতিক-পরিস্থিতি-সম্মত বিপর্য্যয় অপেক্ষা, পণ্য ও পরিচর্য্যার মূল্যের এবং তাহাদের চাহিদা ও যোগানের অধিকতর বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা এবং চল্‌তি মুদ্রার বৃদ্ধি, স্বর্ণের যোগান কিংবা তাহার মিতব্যবহারের তুলনায় অধিকতর অথবা অল্পতর হইতে পারে। কোন কোন দেশ কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে তাহাদের সরকারী অথবা ব্যাঙ্কের কোষাগারে প্রচুর স্বর্ণ নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় রাখিতে পারে। দেশের স্বর্ণ, দেশচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে, অধিকাংশ দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আয়ত্তান্তর্গত স্বর্ণকে "যখের ধনে" পরিণত করে। স্বর্ণের লোভ অতি প্রবল; সুতরাং শক্তি, অর্থ কিংবা অন্য উপায় দ্বারা জাতি ও ব্যক্তিমাত্রই স্বর্ণের সংস্থিতি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমানে, জগতের অধিকাংশ স্বর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারে।

ভারতের এই সম্পর্কে যথেষ্ট দুর্নাম আছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ প্রচুর স্বর্ণের আমদানী করিয়াছিল; কিন্তু ঐ বৎসর হইতে ভারত বহু স্বর্ণের রপ্তানী করিয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য স্বর্ণমান পরিত্যাগ করেন এবং টাকা ষ্টার্লিং-এর সহিত যুক্ত হয়। ভারতে এবং বিলাতে স্বর্ণের মূল্য অপরিসীমরূপে বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নিদারুণ মন্দা উপস্থিত হয়। লাভের লোভেই হউক, অথবা অর্থের অভাবেই হউক, যাহার ঘরে যতটুকু স্বর্ণ ছিল, ভারতবাসী তাহা বিক্রয় করে। অর্থ-নীতিবিদের দৃষ্টিতে ভারত হইতে এই স্বর্ণ রপ্তানী ভারতের জাতীয় সম্পদের হানিকর হইলেও ইহা সত্য যে, ভারত সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থায় প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছিল। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত তাহার স্বর্ণ-সংস্থিতির প্রায় শতকরা বিশ অংশ দেশান্তরিত করিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার বৈদেশিক ঋণভার বহুল পরিমাণে হাল্‌কা হইয়াছিল। ভারতে কত স্বর্ণ আছে, কেহ তাহা বলিতে পারে না; তবে ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরের আমদানী-রপ্তানীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই কালকে পাঠকের বিবেচনার সুবিধার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। ১৯০০-০১ হইতে ১৯৩০-৩১ একাদশ এবং ১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৮-৩৯ আট বৎসর।

	আমদানী		রপ্তানী	
	পরিমাণ ও মূল্য		পরিমাণ ও মূল্য	
	আউন্স (কোটি)	টাকা (ক্রোর)	আউন্স (কোটি)	টাকা (ক্রোর)
১৯০০-০১ হইতে ১৯৩০-৩১	১১˙৬৪	৭১৪˙৫০	২˙৭১	১৬৬˙৭৫
১৯৩১-৩২ " ১৯৩৮-৩৯	˙১৩	১০˙৭৮	৩˙৯৮	৩৮৮˙৪৮

নিখিল জগৎ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের তুলনায় ভারতের খনিজ স্বর্ণ-সম্পদ্ অতি অকিঞ্চিৎকর,—মাত্র ৩ লক্ষ আউন্স এবং তাহার স্বাভাবিক মূল্য ৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ, সম্পদ্ অপেক্ষা সংগ্রহ ও সঞ্চয় বহুলাংশে অধিক।

আর্থিক প্রয়োজনে নিখিল জগতের অর্থ স্বর্ণ (Monetary gold) সমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশ আইন-সঙ্গত নিম্নতম মজুত সংস্থিতি। বক্রী এক-তৃতীয়াংশ মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির মারফতে সচল, অর্থাৎ আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়। এই যে সতর্ক প্রহরি-পরিবৃত ভূগর্ভস্থ অন্ধকূপে চির-নিশ্চল স্বর্ণ-সম্ভার—ইহার মূল্য কি? স্বর্ণের পরিবর্ত্তে সোনালি ইট জমা রাখিয়া যদি তাহাকে স্বর্ণ মনে করা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? জন-সাধারণের মনে সম্পদ্-সমৃদ্ধি সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপাদন ও দৃঢ়ীকরণ ব্যতীত ইহার বাস্তব মূল্য কিছুই নাই। পরন্তু, এরূপ ক্ষেত্রে বহু ক্লেশে, বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া খনি হইতে উত্তোলন এবং সংস্কারের ব্যয় ও পরিশ্রম, অর্থনৈতিক সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে কিন্তু ইহাই আমাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে, যখনই বিশুদ্ধ (Orthodox) স্বর্ণমান অনুযায়ী কোন দেশের চল্‌তি মুদ্রাকে স্বর্ণের নিগড়ে বদ্ধ করা হয়, তখনই তাহার সমস্ত অর্থের, সুতরাং তাহার পণ্য ও পরিচর্য্যার বিনিময়-মূল্যকে পরিবর্তনশীল স্বর্ণ-মূল্যের সহিত পরিবর্ত্তনশীল করা হয়।

যখন স্বর্ণমান অনুযায়ী স্বর্ণের মূল্য কোন দেশের চল্‌তি মুদ্রাতে নিবদ্ধ করা হয়, তখন তাহার মূল্য হয় আপেক্ষিক অথবা অবাস্তব। ইহার যথার্থ মূল্য, পণ্য ও পরিচর্য্যা ক্রয় করিবার শক্তি। এইরূপ দেশে স্বর্ণের মূল্য এবং পণ্যও পরিচর্য্যা মূল্যের সাধারণ স্তর পরস্পরের প্রতিকূল, অর্থাৎ বিপরীত। স্বর্ণ মহার্ঘ হইলে, পণ্য ও পরিচর্য্যা সুলভ হয়; কারণ, স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইলে সেই স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত স্বর্ণমান-বিশিষ্ট দেশের চল্‌তি মুদ্রা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ পণ্য ও পরিচর্য্যা ক্রয় করিতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে, স্বর্ণ সুলভ হইলে পণ্য ও পরিচর্য্যা মহার্ঘ্য হয়। কোন দেশের চলতি মুদ্রার স্বর্ণ-মূল্য বৃদ্ধি পাইলে সেই দেশকে আমদানী-বাণিজ্যে প্ররোচনা দেয়, এবং ঐ মূল্য হ্রাস পাইলে, রপ্তানী বাণিজ্যে প্রবৃত্তি দেয়। সুতরাং পরোক্ষ ভাবে, দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যকে বিপর্য্যস্ত করে। ফলে, তেজী-মন্দার সৃষ্টি হয়।

যদি সর্ব্বজাতি সম্মিলিত ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে কোন নির্দ্দিষ্ট অথবা নির্দ্ধারিত নীতি অনুযায়ী স্বর্ণমানকে ক্রিয়াশীল করেন, তাহা হইলে সুফল প্রদান করিতে পারে। কিন্তু জাতিগত, ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় বালাই। পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ-সংঘর্ষে অকপট আচরণ —অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে—Playing the game—কি সম্ভব? বস্তুতঃ, জগতের নিখিল স্বর্ণ সম্পদকে সচল ও সক্রিয় করিতে হইবে; সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় ও নিরর্থক করিলে, অকপট আচরণের নিয়ম (Rules of the game) ভঙ্গ হইবে। জিঘাংসাপরায়ণ, অতিলোভী জাতিগুলির পক্ষে কি তাহা সম্ভব? আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি ও সমবায় জগতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—সর্ব্বাবস্থাতেই সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়। যখন পরম মিত্র যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার মধ্যে প্রবল পার্থক্য,—তখন অন্য জাতির কথা নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় স্বার্থ প্রায়ই আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীর পরিপন্থী!

আমরা আর একটি মাত্র কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। যদি স্বর্ণমানকেই পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে স্বর্ণ-বাট-মানই শ্রেয়স্কর। জাতীয় চল্‌তি মুদ্রা প্রকরণে স্বর্ণমুদ্রার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আভ্যন্তরীণ চল্‌তি মুদ্রার নিমিত্ত বৈদেশিক বিনিময়-সংস্থিতিও (Holdings of foreign exchange as reseves for domestic currency) নিষ্প্রয়োজন। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এ সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। বিলাতে ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে "ট্রেজারি" নোট চলিয়াছিল এবং তজ্জন্য আইন অনুযায়ী স্বর্ণের মজুত সংস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। স্বর্ণ-মুদ্রার প্রচলন এখন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং নিত্য-নৈমিত্তিক আদান-প্রদান কাগজের নোটে চলিতেছে; পরন্তু, এই কাগজের নোটের পশ্চাতে মজুত-স্বর্ণ অতি সামান্য; অধিকাংশই ঋৎ-হুণ্ডী প্রভৃতি (Securities)। হিল্টন-ইয়ং তদন্ত সমিতি অতি সমীচীন যুক্তি দ্বারা স্বর্ণ-বাট-মান সমর্থন করিয়াছিলেন। সে যুক্তির সারবত্তা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

স্বর্ণলুব্ধ জগতের অধিকাংশ জাতিই স্বর্ণমানের পক্ষপাতী, সুতরাং স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল; কিন্তু স্বর্ণমান লীলা-চঞ্চল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতিস্মর

অলকনন্দা-তীরেতে একটি বাড়ী,—
তুহিনের ভয়ে অতিথি হলাম তা'রি।
শ্যামল মাধবী. আঙিনা ফেলেছে ছেয়ে,
বাড়ী ভরে আছে ফুল ফল ছেলে মেয়ে,
সে কি পবিত্র, সে কি সুন্দর মুখ—
গোটা পাহাড়ের সুষমার যৌতুক।
আত্মীয়তায় মনে হলো সারারাত,
একটা জন্ম কেটেছে ওদের সাথ।

একদা প্রভাতে অচেনা পথেতে যেতে,
বিশাল সায়র পড়িল সম্মুখেতে।
রৌপ্যশুভ্র উতল সফরীগুলি
লাফায়ে উঠিছে রবি-করে চঞ্চলি।
ফুটে আছে নীরে শুভ্র পদ্মফুল।
চেনা মুখ বলি হইল আমার ভুল।
দুলিছে কমল, সরোবরে উঠে ঢেউ—
মনে হলো ছিনু আমি উহাদেরি কেউ।

একদা নিশীথে স্তব্ধ মৌন সব—
চমকি উঠিনু শুনিয়া বংশী-রব।
যত মধু, তত বিষ যে মাখানো সুরে।
দূর কাছে আনে, নিকটকে দেয় দূরে।
অসহনীয় ব্যথা, অসহ আনন্দ,
নিশ্বাস মেরে করে যেন বন্ধ!
বংশীর গানে ফিরে পেলো যেন হিয়া
দূর জন্মে যা গিয়াছিনু যক দিয়া।

ওই ধ্রুবলোকে করিয়াছি আমি বাস,
রশ্মিতে তার এখনো পাই আভাস।
মিটি-মিটি আলো ওই যে আকাশ-জোড়া,
সুদূর স্মৃতির আলোক-চিত্র ওরা।
আমি অতিক্ষীণ প্রাণময় জ্যোতিঃ যাঁর
যত দূরে থাকি, কাছ-ছাড়া নই তাঁর।
অবিচ্ছিন্ন আমি নহি তাঁর পর
ইহাই আমারে করে যে জাতিস্মর।

কভু যমুনার, কভু সরযূর তীরে,
নারায়ণে আমি হেরেছি নরের ভিড়ে।
ভিক্ষু হইয়া ছিলাম অজন্তাতে,
সোমনাথে আমি লড়েছি পাঠান সাথে।
নিরঞ্জনার তীরে করিয়াছি দান,
মহাপথে আমি করিয়াছি প্রস্থান।
ত্যাগ করি দেহ আমিই কাম্য-কূপে,
গিয়েছি এসেছি হেথা নব নব রূপে।

সুন্দর আমি যাহা কিছু দেখি ভবে
মোর দৃষ্টির কস্ লাগিয়াছে সবে।
রয়েছে ধরার সকল সুরভি জুড়ি,
আমার বুকের প্রণয়ের কস্তুরী।
সকল সলিলে আমার অঙ্গবাস,
সব সমীরণে আমারি যে নিশ্বাস।
ঘন অনুভূতি দেয় মোরে সন্ধান
সকল প্রাণেই রয়েছে আমার প্রাণ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

এ যুদ্ধে অন্নে-বস্ত্রে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অর্থাৎ সকল দিকেই টান পড়িয়াছে! যে-সব জাতি যুদ্ধ করিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে কামান গোলা গুলী বারুদ এরোপ্লেন পাঠাইলেই তাদের কর্তব্য সিদ্ধ হইবার নয়! যে কোটি কোটি লোক ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া যুদ্ধ করিতেছে, নিত্য-নিয়মিত ভাবে তাদের অন্ন-বস্ত্র জোগানো, খাদ্য জোগানো,

ফর্ম্মে-লেখা চিঠির ফটো

আত্মীয়-স্বজনের কুশলাদি সংবাদ-সম্বলিত পত্র পাঠানো চাই। এ সব ব্যাপারেও যুধ্যমান জাতিসমূহের কার্য্যতৎপরতার আজ সীমা নাই। জিনিষপত্র এমন ভাবে পাঠানো চাই যে, সেগুলি সুনিশ্চিত ভাবে এবং যথাসম্ভব সত্বর যেন পৌঁছায়! নচেৎ বিলম্ব ঘটিলে কার্য্যহানি
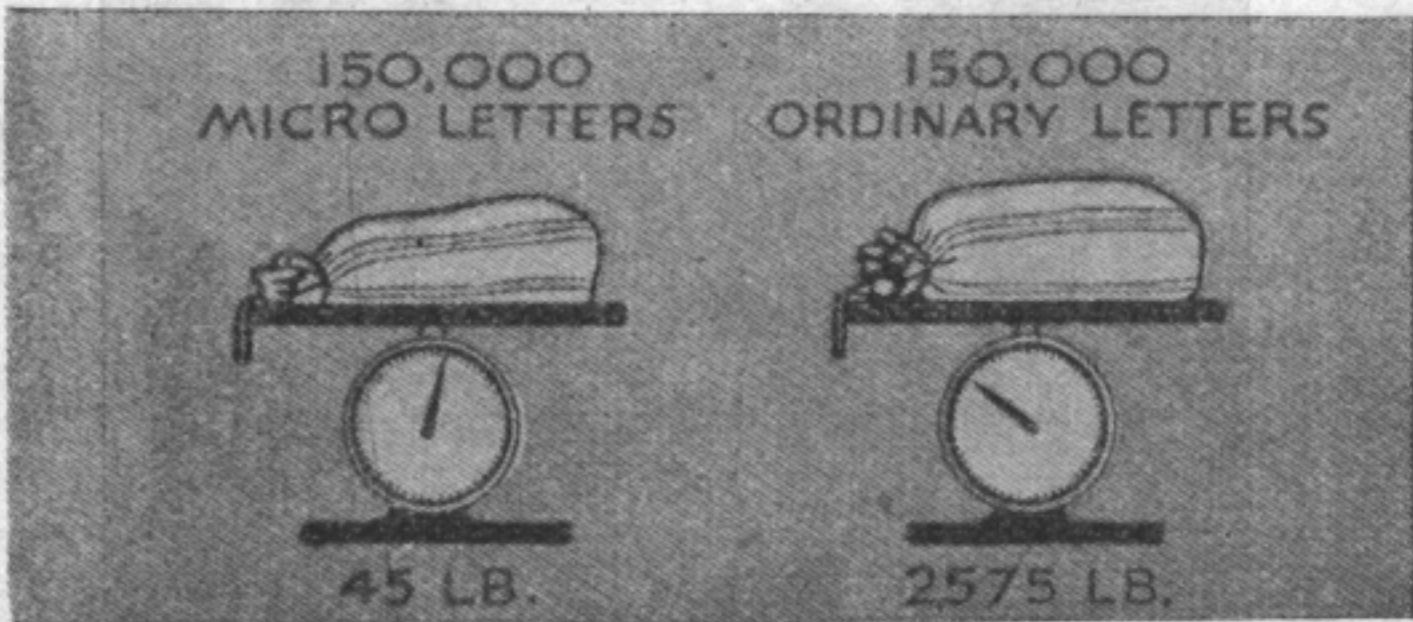
ছোট ব্যাগে চিঠির সংখ্যা দেড় লক্ষ!

এবং বিপত্তি। এ জন্য আমেরিকার ডাক-বিভাগে সংক্ষেপ ও বিচিত্র সঙ্কেত-রীতির প্রচলন হইয়াছে। অর্থাৎ বড় চিঠি লিখিয়া সকল সংবাদ পাঠাইতে চাই—কিন্তু বড় প্যাকেট ডাকে পাঠাইতে নানা অসুবিধা! সে জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে—ডাক-ঘরে বিশেষ ফর্ম্ম আছে; সে ফর্ম্ম চাহিলেই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সেই ফর্ম্মে চিঠি লিখিয়া ডাকঘরে দিলে সে-চিঠির তারা ফটো তোলে—১৬ মিলিমাম্ মাইক্রো-ফিল্মে; তুলিয়া সেই ফটো এনলার্জ করিয়া মেইল-ব্যাগে ভরিয়া বিমান-ডাকে পাঠানো হয়। ইহাতে খরচ পড়ে কম এবং ডাক শীঘ্র যায়। এ ফর্ম্মে-লেখা চিঠি অষ্ট্রেলিয়া-আমেরিকায় যাতায়াতে সময় লাগে আট দিন—ইংলণ্ড-আমেরিকায় যাতায়াতে সময় লাগে ছয় দিন। বিমান-চালক যদি মারা যায়, তবু চিঠি মারা যাইবার ভয় নাই! কারণ, চিঠির মূল-নেগেটিভ থাকে যে ডাক-ঘর হইতে চিঠি পাঠানো হয়, সেই ডাক-ঘরে। একশো ফুট দীর্ঘ ফিল্মে দেড় হাজার চিঠির ফটো তোলা চলে। আমেরিকা এবং য়ুরোপ হইতে এমনি ফটো-চিঠি ভারতে এখন নিত্য অজস্র সংখ্যায় বিলি হইতেছে।

প্যারাশুট-উর্দ্দী

শূন্যপথের উড়ন্ত প্লেন হইতে ঝাঁপ দিবার জন্য প্যারাশুটের ব্যবস্থা বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। সে ব্যবস্থায় অনর্থ না ঘটে, এমন নয়। প্যারাশুট-যাত্রীর পোষাকের কিম্বা প্যারাশুটের গলদে মহা বিপত্তি ঘটিবার আশঙ্কা ছিল খুবই। সম্প্রতি মার্কিণ বিমান-বিভাগ এক-রকম জ্যাকেট তৈয়ারী করিয়াছে—তাহার নাম প্যারাশুট-জ্যাকেট। প্যারাশুট-যাত্রী এ জ্যাকেট আঁটিয়া

প্যারাশুট-জ্যাকেট

শূন্যমার্গ হইতে অনায়াসে এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে ঝাঁপ খাইতে পারেন—জামার রচনা-কৌশলে এতটুকু বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই! তাছাড়া এ জ্যাকেট গায়ে দিয়া নড়ায়-চড়ায় যেমন বাধা বা অসুবিধা ঘটে না, তেমনি নিজের অবস্থান সম্বন্ধেও এতটুকু অনিশ্চয়তার আশঙ্কা নাই।

নকল মণি

প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার বাজারে নকল হীরা আসিয়া টেট্‌স্ ডায়ামণ্ড নামে দেখা দিয়াছিল। সে হীরার ক্ষণ-দীপ্তিতে ভুলিয়া এখানকার বহু ভদ্র নর-নারী অনেক পয়সা দিয়া সে
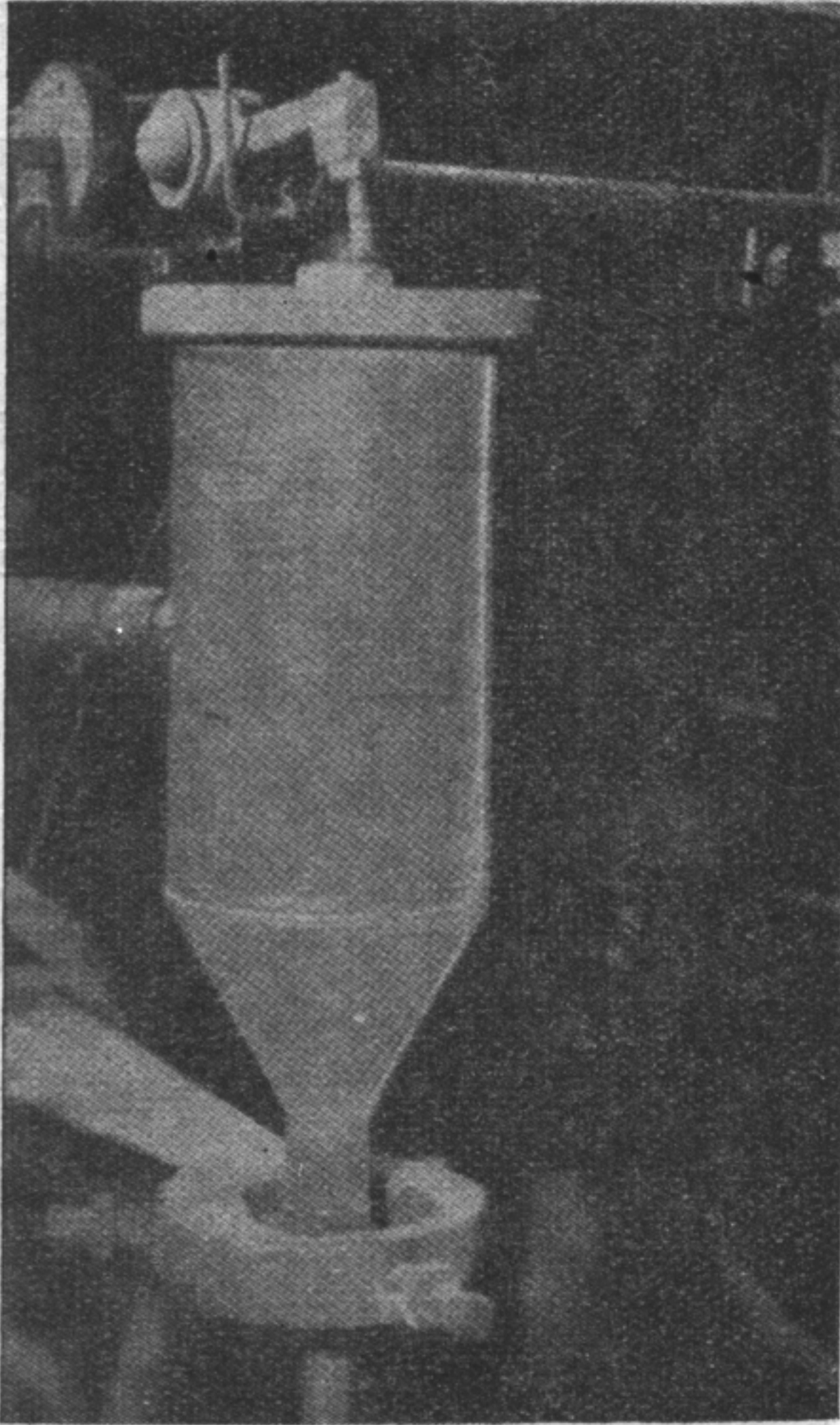
নকল মণি তৈয়ারীর যন্ত্র

সব নকল হীরা কিনিয়া পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন! আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে ভেল্কিদারের ফাঁকি-বাজিতে নয়,
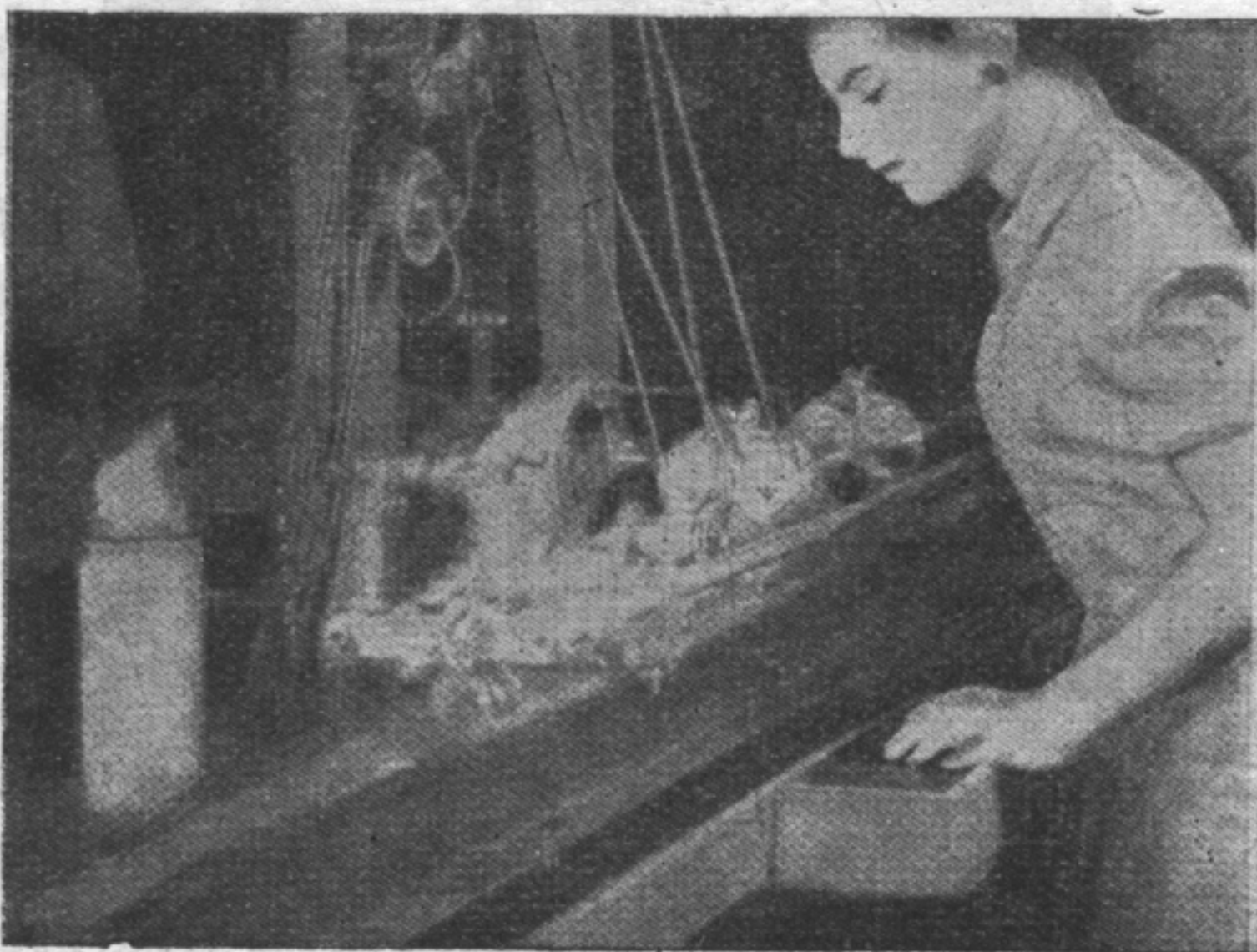
নকল মণির পালিশ

বৈজ্ঞানিকের সাধনায় নানা-রকমের নকল মণিরত্ন আবার তৈয়ারী হইতেছে। এই সব নকল মণি-মুক্তার রচনা-ব্যাপারে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাধনা আছে, তাহা উপেক্ষার বা অবজ্ঞার বিষয় নয়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, ইন্দ্রনীল মণি বা নীলায় এবং চুণীতে আছে এ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড। আগ্নেয়-গিরির তাপে এবং চাপে বসুন্ধরা তাঁর আগ্নেয়-গিরি-নামক ল্যাবরেটরিতে চুণী ও নীলা তৈয়ারী করেন। সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বাষ্পের সংযোগে নানা ধাতু তপ্ত করিয়া বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শুধু নীলা ও চুণী নয়, হীরা-মুক্তাও বৈজ্ঞানিকেরা তৈয়ারী করিতেছেন। এ বিদ্যায় সুইজার-ল্যাণ্ডের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। ঘড়িতে ব্যবহারের জন্য সেখানে এই সব নকল মণিরত্ন অজস্র ভাবে প্রস্তুত হইতেছে। সেখানকার এক একটি ল্যাবরেটরিতে দিনে দু'লক্ষ ক্যারাট্ মণি-রত্ন তৈয়ারী হইতেছে। এ সব মণি-রত্নের জন্ম হইবামাত্র নানা শিল্পী কাটিয়া বিঁধিয়া নানা প্রক্রিয়ায় সেগুলিকে যথাযথ রূপে-বেশে সুসম্পন্ন করিয়া তোলেন। এ-সব নকল মণি-মুক্তা একেবারে ভুয়া নয় এবং কোনোটির দীপ্তিই ক্ষণেকের নয়!

কাগজী কাপড়

কাগজ পাকাইয়া জ্বাল দিয়া তাহার মণ্ড হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মার্কিণ বৈজ্ঞানিকের দল অধুনা যে-কাপড় তৈয়ারী করিতেছেন, দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না! কাগজ হইতে তৈয়ারী এই কাপড় রীতিমত মজবুত এবং এ-কাপড়ে যে-সব ব্যাগের সৃষ্টি হইতেছে, ভার বহিবার এবং সহিবার সামর্থ্যও
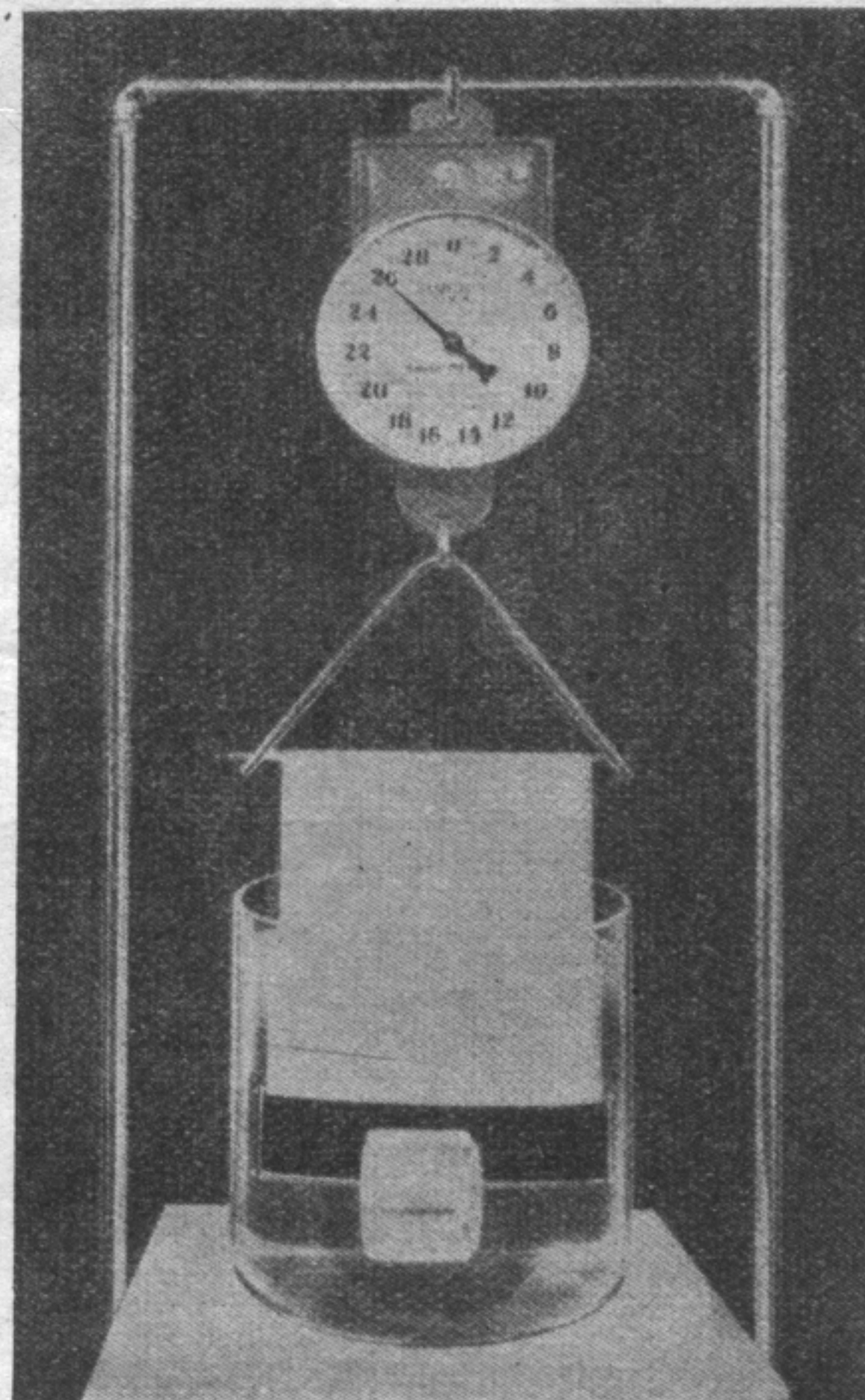
কাগজী-কাপড়ের ব্যাগে ১৩ সের ওজনের ভার

সে সব ব্যাগের অপরিসীম। একরাশ কাগজের শীট্ প্রথমে দু'-চারি দিন জলে ভিজাইয়া রাখা হয়; তার পর সেই ভিজা কাগজ চটকাইয়া

মণ্ড পাকাইয়া বিশেষ রাসায়নিক দ্রাবকে তাহা ডুবাইয়া লইলেই কাগজের পল্‌কা তন্তুগুলি (fibres) বেশ সুদৃঢ়, মজবুত এবং শীট্-বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হয়। এই কাগজী কাপড়ে আমেরিকা এখন তৈয়ারী করিতেছে তোয়ালে, তরী-তরকারী প্রভৃতি বহিবার ব্যাগ, বালিশের ওয়াড়, পর্দ্দা প্রভৃতি রকমারী গৃহস্থালী দ্রব্য। এ কাগজের নাম "এ্যাকোয়ালাইজ" (aqualized) কাগজ। এক-একখানি কাগজের শীট এমন মজবুত হয় যে, তাহাতে পুঁটলি বাঁধিয়া তেরো-চৌদ্দ সের ওজনের জিনিষপত্র অনায়াসে বহন করা চলে।

বিমান-ট্যাঙ্ক

এবারকার যুদ্ধে ব্রিটিশ ব্রিষ্টল বো-ফাইটার নামে এক নূতন জাতের বিমান-ট্যাঙ্ক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ ট্যাঙ্ক একেবারে ভস্মলোচনের মত বিপক্ষ-পক্ষকে দগ্ধ-ভস্ম করিয়া দিতেছে! সাধারণ প্লেনে
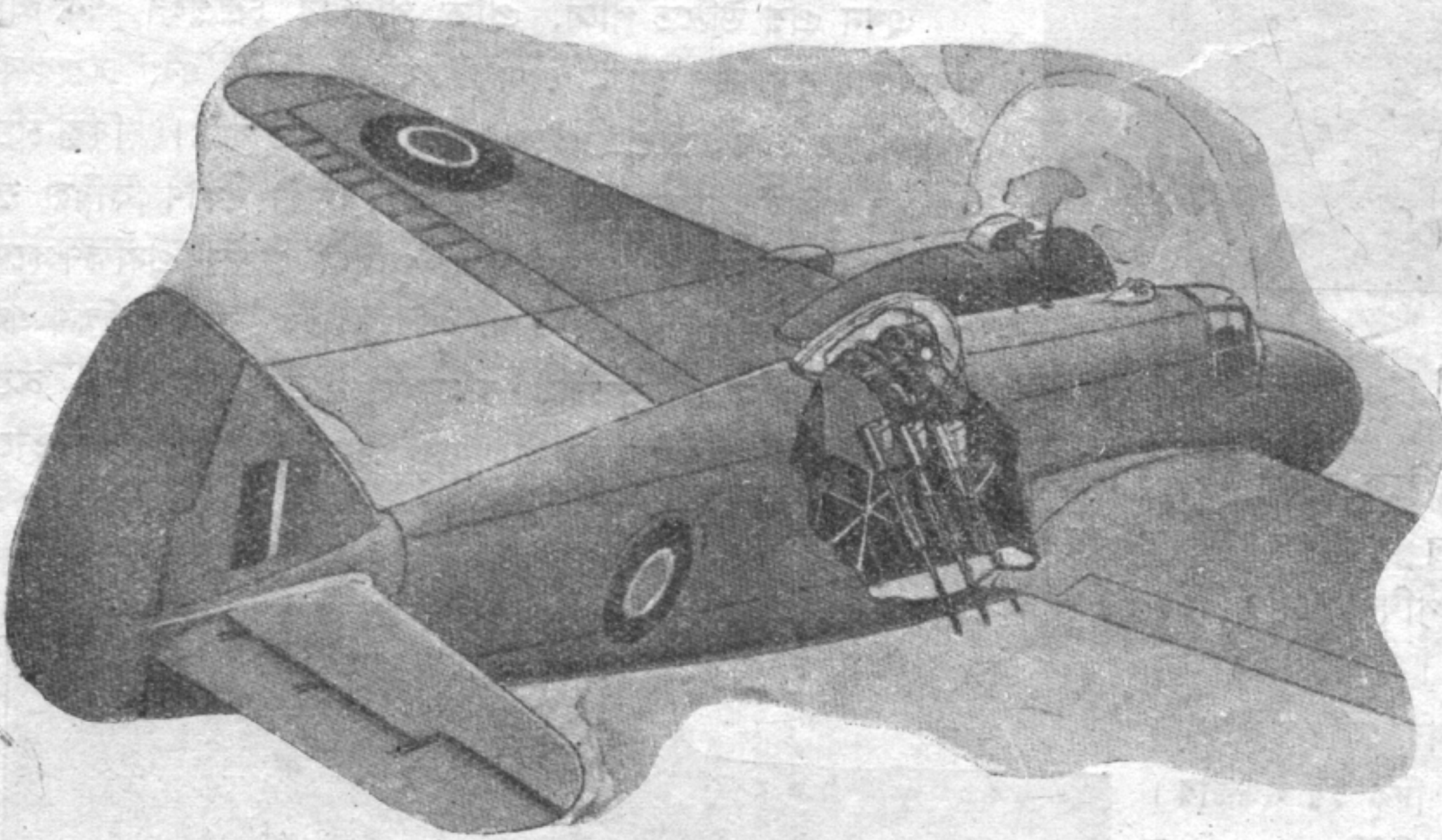
ব্রিটিশ বো-ফাইটার

এ্যান্টি-ট্যাঙ্ক-কামানের ব্যাটারি সংযুক্ত; এবং সেগুলিকে সংলগ্ন করা হইয়াছে নিম্নমুখী ভাবে—তাহার ফলে শূন্যপথে বিচরণ-কালে নীচে তাগ করিয়া এ ট্যাঙ্কের অস্ত্রধারী যাত্রী সারি-সারি অগ্নিবর্ষণে সমর্থ! সে অগ্নির হাতে রক্ষা পাইবে, এমন ব্যবস্থা এখনো বিপক্ষ-পক্ষের কল্পনাতীত!

পাত্র-শোধন

এলুমিনিয়ামের প্যান, কেটলি, পেয়ালা, গ্লাস প্রভৃতির ভিতর-গায়ে যদি গুঁড়া-চূণের মত এলুমিনিয়াম-চূর্ণ জমিতে থাকে, তাহা হইলে এক কাজ করিবেন,—পাত্রমধ্যে জল না দিয়া আগুনের তাপে বেশ করিয়া পাত্রটিকে তাতাইবেন; তার পর পাত্রটি উপুড় করিয়া তার গায়ে কাঠের হাতা বা বেলুন দিয়া ধীরে ধীরে ঘা দিবেন—দেখিবেন, এলুমিনিয়ামের গায়ের জীর্ণ অংশ ঝরিয়া যাইবে! তার পর পাত্রমধ্যে আর গুঁড়া জমিবে না।

এলুমিনিয়ামের প্যান-শোধন

নূতন মার্কিণ-ট্যাঙ্ক

জোড়া-তালি না দিয়া, স্ক্রু-পেরেকের প্যাঁচ না আঁটিয়া পূরাপূরি কাষ্টিং করিয়া মার্কিণ সমর-বিভাগ "জেনারেল লী" নামে নূতন প্যাটার্ণের স্থল-ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিয়াছে। এ ট্যাঙ্কের শক্তি চলিত-ট্যাঙ্কসমূহের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। অখণ্ড ধাতব শীটে তৈয়ারী বলিয়া এ ট্যাঙ্কে সহজে যেমন ভাঙচুর ঘটে না, তেমনি এ ট্যাঙ্কের দেহকে বিপক্ষের অস্ত্রও সহজে বিঁধিতে পারে না।

নূতন মার্কিণ ট্যাঙ্ক

গ্রহণ

সরল রেখায় আলোক-রশ্মির গতি-পথ। যদি কোন ঘন (opaque) বস্তু গতি-পথের সামনে পড়ে, তবে পিছন-দিকে তার ছায়াপাত হইবে। ছায়াটি ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করিলে দেখিব, মধ্য-ভাগ ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং দু'পাশে আধ-আলো আধ-ছায়া-ভাব।
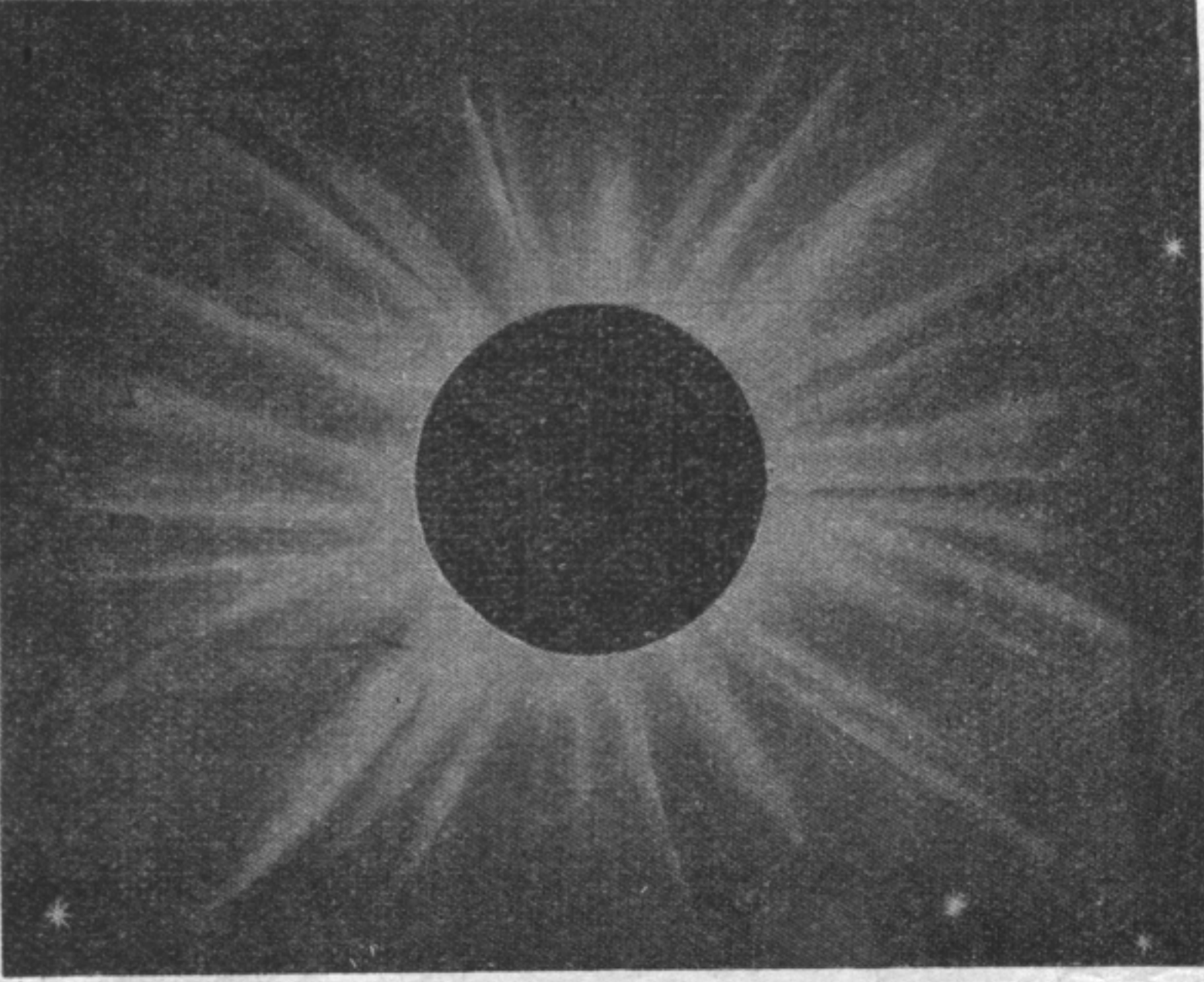
সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস

আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করি, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায় এবং পর-দিন সকালে আবার পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। ইহা হইতে স্বতঃই ধারণা হয় যে, সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে! ব্যাপার কিন্তু আসলে তা নয়। আলোর সামনে একটি ঘন (opaque) বল রাখিলে তার যে-দিক্ আলোর দিকে, সেই দিক্ আলোকিত এবং অপর দিক্ হয় অন্ধকার। এখন বলটিকে যদি একটি লৌহ-শলাকায় বিঁধিয়া অক্ষদণ্ডের (axis) উপর ঘুরানো হয়, তবে বলের প্রত্যেক বিন্দুটি অর্দ্ধ-কাল আলোয় এবং অর্দ্ধ-কাল অন্ধকারে থাকিবে। এই অক্ষদণ্ডটি যদি পৃথিবীর কক্ষতলের উপর লম্বালম্বি ভাবে একটু হেলানো-অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে আলোয় এবং অন্ধকারে থাকার সময় ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে। আলো সূর্য্য এবং বলটি আমাদের পৃথিবী। এই ঘোরার (rotation) জন্যই দিন ও রাত্রির সৃষ্টি।

ইহা ছাড়া পৃথিবীর আর একটি গতি আছে। ঘুরিবার সময় লাটু যেমন অক্ষদণ্ডের উপর ঘোরে তা ছাড়া অগ্রসর হইয়া চলে, পৃথিবীও তেমনই ঘুরিতে ঘুরিতে আগাইয়া চলে; এবং এক বছরে সেকণ্ডে প্রায় ১৮॥ মাইল বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবার সে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই গতি-পথের নাম কক্ষ। পথটি প্রায় বৃত্তাকার এবং সূর্য্য এই কক্ষের প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত।

পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে এক-বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীকে প্রায় এক মাসে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পৃথিবী সূর্য্যের ভৃত্য; গ্রহ আর চন্দ্র পৃথিবীর ভৃত্য—উপগ্রহ। পৃথিবীর ও চন্দ্রের নিজস্ব আলো নাই, সূর্য্যের আলোয় তারা আলোকিত হয়।

চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবী সমসূত্রে অবস্থান করিলে তবেই 'গ্রহণ' সম্ভব। সে ক্ষেত্রে পৃথিবী যদি চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থান করে, তখন সূর্য্যের আলো ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া চন্দ্রে পড়িতে পারে না অর্থাৎ পৃথিবীর গোলাকার ছায়া চন্দ্রকে গ্রাস করে; তেমনি আবার চন্দ্র যখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে আসিয়া পড়ে, সে সময়ে যদি পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্য একই সরল রেখায় থাকে, তাহা হইলে চন্দ্রকে ভেদ করিয়া সূর্য্যের আলো পৃথিবী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, ফলে সূর্য্যগ্রহণ হয়। পূর্ণিমার দিন ছাড়া চন্দ্রগ্রহণ ও অমাবস্যার দিন ছাড়া সূর্য্য-গ্রহণ সম্ভব নয়; কারণ, কেবল সেই দুই দিনই সূর্য্য পৃথিবী এবং চন্দ্র একই সরল রেখায় অবস্থান করে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ এবং প্রতি অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ হয় না কেন? যদি পৃথিবী এবং চন্দ্রের কক্ষ সমতলস্থিত হইত, তাহা হইলে তাহাই ঘটিত বটে। কিন্তু চন্দ্রের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় ৫ ডিগ্রী কোণ করিয়া সূর্য্য পৃথিবীর কক্ষতলের ও কেন্দ্রে এবং পৃথিবী চন্দ্রের প্রদক্ষিণ-কক্ষের কেন্দ্রে অবস্থিত। অতএব চন্দ্র, পৃথিবী এবং সূর্য্য সর্ব্বক্ষণ একই সমতলে থাকে না। সুতরাং এক সরলরেখাতেও থাকে না। চন্দ্রের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষতলকে দুই বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। তাহাদের নাম রাহু এবং কেতু (Nodes)। গ্রহণের জন্য চন্দ্রকে এই দুই বিন্দুর একটিতে কিংবা তার খুবই নিকটে অবস্থান করিতে হইবে। এবং সেই সময়ে পৃথিবী যদি সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যে একই সরল রেখায় থাকিয়া ছায়াকোণের সৃষ্টি করে এবং পূর্ণচন্দ্র সেই ছায়াকোণের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র যদি পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে থাকিয়া সূর্য্যের আলো পৃথিবী অবধি পৌঁছিতে না
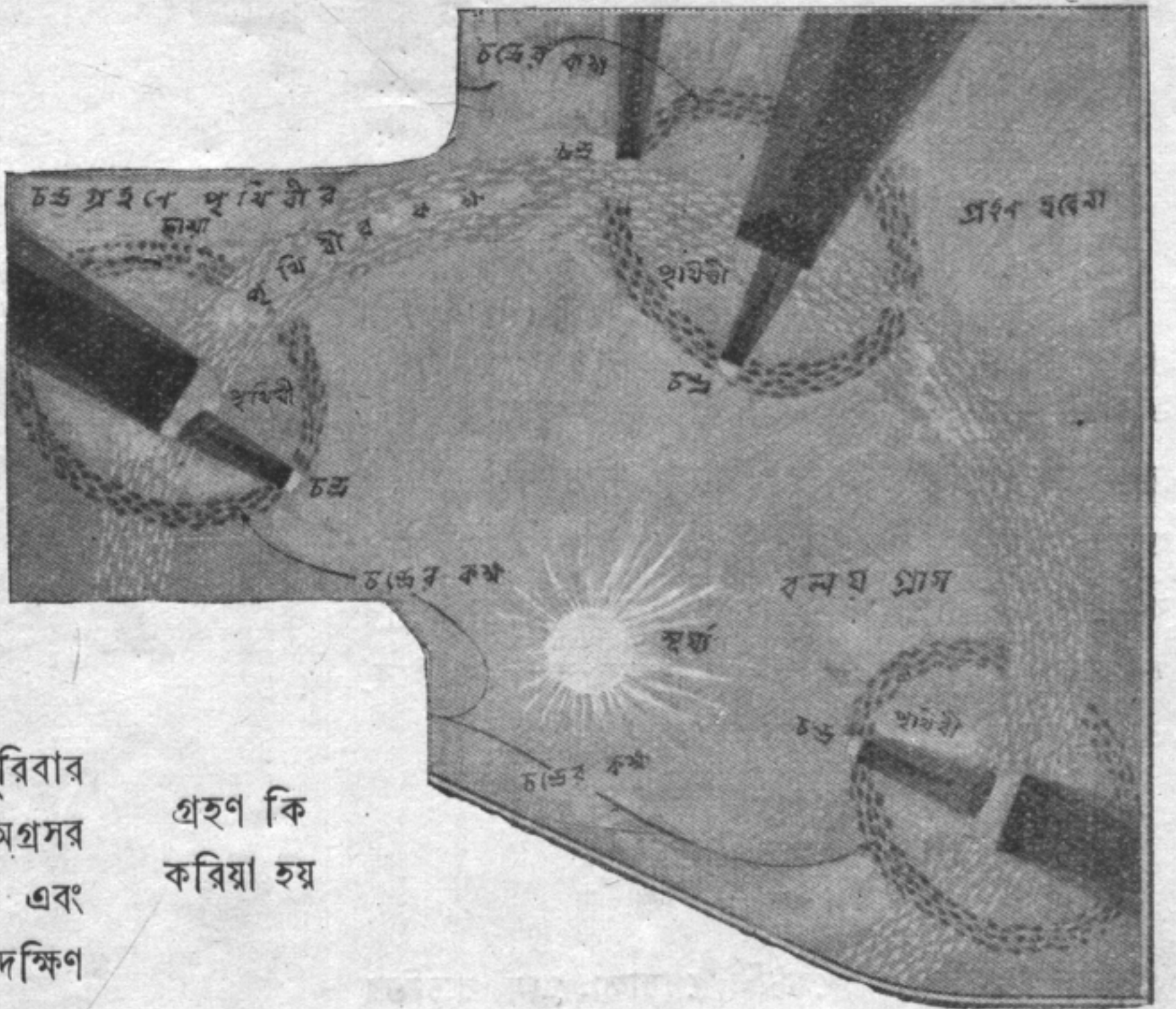
গ্রহণ কি করিয়া হয়

দেয় এবং সে সময় যদি অমাবস্যা থাকে, তবে সূর্য্যগ্রহণ হয়। সাধারণ লোকের ধারণা—সূর্য্য অথবা চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে! চন্দ্রগ্রহণ

চন্দ্রের কলা

দু'-রকম পূর্ণ অথবা আংশিক। সূর্য্যগ্রহণ কিন্তু তিন প্রকারের—পূর্ণ, আংশিক এবং বলয়গ্রাস (annular)।

ছবিতে দেখিতেছি, চন্দ্র যখন প্রদক্ষিণ-কক্ষের 'ক' বিন্দু হইতে 'খ' বিন্দুতে যায় তখন সূর্য্যগ্রহণ হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ক খ অপেক্ষা গ ঘ বৃত্তাংশ বড়; অতএব চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্যগ্রহণের সম্ভাবনা বেশী। হয়ও তাই। কথাটা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না; কারণ সকলেই সূর্য্যগ্রহণ অপেক্ষা চন্দ্রগ্রহণই বেশী দেখিয়া থাকেন। কারণ অতি সহজ। চন্দ্রগ্রহণ হয় চন্দ্র যখন পৃথিবীর পশ্চাতে ছায়া-কোণে প্রবেশ করে। পৃথিবীর অর্দ্ধাংশের মুখ সূর্য্যের দিকে ও বাকী অর্দ্ধাংশের মুখ চন্দ্রের দিকে। যে অর্দ্ধাংশস্থিত লোক সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আছে, তাদের এখন দিন; অপরাংশে রাত্রি। তারা পূর্ণচন্দ্র দেখিতেছিল, হঠাৎ চন্দ্র ছায়াকোণে প্রবেশ করাতে চন্দ্রগ্রহণ ঘটিল। পৃথিবীর অর্দ্ধেক-অধিবাসী একসঙ্গে চন্দ্রগ্রহণ দেখিল; কিন্তু সূর্য্য-গ্রহণের সময় ঠিক তাহা ঘটে না। চন্দ্র পৃথিবীর চেয়ে আকারে ছোট এবং পৃথিবী সূর্য্যের চেয়ে ছোট, অতএব চন্দ্র সূর্য্যের চেয়ে আকারে অনেক-বেশী ছোট; এবং তার ছায়াকোণও অত্যন্ত ছোট। সূর্য্যের দিকে
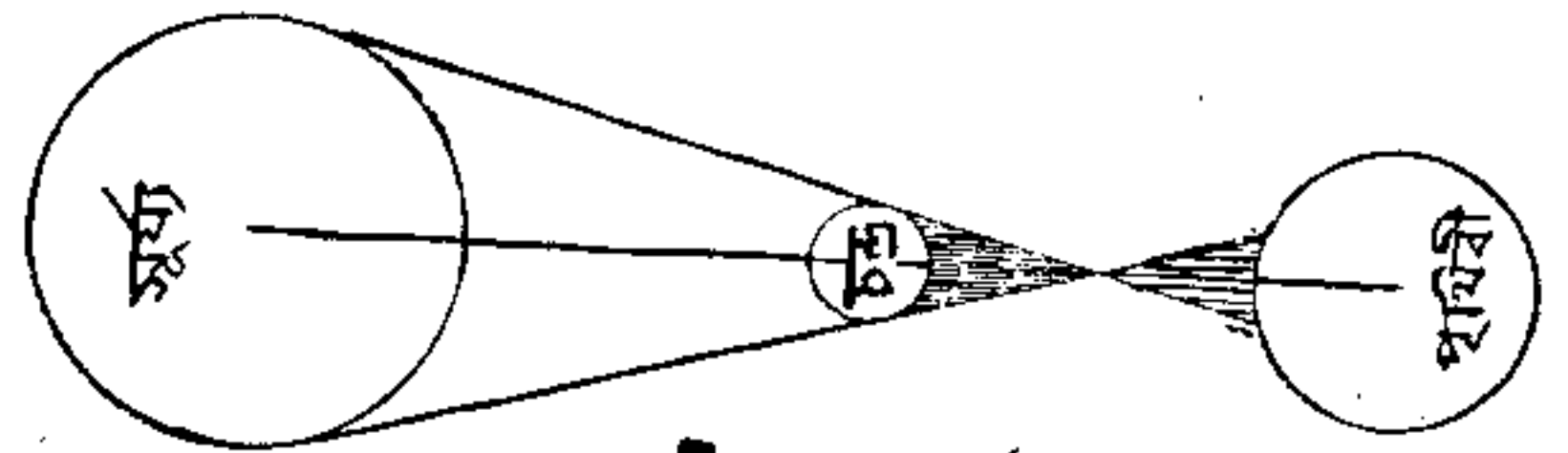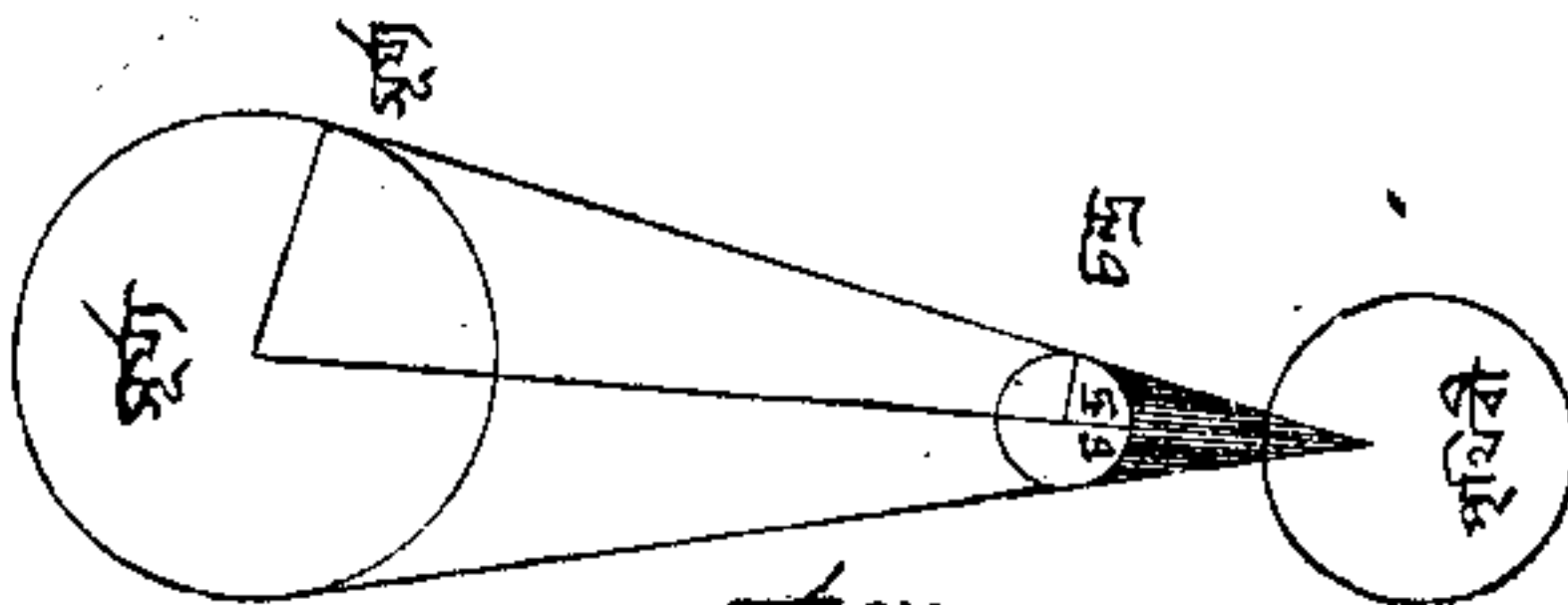
সূর্য্যগ্রহণ হবে

পৃথিবীর যে অর্দ্ধেক-অধিবাসীর মুখ করা ছিল, তারা সকলেই একসঙ্গে ছায়া-কোণের মধ্যে পড়িল না,—মাত্র এক-অংশ ছায়াতে পড়িল। যারা পড়িল, তারাই শুধু সূর্য্যগ্রহণ দেখিল; অবশিষ্ট লোক দেখিতে পাইল না। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে কোন এক স্থান হইতে সূর্য্য-গ্রহণের চেয়ে চন্দ্রগ্রহণ দেখিবার সম্ভাবনা বেশী। যদিও পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের হিসাব কষিলে চন্দ্রগ্রহণের চেয়ে সূর্য্যগ্রহণের সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যাইবে।

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রের সময় লাগে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট। ততক্ষণে পৃথিবীও একটু অগ্রসর হইয়াছে। কারণ, তাকেও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে হইয়াছে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায়। সুতরাং পৃথিবীর অধিবাসীদের মনে হয়, এক স্থান হইতে যাত্রা সুরু করিয়া চন্দ্রের পক্ষে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে সময় লাগিতেছে সাড়ে উনত্রিশ দিন। অর্থাৎ চন্দ্রের এক কলা (যেমন পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা) হইতে পুনরায় সেই কলা আসে সাড়ে উনত্রিশ দিন পরে! এই সময়কে চান্দ্রমাস বলে। চন্দ্র এবং পৃথিবীর কক্ষ যে দুই বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে (রাহু এবং কেতু) সেই দুই বিন্দুও স্থির নয়; বছরে ১৯° করিয়া পিছু হঠে অর্থাৎ ১৮ বছর ৮ মাসে উল্টো দিকে একটা সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করে। সেই জন্য উক্ত বিন্দুদ্বয় দ্বারা যদি বছরের হিসাব কষা যায়, তাহা হইলে দিনসংখ্যা কমিয়া যাইবে। কারণ, সেই স্থানে পৃথিবীর আসিবার পূর্ব্বেই রাহু অথবা কেতু আগাইয়া গিয়া পৃথিবীকে ধরিয়া ফেলে। তাহাতে বছর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টার স্থানে বছর সম্পূর্ণ হইয়া যায় ৩৪৬ দিন ৭ মাসে। প্রথমটিকে সৌর বৎসর এবং দ্বিতীয়টিকে চান্দ্র বৎসর বলে। এক মাসে ২৯½ দিনে সূর্য্য এই বিন্দু হইতে প্রায় ৩০½ ডিগ্রী সরিয়া যায়।

সূর্য্যগ্রহণ হবে না

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর এবং পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যত বেশী হইবে, পৃথিবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী ছায়া-কোণও তত দীর্ঘ হইবে। সুতরাং চন্দ্রের এই ছায়া-কোণে প্রবেশ অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনাও তত বেশী হইবে। সেই সময় চন্দ্র যদি পৃথিবীর খুব নিকটে অবস্থান করে, তবে চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনা আরও বেশী বাড়িবে। চন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষ-তলের মধ্যের কোণও পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং ইহার উপর যদি এই কোণটিও সেই সময় ছোট হয়, তাহা হইলে আর কথাই নাই! এই সব নিয়মগুলিই চন্দ্রগ্রহণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা। এই নিয়মগুলি পালিত হইলে যদি গ্রহণ হয়, তবে এ-কথা জোর করিয়া বলা চলে না যে, ইহার দু'-একটা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও গ্রহণ হইবে! রাহু অথবা কেতু হইতে পৃথিবীর ছায়ার মধ্যবিন্দুর দূরত্বকে গ্রহণ-সীমা (ecliptic limit) বলে। সব কথাগুলিই যদি চন্দ্র-গ্রহণের অনুকূল বলিয়া ধরা যায়, তবে এই দূরত্বকে শ্রেয়ঃ চন্দ্রগ্রহণ-সীমা (major ecliptic limit) এবং সবই যদি বিপরীত হয়, তবে এই দূরত্বকে হেয় চন্দ্রগ্রহণ-সীমা (minor ecliptic limit) বলা হয়। ঠিক এইরূপ শ্রেয়ঃ এবং হেয় গ্রহণ-সীমা সূর্য্যেরও আছে। হেয় সীমার মধ্যে সূর্য্য অথবা চন্দ্র অবস্থান করিলে গ্রহণ হইবেই

কিন্তু শ্রেয়ঃ সীমার মধ্যে থাকিলে গ্রহণ হইতে পারে, আবার না হইতেও পারে। যেমন পরীক্ষার আগে কোন ছাত্র কোন মতে প্রশ্নপত্র জানিতে পারিয়া উত্তর মুখস্থ করিয়া পকেটে নোট করিয়া লইয়া যায় এবং পরীক্ষার হলে সকলের চোখ এড়াইয়া খাতা লিখিয়া যদি পাশ করে, তবে এই সব ব্যাপারগুলির মধ্যে দু'-একটি ফাঁশিয়া গেলেই তার পাশ করার সম্ভাবনা একেবারে নিঃশেষ হয়! কিন্তু কোন ছাত্র যদি উপরিউক্ত কোন রকম সুবিধা না পাইয়াও পাশ করে, তবে কোনরূপ সুবিধা পাইলেও সে পাশ করিবেই!

বছরে দুইটি সূর্য্যগ্রহণ হইবেই, চন্দ্রগ্রহণ অবশ্য একটিও না হইতে পারে। কিন্তু যদি সুযোগ ও সুবিধা মেলে, তবে একই বছরে সাত
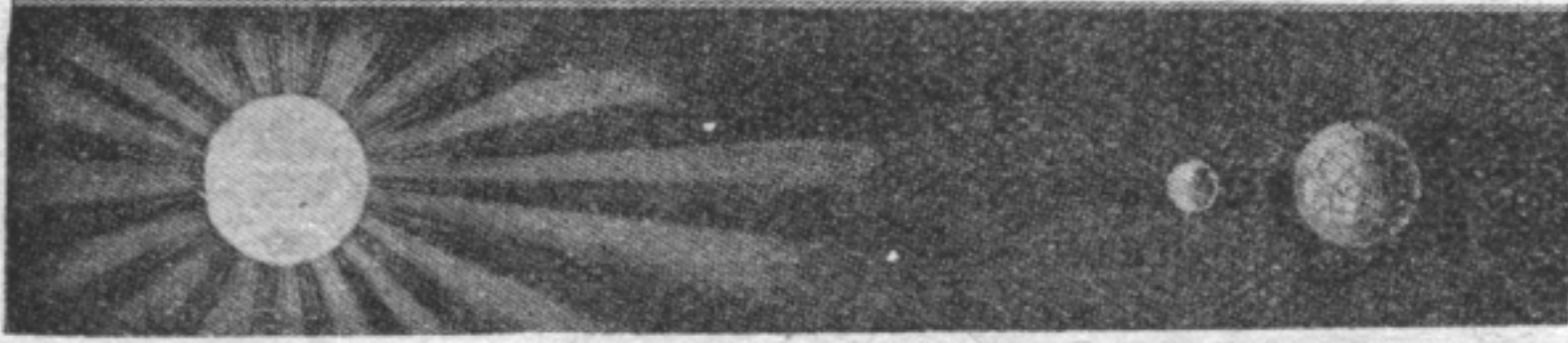
সূর্য্যগ্রহণ

সাতটি গ্রহণও সম্ভব—পাঁচটি সূর্য্যের, দুইটি চন্দ্রের; অথবা চারটি সূর্য্যের এবং তিনটি চন্দ্রের।

একটি চান্দ্র বৎসর প্রায় ৩৪৬.দিন ৭ ঘণ্টার সমান, অতএব ১৯ বৎসর ৬৫৮৫ দিনের সমান। একটা চান্দ্রমাস (অর্থাৎ এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা) ২৯ দিন ১২ ঘণ্টার সমান। অতএব ২২৩ মাস ও ৬৫৮৫ দিনের সমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আজ সূর্য্য ও চন্দ্র যেখানে আছে, ৬৫৮৫ দিন পরে সূর্য্য ও চন্দ্র রাহু এবং কেতুর অবস্থান হিসাবে পুনরায় ঠিক সেইখানেই থাকিবে। অর্থাৎ ৬৫৮৫ দিনে (১৮ বৎসর ১০ অথবা ১১ দিন) পরে পরে একই সময় একই রকম চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ হয়। এই ভাবে একবার কয়েক বৎসরের গ্রহণের সময় কষিয়া লইলে ভবিষ্যতে গ্রহণের সময় নির্দ্ধারণ করিতে কোন অসুবিধা হয় না।
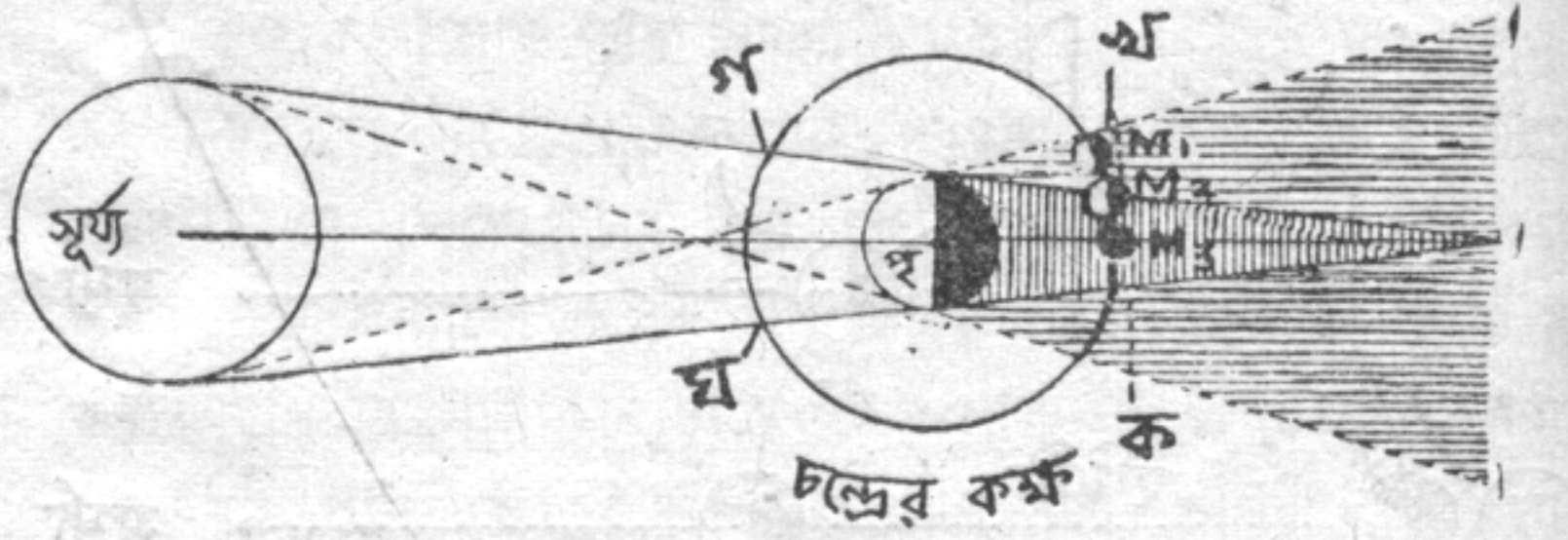
এ বছর ১৫ই শ্রাবণ রবিবার ১৩৫০ সালে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, কিন্তু ভারতে তাহা অদৃশ্য। আর ২৯শে শ্রাবণ রবিবার চন্দ্রগ্রহণ হইবে, আংশিক এবং ভারতে দৃশ্য। চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইবার সময় রাত্রি ঘ ১১।৫১ মিঃ আর ছাড়িবার সময় রাত্রি ঘ ২।৫১ মিঃ। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৪ দিনের ব্যবধানে দুইটি
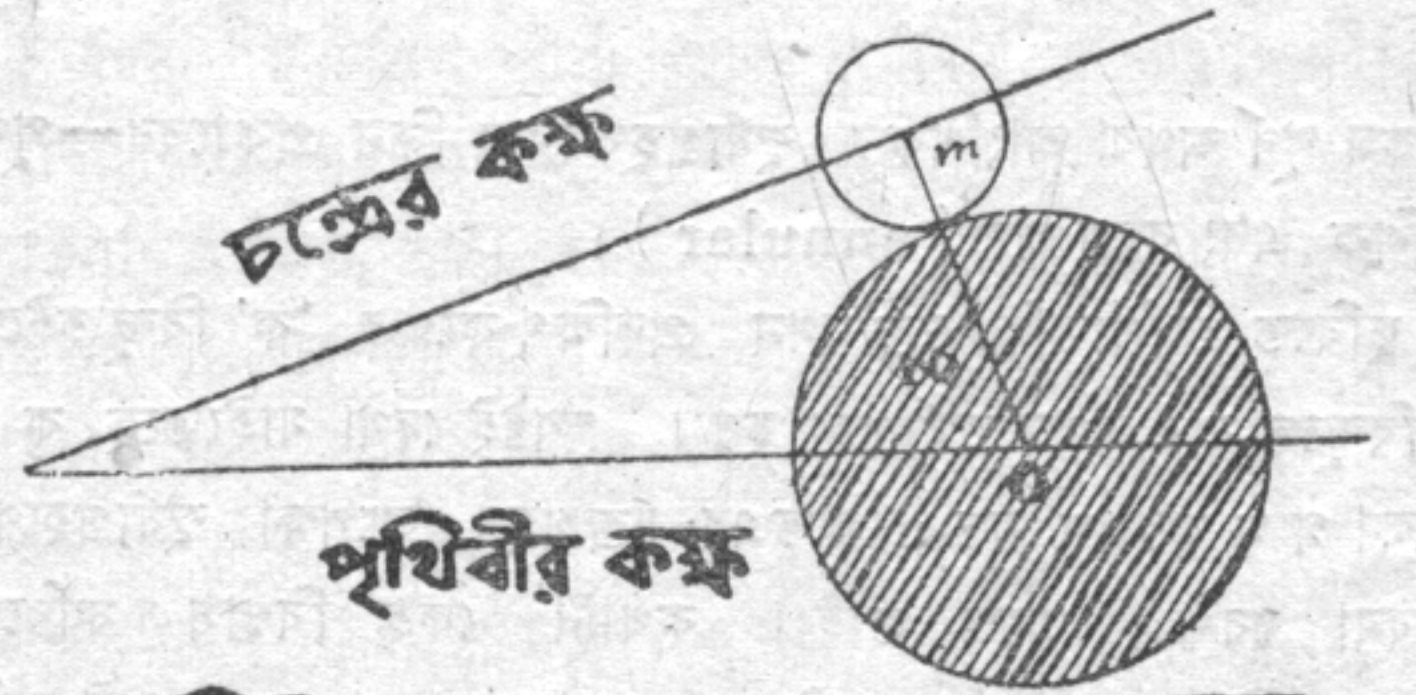
পৃথিবীর ছায়া ও চন্দ্রের অবস্থান

গ্রহণ হইবে! কারণ, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ব্যবধান চৌদ্দ দিনের। অমাবস্যার দিন সূর্য্যগ্রহণ এবং পূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

শ্রীযামিনীমোহন কর এম-এ (অধ্যাপক)।

নীলাভ

মোমের বাতির মত দিন মোর হয়ে আসে ক্ষীণ
আমার কুসুম-ঝরা স্বপনে রঙীন যত দিন,
শেষ হলো আমার এ ক্ষণেকের ভীরু পরিচয়—
মরণের তীরে এসে আজ আমি হয়েছি নির্ভয়।

আমার জীবনভরা সভ্যতার তীব্র কশাঘাত
আমারে করেছে মূক; কত শত অন্ধকার রাত
আমার রঙীন দিনে কালিমার টীকা এঁকে দিয়ে!
আমারে গিয়েছে ফেলে আমার সমস্ত কিছু নিয়ে।

আমার মরুভূ-দেহে রঙে রঙ স্বপ্নময় দিন
সহসা আসিয়া কবে একেবারে হলো যে বিলীন,—
আজ মোর মনে নাই, মনে নাই কখন আবার
আমার কুসুম-দিনে চুপি চুপি এলো যে আঁধার!

প্রেয়সীর লাজে-কাঁপা অর্থময় নীল দু'টি চোখে
চেয়ে চেয়ে কত কথা বলেছি যে ওকে!
সহসা ফিরায়ে মুখ দেখিলাম চেয়ে তার পানে,
ধূসর ঘোলাটে রঙ আজ তার চোখে শুধু আনে!

আরো কত ঝড়-ঝঞ্ঝা জীবনের পথে পথে আসে—
চুপ করে সয়ে যাই মরণের দুঃসহ নিশ্বাসে;—
এ মোর আকাশ নীল পর-পারে রয়ে গেছে কালো,
আমার মরণে যদি নীল হয়, তাই হবে ভালো!

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশাব্লাঙ্কা
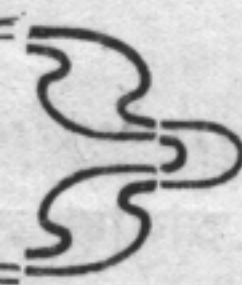
যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না, তখন ইংলণ্ড হইতে আফ্রিকা-য়ুরোপ ও এসিয়ায় আসিবার পথ ছিল জিব্রাল্টারের গা ঘেঁষিয়া ভূমধ্য-সাগরের বুকের উপর দিয়া। যাঁরা বিমানপোতে আসিতেন, তাঁদের পথ ছিল স্বতন্ত্র। আজ এই যুদ্ধের জন্য ও-পথ নিরাপদ নয়—যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কুল। কিছু কাল অর্থাৎ টিউনিসিয়া-বিজয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ভূমধ্য-সাগরের বুক ছিল নির্জ্জন—এ পথে আদৌ জাহাজ চলিত না!
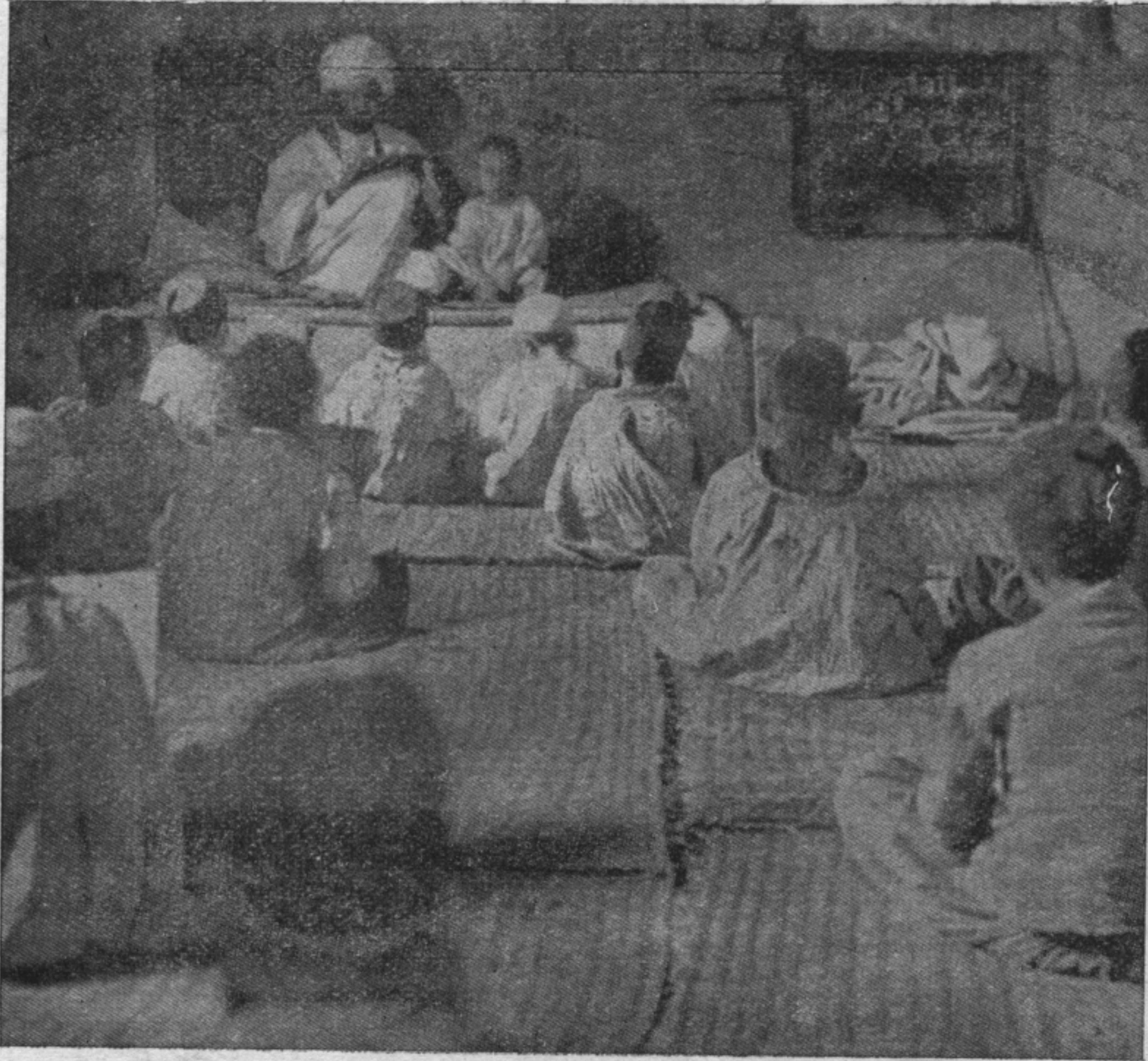
মুর-মহল্লার পাঠশালা—কাশাব্লাঙ্কা

ইংলণ্ড হইতে আসিতে জাহাজ বইতে জিব্রাল্টারের কাছে প্রথমেই আফ্রিকার সর্ব্বোত্তরাবস্থিত মরক্কোর* দেখা মেলে। দক্ষিণে জিব্রাল্টার এবং টাঙ্গিয়ারের মধ্যে দেখা যায় মরক্কো এবং উত্তরে স্পেনের দক্ষিণাবস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী। জাহাজ হইতে মরক্কোর যেটুকু দেখা যায়, তাহাতে আছে শুধু প্রাচীন প্রাসাদ-হর্ম্ম্যাদির ধ্বংসস্তূপ, হার্কুলিসের বিজয়-স্তম্ভ প্রভৃতি। এখানে অন্তরীপটুকু ন' মাইল চওড়া—টাঙ্গিয়ারের দিকে পরিসর পড়িয়া বারো মাইল হইয়াছে; তার পর ট্রাফালগার এবং স্পার্টেল অন্তরীপের উপর দিয়া জিব্রাল্টার অন্তরীপ ঘেঁষিয়া আতলান্তিকের বিরাট্ দেহে নিজের দেহ এলাইয়া দিয়াছে। স্থল-ভাগ বলিতে এখান হইতেই সমুদ্রগামী জাহাজগুলি তাদের শেষ-সিগনাল পায়! ভূমধ্য-সাগরের মুখে মরক্কো যেন প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

কিছু কাল পূর্ব্বে টাঙ্গিয়ার-নিবাসী মার্কিণ রাজদূত সাইরাশ উইকার এই পথে পাড়ি দিয়াছিলেন। এ পথের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন:

জাহাজ হইতে সুদূর উত্তর দিকে চাহিয়া প্রাচীন নগর তারিফার দর্শন পাইলাম। বারো শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলিম বীর তারিফ এবং মুশা স্পেন-বিজয়ে বাহির হইয়া এই সহরেই প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন। সহরের বাঁ-দিকে ট্রাফালগার অন্তরীপ—এইখানে বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়ন পরাজয়ের প্রথম কালিমায় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-দিকে জিব্রাল্টার—ব্রিটিশ প্রতিপত্তির বিজয়-মুকুটের মত চোখে পড়ে। দক্ষিণে আফ্রিকা।

লেখককে রাজকার্য্য-উপলক্ষে স্পানিশ-ফরাশী-অধিকৃত মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া * পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। তিনি বলেন, নব্য শিক্ষা সভ্যতা এবং সংস্কৃতির হিসাবে মরক্কো এখনো সকলের বহু-পিছনে পড়িয়া আছে। য়ুরোপীয়ানদের সঙ্গে মরক্কোর সমুদ্রকূলবর্ত্তী নগরগুলির যা-কিছু ঐ পরিচয়। মরক্কোর অভ্যন্তর ভাগে আজও প্রাচীন কায়েদ জাতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করিতেছে।

লেখক লিখিতেছেন—উত্তর আফ্রিকার গা বহিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইতে উল্লেখযোগ্য প্রথম নগর ফেজ। বালি ও রৌদ্রের দেশ। ফেজে যব এবং গম জন্মায় প্রচুর। এখানকার ভেড়া, ছাগল এবং ঘোড়া গর্ব্বের বস্তু। ফেজের জমি খুব উর্ব্বর—খাদ্যশস্যসম্ভারে রীতিমত সমৃদ্ধ। টাঙ্গিয়ার হইতে ফেজ পর্য্যন্ত রেলওয়ে-লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে—ফরাশী ও স্পানিশ কোম্পানি এক-যোগে এ লাইনটির পরিচালনা করে। এ লাইনটির রক্ষার উপর উভয় জাতির স্বার্থ ও জীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। রেলওয়ে-লাইনটি গিয়াছে সমুদ্রের সঙ্গে সমন্তরাল-রেখায় অলেকাজারকুইভার পর্য্যন্ত, তার পর পেটিটজীনে বাঁকিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তারিত ফরাসী ট্রাঙ্কলাইনে গিয়া মিশিয়াছে।

পেটিটজীন হইতে একটি শাখা দক্ষিণ-পশ্চিমে মেকেনিজের মধ্য দিয়া ফেজে গিয়াছে। ফেজ হইতে আলজিরিয়াব সীমান্তে উজদায় এ শাখার শেষ। অপর শাখা গিয়াছে পশ্চিমে আতলান্তিক-তীরবর্ত্তী রাবাটে; সেখান হইতে আতলান্তিকের কূল বহিয়া এক দিকে কাশাব্লাঙ্কায় অপর দিকে মারাকেশে এ শাখার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। মরক্কো হইতে এই লাইন ওরান, আলজিয়ার্স, কনষ্টানটাইন হইয়া টিউনিসিয়ার মধ্য দিয়া বাইজার্ত্ত এবং টিউনিস

* মরক্কোর সচিত্র বিশদ বিবরণ ১৩৪৯, চৈত্র সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

* টিউনিসিয়ার সচিত্র বিশদ বিবরণ গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

সহর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তার পর আলাদা লাইন আছে—টিউনিস সহর হইতে গেবিশ-উপসাগরের তীরে গেবিশ সহর পর্য্যন্ত। *

এ লাইনের কল্যাণে এই যুদ্ধের সময় ফৌজ এবং ফৌজের রশদ-পত্রাদি জোগানের কাজ কতখানি সহজ হইয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। শুধু আফ্রিকার ফৌজ নয়—য়ুরোপও এই রেল-লাইনের কল্যাণে এ দুর্দ্দিনে খাদ্যশস্যের জোগান পাইয়া বর্ত্তাইয়া গিয়াছে।

লেখক বলিতেছেন, টাঞ্জিয়ার হইতে বাসে চড়িয়া আমি দেশের পরিচয়-গ্রহণে বাহির হইয়াছিলাম। এ পরিভ্রমণে যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত! পথে কোথাও দেখি, সার-সার উট চলিয়াছে, কোথাও বা গাধার সার—তাদের পিঠে লোকজন এবং খাদ্য-শস্যের ভার! কোথাও বা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে অসংখ্য মেষ ও ছাগল তাড়াইয়া পথে চলিয়াছে। দূরে দূরে দেখা যায়, পাহাড়ের কোলে অনাড়ম্বর ছোট ছোট গ্রাম—গ্রামের কোলে ফশল-ভরা ক্ষেত-খামার—বলদ দিয়া চাষীরা ক্ষেতে চাষ করিতেছে। দেখিয়া বার-বার বাই-বেলে-পড়া অতীত দিনের সরল নির্ম্মল শান্তিময় জীবনের কথা মনে পড়িতেছিল।

রাবাটের রাজপথে অন্ধ দরবেশ

এ-সব গ্রামে এখনো বহু যুগের প্রাচীন আচার-প্রথা বিরাজ করিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কারের বিন্দুবাষ্পও সে সব প্রথার গায়ে লাগে নাই! মৃত্তিকানির্ম্মিত দেবতাকে লইয়া গ্রামবাসীদের পূজা দেখিলাম। এ দেবতাটির পূজা করিলে না কি শস্যসম্ভারে ক্ষেত ভরিয়া ওঠে! দেবতার উপর এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস দেখিলাম অটল! এ দেবতার পূজা করিয়া তারা কোনো দিন তাঁর প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয় নাই। তারা বলিল, পূজায় তিনি চিরদিন তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন এবং সে তৃপ্তির প্রসাদে শস্যাদি লাভে তারা কৃতার্থ হইতেছে চিরদিন।

সেবু নদীর মুখে পাইলাম মেদিয়া—তার পর রাবাট সহর। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই রাবাটে হাসান-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বিজয়ী বীর ইয়াকুব এল মনসুর। এ স্তম্ভটি বহু দূর হইতে চোখে পড়ে!

বন্দর হিসাবে রাবাটের তুলনা নাই! মরক্কোয় চারটি বড় সহর আছে—রাবাট তার অন্যতম। অপর তিনটি সহর—ফেজ, মারাকেনা এবং পুণ্যতীর্থ মেকিনিজ। মেকিনিজেই মরক্কো-সুলতানের প্রাসাদ—এবং এই মেকিনিজেই ফরাশী রেসিডেণ্ট-জেনারেলের আবাস এবং অফিস।

রাবাট সহরটি যেন হরগৌরীর মতো—অর্থাৎ অর্দ্ধাংশে পুরানো মুরজাতির বাস, অপরার্দ্ধে আধুনিক ফরাশী সহর। মুর-মহল্লায় প্রাচীন যুগের আবহাওয়া, ফরাশী সহরে পদার্পণ করিলে তেমনি মনে হইবে যেন য়ুরোপীয় সহরে প্রবেশ করিয়াছি! লেখক লিখিতেছেন, —রাবাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ষাট মাইল দূরে বিখ্যাত সহর কাশাব্লাঙ্কা। স্পানিসরা এ সহরের নাম দিয়াছে কাশাব্লাঙ্কা বা সাদা বাড়ী—সহরের পুরানো মুর নাম দার-এল্-বাইদা অর্থাৎ সাদা কুঠি!

কাশাব্লাঙ্কা আতলান্তিকের কূলে প্রসিদ্ধ বন্দর। ফরাশীরা সুদৃঢ় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া কাশাব্লাঙ্কাকে যথাসম্ভব দুর্ভেদ্য করিয়াছে। ডাকারের উত্তরে আতলান্তিকের তীরে এমন বাণিজ্য-কেন্দ্র আর দু'টি নাই! কাশাব্লাঙ্কা হইতে রেলওয়ে-লাইন উত্তরে, পশ্চিমে এবং পূর্ব্বে গিয়াছে উত্তর আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া। উত্তর আফ্রিকার খাদ্যশস্য বিদেশে চালান যায়—এই কাশাব্লাঙ্কা মারফৎ। বন্দরে সব-সময়েই অসংখ্য জাহাজ রহিয়াছে।

---

* অবস্থানের জন্য গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত টিউনিসিয়ার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

আলজিরিয়াকে উত্তর আফ্রিকার "মরাই" বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আলজিরিয়াকে মরাই বলিলেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী সমস্ত বন্দর যদি কোনো কারণে অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও মরক্কোর মারফৎ সর্ব্বপ্রকার চালানী মাল নিরাপদে এই কাশাব্লাঙ্কায় আনিয়া সেখান হইতে তাহা বাহিরে চালান দিতে কোনো অসুবিধা ঘটিবে না। আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশগুলিতেও কাশাব্লাঙ্কা-মারফৎ মালপত্র চালান দেওয়ায় কোনো কারণে বাধা ঘটিতে পারিবে না।

লেখক লিখিতেছেন—উত্তর আফ্রিকার পূর্ব্ব দিকে যাইতে হইলে বাস বা ট্রেণ—যে-কোনো গাড়ীতে চড়িলেই চলিবে। ছু'টি পথই দৃশ্য-বৈচিত্র্যে মনোজ্ঞ। ছু'ধারে পাহাড়, সমুদ্র, বালুকারাশি এবং মালভূমি—চোখের সামনে ক্ষণে ক্ষণে যেন ছবির পরে কে ছবি উল্টাইয়া দিতেছে! এ পথে ডান-দিকে পাইলাম আলজিরিয়ার এ্যাটলাশ এবং গ্রান্দি কাবিলি পাহাড়। এ ছু'টি পাহাড় গায়ে গায়ে মিশিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে! পাহাড়ের ওপারে ধূ-ধূ মরুভূমি বালুকায় ভরা।

মুশলিম ছাত্র কোরাণ পড়িতেছে—কাশাব্লাঙ্কা

উত্তরে রিফ-পর্ব্বতশ্রেণী। এ পাহাড় এমন দুর্গম দুর্ভেদ্য যে, আজ পর্য্যন্ত বহু প্রয়াসেও ইহার রোমাঞ্চকর পরিচয়-কাহিনী কোনো সভ্য জাতি সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

এ-অঞ্চলে মরক্কোর দিকে তাজা ও উজদা, আলজিরিয়ার দিকে ৎলমক্কেন ও সিদি-বিল-আবেশ—মিলিটারী সহর। এ চারটি সহরে শুধু ফরাশী ফৌজের ব্যারাক আছে। বেসামরিক অধিবাসীর চিহ্নও নাই! পথে-ঘাটে শুধু সামরিক উর্দ্দি-পরা লোকজনের ভিড়। স্পাহী-অশ্বারোহীর জীবন লইয়া ফরাশী কথাশিল্পী পীয়ের লোটি যে রোমান্স লিখিয়া গিয়াছেন, সে রোমান্স অমর হইয়া থাকিবে! স্পাহী ফৌজ ছাড়া এ সব ব্যারাকে বাস করে তুর্কো, জুয়াভা, আলজিরিয়ান, মরক্কোন ও সেঙ্গলীজ ফৌজদল।

ওরান একটি চমৎকার বন্দর। এখানে সে-দিন মিত্র-বাহিনীর সঙ্গে অক্ষশক্তির তুমুল সংঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছে। এ্যাডমিরাল ডার্লান যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ জারি করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ফরাশীরা বন্দরের স্বল্পপরিসর স্থানে জাহাজ ডুবাইয়া বন্দর-মুখ বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। বহু জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ ও ব্রিটিশ এঞ্জিনীয়ারের দল অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সে-সব জাহাজ তুলিয়া বন্দরে প্রবেশ-পথ মুক্ত করে।

ওরান প্রাচীন নগর। এখানে সেই সাবেকী আমলের মসজেদ, বাজার, তালবন, নকল ফোয়ারা আজও অখণ্ড দেহে বিরাজ করিতেছে। নূতনের মধ্যে এখানকার বিমান-ক্ষেত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন নিরাপদ ও দুর্জ্জয় বিমান-ক্ষেত্র আফ্রিকায় আর নাই। বিমান-ক্ষেত্রটির সহিত সুদৃঢ় দুর্গ আছে। তাছাড়া বিমান-ক্ষেত্র হইতে চার মাইল দূরে আছে নবনির্ম্মিত নৌঘাঁটি—মার্শ-এল্-কেবির।

ফেরি-ঘাট—বাইজার্ত্ত

ভূমধ্য-সাগরের অধিনায়কত্ব লইয়া এখানে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুলাই তারিখে ফরাশীর সহিত ইংরেজের প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল।

আলজিয়ার্স হইতে ৪০ মাইল দূরে বোর-আর-জমিয়া। এখানে রোমান বীর মার্ক এন্টনি এবং মিসর-রাণী ক্লিওপেট্রার একমাত্র কন্যা ক্লিওপেট্রা সেলিনার সমাধি।

সেলিনার সম্বন্ধে চমৎকার কাহিনী শুনা যায়। এখানকার রাজা জুমিদিয়ার বংশধর রাজা জুবা রোমান-সম্রাট্ অগষ্টাশকে কার্থেজ-বিজয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। সে উপকারের পুরস্কার

র‍্যাগ্-কার্পেটের মেলা—টিউনিসিয়া

স্বরূপ সম্রাট্ অগষ্টাশের কাছে জুবা রাজা সেলিনার পাণি প্রার্থনা করেন। অগষ্টাশ ভাবিলেন, এ বিবাহ হইলে জুবার রাণী সেলিনা রোমের সঙ্গে আর কখনো শত্রুতা করিবেন না। তাই তিনি এ বিবাহে সম্মতি দিলেন। বিবাহ হইল। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা সেলিনার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, রোম জয় করিবেন। বিবাহের পর কিন্তু জুবার আদরে-প্রেমে সেলিনা সে-আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া দর্শন এবং শিল্প-সাধনায় মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। রোম সাম্রাজ্য বহু বিঘ্ন হইতে রক্ষা পাইয়া বাঁচিল। সমাধি-মন্দিরটির আয়তন বিরাট্। এবারকারের যুদ্ধে গোলাগুলীর পীড়নে সে সমাধি-মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ক্লক-টাওয়ার—কাশাব্লাঙ্কা
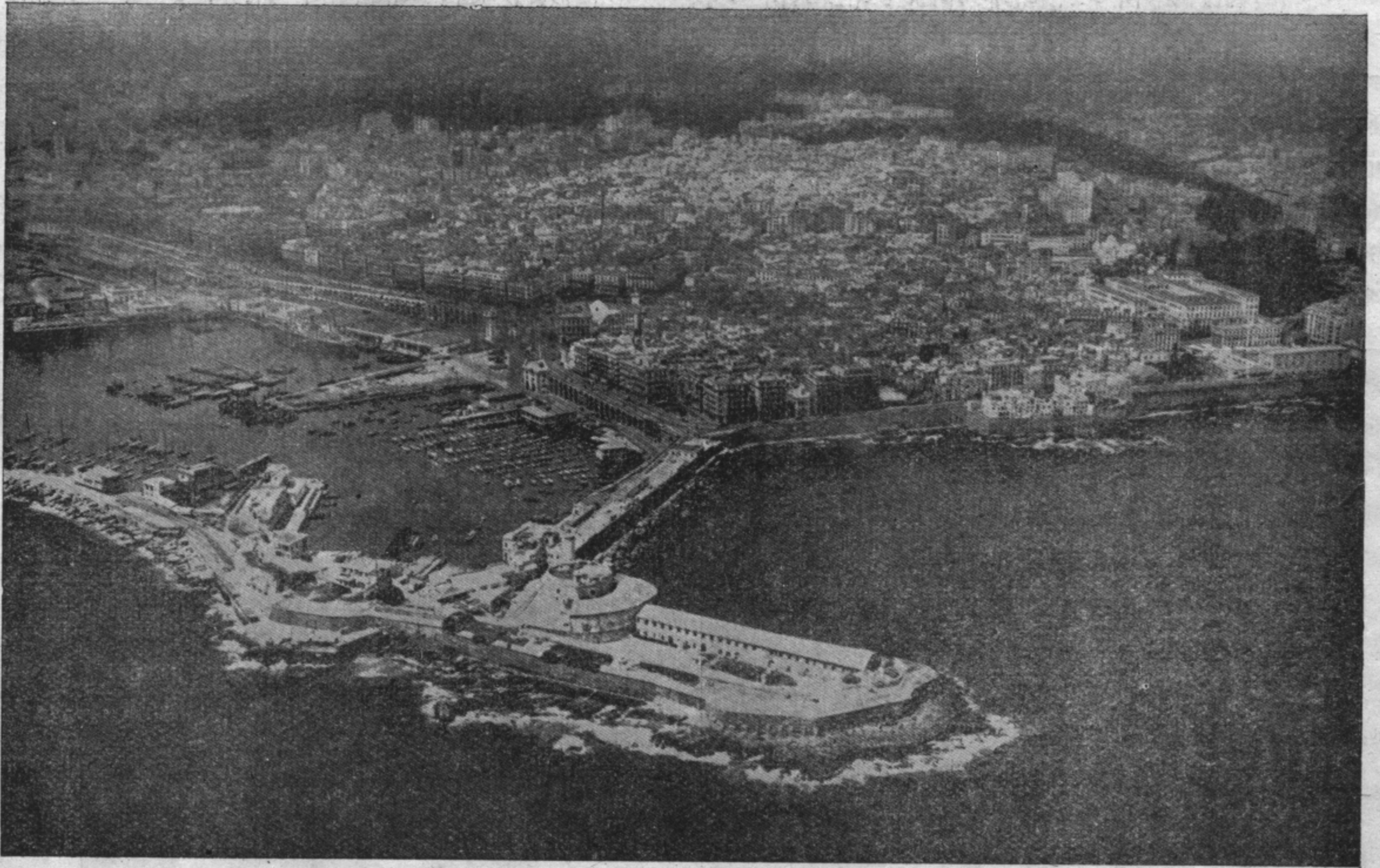
আলজিয়ার্স বন্দর—ষোল ঘণ্টার যুদ্ধে মার্কিণের করগত
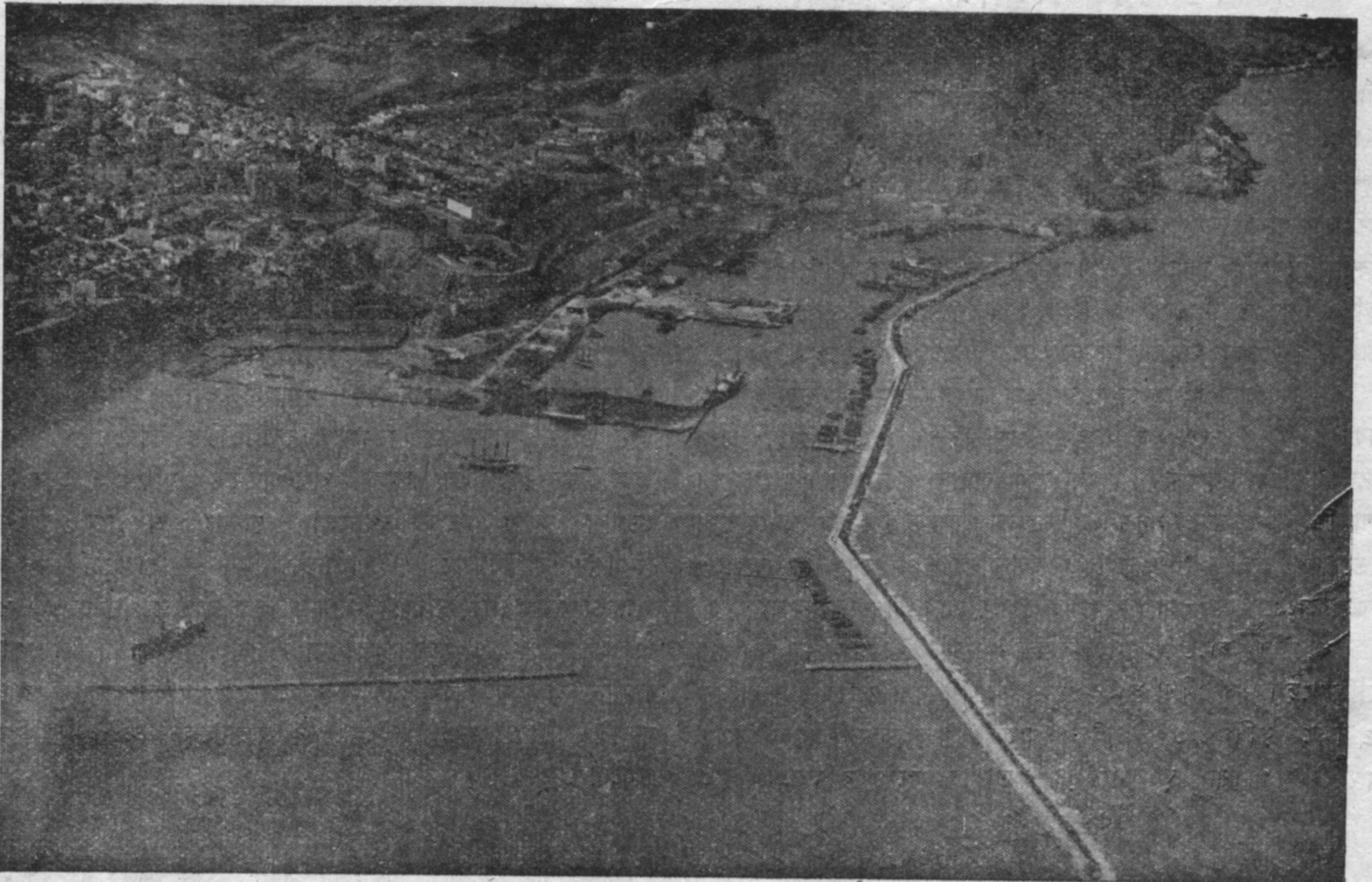
ওরান্ বন্দর

আলজিরিয়ার প্রধান সহর আলজিয়ার্স। আলজিয়ার্স সমৃদ্ধ বন্দর। এখান হইতে ভূমধ্য-সাগরের বুকের উপর দিয়া ফ্রান্সে ও জার্ম্মানিতে প্রচুর খাদ্যশস্য, সুরা এবং অলিভ তৈল চালান যাইত। এবারকারের এ যুদ্ধে যোল ঘণ্টার মধ্যে আলজিয়ার্স ফরাশী ও অক্ষ-শক্তির হস্তবিচ্যুত হইয়া আমেরিকার করতলগত হইয়াছে।

কিন্তু বন্দর হিসাবেই শুধু আলজিয়ার্সের মূল্য নয়—এমন বিরাট্ উর্ব্বর দেশ বোধ হয় সারা আফ্রিকায় আর নাই! প্রাচীন রোমান আসলে এই আলজিয়ার্স ছিল সমগ্র রোমের অন্ন-ভাণ্ডার!

বাসের প্রতীক্ষায় লাইনে দাঁড়ানো—আলজিয়ার্স

আজও এখানকার জমির উর্ব্বরতা এতটুকু কমে নাই! অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকর্ম্ম লইয়া আছে। এখানকার উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমিতে আছে ঘোড়া, ছাগল এবং ভেড়ার জন্য সমৃদ্ধ চারণ-ক্ষেত্র; বুকে অজস্র প্রচুর দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং বিচিত্র ফলের বাগান; সমতল মালভূমে আছে নানা রকমের শস্যে সমৃদ্ধ বিরাট্ বিপুল ক্ষেত্রসমূহ। জাহাজে তুলিয়া ভূমধ্য-সাগর পার করিয়া তৃষিত ক্ষুধিত য়ুরোপ এ-শস্যাদির কল্যাণে আজ বাঁচিয়া আছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের লক্ষ্মীকে সে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে!

আলজিরিয়া হইতে দেশ-দেশান্তরে চালান যায় গম, সুরা, ছোলা, যব, বিবিধ খাদ্যশস্য, তামাক, অজস্র বিচিত্র জাতের ফল,—তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কমলা লেবু, বাদাম, পীচ, কুল এবং খেজুর। আলজিরিয়া দ্রাক্ষায় সমৃদ্ধ। এই দ্রাক্ষা নিঙড়াইয়া এখানে যে সুরা তৈয়ারী হয়, আলজিরিয়ার জল-বাতাসের গুণে সে সুরা—বিশেষজ্ঞদের মতে—না কি স্বর্গের সুধা! তার আর তুলনা নাই!

ফরাশীর হাতে আলজিরিয়ার মাটির উর্ব্বরা-শক্তি বহু গুণ বাড়িয়াছে। ফরাশীরা সর্ব্বত্র প্রচুর নলকূপ বসাইয়াছে; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিপদ্ধতি শিখাইয়া এখানকার কৃষকদের তারা রীতিমত মায়াবী গড়িয়া তুলিয়াছে! তাহার ফলে কৃষিলক্ষ্মী আজ আলজিরিয়ায় তাঁর আসনখানি কায়েমি করিয়া পাতিয়া সেই আসনে অচঞ্চল বসিয়া পূর্ণ-তৃপ্তি ভোগ করিতেছেন এবং প্রীতির দানে আলজিরিয়াকে ভরিয়া তুলিতেছেন।

আলজিরিয়ার পূর্ব্বে টিউনিসিয়া। টিউনিসিয়ার অন্তর্গত বাইজার্ত্ত সহরটি যেন এ অঞ্চলের দুর্জ্জয় প্রহরী! পাহাড় এবং সমুদ্রের বুকে এমন চমৎকার তাহার অবস্থান। তার উপর এক দিকে দুর্গ কারুবা আর এক দিকে দুর্গ সিদি আমেদ। এই অপূর্ব্ব অবস্থানের জন্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বাইজার্ত্ত সহরটি যেন ইতালীর বুক তাগ্ করিয়া পিস্তল উঁচাইয়া আছে (a pistol pointed at the heart of Italy)!

লেখক লিখিতেছেন—বাইজার্ত্তের অদূরে প্রাচীন কার্থেজ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। উত্তর-আফ্রিকার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত

বার্বার তরুণী—আলজিরিয়া

ঘুরিয়া মনে হয় যেন ভূমধ্য-সাগরের পশ্চিমাবস্থিত এই বিরাট্ উপকূলভাগই শুধু এ যুদ্ধের শেষ মীমাংসা করিতে সমর্থ! যে-শক্তি এই উত্তর আফ্রিকায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে,—এক দিক্ দিয়া সে যেমন অস্ত্র-শক্তিতে বঞ্চিত হইবে না, তেমনি অপর দিকে এখানকার দুর্ভেদ্য অবস্থানে নিজেকে নিরাপদ রাখিয়া ফ্রান্স-ইতালী-জার্ম্মানির স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবার পক্ষেও অনেকখানি সুবিধা ও সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবে। তাই এ অঞ্চলটিকে এ যুগের কুরুক্ষেত্র বলিয়া যেমন আখ্যা দিতে পারি, তেমনি যদি মনে করি, এই কুরুক্ষেত্রেই দানবী-লীলার রুধির-সমাধি ঘটিবে, তাহা হইলে সে কল্পনাকে অলীক ভাবিবার কোনো হেতু নাই!

ছোটদের আসর

তোমাদের বয়সী ছেলে

জগতের চারি দিকে এই যে আজ নিত্য-নব-বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের লীলা দেখিতেছ, এ-সব আবিষ্কার-বৈচিত্র্যে তোমরাও নিশ্চয় স্বপ্ন ভাখো—তোমরাও যদি নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে পারো তো বেশ হয়!

এ স্বপ্ন-দেখায় লজ্জা নাই! সাধনায় মানুষ এমনি স্বপ্নকে জীবনে সফল করিয়াছে—তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সাধনা করিলে তোমাদের ছেলে-বয়সের স্বপ্নও সফল হইবে, নিশ্চয়!

পরাধীনতার চাপে স্বাধীন দেশের ছেলেদের মতো কল্পনাকে তোমরা দিক্-বিদিকে পাঠাইতে পারো না! তার উপর আছে দারিদ্র্য—হয়তো এ-সব ভাবিয়া তোমাদের কল্পনা মধ্যপথে থামিয়া যায়! কিন্তু না, কল্পনাকে ছাড়িয়া দাও, নিষ্ঠাভরে যদি সাধনা করিতে পারো, জানিয়ো, তার ফল পাইবেই!

বিদেশী কয়েকটি ছেলের কথা বলিতেছি। ধনীর ঘরে তারা জন্ম লয় নাই! শুধু সন্ধানী মন লইয়া কল্পনাকে তারা সার্থক করিবার জন্য সাধনা করিয়াছিল,—সে সাধনায় কতখানি সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সে কথা শুনিলে তোমাদের দ্বিধা-সংশয় ঘুচিবে, মনে উৎসাহ পাইবে, শক্তি পাইবে। একটা কথা মনে রাখিও, জগতে এক জনে যে-কাজ করিয়াছে, সে-কাজ অপরেও করিতে পারিবে নিশ্চয়! মানুষের পক্ষে অসম্ভব বা অসাধ্য বলিয়া জগতে কিছু নাই! এই যে মোটর-গাড়ী, বায়োস্কোপ, রেডিয়ো, সিনেমা—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এ সবের কল্পনাও মানুষের মনে জাগে নাই! আর আজ? সহজ সত্য-রূপে মানুষ এ-সব বস্তু অনায়াসে লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এ সব কথা থাক—এখন সেই বিদেশী ছেলেদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বলি। আমেরিকার এলেন টাউনে রবার্ট স্পেলিঙের বাস। ছোট ছেলে। রবার্টের বয়স তখন ন' বছর; রবার্টের বড় দাদা উইলিয়মের বয়স এগারো বছর। রবার্টের বাপ ছিলেন রাসায়নিক—তাঁর ল্যাবরেটরি ছিল। লিখিবার কালি লইয়া উইলিয়ম এবং রবার্টের মন খুঁৎ খুঁৎ করিত—বিশ্রী কালো কালি! তাদের পছন্দ হইত না। কালি তৈয়ারীর নানা মশলার কথা বইয়ে দু'জনে পড়িত। সেই সব মশলা লইয়া নিজেদের ঘরের ল্যাবরেটরিতে ঢুকিয়া দু'ভাই নানা কৌশলে কালি তৈয়ারী করিত। এক দিন এক প্রণালীতে ব্লু-ব্ল্যাক কালি তৈয়ারী হইল। কালি দেখিয়া দু'জনে খুব খুশী! ছেলেদের তৈয়ারী এ কালি বাপ দেখিলেন—আরো পাঁচ জনে ব্যবহার করিলেন। সকলেই মহা খুশী। এমন কালি পূর্ব্বে তাঁরা চোখে কখনো দেখেন নাই। এবং সংবাদ পাইয়া ওখানকার এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী উইলিয়ম এবং রবার্টের তৈয়ারী কালির পেটেণ্ট লইয়া বাজারে বাহির করিলেন। উইলিয়ম এবং রবার্ট সেই অল্প বয়সেই হইল কালির ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর অংশীদার।

সান ফ্রানসিশকোর এক ইস্কুলের ছাত্র লিয়ন সালানেভ—বয়স বারো বৎসর। পাড়ায় এক ভদ্রলোকের দূরবীক্ষণ-যন্ত্র লইয়া যখন তখন দূর আকাশের গায়ে নক্ষত্র দেখিত। আকাশের নক্ষত্র দেখা ছিল তার খেলা। নক্ষত্র সম্বন্ধে লেখা ছেলেদের পাঠ্য-বই দেখিলেই পড়িত। সেই সব বই পড়া এবং দূরবীক্ষণে এমনি করিয়া নিত্য নক্ষত্র দেখা—ইহার মধ্যে এক দিন লিয়ন দেখিল, আকাশের পরিচিত নক্ষত্র-পুঞ্জের সঙ্গে অজানা নক্ষত্রের আবির্ভাব—সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত নক্ষত্রগুলির আসন যেন টলিয়াছে! সে এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ পিতৃ-বন্ধুর কাছে এ-কথা বলিল। পিতৃ-বন্ধুও স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখিলেন। তখনি এ সংবাদ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল এবং বিশেষজ্ঞেরা অনুশীলন-কার্য্যে রত হইলেন। সে অনুশীলনের ফলে নূতন কয়টি নক্ষত্রের আবিষ্কার ঘটিল।

লিয়নের নক্ষত্র দেখা

জর্ডান ও জর্ডানের মা

আর একটি ছেলে, জর্ডান বিয়ারম্যান। নিউ-ইয়র্কের নিউ রোশেলে বাড়ী। বয়স সাত বৎসর। জর্ডানের খেলা ছিল বাড়ীর ভাঙ্গা তৈজসপত্র লইয়া জোড়াতালি দিয়া নূতন কিছু খেলনা তৈয়ারী করা। এই খেলা খেলিতে খেলিতে সে এক নূতন রকমের দেওয়াল-আল্‌না তৈয়ার করিয়া বসিল। আল্‌না দেখিয়া মা অবাক্! সে আল্‌নার উপযোগিতা যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল। সাত বছরের ছেলের তৈয়ারী সে আল্‌নার পেটেণ্ট রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল; এবং সে আল্‌নার কারবার করিয়া জর্ডান আজ ক্রোড়পতি হইয়াছে।

লশ এঞ্জেলেশে জ্যাক বেটারিজ মোটর-গাড়ীর ভাঙ্গাচোরা পরিত্যক্ত অংশ কেনা-বেচা করিত। জ্যাকের ছেলে বিলির বয়স পনেরো বৎসর। সেই ভাঙ্গাচোরা অংশ জোড়াতালি দিয়া বিলি চাহিত ছোট-ছেলেদের মোটর-গাড়ী তৈয়ার করিতে। এ বিষয়ে তার সাধনার বিরাম ছিল না এবং এক দিন বিলি এমনি ভাঙ্গাচোরা অংশ লইয়া একখানি মোটর-গাড়ী তৈয়ারী করিল একা—আর কাহারো সাহায্য না লইয়া! ব্যাটারি ফিট করিয়া সে মোটর বিলি পথে চালাইল—মোটর ছুটিল ঘণ্টায় একশো মাইল রেটে।

দু'-চারিটি নয়, আমেরিকার অনেক ছেলে এমনি অভিনব আবিষ্কারে সকলের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে! তোমাদের মধ্যেও অনেকের এমন সখ আছে—কত কি গড়িবার বাসনা! এগুলাকে

অলস-খেলা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এ সব ছেলের মা-বাপকে বলি, ছেলেদের এমন শেখায় উৎসাহ দিবেন! সে উৎসাহে এ সব ছেলে নব নব আবিষ্কারে জগৎকে বিস্মিত করিয়া
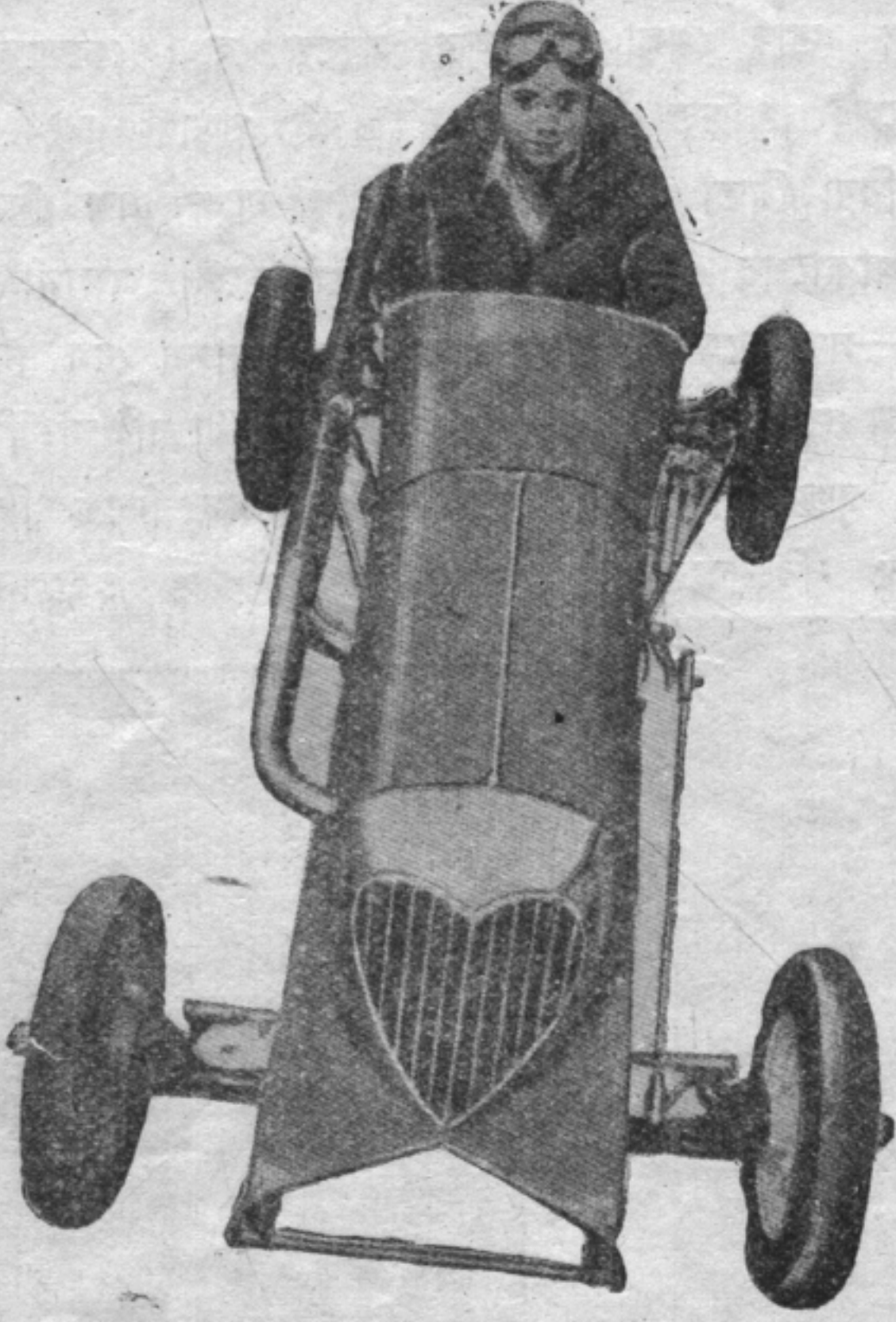
বিলির তৈয়ারী মোটর-গাড়ী

নিজেদের জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ!'

লেখার হদিশ

এক জন বড় লেখককে আমরা একবার ধরেছিলুম। বলেছিলুম,—কি করে আপনি এত সব বই লেখেন? আমরা কেন লিখতে পারি না?

এ কথার উত্তরে হেসে তিনি বলেছিলেন,—তোমরা লেখবার চেষ্টা করো না বলে লিখতে পারো না। আমরা প্রশ্ন করেছিলুম,—লেখবার চেষ্টা করলেই কি লিখতে পারবো? তিনি বলেছিলেন,—নিশ্চয়।

তার পর তিনি বলেছিলেন—যাঁরা বই লেখেন, তাঁদের সে লেখায় কি থাকে? চোখে তাঁরা যা দেখেছেন, কাণে শুনেছেন, বইয়ে পড়ছেন বা যে সব বিষয় চিন্তা করছেন—এই সবই তাঁদের লেখার বিষয়-বস্তু। আমাদের মধ্যে অনেকে যে অনেক-কিছু দেখে-শুনেও সে সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারেন না, তার কারণ, তাঁরা দেখার মত করে কোনো বস্তু দেখেন না। কিম্বা দেখলেও শৃঙ্খলা-পর্য্যায়ক্রমে সাজিয়ে গুছিয়ে সেগুলির বর্ণনা—মুখের ভাষায় বা লেখার হরফে প্রকাশ করতে পারেন না। সব বিদ্যার মতন লেখা-বিদ্যারও চর্চ্চা করতে হয়।

এই কথা বলে তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন—বেশী নয়, একটি দিন তোমরা ঘুম থেকে উঠে যা-কিছু কাজ করবে, রাত্রে শুতে যাবার আগে ধারাবাহিক ভাবে তারই বর্ণনা লেখবার চেষ্টা করো। প্রথমে যে লেখা হবে, তা দেখে হয়তো হাসি পাবে, কিন্তু এমনি দিনের পর দিন লিখতে লিখতে শেষে ভালো লিখিয়ে হতে পারবে!

তিনি বললেন, ধরো, একটা রবিবারে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখতে গেলে। সেখানে নানা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লোকের ভিড়ে কত রকম বৈশিষ্ট্য দেখলে। চিড়িয়াখানা থেকে ফিরে এসে লেখো সেই সবের বিশদ বিবৃতি। তার চেয়েও সহজ উপায় হচ্ছে, কোনো সুলেখকের লেখা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা গল্প-উপন্যাস পড়ে পড়ার শেষে সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বা গল্প-উপন্যাসের চুম্বক নিজের ভাষায় পর-পর লিখে যাও। এমনি করে লেখা মক্সো করতে শিখতে হয়।

বললেন,—স্কুলে essay লেখা। ক্লাসের টীচার essay লিখতে দিলেন—"এগজিবিশন"। তোমাদের মধ্যে অনেকেই একটা না একটা এগজিবিশন দেখেছো। তাতে যা দেখেছো, মনে করে করে লেখো তার বর্ণনা। এগজিবিশন মানে, বিস্তীর্ণ ঘেরা মণ্ডপ—তার মধ্যে বিচিত্র ষ্টলে বা কামরায় নানা দেশের নানা লোকের তৈরী নানা রকম জিনিষ জড়ো করে দেখানো হয়। এ-সব জিনিষের মধ্যে কি কি আছে, সে সব জিনিষ রাখবার জন্য কে কি রকম ষ্টল তৈরী করেছে,—ক'আনার টিকিট কিনে এগজিবিশন দেখতে ভিতরে ঢুকতে হয়; রকমারি জিনিষ-পত্র ছাড়া এগজিবিসন-ক্ষেত্রে আমোদ-প্রমোদের কি রকম সব ব্যবস্থা ছিল, কত রকমের লোক এসেছিল এগজিবিশন দেখতে—তাদের আচার-ব্যবহারে কি রকম বৈশিষ্ট্য ছিল—মনে করে-করে পর-পর এই সব লিখে যাও! তার পর ভেবে-চিন্তে লেখো এগজিবিশনের উপকারিতা কি,—মানুষ বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ের বলে এই যে এত সব জিনিষপত্র তৈরী করেছে, সে-সবের কোথায় আরও কি উন্নতি করা যেতে পারে—এ সব কথা লেখো। এমনি ভাবে স্মরণ এবং মনন-শক্তি বা চিন্তার সংযোগ-সাধন করতে পারলেই লিখতে পারবে।

তার পর লেখার ভাষা ও ষ্টাইল। ভাষা এবং ষ্টাইল রপ্ত করবার জন্য কোনো সুলেখকের লেখাকে আদর্শ করে প্রথমে লেখা মক্সো করতে হবে! কপি-বই দেখে তার অক্ষরের আদর্শে যেমন অক্ষর লিখতে শিখেছিলে, তেমনি ভাবে সুলেখকের ভাষা এবং ষ্টাইলের আদর্শে নিজের ভাষা আর ষ্টাইল গড়ে নিতে হবে। ভাষা ও ভাব চুরি করবে না—ভাষার ও সুরের অনুকরণ করবে মাত্র। তবে শুধু অনুকরণ করলেই চলবে না—অনুকরণে মস্ত কুফল ফলে এই যে, লেখকের নিজস্ব ষ্টাইল কোনো দিন গড়ে ওঠে না।

ষ্টাইল এবং ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে-কথা বলে গেছেন, তার চেয়ে বড় কথা আর নেই! তিনি বলে গেছেন,—সকলে যে-ভাষা বুঝতে পারবে, এমনি সহজ সুস্পষ্ট ভাষায় লিখবে। ষ্টাইল হবে যথাসম্ভব সহজ (plain) এবং সরল। দাঁত-ভাঙ্গা শক্ত কথা বা বাঁকানো জটিল রীতি যথাসম্ভব বর্জ্জন করে চলবে। যা লিখতে চাও, তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিম্বা বহু সমাস-উপমায় জড়িয়ে কণ্টকিত করবার চেষ্টা করো না। জটিলতায় লেখা দুর্বোধ হবে। যে লেখা পড়ে সহজে তার অর্থবোধ হবে না, সে লেখা কেউ পড়বে না—এ কথা মনে রেখো।

লেখার হদিশ সম্বন্ধে আজ গোড়ার কথাটুকুমাত্র বলে রাখলুম। আরও যদি জানতে চাও, এ সম্বন্ধে পরে বিশদ ভাবে আরও অনেক কথা বলবো।

বিচার

উজ্জয়িনী নগরের প্রান্তে ছোট্ট একটি পর্ণকুটীরে এক তরুণ সন্ন্যাসীর বাস। আপন মনে সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন, কারো সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করেন না। এক দিন সকালে স্নান শেষ করে ভগবানের নাম করছেন, এমন সময় ক'জন সদাগর তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। তাদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে কুশলাদি প্রশ্নের পর সন্ন্যাসী আগমনের কারণ জিগ্যেস করলেন। তারা বললে—"প্রভু, আমাদের একটি উট হারিয়েছে। সেই উট খুঁজতে খুঁজতে আমরা এখানে এসে পড়েছি।" সন্ন্যাসী ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন—"আচ্ছা, তোমাদের উট কি কাণা ছিল?" এক জন সদাগর উত্তর দিলে—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সন্ন্যাসী বললেন—"ডান চোখ কাণা?" আর এক জন উত্তর দিলে—"ঠিক বলেছেন।" তখন তিনি বললেন—"আর বোধ হয় তার বাঁ পা খোঁড়া ছিল?" তারা সমস্বরে বলে উঠল—"আজ্ঞে, ঠিক ঠিক! আপনি উটটা শেষ কোথায় দেখলেন?" সন্ন্যাসী সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—"আর তার পিঠে বোধ হয় মধুর পাত্র ছিল?" সদাগরেরা বুঝলে, সন্ন্যাসী নিশ্চয় তাদের উট দেখেছেন। সাগ্রহে প্রশ্ন করলে—"আমাদের উট কোথায় আছে বলুন।" সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন—"আমি বাপু তোমাদের উট দেখিনি।" তারা কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে—"কেন রহস্য করছেন প্রভু? আপনি নিশ্চয় দেখেছেন। না হলে কখনও এমন হুবহু বর্ণনা মিলতে পারে?" সন্ন্যাসী বললেন, "বিশ্বাস করো, সত্যি আমি তোমাদের উট দেখিনি।" সদাগরেরা দেখল, সন্ন্যাসীর মতলব ভাল নয়। নিশ্চয় উটটি চুরি করে লুকিয়ে রেখেছেন। তারা জোর করে সন্ন্যাসীকে ধরে তখন উজ্জয়িনীর রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপের কাছে নিয়ে গেল।

মহারাজ মহেন্দ্র-প্রতাপ পাত্র-অমাত্যসহ সভায় বসে আছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীকে নিয়ে সদাগররা এসে উপস্থিত। সভার লোক অবাক্। সন্ন্যাসীকে ধরে এনেছে কি? রাজার প্রিয় অমাত্য লক্ষ্মীকান্ত সদাগরদের জিগ্যেস করলেন—"কি ব্যাপার? তোমরা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ধরে এনেছ কেন?" এক জন সদাগর উত্তর দিলে—"আমাদের একটি উট হারিয়ে গেছে। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, ইনি সেই উট লুকিয়ে রেখেছেন।" মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"এমন সন্দেহের ন্যায্য কারণ আছে?" এক জন সদাগর তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললে।

মহারাজ সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলেন—"আপনি উটটিকে নিশ্চয় দেখেছেন?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"না মহারাজ, উট আমি দেখিনি, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি, এখনও বলছি।" অমাত্য লক্ষ্মীকান্ত বললেন—"এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। না দেখে নিখুঁত বর্ণনা করা যায় না।" মহারাজ সন্ন্যাসীকে বললেন—"অমাত্য উচিত কথা বলেছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয়, যথার্থ যদি আপনি উটটি না দেখে থাকেন, তবে আমাকে বুঝিয়ে দিন, কি করে আপনি হুবহু বর্ণনা করলেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"মহারাজ! ভগবান্ চোখ দিয়েছেন দেখতে আর বুদ্ধি দিয়েছেন চিন্তা করতে। এই দুইয়ের ঠিকমত ব্যবহারে ছোট জিনিষ থেকে মূল্যবান্ অনেক তথ্য জানা যায়। সকালে নদীতে স্নান সেরে কুটীরে ফেরবার সময় আমি দেখলুম, পথে পিঁপড়ের সার আর মৌমাছিরা ভন্-ভন্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। বুঝলুম, এ পথে কোন মিষ্টি জিনিষ পড়েছে এবং সেটা মধু! আরও লক্ষ্য করলুম, পথের বাঁ-ধারের গাছগুলির উঁচু ডালে যে-পাতা, সে-সব পাতা কোন জানোয়ারে খেয়েছে। বুঝলুম সে উট—আর তার ডান চোখ কাণা। কারণ, সে জন্তুটি ডান-দিকের কোন ডাল ছোঁয়নি। তা ছাড়া অন্য কোন জন্তু অত উঁচু ডালের পাতা খেতে পারে না। আরও দেখলুম, তিনটি পায়ের দাগ স্পষ্ট এবং অপর একটি অস্পষ্ট। ভাবে বুঝলুম, উটটি খোঁড়া।" সন্ন্যাসীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে একটা কোলাহল শোনা গেল এবং একটু পরেই সদাগরদের দলের এক জন লোক এসে সংবাদ দিলে, উট পাওয়া গেছে। তখন তারা মহারাজের আদেশ-মত সন্ন্যাসীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রস্থান করল।

মহারাজ মহেন্দ্র-প্রতাপ সন্ন্যাসীকে বললেন—"প্রভু, আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ দীনের আতিথ্য স্বীকার করেন, তবে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি।" অনেক অনুনয়-অনুরোধের পর সন্ন্যাসী উজ্জয়িনী নগরীতে থাকতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদে নয়, মহারাজ তাঁর জন্য রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে নদীর ধারে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী সেইখানে থাকেন, সাধন-ভজন করেন। মহারাজ সকাল-সন্ধ্যা যখনই সময় পান, তাঁর কাছে যান। অনেক ধর্ম্মকথা এবং উপদেশ-বাণী শ্রবণ করেন। প্রত্যেক কাজেই তাঁর পরামর্শ নেন। এই সব দেখে প্রধান অমাত্য লক্ষ্মীকান্ত সন্ন্যাসীর উপর মনে মনে ভয়ানক চটে উঠলেন। কিন্তু মহারাজের ভয়ে মুখে কিছু বলতে সাহস করেন না! সর্ব্বদা সুযোগ খুঁজতে লাগলেন, কখন্ কি উপায়ে সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করা যায়! এক দিন হয়েছে কি, রাজ-দরবারে তিনটে খুব ঘোরালো রকমের মামলা এসে উপস্থিত। পাত্র মিত্র মন্ত্রী মহারাজ সবাই গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছেন, এমন সময় মহামন্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত বললেন—"মহারাজ, একটা উপায় মাথায় এসেছে!" আগ্রহ-সহকারে মহারাজ বললেন—"কি উপায় বলো, শুনি।" লক্ষ্মীকান্ত উত্তর দিলেন, "সন্ন্যাসীকে একবার ডাকলে হয় না?" মহারাজ তাঁর কথার অনুমোদন করে তখনি সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসতে তাঁর চরণ বন্দনা করে মহারাজ বললেন—"প্রভু, আমরা বড় বিপদে পড়েছি। ক'টি মামলা এসেছে, সেগুলির কোন মীমাংসা আমরা করতে পারছি না।" সাধু বললেন—"বেশ, ব্যাপারটি আমায় খুলে বল।" মহারাজ বললেন—"প্রভু, বিদেশ থেকে এই দু'টি স্ত্রীলোক এই শিশুকে নিয়ে এসেছে। দু'জনেই বলছে, ছেলেটি তার। আমি তো কিছুতেই মীমাংসা করতে পারছি না।" এই বলে তিনি মহিলা দু'টি ও শিশুকে দেখালেন। সন্ন্যাসী বললেন, "বেশ, আর একটি কি মামলা বলুন।" মহারাজ বললেন—"এই মাংসওয়ালা এই তৈল-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিছু অর্থ পাবে। তৈল-ব্যবসায়ী বলছে, মুদ্রাগুলি সে মাংস-বিক্রেতাকে দিয়েছে, আর মাংস-বিক্রেতা বলছে, এ মুদ্রাগুলি তার; তৈল-ব্যবসায়ী তারই দোকান থেকে তুলে নিয়ে তাকে দিয়েছে। সত্যি এ অর্থ কার, নির্ণয় করতে পারছি না।" সন্ন্যাসী বললেন—"বেশ, এরও বিচার হবে। তৃতীয়টি কি বলুন।" মহারাজ বললেন—"এই যে

তিনটি ছেলে উপস্থিত রয়েছে, এরা তিন ভাই। এদের পিতা মৃত্যুকালে বলে গেছেন, যে তাকে সব চেয়ে বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, সেই সমস্ত সম্পত্তি পাবে। তিন জনেই পুত্র, অতএব পিতাকে ভক্তি করে। কাজেই বিচার করতে পারছি না সম্পত্তি কার পাওয়া উচিত।" সন্ন্যাসী বললেন,—"কাল বিচার হবে। সকলকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসতে বলে দিন।"

পরদিন রাজসভায় লোকে লোকারণ্য। সবারই মনে দারুণ আগ্রহ চাঞ্চল্য। যথাসময়ে বিচার আরম্ভ হলো। প্রথমেই শিশু এবং মহিলা দু'টিকে উপস্থিত করা হলো। সাধু জিগ্যেস করলেন—"ছেলে কার?" উভয়েই সমস্বরে উত্তর দিল—"প্রভু, এ শিশু আমার।" কঠোর স্বরে সাধু প্রশ্ন করলেন—"এক ছেলে দু'জনের হতে পারে না। সত্যি করে বলো, এ শিশু কার?" পুনরায় উভয়েই একসঙ্গে বলে উঠল—"ছেলে আমার।" সন্ন্যাসী তখন বললেন—"যখন তোমরা উভয়েই সত্য কথা বলছ, তখন দু'-জনেই এই ছেলের সমান অংশ পাবে। জল্লাদ! এই ছেলেটিকে ঠিক মাঝখান্ থেকে দু'ভাগে কাটো—একে দাও এক ভাগ, আর ওকে বাকীটুকু!" জল্লাদ খড়্গ উত্তোলন করলে, সকলে হায়-হায় করে উঠল। এক জন স্ত্রীলোক তখন উন্মাদের মত সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পড়ে বলে উঠল—"প্রভু, ছেলে আমি চাই না, ওকেই দিন।" অপর রমণী মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। সাধু ইঙ্গিতে জল্লাদকে নিরস্ত করে মহারাজকে বললেন—"মহারাজ, শিশুটি এঁর—যিনি কাঁদছেন! অপরটি মিথ্যে কথা বলেছে।" লক্ষ্মীকান্ত আপত্তি জানালে—"কিন্তু এ বিচারের প্রমাণ কই?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলে—"প্রকৃত মাতা সন্তানের প্রাণের জন্ম ব্যাকুল।" মহারাজ প্রকৃত মাতাকে শিশুটি দিয়ে অপরটিকে কারারুদ্ধ করবার আদেশ দিলেন। সভাশুদ্ধ লোক ধন্ত-ধন্ত করে উঠল। তার পর মাংসবিক্রেতা ও তৈল-ব্যবসায়ীর বিচার আরম্ভ হলো। সাধু বললেন—"এই মুদ্রা তৈল-ব্যবসায়ীর, মাংস-বিক্রেতা মিথ্যা কথা বলেছে।" লক্ষ্মীকান্ত প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি করে জানলেন?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"কাল সমস্ত রাত্রি এই মুদ্রাগুলি একটি পাত্রে জলে ডুবিয়ে রেখেছিলুম। সকালে উঠে দেখি, জলের উপর তেল ভাসছে। কিন্তু রক্তের কণামাত্র নেই! তাতেই বুঝলুম, এই মুদ্রা তৈল-ব্যবসায়ীর, মাংস-বিক্রেতার নয়।" মহারাজ তৈল-ব্যবসায়ীকে অর্থ প্রদান করে মাংসওয়ালাকে কারাগারে পাঠাবার হুকুম দিলেন। অবশেষে তিন ভাইয়ের বিচার আরম্ভ হলো। সাধু তিন ভাইকেই জনান্তিকে একটি ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকতে আদেশ করলেন। সে আসতে তিনি বললেন—"দেখ বাপু, মৃত্যুকালে তোমার পিতা যা বলে গেছেন, সে সব ধাপ্পাবাজি। তিনি আগেই দানপত্র করেছিলেন, তাতে তোমায় কিছু দেননি, অপর দুই পুত্রকে সমান সমান অংশ দিয়ে গেছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর কি অবনিবনা ছিল! থাকলেও একেবারে বঞ্চিত করে যাওয়া উচিত হয়নি।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উত্তর দিল—"আজ্ঞে, আমার বাবা ঐ রকমই ছিলেন। তাঁর বিচার-বুদ্ধি বলে কিছু ছিল না! এত দিন বিষয়-সম্পত্তি পাবার আশায় চুপ করে ছিলুম। কিন্তু যখন কিছুই পাব না, তখন আর বলতে বাধা কি? তিনি ভয়ানক খিট্‌খিটে ছিলেন, আমি তাঁকে দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না।" তাকে বিদায় দিয়ে মধ্যম ভ্রাতাকে ঐরূপ জেরা করতে প্রকাশ পেল, সেও তার পিতাকে ভালো চোখে দেখতে পারত না! অবশেষে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডেকে অনুরূপ কথা বলতে সে উত্তর দিল—"বাবা যা ভাল বুঝেছেন করেছেন! তিনি আমার গুরুজন, তাঁর বিচার করবার অধিকার আমার নেই।" সন্ন্যাসী মহারাজকে বললেন—"সম্পত্তি পাবার প্রকৃত অধিকারী এই, মহারাজ! মহারাজ তখন তিন-ভ্রাতাকে ডেকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে, বড় দু'জনকে শুধু সামান্ত একটা মাসহারার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সভা ভঙ্গ হলো। রাজ্যময় সন্ন্যাসীর বুদ্ধির এবং বিচার-শক্তির প্রশংসায় জাগলো। মহারাজ সন্ন্যাসীর একান্ত অনুরক্ত এবং অনুগত হয়ে পড়লেন। লক্ষ্মীকান্ত ও তাঁর দলের লোকেরা হিংসেয় ফেটে যেতে লাগলেন এবং কি করে মহারাজের চোখে সন্ন্যাসীকে হীন প্রতিপন্ন করবেন, তারই উপায় দিবারাত্র চিন্তা করতে লাগলেন।

তার পর থেকে রাজ্যে চুরি-ডাকাতি বিদ্রোহ হতে লাগল, কিছুতেই থামে না। মহারাজ লক্ষ্মীকান্তকে ডেকে পাঠালেন। কি ব্যাপার? রাজত্বে এ রকম হচ্ছে কেন? লক্ষ্মীকান্ত উত্তর দিলেন—"মহারাজ, কিছুই তো বুঝতে পারছি না, পূর্ব্বে কখনও এমন হয়নি। আপনি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।" মহারাজ বললেন—"নির্ভয়ে বলো। রাজকার্য্যে ভয়ের স্থান নেই।" একটু ইতস্ততঃ করে লক্ষ্মীকান্ত বললেন—"দেখুন, বললে হয় ত বিশ্বাস করবেন না; আমার মনে হয়, এ সবের মূল হচ্ছেন সন্ন্যাসী। শাস্ত্রে বলেছে, অজ্ঞাত-কুলশীলকে বিশ্বাস করো না।" মহারাজ রেগে বললেন—"কি বলছ লক্ষ্মীকান্ত! এক জন সাধু ব্যক্তির নামে এমন হীন অপবাদ দিতে তোমার লজ্জা হলো না! আমায় প্রমাণ দেখাতে পার?" লক্ষ্মীকান্ত উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে পারি, আজ সন্ধ্যার পর।"

লক্ষ্মীকান্ত নিজের দলের লোকদের সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসীর কুটীরে গিয়ে হল্লা করতে শিখিয়ে দিলেন। তার পর কথামত মহারাজকে নিয়ে যখন সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন রীতিমত সেখানে বিদ্রোহীদের আড্ডা চলেছে। মহারাজ দূর থেকে সব দেখে-শুনে আত্মপরিচয় না দিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। পরদিন সভায় সন্ন্যাসীকে বিচারের জন্ম আনা হলো। অপরাধ অতি গুরুতর—রাজদ্রোহ। প্রকাশ্য দরবারে সন্ন্যাসী অভিযুক্ত হবার পর মহারাজ তাঁকে জিগ্যেস করলেন—"কিছু বলবার আছে?" তিনি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন,—"আমার কিছুই বক্তব্য নাই। মহারাজ যদি এত দিনে আমার প্রকৃতি না বুঝে থাকেন, তবে আমার দু'টো কথায় আর কি বুঝবেন!" লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে মহারাজ পরামর্শ করে সন্ন্যাসীর নির্ব্বাসনের আদেশ দিলেন। সন্ন্যাসী কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে প্রশান্ত ভাবে বললেন—"সন্ন্যাসী হয়ে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমার অন্যায় হয়েছিল। এ তার প্রায়শ্চিত্ত। আপনার অপরাধ নেই মহারাজ! ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন।"

অদ্ভুতের পর শান্ত-রস। বরোদা-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে শান্ত-রসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ভরত-নাট্যশাস্ত্রের 'রসাধ্যায়ে', নির্ণয়-সাগর কাব্যমালা-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজের অন্তর্গত নাট্যশাস্ত্রে অষ্ট-রস-বিবরণের পরই নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিতে দেখা যায় (১)। বরোদা সংস্করণের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমাংশে এমন একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহর্ষি ভরতের মতে নাট্য-রস আটটি মাত্র—শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানক-বীভৎস-অদ্ভুত (২)। পক্ষান্তরে, যে শ্লোকে ডক্টর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রসাধ্যায়ের বা কাব্যমালা ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, বরোদা-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায় সে স্থলে সমাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত তিনটি সংস্করণের সমাপ্তি-শ্লোক ১নং পাদটীকায় উদ্‌ধৃত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকের সংখ্যা ডক্টর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রসাধ্যায়ে ৮৪। কাব্যমালা ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে ৮২। আর বরোদা-সংস্করণে উহার সংখ্যা ১০২। ইহার পরই বরোদা-সংস্করণে পূর্ব্বোদ্‌ধৃত চরম শ্লোকটির পরিবর্ত্তে শান্ত-রসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আর উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, রস নয়টি (৩)। বরোদা-সংস্করণে ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম দিকের যে শ্লোকটিতে অষ্ট নাট্যরসের নাম পাওয়া যায়, তাহারও এমন একটি পাঠান্তর আছে, যাহাতে নয়টি নাট্যরসের নাম প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ—রৌদ্র—বীর—ভয়ানক—বীভৎস—অদ্ভুত—শান্ত (৪)। কাব্যমালা-সংস্করণে, ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত রসাধ্যায়ে ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে অবশ্য আটটি নাট্যরসেরই উল্লেখ আছে (৫)। কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণে প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্রের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে নব-রসেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (৬)। কিন্তু কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে উক্ত শ্লোকের পাঠ অন্যরূপ (৭)। এই সকল মতান্তর দর্শনে নাট্যশাস্ত্রের মূল শ্লোকগুলির বিভিন্ন পাঠ মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়া নির্ণয় করা অতি সুকঠিন—ভরত-নাট্যশাস্ত্র-মতে রস আটটি কিংবা নয়টি।

আচার্য্য উদ্ভট তাঁহার 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহে' বরোদা-সংস্করণে দৃষ্ট নব-নাট্যরস-সম্বন্ধীয় শ্লোকটি যথাযথ ভাবে গ্রহণপূর্ব্বক রসের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন—নয়টি নাট্য-রস (৮)। অবশ্য উদ্ভট এ কথা স্পষ্ট বলেন নাই যে, তিনি নাট্যশাস্ত্র হইতে উক্ত কারিকাটি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। তবে তাঁহার পাঠ নাট্যশাস্ত্রের কোন এক পাঠান্তরের অনুরূপ বলিয়া এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, উদ্ভটের আকর-গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বরোদা-সংস্করণে শান্ত রস সম্বন্ধে যে অতিরিক্ত মূলাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপর আচার্য্য অভিনবগুপ্তপাদের টীকাও আছে। টীকার ঐ অংশের উপোদ্‌ঘাতে আচার্য্য বলিয়াছেন—যাঁহারা নব-রস-বাদী, তাঁহাদিগের মতানুসারে শান্তরসের স্বরূপ বলা হইতেছে ইত্যাদি (৯)। ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রসাধ্যায়েও 'অভিনব-ভারতী'র এই অংশটুকু প্রদত্ত হইয়াছে (১০)। অথচ উহার মূলাংশ তিনি ছাপেন নাই। হয়ত যে পুঁথি দেখিয়া তিনি 'রসাধ্যায়' সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে নাট্যশাস্ত্রের উক্ত অতিরিক্ত মূলাংশটুকু ছিল না। কিন্তু অভিনব-ভারতীর উক্ত অতিরিক্ত টীকার মূলভাগ যে অন্ততঃ পাঠান্তর-রূপেও বর্ত্তমান থাকা সম্ভব—এরূপ ধারণা যে ডক্টর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রসাধ্যায়' সম্পাদন-কালে ছিল, তাহার কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন তিনি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কুত্রাপি ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। অথচ তাঁহার সম্পাদিত রসাধ্যায়ের মধ্যে প্রকাশিত অভিনব-ভারতীতেও নাট্য-শাস্ত্রের মূল হইতে প্রতীক উদ্‌ধৃত হইয়াছে (১১)। অথচ ঐ টীকাংশ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন—ষষ্ঠাধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে অষ্ট রসের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও উদ্ভট উহার যে পাঠ উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নব রসের উল্লেখ আছে ও অভিনবগুপ্তও সেই পাঠেরই অনুসরণ করিয়াছেন (১২)।

---

(১) "এবমেতে রসা জ্ঞেয়াস্ত্বষ্টৌ লক্ষণলক্ষিতাঃ। অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভাবানামপি লক্ষণম্"।—(৮৩ শ্লোক, কাব্যমালা ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ ; ৮৫ শ্লোক, ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের রসাধ্যায়)।

(২) "শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ"।—(নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ৬।১৬)।

(৩) "এবং নব রসা দৃষ্টা নাট্যজ্ঞৈর্লক্ষণান্বিতাঃ। এবমেতে রসা জ্ঞেয়া নব লক্ষণলক্ষিতাঃ। অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভাবানামপি লক্ষণম্"।—(নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ৬।১০৯)।

(৪) শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ"।—(নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ৬।১৬ পাঠান্তর)।

(৫) ২নং ফুটনোটে উদ্‌ধৃত শ্লোকটি দ্রষ্টব্য। উহা বরোদা-সংস্করণে ষষ্ঠাধ্যায়ের ১৬শ শ্লোক ; কিন্তু ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের কাব্য-মালা সংস্করণে ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে ১৫শ শ্লোক)।

(৬) "অব্যক্তরূপং সত্ত্বং হি জ্ঞেয়ং নবরসাশ্রয়ম্" (নাঃ শাঃ, কাব্যমালা, ২২।৩, পৃঃ ২৪১)।

(৭) "······ভাবরসাশ্রয়ম্" (নাঃ শাঃ, কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ,

(৮) "শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ"। (—উদ্ভট, কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, চতুর্থ-বর্গ, চতুর্থ শ্লোক)।

(৯) "যে পুনর্নব রসা ইতি পঠন্তি তন্মতে শান্তস্বরূপমভিধীয়তে" (—অভিনবভারতী, নাঃ শাঃ, বরোদা সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩)।

(১০) "যে পুনর্নব রসা ইতি পঠন্তি তন্মতে শান্তস্বরূপমভিধীয়তে তত্র কেচিদাহুঃ···" ইত্যাদি (—ডক্টর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রসাধ্যায়, অভিনবভারতী, পৃঃ ১০৯-১১৭)।

(১১) "'এবমেতে রসা জ্ঞেয়া নবে'তি'—রসাধ্যায়, অভিনব-ভারতী, পৃঃ ১১৭।

(১২) "It is curious to note that the text of Bharata. Chapter VI verse 15, in the most of the manuscripts, mentions eight rasas, which agrees also with the number mentioned in the last śloka, but the same śloka 15 quoted by Udbhata

নবম রস শান্ত—এই পক্ষ গ্রহণ করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বহু বিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শান্ত রস হইতে পারে কি না—ইহা প্রথম বিচার্য্য। বিচারের প্রক্রিয়া আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হইবে না—উহা ভবিষ্যতে অন্য এক বা একাধিক পৃথক্ প্রবন্ধে বিবৃত হইবে। তবে এ প্রসঙ্গে মহর্ষির পদাঙ্কানুসরণে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'শান্ত' নামে রস সম্ভব (১৩)। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিচার উঠিয়াছে—শান্ত-রসের স্থায়ী ভাব কি—শম না নির্ব্বেদ ? একদল আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—'শম' ও 'শান্ত' পদদ্বয় পর্য্যায়-স্বরূপ বলিয়া নির্ব্বেদই স্থায়ী—শম নহে। এ বিষয়ে অভিনবগুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—যেমন 'হাস' (স্থায়িভাব) ও 'হাস্য' (রস) পর্য্যায় হয় না, ঠিক সেইরূপ 'শম' (স্থায়িভাব) ও 'শান্ত' (রস) পর্য্যায় হইতে পারে না। আর 'নির্ব্বেদ' যদি তত্ত্বজ্ঞান-জনিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে 'শম'-স্থায়ীরই অপর নাম 'নির্ব্বেদ' বলা যাইতে পারে। অতএব, শান্ত-রসে শম স্থায়িভাব—নির্ব্বেদ নহে, যদি অবশ্য নির্ব্বেদের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করা হয় (১৪)।

মহর্ষি বলিতেছেন—

শান্তরস শম-স্থায়িভাবাত্মক ও মোক্ষের প্রবর্ত্তক। ইহা তত্ত্বজ্ঞান-বৈরাগ্য-আশয়-শুদ্ধি ইত্যাদি বিভাব-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যম-নিয়ম-অধ্যাত্মধ্যান ধারণা-উপাসনা-সর্ব্বভূতদয়া-লিঙ্গগ্রহণাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য। ইহার ব্যভিচারি-ভাব হইতেছে—নির্ব্বেদ-স্মৃতি-ধৃতি-সর্ব্বাশ্রমশৌচ-স্তম্ভ-রোমাঞ্চ ইত্যাদি (১৫)।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি কয়েকটি আর্য্যা-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

মোক্ষবিষয়িণী অধ্যাত্মচিন্তা হইতে সমুত্থিত, তত্ত্বজ্ঞান-রূপ প্রয়োজনীয় হেতু-সংযুক্ত, নিঃশ্রেয়সের নিমিত্ত উপদিষ্ট শান্ত-রসের সম্ভাবনা আছে (১৬)।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের সংরোধে চিত্ত অধ্যাত্মচিন্তা-সংশ্রিত হইলে সকল প্রাণীর সুখ-হিত-কর শান্তরস উৎপন্ন হয় (১৭)।

যাহাতে দুঃখ নাই—সুখ নাই—দ্বেষ নাই—মাৎসর্য্য নাই—যাহা সর্ব্বভূতে সম, তাহাই শান্ত-রস নামে প্রথিত (১৮)।

রতি-প্রভৃতি ভাবগুলি বিকার, শান্ত উহাদিগের প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে বিকৃতির উৎপত্তি ও পুনরায় প্রকৃতিতেই বিকৃতি-সমূহের বিলয় হইয়া থাকে (১৯)।

নিজ নিজ নিমিত্ত-লাভে শান্ত হইতে রত্যাদি ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার তত্তৎ নিমিত্তের অপগমে ঐ সকল ভাব শান্তেই লীন হইয়া যায় (২০)।

ভরত-নাট্য-শাস্ত্রের রসাধ্যায় এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী সপ্তমাধ্যায়ে মহর্ষি ভাব-লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন।

ধনঞ্জয়-কৃত দশরূপকের অবলোক টীকায় ধনিক শান্তরস-সম্বন্ধে সংক্ষেপে সুন্দর বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—শান্ত-রস-সম্বন্ধে বাদিগণ নানাপ্রকার পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করিয়া থাকেন। এক দল বলেন—'শান্ত' নামে কোন রসই নাই; যেহেতু, আচার্য্য উহার বিভাবাদির প্রতিপাদন করেন নাই বা লক্ষণও দেন নাই। অপর এক পক্ষ বলেন—পুস্তকস্থ সিদ্ধান্তে উহার সম্ভাবনা থাকিলেও জগদ্ব্যবহারে বস্তুতঃ উহার অভাব; যেহেতু, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত রাগ-দ্বেষাদি-প্রবাহের উচ্ছেদ করা অসম্ভব। তৃতীয় পক্ষ বীর-বীভৎসাদির মধ্যে উহার অন্তর্ভাব স্বীকার করেন;

---

followed by Abhinavagupta in his commentary"
—Dr. Mukherjee's Rasadhyaya, Preface, p. V.

(১৩) তস্মাদস্তি শান্তো রসঃ।...ইতিহাসপুরাণাভিধানকোশাদৌ চ নব রসাঃ শ্রূয়ন্তে, শ্রীমৎসিদ্ধান্তশাস্ত্রেম্বপি। তথা চোক্তম্—
"অষ্টানামিহ দেবানাং শৃঙ্গারাদীন্ প্রদর্শয়েৎ।
মধ্যে চ দেবদেবস্য শান্তং রূপং প্রকল্পয়েৎ"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪০

(১৪) "কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতো নির্ব্বেদ ইতি শমস্যৈবায়ং নির্ব্বেদ ইতি নাম কৃতং স্যাৎ। শমশান্তয়োঃ পর্য্যায়ত্বং তু হাসহাস্যাভ্যাং ব্যাখ্যাতং সিদ্ধং সাধ্যতে, যদলৌকিকত্বেন সাধারণাসাধারণতয়া চ বৈলক্ষণ্যং শমশান্তয়োরপি সুলভমেব, তস্মান্ন নির্ব্বেদঃ স্থায়ীতি"।
—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৬।

(১৫) শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। আমাদিগের ইন্দ্রিয় বা করণ দ্বিবিধ—(১) বহিরিন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ ও (২) অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ। বহিরিন্দ্রিয় দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ; (২) কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। অন্তরিন্দ্রিয়—মন। ইহার চারিটি বিভাগ—(১) মন—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক; (২) বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা; (৩) চিত্ত—স্মরণাত্মক; ও (৪) অহঙ্কার—গর্ব্বাত্মক। শম—মনোজয়; দম—বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ। আশয়শুদ্ধি—চিত্তশুদ্ধি বা সত্ত্বশুদ্ধি। যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য (কামেন্দ্রিয়-সংযম) অপরিগ্রহ (বিষয়গ্রহণে অস্বীকার)। নিয়ম—(শরীর ও মনের) শুচিতা, (লব্ধ বস্তুতে) সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন, প্রণব-জপ), ঈশ্বর-প্রণিধান (পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ)। অধ্যাত্মধ্যান—একাগ্রভাবে আত্মবিষয়িণী চিন্তা; ধ্যান—চিন্তার একতানতা। ধারণা—নাভি-হৃদয়াদি দেহাবয়বে অথবা কোন বাহ্যবস্তুতে জ্ঞানপূর্ব্বক চিত্তের বন্ধ বা স্থাপন। উপাসনা—বৈষ্ণব-মতে ইহারই অপর নাম ভক্তি; উপাস্যের প্রতি তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে চিত্ত-বৃত্তির প্রবাহ। লিঙ্গ—চিহ্ন—সন্ন্যাস-চিহ্ন—মস্তক-মুণ্ডন, বিবর্ণ (গৈরিকাদি) বসন ইত্যাদি।

(১৬) নিঃশ্রেয়স—যাহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই, অর্থাৎ মোক্ষ।

(১৭) সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরোধে চিত্ত আত্মচিন্তা-সংস্থিত হইয়া থাকে।

(১৮) দ্বেষ—অপকার। মাৎসর্য্য—পরগুণে দোষের আবিষ্কার।

(১৯) প্রকৃতি—উপাদান-কারণ, যেমন মৃত্তিকা; বিকৃতি—উহার কার্য্য, যেমন ঘটাদি।

(২০) একই মৃত্তিকা হইতে যেরূপ বিভিন্ন নাম-রূপাদি নিমিত্ত অবলম্বনে ঘট-শরাবাদি মৃন্ময় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, আবার ঐ নাম-রূপাদি নিমিত্তের বিলয়ে ঘট-শরবাদি বিকার একই মৃত্তিকা-রূপ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে,—ঠিক সেইরূপ একই শান্ত হইতে বিভিন্ন নিমিত্তবশে রতি-হাসাদি বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়। আবার নিমিত্ত-নাশে ভাবগুলি স্বকীয় বৈচিত্র্য হারাইয়া একই শান্তে বিলীন হইয়া যায়।

ইঁহারা শম-স্থায়িভাব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। মোটের উপর ধনিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—অভিনেয় নাটকাদিতে শমের স্থায়িত্ব নিষিদ্ধ। যেহেতু, শম হইতেছে সকল প্রকার ব্যাপারের (ক্রিয়ার) প্রবিলয়-স্বরূপ; উহা অভিনয়ে প্রদর্শনের অযোগ্য। কারণ, অভিনয় ক্রিয়াত্মক; উহা দ্বারা পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার স্বরূপ প্রদর্শন অসম্ভব (২১)।

এই প্রসঙ্গে ধনঞ্জয়-ধনিকের সিদ্ধান্ত এই যে, শান্তরস স্বরূপে অনির্ব্বাচ্য। তবে তাহার উপায়ভূত মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা প্রভৃতির আস্বাদন সহৃদয়গণ করিতে সমর্থ হন। ইহাকেই শান্ত-রসের (গৌণ) আস্বাদন বলা হইয়া থাকে।

বিচার-প্রসঙ্গে ধনিক বলিয়াছেন—শান্ত রসবাচ্য নহে বলিয়া যদিও নাট্যে উহার প্রবেশ-সম্ভাবনা নাই, তথাপি ইহা ত স্বীকার্য্য যে, সূক্ষ্ম-অতীতাদি সকল বস্তুরই শব্দ-দ্বারা প্রতিপাদিত হইবার যোগ্যতা আছে (অর্থাৎ শব্দ সকল বস্তুর প্রতিপাদনেই সমর্থ); অতএব, শান্ত-রস কাব্যের বিষয় হইবার পক্ষে বাধা থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে ধনঞ্জয় মূল কারিকায় বলিয়াছেন—শম-স্থায়ীর প্রকর্ষভূত শান্ত-রস অনির্ব্বাচ্য; তবে গৌণভাবে মুদিতা প্রভৃতি উপায় শান্ত-রসাত্মক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। যথায় সুখ-দুঃখ-চিন্তা-রাগ-দ্বেষ-ইচ্ছাদি কিছু নাই, সর্ব্বপ্রকার ভাবের মধ্যে শম প্রধান, সেই রসকেই মুনীন্দ্রগণ 'শান্ত' নাম দিয়া থাকেন। যদি শান্ত-রস এইরূপ লক্ষণাক্রান্তই হয়, তাহা হইলে এক মোক্ষ-দশায় আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তির অবস্থাতেই উহার প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। অতএব, স্বরূপতঃ উহা অনির্ব্বচনীয়। শ্রুতিও এই মোক্ষ-স্বরূপ শান্ত-রসকে 'নেতি' 'নেতি' বাক্য-দ্বারা নিষেধমুখেই প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকার শান্ত-রস সহৃদয়গণের আস্বাদন-যোগ্য কদাপি হইতে পারে না। তবে মোক্ষপ্রাপ্তির যে সকল উপায় যোগদর্শনে কথিত হইয়াছে—মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা—ইহাদিগের আস্বাদদ্বারাই শান্ত-রসের আস্বাদন গৌণভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে (২২)।

সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথের মতে—শান্তের স্থায়িভাব শম, উহা উত্তম-প্রকৃতিক, কুন্দেন্দু-সুন্দর-চ্ছায়, শ্রীনারায়ণ উহার অধিদেবতা। অনিত্যত্বাদি-হেতু-বশতঃ অশেষ বস্তুর নিঃসারতা অথবা পরমাত্ম-স্বরূপ ইহার আলম্বন। পুণ্য আশ্রম, হরিক্ষেত্র, তীর্থ, রম্যবনাদি ও মহাপুরুষ-সঙ্গ ইত্যাদি ইহার উদ্দীপন। রোমাঞ্চ, দয়া ইত্যাদি অনুভাব (২৩)। নির্ব্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি, ভূত-দয়া ইত্যাদি ব্যভিচারী।

দর্পণের টীকাকার শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে নির্ব্বেদ ইহার স্থায়িভাব। এই পক্ষে অবজ্ঞার বিষয়ভূত ধনসম্পত্তিই আলম্বন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রন্থকার-মতে নির্ব্বেদ ব্যভিচারী বলিয়া উহার স্থায়িত্ব স্বীকৃত হয় নাই; পক্ষান্তরে, শমই তাঁহার নিকট স্থায়িরূপে অনুভূয়মান হওয়ায় তিনি শমকেই স্থায়ী বলিয়াছেন (২৪)।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দয়াদি গুণের আতিশয্যবশতঃ শান্ত-রস দয়া-বীরাদির অন্তর্গত হইবে না কেন? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—অহঙ্কার-বর্জ্জিত বলিয়া ইহা দয়া-বীরাদির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। দয়া-বীরের সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত নাগানন্দের নায়ক জীমূতবাহন—যিনি সর্প শঙ্খচূড়ের জীবন-রক্ষার্থ গরুড়ের গ্রাসে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ বলেন যে, জীমূতবাহনের চরিত্রে প্রথমে মলয়বতীর প্রতি অনুরাগ ও শেষে বিদ্যাধরগণের চক্রবর্ত্তিত্ব-লাভ দর্শনে বুঝা যায় যে, তাঁহার অহম্ভাবের উপশম হয় নাই। শান্ত-রসে সর্ব্বতোভাবে অহঙ্কারের প্রশমন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ কারণে জীমূতবাহন দয়া-বীরের দৃষ্টান্ত—শান্ত-রসের নহেন (২৫)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শান্ত-রস যদি সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষ-চিন্তা-ইচ্ছাদি-বর্জ্জিত-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ত এক মোক্ষাবস্থায় এই আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থায় ত আর ব্যভিচারি-ভাবাদির প্রকাশ হইতে পারে না। তাহা

(২১) "শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য" (দশরূপক ৪।৩৫—ইহাতে বুঝা যায়, ধনঞ্জয় স্বয়ং শম-স্থায়ী স্বীকার করেন না; অন্ততঃ কাব্যে করিলেও নাট্যে করেন না)। "ইহ শান্তরসং প্রতি বাদিনামনেকবিধা বিপ্রতিপত্তয়ঃ। তত্র কেচিদাহুঃ—নাস্ত্যেব শান্তো রসঃ। তস্যাচার্য্যেণ বিভাবাদ্যপ্রতিপাদনাল্লক্ষণাকরণাৎ" (আচার্য্য—ধনঞ্জয়)। অন্যে তু বস্তুতস্তস্যাভাবং বর্ণয়ন্তি। অনাদিকাল-প্রবাহায়াতরাগদ্বেষয়োরুচ্ছেত্তুমশক্যত্বাৎ। অন্যে তু বীরবীভৎসাদাবন্তর্ভাবং বর্ণয়ন্তি। এবং বদন্তঃ শমমপি নেচ্ছন্তি। যথা তথাস্তু। সর্ব্বথা নাটকাদাবভিনয়াত্মনি স্থায়িত্বমস্মাভিঃ শমস্য নিষিধ্যতে। তস্য সমস্তব্যাপারপ্রবিলয়রূপস্যাভিনয়াযোগাৎ"—অবলোক (৪।৩৫)।

(২২) "নন্বু শান্তরসস্যানভিধেয়ত্বাদ্ যদ্যপি নাট্যেঽনুপ্রবেশো নাস্তি তথাপি সূক্ষ্মাতীতাদিবস্তুনাং সর্ব্বেষামপি শব্দপ্রতিপাদ্যতয়া বিদ্যমানত্বাৎ কাব্যবিষয়ত্বং ন নিবার্য্যতে। অতস্তদুচ্যতে—

শমপ্রকর্ষোঽনির্ব্বাচ্যো মুদিতাদেস্তদাত্মতা ॥ ৪৫ ॥

শান্তো হি যদি তাবৎ—'ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা। রসস্তু শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু শমপ্রধানঃ' ॥—ইত্যেবংলক্ষণঃ, তদা তস্য মোক্ষাবস্থায়ামেবাত্মস্বরূপা-

শ্রুতিরপি 'স এব নেতি নেতি' ইত্যন্যাপোহরূপেণাহ। ন চ তথাভূতস্য শান্তরসস্য সহৃদয়াঃ স্বাদয়িতারঃ সন্ত্যথ তদুপায়ভূতো মুদিতামৈত্রী-করুণোপেক্ষাদিলক্ষণস্তস্য চ বিকাশবিস্তারক্ষোভবিক্ষেপরূপতৈবেতি তদুক্ত্যৈব শান্তরসাস্বাদো নিরূপিতঃ" ॥—দশরূপকাবলোক (৪।৪৫)

মুদিতা—হর্ষ; পুণ্যশীল প্রাণিগণের প্রতি মুদিতা-ভাবনা কর্ত্তব্য। মৈত্রী—সৌহার্দ্দ; সুখী প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা কর্ত্তব্য। করুণা—পরদুঃখ-প্রহাণেচ্ছা; দুঃখী প্রাণিগণের প্রতি করুণা-ভাবনা কর্ত্তব্য। উপেক্ষা—মধ্যস্থভাব; অপুণ্যশীল প্রাণিগণের প্রতি উপেক্ষা-ভাবনা কর্ত্তব্য। এই উপায়-চতুষ্টয়-দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইয়া স্থিতিলাভ করে—একাগ্র হয়।

(২৩) "রোমাঞ্চাদ্যা ইত্যাদিপদেন দয়াদীনামপি গ্রহণম্"—রামতর্কবাগীশ-টীকা।

(২৪) "শান্ত ইতি অত্র নির্ব্বেদঃ স্থায়িভাবঃ। এতৎপক্ষে অবমাননীয়ত্বমেবালম্বনম্। নির্ব্বেদস্য ব্যভিচারিত্বেন স্থায়িত্বাযোগাৎ শমস্য স্থায়িত্বেনানুভূয়মানত্বাচ্চ গ্রন্থকৃতা তদুপেক্ষিতম্"।— রাঃ তঃ টীকা।

(২৫) "নন্বু শান্তে দয়াদ্যতিশয়সম্ভবেন দয়াবীরাদিরেবায়ম্—(রাঃ তঃ টীকা)। "নিরহঙ্কাররূপত্বাদ্দয়াবীরাদিরেষ নো" ॥—সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ) "দয়াবীরাদৌ হি জীমূতবাহনাদৌ অন্তরা মলয়বত্যনু-

হইলে আর উহাকে রস বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা চলে যে—যুক্ত-বিযুক্ত-দশায় অবস্থিত যে শম-স্থায়ী তাহাই যেহেতু রসত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব তদবস্থায় সঞ্চারি-ভাবাদির স্থিতি বিরুদ্ধ হইতে পারে না (২৬)। অর্থাৎ—ভোগ্য বিষয়-সমূহ হইতে প্রত্যাহরণ-পূর্ব্বক সাক্ষাৎকারের যোগ্য বস্তুতে মনোনিধান করিলে চিত্তার একতানতা বা একাগ্রতা হইয়া থাকে। ইহারই নাম ধ্যান বা সমাধি বা যোগ। এই যোগ-যুক্ত ব্যক্তির নাম সমাহিত—যোগযুক্ত বা 'যুক্ত'। এই যোগজ-ধর্ম্ম-সহকৃত মনের সাহায্যে জ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষাৎকার (অর্থাৎ—অপরোক্ষ অনুভূতি) হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত যোগের অভ্যাসে রত—ভূতেন্দ্রিয়জয়ী, পুরুষ প্রথমে নানা বিভূতি অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টকাম-সিদ্ধি ও দূর-দর্শন-দূর-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ অংশতঃ সিদ্ধ যোগী যখন সমাধি-দশায় অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে বলা যায় বিশেষরূপে সমাহিত—বিশিষ্ট যোগযুক্ত বা 'বিযুক্ত'। আর তদবস্থায় তাঁহার যোগজ-ধর্ম্ম-সহকৃত বাহ্যেন্দ্রিয়-সমূহ স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণে অলৌকিক-শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। অর্থাৎ—তৎকালে বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রহণযোগ্য মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট অথবা ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও কেবল যোগবলে গৃহীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, অতিসূক্ষ্ম বা ব্যবহিত বিষয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। তবে যোগবলে তাহাও হওয়া সম্ভব। এক কথায়—তখন অন্তঃকরণ একাগ্র হওয়ায় সেই অন্তঃকরণ-প্রেরিত বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি অতি সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বিষয়ের গ্রহণেও সামর্থ্য দেখাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান পূর্ণ-সিদ্ধ পুরুষকে 'যুক্ত-বিযুক্ত' বলা যায়। যুক্ত-বিযুক্ত পুরুষ একাধারে যেরূপ একাগ্রচিত্ত—যোগযুক্ত, সেইরূপ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিষয়-গ্রহণেও সমর্থ। যুক্ত পুরুষ কেবল একাগ্রচিত্ত। বিযুক্ত পুরুষ যোগাভ্যাসের ফলে অলৌকিক সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। আর যুক্ত-বিযুক্ত পুরুষ যোগযুক্ত অবস্থাতেও দূর-দর্শন-দূর-শ্রবণ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিষয়-গ্রহণাদি অলৌকিক-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন। এইরূপ যুক্ত-বিযুক্ত-দশায় অবস্থিত শম-স্থায়ী বিনা বাধায় বিভাবাদির সহিত যুক্ত হইতে পারে (২৭)।

আর একটি প্রশ্ন—এইরূপ আত্মস্বরূপাপত্তি-দশাতে ত পরমানন্দের অনুভূতি হইতে থাকে বলিয়া শাস্ত্রাদিতে (উপনিষৎ প্রভৃতি আত্ম-বিদ্যা-মূলক শাস্ত্রে) উক্ত হইয়াছে; তবে ঐ দশাতে 'সুখ নাই' ("ন যত্র দুঃখং ন সুখং") বলা হইল কেন? ইহারও উত্তরে বলা যায় যে, এস্থলে 'সুখ' শব্দটি বিষয়ভোগ-জনিত সুখকেই বুঝাইতেছে। বৈষয়িক সুখ-দুঃখের অতীত যে লোকোত্তর আনন্দ তাহা এই সুখ হইতে ভিন্ন। এই কারণেই বলা হয় যে—ইহলোকে কাম্য-বিষয়-ভোগের যে সুখ, অথবা স্বর্গ-ভোগ্য যে দিব্য-সুখ—এই উভয় প্রকার সুখই তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের ষোড়শ ভাগেরও তুল্য নহে (২৮)।

সর্ব্বপ্রকারে অহঙ্কার-রহিত হইলে পর দয়া-বীর, ধর্ম্ম-বীর, দান-বীর, দেবতা-বিষয়িণী রতি প্রভৃতি শান্ত-রসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে (২৯)।

'অহঙ্কার' বলিতে বুঝায় অভিমান। 'অভিমান' অর্থে মনে করা। দেহ-ইন্দ্রিয়-মনে 'অহম্' (অর্থাৎ 'আমি')—এই ভাবের আরোপ করার নাম 'অহঙ্কার' বা 'অহমভিমান'। দেহটাকে—ইন্দ্রিয়গুলিকে বা অন্তঃকরণকে আমি বা আত্মা বোধ করিলে 'অহঙ্কার' (আমি-ভাব—পরমহংসদেবের ভাষায় 'কাঁচা আমি') প্রকাশ পায়। দেহাদি-সম্বন্ধীয় পুত্র-গৃহ প্রভৃতিতে 'মম' (অর্থাৎ 'আমার')—এই ভাবের আরোপও ইহার আনুষঙ্গিক। এই 'আমি' ও 'আমার' ভাব সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হইলে দয়া-বীরাদি শান্ত-রসে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে—ইহাই দর্পণ-কারের উক্তির সার মর্ম্ম (৩০)।

সাহিত্যদর্পণের শান্ত-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় রসের বিবরণ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

দৃশ্যতে। শান্তস্ত সর্ব্বপ্রকারেণাহঙ্কারপ্রশমৈকরূপত্বাৎ তত্রান্তর্ভাব-মর্হতি"।—(সাঃ দঃ)। "তথা চাহঙ্কারাদিসম্বলিতো দয়াদিরেব দয়াবীরাদেৰ্ টকস্তদিতরঃ শান্তরস ইতি বিশেষঃ"।—রাঃ তঃ টীকা।

(২৬) "নন্বু—'ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা। রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু সমপ্রমাণঃ'—ইত্যেবংরূপস্য শান্তস্য মোক্ষাবস্থায়ামেবাত্মস্বরূপাপত্তি-লক্ষণায়াং প্রাদুর্ভাবাৎ তত্র সঞ্চার্য্যাদীনামভাবাৎ কথং রসত্বমিত্যুচ্যতে।

যুক্তবিযুক্তদশায়ামবস্থিতো যঃ শমঃ স এব যতঃ।
রসতামেতি তদস্মিন্ সঞ্চার্য্যাদেঃ স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধা"।—
(সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ)

'সমপ্রমাণঃ'—'শমপ্রধানঃ' এইরূপ পাঠও দেখা যায়। তবে তাহা খুব সঙ্গত নহে। 'সম' (তুল্য) প্রমাণ (প্রতীতি) যাহার—বিষ্ঠা-চন্দন লোষ্ট্র-কাঞ্চন ইত্যাদি বিভাবে দ্বেষ-রাগ বর্জ্জন-হেতু তুল্য বোধ যাহার—এই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। "দ্বেষো রিপূণাম-পচিকীর্ষা রাগঃ সুহৃদামুপচিকীর্ষা ইচ্ছা বৈষয়িকসুখতদুপায়েচ্ছা ভাবেষু পদার্থেষু লোষ্ট্রকাঞ্চনাদিবিভাবাদিষু সৎসু রাগ-দ্বেষরাহিত্যেন সম-বিষমং প্রমাণং প্রতীতির্যেন। শমপ্রধান ইতি পাঠস্তু ন

(২৭) "বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য সাক্ষাৎকর্ত্তব্যে বস্তুনি মনো নিধায় বর্ত্তমানশ্চিন্তাসন্তানবান্ যুক্তঃ। যস্য যোগজধর্ম্মসহকৃতেন মনসা জিজ্ঞাসিতবস্তুসাক্ষাৎকারো জায়তে। যশ্চ ভূতেন্দ্রিয়জয়ী অণিমাদ্যাঃ কামসিদ্ধীর্দূরশ্রবণাদ্যাশ্চ ইন্দ্রিয়সিদ্ধীরাসাদিতবান্ স সমাধ্য-স্থিতো বিযুক্তঃ। যস্য যোগজধর্ম্মসহকৃতানি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি স্বে স্বে বিষয়ে মহত্ত্বসন্নিকর্ষাদিসহকারিনিরপেক্ষাণি বর্ত্তন্তে স এব যুক্তবিযুক্তঃ"—রাঃ তঃ টীকা।

(২৮) "যশ্চাস্মিন্ সুখাভাবোঽপ্যুক্তস্তস্য বৈষয়িকসুখপরত্বান্ন বিরোধঃ। উক্তং হি—'যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্'"—(সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ)

(২৯) "সর্ব্বাকারমহঙ্কাররহিতত্বং ব্রজন্তি চেৎ। অত্রান্তর্ভাব-মর্হন্তি দয়াবীরাদয়স্তথা॥ আদিশব্দাৎ ধর্ম্মবীরদানবীরদেবতাবিষয়-রতিপ্রভৃতয়ঃ" (সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ)

(৩০) "সর্ব্বাকারং সর্ব্বপ্রকারং এতেনাহঙ্কারসামান্যাভাবঃ প্রতীয়তে। সর্ব্বং দেহেন্দ্রিয়াদি আকার আশ্রয়ো যস্য তত্তথা। অহঙ্কারোঽভিমানঃ...অভিমানশ্চ দেহেন্দ্রিয়য়োরহমিত্যারোপঃ। দেহাদি-

মহারাষ্ট্রের পথে

বাল্যকাল হইতেই দেশভ্রমণে আমার ইচ্ছা প্রবল। ছেলেবেলায় মোটর-গাড়ীতে চড়িলেই মনে হইত, আমি 'সুদূরের পিয়াসী' এবং বহু দূর দেশের যাত্রী। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই আজ প্রায় বিশ বৎসর গৃহহীন পরিব্রাজক-বেশে সিংহল, বর্ম্মা এবং ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে ঘুরিয়াছি। ভ্রমণকালে গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র ও কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান করিয়াছি—প্রসিদ্ধ বহু তীর্থ দর্শন করিয়াছি এবং নীলগিরি, (সিংহলের) নিউয়ারা এলিয়া শিলং শৃঙ্গ, ত্র্যম্বক পর্ব্বত, দার্জ্জিলিং, মসুরী, কোয়েটা, মায়াবতী প্রভৃতি পাহাড়ে বিচরণ করিয়াছি। গত দুই বৎসর করাচী-প্রবাসের সময় সিন্ধুদেশ ও বেলুচিস্থানের দর্শনীয় স্থানগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছি। বাকী ছিল কাথিয়াবাড় এবং মহারাষ্ট্র; তাহাও এইবার শেষ করিলাম।

বোম্বাই

করাচী হইতেই বোম্বাই আসিলাম। বোম্বাই শুধু মহারাষ্ট্রের বৃহত্তম নগর নয়, বোধ হয় সমগ্র হিন্দুস্থানের বৃহত্তম নগর। সহরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। নগরবাসিগণ গৃহে বসিয়াই আরব উপসাগরের তরঙ্গমালা দেখিতে পান। বন্দরটিও বিরাট্ এবং জাহাজে পরিপূর্ণ। সহরে আসিয়াই প্রথমে ৺মুম্বা দেবী দর্শন করিলাম। এই দেবীর নামানুসারেই সহরের নাম মুম্বাই বা বোম্বাই হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় বা মারাট্টিগণ এখনও 'মুম্বাই' শব্দ ব্যবহার করেন। বোম্বাইয়ে যত প্রাসাদোপম বৃহৎ অট্টালিকা আছে, বোধ হয়, কলিকাতায় তত নাই। পাশ্চাত্ত্যের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের ইহা একটি প্রধান দ্বার। প্রথমে দেখিলাম—'Gateway of India.' তাজমহল হোটেলের কাছেই। এই সুউচ্চ তোরণটি সমুদ্রবক্ষ হইতে দেখা যায়। সহরের এই অঞ্চলেই বিশ্ববিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, মিউজিয়াম, বিজ্ঞান-মন্দির, টাউনহল প্রভৃতি বিরাজিত। কলিকাতার ন্যায় এখানেও 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী'র একটি শাখা আছে। এখানে উক্ত সোসাইটীর শাখা টাউনহলের একাংশে অবস্থিত এবং ইহার একটি বিশাল গ্রন্থাগার আছে। জাহাঙ্গীর কাউয়াসজী হলটি বোম্বাইর বৃহত্তম বক্তৃতা-গৃহ। এই সহরটি লম্বায় বড় এবং খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী জামসেদ টাটা-পরিবারের স্যার রতন টাটা-প্রমুখ দানবীরগণের দান-ভাণ্ডারের অর্থে নির্ম্মিত বহু অট্টালিকা এখানে আছে, সেখানে শত শত মধ্যবিত্ত পার্শী সপরিবারে নামমাত্র ভাড়া দিয়া থাকিতে পারে। আমরা একটি পার্শী কলোনিতে গেলাম। তাহাতে প্রায় আড়াই শত পরিবার এই ভাবে বাস করিতেছেন। করাচীর মত এখানেও বহু পার্শী হিন্দুভাবাপন্ন। একটি পার্শীর উপাসনা-গৃহে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ-প্রমুখ হিন্দু সাধকগণের ছবি দেখিলাম।

বোম্বাই সহর বৃহত্তর বঙ্গের একটি বড় কেন্দ্র। এখানে বহু শত বাঙ্গালী আছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চপদস্থ। এলফিন্‌ষ্টোন (গবর্ণমেণ্ট) কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য্য ৺ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের যোগ্য-পুত্র ডক্টর শীল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি। পার্শীদের সুবিখ্যাত তাজমহলে হোটেলের (এ হোটেলটি এশিয়ায় না কি অতুল!) ম্যানেজার বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালী ডক্টর দাশ এখানকার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ। শক্তি ও সাধনা ঔষধালয়দ্বয়ের শাখা এখানে আছে। প্রবাসী বাঙ্গালীগণ সহরের দুই উপকণ্ঠে গত ১০।১২ বৎসর যাবৎ প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার গৌরব শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি আশ্রম সহরের এক প্রান্তে খারে আছে। তাহাদের হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার ও ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতিতে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট। কলিকাতার ন্যায় এখানে বাস ও ট্রাম আছে; তবে কলিকাতার ট্রাম বোম্বাইয়ের ট্রাম অপেক্ষা অনেক উন্নত। এখানে সহরের মধ্য দিয়াই রেল-গাড়ী যাতায়াত করে—তবে এখানে মাদ্রাজ সহরের মত ইলেক্‌ট্রিক্ (বিদ্যুৎ-চালিত) রেলগাড়ী খুব চলে। কিন্তু কলিকাতায় ইলেক্‌টিক্ ট্রেন নাই। এখানে সহরের মধ্যে এবং বাহিরে বহু দূর পর্য্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেন চলে। পুণা অবধি এই ট্রেনে যাইতে পারা যায়। ভাড়াও বেশ সস্তা। প্রায় পনের মিনিট পর-পর সহরে গাড়ী যাতায়াত করে। সহরটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া লম্বায় বড়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের হাওয়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, গরম তাই অসহ্য বোধ হয় না। গৌড়ীয় মঠের একটি শাখাও এখানে আছে। থিওজফিক্যাল সোসাইটী, আস্তিক-সমাজ, শঙ্কর মঠ, প্রার্থনা-সমাজ প্রভৃতি বহু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান এখানে আছে।

বাঙ্গালার ব্রতচারী আন্দোলনের ন্যায় মহারাষ্ট্রে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামক একটি আন্দোলন আছে। সমগ্র হিন্দুস্থানে উহার বারো শত শাখা আছে। গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হেড্‌গেয়ার এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা আজ পরলোকে। এই সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষাধিক। এক কোটি হিন্দুকে এই সঙ্ঘভুক্ত করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। অধ্যাপক গোলবলকার এই সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ। তিনি পূর্ব্বে কিছু দিন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অবিবাহিত এবং স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী ভক্ত। অধ্যাপক গোলবলকার ইংরেজিতে "We or our naticnhood defined" নামক একটি চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা লিখিয়াছেন। বইখানিতে দেশসেবক শ্রীএম, এস, এ্যানে'র একটি বিস্তৃত ভূমিকা আছে। উক্ত পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানে হিন্দু-সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের ভিত্তিতেই হিন্দু জাতিকে গঠন করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির আদর্শে রাষ্ট্রগঠন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। জাতি ও রাষ্ট্র এক বস্তু নহে। রাষ্ট্রের ভিত্তি রাজনীতি, আর জাতির ভিত্তি সংস্কৃতি ও সভ্যতা। বাংলার প্রতাপাদিত্য, রাজপুতানার রাণা প্রতাপসিংহ, পঞ্জাবের রণজিৎসিংহ এবং মহারাষ্ট্রের শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মহাজাতি গঠন। ডাঃ হেড্‌গেয়ার ও অধ্যাপক গোলবলকার তাঁহাদের সঙ্ঘের সভ্যগণকে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষকরূপে প্রস্তুত করিতেছেন। সভ্যগণকে লাঠিখেলাদির দ্বারা শরীরচর্চ্চা করিতে হয়। তাহারা অধিকাংশই যুবক। মারাট্টী যুবকগণ খুব তেজস্বী ও বলীয়ান্। হিন্দু মহাসভা আন্দোলন এই বীরভূমি মহারাষ্ট্র হইতেই উৎপন্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাসভার সভাপতি বারিষ্টার সাভারকর ও ডাঃ মুঞ্জে মহারাষ্ট্রের বীরসন্তান। মহাসভার সভাপতি ভি, ডি, সাভারকর তাঁহার 'Hindutva' নামক ইংরেজি গ্রন্থে এবং তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীজি, ডি, সাভারকর তাঁহার 'রাষ্ট্রীয় মীমাংসা' নামক মারাট্টী

গ্রন্থে হিন্দুর জাতিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রে হিন্দুদের মহা-জাগরণ আসিয়াছে।

বোম্বাইয়ে এলিফ্যাণ্টা ও বোরিভলি নামক স্থানে অনেক বৌদ্ধ-গুহা আছে। এইগুলি যাত্রিগণের দর্শনযোগ্য। এই সহরে বৌদ্ধ-সমিতি নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের একটি প্রতিষ্ঠান আছে—উহা হইতে 'বৌদ্ধ-প্রভা' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সহরের মালাবার পাহাড়ে 'Hanging Garden'টিতে নানা প্রকারের ফুলের গাছ দেখিলাম। Madras Marina এবং Colombo Blackএর মত বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরও অতি রমণীয় স্থান। এই সহরটি গুজরাটীদের একটি বড় আড্ডা এবং পার্শীদের প্রধান বাসস্থান। এখানকার Victoria Terminus ভারতের বৃহত্তম রেলওয়ে ষ্টেশন।

নাসিক

বোম্বাই হইতে নাসিক যাই। নাসিক মহারাষ্ট্রের ৺কাশীধাম। বোম্বাই হইতে প্রায় ১১০।১২ মাইল দূরে। অর্দ্ধেক পথ ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনে যাইতে হয়। পথে প্রায় ১৫।২০টি Tunnel বা সুড়ঙ্গ পড়ে। দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে রেলপথ গিয়াছে। কোন কোন টানেল এক মাইল লম্বা। করাচী হইতে কোয়েটা যাইতে বেলুচিস্থানের পাহাড়ে এইরূপ বহু টানেল আছে। জি, আই, পি লাইনে নাসিক রোড ষ্টেশনে নামিয়া মোটর-বাসে পাঁচ মাইল গেলে নাসিক সহর পাওয়া যায়। নাসিক সহরটি ছোট এবং পবিত্র-সলিলা গোদাবরী নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। এইখানে প্রাচীন তীর্থ পঞ্চবটী। পঞ্চবটীতে ভগবান্ রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতা-দেবী সহ কয়েক বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করেন। পঞ্চবটীতেই সীতাগুহা আছে। সীতাগুহা শতাধিক ফিট গভীর। এই গুহাতে সীতাদেবী থাকিতেন। পঞ্চবটীতে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। বট গাছটি অতি প্রাচীন মনে হইল। নাসিক রামক্ষেত্র। এই স্থানের শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রসিদ্ধ। গোদাবরীতে স্নান করিয়া ৺কপালেশ্বর শিবমন্দির দর্শন করিতে হয়। এই শিবমন্দির না কি শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দর্শন করিয়াছিলেন। রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা লক্ষ্মণকে পতিরূপে পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূর্পণখার নাসিকা কাটিয়া দেন। তদনুযায়ী এই তীর্থের নাম হইয়াছে নাসিক।

নাসিকে একটি কলেজ আছে। তাহাতে প্রায় ৩০০ শত ছাত্রছাত্রী। কলেজটি গোখেল শিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত। কলেজে কুমারী সেন নামক একটি মাত্র বাঙ্গালী ছাত্রী আছে। তাহার পিতা মধ্যপ্রদেশে কর্ম করেন। শ্রীউপেন্দ্র-মোহন সাহা নামক বাঙ্গালী অধ্যাপক এই কলেজে আছেন গত ১০।১২ বৎসর যাবৎ। নাসিক ইলেকট্রিক কোম্পানির ম্যানেজার এক জন বাঙ্গালী মিঃ এস, এন, মিত্র। কলেজের জনৈক অধ্যাপক আঠাবলের গৃহেই আমরা অতিথি ছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত এবং স্বগৃহের নাম দিয়াছেন 'রামকৃষ্ণ ধাম'। তিনি মারাঠী ভাষায় "হৃৎপদ্ম' বা 'পরমহংস-প্রতিভা' নামক একটি বই লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক বিলাত-ফেরৎ এবং ফরাসী ভাষা উত্তমরূপেই শিখিয়াছেন। রোঁমা রোলাঁ ফরাসী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সারগর্ভ যে দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা তিনি ফরাসী ভাষায় পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত পুস্তকদ্বয়ের ভারতে প্রচলিত ইংরেজি অনুবাদ মূলানুগত নহে। কয়েক স্থানে তিনি মূল ফরাসী ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি ও তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী বাঙ্গালা শিখিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত "কথামৃত" পাঠ করিবার জন্য। তাঁহার বাড়ীতে বাঙ্গালায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী প্রায় সবই দেখিলাম। পরমহংসদেব যে বাঙ্গালা গানগুলি গাহিয়া সমাধিস্থ হইতেন, সেইগুলি তিনি গাহিতে ও হারমোনিয়ামে বাজাইতে জানেন। গাহিয়া ও বাজাইয়া তিনি আমাদের কয়েকটি গান শুনাইলেন। গ্রন্থের নাম 'হৃৎপদ্ম' কেন রাখিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-পদ্ম যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল আর সেইরূপ কাহারও হয় নাই। হৃৎপদ্মের যেমন দ্বাদশটি পাপড়ি—তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বাদশটি প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের জনৈক গুজরাটী ব্রহ্মচারী এখানে থাকেন। তিনিও বাঙ্গালা পড়িতে ও বলিতে পারেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব-প্রচারে তিনি এখানে খুব যত্নশীল। তাঁহার ঘরেও অনেক বাঙ্গালা পুস্তক আছে এবং তিনিও বাঙ্গালা গান গাহিতে পারেন।

নাসিকে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু মঠ ও আশ্রম আছে। আমরা কৈলাস মঠ দেখিতে গেলাম। ইহার অধ্যক্ষ মণ্ডলেশ্বর মুরলীধরানন্দ স্বামী। ইঁহার বিহারী শরীর। নাসিকে এক অদ্ভুত সাধু দেখিলাম। তিনি পূর্ব্বে পোষ্ট অফিসে চাকুরী করিতেন। চাকুরী ছাড়িয়া গত ২০।২২ বৎসর এখানে মৌন হইয়া আছেন। বৈরাগ্যের প্রাবল্যে তিনি প্রথম ১০।১২ বৎসর কপালেশ্বর শিব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্নান, আহার ও নিদ্রা তুচ্ছ করিয়া সাধনায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত ৫।৭ বৎসর জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সাধুকে একটি কুটীরে রাখিয়া সেবাদি করিতেছেন। সাধু বাক্‌শক্তিহীন নহেন। তিনি কথা বলিতে পারেন। তবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২।১টির বেশী কথা বলেন না। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কেমন আছেন?' তিনি মারাঠিতে বলিলেন, 'ভাল আছি, বেশ ভাল আছি'। শিশুর মত তাঁহাকে খাওয়াইতে, শোয়াইতে ও মলমূত্র ত্যাগ করাইতে হয়। সাধুটির প্রসন্ন-গম্ভীর মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে অভিভূত। নাসিকে কোলাপুর শঙ্কর মঠের শঙ্করাচার্য্য ডাঃ কুর্ত্তকোটীর সহিত দেখা হইল। তিনি মলোবারী। 'Heart of the Gita' নামক তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থখানি শিকাগো প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানির পাঁচ-ছয়টি সংস্করণ হইয়াছে। ডাঃ কুর্ত্তকোটী নাসিকেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। ইন্দোর-মহারাজের মার্কিণ পত্নীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পূর্ব্বে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত এবং অতি অমায়িক ব্যক্তি।

নাসিক সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুই হাজার ফিট উচ্চ এবং খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা দাক্ষিণাত্যের উপত্যকার মধ্যে। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের সহ্যাদ্রি শ্রেণীর উপরে নাসিক, পুণা ও মহাবালেশ্বর প্রভৃতি স্থান অবস্থিত। নাসিকে বৎসরে ৪০।৫০ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি হয়। এই

তীর্থস্থানে একটা জমাট ধর্ম্মভাব আছে। নাসিক হইতে ১৭।১৮ মাইল দূরে ত্র্যম্বক পর্ব্বত ও ত্র্যম্বকেশ্বর শিব। মোটর-বাসে করিয়া আমরা ত্র্যম্বকে গেলাম। ত্র্যম্বক পাহাড় প্রায় ৪৫০০ ফিট উচ্চ। আমরা প্রায় ১১।১২ ঘণ্টায় পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিয়া ব্রহ্মগিরি গঙ্গাঘারাদি দেখিলাম। গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থান এই ত্র্যম্বক পর্ব্বতে। আমরা গোদাবরীর উৎপত্তিস্থানে স্নান করিয়া শরীর, মন শুদ্ধ করিলাম। ত্র্যম্বক-শৃঙ্গ হইতে চতুর্দ্দিকে বহু মাইল-ব্যাপী হরিতক্ষেত্রের স্বর্গীয় দৃশ্য অপূর্ব্ব। হিমালয় পাহাড়ের বক্ষ হইতে উত্তর-শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইলেও বিস্তৃত ভূখণ্ডের এইরূপ মনোহারী দৃশ্য পাওয়া যায় না। ত্র্যম্বক পাহাড়ে শিবাজী-নির্ম্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। এই পাহাড়ের গাত্রদেশে বহু গুহা দেখা যায়। এই সকল গুহায় সাধু-মুনিগণ তপস্যা করিতেন এবং এখনও অনেকে করেন। ত্র্যম্বক-শৃঙ্গে বসিলে মন এক দেবভাবে আপ্লুত হয়। এখানে সত্যই অনুভব করা যায় যে, ইহা দেবভূমি! এইরূপ উচ্চ স্থানে উঠিলে সমতল ভূমির সঙ্কীর্ণতা স্বতঃই মন হইতে অপসৃত হয়। ত্র্যম্বক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র এবং তীর্থস্থান। এখানে বৎসরে প্রায় ১৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। আমরা সেই দিনই ত্র্যম্বক হইতে নাসিকে ফিরিলাম। নাসিকে অনেকগুলি হাই-স্কুল, একটি পুলিশ ট্রেনিং-স্কুল এবং ডাঃ মুঞ্জে-প্রতিষ্ঠিত ভোঁসলে মিলিটারী স্কুল আছে। শেষোক্ত স্কুলটিতে হাই-স্কুলের কোর্সও পড়ান হয়। স্কুলের কোর্স চারি বৎসরের এবং প্রত্যেক বৎসর এক শত করিয়া ছাত্র লওয়া হয়। বিখ্যাত মারাঠি ভক্ত-গায়ক ৺বিষ্ণুদিগম্বরের জন্মস্থান এই নাসিকে। তাঁহার গৃহে ৺রামচন্দ্র-মন্দিরে "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। পতিতপাবন সীতারাম"—এই পদটি দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা গীত হইতেছে। বিষ্ণুদিগম্বরের শিষ্য ভাতখণ্ডে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভাতখণ্ডের সঙ্গীত-গ্রন্থগুলি ভারত-প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্র আজও রামায়ণ ও মহাভারতাদির পুণ্যস্মৃতি বুকে করিয়া আছে। সমগ্র হিন্দুস্থান ভ্রমণ করিলে মনে হয়, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যও নিহিত আছে। শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী মহারাষ্ট্রে ১১৫০টি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, প্রচার ও সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নাসিকে স্বামী রামদাসের সমাধি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত একটি মঠ দেখিলাম। রামদাসজীর "দাসবোধ" গ্রন্থ একখানি উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ। তুলসী-দাসী রামায়ণ বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'দাসবোধে'র বাঙ্গালা অনুবাদ এখনও হয় নাই। এই রামদাসই সম্রাট্ শিবাজীকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া মহারাষ্ট্রের পতাকা গৈরিকরঞ্জিত করিয়াছিলেন।

পুণা

নাসিক হইতে পুণায় যাই। পুণা নাসিকের মতই দুই হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত। ইলেকট্রিক ট্রেণে বোম্বাই হইতে পুণা সাড়ে ৩ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। বোম্বাই হইতে পুণা মাত্র ১১৪ মাইল। পুণা অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সহর। হিন্দু ইতিহাসের এক অমর অধ্যায় এই স্থানেই লিখিত হইয়াছে। ইহা মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। বোম্বাইয়ের ন্যায় পুণা হইতেও বহু মূল্যবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত প্রস্থান-ত্রয়-ভাষ্য নির্ভুল ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। ৪৫০০ ফিট উচ্চ মহাবালেশ্বর পাহাড় এখান হইতে প্রায় ৭১ মাইল দূরে মোটর-বাসে যাইতে হয়। এখানে বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। সহরের এক প্রান্তে সহস্রাধিক ফিট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপরে ৺পার্ব্বতীদেবীর মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন এবং পেশোয়াগণের উপাসনা-স্থল। মন্দির হইতে পুণা সহরের একটি সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। সহরের চারি দিকে উচ্চ পর্ব্বতের প্রাকৃতিক প্রাচীর। বহু মাইল-ব্যাপী পাহাড়ের গাত্রে অসংখ্য সেনানিবাস আছে। পার্ব্বতীদেবীর সম্মুখে 'সপ্তশতী'র নারায়ণী-স্তোত্র পাঠ করিলাম। পার্ব্বতী জাগ্রতা দেবী বলিয়া মনে হইল। হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তীর্থস্থানে; তাই হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ এবং হিন্দুসংস্কৃতি ধর্ম্মমূলক। আর পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতা ও সহরের সৃষ্টি বাণিজ্য-স্থানে ও যন্ত্র-নির্ম্মাণকেন্দ্রে। সেই জন্য পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতি জড়বাদ-মূলক। হিন্দু সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইহা কত জাতির উত্থান ও পতন দেখিয়াছে, কিন্তু স্বয়ং বাঁচিয়া আছে।

পুণায় ভারতীয় মেটিওরোলজিকাল বিভাগের হেড অফিস আছে। এই বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাঙ্গালী ডক্টর ব্যানার্জ্জি। এই বিভাগে ডক্টর সুপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ও ডক্টর উৎসব বসু ও অন্যান্য কয়েকটি বাঙ্গালী আছেন। পুণাতে প্রায় ১৫০।২০০ বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে আছেন। গত বৎসর হইতে তাঁহারা প্রতিমা গড়িয়া দুর্গাপূজা করিতেছেন। ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি জার্ম্মেনির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন। শুনিলাম, মেটিওরোলজিক্যাল বিভাগের হেড অফিস দিল্লীতে শীঘ্র স্থানান্তরিত হইবে। এখানে একটি ক্ষুদ্র বিবেকানন্দ সোসাইটী আছে। সর্দ্দার মুদালিয়র নামক জনৈক তামিল ইহার সম্পাদক। ইনি রামকৃষ্ণভক্ত। উক্ত সোসাইটীর উদ্যোগে প্রতি বৎসর স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পুণাতে অনুষ্ঠিত হয়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে একটি নূতন জাতীয় উৎসব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম গণেশ-উৎসব। গণেশ চতুর্থীতে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর যেমন ৺দুর্গাপূজা, মারাঠির তেমনি গণেশ-উৎসব। মৃন্ময়ী প্রতিমায় গণপতির পূজা হয়। এই উৎসবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। আমরা গণেশ উৎসবের সময়েই এখানে উপস্থিত ছিলাম। উৎসব দেখিয়া মনে হইল, হিন্দুর পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় আনন্দোৎসবই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া। আমাদের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের মূলে আছে ধর্ম্ম। তাই স্বামী বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন ধর্ম্মজাগরণ। ধর্ম্ম-জাগরণ দ্বারাই সহজে হিন্দুর জাতীয় জাগরণ আসিবে। পুণা হইতে ১০।১২ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে শিবাজীর দুর্গ সিংহগড়। জ্ঞানেশ্বর ও তুকারাম-প্রমুখ মহারাষ্ট্রীয় সাধুগণের জন্মস্থান পুণার অদূরে। অধ্যাপক কার্বে পুণায় নারী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার জনৈক মহিলা। পুণায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, আইন কলেজ, ফার্গুসন কলেজ, শিবাজী মিলিটারী-স্কুল ও বহু হাই-স্কুল আছে। পুণাতে মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় নামক একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়

এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। গোখ্‌লে-প্রতিষ্ঠিত "Servant of India Society" দেখিলাম। ইহা একটি নির্জন স্থানে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত! সোসাইটীর অদূরে একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গে পটবর্দ্ধন ও দেবধর নামক বন্ধুদ্বয়ের সহিত মহামতি গোখ্‌লে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন। সেই স্থানে একটি প্রস্তর-বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানটি এখন মারাট্টি যুবকগণের নিকট খুব পবিত্র। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শত শত যুবক-যুবতী এই একান্ত স্থানে যাইয়া গোখ্‌লের অশরীরী আত্মার নিকট স্বদেশপ্রীতির অনুপ্রেরণা লাভ করে। Servants of India Societyর কাছেই Bhandarkar Oriental Research Institute. ডাঃ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এক জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সংস্কৃতবিৎ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহার পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু কাল ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। উক্ত ওরিয়েণ্ট্যাল ইনষ্টিটিউট্ একটি ভারতবিখ্যাত সংস্কৃত গবেষণাগার। এই প্রতিষ্ঠান হইতে সম্প্রতি মহাভারতের একটি সংশোধিত বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে তেমন গবেষণাগার নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বিশ্বভারতীতে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় একটি সুবৃহৎ গবেষণাগারের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

পুণায় অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিবাস। এক সময় এখানে সংস্কৃতের খুব চর্চ্চা হইত, এখনও কিছু কিছু হয়। এখানে গোখেল শিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক বহু কলেজ ও স্কুল পরিচালিত হয়। এই সমিতির স্কুল-কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ শিক্ষাপ্রচারের ব্রতধারী ও অল্প পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করেন। গোখেল বাঙ্গালীদের ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সত্যই করিয়াছিলেন—'বাঙ্গালী আজ যা ভাবে, অবশিষ্ট ভারত আগামী কাল তা ভাববে'। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে এবং এমন কি, রাজনীতিতেও বাঙ্গালা এখনও ভারতে সর্ব্বাগ্রণী। জাতীয় আন্দোলনের উৎসই বাঙ্গালা। কংগ্রেসে আজ বাঙ্গালার উচ্চস্থান না থাকিলেও কংগ্রেস বাঙ্গালার মত ত্যাগ করিতে পারে নাই। চিত্তরঞ্জনের মত প্রথমে কংগ্রেস গ্রহণ না করিলেও শেষে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গান্ধী সুভাষচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করিলেও কংগ্রেস আজ সুভাষচন্দ্রের মতানুবর্ত্তী। মারাট্টি ভাষা বেশ সমৃদ্ধ। একমাত্র মারাট্টি ভাষায় গীতার উপর দু'খানি ভাল টীকা রচিত হইয়াছে—একখানি জ্ঞানেশ্বর-কৃত, অপরটি বালগঙ্গাধর তিলকের। তিলকের গীতারহস্য ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকার বাঙ্গালা তর্জমা এখনও হয়নি। জ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতানুভব' নামক একটি অপূর্ব্ব মারাট্টি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে। জ্ঞানেশ্বরের গীতাটীকা এবং 'অমৃতানুভব' মারাট্টিগণ কর্ত্তৃক বহু ভাবে পঠিত হয়। জ্ঞানেশ্বরের গীতা টীকার' উপর তিলকের গীতারহস্য বিরচিত। তিলকের গীতারহস্য এবং অরবিন্দের গীতাভাষ্য উভয়ই মৌলিক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ভাষ্য প্রথমে ইংরেজিতে রচনা করেন। অধ্যাপক আর, ডি, রাণাডে তাঁহার "Maharashtra Mysticism" নামক বিশাল ও সারবান্ গ্রন্থে মহারাষ্ট্রের সাধুগণের ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মারাট্টিগণের বুদ্ধি ও বিদ্যানুরাগ প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

পুণার পুরানো সহরে পথগুলিতে অসংখ্য সরু গলি। কিন্তু নূতন সহরটি বেশ সুন্দর এবং এখানকার রাস্তাগুলি বেশ চওড়া। নূতন সহরটির নাম 'শিবাজী নগর'। শিবাজী নগর নামে একটি রেলওয়ে-ষ্টেশনও আছে। নূতন সহরেই কংগ্রেস ভবন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও গভর্ণমেণ্ট আফিসগুলি অবস্থিত। পুণায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তিলকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এখানে থিওজফিক্যাল সোসাইটী, কবীর মঠ, দাদূ মঠ, শঙ্কর মঠ প্রভৃতি বহু ধর্ম্মস্থান আছে। পুণা-ভ্রমণ সংক্ষেপে শেষ করিয়া বোম্বাই ফিরিলাম। আজকাল যুদ্ধের জন্য ট্রেনের সংখ্যা অনেক কম হওয়ায় যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা। বরোদা ও নাগপুরও মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত। নাগপুর বহু পূর্ব্বে সমাপ্ত করিয়াছিলাম। তাই বরোদাভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।

হিন্দু জগতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে ঘুরিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, হিন্দুধর্ম্মে বহু সম্প্রদায় ও শাস্ত্র থাকিলেও, হিন্দুসমাজের বহু বিভাগ থাকা সত্ত্বেও, হিন্দু জাতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও, হিন্দু জগতের সাংস্কৃতিক ঐক্য অচ্ছেদ্য, অভেদ্য এবং সুদৃঢ়। হিন্দু জাতি বর্ত্তমানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও এই অমর জাতির ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষা অধিকতর গৌরবময়।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ।

অবতার

"রবিরে ফেলেছি ঢেকে"—কালো মেঘ কয়,
"জগতের কেহ আর নাহি পাবে আলো!"
হাহা-রবে তাড়া করি' আসিয়া মলয়
"হেথা ভিড় করো কেন?"—বলি ধমকালো।

জগতের যত হিংসা যত হানাহানি
"সত্যেরে মেরেছি" ব'লে মাতে উৎসবে।
কবি কহে, "বুকে যার অমৃতের বাণী,
তাহারে করিতে হত্যা কে পেরেছে কবে?

"মানুষ ঘুমায় যবে অজ্ঞান-তিমিরে,
অবতার জন্ম লয় তাহারি কুটীরে।"

শ্রীমতী সুষমা চক্রবর্ত্তী

শুভবিবাহ

[গল্প]

এই সে দিনের কথা।

গত চৈত্র মাসের শেষ। বেলা তখন প্রায় আটটা। থলি-হাতে বাড়ী ফিরিয়া জীবনচন্দ্র গৃহিণী হেমলতা দেবীকে বলিলেন—নাও গো, ওদের কনট্রোলের দোকানে চাল পাওয়া গেল না!

ভাঁড়ারের সামনে দালানে বঁটি পাতিয়া হেমলতা দেবী আনাজ কুটিতেছিলেন, স্বামীর কথায় মুখ তুলিয়া কহিলেন,—তা'হলে আমাদের ঐ চালই চাকরদের জন্ম বার করে দি!

থলি ফেলিয়া জীবনচন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; সামনে মোড়ার উপর বসিয়া বলিলেন—তার পর?

হেমলতা দেবী অম্লান অকুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—তার পর আর কি, আমাদের যে গতি, ওদেরো তাই!

এ কথার অন্তরালে জীবনচন্দ্র অনেকখানি প্রমাদের আভাস পাইলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন—আমাদের এ চালের দাম কত জানো? মণ নেছে তেইশ টাকা করে! চাকর-বামুনকে ঐ তেইশ টাকা মণের চাল খাওয়াবে?

হেমলতা দেবী বলিলেন—তোমার বাড়ীতে চাকরি করতে এসেছে বলে' তো না খেয়ে ওরা চাকরি করতে পারে না! ওদের খেতে দিতে হবে।

কথাটা বলিয়া হেমলতা দেবী স্বামীর পানে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তরকারীর চ্যাঙারিটা ঠেলিয়া দিয়া ডাকিলেন—ঠাকুর···

দালানের নীচে ছোট উঠান। উঠানের ওপারে রান্নাঘর। রান্নাঘর হইতে ঠাকুর জবাব দিল—যাই মা···

ছোট টুকরি হইতে একটা লেবু তুলিয়া লইয়া হেমলতা দেবী বঁটির গায়ে ধরিলেন, ঠাকুর আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

হেমলতা দেবী বলিলেন—ঝোলের আনাজ কুটে দিয়েছি, নিয়ে যাও। খোকা বাবুর ইস্কুল আছে। ওর জন্ম ঝোলটা আগে চড়িয়ে দাও। তার পর ও ভালোবাসে আলু-ভাতে, আলুর খোশা ভাজা··· আর কুচো চিংড়ী আনতে দিয়েছি, সেই কুচো চিংড়ীর সঙ্গে এই থোড় কুটে দিয়েছি, থোড়-চিংড়ী করে দিয়ো। এই পেলেই ও সোনা-মুখ করে' খাবে'খন!

ঝোলের আনাজ লইয়া ঠাকুর আবার গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

জীবনচন্দ্র গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন! তাঁর মাথাটা মুহূর্ত্তে যেন বাংলা থিয়েটারের ষ্টেজ হইয়া উঠিয়াছে! এবং সে ষ্টেজের উপরে হৃদয়-বিদারক পারিবারিক নাটকের অভিনয় সুরু!

ডেপুটিগিরি করিয়া আজ ন'মাস তিনি পেন্সন লইয়াছেন। অনারারী করিবার বাসনা মনে ছিল প্রবল, কিন্তু গৃহিণী হেমলতা দেবীর ভ্রূ-ভঙ্গীতে সে-বাসনা অন্তর-মধ্যে লীন হইয়াছে! হেমলতা দেবী শ্লেষ-ভরে বলিয়াছিলেন—গোলামির মোহ কখনো ঘুচবে না?

জীবনচন্দ্র বলিয়াছিলেন—এ তো মাইনের চাকরি নয় গো··· অনারারি! মানে, নিজের খোশ-খেয়ালে কাজ করা! বদলির ভয় নেই! জবাবদিহি নেই!

হেমলতা জবাব দিয়াছিলেন—না। পাকেচক্রে কতকগুলো নিরীহ

আস্পর্দ্ধা হয় কি করে' দণ্ডমুণ্ডধর সেজে পরের বিচার করতে! তুমি ভাবো, সাজানো মিথ্যা মামলা তুমি ঠিক ধরতে পেরেছো?··· ও-পথে আর নয়। তার চেয়ে সংসার ছাখো, জিরিয়ে আরাম ভোগ করো! পড়াশুনা করো যে হ্যাঁ, লেখাপড়া শিখেছিলে এক কালে, সে লেখাপড়া সার্থক হবে!

হিন্দু ঘরের সাধ্বী সতী সহধর্ম্মিণী হইলেও হেমলতা দেবী কোনো দিনই একান্ত ভক্তি-ভরে স্বামীর সকল কর্ম্মে-আচরণে মাথা নীচু করিয়া সায় দেন না! যেটা উচিত মনে করেন, সেটা বেশ সতেজে বলিতে পারেন! শুধু বলা নয়···

অর্থাৎ এ-কারণে ডেপুটিত্বের প্রতাপ মর্ম্মে গাঁথা থাকিলেও জীবনচন্দ্র স্ত্রীকে চিরদিন ভয় করেন, ভক্তি করেন! উপরিওয়ালাদের উপর যেমন ভয়-ভক্তি, এ ভয়-ভক্তি তেমন নয়, সে-কথা বলা বাহুল্য!

এখন পট উত্তোলন করিয়া মাথার ষ্টেজে ট্র্যাজেডির অভিনয়! প্রথম অঙ্কে পেন্সনের কল্যাণে ঘরে বসিয়া বিরাম-আরাম উপভোগের কল্পনা! তার পর দ্বিতীয় অঙ্কে ট্র্যাজেডির সূত্রপাত! জাপানী বোমার ভয়ে ইভাকুয়েশন! তার ফলে সহরের অর্দ্ধেক দোকান বন্ধ; বাকী অর্দ্ধেকে চাল-ডাল হইতে কাপড়-চোপড়ের দাম চড়িয়া অভ্রভেদী হিমালয়ের মাথায় উঠিতেছে! আরও উঁচুতে চড়িলে কোন্ হিম-বাষ্প-কুহেলিকার মধ্যে সব অদৃশ্য হইয়া যাইবে। বাংলা ট্র্যাজেডিতে মাঝে-মাঝে যেমন নিয়তি বা উদাসিনী আসিয়া সান্ত্বনার কথা বলিয়া, আশার গান শুনাইয়া ট্র্যাজেডির ঘনঘোর আভাসকে খানিকটা হাল্‌কা করিয়া দেয়, এ-নাটকেও তেমনি সান্ত্বনা-স্বরূপ হু'টি কন্‌ট্রোলের দোকান মিলিয়াছিল। একটি তাঁর হাকিমী-আমলের এক আমলার ভাইয়ের মুদিখানা—সেই কালীঘাটে মন্দিরের কাছে; আর একটি শ্যামবাজারে জীবনচন্দ্রের পিসতুত-ভাইয়ের বাড়ীর বাহিরের ঘরে ভাড়াটিয়া ভূষণ সাধুখাঁর দোকান। এ হু'টি দোকানে সপ্তাহে চার-দিন করিয়া হাজিরা দিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া নানা খোশ-গল্পে দোকানদারের তৃপ্তি-সাধনান্তে হু'সের, চার সের করিয়া চাল লইয়া আসেন কন্‌ট্রোলের দরে! সে-চালে বামুন-চাকরের অন্নের সংস্থান হয়। বাজার-হিসাবে দাম পড়ে অনেক কম—কাজেই এতখানি পরিশ্রম ও তোষামোদের আঁচ গায়ে তেমন লাগে না! তবু এক-একবার দোকানের তক্তাপোষে বসিয়া মনে হয়, হু'দিন আগে এ সব লোকের স্পর্দ্ধা হইত কি তাঁর সঙ্গে সমান ভাবে কথা কয়? আর এখন? কোন্ পাপের ফলে ইহাদের তৃপ্তি-সাধনের জন্ম খুঁজিয়া বাছিয়া বচন-বিন্যাস করিতে হয়! পয়সা দিয়া চাল কেনা—মনে হয়, যেন ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি! এই সব দোকানীর মুখের মৃদু হাসি এবং নয়নের ভ্রূভঙ্গীকে যে-ভাবে মানিয়া চলেন, ডেপুটিগিরি করিবার সময় উপরিওয়ালা সাহেবকেও বোধ করি, এতখানি মানিয়া চলেন নাই!

কিন্তু সব সহিয়াছিল কম-দামে চাল মিলিত বলিয়া! রুটিন-মাফিক আজ সকালে কালীঘাটের কনট্রোল-দোকানে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তারা বলিয়াছে, সরকারী

পেন্সনের ছাইয়ে চাপা পড়িয়া তেজানল নিবিয়া নিষ্প্রভ হইয়াছিল, দোকানদারের এ-কথায় ছাই সরাইয়া সে-তেজ যে মনের মধ্যে অগ্নি-শিখায় জ্বলিয়া ওঠে নাই, এমন নয়! সামান্য মুদির এত বড় স্পর্দ্ধা. তিনি মহকুমায় হাকিমী করিয়া আসিয়াছেন, যে ভাবে মুদি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করিল, যেন তিনি মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিতে গিয়াছিলেন!

মন বলিল, ওঠো ফোঁশ করিয়া—দাও একটি ছোবল! বলো, আমাকে দু'সের চাল দিতে পারো না, আর ঐ খাকী শর্ট-সার্ট-পরা সিভিক গার্ড···লাইন-বন্দী ক্রেতাদের বঞ্চিত করিয়া তাদের প্রাপ্য চাউল হইতে দশ সের বারো সের করিয়া বগলি ভরিয়া ঐ সিভিক গার্ডকে দাও যে···যদি একটি রিপোর্ট ঝাড়িয়া দিই?

কিন্তু এ-কথা বলিতে পারেন নাই। বলিতে গেলে সে-কথার উত্তরে মুদি যদি বলে···

তাই মনের ভিতরে রাজ্যের অন্ধকার ভরিয়া জীবনচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন···হাতে শূন্য থলি!

সহসা কি মনে হইল, জীবনচন্দ্র বলিলেন—শুনচো!

বৈকালের জল-খাবারের জন্য হেমলতা দেবী ছেঁচকির আলু-পটল কুটিতেছিলেন···সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবেই বলিলেন—বলো···

জীবনচন্দ্র এক বার চারি দিকে চাহিলেন! তার পর কণ্ঠ মৃদু করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আমি বলছিলুম, চালের সমস্যা দিন-দিন বাড়বে বৈ কমবে না! তাই···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি থামিলেন। হেমলতা দেবীর মুখে ভাব-বিপর্য্যয়ের চিহ্ন লক্ষ্য হইল না। দেখিলেন, ও-মুখে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাব! তখন সাহস হইল। কাসিয়া গলা সাফ করিয়া আবার বলিলেন,—ওদের খোরাকির জন্য যদি টাকার ব্যবস্থা করো! ধরো, তোমার ঠাকুর মাইনে পাচ্ছে বারো টাকা করে, আকলু পাচ্ছে দশ টাকা, পূর্ণ ন' টাকা···ঠাকুরকে যদি কুড়ি টাকা দাও, আকলুকে আঠারো, আর পূর্ণকে সতেরো? আটটা করে টাকা বেশী যা পাবে, তাতে ওদের খাবার ব্যবস্থা ওরা নিজেরা করে নেবে!

হেমলতা দেবী এবার স্বামীর পানে চাহিলেন···দু' চোখের দৃষ্টি বরাভয়প্রদ নয়, বিভীষিকা-সঞ্চারী! আকাশের গায়ে লক-লক করিয়া বিদ্যুৎ-বিকাশ হইলে দারুণ বজ্রনাদের আশঙ্কায় মানুষের বুক যেমন কাঁপিয়া ওঠে, জীবনচন্দ্রের বুক তেমনি কাঁপিল! কিন্তু বিদ্যুতের আগুন যখন ছুটিয়া গিয়াছে, তখন বজ্রনিনাদ অনিবার্য্য এবং অচিরে ঘটিবে! জীবনচন্দ্রও তাই···

হেমলতা দেবী কহিলেন,—এ বাজারে আট টাকায় দু'বেলা পেট পূরে মানুষের খাওয়া হয় কখনো? ওদের মোটা চালের দাম তুমিই তো দিচ্ছিলে সতেরো টাকা করে' মণ! তার পর আটা আছে, ডাল আছে, আনাজ-তরকারী আছে। ওরা গতর খাটিয়ে কাজ করে···খায় তোমার-আমার ডবল, তিনগুণ। নাহলে শরীর থাকবে না! শরীর রাখতে পারলেই তবে ওদের অন্ন জুটবে! দু'টো বাদাম খেলে তোমার চলে যাবে, মাথার খাটুনি তাতে আটকাবে না! ওদের দেহের খাটুনি!···তাছাড়া তোমার বাড়ীতে খাটবে, তুমি ওদের মুখ চাইবে না? এ দুর্দ্দিনে তোমার কষ্ট হবে বলে ওরা আধ-পেটা খেয়ে কাজ করবে? তোমার মুখ চেয়ে আছে···তোমার উপরে নির্ভর···আর তুমি ওদের ফেলে দেবে!···এমন কথা তুমি ওদের বলবে কি করে?···ছি ছি, হাকিমী করে-করে বুকখানা না হয় পাথর করেছো, তা বলে বুদ্ধি-বিবেচনাও খুইয়েছো?

জীবনচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ-তর্কে কোনো দিন তিনি হেমলতা দেবীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না! এ সব আলোচনার সূচনা হইতেই হেমলতা দেবী চিরদিন এমন সুদৃঢ় যুক্তির উপর নিজেকে দাঁড় করান যে, জীবনচন্দ্রের যুক্তির গোলা-গুলী, ভর্ৎসনা-চীৎকারের বোমা তাঁকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, তাঁর নাগালও পায় না! এবং সরিয়া গিয়া হেমলতা দেবীর যুক্তির কথা যতই তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, ততই সে সব যুক্তির অকাট্যতায় অভিভূত হইয়াছেন!···পারিবারিক ব্যবস্থা-পক সভায় এ-ব্যাপারের ব্যতিক্রম কোনো দিন ঘটে নাই! এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। কাজেই চিরদিনকার মতো আজো তিনি হেমলতা দেবীর যুক্তি-বচনের মাঝখানে পলায়নে আত্মরক্ষা করিলেন।

পলাইয়া তিনি গিয়া ঢুকিলেন বাহিরে বসিবার ঘরে। টেবিলের উপর খবরের কাগজ। কাগজ খুলিতে চোখ পড়িল প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে ছাপা হেড-লাইনের উপর!

Difficulties in securing Food grains
How to meet them.

পড়িতে লাগিলেন। মর্ম্ম এতটুকু হৃদয়ঙ্গম হইল না। ভাবিলেন, ব্যাপার কি? ইংরেজী ভুলিয়া গেলাম না কি? মানে বুঝিতে পারি না!···মনোযোগ দিয়া ছত্রের পর ছত্র পড়িতে লাগিলেন। ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে, তার প্রত্যেকটি কথার অর্থ খুব জানা! অথচ সব-কটা কথা অর্থাৎ ভার্ব, নাউন্, এ্যাডজেক্‌টিভ্ মিলিয়া এমন হেঁয়ালি রচিয়া রাখিয়াছে, তার কাছে কোথায় লাগে ক্রশ-ওয়ার্ড পাজ্‌ল্! কাগজ রাখিয়া তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাথার মধ্যে যেন এক-হাজার প্লেন সশব্দে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল!

এমনি বিড়ম্বনার মাঝখানে ভাগিনেয় গোপালচন্দ্রের আবির্ভাব!

গোপাল ডাকিল—মামাবাবু···

মামাবাবুর মাথার মধ্যকার প্লেনগুলা চকিতে থামিয়া গেল। মামাবাবুর চেতনা ফিরিল এবং তিনি মর্ত্ত্যলোকে ফিরিলেন। বলিলেন—গোপাল!

—হ্যাঁ!

—ব্যাপার কি? খপর ভালো?

গোপাল বলিল—হ্যাঁ। মা পাঠালেন···মানে, মামীমাকে একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে···আজই!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—হঠাৎ? কেন রে? দিদির অসুখ না কি?

গোপাল বলিল—না। মানে, বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল! তেশরা বোশেখ।

জীবনচন্দ্র যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! বলিলেন—বিয়ে! কার বিয়ে?

ঈষৎ লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে গোপাল বলিল—আমার।

জীবনচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—ও, হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক··· ক'মাস ধরে কথা চলছিল বটে।

গোপাল বলিল—হ্যাঁ। কাল সকালে পাকা দেখা। গায়ে হলুদ আর বিয়ে দুই-ই ঐ তিন তারিখে।

জীবনচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন—কিন্তু এই মাগ্‌গির বাজার···লোকজন খাওয়ানো···সে তো যার নাম, বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার!

গোপাল বলিল—আপনি যাবেন···মামীমা যাবেন···মার সঙ্গে কথা কয়ে সব ব্যবস্থা করবেন। পাকা দেখা···মানে, তারা আসবে বেলা পাঁচটায়···তার পর আমাদের দিক্ থেকে পাকা দেখতে যেতে হবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। সাড়ে সাতটার মধ্যে পাকা দেখা সারতে হবে। কালকের দিন ছাড়া এর মধ্যে আর দিন নেই!

জীবনচন্দ্র শুধু বলিলেন—হুঁ···

সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর যেন আলিপুরের চিড়িয়াখানা জাগিয়া উঠিল···রাজ্যের পশু-পক্ষীর মিশ্র চীৎকার-গর্জ্জন!

গোপাল বলিল—মামীমা আছেন তো?

জীবনচন্দ্র বলিলেন—থাকবেন না তো যাবেন কোথায়! যা, ভিতরে যা।

গোপাল গেল অন্দরে মামীমা হেমলতা দেবীর কাছে।

জীবনচন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, এই বাজার···ছেলের বিবাহ দিবার জন্য দিদির এখন ক্ষেপিয়া না উঠিলে চলিত না! সামান্য একটা ছোট সংসারের দৈনিক বরাদ্দর চাল-ডাল জোটে না, আর একটা বিবাহ! এ বৃষোৎসর্গ এখন না করিলে নয়! তাছাড়া দিদিকে সে জানে! গোপাল ছোট ছেলে···তার বিবাহ দিদির জীবনে শেষ কাজ! হুঃ! যুদ্ধ চুকিলে বিবাহ দিলে চলিত না? সংসারে যারা আছে, যাদের ফেলিবার উপায় নাই, তাদেরি অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয় না, এ দুঃসময়ে বাহির হইতে আর একটি জীবকে আনিয়া অন্ন-বস্ত্রের দায় বাড়ানো! শাস্ত্রকারেরা স্ত্রী-বুদ্ধিকে প্রলয়ঙ্করী বলিয়াছেন, সে কথা মিথ্যা নয়!

রাশীকৃত চিন্তার ভারে বুক অসহ্য ভারী হইল। তিনি আসিলেন অন্দরে।

দেখেন, হেমলতা দেবীর কুটনা কোটা শেষ হইয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, গোপালও দাঁড়াইয়া। দু'জনে কথা হইতেছে।

তাঁকে দেখিয়া হেমলতা দেবী বলিলেন—শুনেছো গা, গোপালের বিয়ে! দিদি আমাকে আজই যেতে বলেছেন। গোপাল এখনি আমায় নিয়ে যেতে চায়। আমি বলছি, এখন নয়···খাওয়া-দাওয়া সারি··· তার পরে যাবো। তুমি পারবে আমাকে নিয়ে যেতে?

জীবনচন্দ্র বলিলেন—কখন?

হেমলতা দেবী বলিলেন—বারোটা নাগাদ। এর মধ্যে নাওয়া-খাওয়া সেরেনি। তার পর···কিন্তু গিয়ে আজ কি আর ফিরতে পারবো? কাল পাকা দেখা···তারা বিকেলে আসবে।···খাওয়ায় ঘটা না থাকলেও নতুন কুটুম···যা হোক খাতির-অভ্যর্থনা তো করা চাই! দিদি বলে দেছেন, কি করতে হবে, কি করা উচিত, সে-সব তিনি ভুলে গেছেন···আমি গেলে তবে সব ঠিক হবে।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—এ সময়ে কি আর করবে? কিছুই পাওয়া যায় না! যা পাওয়া যায়, তার দাম একেবারে আগুন! দিদিকে বুঝিয়ে বলো, ঐ বর নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে শুধু বৌ আনা—ব্যস্! লোকজন খাওয়ানো বা অন্য সমারোহ···পরে। এখন চলবে না··· চলতে পারে না!

হেমলতা বলিলেন,—কি যে বলো! জন্মের মধ্যে কর্ম্ম বিয়ে! কিছু করতে বলবো না কি রকম?

জীবনচন্দ্র বলিলেন—তার পর? ম্যাও ধরবে কি করে? হুঃ! গায়ে-হলুদের তত্ত্ব যাবে তো?

হেমলতা দেবী বলিলেন—নিশ্চয় যাবে।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—মিলের ধুতি-শাড়ীর দাম যা হয়েছে, তাতে দু'দিন আগে হাতী কেনা যেতো। আর বেনারসী-ফেনারসী··· যার নাম, হুঃ!

হেমলতা দেবী বলিলেন—তুমি থামো তো। সে যা হবার, দেখা যাবে। বিয়ে হচ্ছে···বৌকে বেনারসী দেবে না বটে? লাইনে দাঁড়িয়ে তোমার ঐ কনট্রোলের দোকান থেকে দশ হাত চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের শাড়ী কিনে দিতে হবে···না?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি চাহিলেন গোপালের দিকে, বলিলেন—বেনারসী-টসী কিনছে কে? অম্বুজ?

অম্বুজ গোপালের ভাগিনেয়। ভারি হুঁশিয়ার চালাক ছেলে! সব কাজে আগে গিয়া দাঁড়ায়, হটিতে চায় না!

মামীমার কথার উত্তরে গোপাল বলিল—হ্যাঁ।

হেমলতা দেবী বলিলেন—তুমি তাহলে যাও গোপাল, তোমারো তো শুধু টুঁটো বর সেজে বিয়ে করতে গেলে চলবে না, বাজার করা আছে, আরও পাঁচটা কাজ আছে!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—কোথা থেকে বিয়ে করতে যাবি রে?, তোদের বাড়ী তো ছোট ফ্ল্যাটের এক-তলায়···তারো আবার আধখানা। ওখানে থেকে···

গোপাল বলিল—না। বাড়ী নেওয়া হয়েছে। স্কট্‌স্ লেনে তিনতলা মস্ত-বড় বাড়ী। কাল সকালেই সে-বাড়ীতে যাবো। সেই বাড়ীতে হবে পাকা দেখা।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—অত-বড় বাড়ী নেবার কি দরকার ছিল? আমার এখান থেকে বিয়ে করতে যাওয়া হতো না? রাজসূয় যজ্ঞ করবি ভেবেছিস্! নারদের নেমন্তন্ন করবি এই দুঃসময়ে! তার পর?

কুণ্ঠিত মৃদু হাস্যে গোপাল বলিল—যেখানে যে আছে, মা বললে, সকলকে জানাতে হবে তো···আসতেও বলতে হবে! তবে আসবে না কেউ, কলকাতায় সদ্য সে দিন বোমা পড়েছিল···বোমার ভয়!

হেমলতা দেবী বলিলেন,—বাড়ীর ভাড়া দিতে হবে কত?

গোপাল বলিল—ডেলি পনেরো টাকা করে!

চমকিয়া জীবনচন্দ্র বলিলেন—তার মানে, এক মাসে···এ-মাস একত্রিশ দিনে! অর্থাৎ তা'হলে একত্রিশ ইন্‌টু পনেরো···তার মানে পনেরোর পাঁচ—হাতে থাকে এক! তার পর তিন-পনেরোয় পঁয়তাল্লিশ আর ঐ এক অর্থাৎ চারশো পঁয়ষট্টি টাকা! ওরে বাবা! এত বড় অবিবেচনার কাজও করে! নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারা যাবে না!

হার্ট বুঝি ফেল্ হইবে···বুকখানা সাংঘাতিক বেগে দুলিয়া উঠিল! বুকের সে তীক্ষ্ণ তীব্র স্পন্দন বোধ করিবার উদ্দেশ্যে নিরুপায় হতাশ্বাসে জীবনচন্দ্র স্থান ত্যাগ করিলেন!

সন্ধ্যার সময় স্বামি-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। স্বামী জীবনচন্দ্র। স্ত্রী হেমলতা দেবী।

গোপালদের বাড়ী হইতে হেমলতা দেবী সদ্য ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখনো বেশভূষা ত্যাগ করেন নাই। সেখানে যজ্ঞের যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারই বর্ণনা দিতেছিলেন। বলিলেন, এ যজ্ঞে তাঁকেই যজ্ঞেশ্বরীর আসনে বসিয়া দিদিকে পুত্র-দায় হইতে উদ্ধার করিতে হইবে! জীবনচন্দ্রও সারা দিন বাড়ীতে বসিয়া মনে-মনে অনেক ছবি আঁকিয়াছেন! দিদির জোর তাগিদ, তাঁকে গিয়া বর-কর্ত্তা হইয়া বসিতে হইবে! ছেলে-ছোকরারা করিবে সব সত্য, কিন্তু মাথার উপর এক জন ভারিক্কি লোক না থাকিলে তাদের চালাইবে কে? তাই জীবনচন্দ্র ভাবিতেছিলেন···

হেমলতা দেবী বলিলেন,—দিদি বললেন, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কাল থেকেই ওখানে গিয়ে আমাকে ক'দিন থাকতে হবে। কিন্তু আমি রাজী হইনি। সময় খারাপ। ছেলে-মেয়েদের আমি যে ভাবে নিয়ম করে চালাই, ওখানে ভিড়ে ওদের সে-নিয়ম থাকবে না, অসুখে পড়বে! লোক তো বড় কম হবে না!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—কেন, গোপাল যে বললে, বলা হবে সকলকে, কিন্তু কেউ আসবে না···কলকাতায় সদ্য সে-দিন বোমা পড়েছিল জানুয়ারি মাসে···সেই বোমার ভয়ে।

হেমলতা দেবী বলিলেন—মেদিনীপুর থেকে দিদির ননদ সুখদা লিখেছে, সকলে আসবে···গোপালের বিয়ে···দিদির শেষ কাজ··· না এলে দিদির মনে চিরদিনের জন্য দুঃখ থেকে যাবে। তবে দিনাজপুরে আছে গোপালের এক জ্ঞাতি-কাকা। তিনিও কাল আসছেন সপরিবারে। তার পর তারকেশ্বরে পিসতুতো বোন আছে মানি। সেই মানি বোন, ভগ্নীপোত কামাখ্যা বাবু, তাদের পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে, তারাও কাল আসছে!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—রজনী? শিশির? ওরা আসবে না?

রজনী গোপালের বড়দা। শিশির মেজদা। রজনী থাকে দিল্লীতে, শিশির বাঙ্গালোরে। সেখানে বড় চাকরী করে।

হেমলতা দেবী বলিলেন—না, তারা আসতে পারবে না! লিখেছে, অফিসে ছুটী মিলবে না। যুদ্ধের জন্য তাদের কাজের আর অন্ত নেই! বড় ভাই পাঠিয়েছে এক হাজার টাকা···মেজ দু'হাজার! আর লিখেছে, যেমন যা করতে চাও, করো! আরও টাকার দরকার হলে লিখো, পাঠাবো।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—হুঁ!

তার পর যেমন যাহা ঘটিয়াছিল:

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন। বৈকালে স্কট্স্ লেনের বাড়ীতে গিয়া জীবনচন্দ্র দেখেন, প্রকাণ্ড তিন-তলা বাড়ী লোকে ঠাশা! অবস্থা ঠিক ট্রামের মতো! অর্থাৎ পা বাড়াইবেন, এমন জায়গা নাই! ভিড় গমগম্ করিতেছে। চ্যা-ভ্যাঁ-চীৎকার···ছুটাছুটি···হুড়াহুড়ি। সামনে সিমেন্টে-বাঁধানো উঠান। উঠানের গায়ে চওড়া রোয়াক। সেই রোয়াকের উপরে জোয়ান্ যণ্ডা-গোছ চার-পাচটি ছেলে বসিয়া কুলপী বরফ খাইতেছে। সামনে কুলপীওয়ালা—হাত পুরিয়া হাঁড়ির মধ্য হইতে বিদ্যুতের গতিতে একটার পর একটা টিন বাহির করিতেছে এবং খুলিবামাত্র সাফ! জীবনচন্দ্র কাহাকেও চেনেন না। কাজেই ষ্টেজের উপরে নাটকের নায়ক আবির্ভূত হইয়া সরবে যেমন স্বগত-উক্তি করে, তেমনি সরবে আত্মগত ভাবে অর্থাৎ কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়া তিনি বলিলেন—গোপাল আছে? গোপাল? অম্বুজ?

সামনের ছোকরাটি সাতটা কুলপী খাইয়া হাঁপাইয়া দম লইতেছিল! সে বলিল,—তারা বাড়ীর মধ্যে আছে। ডেকে দেবো?

জীবনচন্দ্র বলিলেন—থাক্, আমি বাড়ীর মধ্যে যাচ্ছি।···পথ কোন্ দিকে?

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দ্বার দেখাইয়া সে কহিল—ঐ দিকে।

জীবনচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

অন্দরে ঢুকিতেও অমনি দৃশ্য, তবে একটু রূপান্তর! এখানে কুলপী বরফের বদলে খাবারের মস্ত চ্যাঙারি···সে চ্যাঙারিতে হিঙের কচুরি ঠাশা! আর সে-কচুরি ধ্বংস করিতেছে সাত-আটটি মেয়ে বসিয়া। এক ধারে দোতলার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া বাঁয়ে বারান্দা। বারান্দায় আসিয়া দেখেন, অম্বুজ দাঁড়াইয়া আছে!

জীবনচন্দ্রকে দেখিয়া অম্বুজ বলিল,—এই যে ছোটদাদু! দিদিমা এ ঘরে।

জীবনচন্দ্র আসিলেন নির্দ্দিষ্ট ঘরের সামনে। ঘরে রাশীকৃত জিনিষ ডাঁই-করা। জলচৌকি, পিতলের গামলা, বাসনকোসন, প্রদীপ হইতে সুরু করিয়া কনের জন্য কাঠের বাক্স, খেলনা, আয়না, সাবান, রুজ, সেণ্টের শিশি, একরাশ বেনারসী শাড়ী। আর সে-সব নাড়া-চাড়া করিতেছেন মহিমময়ী রাজেন্দ্রাণীর বেশে তাঁহারই গৃহিণী হেমলতা দেবী। জীবনচন্দ্র যে আসিয়াছেন, সে দিকে দেবীর লক্ষ্যই নাই!

অম্বুজ বলিল—চেয়ে দেখুন ছোট দিদিমা, নিকুঞ্জ-দ্বারে ঈপ্সিত অতিথি!

অম্বুজ ছেলেটা জ্যাঠা ফাজিল—মুখে তার কোন কথা বাধে না! অম্বুজের কথায় হেমলতা চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন—এসেছো! এই সব শাড়ী ভাখো। তোমার নাতি এনেছে। এ থেকে ক'নের দু'খানা শাড়ী পছন্দ করতে হবে!

বলিয়া তিনি বেনারশী মেলিয়া দেখাইতে লাগিলেন—এখানা দু'শো পঁচিশ, এখানা আড়াইশো, এখানা তিনশো পঁচাত্তর, আর এখানা চারশো। আমি বলছি, পরকে দেওয়া নয়···ঘরের বৌ! আমাদের গেরস্ত-ঘরে এই যা দেওয়া! চারশো টাকারটা দাও গায়ে-হলুদে আর এই আড়াইশোর খানা বৌভাতে! জন্মের মধ্যে কর্ম্ম! বিয়ের সময় যেমন মানাবে, তেমনি এর পরে পার্টি-টার্টিতেও পরে যেতে পারবে···একালে যেমন ফ্যাশন হয়েছে। কি বলো?

এ-সব ব্যাপারে জীবনচন্দ্রের নিজের কোন বক্তব্য কোন কালে নাই। চিরদিন তিনি গৃহিণীর কথায় সায় দিয়া আসিয়াছেন।

অম্বুজ বলিল—তাছাড়া বরের কাণ্ড জানেন ছোটদাদু? বলে, দে, দে ভালোই দে—একশো-দু'শো টাকার জন্য কেন আর, হ্যাঃ! বুঝলে ছোটদাদু, বৌয়ের উপর এখনি এমন টান হয়েছে যে, সকালে আমি কতকগুলো হেয়ারপিন্ এনেছিলুম মুর্গীহাটা থেকে···দু'টাকা দশ আনায় ছত্রিশটা।···সে ওর পছন্দ হলো না। নিজে গিয়ে সেই আর্মি-নেভি ষ্টোর্স থেকে সাত টাকায় এক-ডজন কিনে আনলো। বলে, ভালো জিনিষ দে···ওরা বিদেশে থাকে, খুব আপ-টু-ডেট্! শেষে ভাববে, আমরা কিছু জানি না!

শুনিয়া জীবনচন্দ্র হতভম্ব! একালের ছেলেদের এতটুকু

লজ্জা-সরম নাই! মনে পড়িল, তাঁর বিবাহের সময় বর সাজিয়া তিনি কাহারো মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারেন নাই··· এত লজ্জা···

হাসিয়া অম্বুজ বলিল—ঠিক বয়সে না দিয়ে বুড়ো বয়সে বিয়ে দিচ্ছেন···এ সব আপনাদের সইতে হবে বৈ কি!

হাসিয়া হেমলতা দেবী বলিলেন—তোমার বেলায় তুমি কি করো, দেখবো ভাই!

অম্বুজ বলিল—তা করবো বৈ কি! যা করবো, একটা কীর্ত্তি রাখবো ছোট দিদিমা, দেখে নেবেন তখন!

হেমলতা দেবী বলিলেন—দেখাও চটপট। নইলে কবে মরে যাবো! তোমার বিয়ে দেখে যাওয়া হলো না, এ আপশোষ নিয়ে যেন না মরি!

জীবনচন্দ্র নিঃশব্দে শুধু দেখিতে লাগিলেন।

হেমলতা দেবী বলিলেন—দিদি ভেবেছিলেন, কেউ আসবে না বোমার ভয়ে! তা আসতে কেউ আর বাকী নেই!

অম্বুজ বলিল—জানেন ছোটদাদু, খাই-খরচ যা হচ্ছে, সে-খরচে বোম্বাইয়ের তাজ-মহল হোটেল চালানো যায়।

—যা বলেছিস্ অম্বুজ! সম্ভ বোম্বাই গিয়ে দেখে তো এলুম!

হেমলতা দেবী সম্ভ বোম্বাই গিয়াছিলেন! তাজমহল হোটেল দেখিয়া আসিয়াছেন। সেখানে আছে দক্ষিণা···হোটেলের ম্যানেজার ···তার ওখানেই ছিলেন! কথায় কথায় তিনি এখন বোম্বাইয়ের কথা তুলিয়া সকলের তাক্ লাগাইয়া দেন!

হেমলতা দেবী বলিলেন—বাজার করছে অম্বুজ! খাওয়া-দাওয়া থেকে কনের জিনিষপত্র অবধি কেনা—সব। এক-বাড়ী লোক—চাল খাচ্ছে সব ত্রিশ টাকা মণের। ঘী আটা ময়দা চিনিতে বাড়ী একেবারে যা করে তুলেছে! ভাবি তাই, পথে লাইন করে একমুঠো চালের প্রত্যাশায় হাঁ করে সব দাঁড়িয়ে আছে···দশ-বারো ঘণ্টা করে'···তাও কিছু পাচ্ছে না!···আর এ কি অপচয়!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—এই ভেবেই সব এসেছে আর কি যে বিয়ে-বাড়ীর দৌলতে 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' ভুলতে পারবে ক'দিন!

অম্বুজ বলিল—সত্যি তাই, ছোটদাদু! নাহলে ঐ পুঁটু পিসির মেয়েরা···ওরে বাস্ রে, খেঁদির বিয়ের সময় আনতে গিয়েছিলুম, নাক সিঁটকে বলেছিল বিয়ে-বাড়ীর ভিড়···পাঁচ জনের সঙ্গে নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া···হৈ-হৈ! তাই আসেনি! আর এবারে খপর দেবামাত্র এসে হাজির! পা যেন বাড়িয়ে ছিল! একটি মেয়ে এসেছে বর্দ্ধমান থেকে, আর একটি সেই শান্তিপুর থেকে!

হেমলতা দেবী বলিলেন—তার উপর পাঁচ জনের পাঁচ-রকম বায়না কি! ইনি বলেন, ছেলেরা দাদখানি ছাড়া খেতে পারে না, সয় না। উনি বলেন, জাঁতা-ভাঙ্গা আটার রুটি! কারো ছানা চাই জল-খাবারে···কারো চাই পাঁচ-রকমের ফল! এমনি—

জীবনচন্দ্র বলিলেন—সকলের সব আব্দার রাখতে হচ্ছে তো?

অম্বুজ বলিল—নিশ্চয়! নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন···ওঁদের মান-মর্য্যাদা কি সামান্য!···তারকেশ্বরের ঐ কামাখ্যা-মেসো···

শশধরের প্রাণ গেল তামাক সাজতে-সাজতে! ভাবি, এই ওয়াল্টার ব্যালের ছেলে কত তামাক খেতেন তারকেশ্বরে! হুঁঃ!··· মামারা এবার ঘায়েল হয়ে যাবে। এখনো বিয়ের তিন দিন দেরী··· কত লোকের এখনো আসতে বাকী!

পরের দৃশ্য ২রা বৈশাখ তারিখে। কাল বেলা তিনটা।

জীবনচন্দ্র আসিলেন···হেমলতা দেবীর ফরমাশ-মাফিক পাঁচ-সাতটা গহনা লইয়া। বৌয়ের মুখ দেখিবেন হেমলতা দেবী, তাহারই জন্য একখানা গহনা পছন্দ করিবেন।

ভিতর-বাড়ীর উঠানে পা দিবামাত্র দেখেন, রোয়াকে আসন আর কলাপাতা বিছাইয়া একরাশ লোক খাইতেছে। ছোট-বড়-মাঝারি বয়সের প্রায় ষাট জন লোক। ক'জনের পাতে বড় বড় মাছের মুড়া···আর রকমারি তরকারী-ব্যঞ্জনের পাহাড় একেবারে! রোয়াকের পিছনে খোলা দ্বার-পথে দেখা যাইতেছে ওদিক্কার ঘর···সে-ঘরে মহিলা-মজলিস। সে-ঘরেও তিল-ধারণের স্থান নাই··· এত মহিলা খাইতে বসিয়াছেন!

অম্বুজ বলিল—বসে' যান ছোটদাদু···পাতা করে দি।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—আমি খেয়ে দেয়ে এসেছি রে।···তোর ছোট দিদিমা কোথায়?

অম্বুজ বলিল—ঐ তো, আপনার সম্পর্ক শুধু এক ব্যক্তির সঙ্গে! আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি!

সহাস্যে জীবনচন্দ্র বলিলেন,—জ্যাঠামি রেখে বল, কোথায় তোর ছোট দিদিমা?

অম্বুজ বলিল—তিনি ভাঁড়ারে বসে তদারকীর কাজ করছেন। যাবেন? ঐ দিকে।

জীবনচন্দ্র বলিলেন,—যাবো। দরকার আছে।

ভাঁড়ারে আসিয়া দেখেন, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হেমলতা দেবী এটা-ওটা নাড়িতেছেন···ঠাকুর আসিয়া বলিতেছে, দু'হাঁড়ি দই দিন ···ভৃত্য শশধর আসিয়া বলিতেছে—মশলার যে ফর্দ্দ দিয়েছেন, তাতেই সব লেখা আছে তো মামীমা? অনিল বাবু বাজারে যাচ্ছে বৌভাতের খাওয়ানোর সব মশলা কিনতে···

হেমলতা দেবীর মুখ একেবারে রাঙা সিঁদুর! আঁচলে মুখের ঘাম মুছিয়া তিনি বলিলেন—হ্যাঁ রে, ও-ফর্দ্দে সব জিনিষ লেখা আছে···খুঁটিয়ে সব যেন আনা হয়। অনিলকে বলো, কোনো জিনিষ বাদ না পড়ে। এলে ও-সব আমি গুছিয়ে ফেলবো। একটি ভুল হলে অনর্থ ঘটবে শেষে!

—না মামীমা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকুন গো···আমি থাকতে ভুল হবার জো কি!

একটু পরে অম্বুজ আসিয়া ডাকিল—ছোট দিদিমা···

হেমলতা দেবী বলিলেন—বলো···

অম্বুজ বলিল—সন্দেশ চাই।

—আর সব দেওয়া হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। কত খাবে আর? বুঝলেন ছোটদাদু, নেমন্তন্ন এসে খাচ্ছে সব যেন দু'মাসের খোরাক! ভাবছে, বাড়ী গিয়ে দু'মাস

মনে হচ্ছে, সিভিল পপুলেশন্ আর বাকী নেই! বৌভাতের দিন মিলিটারীদেরও নেমন্তন্ন করিস্ অম্বুজ!

অম্বুজ বলিল—যা বলেছেন! জানেন ছোটদাদু, সিনেমায় অত ভিড় হয় তো, এখন একদম্ খালি!···তারা এসে আজ শাসিয়ে গেছে, এ সব লোককে খাইয়েই যেন আমরা বার করে দি···নাহলে সিনেমায় খালি বাড়ীতে তাদের ছবি দেখাতে হবে!

হেমলতা দেবী সহাস্যে বলিলেন,—চুপ কর্ রে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, সকলে শুনতে পাবে যে!

—ভাবছেন শুনলে অপমান বোধ করে সরে যাবে? রামচন্দ্র! এ দুর্দ্দিনে যে অন্ন দান করে, সে দু'টো কড়া গালাগাল দিলেও তা গায়ে মাখবে না!

আরও দু'ঘণ্টা পরে ছোট একটি ঘটনা।

গোপাল বলিল অম্বুজকে,—ওরে মামাবাবুকে চা এনে দে আর সেই যে পাইকপাড়ার গাঙ্গুলি-বাড়ী থেকে বড় বড় রাজভোগ পাঠিয়েছে আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্বে, সেই রাজভোগ!

অম্বুজ বলিল—বেশ···

অম্বুজ গেল চা এবং রাজভোগ আনিতে। গোপাল বলিল—জানলেন মামাবাবু, গাঙ্গুলিরা রাজভোগ পাঠিয়েছে মোটে ষোলখানি —কিন্তু এক-একখানার ওজন বোধ হয় পাঁচ-সের করে···না মামীমা?

অম্বুজ ফিরিল। হাতে চায়ের পেয়ালা এবং প্লেটে দু'টো আইসক্রীম-সন্দেশ।

গোপাল বলিল—রাজভোগ?

অম্বুজ বলিল—সাবাড়!

—সাবাড়! বলিস্ কি! গোপালের দুই চোখ যেন ঠিকরিয়া বাহির হইবে!

অম্বুজ বলিল—তোমার সেই মেদিনীপুরের সুখদা পিসি গো, তাঁর দুই ছেলে কটা আর জটা···তারা রাজভোগ পেলে না কি আর কিছু চায় না! তাই সুখদা পিসি রাজভোগের পরাতখানি তাদের সামনে ধরে দেছেন। তারাও মাতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থে সব রাজভোগ সাবাড় করেছে!

গোপাল বলিল—বলিস্ কি! দু'টো ছেলেতে মিলে ষোলখানা ঐ বিশ্বম্ভর-ছাঁদের রাজভোগ উড়িয়েছে! দ্যাখ্, দ্যাখ্, বেঁচে আছে তো এখনো?

অম্বুজ বলিল—নিশ্চয়! কি বপু! বুঝলেন ছোটদাদু, চেহারা দেখেননি? দেখবার মতো। হ্যাঁ, ওঁরা দু' ভাইয়ে আজ ভাত খাননি। বললেন, ভাত তো মানুষ রোজ খায়। রাজভোগ খেয়ে দু' ভাইয়ে বায়োস্কোপ দেখতে গেছেন!

গোপাল যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল! বলিল,—রাক্ষস! ভিটে খেয়ে তবে বেরুবে অম্বুজ, তুই দেখে নিস্!

হেমলতা দেবী ভর্ৎসনা করিলেন,—হচ্ছে কি গোপাল? নেমন্তন্ন করে এনেছো না?

গোপাল বলিল—নেমন্তন্ন করে এনে এমন মহাপাতক করেছি যে আমাদেরও খাবে!···তাছাড়া এদেরই বা হলো কি? ঐ এ-আর-পী? দিক্ না এ-সময়ে একবার সাইরেন বাজিয়ে!

এমনি ব্যাপার! বাড়ী যেন মিলিটারী কান্টীন! কাহারো কোনো অভাব নাই! যে যা চায়,···বিড়ি, সিগারেট, তাস, পাশা···সব পায়!

বাড়ীতে থাকিতে এক সের চাল আর আধ সের চিনির জন্য ঘুরিয়া চোখে যারা অন্ধকার দেখিত, এখানে তারা গোপালের শুভবিবাহের কল্যাণে আলোর পারাবারে সাঁতার কাটিতেছে! কে চায় আবার অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে!

কাজেই বিবাহের পরেও কেহ নড়িবার নামটি করিল না। সকালে-বিকালে চা আসে। শেয়ালদার বাজার হইতে দু'-বালতি দুধ! আর চিনি? অম্বুজ বাড়ীতে চিনির পাহাড় বসাইয়াছে!

তার পর শেয়ালদার বাজারে আনাজ-তরকারী যা আসে, এ বাড়ীতে আনিয়া পোরা হয়। ও-তল্লাটের লোক-জন বাজারে গিয়া খালি হাতে বাড়ী ফেরে,—নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, মিলিটারীর জন্য মাছ-মাংস-আনাজ-তরকারীতেও শেষে টান পড়িল!

বেচারীরা জানে না মিলিটারী নয়, সিভিল পপুলেশনের অর্দ্ধেক ঐ স্কট্স্ লেনের একটা বাড়ীতে ঠাশাঠাশি এত বেশী জমিয়াছে যে তাদের জন্যই বাজার উজাড়!

সে-দিন গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া গোপাল আর অম্বুজ আসিল জীবনচন্দ্রের গৃহে।

গোপাল বলিল—বিয়ের পর জোড়ে শ্বশুর-বাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখি, বাড়ী এখনো জমজমাট, মামাবাবু! কাল আবার দু'মণ চাল এসেছে···দাম পড়েছে চল্লিশ টাকা করে'!

অম্বুজ বলিল,—গোপাল প্রকাশ্যে এমন চ্যাঁচামেচি আর গালাগাল সুরু করেছে যে, আমাদের লজ্জা করে, অথচ ওরা বেশ নির্ব্বিকার বসে আছে!

গোপাল বলিল—শুধু বসে থাকা! বাদশাই ভোজ চলেছে—তার উপর একদল দেখবেন বায়োস্কোপ···একদল থিয়েটার। কেউ যাবেন দক্ষিণেশ্বর, কেউ যাবেন চিড়িয়াখানা দেখতে। তা যাবি, যা না বাবা, গাঁটের পয়সা খরচ করে যা!···তা নয়, এ-সবের পয়সাও মার কাছ থেকে নিচ্ছে অম্লান-বদনে!

অম্বুজ বলিল—বাড়ীর ভাড়া হলো···এই দেখুন না, সাতাশে চৈত্র থেকে আজ হলো বোশেখ মাসের ষোল তারিখ···একুশ দিন। একুশ দিনের ভাড়া তা হলে হলো তিনশো পনেরো টাকা!

গোপাল বলিল—ভ্যালা বিয়ে করেছি! প্রাণ যেতে বসেছে! আমি বলি, ভাগাও সব। মা বলে, চুপ, চুপ···আপনার জন··· নেমন্তন্ন করে এনেছি, গলা টিপে তাড়াবো কি রে!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—তাঁদের তো ভাবা উচিত, অনর্থক বাড়ী-ভাড়ার টাকাটা···জানে তো সব, বাড়ীর ভাড়া দিচ্ছ কি রেটে?

ঝাঁজিয়া গোপাল বলিল—জানে না? উঠতে-বসতে দু'বেলা সে কথা শোনাচ্ছি! তা কা কস্য পরিবেদনা!

অম্বুজ বলিল,—একটা মতলব ঠিক করেছি ছোটদাদু··· আইনের প্যাঁচে না পড়ি; তাই আপনি হাকিম-মানুষ, আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।

জীবনচন্দ্র বলিলেন,—কি মতলব রে?

ছাপানো একখানা বাদামি কাগজ মেলিয়া ধরিয়া অম্বুজ বলিল—এই কাগজ···আমার এক বন্ধুর ছাপাখানা আছে, সেখান থেকে ছাপিয়ে

নিয়েছি। যেন ডিরেক্টর অফ মিলিটারী এ্যাফেয়ার্স ইন ইণ্ডিয়া নোটিশ দিচ্ছে, মিলিটারী লোকের আস্তানার জন্য তিন দিনের মধ্যে স্কট্‌স্ লেনের ও-বাড়ী ছেড়ে দেওয়া চাই। নাহলে ডি-আই-রুলে প্রসিকিউশন! অফিসারের একটা নামও জাঁকালো ভাবে সই করেছি···কিচ্ছু বোঝা যায় না···এই দেখুন! এই কাগজ দেখিয়ে একবার চেষ্টা···

হাসিয়া জীবনচন্দ্র বলিলেন,—কাগজখানা করেছিস্ মন্দ নয়! মাথা আছে! কিন্তু খবর্দার, এ কাগজ নিয়ে বাইরে নাড়াচাড়া করিস্ নে! এ নিয়ে পাবলিককে ভয় না দেখালে কিসের ভয়?··· জাষ্ট ফান্!

—ব্যস্, ব্যস্, ব্যস্! অম্বুজ লাফাইয়া উঠিল; গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া অম্বুজ বলিল,—চলে এসো। শুভস্য শীঘ্রং। বাড়ীতে গিয়ে এ-নোটিশ এখনি জারি করে দেবো। সঙ্গে সঙ্গে তোমার বৌ আর লগেজপত্র নিয়ে ও-বাড়ী থেকে সরে পড়ো বাপু! তার পর নিমন্ত্রিতের দল···ডি-আই রুলের গুঁতো বড় সহজ নয়··· ও-নামে পালাবার সব পথ পাবে না!···ওদের তাড়াতে না পারলে ছোট দিদিমাকেও এ বাড়ীতে ফিরিয়ে আনছি না ছোটদাদু···ওঁর জন্যই আমরা খেতে পাচ্ছি। নাহলে ঐ এক-বাড়ী লোক···আর-কারো মুখের পানে তাকাতে জানে না, সকলে শুধু নিজেদের মুখ নিয়েই আছে!

তাহাই হইল। অম্বুজের সেই নোটিশের জোরে যেখানকার যে, সেখানে সে সরিয়া পড়িল। এবং হেমলতা দেবীকে তাঁর গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে আসিল অম্বুজ!

হেমলতা বলিলেন,—কী ছেলে এই অম্বুজ! মা গো!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—বিয়েতে কত খরচ হলো অম্বুজ?

অম্বুজ বলিল—সে-কথা আর বলবেন না ছোটদাদু! হিসেবের ফর্দ্দ বাড়ীতে জড়ো করেছি একটি বস্তা। সে-হিসেবে যোগ দিইনি! ও-বস্তার দু'টি কাপি তৈরী করে' এক-কাপি পাঠাবো বড় মামাকে, আর এক কাপি মেজ মামাকে। হিসেব জুড়ে দু'ভাইয়ে দেখবেন··· ছোট ভাইয়ের বিয়ে খাননি তো তাঁরা, কড়াক্রান্তি-হিসাবে নিজেদের পিতৃ-মাতৃঋণ শোধ করেছেন···মায় সুদ-সমেত!

হেমলতা দেবী বলিলেন,—গোপালের তো বিয়ে হলো, এবারে তুমি একটি বিয়ে করো অম্বুজ, তা হলেই আমাদের মনের খেদ মেটে!

একটা সুদীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া অম্বুজ বলিল—রক্ষা করুন ছোট-দিদিমা! যুদ্ধ থামবার আগে নয়! এই সব নিমন্ত্রিতদের কন্‌ট্রোল করা··· ব্যস্ রে, হোল্ এ্যালায়েড ফোর্স যদি কেউ আমাকে কন্‌ট্রোল করতে বলে, হাসি-মুখে সে-ভার আমি মাথায় নিতে পারি! কিন্তু এঁদের? ওরে বাব্বা! কাজেই এ যুদ্ধ চোকবার আগে আমার বিয়ে···নৈব নৈব চ!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

CONTROL

"এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে"

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

সামঞ্জস্য

বাঙালীর ঘরে এমন অনেক মহিলা আছেন, যাঁরা সংসারে শুধু খেটেই চলেছেন! স্বামী, ছেলেমেয়ে প্রভৃতির পাণ থেকে চুণ না খশে, তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যে কোথাও এতটুকু ব্যাঘাত না ঘটে, তারি তদারকীতে জীবন সমর্পণ করেছেন! নিজেদের সুখ-দুঃখের পানে তাকাতে জানেন না! নিজেদের সুখ-দুঃখ আছে—সে কথাই যেন তাঁরা ভুলে গেছেন! নিজের সত্তায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বামী ও ছেলেমেয়ের সুখ-শান্তির যূপকাষ্ঠে এ ভাবে নিজেকে বলি দেওয়ায় স্বামি-পুত্র আরাম পান হয়তো, কিন্তু এতে মনুষ্যত্বের অপমান হয়।

এ কথার মানে অবশ্য এ নয় যে, মেয়েরা স্বামি-পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে না চেয়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণমাত্রায় আদায় করবেন! স্নেহ-মায়া-মমতার ধার ধারে না,—নিজের সুখ-সুবিধায় মত্ত, মণ্ডল এমন পুরুষ সংসারে আছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী বলে মনে হয় না! স্বামীর জন্য স্ত্রী নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পানে চেয়ে দেখেন না—মা ছেলেমেয়ের তৃপ্তির জন্য নিজের দুঃখ-কষ্ট-নৈরাশ্যকে পায়ে চেপে মাড়িয়ে চূর্ণ করছেন—অনেক স্বামী অনেক ছেলেমেয়ে এ ত্যাগের মর্ম্ম বোঝেন; বুঝে স্ত্রীর মুখের পানে স্বামী তাকান। ছেলেমেয়েরাও মায়ের মন বুঝে মায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মনোযোগী হয়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে স্ত্রী বা মাকে আপন সত্তা সম্বন্ধে উদাসীন দেখলে পুরুষের মনে শুধু মমতা-দরদ জাগে না, বিরক্তিও জাগে।

পুরুষের স্বভাব—কোনো-কিছুতে বাড়াবাড়ি পুরুষ ভালোবাসে না, পুরুষ চায় সামঞ্জস্য। অর্থাৎ সে চায় সংসারের সকল কাজে মেয়েরা যেমন শৃঙ্খলা রাখবেন, রুটিনের মতো সংসার চলবে, তেমনি সে রুটিনের মধ্যে নিজেদের সখ-সাধ-সম্পূরণেও ঔদাস্য করবেন না। অর্থাৎ স্বামী চান্ বাহিরের কাজকর্ম্ম সেরে বাড়ীতে ফিরে এলে স্ত্রী হাসিমুখে যেমন তাঁকে জলখাবার ধরে দেবেন, তেমনি তিনি বেশভূষাতেও পারিপাট্য সাধন করবেন। স্বামী বাড়ী এসে যদি দেখেন, স্ত্রী মস্ত বঁটি পেতে বসে এঁচোড় কুটছেন—কিম্বা স্বামীর জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুর-চাকরের মারফৎ এবং এ ব্যবস্থা যদি কায়েমি ভাবে চলতে থাকে, তাহলে স্বামীর পক্ষে গৃহ হবে অরণ্য। গৃহে তাঁর আরাম-বিরামের আশা দিনে-দিনে সুদূরগামী হয়ে উঠবে! আমাদের দেশে সেই যে কথা আছে,—যিনি রাঁধেন তিনি কি চুল বাঁধেন না? এ কথার দাম আছে সত্যই।

স্বামী বললেন—চলো, আজ সিনেমায় যাই! এ কথার উত্তরে হলুদ-মাখা শাড়ী পরে' হাতের কালী দেখিয়ে স্ত্রী যদি বলেন—বাপ্‌রে, আমার সময় কোথায়? ওদিকে রান্না চড়িয়েছি—বাটনা বাট্‌তে বাকী ইত্যাদি,—তাহলে এমন সংসারে স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু সেই বিয়ের সময়ে পড়া মন্ত্রটুকুকে ধরেই কোনো মতে বজায় থাকবে—স্বামি-স্ত্রীর আসল যে মনের সম্পর্ক, তা যাবে টুটে! গৃহকর্ম্ম নিয়ে বড়াই বা অভিমান করা স্ত্রীর পক্ষে চলে না! গৃহ কার? স্বামি-স্ত্রী—দু'জনের। স্ত্রী যেমন খরচের সুসারের জন্য এবং সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গৃহকর্ম্ম করছেন, স্বামীও তো তেমনি সংসারকে রক্ষা এবং পালন করবার জন্য উদয়াস্ত কাল উপার্জ্জনে মত্ত!

স্বামীর তরফেও অপরাধ আছে। সে অপরাধ—কাজকর্ম্ম আর বন্ধুবান্ধবের মজলিশ নিয়ে তিনি মত্ত থাকেন, গৃহ এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের মুখের দিকে তাকান না! সংসারের খরচ-পত্র, সেই সঙ্গে গহনা কাপড় বা সিনেমার দাবী মেটালেই স্বামীর কর্ত্তব্য চোকে না। সংসার দাঁড়াতে পারে শুধু স্বামি-স্ত্রী পুত্রকন্যা-পরিজনবর্গের সম্মিলিত স্নেহ-প্রেম-মমতা-দরদের উপর। যে সংসারে স্বামী শুধু অন্ন জোগান, স্ত্রী সে-অন্ন পরিবেষণ করেন, ছেলেমেয়ে ছোটবেলায় শুধু আবদার আর লেখাপড়া করে, এ ছাড়া কারো আর অন্য কাজ নেই, কর্ত্তব্য নেই—সে-সংসারের সঙ্গে মেশ বা হোটেলের তফাৎ কোথায়?

সকল দিকে সামঞ্জস্য চাই। নানা বিরুদ্ধ মতবাদের আবহাওয়ায় বাঙালীর সংসারে স্বার্থ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে—স্বামি-স্ত্রী ছেলেমেয়ের দল নিজ-নিজ কর্ত্তব্যমাত্র পালন করে চলেছে—পরস্পরের সুখে-দুঃখে পরস্পরে সংযোগ রাখছে না! কেউ বা আত্মসুখ-কামনায় অপরের সম্বন্ধে দারুণ উদাসীন হচ্ছে! লক্ষণ ভালো নয়। স্নেহ-মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে আত্মসুখ স্বার্থ নিয়ে মানুষ কোনো দিন সুখী হতে পারবে না। বাহিরে বন্ধুবান্ধব, সোসাইটি পার্টি—তার যত আকর্ষণই থাকুক, ও মোহ চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাছাড়া পরের জন্য দরদে যাঁরা বিগলিত হন, ঘরের অতি-প্রিয় আত্মীয়দের উপর যদি সে-দরদের কণাও না মনে জাগে, তাহলে সব মিথ্যা হয়ে যাবে। এজন্য সংসারে সামঞ্জস্য-বিধানের দিকে স্ত্রী-পুরুষ সকলের বিশেষ সচেতন হওয়া দরকার।

মসৃণ অঙ্গ

দেহখানিকে সুঠাম-সুন্দর করিয়া গড়িতে এবং দেহের সুছাঁদ রক্ষা করিতে যেমন ব্যায়ামের প্রয়োজন, তেমনি দেহের লাবণ্য এবং স্নিগ্ধ মসৃণতা রক্ষা করিতেও গাত্রচর্ম্মের ব্যায়াম প্রয়োজন! উদ্ভট শুনাইলেও কথাটা খুব সত্য।

আমাদের দেহের উপরে এই যে চর্ম্ম, এ চর্ম্ম শুধু দেহের আবরণ-আচ্ছাদন মাত্র নয়। এ-চর্ম্মে যে অজস্র লোমকূপ, সেগুলি দেহ-গেহের বাতায়ন। দেহের অভ্যন্তরপ্রদেশে নির্ম্মল আলো-বাতাস যাইবে, তাহারি জন্য বিধাতা এত অজস্র বাতায়ন তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন! এই লোমকূপ দিয়া দেহের ভিতরকার সর্ব্বপ্রকার দূষিত ক্লেদ, গ্লানি, বিষ যেমন অহরহ বাহির হইয়া যাইতেছে, তেমনি এই কূপ-পথে বাহিরের বাতাস এবং আলো গিয়া দেহাভ্যন্তর-ভাগকে নির্ম্মল ও সুস্থ-স্বচ্ছন্দ রাখিতেছে। এই আলো-বাতাস দেহাভ্যন্তরে আমাদের রক্তে গিয়া মেশে, রক্তকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখে—রক্তকে গ্লানি-মুক্ত করে। এজন্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন—আমাদের এই গাত্র-চর্ম্ম **excellent barometer of health—an excellent health-meter.**

কাজেই যে-চর্ম্মে বাতায়নরূপ অজস্র লোমকূপের অবস্থান, সে চর্ম্মকে সুস্থ রাখা চাই। সে জন্য বিশেষজ্ঞেরা গাত্র-চর্ম্মের ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। কড়া তোয়ালে বা ব্রাশ দিয়া আমাদের গা ঘষা-মাজা প্রয়োজন। ব্রাশ দিয়া ঘোড়ার ও পোষা

কুকুরের গা যেমন মার্জ্জনা করি, ঠিক তেমনি ভাবে। এই ঘর্ষণ অর্থাৎ ঘষা-মাজাকে বিশেষজ্ঞেরা বলেন, Friction exercises.

গাত্রচর্ম্মের ব্যায়াম করিলে খোশ, পাঁচড়া, ফোড়া, চুলকানি, দাদ, মায় আঁচিল-তিল—এ-সব উপসর্গ দেহে আশ্রয় লইতে পারিবে না। গাত্রচর্ম্মের ব্যায়াম-সম্বন্ধে অনেকের হুঁশ নাই। গায়ে একরাশ জামাজোড়া চাপাইয়া রাখিলে গায়ের চামড়া অস্বাস্থ্যের বিষে জর্জ্জরিত হয়। গায়ে রৌদ্র-বাতাস লাগানো চাই। জামা-জোড়া গায়ে চাপানো থাকিলেও গায়ে আলো-বাতাস লাগে। সে-লাগা ঐ জামাজোড়া ভেদ করিয়া। জামাজোড়াতেই এ আলো-বাতাসের নির্ম্মলতার অর্দ্ধেকের উপর ক্ষয় পায়—কাজেই সে আলো-বাতাসে সুফল যা লাভ হয়, তা একেবারে অতি যৎকিঞ্চিৎ! কতকগুলা জামাজোড়া গায়ে চাপাইয়া রাখিলে কে না অস্বস্তি বোধ করে? তার কারণ, দেহ চায় বাহিরের নির্ম্মল অনাবিল আলো-বাতাস—তা হাতে বঞ্চিত হইলেই অস্বস্তি ঘটে। এবং এ অস্বস্তি লাঘব করিবার জন্যই আমরা গায়ের ঠিক উপরে নরম ও হাল্কা কাপড়ের আচ্ছাদন দিই। অস্বস্তি অবশ্য তাহাতে কিছু কমে। নিত্য-স্নানে দেহের ক্লেদ পরিষ্কার হয়। তবে স্নানের পর কড়া তোয়ালে বা কড়া শুষ্ক গামছায় গাত্র মার্জ্জনা কর্ত্তব্য। বেশ জোরে-জোরে গাত্র মার্জ্জনা করিবেন।

১। বাঁ হাত তলপেটের উপর

২। বাঁয়ে হেলিয়া

চামড়ার নীচে অনেকখানি রক্ত থাকে। এ রক্ত আবদ্ধ থাকিলে নানাবিধ চর্ম্মরোগ দেখা যায়। অসুখ হইলে স্নান বন্ধ থাকে; তখন চামড়া খশখশে হয়। সে সময় আঙুল দিয়া চামড়া ঘষিলে প্রচুর ময়লা বাহির হয়। ইহা হইতেই বুঝিবেন, দেহের মধ্যকার যত কিছু ক্লেদ-গ্লানি-বিষ ঐ চর্ম্মরন্ধ্র দিয়া নিত্য-নিয়ত বাহির হইতেছে। স্নান কারলে সে ময়লা ধুইয়া সাফ হইয়া যায়। স্নান না করিলে ঐ ক্লেদ-গ্লানি-বিষ চামড়ার উপরে জমিতে থাকে—লোমকূপ বন্ধ হইয়া যায়। এ জন্য অসুখের সময়েও চিকিৎসকেরা গরম জলে স্পঞ্জিংয়ের ব্যবস্থা করেন। স্পঞ্জিংয়ের ফলে চামড়ায় সঞ্চিত ক্লেদ-গ্লানি সাফ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য মেলে, তেমনি রোগেরও অনেকখানি উপশম ঘটিতে দেখা যায়।

কালক্রমে আচার-রীতিতে পরিবর্ত্তন ঘটে। সে পরিবর্ত্তনে অনেক সময়ে স্বাস্থ্যহানি এবং দেহ-বিকৃতি লাভ হয়! আমাদের দেশেই কিছু কাল পূর্ব্বে মেয়েদের বেশে এতখানি আঁটসাঁট-বাঁধনের বাহুল্য ছিল না। আজ সভ্যতার যুগে ফ্যাশনের খাতিরে বডিস্, টাইট্ বডি-সেমিজ প্রভৃতির বন্ধন অনিবার্য্য হইয়াছে। সভ্যতার খাতিরে আগেকার সে ঢিলাঢালা বা লজ্জা-নিবারণ-উপযোগী অল্প-স্বল্প আবরণের রেওয়াজ হয়তো সম্ভব নয়—কাজেই গায়ের চামড়ার ব্যায়াম সম্বন্ধে নিয়মিত বিধি পালন করা কর্ত্তব্য, এ ব্যায়াম-সাধনায় গায়ের চামড়া থাকিবে মসৃণ-চিক্কণ এবং ললিত লাবণ্যে দীপ্ত সমুজ্জ্বল।

৩। দুই হাত দিয়া পিঠ ও কোমর

৪। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া

লজ্জা-নিবারণ এবং শালীনতা রক্ষার জন্য অঙ্গে বস্ত্রাবরণ রাখিতেই হইবে; তবে বাহুল্য বর্জ্জনীয়—বিশেষ বর্ত্তমান সময়ে! পোষাক-পরিচ্ছদের অতিরিক্ত চাপে গাত্র-চর্ম্মে শুষ্কতা, রুক্ষতা এবং অঙ্গের গঠনে বিকৃতি ঘটিবেই। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—চর্ম্ম-ব্যায়াম-সাধনায় দেহ চর্ম্মরোগ-প্রতিরোধে সমর্থ হইবে—সর্দ্দি কাসি জ্বরের ভয়ও একেবারে তিরোহিত হইবে।

এবার চর্ম্ম-ব্যায়াম-সাধনার কথা বলিতেছি।

১। পিছন দিকে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়ান। দুই হাত রাখুন ১ নং ছবির ভঙ্গীতে—বাঁ হাত তলপেটের উপর, ডান হাত পেটের উপর। এবার তলপেট হইতে সুরু করিয়া বুকের উপর দিয়া গলা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ দুই হাতে ঘষিয়া ঘষিয়া মর্দ্দন করুন। তলপেট হইতে হাত যখন উপর-অঙ্গে উঠিবে, তখন নিশ্বাস গ্রহণ

করিবেন ; তার পর এক-মুহূর্ত্তও বিরাম না দিয়া গলা হইতে তলপেট পর্য্যন্ত এমনি ঘর্ষণ করিতে করিতে হাত নামিবে। হাত যখন নামিবে, তখন আর পিছনে হেলা নয়, সিধা-খাড়া দাঁড়াইবেন এবং এই সময়ে শ্বাস ত্যাগ করিবেন। তলপেট হইতে গলা পর্য্যন্ত ; পরক্ষণেই বিরামহীন ভাবে গলা হইতে তলপেট পর্য্যন্ত হাত দিয়া ক্রমান্বয়ে ঘর্ষণ-মর্দ্দন—এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ ষোল-বার।

২। এবার ২ নং ছবির ভঙ্গীতে ডান হাত দিয়া ডান কোমর হইতে ডান গলা পর্য্যন্ত,

৫। বাঁ দিকে কোমর বাঁকাইয়া

৬। দুই পায়ের গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত

সেই সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া বাঁ কোমর হইতে বাঁ পায়ের তলদেশ পর্য্যন্ত জোরে জোরে ঘর্ষণ-মর্দ্দন। তার পর ডান হাত দিয়া ডান কোমর হইতে ডান পায়ের তলদেশ এবং বাঁ হাত দিয়া বাঁ গলা পর্য্যন্ত ঘর্ষণ। এ ব্যায়াম ক্রমপর্য্যায়ে করিবেন ষোল-বার। জোরে জোরে ঘর্ষণ মানে অবশ্য এমন জোর নয়, যাহাতে গায়ের লোম ছিঁড়িয়া যায় বা হাতে-পায়ে-গায়ে জ্বালা ধরে, এ কথা মনে রাখিবেন।

৩। ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত দিয়া পিঠ ও কোমর—হাতে পিঠের যতখানি নাগাল পান—ঘর্ষণ-মর্দ্দন! পাঁচ মিনিট।

৪। ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ডান হাত প্রসারিত করিয়া বাঁ হাত দিয়া ডান হাত ঘর্ষণ—তার পর বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া ডান হাত দিয়া ঘর্ষণ। পাঁচ মিনিট।

৫। এবার বাঁ দিকে কোমর ঈষৎ বাঁকাইয়া বাঁ হাত হাঁটুর উপরে ডান হাত বাঁ-কোমরে—বাঁ হাত হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত লম্বালম্বিভাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তলপেটের উপর সরাসরি (৫ নং ছবি দেখুন)। পরক্ষণে ডান দিকে কোমর বাঁকাইয়া ডান হাতে ডান হাঁটু হইতে কোমর এবং বাঁ হাতে ডান দিক্ হইতে বাঁয়ে তলপেট পর্য্যন্ত ঘর্ষণ-মর্দ্দন। এ ব্যায়াম অন্ততঃপক্ষে পাঁচ মিনিট করা চাই।

৬। ৬ নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া দুই পায়ের গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত মর্দ্দন—তার পর খাড়া দাঁড়াইয়া কোমর হইতে জঘনদেশের উপর দিয়া কোমরের পিছন-দিক্ পর্য্যন্ত—পরক্ষণে বাঁ দিককার কোমর হইতে দু'হাত নামিবে হাঁটু হইয়া দু'পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত। হাঁটু হইতে গোড়ালি এবং গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত মর্দ্দন-কালে ৬ নং ছবির ভঙ্গীতে নুইতে হইবে। নুইবার সময় শ্বাসগ্রহণ—তার পর হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত মর্দ্দন-কালে খাড়া দাঁড়ানো এবং শ্বাস ত্যাগ। এ ব্যায়াম করা চাই—পাঁচ মিনিট।

নিত্য নিয়মিত এ ব্যায়ামে গায়ের চামড়া থাকিবে নবনী-কোমল দীপ্তোজ্জ্বল এবং সুস্থ ; সেই সঙ্গে দেহে মেদ জমিবে না—এবং দেহের গড়ন যৌবন-সুকুমার থাকিবে।

চাওয়া-পাওয়া

আমি চাই না তুমি নিশিদিনই কাছে থাকো !
দু'টি বাহুর মালা দিয়ে আমায় ঘিরে রাখো !
থাকো আমার আঁখির আগে
বুকে রাখো অনুরাগে—
সকল ছেড়ে আমারি হও—
এমন আমি চাহি না কো !

আঁধার যদি নামে কভু নিখিল ঘিরে,
আঁখি যদি তোমায় খুঁজে না পায় ফিরে—
আছি একই আকাশ-তলে
একই বাতাস বয়ে চলে
পরশ করি দোঁহার শিরে—যদি জানি—
তোমায় পাওয়ার বাকী কি আর ? ধন্য মানি !

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা

কবির প্রতি

কত যুগ কত বর্ষ ধীরে ধীরে চলে যাবে কবি,
তব জীবনের ছিন্ন পৃষ্ঠাগুলি আর ছিন্ন ছবি
অবান্তর পরিচয়—একে একে পড়িবে ঝরিয়া,
শুধু রবে কাব্য-গীতি কল্প-বীথি ভুবন ভরিয়া !
বিরহে-মিলনে-ত্যাগে জীবনের উপলব্ধি যত
জীবন-বিচ্ছেদ-শোকে সেই কাব্য সেই গীতি শত
কণ্ঠে কণ্ঠে মুখরিত হবে কত বসন্তে শরতে
বর্ষার বিজন রাত্রে। হৃদয়ের পরতে-পরতে
মূর্চ্ছনা তুলিবে গোষ্ঠ-গৃহে নদী-তটে সন্ধ্যাতারা,
যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস, সাড়া পাবে পথহারা
অমৃত-সঙ্গীতে তব। কেন বন্ধু ভগ্ন-মনোরথ ?
ঈর্ষা-সিন্ধু-বক্ষে হের জাগে তব জয়যাত্রা-পথ।
অশ্রু যেথা রচিতেছে মানবের দুঃখ-ইতিহাস
অন্তরের গানখানি সেথা তুমি করো গো প্রকাশ।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

১৩

সেদিন পঞ্চমী। সন্ধ্যার সময় জ্যোৎস্নার খানিকটা আলো ফুটিয়াছে, সে-জ্যোৎস্নায় মণিময়ের সঙ্গে বাড়ীর লনে বেঞ্চে বসিয়া দিলীপ কল-কারখানার প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিল। কি করিয়া প্রথম অগ্নি-বাষ্পের শক্তি আবিষ্কার হইল এবং সে-শক্তিকে মানুষ নিজের কাজে লাগাইল; তার পর ঐ বিদ্যুতের শক্তি···

মণিময় একাগ্র মনে শুনিতেছিল। তার মানস-নয়নের সামনে মৃদু জ্যোৎস্নার আলোয় ফুটিতেছিল এই পৃথিবী···যেন বিরাট্ এক কর্ম্মশালা···মানুষের জ্ঞান-তপঃসাধনায় তুষ্ট হইয়া নিসর্গ আসিয়া মানুষের হাত ধরিয়া তার সঙ্গে কাজে নামিয়াছে!···

এ-আলোচনার মধ্যে হঠাৎ মণিময় বলিল,—মাষ্টার মশাই···

দিলু বলিল,—কেন?

মণিময় বলিল,—চমৎকার লাগছে আপনার কথা। রূপকথার চেয়েও চমৎকার! আচ্ছা, এত সব চমৎকার আর সত্যি কথা না লিখে ছেলেদের জন্য ঐ সব আজগুবি থ্রিলার গল্প এঁরা কেন লেখেন বলতে পারেন?

দিলু বলিল,—তার কারণ আজগুবি গল্প লেখা সহজ! ওতে ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই! যা মনে আসে, লিখে গেলেই হলো! বিজ্ঞানের কথা লিখতে গেলে লেখককে ভালো করে বিজ্ঞান বুঝতে হবে। বুঝে সে সব কথা গুছিয়ে লিখতে অনেকখানি শক্তির দরকার। ছোটদের জন্য এই সব আজগুবি গল্প যাঁরা লেখেন, তাঁদের সে শক্তির অভাব!

মণিময় কি ভাবিল, তার পর বলিল,—কলকাতার ক'জন পাবলিশারকে বাবার অর্ডার দেওয়া আছে, ছোটদের জন্য নতুন বই বেরুলেই আমাকে তারা সে বই পাঠাবে। কাল আমি তাদের চিঠি লিখে বারণ করে দেবো, এ সব বই যেন আর না পাঠায়! ···বিজ্ঞানের খানকতক বই আপনি আমাকে আনিয়ে দেবেন মাষ্টার মশাই? পড়ে বুঝতে পারি, এমন সহজ বই?

দিলু বলিল,—দেবো আনিয়ে। তেমন বাঙলা বই পাবো না, তবে ইংরেজীতে অনেক ভালো-ভালো বই আছে···পড়ে বুঝতে পারবে, এমনি সহজ করে বিজ্ঞানের কথা সে-সব বইয়ে লেখা আছে।

জোগু ভৃত্য আসিয়া বলিল, কর্ত্তাবাবু দু'জনকে ডাকিতেছেন।

দিলু বলিল,—আমাকেও ডাকছেন?

জোগু বলিল,—হ্যাঁ।

—এসো মণি।

দু'জনে বিলম্ব করিল না, তখনি জানকী বাবুর কাছে আসিল। জানকী বাবু বসিয়াছিলেন তাঁর ঘরে···একা। সামনে টেবিলের উপর একরাশ মোটা খাতা। একখানা খাতা খুলিয়া তারি একটা পাতায় তিনি নিবিড় ভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।

মণিময় ডাকিল,—বাবা···

জানকী বাবু চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

মণিময় বলিল—আমাদের ডেকেছো বাবা?

দিলু আর মণিময়···দু'খানা চেয়ারে পাশাপাশি দু'জনে বসিল ···জানকী বাবুর সামনে।

মণিময় বলিল—বিজ্ঞানের কি চমৎকার কথা বলছিলেন মাষ্টার মশাই! আমি একেবারে জলের মতো সব বুঝতে পারছিলুম! আচ্ছা, তুমি বলো তো বাবা, ঘুমোবার সময় আমরা চোখ বুজি কেন? চোখ না বুজলে আমরা ঘুমোতে পারি না কেন?

চুপ করিয়া সাগ্রহে সোৎসুক নয়নে মণিময় চাহিয়া রহিল জানকী বাবুর পানে। জানকী বাবুর মুখে হাসির দীপ্তি! তিনি চাহিলেন মণিময়ের পানে, বলিলেন—কেন চোখ বুজি?

কথাটা বলিয়া তিনি চাহিলেন দিলীপের পানে···মণিময় তাহা লক্ষ্য করিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—না মাষ্টার মশাই, আপনি বাবাকে বলে দেবেন না। তুমি বলো বাবা···তোমাকে বলতে হবে।

সহাস্যে জানকী বাবু বলিলেন—অনেক জিনিষই জানি মণি··· কিন্তু রোজ চোখ বুজে ঘুমোচ্ছি···সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে; কখনো এর ব্যতিক্রম হলো না···অথচ ঘুমোবার সময় চোখ খুলে না রেখে আমরা চোখ বুজি কেন, তা জানি না!···আচ্ছা, তুমিই বলো ···তোমার কাছ থেকে শুনে আমি শিখি।

বাপের কথায় মণিময়ের আনন্দ যেন ধরে না! উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলিল,—জানো, আমাদের যে এই চোখের পাতা···যখন জেগে থাকি, তখন এই চোখের পাতা খুলে রাখবার জন্য আমাদের রীতিমত চেষ্টা করতে হয়! আমরা ক্লান্ত হলে তবেই তো ঘুম পায়! কাজেই সে-ক্লান্তি হবার জন্য চোখের পাতা খুলে রাখবার সামর্থ্য আমাদের থাকে না···ক্লান্তির জন্য সর্ব্বশরীর ঝিমিয়ে আসে, চোখের পাতাও ক্লান্তিতে বুজে আসে। এ ছাড়া আরো কারণ আছে···তার সবটুকু বোঝা হয়নি। তুমি ডাকলে, তাই চলে এলুম।

জানকী বাবু শুনিয়া খুশী হইলেন। ছেলেবেলায় মাথায় সেই আঘাত লাগিবার ফলে তাঁর একটিমাত্র ছেলে মণিময়ের বুদ্ধিতে যে জড়তার আবেশ, বহু চিকিৎসাতেও সে জড়তা সারিল না! ছেলে মূর্খ হইয়া থাকিবে, এ দুঃখ তাঁর মনে কাঁটার মতো বিঁধিয়া আছে চিরদিন! দেখিয়া শুনিয়া কত মাষ্টার রাখিলেন! বই খুলিয়া পড়াইয়া যতটুকু শিখানো যায়, শিক্ষা দাও—তার পর পৃথিবীর সর্ব্ববিষয়ে কথা কহিয়া গল্প করিয়া ছেলেকে শুনাও—সেই সব কথা ও গল্প শুনিয়া ছেলের জ্ঞান জন্মিবে! তা কোনো মাষ্টার-মশাই-ই ছেলের মনে জ্ঞানের প্রদীপ তেমন করিয়া জ্বালিতে পারিল না!

দৈবাৎ অবশেষে ছেলের মুখে সেদিন দিলীপের সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা···দিলীপকে দিয়া তাই আর একবার চেষ্টা! সে চেষ্টা এই অল্প-দিনে এতখানি সার্থক হইয়াছে!

দিলীপের উপর অনেকখানি প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন—খুব খুশী হয়েছি দিলীপ। মণি যে এত-বড় কথা বুঝেছে আর বুঝে আমাকে বোঝাতে পেরেছে, এ থেকে বুঝছি, তুমি শুধু পড়াশুনা করো না, যা পড়ো, তা একেবারে মজ্জাগত করো···করে' সে-জ্ঞান অপরকে

মশাইদের মধ্যে জ্ঞানকে অনেকে চান মাথার মধ্যে ঠেশে দিতে; মনের মধ্যে গুঁজে দিতে জানেন না। তাই আমাদের পাশ-করা সমাজে আসল জ্ঞান দেখি এত কম! এর রিওয়ার্ড দরকার··· এ্যাপ্রিসিয়েশন···সামনের মাস থেকে মণিময়ের শিক্ষা-হিসাবে বখশিস নয়, একশো টাকা করে তুমি পাবে···দক্ষিণা!

দিলীপ যেন আকাশ হইতে পড়িল···এমনি বিস্ময়ে সে একেবারে অভিভূত!···নিমেষে সে ভাব সম্বৃত করিয়া দিলু বলিল—কিন্তু এ একশো টাকার প্রত্যাশা আমি করিনি! যা আমাকে দিচ্ছেন···

হাসিয়া জানকী বাবু বলিলেন—সব ব্যাপারে দর-কষাকষি করে আমাদের মস্ত একটা দোষ জন্মেছে এই যে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের শিক্ষার দাম নিয়ে আমরা কষাকষি করি···করে' কত সস্তায় মাষ্টার পাবো সেই চেষ্টা করি! তার ফলে সস্তার হয় তিন অবস্থা! অর্থাৎ ভালো লোক পেলেও সে ভালো লোক দাম বুঝে বিদ্যা দান করেন। টাকায় যেখানে পাঁচপোয়া বিদ্যা দরকার, সেখানে কৃপণতা করে আমি যদি আট আনা দি, মাষ্টার মশাইরাও তাহলে পাঁচপোয়া না দিয়ে বিদ্যা দেবেন আড়াই-পোয়া ওজনের!

কথার শেষে জানকী বাবু উচ্চহাস্য করিলেন। তার পর বলিলেন—হ্যাঁ। ডেকেছি কেন, বলি।···আমার একবার সখ হয়েছিল, আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নিজের যেটুকু অভিজ্ঞতা, সে কথা সহজ করে লিখবো। ব্যবসাক্ষেত্রে যাঁরা নামতে চান, সে লেখা পড়ে তাঁরা সমৃদ্ধি লাভ না করলেও অনর্থক লোকসান না ভোগ করেন, এইটুকু সাহায্য তাঁদের হবে। তা বইখানি আমি লিখেছি···ইংরেজীতে···লিখে শেষ করেছি। দু'-তিনবার ছাপাতে দেবো ভেবে লেখা উল্টে দেখতে আমি কুণ্ঠিত হয়েছি শুধু এই ভেবে যে, বাঙালী হয়ে বাঙলা ভাষায় বই না লিখে ইংরেজীতে লিখলুম··· ইংরেজী-জানা সমাজ আমার ইংরেজীর ভুল ধরে তামাসা না করে শেষে! তোমাকে পেয়ে তাই আমি ভাবছি, তোমায় দিয়ে একবার সে-লেখা দেখিয়ে নিই!···আমাদের ইংরেজী হলো সেকালের শেখা। ইডিয়ম, ষ্টাইল সব সেকেলে রকম। তোমার হাত দিয়ে এটা আগাগোড়া আমি রিভাইশ করাতে চাই। অবশ্য তার জন্য···

তাঁর কথা শেষ হইল না। বাধা দিয়া সলজ্জ কম্পিত ভাবে দিলু বলিল—কিন্তু আমার সামর্থ্য···

জানকী বাবু বলিলেন—সে সামর্থ্যের বিচার আমি করেছি দিলীপ। আমেরিকার ইন্টার্ণল কোম্পানির সঙ্গে আমাদের সেই যে গোলযোগ ঘটেছিল, তার সমাধানের জন্য আমার কথামতো তুমি চিঠি ড্রাফ্‌ট করেছিলে! সেই ড্রাফ্‌ট দেখে বুঝতে আমার দেরী হয়নি যে, তোমার মধ্যে জ্ঞানের যে আগুন, সে সামান্য স্ফুলিঙ্গ মাত্র নয়!

জানকী বাবুর মুখে এতখানি প্রশংসা! গৌরবে দিলীপের মন একেবারে ভরিয়া উঠিল! মনে হইল, যদি উপায় থাকিত, এখনি ছুটিয়া গিয়া মার কাছে এ গৌরব-আনন্দ নিবেদন করিত! এ কথা শুনিলে মার মনে কতখানি আনন্দ হইবে! আহা, দুঃখিনী মা! তিনটি ছেলের কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া বাঁচিয়া আছেন! ছেলে তিনটি মানুষ হইবে, দশের সভায় তারা আসন পাইবে—ইহা ভিন্ন মায়ের মনে অন্য কামনা নাই! মনে পড়িল বাপ মহেন্দ্রর কথা···সে বাপ আজ কোথায়!

জানকী বাবু বলিলেন—সমস্যা এই, এ কাজ কখন তুমি করবে!

দিলীপ কোনো জবাব দিল না···নিরুত্তরে রহিল। বুকের মধ্যে যা হইতেছিল···বুঝি, ইহাকেই কবিরা বলেন পুলকের প্লাবন!

মণিময় বলিল—কেন, ফ্যাক্টরির কাজে ওঁকে ছুটী দাও!

জানকী বাবু বলিলেন—সে-কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি হতে পারে দিলীপ! কেন না, প্রথম দিনে তুমি যে কথা আমায় বলেছো···সেই···ফ্যাক্টরিতে থেকেও কেন বড় হওয়া যাবে না? তোমার সে-কথা আমি ভুলিনি দিলীপ! খুব বড় কথা! জজের আসনে বসতে পেয়েও অনেক জজ যে সে-আসনকে ছোট করে, কলঙ্কিত করে! আসনে গৌরব নেই—গৌরব মানুষের মধ্যে! যে-ফ্যাক্টরির ভোলা কালু আবদুল ছিদাম টম্ জ্যাক্ কাজে ফাঁকি দেয়, নেশা করে,—সেই ফ্যাক্টরিতে কাজ করে ইংলণ্ডে-আমেরিকায় কত স্যর ব্যারণ দিকপালের সৃষ্টি হচ্ছে!

মণিময় বলিল—আমাদের দেশেও স্যর আর এন্ মুখার্জ্জি···

হাসিয়া জানকী বাবু বলিলেন—ঠিক কথা। স্যর আর এন তোমার আদর্শ হোন্ দিলীপ! তুমিও এক দিন ফ্যাক্টরিকে গৌরবান্বিত করবে!···কিন্তু সে কথা যাক্! এখন আমি ভাবছি, এ-লেখা কখন তুমি পড়বে বলো তো? আমার অবশ্য খুব তাড়া নেই···আস্তে আস্তে এ কাজ করলেও চলবে।

দিলীপ এবার মুখ তুলিল, মুখ তুলিয়া বলিল—রাত্রে আমি লেখাপড়া করি, সে সময় অনায়াসে আপনার লেখা পড়তে পারবো! আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা···ও-লেখা পড়বার জন্য আমার খুব আগ্রহ···পড়লে নিজে কতখানি শিক্ষা পাবো! ও-লেখা দেখতে আমার দেরী হবে না।

সেই রাত্রেই দিলুর হাতে জানকী বাবু তাঁর লেখা মোটা দু'খানি খাতা দিলেন। খাতা লইয়া দিলু বাড়ী আসিল। খাতায় লেখা নয়, যেন সে বিজয়-লক্ষ্মীর আহ্বান পাইয়াছে!

১৪

জানকী বাবুর শরীর এখন ভালো আছে। কাজে-কর্ম্মে তিনি পরিপূর্ণ মনোযোগ অর্পণ করিলেন। নানা ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষদের অকস্মাৎ এখন অফিস-কামরায় তলব হয়। তাঁদের বলেন কাজ-কর্ম্ম, খাতা-পত্র বুঝাইয়া দিতে! দেখিতে চান, অধ্যক্ষেরা হাজিরামাত্র দিয়া মাহিনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, না, অধীনস্থ লোক-জনের কাজ-কর্ম্ম মন দিয়া দেখিতেছেন; এবং সে-কাজ তাঁরা বোঝেন!

সেদিন ডাক পড়িল পিনাকীর। কেতা-দুরস্ত সাহেবী পোষাক-আঁটা পিনাকী আসিয়া দাঁড়াইল জানকী বাবুর ঘরে।

জানকী বাবুর সামনে টেবিলের উপর খোলা খাতা। সেই খাতায় একটা অঙ্ক দেখাইয়া জানকী বাবু প্রশ্ন করিলেন—এটা পড়ো তো পিনাকী!

পিনাকীর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! তখনি নিজেকে সামলাইয়া ঝুঁকিয়া খাতার অঙ্ক দেখিল,—লেখা আছে চার হাজার সাতশো পঁচাত্তর টাকা বারো আনা ন' পাই।

মুখে এ-অঙ্ক সে উচ্চারণ করিয়া পড়িল।

জানকী বাবু বলিলেন,—বেশ, এ টাকাটা দেওয়া হয়েছে কাকে?

খাতায় নাম লেখা ছিল। দেখিয়া পিনাকী পড়িল,—হ্যামার্টন ষ্টীল ওয়ার্কস্ গ্লাসগো।

জানকী বাবু বলিলেন,—এ টাকা কিসের জন্ত দেওয়া হয়েছে ?

পিনাকীর বুকের মধ্যে কে যেন কামান দাগিল ! সে বলিল,—আজ্ঞে, এ্যাকাউন্টাণ্ট রামহরি বাবুকে জিজ্ঞাসা করে এসে বলছি এখনি।

জানকী বাবু বলিলেন—না, না ! তাঁকে তো আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারি। তা নয়। তুমি বলো···তুমি এ্যাসিষ্টাণ্ট-ম্যানেজার হয়ে কাজ কি দেখছো···অফিসের কোথায় কি হচ্ছে, এ সব খপর তোমার জানা উচিত !

পিনাকীর মুখে কথা নাই ! সে নিরুত্তর।

জানকী বাবু বলিলেন,—কাজ যদি না দেখবে, তাহলে শিখবে কি করে ? তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো···কোথা থেকে ছোট বোল্ট্, আসছে, স্ক্রু আসছে, তাদের কোন্‌টা ভালো···কোন্‌টার কত দাম পড়ছে···সব তিনি বলে দেবেন ! কোন্ জিনিষের কোথায় কি দরকার, কতটা দরকার···তাও তিনি বলে দিতে পারেন। এই যে ফী-মেলে বিলিতী-ডাকে সেখানকার দর-দামের রিপোর্ট আসছে··· সে রিপোর্ট দ্যাখো ?

পিনাকী কোন কালে দেখে না ! দেখিবার প্রয়োজন মনে করে না। সে জানে এখানকার ম্যানেজার অর্থাৎ সর্ব্বময় কর্ত্তা বাপ কামাখ্যা চ্যাটার্জ্জী···পিনাকী সেই কামাখ্যা চাটার্জ্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ! নিজেকে এ-রাজ্যে সে দেখে যেন প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্ ! অফিসে আসে মাসিক এ্যালাউয়ান্স মাসের শেষে হস্তগত হইবে, সেই লোভে ! সাজিয়া আসে, তার কারণ আর সকলের চেয়ে তার পোজিশন যে অনেক উঁচুতে তাহা বুঝাইতে ! সে কি কাহারো সঙ্গে মেশে এখানে ? মিশিবে কি করিয়া ? সে ম্যানেজারের ছেলে—আর উহারা তুচ্ছ শ্রমিক-শিল্পী কেরাণী কুলি বৈ নয় !···তার উপর জানে, পরে সে ম্যানেজার বা বড় সাহেব হইবে ! তার কাজ শুধু সাজিয়া অফিসে আসিয়া নিজেকে জাহির করা, ঘণ্টা টিপিয়া বেয়ারা ডাকা, এবং সকলের উপর হুকুম চালানো !···

পিনাকীর মুখে কথা নাই ! কি কথা বলিবে ? অফিসের বাবুদের ডাকিয়া জানকী বাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা-পড়া করেন,—এ সংবাদ পিনাকীর অজানা নয়। উহারা ম্যানেজারের ছেলে নয়, উহাদের দেখিবেন বৈ কি ! তাই বলিয়া তাহাকেও এমনি ভাবে পরীক্ষা দিতে হইবে, এ কল্পনা পিনাকীর মনে কোনো দিন উদয় হয় নাই !

তাকে নিরুত্তর দেখিয়া জানকী বাবু বলিলেন—তুমি জানো না ! এ-সব না জানলে চলবে কেন পিনাকী ? এক দিন ম্যানেজার হয়ে এত বড় কারবার তোমাকেই যদি চালাতে হয় ? নিজে না দেখে না জেনে তোমার আণ্ডারে যারা কাজ করে, তাদের কথার উপর যদি নির্ভর করো, তাহলে তাদের হাতে তোমাকে পুতুল বনে' থাকতে হবে ! দিস্ ওণ্ট ডু, মাই বয়। তুমি যাও, আজ থেকে খাতাপত্র দেখে সব শেখবার চেষ্টা করবে।

পিনাকী তাড়াতাড়ি বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি যেমন বলছেন, এবার থেকে তাই হবে। ভবিষ্যতে আর এমন হবে না !

জানকী বাবু বলিলেন—হ্যাঁ···এই আমি চাই !···

পিনাকী চলিয়া যাইতেছিল, জানকী বাবু বলিলেন—একটা কথা···

পিনাকী দাঁড়াইল। জানকী বাবু বলিলেন,—বাইরের একটা অফিসের ভার আমাদের হাতে আসছে। সেখানে এক জন ম্যানেজার পাঠাতে হবে···আমাদের নিজের লোক ! তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে এর মধ্যে তোমাকে সে-কাজে যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে, পিনাকী !···তোমার বাবা এ-কথা জানেন। তাঁকে আমি বলেছি, বাহিরের সে-অফিসের জন্ত যোগ্য লোক চাই। তাতে তিনি তোমার কথা বলেছেন। সেই জন্ত তোমাকে আমি ডেকেছিলুম···শুধু দেখতে ইফ ইউ কুড ম্যানেজ দেয়ার।···কিন্তু যা দেখলুম···

কথাটা শেষ না করিয়া জানকী বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। পিনাকীর বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

জানকী বাবু বলিলেন—এখনো মাসখানেক সময় আছে। এর মধ্যে নিজেকে তৈরী করে নাও।

পিনাকী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিজেকে তৈরী করে নেবো।

—হুঁ···

পিনাকী চলিয়া গেল···জানকী বাবু ডাকিলেন—মুরারি···

মুরারি আসিল।

জানকী বাবু বলিলেন—নাম লেখা স্লিপ পাঠিয়েছে···কে দেবীদাস ভটচায্যি···বাইরে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে নিয়ে আয়।

মুরারি চলিয়া গেল। এবং পাঁচ মিনিট পরে ফিরিল ; তার সঙ্গে নিরীহ-গোছ এক জন বাঙালী ভদ্রলোক।

জানকী বাবু বলিলেন—আপনার নাম দেবীদাস ভট্টচায্যি ?

ভদ্রলোক কহিলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি চাই আপনার ?

ভদ্রলোক বলিলেন—আমি কলকাতা থেকে আসছি। মানে, এখানকার সুপ্রসন্ন বাবু···তাঁরি শ্বশুরবাড়ী থেকে। তাঁরা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। সুপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধী সত্যবান বাবু··· সাব-জজ···তাঁর সম্বন্ধীর একটি ছেলে আছে। বিলেত থেকে মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছে। ছেলের বাপ মস্ত বড় কনট্রাক্টর···পি-ডব্লু-ডীর সব কাজ তাঁর একেবারে বাঁধা। বাপের নাম জগদীশ রায়। ছেলের নাম অমরেশ। অমরেশের জন্ত ওঁরা পাত্রী খুঁজছেন। আপনার কাছে তাই ওঁরা আমাকে পাঠালেন,—আপনার যদি পছন্দ হয়···অর্থাৎ আপনার কন্যার সঙ্গে···

জানকী বাবু বলিলেন—আপনি ঘটক ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

জানকী বাবু বলিলেন—আমার মেয়ে আছে এবং তার জন্য পাত্রও খুঁজছি। তবে বিলেত-ফেরত মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার ? সাহেব-মানুষকে কেমন ভয় করে, ঘটক মশাই ! জীবনে অভিজ্ঞতা তো বড় অল্প হলো না !···আপনার বয়স বেশী নয়···আমাদের মতো প্রবীণ লোকের অভিজ্ঞতার কথায় আপনারা বোধ হয় হাসবেন ! আপনাদের বয়সে আমরাও হাসতুম।···কিন্তু দেখছি, হাসা অন্যায় হয়েছিল। অভিজ্ঞতার দাম সামান্য দাম নয় ! কালে মানুষের রুচির অদল-বদল হতে পারে, কিন্তু মানব-চরিত্র কখনো বদল হতে দেখলুম না !

ঘটক-ভদ্রলোক এ-কথার মর্ম্ম বুঝিলেন না, তার কি জবাব দিবেন ! জানকী বাবুর মন রাখিতে তিনি শুধু মৃদু হাস্য করিলেন।

জানকী বাবু বলিলেন—এ-ছেলেটির বয়স ?

—আজ্ঞে, সাতাশ বছর।

জানকী বাবু বলিলেন—আমার মেয়ের বয়স হলো চোদ্দ···তা বেমানান্ হবে না!

জানকী বাবু কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন—ছেলেমেয়ে বিবাহ-যোগ্য হলে পাঁচটা পাত্র-পাত্রী দেখতে হয়, দেখে নাড়াচাড়া করতে হয়। তবে বুঝছেন তো, আমার এই বয়স,—আর দেহের সামর্থ্য! এ-বয়সে কলকাতা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে পাত্র দেখা··মস্ত অসুবিধার ব্যাপার!

ঘটক-ভদ্রলোক বলিল—তা নয়। বলেন যদি, তাঁরা মেয়ে দেখতে আসবেন তো···এখানে সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ী রয়েছে···মেয়ে দেখতে পিতাপুত্র দু'জনেই না হয় আসবেন! পাত্রটিকে আপনি তখন এইখানেই চোখে দেখবেন।

জানকী বাবু বলিলেন—বিয়ে হবে, কি, হবে না···মানে, নিশ্চয়তা নেই তো! এত দূরে তাঁরা আসবেন কষ্ট করে?

ঘটক-ভদ্রলোক বলিল—নিশ্চয় আসবেন। কন্যা-দায় যেমন দায়, পুত্র-দায়ও তেমনি-!

জানকী বাবু বলিলেন—আপনি কলকাতা থেকেই বরাবর আসছেন তো?

—আজ্ঞে, হাঁ।

—খাওয়া-দাওয়া?

ঘটক বলিল—সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে এসে নেমেছি। সেইখানেই স্নানাহার সেরে আপনার কাছে আসছি। রাত্তিরের ট্রেণে যদি ফিরতে পারি, ইচ্ছা আছে। তাহলে ওঁদেরো যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে এনে পাত্রী দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারি! আজ নমস্কার, আমি আসি।

জানকী বাবু বলিলেন—তা হয় না। অতিথি! আমার ওখানে একবারটি যেতে হবে।···ওরে মুরারি···

মুরারি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—আজ্ঞে···

জানকী বাবু বলিলেন—বাবুকে বাড়ীতে নিয়ে যা! নিজে থেকে ওঁর জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়ে জলখাবার খাওয়াবি। তার পর সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবি। আমার গাড়ী রয়েছে···ঐ গাড়ীতে করে এখান থেকে যা।

তার পর তিনি চাহিলেন ঘটক-ঠাকুরের পানে, বলিলেন—আমার এখন যাবার উপায় নেই ঘটকমশায়। এ ত্রুটি···

—না···না, বলেন কি আপনি! আপনার ত্রুটি? শশব্যস্তে প্রতিবাদ জানাইয়া ঘটক দেবীদাস ভটাচার্য্য মুরারির সঙ্গে বাহির হইয়া গেল!

১৫

দু'দিন পরের কথা।

বেলা সাড়ে ন'টা। সুভাষিণী স্নান করিতে গিয়াছে, মোহন বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিল, হঠাৎ উঠানে আহ্বান জাগিল,—কোথায় গো বাড়ীর লোকজন?

এ কণ্ঠ গৌরী ঠাকুরাণীর। কণ্ঠ সুভাষিণীর কাণে পৌঁছিল। সুভাষিণী চিনিল। কূয়াতলা হইতে সুভাষিণী বলিল—দিদি! কি

সুভাষিণী বলিল—দিলু কাজে বেরিয়ে গেছে। নীলু এখানে থাকে না তো···সে রঙপুরে···সেখানকার কলেজে পড়ছে। আর মোহন···নেই ওখানে?

মোহন ছিল দাওয়ায়, মায়ের মুখে নাম উচ্চারিত হইবামাত্র সে বলিল—আমি এইখানে, মা।

মা বলিল—পিসিমা এসেছেন। তাঁকে বসাও মোহন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও···আমি এখনি আসছি!

মোহন উঠিয়া গৌরী ঠাকুরাণীর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মোহনের চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন লইয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আমাকে চেনো?

মাথা নাড়িয়া মৃদু হাস্যে মোহন বলিল—চিনি।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—কি করে চিনলে আমাকে? তুমি সেই কবে দেখেছো···কত কাল আগে!

সলজ্জ মৃদু হাস্যে মোহন বলিল,—আমি জানি।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—কোন্ ক্লাসে পড়ছো?

মোহন বলিল—ক্লাস সেভেন্।

—দাদাদের মতো এগজামিনে ফার্ষ্ট হচ্ছো তো?

মোহন সলজ্জে মাথা নত করিল, কোনো কথা বলিল না।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—গেল-এগজামিনে কত হয়েছিলে?

মাথা তুলিয়া মোহন বলিল,—ফার্ষ্ট!

খুশী-মনে গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—এই তো চাই বাবা। মায়ের খালি বুক···তোমরা তিন ভাইয়ে মাণিক-রতন হয়ে মায়ের বুক ভরে রাখো! মাকে সুখী করো। মায়ের চেয়ে বড় পৃথিবীতে তোমাদের আর কেউ নেই। এই মাকে কোনোদিন তুচ্ছ করো না বাবা, যত বড়ই হও! মাকে যে মানে না, কোনো দিন সে বড় হতে পারে না।

গৌরী ঠাকুরাণী তাঁর মন হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে সব কথায় যেন বিদ্যুতের প্রবাহ! মোহনের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চে ভরিয়া উঠিল।

সুভাষিণী আসিল। ভিজা কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গে মুড়িয়া···মাথায় দীর্ঘ কেশের রাশি এলায়িত। সাদা থানের আবরণ ভেদ করিয়া অঙ্গের উজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে!

হাসি-ভরা মুখে সুভাষিণী বলিল,—ভিজে কাপড়ে প্রণাম করবো না দিদি···কাপড় ছেড়ে এসে প্রণাম করবো।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তোমার প্রণাম নিতে আমি আসিনি বৌ। বাড়ী এলুম, তাই সব দেখতে-শুনতে এসেছি! দূরে থাকলেও মন আমার তোমাদের কাছে এইখানে পড়ে আছে···এ কী বন্ধনে বেঁধেছো! এক দিকে ঐ কুমু···আর এক দিকে তোমরা। বুড়ো বয়সে কোথায় তীর্থধর্ম্ম করবো···তা নয়! কোনো তীর্থে গিয়ে মনস্থির করে থাকতে পারি না!

সুভাষিণী বলিল,—স্নেহ এমন জিনিষ দিদি! নীচের দিকেই তার গতি! উপর-দিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা···সে-ভক্তিও এই স্নেহের সঙ্গে পেরে ওঠে না!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—তাই। এখন যাও দিকিনি, ভিজে

সুভাষিণী ঘরে ঢুকিল কাপড় ছাড়িতে। গৌরী ঠাকুরাণী বসিলেন দাওয়ায় মেঝেয়। মোহন শশব্যস্তে বলিল,—মেঝেয় বসছেন কেন, পিসিমা? আমি আসন নিয়ে আসি।

বলিয়া মোহন আসন আনিবার জন্ম ছুটিতেছিল, তাকে নিবৃত্ত করিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—না, না! পাগলা ছেলে! আসনে কাজ নেই, তোমার পিসিমা সাহেব নয় যে মেঝেয় বসলে মানহানি হবে!

ভিজা কাপড় ছাড়িয়া শুকনো কাপড় পরিয়া সুভাষিণী তখনি আসিল। বলিল,—ও কি দিদি! মাটীতে কেন?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—মাটীই ভালো! এই মাটীর মায়াতেই তো আমাদের ঠাকুর-দেবতারা মাটীর পৃথিবীতে জন্ম নেন! আমার জন্ম ব্যস্ত হয়ো না বৌ! এই তো বাড়ী এসেছি···এখনো স্নান করিনি! মন পড়ে রয়েছে এখানে···স্নান সেরে আসবো, তার তর সইলো না!

সুভাষিণী বলিল—হঠাৎ বাড়ী এলে যে!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—হঠাৎ নয় বৌ। ওরা টেনে নিয়ে এলো। মানে, সত্যবানের সম্বন্ধী জগদীশ বাবু। তিনি এসেছেন, জগদীশ বাবুর স্ত্রী এসেছে, জগদীশ বাবুর ছেলে অমরেশ এসেছে। কুমু আর জামাই জ্যোতির্ম্ময়ও এসেছে। বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে এখানে এনে বাস্তু-দেবতাকে প্রণাম করানো হয়নি তো! সুবিধা হলো এখন···বললুম, চলো সব···তাই আসা।

সুভাষিণী বলিল,—ওঁরা এলেন যে?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—এলেন···মানে, জগদীশ বাবু তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন। চমৎকার ছেলে···যেমন চেহারায়, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধিতে! বিলেতে ছিল পাঁচ বছর। মাস-খানেক হলো পাশ করে ফিরেছে। জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচির সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছিলুম আমি···তাই এসেছেন! মেয়ে-ছেলে দু' পক্ষের দুই দেখা হয়ে যাবে।

সুভাষিণী বলিল—জানকী বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—ওরা মেয়ে খুঁজছিল, বললুম। কলকাতায় আছি···কুমুর দিদিমা আমাকে ছাড়লেন না। বলেন, একা পড়ে আছি গৌরী···তোমার মতো মেয়ে থাকতে একা কেন থাকবো? যে কটা দিন দুই মায়ে-ঝীয়ে এক সঙ্গে থাকা যায়, থাকি এসো। বুড়ো মানুষের কথা ঠেলতে পারি না ভাই! চমৎকার মানুষ! সেকেলে বিধবা···আচার-নিয়ম মানেন! তবু একালের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কোনোখানে মতের অমিল দেখি না! তাদের অনাচার-অনিয়মগুলিও এমন সহজ বুদ্ধিতে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারেন, আশ্চর্য্য!

তার পর অনেক কথা হইল। ঘর-সংসারের কথা···ছেলেরা কে কি করিতেছে···তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের আশার কথা···

গৌরী ঠাকুরাণী কহিলেন—আর একটি নতুন মানুষ এসেছে আমাদের সঙ্গে···সত্যবানের লোক। রাজীব। এ রাজীব কে, জানো?

সুভাষিণী বলিল—না।

গৌরী ঠাকুরাণী কহিলেন—তোমার মামাশ্বশুর ছিলেন প্রসন্ন বাবু···তাঁর কাছে এই রাজীব কাজ করেছে চির-জীবন। তাঁর সুখে-দুঃখে এই রাজীব ছিল সাথী।···তিনি মারা যাওয়া ইস্তক সত্যবানের কাছে আছে। সত্যবান্ তাকে কলকাতায় রেখে গেছে। মায়ের এই বয়স! বললে, লোকটি খুব বিশ্বাসী আর কাজের···বাড়ীর চার্জ্জ সে অনায়াসে নিতে পারবে···অনেক অসুবিধা থেকে পরিত্রাণ পাবে, মা! তা লোকটি ভাই, সত্যি চমৎকার!

সুভাষিণী একাগ্র মনে এ কথা শুনিল। শুনিয়া কিছু বলিল না··· নিরুত্তরে রহিল! মনের উপর বহু-অতীত দিনের কথা স্বপ্নাভাসে জাগিয়া উঠিল। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে স্বামীর মুখে শুনিয়াছে রাজীবের স্নেহ-মমতার কথা, রাজীবের যত্ন-আত্তির কথা! মহেন্দ্র বলিত, —তাকে কোনো দিন চাকর বলে মনে করিনি সুভা···এমন তার দরদ! মনে হতো কোন্ পূর্ব্বজন্মে রাজীব যেন ছিল মায়ের পেটের ভাই! যে সেবা-যত্ন করতো, অনেক ভাইয়েও তেমন করে না···

সেই রাজীব! রাজীবের বুকে স্বামী মহেন্দ্রর সমস্ত বাল্য-জীবনটাই যেন মণির মতো সযত্নে সংরক্ষিত আছে! সাধ হয়, ও বুকের ডালা খুলিয়া সে মণি-রত্নের সন্ধান লইতে! একটা অন্তর্গূঢ় বেদনায় সুভাষিণীর দুই চোখ বাষ্পে ভিজিয়া উঠিল!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আমার সঙ্গে অনেক কথা হয় এই রাজীবের। কুমুর বিয়ের সময় কামাখ্যা সাহেবের স্ত্রী জয়া গিয়েছিল তো কলকাতার বাড়ীতে! জয়াকে দেখেই চিনলো! জয়াদি-জয়াদি বলে কি যত্নই করতো···ওর ছেলেমেয়েদের উপর কত মায়া! তাতেই তো রাজীবের মুখে শুনলুম ওর পরিচয়···উমাপ্রসন্ন বাবুর কথা···মহেন্দ্র বাবুর কথা। মহেন্দ্র বাবুর কথা ও প্রায় বলে। বলে, কর্ত্তা রাগ করে মুখে বলতেন ছেঁটে দিয়েছি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক, স্নেহের সব বন্ধন···তবু থেকে থেকে কি অস্থির না হতেন! শেষে মারা যাবার আগে মহেন্দ্র বাবুর কত সন্ধান তিনি করেছিলেন। মহেন্দ্র বাবুকে দেখবার জন্ম হাঁপিয়েই প্রাণটা বেরিয়ে গেছে! মারা যাবার ঠিক আগে জয়া আর জামাই কামাখ্যাকে কাছে আনিয়েছিলেন···উইল লিখিয়ে ছিলেন···তাতে সম্পত্তি ভাগ করে অর্দ্ধেক দিয়ে গেছেন জয়াদের আর বাকী অর্দ্ধেক মহেন্দ্র বাবুকে ···যাকে বলে, একেবারে চুলচেরা ভাগ!···বাড়ী-ঘর, জমি-জায়গা, ব্যাঙ্কের টাকা, কোম্পানির কাগজ···যা-কিছু করেছিলেন, সেই সর্ব্বস্বের অর্দ্ধেক।

সুভাষিণীর পায়ের তলায় পৃথিবী যেন দুলিতে লাগিল! চোখের সামনে দিনের আলো মলিন নিষ্প্রভ হইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল! আর বুকের মধ্যে···

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আমার মুখে তোমাদের কথা শুনে··· হাজার হোক চাকর মানুষ···রক্ত-সম্পর্ক নয়···কেঁদে একেবারে আকুল! খালি বলতো, বাসন্তীতে কবে আপনি যাবেন পিসিমা? আমি সঙ্গে যাবো দাদার ছেলেদের দেখবো! বলতো, বিয়েতে দুই ছেলে কলকাতায় এসেছিল···তা চোখেও দেখলুম না···চিনলুম না তাদের!···সে এলো আমাদের সঙ্গে শুধু তোমাদের দেখতে।··· এসেই জয়ার কাছে গেল। বললে, ওবেলায় এখানে আসবে। আমাকেই নিয়ে আসতে হবে।

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহে

শ্রীল রঘুনাথ দাস পুরীধামে আগমন করিয়া তথায় ষোড়শ বৎসর অবস্থান করেন। এই ষোড়শ বৎসর ধরিয়া তিনি কাশীমিশ্রের ভবনে (যাহা অধুনা শ্রীরাধাকান্ত মঠ নামে পরিচিত) শ্রীল স্বরূপদামোদরের সহিত একসঙ্গে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের এই ষোড়শবর্ষব্যাপী যাবতীয় লীলা দর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলায় শ্রীস্বরূপদামোদরের সহকারিরূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছেন। এইরূপে রঘুনাথ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-লীলা, শ্রীবল্লভভট্টের সহিত প্রভুর পুরীধামে মিলন ও তৎপরে বল্লভভট্টের দাম্ভিকতার জন্য তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর বিরক্তি ও অবশেষে বল্লভভট্টের বিনয়পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনায় তাঁহার প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের করুণা, অতঃপর বল্লভভট্টের শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট হইতে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলন, মহাপ্রভুর সহিত গৌড়ীয় ভক্তগণের মিলন, রথাগ্রে মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের নৃত্য ও সংকীর্ত্তন, ভবানন্দ রায়, রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক ও বাণীনাথ পট্টনায়ক সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার এবং এই বংশের প্রতি মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব কৃপা, রামানন্দ রায়ের অলৌকিক চরিত্র—নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া উত্তরকালীন ভক্তবৃন্দের জন্য তাহা জানিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ও শেষ-জীবনের ভজন-সহচর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই সকল ব্যাপার প্রধানতঃ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে শুনিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলার কয়েক বৎসর তিনি শ্রীকৃষ্ণের তীব্র বিরহে সর্ব্বদা "ভ্রমময় চেষ্টা" করিতেন ও "প্রলাপময় বাক্য" বলিতেন—এবং যাহা শ্রীচৈতন্যদেবের গম্ভীরালীলা * নামে বিখ্যাত হইয়া ভক্তবৃন্দের পরমানন্দ বিধান করিতেছে—তাহা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীই প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁহার মুখে শুনিয়াই মনস্বী পণ্ডিত ভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহা নিজ গ্রন্থে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলা শ্রীল স্বরূপদামোদরও কিছু কিছু করচা (notes) করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ করচা সুবিস্তৃত গ্রন্থ না হইলেও উহাতে সূত্রাকারে ও অন্যান্য ভাবে মহাপ্রভুর লীলার অনেক কথা ছিল। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী যখন ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত এই করচা বর্ত্তমান ছিল; কারণ, ভক্তিরত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গে (৫৪৭ পৃঃ বহরমপুর সংস্করণ) এই করচা হইতে পূর্ব্বে অন্য কোনও গ্রন্থে অনুল্লেখিত শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার পরেই ঐ করচার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—ঐ করচার রঘুনাথ দাস গোস্বামী একটি পঞ্জী বা বৃত্তি রচনা করেন। বলা বাহুল্য, তাহারও এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ মিলে নাই; অতএব তাহাও লোপ পাইয়াছে। কিন্তু অতি সাবধানী ভক্তপ্রবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" ঘটনা হিসাবে তাহার কোনও ঘটনা বাদ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই স্বরূপের ও রঘুনাথের রক্ষিত সকল লীলার কথাই বর্ত্তমানে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাইতে পারি।

অবশেষে ১৪৫৫ শকে নীলাচলের এই চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। অদ্বৈত আচার্য্য গৌড়দেশ হইতে জগদানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা একটি তর্জ্জা মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইলেন। তর্জ্জাটি এই—

> "বাউলকে কহিও—লোকে হইল বাউল।
> বাউলকে কহিও—হাটে না বিকায় চাউল।
> বাউলকে কহিও—কাজে নাহিক আউল।
> বাউলকে কহিও—ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

এই অদ্ভুত তর্জ্জা শুনিয়া স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—"আচার্য্য অতিশয় শক্তিশালী পূজক। তিনি আগমশাস্ত্রের বিধানে পূজাদি করিতে অতিশয় সুদক্ষ। আগমশাস্ত্রানুসারে পূজার জন্য ঘটে বা প্রতিমূর্ত্তিতে দেবতার আবাহন করিয়া পূজাকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে দেবতাকে নিরোধ করিয়া রাখেন, পরে পূজা সমাপ্ত হইলে দেবতাকে বিসর্জ্জন দেন। তবে আচার্য্য এই তর্জ্জার দ্বারা কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না—কারণ, মহাযোগেশ্বর আচার্য্য নানাপ্রকার তর্জ্জা রচনা করিতে পারেন, সাধারণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না।

শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন—কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের ঐকান্তিক প্রার্থনায় শ্রীল মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন, এ কথা সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। আমাদের মনে হয়, প্রভুকে অবতীর্ণ করাইয়া যে কার্য্য সুসিদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়াছে—অতএব ধরাধামে আর প্রভুর প্রকট থাকিবার প্রয়োজন নাই; আচার্য্যের তর্জ্জার মধ্যে বোধ হয় এই প্রকারের ইঙ্গিত বর্ত্তমান ছিল। ইহা বুঝিতে পারিয়াই স্বরূপদামোদর গোস্বামী "বিমন" হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মহাপ্রভু অতি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবেন। এই তর্জ্জা পাইবার পরেই মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের দশা আরও বাড়িয়া গেল। ইহার কিছু দিন পরেই পুরীধাম অন্ধকার করিয়া অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্ররূপী শ্রীচৈতন্যচন্দ্র লীলা সম্বরণ করিলেন।

ইহার কিছু পরেই মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ তদ্গতপ্রাণ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী অপ্রকট হইলেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর ভক্তগণের যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। শ্রীল নন্দনন্দন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যখন অক্রূর কর্ত্তৃক মথুরাপুরে নীত হন, তখন শ্রীবৃন্দাবনধাম যেমন হতশ্রী হইয়া গিয়াছিল—

---

* নীলাচলে মহাপ্রভুর অবস্থান করিবার জন্য মহারাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার গুরু কাশীমিশ্রের ভবন তাঁহাকে অর্পণ করেন। এই স্থানে মহাপ্রভু যে একতলা সঙ্কীর্ণ ঘরে অবস্থান করিতেন, সেই ঘরটি "গম্ভীরা" নামে বিখ্যাত। এই স্থানে অদ্যাপি মহাপ্রভুর গাত্রের ছিন্ন কন্থা ও পায়ের কাষ্ঠ-পাদুকা রক্ষিত হইয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতি উদ্দীপ্ত রাখিয়াছে।

বৃন্দাবনের পুষ্পলতা-পল্লবাদি যেরূপ শুকাইয়া গিয়াছিল—পুরীধামের পরমানন্দ-নিকেতনও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অভাবে সেই রূপ ধারণ করিল। স্বরূপদামোদরাদি ভক্তগণের বিরহে পুরীধাম সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, চক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের যে অবস্থা হইল তাহা বর্ণনাতীত। প্রায় সমকালে মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদরের অন্তর্ধানে রঘুনাথ একেবারে আশ্রয়হীন হইলেন। রঘুনাথের তখন শ্রীবৃন্দাবনের কথা মনে পড়িল। শ্রীচৈতন্যদেব গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়া শ্রীল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের আশ্রয় দান করিয়া গিয়াছেন—এবং গুঞ্জামালা দিয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকা-চরণের আশ্রয় দান করিয়া গিয়াছেন, এই কথা মনে করিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীপুরীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিলেন, "মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদর এই উভয়েই যখন আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন আর আমার অনর্থক জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? আমি শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শীর্ষদেশ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।" এই মনে করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদিগের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীও যে মহাপ্রভুর বিরহ-বেদনায় বিশেষরূপে ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতকে দিয়া মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

"আমিহ আসিতেছি"—কহিও সনাতনে।
আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে।"

—অন্ত্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী এই যে সংবাদ-প্রেরণ-বিবরণ লিখিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই মিথ্যা হইতে পারে না। অথচ দেখা যাইতেছে যে, এই সংবাদ প্রেরণের পর প্রকট দেহে শ্রীচৈতন্যদেব আর শ্রীবৃন্দাবনে যান নাই। অতএব তাঁহার এই সংবাদ প্রেরণের ব্যাপারের মধ্যে যে গভীর রহস্য বিদ্যমান, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমাদের মনে হয়, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপুরুষোত্তমধামের প্রকট লীলা-নাট্যের উপসংহার করিয়া আনন্দময় অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলায় সমাগত হইলেন। আমরা দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্যদেবের পুরুষোত্তমলীলা সম্বরণের সঙ্গেই শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিগণের কার্য্যশক্তি বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল এবং শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীল মদনমোহন দেবকে ও শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবোত্তমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সকলেই শ্রীবৃন্দাবনে বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন আলো করিয়া বসিলেন। অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে স্বয়ং শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বিগ্রহরূপে পুরীধাম হইতে আগমন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সম্পূর্ণ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী অনতিবিলম্বে তাঁহার সুবিখ্যাত নাটকদ্বয় ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থদ্বয় শেষ করিলেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভাগবতের পাঠকরূপে শ্রীশ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলার অলৌকিক ভাবের উন্মেষ সাধন করিতে লাগিলেন। এই সময়েই শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীল স্বরূপদামোদরের বিয়োগে অসীম করুণার মূর্ত্তিমান বিরহ-বিগ্রহ-রূপে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে সমাগত হইলেন।

শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হন নাই। তাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতির আলোকে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমলীলার অবসানে অপ্রাকৃত লীলাবিগ্রহরূপে শ্রীমচ্চৈতন্যদেবকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীও তাঁহাদের এই বিদ্বৎপ্রতীতির অংশী হইলেন এবং তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বিয়োগ-ব্যথায় অভিভূত না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগের প্রতি যে যে কার্য্যের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, নবীন উদ্যমে অসীম উৎসাহে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরূপ-সনাতন যখন তাঁহাদের প্রাণের অভীষ্ট ধন শ্রীমদ্দাস গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে পাইলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার সকল দুঃখ মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রীবৃন্দাবনের পরমানন্দময় সত্তায় ডুবাইয়া ফেলিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব যে তাঁহার নিত্য স্বরূপের সপরিকরে শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান, ইহা তিনি অনুভব করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে ভৃগুপতনের দ্বারা প্রাণনাশের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে তিনি বৈরাগ্যের ও ভজনের আদর্শ শ্রীমদ্দাসগোস্বামিরূপে শ্রীবৃন্দাবনের ভজনশীল বৈষ্ণবগণের, বিশেষতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরগণের এক স্থায়ী সম্পদ্‌রূপে পরিণত হইলেন।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবসমাজে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই। স্মার্ত্ত-সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে বহুমান করিয়া সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মতে—

"যদি যোগী সমর্থশ্চেৎ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ।
তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ।"

যদি যোগসিদ্ধ পুরুষ যোগবলে বিনা-যানে সমুদ্র-লঙ্ঘনেও সমর্থ হন, তথাপি তিনি যেন মনের দ্বারাও কখন লৌকিক সামাজিক বিধিকে লঙ্ঘন না করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সমাজে যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতার সঞ্চার না হয়, সেই জন্য নিজে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া সেই আশ্রমের বিধানগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ন্যায় মহাপুরুষও আপনাকে ম্লেচ্ছ সংসর্গে পতিত বলিয়া মনে করিয়া শ্রীল জগন্নাথের সেবকগণের সহিত সংস্পর্শ হইলে অপরাধী হইবেন, মনে করিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সমুদ্রের তপ্ত বালুকাময় পথে যমেশ্বর টোটায় অবস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত দেখা করিতে আসেন এবং পথে আসিতে উত্তপ্ত বালুকার স্পর্শে তাঁহার পায়ে ফোস্কা হয়; কিন্তু সনাতনের এই ব্যবহারে শ্রীচৈতন্যদেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"যদ্যপি তুমি হও জগত-পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ।
তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয়—সাধুর ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই লোক নাশ।
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না কৈলে আর করিব কোন্ জন?"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৪র্থ পরিচ্ছেদ

কায়স্থকুলগৌরব রঘুনাথ দাস পরমভাগবত এবং শ্রীরূপ-সনাতনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ হইলেও তিনি চির দিন শাস্ত্রবিধি ও সমাজবিধি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। বিনয়ের অবতার রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনে "দাসগোস্বামী" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও তিনি আচার্য্যের অধিকার-গ্রহণে কোন দিনও উৎসুক ছিলেন না। শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবার পরই শ্রীরূপ তাঁহার হস্তে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীকে সমর্পণ করেন। এই মহাপণ্ডিত পরমভাগবত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীল দাসগোস্বামীকে গুরুজ্ঞানে সেবা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, শ্রীল কৃষ্ণদাসের সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জন রাধা-কুণ্ডে তাঁহার দিন পরমানন্দে ভজন-সুখে অতিবাহিত হইত। কর্ম্মী ভক্ত কৃষ্ণদাস শ্রীল রঘুনাথের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠেই বলিয়া গিয়াছেন—

"তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।"—আদি, ১০ম পরিচ্ছেদ
"চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে।"—মধ্য, ২য় পরিচ্ছেদ

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্যদেবের অসীম কৃপাপারাবারে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার পরমগুরু শ্রীস্বরূপদামোদরের কর্ম্মী শিষ্যরূপে অবস্থান করিয়া সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসরকাল রঘুনাথ ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের যে যে লীলা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া ভক্তগণের নিকট রঘুনাথ তাহা প্রকাশ করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীপুরীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীল মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজনরীতির সহিত শ্রীমহাপ্রভু ও তৎপরিকর-গণের আচরণ মিলাইয়া শুদ্ধা ভজনরীতির আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন আবার তাঁহারা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দের ভজনাদর্শ শ্রবণ করিয়া আরও দৃঢ় ভাবে সেই আদর্শ প্রচারের যোগ্যতা লাভ করিলেন। শ্রীল রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া কয়েক মাস ধরিয়া শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত-কথা শুনাইয়া সঞ্জীবিত করিলেন। তিনি ঐ সময় হইতে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিদিন এক প্রহর কাল ধরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব চরিত-কথা ভক্তগণকে পরিবেষণ করিতেন। বৃন্দাবনের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গের ত্রিলোকপাবনী জীবনকথায় অভিষিক্তিত হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। অপর দিকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের চিরপোষিত মনোরম লতাকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমভক্তিরসামৃতে অভিষিক্ত করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী তাঁহাকে যে রসময় ভজনপদ্ধতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামীও সেই শুদ্ধা রসগর্ভা ভজন-মাধুর্য্য সম্পদের অধিকারী। এই জন্য তিনি শ্রীরূপের সঙ্গলাভে শ্রীল স্বরূপদামোদরেরই সঙ্গ যেন পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীল দাস গোস্বামী তাঁহার স্তবাবলী গ্রন্থাদিতে শ্রীরূপের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ভজনবর্ত্মোদ্দেশী গুরুর ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ, তিনি শ্রীরূপে ও স্বরূপে অভিন্নতা দর্শন করিয়াই যেন কৃতকৃতার্থ হইলেন। এই জন্যই আমরা তাঁহার "দানকেলি-চিন্তামণি"র প্রারম্ভেই দেখিতে পাই—

"উদ্দামনর্ম্মরসরঙ্গতরঙ্গকান্ত-
রাধাসরিদ্‌গিরিধরার্ণবসঙ্গমোত্থম্।
শ্রীরূপ-চারুচরণাব্জ-রজঃপ্রভাবা-
দন্ধোঽপি দাননবকেলিমণিং চিনোমি।"

অনুবাদ—উদ্দাম পরিহাস-রঙ্গরূপ তরঙ্গে পরিপূর্ণা পরমরমণীয়া শ্রীরাধিকারূপা নদীর সহিত শ্রীগিরিধারিরূপ সাগরের মিলনে যে দাননবকেলিমণির উদ্ভব হইয়াছে, আমি অন্ধ হইলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর সুচারু চরণপদ্মের রজের প্রভাবে তাহা চয়ন করিতেছি।

বস্তুতঃ, রসতত্ত্বভূপতি শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-প্রমুখ গ্রন্থাবলীই শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীরূপের ললিতমাধব নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অধ্যয়ন করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর যে তীব্র বিরহানলে শ্রীব্রজদেবীগণ ও শ্রীবৃন্দাবন দগ্ধ হইয়াছিল, তাহার তাপে তিনিও অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী "দানকেলিকৌমুদী" নামে এই একাঙ্কের নাটকখানি রচনা করেন। এই দানকেলিকৌমুদীর লীলা-মাধুর্য্য অনুভবের ফলেই তাঁহার "কেলিচিন্তামণি"র আবির্ভাব। এই জন্যই তিনি দানকেলিচিন্তামণির প্রারম্ভেই ঐ ভাবে শ্রীরূপের ঋণ স্বীকার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, পরন্তু এই "দানকেলিচিন্তামণি"র শেষেও বলিতেছেন—

"রাধামাধবয়োর্দানকেলিচিন্তামণিং গিরৌ।
লব্ধমন্ধেন বীক্ষন্তাং শ্রীমদ্রূপগণাঃ প্রিয়াঃ।
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-রজোঽহং স্যাং ভবে ভবে।"*

অনুবাদ—"এই অন্ধ ব্যক্তি শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের যে "দানকেলিচিন্তামণি" লাভ করিয়াছে, শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর প্রিয় পরিকরগণ তাহা বিশেষ ভাবে বিচারপূর্ব্বক আস্বাদন করুন।

"দশনে তৃণধারণ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মের রজোরূপে পরিণত হইতে পারি।"

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

---

* এই চিন্তামণিস্বরূপ দানকেলিচিন্তামণি শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজীর কৃপায় লোকলোচনের গোচর হইয়াছে। (এই শ্রীল বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, নামে কুমিল্লা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।)

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

জার্ম্মাণীর প্রত্যাশিত অভিযান ঃ—

প্রায় সাড়ে তিন মাস প্রতীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের পর জার্ম্মাণী রুশ-রণাঙ্গনে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসর যে সময় তাহার অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল, এই বৎসর তাহার দেড় মাস পর সে আক্রমণ আরম্ভ করিল। রুশ-রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক-যুদ্ধ-পরিচালনের মাত্র পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে দেড় মাস সময় জার্ম্মাণী নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করে নাই। গত শীতকালে ষ্ট্যালিনগ্রাড্ ও অন্যান্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ সমরনায়কদিগের তিক্ত অভিজ্ঞতা, টিউ-নিসিয়া যুদ্ধের দ্রুত অবসান এবং তাহার ফলে য়ুরোপখণ্ডের প্রত্যক্ষ বিপদ্ বৃদ্ধি—এই সকল কারণে জার্ম্মাণীকে বিবেচনা করিয়া এবং বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইয়া আক্রমণাত্মক যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে হইয়াছে।

পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর অভিযানে বিলম্ব দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছিলেন—জার্ম্মাণী বোধ হয় আর আক্রমণাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হইবে না, সে এখন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-নীতি গ্রহণ করিবে। ইতিমধ্যে জনরবও রটিয়াছিল যে, জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে সৈন্য অপসারণ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণীর পূর্ব্ব-য়ুরোপে আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রতিরোধ-নীতির যথাযথ অনুসরণের জন্যও এই অঞ্চলে তাহার আক্রমণ প্রয়োজন। অক্ষশক্তির অধিকৃত য়ুরোপখণ্ড এখন একরূপ পরিবেষ্টিত; দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি এবং পূর্ব্ব দিকে সোভিয়েট-রুশিয়া যদি নিরুদ্বেগে শক্তি সঞ্চয়ের আরও সুযোগ পায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহাদিগের দ্বিমুখী আক্রমণের প্রতিরোধ জার্ম্মাণীর পক্ষে অসাধ্য হইবে। বর্ত্তমানে সম্মিলিত পক্ষের প্রসারিত বিশাল "সাঁড়াশীর" অন্ততঃ একটি বাহু চূর্ণ করিতে পারিলে, জার্ম্মাণী অন্য দিকে অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করিতে পারে; সেই অবস্থায় যুদ্ধকে বহুকাল স্থায়ী করিয়া সম্মিলিত পক্ষে সন্ধির আগ্রহ সৃষ্টির আশা করা তাহার পক্ষে অসঙ্গত নহে। অক্ষশক্তি এখন আর প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবার আশা করিতে পারে না; বহুকাল যুদ্ধ পরিচালন করিয়া রণক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি এবং তাহার ফলে সম্মিলিত পক্ষে সন্ধির আগ্রহ সঞ্চারের চেষ্টাই তাহার একমাত্র পথ।

পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে জার্ম্মাণীর সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত প্রচার-কার্য্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এক শ্রেণীর ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিক য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির বিরোধী। তাঁহারা টিউনিসিয়া যুদ্ধের সময় হইতেই প্রচার করিতেছেন যে, জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে—রুশিয়ার প্রতি নাৎসী সেনার চাপ হ্রাস পাইয়াছে; সুতরাং য়ুরোপে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযানের আর প্রয়োজন নাই। সোভিয়েট রুশিয়া এই অন্যায় প্রচারকার্য্যের বিরুদ্ধে একাধিকবার প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছে যে, পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে সৈন্য অপসারণ করা দূরে থাকুক, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির য়ুরোপ অভিযান আসন্ন হওয়া সত্ত্বেও জার্ম্মাণী য়ুরোপের অন্যান্য অঞ্চল হইতে পূর্ব্ব-য়ুরোপে সৈন্য ও সমরোপকরণ স্থানান্তরিত করিয়াছে।

গত ৫ই জুলাই প্রাতে সেনাপতি ফন্ ক্লুজের নেতৃত্বে জার্ম্মাণীর ১৫ ডিভিসন্ উৎকৃষ্ট যান্ত্রিক (পাৎসার) বাহিনী, ১ ডিভিসন মোটরচারী সেনা এবং ১৪ ডিভিসন্ পদাতিক সৈন্য ওরেল হইতে বিয়েলগোরোড পর্য্যন্ত প্রসারিত ১৮০ মাইল রণাঙ্গনে প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। সপ্তাহ কালের যুদ্ধে ওরেল্ হইতে কুরস্ক পর্য্যন্ত ১ শত মাইল স্থানে সোভিয়েট সেনার প্রতিরোধ একরূপ অলঙ্ঘ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিয়েলগোরোড অঞ্চলে জার্ম্মাণ সেনা সোভিয়েট-ব্যূহ সামান্য ভেদ করিয়াছিল। ফন ক্লুজ এই স্থানে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সোভিয়েট-ব্যূহে প্রবিষ্ট "বর্শাফলক" বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিয়েলগোরোডের অতি সন্নিকটে জার্ম্মাণীর বিশাল আক্রমণ-ঘাঁটী খারকভ অবস্থিত; কাজেই, এখানে আক্রমণের বেগ প্রয়োজনানুযায়ী বৃদ্ধি করা ফন্ ক্লুজের পক্ষে সহজসাধ্য।

জার্ম্মাণীর আশু সামরিক লক্ষ্য এখনও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তবে, তাহার আক্রমণ-ক্ষেত্রের সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া মনে হয়, সোভিয়েটের প্রধান সরবরাহ-সূত্রগুলিই তাহার আশু লক্ষ্য। প্রতিপক্ষকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করিয়া পরে এক একটি অংশকে পৃথক ভাবে আক্রমণ করাই নাৎসী রণনীতি। এই নীতি প্রয়োগের পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান আক্রমণ-ক্ষেত্র হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া নাৎসী সেনা যদি ডন্ নদী অতিক্রম করিয়া মিচুরিনস্ক পর্য্যন্ত পৌঁছিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের পারস্পরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। তখন বিচ্ছিন্ন-সংযোগ দুইটি অংশকে সে পৃথক্ ভাবে আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইবে। ওরেল্-বিয়েলগোরোড অঞ্চল হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইবার পর নাৎসী সমর-নায়কগণ উত্তরে মস্কো পরিবেষ্টনের এবং দক্ষিণে ককেসাস্ অভিযানের প্রয়াস করিবেন। একই সময়ে দুই দিকে এই অভিযান চলিতে পারে; অথবা একটি অঞ্চলে অভিযান কিছু দূর প্রসারিত হইবার পরে তখন অন্য দিকে তাঁহাদের মনোযোগ পতিত হওয়াও সম্ভব।

সম্প্রতি জনরব প্রচারিত হইয়াছে যে, রুশিয়াকে স্বতন্ত্র ভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অভিযান। এই জনরবে গুরুত্ব আরোপ করিয়া জার্ম্মাণ রাজনীতিকদিগের

কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তায় সন্দেহ প্রকাশ করা অন্যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কগণ কোন্ ধাতুতে গঠিত, তাহার পরিচয় এত দিনে হিট্‌লার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ পাইয়াছেন। ষ্ট্যালিন্-ক্যালিনিন্-মলোটভ্‌কে যে পেতাঁ-লাভালের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধিও তাঁহাদের আছে।

বলা বাহুল্য, সোভিয়েট সমর-নায়কগণ কেবল ওয়েল-বিয়েল্-গোরোড্ অঞ্চলে প্রতিরোধরত থাকিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিবেন না। গ্রীষ্মকালে তাঁহারা ব্যাপক প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হন না বটে; তবে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার প্রয়োজনেই তাঁহাদিগকে স্থানে স্থানে আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মধ্য রণাঙ্গনে ল্যাটাভিয়া সীমান্তের ৬০ মাইল পূর্ব্ব দিকে ভেলিকাইলুকিতে রুশ সেনা পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ফন্ ক্লুজের বর্ত্তমান আক্রমণ-ক্ষেত্রে নাৎসী সেনার বেগ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে মধ্য রণাঙ্গনে এই ভেলিকাই-লুকিতে রুশ সেনার আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে। দক্ষিণ অঞ্চলে আজভ সাগরের তীরেও রুশ সেনার তৎপরতা আরম্ভ হওয়া সম্ভব।

অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার পর হইতে জার্ম্মাণী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। এই সংবাদ অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যেমন নির্ব্বুদ্ধিতা, তেমনই ইহাতে অত্যুৎসাহী হওয়াও অন্যায়। ক্ষতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সমগ্র শক্তির প্রয়োগে একটি ক্ষেত্রে শত্রুর ব্যূহভেদে প্রয়াসী হওয়াই জার্ম্মাণ রণকৌশলের অঙ্গ। কাজেই, প্রায় দুই শত মাইল রণাঙ্গনে সপ্তাহকালের যুদ্ধে আড়াই হাজার ট্যাঙ্ক ও এক হাজার বিমান ধ্বংস হওয়া অসম্ভব নহে। এই ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্ম্মাণী যদি সোভিয়েটের প্রতিরোধ-প্রাচীরে ফাটল ধরাইতে পারে, তাহা হইলে তখন সেই লাভের তুলনায় বর্ত্তমান ক্ষতি নগণ্য প্রতিপন্ন হইবে। আর এই ক্ষতি স্বীকার সত্ত্বেও সোভিয়েটের প্রতিরোধ যদি হিমালয়ের ন্যায় অটল থাকে, তাহা হইলে নাৎসী বাহিনীর ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি-ক্ষয়ের ফলে সোভিয়েট বাহিনীর পরবর্ত্তী আক্রমণে তাহারা সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার সিসিলি আক্রমণ—

রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অভিযানের আশু ফল যাহাই হউক না কেন, ইহার প্রকৃত সাফল্য বা বিফলতা ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির য়ুরোপ অভিযানের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতার উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। কাজেই, ঠিক এই সময়ে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার সিসিলিতে অবতরণ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ১০ই জুলাই ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা ইটালীর পাদভূমি—ভূমধ্য সাগরের বিশালতম দ্বীপ সিসিলিতে অবতরণ করিয়াছে; দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল তাহাদিগের প্রথম অবতরণ-ক্ষেত্র। ইতোমধ্যে সীরাকিউস্ হইতে লিকাটা পর্য্যন্ত প্রসারিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের সমস্ত বন্দর ও বিমানঘাঁটী তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

সিসিলির দক্ষিণে প্যান্টেলেরিয়াকে সিসিলির পাদভূমি বলা যাইতে পারে; আর সিসিলি ইটালীতে পৌছিবার শেষ সোপান। প্যান্টেলেরিয়া অধিকারের পর সম্মিলিত পক্ষের বিমান বাহিনী সিসিলির পেলারমো, মার্সালা, ক্যাটানিয়া প্রভৃতি পোতাশ্রয়ে এবং বিভিন্ন বিমানক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছিল। সিসিলি ও প্রণালীতে খেয়ার সাহায্যে রেলগাড়ী পারাপারের ব্যবস্থা আছে। সম্মিলিত পক্ষের বিমান এই প্রণালীর দুই পার্শ্বের মেসিনা ও রেগিও-ডি-ক্যালাব্রিয়া এক প্রকার ধূলিসাৎ করিয়াছে। নিয়মিত বিমান আক্রমণের ফলে সিসিলির প্রতিরোধ-কেন্দ্রগুলি যে ভাবে চূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে অবতীর্ণ সেনাবাহিনীর কর্ত্তব্য সহজেই সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অবশ্য, অক্ষশক্তি সহজে প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা ত্যাগ করিবে না; প্রত্যেক পদে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটাইয়া রুশ রণাঙ্গনের সহযোদ্ধৃগণকে অগ্রসর হইতে সময় ও সুযোগ দেওয়াই এখন অক্ষশক্তির রণনীতি। এই জন্যই সিসিলির প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে তথায় শেষ মুহূর্ত্তেও জার্ম্মাণ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। তবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যকে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য করিবার শক্তি অক্ষশক্তির নাই; তাহারা সেরূপ আয়োজনও করে নাই, তাহাদের পরিকল্পনাও সেরূপ নহে। ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীকে যথাসম্ভব অধিক কাল আটক রাখিয়া পূর্ব্ব-য়ুরোপে আক্রমণের বেগ বর্দ্ধিত করাই অক্ষশক্তির বর্ত্তমান নীতি।

সিসিলি অভিযান ইটালীতে প্রত্যক্ষ আক্রমণেরই সূচনা। সিসিলিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষ তথাকার বিমান-ক্ষেত্রগুলির দ্রুত সংস্কার করিবেন এবং তথা হইতে ইটালীতে তাঁহাদের প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ চলিবে। বিমান আক্রমণের দ্বারা ইটালীর প্রতিরোধক্ষেত্রগুলি বিধ্বস্ত করিবার পর তখন স্থলপথে আক্রমণ প্রসারিত করিবার প্রয়াস হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইটালী ও তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলিতে সম্মিলিতপক্ষের সেনাবাহিনীর অবতরণ-সম্ভাবনার কথা বুঝিয়াই জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপে অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের অবতরণে এবং ইটালীর কতকাংশ তাহাদের দ্বারা মথিত হইলেও জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপে আক্রমণের বেগ হ্রাস করিবে না। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি নাৎসী বাহিনীর চাপ হ্রাস করাইতে হইলে দক্ষিণ-য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে এবং পশ্চিম ও উত্তর-য়ুরোপে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। কেবল ইটালীতে কিছু সৈন্য প্রবেশ করাইলে সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সমর্থকদিগকে সাময়িক ভাবে সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু উহাতে সামরিক উদ্দেশ্য বিশেষ সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহারা বিভিন্ন দিকে আক্রমণ প্রসারিত করিবেন; ফ্রান্সও তাঁহাদের অন্যতম ক্ষেত্রস্থল। এই সম্পর্কে আর একটি সুলক্ষণ—সিসিলি অভিযানে ফরাসী সৈন্য যোগ দেয় নাই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বিপন্ন ফ্রান্সকে ইটালী পশ্চাদ্দিক হইতে ছুরিকাঘাত করিয়াছিল। সেই ইটালীর বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিবার জন্য ফরাসী সেনার আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তাহারা এই প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ লয় নাই। সঙ্গত ভাবেই মনে করা যাইতে পারে, ফরাসী সেনাবাহিনী তাহাদের মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

সুদূর প্রাচী—

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে নিউ গিনিতে ও সলোমনসে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণাত্মক তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। নিউ গিনিতে নেসো উপসাগরে সম্মিলিত পক্ষের সেনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; উত্তর উপকূলে জাপানের বিশাল ঘাঁটী স্যালামুয়া এখন একরূপ পরিবেষ্টিত। এই অঞ্চলে স্যালামুয়া ও লে অধিকারই সম্মিলিত পক্ষের আশু লক্ষ্য। সলোমনসে নিউ জর্জ্জিয়ায় মার্কিণী সেনা সাফল্যজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে। তথায় মুণ্ডা জাপানের একটি প্রধান ঘাঁটী, মুণ্ডা এখন প্রায় পরিবেষ্টিত, হয় ত তাহার পতনও আসন্ন। মুণ্ডা অধিকারে সমর্থ হইলে সম্মিলিত-পক্ষ এখন উত্তর দিকে বুগাঁভিলের উদ্দেশ্যে আক্রমণ প্রসারিত করিবেন। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে নিউ বৃটেনের রবাউল জাপানের বিশালতম নৌ ও বিমান ঘাঁটী। এখান হইতেই তাহার প্রধান প্রধান আক্রমণ চালিত হইয়া থাকে। জেনারল ম্যাক্-আর্থারের শেষ লক্ষ্য এই রবাউল।

সম্মিলিত পক্ষের এই আক্রমণাত্মক-তৎপরতা প্রধানতঃ প্রতিরোধমূলক উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপ হইতে ধীরে ধীরে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ও ফিলিপাইনের উদ্ধার এবং জাপানে আক্রমণের প্রসার কার্য্যকরী পরিকল্পনা নহে। তবে, অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপান বিতাড়িত হইলে অষ্ট্রেলিয়ার সমূহ বিপদ দূরীভূত হইবে। আর এই অঞ্চলে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীতে জাপান এখন প্রতিষ্ঠিত, উহা ব্যবহারের সুবিধা পাইলে সম্মিলিত-পক্ষ জাপানের নৌ ও বিমান-শক্তিতে প্রবল আঘাত হানিতে পারিবেন।

সম্প্রতি জনরব রটিয়াছিল যে, জাপান মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে সৈন্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছে; রুশিয়ার বিরুদ্ধে তাহার আক্রমণ আসন্ন। এই জনরবে অধিক গুরুত্ব আরোপের সঙ্গত কারণ নাই। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত-পক্ষের উদ্যত খড়্গ উপেক্ষা করিয়া রুশিয়ার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করিতে যাওয়া এখন জাপানের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। অবশ্য, সম্প্রতি ইরাণ হইতে রুশিয়ার মধ্য দিয়া চীনে সাহায্য পৌঁছিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার জন্য জাপান হয় ত উৎকণ্ঠিত। তবে, এই সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সে রুশিয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবে না। বিমান-আক্রমণের প্রাবল্য বৃদ্ধি করিয়াই হউক, আর স্থলপথে সৈন্য পরিচালনা করিয়াই হউক, সে চীনের মধ্যেই ঐ পথ বিচ্ছিন্ন করিতে

জাপান অত্যন্ত কৌশলে তাহার প্রকৃত অভিসন্ধি গোপন রাখিতেছে। সে যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন করে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। চীনে তাহার কূটনৈতিক কৌশল সফল হইবে বলিয়াই জাপান আশা করে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি—জাপান নান্‌কিং সরকারের সাহায্যে অবরুদ্ধ চুংকিংএর সমর্থকদিগকে প্রভাবান্বিত করিতে প্রয়াসী। সম্প্রতি মাদাম চিয়াং-কাই-সেক্ অটোয়ায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। মাদাম্ চিয়াং বলিয়াছেন—অবরুদ্ধ চীন আজ ৬ বৎসর চরম দুঃখ সহিয়াছে; আর তাহারই পার্শ্বে নান্‌কিং জাপানের সাহায্যে ক্রমেই পুষ্ট হইতেছে। আর জাপান অবিরাম প্রচারকার্য্য চালাইতেছে যে, সে চীনাদিগের মিত্র—চীনাদিগের উৎপীড়কগণকেই সে কেবল শাস্তি দিতে চাহে; যে জাপান প্রথমে চীনাদিগের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল, সে-ই এখন চীনাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেছে। উদারণ স্বরূপ মাদাম্ চিয়াং বলেন—হংকংএ ধৃত ইংরেজদিগের প্রতি জাপানীরা দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল বটে; কিন্তু চীনাদিগের প্রতি তাহারা সদ্ব্যবহার করে। মাদাম্ বলেন—জাপানীদের এই প্রচার-কৌশল অত্যন্ত ভয়াবহ।

সম্মিলিত পক্ষ আশা করেন—য়ুরোপে যুদ্ধের অবস্থা যখন তাঁহাদের অনুকূল হইতেছে, তখন ভারত মহাসাগরে নৌবহর স্থানান্তরিত করিয়া সত্বর ব্রহ্ম-অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। ব্রহ্মদেশ মুক্ত হইলে চীনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া জাপানকে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করা যাইবে। সম্মিলিত-পক্ষের এই পরিকল্পনা অনুসারে তৎপরতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই জাপান চুংকিংকে সমর্থকশূন্য নিঃসঙ্গ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছে।

এই সময়ে—বর্ষা অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম-অভিযানের ঘাঁটী পূর্ব্ব-ভারতে জাপানের আঘাত পতিত হইবার সম্ভাবনাও উপেক্ষা করা যায় না। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযান পরিচালনের জন্য নৌশক্তির বিশেষ প্রয়োজন। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রয়োজন মিটাইয়া জাপান বর্ত্তমানে ভারতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনানুরূপ নৌবাহিনী প্রয়োগ করিতে পারিবে কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, ইহা সত্য—জাপান যদি আপাততঃ ভারতের উদ্দেশ্যে সৈন্য পরিচালনে অসমর্থও হয়, তাহা হইলেও সম্মিলিত-পক্ষের পরিকল্পিত ব্রহ্ম-অভিযান ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে সে পূর্ব্ব-ভারতে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইবে। গত শীতকালে জাপানের বিমান-আক্রমণের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহার দ্বারা জাপানের আক্রমণ শক্তির পরিমাপ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। সম্প্রতি জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারল টোজোর সিঙ্গাপুর এবং প্রাচ্য অঞ্চলের অন্যান্য রণক্ষেত্র পরিদর্শন হয় ত অর্থশূন্য নহে। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালিত করিতে হইলে সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুণ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জই সে অভিযানের প্রধান ঘাঁটী হইবে। আসাম বা বাঙ্গালার পূর্ব্ব-সীমান্ত দিয়া কেবল স্থলপথে ভারতের বিরুদ্ধে

সাময়িক প্রসঙ্গ

লাট পরিবর্ত্তন

লর্ড লিন্‌লিথগোর কার্য্যকাল—৫ বৎসর—অতীত হইয়া গিয়াছে; তাহার পরেও তাঁহাকেই ভারতবর্ষের বড়লাট পদে রাখা হইয়াছে। যুদ্ধ যে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, তাহা বলা বাহুল্য। তবে লর্ড লিন্‌লিথগোর কার্য্যকাল যে ভারতবাসীর দিক্‌ হইতে বিবেচনা করিলে সাফল্যমণ্ডিত তাহা বলা যায় না। তিনি বড়লাট হইয়া আসিবার পূর্ব্বে ভারতীয় কৃষি কমিশনে সভাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন। আমরা সেই জন্য আশা করিয়াছিলাম, তিনি বড়লাট হইয়া আসিয়া সেই কমিশনের নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করিবেন এবং তাহাতে এই কৃষিপ্রাণ দেশের লোকের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু আমাদিগের সে আশাও পূর্ণ হয় নাই। বড়লাট হইয়া আসিয়া তিনি এ দেশে গোজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হইয়াছে, বলা যায় না। তিনি স্বয়ং রক্ষণশীল দলের রাজনীতিক। সেই জন্য তিনি ভারতবাসীর রাজনীতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন করিতে পারেন নাই। বিশেষ যুদ্ধ ও তাহার পর কংগ্রেসী আন্দোলন যেন তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছে।

এত দিনে তিনি বিদায় লইতেছেন। তাঁহার স্থানে কে নিযুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া কয় মাস কাল বিশেষ আলোচনা ও অনুমান চলিয়াছিল। ৪ঠা আষাঢ় সব সন্দেহের অবসান হইয়াছে। ঐ দিন বিলাতী সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতের জঙ্গীলাট সার আর্চিবল্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হইয়া আগামী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড লিন্‌লিথগোর স্থানে কার্য্য করিবেন। আর সার আর্চিবল্ডের স্থানে সার ক্লড অচিনলেক ভারতের জঙ্গীলাট হইলেন।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। স্থির হইয়াছে, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার দায়িত্ব হইতে জঙ্গীলাটকে অব্যাহতি দিয়া ঐ কার্য্যের জন্য "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমাণ্ড" নামক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে। অর্থাৎ নূতন দপ্তর ও নূতন পদ সৃষ্ট হইবে। আমাদিগের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি, এ দেশে নূতন পদ সৃষ্ট হইলে তাহা আর রহিত হয় না। সুতরাং এ বার যে নূতন পদ সৃষ্ট হইতেছে—জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলেও তাহা যাইবে কি না—অর্থাৎ তাহা আরব্য উপন্যাসের সাগরিক বৃদ্ধের মত ভারতের স্কন্ধে চাপিয়া থাকিবে কি না, তাহা বলা যায় না। তবে পদের সৃষ্টি বা বিলোপ কিছুই ভারতবাসীর মতসাপেক্ষ নহে। বিশেষ বর্ত্তমানে তাহার আলোচনা করিয়া কোন ফল নাই; ভবিষ্যতেও থাকিবে কি না, বলা যায় না।

সার আর্চিবল্ড ভাইকাউণ্ট হইয়া বিলাতের অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত লর্ড ওয়াভেল হইয়াছেন।

এই নিয়োগের বৈশিষ্ট্য—এত দিন রাজনীতিকদিগকেই ভারতের বড়লাট করা হইত; এমন কি লর্ড কিচেনারের বড়লাট হইবার বাসনা থাকিলেও তৎকালীন ভারত-সচিব তাহাতে সম্মত হন নাই। এ বার জঙ্গীলাটকে বড়লাট করা হইল। নূতন পদের কার্য্যে তিনি যে অনভিজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্য কয় মাস কাল তিনি ইণ্ডিয়া আফিসে পাঠ লইবেন। তিনি ইতোমধ্যেই তাহা আরম্ভ করিয়াছেন।

যদিও বলা হইয়াছে, এই নিয়োগ সাময়িক ব্যবস্থা নহে; তথাপি এ কথা বলা অসঙ্গত হইতে পারে না যে, পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা যদি ভারতবর্ষও স্পর্শ না করিত—জাপানের সহিত যুদ্ধে ভারতবর্ষ যদি কেবল বৃটেনের নহে, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রধান ঘাঁটী না হইত—চীনকে সাহায্যদান যদি ভারতবর্ষ হইতেই করিতে না হইত—ব্রহ্ম পুনরধিকার-চেষ্টা যদি ভারতবর্ষ ব্যতীত হইতে পারিত—তবে জঙ্গীলাটকে বড়লাট নিযুক্ত করা হইত কি না—সন্দেহ।

লর্ড ওয়াভেলের রাজনীতিক মতের পরিচয়দানের অবসর এত দিন ঘটে নাই। তবে আমরা জানি, সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যখন বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতীয় নেতৃগণকে দেশরক্ষা ব্যাপারে জঙ্গীলাটের সহিত আলোচনা করিতে বলা হইয়াছিল এবং তাহাতে ভারতীয় নেতৃগণ এই বিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিলেন যে, সার আর্চিবল্ড ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন—দেশরক্ষার অধিকার দিতে আগ্রহশীল নহেন। সুতরাং মনে করা অসঙ্গত নহে যে, বিলাতের বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী ও বর্ত্তমান ভারত-সচিব যে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, তাঁহারা সেই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক বুঝিয়াই লর্ড ওয়াভেলকে লর্ড লিন্‌লিথগোর পরে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিলেন। ইংরেজ কবি মিল্টন যেমন তাঁহার কাব্যরচনার আরম্ভে তাঁহার যাহা অন্ধকার আছে তাহা আলোকিত করিবার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছিলেন—তেমনই লর্ড ওয়াভেলের যেটুকু অজ্ঞতা আছে, তাহা তিনি ইণ্ডিয়া আফিসে শিক্ষায় দূর করিতে পারিবেন।

—

প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের কৈফিয়ৎ

২০শে আষাঢ় কয় মাস পরে নূতন সচিবসঙ্ঘের কার্য্যকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়া ২১শে আষাঢ় শেষ হইয়াছে। প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের অবসানের কথা পাঠকগণ অবগত আছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর খাদ্য-সমস্যার গুরুত্ব দেখাইয়া ব্যবস্থা পরিষদের আস্থাভাজন সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইয়া মসলেম লীগ-প্রভাবিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করাইয়া ৩ সপ্তাহের কিছু অধিক কাল শাসনকার্য্যের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন সচিবসঙ্ঘ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে বিরত থাকায়—

(১) পরিষদের পক্ষে বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের সম্বন্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা সম্ভব হয় নাই

(২) সচিবসঙ্ঘকে অননুমোদিত ব্যয় করিতে দেওয়া হইয়াছে

(৩) প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের পক্ষে পদত্যাগের জন্য কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ ঘটে নাই।

এ বার অধিবেশনের আরম্ভে প্রাক্তন প্রধান-সচিব প্রভৃতি তাঁহাদিগের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে চাহিলে নিয়মের কথা তুলিয়া বর্ত্তমান প্রধান-সচিব তাহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু পার্লামেণ্টে প্রচলিত প্রথা—পদত্যাগী প্রধান-মন্ত্রী বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন। সেই নজিরে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি মিষ্টার ফজলুল হক ও তাঁহার

সহ-সচিবদিগের বিবৃতিদানের অধিকার স্বীকার করিলে প্রথমে মিষ্টার হক ও তাহার পর শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃতি প্রদান করেন। মিষ্টার হকের বিবৃতি দীর্ঘ। সে বিবৃতি বাঙ্গালার গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-তালিকা—জনগণের নিকট অভিযোগের আর্জ্জি বলিলে অসঙ্গত হয় না। তিনি বলিয়াছেন, তিনি সার জন হার্বার্টের সম্বন্ধে গুরু অভিযোগসমূহ উপস্থাপিত করিলেন; সার জনের পক্ষে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বা পরিষদে তাঁহার বক্তব্য ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দেশে জনমতের মর্য্যাদা বিদেশী শাসকগণ স্বীকার করেন না, সে দেশে যে গভর্ণর তাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন, এমনও মনে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

তবে যতক্ষণ সার জন ঐ সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন না করিবেন, ততক্ষণ লোক মনে করিবে—এ দেশে যে শাসন-পদ্ধতিকে বৃটিশ সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বলিয়া পরিচিত করেন, তাহা গণতন্ত্রানুমোদিত নহে—স্বায়ত্ত-শাসন হিসাবে তাহা "ধাপ্পা" বলা যাইতে পারে। কারণ, মিষ্টার হকের অভিযোগ—যদিও বলা হইয়াছিল, যে সকল বিভাগের ভার সচিবদিগের, গভর্ণর সে সকলে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তথাপি সার জন পদে পদে সেরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাহাতে বাঙ্গালা সরকারের আর্থিক ক্ষতিও হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন স্বৈর-শাসন ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। প্রথমে—স্বতন্ত্র ভাবে পদত্যাগ করিয়া ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই কথাই বলা হইয়াছিল। কিন্তু মিষ্টার ফজলুল হক যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি ভিত্তিহীন না হয়, তবে শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতির পরেও সার জনের ব্যবহার ও মনোভাব সংশোধিত হয় নাই; বোধ হয় লর্ড লিন্‌লিথগোও তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই।

মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন—প্রথমাবধিই সার জন প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের বিরোধী ছিলেন। অথচ সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া সেই সচিবসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার পরিচালনা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সম্মিলিত ভাবে করা হয়। মিষ্টার হকের অনুযোগ, সার জন মুসলেম লীগ-প্রভাবিত সচিবসঙ্ঘের পক্ষপাতী এবং সেই জন্য—নূতন সচিবসঙ্ঘের ১৩ জন সচিব, ১৩ জন পার্লামেণ্টারী, ৪ জন অতিরিক্ত "হুইপ" মঞ্জুর করিয়া—ব্যয় বর্দ্ধিত করিলেও প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘকে বিস্তার লাভ করিতে দেন নাই এবং ৭ জন মাত্র সচিবকে এক জন মাত্র পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী দেওয়া হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে—সার জন চাউল অপসারণের ব্যবস্থায় সচিবদিগের সহিত পরামর্শও করেন নাই এবং তাঁহার ব্যবস্থায় বাঙ্গালা সরকারের যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অল্প নহে। সার জন সচিবদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া এক জন ইংরেজ ব্যবসায়ীকে ও এক জন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীকে খাদ্য-সমস্যার সমাধানের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, পরন্তু নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের কার্য্যে সচিবগণ কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। সে বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া মিষ্টার হক তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি মিষ্টার হককে বিবৃতি প্রদানকালে তাহা পাঠ করিতে নিষেধও করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইলে মিষ্টার হক যখন সে বিষয়ে তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তখন সার জন সে জন্য তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করেন। মিষ্টার হকের অভিযোগ পাঠ করিয়া মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ সকল যদি ভিত্তিহীন না হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে—সার জন হার্বার্ট গভর্ণরের পদে থাকিবার যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। খাদ্য-দ্রব্য-সমস্যার সমাধানে সার জন যে কায করিয়াছেন, তাহাও প্রশংসনীয় বলা যায় না। মিষ্টার হক পত্রের নকল নজীররূপে প্রদান করিয়া তাঁহার অভিযোগ প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। কাযেই যদি সার জন অভিযোগসমূহ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করিতে না পারেন, তবে লোক সে সকল অভিযোগ সত্য বলিয়াই মনে করিতে পারে। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সর্ব্বতোভাবে মিষ্টার ফজলুল হকের অভিযোগের সমর্থন করিয়াছেন। সার জন যদি তাহার কোন কৈফিয়ৎ না দেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে হইবে—তিনি লোকমতের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না, সুতরাং তিনি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত করিবার অযোগ্য।

—

বাঙ্গালার বাজেটের ভাগ্য

যে সময় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালার বাজেটের আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় সমগ্র বাজেট পরিষদে গৃহীত হওয়া পর্য্যন্তও অপেক্ষা না করিয়া বাঙ্গালার গভর্ণর তৎকালীন সচিব-সঙ্ঘের অবসান ঘটান। তাহার পর যত দিন তিনিই শাসনের সকল বিভাগের পরিচালনা করিয়াছিলেন, তত দিন তিনি ব্যয় মঞ্জুর করিবার অধিকারী হইলেও যে দিন হইতে আবার সচিবসঙ্ঘ কায়েম করা হইয়াছে, সেই দিন হইতে সরকার বাজেটের অনুমোদিত ব্যয় ব্যতীত ব্যয় করিতে পারেন না। সেই জন্য ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা অনিবার্য্য হয়। সরকার পক্ষ পরিষদে বাজেটের অবশিষ্ট অংশ পেশ করিতে চাহেন। কিন্তু ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহাতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন—যে সময় গভর্ণর ব্যয়ের জন্য দায়ী ছিলেন, সে সময়ে কত ব্যয় হইয়াছে, তাহা না জানিলে পরিষদ কখনই সমগ্র ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারেন না। বিস্ময়ের বিষয়, এই সহজ কথা বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের ও গভর্ণরের বোধগম্য হয় নাই। ব্যয়ের অবস্থা ও পরিমাণ না জানিয়া—বাজেটের এক ভগ্নাংশের ব্যয় মঞ্জুর করা যে অসম্ভব তাহা বুঝিয়া পরিষদের সভাপতি ঐরূপ বাজেট পেশ করিতে দিতে অসম্মত হন। ফলে বিনা বাজেটেই কায চলিতেছে এবং বর্ত্তমান প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—তাঁহাদিগকে "অনমুমোদিত" ব্যয় করিয়া যাইতে হইবে। অনমুমোদিত ব্যয় সরকার করিতে পারেন কি না—অর্থাৎ ভারত-শাসন আইনের নির্দ্দেশে তাহা হইতে পারে কি না, তাহা এখন বিচার্য্য হইবে। তবে সে বিচার আদালতে হইবে, কি একাউণ্টেণ্ট-জেনারলের মতানুসারে হইবে, তাহা দ্রষ্টব্য। জানা যাইতেছে, এ বিষয়ে বাঙ্গালার এড্‌ভোকেট-জেনারল যে যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, পরিষদের সভাপতি

তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন না কি বাঙ্গালা সরকার বড়লাটের মারফতে এ বিষয় ভারত-সচিবের গোচর করিয়া তাঁহার নির্দ্ধারণের জন্য অপেক্ষা করিবেন। বাস্তবিক যদি বিনা বাজেটে সরকারের কায চালান সম্ভব হয়—যদি "অননুমোদিত" ব্যয় করা যায়—তবে ব্যয়বহুল সচিবসঙ্ঘ, ব্যবস্থা পরিষদ, ব্যবস্থাপক সভা এ সকলের সার্থকতা কি? প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের সহিত ব্যবহারে বাঙ্গালার গভর্ণর দেখাইয়াছেন—এ দেশে স্বৈরশাসন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ছদ্মবেশে গণতন্ত্রকে ভুল বুঝায়; আর এখন তাঁহার সৃষ্ট সচিবসঙ্ঘ "অননুমোদিত" ব্যয় করিতেছেন! একাউণ্টেণ্ট-জেনারল যদি ঐরূপ ব্যয় মঞ্জুর করিতে অসম্মত হন, তবে কি গভর্ণর তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতায় তাহা মঞ্জুর করিতে পারেন? যখন ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা বাতিল হয় অর্থাৎ যখন তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বাজেট মঞ্জুর করার অধিকার ব্যবস্থা পরিষদের হয়। সে নিয়ম কি বাঙ্গালায় লঙ্ঘিত হইতে পারে? বাজেটের প্রত্যেক অংশ ব্যবস্থা পরিষদে আলোচিত হয় এবং পরিষদ যে বাজেট মঞ্জুর করেন, তদনুসারেই সচিবসঙ্ঘ ব্যয় করিতে পারেন। এমন কি যে সচিবসঙ্ঘ একখানি সংবাদপত্রকে টাকা দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন সে সচিবসঙ্ঘকেও সে ব্যয় পরিষদে মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইয়াছিল। ব্যবস্থা পরিষদে যে বাজেট মঞ্জুর হয় নাই, সে বাজেটকে বাজেট বলা যায় না। সে অবস্থায় সরকারের ব্যয় কিরূপে চলিতে পারে? যে সময় গভর্ণর শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন, সে সময় যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার হিসাব কি তাহার পর দুই মাসেও করা সম্ভব হয় নাই? এ সবই বিস্ময়কর ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না! বাজেট না হইলে—যে সকল বিভাগের ব্যয় মঞ্জুর হয় নাই, সে সকল বিভাগের কর্ম্মচারীরা কিরূপে বেতন পাইতে পারেন, তাহাও জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। এই অবস্থায়ও যে বাঙ্গালায় আবার ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করা হইল না, তাহাতে মনে হয়—ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশে তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার উদগ্র আগ্রহেই—নিয়মানুগ ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও—বাঙ্গালায় তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে।

আইন ও বে-আইনী

সরকারের অর্ডিনান্স-বলে যে সকল "স্পেশাল" আদালত—ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে গৃহের মত দেখা গিয়াছিল, সে সকল আইনতঃ সিদ্ধ কি না, তাহা বিচার্য্য হইলে প্রথমে কলিকাতা হাই-কোর্ট তাহা অসিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তাহার পর বাঙ্গালা সরকার সেই নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে ফেডারল কোর্টে আপীল করিলে সে আপীল যখন অগ্রাহ্য হয়, তখন সরকার তাড়াতাড়ি আবার এক অর্ডিনান্স জারি করেন। সেই অর্ডিনান্সে আদালতের নির্দ্ধারণের সম্ভ্রম আংশিকরূপে রক্ষা করা হয়—ঐ জাতীয় আদালতের বিলোপ সাধন করা হয় এবং নির্দ্ধারণ দান করা হয়—যে সকল আসামী ঐরূপ আদালতে বিচারাধীন, তাহাদিগের বিচার সাধারণ আদালতে হইবে। এ পর্য্যন্ত ভাল কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফতোয়া দেওয়া হয়—যে সকল বিচার ঐরূপ আদালতে হইয়া গিয়াছে, সে সকল বিচার সাধারণ আদালতের বিচার বলিয়া বিবেচিত হইবে। অর্থাৎ যে আদালত আইনতঃ অসিদ্ধ তাহার বিচার আইনতঃ সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইহা সঙ্গত কি না, তাহা কলিকাতা হাইকোর্টে বিবেচিত হইয়াছে—অর্থাৎ পুরাতন অর্ডিনান্স বাতিল করিয়া যে নূতন অর্ডিনান্স জারি করা হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ কি না—তাহারই বিচার হইয়াছে। বিচারে চীফ জাষ্টিস ও মিষ্টার জাষ্টিস খোন্দকার অর্ডিনান্সের শেষাংশ সিদ্ধ বলিয়াছেন—অর্থাৎ মত প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ জাতীয় আদালতে যে সকল মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে, সে সকল মামলার বিচার সাধারণ আদালতে হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইবে। কিন্তু মিষ্টার জাষ্টিস সেন সে মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন—যে সকল আদালত আইনতঃ অসিদ্ধ, সে সকল আদালতের বিচার কখনই সিদ্ধ আদালতের বিচার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তাঁহার কথা—মাথা যদি না থাকে, তবে মাথা-ব্যথা কখনই সম্ভব হইতে পারে না! মিষ্টার জাষ্টিস সেন যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন—অপর দুই জনের রায়ে সে যুক্তি খণ্ডিত হয় নাই।

বন্দীর মুক্তি

বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় রাজনীতিক কারণে বন্দীর সংখ্যা অল্প নহে—১ হাজার ৭ শত। প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘ এই সকল বন্দীর মধ্যে কতকাংশকে মুক্তি প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; কারণ, পুলিস তাহাতে সম্মত হয় নাই। শেষে তাঁহারা যখন পদত্যাগ করেন, তখন তাঁহারা ৫ শত বন্দীকে মুক্তিদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ গঠনের প্রাক্কালে প্রধান-সচিব যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মুক্তি, তাঁহাদিগের পরিজন-গণের বৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে সহানুভূতি সহকারে বিবেচনার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সচিবসঙ্ঘে বর্ত্তমান প্রধান-সচিব স্বরাষ্ট্র-সচিব ছিলেন, সেই সময় যখন ভারত সরকার রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের স্বজনগণের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন তিনিই তাহাতে আপত্তি করিয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই জন্য এ বার যে সচিবসঙ্ঘ প্রায় এক শত বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন ও বন্দীদিগের স্বজনগণের ভাতা বর্দ্ধিত করিতেছেন বলিয়াছেন, ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু তাহা "ধাপ্পা" বলিয়া অভিহিত করিয়া-ছেন। তবে দেখা যাইতেছে, যে সকল ব্যক্তিকে এখন মুক্তিদানে পুলিসের আপত্তি হইতেছে না, তাঁহাদিগেরই প্রধানদিগের মুক্তির প্রস্তাব প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘ করিলে তাহাতে বিশেষ আপত্তি হইয়া-ছিল! কেবল তাহাই নহে, যাঁহাদিগের মুক্তিদান প্রাক্তন সচিব-সঙ্ঘের অভিপ্রেত ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেককে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে মিসেস নেলী সেন গুপ্তা বন্দীদিগকে মুক্তিদানের যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা উপলক্ষ করিয়া সচিবদলের পক্ষীয় মিষ্টার আব্দর রহমন সিদ্দিকী বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের কার্য্যের সমর্থক এক সংশোধক প্রস্তাবও

উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাব আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হয়—প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গৃহীত হয় নাই।

কিন্তু প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে যে সকল কথা জানা গিয়াছে, সে সকল বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার—যাঁহারা এখনও বন্দিদশায় কালক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বয়স ৭০ বৎসর এবং তিনি অসুস্থ। তথাপি তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইতেছে না। এক জন ডাক্তারের আয় মাসিক দেড় শত টাকা থাকিলেও তাঁহাকে বন্দী করার বহু দিন পরে মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল! সম্প্রতি বন্দীদিগকেও স্থানান্তরিত করিবার সময় হাতকড়া দিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

কেবল পূর্ব্বোক্ত কথাই নহে। বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ যে সকল বন্দী হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও মুক্তির আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ নং রেগুলেশন জারি করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখিতেছেন।

মেদিনীপুর জেলে না কি রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকেও ঘানী ঘুরাইতে হইয়াছে। কখন্ এই ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ পায় নাই। তবে আমরা দেখিয়াছি, মেদিনীপুরে যখন রাজনীতিক কারণে হাঙ্গামা প্রবল হয়, তখন যে ব্যক্তি তথায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—তিনি যে আপনার সম্ভ্রম সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণাবশে অনাচার করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারকের মন্তব্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

খাদ্য-সমস্যা

বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা দিন দিন তীব্র ও জটিল হইয়া উঠিতেছে। প্রাক্তন সচিব-সঙ্ঘের দোষ দেখাইয়া বা বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘকে দায়ী করিয়া সে সমস্যা সমাধানের আশা নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা রক্ষা পাইতে পারি, তাহাই বিবেচ্য। প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘ বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অভাব স্বীকার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ যত দিন পারিয়াছেন, সেই সত্য গোপন করিয়াছেন—বলিয়া আসিয়াছেন—অভাব নাই। তাঁহারা এই মতের সমর্থনে হিসাবও দাখিল করিয়াছেন! কিন্তু সে হিসাব যে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন—অভাব আছে এবং লোককে অল্প আহার করিয়া—দুই বেলা না জুটিলে এক বেলা খাইয়া বাঁচিতে হইবে! অথচ কি পরিমাণ আহার ব্যতীত দেহ কর্ম্মক্ষম থাকে না, তাহা তাঁহারা বলিতেছেন না এবং সেই আহার যোগাইতে পারিতেছেন না! তাহার পর তাঁহারা পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিতেছেন; কোন পরীক্ষাই সফল হইতেছে না। তাঁহাদিগের কোন্ কোন্ পরীক্ষায় কিরূপ ফল ফলিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া কায করা প্রয়োজন। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। খাদ্য-সচিব মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, ভারত সরকার বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই প্রদেশচতুষ্টয়ে "পূর্ব্বাঞ্চল" গঠিত করিয়া ও তাহাতে খাদ্য-শস্যের অবাধ বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত করিয়া খাদ্য-শস্য ক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে বলায় তিনি ইস্পাহানী কোম্পানীকেই সে ভার দিয়াছেন। তিনি ইস্পাহানী কোম্পানীর যত প্রশংসাই করুন না—তিনি যে এ বিষয়ে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের যে দুর্ভিক্ষে ("ছিয়াত্তরের মন্বন্তর") বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালীন শাসক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে এমন অভিযোগও উপস্থাপিত হইয়াছিল যে, তাহারা দেশে সমস্ত শস্য লইয়া দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহারা যে মূল্যে শস্য কিনিয়াছিল, তাহার আট দশ দ্বাদশ গুণ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাহারা—ইচ্ছামত মূল্য দিয়া কৃষকদিগের সামান্য সঞ্চিত শস্য লইয়াছিল,—যে সকল নৌকায় অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাউল আসিতেছিল, সে সকল ধরিয়া চাউল লইয়াছিল, কৃষকদিগকে বীজ-ধানও বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিল। সমগ্র সরকারের বিরুদ্ধে আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শস্যের ব্যবসা করার অভিযোগ শুনা গিয়াছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাই এই সকল অপরাধে অপরাধী ছিলেন।

এ বার যাহাতে তাহা হইতে না পারে, সে জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে? সে বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার লোককে কিছুই জানান নাই।

কেন্দ্রী সরকার আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্দ্দিনে বাঙ্গালাকে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না। কিন্তু সে আশা কত দূর ফলবতী হইবে, তাহা কে বলিবে? সে দিন ব্যবস্থা পরিষদে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাঞ্চল" সৃষ্টির পূর্ব্বে কেন্দ্রী সরকার বাঙ্গালাকে ৫ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য (চাউল, গম প্রভৃতি) প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহার কি হইয়াছে? সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। তাহার পর বলা হয়, কেন্দ্রী সরকার বাঙ্গালার জন্য ৫ কোটি টাকার খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন। তাহা কোথায় সঞ্চিত হইয়াছে? চাউলের যখন অভাব থাকে না, তখনই বাঙ্গালায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন গমের প্রয়োজন হয়, এখন চাউলের যেরূপ অভাব, তাহাতে অনেক অধিক গমের প্রয়োজন অনিবার্য্য। অথচ সমগ্র ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাতে মোট প্রায় ২ লক্ষ ২৪ হাজার টন গম দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার এক-চতুর্থাংশের অধিক গম পাওয়া যায় নাই। তদ্ভিন্ন বাজরা প্রভৃতি এ বৎসর মোট ২ লক্ষ টন দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ১০ হাজার টনের অধিক ঐ সকল শস্য লাভ বাঙ্গালার ভাগ্যে ঘটে নাই।

মিষ্টার সুরাবর্দ্দী যখন এই হিসাবের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই, তখন ইহাই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে কি অবস্থা অনিবার্য্য? চাউলের আশা কোথায়? বিহার যে বাঙ্গালাকে সাহায্য করিবে—এমন আশা নাই বলিলেই হয়। উড়িষ্যায় চাউল রপ্তানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং উড়িষ্যার খাদ্য-সচিব বলিয়াছেন, উড়িষ্যায় (খাস উড়িষ্যায় ও উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্যসমূহে) বাহিরে দিবার মত যে চাউল ছিল, তাহা ইতোমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। উড়িষ্যা আপনি উপবাস করিয়া অপরের অন্ন যোগাইবে না। ইতঃপূর্ব্বেই উড়িষ্যার প্রধান-সচিব এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছিলেন, বাঙ্গালার জন্য ক্রীত বলিয়া বাঙ্গালার সচিব যে চাউল ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন,

তাহা উড়িষ্যা সরকার উড়িষ্যার প্রয়োজনে আটক করিয়াছিলেন। এই চাউল কে বা কাহারা কিনিয়াছিল এবং কি দরে কিনিয়াছিল ?

আসামের ব্যাপারটি রহস্যাচ্ছন্ন। কারণ, আসাম সরকার বাঙ্গালা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল কিনিয়াছেন এবং তাহার মূল্য বাঙ্গালা সরকারের মারফতে প্রদান করা (মেসার্স স ওয়ালেস কোম্পানীকে ?) হইয়াছে ! আবার আসামের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—আসামের যে অংশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই অংশে যে ইস্পাহানী কোম্পানী চাউল কিনিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে আসামের প্রধান-সচিবের এক পুত্র কোম্পানীর লোকের সহগামী ছিলেন।

সুতরাং কি হইবে ?

সম্প্রতি শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুত হরিচরণ ঘোষ যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখান হইয়াছে, বাঙ্গালার অভাবের জন্ম যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য প্রয়োজন, তাহা পাইবার আশা নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, সে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আনিতে যত মালগাড়ী প্রয়োজন, তাহাও সরকার যোগাইতে পারেন না। জ্বালানী কয়লার আমদানী সম্পর্কেও আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, তিনি "জ্ঞানপাপী" হইলেও অপরাধী নহেন! কারণ, অভাবের কথা বলিলে লোক ভয় পাইবে ও সঞ্চয়ে আগ্রহ করিবে বলিয়া তিনি অভাবের কথা বলিতেই চাহেন নাই এবং তিনি যে সংবাদ লইয়াছিলেন ও কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে সরবরাহের যে আশা পাইয়াছিলেন, তাহাতে অনায়াসে বলিতে পারিয়াছিলেন অভাব নাই বা থাকিবে না। বিশেষ খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে লোকে অল্প আহার করায় অভাব হ্রাস পাইতেছে!

খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে লোকের পক্ষে আহারের পরিমাণ হ্রাস করা যদি স্বস্তির কারণ হয়, তবে ত অনাহারে বহু লোকের মৃত্যুও আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে! একেই ত সার চার্লস এলিয়ট মন্তব্য করিয়াছেন—"আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমাদিগের (ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষের) কৃষকদিগের অর্দ্ধাংশের ক্ষুধা বৎসরে কখন পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না"—তাহার উপর আবার যখন খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে বহু লোক সেই স্বল্পাহারও স্বল্প করিতে বাধ্য হয়, তখন কি জীবিতগণ জীবন্মৃতই হয় না ?

যাহারা জীবিত হইলেও জীবন্মৃত, তাহাদিগের দ্বারা কি অধিক শস্যোৎপাদনের শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে ? সমগ্র জাতির অবস্থা তাহাতে কিরূপ হয় ?

কলিকাতায় কতকগুলি দোকানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল ও আটা পাওয়া যায় ; কিন্তু যে স্থানে মাত্র সাড়ে চারি শত লোক প্রতিদিন তাহা পাইতে পারে, তথায় প্রতিদিন সহস্রাধিক ক্রেতার সমাবেশ হয়। যাহারা মূল্য দিয়া খাদ্য-দ্রব্য কিনিতে আইসে, তাহারা ভিখারীর অধম কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হয়—জনতায় মৃত্যুর সংবাদও যে পাওয়া যায় না তাহা নহে।

মফঃস্বলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার আভাস ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের সমর্থক দলের সদস্য খাঁন বাহাদুর আবদুল ওয়াহেদ খাঁনের বিবৃতিতে পাওয়া যায়, যে বরিশাল বাঙ্গালার ধান্যের গোলা বলিয়া বিবেচিত হয়, তথায় তিনি কয়টি স্থানে স্বয়ং দেখিয়াছেন :—

বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে বিক্রয়ার্থ পটুয়াখালীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। কেহ কেহ স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছে। লোক খাদ্যাভাবে অখাদ্য—এমন কি মৃত গরুর মাংসও আহার করিতেছে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক বার লোক মৃত গরুর মাংসও খাইতেছে বলায় মিষ্টার সুরাবর্দ্দী তাঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন। এ বার তিনি খাঁন বাহাদুরের উক্তির প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই!

আর যে দেশে সভ্য সরকার বিদ্যমান, সেই দেশে লোক স্ত্রী-কন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে! ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার ফলে লোক—"পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিয়াছিল—শেষে কিনিবার লোক পাওয়া যাইত না।" ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কথা নহে—ইহা সরকারী দপ্তরের বিবরণ হইতে ইংরেজ ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিবরণ। সে বার সেই দুর্ভিক্ষের পর ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে ; তাহাদিগের বিক্ষোভের বহির্ব্বিকাশ দেখা যাইতেছে না। তাহার কারণ, সার উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর স্বভাবই এই যে, বাঙ্গালী নিঃশব্দে সহ্য করে—বিশেষ ঘরের কথা পরকে জানিতে দিতে চাহে না। সেই জন্য ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতেও গৃহস্থ-গৃহে মহিলারা অনাহারে তিলে তিলে মরিয়াছেন—তথাপি বাহির হইতে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতাহেতু বর্দ্ধমানের মহারাজ নিজ গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বীরভূমের মহারাজ কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের বৃদ্ধ রাজা কারাগার হইতে মুক্তি লাভের পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন—তিনি গৃহবিগ্রহ "মদনমোহন" বন্ধক দিয়াও আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সে বার বাঙ্গালার আর্থিক জীবনে বিপ্লব ঘটিয়াছিল ; এবার সামাজিক জীবনেও কি তাহাই হইতেছে না ?

প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের যখন অবসান ঘটে, তখনই প্রদেশে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু তখন চাউলের যে মূল্য ছিল, এখন তাহার তিন গুণেরও অধিক হইয়াছে। তখনই প্রধান-সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছিলেন, দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ কিরূপে বাঁচিয়া আছে, তাহা ভগবানই জানেন! আজ যদি বলা হয়, তাহারা অনাহারে মরিতেছে, তবে কি তাহা অত্যুক্তি হইবে ?

প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের পরস্পরকে দোষ দিলে যে অবস্থার উন্নতি হইবে, তাহা নহে। আর ওদিকে ভারতবাসীর সহিত সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতিহীন ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী বিলাতের লোককে বুঝাইতেছেন—কৃষকগণ শস্য বাজারে ছাড়িতে অসম্মত হওয়ায় ও লোকের আয়-বৃদ্ধিতে অধিক আহারে ভারতে খাদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অথচ তিনিই কিছু দিন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়ায় বাঙ্গালার অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়াছে। তাঁহার কোন্ কথায় লোক বিশ্বাস স্থাপন করিবে ? না—কোন কথাই বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্য নহে ? আমরা পূর্ব্বেই সার চার্লস এলিয়টের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। সার উইলিয়ম হাণ্টারও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—কৃষকের ঘরে সঞ্চয় থাকে না। আর আমরা

দেখাইতে পারি, ভারতে লোকের আয় ব্যয়ের তুলনায় বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাসই পাইয়াছে। তিনি বিলাতের লোককে যাহাই কেন বুঝাইবার চেষ্টা করুন না—অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা দেশের লোক বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছে।

তিনি কি এ বিষয়ে সরকারের (বৃটিশ সরকারেরও) দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন ?

বাঙ্গালা সরকারের খাদ্য-সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, লোক যাহাতে আতঙ্কিত না হয়, সেই জন্য তিনি অভাবের বিষয় আলোচনা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু লোক কি অনাহারেও অভাব বুঝিতে পারিতেছে না ?

এ দেশে যে সকল য়ুরোপীয় শোষণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপ সহানুভূতিহীন তাহার পরিচয় ২১শে আষাঢ় ব্যবস্থা পরিষদে পাওয়া গিয়াছে। সে দিন যখন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "সরকারকে বাঙ্গালার জন্য বৃটিশ সরকারের ও ভারত সরকারের নিকট হইতে খাদ্য-দ্রব্য আনিতেই হইবে"—তখন য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠেন—"টোজো (অর্থাৎ জাপান) তোমার বন্ধু।" বিরক্ত হইয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলেন—"য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমরা ঐরূপ উত্তরই পাইব, জানি। যদি য়ুরোপীয়দিগের সহিত ভারতে ১ শত ৭০ বৎসরের সম্বন্ধের পর বাঙ্গালাকে এই ভাবে অনাহারে মরিতে হয়, তবে যে অন্ততঃ য়ুরোপীয়রা আমাদিগের বন্ধু নহে—তাহাতে সন্দেহ নাই !" য়ুরোপীয় সদস্যটির নিষ্ঠুর উক্তির নানারূপ ব্যাখ্যাও করা যায়।

যখন বাঙ্গালার এই অবস্থা, তখনও বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বীকার করিয়া লোককে—দুর্ভিক্ষকালীন—খাদ্য সরবরাহের ভার গ্রহণ করিলেন না ! অথচ বাঙ্গালার গভর্ণরের অনুমোদনে ১৩ জন সচিব ও ১৩ জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ও ৪ জন অতিরিক্ত "হুইপ" সরকারের ব্যয় বর্দ্ধিত করিয়া—"জনমনুমোদিত" ভাবে বেতন গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। ইহা যে গভর্ণরের ও সচিবদিগের দেশের লোকের দুর্দ্দশায় সহানুভূতির পরিচয় নহে, তাহা বলিতে দ্বিধাবোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্য বৃদ্ধির যে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হইয়াছে, তাহার পরিচয়ও আমরা পাইতেছি না।

কাযেই ভবিষ্যতের অন্ধকারে আশার ক্ষীণ আলোকও প্রতিভাত হইতেছে না।

আদালতের মান ও অপমান

কলিকাতার হাইকোর্ট ও ফেডারল কোর্ট ভারত-রক্ষা নিয়মের ২৬ দফা অসিদ্ধ বলায় কলিকাতা হাইকোর্ট যে সকল বন্দীকে মুক্তি দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যে পুলিস ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনের বলে এজলাসে বা আদালতের অলিন্দে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আদালতের অপমান করা হইয়াছিল কি না, তাহা কলিকাতা হাইকোর্টে বিচার্য্য ছিল। বিচারে চীফ-জাষ্টিস ও মিষ্টার জাষ্টিস খোন্দকার সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই নিরপরাধ বলিলেও মিষ্টার জাষ্টিস মিত্র (শ্রীযুত রূপেন্দ্রনাথ মিত্র) দারোগা হাসান, গফুর ও

চীফ-জাষ্টিসের রায়ে তিনি স্বীকার করিয়াছেন বটে, শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের প্রতি অকারণ বলপ্রয়োগ করা হইয়াছিল (এডভোকেট জেনারেলও তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন) কিন্তু ফতোয়া দিয়াছেন—সে বিষয়ে নীহারেন্দু ও গ্রেপ্তারকারীদিগের সঙ্গে বুঝাপড়া হইবে। আদালত-গৃহে ঐরূপ বল প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও তাহাতে আদালতের অপমান হয় নাই। আর দারোগা গফুর যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেও আদালতের অপমান হয় নাই বলিয়া তিনি তাহাকে সদুপদেশ দিয়াছেন—ভবিষ্যতে সে যেন যাহা জানে তাহার মধ্যেই উক্তি সীমাবদ্ধ রাখে।

রূপেন্দ্র বাবু কিন্তু বলিয়াছেন :—

(১) দারোগা হাসান যাহা বলিয়াছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না।

(২) জানভ্রিণের এফিডেভিটে প্রকৃত কথা ঢাকিবার চেষ্টা আছে। তাহা সন্তোষজনক নহে।

(৩) মনে করিবার কারণ আছে, জানভ্রিণ যখন গ্রেপ্তার করে, তখন তাহার নিকট ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট ছিল না। অর্থাৎ সে বিনা-ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তারের পর ওয়ারেণ্ট পাইয়াছিল বা আনাইয়া লইয়াছিল।

দারোগা হাসানের সম্বন্ধে রূপেন্দ্র বাবু মন্তব্য করিয়াছেন—তাহার উক্তি বিশেষ ভাবে আদালতের অবমাননাকর। সে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে বুঝাইবার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ছিল—হাইকোর্ট যাহাই কেন করুন না—পুলিসই সর্ব্বেসর্ব্বা। সে পুলিস—সুতরাং কোন্ অধিকারে সে গ্রেপ্তার করিতেছে, তাহাও দেখাইতে বাধ্য নহে। তাহার কার্য্যে আদালতের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা।

পুলিসের এক জন কর্ম্মচারী যে বলিয়াছিল—"তামাসা" শেষ হইয়াছে ; তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—সে হাইকোর্টের বিচারকে "তামাসা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল।

চীফ-জাষ্টিস একাধিক বার—যেন কৈফিয়তে—বলিয়াছেন বটে, পুলিস আদিষ্ট হইয়া কাজ করিতেছিল, কিন্তু রূপেন্দ্র বাবু মত প্রকাশ করিয়াছেন—সে কথা দণ্ডদানকালে বিবেচ্য। অর্থাৎ তাহাতে অপরাধ দূর হয় না—অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস হয় কি না, তাহা বিবেচনার বিষয় হয়। যখন তাঁহার সহঃ-বিচারকদ্বয় আসামীদিগকে নিরপরাধ মনে করিয়াছেন, তখন আর সে বিষয়ে আলোচনার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

রূপেন্দ্র বাবু বাঙ্গালী। তিনি পুলিসের ব্যবহার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যে এ দেশের লোকের মত, তাহা আমরা দৃঢ়তা সহকারেই বলিব।

মিষ্টার জাষ্টিস খোন্দকার মিষ্টার দত্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—এ দেশের পুলিসের সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাসের উল্লেখ করিয়াছেন—পুলিসের ধৃষ্টতায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু সে সব বলিয়া বলিয়াছেন—তাহাতে আদালতের অবমাননা করা হয় নাই।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য পুলিসের ঐ সকল কর্ম্মচারীর পদোন্নতি হইবে কি না, তাহা অবশ্য হাইকোর্টের লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে ; আর

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

৩০শে আষাঢ় বোম্বাই নগরে নিখিল-ভারত সংবাদপত্র-সম্পাদক-সঙ্ঘের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বড়লাটের শাসন পরিষদে সংবাদ ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সার সুলতান আমেদ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে এ দেশে সংবাদপত্রের অবস্থা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তাহা মনে করিবার উপায় নাই। তিনি বলিয়াছেন—তিনিও যুদ্ধকালেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতারক্ষার পক্ষপাতী। তিনি সে বিষয়ে সংবাদপত্রকে সাহায্য করিয়া সংবাদপত্রের সাহায্য চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি সংবাদপত্রের নিকট হইতে সরকারের প্রচারকার্য্যে সহযোগিতা চাহেন। তিনি প্রচার পরামর্শ সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন এবং তাহাতে যোগদান জন্য সাংবাদিকদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছেন।

তাঁহার বক্তৃতার উত্তরে সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত কস্তুরীরঙ্গ শ্রীনিবাসন যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে দেখান, সরকারের এই বিভাগের গুরুত্ব ও প্রয়োজন যত অধিকই কেন হউক না, ইহা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পরে সৃষ্ট হইয়াও সময় সময় কর্ণধারহীন তরণীর দশা প্রাপ্ত হইয়া শেষে বেতার বিভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনে ইহা মিত্রদেশসমূহে ভারতীয় নেতৃগণের সম্বন্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ ও নিন্দা প্রচারের উপায়ে পরিণত হয় এবং রাজনীতিসংক্রান্ত সকল সংবাদ কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা আরম্ভ হয়।

যে ভাবে মার্কিণের সাংবাদিক মিষ্টার লুই ফিশারের প্রবন্ধাদি প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত শ্রীনিবাসন বলেন—যদি এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হয়, তবে সংবাদপত্রের পক্ষে কর্ত্তব্য পালন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হয় ত সার সুলতান বলিবেন, সে কায অন্য বিভাগের। কিন্তু এ কথা যদি সত্য হয় যে, যোগ্যতা-বৃদ্ধির জন্যই বিবিধ বিভাগের সৃষ্টি করা হয়, তবে এইরূপ অবস্থায় সংবাদ ও বেতার বিভাগের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? এই বিভাগ টিউনিসিয়ার বিজয়-ঘোষণার উৎসবের জন্য সংবাদপত্রসমূহকে অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন; অথচ সে জন্য অতিরিক্ত কাগজ চাহিলে বলা হয়—তাহা দেওয়া হইবে না, সংবাদপত্রগুলি এক দিন প্রচার বন্ধ রাখিয়া সেই কাগজ ঐ সংখ্যার জন্য ব্যবহার করিতে পারেন! এইরূপ ব্যবহারে সহযোগ আকৃষ্ট করা যায় না।

সার সুলতান যে পরামর্শ সমিতি প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, তাহা সাংবাদিকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং তিনি সে সমিতিতে সাংবাদিকদিগকে বর্জ্জন করিলেই ভাল হয়। তিনি যদি সঙ্ঘের অধিবেশনে উপস্থিত হয়েন, তবে তিনি অধিক উপকৃত হইবেন।

সার সুলতান বলিয়াছিলেন, যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রের পক্ষে যতটুকু স্বাধীনতা সম্ভোগ করা সম্ভব, ভারতে সংবাদপত্র ততটুকু স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে। ইহা পাঠ করিলে মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রী সরকারের দপ্তর হইতে সংবাদ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে সকল আদেশ ও নির্দ্দেশ প্রচারিত হয়, তিনি সে সকলের সংবাদও রাখেন না। দিল্লীতে যে সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আছেন, তাঁহারা ও সঙ্ঘ সরকারের নিকট যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সকলের সংবাদও কি সার সুলতান রাখেন না? তিনি নূতন পদে নবপ্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তিনি যদি সকল বিষয় জানিয়া সম্পাদক-সঙ্ঘে বক্তৃতা করিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে তাহা সঙ্গত ও শোভন হইত।

তিনি কি জানেন না, সংবাদপত্রের সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে সংবাদপত্রসমূহের প্রচার বন্ধ রাখাও হইয়াছিল এবং কলিকাতায় যে প্রবীণ সম্পাদক সম্পাদকসমূহের যে সভায় প্রচার বন্ধ রাখা স্থির হয়, তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—ভারতরক্ষা নিয়মের বলে তাঁহাকে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছিল? বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে বার বার উল্লেখিত হইয়াছে—সরকার সংবাদপত্রের সম্বন্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংবাদপত্রসমূহকে যে সকল নির্দ্দেশ প্রদান করা হয়, সে সকল যদি "গোপনীয়" বলিয়া চিহ্নিত না হইত, তবে আমরা সেইরূপ বহু নির্দ্দেশ প্রকাশ করিতে পারিতাম।

আমরা সংবাদপত্রের বিষয়েই আলোচনা করিতেছি। নহিলে বেতার সম্বন্ধেও যে অনেক কথা বলিতে পারিতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বেতারে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়া ফেডারল কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারক সার মরিস গাওয়ারও যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেতার আফিসে যিনি ফেডারল কোর্টের চীফ-জাষ্টিসের বক্তৃতায় আইনগত আপত্তি করিতে পারেন, তাঁহার জয় হউক।

শ্রীযুত শ্রীনিবাসন বলিয়াছেন, ভারতের রাজকর্ম্মচারীরা অনায়াসে এ দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বৃটেনে ও মার্কিণের সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার তুলনায় আমাদিগের স্বাধীনতা স্বাধীনতা-নামের যোগ্য কি না, তাহা কে বলিবে?

তবে সার সুলতান যদি মনে করেন, স্বাধীন দেশে সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করে, পরাধীন দেশের সংবাদপত্রের পক্ষে তাহা সম্ভোগ করিবার আশা দুরাশা—সে স্বতন্ত্র কথা। তিনি কি বলিবেন—পরাধীন, স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত ভারতের সংবাদপত্রসমূহ যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট?

দীনেন্দ্রকুমার রায়

১২ই আষাঢ় স্বগ্রাম মেহেরপুরে (নদীয়া জিলা) ৭৪ বৎসর বয়সে প্রবীণ সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বগ্রামে অধ্যয়নের পর কৃষ্ণনগরে আসিয়া—শেষে পিতৃব্যের নিকট মহিষাদলে গমন করেন। পঠদ্দশাতেই দীনেন্দ্রকুমার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহার গ্রাম্যচিত্র ও গ্রামপরিবেষ্টনে স্থাপিত চরিত-চিত্র লইয়া রচিত গল্প বিবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত তিনি গ্রামের ও গ্রাম্যসমাজের চিত্র অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের সায়াহ্নে—বহু দিন 'বসুমতী'র সেবা উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিবার পর তিনি যে মাত্র কয় মাস পূর্ব্বে গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া তথায় শেষ শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনের সহিত

সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্যসম্পন্ন। তিনি যেন তাঁহার পল্লী-জননীর আকর্ষণ অনুভব করিয়া তাঁহার অঙ্কে ফিরিয়া গিয়াছিলেন! মনে করিয়াছিলেন :—

"সন্ধ্যা হ'ল বেলা গেল—
কোলের ছেলে নে মা, কোলে।"

দীনেন্দ্র বাবু জীবনে বহু শোক ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোগ-শোক এ সকল কখন তাঁহার সাহিত্য-সেবায় অন্তরায় হইতে পারে নাই; পরন্তু তিনি বলিতে পারিতেন, সাহিত্য-সেবাতেই—

"পাইয়াছি শোকে শান্তি, পাইয়াছি দুঃখে সুখ;
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র, প্রেমে ভরিয়াছে বুক।"

তাঁহার সেই সাহিত্য-সেবা কিরূপ ছিল, তাহার শেষ পরিচয় তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তিনি 'মাসিক বসুমতী'র জন্য একখানি উপন্যাসের অনুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহার উপন্যাসের অনুবাদ মৌলিক রচনার মত মনোরম হইত। গত মাসেও 'কথাশিল্পীর হত্যা-রহস্যে'র দুইটি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ দিয়া তাঁহার পুত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি "উপন্যাসের কপি কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পরে পাঠাইতেছি।" তখন তাঁহার পুত্রও জানিতেন না—আমরাও কল্পনা করিতে পারি নাই—তিনি কায অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান নাই! রচনা শেষ করিয়া—"সম্পূর্ণ" লিখিয়া—স্বাক্ষর করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। হয় ত মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বা তাহার পূর্ব্বদিন তিনি রচনাটি শেষ করিয়াছিলেন।

দীনেন্দ্রকুমার রায়

"সাপ্তাহিক বসুমতী"তে তিনি প্রথম সাংবাদিকের কাযে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন তিনি ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির নিকট সাংবাদিকের শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরে কিছু কাল "সাপ্তাহিক বসুমতী"র সম্পাদকরূপে কায করিয়া তিনি সংবাদপত্রের কায ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার আসিয়া কিছু দিন 'দৈনিক বসুমতী'তে কায করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত 'মাসিক বসুমতী'র সহিত সম্বন্ধ ছিলেন।

তিনি অনুবাদ কিরূপ সরস ও সুন্দর করিতে পারিতেন, নেপোলিয়নের জীবনচরিতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় সপ্রকাশ। অরবিন্দ যখন বরোদা রাজ্যে কায করিতেন, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার জন্য এক জন সঙ্গীর সন্ধান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের মনোনয়নে দীনেন্দ্র বাবু তথায় গমন করেন।

যে সময় তিনি বরোদায় ছিলেন, সে সময়ের কথা তিনি যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ভাষা মার্জ্জিত, সরল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দগামী ছিল। সেই ভাষার গুণেই তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ-সহস্র অনূদিত উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদিগের বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত মৌলিক উপন্যাসের সংখ্যা অল্প। কিন্তু তিনি যেমন বহু ইংরেজী উপন্যাসের বঙ্গানুবাদে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তেমনই বহু ছোট গল্পও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনায় যে শুচিতা ছিল, তাহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের ও গ্রাম্য জীবনের দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। আজ যেমন সেকালের বিলাতের গ্রাম্য জীবনের পরিচয় গ্রহণ করিতে পাঠকগণ জর্জ্জ ইলিয়টের পুস্তক পাঠ করেন, তেমনই বাঙ্গালার অতীত গ্রাম্য জীবনের চিত্র বাঙ্গালী পাঠক দীনেন্দ্র বাবুর রচনায় পাইবেন। দীনেন্দ্র বাবু যদি অন্য কোন গ্রন্থ আর না লিখিতেন, তথাপি তাঁহার রচিত "পল্লীচিত্র" এবং "পল্লী-বৈচিত্র্য" তাঁহার কীর্ত্তি চির-সমুজ্জ্বল রাখিত। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার লেখনীর বিশ্রাম ছিল না। সাহিত্য-সেবায় তিনি কখন আলস্য দেখান নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা এক জন পুরাতন বন্ধু ও সহকর্ম্মী হারাইয়া বেদনানুভব করিতেছি।

—

পণ্ডিত জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন

৮ই আষাঢ় ঢাকার সান্নিধ্যে নোয়াদ্ধাগ্রামে প্রবীণ বৈয়াকরণ পণ্ডিত জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অসাধারণ শাব্দিক পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌমের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, ন্যায়ের শব্দখণ্ড প্রভৃতি পাঠ করিয়া নিজ ভবনে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ তাঁহার ছাত্রদিগের অন্যতম।

—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

১২ই আষাঢ় ১৯ দিন টাইফয়েড রোগে পণ্ডিত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রীর দেহান্ত হইয়াছে। অতি অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া তিনি জন্মস্থান রাজসাহী ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন এবং তথায় বিশ্রুতকীর্ত্তি মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকট পাণিনি ব্যাকরণের আদ্যোপান্ত ও বেদান্তাদি নানা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আকুমার অনন্যচিত্তে শাস্ত্রাভ্যাসের ফলে আকুমারিকা-হিমাচল ভারতের পণ্ডিত সমাজে তাঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল। বারাণসী সংস্কৃত কলেজে তিনি পাণিনি

ব্যাকরণের আচার্য্যপদ লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত এই পদ লাভ করেন নাই। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তাঁহার পাণিনি ও বেদান্তের অধ্যাপকপদে নিয়োগ হয়। 'মাসিক বসুমতী'তে তিনি ভগবান্ পতঞ্জলি কৃত পাণিনির
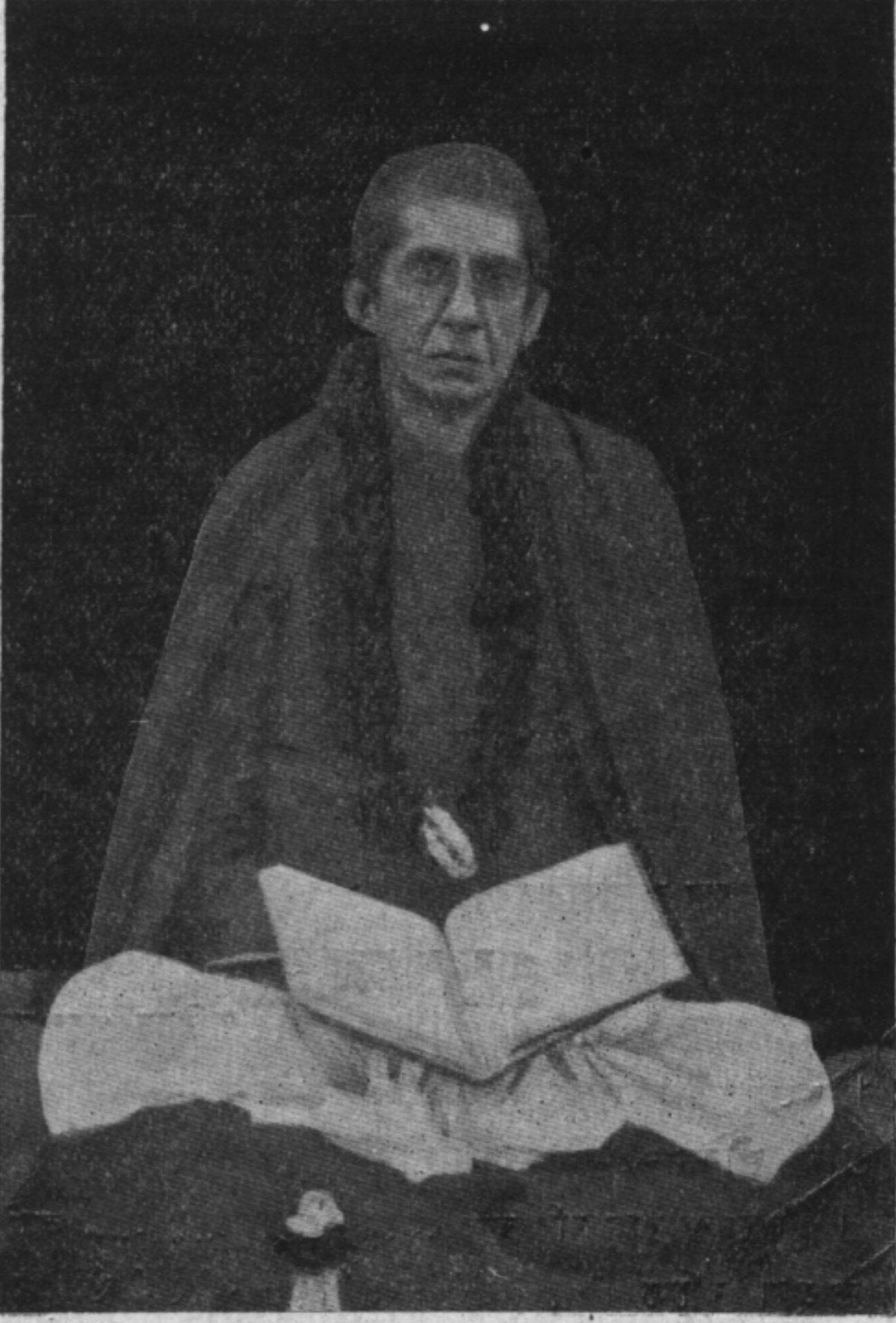
হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

অষ্টাধ্যায়ী মহাভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোভাবে বাঙ্গালা হইতে পাণিনীয়-ব্যাকরণ-দর্শন-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইল বলা যায়। তাঁহার মৃত্যুতে দেশমাতৃকা এক জন প্রতিভাবান্ কৃতী সন্তান হারাইলেন—বাঙ্গালার পাণ্ডিত্য ম্লান হইল।

শৈলেন্দ্র বাগচী

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, ১৯শে আষাঢ় মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে রেশম-শিল্পবিশেষজ্ঞ পিতা সুধাংশুশেখরের পুত্র—ঐ শিল্পে বিশেষজ্ঞ পুত্র শৈলেন্দ্র সহসা সন্ন্যাসরোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লইয়া জাপানে গমন করেন এবং তথায় ৩ বৎসর রেশম-শিল্প অধ্যয়ন করিয়া জাপান সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া বিলাতে এবং তাহার পর ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও ইটালীতেও শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি যখন ভারত সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন, তখন জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিনানুমতিতে গমনাগমন নিষিদ্ধ হয় এবং সেই জন্য সতর্ক পুলিস তাঁহার শব শ্মশানে লইয়া যাইবার পথেও বাধা দিয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্র দে

প্রবোধচন্দ্র দে সিদ্ধান্তসিন্ধু ১৯শে আষাঢ় ৫৭ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কিশোরীচাঁদ মিত্রের একমাত্র সন্তান কন্যার—কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার তৃতীয়াগ্রজ শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দের মত প্রবোধ-চন্দ্র বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। তিনি মৃত্যুকালে বরিশালে জিলা ও দায়রা জজ ছিলেন। তাঁহার মধ্যমাগ্রজ ডাক্তার। প্রবোধচন্দ্র নাগপুরের সর্ব্বজন-সমাদৃত সার বিপিনকৃষ্ণ বসুর জামাতা ছিলেন। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা এবং বিধবা রাখিয়া গিয়াছেন।

বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫ই আষাঢ় ৬৪ বৎসর বয়সে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও রাজনীতিক বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের রাজনীতিক গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিজয়চন্দ্র অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের সহকর্ম্মিরূপে দেশসেবা আরম্ভ করেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। আজ, বোধ হয়, এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে. যে প্রবন্ধের জন্য সরকার 'বন্দে মাতরমের' ছাপাখানা প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন—কারাগারে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর হত্যা লইয়া লিখিত—সেই প্রবন্ধ বিজয়চন্দ্রের রচনা। তিনি গোলটেবল বৈঠকে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের দাবী পেশ করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া চাকরী প্রভৃতিতে হিন্দুকে অর্দ্ধেক ও মুসলমানকে অর্দ্ধেক অংশ দিয়া হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান-চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বহু রাজনীতিক মোকর্দ্দমায় অভিযুক্তদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টাররূপে তিনি ভাওয়ালের মামলায় সন্ন্যাসীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করেন—তাহাতে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। মৃত্যুকালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন এবং অসুস্থ শরীরে কর্পোরেশনের জল-সরবরাহ বিষয়ের অভিযোগের তদন্তকার্য্যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রোগ বর্দ্ধিত হয়। জনসাধারণের কার্য্যে তাঁহার আগ্রহের ইহাও অন্যতম প্রমাণ।

পরলোকে লীলা দেবী

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী আর্য্যকুমার চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী—সার আশুতোষ চৌধুরীর পুত্রবধূ—শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের একমাত্র কন্যা লীলা দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ—নাটক প্রণয়নে বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার আলোক-চিত্র 'মাসিক বসুমতী'র চিত্র-গৌরব সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন!"

—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—মিষ্টার টমাস

শ্রাবণ, ১৩৫০

মাসিক বসুমতী

২২শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৫০ | ৪র্থ সংখ্যা

রস

১৮

ভাবপ্রকাশনে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, নাট্যবিদ্‌গণের মতে স্থায়ি-ভাব আটটি মাত্র—নয়টি নহে। কারণ, শমকে নাট্যোপযোগী স্থায়ী বলা চলে না। শমে সকল ব্যাপার (ক্রিয়া) বিলীন হইয়া যায়—এ হেতু উহার অনুভাব থাকিতে পারে না (১)। অতএব, নাট্যে উহার অভিনয় প্রদর্শন সম্ভব নহে। আর সেই কারণেই উহার বৃথা প্রয়োগে রস-পুষ্টি হয় না। তাই শারদাতনয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আটটি মাত্র স্থায়ী ভাবই নাট্যের উপযোগী (২)।

স্থায়ি-ভাবের স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে গিয়া শারদাতনয় বলিয়াছেন—উহা লবণ-মিশ্রিত জলের ন্যায়। বিশুদ্ধ জলে লবণ মিশাইলে বাহ্য-দৃষ্টিতে জলে লবণের পৃথক্ অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না—জল ও লবণ তাদাত্ম্যভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ স্থায়ি-ভাবে আগন্তুক ব্যভিচারি-ভাবগুলি আরোপিত হইলে উহাদের পৃথক্ সত্তা তখন আর লক্ষিত হয় না—স্থায়ী ও ব্যভিচারী অভিন্ন হইয়া যায় (৩)। ব্যভিচারি-ভাবগুলি স্থায়ি-ভাবের উপর সমুদ্রজলোপরি তরঙ্গের মত একবার ওঠে, একবার নামে। তরঙ্গ যেমন ক্ষণ-পরে জলেই বিলীন হয়, ব্যভিচারি-ভাবগুলিও সেইরূপ ক্ষণমধ্যে স্থায়ীতে মিলাইয়া যায়। তাহাদিগের এ আত্মপ্রকাশ ক্ষণিকের নিমিত্ত—এই কারণেই তাহাদিগকে স্থায়ী বলা চলে না ; পক্ষান্তরে, তাহাদিগের সঞ্চারী বা ব্যভিচারী নাম দিতে হয় (৪)। ইহাই হইল স্থায়ী ও ব্যভিচারীর মূলগত বিভেদ। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক—শান্ত-রসের স্থায়ি-ভাব বলিয়া যাহা সাধারণতঃ গণ্য হইতে পারে, সেই শম প্রকৃতই স্থায়িরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না। যদিও শম অন্যান্য স্থায়ি-ভাবেরই ন্যায় একটি ভাব—তথাপি উহা স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, শম এমনই একটি ভাব, যাহার সহিত নির্ব্বেদাদি অন্য কোন ব্যভিচারি-ভাবই মিশ্রিত হইয়া তাদাত্ম্যাপন্ন হইতে পারে না। আরও একটি কথা এই যে, সেই ভাবই স্থায়ী হইবার যোগ্য, যাহা রস-রূপে পরিণত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, শম রসের পরিপোষক ত নহেই—বরং বিরসতারই হেতু। অতএব, নাট্যবিদ্‌গণের মতে আটটিই স্থায়ি-ভাব (৫)।

প্রেক্ষকগণের চিত্ত-বৃত্তি কিরূপে রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে,

(১) কোন ব্যাপার বা ক্রিয়া সঙ্ঘটিত হইলে উহার কার্য্য বা ফল দৃষ্টিগোচর হয়। অনুভাব—কার্য্য। শৃঙ্গারের অনুভাব—হাস্য-কটাক্ষ প্রভৃতি। শম স্থায়ী হইলে উহাতে কোন ক্রিয়াই থাকে না। অতএব, উহার অনুভাবও প্রকাশ পাইতে পারে না।

(২) "বিলীনসর্ব্বব্যাপারঃ শমঃ স্থায়ী ভবেদ্ যতঃ। অতোঽনুভাবরাহিত্যান্ন নাট্যেঽভিনয়ো ভবেৎ। তস্মাদ্‌বৃদ্ধপ্রয়োগেণ রসপোষো ন জায়তে। ততোঽষ্টৌ স্থায়িনো ভাবা নাট্যস্যৈবোপযোগিনঃ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধি, পৃঃ ২৬

(৩) "যতঃ স্বরূপারোপেণ ভাবানন্যানুপস্থিতান্। স্বাত্মৈক্যেন গৃহ্লাতি স স্থায়ী লবণোদবৎ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ২৬

(৪) "বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ। স্থায়িন্যুন্মগ্ন-নির্মগ্না কল্লোলা ইব বারিধৌ। উন্মজ্জন্তো নিমজ্জন্তঃ কল্লোলাশ্চ যথার্ণবে। তস্যোৎকর্ষং বিতন্বন্তি যান্তি তদ্রূপতামপি। স্থায়িন্যু-ন্মগ্ননির্মগ্নাস্তথৈব ব্যভিচারিণঃ। পুষ্ণন্তি স্থায়িনঃ স্বাংশ্চ তত্র যান্তি রসাত্মতাম্। যদ্যপি সান্দ্রসাত্মত্বং তেষাং ক্বাপি কদাচন। অস্থির-ত্বাদথৈতে স্যুর্নাট্যাদ্যনুপযোগিনঃ"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ২৫-২৬

(৫) "যতঃ স্বরূপারোপেণ ভাবানন্যানুপস্থিতান্। স্বাত্মৈক্যেন গৃহ্লাতি স স্থায়ী লবণোদবৎ। ভাবসাধারণত্বেঽপি নির্ব্বেদাদ্যৈর্ন শক্যতে। স্থায়িত্বমাত্মনো নেতুমতাদ্রূপ্যস্বভাবতঃ। যত্র ক্বচিৎ স্যাত্তৎপোষো বৈরস্যায়ৈব কল্পতে। অতো নাট্যবিদামষ্টাবেবাত্র স্থায়িনো মতাঃ। প্রকৃষ্যমাণো যো ভাবো রসতাং প্রতিপদ্যতে। স এব ভাবঃ স্থায়ীতি ভরতাদিভিরুচ্যতে"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ২৬

তাহার বিস্তৃত বিবরণ শারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে তাহার পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। এই দর্শক-চিত্ত-বৃত্তি শারদাতনয়ের মতে অষ্টবিধ—নববিধ হইতে পারে না। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতে মনোবৃত্তি নব-সংখ্যক। অতএব, তন্মতে নাট্যেও শান্ত-রস বর্ত্তমান বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু নাটকাদি দৃশ্যকাব্যগুলিতে তপশ্চরণ-ক্রিয়ার অভিনয় করা প্রায় অসম্ভব। অতএব, তপশ্চর্য্যার বিবরণ-যুক্ত বাক্যার্থ বা তপস্যা-রূপ পদার্থ হইতে সহৃদয় সামাজিকগণের মনে শান্ত-রস উৎপন্ন হয় না। শম-স্থায়ি-ভাব যথাস্থান-নিবেশিত বিভাবাদি-দ্বারা যদি বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে শান্ত-রসও সম্ভব হয়—কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, শম-ভাবের কোন বিকারই না থাকায় উহা রসস্বরূপে পরিণত হইতেই পারে না। অতএব, শান্তরসের উদ্ভব সম্ভব নহে—আর সেই কারণে নাট্যরস আটটি মাত্র। ইহা পদ্মভূর মত (৬)।

তবে কি 'শান্ত'-নামক কোন রসই কখনও সম্ভূত হইতে পারে না?—ইহার উত্তরে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, রসজ্ঞ কবির শান্ত-রস-দ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে। রসোৎপত্তি-প্রকার সম্যগ্‌রূপে আলোকন, শ্রবণ ও অনুভব করিয়া—পরকে উহা দেখাইয়া শুনাইয়া ও অনুভব করাইয়া সর্ব্বপ্রকারে সম্পূর্ণকাম সন্তুষ্টচিত্ত কবি চরমে শান্ত-রসেই মুক্তি পাইয়া থাকেন (৭)।

শান্ত-রসের বিভাব-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—বিষয়ের হেয়ত্ব দর্শন ও শ্রবণ, ধর্ম্মোপাখ্যান-পুরাণাদি শ্রবণ, পুণ্যতীর্থে অবগাহন, পুণ্যাশ্রমে নিবাস, যোগিগণের সহিত নিত্যসঙ্গ, জড় (বোবা)-অন্ধ-বধির-গণের তারতম্য দর্শন, ব্যাধি-দারিদ্র্য-মরণ, নরক-যাতনা-শ্রবণ, পুণ্যক্ষয়বশতঃ স্বর্গ হইতে পতন, কুযোনিতে জন্মলাভ প্রভৃতি, ক্লেশ-প্রযত্নের বৈফল্য প্রভৃতির আলোচনা, দুঃখত্রয়-ঘাতন প্রভৃতি বিভাব হইতে শমাত্মক স্থায়ি-ভাব কাহারও কাহারও নিকট রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে (৮)।

(৬) "কেচিন্নবাত্মিকামাহুর্মনোবৃত্তিং বিচক্ষণাঃ। ততঃ শান্তো রসো নাট্যেঽপ্যস্তীতি প্রতিজানতে। নাটকাদিনিবন্ধে তু তপশ্চরণ-বস্তুনি। অভিনেতুমশক্যত্বাত্তদ্বাক্যার্থপদার্থয়োঃ। সামাজিকানাং মনসি রসঃ শান্তো ন জায়তে। শমঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্যথাস্থান-নিবেশিতৈঃ। বর্দ্ধিতশ্চেদ্রসঃ শান্তোঽপ্যস্তীত্যুদ্ভাব্যতে ক্বচিৎ। অস্য সর্ব্ববিকারাণাং শূন্যত্বাত্ রসাত্মনা। পরিণেতুং ন শক্নোতি তস্মাচ্ছান্তস্য নোদ্ভবঃ। তস্মান্নাট্যরসা অষ্টাবিতি পদ্মভুবো মতম্"।

—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ৪৭

(৭) "এবম্প্রকারাণালোক্য সমাকর্ণ্যানুভূয় চ। পরেভ্যো দর্শয়-ন্নেবং শ্রাবয়ন্ননুভাবয়ন্। সর্ব্বপ্রকারৈঃ সম্পূর্ণকামঃ সন্তুষ্টমানসঃ। প্রাপ্নোতি মুক্তিং চরমে শান্তেনৈব রসেন সঃ"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ১৩৫

(৮) "শান্তো বিষয়হেয়ত্বদর্শনশ্রবণাদিভিঃ। ধর্ম্মাখ্যান-পুরাণৈশ্চ পুণ্যতীর্থাবগাহনৈঃ। পুণ্যাশ্রমনিবাসৈশ্চ যোগিভির্নিত্য-সঙ্গমৈঃ। জড়ান্ধবধিরাদীনাং তারতম্যাবলোকনৈঃ। ব্যাধিদারিদ্র্য-মরণৈর্নারকযাতনাশ্রুতৈঃ। পুণ্যক্ষয়প্রপতনকুযোনিশ্রয়ণাদিভিঃ। ক্লেশপ্রযত্নবৈফল্যাদ্দুঃখত্রিতয়ঘাতনৈঃ। ইত্যাদিভির্বিভাবৈঃ স্যাচ্ছমাত্মা কস্যচিদ্রসঃ"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ১৩৫

শান্ত-রসাস্বাদনকারী যোগিগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন, দুঃখি-নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে যথাশক্তি পরিত্রাণ, অনুরাগ ব্যতীত সর্ব্বত্র সুখিগণের অনুমোদন, শাক-মূল-ফলাদি-দ্বারা শরীরের স্থিতি-সাধন, ব্রত-উপবাস-নিয়ম, বল্কল-অজিন-ধারণ, সর্ব্বভূতে অহিংসা, প্রাণি-নির্ব্বিশেষে অনুগ্রহ, অঙ্গের কৃশতা ও কর্কশতা, ত্রিষবণ স্নান, ঋজু ও আয়তভাবে উপবেশন, ধ্যান, নাসাগ্রে দত্ত-দৃষ্টি, ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি-নিরোধের নিমিত্ত বিষয়সমূহ হইতে নিয়মন—এইগুলি প্রায়ই শান্ত যোগিগণের বৈশিষ্ট্য (১)।

শম-স্থায়ীর প্রায় কোন অনুভাব থাকিতে পারে না। কারণ, শম মানে-অপমানে-শোকে-হর্ষে-সুখে-দুঃখে সমবৃত্তি। পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়ে সমবৃত্তিক হওয়ায় উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। যিনি শত্রু ও মিত্রে সমভাবাপন্ন, তাঁহার উহাদের একের প্রতি আকর্ষণ বা অপরের প্রতি বিরূপতা জনিত কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। তবে সাত্ত্বিক-ভাবগুলিকে অনুভাবের প্রকারভেদ বলিয়া ধরিলে বলা চলে—আনন্দাশ্রু-রোমাঞ্চ স্বেদ-স্তম্ভ—এই গুলিই শান্ত-রসের অনুভাব। অপর কেহ কেহ মনে করেন—শান্তের অনুভাব একমাত্র রোমাঞ্চ। কোন সঞ্চারি-ভাবই শান্তের উপকার সাধন করিতে পারে না। এ কারণে শান্তরসকে বিকলাঙ্গ বলা হইয়া থাকে। যখন বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হয়, অন্তঃকরণ যখন শান্তিলাভে উন্মুখ, তখন নির্ব্বেদাদি

(১) যথাশক্তি পরিত্রাণং দুঃখিনামবিশেষতঃ। বিনা রাগেণ সর্ব্বত্র সুখিনামনুমোদনম্। শাকমূলফলৈরন্যৈঃ শরীরস্থিতিসাধনম্। ব্রতোপবাসনিয়মো বল্কলাজিনধারণম্। অহিংসা সর্ব্বভূতানা-মবিশেষাদনুগ্রহঃ। অঙ্গেষু কার্শ্যং কার্কশ্যং স্নানং ত্রিষবণোচিতম্। ঋজ্বায়তাসনং ধ্যানং নাসাগ্রাহিতলোচনম্। বিষয়েভ্যো নিয়মন-মিন্দ্রিয়াণাং নিবৃত্তয়ে। ইত্যাদয়ো বিশেষাঃ স্যুঃ প্রায়ঃ শান্তেষু যোগিষু"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ১৩৫।

দুঃখি-নির্ব্বিশেষে দুঃখ-দূর করা, বিনা অনুরাগে সর্ব্বত্র সুখিগণের অনুমোদন—"মৈত্রঃ করুণ এব চ"—গীতা (১২।১৩)। ইহাতেই যোগসূত্রের মৈত্রী-করুণাদির (১।৩৩) ইঙ্গিত পাওয়া যায়—"সর্ব্ব-প্রাণিষু সুখ-সম্ভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ। দুঃখিতেষু করুণাম্"। —ব্যাসভাষ্য, যোগসূত্র (১।৩৩)। যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গ (যোগসূত্র ২।২৯)। অহিংসা-সত্য-অস্তেয় (অচৌর্য্য)-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহ = যম (যোঃ সূঃ ২।৩০)। এই গুলিই সার্ব্বভৌম ভাবে প্রযুক্ত হইলে 'মহাব্রত' নামে কথিত হয় (যোঃ সূঃ ২।৩১)। শৌচ-সন্তোষ-স্বাধ্যায়-তপস্যা-ঈশ্বর-প্রণিধান = নিয়ম (যোঃ সূঃ ২।৩২)। বল্কল (বৃক্ষত্বক্ পরিধেয়)। অজিন—কৃষ্ণসার-মৃগ-চর্ম্ম। অহিংসা যম-সাধন—যোগাঙ্গ। সবন—সোম-রস নিষ্কাশন; উহার গৌণার্থ যে সময়ে সোমরস বাহির করা হয়—প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা; ত্রিষবণ স্নান—প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে সায়ংকালে তিনবার স্নান। ঋজু আয়তভাবে উপবেশন—আসন—স্থিরসুখ আসন (যোঃ সূঃ ২।৪৬)। প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) একতানতা—ধ্যান (যোঃ সূঃ ৩।২)। নাসাগ্রে দৃষ্টি—নাসাগ্র বলিতে বুঝায় নাসারন্ধ্রের নিকটবর্ত্তী অগ্রভাগ, অথবা ভ্রূ-মধ্য; ইহাই যোগাঙ্গ 'ধারণা' (যোগসূত্র ৩।১)। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-সমূহ হইতে নিয়মন—'প্রত্যাহার' (যোঃ সূঃ ২।৫৪)।

ব্যভিচারি-ভাবেরও বাহ্ম প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। তাহা ছাড়া শান্তের অনুভাব নাই। হর্ষাদির অনুভব হয় না বলিয়াই ত শান্ত-রসকে বিকলাঙ্গ বলা হয়। 'আছে'—মাত্র এই সত্তা-রূপেই শান্ত-রস প্রতীত হইয়া থাকে—অন্য কোন ভাব ইহাতে প্রকাশিত হয় না। এ হেতু ইহার নাট্যে অভিনয়ও সম্ভব নহে। শম ইহার স্থায়ী ভাব বলিয়া ধরিলে হর্ষাদি সঞ্চারি-ভাব বা কোনরূপ অনুভাব তথায় থাকিতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শম সর্ব্বব্যাপার-বিহীন—উহাতে কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এ হেতু উহার কোন কার্য্য (effect) বাস্তবতঃ প্রকাশিত হয় না; তাই উহার অনুভাব (=কার্য্য) নাই। আর শম এমনই ভাব যে, উহাতে জলতরঙ্গের ন্যায় ক্ষণে আবির্ভূয়মান ক্ষণপরে তিরোভাবশীল কোন ব্যভিচারি-ভাবের মিশ্রণও সম্ভব নহে। অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাব না থাকায় উহার দুইটি অঙ্গ বিকল বলা চলে। কিন্তু অঙ্গবৈকল্যের বাহুল্য-সত্ত্বেও উহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কারণ, দেহিগণের পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ, তাহার প্রকৃষ্ট উপযোগী এই শম (১০)।

অতএব, মোটের উপর দাঁড়াইতেছে এই যে, শারদাতনয়ের মতে শম-স্থায়ী হইতে শান্ত-রস জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু উহা নাট্য-রস-রূপে অভিনেয় হইতে পারে না।

শারদাতনয় শান্ত-রসের দেবতা, বর্ণ, উৎপত্তির ইতিহাস প্রভৃতির বর্ণনা করেন নাই। এই স্থলেই তাঁহার শান্ত-রস-প্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশ-কার মম্মট ভট্ট ব্যভিচারি-ভাব-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া শান্ত-রসের বিষয় নিপুণ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারি-ভাবের প্রথমটিই নির্ব্বেদ। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—রস আনন্দ-স্বরূপ—কল্যাণের নিদান। তাহার পরিপোষক ব্যভিচারি-ভাবসমূহের মধ্যে প্রথমেই অমঙ্গল-বহুল নির্ব্বেদের উল্লেখ অসঙ্গত। তথাপি শাস্ত্রে প্রথমেই উহার নাম কেন? ইহার উত্তরে প্রকাশ-কার বলিয়াছেন যে, নির্ব্বেদের প্রথম উল্লেখের পর্য্যাপ্ত কারণ আছে। ইহা ব্যভিচারি-ভাবান্তর্গত হইলেও যোগ্যকালে স্থায়ীর রূপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ—নির্ব্বেদ-স্থায়ী শান্ত-রস-রূপ নবম রসও বর্ত্তমান আছে—ইহা মম্মটের মত। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি যে প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য নিম্ন-রূপ—

" সর্পে অথবা হারে, কুসুম-শয্যায় অথবা পাষাণে, মণিতে অথবা লোষ্ট্রে, প্রবল শত্রুতে অথবা মিত্রে, তৃণে অথবা স্ত্রীজনে ও পবিত্র অপবিত্রে সম-সমদৃষ্টিবিশিষ্ট আত্মার পবিত্র অরণ্যে (অর্থাৎ তপোবনে) 'শিব-শিব-শিব' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দিন যাইতেছে (১১)।

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ ঠক্কুর বলিয়াছেন—প্রকাশকারের উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ, আলঙ্কারিকগণের মত এই যে, 'শান্ত'-নামক রস অনুভব-সিদ্ধ বলিয়া উহার অপলাপ (বা অপহ্নব) করা সম্ভব নহে। কিন্তু উহার স্থায়ী 'নির্ব্বেদ'—ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। কারণ, নির্ব্বেদ বলিতে বুঝায়—বিষয়ে হেয়ত্ব-জ্ঞান, অথবা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে অবমান। পক্ষান্তরে, শান্তি (অর্থাৎ শম) হইতেছে নিখিল বিষয়ের পরিহার-জনিত কেবল শুদ্ধ আত্মার বিশ্রমানন্দের প্রাদুর্ভাব—উহাও অনুভব-সিদ্ধ। এই কারণেই

---

(১০) "মানাপমানয়োঃ শোকহর্ষয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ। সমবৃত্তিতয়া প্রায়ো নানুভাবা ভবন্তি হি। আনন্দবাষ্পরোমাঞ্চস্বেদস্তম্ভাঃ স্যুরেকদা। শান্তানুভাবো রোমাঞ্চ এক এবেতি কেবলঃ। নোপকুর্ব্বন্তি শান্তস্য ভাবাঃ সঞ্চারিণো যতঃ। তস্মাচ্ছান্তরসস্যৈবং বিকলাঙ্গত্বমুচ্যতে। নিবৃত্তে বিষয়াসঙ্গে স্বান্তে শান্তিমুপেয়ুষি। নির্ব্বেদাদেরনুদয়াদনুভাবো ন দৃশ্যতে। অতো হর্ষাদ্যনুভবরাহিত্যাদ্বিকলাঙ্গতা। অস্তীতি সত্তামাত্রেণ প্রায়ঃ শান্তো বিভাব্যতে। যতো ন ভাবোঽভিনয়ো ন শক্যো নাট্যকর্ম্মণি। শমে স্থায়িনি তত্র স্যুর্ভাবা হর্ষাদয়ঃ কথম্। অতোঽয়ং বিকলপ্রায়স্তথাপি শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। প্রকৃষ্টোপযোগিত্বাৎ পুরুষার্থস্য দেহিনাম্" ।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ১৩৫-১৩৬

(১১) "নির্ব্বেদস্যামঙ্গলপ্রায়স্য প্রথমমনুপাদেয়ত্বেঽপ্যুপাদানং ব্যভিচারিত্বেঽপি স্থায়িতাভিধানার্থম্। তেন—

নির্ব্বেদস্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ।

যথা—অহৌ বা হারে বা কুসুমশয়নে বা দৃষদি বা
মণৌ বা লোষ্ট্রে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদি বা।
তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশো যান্তি দিবসাঃ
ক্বচিৎ পুণ্যেঽরণ্যে শিব শিব শিবেতি প্রলপতঃ।

"নির্ব্বেদস্যামঙ্গলপ্রায়স্য পশ্চান্নির্দ্দেশ্যত্বেঽপি প্রাঙ্ নির্দ্দেশো মুখ্যত্ব-প্রকাশনেন স্থায়িত্বপ্রতিপাদনায়।···স্ত্রৈণং স্ত্রীসমূহঃ" ।—প্রদীপ। নাগোজী ভট্ট শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ক্বচিদমেধ্যে মেধ্যে বা। প্রয়োজনাভাবাচ্ছিবশব্দোচ্চারণস্যাপি প্রলাপরূপত্বেন তত্রাপ্যুদ্বিগ্নত্বদ্যোতনম্।···যান্তীতি পাঠে জীবন্মুক্তেন বিদ্যমানায়াঃ স্বাবস্থায়াঃ পরামর্শো বোধ্যঃ। বস্তুতো যান্তিতি পাঠোঽযুক্ত এব। তাদৃশদিনগমনে রতেঃ প্রতীয়মানত্বেন তৎপ্রধানভাবধ্বনিত্বাপত্তেঃ। অত্র ক্বচিদিত্যনেনামেধ্যে মেধ্যে বেত্যর্থকেন শান্তপরিপোষসম্ভবে পুণ্যারণ্য ইত্যধিকং প্রতিকূলং চেত্যাহুঃ। অত্র মিথ্যাত্বেন পরিভাব্যমানং জগদালম্বনম্। তপোবলাদ্যুদ্দীপনম্। অহিহারাদ্যোঃ সমদর্শনমনুভাবঃ। মতিধৃতিহর্ষাঃ সঞ্চারিণঃ" ।—উদ্দ্যোত। অর্থাৎ—শ্লোকস্থিত 'ক্বচিৎ' পদের অর্থ—অপবিত্রে বা পবিত্রে। শ্লোকস্থ 'প্রলপতঃ' শব্দের অর্থ—'শিব' শব্দের উচ্চারণেও এরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি তিনি যখন উহা উচ্চারণ করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে, উহাও তাঁহার নিকট প্রলাপ বলিয়া মনে হইতেছে ও এ কারণে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। 'যান্ত' ও 'যান্তি'—দুইটি পাঠই মূলে আছে। 'যান্তি' পাঠ ধরিলে বুঝিতে হইবে যে, জীবন্মুক্ত কোন পুরুষ নিজের জীবন্মুক্ত-দশার যথাযথ বিবরণ দিতেছেন। 'যান্ত'-পাঠটি অসঙ্গত। কারণ 'যান্ত' এই লোট্-প্রত্যয়ান্ত-পদে কোনরূপ ইচ্ছা সূচিত হয়। অতএব, এ স্থলে যখন যথোক্ত ভাবে দিন যাওয়ার প্রার্থনা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, ঐ প্রকার দিন যাইলে কোন প্রকার রতি (প্রীতি)-অনুভবের কামনাই প্রধানভাবে ধ্বনিত হয়। তাহা জীবন্মুক্তের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। 'ক্বচিৎ' অর্থে অপবিত্রে অথবা পবিত্রে এরূপ অর্থ-দ্বারা শান্ত-রসের পরিপোষ সম্ভাবিত হওয়ায় 'পুণ্যারণ্য'-পদটি অধিক ও পূর্ব্বভাবের বিরোধী। মিথ্যারূপে চিন্তনীয় জগৎ এ স্থলে আলম্বন। তপোবনাদি উদ্দীপন। অহি-হারাদিতে সমদৃষ্টি অনুভাব। মতি-ধৃতি-হর্ষাদি ব্যভিচারী।

(শাস্ত্রে) বলা হইয়াছে—'ইহলোকে যাহা কামোপভোগজনিত সুখ, আর পরলোকে যাহা দিব্য মহাসুখ,—সে সকল সুখ তৃষ্ণাক্ষয়-জনিত সুখের ষোড়শ ভাগেরও সমান হয় না।' অতএব, 'সর্ব্বচিত্ত-বৃত্তির বিরাম ইহার স্থায়ী'—এই মত নিরস্ত হইল। কারণ, সর্ব্বচিত্ত-বৃত্তির বিরাম অভাব মাত্র। অভাব ত আর স্থায়ী ভাব বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এ হেতু শমই শান্তরসের স্থায়ী। নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী মাত্র। এই শম-স্থায়ীর লক্ষণ—নিশ্চেষ্ট ও নিস্তৃষ্ণ অবস্থায় স্বাত্মবিশ্রাম-জনিত যে আনন্দ, তাহাই শম (১২)।

নাগোজী ভট্ট গোবিন্দ ঠক্কুরের এই মতের প্রতিবাদ-পূর্ব্বক প্রকাশকারের মত সমর্থন ও ভরত-মতের সহিত তাঁহার অবিরোধ প্রতিপাদিত করিয়াছেন। কারণ, মহর্ষির মতে শমই স্থায়ী—নির্ব্বেদ নহে। গোবিন্দ ঠক্কুর বলিয়াছেন—বিষয়ে হেয়ত্ব বোধই 'নির্ব্বেদ'। 'বিষয়' এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা তদতিরিক্ত বাহ্য বিষয়। নির্ব্বেদের অপর লক্ষণ আত্মাবমাননা। ইহার অর্থ দেহাদি উপাধি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে তুচ্ছত্ব জ্ঞান। ইহা হইতে বোধ হয় যে, নির্ব্বেদ সুখরূপ নহে—এ কারণে উহা স্থায়ী হইতে পারে না। নাগোজী ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—করুণ-রসের স্থায়ী শোকও ত সুখরূপ নহে, তবে উহা স্থায়ী হয় কিরূপে? অতএব, প্রদীপকারের এই সমাধান গ্রাহ্য নহে। বস্তুতঃ, রতি-স্থায়ীকে অবলম্বন করিয়াই হর্ষাদির যেরূপ প্রবর্ত্তন হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান-জনিত নির্ব্বেদকে আশ্রয় করিয়াই শমাদির প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়; অতএব শম স্থায়ী নহে—স্থায়ী উহার আশ্রয়ভূত নির্ব্বেদ (১৩)।

এই প্রসঙ্গে ইহা বক্তব্য এই যে, নাগোজীর এই উক্তি-দ্বারা কাব্যপ্রকাশের উক্তির সমর্থন ও গোবিন্দ ঠক্কুরের উক্তির খণ্ডন আপাততঃ যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও সর্ব্বাংশে উহার সমর্থন করা যায় না। কারণ, স্বয়ং মহর্ষি ভরত ও আচার্য্য অভিনব গুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শান্ত-রসে শম বা তত্ত্বজ্ঞানই স্থায়ী—নির্ব্বেদ নহে। তবে নির্ব্বেদ যদি তত্ত্বজ্ঞানোত্থিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে উহা শমেরই নামান্তর—ইহাও পূর্ব্বপ্রবন্ধে (আষাঢ়, ১৩৫০, পৃঃ ২৪৮) বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও উহা আলোচিত হইবে। তত্ত্বজ্ঞানজ নির্ব্বেদ—বৈরাগ্যের চরম—জ্ঞানেরও পরাকাষ্ঠা—উহাই আত্মস্বরূপ—মুনির মতে উহাই শম।—ইহা অভিনবের সিদ্ধান্ত। ইহার উপর আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা চলে না। এ কারণে—তত্ত্বজ্ঞানোত্থিত নির্ব্বেদ ও শমে কোন ভেদ করা যায় না। ইষ্টবিয়োগ অনিষ্টপ্রাপ্তি-জনিত নির্ব্বেদের সহিত সে প্রভেদ দেখান যাইতে পারে। ইহা নাগোজীও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞান-জনিত নির্ব্বেদ—বিষয়ে বিদ্বেষ—উহাই স্থায়ী হইয়া থাকে। আর ইষ্টবিয়োগ বা অনিষ্টপ্রাপ্তি জনিত নির্ব্বেদকে শুধু ব্যভিচারী বলা যায়—"স্থায়ী স্যাদ্ বিষয়ে দ্বেষস্তত্ত্বজ্ঞানাত্তবেদ্ যদি। ইষ্টানিষ্টবিয়োগাপ্তিকৃতস্তু ব্যভিচার্য্যসৌ"। ইহা নিজমুখে স্বীকারের পরও নাগোজী যে কেন তত্ত্বজ্ঞানোৎপন্ন নির্ব্বেদ ও শমের মধ্যে পার্থক্য দেখাইলেন, তাহা বুঝা গেল না। সম্ভবতঃ জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের প্রভাব।

নাগোজী প্রকাশকারকে সমর্থন করিতে যাইয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই সিদ্ধান্ত মহর্ষি ভরতের সিদ্ধান্ত-বিরোধী বলিয়া হেয় হইতে পারে। কারণ, মহর্ষির মতে—'শান্ত-রস—শমস্থায়িভাবাত্মক মোক্ষপ্রবর্ত্তক' (১৪)। তাই নাগোজী বলিতেছেন—তাঁহার সিদ্ধান্তে কোনরূপেই মুনির উক্তি-বিরোধ আশঙ্কা করা উচিত হইবে না। কারণ মুনি (ভরত) যে শমকে স্থায়ী বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—যাহা হইতে শম লাভ হয়, অর্থাৎ—'নির্ব্বেদ'। 'তৃষ্ণাক্ষয়' পদের অর্থ—তৃষ্ণার ক্ষয় হয় যাহা হইতে অর্থাৎ—নির্ব্বেদই। অতএব, মুনি যে বলিয়াছেন—মোট ভাবের সংখ্যা উনপঞ্চাশ—মুনির সে উক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষিত করিয়াই এ সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। আটটি স্থায়ি-ভাব, আটটি সাত্ত্বিক, তেত্রিশটি ব্যভিচারি-ভাব—মোট উনপঞ্চাশ ভাব। পক্ষান্তরে, শমকে অতিরিক্ত নবম ভাব বলিয়া ধরিলে একটি অধিক হইয়া মোট পঞ্চাশটি ভাব দাঁড়ায়। উহাই বরং মুনির সিদ্ধান্ত-বিরোধী। (১৫)

আপাত-দৃষ্টিতে নাগোজীর উক্তি নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হইলেও উহা নির্ব্বিচারে মাথা পাতিয়া লওয়া সম্ভব নহে। মহর্ষি ভরত ত অতি সুস্পষ্ট ভাষায় শমকেই স্থায়ী বলিয়াছেন। আর তাহার ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে অভিনব গুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন—মোক্ষ-নামক পরম পুরুষার্থের উপযোগিনী চিত্তবৃত্তিই স্থায়ী। কেহ কেহ উহার নাম দেন—'নির্ব্বেদ'। এ নির্ব্বেদ অবশ্য দারিদ্র্যাদি-জনিত নহে—পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানোৎপন্ন। এ নিমিত্ত উভয় 'নির্ব্বেদ' বিভিন্নরূপ—যেহেতু, উভয়ের কারণ ভিন্ন—একের—দারিদ্র্যাদি, অপরের—তত্ত্বজ্ঞান। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে বহু বিচারের পর অভিনব বলিয়াছেন—

---

(১২) "শান্তো নাম রসস্তাবদনুভবসিদ্ধতয়া দুরপহ্নবঃ। ন চৈতস্য স্থায়ী নির্ব্বেদো যুজ্যতে। তস্য বিষয়েঽলংপ্রত্যয়রূপত্বাদাত্মাবমানরূপত্বাদ্বা। শান্তশ্চ নিখিলবিষয় পরিহারজনিতাত্মমাত্রবিশ্রমানন্দপ্রাদুর্ভাবময়ত্বানুভবাৎ।" তদুক্তম্—'যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্।' ইত্যাদি। অতএব 'সর্ব্বচিত্তবৃত্তিবিরামোঽস্য স্থায়ী' ইতি নিরস্তম্। অভাবস্য স্থায়িত্বাযোগাৎ। তস্মাচ্ছমোঽস্য স্থায়ী। নির্ব্বেদাদয়স্তু ব্যভিচারিণঃ। স চ—'শমো নিরীহাবস্থায়ামানন্দঃ স্বাত্মবিশ্রমাৎ'। ইতি।—প্রদীপ।

(১৩) "বিষয়েষ্বিতি। স্বস্মিন্ স্বাতিরিক্তে চ। অলংপ্রত্যয়ঃ। হেয়ত্বপ্রত্যয়ঃ। আত্মাবমাননম্। দেহাদ্যবচ্ছিন্ন আত্মনি তুচ্ছত্ব-বুদ্ধিঃ। তথা চ সুখরূপত্বাভাবান্ন তৎস্থায়িকস্য রসত্বমিতি ভাবঃ। শোকবৎ সমাধানমিদং চিন্ত্যম্।···বস্তুতো রত্যাদিমুপজীব্য হর্ষাদিরিব তত্ত্বজ্ঞানজনির্ব্বেদমুপজীব্য শমাদিপ্রবৃত্তেঃ স এব স্থায়ী ন শমঃ"। —উদ্দ্যোত।

(১৪) "শান্তো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকো মোক্ষপ্রবর্ত্তকঃ"—নাঃ শাঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৩৩৩, বরোদা সং।

(১৫) "ন চ রুচিচ্ছম ইতি মুন্যুক্তিবিরোধঃ। শম্যতে যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তস্য নির্ব্বেদপরত্বাৎ। তৃষ্ণায়াঃ ক্ষয়ো যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তৃষ্ণাক্ষয়োঽপি নির্ব্বেদ এব। অতএবৈকোনপঞ্চাশদ্ভাবা ইতি মুন্যুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। অষ্টৌ স্থায়িনোঽষ্টৌ সাত্ত্বিকাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ব্যভিচারিণ ইত্যেবং গণনয়া হি তত্ত্বম্। শমস্যাপি ভাবত্বে ত্বাধিক্যাপত্তিরিতাহুঃ"। —উদ্দ্যোত।

তত্ত্বজ্ঞান হইতে নির্ব্বেদ জন্মে না, পরন্তু, নির্ব্বেদ হইতেই তত্ত্বজ্ঞান, আর তত্ত্বজ্ঞান হইতেই মোক্ষ (১৬)। বৈরাগ্য হইতে মোক্ষ হয় না—হয় প্রকৃতিলয় (১৭)। অতএব, বৈরাগ্য বা নির্ব্বেদকে স্থায়ী বলা চলে না।

যদি কেহ বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞানিগণেরই দৃঢ় বৈরাগ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান-জনিত বৈরাগ্য (—নির্ব্বেদ) স্বীকারে বাধা কি? ইহার উত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন,—ভগবান্ পতঞ্জলির মতে তাদৃশ পরবৈরাগ্যই ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। অতএব, দাঁড়াইতেছে যে—তত্ত্বজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর। গোড়ার দিকের স্তরগুলির পরিপোষক শেষের দিকের স্তরগুলি। সর্ব্বশেষ স্তর পরবৈরাগ্য—উহাই পরম জ্ঞান। এ সিদ্ধান্তেও নির্ব্বেদ স্থায়ী হইতে পারে না। পরন্তু, তত্ত্বজ্ঞানই স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায় (১৮)।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভগবান্ অক্ষপাদ মিথ্যাজ্ঞান-নাশের কারণ-ভূত তত্ত্বজ্ঞানকেই ত বৈরাগ্যেরও কারণ বলিয়াছেন। তাহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, বস্তুতঃ বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ এক নহে—ভিন্ন। নির্ব্বেদ হইতেছে শোক-প্রবাহের প্রসরণ-কারিণী চিত্তবৃত্তি-বিশেষ, আর বৈরাগ্য রাগাদির প্রধ্বংস। আর যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ অভিন্ন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যেহেতু, উহার যে কারণ তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে মোক্ষের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—মধ্যবর্ত্তী বৈরাগ্য মোক্ষ-কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। আরও এক কথা—তত্ত্বজ্ঞান হইতে যে নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্যের উৎপত্তি, সে পরম বৈরাগ্যও শমেরই নামান্তর মাত্র। অতএব, সাধারণতঃ যে অর্থে 'নির্ব্বেদ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই অর্থ ধরিলে নির্ব্বেদ শান্ত-রসের স্থায়ি-ভাব হইতে পারে না (১৯)।

এ সম্বন্ধে অভিনব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—যেহেতু, তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষ-সাধন, অতএব উহাকেই শান্ত-রস-স্বরূপ মোক্ষের স্থায়ি-ভাব বলা উচিত। তত্ত্বজ্ঞান বলিতে বুঝায় আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়-দ্বারা লভ্য—উহা বিষয়-জ্ঞানের তুল্য নহে—উহা আত্মার স্বরূপভূত জ্ঞান। অর্থাৎ—উপনিষদের সিদ্ধান্তে আত্মাই আত্মজ্ঞান। অতএব, একমাত্র আত্মাই শান্ত-রস-স্বরূপ মোক্ষে স্থায়ী। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে স্থায়িরূপে ইহা বর্ণিত হয় নাই কেন? ইহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—রতি প্রভৃতি ভাব নিত্য স্থায়ী নহে—পরন্তু, উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া আপেক্ষিক-রূপে স্থায়ী। নিত্য স্থায়ী আত্মাকে ভিত্তিরূপে আশ্রয় করিয়া ইহারাও কিছু কালের নিমিত্ত স্থায়ি-রূপে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ, অধিষ্ঠানভূত আত্মার স্থায়িত্ব-নিবন্ধনই ইহাদিগের স্থায়িত্ব—অন্যথা ইহাদিগের স্বতন্ত্র স্থায়িত্ব নাই। পক্ষান্তরে, রতি প্রভৃতি অপর সকল ভাবের অধিষ্ঠান (=আশ্রয় বা ভিত্তি)-স্থানীয় যে তত্ত্বজ্ঞান, (=আত্মজ্ঞান=আত্মা) তাহা সকল স্থায়িভাবের মধ্যে স্থায়িতম—স্বভাবতঃ স্বতঃসিদ্ধ স্থায়ী। একারণে উহার আর পৃথগ্ গণনা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব, মহর্ষি-প্রোক্ত উনপঞ্চাশ ভাবের আধিক্যসম্ভাবনায় মুনির উক্তি-বিরোধ আশঙ্কনীয় নহে (২০)।

এই আত্মস্বভাব বা আত্মস্বরূপ নিত্য-স্থায়ী—ইহা কখনও ব্যভিচারী হইতে পারে না; যেহেতু, ইহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব নহে—ইহা নিত্যই একরূপ। এইরূপ সমাত্মভাবকেই

---

(১৬) "······মোক্ষাভিধানপরমপুরুষার্থোচিতা চিত্তবৃত্তিঃ কিমিতি রসত্বং নানীয়ত ইতি বক্তব্যম্। যা চাসৌ তথাভূতা চিত্তবৃত্তিঃ সৈবাত্র স্থায়িভাবঃ। এতত্তু চিন্ত্যম্—কিং নামাসৌ? তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতো নির্ব্বেদ ইতি কেচিৎ। তথাহি দারিদ্র্যাদিপ্রভবো যো নির্ব্বেদ-স্ততোঽন্য এব, হেতোস্তত্ত্বজ্ঞানস্য বৈলক্ষণ্যাৎ। ·········বিরক্তো হি তথা প্রযততে যথাস্য তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে। তত্ত্বজ্ঞানাদ্ধি মোক্ষো, ন তু তত্ত্বং জ্ঞাত্বা নির্ব্বিদ্যতে নির্ব্বেদাচ্চ মোক্ষ ইতি············"।—অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৩৪—৩৫।

(১৭) "বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ (সাংখ্যকারিকা ৪৭) ইতি হি তত্রভবন্তঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৫।

(১৮) "নন্থ তত্ত্বজ্ঞানিনঃ সর্ব্বত্র দৃঢ়তরং বৈরাগ্যং দৃষ্টম্। তত্র ভগবদ্ভিরপ্যুক্তং—"তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্য"মিতি (যোগসূত্র ১।১৬)। ভবত্বেবং, "তাদৃশং তু বৈরাগ্যং জ্ঞানস্যৈব পরা কাষ্ঠে"তি ভুজঙ্গবিভুনৈব ভগবতাভ্যধায়ি। ততশ্চ তত্ত্বজ্ঞানমেবেদং তত্ত্বজ্ঞান-মালয়া পরিপোষ্যমাণমিতি ন নির্ব্বেদঃ স্থায়ী, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানমেব স্থায়ীতি ভবেৎ"।—অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৩৫। এ মতে অভিনব নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য একই বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

(১৯) "নন্থ মিথ্যাজ্ঞানমূলো বিষয়গন্ধস্তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রশাম্যতীতি দুঃখজন্মসূত্রেণাক্ষপাদৈর্ভগবদ্ভির্মিথ্যাজ্ঞানাপচয়কারণত্বজ্ঞানং বৈরাগ্যস্য দোষাপায়লক্ষণস্য কারণমুক্তম্। নন্থ ততঃ কিম্? নন্থ বৈরাগ্যং নির্ব্বেদঃ। ক এবমাহ? নির্ব্বেদো হি নাম শোকপ্রবাহপ্রসরণরূপ-শ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ। বৈরাগ্যং তু রাগাদীনাং প্রধ্বংসঃ। ভবতু বা বৈরাগ্যমেব নির্ব্বেদস্তথাপি তস্য স্বকারণবশামধ্যভাবিনোঽপি ন মোক্ষে সাধ্যে সূত্রস্থানীয়তা···। কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতো নির্ব্বেদ ইতি শমস্যৈবেদং নির্ব্বেদনাম কৃতং স্যাৎ···তস্মান্ন নির্ব্বেদঃ স্থায়ীতি"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৬

এস্থলে তিনটি কথা আছে। প্রথমতঃ, মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্র-মতে (১।১।২—"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি"······) তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান-নাশের কারণ—বৈরাগ্যেরও কারণ। অভিনব বলিতেছেন—এ বৈরাগ্য আর নির্ব্বেদ এক নহে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ধরিয়া লইলেন যে, নির্ব্বেদ বৈরাগ্য একই। তৎসত্ত্বেও শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, নির্ব্বেদ নহে। ইহা সত্য যে, তত্ত্বজ্ঞান হইতে নির্ব্বেদ জন্মে। এ কারণে নির্ব্বেদেরই মোক্ষ-কারণ হওয়া উচিত। কিন্তু শাস্ত্রে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। নির্ব্বেদের কারণ তত্ত্ব-জ্ঞানকেই মোক্ষ-কারণ বলা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান-জনিত যে নির্ব্বেদ তাহারই নামান্তর শম—উহা তত্ত্ব-জ্ঞানেরই পরিপূর্ণ অবস্থাভেদ মাত্র।

(২০) "ইহ তত্ত্বজ্ঞানমেব তাবন্মোক্ষসাধনমিতি তস্যৈব মোক্ষে স্থায়িতা যুক্তা। তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ নামাত্মজ্ঞানমেব।···তেনাত্মৈব···স্থায়ী। ···রত্যাদয়ো হি তত্তৎকারণান্তরোদয়প্রলয়োৎপদ্যমাননিরুধ্যমানবৃত্তয়ঃ কঞ্চিৎকালমাপেক্ষিকতয়া স্থায়িরূপাত্মভিত্তিসংশ্রয়াঃ স্থায়িন ইত্যুচ্যন্তে। তত্ত্বজ্ঞানন্তু সকলভাবান্তরভিত্তিস্থানীয়ং সর্ব্বস্থায়িভ্যঃ স্থায়িতমং··· নিসর্গত এব সিদ্ধস্থায়িভাবমিতি···অতএব পৃথগস্য গণনা ন যুক্তা।··· তেনৈকোনপঞ্চাশদ্ভাবা [illegible]

মুনি 'শম'-শব্দ-দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে ইহাকে 'শম'-শব্দ-দ্বারা নির্দেশ করা যাউক, অথবা 'নির্ব্বেদ'-শব্দ-দ্বারাই ইহার উল্লেখ করা হউক,—ইহা যে সাধারণ একটি ভাবমাত্র নহে—শম-রূপ চিত্তবৃত্তি বা দারিদ্র্যাদি-জনিত নির্ব্বেদের তুল্য নহে—ইহা বুঝিতে হইবে। ইহা আত্মস্বরূপ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান—ইহাই শমতা। ইহাই আচার্য্য অভিনব গুপ্তের অভিমত (২১)।

বলা বাহুল্য এই যে, কাব্যপ্রকাশ-কার প্রথমে নাট্যে অষ্টরস বলিয়া উপক্রম-পূর্ব্বক উপসংহারে শান্তও নবম রস—এইরূপ কথা বলিয়াছেন। গোবিন্দ ঠক্কুর এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—শান্ত-রসে রোমাঞ্চাদির অভাব-বশতঃ উহা অভিনয়-যোগ্য বলিয়া গণ্য হয় না—উহা কেবল কাব্যের বিষয়ীভূত। তাই নাট্যে অষ্টরস এই কথা মূলে উল্লিখিত হইয়াছে। অথবা, এরূপও বুঝা যাইতে পারে যে—নাট্যে অষ্টরস প্রতিপাদিত হইল, কাব্যেও এই আটটিই রস (২২)।

নাগোজী ইহার উপর উদ্দ্যোতে বলিয়াছেন—শান্ত-রস সর্ব্ববিষয় হইতে উপরম-স্বরূপ বলিয়া উহার অভিনয় সম্ভব হয় না। এই কারণে প্রাচীনগণ অষ্ট নাট্য-রস বলিয়াছেন। অথবা প্রাচীনগণের কথা ছাড়িয়া নবীনগণের সিদ্ধান্ত ধরা যাউক। এ পক্ষের মতানুসারে—উপসংহারে যে বলা হইয়াছে—'শান্তও নবম রস'—ইহা নাট্য-কাব্য-সাধারণ (২৩)। কারণ, বহু ব্যক্তি উহার অভিনয়-যোগ্যতাও স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব, প্রকাশকারের মতে শান্ত নবম রস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তবে তাহা নাট্য-রস হইতে পারে কি না—এ বিষয়ে তিনি দুইটি বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

এ প্রসঙ্গে অন্যান্য আলঙ্কারিকগণের মতও সংক্ষেপে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

---

(২১) "ন চাস্যাত্মস্বভাবস্য ব্যভিচারিত্বাসম্ভবাদবৈচিত্র্যাবহত্বা-নৌচিত্যাচ্চ। সমাত্মস্বরূপস্য দম (শম ?)-শব্দেন মুনির্ব্যপদিষ্টঃ (?) যদি তু স এব শমশব্দেন ব্যপদিশ্যতে নির্ব্বেদ-শব্দেন বা তন্ন কশ্চিদ্ভাব এব কেবলং শমশ্চিত্তবৃত্ত্যন্তং, নির্ব্বেদোঽপি দারিদ্র্যাদি-বিভাবান্তরোত্থিতনির্ব্বেদতুল্যজাতীয়ো ন ভবতি।···তদিদমাত্মস্বরূপ-মেব তত্ত্বজ্ঞানং শমতা চ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮

(২২) কাব্যপ্রকাশের ৪।২৯ কারিকায় বলা হইয়াছে··· "অষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।" উহার উপর গোবিন্দ বলিতেছেন—"শান্তস্য রোমাঞ্চাদিবিরহেণানভিনেয়ত্বাৎ কাব্যমাত্রগোচরত্বমিত্যভি-ধানান্নাট্য ইত্যুক্তম্। যদ্বা নাট্যে তাবদষ্টৌ রসাঃ প্রতিপাদিতাঃ। অতঃ কাব্যেঽপি তাবন্ত এব"।—প্রদীপ।

(২৩) "অনভিনেয়ত্বাদিতি। সর্ব্ববিষয়োপরমস্বরূপত্বাত্তস্যেতি ভাবঃ। গীতবাদ্যাদেস্তদ্বিরোধিত্বাচ্চেত্যপি বোধ্যম্।···অভিধানাদিতি পাঠে বৃদ্ধৈরিতি শেষঃ। যদ্বেতি। অত্র পক্ষে শান্তোঽপি নবমো রস ইত্যেতদ্বক্ষ্যমাণং নাট্যকাব্যসাধারণম্। তস্যাপ্যভিনেয়ত্বস্য বহুভিরঙ্গীকারাদিতি ভাবঃ। গীতাদিকমপি তদ্বিষয়ং ন তদ্বিরো-ধীত্যাহুঃ"—উদ্দ্যোত।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

সাঁতার-ব্যায়াম

যাঁরা রীতিমত সাঁতার কাটেন, তাঁদের দেহ যেমন রমণীয় ছাঁদে গড়িয়া ওঠে, সে-ছাঁদ তেমনি সহজে ভাঙ্গিতে-চুরিতে জানে না! সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও থাকে অটুট। তবে সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিলেই কুফল ফলে—'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্'। সাঁতার কাটিব বলিয়া যদি চব্বিশ ঘণ্টা জলে পড়িয়া মাতন তুলি, তাহা হইলে দেহের সুকুমার ছাঁদ রক্ষা করা যেমন কঠিন হয়, স্বাস্থ্য-হানিরও তাহাতে তেমনি আশঙ্কা!

পল্লীর খিড়কি-পুকুরে বহু মহিলা আজো হয়তো স্নানের সময় একটু-আধটু সাঁতার-চর্চ্চা করেন। তবে সেখানেও যে সাঁতারে তাঁরা সুনিয়ম রক্ষা করিতে পারেন, এমন মনে হয় না। সাঁতারে স্বাস্থ্য ভালো থাকে—দেহের ছাঁদ সুকুমার থাকে। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে নদীতে বা পুকুরে সাঁতার-চর্চ্চায় বহু বিঘ্ন; এবং সে-বিঘ্ন হয়তো নানা কারণে বিদূরিত করা সম্ভব নয়।

সাঁতারের রীতিতে অনায়াসে ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতে পারেন। এ ব্যায়ামে দেহ যেমন সুশ্রী সুকুমার ছাঁদে গড়িবে, দেহের সে ছাঁদ যেমন অটুট্ থাকিবে, তেমনি স্বাস্থ্যও থাকিবে অক্ষুণ্ণ; সর্দ্দিকাশি অজীর্ণতার বালাই ঘটিবে না; মন থাকিবে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল; এবং মেয়ে-জন্মের সব চেয়ে যে বড় দায়, সন্তান-প্রসব—সে-সময় কোনোরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বা বিপর্য্যয় ঘটিবার ভয় থাকিবে না। প্রসবান্তে বহু নারীর দেহ যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যে নানা উপসর্গ দেখা দেয়, সে-সব হইতেও নিস্তার পাইবেন,—এ আশা খুব বেশী বলিয়াই বিশেষজ্ঞেরা রায় দিতেছেন।

আজ সেই সাঁতার-ব্যায়ামের কথা বলিতেছি।

১। প্রথমে ১ নং ছবির ভঙ্গীতে দু'পা একসঙ্গে সংলগ্ন করিয়া সিধা দাঁড়ান—দুই হাত দু'দিকে ঝুলানো থাকিবে। তার পর সবেগে দু'হাত তুলুন উর্দ্ধে; তুলিয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ পর্য্যন্ত গুণিবেন। গোণা শেষ হইবামাত্র সবেগে দু'হাত একসঙ্গে নামাইবেন। হাত নামাইয়া আবার গুণিবেন ১, ২, ৩, ৪, ৫। তার পর আবার

হইবে এবং নামাইবার সময় শ্বাস ত্যাগ করিবেন। এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

১। দু'পা একসঙ্গে সিধা দাঁড়ান

২। সাঁতারে জল কাটিবার ভঙ্গীতে

৩। টেবিলের উপর

২। ছোট একটি জলচৌকির উপর একটি বালিশ রাখুন। রাখিয়া ২ নং ছবির ভঙ্গীতে বালিশের উপর পেটের ভর দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ুন—দুই হাত এবং দুই পা থাকিবে চৌকির বাহিরে প্রসারিত। সাঁতারে জল কাটিবার ভঙ্গীতে এবার ডান হাত সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া ঘুরান। এ সময় মুখ ফিরাইবেন বাঁ দিকে এবং বাঁ হাত থাকিবে ট্যারচা ভাবে বাঁ-দিককার জঘনদেশে। তার পর ডান হাত টানিয়া রাখুন ডান দিকে জঘনদেশের উপর—শোয়ানো ভাবে; বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া দিবেন—সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইবেন ডান দিকে—ঠিক ঐ ২ নং ছবির অনুরূপ ভঙ্গীতে। এই সঙ্গে ডান হাত সিধা প্রসারিত করিবার সময় ডান পা উপর দিকে তোলা চাই; বাঁ পা নীচের দিকে নামান, আবার বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া দিবার সময় বাঁ পা তুলিবেন এবং ডান পা নামাইবেন। ডান ও বাঁ হাত প্রসারিত করা—সেই সঙ্গে দুই পা তোলা-নামা করা এবং মুখ ডাহিনে-বাঁয়ে ফিরানো—ইহাতে এতটুকু বিরতি না দিয়া ক্রমান্বয়ে করা চাই অন্ততঃপক্ষে বিশ-পঁচিশ বার। সাঁতার কাটিবার সময় মানুষ যেমন করিয়া হাত-পা ছোড়ে, ঘাড় নাড়ে, তেমনি করিয়া ডাহিনে-বাঁয়ে হাত-পা ছোড়া প্রভৃতি সাঁতার-রীতির অনুকরণে এ ব্যায়াম-রীতির প্রবর্তন।

৩। এবারে চাই একটি উঁচু টেবিল কিম্বা খাট অথবা তক্তাপোষ। টেবিল বা তক্তাপোষের উপর ছোট তোষক বা বালিশ রাখিবেন—নহিলে কঠিন কাঠের স্পর্শে গায়ে বেদনা বোধ করিবেন। টেবিল বা তক্তাপোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন। এমন ভাবে শুইবেন, দু'পা যেন কোনো অবলম্বন না পায়; ঝুলন্ত ভাবে থাকিবে (৩ নং ছবি দেখুন)। এবার ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত কাঁধের সঙ্গে সরাসরি আনিয়া মুড়ুন—দুই কর-পল্লব আসিবে কাঁধের উপর। পরক্ষণে দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত করিয়া দিন উরুর উপর পর্য্যন্ত, সঙ্গে সঙ্গে দু'পা হাঁটুর কাছে দুমড়াইয়া গোড়ালি দু'টি আনুন টেবিল বা খাট-তক্তাপোষের দিকে। দুই হাঁটু এ সময় সংলগ্ন না রাখিয়া বিযুক্ত করিয়া দিবেন। তার পর আবার দুই হাত তুলিয়া কাঁধের সঙ্গে সরাসরি ভাবে রাখা। এ ব্যায়াম বিরাম-বিহীন ভাবে করা চাই পাঁচ-সাত মিনিট। এ ব্যায়ামে সর্ব্বাঙ্গে যে ঝাঁকানি লাগিবে, তার ফলে মেদ ঝরিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিটোল সুকুমার ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে।

৪। এবার টেবিল বা খাট-তক্তাপোষের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া দুই হাত ৪ নং ছবির মতো মুড়িয়া দু'পা হাঁটুর কাছ হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া একবার দু'পা ফাঁক করিবেন, পরক্ষণে আবার দু'পা সংলগ্ন করিবেন। দু'পা ফাঁক করা এবং পুনরায় সংলগ্ন করা—এ কাজ করিতে হইবে বেশ দ্রুত তালে। দু'পা সংলগ্ন করিবামাত্র সংলগ্ন দু'পা নিজের দিকে সবেগে আকর্ষণ করিবেন। তার পর এমনি সংলগ্ন ভাবেই নিজের দিক্ হইতে ঠেলিয়া দু'পা ফাঁক করিয়া যতখানি সম্ভব পরস্পরের কাছ হইতে অপসারণ। এ ব্যায়াম ক্রমান্বয়ে বিরতিহীন ভাবে করা চাই অন্ততঃ ছ'-সাত মিনিট।

৫। এবার সিধা খাড়া দাঁড়ান; দু' পায়ের হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠেকিয়া থাকিবে। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করুন (৫ নং ছবির ভঙ্গীতে)। প্রসারিত করিয়া দুই হাত দু'দিকে জোরে-জোরে চক্রাকারে

৪। এবার উপুড় হইয়া

ঘুরান ; সামনে-পিছনে ঘন-ঘন এবং দ্রুততালে ঘুরান। এ ব্যায়ামে সর্ব্বাঙ্গে দোলন লাগিবে। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট।

৫। দু' হাত দু'দিকে প্রসারিত

৬। এবার ৬ নং ছবির ভঙ্গীতে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দুই পা পরস্পর সংলগ্ন রাখিয়া দুই হাত উর্দ্ধে তুলুন—এমনি ছবির অনুরূপ ভাবে। এমনি ভাবে অবস্থান করিয়া দু'হাত দু'দিকে বেশ জোরে জোরে—যেন জল কাটিতেছেন,—এমনি ভঙ্গীতে তোলা-নামা করুন। হাত যখন তুলিবেন তখন নিশ্বাস লইবেন ; হাত নামাইবার সময় শ্বাস ত্যাগ করিবেন। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট।

৭। এবার ৭ নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান—দেহকে সামনের

৬। সামনে ঈষৎ ঝুঁকিয়া

দিকে অনেকখানি ঝুঁকাইয়া দিয়া ; তার পর সাঁতারের ভঙ্গীতে ডান হাত সামনের দিকে প্রসারণ, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত পিছন দিকে এবং

৭। ডান হাত সামনের দিকে

মুখ বাঁ দিকে ফিরানো ; পরক্ষণে মুখ ডান দিকে ফিরাইয়া বাঁ হাত সামনের দিকে, ডান হাত পিছন দিকে প্রসারিত করা। এ ব্যায়ামও দ্রুততালে বিরতিহীন ভাবে করা চাই পাঁচ মিনিট।

এ কয়টি ব্যায়াম যদি নিত্য পালন করেন, তাহা হইলে দেহের সুকুমার শ্রী-ছাঁদ, সঙ্গে সঙ্গে তারুণ্য কোনো দিন লোপ পাইবে না—স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে। মেদ জমিয়া যাঁদের দেহ কদর্য্য পিণ্ড হইয়া গিয়াছে, এ ব্যায়ামে মেদ-পিণ্ডত্ব-বর্জ্জিত হইয়া তাঁদের দেহও সুকুমার হইবে এবং সেই সঙ্গে বহু অস্বাস্থ্যের অবসান ঘটিবে।

ফিল্মে চলন্ত ট্রেণের ছবি

একরাশ টুক্‌রা ছবি জোড়াতালি দিয়া ফাঁকির কারসাজি নয়, ক্যামেরার দিকে মুখ করিয়া ট্রেণ আসিতেছে লাইনের উপর দিয়া—তার ছবি আমেরিকার ফিল্ম-শিল্পীরা আজ অপরূপ কৌশলে তুলিতেছেন। কৌশলের কথা বলি। যে-লাইনে ট্রেণ আসিতেছে, সেই লাইনের
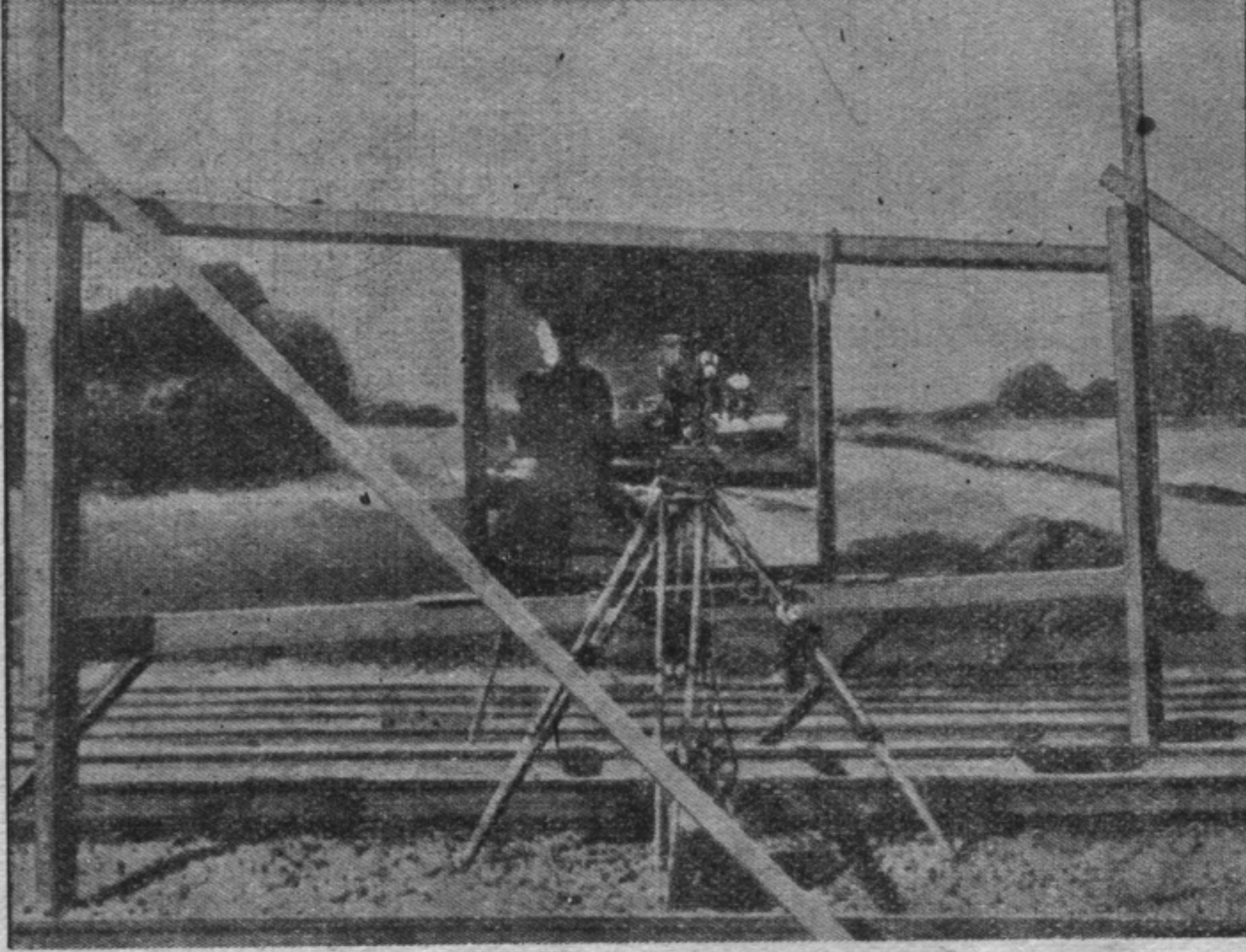
সামনা-সামনি চলন্ত ট্রেণের ছবি তোলা

পাশে ক্যামেরা রাখা হয়। ক্যামেরার পাশে থাকে একখানি কাঠের ফ্রেম—লাইনের এদিক্ হইতে ওদিক্ পর্য্যন্ত উঁচু করিয়া এ ফ্রেম খাটানো হয়। এবং এই ফ্রেমের মাঝামাঝি উপর-দিকে একখানা আয়না ঝুলানো থাকে। আয়নাখানি থাকে দু'দিককার লাইনের
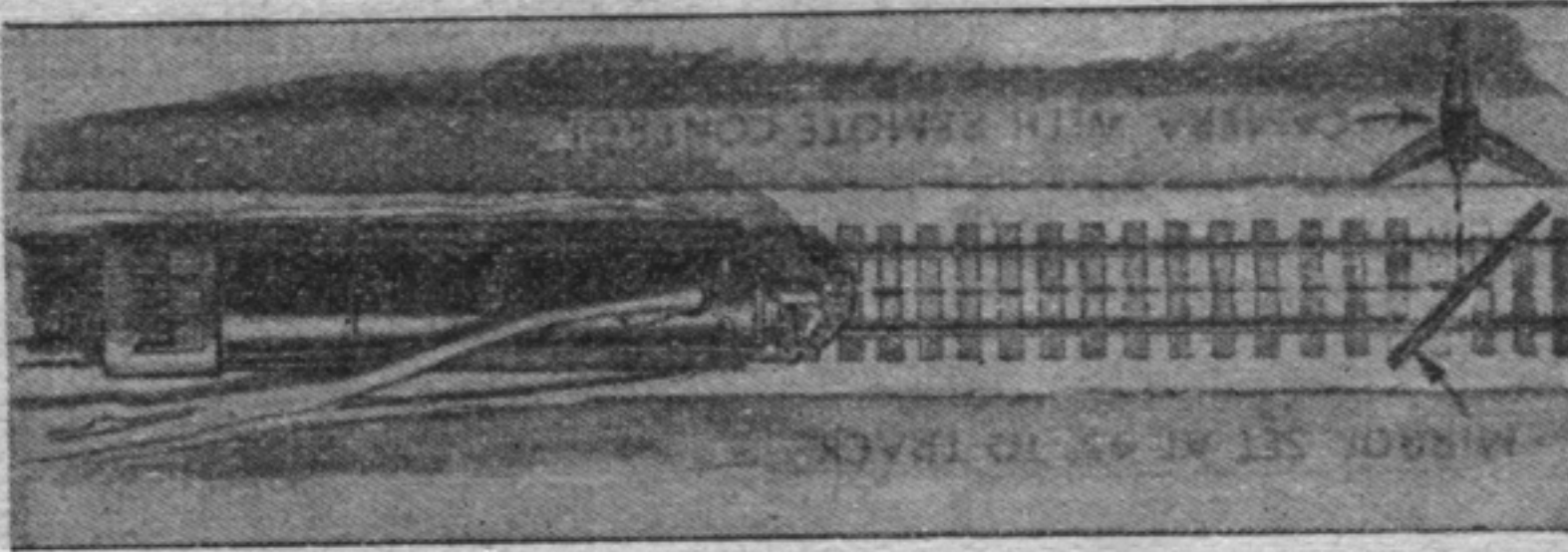
লাইনে ট্রেণ—ট্যার্‌চা-লাইনে আয়না!

উপর সরাসরি ভাবে। লাইনে চলন্ত ট্রেণের প্রতিবিম্ব পড়ে আয়নার গায়ে—আয়নাখানি ক্যামেরার লেন্সের সমরেখায় ঝুলানো থাকে; কাজেই তাহাতে চলন্ত ট্রেণের প্রতিবিম্ব পড়িবামাত্র লেন্সে ছবি ওঠে। ট্রেণখানি আয়নাটিকে ধাক্কায় চূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে আয়নার গায়ে ধাক্কা লাগিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত ট্রেণ সবেগে সামনে আসিতেছে, সে ছবি পুরাপুরি গ্রহণ করা চলে।

প্রাথমিক পরিচর্য্যা

শত্রুর বোমা কখন কোথায় পড়িয়া কত মানুষকে জখম করিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। এবং এ বিপদে সদ্য যদি জখমী-লোকের যথারীতি পরিচর্য্যা না করা হয়, তাহা হইলে তাকে বাঁচানো দায়। কোথায় কাহার কাছে প্রাথমিক পরিচর্য্যার সরঞ্জাম-পত্র, কখন তাহা পাওয়া যাইবে, সব ঠিক পাওয়া যাইবে কি না—চিন্তার কথা! আমেরিকার এক আম্বুলান্স-কোরের ধাত্রী শ্রীমতী কাম্পিজিলিয়া এ বিপত্তি-মোচনের জন্য প্রাথমিক পরিচর্য্যার সরঞ্জাম-পত্র সর্ব্বক্ষণ পোষাকে আঁটিয়া রাখিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

সব সরঞ্জাম পিঠের ব্যাগে

ব্যাগের মধ্যে ঔষধপত্র, ব্যাণ্ডেজ, ফেল্ট, হাইপোডার্ম্মিক নীড্‌ল্, মরফিনের বোতল, চোখের লোশন,—অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যাগের বিভিন্ন পকেটে মজুত থাকে; এবং চওড়া দু'টি ষ্ট্র্যাপের সহিত সংযুক্ত করিয়া এ ব্যাগ শুশ্রূষাকারীর পিঠে ঝুলাইয়া রাখা হয়। কাজেই আপৎকালে পরিচর্য্যার কাজে অসুবিধা ঘটিতে পারে না।

অল্পাহার

অতিভোজন যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা-অনিষ্টকর, অল্পাহারও ঠিক তেমনি। এ যুগে নানা কারণে আমাদের আহারের সময় ও ব্যবস্থাদিতে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনেকে সকালে এক পেয়ালা চা, টোষ্ট; তার পর কার্য্য-ক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় নাকে-মুখে কোনো মতে দু'মুঠা ভাত-ডাল গুঁজিয়া আহারের বালাই চুকাইয়া লন। তার উপর মধ্যাহ্নে কার্য্যক্ষেত্রে কেহ খান এক পেয়ালা চা, দু'খানি টোষ্ট—কেহ বা দু'খানা কচুরি-সিঙ্গাড়া-সন্দেশ! তার পর খুশী-মনে পেট ভরিয়া যে আহার, তাহা ঘটে রাত্রে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ ব্যবস্থায় শরীর মাটী হয়! এ-আহারে দেহের পুষ্টি হইতে পারে না। এমন অল্পাহারে দেহ বা শক্তি-সামর্থ্য সদ্য বেজুত বোধ না করিতে পারেন—কিন্তু তিলে তিলে যেমন তাল গড়িয়া ওঠে, নিত্য দিনের এ অল্পাহার-রীতির ফলে স্বাস্থ্যও তেমনি তিলে-তিলে ভাঙ্গিয়া শেষে অকর্ম্মণ্য হয়। আমাদের দেশে মেয়েরা সাধারণতঃ বড় অল্পাহারী সে জন্য তাঁদের স্বাস্থ্যে ঘুণ ধরিয়াছে। দেহে একটা না একটা উপসর্গ লাগিয়াই আছে! বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সারা দিনে মাঝে মাঝে একটু কিছু যদি খান, তাহা হইলে স্বাস্থ্যে ঘুণ ধরিবার ভয় থাকিবে না।

ভীম-ভৈরব সাইরেন

সাইরেনের রব কিরূপ বিকট—অনেকের তাহা ভালো করিয়া জানা আছে! সমর-বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা ও সাধনার ফলে নিউ-

অতি ভৈরব রভসে

ইয়র্কে সম্প্রতি যে অভিনব সাইরেনের সৃষ্টি হইয়াছে, তার নিনাদ এমন ভীম-ভৈরব যে, পঞ্চাশ মাইল দূরেও সে রব গিয়া পৌঁছায়। এ সাইরেন-যন্ত্রটি চালাইবার জন্য যে এঞ্জিন, তার শক্তি ১৪০ অশ্ব-শক্তির সমতুল্য।

শত্রুর পিছনে

ব্রিটিশ সমর-বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি বিপক্ষ-অনুসারী প্লেন তৈয়ারী হইয়াছে। ৪৮ মিনিটে এ প্লেন চলে ৩২৭ মাইল; অর্থাৎ ঘণ্টায়
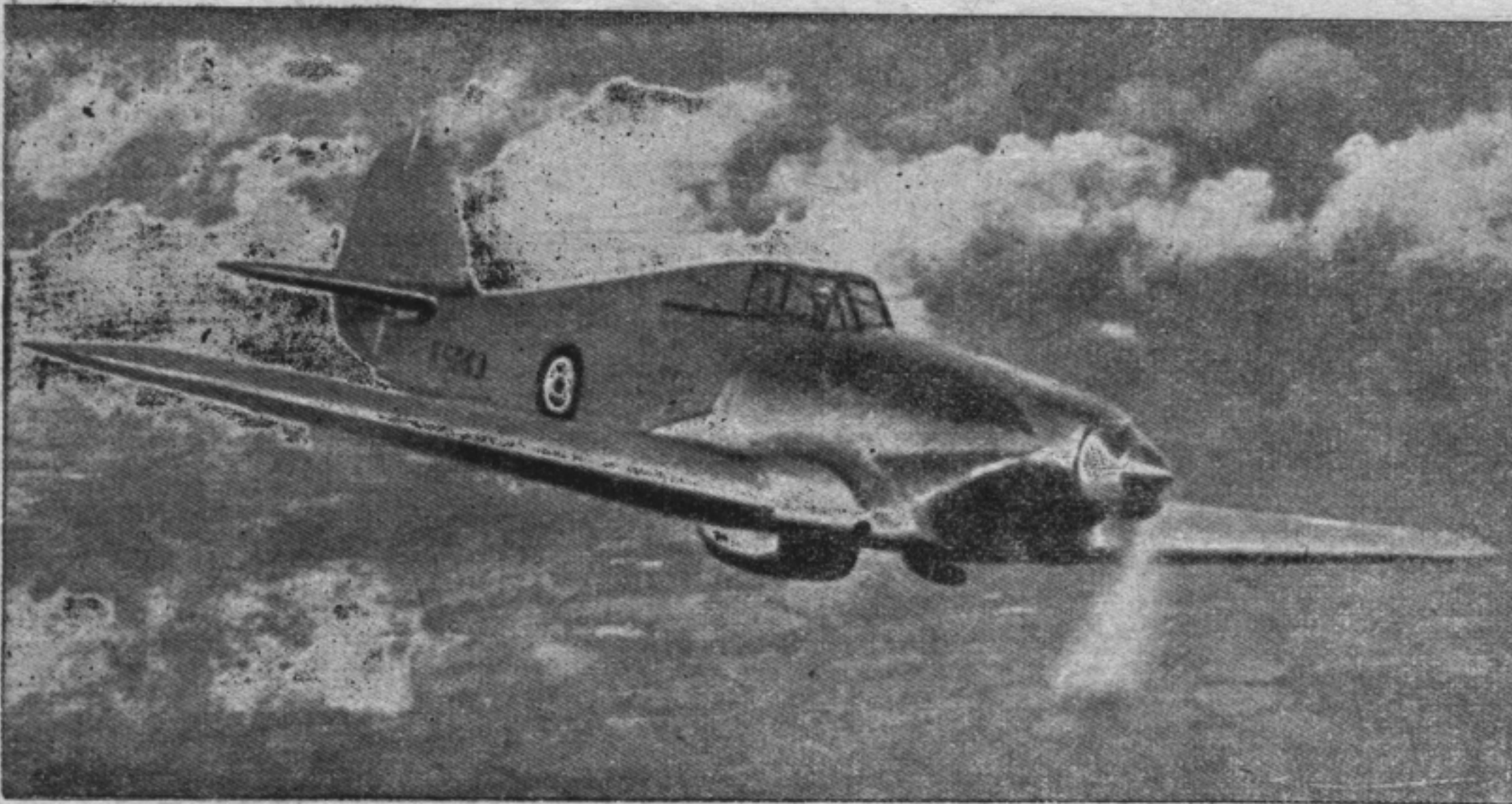
শত্রুর পিছনে তাড়া

৪০৯ মাইল রেটে। দিনে-রাত্রে বৃষ্টি-কুয়াশাতেও এ প্লেনের গতি রুদ্ধ বা মন্থর হইতে জানে না। ভিতরকার কলা-কৌশল সামরিক বিভাগ প্রকাশ করিতে চায় না। এইটুকু শুধু জানা গিয়াছে যে, ইহার গতি নিঃশব্দ। এঞ্জিনের শক্তি ৯১০ অশ্ব-শক্তির সমতুল্য। এ প্লেনের পাখা এবং অবয়ব প্রভৃতি বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদিত। আকাশের বর্ণ বুঝিয়া আচ্ছাদন-বস্ত্রের বর্ণও যেমন-খুশী বদল করা যায়।

তৃষ্ণার জল

এ যুদ্ধে রণক্ষেত্রে, জাহাজ-ডুবিতে, প্লেন-ভাঙ্গায় অর্থাৎ সর্ব্বদিকে যেন নরমেধ-যজ্ঞ চলিয়াছে! সাগরের বুকে ভেলায় ভাসিয়া অথবা বিজন প্রদেশে ঠাঁই পাইলেও প্রাণরক্ষার আশা সুদূর-পরাহত। ক্ষুধায় খাদ্য নাই, পিপাসায় জল মিলিবে না! তার উপর রৌদ্র-তাপ, বৃষ্টির জল, শীতের হিম প্রাণঘাতী হইয়া ওঠে! এ সম্বন্ধে অনুশীলন করিয়া মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন,—মানুষের দেহের যে-ভার—ওজন করিলে দেখা যাইবে, এ ভারের দশ-আনা ভাগ হইল দেহমধ্যস্থ জলের ভার। দেহের এ ভার ঠিক রাখিতে হইলে প্রায়ই আমাদের জল পান করিতে হয়। প্রচুর জল পান করা চাই; নহিলে দেহের ব্যালান্স থাকিবে না। দেহ-মধ্যে জলের অভাব ঘটিলে আমাদের পিপাসা পায়। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সাড়ে তিন দিন এক বিন্দু জলপান না করিয়াও বাঁচিয়া থাকা যায়,—শীত-প্রধান দেশে বাঁচা চলে চার দিন। আমাদের দেহের যে ওজন, দেহ-মধ্যস্থ রক্তের ওজন সে-ওজনের এক-ত্রিংশতম ভাগ! যে-ব্যক্তির দেহের ওজন দু'মণ সতেরো সের, তার দেহে সাড়ে সাত সের ওজনের অর্থাৎ ১৫ পাঁইট রক্ত থাকা আবশ্যক—নচেৎ তার পক্ষে সুস্থ থাকা অসম্ভব। কাজেই জলের অভাবে আমাদের রক্তই প্রথমে দূষিত হয়। দেহমধ্যে জলের মাত্রা কমিলে রক্ত গাঢ় হয়। সে সময় জল পান না করিলে এ গাঢ়তা এত বাড়িয়া ওঠে যে, আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা-মারফৎ রক্তের জোগান পায় না—'ডিলিরিয়াম' দেখা দেয়,—চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ-ঝাপ্‌সা হয় এবং হার্ট ফেল হইয়া মৃত্যু ঘটে।

জাহাজ-ডুবি হইয়া সমুদ্রে ভেলার বুকে যে-সব লোক কোনো মতে আশ্রয় লয়, তাদের পক্ষে সমুদ্র-জল পান করা চলে—অতএব তাদের মৃত্যু কেন ঘটিবে? তাছাড়া আমাদের রক্তে লবণ আছে, সাগর-জলেও লবণ, সুতরাং লবণাক্ত জল-পানে মৃত্যু ঘটিবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, সাগর-জলে লবণ আছে অত্যন্ত বেশী। সাগর-জল পান করিলে সে জল হইতে লবণরাশি গিয়া পাকস্থলীতে জমে। কাজেই দেহ-মধ্যস্থ রক্তের তরলতা নষ্ট হয়; তরলতা নষ্ট হইলে জমাট রক্ত দেহমধ্যে প্রবাহিত হইতে পারে না; কাজেই মৃত্যু ঘটে। তরকারী বেশী লবণাক্ত

করিয়া খাওয়া বা শুধু শুধু খানিকটা করিয়া লবণ খাওয়ার অভ্যাসে মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনা হইবে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল পান করিলে পাকস্থলী তাহা সহ্য করিতে পারে না। সে জল কড়া জোলাপের কাজ করিবে। তাহাতে উগ্র উদরাময় রোগ হইবে, পিপাসা বেশী-রকম বাড়িবে এবং তার ফলে মৃত্যু আশু এবং সুনিশ্চিত। পচা পুকুরে, খানায়, ডোবায় বা মরুভূমির বুকে সঞ্চিত যে জল পাওয়া যায়, সে জলে প্রচুর ক্ষার (alkali)। সে জল পান করিলেও পিপাসা বাড়িবে এবং রক্তে টান ঘটিবে। অতএব সাবধান, সে জল কদাচ পান করিবেন না। পিপাসার সময় পানীয় জল না পাইলে শুধু মানুষ নয়, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি পশু এবং পক্ষিকুলও ঠিক ঐ কারণে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। সুতরাং "প্রাণিনাং প্রাণাঃ" যে জল—শাস্ত্রের এ-বচনে বিমূঢ় গোঁড়ামি বা এতটুকু অত্যুক্তি নাই!

ডাঙ্গায় চলে, জলে চলে

—

জলে-স্থলে অবাধে চলে

কালিফোর্ণিয়ার বিজ্ঞান-শিল্পীর অপূর্ব্ব দান—নূতন গড়নের মোটর ট্রাক্টর। যন্ত্রপাতি ও রশদপত্র বহিবার জন্য এই নূতন ট্রাক্টরে যে এঞ্জিন লাগানো হইয়াছে, নদীতে নামিলেও সে এঞ্জিন অচল বা নিষ্ক্রিয় হয় না। অর্থাৎ জলে-স্থলে পাহাড়ে-নালায় পাকা কঠিন পথে এবং পঙ্ক-কর্দ্দমেও এ ট্রাক্টর অবাধে চলে; এবং চলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল রেটে। পাথরের ঠোক্করে এ ট্রাক্টর যেমন অক্ষত, নদীর জলে স্নান করিয়া ডাঙ্গায় উঠিলেও তেমনি সবল, সচল। এ-ট্রাক্টরের সৃষ্টিতে কর্ম্ম-জগতের বহু সুবিধা হইবে।

—

বিপক্ষের গুপ্ত তথ্য

বিপক্ষ-পক্ষে যে-সব মন্ত্রণা-পরামর্শের আদান-প্রদান চলে, সে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য আমেরিকায়, ব্রিটেনে এবং ফ্রান্সে নূতন কৌশলে বেতার-ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়াছে। ষ্টেশনগুলি মৃত্তিকা-গর্ভে অবস্থিত; এবং শিক্ষিত সংবাদ-গ্রহীতারা সেখানে সর্ব্বক্ষণ বসিয়া আছে—কাণে 'হেডফোন্' লাগাইয়া। বিপক্ষ-পক্ষে বেতার-মারফৎ যে সব বার্ত্তা প্রচারিত হয়, এই সব ষ্টেশনে বসিয়া সংবাদ-গ্রহীতার দল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাহা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে শর্ট-হ্যাণ্ড রীতিতে লিখিয়া লয়। এ প্রণালীতে বিপক্ষ-পক্ষীয় রাজনীতিক-গণের উক্তি, জন-সাধারণের মতামত নিমেষে জানা যায়। প্রচার-কার্য্যে এতখানি তৎপরতার জন্য কাজের অনেক সুবিধা হইতেছে।

সংবাদ-গ্রহীতা

মাটীর নীচে ষ্টেশন

—

গোধূলি

প্রান্তরের শ্যামল আঙ্গিনা দিগন্তের ধূসরে বিলীন,
গোধূলির রূপালি ধূসর আঁখি-পাত আবেশে ঝিমায়—
এলোকেশী সরম-আভায় আপনাতে নীরবে নিলীন।
আকাশের নীলিম আড়ালে একাকিনী কিশোরী তারকা
দিনান্তের পৃথিবী-জীবন চেয়ে দেখে চকিত নয়নে—
সুদূরের গোধন বিলায় গোধূলির ধূলির বারতা।
ক্লান্ত-পাখা পাখীর ডানায় ভেসে আসে কাদের নিশ্বাস?
অজানার কোন্ সে মেয়ের জীবনের সোহাগ-বেদনা?
মিশে যায় গোধূলি-বেলায় মুহূর্ত্তের সকল উচ্ছ্বাস!
গাছে গাছে লেগেছে যেখানে রজনীর কাজল-পরশ,
পাখীদের কাকলী-আলাপ—চাঁদিমার চিকণ রেখাটি
আন-মনে গগন-কিনারে গোধূলির বিলায় হরষ।

শ্রীঅজিত সেন (এম-এ, বি-পি-ই)।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

১৬

বৈকালে গৌরী ঠাকুরাণী আবার আসিলেন। সঙ্গে রাজীব।

গৌরী ঠাকুরাণী পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাজীব কাঁদিয়া আকুল! বলিল—কথা-কাটাকাটি করে দাদা সেই যে চলে এলো, আর দেখা হলো না! কর্ত্তা কম হেদিয়েছিলেন! দাদা চলে আসার পর থেকে একটি দিনের জন্য মনে শান্তি ছিল না! শেষ নিশ্বাস পড়বার সময়েও মুখে শুধু একটি কথা মহীন···মহীন···মহীন!

তার পর খুঁটিয়া খুঁটিয়া রাজীব সব কথা বলিল। বলিল, নূতন উইল লিখাইবার জন্য কি জেদাজেদি! কাগজ আসিল। মুখে তিনি বলিতে লাগিলেন বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থার কথা···জামাই কামাখ্যা বাবু লিখিতে লাগিলেন···তার পর সহি করিতে গিয়া চোখে কি হইল, কিছু আর দেখিতে পান না! রাজীবকে কি ধমক··· আলো জ্বালে নাই কেন? রাজীব যত বলে, আলো জ্বলিতেছে—জোরালো-বাল্‌বের আলো···তত তিনি ধমক দেন! বল্লেন, না, না! রাজীব মস্করা করিতেছে!···উইল সহি করা হইল না···জয়াদি সে-উইল রাখিয়া দিল কর্ত্তার ড্রয়ারে···কর্ত্তার স্বস্তি ছিল না···শেষে জয়াদি কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—নাই বা সই হলো জ্যাঠাবাবু ···তাকে যা দিতে চান, সে পাবে; তবে কর্ত্তা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন!···তার পর তিন-দিন তিন-রাত চেতনা নাই···যে-চোখ মুদিয়াছিলেন, সে-চোখ আর এ-জন্মে খুলিলেন না! সে উইলও আর সহি হইল না!···রাজীবের সব মনে আছে···পর-পর যা-যা ঘটিয়াছিল, সব!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তোমার জয়াদির কাছে তো গিয়েছিলে, উইলের কথা বলেছিলে রাজীব?

রাজীব বলিল—বললুম বৈ কি মা! বললুম, মহীন দাদার ছেলেরা এইখানেই রয়েছে···তাদের যা পাবার, সব দেছ তো দিদি··· কর্ত্তা বাবুর ব্যবস্থা-মতো?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তাতে তোমার জয়াদি কি জবাব দিলে?

রাজীব বলিল,—বললে, ও সব টাকা-কড়ির কথা তোমার জামাইবাবু জানে, রাজীব!···তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজীব আবার বলিল—জয়াদি আর সে-জয়াদি নেই! কেমন যেন! বড় ঘরের গিন্নি হয়েছে···এখানে এত মান-সম্ভ্রম···বোধ হয় তাই বদলেছে! কি, হয়তো বদলায়নি! অনেক দিন পরে দেখছি বলে আমারি বোঝবার ভুল!

সুভাষিণীকে দেখিয়া রাজীব বলিল—কর্ত্তাবাবু ভয়ঙ্কর জেদী মানুষ ছিলেন বৌমা! ভেবেছিলেন, মানুষ হয়ে মহীন দাদা তাঁকে ত্যাগ করে গেল···কখনো তিনি তার নাম করবেন না! কিন্তু বলতেন আমার কাছে মাঝে-মাঝে, হ্যাঁ রে রাজীব, সে এমন ভুলে গেল আমাকে? বিয়ে-থা করেছে নিশ্চয়! বৌমাকে নিয়ে একবার এলো না আমার কাছে যে আমি বৌমাকে দেখবো? কাজের মানুষ ছিলেন··· কাজ নিয়ে অহরহ ব্যস্ত···একলা থাকলেই আমাকে ডেকে আর

কাঠ হইয়া সুভাষিণী বসিয়া শুনিতেছিল,···তার দু' চোখ বাষ্প-ভারে আচ্ছন্ন!

নীলু কহিল—ছেলেবেলায় বাবার মুখে তোমার অনেক গল্প শুনেছি! বাবা বলতেন, তোমাকে খুব ভয় করতেন। সত্যি?

সুভাষিণী বলিল,—কাকা বলো নীলু···তোমাদের কাকা!

রাজীব একটা নিশ্বাস ফেলিল। বলিল,—তোমার বাবা বলতো, চিরদিন খাটবে রাজীব? মামাবাবুকে বলে পেন্‌শন নাও। আমি বলতুম, তোমার ছেলেমেয়ে হলে তখন পেন্‌শন দিয়ো দাদাবাবু··· তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তখন গল্প করে দিন কাটাবো!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—জীবনে মানুষ কত কি পায়! কোন্‌টার কি দাম তা যদি মানুষ বুঝতো!···এঁর কি যাবার কথা? না, যাবার বয়স হয়েছিল? তাছাড়া মামাবাবুর অত স্নেহ-মায়া···

সুভাষিণী বলিল—কত দুঃখ করতেন! বলতেন, মন আমার পড়ে আছে মামাবাবুর উপর···যেতে ভয় করে। যদি বলেন, দূর হয়ে যা···সহ্য করতে পারবো না? স্নেহের অভাবের কথা মামাবাবু বলেছিলেন, সে-কথা কাঁটার মতো আজীবন তাঁর মনে বিঁধে ছিল। তবু বলতেন, যাবো মামাবাবুর কাছে। যেতে পারেননি পাছে তিনি ভাবেন পয়সার কষ্ট পাচ্ছেন···পয়সার লোভে এসেছে আত্মীয়তা করতে!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—কত ভুল যে আমরা করি! আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, ভুলগুলোই চিরদিন বড় হয়ে আমাদের মনে বাসা বাঁধে!—ভুলকে ভুল বুঝে সে-ভুল শোধরাবার কোনো চেষ্টা করি না!···ভাবো তো, দু' পক্ষ যদি দু' পক্ষের ভুল বুঝে এ ভুলের বোঝাপড়া করতেন! তিনিও তাহলে সারা জীবন মনে অশান্তি ভোগ করতেন না, মহীনবাবুকেও অশান্তির কাঁটায় জর্জ্জরিত হতে হতো না!···পৃথিবীর চেহারাই যেতো বদলে!

রাজীব নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—বড় ছেলেটিকে দেখছি না!

নীলু দিল জবাব। বলিল,—দাদার ফিরতে দেরী হয়। অফিসের কাজ সেরে জানকীবাবুর বাড়ীতে যায়। তাঁর ছেলে দাদার কাছে পড়ে। তাছাড়া জানকীবাবু আরো কত কাজ দেন। দাদাকে জানকীবাবু খুব বেশী ভালোবাসেন!

রাজীব বলিল,—কার ছেলে তোমরা বাবা···তোমাদের ভালোবাসবে না, এমন মানুষ পৃথিবীতে থাকতে পারে না!

ছোট মোহন একান্তে বসিয়া ক্লাসের হোম-টাস্ক লিখিতেছিল··· সেই সঙ্গে এ-সব আলোচনা তার কাণে যাইতেছিল না, তা নয়!

সুভাষিণীকে বলিলেন গৌরী ঠাকুরাণী—আমি আশ্চর্য্য হয়েছি বোন, রাজীবের মুখে এ-কথা শুনে! তোমার মামাবাবু মারা যাবার সময় সম্পত্তি ভাগ করে তার অর্দ্ধেক তোমাদের দেবার ব্যবস্থা করে গেছেন! অথচ···

মুখে মলিন হাসি···সুভাষিণী বলিল—যাঁর টাকা, তাঁর কাজে যখন এলো না···টাকার অভাবে রোগে এক দিন বিশ্রাম পেলেন না ···এমন ভাবে দেহ-পাত করে চলে গেলেন! ও-টাকায় আমার

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—আমি কিন্তু শুনোতে ছাড়বো না! এতখানি দেমাক করে বেড়ায়…তোমাদের মানে না…তোমরা যেন অজাত, না, বেজাত! অথচ তোমাদের টাকা ফাঁকি দিয়ে বসে আছেন!…পরকে ফাঁকি দিয়ে যে নবাবী করে, সে আবার নাক তুলে বেড়ায় কিসের দর্পে!

সুভাষিণী বলিল,—না, না দিদি, আমাদের জন্ত কেন তুমি ওদের শাপ-মন্যি কুড়োবে! কিছু বলো না!…আমি জানি দিদি …উনি বলতেন, মানুষকে মানুষ কিছু দিতে পারে না কথনো… দেবার মালিক ভগবান্! তিনি না দিলে মানুষের সাধ্য নেই দিয়ে কারো দুঃখ দূর করবে!

কথাটা বলিয়া সুভাষিণী নিশ্বাস ফেলিল! টাকা থাকিলে এমন না হইয়া কত কি হইতে পারিত, বুঝি, মনের মধ্যে চকিতে জাগিয়া উঠিল তাহারি ছবি!

রাজীব বলিল—কাকেও বলতে হবে না মা। জয়াদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম টাকার কথা।…জয়াদি তাতে জবাব দিলে, টাকা-কড়ির কথা তোমাদের জামাইবাবু জানে!…এ কথা জামাইবাবুর কাছেই পেড়ে দেখবো…তিনি কি বলেন!…আর এও বলি বৌমা, তোমার নিজের টাকা…ভিক্ষে নয়, এ-টাকা তোমাকে যে দেছে, তার কাছে তুমি সত্যবদ্ধ হয়ে সে টাকার ভার নিয়েছো। সে-টাকা আত্মসাৎ করবে, এ কেমন কথা!

সুভাষিণী বলিল—কি হবে দাদা টাকায়? তোমরা আশীর্ব্বাদ করো…তোমাদের আশীর্ব্বাদ থাকলে আমার ছেলেদের কোনো অভাব, কোনো দুঃখ থাকবে না।

১৭

রাত্রে কামাখ্যা সাহেব খাতাপত্র খুলিয়া বসিয়াছে, জয়া আসিয়া সামনের চেয়ারে বসিল।

বলিল—রাজীব এসেছিল…তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

কথাটা কামাখ্যা সাহেব শুনিয়াও শুনিল না! জয়া দেবী বলিল —কথাটা কাণে গেল না বুঝি?

কামাখ্যা সাহেব বুঝিল, জয়া দেবীর কথা শুনিতেই হইবে। ভাব দেখিয়া মনে হয়, জয়া পণ করিয়া আসিয়াছে, কথা না শুনাইয়া ছাড়িবে না! মুখ তুলিয়া অগত্যা প্রশ্ন করিল—কি বলছো?

জয়া বলিল—রাজীব এসেছে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—হুঁ।

—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—না।

জয়া বলিল—তোমার সঙ্গে দেখা করবে।…অনেক কথা বললে। বললে, ওদের ওখানে যাবে…মহীনের ছেলেদের জন্ত মন আকুল হয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলে, মহীনের টাকা-কড়ি তাকে দেওয়া হয়েছে তো?

কামাখ্যা সাহেব জ্বলিয়া উঠিল! বলিল—গুরুঠাকুর এসেছেন উপদেশ দিতে!…তুমি ওকে মাথায় তুলেছো নিশ্চয়!

জয়া বলিল—মাথায় আমি কি তুলবো! আমাদের এতটুকু বেলা থেকে দেখছে! জ্যাঠামশাই ওকে মাথায় রাখতেন! কাজেই কোনো দিন চাকরের মতো ওকে আমরা দেখিনি তো!

এইটুকু মাত্র বলিয়া কামাখ্যা সাহেব আবার খাতাপত্রে মনোনিবেশ করিল।

জয়া বলিল—মহীনের বাড়ীতে আজ বিকেলে ওর যাবার কথা ছিল, বৌকে আর ছেলেদের দেখতে! জ্যাঠামশায়ের উইলের কথা, টাকার কথা তাদের কাছে ও বলবে না, ভাবো?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—যদি বলে, সে জন্ত কি করতে হবে?

জয়া কহিল—কি করতে হবে, তুমিই জানো! আমি তোমাকে বলেছিলুম, ওদের একেবারে বঞ্চিত করো না! তুমিই বলেছিলে থামো, থামো, বৈষয়িক ব্যাপারে মেয়ে-মানুষ হয়ে কথা কইতে এসো না!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—সে-দিন যদি ও কথা বলে থাকি, তাহলে আজো আমি ঐ কথাই বলছি—এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই!

জয়া বলিল—এ কথা যদি ওঠে, কি জবাব দেবে শুনি?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কাকে জবাব দিতে হবে? তোমার ভাইয়ের ছেলেদের? না, ঐ খানশামা-বাবুকে?

জয়া বলিল—তুমি ভাবো, এ কথা যদি ওঠে, তাহলে জানকীবাবুর কাণে এ-কথা পৌছুবে না?…জানকীবাবুকে তো মহীনের বড় ছেলে খুব বশ করে ফেলেছে, ছেলেরা বলে। তোমার ছেলেকে ছেড়ে তারি উপর জানকীবাবুর অনেক বেশী নির্ভর!

কামাখ্যা সাহেব এ সব কথা জানে না, তা নয়। জানে। তবে এ-কথা লইয়া জানকীবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিতে চায় না! জানকীবাবুকে সে ভালো করিয়া জানে। অপরে যদি কোনো বিষয়ে জিদ ধরিয়া বসে, জানকীবাবু সে-জিদ ভাঙ্গিবেন, নিশ্চয়! তাই কামাখ্যা সাহেব মনে-মনে মস্ত আশা গড়িয়া রাখিয়াছে,… অর্থাৎ সুবিধা বুঝিয়া ছেলের আসন উঁচুতে তুলিয়া সে-আসনকে কায়েমি করিবে! এ-সব তুক্‌তাক্ কামাখ্যা সাহেবের ভালো করিয়া জানা আছে! সে কৌশল কামাখ্যা সাহেবের জানা না থাকিলে এখানে সর্ব্ববিভাগে কামাখ্যা সাহেব এত কাল একচ্ছত্র আধিপত্য রক্ষা করিতে পারিত না!

জয়ার কথার উত্তরে কামাখ্যা সাহেব বলিল—তুমি কিছু ভেবো না। তোমার জ্যাঠামশায়ের সে উইলের মুশাবিদা আমিই করেছিলুম। এখন তোমার গুরুঠাকুর রাজীব যদি সে উইলের কথা তোলে তো তার হেস্তনেস্ত আমিই করতে পারবো!…একটা চাকর এসে আমার সামনে হুমকি দেবে, আমাকে করবে কাহিল, এতখানি অপদার্থ আমি নই, সত্যি!

স্বামীর এ কথায় কোনো আশ্বাস মিলিল না। স্বামী গোঁ ধরিয়া আছে, গোঁ ছাড়িবে না! কাজেই আশ্বাস মিলিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কামাখ্যা সাহেবের অফিস-কামরা ত্যাগ করিয়া জয়া নিজের মহলে আসিল। আসিয়া দেখে, পিনাকী বসিয়া আছে খাটের উপর…মলিন মুখ।

জয়া বলিল—হঠাৎ এমন সময় আমার ঘরে?

সুপুত্রের মতো নম্র কণ্ঠে পিনাকী বলিল—ভারী বিপদে পড়েছি।

জয়া বলিল—বিপদ তো তোমাদের লেগেই আছে। এত

এ কথায় পিনাকী ভড়কাইয়া গেল ! বাবার ঘরে মা গিয়াছিল, সে জানে। বুঝিল, নিশ্চয় ছেলেদেরি কোনো ব্যাপার লইয়া বাপের সঙ্গে মায়ের মতান্তর-মনান্তর ঘটিয়া গিয়াছে নিশ্চয় ! মার মন তাই এমন···

কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মা বলিল,—কি বিপদ বাধিয়েছো শুনি ?

পিনাকী বলিল—সুপ্রসন্নবাবুর মেয়ের বিয়েতে কলকাতায় গিয়েই তো মুস্কিল বাধলো। জানো আমার একটু পোষাক-আশাকের সখ আছে ! এক দিন চৌরঙ্গীর দিকে বেরিয়ে ওয়াটশন কোম্পানির দোকানে ঢুকেছিলুম। কি সব স্যুট দেখলুম ! লোভ সামলাতে পারলুম না ! দু'টো নতুন স্যুটের অর্ডার দিলুম। সঙ্গে ছিল গোটা পঁচিশেক টাকা···তাই থেকে দশ টাকা দিলুম তাদের এ্যাডভান্স ! এখন সে-পোষাক তৈরী। তারা পোষাক পাঠিয়েছে ভি-পি পার্শ্বেল-পোষ্টে। দাম দিতে হবে একশো বারো করে', যার নাম দু'শো চব্বিশ টাকা !

কথা শুনিয়া জয়ার দুই চোখ কপালে উঠিল ! জয়া বলিল—দু'শো চব্বিশ টাকায় দু'টো স্যুট্ ! কি ভেবেছো পিনু ?

পিনাকী বলিল—তবু তো দশ টাকা এ্যাডভান্স দিয়েছি ! না হলে দু'শো চৌত্রিশ টাকা পড়তো। এ টাকা অবশ্য ডাক-খরচা নিয়ে···আলাদা ডাক-খরচা দিতে হবে না !

জয়া কোনো জবাব দিল না···মুখ ফিরাইয়া ডাকিল,—মুখ্যি···

মুখ্যি ওরফে মোক্ষদা দাসী। জয়ার খাশ-পরিচারিকা। রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে মুখ্যি আসিয়া জয়ার পায়ে হাত বুলাইয়া পা টিপিয়া দেয়। ঘুম তো সহজে আসে না ! কি যে হইয়াছে ! অনেকক্ষণ পা টিপিতে টিপিতে তবে ঘুম আসে !

মুখ্যি আসিলে আর্জী পাশ করানো কঠিন হইবে, তাই পিনাকী বলিল—আজ পোষ্ট-আপিসের লোক গিয়েছিল অফিসে। আমি বলে দিয়েছি, বাড়ীতে টাকা আছে। বাড়ীতে আসতে বলেছি। টাকা নিয়ে পোষাকের প্যাকেট ডেলিভারী দিয়ে যাবে। কাল বেলা ন'টার মধ্যে বাড়ীতে আসবে। কিন্তু টাকা আমার হাতে নেই।

উদাস কণ্ঠে জয়া বলিল—হাতে টাকা না থাকে, প্যাকেট ফেরত যাবে।

পিনাকী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বলিল—তা কখনো হয় ? সই করে অর্ডার দিয়ে এসেছি ! বাঃ !

জয়া বলিল—যার সামর্থ্য নেই, এমন অর্ডার সে দেয় কেন ?

পিনাকী বলিল—বা রে, তখন কি জানতুম এত দাম পড়বে ! —তাছাড়া বাবা আমার এ্যালাউয়ান্স বন্ধ করে দেছে ! বলে, অফিস থেকে টাকা পাচ্ছো তো। না হলে তোমাকে শুধু শুধু জ্বালাতন করবো কেন ? কখনো জ্বালাতন করেছি নিজের সখের খাতিরে, বলো ?

জয়া দেবী বলিল—অফিস থেকে টাকা পাচ্ছো ! ভাতের খরচ দিতে হয় না ! সখের পোষাকের খরচ তাই থেকে দেবে !

পিনাকী বলিল—ভারী তো টাকা পাই অফিস থেকে ! হুঁঃ, মাসে দেড়শোটি মাত্র টাকা।

জয়া দেবী বলিল—তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা যারা পায়, তারা সে

পিনাকী বলিল—যে ভাবে মানুষ করেছো, মানে, সে ভাব বজায় রেখে চলতে গেলে তার খরচপত্র কত পড়ে, হিসাব আছে ?

জয়ার ভাব কঠিন ও অবিচল ! জয়া বলিল—হিসাব থাকলেও তোমাকে এ টাকা দেবার সামর্থ্য আমার নেই, পিনু ! তুমি তো জানো, আমার নিজের টাকা-কড়ি কিছু নেই···তোমাদের সংসারে আমিই শুধু বিনা ভাতায় বাস করছি !

পিনাকী মায়ের দুই পা জড়াইয়া ধরিল, বলিল—লক্ষ্মীটি মা··· এইবার···শুধু এইবারটির জন্য ! এই আমি কাণ মলছি, নাক মলছি, এবার থেকে আমি বুঝে চলবো···আর কখনো তোমার কাছে হাত পাতবো না···একটি পয়সার জন্যও না ! এবারকারের মতো আমাকে রক্ষা করো।

জয়া বলিল—ওঁর কাছে বলো গে না, যিনি দেবার মালিক ···যাঁর কাছ থেকে বরাবর সব পেয়ে আসছো !

দুই চোখ কপালে তুলিয়া থিয়েটারী ভঙ্গীতে পিনাকী বলিল—বাবার কাছ থেকে ?

—তা নয় তো রাস্তার লোকের কাছে চাইতে যেতে বলছি ?

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পিনাকী বলিল—তবেই হয়েছে ! ···বাবা বলে, হুঁঃ···যেখান থেকে যে এসে আমার নামে নালিশ করে বলবে, টাকা পাবে, বাবা তাকে দিচ্ছে টাকা···আর আমাকে শাসাচ্ছে তোমার এ্যালাউয়ান্স থেকে আসছে মাসে এ টাকা কাটা যাবে ! কাটলো টাকা। এই করেই তো বাবা আমাকে আরো বেহাল করে দেছে !···বাবার কাছে আমি যেতে পারবো না টাকার জন্য। মরে গেলেও না !···তুমি দাও টাকা।

জয়া বলিল—আমায় কেটে ফেললেও একটি পয়সা বেরুবে না ! আমাকে মিছে বলা !···

মুখ্যি আসিল। দেখিয়া জয়া বলিল—এসেছিস ! আয়···

বলিয়া জয়া স্নানের উদ্যোগ করিল।

পিনাকী ডাকিল—মা···

সে স্বরে আবেদনের গভীর কাকুতি ! মা বলিল—আমি সত্যি কথাই বলেছি পিনু। একটি পয়সা দেবার সামর্থ্য আমার নেই !··· আর এ'ও বলি, দেড়শো টাকা পেয়েও তোমার সখ আর বাবুয়ানা মেটাতে পারো না ! আর ঐ মহীনের ছেলে···তাদের সংস্থানের কথা ভাবো দিকিনি !

এ কথায় পিনাকী একেবারে খ্যাঁক করিয়া উঠিল ! বলিল—ডার্টি বেগার্স ! ওদের মতো থাকতে বলো ? হুঁঃ ! কিসে আর কিসে !

জয়া বলিল—যাও ! আমাকে মিছে জ্বালাতন করো না। আমার হাতে দু'টো টাকা নেই আর রাত পোহালে আমি তোমায় দেবো দু'শো চব্বিশ টাকা !

এ কথা বলিয়া জয়া দেবী শয্যায় দেহ-ভার লুটাইয়া দিল। মুখ্যি পা দু'খানা নিজের কোলে টানিয়া খাটের প্রান্তে বসিল।

নৈরাশ্যের আক্রোশে দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া পিনাকী বলিল—দেবে না টাকা ? বেশ ! কাল সকালে উঠে দেখবে, তোমার বড় ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে মরে ঝুলছে !···এ দেশী দোকানের বিল নয়

১৮

গ্রহ-নক্ষত্রগুলা যেন বাঁকিয়া একজোটে সব কি চক্রান্ত করিয়া বসিয়াছে। পরের দিন সকালে কামাখ্যা সাহেব চা পান শেষ করিয়া বাড়ীর অফিস-কামরায় চিঠিপত্র খুলিয়া বসিয়াছে, মঙ্গল-গ্রহের মতো রামহরি সান্যাল আসিয়া নমস্কার করিয়া সামনে দাঁড়াইল।

রামহরিকে দেখিবামাত্র কামাখ্যা সাহেব চমকিয়া উঠিল। সে-দিনের সব কথা মনে পড়িল। ভাবিল, আবার বুঝি কোনো নূতন নালিশ দায়ের করিতে আসিয়াছে! কহিল—কি খপর সান্যাল?

রামহরি বলিল—আজ্ঞে, এসেছিলুম···তার মানে, আপনি যেমন বলেছিলেন, আপনার কথা-মত মেয়ের জন্য একটি পাত্র স্থির করেছি। তাদের পাকা কথা দিতে পারছি না···মানে, আপনার কাছ থেকে আশ্বাস না পেলে!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—আমার কাছ থেকে আশ্বাস!

রামহরি বলিল—আজ্ঞে, জানেন তো, ভালো সম্বন্ধ কেন ভেঙ্গে গেল···সেই মুস্তোড়া-কোলিয়ারীর এঞ্জিনীয়ার ছেলেটি! আপনার কাছে তাই কেঁদে এসে পড়েছিলুম। সব শুনে আপনি বলেছিলেন! সেই···মানে, পিন্টুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে যখন দেওয়া যাবে না, আপনি বলেছিলেন, বিয়ের সময় কিছু অর্থ সাহায্য করবেন!

কামাখ্যা সাহেব স্থির-মনে কথাটা শুনিল। শুনিয়া কোনো জবাব দিল না।

অবিচল নেত্রে রামহরি চাহিয়া রহিল কামাখ্যা সাহেবের পানে—উত্তরের প্রত্যাশায়! বড়লোকের মুখের কথা···সে কথায় নির্ভর রাখিবে, এতখানি বিমূঢ়তা তার নাই! তবু···কথাটা যখন কামাখ্যা সাহেব বলিয়াছে, একবার সে কথার খেই ধরিয়া তাকে নাড়া দিতে ক্ষতি কি? যদি কিছু আসে!

কামাখ্যা সাহেবকে নিরুত্তর দেখিয়া রামহরির বুকখানা কাঁপিল। রামহরি বলিল—তাহলে আমার সম্বন্ধে অনুমতি···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—টাকা দেবো, বলেছিলুম,—বটে! কত টাকা, বলো তো?

রামহরি বলিল—আজ্ঞে, আপনি বলেছিলেন দু'হাজার!··· মানে, সেই কথার উপর ভরসা করেই এখানে সব ঠিক করে ফেলেছি। ···ছেলেটি ভালো। বাপ কলকাতার এক বড় সদাগরী আপিসের বড় বাবু···ছেলেটিকেও বাপ নিজের আপিসে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। তারা চায় সবশুদ্ধ সাড়ে তিন হাজার টাকা! তার পর থাওয়ান-দাওয়ান আছে। মোট যার নাম, চার হাজারের কমে হবে না। তা আমি কোনো মতে দু'হাজার জোগাড় করতে পারবো···স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে···আর গবর্ণমেণ্ট পেপার বেচে। বাকী দু'হাজার···মানে, আপনার কথায় ভর করে তাদের সঙ্গে অনেকখানি এগিয়েছি···বাকী শুধু বিয়ের দিন স্থির করে পাকা দেখা সেরে ফেলা!

কামাখ্যা সাহেবের বুকে যেন কে মুগুর মারিল! বুকখানা এমনি টন্ টন্ করিয়া উঠিল! কামাখ্যা সাহেব বলিল—এত টাকা রোজগার করছো সান্যাল···আর মেয়ের বিয়ের জন্য দু'হাজার টাকার জোগাড় করতে···বলছো, কোম্পানির কাগজ বেচবে, স্ত্রীর গহনা বন্ধক দেবে।

রামহরি বুঝিল বড়লোকের যা ধুয়া···বলিল—আজ্ঞে, আপনিও

পোজিশন রেখে চলতে হলে···আপনিই দেখুন না···আপনি তো এখানকার মালিক বললেই চলে··· খরচপত্র কত বেশী করতে হয়! আপনার পোজিশনে আপনি যেখানে এক হাজার দু'হাজার বাড়তি খরচ করেন, আমরা চুনোপুঁটির দল···পোজিশনের জন্য আমাদের সেখানে কম্-সে-কম্ পঞ্চাশটা টাকাও তো বাজে-খরচে যায়!···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—হুঁ···বিয়ে কবে দেবে, স্থির করেছো?

রামহরি বলিল—এই মাসের শেষাশেষি! তাঁরা তাই চান। আরো দু'টি-তিনটি পাত্রী তাঁদের হাতে রয়েছে! যে আগে কথা দেবে, তার সঙ্গেই তাঁরা পাকা কথা কবেন!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—বেশ! যখন বলেছি দেবো···তখন ও দেওয়া হয়েছে, জেনো!···কথা তুমি দাও গে।

রামহরির মন তবু প্রবোধ মানিতে চায় না! রামহরি বলিল —টাকার জন্য কবে নাগাদ আপনাকে আবার জ্বালাতন করতে আসবো তাহলে?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—বিয়ের পাঁচ-সাত দিন আগে এসে টাকা নিয়ে যেয়ো!

এ-কথার উপর আর কথা চলে না। উত্তর ভালো। তবু মনের ভার এ উত্তরে লঘু হইল না! উপায় কি! রামহরি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কামাখ্যা সাহেব আবার চিঠিপত্র খুলিয়া বসিল। মনে সে সহজ প্রসন্নতা নাই···মন বিরসতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

জয়া আসিল, বলিল—একটা কথা ছিল···

কামাখ্যা সাহেব বিরক্ত হইল। বলিল—আবার কথা! তোমাদের পাঁচ জনের কথার জ্বালায় আমার কাজকর্ম্ম সব বন্ধ হবে, দেখছি!

এ কথায় জয়া দমিল না। বলিল—জানকীবাবু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন কলকাতা থেকে! শুনলুম, কারা এসেছে মেয়ে দেখতে।

কামাখ্যা সাহেব এ সংবাদ শুনিয়াছে। উত্তরে বলিল—হবে!

—হবে! জয়া বলিল—হবে, মানে? তবে যে তুমি বরাবর বলে আসছো, তোমার ছেলের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন···তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে তোমার ছেলে এখানকার ছত্রধর হয়ে বসবে···সে কথা তবে বাজে?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—ছেলেকে তুমি এমন তৈরী করেছো যে, তার সঙ্গে জানকীবাবু দেবেন তাঁর মেয়ের বিয়ে, ভাবো?

জয়া বলিল—ছেলে আমি তৈরী করেছি? না, তুমি?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—সে সম্বন্ধে এখন তর্ক করে লাভ নেই। ···ছেলে যা তৈরী হয়েছে···তোমার-আমার এখন সাধ্য নেই যে, তাদের ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়বো!···এই মাত্র এসেছিল রামহরি সান্যাল। তার ডাগর মেয়েকে নিয়ে তোমার ধিঙ্গি ছেলে যে-চালে চলেছিলেন···ভাগ্যে দেশটা বিলেত নয়—তাহলে বহু টাকা খেশারত দিতে হতো! তবু রামহরি যে রকম চ্যাচামেচি সুরু করেছিল, পাছে পাঁচ-কাণ হয়, দায়ে পড়ে তাই তার মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলুম। আর বলেছিলুম, তার সে-মেয়ের বিয়েতে আমি দু'হাজার টাকা দেবো!

শুনিয়া জয়া শিহরিয়া উঠিল! তুমি দেবে দু'হাজার টাকা?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—হুঁহাজার না দি, কিছু দিতে হবে। *যে-রকম লোক···বাগে পেয়েছে···কিছু টাকা না নিয়ে ছাড়বে না···* বুঝছি!

জয়া ক্ষণকাল নিরুত্তরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কি মনে হইল, ফিরিল। ফিরিয়া বলিল—রাজীবের কথা খেয়াল রেখো! সে আসবে তোমার কাছে···মহীনের সম্পত্তির কথা কইতে।

কামাখ্যা সাহেব রাগিয়া অগ্নিশিখা হইয়া উঠিল! কহিল—সম্পত্তি! কার সম্পত্তি? কিসের সম্পত্তি, শুনি?

জয়া বলিল—জ্যাঠামশায়ের সম্পত্তি। মারা যাবার সময় নিজের হাতে তুমি উইল লিখেছিলে···রাজীব ছিল তার সাক্ষী!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কিসের সাক্ষী? কিসের উইল? মরবার সময় মাথা খারাপ হয়ে তিনি যা তা ভুল বকছিলেন···তাঁকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য আমি কতকগুলো ছাই-পাঁশ লিখেছিলুম!···হুঁঃ! সে উইল? কোনো দেশের কোনো আইনে তাকে উইল বলে না! আসুক রাজীব···তাকে আমি বুঝিয়ে দেবো'খন উইলের মর্ম্ম!

উত্তর শুনিয়া জয়া আরো স্তম্ভিত হইল। পায়ের নীচে মাটী যেন দুলিতে লাগিল! দেহ-মন ব্যাপিয়া তাহারি দোলনের কাঁপন!

জয়া বলিল—আমি জ্যাঠামশায়ের কাছে বলেছিলুম, নাই বা সই হলো জ্যাঠামশাই···যাকে তুমি যা দিয়ে যাচ্ছো, সে তা পাবে··· আমি দেখবো। সে-কথা?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—যদিই বা সে কথা তুমি বলে থাকো··· সে কথায় তোমার জ্যাঠামশায়ের পুরোনো উইল বাতিল নামঞ্জুর হয়ে যাবে? হতো বটে বাতিল, তিনি যদি এ উইলে সই করতেন! এ হলো আইনের কথা! বুঝলে···আইন! এ আইনের যুগ! আমরা পুরুষ মানুষ···কাজের লোক···আমরা আইন মেনে চলি। ও-সব বে-আইনী মেয়েলি কাঁদুনির আমরা প্রশ্রয় দিই না!

স্থির অবিচল নেত্রে জয়া চাহিয়া রহিল স্বামীর পানে। তার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল···বাতাসের দোলায় গাছের কচি কিশলয় যেমন কাঁপে, তেমনি! মনের মধ্যে বিভীষিকা যেন কালো কালির ফণা তুলিয়া খাড়া হইয়া উঠিল!

জয়া বলিল—তোমার এই পাপেই ছেলেগুলো এমন বিগড়ে গেল!···এছাড়া তার আর অন্য কোনো কারণ নেই।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—পাপ! কি পাপ করলুম আমি, শুনি?

শান্ত সংযত কণ্ঠে জয়া বলিল—থাক্···তুমি স্বামী···শাস্ত্রে বলে, পরম-গুরু···তোমার পাপের কথা মুখে উচ্চারণ করে' আরো অমঙ্গল ডেকে আনবো শেষে? আমার ভয় করে! এ কথা বলিয়া জয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

কামাখ্যা সাহেবের চিঠিপত্র আর পড়া হইল না। মনের মধ্যে সমস্ত একাকার করিয়া যেন আগুনের লহর বহিতেছে···বিকট তার তাপ···অসহ্য তার জ্বালা!···নিঃশব্দে সে বসিয়া রহিল!

যেন কি একটা ঘটিয়া গিয়াছে···বিরাট্ বিপর্যয়! এবং কামাখ্যা সাহেব আজ একান্ত নিরুপায়, অসহায়! স্ত্রী? মুখের পানে না চাহিয়া চলিয়া গেল! পুত্র-কন্যা? তারা নিজেদের লইয়া মত্ত···শুধু স্বার্থ···শুধু দাও আর দাও! বাপের সুখ-দুঃখের কোনো খপর রাখে না!

আলোর প্রখর দীপ্তিতে নিজের সমস্ত অতীত জীবনটা যেন জ্বলজ্বল্ করিয়া উঠিল!···

কিসের জন্য? কাহার জন্য···কি করিয়া সারা জীবন কাটাইয়া দিল? টাকা···টাকা···টাকা! সে-টাকার বিনিময়ে আরাম-বিরাম কোথায় মিলিয়াছে? শান্তি কৈ?

এ আলোয় অতীতের যতখানি দেখা যায়···তার কোথাও এতটুকু আরাম বা শান্তির ছায়াময় স্নিগ্ধ তরুতলের দেখা মেলে না!

অনন্ত জতুগৃহ মধ্যে বসিয়া কামাখ্যা সাহেবের দেহ-মন পুড়িতে লাগিল।

সহসা কে ডাকিল—জামাইবাবু···

কামাখ্যা সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখে···মুখ যেন পরিচিত! কে···?

আগন্তুক কহিল—আমি রাজীব।

রাজীব! এখনো বাঁচিয়া আছে! আশ্চর্য্য!

একটু পূর্ব্বে যে-রাজীবের নামে অতখানি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়াছে, এখন সে-রাজীবকে সামনে দেখিয়া কামাখ্যা যেন কাঁটা হইয়া গেল! কোনো মতে মুখে বলিল—ও···হ্যাঁ···রাজীব!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রূপকথা

নাই বা এলে কদম-তলে—কুঞ্জবীথি থাকুক দূরে!
রাজার কুমার ছুটাক ঘোড়া তেপান্তরে দূর সুদূরে।

আজকে প্রিয়া আমরা কেবল খেলবো মনের গোপন কোণে,
চাঁদের কিরণ নাই ছড়ালো মধুর হাসি কুঞ্জবনে;
শাওন-সাঁঝের আঁধার যদি নামে নামুক ধরার 'পরে,
তায় বা কিসের ক্ষতি মোদের? থাকবো মোরা আঁধার ঘরে!
তোমার উছল হাসির রেখা আমার ঘরে জ্বালবে আলো—
আঁধার আমি চাই সখি আজ, আঁধার আমার লাগবে ভালো!
বাহিরে বয় বাদল বাতাস করুণ কাতর নিষ্পীড়নে,
উতল বাতাস আজকে সখি কইছে কথা আমার মনে—

বলছে যেন রাজকুমারী সোনার কাঠির পরশ পেয়ে
উঠলো বেঁচে দৃষ্টি-বিহ্বল রাজকুমারের পানে চেয়ে!
তুমিই সখী রাজার কুমার, আজকে আমি রাজকুমারী—
আজকে তুমি সকল আমার—সহজ কথায় বলতে পারি।
সোনার কাঠির পরশ দিয়ে ঘুম ভাঙালে আমার মনে,
বাদল বাতাস জানায় ফাগুন, জাগলো কুসুম হৃদয়-বনে।
আজকে তুমি নাও গো সখি আজকে আমায় আপন করে'
নিঃস্ব করে' রিক্ত করে' এই বাদলের অন্ধকারে।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক গগনে যে কু-গ্রহের উদয় হইয়াছিল, গত ২৬শে জুলাই তাহা কক্ষচ্যুত হইয়াছে। ফ্যাসিজমের মন্ত্রগুরু সীনর মুসোলিনি এই দিন ইটালীর এক-নায়কত্বের গদি হইতে অপসারিত হইয়াছেন। ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমান্নুয়েল্ স্বয়ং সম্মিলিত পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনের ভার লইয়াছেন। প্রবীণ সেনাপতি মার্শাল্ বাদোগ্‌লিও প্রধান-মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজা ভিক্টর ও মার্শাল বাদোগ্‌লিও ইটালীর শাসনভার গ্রহণ করিবার পর ফ্যাসিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বহু ফ্যাসিষ্ট কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও ইটালী যে ফ্যাসিষ্ট-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। রাজা ভিক্টরের দৌর্ব্বল্যের সুযোগে যে ফ্যাসিজম্ ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রভুত্ব অপ্রতিহত রাখিবার জন্য ২১ বৎসর কাল এই নৃপতি স্বীয় রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত রাখিয়াছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মার্শাল্ বাদোগ্‌লিও ফ্যাসিজমের প্রতি প্রসন্ন না থাকিলেও ফ্যাসিষ্ট সরকারের ভৃত্যরূপে তিনি আবিসিনিয়ায় বিষ-বাষ্প ব্যবহার করিয়াছিলেন, আদ্দিস্-আবাবার ডিউক্ উপাধিতেও ভূষিত হইয়াছিলেন। পরে, ইনি ফ্যাসিষ্ট দলের সভ্যও হন। এই গুণধর মার্শাল ও দুর্ব্বলচিত্ত রাজা ভিক্টর এখন ইটালীর কর্ণধার।

কিরূপ অবস্থায় এবং কেন মুসোলিনি পদত্যাগে বাধ্য হইলেন, তাহার নির্ভরযোগ্য সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই; ইটালীকে জার্ম্মাণীর প্রয়োজনানুরূপ সাহায্যদানে অসম্মতিই যে মুসোলিনির পতনের একমাত্র কারণ—ইহা অনুমান মাত্র। সে যাহা হউক, মুসোলিনির পতনে ইটালীর প্রতিরোধের অবসান হইবে বলিয়া যে আশা পোষণ করা হইয়াছিল, তাহা ফলবতী হয় নাই। সম্মিলিত পক্ষের পণ—অক্ষশক্তি বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহারা অস্ত্র সম্বরণ করিবেন না। তাই, জেনারল আইসেনহাওয়ার ইটালীয় জনসাধারণ ও রাজা ভিক্টরের উদ্দেশে তাঁহার বেতার বক্তৃতায় কেবল ইটালীর আত্মসমর্পণই দাবী করিয়াছিলেন, কোনরূপ সর্ত্ত উপস্থাপিত করেন নাই। মার্শাল বাদোগ্‌লিও দুর্দ্দান্ত সেনাপতি; তিনি বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিবার লোক নহেন। ইহা ব্যতীত, যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার পর ইটালীর অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা না জানিয়া ইটালীর পক্ষে অস্ত্র ত্যাগ করা স্বাভাবিকও নহে। জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য ইটালী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী; অতঃপর সম্মিলিত পক্ষ যদি এই ঘাঁটী ব্যবহার করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ভীষণতা হইতে ইটালী নিস্তার পাইবে না; অর্থাৎ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন লাভ হইবে না। কাজেই ইটালীকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহারের প্রলোভন যে সম্মিলিত পক্ষ ত্যাগ করিবেন—এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত ইটালীর পক্ষে অস্ত্র ত্যাগ করা কার্য্যতঃ অসম্ভব।

ভিক্টর ইমান্নুয়েল্

সীনর মুসোলিনি

ইটালীকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখায় জার্ম্মাণীর গভীর সামরিক স্বার্থ আছে; সে আপাততঃ ইটালীকে দিয়া তাহার প্রতিরোধমূলক সংগ্রাম চালাইতে চাহে। ইটালী যদি সম্মিলিত পক্ষের সহিত পৃথক্ সন্ধি করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী প্রত্যক্ষ ভাবে বিপন্ন হইবে। তখন সমগ্র দক্ষিণ-য়ুরোপের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িবার প্রয়োজন হইবে; ইটালীয় নৌবহর হস্তচ্যুত হওয়ায় সমুদ্রবক্ষেও জার্ম্মাণী দুর্ব্বল হইবে। কাজেই, ইটালী জার্ম্মাণীকে ত্যাগ করিতে চাহিলেও জার্ম্মাণী এখন সহজে ইটালীকে ত্যাগ করিতে পারে না। এই দুই মিত্ররাষ্ট্রের মতদ্বৈধের ফলে যদি মুসোলিনির পতন ঘটিয়াও থাকে, তাহা হইলেও এখন এই দুই রাষ্ট্রের মৈত্রীবন্ধন নূতন করিয়া দৃঢ় হইয়া উঠা স্বাভাবিক। এখন মার্শাল্ বাদোগ্‌লিওর বহু অন্যায় আবদারও হিটলার সহ্য করিবেন।

ইটালীকে লক্ষ্য করিয়া সম্মিলিত পক্ষের অভিযান পরিচালিত হইবার রাজনৈতিক কারণ আছে। অবশ্য, উত্তর-আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইটালীকে আঘাতের সামরিক সুবিধাও তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক দিক্ হইতে ইটালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সম্মিলিত পক্ষ আশা করিয়াছিলেন—

যুদ্ধের অবস্থা প্রতিকূল হইবামাত্র ইটালীতে রাজনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিবে ; সে তখন স্বতন্ত্র সন্ধির জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবে। এই হিসাব অনুসারে মুসোলিনির পতনে তাঁহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিলেন। ইটালী যদি সত্যই স্বতন্ত্র সন্ধির প্রার্থী হইত, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষ বিনা অস্ত্র সঞ্চালনে যুদ্ধের একটি বড় অধ্যায়ে জয়ী হইতেন। যে কারণেই হউক, তাহা সম্ভব হয় নাই। ফলে, সম্মিলিত পক্ষ এখন যুদ্ধ-সম্পর্কে জার্ম্মাণীর পরিকল্পনার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলেন। বর্ত্তমানে ইটালীকে দিয়া প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালানই জার্ম্মাণীর সমর-পরিকল্পনা ; সম্মিলিত পক্ষকে এখন ইটালীয় ভূমিতে ইটালীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং একাধিক বড় যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিতে হইবে।

মার্শাল বাদোগ্‌লিও

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইটালীকে জার্ম্মাণীর সহিত সম্বন্ধচ্যুত করাইবার পরিকল্পনা যখন সফল হইল না, তখন অবিলম্বে জার্ম্মাণীকে অন্যান্য ক্ষেত্রে আঘাত করা প্রয়োজন। কেবল ইটালীকে লইয়া বসিয়া থাকিলে জার্ম্মাণীর সুবিধাই হইবে ; য়ুরোপে প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এবার গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণী আর পূর্ব্ব-য়ুরোপে আক্রমণাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই ; তথায় সোভিয়েট বাহিনী জার্ম্মাণীকে প্রবল ভাবে আঘাত করিতেছে। এই সময় উত্তর, পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর অঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করা প্রয়োজন ; সেই আঘাত যদি প্রবল ও ব্যাপক হয়, তাহা হইলে আগামী বৎসর জার্ম্মাণী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতে পারে। এই বিষয়ে বিলম্ব করিলে সম্মিলিত পক্ষের অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইবে ; কারণ, শীতকালে য়ুরোপের কতকগুলি অঞ্চলে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম-পরিচালন দুষ্কর।

সিসিলির যুদ্ধ—

সিসিলির যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব উপকূলে অক্ষশক্তির প্রধান প্রতিরোধ-ব্যূহ ক্যাটানিয়র পতন ঘটিয়াছে ; পশ্চিমে উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল দিয়া মার্কিণী সৈন্য এবং মধ্য অঞ্চল দিয়া ক্যানাডীয় সৈন্য দ্রুত মেসিনা প্রণালীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সময় সমুদ্র-বক্ষে বৃটিশ নৌ-বাহিনীও অত্যন্ত তৎপর। উপকূল-পথে গোলাবর্ষণ করিয়া তাহারা অক্ষশক্তির সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে ; অবিরাম গোলাবর্ষণে মেসিনা প্রণালী অলজ্ঘ্য করিয়া তুলিতেছে।

সিসিলির উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কিছু অক্ষশক্তির সেনা "দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া" শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইতোমধ্যে অক্ষশক্তির সেনা দলে দলে সিসিলি ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই মনে হয়, অক্ষশক্তি সিসিলিতে আর সৈন্যক্ষয় করিতে চাহে না। শত্রুসেনার পশ্চাদপসরণের পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সম্মিলিত পক্ষের নৌ ও বিমানবাহিনী এখন মেসিনা প্রণালীর প্রতি এবং ইটালীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে বিশেষ ভাবে অবহিত।

রুশ-রণাঙ্গন—

পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর আক্রমণাত্মক প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। গত ৫ই জুলাই জার্ম্মাণ সেনাপতি ফন্ ক্লুজ ওরেল-কুরস্ক ও কুরস্ক-বিয়েলগোরোড অঞ্চলে আক্রমণ আরম্ভ করেন। প্রথম আক্রমণে উত্তরাঞ্চলে ৫ মাইল এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ১৫ মাইল সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট সেনা অকস্মাৎ প্রবল প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে এবং ২৩শে জুলাইয়ের মধ্যে তাহাদের হৃত অঞ্চল পুনরধিকার করিয়া লয়।

রুশ সেনাপতিমণ্ডল ঐ সময় ওরেলে জার্ম্মাণীর ২॥ লক্ষ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ও নিশ্চিহ্ন করিবার সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধ করিতে থাকেন। বিয়েলগোরোড অভিমুখেও তাঁহাদের আক্রমণ চলিতে থাকে। গত ৪ঠা আগষ্ট সোভিয়েট বাহিনী ওরেল ও বিয়েলগোরোড পুনরধিকার করিয়াছে। কিন্তু ওরেলের জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিবার পরিকল্পনা সফল হয় নাই ; তাহারা উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ব্রিয়ানস্কের দিকে পশ্চাদপসরণ করিতে পারিয়াছে। উত্তরে ব্রিয়ানস্ক এবং দক্ষিণে জার্ম্মাণীর অন্যতম প্রধান ঘাঁটী খারকভের উদ্দেশে এখন সোভিয়েট বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিত হইতেছে। খারকভের তিন দিক্ হইতে আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই রুশ সেনা অগ্রসর হইতেছে। ইতোমধ্যে খারকভের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে চুগুয়েভ রুশ সৈন্যরা অধিকার করিয়াছে ; খারকভ-পলটভা রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। খারকভের পতন হইলে দক্ষিণ অঞ্চলে জার্ম্মাণী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ; ইহার পর যুদ্ধক্ষেত্র হয়ত অতি সত্বর নীপার নদীর তীর পর্য্যন্ত সরিয়া যাইবে। মধ্য-রণাঙ্গনে স্মলেন্স্কই জার্ম্মাণীর প্রধানতম ঘাঁটী ; ব্রিয়ানস্ক, উত্তরে ভোলকাইলুকি এবং উত্তর-পূর্ব্বে ভিয়াস্‌মা হইতে এই স্মলেন্স্ক অভিমুখে আক্রমণ প্রসারিত করাই সোভিয়েট সেনাপতিদিগের উদ্দেশ্য।

এবার গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণীর আক্রমণ যে এই ভাবে ব্যর্থ হইবে এবং নাৎসী সেনাদল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিরোধে রত থাকিতে বাধ্য হইবে, তাহা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। রুশিয়ার বিরুদ্ধে শেষবার প্রবল অভিযান চালাইয়া তাহার সমর-শক্তি চূর্ণ করিতে প্রয়াসী হওয়াই জার্ম্মাণীর পক্ষে স্বাভাবিক। এই ভাবে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের শেষ ক্ষীণ আশা তাহার ছিল। বস্তুতঃ, এই আশা লইয়া সে আক্রমণেও প্রবৃত্ত হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর এই শেষ আশা যখন বিফল হইয়াছে, তখন প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে কালক্ষয় করিয়া যুদ্ধে অচল অবস্থা আনয়ন এবং সম্মিলিত পক্ষে সন্ধির জন্য আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াসই তাহার একমাত্র অবশিষ্ট পন্থা। কাজেই, এখন কি পূর্ব্ব-য়ুরোপ, কি উত্তর ও দক্ষিণ-য়ুরোপ—সর্ব্বত্র জার্ম্মাণী প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কালক্ষয় করিতে প্রয়াসী হইবে এবং

সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে বিভেদ ও পারস্পরিক সন্দেহ সৃষ্টির জন্ত কূটনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিতে থাকিবে। ভবিষ্যতে রণক্ষেত্র অপেক্ষা কূটনীতিক্ষেত্রেই জার্ম্মাণীর তৎপরতা অধিক প্রকাশ পাইবে বলিয়া মনে হয়।

জাপানের রুশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা ?

যুরোপে অক্ষশক্তির অবস্থা যে অত্যন্ত প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ষ্টালিনগ্রাড ও টিউনিসিয়া তাহাকে প্রবল আঘাত দিয়াছে, সিসিলি ও তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপাবলী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সে ভূমধ্যসাগরে দুর্ব্বল হইয়াছে, পশ্চিম-যুরোপে ক্রমবর্দ্ধমান বোমাবর্ষণের ফলে তাহার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, যুরোপখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণাশঙ্কা তাহাকে সন্ত্রস্ত রাখিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, যুদ্ধের এই গতি পরিবর্ত্তনের জন্ত অক্ষশক্তি এখন তাহাদের প্রাচ্য সহচরকে রুশিয়া আক্রমণের জন্ত প্ররোচিত করিবে। এই অনুমানের সমর্থনে তাঁহারা বলেন—বের্লিনস্থিত জাপ-দূত সম্প্রতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন এবং টোকিওর জাপ পররাষ্ট্র-সচিবের সহিত পুনঃ পুনঃ আলাপ করিয়াছিলেন। এইটুকু সংবাদে ভিত্তি করিয়া জাপানের রুশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। অক্ষশক্তির বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে জাপানের রুশিয়া আক্রমণ সম্ভবপর মনে হইতে পারে; যুদ্ধের গতি ফিরাইবার জন্ত ইহাই অক্ষশক্তির শেষ উপায়। যুরোপে জার্ম্মাণী যদি পরাজিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র অক্ষশক্তির চরম সমাধি অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইবে; জাপানে টোজো কোম্পানীর অন্তর্ধানে বিলম্ব হইবে না।

পূর্ব্ব দিক্ হইতে রুশিয়াকে আঘাত করিবার প্রয়োজন বোধ হইবামাত্রই যে জাপান এই দারুণ বিপজ্জনক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা মনে করা যায় না। রুশিয়া পশ্চিম রণক্ষেত্রে যতই বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকুক না কেন, উহাতে পূর্ব্বাঞ্চলে তাহার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই। জাপানের সহিত যে কোন মুহূর্ত্তেই তাহার সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইতে পারে—ইহা জানিয়াই রুশিয়া তাহার সমর-পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। মাঞ্চুকোয় ১০ লক্ষ সৈন্তের অবস্থিতির কথা চীনা রাজনীতিকদিগের নিকট পৌঁছিল; কিন্তু রুশ রাজনীতিকগণ তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেন না—ইহা কখনও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে রুশিয়া ব্যাপক সমরায়োজন করিয়াছে; পশ্চিমাঞ্চলের সহিত পূর্ব্বাঞ্চলের এই আয়োজনের সম্পর্ক নাই—স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী, স্বতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র এবং স্বতন্ত্র গোলাগুলীর কারখানা পূর্ব্ব-এশিয়ায় প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় জাপান যে এক আঘাতে রুশিয়ার কিছুই করিতে পারিবে না—ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্ব-রুশিয়ায় যদি কিছু কাল যুদ্ধ চলে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান যদি নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে পশ্চিম দিকে রণক্ষেত্র সরাইয়া লইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে জাপান নিজে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। রুশিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলেই জাপানে প্রত্যক্ষ বিমান-আক্রমণের সর্ব্বোত্তম ঘাঁটী; এই ঘাঁটী ব্যবহারের সুযোগ পাইলে, সম্মিলিত পক্ষ এত দিন যে অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন, তাহা দূর হইবে। ইহা ব্যতীত অবরুদ্ধ চীনে

আমেরিকার দূর পাল্লার বোমাবর্ষী বিমানগুলি জাপানের উত্তরে কিউ-রাইল দ্বীপপুঞ্জে বোমা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে অতর্কিতে সৈন্ত অবতরণ করাইয়া জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাতের পরিকল্পনা হয়ত আমেরিকার আছে। এই সময় জাপনকে আঘাত করিবার জন্ত পূর্ব্ব-এশিয়ার ঘাঁটী ব্যবহারের সুযোগ যদি সম্মিলিত পক্ষের হয়, তাহা হইলে জাপান অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় জাপানের পক্ষে রুশিয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ ব্যাপার নহে; এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে জেনারল টোজো বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিবেন।

সুদূর প্রাচী—

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সম্মিলিত পক্ষের মুণ্ডা অধিকার। সলোমন্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে নিউ জর্জ্জিয়ায় মুণ্ডা জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী ছিল। সম্প্রতি এই ঘাঁটী সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাফল্যে অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু জাপানকে এই ভাবে পরাজিত করিবার আশা বাতুলতা। প্রশান্ত মহাসাগরের এক একটি দ্বীপ হইতে জাপানকে বিতাড়িত করিতে যদি এত সময় অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষের জাপানী দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিতে শতাব্দী কাল অতিবাহিত হইবে।

তবে, একটি আশার কথা—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে যে ভাবে জাপানের নৌ ও বিমান-বাহিনী পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহাতে যে অতি সত্বর সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; এই ক্ষতিপূরণের উপযোগী উৎপাদন-শক্তি জাপানের নাই। জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নৌ-যুদ্ধের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্থলভাগে জাপানের সহিত শক্তি-পরীক্ষার পূর্ব্বে সমুদ্রবক্ষে তাহাকে যদি হীনবল করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে পরাভূত করা অত্যন্ত দুষ্কর হইবে। কাজেই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান নৌ-যুদ্ধে পরাভূত হইতে থাকিলে স্থলভাগে তাহার চরম পরাজয়ও নিকটবর্ত্তী হইবে।

সম্মিলিত পক্ষ বর্ষার পরে ব্রহ্ম-অভিযানের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতেছেন। এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশে তাঁহাদের বিমান-আক্রমণের প্রাবল্য সম্প্রতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ প্রসারিত হইবার পূর্ব্বে ভারত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের সহিত জাপানের প্রবল শক্তি-পরীক্ষা হইবে; সেই শক্তি-পরীক্ষার ফলাফলের উপরই ব্রহ্ম-অভিযানের ফলাফল বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবে। কাজেই, প্রশান্ত মহাসাগরের নৌ-যুদ্ধের সহিত ব্রহ্ম-অভিযানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রশান্ত মহাসাগরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জাপান যদি ভারত মহাসাগরে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে সে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িবে।

ব্রহ্মদেশে বসিয়া জাপান কেবল সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধের আয়োজনই করিবে, কি ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ প্রসারিত হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ব-ভারতে আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা দুষ্কর। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধই জাপানের প্রকৃত জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম।

ব্রহ্মচীন পথ উন্মুক্ত হইবে এবং চীনের শক্তি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। চীনের শক্তিবৃদ্ধিই জাপানকে পরাভূত করিবার একমাত্র নিশ্চিত উপায়। কাজেই, ব্রহ্মদেশ রক্ষার জন্য জাপান যে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্রহ্মদেশ রক্ষার প্রয়োজনে সে পূর্ব্ব-ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতভূমিতে রণক্ষেত্র প্রসারিত করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারে। বিশেষতঃ, ভারতের রাজনীতিক জটিলতা ও শোচনীয় অর্থনীতিক অবস্থা জাপানকে উৎসাহিত করিবার সম্ভাবনা আছে। সে এই অলীক আশা পোষণ করিতে পারে যে, এই সময় ভারতের বেসামরিক জনসাধারণ তাহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া গ্রহণ করিবে; তাহাদের সহযোগে রণক্ষেত্রে জাপান-সেনার দায়িত্ব লঘু হইবে।

মিঃ চার্চ্চিলের সফর—

গত ১০ই আগষ্ট মিঃ চার্চ্চিল পুনরায় আমেরিকায় গিয়াছেন। কুইবেকে মার্কিণী রাষ্ট্রনায়কদিগের সহিত তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এবার কেবল য়ুরোপের যুদ্ধ সম্পর্কেই নহে—জাপানের বিরুদ্ধে আসন্ন অভিযান সম্পর্কেও কুইবেকে আলোচনা হইবে বলিয়া মনে হয়। তবে, আলোচনা সামরিক প্রসঙ্গেই নিবদ্ধ থাকিবে। জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সহিত ভারতের ও ব্রহ্মদেশের রাজনীতিক প্রশ্ন বিশেষ ভাবে জড়িত। কিন্তু এই বিষয়ে কুইবেকে যে কোনরূপ আলোচনা হইবে না, তাহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১২।৮।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন

বাঙ্গালার এই ঘোর দুর্দ্দিনেও যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশন ২৬শে আষাঢ় চন্দননগরে নিত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা সত্যই আনন্দের বিষয়। বঙ্গভাষা এবং বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি, বঙ্গভাষার প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদর্শন এবং ভাষার বহুল প্রচার ও প্রসার কামনাই এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত হরিহর শেঠ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চন্দননগরের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে চন্দননগরের অবদানের উল্লেখ করিয়া গর্ব্ব করিবার মত তেমন কিছু না থাকিলেও ভারতচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়স্থানরূপে; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের উদ্বোধন-স্থানরূপে; আত্মোৎসর্গের অতুল্য দৃষ্টান্ত কানাইলালের জন্ম-স্থানরূপে; মাইকেল, বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল, ভূদেব, বঙ্কিম, নবীনচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গভারতীর সুসন্তানদিগের স্মৃতি-বিজড়িত তাঁহাদিগের বাঞ্ছিত স্থানরূপে; জয়পুর মানমন্দিরের অন্যতম নির্ম্মাতা জ্যোতিষী ফাদার পঁ ও বুদিয়ে, বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নব সংস্করণের প্রকাশক ফাদার গেঁরার প্রবাস-বাসের স্থানরূপে; কবি পাঁচালী তর্জ্জা যাত্রার আদি অন্যতম প্রবর্ত্তক রাসু, নৃসিংহ, নিত্যানন্দ, আণ্টুনি সাহেব, চিন্তেমালা, বাণভট্ট, গুরুবল্লভ, বউমাষ্টার, মহেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির বাসস্থান ও কর্ম্মক্ষেত্ররূপে আমরা আমাদিগের জন্মস্থান এই চন্দননগরের জন্য গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। * * বাঙ্গালী যদি জগতে কালজয়ী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে জাতীয় ভাষা, জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা চাই-ই এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতির মধ্যে ভাষার বিস্তার সাধন আবশ্যক।"

সম্মেলনের মূল সভাপতি রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার অভিভাষণে বিশ্বসাহিত্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"বাংলা গদ্য সাহিত্য সেইরূপ, যে আজ সভ্য জগতের দরবারে একটি সম্মানিত আসন অধিকার করবার স্পর্দ্ধা করছে, তার কারণ এর পিছনে আছে পদ্য সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্য। এখনও আমাদের বাংলা কাব্য-সাহিত্য বিশ্বের বিস্ময়ের সামগ্রী। সুতরাং আমরা এ কথা গৌরব করেই বলতে পারি যে, কি পদ্যে, কি গদ্যে অধিকার করবার যোগ্যতা রাখে।··· জননী বঙ্গভাষার স্নেহ-কোমল সূত্রে দুইটি বড় জাতিকে বাঁধতে পারতো—কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য, তা হলো না। এক দিন হয়ত হবে। হয়ত কেন? নিশ্চয় হবে। এক দিন হয়েছিল, যখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কণ্ঠে কণ্ঠে সঙ্গীত মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল চারুশিল্পে ভাস্কর্য্য মহিমা-মণ্ডিত হয়েছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ না করেও এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি যে, বঙ্গভাষা-জননীর প্রসাদে আমাদের উভয় শাখার মধ্যে যে সংস্কৃতিগত ঐক্য গড়ে উঠেছে, তা সাময়িক স্বার্থান্ধতায় ক্ষুণ্ণ হলেও চিরদিন সে ঐক্যকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সুললিত আবেগময়ী ভাষায় সাহিত্য কি? তাহার উদ্দেশ্য কোথায়? তাহার সার্থকতা ইত্যাদির আলোচনা সম্বন্ধে বলেন—"সাহিত্যকে শুধু কবিতা ও উপন্যাসের বন্ধন থেকে সর্ব্বমানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং জীবন-সংগ্রাম ও জীবনকর্ম্মের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে, তাকে অবসর-বিনোদনের বিলাসিতা থেকে কঠোরতর বাস্তবতার অগ্নিদাহিকার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে, আত্মানুসন্ধান ও মুক্তির সন্ধান হবে আমাদের জিজ্ঞাসা এবং সেই জিজ্ঞাসার বাহনরূপে দেখা দিবে নূতনতর সাহিত্যের চিন্তা।"

বিজ্ঞান-শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদার বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে সচেষ্ট হইবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যাহাতে সত্বর বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই দুরূহ কার্য্য এক মাতৃভাষার সাহায্যেই সম্ভব। জগদীশচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষার সাহায্যেই বিজ্ঞানের আলোচনা করা উচিত। তাই তিনি প্রায় ৫২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি বাংলা ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন, এমন কি, তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলির নামকরণ বাংলা ভাষাতেই করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র চিরদিন বিজ্ঞানসেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টা বিফল হয় নাই। এখন আমাদের বিজাতীয় ভাষার মোহ প্রায়

খাদ্য-সমস্যা

বাঙ্গালায় খাদ্য-সমস্যার সমাধান হওয়া ত পরের কথা, সে সমস্যা দিন দিন অধিক তীব্র হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা কলিকাতা কর্পোরেশনে বিবৃত একটি ঘটনায় বুঝা যায়। হিন্দু সংকার সমিতি এক দিনে কলিকাতার রাজপথ হইতে ২৭টি শব শ্মশানে লইয়াছেন। ইহার সহিত যদি মুসলমান সৎকার সমিতির হিসাব যোগ করা যায়, তবে দেখা যাইবে—যে কলিকাতা বাঙ্গালার রাজধানী—যে কলিকাতায় বাঙ্গালার গভর্ণর বিরাজিত—সেই কলিকাতার রাজপথে যদি প্রতিদিন অনাহারে এইরূপ লোক মরিয়া পড়িয়া থাকে, তবে মফঃস্বলে অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, কলিকাতায় লোককে চাউল ও গম দিবার—যেমনই কেন হউক না—ব্যবস্থা আছে জানিয়া মফঃস্বল হইতে লোক কলিকাতায় আসিতেছে—অনেকে যে পথেই মরিতেছে, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাঙ্গালা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব—মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী সচিব হইয়া বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অভাব যদি থাকে, তবে তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে—থাকিলে সে অভাব অনায়াসে অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানীর দ্বারা পূর্ণ করা যাইবে। তাহার পর তাঁহার সুর ক্রমেই—অনাহার ক্লিষ্টের কণ্ঠস্বরের মত—ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—পাছে অভাবের উল্লেখ করিলে লোক ভয় পায়, সেই জন্য এবং কেন্দ্রী সরকারের প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—অভাব নাই। অর্থাৎ তিনি মিথ্যা কথা বলিলেও তাহা খাঁটী মিথ্যা নহে!

কেন্দ্রী সরকারের প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হয় নাই। কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য সার আজিজুল হক যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর উক্তির সহিত "তুল্য-মূল্য।" তিনি বলিয়াছেন—যখন অন্যান্য প্রদেশের আপত্তিতে খাদ্য-শস্যে অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থা বাতিল করিতেই হইল, তখনও তিনি হাল ছাড়িলেন না। তিনি ও যান-সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল সব ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে লাহোরে গমন করিলেন। তথায় যখন তাঁহারা সব বাধা অতিক্রম করিবার উপায় করিতে পারিলেন—ঠিক সেই সময়ে—বাঙ্গালার এমনই দুরদৃষ্ট যে—দামোদরের বন্যায় রেলপথ ভাঙ্গিল। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টার ত্রুটি হইল না। তাঁহারা স্থলপথ না পাইয়া জলপথ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন—জাহাজে বাঙ্গালায় গম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। দুইখানি জাহাজে গম বোঝাই করাও হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ দুইখানিরই কল বিগড়াইয়া গেল! এখনও জাহাজের কল সংস্কৃত হইতেছে। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কেহ নিবারণ করিতে পারে না; কিন্তু যে জাহাজে মাল বোঝাই করিবামাত্র তাহার কল অচল হয়, সে জাহাজ কোথা হইতে কে সংগ্রহ করিয়াছিল? এ দিকে যে বাঙ্গালায় লক্ষ লক্ষ লোকের দেহের কল অচল হইতেছে—তাহার

দিয়া—অব্যাহতি লাভ করা যায় বটে, কিন্তু ভগবানের কাছেও কি তাহা হইতে পারে?

সার আজিজুল হক যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, দামোদরের বন্যার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গম পাঠাইবার আবশ্যক ব্যবস্থাও হয় নাই?

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এ বার বাঙ্গালার অবস্থার সহিত "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" সময়ে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন—এ যেন পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন হইতেছে।

যুদ্ধের জন্যই যে বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা প্রধানতঃ ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ:—

(১) যুদ্ধের জন্য (ব্রহ্ম অধিকারচ্যুত হইবারও পূর্ব্বে) ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছিল—এখন তাহা আমদানী হইতেই পারে না।

(২) ব্রহ্ম জাপান কর্তৃক অধিকৃত হইলে বহু নরনারী তথা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে—অনেকে বাঙ্গালার পথে মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে গিয়াছে।

(৩) সামরিক প্রয়োজনে বাঙ্গালায় বহু সৈন্য রাখিতে হইয়াছে।

এই সকল কারণেও যে বাঙ্গালা সম্বন্ধে কেন্দ্রী সরকারের বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা বলা বাহুল্য। কেন্দ্রী সরকার সে দায়িত্ব-বিষয়ে কি অবহিত হইয়াছেন?

বাঙ্গালায় যখন চাউলের অভাব, তখনও যে বাঙ্গালা হইতে চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিদেশ হইতে গম আনাইবার কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। মধ্যে যে বলা হইয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়া হইতে কয় জাহাজ গম ভারতে আমদানী হইয়াছে, তাহা সত্য হইলেও অর্দ্ধসত্য। কারণ, ঐ গম ভারতের জন্য উদ্দিষ্ট ছিল না—ইরাকে বা ইরাণে—অথবা উভয় দেশে যাইতেছিল। সেই সময় ভারতে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব অত্যন্ত অধিক হওয়ায় (হয়ত বা সৈনিকদিগের প্রয়োজনে) জাহাজ কয়খানি ভারতবর্ষে আনিয়া গম লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে আবার গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঋণ শোধ করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে যদি ইরাকে বা ইরাণে গম পাঠান সম্ভব হয়, তবে ভারতেই বা হয় না কেন; সে বিষয়ে কি আবশ্যক চেষ্টা হইয়াছে বা হইতেছে?

বাঙ্গালার যে খাদ্য-সচিব লোককে অভয় দিয়াছিলেন, চাউলের অভাব হইবে না; তিনিই আজ তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—ভাত পাইবার সম্ভাবনা অল্প—সুতরাং ফেন খাইতে থাক। তিনি সরকারী সদাব্রত খুলিবার পূর্ব্বে সদাশয় ব্যক্তিদিগকে সদাব্রত খুলিতে আহ্বান করিতেছেন। দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন না। তিনি যে ফেনের কথা বলিতেছেন, তাহারও "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" ঠিক করিয়া দিবেন এবং কেহ বিতরণ করিতে চাহিলে সরকারী খানাঘরে তাহা কিনিতে পাইবেন। তিনি যেমন ভাবে বাঙ্গালা সরকারের পক্ষে চাউল

ইস্পাহানীকে দিয়াছিলেন, তেমনই কি এই ফেন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিবার ঠিকাও কাহাকেও দিয়াছেন বা দিতেছেন?

তিনি তাঁহার ঐ ফেনের উপকরণের পরিচয় দিয়াছেন :—

"কলে পিষ্ট বা হাতে চূর্ণ করা জওয়ার, বাজরা, গম, চীনাবাদাম, নানারূপ ডাল এবং বহু পরিমাণে কুমড়া বা মিঠা আলু প্রভৃতির সঙ্গে ছিটাকোঁটা চাউল ফেলিয়া তাহার সঙ্গে পেঁয়াজ ও হলুদ—অবশ্য একটু লবণও দিয়া—সিদ্ধ করিলেই এই ফেন হইবে। তাহা কেবল বলকারকই নহে—পরন্তু মুখরোচকও বটে।"

ঐ ফেন ২ ছটাক—অভাবে দেড় ছটাক আত্মস্থ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

অবশ্য এ বিষয়ে পরীক্ষা সচিবরা আপনারা করিয়াছেন কি না এবং যে গভর্ণর সার জন হার্বার্ট খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘকে পদত্যাগ করাইয়াছিলেন তাঁহাকেও পরীক্ষা করিতে বলিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না।

তবে কলিকাতায় একটি সদাব্রত উদ্বোধন উপলক্ষে জাষ্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত অনেকেই একমত হইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের শোচনীয় ও লজ্জাজনক ভুলের জন্যই আজ এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

এই সকল ভুলের জন্য দায়ী কে?

ভুল যে কেন্দ্রী সরকার যেমন, প্রাদেশিক সরকারও তেমনই করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার পরিচয় আমরা দিয়াছি। কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায় কি?

আজও যে বাঙ্গালার গভর্ণর হইতে বাঙ্গালার সচিবরা কেহ কোন সাহায্যদান কেন্দ্রে তাঁহাদিগের বেতনের অনুপাতে সাহায্য দিয়াছেন, এমন কথা বাঙ্গালার লোক শুনে নাই।

যে দিন কেন্দ্রী পরিষদে খাদ্য-দ্রব্য সম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ হয়, সেই দিনই ঘোষিত হয়, সার আজিজুল হক খাদ্য-সদস্যের পদ ত্যাগ করিবেন এবং পরদিন হইতেই সার জে, পি, শ্রীবাস্তব সেই পদের ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এ দেশে সরকারী কাযে প্রায়ই দেখা যায়—হাকিম যাইলেও হুকুম বহাল থাকে। সেই জন্যই আজ আমরা তাঁহার উক্তির আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

সার আজিজুল বলিয়াছিলেন :—

বোধ হয় কোন প্রদেশই দেশে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। কেবল বাঙ্গালার দোষ নহে।

অবশ্য তাঁহার এই উক্তিতে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ সন্তুষ্ট হইবেন; কারণ, ইহা সেই "দশে মিলি করি কায" হইতেছে। কিন্তু ইহাতে সকল প্রদেশের সরকারেরই যে ক্রটি স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য প্রদেশ যাহাই কেন বলুন না—তাহা সরকারের ব্যবস্থার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। প্রদেশে খাদ্য-শস্যের অবস্থা কিরূপ, তাহাও না জানা যে কোন সরকারের পক্ষে লজ্জার কথা এবং যে ব্যবস্থায় তাহা হয় তাহার প্রতীকার প্রয়োজন। সে বিষয়ে কেন্দ্রী সরকার কি করিয়াছেন?

কেন্দ্রী সরকার বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই প্রদেশ চতুষ্টয় লইয়া "পূর্ব্বাঞ্চল" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যয়বহুল নূতন পদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা এই "পূর্ব্বাঞ্চলে" খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম কার্য্যের সমর্থনে সার আজিজুল বলেন, বাঙ্গালার অবস্থা প্রতীকারাতীত হইয়া উঠিতেছিল দেখিয়া উপায়ান্তর না থাকায় সরকারকে ঐ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

যদি তাহাই হয়, তবে কেন্দ্রী সরকার কি জন্য তাহা বজায় রাখিলেন না?

সার আজিজুল যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ত উহা বহাল রাখার প্রয়োজনই প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলিয়াছেন, ঐ অবস্থায় অভাবগ্রস্ত প্রদেশে খাদ্য-শস্য আমদানীতে আসন্ন বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ সম্ভব হইয়াছিল। যদি সে ব্যবস্থা রক্ষা করা যাইত, তবে কোন কোন স্থানে খাদ্য-শস্যের মূল্য কিছু বর্দ্ধিত হইলেও মূল্যের সমতা রক্ষিত হইত ও মূল্য, মোটের উপর হ্রাস পাইত। কিন্তু, অবাধ বাণিজ্যনীতি ঘোষিত হইবার পর হইতেই তাহার প্রচলন-পথে নানারূপ বাধা স্থাপিত হইতে থাকে—যে সকল মাল ক্রীত হইয়াছিল, সে সকল সরকারের জন্য গৃহীত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীত মালের কতকাংশ অল্প মূল্যে দিতে ক্রেতাকে বাধ্য করা হয়; মজুদদারদিগকে ঝাঁপ বন্ধ করিতে আদেশ করা হয়; ব্যবসায়ীদিগকে মাল বিক্রয় করিতে, ষ্টেশন-মাষ্টারদিগকে মালগাড়ী দিতে ও গো-যানের চালকদিগকে মাল বহন করিতে নিষেধ করা হয়; ব্যবসায়ী এজেণ্টদিগকে গ্রেপ্তার ও মামলাসোপর্দ্দ করা হয়—ইত্যাদি। কাযেই, অবাধ-বাণিজ্যনীতি রক্ষিত হয় নাই। একটি প্রদেশে সরকার গত জানুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত সস্তায় চাউল না কিনিলেও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলেই আপনাদিগের প্রদেশের জন্য চড়া দরে চাউল কিনিয়া সঞ্চয় করিতে থাকেন।

সার আজিজুল কোন্ প্রদেশে এইরূপ হইয়াছে, তাহা বলেন নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালার খাদ্য-সচিব মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী পূর্ব্বেই উড়িষ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে লোকের সে বিষয় অনুমান করিতে বিলম্ব হইবে না।

কিন্তু অবস্থা যখন এইরূপ—ভারতের এক প্রদেশ যখন অন্য প্রদেশের দুর্দ্দশায় এত উদাসীন, তখন কি—

(১) কেন্দ্রী সরকার তাঁহাদিগের চরম দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারেন না? তাঁহারা যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা উপাপিত করেন, তবে কি আমরা বলিতে পারি না—বহু ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে? ভারত সরকারই কি বাঙ্গালা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন?

(২) বাঙ্গালা সরকার কি—

(ক) কেন্দ্রী সরকারকে যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত সৈনিক প্রভৃতির আহার্য্য যোগাইতে বলিয়াছেন?

(৩) উড়িষ্যা, বিহার বা আসাম বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় বাণিজ্য করিতে চাহিলে—বাঙ্গালীর শবের উপর আপনারা প্রাচুর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে সেই সকল প্রদেশের লোককে—সঙ্কটকালে—বাঙ্গালা হইতে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

উড়িষ্যায় ও আসামে যে সচিবসঙ্ঘ রহিয়াছে, তাহা সরকারের অনুগ্রহ ও সাহায্য ব্যতীত এক দিনও থাকিতে পারে না। সেই সকল সচিবসঙ্ঘ যখন বাঙ্গালার, অন্য প্রদেশের, দুর্দ্দশার উপর

আপনাদিগের স্থায়িত্ব রক্ষিত করিতে চাহেন, তখনও কি কেন্দ্রী সরকার তাঁহাদিগের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগের সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না? বিহারে ত তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনও নাই। তথাপি যদি সে প্রদেশ বাঙ্গালার দুর্দ্দিনে বাঙ্গালাকে আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল দিতে অস্বীকার করে, তবে কি সে জন্য গভর্ণরকেই দায়ী করিতে হয় না?

সার আজিজুল হক বলিয়াছেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিতেছেন। তাহা কি সার জে, পি, শ্রীবাস্তব সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিবেন? আর যদি তাহা হয়, তবে যত দিনে সে ব্যবস্থা হইবে, তত দিনে বাঙ্গালার কত লোক অনাহারে মরিয়া খাদ্য-সমস্যার সমাধান-পথ পরিষ্কৃত করিবে?

গত ২৭শে শ্রাবণ কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল, ইণ্ডিয়ান, মুসলিম ও মাড়বারী বণিক্‌সঙ্ঘ-চতুষ্টয় কেন্দ্রী সরকারকে তার করিয়াছিলেন—তাঁহারা শুনিয়াছেন, সম্প্রতি দেশ হইতে বহু পরিমাণ চাউল দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করা হইয়াছে। বণিক্‌সঙ্ঘ-চতুষ্টয় ইহাতে আপত্তি করিয়া জানাইয়াছেন, যে সময় এ দেশে চাউলের একান্ত অভাব এবং সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—ভারতবর্ষের কোন স্থান হইতে বিদেশে চাউল-রপ্তানী করা হইবে না, সেই সময় এই রপ্তানী বিশেষ অসঙ্গত। আর যে দক্ষিণ আফ্রিকা আজ তথায় ভারতীয়দিগকে মনুষ্যের অযোগ্য অপমানে লাঞ্ছিত করিতেছে—সেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাউল দিয়া সাহায্য করা ভারতবাসীর জাতীয় আত্মসম্মান-জ্ঞানে দুরন্ত আঘাত করা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবাসীর সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহা ভারত-সরকারেরও অবিদিত থাকিবার কথা নহে। এক বার দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার খনিতে ভারতীয় শ্রমিক-দিগের প্রতি কুব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—সে দেশ হইতে যে কয়লা আসিবে, তাহা বেত্রাহত ভারতবাসীর রক্তে সিক্ত।

এখন যদি সেই দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্যার্থ ভারতবর্ষের নিরন্ন নরনারীর মুখের গ্রাস প্রেরণ করা হয়, তবে আর বলিবার কি থাকিতে পারে?

কেন্দ্রী সরকার চেম্বার অব কমার্স সমূহের কথার আংশিক প্রতিবাদ ২৯শে শ্রাবণ করিয়াছেন। তাঁহারা এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় এ দেশ হইতে চাউল রপ্তানী হইয়াছে এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প—বর্ত্তমান বৎসরে মাত্র ৭ শত ২৭ টন—কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়াছে—আর সে-ও ভারতীয় নাবিকদিগের জন্য। যদি তাহাই হয়, তবে কি আমরা বলিতে পরি না—এ দেশে যে লক্ষ লক্ষ বৃটিশ ও মার্কিণ সৈনিক আছে এবং বড়লাট ও জঙ্গীলাট হইতে সার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল, সার এডওয়ার্ড বেন্থল প্রভৃতি ইংরেজ মজুদ আছেন, এই সময়ে তাঁহাদিগের জন্য তাঁহাদিগের দেশ হইতে—অন্ততঃ সাম্রাজ্যের বাহির হইতে ভারতে গম প্রভৃতি আমদানী করাই কি অসম্ভব?

গত জানুয়ারী মাসেও পারস্যোপসাগরে ২ হাজার টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। কেন? পারস্যোপসাগরেও কি "অন্নভোজী" ভারতীয় আছে? যে সময় বাঙ্গালায় এক সের চাউলেও এক জনের জীবন একাধিক দিন রক্ষিত হইতে পারে, সেই সময় এই ২ হাজার টনের মূল্য কি অল্প?

সরকারী বিবৃতিতে কেবল কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী চাউলের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে আরও বন্দর আছে। সে সকল হইতেও চাউল রপ্তানী হয় নাই ত?

কেন্দ্রী সরকার আপনাদিগের কার্য্যের সমর্থনকল্পে বলিয়াছেন:—

"১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে মোট ৯ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য বিদেশে পাঠান হয়। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার পরিমাণ—৫৫ হাজার টন হয়; ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহা ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন হয়। এই ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টনের অর্দ্ধাংশ সিংহলে প্রেরিত হয়। তথায় ৮ লক্ষ ভারতীয় কায করিতেছে এবং ব্রহ্ম ও মালয় জাপানের হস্তগত হওয়ায় তাহাদিগকে চাউলের জন্য ক্রমেই ভারতবর্ষের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পারস্যোপসাগরে, আরবে, ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে ও আফ্রিকার বন্দরসমূহেও চাউল গিয়াছে। সে সকল স্থানে ভারতীয় সম্প্রদায় আছে এবং দীর্ঘকাল ভারতের সহিত ব্যবসা ও রাজনীতিকসূত্রে বদ্ধ সম্প্রদায়ও বিদ্যমান।"

১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে যে রপ্তানী খাদ্য-শস্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর কল্যাণকল্পে—তাহাদিগের খাদ্যাভাব মোচনের জন্য, কি সমুদ্রপথ জাহাজের পক্ষে সঙ্কটসঙ্কুল বলিয়া তাহা প্রকাশ নাই। বৃটেন বহুদিন ভারতের সহিত বাণিজ্য ও রাজনীতিক সূত্রে বদ্ধ। সেই কারণে কি বৃটেনেও চাউল রপ্তানী সমর্থিত হইতে পারিবে?

সিংহলে যে ৮ লক্ষ ভারতীয় কায করিতেছে—তাহারা কাহা-দিগের কায করিতেছে? তাহাদিগের জন্য চাউলের ব্যবস্থা করা কি তাহাদিগের নিয়োগকারীদিগেরই কর্ত্তব্য নহে? সে জন্য ভারত সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ কি, তাহাই কি ভারতবাসীর জিজ্ঞাস্য নহে। সিংহলের সরকার ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সদ্ব্যবহার? না—অসদ্ব্যবহার? সেই সিংহলে ভারতীয়গণের জন্য ভারতবর্ষ অনাহারে থাকিয়া চাউল পাঠাইবে কেন?

যদি বিদেশে ভারতবাসীকে খাওয়াইবার দায়িত্ব ভারত সরকারের থাকে, তবে এ দেশে ইংরেজ ও মার্কিণীদিগকে খাওয়াইবার জন্য কি বৃটেন ও মার্কিণ হইতে খাদ্য-দ্রব্য আমদানী করা সঙ্গত বলা যায় না?

সার ব্যারণ জয়তিলক এ দেশে চাউলের সন্ধানে আসিবার পূর্ব্বে এ দেশের লোক সিংহলকে চাউল প্রদানজন্য ভারত সরকারের প্রতি-শ্রুতির বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। সে কথা কি জন্য গোপন রাখা হইয়াছিল? সামরিক প্রয়োজনই কি তাহার কারণ?

এ দেশে কি দক্ষিণ আফ্রিকার লোক নানা কারণে নাই? যদি

ভারত সরকারের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—ভারতীয় খালাসী ব্যতীত আর কাহারও জন্য এখন আর ভারত হইতে খাদ্য-শস্য রপ্তানী করা হইতেছে না। যখন বাঙ্গালার লোককে চাউলের অভাবে বাজরা, জওয়ারও খাইতে বাধ্য হইতে হইতেছে, তখন কি বিদেশে ভারতীয় খালাসীদিগকে সেই সেই দেশের খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করা অসম্ভব?

এ দিকে বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ বৈঠকের পর বৈঠক বসাইয়া "বিবেচনা" করিতেছেন। যদি বৈঠকে ও বিবেচনায় নিরন্নের অন্নাহার হইত, তবে বাঙ্গালী আজ অতিভোজনে অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইত। এই সকল বৈঠকে ও বিবেচনায় বুঝা যায়—তাঁহারা কি কর্ত্তব্য তাহা জানেন না—অন্ধকারে পথের সন্ধানমাত্র করিতেছেন। শেষ নির্দ্ধারণ—"চাউলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, সরকারের নিয়ন্ত্রণে যে সকল স্থানে অধিক চাউল আছে, সে সকল স্থান হইতে অভাব-পীড়িত স্থানে চাউল আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর সে জন্য অবিলম্বে বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া এক কমিটী গঠিত করা হইবে।"

এই সকল বিশেষজ্ঞকে কোথা হইতে কে আমদানী করিবেন? আমরা দেখিয়াছি বে-সরকারী সরবরাহ বিভাগ পুলিস হইতেও লোক বাছাই করিয়া লইতেছেন। পুলিসে চাকরীয়ারা কি খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন? সে অভিজ্ঞতা কিরূপ?

পূর্ব্বাঞ্চলে (বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ চতুষ্টয়ে) যে অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বাতিল হইয়াছে। কিন্তু এখনও কি মেসার্স ইস্পাহানী বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে চাউল কিনিবার ঠিকা সম্ভোগ করিতেছেন না? মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ইঁহাদিগের যোগ্যতার পরিচয়ে বলিয়াছিলেন—ইঁহারা মসলেম লীগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন। তাহাও কি যোগ্যতার পরিচায়ক?

মেসার্স ইস্পাহানীকে বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে কত টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের সহিত কি চুক্তি হইয়াছে, তাহা কি প্রকাশ করা হইবে? মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন, বাঙ্গালার গভর্ণর বিনাচুক্তিতেই কোন ঠিকাদারকে চাউল সম্বন্ধে যে ঠিকা দিয়াছিলেন, তাহাতে সরকারের অনেক টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা! এ বার যদি কোন চুক্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত বাঙ্গালার লোকের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, তাহারা তাহা জানিতে চাহিলে তাহা কখনই অসঙ্গত বলা যায় না।

কেন্দ্রী পরিষদে যান-সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছেন, তিনি কলিকাতায় ও হাওড়ায় খাদ্য-শস্য সরবরাহের জন্য অসাধারণ ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বলিয়াছিলেন—কলিকাতা ও হাওড়াই সমগ্র বাঙ্গালা দেশ নহে। কিন্তু কলিকাতায় ও হাওড়ায় আমরা লোকের যে দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাও কি তাঁহার ও খাদ্য-সদস্যের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?

পঞ্জাব সরকার না কি ১০ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী করিতে দিতে সম্মত হইয়াছেন। যদি পঞ্জাবে এখনও—অপরকে প্রদানের উপযোগী—এত চাউল মজুত থাকে, তবে এত দিনেও তাহা বাঙ্গালায় আনিবার ব্যবস্থা না করা কি "বাসা থাকিতে বাবুই পাখী ভিজার" মতই বলা যায় না?

বড় দুঃখেই কি শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বলেন নাই—যে অব্যবস্থা আমরা লক্ষ্য করিতেছি, নির্ব্বোধ ও দুষ্টবুদ্ধিরা ব্যবস্থা করিবার ভার পাইলেও তদপেক্ষা অধিক অব্যবস্থা করিতে পারিত না। বলা বাহুল্য, তিনি ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দোষারোপ করেন নাই।

এখন কি হইবে?

ভারতের (বিশেষ বাঙ্গালার) খাদ্য-সমস্যা যে বিলাতেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিলাত হইতে আমরা সাহায্য পাই নাই—সহানুভূতি পাইয়াছি এবং তাহাতে যে আমাদিগের অভাব ঘুচিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিরূপ সংবাদ বিলাতে পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, বিলাতের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত মন্তব্য পাঠ করিলে মনে হয়, তথায় লোক এই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ হয় বুঝিতে পারে নাই, নহেত—তাহার সম্মুখীন হইতে চাহিতেছে না। 'টাইমস' যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিতে হয়, "নাচে ভাল—পাক দেয় খারাপ।" 'টাইমস' বলিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সরকার ও জিলার রাজকর্ম্মচারীরা আপনাদিগের (প্রদেশের বা জিলার বা মহকুমার) কৃষকদিগের স্বার্থের নিকট জাতির ও দেশের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহাদিগের কাজ নিন্দনীয়। লোককে ভয় দেখাইয়া সঞ্চিত শস্য বাহির করান সম্ভব নহে। কিন্তু কিসে তাহা সম্ভব হয়, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। প্রত্যেক প্রদেশে প্রকৃত প্রতিনিধি দলে গঠিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর ভার দিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে—নহিলে নহে।

আর একখানি পত্র ('ইয়র্কশায়ার পোষ্ট') ভারতের বিরাটত্ব হইতে জাতিভেদ পর্য্যন্ত অসুবিধায়ই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই দুর্ভিক্ষের পরেও ভারতের অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হইবে না। বর্ত্তমানে তাহার সহিত অন্যান্য দেশের যোগ না থাকায় সে বিপন্ন—ব্রহ্ম, মালয়, চীন প্রভৃতি যে সকল দেশ আজ জাপানীদিগের দ্বারা অধিকৃত, সে সকলের সহিত সংযোগ না ঘটিলে ভারতের উন্নতির আশা নাই। সে সংযোগ স্থাপিত হইলেও ভারতের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। যত দিন ভারতবর্ষ আপনার শিল্প-প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ অধিকার লাভ না করিবে—তত দিন কিরূপে তাহার দারিদ্র্যের মূল কারণ দূর হইতে পারে?

সে পরের কথা। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ইংরেজ সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে নীতিতে বৃটেন কিরূপ উপকৃত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই—পরে বৃটেন—এই যুদ্ধে অর্থ ব্যয়ের বিষয় মনে করিয়াও তাহার পরিবর্ত্তন করিবে কি না, তাহার আলোচনা আজ আর আমরা করিব না।

আজ সম্মুখে কর্ত্তব্য—লোককে অনাহারজনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করা। নূতন খাদ্য-সচিব কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন—তিনি সকলের সহযোগ চাহেন। কিন্তু তিনি সহযোগ লাভের সদুপায় অবলম্বন করিবেন কি?

"মেঘেতে বিজলি হাসি"

১

"ক্ষেপা কুকুর! ক্ষেপা কুকুর!"—"বাতুলা কুকুর!"—সমুদ্র-গর্জ্জন ডুবাইয়া এই সকল রব এবং ভয়াকুল পলায়নপর জনতা—কূলগামী সমুদ্র-তরঙ্গের মত দ্রুত দূর হইতে নিকটে আসিয়া পড়িল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই—দিনান্ত-রবিকর কেবল—বেলাবালু ও নীল জলের উপর হইতে প্রখর আলোক স্নিগ্ধ করিয়া সন্ধ্যার ধূসরতায় আপনাকে মিশাইবার চেষ্টা করিতেছে। জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ! পুরীর সমুদ্রতীর পবন-স্পর্শলোলুপ নরনারীতে পূর্ণ। একটি ক্ষিপ্ত কুকুর সহর হইতে বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রকূলে আসিয়াছিল এবং তথায় একাধিক ব্যক্তিকে দংশন করিয়া আর সকলকে আক্রমণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল।

ভীতিব্যঞ্জক রব শুনিয়া বহু লোক বেলাভূমি ত্যাগ করিয়া গেল; দুই চারি জন গেল না। শেষোক্তদিগের মধ্যে এক যুবক রহিল। তাহার দেহ সুগঠিত—মুখে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব। যে জনতা পলাইয়া আসিতেছিল—তাহার সর্ব্বশেষে এক তরুণী। বোধ হয়, তাহার রক্তবর্ণ রেশমী কাপড় কুকুরটিকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল এবং সে তাহাকে দংশন করিবার জন্য ছুটিতেছিল। যুবক যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল তরুণী ও কুকুরটি দৌড়াইতে দৌড়াইতে যখন সেই স্থানে আসিল, তখন—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আর না-ই বলিলেই হয়—কুকুরটি তরুণীর শাড়ী কামড়াইবার জন্য মুখ খুলিয়াছে। যাঁহারা দেখিলেন—তাঁহাদিগের সকলেরই মনের মধ্যে যেন ভীতির ছুরিকা-প্রবেশ অনুভূত হইল।

যুবক মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া শুষ্ক বালু তুলিয়া লইয়াছিল—অতর্কিত ভাবে কুকুরটির মুখ লক্ষ্য করিয়া তাহা ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সবল বাহুতে তরুণীকে বদ্ধ করিয়া—যেন শূন্যে তুলিয়া সমুদ্রের বিপরীত দিকে সরাইয়া আনিল।

চক্ষুতে বালুকাপাতে দৃষ্টি হারাইয়া কুকুরটি যে দিকে ছুটিয়া গেল, সে দিকে "নুলিয়া"—ধীবরগণ দিনশেষে জাল গুটাইতেছিল। কুকুরটি সেই জালে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নুলিয়ারা ও কুকুরটির পশ্চাদ্ধাবনকারীরা লাঠি দিয়া তাহাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া মৃত্যুমুখযাত্রী করিতে লাগিল—তাহার আর্ত্ত চীৎকার প্রথমে আকাশ পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল।

এ দিকে যুবক তরুণীকে নিরাপদ স্থানে আনিয়া বাহুবন্ধ শিথিল করিলেই লক্ষ্য করিতে পারিল—বোধ হয়, শ্রান্তিতে ও ভীতির পরবর্ত্তী অবসাদে—সে পড়িয়া যাইতেছে। কাজেই যুবক তাহাকে ধরিয়া সেই স্থানে বসাইয়া দিল এবং আপনি তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই এক জন মহিলা প্রায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে তথায় আসিয়া তরুণীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন—তাহাকে ডাকিলেন, "বিজলি!"

তরুণী মুখ তুলিয়া চাহিল।

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কি বিপদ হ'তেই উদ্ধার পাওয়া গেছে!"

তিনি সঙ্গী ভৃত্যকে বলিলেন, "উদয়! রিক্‌সা, ট্যাক্সী, ঘোড়ার গাড়ী—যা' পাও আন।"

তৎক্ষণে একটি বালক ও একটি বালিকাও তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহাদিগের মুখ হইতে তখনও আতঙ্কভাব দূর হয় নাই।

যে যুবক তরুণীর উদ্ধার-সাধন করিয়াছিল, বহু লোকের প্রশংসমান দৃষ্টির কেন্দ্র হইয়া সে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। এই বার আর তাহার তথায় থাকিবার প্রয়োজন নাই বুঝিয়াই সে চলিয়া গেল।

তখন জলের উপরে যেমন স্থলেও তেমনই আলো আর অন্ধকার পরস্পরের উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। ওদিকে কুকুরটির আর্ত্তনাদ ও জীবন উভয়ই শেষ হইয়া গিয়াছে।

২

গৃহে ফিরিয়াই অঞ্জলি পিতামহীকে ঘটনার বিষয় বলিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "জগবন্ধু রক্ষা করেছেন। তোরা একা একা যাস্, আমার ভয় হয়।"

বিজলী বলিল, "তোমার সব তা'তেই ভয়, ঠাকুরমা। তুমি আমাদের বলতে—

'আহার, নিদ্রা, ভয়
যত বাড়াও ততই হয়।'

তুমি নিজে আহার আর নিদ্রা ত প্রায় ত্যাগই করেছ—কিন্তু ভয় বাড়িয়েই চলেছ।"

"যে অদৃষ্ট ক'রে এসেছি, দিদি!"—বলিয়া ঠাকুরমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অদৃষ্ট বটে। একমাত্র পুত্র লইয়া তিনি বিধবা হইলে তিনি যখন শ্বশুর বর্ত্তমানে স্বামীর মৃত্যুতে শ্বশুরালয়ের সম্পত্তিতে বঞ্চিতা হইয়া পিত্রালয়ে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, সে আজ বহু দিনের কথা। মধ্যম ভ্রাতা একটা কোন্ সূত্রে ব্রহ্মে যাইয়া ওকালতী করিয়া মান ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কেহই উকীল হইতে না পারায় তিনি ভাগিনেয়কে বিবাহ দিয়া বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনিয়া আপনার সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। ঠাকুরমা পিত্রালয়েই থাকিতেন। তাহার পর ব্রহ্মেই অঞ্জলি, নির্ম্মল ও বিজলি জন্মগ্রহণ করে। অমিতব্যয়ী পুত্র সন্তানদিগকে যেমন বিলাসে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদিগের শিক্ষার জন্য তেমনই অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। অঞ্জলির বয়স যখন চৌদ্দ উত্তীর্ণ হয়, তখন তাহার বিবাহ দিতে আসিয়া—গগনচন্দ্রের সহিত বহু ব্যয়ে তাহার বিবাহ দিয়া তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান, কলিকাতার বাসায় ঠাকুরমা নির্ম্মল ও বিজলিকে লইয়া থাকিবেন—তাহারা কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যালয়ে পড়িবে—তাহাদিগের মাতা বৎসরে দুই বার ও তিনি এক বার ব্রহ্ম হইতে আসিবেন। সেই ব্যবস্থায় প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়াছিল। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জামাতা গগনচন্দ্র উকীল হইলে তাহার শ্বাসকষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার শ্বশুরই তাহার সমুদ্রতীরে পুরীতে ওকালতীর ব্যবস্থা করিয়া তথায় তাহার জন্য বাড়ী কিনিবার টাকা দিয়াছিলেন। তাহার পরে যে বৎসর নির্ম্মল আই, এ, পরীক্ষায় ও বিজলি প্রাথমিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া উত্তীর্ণ হয়, সেই বৎসর তাহাদিগের মাতৃবিয়োগ হয়। সে আঘাত তাঁহার স্বামীর পক্ষে দারুণ হয় এবং

দুই বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই এক দিন সংবাদ আসে, তিনি তিন দিনের জ্বরে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি কোন দিনই সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী ছিলেন না—বিশেষ পত্নীর মৃত্যুর পর প্রায় দুই বৎসর ব্যবসায়ে অমনোযোগী হইয়াছিলেন—অথচ কলিকাতায় পুত্রকন্যার জন্ম যেমন, পুরীতে কন্যা-জামাতার জন্য তেমনই প্রভূত অর্থ মাসে মাসে পাঠাইতেন। কাযেই কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

সেই অবস্থায় ঠাকুরমা নির্ম্মল ও বিজলিকে লইয়া যেন অকূলে ভাসিলেন। তিনি কয় বৎসর হইতেই বিজলির বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ হয় নাই—সে জিদ করিয়াছিল, পড়িবে, তাহার পিতাও তাহার মতের বিরোধী হয়েন নাই।

অবস্থা বুঝিয়া নির্ম্মল কলেজের অধ্যাপকের সাহায্যে যুদ্ধে একটা বেসামরিক চাকরী যোগাড় করিয়া দিল্লীতে গিয়াছে, কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া—বহু আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া টাকা ঠাকুরমা'কে দিয়া তাঁহাকে ও বিজলিকে পুরীতে ভগিনীর কাছে রাখিয়া গিয়াছে—চাকরীর অবস্থা বুঝিয়া পরে যে ব্যবস্থা হয় করিবে।

ঠাকুরমা অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি কে?"

অঞ্জলি লজ্জিত ভাবে বলিল, "গোলমালে আমি তা' জানবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, ঠাকুরমা। কি হ'বে?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "গগন আসুক—সে ঠিক জানতে পারবে।"

গগনচন্দ্র সে দিন একটা মোকর্দ্দমা করিতে কটকে গিয়াছিল। তাহার ফিরিতে রাত্রি ৯টা বাজিবে।

৩

যথাসময়ে গগনচন্দ্র ফিরিয়া আসিল। সে আহার করিতে বসিলে ঠাকুরমা বলিলেন, "দাদা, আজ যে কাণ্ড হয়েছে!"

সে বলিল, "এই দেখুন, ঠাকুরমা, ক' ঘণ্টা মাত্র আমি ছিলাম না—এর মধ্যেই কাণ্ড হয়ে গেল? কাণ্ডটা কি?"

ঠাকুরমা অঞ্জলিকে বলিলেন, "বল ত, দিদি।"

অঞ্জলি ঘটনাটি বিবৃত করিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, "আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'ত। কি রক্ষাই পেয়েছে!"

গগনচন্দ্র বলিল, "শুধু কি সেই রক্ষা—আপনার ছোট নাতনীটি যে মনের দুঃখে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন নাই, সে-ও রক্ষা।"

ঠাকুরমা বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "কেন, দাদা?"

"প্রথম কথা—এক জন পুরুষ যে কায করতে পারলে, উনি তা' পারেন নাই; তা'র পর এক জন পুরুষ ওঁকে বিপদ হতে উদ্ধার করল—এ কি কম অপমান! পুরুষের যে ক্ষমতা—শ্রেষ্ঠত্ব বলতে সাহস হয় না—উনি অস্বীকার করবার জন্য চুলও ছেঁটেছিলেন—তা'র এই পরিচয় পেয়ে যে উনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন নাই, সে কি আশ্চর্য্যজনক নহে?"

গগনচন্দ্রের কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যত আঘাতই কেন থাকুক না, তাহা অসঙ্গত নহে। কারণ, কলেজে অধ্যয়নকালে বিজলি নারী-প্রগতি আন্দোলনের নেতৃত্ব করিত। সে সমানভাবে ছাত্রদিগের সহিত মিশিত—আলোচনা করিত। কিন্তু তাহার ব্যবহারে এমন ব্যবধান ও কথায় এমন ক্ষুরধার ছিল যে, তাহার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতায় যে সকল ছাত্র আকৃষ্ট হইত, তাহারা কখন ঘনিষ্ঠতার দ্বারা দূরত্বের সীমা অতিক্রম করিতে পারিত না। তাহার কথায় তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিত—"ও সেই—

'..........................যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।'

বিজলিই বটে।

তাহার পর গগনচন্দ্র বিজলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়াছ ত?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে যে কে, গোলমালে তা' জানবার কথাও অঞ্জলির মনে হয় নাই।"

গগনচন্দ্র বলিল, "অঞ্জলির কথা হচ্ছে না, ঠাকুরমা। উনি—মনে ইচ্ছা থাকলেও কাযে অগ্রসর হ'তে পারেন না। যিনি পুরুষদের 'থোড়াই কেয়ার' করেন, তাঁ'র কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

বিজলি কিছু বলিতে পারিল না। সত্যই সে কথা তাহার মনে হয় নাই।

ঠাকুরমা বলিলেন, "ছেলেটি কে, তা'-ও ত জানা গেল না।"

গগনচন্দ্র বলিল, "তা' জানতে বেশী সময় লাগবে না। অত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল—তখন সেখানে অনেক লোকও ছিল; হরিচরণকে ব'লে দিব—কাল সকালেই সব সংবাদ আনবে।"

হরিচরণ উকীলের মুহুরী। দূরসম্পর্কীয় এক খুড়-শ্বশুরের নাম হরিনাথ কি হরিমোহন, কি হরিদাস, কি হরিপদ একটা কিছু ছিল। তাই ঠাকুরমা হরিচরণকে কেবল চরণ বলিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চরণ সংবাদ আনতে পারবে?"

"তা' আর পারবে না? কথায় বলে তিনটা বেটো ঘোড়া ম'রে একটা দালাল হয়; আর তিনটা দালাল ম'রে তবে একটা উকীলের মুহুরী হয়।"

সকলেই হাসিলেন।

গগনচন্দ্র বিজলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল আমার সঙ্গে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিতে যা'বে ত?"

বিজলি সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "যা'ব।"

তখন গগনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা সত্য ত?"

অঞ্জলি বলিল, "কি বলছ?"

"ভাবছি হয় ত—ঐ ক্ষেপা কুকুর, ঐ ছুট—ও সবই মায়া; আর মায়াবসানে দেখা যা'বে—এসে উপস্থিত—তোমার ভগিনীপতি।"

অঞ্জলি বলিল, "তুমি উকীল না হয়ে কবি হ'লে না কেন?"

"কবি হ'তে যা'ব কেন? বরং বৈদান্তিক হ'লে হ'ত।"

৪

গগনচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিল, সে সকল বিজলিকে বিস্মিত করে নাই। তাহার কারণ, সে সকল কথা সে গগনচন্দ্র বলিবার পূর্ব্বেই ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন তাহার মনের মধ্যে সব কেমন বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতেছিল। যে মত সে সমগ্র আগ্রহে দৃঢ় করিয়া আসিয়াছে—তাহার মূল যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। এক মুষ্টি বালু—সেই বেলাবালু-বিস্তার হইতে তুলিয়া লইয়া কুকুরের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ—কি সহজসাধ্য কায। অথচ তাহা তাহার মনে হয় নাই! তাহার

পর যখন হয়ত আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই সে দগ্ধ হইত, ঠিক সেই সময়ে তাহাকে দৃঢ় বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া লইয়া আনা কেবল যে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক তাহাই নহে, পরন্ত তাহাতে আপনার বিপদ তুচ্ছ করিয়া অপরকে রক্ষা করিবার যে প্রবল প্রকৃতি আত্মবিকাশ করে, তাহা স্বতঃই লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করে। বহু লোক যখন পলায়নে রত, যে যাহার নির্ব্বিঘ্নতার সন্ধান করিয়াছিল, তখন যে ব্যক্তি আপনার কথা না ভাবিয়া অপরিচিত বিপন্নের কথাই ভাবিয়াছেন, তিনি সাধারণ লোক হইতে কত ভিন্ন —কিরূপ স্বতন্ত্র-প্রকৃতির, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়— তাঁহার মনুষ্যত্ব মহত্ত্বে পরিণতি লাভ করিয়া উদয়াস্ত ভাস্কর-কিরণোজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গের মতই প্রতিভাত হয়।

পুরুষের সহিত নারীর অধিকার-বৈষম্য যে প্রাকৃতিক ব্যবধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—এই মত সে এতই অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছিল যে, তাহার জন্য পুরুষের প্রতি তাহার যেন বিদ্বেষ উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু আজ যেন বিনা তর্কে—বিনা যুক্তিতে তাহার মত শিথিলমূল বলিয়া অনুভূত হইতেছিল। বিস্ময়ের বিষয়, তাহাতে সে কোনরূপ বিক্ষোভ অনুভব করিতেছিল না—বেদনা ত পরের কথা।

সে যে সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে তাঁহার কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল, সে জন্য সে কুণ্ঠানুভব করিতেছিল।

সে রাত্রিতে নানা ভাবনায় বিজলির সুনিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে সে-ই এক বার গগনচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—হরিচরণ কি সংবাদ লইতে পারিয়াছে ?

বেলা প্রায় ৯টার সময় গগনচন্দ্র গৃহের ভিতরের অংশে আসিয়া জানাইল, হরিচরণ সংবাদ আনিয়াছে—লোকটি তাহাদিগের গৃহের অদূরে আছেন। তিনি তাঁহার মাতাকে লইয়া পুরীতে আসিয়াছেন; অধ্যাপকের কায করেন; নাম—অভ্রকুমার দে।

বিজলির মুখ বিবর্ণ—যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল।

তাহার মনে কয় বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা যেন চলচ্চিত্রের যবনিকায় চিত্রের মত ফুটিয়া উঠিল। তখন সে কলেজে ছাত্রী। সে দিন নবনিযুক্ত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক প্রথম অধ্যাপনা করিবেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া—সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন—তাঁহার যে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সেই সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরীক্ষকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন—এরূপ বিদ্যাপরিচয় পূর্ব্বে কোন পরীক্ষার্থী দিয়াছেন কি না, সন্দেহ—ইহা অপেক্ষা অধিক বিদ্যাপরিচয় যে কেহই দেন নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁহার অধ্যাপনা কিরূপ হয়, জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বিজলির মনে দুষ্ট অভিসন্ধি পুষ্ট হইতেছিল—সে অধ্যাপককে বিব্রত করিবে।

অধ্যাপক—অভ্রকুমার দে। সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অধ্যাপনা-কক্ষে প্রবেশ করিল—একটি ভৃত্য কতকগুলি পুস্তক লইয়া আসিল—সেগুলি টেবলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। অধ্যাপক তরুণ—তাহার চক্ষুতে বুদ্ধির দীপ্তি—মুখে গাম্ভীর্য্য। ছাত্র-ছাত্রীদিগের হাজিরা লইয়া সে তোমাদিগকে তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যদি কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব।"

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ছাত্রছাত্রীরা মুগ্ধ হইয়া অধ্যাপকের কথা শুনিতে লাগিল। কেবল বিজলি ছল সন্ধান করিতে লাগিল।

অধ্যাপক সেই কবিতাটির দুইটি চরণ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিল :—

"Love took up the harp of Life, and
smote on all the chords with might ;
Smote the chord of Self, that, trembling,
pass'd in music out of sight."

"প্রেম তুলি' নিল জীবনের বীণা
ঝঙ্কার দিল—তারে তারে তা'র ;
'আপন'-তন্ত্রী ঝঙ্কারে গেল
সঙ্গীতে মিশি'—ফিরিল না আর।"

ঐ চরণদ্বয় আবৃত্তি করিয়া অভ্রকুমার কোন মন্তব্য করিবার পূর্ব্বেই বিজলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুস্পষ্ট ভাবে বলিল, "সার, এ উক্তি কি হাস্যোদ্দীপক—অন্তঃসারশূন্য ভাবাভিনয়মাত্র নহে ?"

অভ্রকুমার মুখ তুলিল—একবার চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"মানুষ কি কখন তাহার 'আপনত্ব' ত্যাগ করিতে পারে ? তাহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে ?"

অভ্রকুমার একটু বিব্রত হইল—কারণ, যে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছে, সে ছাত্র নহে ছাত্রী। কিন্তু সে তাহার বিব্রত ভাব অতিক্রম করিয়া বলিল, "পৃথিবীর বিপুল সাহিত্য ঐ কথাই বলে—প্রেম তাহার রসায়নে স্বত্ব পরিবর্ত্তিতরূপ করে। সে তাহার উক্তির সমর্থনে নানা দেশের সাহিত্য হইতে কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিতে যাইতেছিল। সেই সময় বিজলি বলিল—আবার এক জন বড় ইংরেজ লেখকও লিখিয়াছেন—

"মাটন চপের মতই প্রণয়
ত্বরিতে শীতল হয়—"

সে সমগ্র কবিতাটি আবৃত্তি করিবার পূর্ব্বেই ছাত্র-ছাত্রীদিগের হাস্যরোলে কক্ষ মুখরিত হইল।

সেই হাস্যরোল—তাঁহার কক্ষে শুনিতে পাইয়া অধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে প্রমাদ গণিল। কারণ, অধ্যক্ষ অত্যন্ত শৃঙ্খলাপ্রিয়—কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিলে তিনি সে জন্য সকলকে কঠোর দণ্ড দিয়া থাকেন। অনেকেই বিজলির প্রতি বিরক্ত হইল।

অধ্যক্ষ আসিয়া হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অভ্রকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "বিদ্যার্থীদিগের নির্দোষ হাস্য। উহাতে আপত্তির কিছুই নাই।"

অধ্যক্ষ চলিয়া যাইলেন।

অভ্রকুমার পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখিল, তখনও তাহার পড়াইবার সময় ১০ মিনিট আছে। সে পুস্তকগুলি গুছাইয়া লইয়া—"বন্ধুরা, বিদায়"—বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইল। এক জন ছাত্র যাইয়া বলিল, "আমি বহিগুলি লইয়া যাইতেছি।"—অভ্রকুমার বলিল, "ধন্যবাদ, কিন্তু আমিই লইয়া যাইব।"

অভ্রকুমার চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার "বিদায়ের" প্রকৃত অর্থ সে দিন কেহ বুঝিতে পারিল না। পরদিন যখন সে আর আসিল না এবং তাহার স্থানে আর এক জন অধ্যাপক আসিলেন, তখন সকলে তাহা বুঝিতে পারিল।

বিজলি যেন বিজয়ের গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল। সতীর্থদিগের মধ্যে এক দলের বিরক্তিতে সে গর্ব্ব মলিন হইতে লাগিল। অভ্রকুমারের পরে যে অধ্যাপক আসিলেন—তাঁহার অধ্যাপনায় অনেকেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। গানের বৈঠকে যাহাকে "আসর জ্বালাইয়া যাওয়া" বলে অভ্রকুমার যে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অধ্যাপনা করিয়াছিল, তাহাতে তাহাই করিয়া গিয়াছিল।

ছাত্র-ছাত্রীরা জানিত না, বাঙ্গালার বাহিরে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সে অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করিতে আহূত হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের সুযোগ সে ত্যাগ করিতে চাহে নাই। সে দিনের ঘটনার পর সে বাঙ্গালার বাহিরে যাওয়াই স্থির করিয়াছিল। সতীর্থগণ উৎকৃষ্ট অধ্যাপক হারাইবার জন্য বিজলিকেই দায়ী করিতে লাগিল।

তাহার পরে বিজলির জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আর এত দিন পরে, সেই অভ্রকুমারই তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া রক্ষা করিয়াছে। হয়ত পূর্ব্বে এরূপ ঘটিলে সে আপনাকে ধিক্কার দিত। কিন্তু এখন সে তাহা করিতে পারিল না। কেন পারিল না, তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিল না।

৫

আদালত হইতে ফিরিয়া বেশপরিবর্ত্তনান্তে হাত-মুখ ধৌত করিয়া—আহার করিয়া গগনচন্দ্র যখন বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিজলিকে ডাকিল—"চল, ধন্যবাদ দিয়া আসবে"—তখন বিজলি যাইতে অসম্মত হইল।

গগনচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া অঞ্জলিকে বলিল, "তোমার ভগিনীটিরও লজ্জা হ'ল!"

অঞ্জলি বলিল, "না-ই বা গেল—তুমিই যাও।"

"তা' ত যাবই; কিন্তু এ ত ভাল লক্ষণ নহে!"

"কেন?"

"বিজলি টেনিসনের কবিতা বড় ভালবাসে—একটি কবিতায়—'সুপ্ত সুন্দরী'তে আছে—বাঞ্ছিতের এক বার স্পর্শে মায়াপুরীর মায়া-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল—সুপ্ত সুন্দরী চক্ষু মেলেছিলেন।"

অঞ্জলি বলিল,—"এতও তুমি জান!"

গগনচন্দ্র চলিয়া গেল।

বিজলি সত্য সত্যই টেনিসনের কবিতা পাঠ করিত। সে অভ্রকুমারের সেই আবৃত্তির পর হইতে কি না, তাহা সে কখন ভাবিয়া দেখে নাই।

গগনচন্দ্র যাইবার পূর্ব্বে অঞ্জলি তাহাকে বলিয়াছিল, বিজলি কলেজে ঐ অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিল এবং সেই সময় তাঁহাকে এত উত্যক্ত করিয়াছিল যে, তাহা স্মরণ করিয়া এখন তাঁহার কাছে যাইতে লজ্জানুভব করিতেছে।

গগনচন্দ্র অভ্রকুমারকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া অন্যান্য কথার মধ্যে বলিল, "যা'কে কাল আপনি কুকুরের কামড় হ'তে রক্ষা করেছেন, সে এক সময়ে আপনার ছাত্রী ছিল।"

অভ্রকুমার বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ছাত্রী!" সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে গিয়াছিল, তথায় কোন ছাত্রী তাহার নিকট অধ্যয়ন করে নাই।

গগনচন্দ্র বলিল, "তা'-ই ত সে বলেছে।"

"বাঙ্গালায় আমি ত এক দিন—এক ঘণ্টারও কিছু কম সময় অধ্যাপকের কায করেছিলাম।"

"কিন্তু সে বলেছে: কলেজে আপনাকে উত্যক্ত করেছিল। সেই জন্য নিজে এসে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারলে না।"

অভ্রকুমার হাসিয়া উঠিল। সেই এক দিনের অধ্যাপকের কাযের কথা তাহার মনে পড়িল। তবে কি এই তরুণীই তাহাকে বিব্রত করিয়াছিল? সে বলিল, "সে জন্য তাঁ'কে লজ্জিত হ'তে বারণ করবেন। বাঙ্গালা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছিল—কায অল্প ও অবসর অধিক থাকায় আমি গবেষণার সুবিধা ও সুযোগ পেয়েছি।"

"আমি তা'কে তা' বলব। কাল বা পরশু তা'কে আর তা'র দিদিকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে আনব—আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে যা'বেন।"

অভ্রকুমার আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আমার স্ত্রী!—সে যে আকাশ-কুসুম।"

গগনচন্দ্র বলিল, "তিনি কত দিন—"

বাধা দিয়া অভ্রকুমার বলিল, "তিনি গত হ'ন নাই; আগতই হ'ন নাই।"

"আপনি একাই এসেছেন?"

"না। মা আছেন। 'আনন্দ মঠের' সন্তানের মত আমি বলি, আমার আছেন ঐ মা। মা'র শরীর দুর্ব্বল, তা'র উপর হিন্দু বিধবার কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যে স্থানে অধ্যাপক ছিলাম, তথায় শীত ও গ্রীষ্ম দুইই প্রবল—মা'র কষ্ট হয়। সেই জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চাকরী স্বীকার ক'রে বাঙ্গালায় ফিরে আসছি।"

"সমুদ্রের কূলে বেড়াইতে যা'বেন?"

"না। আজ আর যাওয়া হইবে না; মা মন্দিরে যা'বেন—তাঁ'কে নিয়ে যেতে হ'বে।"

"মন্দিরে যা'বেন? আমাদের ঠাকুরমা—আমার স্ত্রীর ঠাকুরমা আছেন; তিনিও এখনই—এই পথে মন্দিরে যাবেন; তাঁ'র সঙ্গেই যাবেন।"

গগনচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখনই অদূরে তাহার মোটর যানের বাঁশী শুনিয়া সে পথে আসিয়া দাঁড়াইল এবং যান দাঁড় করাইয়া ঠাকুরমা'কে জানাইল, "ঠাকুরমা, যিনি কাল বিজলিকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি এই বাড়ীতে আছেন। তাঁর মা ঠাকরুণও মন্দিরে যা'বেন। আমি বললাম, আপনারা একসঙ্গে যা'ন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "বেশ ত।"

গগনচন্দ্রের কথায় ঠাকুরমা যান হইতে অবতরণ করিয়া

অভ্রকুমারের গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহার মাতাকে লইয়া মন্দিরে গমন করিলেন। অভ্রকুমার সঙ্গে গেল।

গগনচন্দ্রের সামাজিক শিষ্টাচার সকলকে আকৃষ্ট করিত।

মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরমা অভ্রকুমারের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন—"যেমন রূপ, তেমনই কি গুণ! কি মিষ্ট কথা! খালি পায়ে গেল—আর কি যত্নে—কত সাবধান হয়ে মা'কে নিয়ে গিয়ে জগবন্ধু দর্শন করাল! সঙ্গে সঙ্গে আমার যা'তে কোন অসুবিধা না হয়, সে দিকে কি লক্ষ্য রাখতে লাগল! মা'র এক ছেলে—এক সন্তান—কিন্তু—এক চন্দ্রে অন্ধকার দূর হয়"—ইত্যাদি।

৬

পরদিন মন্দিরে যাইবার জন্য ঠাকুরমা অভ্রকুমারের মাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই অভ্রকুমার মাতাকে লইয়া গগনচন্দ্রের গৃহে আসিল এবং তথা হইতে মা তাঁহার সঙ্গে মন্দিরে গমন করিলেন।

সে দিন বিজলি আবার অভ্রকুমারকে দেখিল। তাহার মনে হইল, এই কয় বৎসরে তাহার দৃষ্টিতে মনীষার ঔজ্জ্বল্য মলিন হয় নাই—মুখের ভাব গাম্ভীর্য্যে আরও সুন্দর হইয়াছে।

বিজলি পূর্ব্বদিন গগনচন্দ্রের নিকটে শুনিয়াছিল, অভ্রকুমার বলিয়াছে—সে কলেজে চাপল্যহেতু যে ব্যবহার করিয়াছিল, সে জন্য তাহার লজ্জিত হইবার কারণ নাই—অভ্রকুমারের পক্ষে তাহা শাপে বর হইয়াছিল। সে কেবলই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, অভ্রকুমার সত্য সত্যই তাহার সেই অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে ত? অভ্রকুমার যে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে—তাহা আপনাকে বুঝাইবার জন্য বিজলি কেবলই চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথম দিনের সেই কথা সে কখন ভুলে নাই—অধ্যক্ষকে সে বলিয়াছিল, "বিদ্যার্থীদিগের নির্দ্দোষ হাস্য। উহাতে আপত্তিকর কিছুই নাই।" সেই উক্তিতে ক্ষমার যে বিকাশ ছিল, তাহা সেই দিনই সকল বিদ্যার্থী অনুভব করিয়াছিল। তাহার পর—ভাগ্যচক্রের কি বিস্ময়কর আবর্ত্তন—অভ্রকুমারই তাহাকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া অপ্রত্যাশিত স্থানে অতর্কিতে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। সে কি তাহার যে অকারণ গর্ব্ব সে পর্ব্বত বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে—তাহা বল্মীকমাত্র প্রমাণ করিবার জন্য? তাহার সবল বাহুর স্পর্শেই কি তাহা হইয়াছে? অভ্রকুমার বলিয়াছে বটে, বিজলির কলেজে ব্যবহারে লজ্জার কোন কারণ নাই—কিন্তু সে কি সত্য সত্যই তাহার সেই প্রগল্‌ভতা—সেই ধৃষ্টতা—সেই অশিষ্টতা ক্ষমা করিতে পারিয়াছে? সে দিন তাহার ব্যবহার বিজলির নিকট প্রগল্‌ভতার,—ধৃষ্টতার ও অশিষ্টতার পরিচয় বলিয়া মনে হয় নাই—পরে হইতেছিল—আজ সে বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ নাই। অভ্রকুমার তাহার সেই ব্যবহার ক্ষমা করিয়াছে—আপনাকে বুঝাইবার জন্যই যেন তাহার মনে আগ্রহ অনুভূত হইতেছিল; সে মনে করিতেছিল, নহিলে সে কখনই গগনচন্দ্রের গৃহে তাহার মাতাকে লইয়া আসিত না।

বিজলির মনে হইতেছিল, তাহার মত, তাহার দৃঢ়তা—সব যেন বন্যায় ছিন্নমূল তরুর মত ভাসিয়া যাইতেছিল; সে সে সকল রক্ষা করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু কিসে সে সকল ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না!

এদিকে ঠাকুরমা'র সঙ্গে অভ্রকুমারের মাতাকে মন্দিরে পাঠাইয়া গগনচন্দ্র তাহাকে লইয়া সমুদ্রকূলে বেড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া—বাহিরের ঘরে যাইবার পূর্ব্বে অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তোমরা বেড়া'তে যাও নাই?"

অঞ্জলি "না" বলিলে সে বিজলিকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "এক দিন একটা কুকুর তাড়া করাতেই ভয়ে আর সেদিকে গেলে না! এমনই ক'রে কি স্ত্রীস্বাধীনতা লাভ হইবে?"

বিজলি মনে মনে কি ভাবিল বটে, কিন্তু মুখে বলিল, "কেন—আমরা অধীনতা ভোগ করছি না কি?"

"অভ্রকুমার বাবুকে নিয়ে গিয়াছিলাম—কোন্ স্থানটায় ঘটনাটি ঘটেছিল দেখালেন। বহু লোকই তাঁ'কে দেখিয়ে বলতে লাগলো—তিনিই আগের দিন এক তরুণীকে রক্ষা করেছিলেন; তিনি তা'তে কি লজ্জিতই হয়ে পড়ছিলেন! শিক্ষাব্রতীদের অমনই হয়—তা'রা ডানপিটে হয় না।—"

অঞ্জলি বলিল, "উকীলদের মত?"

এই সময় ঠাকুরমা ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগের তিন জনকে কথোপকথনরত দেখিয়া বলিলেন, "কি ছেলে! দেখলে চক্ষুর পাপ যায়।"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া গগনচন্দ্র বলিল, "কে, ঠাকুরমা? আপনার নাৎজামাই ত?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তুমি ত, দাদা, ভাল বটেই', আমি সেই ছেলেটির কথা বলছি। তা'র মা'কে ত বললাম, এখনও ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, ছেলে বিয়ে করতে চাহে না। বলে তাঁ'র অসুবিধা হ'বে।"

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"ছেলে লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করবার পক্ষপাতী। পাছে তা'তে মা'র কোন অসুবিধা হয়, সেই ভয়ে সে হাজার বললেও বিয়ে করতে চাহে না! মা'কে এত ভক্তি করে। তিনি দুঃখ করছিলেন, তিনি আর কত দিন? কিন্তু ছেলে শুনে না।"

গগনচন্দ্র অঞ্জলিকে বলিল, "শুনলে ত? পিতৃ-ভক্তির আদর্শ—প্রতীক ভীষ্মও পুরুষ মানুষ ছিলেন; আর মাতৃভক্তির আদর্শ অভ্রকুমার বাবুও পুরুষ মানুষ।"

সেই দিন ঠাকুরমা বিজলির অসাক্ষাতে অঞ্জলিকে বলিলেন, "ছেলেটি ত লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায়—তুই দেখ না, বিজলির মত করাতে পারিস্ কি না। তা' হ'লে আমি ছেলেটির মা'কে বলি।"

অঞ্জলি বলিল, "তুমি ব'লে দেখ, ঠাকুরমা।"

"আমি ওর সঙ্গে তর্কে পারি না।"

অঞ্জলি মুখে বলিল, "ব'লে দেখব;" কিন্তু মনে মনে বলিল—অসম্ভব। কারণ, ভগিনীকে সে জানিত এবং সে পাঠ্যাবস্থায় অধ্যাপক অভ্রকুমারের সহিত যে অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল তাহা সে-ই বলিয়াছে।

কিন্তু অঞ্জলি সেই দিন রাত্রিকালে যখন পিতামহীর কথা গগনচন্দ্রকে বলিল, তখন গগনচন্দ্র বলিল, "দেখ কি হয়—অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়। অভ্রকুমার যে কোন কথা মনে গির দিয়ে রেখেছেন, তা' তাঁ'র ব্যবহারে মনে হয় না। আর তোমার

ভগিনীটিকে দু'দিন খুবই শিষ্টশান্ত দেখছি—যেন স্থির বিজলি! তবে সে মানসিক পরিবর্ত্তনে কি সে দিনের সেই ঘটনায় স্নায়বিক আঘাত-ফল তা' বলতে পারি না। কারণ, সে হয়ত ডাক্তারের এলাকায় পড়ে—উকীলের পক্ষে তা' বিবেচনা করতে যাওয়া অনধিকার প্রবেশ।"

৭

পরদিন প্রাতঃকালে অভ্রকুমার আসিয়া গগনচন্দ্রের গৃহে উপনীত হইল। গগনচন্দ্র "আসুন! আসুন!" বলিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল, "এক পেয়ালা চা দিতে বলি?"

অভ্রকুমার বলিল, "না।"

"চা কি পান করেন না?"

"নিয়মিত যাত্রী নহি। কিন্তু আজ পান নিষিদ্ধ।"

"কেন?"

"আজ মা'র ছেলেটির জন্মতিথি। আমি ভুললেও মা ভুলেন না—পিণ্ডাধিকারীর জন্য আজ তিথি-পূজা আছে। সেই জন্যই আমি সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।"

"বিরক্ত কি, অভ্রকুমার বাবু?"

"রক্তই হ'ন আর বিরক্তই হ'ন—মা'র আদেশ আমাকে পালন করতেই হ'বে, তবে আমি দূত অবধ্য। মা বললেন, আজ আপনারা সকলে মা'র কাছে খা'বেন। যদি আপনারা যা'ন, তিনি এসে ব'লে যা'বেন।"

গগনচন্দ্র বলিল, "তিনি আসবেন কেন? আপনার আসা কি নামঞ্জুর?"

অভ্রকুমার বলিল, "একটু কথা আছে। মা বলেছেন, আপনার ঠাকুরমা'কেও পা'র ধূলা দিতে হ'বে। তিনি বললেন, আর কোথাও হ'লে বলতে সাহস করতেন না—এ শ্রীক্ষেত্র, প্রসাদই গ্রহণ করা হ'বে।"

"দেখুন, আজকাল ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ—আমার কথাই আমি বলতে পারি, তা-ও হয়ত পূরা পারি না। আমি সব জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।"

"ঠাকুরমা! ঠাকুরমা!" বলিতে বলিতে গগনচন্দ্র বাড়ীর ভিতরের অংশে গেল এবং সকল কথা বলিয়া আসিয়া অভ্রকুমারকে বলিল, "চলুন, আপনার কথা আপনিই বলবেন।"

অভ্রকুমার যাইয়া ঠাকুরমা'কে প্রণাম করিল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গগনচন্দ্র তাহাকে বলিল, "ঠাকুরমা'র ঘোমটার ঘটা দেখেছেন! এখন কনে বৌরাও অমন ঘোমটা দেয় না।"

অভ্রকুমার বলিল, "উনি ত এখনকার ন'ন। আমিও মা'র দেখে অমনই ঘোমটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি কিন্তু ওকে ঘোমটার ঘটা বলি না—শিষ্টাচারের ঘটা বলি; সেরিডেন এ দেশের অন্তঃপুরের কথায় কি বলেছেন, তা'ত জানেন।"

সে সেরিডেনের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি আবৃত্তি করিল।

সে যাহা বলিল, তাহাতে ঠাকুরমা আর "না" বলিতে পারিলেন না! তিনি কেবল বলিয়া দিলেন, অভ্রকুমারের মা'কে কষ্ট করিয়া আসিতে হইবে না।

যাইবার সময় অভ্রকুমার গগনচন্দ্রকে বলিল, "আপনার আদালতে কখন যেতে হ'বে।"

গগনচন্দ্র বলিল, "আদালতে কাযের যে বহর, তা'তে যখন হয় গেলেই হয়—না গেলেও ক্ষতি নাই। আমি ঠিক যা'ব।"

তাহাই হইল।

সে দিন বিজলিকে দেখিয়া অভ্রকুমারের মাতা ঠাকুরমা'কে বলিলেন, "আপনি ত আমাকে বলছিলেন—ছেলের বিয়ে কেন দিইনি। আমি জিজ্ঞাসা করি—নাতনীর বিয়ে দেননি কেন?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আমার অদৃষ্ট। যাদের কায তা'রা চ'লে গেল—আমারই ডাক আসছে না। আমি কি এ ভার বহিতে পারি? বিশেষ ওরা লেখাপড়া শিখেছে—আমাদের পসন্দ হয়ত ওদের ভাল লাগে না; আমিও জোর ক'রে কিছু বলতে সাহস করি না।"

অভ্রকুমারের মাতা আর কিছু বলিলেন না।

সেই দিন মন্দিরে জগবন্ধু দর্শন করিয়া আসিবার সময় ঠাকুরমা অভ্রকুমারের মাতাকে বলিলেন, "বলতে ভরসা হয় না—যদি অনুগ্রহ করেন—"

অভ্রকুমারের মাতা বলিলেন, "কি?"

"যদি আমার নাতনীটিকে গ্রহণ করেন।"

"আজ অভ্রকুমারের জন্মদিন—শ্রীমন্দিরে আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিব না; কিন্তু বলি, আমি ত অভ্রকুমারের বিয়ে দিলে বেঁচে যাই। আপনি আপনার বড় নাতজামাইকে ওকে বলতে বলুন। আর ও ফিরে এলে আমিও বলব।"

বিস্মিত ভাবে ঠাকুরমা বলিলেন, "ফিরে এলে?"

অভ্রকুমারের মাতা বলিলেন, "হাঁ। পশ্চিমে আমার শীতে আর গ্রীষ্মে কষ্ট হয় ব'লে ও কলিকাতায় চাকরী নিয়েছে। কিন্তু আমাকে ব'লে নাই যে, কায বুঝিয়ে দিতে ওকে এক বার সেই চাকরীর স্থানে যেতে হ'বে—আমি জগবন্ধু দেখবার ইচ্ছা এক দিন জানিয়েছিলাম ব'লে পুরীতে এসেছে। আমি জানলে একেবারে সেখানকার কায সেরে আসতে বলতাম। এখন কাল ওকে যেতে হ'বে। তা'ই ভাবছি কি হ'বে।"

"কেন?"

"ছ' সাত দিন ত হ'বেই। সম্বল পুরাণ চাকর—ও সঙ্গে না গেলে অভ্রকুমারের কষ্ট হ'বে—আবার ও গেলে এখানে—নূতন জায়গায়—থাকে কে?"

"আমি গগনকে ব'লে তা'র ব্যবস্থা করব। আপনার বাড়ী ত কাছেই।"

শুনিয়া অভ্রকুমারের মা যেন স্বস্তি অনুভব করিলেন।

ঠাকুরমা গৃহে আসিয়া গগনচন্দ্রকে অভ্রকুমারের মাতার কথা বলিলে সে পরদিন অভ্রকুমারের কাছে যাইয়া আবশ্যক ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিল; বলিল, অভ্রকুমার পুরাতন ভৃত্যকে লইয়া যাইতে পারে; এ কয়দিন সে তাহার গৃহের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিবে—দ্বারবান দিবে এবং তাহার মাতা যদি অনুগ্রহ করিয়া এ কয় দিন তাহার গৃহে থাকিবার প্রস্তাবে অসম্মত হন, তবে তাহার স্ত্রী, ঠাকুরমা ও বিজলি যতক্ষণ সম্ভব তাঁহার কাছে থাকিবেন।

অভ্রকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রা করিতে পারিল।

৮

গগনচন্দ্র যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহা পালন করিল এবং তাহাতে ঠাকুরমা ও অঞ্জলি তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিলেন।

অঞ্জলি ও বিজলি অভ্রকুমারের মাতার নিকটেই প্রায় সমস্ত দিন থাকিল—অঞ্জলিকে যখন সংসারের কাযে গৃহে আসিতে হইল, তখন সে বিজলিকে তাঁহার নিকটে রাখিয়া আসিল। বিজলি যেরূপ শান্তভাবে তাঁহার কাছে থাকিল, তাহাতে অঞ্জলিও বিস্ময়ানুভব করিল। প্রথম দিন অভ্রকুমারের মাতা রাত্রিকালে গগনচন্দ্রের গৃহে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে গগনচন্দ্র যখন বলিল, "আপনি একা থাকবেন—সে হ'বে না; বিজলি আপনার কাছে থাকুক" তখন তিনি "না" বলিলেও বিজলি যে তাহাতে আপত্তি করিল না, তাহা অঞ্জলি লক্ষ্য করিল।

সন্ধ্যার পর আহারান্তে অঞ্জলি যখন সত্য সত্যই বিজলিকে তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইবার জন্য আনিল, তখন অভ্রকুমারের মাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেও বিব্রত না হইয়া পারিলেন না। কারণ, একে তাঁহার গৃহে সাধারণতঃই আসবাবের বাহুল্য থাকে না—গৃহে কেবল মা আর ছেলে, তাহাতে পুরীতে তাঁহারা অল্পদিনের জন্য আসিয়াছেন। কেবল পুস্তক বলিলে যদি আসবাব বুঝায়, তবে অল্পদিনের জন্যই হউক আর অধিক দিনের জন্যই হউক অভ্রকুমার যে স্থানেই যাইত, সেই স্থানেই সে আসবাবের অভাব থাকিত না। বিশেষ এ বার সে নূতন পদে অধ্যাপনার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মা যে ঘরে শয়ন করিতেন, তাহার পার্শ্বের ঘরটি বড়, তাহাই অভ্রকুমার শয়নের ও অধ্যয়নের কক্ষরূপে ব্যবহার করিত। মা আপনার খাটখানি সেই ঘরে অভ্রকুমারের খাটের পার্শ্বে লইলেন এবং স্বয়ং অভ্রকুমারের খাটে বিজলির জন্য শয্যা-রচনা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতে বিজলি গগনচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া যাইবার পরে অভ্রকুমারের মাতা পূজার্চ্চনা সারিয়া তথায় যাইয়া বিজলির পিতামহীকে বলিলেন, "আপনাদের কি বিব্রতই করলাম!"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে কি কথা?"

"আপনার নাতিনী যে ভাবে আমাকে আগলেছে, তা' বোধ হয়, আমার মেয়ে থাকলে সে-ও পারত না—ও একেবারে মা'র মত ব্যবহার করেছে।"

বিজলি তাঁহার কথায় মনে যুগপৎ আনন্দ ও লজ্জা অনুভব করিল। সে দৃষ্টি নত করিল।

অভ্রকুমারের মাতা বলিলেন, "যদিও ও যে যত্ন করেছে, তা'তে আপনাকে তা' হ'তে বঞ্চিত করতে ইচ্ছা হয় না; তবুও ওকে আর ব্যস্ত করব না—আজ আমিই আসব।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে হ'বে না—এ যে আপনার স্নেহ আর আশীর্ব্বাদ লাভ করবার সুযোগ পেয়েছে, সে বিজলির পরম ভাগ্য; ও-ই আপনার কাছে থাকবে।"

তিনি বিজলিকে বলিলেন, "দিদি, তোমার কোন অসুবিধা হ'বে না ত?"

বিজলি বলিল, "না"।—কিন্তু বলিতে মনে কেমন লজ্জানুভব করিল। সে ভাবটি তাহার পক্ষে নূতন।

৯

গমনের দশ দিন পরে অভ্রকুমার ফিরিয়া আসিল। সে আসিয়া লক্ষ্য করিল—যে ঘরে সে অধ্যয়ন ও শয়ন করিত, দুইখানি খাটই সেই ঘরে—মনে করিল, সেই ঘরটিতেই অনেক জিনিষ থাকায় মা সেই ঘরেই তাহার অনুপস্থিতি কালে শয়ন করিতেন; আর লক্ষ্য করিল, তাহার টেবল, পুস্তক প্রভৃতি সবই ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখা হইয়াছে।

সেই দিন মধ্যাহ্নে সে আহারে বসিলে তাহার মাতা বলিলেন, "বাবা, এ বার আমি তোর বিয়ে দিবই—তোর কোন আপত্তি শুনব না।"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "মা, এই ক'দিন ছেলের কায করবার ছিল না—সেই দীর্ঘ অবসরে তুমি বুঝি ভেবে ভেবে ছেলেকে মা'র কাছ হ'তে দূর করবার ঐ উপায়টি আবিষ্কার করেছ?"

"না, বাবা, যা'র সঙ্গে তোর বিয়ে দিব, তাকেই আবিষ্কার করেছি। ভাল ক'রেই দেখে—চিনে নিয়েছি।"

"অর্থাৎ লোক টাকা যেমন বাজিয়ে নেয়, তেমনই সে খাঁটী কি মেকী তা দেখেছ?"

"তা-ই বটে। দেখে নেবার এমন সুযোগ প্রায়ই হয় না।"

"সে কে?"—অভ্রকুমার হাসিতেছিল।

মা বলিলেন, "যে মেয়েটিকে তুই সমুদ্রের ধারে সেদিন রক্ষা করেছিলি—বিজলি।"

অভ্রকুমারের মুখ হইতে হাসি অন্তর্হিত হইল। সে বলিল, "বল কি, মা!"

মা বলিলেন, "কেন? তোর কি আপত্তি হ'তে পারে?"

"ও সব কলেজে-পড়া মেয়ে তোমার অসুবিধা হ'বে। তুমি যা'তে সুখী হ'তে পারবে না, সে কায আমাকে করতে ব'ল না, মা।"

"অভ্র, তোর বৌ হ'তে যদি আমি অসুখী হই, তবে আমি বুঝব, দোষ আমার আর দোষ আমার অদৃষ্টের। তুই সে ভয় করিস না।"

"তুমি জান না—"

মা তাহার কথা আর অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিলেন, "আমি ভালরূপই লক্ষ্য করেছি। এ দশ দিন সে ত আমার কাছেই ছিল। তুই দেখিস নাই—তোর বসবার ঘরেই দু'খানা খাট—আমরা দু'জন ঐ ঘরে শু'তাম। ঘর-দ্বারের অবস্থা লক্ষ্য করিস নাই? সব ঝাড়া-মুছা—ঘর যেন হাসছে। কি কাযের মেয়ে! আর প্রতিদিন মন্দিরে কি যত্ন ক'রেই আমাদের ঠাকুর-দর্শন করিয়েছে!"

অভ্রকুমার বুঝিল, কয় দিনে ব্যাপারটা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "মা, তুমি ব্যস্ত হয়ে কিছু স্থির ক'র না। ভাল ক'রে ভেবে দেখ।"

মা বলিলেন, "আমি ভাল ক'রেই ভেবে দেখেছি। তবে তোকে না ব'লে শেষ কথা দিই নাই—এ বার দিব। তুই অমত করিস না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি—তোরা সুখী হ'বি। বাঙ্গালীর—হিন্দুর ছেলে মেয়ে—কেন অসুখী হ'বে? আমার বিশ্বাস, আমি যে শ্রীক্ষেত্রে এসেছি আর সে দিনের ঘটনাক্রমে যে মেয়েটির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, সে সবই জগবন্ধুর কৃপায়।"

অভ্রকুমার ভাবিতেছিল।

মা বলিলেন, "তুই ভাবিস না, বাবা! আমার মেয়ে নাই—মেয়েটির মা নাই। আমি ওকেই আনব।"

অভ্রকুমার কোন কথা বলিল না—সে ভাবিতেছিল। সে যত ভাবিতেছিল, তাহার ভাবনা তত বাড়িতেছিল।

শেষে এক এক বার অভ্রকুমারের মনে হইতে লাগিল—

যে ভাবনার অন্ত নাই, তাহার অন্তলাভের আশা ত্যাগ করিয়া "যন্তবিধ্য" মনে করাই হয়ত ভাল।

সে দিন শনিবার। গগনচন্দ্র মধ্যাহ্নের পরেই কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, অভ্রকুমারের মাতা অভ্রকুমারের আনীত খাবার প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে-সব দেখিয়া, তাহার কৌতূহল হইল—অভ্রকুমার যুদ্ধজনিত অবস্থার কি নূতন সংবাদ বা জনরব আনিয়াছে সে তাহা জানিয়া আসিবে; কারণ, সংবাদ-নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহার স্বরূপ সে একাধিকবার অভ্রকুমারের সহিত আলোচনা করিয়াছে।

গগনচন্দ্র অভ্রকুমারের গৃহে যাইয়া দেখিল, অভ্রকুমার গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। সে কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে যেন চিন্তিত দেখছি!"

মৃদু হাসিয়া অভ্রকুমার বলিল, "যে ষড়যন্ত্র আপনি করেছেন! মা'কে কি বলেছেন?"

"বাধ্য হয়েই তাঁ'কে বিরক্ত করতে হয়েছে, অভ্রকুমার বাবু। আপনি ত আর কোথাও জব্দ হ'বেন না।"

"আমার মনে পড়ে না—মা কখন কোন কায আমাকে করতে হ'বে ব'লে জিদ করেছেন। কাজেই তিনি কোন কথা বললে তা'তে 'না' বলতে আমার যে কত কষ্ট হয়, তা' আর কেহ বুঝতে পারবে না।"

"কেনই বা 'না' বলবেন? মা'র কি বিজলিকে পসন্দ হয় নাই?"

"না হ'লে ত কথাই ছিল না। বেশী পসন্দই হয়েছে।"

"তবে আপনিই বা আপত্তি করবেন কেন?"

"সেই কথাই ত মা'কে বলছি—কলেজে-পড়া মেয়ে—মা'র কি অসুবিধা হ'বে না?"

"কেন হ'বে, অভ্রকুমার বাবু? কলেজে পড়লেই কি বাঙ্গালীর মেয়ে সংস্কারও অতিক্রম করতে পারে। তা' হয় না।"

"অর্থাৎ আপনি বলেন, 'যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না? হয়ত বাঁধে—কিন্তু যদি চুল না থাকে, তবে চুল বাঁধবে কেমন ক'রে?"

"আমাদের মেয়েদের চুলের অভাব ত লক্ষ্য করতে পারি না। বরং তা'র প্রাচুর্য্য—সুবাসিত কেশতৈলের খরচ যোগা'বার সময় বাহুল্য ব'লেই মনে হয়। তবে কা'রও কা'রও যদি চুল তুলবার বাতিক থাকে, সে আমি বলতে পারি না।"

অভ্রকুমার ভাবিতে লাগিল।

গগনচন্দ্র বলিল, "আর ভেবে কি করবেন?"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "আপনারা ত মক্কেলের ফাঁসীর আদেশ হ'লে বলেন—'দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়—তা'র পর দেখা যা'বে।' আপনি কি জানেন, আপনার শ্যালিকাটির মত কি?"

"ওর আবার মত! আপত্তির কোন লক্ষণ ওর দিদি লক্ষ্য করেন নাই।"

"সে মত নহে, গগন বাবু। উনি এক দিন বলেছিলেন—'মাটন

গগনচন্দ্র বলিল, "ছেলে মানুষ—বিদ্যা জাহির করবার জন্য তখন কি বলেছিল, তা' ধরতে নাই।"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "আমি তখনই কলেজের অধ্যাপককে সে কথা বলেছিলাম—তরুণদের নির্দ্দোষ হাসি।"

গগনচন্দ্র বলিল, "তা' হ'লে আর অমত করবেন না।"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "কেবল একটা কথা আছে, গগন বাবু—আপনার শ্যালিকা প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বত্ব সম্বন্ধে খুব দৃঢ় মত পোষণ করতেন, সে মত কি তিনি পরিবর্ত্তন করেছেন; যদি ক'রে থাকেন, তবে তা'র কারণ কি?"

গগনচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখে উত্তর এনে দিব।"

১০

গৃহে ফিরিয়া গগনচন্দ্র হাসিতে হাসিতে সব কথা বলিল। চুল সম্বন্ধে অভ্রকুমারের উক্তিতে তাহার পাঠদ্দশায় প্রগতির প্রতীক মনে করিয়া চুল ছাঁটার সম্বন্ধে ইঙ্গিত ছিল, কি না—বিজলি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সেই সব কথা শুনিয়া তাহার সেই সময়ের তুষ্ট-বুদ্ধি যেন আবার উদিত হইতে লাগিল। গগনচন্দ্র যখন বলিল, "অভ্রকুমার বাবুর কথার কি উত্তর দিব, বল, বিজলি?"—তখন সে বলিল, "আপনি অত মাথা ঘামা'বেন না; উত্তর পা'বেন।"

তাহার পরে ঠাকুরমা যখন অভ্রকুমারের মাতাকে মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য তাহার গৃহে গমন করিলেন, তখন—কয়দিনের মতই, বিজলি তাঁহার সঙ্গে গেল। সে কয়দিন পূর্ব্বে তাহার মাতাকে বলিয়া অভ্রকুমারের টেবল হইতে একখানি পুস্তক আনিয়াছিল। সে সেইখানি ফিরাইয়া দিতে গেল এবং আপনি যাইয়া সেখানি যে স্থান হইতে লইয়াছিল, সেই স্থানে রাখিয়া আসিল। তাহার মুখে মৃদু হাসি।

সন্ধ্যার পরে ভৃত্য টেবলে আলোকদান রাখিয়া যাইলে অভ্রকুমার দেখিল—টেবলের উপর একখানি কাগজ—কাগজখানা চাপা দেওয়া রহিয়াছে। কৌতূহলবশে সে প্রথমেই তাহা দেখিল। তাহাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত—"উত্তর" এবং তাহার পরে টেনিসনের কবিতার দুই চরণ:—

"প্রেম তুলি' নিল জীবনের বীণা
ঝঙ্কার দিল—তারে তারে তা'র;
'আপন' তন্ত্রী ঝঙ্কারে গেল
সঙ্গীতে মিশি'—ফিরিল না আর।"

পরদিন মা যখন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলিস, বাবা? আর অমত করিস না।"—তখন অভ্রকুমার বলিল, "তোমার যা' ভাল মনে হয় কর।"

তাহার পরেই যখন গগনচন্দ্র আসিয়া বলিল, "অভ্রকুমার বাবু, বিজলিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; সে বলেছে, 'উত্তর পাবেন'।"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "উত্তর পেয়েছি।"

"নির্ভুল হয়েছে ত?"

"হাঁ। পূর্ণ নম্বর পাবার মত।"

উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

অভ্রকুমারের মাতা গগনচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার ঠাকুর-মা'কে ব'ল—মন্দিরে বসে আমরা বিয়ের দিন স্থির করব।"

*　　*　　*　　*

গগনচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া ঠাকুর-মা'কে বলিল, "ঠাকুর-মা, নির্ম্মলকে তার ক'রে এলাম।"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—কিসের জন্য, দাদা ?"

"সে-ই যে—

'মেঘেতে বিজলি-হাসি　　আমি বড় ভালবাসি,
যে যা'বি সে যা'বি তোরা, গিরিজায়া যায় রে।'

অভ্রকুমার বাবুর মা বললেন, মন্দিরে আপনারা দু'জনে বিয়ের দিন স্থির করবেন। নির্ম্মল কবে আসতে পারবে—জানতে হ'বে ত ?"

ঠাকুরমা'র মুখে হর্ষ বিকশিত হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, বিজলির মুখে আনন্দ-দীপ্তি।

অঞ্জলি স্বামীকে বলিল,—"নিজের বুদ্ধিতে কায ক'রে—মিছা-মিছি তার ক'রে ক'টা টাকা নষ্ট করলে।"—বলিয়া সে একখানি তার গগনচন্দ্রের হস্তে দিল—নির্ম্মল তার করিয়াছে, সে কলিকাতায় বদলী হইয়াছে; প্রথমেই পুরীতে আসিতেছে।

ঠাকুরমা জগবন্ধুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শব-যাত্রা

(রুশ কবি ইভান্ ক্রাইলভ)

সেকালে মিশরে ছিল রীতি—গেছে জানা—
ধনীর মৃত্যুতে হতো বহু লোক ভাড়া করে আনা;
শব নিয়ে শবযাত্রী পথে হলে বার—
এরা যেতো সঙ্গে সঙ্গে তুলি হাহাকার,
আর্ত্ত ক্রন্দনের রোল! সেই শোকোচ্ছ্বাস
বিদীর্ণ করিত সারা আকাশ-বাতাস!
একদা মরিল এক ধনী। শবযাত্রা সমারোহে চলে;
পিছে লোক হাজার-হাজার বিগলিত শোক-অশ্রুজলে
ফুকারি-ডুকারি কাঁদে কত, বক্ষে রুদ্র করাঘাত হানে।
দেখে মনে হয়, এরা বুঝি এখনি মরিবে ব্যথা-বাণে!

বিদেশী পথিক এক পথে—এ দৃশ্যে দুলিল তাঁর মন।
প্রিয়-জন-বিয়োগ-বিধুর! সবারে ডাকিয়া তিনি—
"বুঝিতেছি প্রিয়-হারা সবে শোকে হেন অধীর হৃদয়।
বাঁচাবার মন্ত্র আমি জানি, বাঁচাইয়া দিলে কিবা হয় ?"
এ কথা শুনিয়া সবে-কয়,
"এত যদি জানো দয়াময়,
বাঁচাইয়া দাও মৃতে দু'দিনের তরে—
দু'টি দিন গত হলে ফের যেন মরে!
ধনী লোক বাঁচে যদি, নাহি কোনো লাভ
বাঁচিলে না ঘোচে কভু মোদের অভাব!
মরিলে আনিবে ডাকি বহু অর্থ দিয়া
আমাদেরে,—মৃত্যুশোকে বক্ষ বিদরিয়া
ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে মোরা জানাইব শোক—
মোরা ধন্য হবো অর্থে; শোকে ধন্য হবে ধনী লোক!"

কবি কহে, ঠিক কথা! হেন ধনী আছে
যাহার মরণে বিশ্ব প্রাণ পেয়ে বাঁচে!
যাবৎ জীবন রহে এ সব ধনীর
কণামাত্র লাভ তাহে নাহি ধরণীর!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুঞ্জয়

জীবনের যত গ্লানি
মোদের বক্ষের 'পরে জমা হয়ে আছে, তাহা জানি।
অত্যাচারী হেনেছে আঘাত,
তাদের ভ্রুকুটি-ভঙ্গে উৎসারিত আসন্ন উৎপাত।
কত জাতি জিনে নিল দেশ—
তাদের আদেশ
যুক্ত করে নত মুখে করেছি বহন।
অপমানে জর্জ্জরিত হইয়াছে মন—
তবু মৃত্যু ঘটে নাই, বাঁচিয়াছি মরিতে মরিতে।
উত্তপ্ত রক্তের স্রোত বহিয়াছে শীর্ণ ধমনীতে।
মৃত্যুরে করি না আর ভয়,
মোরা মৃত্যুঞ্জয়।
মৈত্রীভরা সাধনা সাম্যের
শুধু এনে দিতে পারে মুক্তি এ মহাবিশ্বের।
ছলে বলে নিষ্পেষণে,
অত্যুগ্র শাসনে
যাহা কভু হয়নি সম্ভব;
পশু-শক্তি যেখানে মেনেছে পরাভব,
সে কর্ম্ম সাধিতে পারে সাধনা সাম্যের—
এনে দিতে মুক্তি-মন্ত্র মহামানবের।
তাই মোরা যুগে যুগে জাগি
মৃত্যুভয় ত্যাগি,
আপন অহিত করি বিশ্ব-হিত তরে,
শত্রু-মিত্রে প্রেম-মন্ত্রে বাঁধা পরস্পরে।
পেয়েছি সন্ধান
মৃত্যুর অমৃত মাঝে জীবনের নব জয়-গান!
স্বার্থভরা শোষণের সর্ব্বগ্রাসী প্রলুব্ধ বাসনা,
অশান্তির দ্বারে দ্বারে হানা
মুছে যাবে চিরতরে এই বিশ্ব হতে
সর্ব্বজন-মুক্তি লাগি আলোর প্রভাতে।
তাই মোরা চিরমৃত্যুঞ্জয়,
জিনিয়াছি ঘৃণা, লজ্জা, ভয়।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

কথাশিল্পীর হত্যা-রহস্য

[উপন্যাস]

অষ্টম পল্লব

আসামীর আত্মসমর্পণ

পরদিন আদালতের কার্য্য আরম্ভ হইলে আসামীর কৌঁশুলী জন গারসাইড তাঁহার মক্কেলের জীবন-রক্ষার জন্ম বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। আদালতে উপস্থিত জনসাধারণ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

জন গারসাইড জুরিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জুরি মহোদয়গণ, এই বার আমি আপনাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়ানুরাগে নির্ভর করিয়া আমার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলাম। জনসাধারণের নিকট যে ন্যায়-নিষ্ঠার আশা করা যায়, আপনাদেরও তাহার অভাব হইবে না, ইহাই আমার ধারণা।

"আমার বিজ্ঞ বন্ধু ফরিয়াদী পক্ষের কৌঁশুলী আপনাদিগকে এ কথা বুঝাইবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন যে, আমার মক্কেল নরহন্ত্রী। আশা করি, আমি অতি সহজেই আপনাদিগকে বুঝাইতে পারিব যে, মিস্ ওলিভিয়া ডেনের চরিত্র যে ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—মিথ্যা।"

বিচারপতি তাঁহার আসনে উপবেশন করিয়া নিবিষ্টচিত্তে আসামীর কৌঁশুলীর বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। সংবাদদাতারা সবেগে লেখনী পরিচালিত করিয়াও মিঃ গারসাইডের বক্তৃতার অনুসরণে সমর্থ হইল না। ডেভিড গারসাইড তাহার ভ্রাতাকে অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিতে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সেই বক্তৃতা লিখিবার সময় তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল। জন গারসাইড ক্রমশঃ সতেজ ভাষায় তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার উপসংহার করিলেন।

উপসংহারে তিনি বলিলেন, "জুরি মহোদয়গণ, আপনারা আমার এ কথায় নির্ভর করিতে পারেন যে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ-ইন্‌স্পেক্টর ফরিয়াদী পক্ষের অনুকূলে যে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন, কেবল মাত্র তাহাই নিরপেক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য।

"এই মামলার বিচারকালে আমরা নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে পাইয়াছি। এ কথা বলা হইয়াছে এবং আমার বিবেচনায় অত্যন্ত অন্যায় ভাবেই বলা হইয়াছে যে, এই অভিযুক্তা স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা জীব; কারণ, ফরিয়াদী-পক্ষ যুবক মাইগুমে ও পিটার ট্রেনটনের প্রতি আমার মক্কেলের যে ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কোন ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের পক্ষেই সম্ভবপর। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে এবং হাতে-কলমে তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত এই অভিযোগের অসারতা সপ্রমাণ করিব। লণ্ডনের কোন বিখ্যাত হাসপাতালে স্ত্রীরোগ-সমূহের যে বহুদর্শী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছেন, আমি তাঁহারই সাহায্যে প্রতিপন্ন করিব—মিস্ ডেনের সতীত্বে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

"সার জোসেফ মাইগুমে সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইয়া কিরূপ ভাব-ভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যখন তিনি সাক্ষ্য দিতে উঠিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে অবজ্ঞা ও ঘৃণা পরিস্ফুট হইয়াছিল, যেন তিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়াই একটি তরুণীকে প্রকাশ্য ভাবে অপমানিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই—যদিও তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা যৎপরোনাস্তি অতিরঞ্জিত। আমি আপনাদিগকে অসঙ্কোচে বলিতে পারি, সার জোসেফ অত্যন্ত পক্ষপাত-দুষ্ট সাক্ষী। যাহা হউক, আমার আনন্দের বিষয় এই যে, আমি তাঁহাকে আপনাদের এবং বিচারপতির নিকট প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছি যে, আমার মক্কেলকে তাঁহার চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়া তিনি অন্যায় ও হঠকারিতার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন।

"কিন্তু আমি যে ব্যক্তির কথা বলিলাম, তিনি ফরিয়াদী পক্ষের এক জন প্রধান সাক্ষিরূপে সাক্ষীর কাঠরায় দাঁড়াইলেও যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার তুলনায় তাঁহার অবলম্বিত পক্ষপাত নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়! বিশেষতঃ, সোয়ানেস নামক সাক্ষী সাক্ষ্যদান কালে কিরূপ ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছিল, আপনারা সকলে তাহাও লক্ষ্য করিয়াছেন।

"অধিক দিনের কথা নহে, প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডনের কোন প্রবীণ ম্যাজিষ্ট্রেট সোয়ানেসকে ছয় মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান-কালে তাঁহার রায়ে তাহাকে 'সংশোধনের অযোগ্য' বদমায়েস বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন; 'সংশোধনের অযোগ্য' এই বদমায়েস আমার মক্কেলের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রাশি রাশি মিথ্যা কথা উদ্গিরণ করিয়াছে। এই নির্লজ্জ ভৃত্য আমার মক্কেলের প্রতি এরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল যে, সে বহুবার তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

"আমার যুক্তি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত না হইলেও আমি এখন আপনাদিগকে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই ব্যক্তি—এই বদমায়েস সর্ব্বপ্রকার দ্বিধা ও সঙ্কোচবর্জ্জিত। মিস্ ডেন যখন সাক্ষ্য দিতে উঠিবে তখন সে আপনাদিগকে বলিবে, যে সময় নিহত ব্যক্তির সহিত তাহার কলহ চলিতেছিল, সেই সময় এই নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী মুহূর্ত্তের জন্যও সেই কক্ষে উপস্থিত ছিল না।

"এইবার আমি মৃত ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে আপনাদের নিকট দুই একটি কথার উল্লেখ করিব। বলা বাহুল্য, মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করা আমি শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করি। কিন্তু আমার স্কন্ধে যে দায়িত্ব-ভার ন্যস্ত আছে—তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই আমি এই মামলায় এরূপ সাক্ষী আহ্বান করিতে বাধ্য হইতেছি, যাঁহারা আপনাদের নিকট প্রতিপন্ন করিবেন—স্ত্রীলোকদের প্রতি মিঃ পিটার ট্রেনটনের ব্যবহার কেবল অভদ্র নহে, অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল; ইতর লোকেও সেরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। আমি যে দুই জন সাক্ষীকে সাক্ষীর কাঠরায় তুলিব, তাঁহারা পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে নিহত ঔপন্যাসিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সচ্চরিত্রা তরুণী। তাঁহারা আপনাদের নিকট সাক্ষ্য দিবেন। এই বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের দুর্ব্ব্যবহারেই তাঁহারা তাহার চাকরী ত্যাগ করিতে

বাধ্য হইয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে প্রলোভনে বশীভূত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। আমার মক্কেল তাহাকে প্রণয়ে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করা দূরের কথা, আমার মক্কেল সাক্ষ্যদান-কালে হলফ করিয়া এই মর্ম্মে জবানবন্দী দিবেন যে, সে যখন মেফেয়ার পল্লীর ১০১ নং কার্জ্জন ষ্ট্রীটে বাস করিতেছিল, সেই সময় ট্রেনটন পুনঃ পুনঃ তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া তাঁহার জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিল।"

যে সকল শ্রোতা আসামীকে অপরাধী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, মিঃ জন গারসাইডের বক্তৃতা শুনিয়া তাহাদের মতের পরিবর্ত্তন হইল; তাহাদের ধারণা হইল, সে তাহার মনিবকে হত্যা করে নাই, তাহারা অস্ফুট স্বরে অভিমত প্রকাশ করায় বিচার-কক্ষে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল। এজলাসের প্রহরী 'চুপ, চুপ,' শব্দে গর্জ্জন করিল।

জজ কঠোর স্বরে আদেশ করিলেন, "কেহ কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত করা হইবে।"

এই আদেশে দর্শকগণ নীরব হইল। সেই সময় আসামী আসামীর কাঠরা ত্যাগ করিয়া সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করায় সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ওলিভিয়া ডেন অকম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে হলফ পাঠ করিল। সে তাহার সঙ্কট বুঝিতে পারিলেও সংযম হারাইল না। সে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া প্রশান্ত ভাবে তাহার কৌঁশুলীর প্রশ্নের উত্তর দান করায় আদালতের সকল লোক তাহার পক্ষপাতী হইল।

আসামীর কৌঁশুলী তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "ফরিয়াদী পক্ষের তর্কের বিষয় এই যে, দুর্ঘটনার রাত্রিতে তুমি তোমার মনিবের ইচ্ছার প্রতিকূলে ১০১নং কার্জ্জন ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, এ কথা কি সত্য?"

ওলিভিয়া বলিল, "না, ও-কথা সত্য নহে। সেই দিন অপরাহ্ণ ৪টার সময় মিঃ ট্রেনটন আমাকে আদেশ করেন; আমি কয়েক ঘণ্টার জন্ম বাড়ী যাইতে পারি; কিন্তু তিনি রাত্রি পৌনে আটটার সময় আমাকে সেখানে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।"

"তিনি কি ইহার কারণ বলিয়াছিলেন?"

"না। কিন্তু আমার ধারণা হইয়াছিল তিনি বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার কাজ আরম্ভ করিবেন; কারণ, তিনি সাধারণতঃ এইরূপই করিতেন।"

কৌঁশুলী বলিলেন, "মিস্ ডেন, এ কথা কি সত্য যে, মিঃ ট্রেনটনের সঙ্গে বসিয়া কখন্ তোমাকে কাজ করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। আমার বিশ্বাস, সাধারণতঃ তুমি প্রত্যূষেই তাঁহার সঙ্গে কাজ করিতে বসিতে।"

"হাঁ, এ কথা সত্য।"

"এ অবস্থায় তুমি কি করিতে?"

ওলিভিয়া লজ্জা-জড়িত স্বরে বলিল, "মিঃ ট্রেনটন রাত্রিকালে আমাকে তাঁহার ফ্ল্যাটে থাকিবার জন্ম প্রায়ই অনুরোধ করিতেন; কিন্তু আমি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতাম।"

"এ কথা কি সত্য যে, তুমি তাঁহার সঙ্গে কাজ করিবার সময় তিনি তোমার প্রণয়লাভের চেষ্টা করিতেন?"

"সত্য।"

"তাঁহার এই চেষ্টা কি তোমার প্রীতিকর হইত?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া ওলিভিয়ার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। সে কোন দিকে না চাহিয়া সহজ স্বরে বলিল, "না। আমি অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে করিতাম।"

তাহার কৌঁশুলী তাহাকে বলিলেন, "আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু ফরিয়াদী-পক্ষের কৌঁশুলী বলিয়াছেন—তুমি যে ছয় মাসেরও অধিক কাল মিঃ ট্রেনটনের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলে—তোমার প্রতি তাঁহার দয়াই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু মিঃ ট্রেনটনের ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি যে কথা বলিলে, সেইরূপ ব্যবহার সত্ত্বেও তুমি কি কারণে সেই চাকরীতে লিপ্ত ছিলে, তাহা কি তুমি বিচারপতির নিকট প্রকাশ করিবে?"

ওলিভিয়া বলিল, "আমার আশঙ্কা ছিল, ঐ চাকরী ত্যাগ করিলে হয় ত অন্য কোন চাকরী সংগ্রহ করিতে পারিব না।"

কৌঁশুলী তাহাকে বলিলেন, "এইবার আমরা ৯ই অক্টোবরের রাত্রির কথা আলোচনা করিব। তুমি বলিয়াছ, তুমি মনিবের ব্যবস্থানুসারে রাত্রি পৌনে আটটার সময় তাঁহার ফ্ল্যাটে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে। সেই সময় তুমি মিঃ ট্রেনটনকে কি অবস্থায় দেখিয়াছিলে?"

সাক্ষী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মিঃ ট্রেনটনকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল—তিনি তখন নেশায় চুর!"

"কখন কখন তাঁহাকে কি ঐ অবস্থায় দেখা যাইত?"

"হাঁ, যাইত।"

"মিঃ ট্রেনটনের পোষাক তখন কি রকম ছিল?"

"তিনি পায়জামা ও গাউনে সজ্জিত ছিলেন।"

"তিনি কি তখন কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন!"

"না, সেরূপ কোন চেষ্টাই করেন নাই।"

"তোমার নিকট প্রেম-নিবেদনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল?"

"হাঁ, এ কথা সত্য বলিয়াই মনে হয়।"

"তুমি কি তাঁহার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলে? তাঁহাকে দেখিয়া তোমার ভয় হইত?"

"হাঁ, আমার আতঙ্ক হইত।"

কৌঁশুলী এবার বলিলেন, "তোমার আতঙ্ক হওয়াতেই কি তুমি একখানা খবরের কাগজ কিনিয়া আনিবার অজুহাতে ফ্ল্যাট হইতে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলে?"

"সে কথা সত্য। আমি আশা করিয়াছিলাম, আমি অতি অল্পকালও বাহিরে থাকিলে সেই অবসরে তাঁহার নেশা হয় ত ছুটিয়া যাইবে। অন্যান্য সময়েও সেইরূপ হইয়াছিল।"

"ফ্ল্যাট ত্যাগ করিয়া কতক্ষণ তুমি বাহিরে ছিলে?"

"বারো মিনিটের অধিক নহে।"

"তুমি যে অল্প সময় ফ্যাটে অনুপস্থিত ছিলে, সেই সময়েই মিঃ ট্রেনটন নিহত হইয়াছিলেন?"

"হাঁ, তাহাই হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।"

কৌঁশুলী এবার বলিলেন, "বিশেষ প্রয়োজনে একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে মিস্ ডেন, তুমি কি মিঃ ট্রেনটনকে হত্যা করিয়াছিলে?"

"না, আমি নিশ্চিত ও-কার্য্য করি নাই; আমি নিরপরাধ।"

কৌঁশুলী বলিলেন, "ফরিয়াদী-পক্ষ একটি ঘটনায় বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে ছোরার আঘাতে মিঃ ট্রেনটন নিহত হইয়াছিলেন, সেই ছোরার হাতলে তোমার অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি তুমি দয়া করিয়া প্রকাশ করিবে মিস্ ডেন!"

আসামী যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল, "আমি পূর্ব্বে কোন দিন কোন মৃতদেহ দেখি নাই, এ জন্য মিঃ ট্রেনটনের মৃতদেহ দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল। আমি—আমি তখন জানিতে পারি নাই, এমন কি, প্রথমে বুঝিতেও পারি নাই যে, মিঃ ট্রেনটন সত্যই মরিয়াছেন কি না। সুতরাং তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু বুকে ছোরা বিদ্ধ অবস্থায় নিস্তব্ধ ভাবে তিনি পড়িয়া আছেন দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে ছোরাখানি টানিয়া বাহির করিবার জন্য আমি তাহার হাতল স্পর্শ করিয়া—"

ওলিভিয়া এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইল। কৌঁশুলী তাহাকে কথা শেষ করিবার সুযোগ না দিয়াই বলিলেন, "মিস্ ডেন, আমার আর একটি মাত্র প্রশ্ন আছে। সোয়ানেস হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে, মিঃ ট্রেনটনের সহিত তোমার বিরোধের সময় তুমি না কি তাঁহাকে বলিয়াছিলে, "তুমি আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিলে আমি তোমাকে খুন করিব।" মিঃ ট্রেনটন নিহত হইবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তুমি এই কথা বলিয়াছিলে। সত্যই কি তুমি তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াছিলে?"

"না, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিলে আমি আপনার চাকরী ত্যাগ করিব।' সাক্ষী সেই কক্ষে ছিল না। সে কোন্ প্রমাণে ঐ কথা বলিল?"

সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবি এবার মিস্ ডেনকে জেরা করিতে উঠিয়া বলিলেন, "মিঃ ট্রেনটনের নিকট চাকরী করা যখন তোমার এতই অপ্রীতিকর হইয়াছিল, তখন তুমি কি কারণে তাঁহার চাকরী ত্যাগ কর নাই, ইহা কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি? তোমার ন্যায় তরুণীর এরূপ আকর্ষণ-শক্তি থাকিতে স্থানান্তরে চাকরী সংগ্রহ করা কি কঠিন হইত?"

সাক্ষী প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "সার এডমণ্ড, আপনি যদি পৃথিবীতে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে চাকরীর বাজারে এই ভীড়ের ভিতর চাকরী সংগ্রহ করা নারীর পক্ষে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার সহজেই তাহা বুঝিতে পারিতেন।"

এই সুস্পষ্ট জবাব শুনিয়া সার এডমণ্ড সাক্ষীর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অসন্তুষ্ট স্বরে বলিলেন, "তুমি হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছ, তুমি যখন তোমার মনিবের সহিত কলহ করিতেছিলে —সেই সময় সাক্ষী সোয়ানেস সেই কক্ষে ছিল না। তুমি কি এখনও সে কথা অস্বীকার করিতে চাও?"

"আমি এখনও বলিতেছি, সোয়ানেস সে সময় সে ঘরে ছিল না।"

কৌঁশুলী বলিলেন, "তোমাদের কলহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সোয়ানেস একখান পত্র আনিয়া তোমার হাতে দিয়াছিল, এ কথা কি তুমি অস্বীকার কর না?"

"উহা কি কোন পুরুষের পত্র?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া সাক্ষী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল না।

জজ বলিলেন, "তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।"

সাক্ষী অস্ফুট স্বরে বলিল, "উহা পুরুষের লিখিত পত্র।"

"সেই পুরুষ কি তোমার প্রণয়ী?"

সাক্ষীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "না।"

"যদি উহা তোমার প্রণয়ীর পত্র না হয়, তাহা হইলে তুমি কি কারণে তাহা মিঃ ট্রেনটনকে দেখিতে দিয়াছিলে?"

সাক্ষী বলিল, "মিঃ ট্রেনটনকে আমি তাহা দেখাই নাই। তিনি তাহা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন।"

"উহা তোমার প্রণয়ীর পত্র না হইলে সেই পত্রের কথা স্বীকার করিতে তোমার ঐরূপ লজ্জিত হইবার কারণ কি?"

এই সময় সেই কক্ষের দ্বার-প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি জজকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মাই লর্ড, এই প্রশ্নে আমার আপত্তি আছে!"

আদালতের সকল লোক আগন্তুকের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কোন দিকে না চাহিয়া বিচারকের সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে প্রহরীরা তাহাকে বাধা দান করিল। সে তাহাদিগকে ঠেলিয়া-ফেলিয়া সাক্ষীর কাঠরার সোপান-প্রান্তে উপস্থিত হইল। তাহার পর সে বিচারকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মাই লর্ড, আমি এই আসামীর পিতা। উহাকে সাক্ষীর কাঠরায় তুলিয়া সেই চিঠির লেখক কে তাহা জানিবার জন্য সরকার-পক্ষের কৌঁশুলী উহাকে জেরা করিতেছে। আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই সেই পত্রের লেখক। পুলিশ আমার অনুসরণ করায় আমি বিপদে পড়িয়াছিলাম; এ জন্য আমি আমার কন্যার নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলাম, নতুবা তাহাকে ঐ পত্র লিখিতাম না। কারণ দীর্ঘকাল আমি কন্যার সন্ধান লই নাই, এবং অত্যন্ত লজ্জাজনক ভাবে পিতার কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু ওলিভিয়াই আমার একমাত্র সন্তান, আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। আমি আর অধিক দিন—"

কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল; সে সতৃষ্ণ নয়নে ওলিভিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, এবং সহসা তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রহিত হওয়ায় মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

নবম পল্লব

সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে

সেই দিন সংবাদপত্র সমূহের সান্ধ্য-সংস্করণে মোটা মোটা অক্ষরে প্রকাশিত হইল,—

ট্রেনটন হত্যার মামলার
অদ্ভুত পরিণতি।
আসামীর পিতা ওল্ড বেলী আদালতের কক্ষে
সহসা মৃত্যুমুখে পতিত!

ডেভিড গারসাইড যখন আদালত হইতে পথে বাহির হইল, তখন সংবাদপত্রবিক্রেতা বালকেরা চিত্তাকর্ষক প্ল্যাকার্ড হাতে লইয়া সান্ধ্য-সংস্করণের সংবাদপত্রগুলি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিল; পথিকগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই সকল সংবাদপত্র ক্রয় করিতেছিল। আদালত-কক্ষে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ পাঠ করিবার জন্য সকলেই উৎসুক। ডেভিড তাড়াতাড়ি 'অয়ার' (Wire) সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া 'টাইপ রাইটারে' পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিবরণ টাইপ করিবার জন্য ব্যাকুল!

ডেভিড চিপ সাইডের মোড়ে প্রবেশ করিতেই কে তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া পথের অন্য ধারে সরাইয়া দিল। কে তাহাকে ঐ ভাবে ধাক্কা দিল, ইহা দেখিবার জন্য সে মুখ ফিরাইতেই এক ব্যক্তির বিবর্ণ মুখ দেখিতে পাইল; সেই মুখের উর্দ্ধাংশ ফেল্টের টুপিতে আবৃত থাকিলেও তাহাতে হিংসা পরিস্ফুট। লোকটির চক্ষু সর্পের চক্ষুর ন্যায় খলতাপূর্ণ।

লোকটাকে পেশাদার তস্কর বলিয়াই ডেভিডের ধারণা হইল। সে মুখ তাহার পরিচিত; কিন্তু পূর্ব্বে কোথায় তাহাকে দেখিয়াছিল তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না। ডেভিড তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে তাহাকে পাশে ফেলিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হইল, এবং জনতার মধ্যে মিশিয়া অদৃশ্য হইল।

কিন্তু এই ঘটনার কথা অধিক কাল ডেভিডের স্মরণ রহিল না; 'অয়ার' পত্রিকায় কি ভাবে হত্যাকাণ্ডের বিবরণটি লিখিতে আরম্ভ করিবে, সে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সে 'অয়ার' পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া একটি 'টাইপ রাইটারে'র সম্মুখে বসিয়া পড়িল এবং কয়েক মিনিট চিন্তার পর গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় ধূমপানের জন্য উৎসুক হইয়া কোটের বাঁ দিকের পকেটে হাত পূরিয়া তামাকের থলিটি (Pouch) বাহির করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তামাকের থলির পরিবর্ত্তে একখানি লেফাফায় তাহার হাত পড়িল!

সবিস্ময়ে সেই লেফাফাখানি টানিয়া বাহির করিয়া তাহাতে তাহার নাম দেখিতে পাইল। লেফাফাখানি খুলিয়া তাহার ভিতর এক ফর্দ্দ সাদা কাগজ পাইল। তাহাতে পত্রখানির তারিখ লেখা থাকিলেও লেখকের নাম ছিল না। তাহাতে লিখিত ছিল,—

"আমার পূর্ব্বপত্রে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম—তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য পুনর্ব্বার সংবাদ দিব না।

তুমি জানিয়া রাখ আমার সে কথার ব্যতিক্রম হইবে না।"

এক জন লোক এই সময় ডেভিডের পশ্চাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ডেভি?"

প্রশ্নকর্ত্তা 'অয়ারের' সংবাদ-বিভাগের সম্পাদক মেডলি। সর্ব্বসাধারণের ঔৎসুক্যবর্দ্ধক উক্ত চাঞ্চল্যজনক সংবাদটি ডেভিড কি ভাবে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহ হওয়ায় মেডলি তাড়াতাড়ি ডেভিডের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তিনি ডেভিডকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখনও উহা লিখিতে আরম্ভ কর নাই?"

ডেভিড তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল, এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি শীঘ্রই লিখিয়া দিতেছি; আপনি

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই দুই স্তম্ভব্যাপী গল্পটি লিখিত হইল। সংবাদ-বিভাগের সহকারী সম্পাদকগণের হস্তে প্রদানের পূর্ব্বে মেডলি তাহা তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, "ডেভি, তোমার গল্প-রচনার শক্তি অসাধারণ। এই অল্প সময়েই তুমি কি চমৎকার কৌশলে ইহা লিখিয়া ফেলিয়াছ! আমি তোমাকে কত দিন বলিয়াছি, তুমি বেতনভোগী সহকারিরূপে আমার সংবাদ-বিভাগে যোগদান কর। যদি বার্ষিক পনের শত পাউণ্ড বেতন অল্প বলিয়া তোমার—"

ডেভিড হাত তুলিয়া তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমরা পরে এই বিষয়ের আলোচনা করিব—যদি আমার ভাগ্যে 'পরে' বলিয়া কিছু থাকে।"

ডেভিডের কথায় মেডলি মুখের পাইপ হাতে লইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন. "এখন তুমি মদে বেহুঁস হইয়াছ বলিয়া ত মনে হয় না! তবে এ রকম অসংলগ্ন কথা বলিবার কারণ কি? 'যদি আমার ভাগ্যে পরে বলিয়া কিছু থাকে'—ইহার কোন অর্থ আছে কি?"

ডেভিড চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া মেডলিকে সংযত স্বরে বলিল, "দেখুন, যদি আমি আপনাকে কোন গোপনীয় কথা বলি, তাহা হইলে আপনি কি আমার নিকট অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছেন যে, তাহা আপনার ওষ্ঠের বাহিরে আসিবে না? আপনি সম্পাদক, আমি আপনার সংবাদদাতা, আপনার সহিত আমার এরূপ সম্বন্ধের কথা না ভাবিয়া আমরা উভয়েই ভদ্রলোক এই প্রকার সম্বন্ধ ধরিয়া আমি আপনার নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিব। আমার কথা আপনি বুঝিতে পারিলেন?"

মেডলি বলিলেন, বুঝিয়াছি; এখন কি বলিতে চাও বল।"

ডেভিড বলিল, "তবে শুনুন; কথাটা জরুরী। আমার বিশ্বাস, মিঃ ট্রেনটনের প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরিয়া দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। যে তরুণীকে আসামী করা হইয়াছে, সে আপনার আমার ন্যায়ই নিরপরাধ, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"

মেডলি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইহা কি তোমার আন্তরিক কথা?"

"হাঁ, আমি অন্তরের সহিত এ কথা বলিতেছি। আপনি ইহা পড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।" পকেট হইতে সতর্কতা-জ্ঞাপক পত্রখানি বাহির করিয়া ডেভিড মেডলির সম্মুখে প্রসারিত করিল।

মেডলি তাহা হাতে লইয়া পাঠ করিলে ডেভিড বলিল, "ওখানি একই মর্ম্মের দ্বিতীয় পত্র। পত্রলেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্যে সন্দেহের কোন কারণ নাই; ইহা ধাপ্পা নহে। আপনার কিরূপ মনে হয়?"

মেডলি বলিলেন, "আমি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম না। এ কি ব্যাপার তাহা তুমি আমাকে খুলিয়া বলিবে?"

ডেভিড বলিল, "কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি পিটার ট্রেনটনের হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। আমি একাধিক কারণে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

করে; ভ্রাতাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য আমার আগ্রহ হওয়ায় আমি অধিকাংশ সময় হত্যাকারীর সন্ধানে রত থাকিতাম।"

মেড্‌লি বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস—হত্যাকারীর অনুসন্ধান কার্য্যে তুমি ঠিক পথের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে?"

ডেভিড বলিল, "এখন আমি সে সকল কথা প্রকাশ করিব না; তাহার একটি কারণ এই যে, এখন পর্য্যন্ত আমি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় কারণ, এ কথা প্রকাশ করা বিপজ্জনক। সংবাদপত্রের সম্পাদক আপনি,—মানহানির মামলার দায়িত্ব আপনার অজ্ঞাত নহে।"

মেড্‌লি হাসিয়া বলিলেন, "আজকাল পাগলকে পাগল বলিলে সেও মানহানির আইনের সাহায্যে নষ্টমান উদ্ধার করিতে চায়!"

ডেভিড বলিল, "আপনার কথা সত্য। সুতরাং আপনার দায়িত্ব উপেক্ষার যোগ্য নহে।"

মেড্‌লি বলিলেন, "কিন্তু সংবাদপত্র সম্পাদনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি অপরাধ-তত্ত্বের হিসাবে এই কাহিনী এরূপ চাঞ্চল্যজনক ও চিত্তাকর্ষক হইবে যে, গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এ দেশে এরূপ বিচিত্র কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। এই জন্যই আমরা ইহা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিব।"

ডেভিড বলিল, "আপনি নিশ্চিতই ইহা প্রকাশ করিবেন; এবং যদি আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে ইহা পাঠ করিয়া পাঠক-সমাজ কি অভিমত প্রকাশ করেন—তাহাও জানিতে পারিব।"

মেড্‌লি সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি সত্যই মনে কর, এই কাহিনী প্রকাশ করিলে তোমার জীবন বিপন্ন হইবে?"

ডেভিড সেই পত্রখানির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; তাহা তখন পর্য্যন্ত তাঁহার হাতে ছিল।

অতঃপর সে বলিল, "এই পত্রখানি যে ব্যক্তি আমার পকেটে গুঁজিয়া দিয়া ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল, আপনি যদি তাহার মুখ দেখিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে এ কথা জিজ্ঞাসা করাই আপনি নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন।"

দশম পল্লব

ঘটনা-বৈচিত্র্য

তিন ব্যক্তি গুপ্ত পরামর্শের জন্য মিলিত হইয়াছিল। 'হাউস অফ দি এবমিনেবলের' পরিচালক এম, ডিগো এবং সোহো পল্লীর বদমায়েসদের আড্ডায় যে দীর্ঘকায়, ভীমমূর্ত্তি গুণ্ডা 'কাউণ্ট' নামে পরিচিত ছিল—সেই 'কাউণ্ট' ব্যতীত এক জন সুবেশধারী বিদেশী সেই সমিতিতে যোগদান করিয়াছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তির প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। সে 'গুণ্ডা সর্দ্দার' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তাহার পাণ্ডুর মুখে নেশাখোরের মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট; তাহার চক্ষু দু'টি সর্পের নির্নিমেষ নেত্রের ন্যায় খলতাপূর্ণ। সেই গুপ্ত সমিতিতে তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হইল, তাহা সে আগ্রহ-ভরে শুনিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে সে তাহার সহযোগিদ্বয়কে বলিয়াছিল, "আজ অপরাহ্নে ডেভিড গারসাইড ওল্ড বেলি হইতে পথে আসিলে আমি তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া সেই পত্রখানি তাহার পকেটে গুঁজিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলাম।"

"সে কি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিল বলিয়া তোমার মনে হয়?"

"সে কথা বলা বড় শক্ত সর্দ্দার! কিন্তু সে আমার মুখের দিকে এমন কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়াছিল যে, আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।"

এম, ডিগো মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি তাহার মুখের উপর আরও অধিক কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলে। তোমার স্মরণ রাখা উচিত বন্ধু সাগ্রিন, যে, এ সকল ব্যাপারে খুব বিবেচনা করিয়া চলাই কর্ত্তব্য।"

সাগ্রিন নামক গুণ্ডাটি গম্ভীর স্বরে বলিল, "সে কথা আমার ভালই জানা আছে। কিন্তু সেই লোকটিকে দ্বিতীয় বার পত্রদ্বারা সতর্ক করিবার কি কোন প্রয়োজন ছিল? তুমি তাহাকে সাবাড় করিতে প্রস্তুত ছিলে! সুতরাং তাহাকে ঐ ভাবে সতর্ক করা পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে হয়।"

'কাউণ্ট' গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "সাগ্রিন, উহার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু এখন আমি সে সকল কথার আলোচনা করিতে চাহি না। আমাদের আশা ছিল, উক্ত ভদ্রলোকটি সতর্কতা-জ্ঞাপক পত্রের প্রথমখানি পাইয়াই সতর্ক হইবে, কিন্তু দেখা গিয়াছে, সে নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করিয়াছিল। তাই সে বেচারার দুর্ম্মতির জন্য আক্ষেপ হয়।"

* * * *

এবার আমরা অন্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

সুন্দরী জুনের সুনীল চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাহার প্রণয়ী ডেভিডকে দেখিয়া বলিল, "ডেভিড, প্রিয়তম, আমি শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আজ রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে—এ আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আসিয়াছ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।"

ডেভিড জুনকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত; তথাপি ডেভিড কোনরূপে উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। তাহার মন চিন্তাকুল, মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

জুন তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? তোমার কি হইয়াছে?"—আতঙ্কে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

ডেভিড গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমার কথা শোন জুন! তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার কর—যদি তোমার সঙ্গে কিছু দিন আমার দেখা না হয়—তাহা হইলে তুমি উৎকণ্ঠিত হইবে না, বা ভবিষ্যতে আমার সহিত সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করিবে না।"

"তুমি কোথায় যাইতেছ?"

ডেভিড বলিল, "যে কাজ আমি হাতে লইয়াছি—সেই কাজে।"

জুন মুখ ভার করিয়া বলিল, "তুমি কি সেই মেয়েটার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার কর নাই? আমি জানি সে নিরপরাধ, এবং প্রথম হইতেই আমি তোমাকে সে কথা বলিয়া আসিতেছি। তাহার সম্বন্ধে যে সকল কথা খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে—আজ রাত্রে সেগুলি সমস্তই আমি মন দিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি। আমার বিশ্বাস,

পৃথিবীর কোন জুরী তাহাকে অপরাধী বলিয়া রায় প্রকাশ করিতে পারিবে না।"

ডেভিড বলিল, "এই যুবতী মুক্তিলাভ করিলেই যথেষ্ট হইল—এরূপ আমি মনে করি না। তাহাকে মুক্তিদানের জন্য চেষ্টা করিব —প্রথমে এইরূপই আমার সঙ্কল্প ছিল। তুমি আমাকে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলে বলিয়াই আমি যে ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—এ কথা মনে করিও না, বা তোমার বা আমার জিদের কথা ভাবিয়া ঐরূপ করিয়াছিলাম ইহাও ভাবিও না। এতদ্ভিন্ন আমার ভাই আদালতে তাহার পক্ষ সমর্থন করায় আমি আমার ভ্রাতার স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় উহা করিয়াছিলাম—যেন এ চিন্তাও তোমার মনে স্থান না পায়। ঐ সকল ব্যতীত তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আমার আগ্রহের অন্য কারণও এখন দেখা যাইতেছে।"

"সে কারণ কি, তাহা আমাকে বলিবে?"

ডেভিড জুনকে সেই কথা বলিতে উদ্যত হইল বটে, কিন্তু তাহার মুখে কথা বাহির হইল না; ওষ্ঠে আসিয়া তাহা মিলাইয়া গেল। (found the words freezing on his lips.)

ডেভিড বলিল, "যখন আমার বলিবার শক্তি হইবে, তখন তোমার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিব। ইহা আমার অঙ্গীকার বলিয়া মনে করিতে পার। এখন আমি তোমার নিকট বিদায় লইব।"

ডেভিড জুনকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার ওষ্ঠ চুম্বন করিল; তাহার পর তাহাকে আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেই সময় পথে জনসমাগম ছিল না, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। ডেভিড তাহার প্রণয়িনীর কথা চিন্তা করিতে করিতে সেই পথে চলিতে লাগিল। সেই সময় এক জন লোক কিছু দূরে থাকিয়া সতর্ক ভাবে তাহার অনুসরণ করিতেছিল, ডেভিড তাহা বুঝিতে পারিল না; কোন দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

ডেভিডের অনুসরণকারী দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে তাহার ঠিক পশ্চাতে আসিয়া তাহার মস্তকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতেই ডেভিডের দেহ ধরাশায়ী হইল দেখিয়া তাহার দুই জন অনুসরণকারী তাহার অচেতন দেহ ধরিয়া ফেলিল। সেই পথের মোড়ে এক জন কনষ্টেবল পাহারা দিতেছিল; তাহার ধারণা হইল—কোন পথিক মদের নেশায় বিভোর হইয়া খানায় পড়ে দেখিয়া তাহার দুই জন বন্ধু তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল।

কনষ্টেবল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মনে মনে হাসিয়া অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের অধিকাংশ পুলিশ প্রহরী এই ভাবেই কর্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে!

* * * * * *

মস্তকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত প্রাপ্ত হইলে সংবাদ-সংগ্রাহক ডেভিড গারসাইডের অবস্থা কিরূপ হইল, এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব।

চেতনা লাভ করিয়া ডেভিডের মনে হইল, তাহার মাথার ভিতর [illegible] করাত চলিতেছে। তাহার তখন নড়িবার শক্তি

দূরবর্ত্তী পথে তাহার এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। সেই সময় জুন তাহার ঘরের জানালা দিয়া পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় ডেভিডের উপর গুণ্ডার আকস্মিক আক্রমণ তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

ডেভিড চেতনা লাভ করিয়া তাহার সঙ্কটের কথা চিন্তা করিতে করিতে শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল, তাহার চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার হাত-পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ ছিল! সে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহাকে কোথায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাও নির্ণয় করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল। তাহার অনুমান হইল, সেই স্থানটি সোহো পল্লীর সন্নিহিত কোন গুণ্ডার আড্ডা।

ডেভিড ভাবিতে লাগিল, যে গুণ্ডা সেই দুইখানি পত্র লিখিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়াছিল, সে কি তাহাকে হত্যা করিতে সাহসী হইবে?

ডেভিড সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে কতক্ষণ অচেতন অবস্থায় শায়িত ছিল তাহা ধারণা করিতে পারিল না, ট্রেনটনের হত্যাকাণ্ডের বিচার শেষ হইয়াছিল কি না তাহাও বুঝিতে পারিল না। ওলিভিয়া ডেন কি মুক্তিলাভ করিয়াছে? তাহার মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হইল, তাহার উত্তর স্থির করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল!

সেই সময় বৈদ্যুতিক দীপালোকে সেই কক্ষ আলোকিত হইলে ডেভিড বুঝিতে পারিল, তাহার কোন শত্রু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

আগন্তুক ডেভিডের মাথার কাছে আসিয়া বলিল, "ওহে সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার, এখন কেমন আছ?"

ডেভিড তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল। সে যখন লণ্ডনের দস্যু, তস্কর ও গুণ্ডাদলের বাস-পল্লীতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল, সেই সময় দুর্দ্দান্ত নরহন্তা বলিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিল।

আগন্তুক ক্রূর দৃষ্টিতে ডেভিডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কঠোর স্বরে বলিল, "তোমার যাহা প্রার্থনা ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আশা করি, এই ভাবে ফাঁদে পড়িয়া তুমি খুশী হইয়াছ।"

ডেভিড ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ, এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল। তবে এ কথাও সত্য যে, লণ্ডনের প্রত্যেক সংবাদপত্রের পরিচালক চতুর্দ্দিকে আমার সন্ধান করিতেছে; তাহাদের কেহ না কেহ আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।"

গুণ্ডাটা দৃঢ় স্বরে বলিল, "তাহারা তোমার সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই তুমি এই কক্ষের নিম্নস্থিত ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে। তুমি জীবিত অবস্থায় সমাহিত হইবার জন্য প্রস্তুত হও।"

বিচারক মিঃ স্কার্থডেল তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত নথিপত্র হইতে মাথা তুলিয়া তাঁহার পত্নী সুসানকে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আমার অনুরোধ—তুমি এখন কয়েক মিনিট আমাকে বিরক্ত করিও না। আমি আগামী কল্য পুনর্ব্বার ট্রেনটন-হত্যাকাণ্ডের মামলার বিচারে প্রবৃত্ত হইব, ইহা বোধ হয় তোমার স্মরণ নাই। কিন্তু—"

আমার তাহা বিলক্ষণ স্মরণ আছে, এবং এখন তোমার সঙ্গে সেই বিষয়েরই আলোচনা করিতে আমার আগ্রহ হইয়াছে। আমি জানি, আমার নিকট তুমি এ সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে চাহ না, তথাপি আমাকে তাহা বলিতে হইবে।"

এ কথা শুনিয়া মিঃ স্বার্থডেল পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, এবং সময় দেখিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে বল, আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, তাহার পর আর এক সেকেণ্ডও সময় পাইবে না।"

সুসান স্বার্থডেল তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "হোরেসিও, তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার কর, আসামী বেচারাকে মুক্তিদানের জন্য তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। তুমি হয় ত আমাকে নির্ব্বোধ মনে করিতেছ, সম্ভবতঃ আমি সত্যই নির্ব্বোধ; কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই অভাগা নারীর সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে— তাহা সমস্তই আমি পাঠ করিয়াছি। এখন আমার নিঃসংশয়ে ধারণা হইয়াছে—ওলিভিয়া ডেন সত্যই নিরপরাধ।"

মিঃ স্বার্থডেল এ কথা শুনিয়া পত্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার বাম বাহুমূলে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। সুসানের মনে হইল, তাঁহার নখরগুলি বাহুর ত্বকে বিদ্ধ হইয়া তাহা বিদীর্ণ করিবে।

স্বার্থডেল স্ত্রীর মুখের উপর পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তরুণী ডেন যে নিরপরাধ তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি সুসান? সে যদি তাহার মনিবকে খুন না করিয়া থাকে, তাহা হইলে কে তাহাকে খুন করিল?"

সুসান তাঁহার স্বামীর অগ্নিময় চক্ষুর দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "তাহা আমি জানি না; আমি কিরূপে জানিব যে—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে মিঃ স্বার্থডেল কঠোর স্বরে বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

পত্নীকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি তুমি কোন দৈবজ্ঞের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে?"

সুসান যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন! কথাটা মিথ্যা হইলেও সুসান তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হাঁ হোরেসিও, যে ব্যক্তি লোকের ভাগ্য-ফল গণনা করেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, আমি নিউবণ্ড ষ্ট্রীটে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ওলিভিয়া ডেন নিরপরাধ। তিনি তাঁহার স্ফটিক-চক্ষে তাহার নির্দ্দোষিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।"

মিঃ স্বার্থডেল অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "সেই লোকটা নির্ব্বোধ এবং প্রতারক। আমি পুলিশের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব। পুলিশের নিকট তোমাকে এজাহার দিতে হইবে। কারণ—"

সুসান আতঙ্কে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "না, না, পুলিশকে এখানে আসিতে দিও না। তাহারা যেন দূরে থাকে। হোরেসিও, তাহাদিগকে তফাতে রাখিও।"

সুসান অবসন্ন দেহে স্বামীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন; তথাপি তাঁহার নিষ্ঠুর স্বামী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিশকে কি কারণে এখানে আসিতে নিষেধ করিতেছ?"

সুসান কাতর স্বরে বলিলেন, "তুমি নিজেই তাহা জান হোরেসিও। তোমার তাহা অজ্ঞাত নহে—ইহা তুমি অস্বীকার

-এ কথা শুনিয়া স্বার্থডেল পত্নীর মুখের উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই কক্ষের প্রাচীর-সংলগ্ন বৃহৎ ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং একটি দেরাজ খুলিয়া এক গাছা চাবুক বাহির করিলেন। সেই চাবুক যাহার পিঠে পড়িত, তাহার পিঠ কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিত!

* * *

ডেভিড তাহার প্রণয়িনী জুনের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে জুন তাহার বাসকক্ষের জানালা খুলিয়া ডেভিডের গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কয়েক মিনিট পরে জুন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সে দেখিল, দুই জন লোক হঠাৎ একটি প্রাচীরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া ডেভিডকে আক্রমণ করিল। মুহূর্ত্ত পরে একখান মোটর-কার সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলে সেই দুই ব্যক্তি আহত ও হতচেতন ডেভিডকে ধরাধরি করিয়া তাহাদের মোটর-কারে নিক্ষেপ করিল! তার পর গাড়ী ডেভিডকে লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

এই লোমহর্ষণ ঘটনায় জুন আতঙ্কে অভিভূত হইলেও অবিলম্বে আত্মসংবরণ করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরিচ্ছদে সজ্জিত হইল। সে স্থির করিল, 'অয়ার' পত্রিকার সম্পাদকের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে বিপদের কথা জানাইবে এবং সাহায্য প্রার্থনা করিবে। তাহার আশা হইল—'অয়ারের' ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন ও শক্তিশালী পত্রিকার পরিচালকবর্গ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে ডেভিডকে শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন।

'অয়ারের' সংবাদ বিভাগের সম্পাদক মেড্‌লির নিকট জুন ডেভিডের বিপদের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিল।

তাহার কথা শুনিয়া মেড্‌লি বলিলেন, "মিস্ মেরিক্, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমাদের সংবাদপত্রের যে শক্তি আছে—তাহা আমরা এই কার্য্যে বিনিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না—এ কথা অনায়াসেই আপনাকে বলিতে পারি, এই প্রকার পীড়নে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। মিঃ গারসাইডকে যেখানেই 'গুম্' করিয়া রাখা হউক, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইবে না।"

জুন 'অয়ারের' কার্য্যালয় ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মেড্‌লি তাহাকে বলিলেন, "আপনি একা বাড়ী ফিরিবেন না মিস্ মেরিক! আমার কোন কর্ম্মচারী ট্যাক্সিতে আপনাকে আপনার বাড়ীতে রাখিয়া আসিবে। আপনি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন।"

মিস মেরিক প্রস্থান করিলে মেড্‌লি তাঁহার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। বিলাতের প্রত্যেক সংবাদপত্রের অফিসে বিশেষ প্রয়োজন উপলক্ষে ব্যবহারের জন্য টেলিফোনের গোপনীয় নম্বর আছে। মেড্‌লি সেইরূপ একটি নম্বর বাহির করিয়া ডিটেকটিভ-সার্জ্জেণ্ট বেন মর্কিকে আহ্বান করিলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট বেন মরকি 'অয়ার' অফিসের অনুকূলে গোপনে গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য নিয়মিত ভাবে দক্ষিণা পাইত।

বেন মরকি টেলিফোনে সাড়া দিলে মেড্‌লি তাহাকে বলিলেন, "একটি দারুণ চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাহার বিবরণ বলিবার

প্রকাশ না পায়। ডেভিড গারসাইড প্রায় চল্লিশ মিনিট পূর্ব্বে এজময়ার রোডের সন্নিহিত সিয়ার ষ্ট্রীট দিয়া যাইবার সময় দুই জন গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; তাহারা তাহাকে তাহাদের মোটর-কারে তুলিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। আমার অনুরোধ, তুমি তাহাকে যেরূপে পার খুঁজিয়া বাহির কর। কাজটি অত্যন্ত জরুরী। কথাটা গোপন রাখিবে। এমন কি, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও এখন এ কথার আলোচনা করিও না।"

বেন মরকি বলিল, "আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেই গুণ্ডা দু'টোর চেহারা কি রকম?"

মেড্‌লি বলিলেন, "আমি তাহাদিগকে দেখি নাই। তবে সিয়ার ষ্ট্রীটের কোন ফ্ল্যাট হইতে গারসাইডের কোন বন্ধু তাহাদের এই গুণ্ডামী দেখিতে পাইয়াছিল। এ জন্য তাহারাই দায়ী।"

বেন মরকি বলিল, "উত্তম। আমার যাহা সাধ্য তাহার ত্রুটি করিব না কর্ত্তা!" ক্রমশঃ

দীনেন্দ্রকুমার রায়

মামা-ভাগ্নে

[গল্প]

হাওড়া-আমতা রেলপথে শীতলপুর গ্রাম। এই গ্রামের হাট-তলায় অক্ষয় ঘোষের মুদীখানায় এক দিন সকালে গ্রামের পাঁচ জন বসিয়া অন্যান্য দিনের মত তামাক পোড়াইতে পোড়াইতে গল্প-গাছা করিতেছিল।

নীলু গোঁসাই কহিল—"'চেতাবনী'র কথা সবই যখন প্রায় খেটে আসচে, তখন কলিযুগের যে শেষ এবং সত্যযুগ আসন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

ইহাদের সকলের মধ্যে সুরেশ হালদার ছিল বয়সে নবীন। সে এবার আই, এ, পরীক্ষা দিয়া দুই বৎসর পরে গ্রামে আসিয়াছে এবং তাহার দ্বারা জগতের কি একটা অসাধারণ এবং শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পন্ন হইবে, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া, যেন তাহারই অপেক্ষায় তাস, ফুটবল, দিবানিদ্রা, নভেল, খোসগল্প, পাঁঠা মারিয়া 'পিক্‌নিক্' প্রভৃতি কার্য্যে দিনাতিপাত করিতেছে। নীলু গোঁসাইএর কথায় সুরেশ কহিল—"যত সব নন্‌সেন্স্! কতকগুলো বাজে কথা নিয়ে বেশ-কিছু বই বিক্রী কোরে নিলে! যেমন বোকা দেশ!"

নীলু গোঁসাই ফোঁশ্‌ করিয়া উঠিল—"দু'পাতা ইংরিজী পোড়ে এমন ভাবে গোল্লায় যেয়ো না। তবে কি না এটাও ঠিক যে, দু'পাতা পোড়েই ত গোল্লায় যাবার কথা! একটু বেশী কোরে—অর্থাৎ পড়ার মত পড়লে আর……"

গোঁসাইয়ের কথাটা কাড়িয়া লইয়া ননী বিশ্বাস সুরেশের দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া কহিল—"কিন্তু লেখাগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্চে!"

সুরেশ হাসিতে হাসিতে কহিল—"কি ফলে যাচ্চে?"

"এক নম্বর থেকে ধর। প্রথমে এই যুদ্ধেই ত লক্ষ লক্ষ জীবক্ষয়! তার পর ধর, মেদিনীপুরের বন্যা, তা'তে আপাততঃ ঐ এগার হাজারই ধর। কোথায় ইন্দোচীন, সেখানকার ঝড়েও এগার হাজার। তার পর হালসীবাগানের আগুন……

রমানাথ কহিল—"আমেরিকার বোষ্টনে অগ্নিলীলা; সেটা ধর?"

"হাঁ। তার পর, টার্কীতে উপরি উপরি দু' দফা ভূমিকম্প। হাজার হাজার লোক তাতে মরেচে। তার পর বাঙ্গলা দেশের মন্বন্তর! এ আর বিস্তারিত বুঝিয়ে বলবার বোধ হয় আবশ্যক হবে না।"

শিবকালী বাঁড়ুয্যের হাতে ছিল হুঁকা। একটা 'সুখটান্' দিয়া শিবকালী কহিল—"অপরঞ্চ কিং ভোবিষ্যতিম্! আরো না-জানি কি অঘটন ঘটে!"

ননী বিশ্বাস শিবকালীর হুঁকা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া নিজের হুঁকার মাথায় বসাইল এবং একটা জোর দম দিয়া সুরেশের উদ্দেশে কহিল—"নাতি, একেবারে শেষ কলির ছেলে তোমরা, এগুলো শাস্ত্রীয় কথা, একটু বিশ্বাস কোরো। চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো ভাবতে পেরেছিল যে চাল হবে চল্লিশ টাকা-মণ?"

বৃন্দাবনের আফিং সেবনের অভ্যাস ছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আফিংয়েরও যে এই রকম দুষ্প্রাপ্যতা ঘট্‌বে, এও কি কেউ কখনো কল্পনা করতে পেরেছিল!"

নীলু গোঁসাই কহিল—"কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, চল্লিশ টাকা মণ চাল হওয়া সত্ত্বেও এখনো কাতারে-কাতারে লোক মরচে না কেন?"

অক্ষয় ঘোষ এতক্ষণ খরিদ্দার বিদায়ের দিকে ব্যস্ত ছিল; এক্ষণে কহিল—"এর মধ্যেও দেবতার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে জানবে খুড়ো-গোঁসাই!"

শিবকালী কহিল—"ভেতরে-ভেতরে লোক খুবই মরচে, কে কার খবর রাখে বল? এই সে দিন মুন্সীর হাট ষ্টেশনে একটা লোক মর-মর অবস্থায় পোড়েছিল। লোকটা না কি ভদ্দর লোক। চৌদ্দ দিন পেটে অন্ন-জল পড়েনি। তাকে খাওয়াবার জন্যে ভাত-তরকারী আনা হোল। সে কিছুতেই খেলে না। বল্লে—আমার স্ত্রী-পুত্র না খেতে পেয়ে আমার চোখের সামনে মরেচে, সুতরাং আমি আর নিজেকে বাঁচাবার জন্যে খাব না।' তার পর, সেই রাত্রেই লোকটা মারা যায়।"

এমন সময় কার্ত্তিক হন্ত-দন্ত হইয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কহিল—"ভুঁইপাড়ায় গিয়েছিলুম—এক বীভৎস ব্যাপার দেখে এলুম। তিন জনে একসঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে!"

শিবকালী একটু গা-নাড়া দিয়া বসিয়া কহিল—"নীলু, শোন—শোন। কি ব্যাপারটা বল ত বাবাজি!"

কার্ত্তিক তখন বলিতে আরম্ভ করিল; কেমন করিয়া ভুঁই-পাড়ার এক জন লোক, তার স্ত্রী আর তার ভাই অন্নাভাবে নদীর ধারের আমবাগানে তিনটা গাছে তিন জনে গলায় দড়ি দিয়া

ঝুলিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতে লাগিল। বর্ণনা শেষ করিয়া কহিল—"পথে আসতে শুনে এলুম, মাকালপুরের বাবুদের বাড়ী কাল না কি তিনশো প্রজা এসে ধন্না দিয়ে পড়েছিল—'খেতে দাও—খেতে দাও!'—কিন্তু একটা সুখের বিষয়, ধান আর পাট এবারে যা হোয়েচে, এ রকম বহু কাল হয়নি। দু'ধারের সব ক্ষেত দেখতে দেখতে এলুম, মা-লক্ষ্মী যেন সবুজ সাড়ী পোরে প্রাণভরা আনন্দেতে হাসচে! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়!"

সুরেশ এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই; এইবার বলিল—"কলিযুগের শেষ যদি, তবে এ রকম সু-ফসল হ'বার ত কথা নয়! আপনাদের 'চেতাবণী' এ বিষয়ে কিছু বোলেচেন না কি?"

নীলু গোঁসাই কথার শ্লেষটা লক্ষ্য করিল; কহিল, "বোলেচেন বই কি! একটু মাথা খাটিয়ে বুঝে নিতে হয়। সত্যযুগ যে আসচে, এ সব তারই লক্ষণ। সূর্য্য ওঠবার আগে এক দিকে অন্ধকার আস্তে আস্তে সরে যায়, আর এক দিকে একটু একটু কোরে আলো দেখা দেয়, এ-ও তাই।"

অক্ষয় ঘোষ দেখিল, আলোচনা বন্ধ হওয়াই ভাল। সে কার্ত্তিকের দিকে চাহিয়া কহিল—"মামার খবর কি গো কার্ত্তিক বাবু? মামীর সঙ্গে ভাবের পালা, না আড়ির পালা?"

কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে কহিল—"সকালের খবরটা অবশ্য জানি না, তবে কাল রাত্তির পর্য্যন্ত ত ভাবের পালা-ই ছিল দেখেছি।" বলিয়া কার্ত্তিক সুরেশের হাত ধরিয়া টানিয়া গয়লা-পাড়ার দিকে চলিয়া গেল।

যদি এ কথা সত্য হয় যে, যাহার নাম করা যায়, সে লোক তখনি সেই স্থানে আসিয়া পড়িলে তাহার দীর্ঘজীবন প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কার্ত্তিকের মাতুল শশধর ঘোষাল বহু কাল বাঁচিবে। কেন না, মিনিট পাঁচেক পরেই ধীরে ধীরে এবং বিমর্ষচিত্তে শশধর দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অপর কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া কোন দিকে না চাহিয়া দোকান হইতে বার আনা দিয়া অর্দ্ধ সের চিঁড়া লইয়া চলিয়া গেল।

কিছু আগে কার্ত্তিককে অক্ষয় যে-প্রশ্ন করিয়াছিল, এই ব্যাপারে সে-প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া গেল। সকলেই বুঝিল যে, গত রাত্রে ভাবের পালা থাকিলেও, সকাল হইতে শশধর এবং শশধর-গৃহিণীর মধ্যে ঝগড়ার পালাই চলিতেছে; নচেৎ দোকান হইতে চিঁড়ে যাইত না।

* * * *

বিয়ের সময় বর-ক'নের নামে এক-থালা জলের উপর 'মোনা-মুণী' ভাসানো হয়। 'মোনা-মুণী' বেণের দোকানে বিক্রী হয়; দেখিতে অনেকটা কলার বীচির মত। ভাসিতে ভাসিতে যদি 'মোনা-মুণী' পরস্পর একত্র হইয়া গায়ে-গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দাম্পত্য-জীবনে কখনো গরমিলের সম্ভাবনা নাই। আর যদি 'মোনা-মুণী' পরস্পর না মিলে, তাহা হইলে বর-কন্যার জীবনেও মিল হইবার আশা থাকে না। আর যদি এমনই হয় যে 'মোনা-মুণী' একবার মিশিতেছে, আবার পরক্ষণেই দু'টাতে দু' পাশে সরিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, দাম্পত্য-জীবনও সেইরূপ যাইবে! অর্থাৎ—একবার আলো, একবার অন্ধকার!

পাড়ার বৃদ্ধার দল, যাহারা জানিত, তাহারা বলে—শশধর আর প্রমীলার বিয়ের সময় 'মোনা-মুণী'র অবস্থা শেষোক্তরূপ ঘটিয়াছিল; তাই এবেলা-ওবেলা উভয়ের মধ্যে ঝগড়া এবং ভাব, ভাব এবং ঝগড়া। আবার অনেকে বলে যে, শুভদৃষ্টির সময়ে কোন দুষ্ট লোক 'মন্দ' করিয়াছিল। যে কারণেই হউক, শশধর এবং তদীয় পত্নী প্রমীলাবালার মধ্যে মিনিটে-মিনিটে ঝগড়া এবং মিনিটে-মিনিটে ভাব হয়! যেন শরতের আকাশ—এই বৃষ্টি, এই রৌদ্র!

আজিকার সকালের আকাশ ছিল—শুভ্র কাশের আন্দোলনে আন্দোলিত, কুসুম-সুরভিত, রৌদ্র-দীপ্ত, হঠাৎ প্রমীলার একটা কথায় নির্মেঘ আকাশে মেঘ সঞ্চার এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ!

শশধর দালানে বসিয়া আরামের সহিত চুমুকে-চুমুকে চা পান করিতেছিল, আর প্রমীলা সুমুখে বসিয়া পাণ সাজিতেছিল। পাণের উপর সুপারী দিতে দিতে প্রমীলা কহিল—"বাবা! সুপুরীর কী দাম হোল!"

শশধর কহিল, "সুপুরীর দাম মানে? আর কোন জিনিসের বুঝি দাম বাড়েনি, খালি সুপুরীরই দাম বেড়েচে?"

"তাই ত বলচি যে……"

"না? তাতো বল্লে না! বল্লে, সুপুরীর কী দাম বাড়লো!"

"আরে কী মুস্কিল!—তা, বলিচি ত বলিচি, বেশ কোরেচি।"

—মেঘ আকাশ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল!

"বেশ করেছি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।"

"হ্যাঁ, তত বড় কথা! ইস্! ভারি 'ইয়ে' হোয়েচে!"

ইহার পরই মেঘ-গর্জ্জন এবং বর্ষণ! প্রমীলা পাণের বাটা দেয়ালের গায়ে ছুঁড়িয়া দিল; সাজা পাণগুলা ছত্রাকারে ছড়াইয়া ফেলিল; তার পর সারা দালান কাঁপাইয়া শয়ন-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আর শশধর নিষ্ফল আক্রোশে বসিয়া বসিয়া গর্জ্জাইতে লাগিল!

অনেক বেলায় কার্ত্তিক বাড়ী আসিয়া দেখিল, বাড়ী নিস্তব্ধ। মামী তাহার রান্নাঘরের মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। আর মামাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, ভাঁড়ার, গোয়াল, ঢেঁকি-শাল, কাঠের-চালা—কোথাও না। ভুঁইপাড়ার আম-বাগানের কথা ভাবিয়া হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে উদয় হইল। সে তখন তাড়াতাড়ি আর একবার সব ঘরের কড়ি ও আড়াগুলি এবং খিড়কীর বড় বকুল গাছটার ডালগুলা ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক ভাবিতে লাগিল—মামা গেল কোথায়? ঝগড়া-ঝাঁটি ত প্রায় নিত্যই হয়, কিন্তু মামা ত কখনো ঘরছাড়া হয় না। কালী ঝি-টাই বা কই?—একটা সুখের কথা, শশধরের পুত্র নাই, কন্যা নাই, ভ্রাতা নাই, ভগিনী নাই; অর্থাৎ তাহার জন্য ভাবিবার কেহ নাই; কিন্তু তবু এমন-এক জন আছে যে, তাহার জন্য ভাবিয়া থাকে এবং সে-এক জন হইতেছে—ভাগিনেয় কার্ত্তিক। কিন্তু দুঃখের কথা, লোকে তবু প্রবাদ রটনা করে—'জন, জামাই, ভাগনা। তিন নয় আপ্‌না।'

কিন্তু যাহাই হউক, কার্ত্তিকের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় নাই। সুরেশ প্রভৃতি মিলিয়া আজ তাহাদের একটা বড় রকমের 'পিক্‌নিক্' করিতেছে। পাঁঠা মারা হইয়াছে। কার্ত্তিকের উপর

মামাকে কোথাও না পাইয়া যখন সে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল, তখন উপরে চিলের ঘরের মধ্য হইতে প্রবল একটা নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাইল। এ নাসিকাধ্বনি মাতুলের না হইয়া যায় না! কারণ, মাতুলের হ্রস্ব এবং স্থূল দেহের মতই এ ধ্বনির সামঞ্জস্য বর্তমান। ধ্বনির অনুসরণ করিয়া কার্ত্তিক টিপি-টিপি ছাদে আসিয়া দেখিল, তাই বটে! মাতুল চিৎ হইয়া শয়ান। প্রভূত রোমাবলী-সমন্বিত বিশাল বক্ষের উপর ভিজা গামছাখানি পাট করিয়া রক্ষিত। এক পাশে চিঁড়ার ফলারের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি পড়িয়া আছে।

তেমনি সতর্ক পদক্ষেপে কার্ত্তিক নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল, মামী তেমনই ঘুমাইতেছে। তখন নিশ্চিন্ত চিত্তে কার্ত্তিক ভাঁড়ারের ভিতর প্রবেশ করিল এবং ঘি-এর ভাঁড়ে যে আধ-সেরটাক আন্দাজ ঘি ছিল, সঙ্গে আনীত একটি এলুমিনিয়ম পাত্রে তাহা ঢালিয়া লইল এবং মাটির ঘি-এর ভাঁড়টি তিন টুকরায় ভাঙ্গিয়া তাহা মেঝের উপর রাখিয়া দিল। আশ-পাশের আরো দুই চারিটা মাটির পাত্র—কোনটা ভাঙ্গিয়া, কোনটা না-ভাঙ্গিয়া—মেঝের উপর ছড়াইয়া রাখিল। তার পর পকেট হইতে কাগজে জড়ানো একটা পাঁঠার ঠ্যাং-এর খানিকটা অংশ বাহির করিল। আজ তাহাদের পিক্‌নিকে যে পাঁঠাটাকে মারা হইয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে সে-ই এই ঠ্যাং-এর অধিকারী ছিল। হাড়খানা কার্ত্তিক মেঝের একধারে ফেলিয়া রাখিল এবং তৎপরে ঘৃতপাত্র হস্তে সন্তর্পণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে শীতলাতলার কাছে কালী ঝি-এর সঙ্গে দেখা হইল। কালী জিজ্ঞাসা করিল—"দাদাবাবু, কি ওতে?" কার্ত্তিক কহিল—"গঙ্গাজল।"

সে-রাত্রে কার্ত্তিক বাড়ী ফিরিবার আর অবসর পাইল না।

পরদিন বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় যখন সে গৃহে ফিরিল, দেখিল—মামা দালানে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে চা খাইতেছে আর কিছু দূরে মামী বসিয়া কুট্‌না কুটিতেছে।

চায়ের খালি কাপটা পাশে রাখিয়া দিয়া মামা সহাস্য বদনে মামীর উদ্দেশে কহিল—"তার পর?"

মামী কহিল—"তার পর গাছের সেই শুকনো পাতাটা মাটিতে পড়েই হোয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড সাপ। কাছেই একটা গরু ঘাস খাচ্ছিল; সাপটা গিয়ে তাকে ছোবল্ দিলে। গরুটা সেইখানেই পড়লো ঢলে! তার পর সাপ এঁকে-বেঁকে গিয়ে হঠাৎ হোল এক ভীষণ বাঘ! বাঘ হ'য়েই মারলে এক হরিণ। কিন্তু খেলে না কো। না খেয়েই……

কার্ত্তিক বুঝিল—'পিস্' (peace)—ভয়ানক 'পিস্'! নচেৎ রূপকথার গল্প চলিত না।

কার্ত্তিককে দেখিতে পাইয়া প্রমীলা তাহাকে কহিল—"তোর ব্যাপার কি বল্ ত? কাল সারা রাত আর তুই বাড়ী···

মামীকে কথা শেষ করিতে অবসর না দিয়া কার্ত্তিক কহিল—"কাল সারা দিন-রাত মস্ত এক হাঙ্গামায় পড়েছিলুম, মামী-মা। ও-পাড়ার সুরেশের পেটের মধ্যে অশথ গাছ জন্মেছিল; তাই দিন-দিন ও শুকিয়ে যাচ্ছিল।"

"বলিস্ কি রে! পেটের ভেতর অশথ গাছ! ধরা পড়ল কি করে?"

"মজীরহাটের বিপিন রোজা ধরে ফেল্লে। এত বড় 'গুণীন্' ত এ-তল্লাটে আর নেই। সে-ই কাল এসে মন্তর-তন্তর, ঝাড়-ফুঁক্, তুক্-তাক্ কত-কি কাণ্ড-কারখানা কোরে সেই অশথ গাছ মারলে।"—এই সূত্রে কার্ত্তিক কহিল, কাল তাহাকে কি রকম খাটিতে হইয়াছে! এক-হাজার-এক অশথ পাতা, বেল-কাঠ, ভেড়ার দুধ, হোমের ঘি—কত-কি সব যোগাড় করিয়া আনিতে হইয়াছে তাহাকে।

প্রমীলা তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—"ঘি-এর কথায় মনে পড়ে গেল, কাল কি হোয়েচে জানিস্? কোত্থেকে একটা কুকুর একটা পাঁঠার ঠ্যাং মুখে করে এনে আমাদের ভাঁড়ারে ঢুকেচে। ঢুকে, বেঞ্চির ওপর থেকে ঘি-এর ভাঁড় ফেলে ভেঙ্গেচে আধ সেরটাক আন্দাজ ঘি ছিল, সব খেয়েচে! সে আর কি বলবো তোকে, একেবারে নৈ-নেত্য করে গিয়েচে!"

"আচ্ছা কোরে ধরে ঠ্যাঙ্গাতে পারলে না তাকে?"

"আমি তখন ঘুমুচ্ছিলুম। তুই বাড়ী ছিলি না, কালীও ছিল না। কালী এসে বল্লে—'দাদাবাবু গঙ্গাজল নিয়ে ঐ দিকে যাচ্চে।'—তা সুরেশের পেটে আর অশথ গাছ নেই ত?"

"না, মামী-মা। পেটে আগে গাছের হাওয়া বইতো; ঐ সব করবার পর কাল থেকে আর হাওয়া বয় না।"

প্রমীলার মুখের দিকে চাহিয়া শশধর কহিল—"দেখ, আমার পেটের মধ্যেও বোধ হয় গাছ জন্মেচে! হাওয়া বয়। তবে সম্ভব—তেঁতুল গাছ! কেন না, খালি-খালি টক ঢেঁকুর ওঠে।"

"তোমার যত অনাছিষ্টি কথা! খেয়ে-দেয়ে ত আর অন্য কাজ নেই!"

"তার মানে, আমি একটা নিষ্কর্ম্মা—এই বলতে চাও?"

"নিষ্কর্ম্মাই ত।"

শশধরের মুখ-ভাব চকিতে পরিবর্ত্তিত হইল; চোখের দৃষ্টিতে একটা তীব্রতা ফুটিয়া উঠিল। কপাল কুঞ্চিত হইল। এমন যখন অবস্থা, তখন উঠান হইতে শম্ভু বাগদীর বৌয়ের ডাকে প্রমীলা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ঝড় উঠিতে-উঠিতে উঠিল না।

* * * *

আগে হইতেই বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর হাওয়া বহিতেছিল। হঠাৎ এই সময়টায় তাহার সহিত মিতালী করিতে আর একটা চাঞ্চল্যকর হাওয়া প্রবাহিত হইল। সরকার হইতে প্রচারিত করা হইল যে, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে কি-পরিমাণ ধান-চাউল মজুত আছে তাহার অনুসন্ধান চলিবে। সাধারণ লোকে এ কার্য্যের আদ্যোপান্ত না জানিয়া এবং সদুদ্দেশ্য না বুঝিয়া একটু যেন আতঙ্ক-চঞ্চল হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, সরকার বুঝি তাহাদের সঞ্চিত ধান-চাউল বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে। এইরূপ যাহারা ভাবিল, তাহাদের মধ্যে শশধর এক জন। শশধরের প্রায় পঞ্চাশ মণ চাউল মজুত ছিল, যাহার মূল্য বর্ত্তমানে প্রায় দুই হাজার টাকা।

শশধর কার্ত্তিকের শরণাপন্ন হইল, কহিল—"কি হবে কার্ত্তিক?"

ধান-চাউলের প্রকৃত ব্যাপারটা কার্ত্তিক জানিত; কিন্তু সেই-ই শশধরকে উল্টা বুঝাইয়া দিয়া ভয় খাওয়াইয়া দিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাহার একটা মতলব ছিল! মতলব এই যে, তাহার আর পাড়া-গাঁয়ে পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছে না! সে চায়—কলিকাতায় গিয়া থাকে। পাড়া-গাঁর মাঠ-ঘাট, জল-কাদা,

ঝোপ-জঙ্গল, আর অক্ষয় ঘোষের দোকান—তাহার একান্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সে অনেক বার মামাকে কলিকাতায় গিয়া থাকিবার জন্ত অনেক প্রকার সৎপরামর্শ দিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার আপনা হইতেই সুযোগ আসিয়া পড়িল। কার্ত্তিক কহিল—"কোলকাতা এ-আইনে পড়েনি, সুতরাং চালগুলো নিয়ে কোলকাতায় গিয়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত। ছ' হাজার টাকা ত আর কম নয়!"

শশধরও নিজের মনে বার বার বলিতে লাগিল—ছ' হাজার টাকা কম নয়!

সর্ব্বদাই একটা দুশ্চিন্তা শশধরকে পাইয়া রহিল। কর্ম্মহীন অবস্থায় দুশ্চিন্তা যেন আরো বেশী করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। কোন একটা কাজ লইয়া থাকিলে চিন্তাটা তত জোর করিতে পারে না। এ জন্ত শশধর কাজ খুঁজিয়া বেড়ায়। সে দিন বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় শশধর একটা কোদাল লইয়া উঠানের এক ধারে মস্ত বড় গর্ত্ত খুঁড়িতে সুরু করিল। প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল—"উঠোনের মাঝে গর্ত্ত খুঁড়চ কেন?"

খুঁড়িতে খুঁড়িতে শশধর বলিল—"আবার বুজিয়ে দেবো এখন! দিয়ে এর মধ্যে সীমের বীচি পুঁতে দেব।"

"যাচ্চ ত কোলকাতায় চলে, সীম তোমার খাবে কে? বলে—

—'কাজের কাজি নইকো আমি, অকাজের ধাড়ী!

ভাল করতে সাধ্যি নেই— মন্দ করতে পারি।'

—তা তোমার তাই হোয়েচে!"

কট্-মট্ করিয়া প্রমীলার দিকে চাহিয়া শশধর কহিল—"তার মানে?"

"তার মানে বুঝে নাও।"

রাগে শশধরের শ্বাস জোরে-জোরে বহিতে সুরু করিল, চোখের চাহনির মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল। হাতের কোদালটা পাঁচিলের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রমীলার অনুসরণে রান্নাঘরের দিকে ধাবিত হইল। তার পর কথার তুবড়ী, চীৎকার, হুঙ্কার, লম্ফ-ঝম্ফ এবং যবনিকা-পতন! অর্থাৎ প্রমীলা চলিয়া গেল—পাশের ভট্টাচার্য্যি বাড়ী; আর শশধর শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া লাগাইল খিল!

অনেক বেলায় কার্ত্তিক বাড়ী ফিরিয়া বুঝিল—বাড়ীর আকাশ মেঘাবৃত; মামী বাড়ী নাই; মামার ঘরে খিল দেওয়া; আর রান্না-ঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া কালী ঝি অঘোরে ঘুমাইতেছে। রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া দেখিল, রান্না-বান্না সবই প্রস্তুত, শুধু খাইবার লোকের অভাব। সুতরাং কার্ত্তিক স্নান করিয়া আসিল এবং হাঁড়ী হইতে ভাত-তরকারী বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিল।

সন্ধ্যার পরই কার্ত্তিক বাড়ী ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার জ্বর হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর। শশধর ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"কাল সকালেই ডাক্তারখানা থেকে কুইনাইন এনে খাবি; বুঝলি?"

"খাবো, মামা।"

প্রমীলা আসিয়া কহিল, "খবরদার, কুইনাইন্ খাবি না, জ্বর তা হোলে আটকে যাবে। আমি বেলপাতা আর গোলঞ্চর রস কোরে

খানিক পরেই শশধর পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"আজ রাত্রে শুধু একটু জল-সাবু খেয়ে থাকবি।"

দালান হইতে প্রমীলা হাঁক দিয়া কহিল—"রাত্রে জল-সাবু খেলে বুকে সর্দ্দী লাগবে, কেতো। কিছুতেই জল-সাবু খাবি না। দুধ-খই দেবো, তাই খাবি।"

দিন পাঁচ-সাত পরে কার্ত্তিক আরোগ্য হইলে, শশধর কহিল—"কোলকাতায় যদি যেতে হয়, তাহোলে আর দেরী কোরে ফল নেই।"

কার্ত্তিক কহিল—"শীগ্‌গীর না গেলে ওই ছ'হাজার টাকার চাল চলে যাবে মামা! সুতরাং আর দেরী……"

"না, না, তাহোলে আর দেরী করা নয়। তুই কাল গিয়ে অল্প ভাড়ায় ছোটখাটো একটা বাড়ী ঠিক করে আয়।"

পরদিন মামার কাছ হইতে ট্রেণ-ভাড়া আদি লইয়া কার্ত্তিক কলিকাতা চলিয়া গেল; কিন্তু দুই দিন ধরিয়া বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াও ছোট খালি বাড়ী বাহির করিতে পারিল না। কলিকাতায় লোকে লোকারণ্য। এমন কি, ফুট-পাথগুলা এক শ্রেণীর লোক দ্বারা অধিকৃত। যে-কলিকাতায় 'টু লেট্'-এর ছড়াছড়ি ছিল, সেখানে এখন আর একখানিও 'টু লেট্' খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক জন ভদ্রলোক কার্ত্তিককে কহিল—"এখন too late! বাড়ী এখন আর পাবেন না।"

ঘুরিতে-ঘুরিতে কার্ত্তিক দেখিল, কালীঘাট সদানন্দ রোডে বেশ একটি ছোট বাড়ী খালি রহিয়াছে। তিনখানা শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, কল, পাইখানা; তবে পাকা দেয়ালের উপর টিনের আচ্ছাদন। তা হউক, বাড়ীখানা পছন্দসই। কিন্তু পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোকের নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উহা ভাড়া হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ভাড়া লইয়াছেন, আজই তাঁহারা আসিবেন। বাড়ীটার ভাড়াও অন্যান্য বাড়ীর তুলনায় সুবিধাজনক ছিল—২৫৲ টাকা। বাড়ীর মালিক এক বিধবা স্ত্রীলোক—থাকেন বালীগঞ্জে। একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়া কার্ত্তিক পুনরায় সেই বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিল, তিনখানা ঠেলাগাড়ী-বোঝাই মাল-পত্র লইয়া একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছে। গাড়োয়ানরা মাল-পত্রগুলি নামাইবার আয়োজন করিতেছে। কার্ত্তিক ভদ্রলোককে কহিল—"এ বাড়ী কি আপনিই ভাড়া নিলেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আপনার নিবাস?"

"নিবাস ময়মনসিং। এখানে এসেছিলাম চেতলায় 'ভায়রা'র বাসায়।"

একটু চিন্তিত ভাব দেখাইয়া কার্ত্তিক কহিল—"এই বাড়ীতেই থাকবেন?—তা থাকুন! কালীর পীঠস্থান, মা-কালীর নাম নিয়ে থেকে যান।"

অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত ভদ্রলোকটি কহিল—"কেন? কেন? ব্যাপার কি?"

"পাড়ার লোকে আপনাকে কিছু বলেনি?"

"না, কিছুই ত কহে নাই।"

অত্যন্ত অধীর উদ্বিগ্নতার সহিত ভদ্রলোক কহিল—"না—না, নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে, আপনাকে বলতেই হবে।"

"আপনি আমাকে মহা ফ্যাসাদে ফেল্‌লেন। তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে মিছে কথাই বা কি কোরে বলি!"

"না—না, আপনি সত্যই বলুন। আমি বিদেশী লোক, আপনি এক জন ভদ্দর ব্যক্তি…………"

"এ বাড়ীতে আর থেকে কাজ নেই। এটা 'থাইসিস্'য়ের বাড়ী। এর আগে যতগুলি ভাড়াটে এ বাড়ীতে থেকে গেছেন, সকলেরই একটি—না—একটি ওই রোগে…………"

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ময়মনসিংয়ের ভদ্রলোক কহিল—"বলেন কি! টি বি! ওঃ, আপনি বড়ই উপকারটা করলেন, মশাই! —গাড়ীওলা, চিজ্-উজ্ মৎ নামাও। যাঁহাসে লে আয়া, ফের হুঁয়া লে যানে হোগা।"

ভদ্রলোক কার্ত্তিককে অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া ধুলাপায়েই আবার 'ভায়রা'র বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিল।

* * * *

শশধর স-পরিবার এবং স-চাউল কলিকাতায় আসিয়াছে। সদানন্দ রোডের সেই বাড়ী। বাড়ীখানা শশধর ও প্রমীলার বেশ পছন্দ হইয়াছে। এই বাড়ীর সূত্রেই সে দিন কার্ত্তিক ময়মনসিংয়ের সেই ভদ্রলোকটির নিকট হইতে অশেষ ধন্যবাদ পাইয়াছিল, এখন মাতুল-মাতুলানীর নিকট হইতেও আর এক দফা ধন্যবাদ পাইল।

শশধর প্রমীলাকে কহিল—"কোলকাতার খরচ-পত্র যদিও একটু বেশী পড়বে বটে, কিন্তু থাকা যাবে বেশ সুখে। কি বল?"

"নিশ্চয়। বাবা! এত দিন পরে দু'বেলা রান্নার হাত থেকে বাঁচলুম।"

কলিকাতায় আসিয়া শশধর দেখিল, শুধু কালী ঝিয়ের দ্বারা এখানে সব কাজ চলিবে না। বাজার করা, দোকান করা, তা ছাড়া কন্‌ট্রোলের দোকান হইতে এ-ও-তা আনা, এ সমস্ত একা কালীর দ্বারা হইবে না। সে জন্য জগু নামক এক জন বেহারীকে রাখা হইয়াছে। তার দ্বারা দুই বেলা রান্নার কাজও চলিতেছে।

কলিকাতা আসিবার পর হইতে কার্ত্তিক বড় একটা বাড়ীতেই থাকে না! নানা কাজে-কর্ম্মে-মতলবে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। শুধু দুই বেলা খাবার সময় তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সে দিন সারা-বেলার পর বিকালের দিকে বাড়ী ফিরিয়া কার্ত্তিক অনুমান করিল—মামা-মামীর মধ্যে যেন গণ্ডগোল বাধিয়াছে। এ বিষয়ে কালীকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করাতে, ইঙ্গিতে সে যাহা জানাইল, তাহাতে কার্ত্তিক বুঝিয়া লইল যে তাহার অনুমান ঠিকই।

কার্ত্তিকের গলার সাড়া পাইয়া শশধর কহিল—"কেতো, ঠাকুরকে বোলে দে, এ বেলা খিচুড়ী আর ইলিস্ মাছ ভাজা হবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে প্রমীলা কার্ত্তিকের উদ্দেশে বলিল—"ওরে, ঠাকুরকে বল, এ বেলা চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা হবে।"

কিছু পরে শশধর ও-ঘরে কার্ত্তিককে ডাকাইয়া কহিল—"ঠাকুরকে বলেচিস্—খিচুড়ী আর ইলিস মাছ ভাজার কথা?"

"বলেচি মামা।"

কার্ত্তিক এ-ঘরে আসিলে প্রমীলা বলিল—"ফলারের কথা বোলে

"হ্যাঁ, মামী-মা।"

ঠাকুরকে কার্ত্তিক উভয় রকমেরই ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল এবং রাত্রে ফিরিয়া মামার সঙ্গে খিচুড়ী ইলিস মাছ ভাজা এবং মামীর সঙ্গে চিঁড়ে দইয়ের ফলার খাইয়া শুইয়া পড়িল।

পরের দিন দ্বিপ্রাহরিক আহারান্তে ও-ঘরে শুইয়া শশধর স্থির করিল যে, এ-জীবন আর সে রাখিবে না! আত্মহত্যা করিবে! আফিং খাইয়া মরিবে। সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরকে ডাকিয়া তাহার হাতে দুইটা টাকা দিয়া বলিল—"দু-টাকার আফিং আনবে।"

এ-ঘরে প্রমীলাও শুইয়া শুইয়া ঠিক করিয়া ফেলিল, গায়ে কেরোসিন্ ঢালিয়া সে পুড়িয়া মরিবে; এবং কালীকে ডাকিয়া দু' টাকার কেরোসিন আনিতে বলিল।

ঘণ্টা-দুই পরে দু'জনেই ফিরিয়া আসিল। ও-ঘরে গিয়া ঠাকুর শশধরকে জানাইল—"আফিং নেহি মিল্‌তা বাবু। দিনভোর 'লাইন'মে খাড়া হোনে সে দো পয়সাকা মিল্‌নে সক্‌তা।"

এ-ঘরে আসিয়া কালী প্রমীলাকে কহিল—"কেরাছিন পাওয়া যাবে না মা! ওরে বাবু রে! কী ভীড়! গোটা দিন দাঁড়িয়ে থাকলে সিকি-বোতলটাক হয় ত পাওয়া যেতে পারে।"

অগত্যা ভাগ্যবিড়ম্বনায় কাহারও আর মরা হইল না।

সন্ধ্যার পর কার্ত্তিক বাড়ী আসিলে প্রমীলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"এ রকম স্বামীর ঘর করার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। তাহোলে আমিও বাঁচি, উনিও বাঁচেন!"

খুব আস্তে আস্তে কার্ত্তিক কহিল, "মামাও তাই বলে। বলে—'ওটা মরে গেলে গায়ে বাতাস লাগে। সোনার প্রায় একশো টাকা কোরে ভরি। মলে পরে ওর গয়না ক'খানা বিক্রী কোরে, ঐ টাকায় মজাসে কিছু দিন তোয়াজ কোরে খাওয়া-দাওয়া করি।"……

বারুদে অগ্নি সংযোগ হইলে তুবড়ী যেমন ফোঁস করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, প্রমীলাও সেইরূপ আগুনের ফোয়ারার মত হইয়া কহিল—"গয়নাগুলো বিক্রী কোরে মজা করে খাবেন! মরি যদি, তাহোলে কি আর গয়নাগুলো রেখে যাব! ও-সব, কেতো, তোকে আমি দিয়ে যাব।" তার পর কিছুক্ষণ মনে-মনে গজরাইবার পর কহিল—"তোকে আমার সব গয়না এখনি দিয়ে দিচ্চি। বাক্সটা—তোর কাছে—তোর ঘরে রেখে দে—আজই রেখে দে।"

গহনা যদিও বেশী নয়, তবুও আজ-কালকার বাজারে তাহার দাম প্রায় হাজার-খানেক টাকা হইবে।

বাক্সটা হাতে লইয়া কার্ত্তিক কহিল—"না—না মামী-মা, তা কি কখনো হয়! এ তুমি তোমার কাছেই রেখে দাও মামী-মা। মামার কথা ছেড়ে দাও।"

"কিছুতেই না। ও গয়না আমি তোকে দিলুম, তুই তোর কাছে রেখে দে। দেখি, কি করে আমার!"

অগত্যা বাধ্য হইয়া গহনার বাক্সটা কার্ত্তিককে লইতেই হইল এবং উহা নিজের ঘরে লইয়া গিয়া রাখিল।

একটু পরে শশধর কার্ত্তিককে ডাকিয়া কহিল—"সংসারটা ছারেখারে দিলে! কত বড় দুষ্ট মেয়ে-মানুষ! আর আমার এক দণ্ড এ সংসারে থাকতে ইচ্ছে হয় না, কার্ত্তিক। সবই ত দেখছিস্!"

অনুচ্চ কণ্ঠে কার্ত্তিক বিজ্ঞের ন্যায় কহিল—"ভয়ানক স্বভাব

খারাপ মামী-মার। কি আর বলব বলুন! একটু আগেই ত মামী-মাকে বল্‌ছিলুম যে, কেন তুমি এ-রকমটা কর? শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে কবে হয় ত মামা বিবাগী হোয়েই বেরিয়ে যাবে।"

"অ্যাঁ—অ্যাঁ! বলেছিস্ এ কথা?"

"এই ত খানিক আগে বলে এলুম!"

"কি বল্লে তা'তে?"

"খুব রেগে উঠলো। বল্লে—"বিবাগী হোয়ে যায় যদি ত বয়েই গেল। আমার শ্বশুরের ভিটে আছে, বাগান-পুকুর আছে, ৫১ বিঘে ধান-জমী আছে, আমার থাকবার খাবার ভাবনা নেই। আমি···"

তড়াক্ করিয়া শশধর সপ্তমে উঠিল! কহিল—"ভিটে আছে! ৫১ বিঘে ধান-জমী আছে!—তার একচুল আমি ওর জন্যে রেখে যাচ্চি কি না! সব আমি তোর নামে দান-পত্তর লিখে দেবো, কেতো। ওকে আমি পথে বসিয়ে যাব!"

ফিস্-ফিস্ করিয়া কার্ত্তিক কহিল—"চুপ করুন, চুপ করুন, মামা!"

অধিকতর উত্তেজিত হইয়া শশধর কহিল—"কিছুতেই না। সব আমি তোকে রেজেষ্টারী দান-পত্তর কোরে দিয়ে যাব। ওই ৭০০ টাকার নোটের বাণ্ডিল আজ আট মাস বুকে কোরে রেখে দিয়ে এসেচি, মিত্তিরদের ঐ বিশ বিঘের জমাটা কিনবো বোলে। ছাই কিনবো! ও সাতশো টাকা তোকে আমি দিয়ে দেবো।"

হিতৈষী উপদেষ্টার মত কার্ত্তিক কহিল—"না মামা, না। টাকাটা দিয়ে মামী-মার নামে ঐ জমাটা············"

অদ্ভুত মুখভঙ্গীর সহিত চীৎকার করিয়া শশধর কহিল—"মামী-মার নামে! মামী-মার নামে ছাই দেবো! এ টাকা আমি তোকে দেবো।"

হাউইয়ের মত ঘর হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া প্রমীলাও সমভাবে চীৎকার করিয়া কহিল—"তবে ত আমার সব বোয়ে গেল! যাকে ইচ্ছে তাকে দাও।"

"দেবোই ত। এক্ষুণি দেবো!"—বলিয়া ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া গিয়া শশধর ট্রাঙ্ক হইতে সেই সাতশো টাকার নোটের বাণ্ডিলটা বাহির করিয়া আনিয়া কার্ত্তিকের হাতে দিল। কার্ত্তিক কহিল—"এ কি করচেন, মামা!" কিন্তু তা সত্ত্বেও নোটের বাণ্ডিলটা তাহাকে লইতেই হইল। না লওয়া ছাড়া অন্য উপায় রহিল না।

হায় মোনা-মুণী! কেন তোমরা ভাসিতে ভাসিতে পরস্পর গায়ে-গায়ে মিশিয়া যাও নাই!

* * * *

পরদিন সকালে শশধরের ছোট সংসারে বড় রকমের একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কার্ত্তিক নিরুদ্দেশ! হাজার টাকার গহনা আর সাতশো টাকার নোটের বাণ্ডিল—নিরুদ্দেশ হইবার পক্ষে এরূপ সুবর্ণ সুযোগ যে জীবনে আর দ্বিতীয় বার আসিবে না, কার্ত্তিক তাহা বুঝিয়াছিল!

এক দিকে ক্রোধ ও ক্ষণেকের উত্তেজনার ফলে সতেরশো টাকা এই ভাবে পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল! অপর দিকে সেই

প্রমীলা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল—"উঃ। কী সর্ব্বনাশ হোলো আমার! ওগো, কেন তুমি আমার সঙ্গে রাগারাগি ঝগড়া করতে গেলে গো!"

শশধর নির্ব্বাক্। তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার বাক্যস্ফুরণই হইল না! শুধু মাঝে মাঝে একটা ঝাড়া নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

তিন দিন পরে তাহার মুখ হইতে প্রথম কথা বাহির হইল—"উঃ! কল্কীর চেহারাটা কী ভীষণ! ঘোড়াটা দেখেছ? একেবারে সাদা ধব্‌ধবে।"

কান্নার সহিত জড়িত হইয়া প্রমীলার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—"এ সব তুমি কী বলছ গো!

"বলচি যে, এ ধাক্কা সামলানো দায়, প্রমীলা। তাই এই রকম একটা কিছু কল্পনা কোরে নিয়ে মনকে না বোঝালে বাঁচবো না—উঃ! কলির শেষে কল্কী আবির্ভূত হয়ে সব একেবারে তচ্-নচ্ করে দিয়ে গেল! তলোয়ারখানার ধার কি! যাক্ বাবা, আমরা খুব বেঁচে গেছি। খালি সতের শো টাকার ওপর দিয়ে এত বড় বিপদটা কেটে গেল।"

সত্যই এ ধাক্কা সামলানো শশধরের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। কলি, কল্কী, সত্যযুগ—কোন কল্পনাই এ ধাক্কায় টিকিল না। অন্তরের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া কোন আলোকের রেখাই আসিতে পারিল না। তত্রাচ শশধর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এই সতের শো টাকা যেমন করিয়া হউক বাহির হইতে তাহাকে উপায় করিতে হইবে। আর কার্ত্তিককে একবার সামনে পাইলে সে খুন করিবে!

অতঃপর শশধরের প্রধান চিন্তার বিষয় হইল, কি করিয়া কিছু টাকা উপায় করা যায়। দিন-রাত সে এই চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিল। কি করিবে সে? চাকুরী?—জীবনে কখনো করার অভ্যাস নাই, চাকুরী করা তাহার পোষাইবে না। ব্যবসায়?—এ বাজারে কোন ব্যবসা ফাঁদা সুবিধার হইবে না। চাকুরী নয়, ব্যবসা নয়—তাহোলে পয়সা উপায়ের আর কি উপায়? ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হইল। কালীঘাট একটা তীর্থস্থান। এখানে যাত্রী-ধরা দালালরা বেশ কিছু উপায় করে। তাই করিলে হয় না?—না, পোষাইবে না; বড় হীন কাজ। আর তা ছাড়া বড্ড ঘোরা-ঘুরি করিতে হয়! আর যাত্রীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতে হয়। তাহোলে—তাহোলে—তাহোলে············

দিন-পাঁচ সাত ধরিয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ শশধরের মাথায় একটা ফন্দী ঢুকিল। সে দেখিল, দেশের এই মহা দুর্দ্দিনে লোকের মামলা—মোকদ্দমা ঠিকই বজায় আছে। সে এক দিন আলিপুর জজকোর্টে গিয়া দেখিল, এমন দুর্ভিক্ষের দিনেও উকীল-মোক্তার, মক্কেল, মকর্দ্দমার সংখ্যা কিছু মাত্র কমে নাই, বরং আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। শশধর ঠিক করিল, সে এক 'মামলা-কালী' প্রতিষ্ঠা করিবে। এই মামলা-কালীকে প্রণামী-পূজা দিলে মোকর্দ্দমায় তাহার শুভ হইবেই। শশধর ভাবিয়া দেখিল, অন্যান্য কার-কারবারের দিকে ভীড় হইলেও এ জিনিষটায় এখনো কেহ হাত দেয় নাই। ফিরিঙ্গি-কালী আছে, পাগলা-কালী আছে, ডাকাতে-কালী আছে, শ্মশান-কালী আছে, চীনে-কালী আছে, রোটন্তী-কালী আছে—কিন্তু মামলা-কালী নাই!—নতুন জিনিষ! শশধর আনন্দে লাফাইয়া

কালীঘাটে 'পটুয়া পাড়া' নামে একটা পল্লী আছে, সেখানে পটুয়াদের বাস। সারা বছর ধরিয়া নানারূপ দেব-দেবীর প্রতিমা গড়াই তাহাদের পেশা। শশধর ফরমাস দিয়া সেইখান হইতে একটি কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আনিল। তৎপূর্ব্বেই বাড়ীর মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া একখানা ঘরের রাস্তার দিকের দুইটা জানালা খুলিয়া সেই স্থানে বড় বড় দুইটা দরজা বসানো হইয়াছিল। শুভদিনে রাস্তার উপরকার সেই ঘরে 'মামলা-কালী' অধিষ্ঠিত হইয়া মক্কেলদের শুভাশীর্ব্বাদ দান ও পূজা-প্রণামী গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন।

আহ্বানের সাড়া আসিতে লাগিল—মন্দ নয়। লোকের মুখে-মুখে এবং সামান্য কিছু হ্যাণ্ডবিলের সাহায্যে বহু বাদী, প্রতিবাদী, আসামী, ফরিয়াদীর কাণে মামলা-কালীর সংবাদ গিয়া পৌঁছাইল এবং প্রত্যহই ভক্তগণের নিকট হইতে দু'-পাঁচ টাকা করিয়া 'ফী'—অর্থাৎ প্রণামী পড়িতে লাগিল।

শশধরের মনের ক্ষতস্থানে মামলা-কালী-প্রদত্ত দৈব-মলমের প্রলেপ পড়িল। তাহার মনে আবার সুখ, শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

* * * *

"বলিস্ কি কালী!"

"হাঁ দাদাবাবু। কাল সাড়ে তিন টাকা পেন্নামী পড়েচে। পরশু পড়েছিল দু'টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা। শনি-মঙ্গলবার সব চেয়ে বেশী পড়ে।"

কার্ত্তিক আর কালী-ঝিয়ের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল। কার্ত্তিক মাতুলের বাসা হইতে সে দিন অতি প্রত্যূষে অদৃশ্য হইবার পর হইতে ভবানীপুরের এক 'মেস্'-এ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাজারের সময় সে বাজারে আসিয়া গোপনে কালীর সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাহাকে মাঝে-মাঝে দু-একটা টাকা দিয়া বশ করিয়া ফেলে। কালী সুযোগ পাইলেই কার্ত্তিকের 'মেস্'-এ আসিয়া তাহাকে শশধর-সম্পর্কীয় সকল সংবাদ সরবরাহ করিয়া যায়।

কার্ত্তিক কহিল—"খুব ফন্দী বার কোরেচে ত! মামীর সঙ্গে আর ঝগড়া-ঝাটি হয় না?"

"না। এখন খুবই আনন্দে আছে। তবে তোমার ওপর যা রাগ, তা আর বলবার নয়।"

মিনিট দু'চার একান্ত মনে কি ভাবিয়া কার্ত্তিক বলিল—"দ্যাখ্, কালী, তোকে আমি মামীর সব গয়নাগুলো দিয়ে দেবো, যদি এক কাজ করতে পারিস্! দু'জনে আমরা তাহোলে লাল হোয়ে যাব, কালী।"

কালী কহিল—"কি কাজ বল।"

"ওরা মাটীর 'মামলা-কালী' করেচে, আমি 'মকর্দ্দমা বাবা' বসাবো। তোকে করবো বাবার 'ভৈরবী'। তোকে মানাবেও বেশ। দ্যাখ, পারবি? দু'হাত দিয়ে তাহোলে টাকা কুড়ুবো কালী। আদ্ধেক তোর, আদ্ধেক আমার।"

কালী চুপ!

কার্ত্তিক কহিল—"কি বলিস্ কালী? রাজী আছিস্? বহু টাকা রোজগার হবে! আদ্ধেক আমার, আদ্ধেক তোর।"

"আদ্ধেক আমায় দেবে ঠিক?"

"নিশ্চয়। তুই হবি পার্টনার! না দিলে তুই 'ভৈরবী' থাকবি কেন?"

কালী রাজী হইল।

অতঃপর এক সপ্তাহের মধ্যেই আলিপুর গোপালনগর রোডের মোড়ের উপর—যেখান হইতে একটি রাস্তা জজ্-কোর্টের দিকে, আর একটি রাস্তা ফৌজদারী কোর্টের দিকে গিয়াছে, সেইখানে এক প্রশস্ত এবং প্রকাশ্য গৃহের মধ্যে বিশেষরূপ আয়োজন এবং আড়ম্বরের সহিত মকর্দ্দমা-বাবার প্রতিষ্ঠা হইল। মাটীর চতুর্ম্মুখ এক ব্রহ্মা-মূর্ত্তি! সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র কলিকাতা ও চব্বিশ-পরগণা জেলায় মকর্দ্দমা-বাবার কথা প্রচারিত হইয়া গেল এবং প্রত্যহ দলে-দলে মকর্দ্দমা-সংশ্লিষ্ট নর-নারীগণ, এমন কি—উকীল-মোক্তারের দলও আসিয়া মকর্দ্দমা-বাবার পাদদেশ 'প্রণামী'র দ্বারা পূর্ণ করিতে লাগিল।

যথাসময়ে এই সংবাদ শেলের মত শশধরের কর্ণে নয়—বক্ষে আসিয়া বাজিল!

* * * *

"ওঃ! আমি মরে গেলুম! প্রমীলা, আমি মরে গেলুম! কেতোকে আমি খুন করবো!"—দুই হাতে বুক চাপিয়া শশধর মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। প্রমীলা তাহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"উঃ! কী শক্রতাই শেষকালে কার্ত্তিক করলে গো!"

"আমি ওকে খুন না কোরে ছাড়বো না। সব দিক দিয়ে আমায় নষ্ট করলে! উঃ!"—শশধর অন্তর-যন্ত্রণায় ছট্-ফট্ করিতে লাগিল।

"দেখ, ও-রকম কোরো না, স্থির হও। টাকা-গয়না গেছে, প্রাণ থাকলে আবার হবে।"

"আর হবে না, আর হবে না। হবে কোত্থেকে? মামলা-কালী থাকলে হতো বটে। উঃ! কত ভেবে-চিন্তে, মাথা খাটিয়ে 'মামলা-কালী' বার করলুম, তার মাথাও শেষকালে খেলে! রোজ চার-পাঁচ টাকা কোরে প্রণামী পড়তে সুরু হোয়েছিল। এক বছরের মধ্যেই আমার……কেতোকে আমি খুন করবো। কেতোকে খুন করবো, আর ঐ ভৈরবী বেটিকেও খুন করবো।" শশধর হাঁপাইতে লাগিল।

প্রমীলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"'জন জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা।'—ওরে একেবারে ঠিক কথা রে—একেবারে ঠিক কথা! চল, এখানে থেকে আর আমাদের দরকার নেই, আমরা শেতলপুর যাই।"

শশধর যেন পাগলের মত হইয়া গেল। স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই। কখনো বসিয়া, কখনো দাঁড়াইয়া, কখনো শুইয়া শূন্যদৃষ্টিতে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে আর মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—"খুন করব কেতোকে! কালীকে খুন করব!"

প্রমীলা আতঙ্ক-বিহ্বল হইয়া বলে—"ওগো, তুমি স্থির হও, ও-রকম কোরো না। স্থির হোয়ে আগেকার মত আমার সঙ্গে ঝগড়া কর।"

পাশের বাড়ীর বোসেদের গিন্নীর সঙ্গে প্রমীলার ভাব-সাব হইয়াছিল। বোস-গিন্নী কহিল—"কাল সকালে আমার মেজ

মেয়েকে দেখতে ভবানীপুরের এক জন ভাল ডাক্তার আসবে। তাকে দিয়ে দেখিয়ে একটা ভাল ওষুধ-বিষুদের ব্যবস্থা কর। এ-রকম হওয়া ত ভাল নয়।"

পরদিন সকালে ভবানীপুরের সেই ভাল ডাক্তার শশধরকে দেখিতে আসিল। ডাক্তার শশধরকে পরীক্ষা করিয়া এবং প্রমীলার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল—"ভয়ানক 'শক্' পেয়ে 'ব্রেণ য়্যাফেক্ট' করেচে। একটা প্রেসকৃপশন্ লিখে দিয়ে যাচ্চি, এইটে রোজ তিনবার কোরে······"

প্রেস্কৃপশন্ লিখিতে লিখিতে শশধরের মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, দাস্তটা রোজ পরিষ্কার হয় ত ?"

শশধর কোন উত্তর দিল না। সে তখন কল্পনা-নেত্রে দেখিতে লাগিল,— দুই কোর্টের মধ্যবর্ত্তী পথে মোড়ের উপর সুপ্রশস্ত ঘর। ঘরের মধ্যস্থলে মকর্দ্দমা-বাবার সামনে ভৈরবী-রূপিণী কালী ঝি আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়া আছে। তাহার সমস্ত কপালদেশ সিঁদূরে লেপা, হাতে সিঁদূর মাখানো ত্রিশূল—সারা ঘর ধূপ-ধুনার গন্ধ ধূমে আচ্ছন্ন। একপাশে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া সেবকরূপী কার্ত্তিক কম্বলাসনে বসিয়া আছে ; আর এক পাশে জবা ও বিল্বদলের মধ্যে সিন্দূর-চর্চ্চিত পাঁচটি মড়ার মাথা। কালীর সম্মুখে অসংখ্য ভক্তের দল ; আর সেই ভীড়ের মধ্য হইতে বৃষ্টির ধারার মত টাকা-পয়সা সিকি-আধুলী দোয়ানী প্রণামী-স্বরূপ আসিয়া মকর্দ্দমা-বাবার পদতলে পড়িতেছে।

ডাক্তার কহিল—"এইটে আনিয়ে নেবেন। রোজ তিন দাগ কোরে···

ক্ষিপ্তের মত শশধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া মালকোঁচা কষিল ; তার পর প্রেসকৃপশনটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিদ্যুদ্গতিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল ! পথে এক জনদের বেড়া হইতে একখানা বাঁশ খুলিয়া লইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে গোপালনগর রোডের অভিমুখে ছুটিল। পথিকরা তাহাকে দেখিয়া কেহ বা বিস্মিত হইল, কেহ বা আতঙ্কিত হইল। যাহারা নিষ্কর্ম্মা, তাহারা কৌতূহলী হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে শশধর মকর্দ্দমা-বাবার ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উন্মাদের মত তত্রত্য অসংখ্য জনতা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। হঠাৎ সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া কার্ত্তিক চকিতে আসন হইতে উঠিয়া পড়িল এবং চক্ষের নিমেষে গৃহাভ্যন্তর হইতে একটি দীর্ঘ বংশযষ্টি হাতে লইয়া মাতুলের সম্মুখীন হইল। তার পর···

তার পর যে বীভৎস ব্যাপার ঘটিল, তার বর্ণনা না করাই ভালো !

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

অভিযাত্রিক

বিদ্রূপ হানো আরো—
ঘৃণা-মিশ্রিত শব্দের স্রোতে ক্ষতি নাই আজ কারো !
যে দিন প্রথম জন্ম লভেছি মহা বিশ্বের বুকে—
বাজেনি শঙ্খ, দয়া করি কেহ মধু দেয় নাই মুখে,

অসহায়া নারী বক্ষে চাপিয়া অনাহূত সন্তানে—
শঙ্কিত চিতে প্রণাম জানাল বধিরের ভগবানে !
সম্বল তার নয়নের জল ললাটে পড়েছে ঝরি
নর-বিধাতার অতি অপূর্ব্ব লেখনী স্মরণ করি !

তার পর এই বন্ধুর পথে যাত্রা করেছি সুরু,
নীলাকাশে জাগে মহা ধূমকেতু বুক করে দুরু-দুরু !
নব পথিকের অর্ব্বুদ আশা আজিকার এই রাতে
অঙ্কিত হয় বালুকা-বেলায় আমাদের পদাঘাতে !

কাল রাতে জানি মহা সাগরের ঊর্ম্মির অভিসারে
আমাদের গত পথের চিহ্ন ধুয়ে যাবে বারে-বারে—
অভিযাত্রিক আমরা তখন হয় ত দাঁড়ায়ে আছি
অনতিক্রম্য মরুভূর কোন্ সীমানার কাছাকাছি !

ক্ষমা করো প্রিয় বুঝিতে পারিনি কবে করি গেছে দান
চির-দারিদ্র্য আমাদের লাগি থৃষ্টের সম্মান,—
শুধু মনে জাগে পাষাণ ভাঙ্গিয়া নগরী সৃজন করি
তারি রাজপথে তোমাদের রথে চিরকাল চাপা পড়ি !

চির-যৌবনা এই পৃথিবীর বিম্বাধরের সুরা
চূর্ণ করিয়া কত সৃষ্টির আকাশ চুম্বী চূড়া,
বহ্নি-দগ্ধ রেখে যায় যত ধূমায়িত শেষ ছাই—
অভিযাত্রিক আমরা কেবল ভাগ করে নিই তাই !

এমনি কেটেছে হাজার বরষ এখনো রয়েছে বাকি—
দু'হাতে জড়ানো লোহার শিকলে মনে হয় রাঙ্গা রাখি !
মৃত প্রেমিকার সমাধি-ভূমিতে পূর্ণিমা-রজনীতে
কত বার মোরা ফিরে আসিয়াছি প্রেমের অর্ঘ্য দিতে,—

স্থির মহাকাল আমাদের সাথে মিতালি করিয়া হেথা
শক্তি পেয়েছে মোদের শোণিতে হয়েছে দুর্ব্বিচেতা !
অক্ষম জানি, তবু সান্ত্বনা মোরা পারি বারে-বারে
ধ্বংসের লাগি সৃষ্টি করিতে আপনার বিধাতারে !

১৬

অমিয় এবং রত্না ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল।

মিসেস্ গোস্বামী গম্ভীর মুখে একবার তাহাদের দিকে চাহিয়াই নিজের কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

অমিয় সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল! কৈফিয়তের সুরে কহিল,—গাড়ীটা হঠাৎ—

মিসেস্ গোস্বামী মুখ তুলিলেন। দৃষ্টিতে উদ্বেগ। কহিলেন,—তোমরা নিরাপদে ফিরেছো! কোনো ক্ষতি হয়নি তো?

অমিয় কহিল,—না।

রত্না চাহিয়া দেখিল,—ড্রইং-রুমে আজ অনেকগুলি জীব জড়ো হইয়াছে। এবং সকলের চোখেই কৌতূহলী দৃষ্টি! সে দৃষ্টি রত্নার উপর নিবদ্ধ। অনিল শুধু পিছন ফিরিয়া পিয়ানো বাজাইতেছে এবং তাহার পাশের কৌচ অধিকার করিয়া কল্পনা বসিয়া গান গাহিতেছে।

রত্নার পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তোমার যে গান ক'খানা তৈরী করতে দিয়েছিলুম, হয়েছে?

মাথা নাড়িয়া রত্না জানাইল,—হইয়াছে।

—বেশ, কল্পনার পাশে গিয়ে বসো, অনিল বাজাবে। আমি আজ একে একে সকলের গান শুনবো। বলিয়া পুত্রকে কহিলেন,—তোমার অর্জ্জুনের পার্ট ধরো অমি।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখের মত কণ্ঠস্বরও গম্ভীর।

অমিয় হাত বাড়াইতেই টেবলের উপর হইতে পিন্-আঁটা ক'খানা কাগজ তিনি পুত্রের হাতে দিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী ডাকিলেন,—লাবণ্য, চন্দ্রা, প্রভা, রেখা—

মিসেস্ গোস্বামীর ইস্কুলের ছাত্রীরা আসন ছাড়িয়া একে একে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—নাও। তোমাদের পার্ট! এটা রইল রত্নার—ও যদি গান শুনিয়ে আজ খুশী করতে পারে, উর্ব্বশীর পার্ট ও পাবে।

রত্নার সমস্ত অন্তর যেন অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল! বিবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে সে কল্পনার পাশে গিয়া বসিল।

অলক রায়, শচীন সেন আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। উভয়েই জুনিয়ার ব্যারিষ্টার—অনিলের বন্ধু। তাহাদের নারদ ও ভরত মুনি সাজিবার কথা। মিসেস্ গোস্বামীকে তাহারা অভিবাদন দিল।

প্রত্যভিবাদনের পর প্রফুল্ল স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—আমি জানতুম তোমরা ঠিক সময়ে আসবে।

এ কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন খোঁটা ছিল, অতি সূক্ষ্ম হইলেও তীক্ষ্ণ ভাবে সে খোঁটা অমিয়কে বিঁধিল। মুখ না তুলিয়াই হাতের খাতাখানা সে নিবিষ্ট মনে পড়িতে লাগিল।

অলক রায় রত্নাকে আজ প্রথম দেখিল। মিসেস্ গোস্বামীকে প্রশ্ন করিল,—ইনিই উর্ব্বশী সাজবেন? চক্ষে তাহার প্রশংসার প্রদীপ্ত দৃষ্টি।

রত্নার পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—সেই রকম তো মনে করেছি! কিন্তু রত্না অনুপস্থিত ছিল। বেশ্ লেট।

রত্না মাথা নত করিল। যেন তাহার মস্ত গুরু অপরাধের

কল্পনার গান শেষ হইল। মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তোমার গলা ভারি মিষ্টি মা কল্পনা!

কল্পনা একটু হাসিল। সেই সঙ্গে কটাক্ষে রত্নার ম্রিয়মাণ মুখখানাও দেখিয়া লইল। কহিল,—রত্নার গলাও চমৎকার মাসিমা। কত দিন কলেজে আমরা শুনেছি তো।—হ্যাঁ রত্না, অমন চুপ-চাপ কেন ভাই?

কল্পনার মিহি সুরে এই কপট আত্মীয়তা-প্রকাশে রত্নার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বালা করিয়া উঠিল! সে কোন উত্তর দিল না।

অনিল পিয়ানো হইতে মুখ ফিরাইল। রত্নার দিকে চাহিয়া কহিল,—এই যে রত্না এসেছো! এবার তোমার টার্ণ! বলিয়া সে একটু হাসিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—হ্যাঁ, এইবার তুমি আরম্ভ করো, রত্না!

রত্না অনিলের দিকে ফিরিয়া বসিল। তাহার বিষাদ-মলিন মুখ দেখিয়া অনিল বুঝিল, রত্নার অভিমান হইয়াছে! মৃদু কণ্ঠে কহিল,—চা খেয়েছো?

রত্না কোন সাড়া দিল না।

অনিল বাজনা ধরিল।

রত্না গাহিল। সমস্ত অন্তর ঢালিয়া নিঃশেষে সে যেন সঙ্গীতে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ঝরণার বাধাহীন জলধারার ন্যায় সুমিষ্ট কণ্ঠ-নিঃসৃত সুরের স্বচ্ছ প্রবাহ-ছন্দ, তাল, লয় যেন কক্ষস্থ সকল প্রাণীকে কিছুক্ষণের জন্য আবিষ্ট করিয়া রাখিল।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকলে নীরব, নিস্তব্ধ! অমিয় রুদ্ধ নিশ্বাসে নিষ্পলক নেত্রে রত্নার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল। সুরের পর সুর স্বপ্নের জাল বিছাইয়া চলিল! গানের পর গান নেশার মত সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল!

কল্পনা আসিয়া অমিয়র পাশের আসনে বসিল এবং মৃদু কণ্ঠে কহিল—মিষ্টার গোস্বামী সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন যে! পুলকিত মাধবের মত! তার মুখে ব্যঙ্গের হাসি!

কল্পনা চাহিয়া দেখিয়াছে,—যতক্ষণ সে গান গাহিতেছিল,—মিষ্টার গোস্বামী সেই সময়টায় নিজের পার্টের কাগজে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন! তাই অমিয়র এই তন্ময়তা ঈর্ষ্যার মত তাঁহার মনে বিদ্বেষ সঞ্চারিত করিল! রত্নার মুখের ম্লানিমাই যে মিসেস্ গোস্বামীর গম্ভীরতার হেতু, এটুকু সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল; এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই প্রথম হইতে তার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সঙ্গীত-স্রোত থামিল। মিসেস্ গোস্বামী প্রফুল্ল স্বরে কহিলেন চমৎকার হয়েছে। সাধে বলি রত্না,—তুমি ক্ষণজন্মা মেয়ে! যাক, তোমার আজকের দেরীটুকু আমি মাপ কল্লুম। কাল নাচের রিহার্সাল চলবে। এখন চা আসুক।

চা আসিল। সকলেই হাত বাড়াইল, পেয়ালা গ্রহণ করিল। রত্নার কাছে ট্রে আসিতে সে মাথা নাড়িল।

অনিল কহিল,—তুমি চা খাবে না?

—আমি চা খেয়েছি! আর ইচ্ছে নেই।

—ও, তাই তোমাদের ফিরতে এত দেরী! কথা হইতেছিল

মৃদু স্বরে। কল্পনা তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। মিসেস্ গোস্বামীকে কহিল,—রত্না চা নিলে না, মাসিমা!

অনিল উত্তর দিল—না! ওর ভালো লাগছে না!

অমিয় অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল। কথার শেষ অংশটা তাহার কর্ণে লাগিতেই সে কহিল,—কি ভালো লাগছে না অনিল?

—রত্না চা খাবে না! সেই কথা হচ্ছে!

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—না, ওকে তোমরা জিদ করো না! ওর অসুখ করলে আমার ভারী ভাবনা হবে।

কৃত্রিম অভিমান-ভরা কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—আমাদের অসুখ করলে আপনার ভাবনা হবে না মাসিমা?

অমিয় সহসা মুখ তুলিল। ধীর স্বরে কহিল,—না! সাধারণ ভাবেই মন অসুস্থ হবে মিস্ চ্যাটার্জ্জি। কিন্তু রত্নার কথা আলাদা! ওর জন্য প্রতিপদে আমাদের চিন্তিত হতে হবে। ও যে আমাদের কাছে আছে।

মিসেস্ গোস্বামীর কান বাঁচাইয়া গলা নামাইয়া কল্পনা কহিল,—সকলের চেয়ে বেশী ভাবনা বোধ করি আপনারই হবে!

—হলে খুব অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক লাগবে? অমিয় উত্তর করিল।

যেন প্রচ্ছন্ন স্বীকার-উক্তি! রত্নার বিরুদ্ধে কল্পনার সমস্ত মন নিমেষে তাতিয়া উঠিল। পাড়াগেঁয়ে একটা গরীবের মেয়েকে উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃযুগল অনুক্ষণ যেন পাহারা দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে! যেন অমৃত-পাত্রের সম্মুখে সুদর্শন-চক্র! কিন্তু কি আছে রত্নার? শুধু রূপ! বসন্ত-সমাগমে পুষ্পিত কাননে লুব্ধ মধুপের গুঞ্জন-ধ্বনির মত এই স্তাবকের দল রত্নার যৌবনশ্রী-মণ্ডিত অপরূপ তনুর লাবণ্যে যেন আত্মহারা! মোহাচ্ছন্ন! জ্বলন্ত অঙ্গারের মত নিষ্ফল ক্রোধে কল্পনার সমস্ত মন ধিক্-ধিক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

আরতি কহিল,—চা খাওয়া শেষ হলো মাসিমা। অমিয়-দা এবার পার্ট আরম্ভ করুন।

মিসেস্ গোস্বামী কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাকে কহিল,—আজ আমি ভারি ক্লান্ত মা, কাল থেকে তোমার কাজে লেগে যাবো! বলিয়া রত্নার পানে চাহিয়া কহিল,—ওর গান তো শেষ হোল,—বাকী কাজগুলো ও কাল করবে। আজ তুমি ওকে ছুটী দিয়ে দাও, মা! আজ ও অনেকটা পরিশ্রম করেছে আমার সঙ্গে।

গম্ভীর কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী অনুমতি দিয়া কহিলেন,—বেশ, তাই হোক! আজ আমি এদের দেখি।

সকলকে অভিবাদন করিয়া অমিয় রত্নাকে কহিল,—তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করোগে! আমিও চললুম। বলিয়া কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কক্ষ হইতে সে নিক্রান্ত হইয়া গেল। জানিতেও পারিল না, ভ্রূকুটি-ক্ষুব্ধ দুই চোখ কল্পনা অগ্নি-কটাক্ষে ভরিয়া দু'জনের পানে চাহিয়া আছে!

১৭

রত্নার অত্যন্ত ভাবনা পিতাকে লইয়া। গোস্বামী সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে তিনি যদি এখানে আসেন, তবে—

পিতাকে রত্না চিঠি লিখিয়া আসিতে নিষেধ করিতে পারে নাই! কেমন সঙ্কোচ হইতেছিল! অথচ এই বিশিষ্ট সভ্য সম্প্রদায়ের মাঝখানে গ্রাম্য ইস্কুল-মাষ্টারের আসন কোন্‌খানে, তাহা ভাবিতে মন তাহার পদে পদে কুঞ্চিত হইতেছিল। অবশ্য পিতা উচ্চ-শিক্ষিত পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট! তথাপি অনাড়ম্বর পল্লী-জীবন-যাত্রায় তিনি অভ্যস্ত। সরল প্রকৃতির মানুষ! কৃত্রিম আচার-প্রিয় এ সমাজের আদব-কায়দায় তিনি একেবারেই অনভ্যস্ত! এখানকার চলাফেরা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আনাড়ি। অবশ্য সকলেই তাহার পিতাকে সানন্দে গ্রহণ করিবে—সাদর সম্বর্দ্ধনা দিবে! তবু তাহাদের চোখের অর্থময় দৃষ্টি, অধরের বক্র হাস্য-রেখা, নিঃশব্দ ইঙ্গিতে রত্নাকে বুঝাইয়া দিবে, এই সম্ভ্রান্ত সমাজের মণি হইবার জন্য রত্নার যে এই বিপুল প্রয়াস, এ শুধু বাতুলতা!

বহু তিক্ত অভিজ্ঞতায় রত্না জানিত—ছদ্ম সহানুভূতি, কপট দুঃখ প্রকাশ, কৃত্রিম বেদনাভিনয় এবং মৌখিক আনন্দ প্রকাশ এ সমাজের অঙ্গ! এখানকার আচরণে পিতা পদে পদে বিভ্রান্ত হইবেন, রত্না কিন্তু লজ্জায় মরিয়া যাইবে!

সমস্ত কথাই রত্নার মনে জাগিতে লাগিল। প্রথম যখন বোর্ডিংএ থাকিত, সহাধ্যায়িনীর দল তাহার শাড়ী-ব্লাউস লইয়া কত রঙ্গ-কৌতুক কত হাসাহাসি করিত। এ সকল হইতে আশাতীতরূপে মুক্তি দিলেন, মিসেস্ গোস্বামী।

মিসেস্ গোস্বামী তাহার একটা লম্বা লেস-ঝুলানো জামার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কাল দর্জ্জি আসবে, তোমার জামা, সায়া, সেমিজ, বডিস্ সমস্তর মাপ তাকে দিয়ো রত্না। ওগুলো আর পরো না মা।

অনিল বই পড়িতেছিল, মায়ের কথায় মুখ তুলিয়া রত্নার পানে চাহিল। কহিল,—কেন, দিব্বি জিনিষ তো! রং-চংও তেমনি—পয়সা দিয়ে রত্না খবর্দ্দার কম কাপড় নিয়ো না!

মিসেস্ গোস্বামী কৃত্রিম তিরস্কারে পুত্রকে শাসন করিয়া কহিলেন—থাম্—ও কি তোর মত উড়নচণ্ডী হবে!

লজ্জিত মুখে রত্না কহিল,—এগুলো সব কেনা মাসিমা।

স্নেহ হাস্যে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—জানি মা, পাড়াগেঁয়ে পছন্দর সঙ্গে সহরের পছন্দ-রুচি খাপ খায় না। তাহার পর সেই জামা-কাপড়ের ফ্যাশনে সহাধ্যায়িনীর দল ঈর্ষ্যান্বিত দৃষ্টিতে রত্নার প্রশংসা করিত। বিনিময়ে মিসেস্ গোস্বামীর প্রতি রত্নার চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া থাকিত।

পিতার সম্বন্ধে তেমনি একটি হাস্যোদ্দীপক বিভ্রাটের আশঙ্কায় রত্নার মন অনুক্ষণ শুধু অস্বস্তি অনুভব করা নয়, ভীত হইতেছিল। যদি তিনি ধুতি পাঞ্জাবী ত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ সাহেব সাজিবার বাসনায় চাঁদনির বাজার হইতে সস্তার কোট-প্যাণ্ট কিনিয়া সেই বেশে দর্শন দান করেন? মুখে কেহ কিছু বলিবে না! কিন্তু সেই অদ্ভুত ছাঁটকাটের পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পাঁচ জনের মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিবে, সে-ভাষা পড়িবার বিদ্যা রত্নার আয়ত্ত হইয়াছে।

রত্না পাশ ফিরিল। কল্পনার কথা মনে আসিল। ক্ষুব্ধ অভিমানে দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। গান শেষ করিয়া কল্পনা যখন অমিয়র পাশে গিয়া আসন গ্রহণ করিল, তাহার সেই কথা বলিবার ছন্দ, গ্রীবার ভঙ্গী অমিয়র পাশে বসিবার মুহূর্ত্তে ওষ্ঠের মৃদু হাসি—সে সমস্তই রত্না লক্ষ্য করিয়াছিল। অমিয়র দিকে ঝুঁকিয়া

তাহার হাতের কাগজগুলা কল্পনা পড়িতে লাগিল। অমিয়র আচরণে বা মুখে রত্না যদিও এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই, কল্পনা কিন্তু এমন করিয়া চাপা-গলায় অমিয়র সহিত কথা কহিতেছিল, হাসিতেছিল,—যে তাহার উপর যেন কল্পনার কোন বিশেষ অধিকারে নিবিড় দাবী প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছিল!

রত্না ভাবিবার চেষ্টা করিল,—কল্পনার এই আধিপত্য কিসের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত? ওরা তো ব্রাহ্মণ! অমিয় আজ সন্ধ্যায় রত্নাকে বলিয়াছে, তাহা হইতে পারে না! মনকে তাই প্রতিক্ষণে নিবৃত্ত করিতেছিল—কিন্তু কি হইতে পারে না? কোন্ অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা? সে কি?

লেপের মধ্যে রত্না ঘামিয়া উঠিল। এতক্ষণে রত্না নিজেকে কল্পনার সহিত মিলাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিল,—সৌন্দর্য্যে, সংগীতে-নৃত্যে সকল দিকেই সে কল্পনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! তবে কি জন্য? কেন? কল্পনা অমিয়র কাছে অগ্রসর হইবে, আর উদাস নেত্রে রত্না তাহার পিছনে পড়িয়া থাকিবে? না, না! রত্না কল্পনাকে প্রতিহত করিবে! নিজের দুর্ব্বার শক্তিতে সে তাহাকে বাঁধা দিবে। অমিয়—অমিয়ই রত্নার সর্ব্বস্ব! অমিয়র চোখের সম্মুখে নিজেকে সে এমন করিয়া দীপ্ত সুধা-মণ্ডিত করিয়া তুলিবে, কল্পনা নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে! বিবেকের কোন অনুশাসন রত্না শুনিবে না! কল্পনার জয়ী হওয়ার অর্থ, গোস্বামি-পরিবারে সে হইবে এক জন কৃপার পাত্রী!

সম্পদ্ বিভব বা প্রভুত্বের এমন প্রচণ্ড প্রভাব, এতখানি মোহিনী মায়া যে অপরের নিকট ধার করা হইলেও আপনার করিয়া বাহিরের সমাজে দেখাইবার লোভ মানুষ কিছুতে ত্যাগ করিতে পারে না! তাহাতে ভিতরের ফাঁক যতই বাড়িয়া উঠুক, সেই ছদ্ম সম্মানের মুখোস খুলিয়া ফেলা সাধ্যাতীত হয়!

হঠাৎ রত্নার মনে হইল,—কল্পনা হইবে অমিয়র অধিকারী আর সে হইবে বাহিরের অতিথি,—এ অপমান সে সহিবে না।

রাত্রি-শেষের দিকে রত্নার চোখে ঈষৎ নিদ্রা আসিয়াছিল, কিন্তু নীলিমা-তলে উষার বিকাশের সন্ধিক্ষণেই কমল-নেত্র উন্মীলন করিয়া সে চাহিয়া দেখিল।

গোস্বামি-ভবনের প্রতি শয়ন-কক্ষে সংলগ্ন বাথরুম! রত্না মুখ-হাত ধুইয়া আলনা হইতে গরম গায়ের কাপড় লইয়া শ্লিপার পায়ে যখন ঘরের বাহিরে আসিল, তখন আলো-অন্ধকারে যেন ভাগাভাগি হইতেছে! বারান্দায় সেই আবছায়া-কুয়াশায়-ভরা উদ্যানের গাছপালায় অদৃশ্যপ্রায়-বাড়ী অর্দ্ধ সুপ্তি-মগ্ন! ভৃত্য-পরিচারিকার দল সবে গাত্রোত্থান করিয়া কাজে যোগ দিতেছে।

বারান্দায় এমন অসময়ে রত্নাকে দেখিয়া তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টি পলকের জন্য রত্নার উপর নিপতিত হইল। রত্না সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না! গোটা-দুই বারান্দা পার হইয়া সে আসিয়া অমিয়র শয়ন-কক্ষের সামনে দাঁড়াইল।

অমিয়র ঘরের কপাট ভেজানো। ভিতর হইতে বন্ধ কি না, সে শুইয়া আছে, কি জাগিয়া আছে, কিছু বুঝিতে না পারিয়া একটা রেলিং ধরিয়া স্তব্ধ চিত্তে রত্না দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই অমিয়র খানসামা একটি পাত্রে খানিকটা গরম জল লইয়া মনিবের কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া রত্নাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

রত্না জানিতে চাহিল, সাহেব উঠিয়াছে কি না?

অভিবাদন করিয়া ভৃত্য জানাইল, প্রভুর ঘুম ভাঙ্গিলেও গাত্রোত্থান এখনো হয় নাই।

রত্না কহিল,—সেলাম দিয়ো।

১৮

নৈশ পরিচ্ছদের উপর ড্রেসিং-গাউন চাপাইয়া অমিয় ঘরের বাহিরে আসিয়া সামনে প্রতিমার ন্যায় রত্নাকে দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কহিল,—আমায় ডাকচো?

—হ্যাঁ। তুমি বেড়াতে যাবে না অমিয়-দা?

অবাক্ হইয়া অমিয় কহিল,—বেড়াতে! এত সকালে? আমার তো এখনো হাত-মুখ ধোয়া হয়নি!

—বেশ, আমি দাঁড়াচ্ছি,—তুমি চটপট সেরে নাও।

অমিয়র বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। কহিল,—আমি দাঁড়াচ্ছি, মানে? তুমি যাবে না কি?

—হ্যাঁ, যাবো! রত্নার স্বর দৃঢ়।

অমিয় মুহূর্ত্ত কাল রত্নার পানে চাহিয়া রহিল।

রত্না কহিল,—তুমি না বললে, ভোরে উঠে তুমি বেড়াতে যাও!

—মিথ্যে বলিনি। কিন্তু রাত্রি শেষ হবার আগে যে উঠি, এমন কথাও তো বলিনি!

আব্দারের সুরে রত্না কহিল,—না গো, না। রাত্রি শেষ নয়! ভোর অনেকক্ষণ হয়েছে। এ কুয়াশা।

—হবে। কিন্তু এত তাড়া দিচ্ছ কেন তুমি?

—দেবো না? মাসিমা এখনি উঠবেন! আমার আর বেড়াতে যাওয়া হবে না।

বিস্মিত কণ্ঠে অমিয় কহিল,—মাসিমাকে না বলেই তুমি যেতে চাও না কি?

অকুণ্ঠিত কণ্ঠে রত্না কহিল,—হ্যাঁ।

চমকিত হইয়া অমিয় কহিল,—সে কি!

এতটুকু অপ্রতিভ না হইয়া রত্না কহিল,—কেন, এতে দোষ কি! আমরা তো সকালের মধ্যেই ফিরে আসবো। তোমার খালি না নিয়ে যাবার ফন্দী!

অমিয় একটু হাসিল। কহিল,—আমার না নিয়ে যাবার ফন্দী, কিন্তু তোমারই বা এত জিদ কেন?

—আমি গাড়ী চালাতে শিখবো। বিকেলে হবে না, মাসিমার কাছে হাজির থাকতে হবে! আর ক'টা দিন বাদেই তো তুমি চলে যাবে, আমার আর শেখা হবে না।

এতক্ষণে জিনিষটা স্বচ্ছ হইল। হাঁ, গাড়ী হাঁকাইবার নেশা এমনি বটে! কিশোর কালে অমিয়কেও এক দিন এ আশায় পাইয়াছিল! বাপের নূতন গাড়ী—হাত দিবার অনুমতি নাই! তাহাকে লইয়াই গোপনে সে পাড়ি দিত! ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত, ভর্ৎসিত হইয়াছে, তথাপি গাড়ী লইতে ছাড়িত না। উত্ত্যক্ত হইয়া পিতা একখানা ছোট গাড়ী তাহাদের দুই ভাইকে কিনিয়া দিলেন।

অমিয় হাসিল।—বুঝেছি! তাই তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপি-সাড়ে পালাতে চাও! কিন্তু মা বকুনি দিলে আমি জানি না। আঙুল দেখিয়ে দেবো সোজা তোমায়। একটি কথা বলবো না।

—তাই দিয়ো! আমি তো কোন অন্যায় কাজ করছি না। নাও অমিয়-দা, ওই ছাখো, আকাশে আলো ফুটেছে।

অমিয় আকাশের দিকে চাহিল। তার পর হাসিয়া কহিল,—ঘরে যাও—পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার হয়ে যাবে।

মাথা নাড়িয়া জিদের স্বরে রত্না কহিল,—না, আমি এক-পা নড়বো না—তুমি দেরী করবে।

—না রে পাগল, না! আমি নিচ্ছি। এমন করে দাঁড়িয়ে থাকে না। যাও, ঘরে গিয়ে জুতো-মোজা পরে এসো। অমিয়র স্বরের শেষের দিকে কর্তৃত্বের আভাস।

কোন উত্তর না দিয়া রত্না আদেশ পালন করিতে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে রত্না যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কেবল পায়ের হিল-জুতা সিল্কের মোজা নয়—মাথার চুল হইতে শাড়ীখানা পর্য্যন্ত সমস্ত পরিপাটি করিয়াই সে উপস্থিত হইল। গায়ে মূল্যবান সোনালী ওভার কোর্ট।

অমিয়কে ডাকিয়া রত্না কহিল,—হয়েছে অমিয়-দা?

—হ্যাঁ ভাই, এই যে! বলিয়া টুপি হাতে লইয়া অমিয় বাহির হইয়া আসিল; এবং রত্নার পানে চাহিয়া সহাস্যে কহিল,—তোমায় দেখেই বুঝি কবিরা উষার বর্ণনা লিখেছে!

রত্নার কপোল ডালিম ফুলের মত রক্তিম হইয়া উঠিল।

সলজ্জ হাস্যে রত্না কহিল,—আপনার কবিত্ব মাঠে বসে শুনবো! তখন খুব মিষ্টি লাগবে। এখন চলুন।

কপট গাম্ভীর্য্য সহকারে অমিয় কহিল—গাড়ী চালানো নয়, আরো অনেকখানি মতলব আছে সেই সঙ্গে।

গাড়ীতে উঠিয়া রত্না কহিল,—আমি তোমার শীটে বসবো, এখন তো ভীড় নেই!

সহাস্যে অমিয় কহিল,—চাপা পড়ে পড়ুক! গরীব মেথর ধাঙড়—ওদের প্রাণের কি আর দাম আছে?

সকৌতুকে রত্না কহিল,—না সিদ্ধার্থ দেব, প্রাণী মাত্রের দুঃখে আমি বিগলিত না হলেও মানুষের প্রাণের দাম আছে আমার কাছে।

কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে অমিয় ফিরিয়া একবার রত্নার মুখের পানে চাহিয়া আবার গাড়ী চালাইতে লাগিল। কহিল,—হঠাৎ আমায় মূর্ত্তিমান অহিংস ঠাউরালে কি করে সে?

—অহিংস না হোক, তেমনি উদাসীন তো!

—হুঁ! বলিয়া অমিয় নীরব রহিল।

গাড়ীর মোড় ঘুরিতেই রত্না কহিল,—লেকের দিকে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ। বলিয়া অমিয় কহিল,—কি বললে তুমি, উদাসীন? তা বটে! পার্থের মত!

"ব্রহ্মচারী ব্রতচারী আমি
তব যোগ্য নহি বরাননে!"

রত্নার সুগৌর মুখের উপর শোণিতের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সে কহিল,—পার্থ ও কথা বলেছিল চিত্রাঙ্গদাকে—কিন্তু শেষে তার হাতেই নিজেকে সমর্পণ করেছিল। আমি যদি নাটক নির্ব্বাচন করতুম—'চিত্রাঙ্গদা-অর্জ্জুন' করতুম, উর্ব্বশী-অর্জ্জুন করতুম না।

—কেন করতে না?

রত্না কহিল,—উর্ব্বশীর অভিসার ব্যর্থ হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে পেয়েছিল।

অমিয় কহিল,—তা পেয়েছিল। কিন্তু সে পাওয়া ছিল বিড়ম্বনার মত, নয় কি?

রত্না অমিয়র পিঠের উপর হাত রাখিল। কহিল,—এবার আমি চালাই অমিদা।

—চালাও এসে। শীট বদল করি। বলিয়া গাড়ী থামাইয়া শীট বদল করিয়া অমিয় বসিল। তাহার চোখে-মুখে প্রদীপ্ত উৎসাহ। সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ স্বরে অমিয় কহিল,—প্লেন চালাতে আরও আনন্দ, রত্না, তুমি এয়ার-সার্ভিসে ভর্ত্তি হও!

রত্না চমকিয়া উঠিল। অতীতে কথার ছলে এমনি একটি ভবিষ্যৎ-বাণী হইয়াছিল।

শান্ত স্বরে রত্না কহিল,—মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা শক্তি থাকলে কি সব জিনিষ হয় অমিয়-দা?

—কেন হবে না? চেষ্টায় সংগ্রহ করতে হয়।

—না অমিয়-দা, চেষ্টা করলেও হয় না। আমার মনে একান্ত ইচ্ছা বা যোগ্যতা থাকলেও আমি এয়ার-সার্ভিসে যোগ দিতে বা পাইলট হতে কখনই পারবো না, সে আমার আকাশ-কুসুম!

—কেন তুমি আকাশ-কুসুম বলছো! কি অসুবিধা তোমার?

—অসুবিধা! অভাবই মস্ত অসুবিধা! রত্নার মুখে বিষাদের ছায়াপাত হইল।

অমিয় শান্ত স্বরে কহিল,—না রত্না, আমি তোমার সে অভাব রাখবো না! তুমি কখনো তোমার অসামর্থ্যের কথা ভেবে দুঃখ পেয়ো না। তাতে আমিও দুঃখিত হবো।

রত্নার আয়ত নেত্র হইতে একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

—কাঁদচো রত্না! না, গাড়ী থামাও—এমন উতলা মন নিয়ে গাড়ী চালানো হয় না। থামাও গাড়ী।

রত্না গাড়ী থামাইল। অমিয় কহিল,—এসো আমরা খানিকটা মাঠে বেড়াই।

উভয়ে গাড়ী হইতে নামিল।

রত্নাকে একটা আসনে বসাইয়া পাশে অমিয় নিজে বসিল। রত্নার হাত ধরিয়া মৃদু চাপ দিয়া কোমল স্বরে কহিল,—নিজেকে কখনো অভাবগ্রস্ত মনে করো না রত্না। আমি যেখানে যত দূরেই থাকি, তোমার প্রয়োজনটুকু শুধু আমায় জানিয়ো।

১৯

চায়ের টেবলে বসিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অমিয় রত্না?

বয় জানাইল,—বাহার গিয়া।

মিষ্টার গোস্বামী সবিস্ময়ে পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—প্রাতর্ভ্রমণ। চা না খেয়ে?

মিসেস্ গোস্বামীর মুখ অন্ধকার হইল! গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—শুনছি তো! আমার অনুমতি নেওয়া বোধ হয় তারা উচিত মনে করেনি!

গোস্বামী সাহেব সাড়া দিলেন না।

অনিল এতক্ষণ টোষ্ট চিবাইতেছিল। সেটা শেষ হইতে কহিল,—না, ভেবেছে, এখনি তো ফিরবে।

—তা হোক অনিল! আমি যখন আছি, বাড়ীর মাথা—তখন মুহূর্ত্তের জন্য হোক, অনেক ক্ষণের জন্যই হোক, সকল কাজেই আমার অনুমতি নেওয়া,—আমায় জানানো প্রয়োজন।

গূঢ় ক্রোধের আভাসে মিসেস্ গোস্বামীর স্বর অত্যন্ত গম্ভীর। অনিল আর সাড়া দিল না। জননী স্নেহ দিতে যেমন কোমল, শাসন করিতেও তেমনি কঠিন, সে তা জানে। মনে মনে রত্নার জন্য সে শঙ্কিত হইল। রত্না জননীর স্নেহের দিকটাই দেখিয়াছে; তাঁহার কঠোরতার দিক তার সম্পূর্ণ অপরিচিত! তাই এত বড় ভুল সে স্পর্দ্ধার মত করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু বিস্ময় সেখানে নয়। অনিলের আশ্চর্য্য ঠেকিতেছিল অগ্রজের আচরণ। এ যেন অদ্ভুত হেঁয়ালি! মনে মনে চিন্তা করিয়া অনিল তাহার মর্ম্ম অবগত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। জ্যেষ্ঠ কিশোর-কাল হইতে ধীর-প্রকৃতি। অনিলের বাচালতায় কত দিন বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে। নিয়মানুবর্ত্তিতার ভক্ত! স্বেচ্ছাচারিতা তার দু' চোখের বিষ! তাহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল সকলের অজ্ঞাতে রত্নাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হওয়া! অনিলের অবিদিত নয়, কত কুমারী জ্যেষ্ঠকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়া শেষে নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। অনিল নিঃসংশয়ে জানে, চপলতাই ছিল ভ্রাতাকে পাইবার পথে বিশেষ অন্তরায়। কল্পনার প্রচেষ্টা হয়তো এমনি বিপত্তিতে টুটিয়া এক দিন খান-খান হইয়া যাইবে! সেই মানুষ রত্নার কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত অভাবিত জটিল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল কি করিয়া? কেন?

সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মিষ্টার গোস্বামী পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—এবার বল্টু এলে বলে দেবো স্পর্শমণিটিকে ছাখো! ইনি আমাকে যেমন একেবারে বদল করে নিয়েছেন, তেমনি তোমার মেয়েকে নিজের বলে চিন্‌তে পারবে না! বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখের আঁধার ফিকা হইয়া আসিলেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল না! মিষ্টার গোস্বামী বুঝিলেন, ভার্য্যার মনে ওই যে স্ফুলিঙ্গ রহিল, ইহাকে নিঃশেষে নির্ব্বাপিত না করিতে পারিলে বেচারী মেয়েটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

মিষ্টার গোস্বামী প্রশংসিত কণ্ঠে কহিলেন,—এ তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা লীলা! আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না, প্রথমে যে রত্নাকে দেখেছিলুম,—এত অল্প দিনে সে এমন হবে! কি রকম জড়সড় লাজুক ছিল। প্রথম তুমি যে দিন ওকে নাচ শেখাতে গেলে, আমি কিছু না বললেও মনে মনে ভেবেছিলুম, নিজের পাগলামী তুমি বুঝতে পারবে! কিন্তু এখন—

মিসেস্ গোস্বামীর মুখে এতক্ষণে সকালের মেঘহীন আকাশের আলো ঝল্‌-মলানির মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌতুক কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—এখন—কি?

—এখন—এখন অবাক্ হয়ে যাই! তাক লেগে যায়—সেই রত্না এই উর্ব্বশী সেজে আমার বন্ধুদের অবাক্ করে দেবে, এ বিশ্বাস আমি রাখি। তাই আনন্দ হয়, গর্ব্ব বোধ করি তোমার হাতে গড়া জিনিষ বলে! তাই তো বল্টুকে অত করে নিমন্ত্রণ করলুম!

বেয়ারা ট্রেতে করিয়া ডাকের চিঠিগুলা আনিয়া মিসেস্ গোস্বামীর সম্মুখে ধরিল।

মিসেস্ গোস্বামী সকলের চিঠি বিলি করিতেন। অনিলের চিঠি তাহার হাতে দিয়া আর একখানা তুলিয়া কহিলেন,—এ তো হরিপালের ছাপ! রত্নার চিঠি। তার ঘরে দিয়ে এসো। এই নাও তোমার হরিপালের চিঠি! এখানা আমার মধুপুরের। বলিয়া বাকী চিঠিগুলা হাকিম সাহেবের কামরায় রাখিয়া আসিতে বেয়ারাকে আদেশ করিলেন।

পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া নিজের চিঠিখানা খুলিয়া তাহাতে দৃষ্টি বুলাইয়া গোস্বামী হাস্য করিলেন। কহিলেন,—বল্টুর চিঠি! সে-দিন সে আসতে পারবে না। তার ইস্কুল ইনস্পেক্‌সনে আসবে! তাই মাপ চেয়েছে।

উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—রত্নার কথা কি লিখেছেন? তার থিয়েটার করা সম্বন্ধে?

—হ্যাঁ গো, ফুল পারমিসন্! মিসেস্ গোস্বামীর বিবেচনার উপর তার পরিপূর্ণ আস্থা! কন্যা সম্বন্ধে উর্ব্বশী সাজার অনুমতি দিয়েছে! আর তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে, তুমি তার কন্যাকে নৃত্যে এতখানি পারদর্শী করেছো বলে। রত্নার মাও তোমায় তাঁর আন্তরিক আনন্দ জানিয়েছেন।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—ওদের বাড়ীতে হয়তো হৈ-হৈ পড়ে গেছে। পাড়া-গাঁ তো!

—তা আর বলতে! পুকুর-ঘাটে হয়তো ঝগড়াই বেধে গেল!

মা হাসিলেন, কহিলেন,—ঝগড়া কি রে? সেখানে হয়তো কত ঘোঁট হচ্ছে,—মেয়ে খৃষ্টানী হলো বলে!

—তা হোক! কিন্তু তারা বলছে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, তাই অত ফরফরানি। আঙুর ফল টক্ বলার মত ওরা আমাদের সহরের নিন্দা করে! এ আমি তোমায় বাজি রেখে বলতে পারি।

মা হাসিতে লাগিলেন।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—আমি অফিস্-কামরায় চল্‌লুম।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের সভায় উপস্থিত থেকো।

—থাকতে পারি। কিন্তু বল্টু যখন আসেনি, তখন তোমাদের নারদ, ভরত হতে রাজি নই!

মিসেস্ গোস্বামী হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—না গো না, তোমাদের বন্ধু-যুগলকে আমি বনমানুষ সাজাচ্ছি না! আমি দর্শক হিসাবে নিমন্ত্রণ করছি।

—অল্ রাইট! এখন আমি চল্লুম। বলিয়া গোস্বামী সাহেব প্রস্থান করিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী ঘড়ির দিকে চাহিলেন। কহিলেন,—সাড়ে সাতটা বাজলো, এখন তারা ফিরলো না।

যে মেঘখানা হাস্যালাপের সুবাতাসে অন্তর্হিত হইয়াছিল, আবার তাহা ঘনায়মান হইল। গুমোট সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়া ত্রস্তে অনিল কহিল,—রত্নার সব নতুন কি না, তাই ওকে নিয়ে বেড়াতে গেলে আনন্দ পাওয়া যায়! বোধ হয়, ফিরতে তাই দেরী হচ্ছে!

অপ্রসন্ন মুখে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—সেই জন্যই রত্নাকে আমি বিশেষ কিছু বলি না! কিন্তু আজকের আচরণটা তার শুধু বাড়াবাড়ি নয়, গর্হিত, এ তোমায় স্বীকার করতে হবে।

—না, তাতে আমি 'না' বলছি না। বলছি, পাড়াগেঁয়ে বুনো মেয়ে ও অত এটিকেটের ধার ধারে না! ওর সৌভাগ্যই ওকে তোমার স্নেহচ্ছায়ায় এনেছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—মেয়েটার বিয়ে যদি একটা বড় ঘরে দিতে পারি!

অনিল চুপ করিয়া রহিল।

মিসেস্ গোস্বামী একটু নীরব থাকিয়া কহিলেন,—আমার ইচ্ছে থাকলে কি হবে! ওর বাপ যে বড্ড পাড়া-গেঁয়ে! বড় ঘরের ছেলেরা শ্বশুর-বাড়ীর একটা পোজিসন্ খোঁজে। এই ছাখো না, আমি যখন তোমাদের বিয়ে দেবো, তখন আমার সমকক্ষ ঘরই খুঁজবো! শুধু রূপ দেখলেই তো চলবে না!

—কিন্তু মা, রূপের সঙ্গে যে সকলকার সব থাকবে, তা তো হতে পারে না।

—তা না হতে পারে। তবে একটা পরিচয়ের কামনা সকলেই করে। দু'টো হাই-ফ্যামিলির সঙ্গে নিকট না হোক, দূর কনেকসন আছে, লোকে দেখতে চায়।

—তা বটে! বলিয়া অনিল অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন—এই কল্পনাকেই ছাখো। রত্নার চেয়ে ওকে দেখতে ঢের নীরেস। যার চোখ আছে, সেই স্বীকার করবে! কিন্তু তা বললে কি হয়,—ওর বাপ ছিল স্যার—হাইকোর্টের জজ! ভাই ম্যাজিষ্ট্রেট! ওর পরিচয়ই আলাদা! জানা শোনা, মেলা-মেশা সে ওর ঢের বেশী! আমি রত্নাকে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মানলেও ইন্দ্রাণীর পার্টটা কল্পনাকে দেওয়াই উচিত বিবেচনা করলুম! তুমি কি বলো?

নীরস স্বরে অনিল কহিল—না, ও কিছু খারাপ পার্ট করেনি!

টেলিফোন বাজিল।

আরদালী আসিয়া জানাইল, চ্যাটার্জ্জি মিসিবাবা, হাকিম সাহেবকো সেলাম ভেজা।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অনিল, তুমি বলোগে অমিয় বাড়ী নেই।

অনিল গিয়া কল্পনাকে জানাইল,—দাদা প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

কল্পনা প্রশ্ন করিল,—কতক্ষণ?

অনিল উত্তর দিল,—ঠিক জানি না। ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখিনি।

—আচ্ছা। অনুগ্রহ করে রত্নাকে একবার ডেকে দিন্।

অনিল কহিল,—সে-ও নেই।

—সে কোথায় গেল? ঘুম থেকে উঠে তাকেও দেখেননি?

অনিল কহিল,—না! সে-ও দাদার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

বিদ্রূপের স্বরে কল্পনা উত্তর দিল—ওঃ! আচ্ছা, আপনি তাহলে এখন একা?

—না, মার সঙ্গে গল্প করছিলুম।

মাসীমা! আচ্ছা, তাঁকে বলবেন—আজ আমার যেতে দশ মিনিট লেট হবে। তিনি রাগ না করেন।

বেশ। আর কিছু বলবার আছে?

'না' বলিয়া কৌতুক কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—দেবরাজ, আসি তবে, বিদায়, নমস্কার।

সহাস্যে অনিল কহিল,—আশীর্ব্বাদ দিলাম ইন্দ্রাণি! যাত্রা হোক শুভ তব।

২০

সন্ধ্যার আসরে সকলে সম্মিলিত। বড় হল-ঘরে সভা বসিয়াছে। ঘর যেন গম্‌-গম্ করিতেছে। নাটকের আজ পূর্ব্বাভিনয়-রাত্রি! বিচারকের আসনে গোস্বামী সাহেব তাঁহার দুই অন্তরঙ্গকে লইয়া বসিয়াছেন! নাটকের দোষগুণ, ত্রুটি, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যোগ্যতার আজ পরীক্ষা।

অনিলের পরিচালিত যন্ত্রি-সঙ্ঘের একতান থামিল।

যবনিকা উত্তোলিত হইল। ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী বেশে কল্পনা ও অনিল রাজসভায় প্রবেশ করিলেন।

তাহাদের চিন্তা, কথা, সখীদের নাচগান একে একে শেষ হইল! গোস্বামী সাহেব তারিফ করিলেন,—কল্পনার পার্ট সুন্দর হয়েছে।

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন,—মিসেস্ গোস্বামী চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন।

এবার অপ্সরাদের নৃত্যগীত। মিষ্টার গোস্বামী সপ্রশংস নেত্রে পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—আমি যদি একটা থিয়েটারের ব্যবসা করতুম, তোমাকে ডিরেক্টর করতুম।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তাঁহার পরিচালনায় যে নাটক অভিনীত হইতেছে, তাহার মনোরম বৈশিষ্ট্য সকলের মনোহরণ করিতে পারিবে, এই উপলব্ধি গর্ব্বের মত তাঁহার অন্তরকে স্ফীত করিয়া তুলিতেছিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—'ষ্টেটসম্যানের' ফটোগ্রাফারকে এনে রাখবার ব্যবস্থা করেছি আমি।

মিষ্টার গোস্বামী হাসিলেন।

মিষ্টার বাকৃচি নিজের কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন,—বয়েস থাকলে আমিও এ অভিনয়ে যোগ দিতুম।

গোস্বামী সাহেব হাসিয়া উঠিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী সহাস্যে কহিলেন,—বেশ তো, আসুন না! আপনাকে বেছে একটা পার্ট আমি দিচ্ছি।

মিষ্টার গ্যাংলি কহিলেন,—অষ্টাবক্রের পার্ট যদি থাকে বাকৃচিকে দিন। আমি গ্যারাণ্টি, বাকৃচি সাক্‌সেসফুলি প্লে করবে।

আবার একটা হাসির তুফান উঠিল।

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন,—গ্যাংলি, তুমি আমার গাউট আর সায়েটিকা নিয়ে ঠাট্টা করছো! শীত পড়ার সঙ্গে রোগটা বেড়েছে, কিছু বলতে পাচ্ছি না। তবে অক্সফোর্ডে যখন পড়তুম, হ্যাঁ, নাচ তখন কিছু কিছু শিখেছিলুম বৈ-কি! ওদিকে সখ ছিল। মামার এ পক্ষে নেহাৎ ছেলে হোয়ে পড়লো। কে জানে, আদিম মামী ফস্ করে মরে যাবে, মামা পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার ভাগ্যবান হবেন! পুত্রমুখ দর্শন করবেন!

মিষ্টার গোস্বামী কহিলেন,—তার পর?

—তার পর চিঠিতে এই শুভ সংবাদ পেয়ে "পুনর্মূষিকো ভব"র মত নাক-কাণ বুজে পি, এইচ, ডি, পাশ করে ফিরতে হলো। অন্ন-চেষ্টা আছে তো!

গ্যাংলি কহিলেন,—তার পর সারাজীবন গরু ঠ্যাঙাচ্ছ!

—যা বলেছ! আজ-কাল আবার শুধু ছাত্র নয়! ছাত্রীরাও আক্রমণ করেন। বিশেষ এগজামিনের পর। সে কি ঘোরাঘুরি! জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তোলে।

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—না, সে রকমে আমি প্রশ্রয় দিই না।

গ্যাংলি কহিলেন,—অর্জ্জুনের পার্ট তো কুমিল্লার ভাগ্য-বিধাতা করবেন?

—হ্যাঁ, সব্যসাচীর পার্টে অমিকেই আমি বেশী পছন্দ করি।

সহাস্যে অমিয় কহিল—আমার কিন্তু বিশেষ আপত্তি ছিল। ও শাপ গাল খেতে আমি রাজি নই। তাকে মিথ্যা বুঝে কি নাস্তা-নাবুদই করলে, ওঃ, একেবারে টেরিব্‌ল্‌!

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তুমি পার্ট বদলে নাওনি কেন?

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—অমি মুখে যাই বলুক, অর্জ্জুনের পার্টেই ওকে মানায় ভালো। করেও চমৎকার। নাও, অমি উঠে পড়ো!

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন,—হ্যাঁ, প্রচণ্ড বিক্রমে স্বর্গপুরী আক্রমণ-কারী অসুরকে নিপাত করো। ভালো, আপনাদের ইন্দ্রাণী কিন্তু চমৎকার হয়েছে!

কল্পনার পানে স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—হ্যাঁ, এক জন ট্যালেণ্টেড্‌ এ্যাকট্রেশ! বলিয়া তিনি পরিচয় দিলেন,—ও আমাদের সুশীলের বোন।

—কে সুশীল? রায়পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সুশীল চ্যাটার্জ্জী? মিষ্টার বাকৃচি প্রশ্ন করিলেন।

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—হ্যাঁ! অমিয়র বিশেষ বন্ধু। আমাদের ছেলের মত।

গ্যাংলি কহিলেন,—মিস্‌ চাটার্জ্জিকে 'দেবযানী' প্লে করতে আমি দেখতে গিয়েছিলুম।

মৃদু হাস্যে কল্পনা উত্তর দিল,—হ্যাঁ! এম্পায়ারে আমরা শকুন্তলা অভিনয় করেছিলুম।

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন,—আমি তখন মুসোরিতে! কাগজে খুব সুখ্যাতি পড়েছিলুম বটে।

গ্যাংলি কহিলেন,—ও, সেই জন্যে আপনার অভিনয় এত ভালো হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের গ্রুপে আপনিই হচ্ছেন বেষ্ট।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—অনিলও ইন্দ্রের ভূমিকা বেশ করেছে।

হ্যাঁ, প্রশংসাযোগ্য বটে! আমি দেবযানীর গানের সুখ্যাতি করছি।

মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, চিত্রলেখার ভূমিকায় যাহারা নামিয়া ছিল, মিসেস্‌ গোস্বামী তাঁহার সেই ছাত্রীদের পরিচয় করিয়া দিলেন।

আবার ইন্দ্রের সভা। মন্ত্রণা-বৈঠক। ভরত মুনি। নারদ মুনি সব বসিয়াছেন। গভীর গবেষণা হইতেছে, পার্থ ধনুর্দ্ধরকে কেমন করিয়া কি ভাবে স্বর্গে অভিনন্দিত করা হইবে।

গ্যাংলি পুলকিত কণ্ঠে কহিলেন,—মিসেস্‌ গোস্বামীর পরিচালনা করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। আমার মনে হচ্ছে, যাকে যে পার্ট দিয়েছেন, সে যেন তার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আচ্ছা, উর্ব্বশী কাকে দেছেন?

—সে আমাদের জানা একটি মেয়ে।

মিষ্টার গোস্বামী সচকিতে কহিলেন,—কৈ? রত্না কোথায়? বলিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন, সকলের পিছনে দূরে একটা কোণে চুপ করিয়া রত্না বসিয়া আছে। কমল মুখে ক্ষুণ্ণতার অতি সূক্ষ্ম ছায়া যেন জড়াইয়া আছে।

মিষ্টার গোস্বামী স্নেহ কণ্ঠে ডাকিলেন,—রত্না লক্ষ্মী,—

মিসেস্‌ গোস্বামী স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন,—ও কি, রত্না, তুমি অত পিছনে বসেছো কেন? বলিয়া সহাস্যে স্বামীর বন্ধুদের পানে চাহিয়া কহিলেন,—ওর সবে এই হাতে-খড়ি!

মিষ্টার বাকচি কহিলেন,—এত-বড় একটি ভূমিকা দিচ্ছেন!

গোস্বামী সাহেব উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ, প্রথম হলেও রত্নার উপর মিসেস্‌ গোস্বামীর বিশ্বাস অনেকখানি। কথাগুলা অতি সাধারণ, কিন্তু তাঁহার উচ্চারণের প্রত্যেক শব্দে তিনি এমন জোর দিলেন যে, ইহা লইয়া কেহ আর প্রতিবাদ করিল না।

কল্পনা একেবারে অমিয়র পাশে নিজের আসন লইয়াছিল। কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া অমিয়র কাণে কহিল,—রত্নার সৌভাগ্য, মিষ্টার গোস্বামী অবধি তার তরফে আছেন।

ঈষৎ হাস্যে তেমনি মৃদু কণ্ঠে অমিয় উত্তর দিল,—হ্যাঁ, আমিও তাই কামনা করি!

অমিয় বা কল্পনার কোন বাণীই রত্নার কাণে পৌঁছাইল না। দূর হইতে নির্নিমেষ নয়নে সে শুধু উভয়কে দেখিতেছিল।

মিসেস্‌ গোস্বামীর আহ্বানে রত্না উঠিয়া মন্থর গতিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সকলের বিস্মিত দৃষ্টি নিপতিত হইল রত্নার উপর।

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, ফাল্গুনী তোমরা যে, যার জায়গায় গিয়ে বসো।

সভাসদ্‌ যে যার আসন গ্রহণ করিল। এবার উর্ব্বশীর নৃত্য আরম্ভ হইবে।

রত্না চাহিয়া দেখিল, কল্পনার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইল অনিল।

কল্পনার বাঁ দিক্‌কার আসন অধিকার করিয়া বসিল—অমিয়।

একতান আরম্ভ হইল। এবং তাহা থামিতেই ইন্দ্রাণী পার্থের পরিতোষের জন্য উর্ব্বশীকে নৃত্য করিতে আদেশ দিলেন।

কল্পনা রাজ্ঞী, রত্না তাহার সভা-নর্ত্তকী।

হঠাৎ রত্নার মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। নাক, কাণ দিয়া যেন প্রচণ্ড উত্তাপ বাহির হইতে লাগিল। কঠোর আয়াসে আত্মদমন করিয়া সে গান আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার কোকিল-কণ্ঠের সুমিষ্ট সুর কেবলই জড়িমা-যুক্ত হইতে লাগিল। সে স্বচ্ছ উচ্ছ্বাস-ধারা যেন উপলখণ্ডে প্রতিহত।

নৃত্যে রত্না ছন্দ হারাইল। তাল, লয় কেবলই কাটিতে লাগিল। দর্শকদের চোখে প্রতিপদে তাহার ত্রুটি সুস্পষ্ট হইতে লাগিল।

পার্থের আসনে বসিয়া অমিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে রত্নার পানে চাহিল। অনিল বিমূঢ়! মিসেস্‌ গোস্বামীর মুখ অন্ধকার! মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে বিদ্যুতের মত থমকিয়া থমকিয়া তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইতে লাগিল। কল্পনার ওষ্ঠপুটে হাসি।

ঘরে সকল প্রাণীর মুখেই পরিবর্ত্তনের রেখা। ভাবান্তর ঘটিল না শুধু মিষ্টার গোস্বামীর প্রশান্ত মুখে। স্নেহ-কোমল চক্ষেই তিনি রত্নার ভুলচুক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দৃষ্টি তাঁহার প্রসন্ন

উর্ব্বশীর নৃত্য শেষ হইতে মিসেস্ গোস্বামী ঘোষণা করিলেন,—পার্ট বদলাতে হবে।

সকলে উৎসুক নেত্রে মিসেস্ গোস্বামীর পানে চাহিল।

বাক্‌চি মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—এটা মেন্ পার্ট! এমন ফেলিয়োর! এক জন বেটারকে চাই!

মিসেস্ গোস্বামী আঁধার-মুখে কহিলেন,—হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছে! যাক, আমি শুধরে নেবো!

কৃত্রিম সহানুভূতি ঢালিয়া কল্পনা বিলাতী মেমের কণ্ঠ অনুকরণ করিয়া কহিল,—রত্নার বোধ হয় শরীর তেমন ভাল নেই। তাই আজ তেমন পারলো না। মাসিমা তো বলেন,—ও সকলের চেয়ে ভালোই করে।

অনিল উত্তর দিল,—মিথ্যে বলেন না।

লজ্জিত মুখে সঙ্কুচিত পদে রত্না যে সরিয়া গেল, অনিলের তাহা দৃষ্টি এড়াইল না। এতগুলা দৃষ্টির সম্মুখে এমন পরাভব হইলে মানুষ মরমে মরিয়া যায়! সে অনুভূতি অনিলের ছিল।

পিতার ন্যায় অমিয়ও নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিল। আজিকার অভিনয় রত্নার জন্য ব্যর্থ হইয়া গেল! এ যেন আঘাতের মত তাহার বুকে বাজিতে লাগিল।

মিসেস্ গোস্বামী ডাকিলেন,—কল্পনা—

সুমিষ্ট কণ্ঠে উত্তর হইল—মাসিমা—

—তোমার মাসিমার মেয়ে, না, কে, বলছিলে না—কি নাম তার?

কল্পনা কহিল,—পারুল মুখার্জ্জি! এ বছর বি-এ পাশ দেবে। বার-কয়েক সে পারফারমান্সে নেমেছে।

—তাকে চাই! কীর্ত্তন ইন্‌ষ্টিউটে। সে না গান করে—আমি নাম শুনেছি তার। বসন্ত-উৎসবে এম্পায়ারে নেমেছিল,—তাকে আনাতে পারবে?

হাসিয়া কল্পনা কহিল,—আপনি ডেকেছেন শুনলে সে ছুটে আসবে। আমায় তো সে দিনও বলছিল,—তোদের নাটকে আমায় একটা পার্ট দিলিনি!

—তবে তুমি আমার নাম করে তাকে ডাকো মা!

উৎসাহিত মুখে কল্পনা কহিল,—আপনি যদি বলেন, আমি এখনি আপনার নাম করে তাকে ফোন করতে পারি।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তাই করো।

গ্যাংলি কহিলেন,—আপনি কি মনে করেন, একটা দিনের মধ্যে মিস্ মুখার্জ্জি তাঁর ভূমিকা তৈরী করে নিতে পারবেন?

—নাও যদি পারে—তবু এ উর্ব্বশীর চেয়ে ভালো হবে। আমি চেহারার দিকে চেয়েই উর্ব্বশী নির্ব্বাচন করেছিলুম।

অমিয় প্রশ্ন করিল,—উর্ব্বশীর ভূমিকা থেকে রত্নাকে তুমি ক্যান্‌সেল করলে?

দৃঢ় কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,- নিশ্চয়।

অমিয় নীরব রহিল।

অনিল কহিল,—একটা দিন মোটে মিস্ মুখার্জ্জি পাচ্ছেন, যদি তিনি ফেলিয়োর হন? তার চেয়ে রত্না খানিকটা তৈরী করেছে—ক'দিন তো করছে।

মিসেস্ গোস্বামী মাথা নাড়িলেন। কহিলেন,—তোমরা এখনও সে আশা করো! কিন্তু আমি রাখি না। এই ক'জন নতুন লোকের সামনে ওর যদি এই হয়, তাহলে সে-দিন অত লোকের সামনে কি হবে না, বলতে পারো?

কল্পনা কহিল,—সে একটা ভাবনার কথা।

—তুমি বলতো মা! বলিয়া তিনি কল্পনার পানে চাহিলেন। কহিলেন,—তোমাদের এ সব অভ্যাস আছে। রত্নার তো তা নয়। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে! এটুকু এরা বোঝে না!

অনিল প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—তবু তো একটা দিক্ নিখুঁত হবে, উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য!

বাক্‌চি অনিলের দিকে চাহিলেন,—এটা বিউটী একজিবিসন হচ্ছে? না, আর্টের বিচার? আচ্ছা, মিসেস্ গোস্বামী, আপনার সেট থেকে কাউকে উর্ব্বশী করুন না! তার পার্ট ওই মেয়েটিকে দিন! একটু অদল-বদল!

মিসেস্ গোস্বামী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিলেন,—তাই করি। কিন্তু কল্পনা, তুমি মা তোমার পারুল বোনটিকে ফোন করো। কি বলো অমিয়? কথাটা বলিয়া পুত্রের সমর্থন লইতে গিয়া দেখিলেন, নির্ব্বিকার চিত্তে চেয়ারে হেলিয়া উর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া অমিয় গৃহের শিলিংএর কারুকার্য্য দেখিতে অকস্মাৎ মনোযোগী হইয়াছে।

ব্যঙ্গ হাস্যে কল্পনা কহিল,—মিষ্টার গোস্বামী হঠাৎ এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা আয়ত্ত করতে চাইছেন না কি?

অমিয় মুখ ফিরাইল। কহিল,—ক্ষতি কি? মনটা সব সময় একটা কাজে জুড়ে রাখলে অন্ততঃ পাশের লোকগুলো একটু অব্যাহতি পায়।

কল্পনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

নারী

বাহিরে তোমারে যতখানি খাটো করি,
অন্তরে তুমি ততখানি বড় হও!
কণ্ঠ তোমার যত চেপে-চেপে ধরি,
লেখনীর মুখে তত তুমি কথা কও!

ছোট করিবার ছলে ছোট হয়ে নিজে
ব্যর্থপ্রয়াসে মোরা যত উঠি রেগে,—
তব গরিমার সোনার মুকুটখানি
উজ্জ্বল রাগে শির তোলে কালো মেঘে!

হে নারি, তোমারে মলিন করার লোভে
এনেছিনু যত পথের ধূলা ও বালি—
এক কণা তার লাগিল না তব দেহে,
মোরা শুধু গায়ে মাখিলাম মিছে কালি!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাঞ্চুরিয়া

এশিয়া-ভূখণ্ডে আজ রণচণ্ডীর যে এই মত্ত তাণ্ডব, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধকে উপলক্ষ করিয়াই এ তাণ্ডবের সূচনা! আগুন তখন প্রকাশ্যে তেমন না জ্বলিলেও আক্রোশের বহ্নি-ধূম মনে-মনে পুঞ্জিত হইতেছিল! বাহিরে সে-আগুন একেবারে প্রকাশ পায় নাই, এমন নয়! একটি সংগ্রামে উভয় পক্ষে তখন এক লক্ষ সৈন্যেরও সমাবেশ হইয়াছিল; এবং সে-যুদ্ধে প্রায় আঠারো হাজার জাপানী হতাহত হয়।

এ সব বিরোধ-সংঘর্ষে তখন পৃথিবীর টনক নড়ে নাই। তার কারণ, জাপান এবং রাশিয়ার কোনো পক্ষেই রণ-মত্ততার তেমন হুঙ্কার-টঙ্কার ছিল না এবং এ বিরোধ ঘটিয়াছিল সুদূর মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে।

তার পর মাঞ্চুরিয়ার নাম নিখিলের চিত্ত-পটে সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিল। তখন সকলে বুঝিল, মাঞ্চুরিয়া লইয়া উভয় পক্ষের সংঘর্ষ সুনিশ্চিত। টোকিয়ো হইতে রাশিয়ার ভ্লাডিভষ্টক পৌঁছিতে বিমান-পথে সময় লাগে তিন ঘণ্টা। ভ্লাডিভষ্টক-দুর্গ সুরক্ষিত এবং তার পিছনে সোভিয়েট-ফৌজের প্রবল শক্তি উদ্যত, এ জন্য জাপানের মনে সব-সময়েই ভীষণ আতঙ্ক! এ আতঙ্ক দূর করিতে না পারিলে জাপান বুঝিতেছিল, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে তার স্বস্তির আশা নাই! ঐ ভ্লাডিভষ্টক হইতে যে-কোনো মুহূর্ত্তে মার্কিণ বমার আসিয়া জাপানকে বিধ্বস্ত করিতে পারে, মার্কিণ-ফৌজও মাঞ্চুরিয়ায় জড়ো হইতে পারে জাপানের ধ্বংস-সাধনকল্পে!

ভ্লাডিভষ্টকের আতঙ্ক দূর করিতে জাপানকে মাঞ্চুরিয়া লইতেই হইবে। মাঞ্চুরিয়া হস্তগত হইলে ভ্লাডিভষ্টকের পিছনে যে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান্ রেলোয়ে-লাইন, সে লাইন চূর্ণ করিয়া য়ুরোপীয়-রাশিয়া হইতে এশিয়াটিক-রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাকে অনেকখানি দুর্ব্বল করা যাইবে—এই উদ্দেশ্য লইয়া জাপানের কোয়ানতাং ফৌজকে নেপথ্যে মাঞ্চুরিয়া-বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করিতে জাপানের ত্রুটি ছিল না।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাঞ্চলে প্রথম যে কয়টি যুদ্ধ হয়—জলে এবং অন্তরীক্ষে—সে সব যুদ্ধে জাপান হইতে ফৌজের পর ফৌজ আসিয়াছে—মাঞ্চুরিয়া হইতে আসে নাই।

কোয়ানতাং ফৌজ আসে নাই—সে ফৌজ ছিল স্বতন্ত্র। জাপানের কোয়ানতাং ফৌজ—যাহাকে বলে একেবারে বাছাই-করা দল। তাদের অস্ত্রশস্ত্রাদিও একেবারে সর্ব্বোত্তম শ্রেণীর। তার উপর এই কোয়ানতাং ফৌজ শুধু সামরিক কলা-কৌশলেই অভিজ্ঞ নয়; তাদের রাজনৈতিক কুশলতাও অনন্যসাধারণ। কোয়ানতাং ফৌজ শুধু যে আজ মাঞ্চুরিয়া শাসন করিতেছে তা নয়, টোকিও গভর্ণমেণ্টে আজ তারাই সর্ব্বেসর্ব্বা।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হিডেকি টোজো এই কোয়ানতাং ফৌজ-দলভুক্ত। তাঁর সচিব ও পরামর্শদাতারাও কোয়ানতাং ফৌজ দলে পদস্থ কর্ম্মচারী। ইঁহারাই আজ জাপানের রাজনীতি পরিচালনা করিতেছেন। জাপানের কোনো ব্যাপারে জন-সাধারণের কোনো অধিকার বা শক্তি নাই। সামরিক দল লইয়াই জাপানের ক্যাবিনেট

মাঞ্চুরিয়া

বা মন্ত্রিসভা সংগঠিত। জাপানের যিনি সর্ব্বময় সম্রাট্, তিনি নামেই সম্রাট্! আসলে তিনি শুধু এই সামরিক দলের রবার-ষ্ট্যাম্প বা শীলমোহর!

প্রাচ্য জগতে জাপান যে এই বিরাট্ ধ্বংস-যুদ্ধ ফাঁদিয়াছে, সে যুদ্ধের ব্যবস্থাপকও ঐ কোয়ানতাং ফৌজ।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান-গভর্ণমেণ্টের সম্মতি না লইয়া গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোয়ানতাং দলের তরুণ কর্ম্মচারীরা মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে; চীনের অধিকার হইতে মাঞ্চুরিয়াকে জাপান কাড়িয়া লয়; কাড়িয়া মাঞ্চুরিয়া নাম কাটিয়া নূতন নাম-করণ করে মাঞ্চুকুয়ো।

মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া এখানে তারা সামরিক ঘাঁটী নির্ম্মাণে উদ্যত হয়, সোভিয়েটকে এ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে।

এ কাজে জাপান এখনো বিলম্ব করিতেছে কেন? বিলম্বের কারণ, কোয়ানতাং দল এখন বুঝিয়াছে, সোভিয়েট-শক্তি সামান্য নয়। এই জন্যই তারা স্থির করে, দক্ষিণ-এশিয়া সুরক্ষিত নয়; দক্ষিণ-এশিয়াকে পূর্ব্বে অধিকার করা চাই; তার পর হিটলার-কর্ত্তৃক রাশিয়া কতখানি খর্ব্ব হয়, জাপান তাহা দেখিবে। হিটলারের হাতে রাশিয়া খানিকটা হতবল হইলে তখন ইঙ্গীজের অজস্র তৈল ও খনির জোরে প্রচুর সামর্থ্য লাভ করিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিবে—ইহাই জাপানের অভিপ্রায়। জাপানের সে অভিপ্রায় কিয়দংশে সিদ্ধ হইয়াছে। মালয় এবং ইঙ্গীজ প্রদেশের ধাতু ও রাসায়নিক সম্পদ-সম্ভার আজ জাপানী ফ্যাক্টরিসমূহে ভারে-ভারে আসিয়া জমিতেছে এবং তাহা দিয়া অজস্র-ভাবে প্লেন, ট্যাঙ্ক, গুলীগোলা, বারুদ তৈয়ারী হইতেছে। জাপানের হাতে এখন এত লৌহ ও তৈলখনি যে, তাহার জোরে জাপান বহু বৎসর যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ হইবে!

এ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সূচনা-কালে উইলার্ড প্রাইস্ নামে এক জন মার্কিণ সুধী মাঞ্চুরিয়া-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। মুকদেনে এক দস্যু-সর্দ্দারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এ সর্দ্দারের বাস মাঞ্চুরিয়ায়। আমেরিকায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। আইনের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় ফিরিয়া তিনি আইনের ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু পশার হইল না বলিয়া পয়সার জন্য ডাকাতের দল খুলিয়া সে-দলের তিনি সর্দ্দার হন। তাঁর দৌরাত্ম্যে গবর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁকে ভালো চাকরি দিয়া বশীভূত করিয়াছে।

প্রাইস সাহেবকে সে ভদ্রলোক মাঞ্চুরিয়ার যে ইতিবৃত্ত শুনাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম যেমন বিচিত্র তেমনি মনোরম।

খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব হইতেই মাঞ্চুরিয়ার বুকে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। তার পর ৯০৭ খৃষ্টাব্দে খিতান জাতি আসিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে। খিতান-জাতি উত্তর-চীনে

চীনা বাজির দোকান—মুকদেন
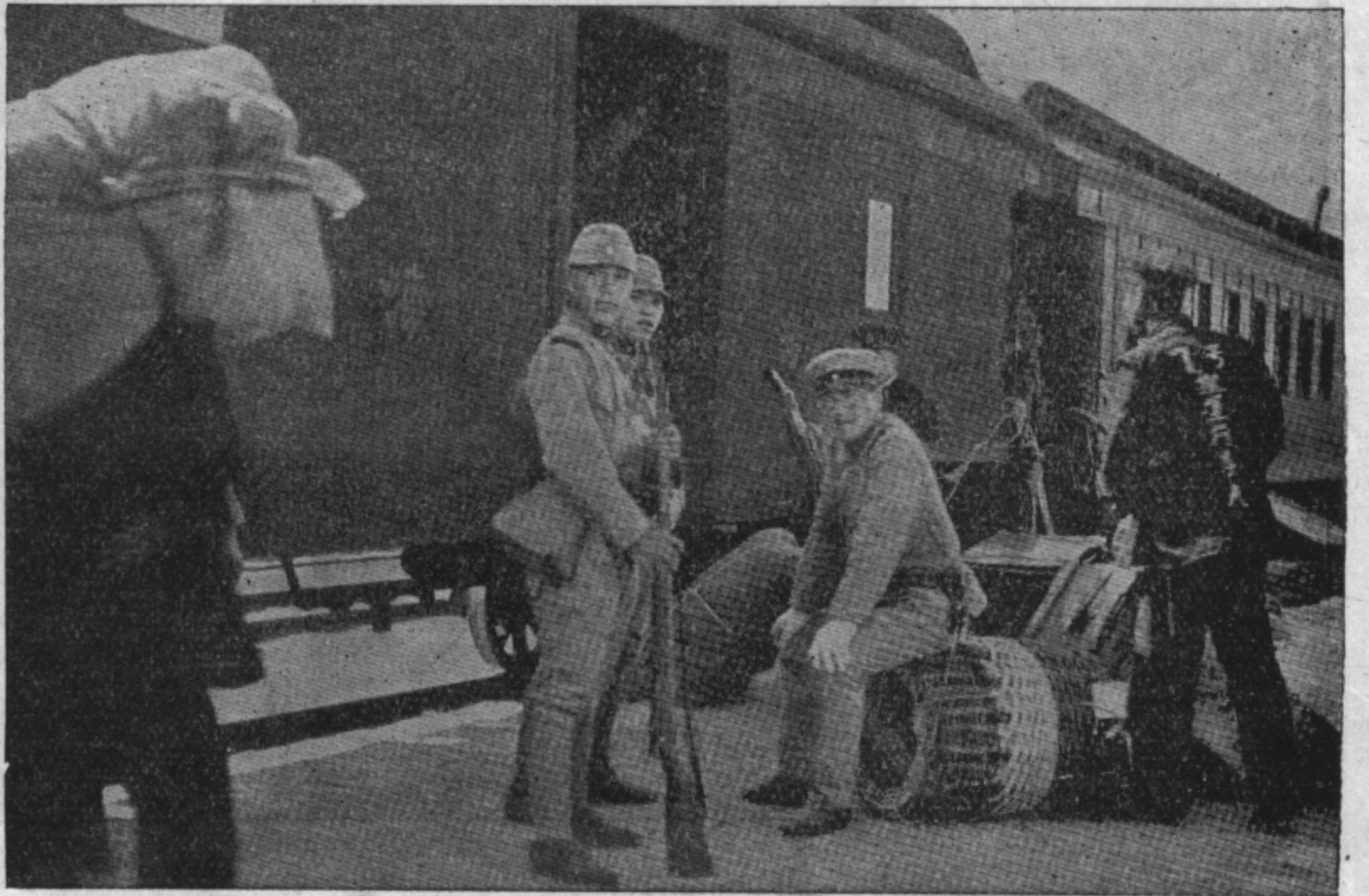
জাপানী ফৌজ চলিয়াছে দস্যু-দলনে—মুকদেন রেল-ষ্টেশন

রাজ্য এবং রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। ১১১৫ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ার সামরিক জুটিন জাতি খিতান বংশের উচ্ছেদ করিয়া মাঞ্চুরিয়ার স্বর্ণ-বংশ (Golden Dynasty) প্রতিষ্ঠা করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিশ খান্ আসিয়া চীন আক্রমণ করে এবং তাহার হাতে স্বর্ণ-বংশের বিলোপ সংসাধিত হয়। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে নুর হাচু নামে এক দুর্দ্ধর্ষ বীর আসিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করেন।

মাঞ্চুরিয়া অধিকারের পর তিনি চীনের সিংহাসন লাভে অভিলাষী হন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বীর নুর হাচুর পৌত্র বসেন চীন সম্রাট্ হইয়া চীনের সিংহাসনে। তিনিই মাঞ্চুরিয়ার আধুনিক মাঞ্চু-বংশের আদিপুরুষ।

হার্বিন রেলোয়ে-ষ্টেশন

কাগজের ঘোড়া-গরু—চিনচৌয়ের মাঞ্চুরা মৃতদেহের সঙ্গে চিতাগ্নিতে জ্বালায়

ও-দিকে রাশিয়া তখন সাইবেরিয়া গ্রাস করিতেছিল। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে আসিয়া রাশিয়া দেখিল, বরফে সব জমিয়া আছে! সাগর-কূলে বন্দরের সন্ধানে অগ্রসর হইয়া তারা শেষে মাঞ্চুরিয়ায় আসিয়া পৌছিল।

মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানেরও ক্রমে লক্ষ্য পড়িল। এত কাছে শক্তিমান্ রাশিয়া আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছে, ইহাতে জাপানের অমঙ্গল ঘটিতে পারে ভাবিয়া জাপানের অশান্তি এবং অস্বস্তির সীমা ছিল না। সে অস্বস্তি মোচনের জন্য ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া-গ্রহণের উদ্দেশ্যে জাপান যুদ্ধে নামিল। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না; তবু জাপান বিরাম মানিল না। ১৯০৪-৫ এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নবোদ্যমে আবার মাঞ্চুরিয়া অভিযানের উদ্যোগ চলিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপানী অভিযান সফল হইল—মাঞ্চুরিয়া গেল জাপানের হাতে।

মাঞ্চু-সর্দ্দার ভদ্রলোকটি বলেন, মাঞ্চুরিয়া আজ জাপানের অধিকারে সত্য—কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, কোনো বিজয়ী পক্ষই দীর্ঘ কাল মাঞ্চুরিয়া ভোগ করিতে পারে নাই। ফুট-বলের মতো মাঞ্চুরিয়াকে লইয়া জাপান, চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধ-ক্রীড়ার বিরাম কোনো দিন ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না!

অবিরাম এই যুদ্ধ-বিরোধ-বিগ্রহের ফলে মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসীদের প্রকৃতি চিরদিন চঞ্চল রহিয়া গিয়াছে—তারা শ্রমশিল্পে বিমুখ; মতি-স্থৈর্য্যও তাহাদের অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। মাঞ্চু জাতির প্রকৃতিতে দস্যুর উদ্দামতা তাই খুব বেশী লক্ষিত হয়।

লেখক বলিতেছেন, মাঞ্চুরিয়ায় যত দস্যুর বাস, পৃথিবীর আর কোনো প্রদেশে এমন নয়! এ দস্যুতার উচ্ছেদকল্পে জাপানী গবর্ণমেণ্ট প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে—তবু সে চেষ্টা সফল হইতেছে না। এ-অঞ্চলে যদি দস্যুতা ঘুচিল তো ও-অঞ্চলে তার প্রাদুর্ভাব! ঢাকা দিলে ফুটন্ত জলকে যেমন স্থির রাখা যায় না, মাঞ্চু জাতির উদ্দাম প্রকৃতিকেও তেমনি কাহারো সাধ্য নাই, স্থির বা শান্ত রাখিবে!

মাঞ্চুরিয়ার কৃষকের দল ক্ষেত-খামার বা ফশল সম্বন্ধে কখনো নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। তাদের বিশ্বাস, ফশল যেমন ফলিবে, তখনি হয় ডাকাতে তাহা লুটিয়া লইয়া যাইবে, নয়তো যুদ্ধ-বিগ্রহে ক্ষেত হইবে কুরুক্ষেত্র এবং সমস্ত ফশল হইবে নষ্ট! এ জন্য কাজে তাদের নিষ্ঠার অভাব। সুযোগ পাইলে তারা দস্যুবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। চাষের কাজে মনোযোগী না হইয়া তারা তাই দস্যুদল গড়িয়া জীবিকার্জ্জনে মত্ত থাকে। যারা বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, তারাও দস্যুদলের সর্দ্দারী করিয়া জীবনাতিপাত করিতেছে। এক-এক দলে ডাকাতের সংখ্যা ২৫০০।৩০০০

দস্যু-দলনী-ফৌজ-বাহী ট্রেণ—এ-ট্রেণ ছদ্মবেশে পথ চলে

দস্যুদের মাঞ্চুরা বলে হুঙ্-হুংজু (Red Beards)। এখানকার আদিযুগের দস্যুরা না কি জাতে ছিল মাঞ্চুরিয়াবাসী কশাক; তাহারি জন্য ও-নামের সৃষ্টি। অনেকে বলেন, তা নয়! মুখে লাল দাড়ি আঁটিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হয় বলিয়াই এ-নামের উৎপত্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনের শান-চুঙ এবং চিহলি হইতে বহু চীনা মাঞ্চুরিয়ায় বাস করিতে আসে। দস্যুতা ছিল সে সব চীনার জীবিকার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন।

জাপানী শাসনের কঠিন চাপে দস্যুরা আজ প্রকাশ্য ভাবে ডাকাতি করিতে পারিতেছে না। তাই তারা পীপলস্ রেভলিউ-সনারি আর্ম্মি; ন্যাশন্যাল স্যালভেশন আর্ম্মি; কোরিয়ান ন্যাশন্যাল আর্ম্মি
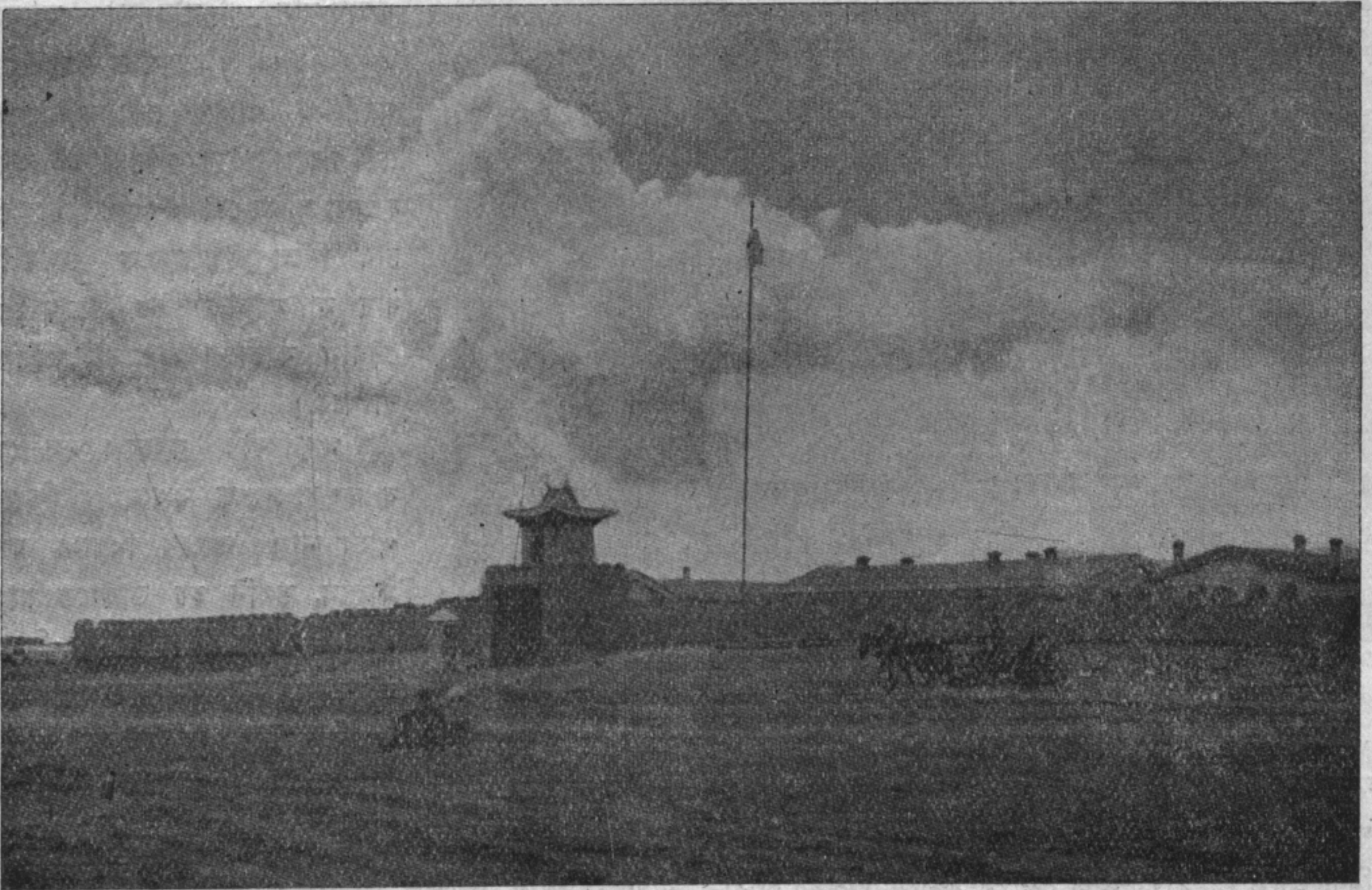
মোঙ্গোল-ফৌজের কেল্লা—হাইলার
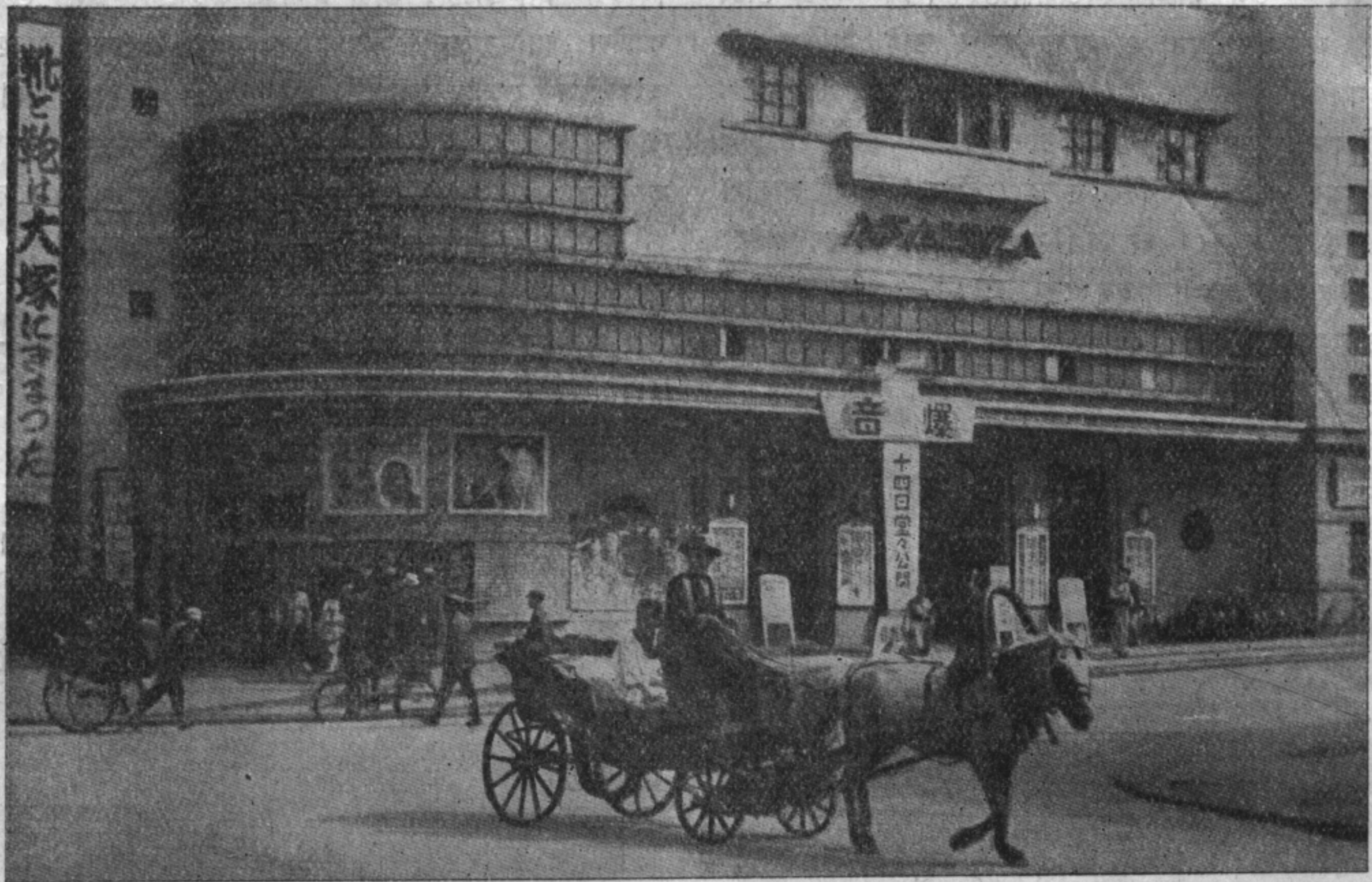
জাপানী টকি-হাউস—শিংকিং। এখানে শুধু চীনা ও জাপানী-ফিল্ম দেখানো হয়—মার্কিন-ফিল্ম নিষিদ্ধ

—এই সব নাম লইয়াছে এবং দস্যুতাকে বলিতেছে স্বাধীনতা-লাভের জন্য সংগ্রাম! দলের নাম যাহাই দিক, তাদের আসল কাজ দস্যুতা। আচারে-ব্যবহারে পশুর মত ইহারা নির্ম্মম নৃশংস। আজ জাপানী শাসনেও মাঞ্চুরিয়ায় পথিকের পক্ষে একাকী পথ চলা মোটে নিরাপদ নয়; প্রাণ হাতে লইয়া পথ চলিতে হয়। যেখানে পথ মাঠ বা জলার মধ্য দিয়া গিয়াছে, সে সব পথে দস্যুরা সব সময়ে ওৎ পাতিয়া আছে! পথিকের কাছ হইতে যাহা পায় তাহাই লুঠ করিবে। মাঞ্চুরিয়ায় এক-রকম ফশল হয়, তার নাম কাওলিয়াং। এই কাওলিয়াং মাথায় বাড়িয়া দশ-বারো হাত উঁচু হয়। কাজেই মাঠের কাওলিয়াং-ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকা

মরু-ফৌজদলের মোঙ্গোল অশ্বারোহী

মোটে কঠিন নয়। জুন মাসে কাওলিয়াঙের ফশল অজস্র ভাবে বাড়িয়া ওঠে। জুন মাসে খুন ও লুঠের বহরও তাই বাড়িয়া ওঠে অসাধারণ রকম।

যারা বুদ্ধিমান, তাদের ডাকাতিতে বেশ একটু চাতুর্য্য আছে। পথিকের সঙ্গে অমায়িক ভাবে মিশিয়া তারা আলাপ করে; তার পর তাকে করে চায়ের নিমন্ত্রণ। সে নিমন্ত্রণ লইয়া পথিক যদি ডাকাতের সহগামী হয় তো বহু অলি-গলি ঘুরাইয়া তাকে আড্ডায় আনা হয়। সেখানে গল্প-গুজব, চা-পান এবং আলাপ-পরিচয় চলে। আলাপ-পরিচয়ে আসর বেশ জমিয়া ওঠে। জমিবামাত্র রুদ্র শাসনে সহসা আদেশ জারি হয়,—বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দাও—এত অর্থ চাই। এখনি! নহিলে তোমার বাড়ী ফেরা ঘটিবে না, শমন-সদনে গমন!

সাউথ-মাঞ্চুরিয়ান রেলে ট্রেণের কামরায় জাপানী যাত্রী—ট্রেণ-পরিচারিকার কাজ করে রুশ-রমণী

চিঠির উত্তরে টাকা যদি আসে তো পথিক পায় মুক্তি, নয় তাকে হত্যা করে।

লেখক লিখিতেছেন, আমি এক দিন খুব রক্ষা পাইয়াছিলাম! চাংচুঙ সহরের বাহিরে ই-তুঙ-সিয়েন গ্রাম। সেই গ্রামে যাইতেছিলাম। চাংচুঙ হইতে ই-তুঙ-সিয়েন ৩০ মাইল মাত্র দূরে। আমি চলিয়াছিলাম গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া। গ্রামে পৌঁছিয়া শুনিলাম, আগের দিনে সে পথ হইতে বহু যাত্রীকে ডাকাতরা ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমার বিপদ না ঘটিবার কারণ, ডাকাতরা সে-দিন কোথায় একখানা গ্রাম লুঠিতে গিয়াছিল। আমি যে-দিন গ্রামে পৌঁছিলাম, তার পরের দিন শুনিলাম, ডাকাত ধরিবার জন্য এক দল মাঞ্চুরিয়ান ফৌজ পাঠানো হইয়াছে। বৈকালে শুনিলাম, ফৌজ ফিরিয়া আসিয়াছে; তারা না কি আঠারো জন ডাকাতের মুণ্ড কাটিয়া আনিয়াছে! আদালতে তাদের আনা হইয়াছে। শুনিয়া আদালতে গেলাম ডাকাত দেখিতে। আদালতে চীনা ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁর পাশে এক জন জাপানী মন্ত্রী। মন্ত্রী বসিয়াছেন বিচার পরিদর্শন করিতে। টেবিলের উপর ১৮টি নরমুণ্ড। সম্মুখে এক দল সেনা।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রশ্ন করিলেন,—এগুলি ডাকাতদের শির?

ফৌজের ক্যাপটেন বলিল—হাঁ হুজুর।

জাপানী মন্ত্রীর পানে চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—আমাদের সাহসী সেনাদল আঠারো জনের মুণ্ড কাটিয়াছে। বাকী ডাকাতগুলা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।

জাপানী মন্ত্রীর এ কথা বিশ্বাস হইল না। তিনি তখন প্রশ্ন করিলেন ক্যাপটেনকে—ঠিক কথা বলিতেছ? এগুলা ডাকাতের মুণ্ড? গ্রামের মোড়লদের মুণ্ড নয়?
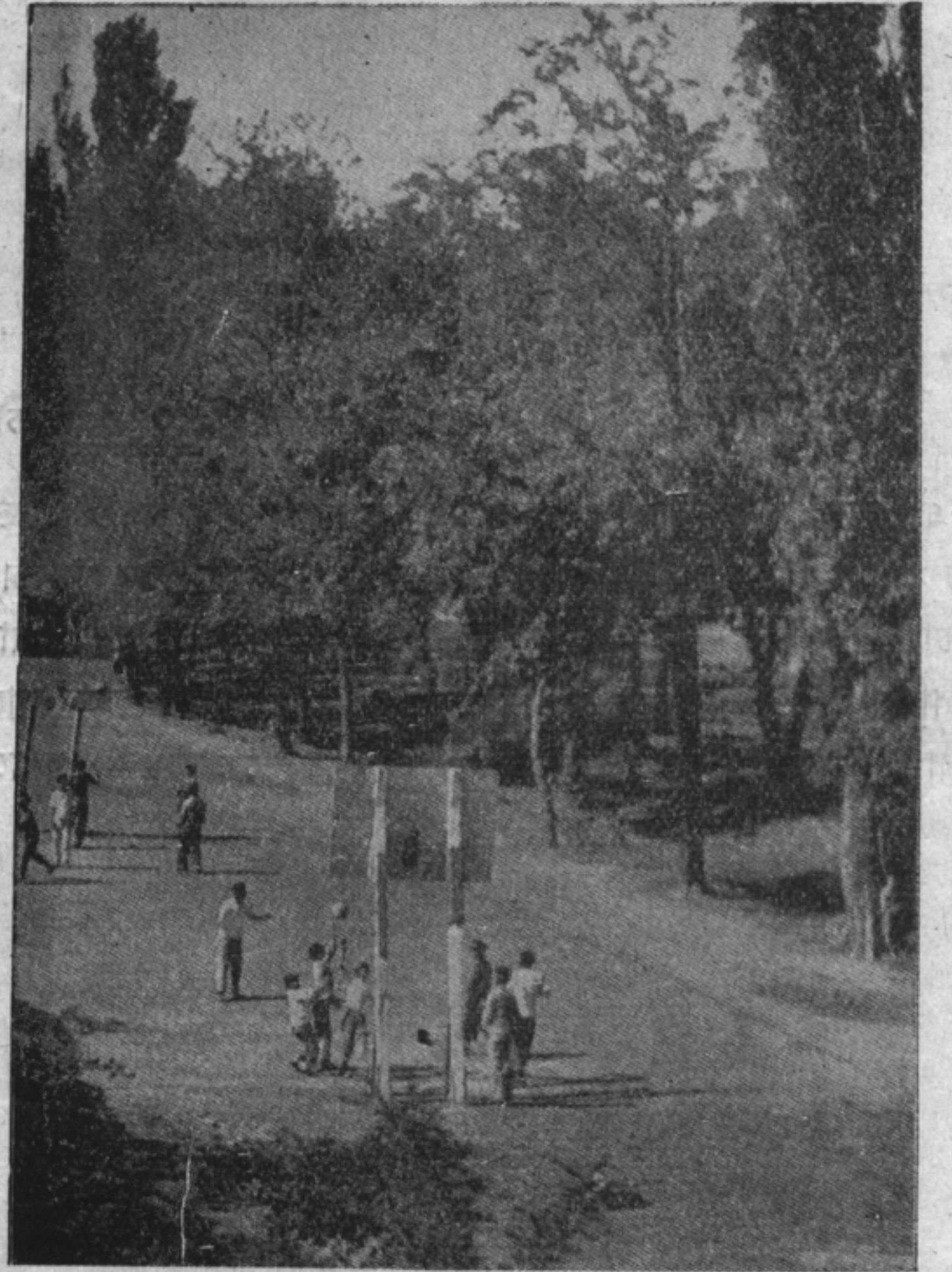
বেশ-বল্ খেলার গ্রাউণ্ড—দাইরেন্

ক্যাপটেন বলিল—না হুজুর।

জাপানী প্রশ্ন করিলেন—তোমাদের মধ্যে ক'জন মারা গিয়াছে?

—এক জনও না।

জাপানী বলিলেন—তোমাদের গায়ে সামান্য চোটও নাই, অথচ আঠারো জন ডাকাতের শির কাটিয়াছ! ভয়ঙ্কর বীরত্ব! তোমাদের কামান-বন্দুক ছিল?

ক্যাপটেন বলিল—ছিল। দশটি কামান ছিল। তাছাড়া বন্দুক ছিল।

জাপানী। সে কামান-বন্দুক কৈ?

ক্যাপটেন। গুলীগোলা ফুরাইলে কামান-বন্দুক রাখিয়া দিই—দিয়া ছুরি হাতে আক্রমণ করিয়াছিলাম।

জাপানী প্রশ্ন করিলেন—ছুরি কৈ, দেখি?

ক্যাপটেন বলিল—ছুরি সঙ্গে আনি নাই হুজুর !

জাপানী বলিলেন—মিথ্যাবাদী ! ডাকাত মারিবে কি, তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র তারা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ! লজ্জা ঢাকিতে তোমরা গ্রামের নিরীহ লোক মারিয়া তাদের শির আনিয়াছ ! যাও সব ব্যারাকে। সামরিক আদালতে তোমাদের বিচার হইবে !

জাপানী মন্ত্রীটি পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আমাদের অসুবিধা কত, দেখিতেছেন তো ! আমরা চাই এখানকার জন-সাধারণের কল্যাণ ! কিন্তু ইহারা পণ করিয়াছে, আমাদের সহযোগিতা করিবে না।

কথাটা সত্য। কারণ, যে সব চীনা বা মাঞ্চু কর্ম্মচারী আছে, তারা জাপানী গবর্ণমেণ্টের বেতন খাইলেও পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাছাড়া এই সব মাঞ্চু ডাকাত জাপানের বশ্যতা মানিতে চায় না। তারা জাপানের শত্রু। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে চীনা বা মাঞ্চু কর্ম্মচারীরা অঙ্গুলি তুলিবে না ! এই সব ডাকাত এখন যে লুঠপাট করে, সে লুঠপাটের উদ্দেশ্য টাকা এবং অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে ! এ-সব ডাকাত নিজেদের এখন ভলাণ্টিয়ার বলিয়া পরিচয় দেয়।

আইনজ্ঞ দস্যু-সর্দ্দার

কাজেই জাপান যদি রাশিয়া আক্রমণ করিতে চায়, তাহা হইলে মাঞ্চুরিয়ান্ বা চীনাদের কাছ হইতে তিলমাত্র সাহায্য পাইবে না। মাঞ্চুরা জাপানের বিরুদ্ধাচরণ করিবেই। জাপানীরা তাহা ভালো করিয়া জানে। তাই তারা এখানকার লোকদের বলে, বেইমান ! অকৃতজ্ঞ ! মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীরা ভালো পথ-ঘাট রেল-লাইন প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া দিয়াছে ; কৃষির উন্নতি করিতেছে ; শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতেছে ; এত সব উপকারের জন্য ইহাদের এতটুকু কৃতজ্ঞতা নাই !

এ প্রসঙ্গে লেখকের সহিত এক জন চীনা কর্ম্মচারীর আলোচনা হইয়াছিল। চীনা কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন,—জাপানের কত দরদ আমাদের উপর ! ক্ষেতে ফশলের প্রাচুর্য্য—সে সব যায় জাপানীর ভোগে ! খনি খুলিতেছে—তার সম্পদ্ যায় জাপানে ! যাহা কিছু হোক্, খাটিয়া মরিব আমরা, আর তার ফল খাইবে জাপানী ! আমাদের ভালো করিবার জন্য কি দরদ !

জাপান মাঞ্চুরিয়ায় পাইয়াছে কুবেরের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার। মাঞ্চুরিয়ার জন-সংখ্যা ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ। ইহার মধ্যে কোরিয়ান, মোঙ্গোল, মাঞ্চু, রুশ এবং জাপানীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ ; বাকী চীনা। ইহাদের দাস্যে নিযুক্ত করিয়া জাপান এখানে আজ কুবের-ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছে। মাঞ্চুরিয়া খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ। সে সব খনিতে খাটিয়া মরিতেছে চীনা ও মাঞ্চুরা ! আর খনির লভ্যাংশ যাইতেছে জাপানী-জঠরে ! মাঞ্চুরিয়ায় কয়লা মেলে সীমাহীন ভাবে। ফুশুনের কয়লা-খনি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিরাট্। তেমনি এখানে প্রচুর লৌহ আছে। তাছাড়া ম্যাগনেসাইট, শিলাজতু, বেলে পাথরও অজস্র পরিমাণে মিলিতেছে। এ-সবের জোরে জাপানের কল-কারখানা, তোপখানা আজ একেবারে সমৃদ্ধি-ভারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মাঞ্চুরিয়ায় বড় বড় বন আছে—সেখানে কাঠ মেলে বিপুল ভাবে ; এবং বেশ দামী ও ভালো কাঠ। পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়গুলি যেন খনিজ সম্পদের এক একটি তোষাখানা। তাছাড়া এখানে জমির উর্ব্বরতাও সীমাহীন।
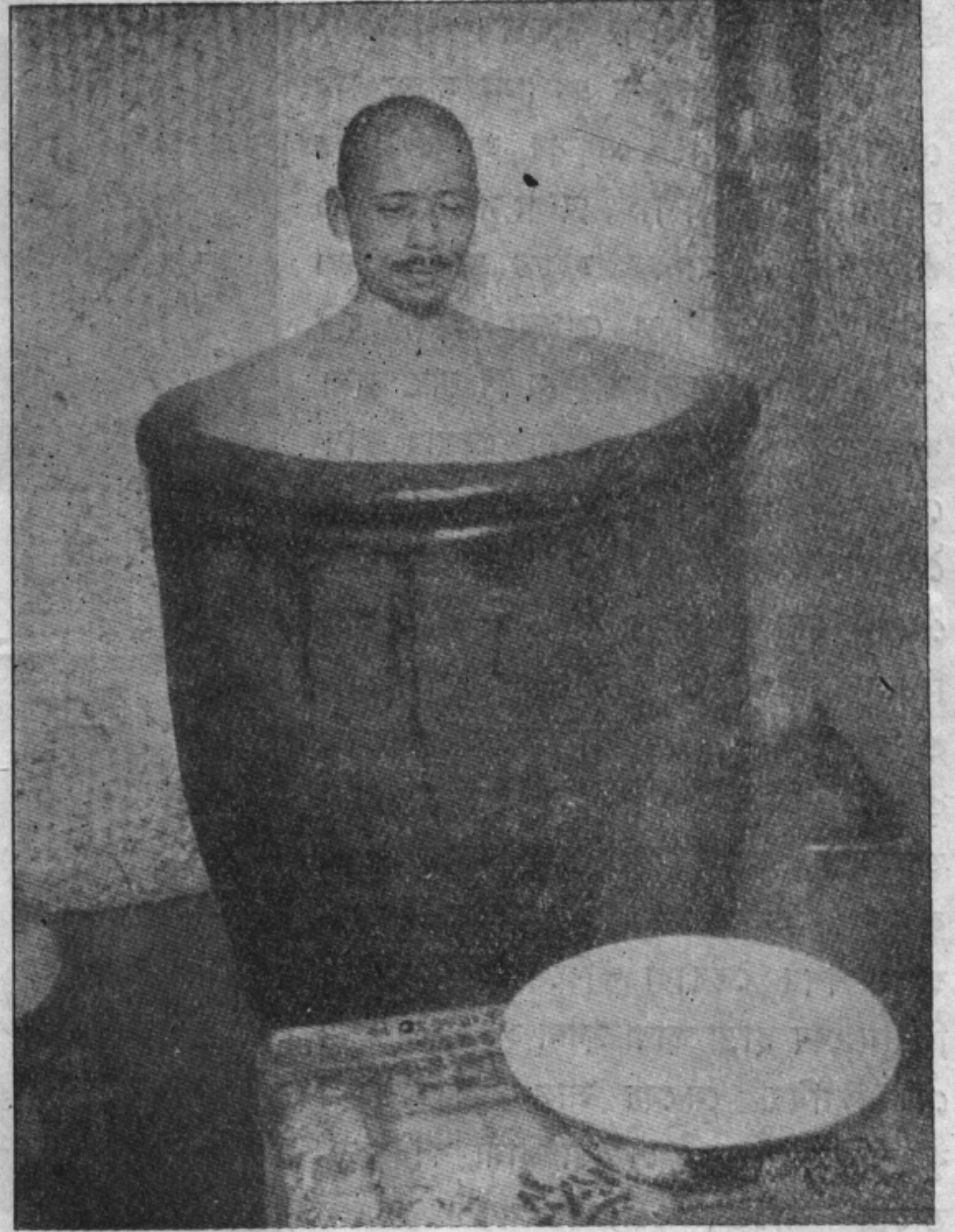
জাপানী সেনার গরম-জলে স্নান

মাঞ্চুরিয়ার বুক চিরিয়া লিয়া-ও নদী বহিয়া চলিয়াছে—এই নদীর স্নেহস্পর্শে এমন উর্ব্বরতা। শীতের সময় নদীর বুক বরফে ভরিয়া থাকে—'স্লেজ' গাড়ীতে করিয়া পারাপার ও মাল-চালানীর কাজ চলে।

মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া জাপানী কৃষি-জীবীদের আনিয়া এখানকার মাটীতে সোনা ফলাইবে, ইহাই ছিল জাপানের উদ্দেশ্য। কিন্তু জাপানের কৃষক-সম্প্রদায় দেশ ছাড়িয়া এখানে আসিতে চাহে না। সে জন্য মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের উপনিবেশ-স্থাপনার কল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। মাঞ্চুরিয়ায় যে সব জাপানী আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছে, তাদের মধ্যে এক দল মদগর্ব্ব-স্ফীত প্রভুত্বকামী; আর এক দল স্বার্থপর ভাগ্যান্বেষী। লুঠ করিয়া উদর-পূর্ত্তি করাই সকলের উদ্দেশ্য।

মাঞ্চুরিয়ায় অসংখ্য জাপানী ল্যাবরেটরি খোলা হইয়াছে। সে সব ল্যাবরেটরিতে চলিয়াছে জমির পরীক্ষা, যোগ্য সার-তৈয়ারীর আয়োজন। মার্কিন হইতে জাপান তুলা লইত। কোনো দিন কোনো কারণে যদি সে-তুলায় টান পড়ে, তাই মাঞ্চুরিয়ার নানা ফশল হইতে জাপান তুলা তৈয়ার করিতেছে। এ তুলা এমন অজস্র পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে যে, জাপান আজ অন্য কোনো দেশের তুলা চাহে না—এ তুলায় নিজেদের চাহিদা মিটাইয়া অপরকেও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করিয়া তার বিনিময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে জাপান আগে পশম লইত। এখন মোঙ্গোলিয়ান মেষের লোম হইতে পশম তৈয়ারী করিতেছে। মোঙ্গোলিয়ান মেষ ছাড়া তারা ফ্রান্স হইতে মেরিনো মেষ আনিয়া সে-মেষ লালন করিতেছে। কুঙচুকিঙে পশমের যে কারখানা করিয়াছে, তাহার আয়তন ও কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না! জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা মোঙ্গোলিয়ান মেষের দেহে মেরিনো মেষের লোম জুড়িয়া মেরিনো লোম উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানের দিক দিয়া মাঞ্চুরিয়ার নব-জন্ম হইয়াছে, সত্য; এবং এখানকার চীনাদের সে বিজ্ঞানে জ্ঞানও জন্মিয়াছে প্রচুর। কিন্তু এ জ্ঞানের ফলে পার্থিব সম্পদ যা কিছু মিলিতেছে, তাহা জাপান লুঠিয়া লইতেছে। অর্থাৎ শাঁস খাইতেছে জাপান আর চীনা অধিবাসীর ভাগ্যে শুকনো খোলাই শুধু সার! জাপান চীনা শ্রমিকদের বশে রাখিয়াছে আফিমের মৌতাতে! সিগারেটে তামাকের বদলে চীনা শ্রমিকের দল আফিমের ধূম্র সেবন করে। সে ধূম্র-সেবায় পেশীর শক্তি কমে না, মন কিন্তু মরিয়া নির্জীব হয়। চেতনা-বিহীন পশুর মত তারা খাটিয়া মরে। আফিমের রকমারি সিগারেট-সিগার তৈয়ারী করিয়া জাপান সেগুলি চীনা শ্রমিকের বাজারে ছাড়িয়াছে শস্তা দামে। এ জন্য এ সব শ্রমিক নীরবে কাজ করে। অবিচার বুঝিলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আত্মোন্নতি করিবে, সে চিন্তাও আফিমের ধূম্র-বাষ্পের মহিমায় তাদের মনে চাপা পড়িয়াছে।

পৌত্র-পৃষ্ঠে মোঙ্গোল-পিতামহী

অসি-ক্রীড়ার জন্য জাপানী ও শ্বেত-রাশিয়ানদের সাজ-সজ্জা

লেখক লিখিতেছেন, মাঞ্চুরিয়ার সর্ব্বদক্ষিণে দাইরেন বন্দর। পথ-ঘাট বেশ বড় এবং জাপানীরা বাড়ী-ঘর তৈয়ারী করাইয়াছে পাথর দিয়া। জাপানীরা বলে, এখানে পাকা ব্যবস্থা করিবার কারণ, এখানে আমরা চিরকালের জন্য থাকিতে চাই। সহরে আজ কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের সীমা নাই। বন্দর-মারফৎ চালানি এবং আমদানি মালপত্রের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য সত্যই অসাধারণ রকমের।

বন্দরের পিছনে প্রায় দশ হাজার চীনার বাস। ইহারা শানতুঙ হইতে মাঞ্চুরিয়ায় আসিয়াছিল অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে। তারা থাকে পিছনকার মহল্লায়। সংখ্যায় প্রায় দশ হাজার। এ-সব চীনা কাজ করে বন্দরে ও কল-কারখানায়। জাপানীদের বেতনের চেয়ে বিশ ভাগ কম বেতন পায়। অর্থাৎ দেহ ও মস্তিষ্ক খাটাইয়া যে-কাজে জাপানীরা পারিশ্রমিক পায় বিশ টাকা, চীনারা সে-কাজের জন্য পায় এক টাকা! পেটের দায়ে কাজ ছাড়িয়া বন্দর ছাড়িয়া যাইবে, সে উপায়ও বেচারীদের নাই! তার কারণ, জাহাজে টিকিট মিলিবে না। অল্প আয়, ঋণভারে তারা কাতর—জর্জ্জরিত! এ ঋণ লইয়াছে মনিব-কোম্পানির কাছ হইতে। কাজেই পরিশোধের আশা নাই—আজন্ম ক্রীতদাস হইয়া আছে! ইহাদের বাসের জন্য লম্বা টানা ব্যারাক-বাড়ী আছে—এক এক কামরায় পঞ্চাশ জন করিয়া লোকের বাস। ইট পাতিয়া সেই ইটের উপরে একখানা চ্যাটাই বা মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন! জাপানীরা বহু স্থানে 'আদর্শ গ্রাম' তৈয়ারী করিতেছে। বাসের জন্য এ-সব গ্রামে গৃহের দেওয়াল সিমেন্টের বা কাঠের অথবা মাটীর; মাথার উপর এক পুরু টালির আচ্ছাদন।

মাঞ্চুরিয়ার দেহ বিদীর্ণ করিয়া চারি দিকে রেলোয়ে-লাইন পাতা হইয়াছে। এ সব লাইনের কল্যাণে সমস্ত সহরগুলির সঙ্গে যোগসূত্র রচিত। দাইরেনের কাছে রিয়ো জীন্ চমৎকার স্বাস্থ্য-নিবাস। কিরশু বা চিন্‌চৌ অতি প্রাচীন নগর। এখানকার লোকজনের আচার-ব্যবহার এখনো সেই মান্ধাতার আমলে প্রবর্ত্তিত আচার-ব্যবহারের অনুরূপ রহিয়াছে। মুকদেন সর্ব্বপ্রধান নগর। নূতন-পুরাতনে মুকদেন দেখিতে যেন হরগৌরীর মত! এক দিকে জাপানীদের তৈয়ারী নূতন সহর টোকিয়োর আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে—আর এক দিকে পড়িয়া আছে পুরাতন সহর। পুরাতন সহরের বুকে মাঞ্চুরাজ নুর হাচুর সমাধি-ভবনটি এখনো টিঁকিয়া আছে। জাপানী মাঞ্চুরিয়া বা মাঞ্চুকুয়োর রাজধানী শিংকিং (ভূতপূর্ব্ব চাঙচুন)। শিংকিং পূর্ব্বে ছিল মশা-মাছির আড্ং—জাপানীর হাতে সুদৃশ্য বেশে নগরের শোভা হইয়াছে এখন ছবির মত অপরূপ!

উত্তরে হার্বিন। হার্বিনের লোকসংখ্যা ৬৬০০০০ (ছেষট্টি লক্ষ)। হার্বিনে শিঙ্গুরা নদী। এ নদীর জন্য দেশ উর্ব্বরতায় সমৃদ্ধ। নদীতে শীতকালে জল দেখা যায় না—বরফে ঢাকিয়া থাকে।

রুশ সম্রাটের আমলে হার্বিন ছিল নির্ব্বাসিত শ্বেতাঙ্গ-রাশিয়ানদের কারা-আশ্রয়। এখন রাজ-ধর্ম্মী রাশিয়ানরা এখানে আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছে। সোভিয়েট-রাশিয়ায় তাদের প্রবেশ করিবার জো নাই—করিলে নিগ্রহের সীমা থাকিবে না। এই হার্বিনের পরেই রাশিয়া।

লেখক লিখিতেছেন, হার্বিন হইতে আমরা আমুর নদীর তীরে আসিলাম। আমুরের তীরে তাহেই-হো। আমুর নদীটি চওড়ায় এক মাইল। ওপারে সাইবেরিয়া। নদী পার হইয়া আমরা গিয়া পৌছিলাম সাইবেরিয়ার ব্লাগোভেশ্‌চেন্স্ক সহরে। নদী পার হইলাম নৌকাযোগে, সেতু নাই। রাশিয়ায় আসিয়া দেখি, এখানকার লোকজন নিঃসংশয় মনে বাস করিতেছে; ওপারে জাপানীদের আস্তানার জন্য তাদের মনে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি নাই! ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ-সূচনায় জাপান প্রথমে লক্ষ্য করিতেছিল রাশিয়া এ যুদ্ধে চীনের পক্ষ

রুশ-আমলের প্রাচীন গির্জ্জা—হার্বিন

লইয়া চীনকে সাহায্য করে কি না। সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া তবে জাপান এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

ভ্‌লাডিভষ্টকে বহু বিমান-ক্ষেত্র আছে। অজস্র গিরিগুহার মধ্যে তোপখানা গুলী-গোলা-বারুদ সঞ্চিত আছে প্রভূত পরিমাণে। কাজেই নগরটিকে সুরক্ষিত দুর্গ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

নুর-হাচুর সমাধি-ভবন। পুরাতন তুঙ-লিঙ মহল্লা—মুকদেন্

চীনা মন্দির—মুকদেন্

মাঞ্চুরিয়ায় বহু মোঙ্গোলের বাস। জাপানীদের তারা সুনজরে দেখে না।—সুযোগ পাইলেই লুঠপাট ও দৌরাত্ম্যে মোঙ্গোলরা জাপানীদের বিব্রত করে।
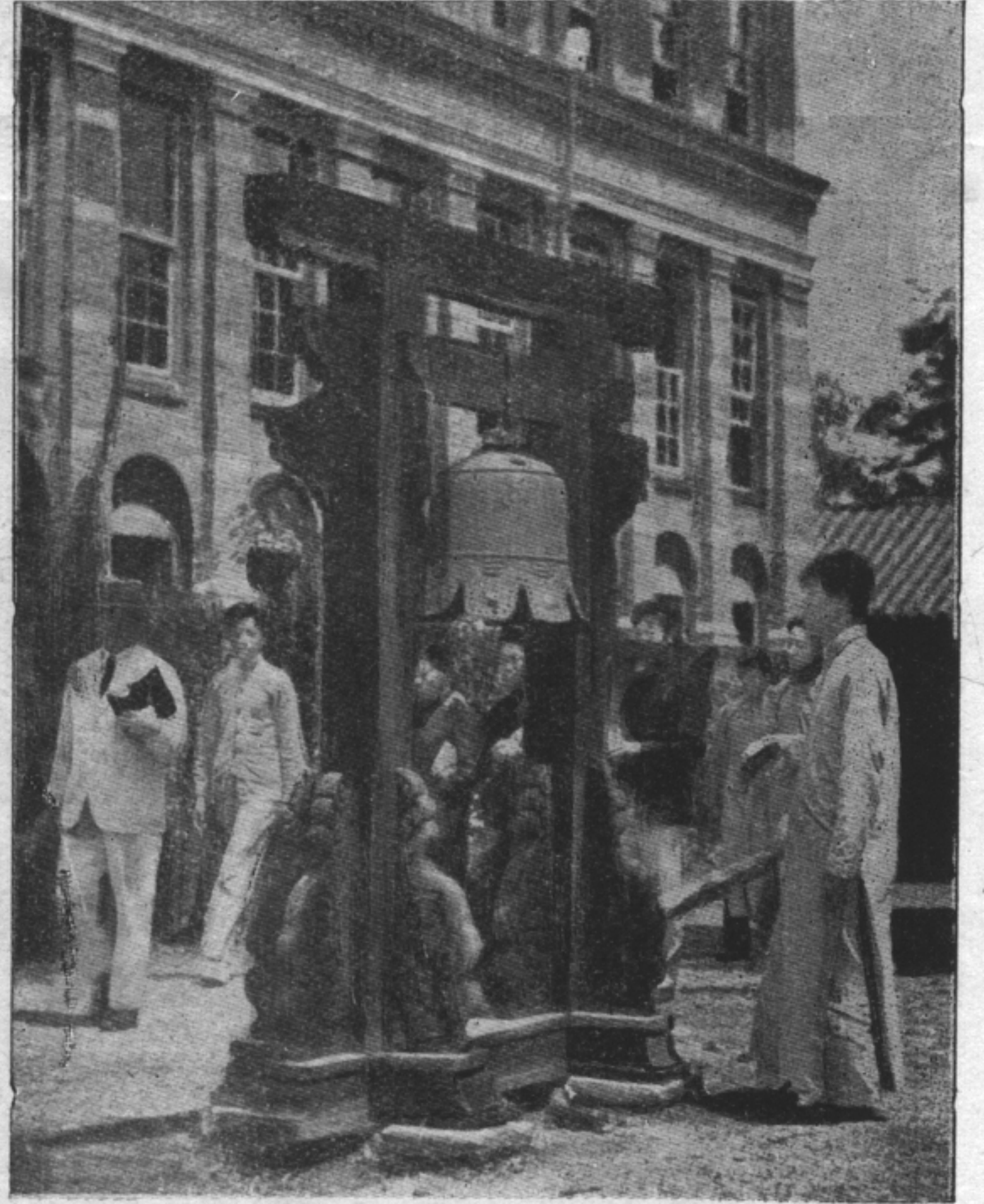
ভ্‌লাডিভষ্টক এবং কামচাট্‌কা-অন্তরীপ—এ-দু'টি যেন সতর্ক প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। জাপান জানে, ভ্‌লাডিভষ্টক যদি বা করায়ত্ত হয়, কামচাট্‌কা দুরধিগম্য। এবং এই কামচাট্‌কা-মারফৎ আমেরিকা

দাইরেন রেল-ষ্টেশন

মোঙ্গোলদের আস্তানা।

ভ্‌লাডিভষ্টক সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন, জায়গাটি গিরিপর্ব্বত-সঙ্কুল—এখানে ২০৬০০০ দু'লক্ষ ছ'হাজার লোকের বাস। তাহারা জনে-জনে সাহসী যোদ্ধা।
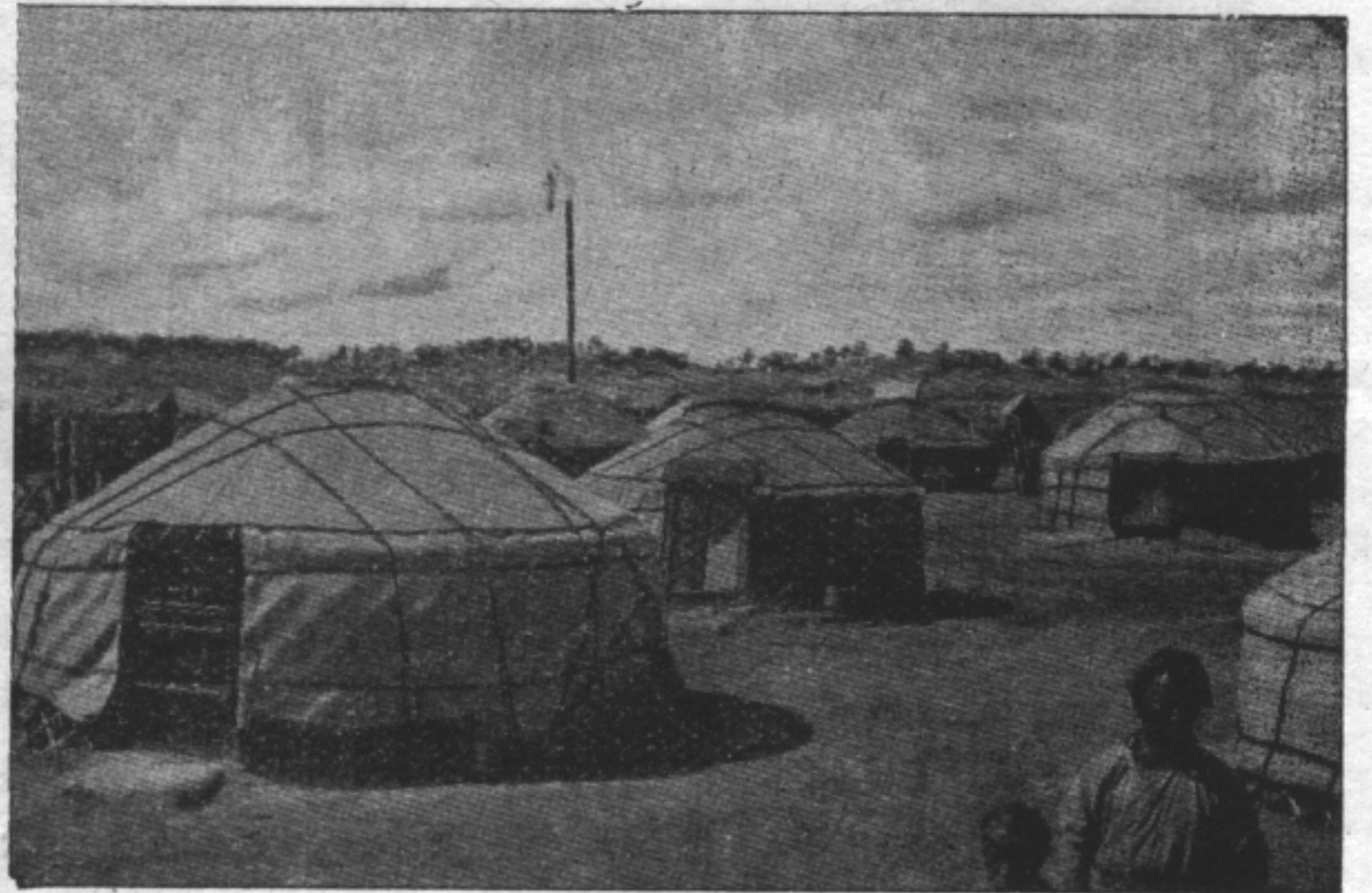
নিমেষে আসিয়া রাশিয়াকে সাহায্য করিতে পারে; কামচাটকার দুরধিগম্যতা বুঝিয়া জাপানীরা অলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে মাত্তু, আগাত্ত এবং কিশ্‌কা অধিকার করিয়া সে তিন জায়গায় পাকা সমর-খাঁটী তৈয়ারী

বরফ-জমা লিয়া-ও নদী। বীনের চালান

বরফ-জমা শিঙ্গুরা নদী—হার্বিন

করিয়াছে। জাপানের কিউরাইল দ্বীপ কামচাট্‌কা হইতে বিশ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। কামচাট্‌কার কোলে সাগর-জলে জাপানী ধীবরের দল মাছ ধরে। তাহাতে বাধা নাই, নিষেধ নাই। কিন্তু কামচাট্‌কার কূলে আসা —জাপানীদের সে-অধিকার আদৌ নাই।

লেখক লিখিয়াছেন, প্রাচ্যে সমর-ঘাঁটী খুলিতে হইলে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত হইবে তাহার পক্ষে যোগ্য স্থান! সে জন্য মাঞ্চুরিয়াকে দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তোলায় জাপানের যেমন স্বার্থ, মিত্রশক্তিও তেমনি মাঞ্চুরিয়ার সম্বন্ধে উদাসীন নয়। মাঞ্চুরিয়া যদি জাপানের করচ্যুত হয়, তাহা হইলে জাপানের পক্ষে যেমন বিশ্ব-বিজয়ের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবে, তেমনি মাঞ্চুরিয়া রক্ষা করিয়া জাপান যদি কোনো দিন রাশিয়া জয় করিতে পারে, তাহা হইলে মিত্রশক্তির পক্ষেও স্বাধীন পৃথিবীর স্বপ্ন আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে!

বর্ষার পল্লীবাস

পাষাণ-ঘরে বসত করা চায় না আমার মন—
মেঠো মেটে বাড়ীর লাগি মন করে কেমন!
ঝড় ও জলের উপদ্রবটা সেথায় যে পাই টের
সমদুখী, ব্যথার ব্যথী যত দরিদ্রের—
কর্দ্দমময় পিচ্ছিল পথ করছে নিমন্ত্রণ।

হঠাৎ ভীষণ হরপা এসে ধাক্কা মারে দ্বারে,
ঘাগ্‌রা ঘুরায় ঘূর্ণী রাঙা নিষেধ মানে না রে।
দিবস-রাতি দুলে দুলে কাতর তরু-শির,
আনন্দেতে বিরাম-বিহীন নাচে অজয়-নীর,
মাঠ ডুবায়ে বন্যা-বারি বাড়ছে ক্ষণেক্ষণ।

মাছরাঙা বক টিটিভ ডাকে ডাহুক ধরে সার,
জলসা হাওয়ায় ঝিঁঝার ডাকও লাগে চমৎকার!
'বাদার ঘাটে' জলে-কাদায় হাটুরেদের ভিড়,
সুদূর থেকে ভেসে আসে গন্ধ মালতীর,
ফলের ভারে নত ঘন নিবিড় জম্বুবন।

চক্ষু জুড়ায় শ্যাম-বনানী নব তৃণাঙ্কুর।
শ্যামলিমার নাইকো সীমা ভুবন পরিপূর!
দুঃখ বহুৎ, কষ্ট বহুৎ, নানান রকম ভয়,
সুখে আছে, সুখে থাকুক দূরে যারা রয়—
পল্লী-কুটীর আমায় দেখায় স্বর্গেরই স্বপন!

ভয় করে' কি দেখবো না কো নৃত্য অভয়ার?
জড়ের সাথে জড়িয়ে থাকা বস্তু আকাঙ্ক্ষার!
পশু-পাখীর এ আনন্দ দেখবি না কি তুই?
দিনে দিনে মূর্ত্তি নূতন ধরছে কেমন ভুঁই?
করবি নাকো এমন সবুজ সাগরে তর্পণ?

হাসিমুখে ভাই, তোদের কারো ভাগ্য এমন নাই!
হেথা আমি দিগম্বরের করের পরশ পাই!
ওঠে নামে চরণ তাঁহার শিঙায় ওঠে বোল,
ডম্বরু তাঁর বাজে করি' পবন উতরোল—
পাই যে শিবের খণ্ড-শশীর অমৃত কিরণ।

সৌধ-প্রাসাদ দেখলি অনেক—পেলি আনন্দ?
দুঃখ দেখে অশ্রু ফেলা—নয় সেটা মন্দ!
চাল-মেলেনি বৈকালেতে জেলেছে উনান,
দৈন্য-অভাব মনকে করে পবিত্রতা দান—
বুকের কাছে সরিয়ে পাতে হরির সিংহাসন!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

যশোধরা

১

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান জানি, কিন্তু এ'ও জানি, মহাভারত ছাড়াও ভারতীয় ইতিহাসে ও সাহিত্যে নানা অমৃত-কথা সঞ্চিত আছে। আজও ভূলোকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানব যাঁহাকে 'লোকনাথ' বলিয়া স্মরণ করে, যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া 'শরণং গচ্ছামি' বলিয়া আকুল প্রার্থনা জানায়, বেদপন্থিগণও যাঁহাকে পরিশেষে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, তাঁহার কাহিনীও অমৃত-সমান!

কাহিনী বলিতেছি, কারণ গৌতম বুদ্ধের জীবনী বলিয়া যাহা চলে, তাহার কতটুকু ইতিহাস, আর কতখানি ইতিহাস নয়, নির্ণয় করা অসাধ্য। পরবর্ত্তী কালের ভক্ত-পরম্পরার ফেনিল কল্পনাস্রোতের আবর্ত্তে জন্ম, এবং বাঁধনহারা উদ্দাম উচ্ছাসে পরিপুষ্ট কাহিনীগুলির নীচে পড়িয়া ইতিহাস এমনই আত্মগোপন করিয়াছে যে, পাশ্চাত্ত্য মনীষার গবেষণার তীব্র আলোকসম্পাতেও সে ইতিহাসকে বহু স্থানে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। কাহিনীগুলির রচনা কোনও দেশ-বিশেষের বৌদ্ধগণের নয়, অথবা একই সম্প্রদায়ের সাহিত্যের ভিতর দিয়াও তাহাদের প্রকাশ নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা, অথবা স্থানবিশেষে একই রূপকথার অদ্ভুত রূপান্তর! ফলে বহু স্থলেই স্থবিরবাদিগণের পালি ভাষায় নিবদ্ধ কাহিনীর সহিত সংস্কৃতে রচিত কাহিনীর সঙ্গতি নাই, কিংবা উত্তর-ভারতের কাহিনীর সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতীয় কাহিনীর অথবা ভারতীয় কাহিনীর সহিত বৃহত্তর ভারতের কাহিনীর সাদৃশ্যের শোচনীয় অভাব। কাজেই এই সকল অসঙ্গতির মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন করিতে গিয়া ঐতিহাসিককে পদে পদে উদ্‌ভ্রান্ত এবং দিশাহারা হইতে হয়।

এ-কথা স্মরণ রাখিলে যে নারী যৌবনের সমস্ত কামনা, বাসনা ও সুখস্বপ্ন লইয়া একদা রাজোপম ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্র গৌতমের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে শয্যাভাগের অধিকার লইয়া,—সেই নারীর ইতিহাস উদ্ধার করা আরও কত কঠিন, তাহা উপলব্ধি হইবে। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস আজও জানে না সে নারীর নামটা কি? পালি ত্রিপিটকের মধ্যে কেবল বিনয়পিটকের সম্ভবতঃ এক স্থানেই তাঁহার উল্লেখ আছে; সে উল্লেখও তাঁহার নিজের পরিচয় নয়, স্বামীর পরিচয় নয়, 'রাহুল-মাতা' বলিয়া। অথচ সঙ্ঘের প্রাচীন আচার্য্যগণ যে নাম জানিতেন না, অথবা জানিয়াও জানাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, পরবর্ত্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহারই কত নাম! ভদ্দকচ্চা বা ভদ্দকচ্চানা (ভদ্রকাঞ্চনা), সুভদ্দকা (সুভদ্রকা), বিম্বা, বিম্বাসুন্দরী গোপা, যশোধরা। হয়তো এগুলির কোনটাই তাঁহার প্রকৃত নাম নয়, কিংবা ইহাদের মধ্যে যে কোনটি তাঁহার নাম হওয়াও অসম্ভব নয়!

* * * *

কপিলবাস্তুর শাক্যনায়ক শুদ্ধোধনের বিগতযৌবনা পত্নী মায়া যে দিন দেবদহে পিত্রালয়ে যাইবার পথে লুম্বিনীর উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে শালতরুর (অথবা অশোকতরুর) শাখা ধরিয়া সহসা প্রসববেদনায় কাতর হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই পুত্র প্রসব করিলেন, সে দিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সেই দিনই সদ্যোজাতকে কপিল-বাস্তুতে ফিরাইয়া আনা হইল, আর সেই পুণ্যদিনেই ইহলোকে না কি আরও সপ্ত প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক জন ছিলেন মানবী। এই মানবীই রাহুল-মাতা। 'ললিতবিস্তরে'র মতে তাঁহার নাম গোপা, আর তিনি দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা। তিব্বতীয় বিনয়পিটক 'দুল্‌ব' অনুসারে দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যার নাম যশোধরা। যশোধরাই রাহুল-মাতা। আর গোপা ও মৃগজা নামে গৌতমের অপরা দুই পত্নী ছিল। 'বুদ্ধচরিতে' রাহুল-মাতার নাম দিয়াছেন যশোধরা, যদিও কাহার কন্যা, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু পালি সাহিত্যের সাক্ষ্যানুসারে রাহুল-মাতা দণ্ডপাণির ভ্রাতা সুপ্পবুদ্ধ (সুপ্রবুদ্ধ); এবং অমিতা (অমৃতা) নাম্নী তাঁহার ভার্য্যার তনয়া। সুপ্পবুদ্ধও ছিলেন শাক্যবংশীয় নেতা। কিন্তু তাঁহার আরও গৌরবের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি না কি মায়ার সহোদর ভ্রাতা, অর্থাৎ গৌতমের মাতুল। কিন্তু মতান্তরে অমৃতা ছিলেন গৌতমের পিতৃস্বসা।

পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের শেষ বুদ্ধকে প্রসব করিয়া সাত দিন পরে জননী মায়াদেবী লোকান্তর গমন করিলেন। মায়ার ভগিনী ও সপত্নী তখন মাতৃহারা শিশুকে মায়ের মতই স্নেহে ও যত্নে মানুষ করিতে লাগিলেন। দিন যায়। ষোল বৎসর পরে শুদ্ধোধন তাঁহার শাক্যজ্ঞাতিবর্গের নিকট দূত পাঠাইলেন, তাঁহাদের কন্যাদের মধ্যে কাহাকেও পুত্রের জন্য পাত্রী মনোনীত করিয়া আসিবেন! কিন্তু জ্ঞাতি হইলে কি হয়, জাতি-হিসাবে শাক্যেরা ছিলেন অহঙ্কারী। তাঁহারা সম্মত হইলেন না। মেয়ে তাঁহারা দিবেন না! শুদ্ধোধনের ছেলের রূপ আছে সত্য, কিন্তু বিদ্যা? ধনুর্ব্বিদ্যায় বা অন্য কোন পুরুষোচিত ক্রীড়ায় কিছুমাত্র নৈপুণ্য নাই! বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে রক্ষা করিবে কি করিয়া? এ অবস্থায় মেয়ে তাঁহাকে কি করিয়া দেওয়া চলে?

কথাটা গৌতমের কানেও উঠিল। রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কোন বিদ্যাই তাঁহার নাই? মেয়ে উহারা দিবে না। বটে!

এক বিরাট জনসভায় সমস্ত শাক্যদের আহ্বান করিয়া সমবেত সকলের সম্মুখে গৌতম ধনুর্ব্বিদ্যায় নিজের নানা কৃতিত্বের পরীক্ষা দিলেন। দেখিয়া শাক্যদের যেমন হইল বিস্ময়, তেমনই আনন্দ। তাহারা তখন প্রত্যেকে উদ্‌গ্রীব হইয়া নিজের নিজের মেয়ে পাঠাইয়া দিল কপিলবাস্তুতে গৌতমের উদ্দেশ্যে। ফলে ইহাদের সংখ্যা দাঁড়াইল না কি চল্লিশ হাজার! গৌতমের একাধিক পত্নী ছিল কি না, অনুমান করা কঠিন থাকিলেও প্রধানার স্থান যিনি অধিকার করিলেন, তথাকথিত ইতিহাসে তাঁহার যশোধরা নামই চলে বেশী, আর সম্ভবতঃ তিনি সিদ্ধার্থের সমবয়স্কা মামাতো অথবা পিসতুত ভগিনী।

২

তার পর তের বৎসর। তের বৎসর ধরিয়া যশোধরা স্বামীর ঘর করিলেন। স্বামীর সুন্দর সুঠাম তনু। তেজোদৃপ্ত দু'টি চোখ। যশোধরাকে দেখিলেই সে চোখ দু'টি হাসিয়া নাচিয়া ওঠে। যশোধরা পলাইয়া যান। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর কণ্ঠলগ্না হন। দিনে গগনের রামধনুর সপ্তবর্ণের ছায়া পড়ে দম্পতির বুকে। পরক্ষণেই যশোধরা সলজ্জ হাস্যে অভিযোগ করেন, গৌতমের কাছে গৌতমেরই অত্যাচারের কথা। গৌতম আশ্বাস দেন, আচ্ছা,

আর নয়! কিন্তু রাত্রির আকাশের গায়ে চাঁদ ওঠে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায়,—আশ্বাসের কথা গৌতম ভুলিয়া যান। যশোধরা আর পারেন না! প্রহরে প্রহরে এ কি জ্বালাতন! বহু মিনতির পর প্রণয়ভীতা রাত্রিশেষে ঘুমাইয়া বাঁচেন।

বুঝি বা এমনি করিয়াই যশোধরা ও তাঁহার দয়িতের প্রথম যৌবনের পুলকঘন কৌতুকোজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলি আদরে সোহাগে চুম্বনে মান-অভিমানে কাটিয়াছিল নয়নাভিরাম সৌধের উপরতলার কক্ষে কক্ষে,—কিন্তু ইতিহাস তাহার কোন সন্ধান দেয় না। ইতিহাসের দৃষ্টি শুধু বাহিরের ঘটনাবলীর উপর, অন্তর-রাজ্যের কথা তাহার গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কে জানে, পাষাণের বুক দিয়া বহুমুখী জলধারা এক দিন গড়াইয়া যাইত কি না! কিংবা মহাভিনিষ্ক্রমণের পূর্ব্বক্ষণে একখানি নারী-মুখ এ-জন্মের মত আর একবার চোখের দেখা দেখিয়া লইবার লোভে কি কাহারও চিত্ত লালায়িত হয় নাই? গভীর নিশীথে সেই নিদ্রিতা রমণীর শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া সন্তর্পণে কেহ কি উঁকি মারে নাই? সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল?

কথাটা জানা হইলেও একটু খুলিয়া বলি। আট জন ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শুদ্ধোধন শঙ্কিত ছিলেন, কোন্ মুহূর্ত্তে বংশধর বুঝি গৃহত্যাগী হইয়া যায়। এই আশঙ্কায় তিনি সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেন—যাহাতে পুত্রের দৃষ্টিপথে ব্যাধি, জরা বা মৃত্যুর কোন দৃশ্য পতিত হইয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার না করে।

পুত্রের চিত্ত সংসারের প্রতি যাহাতে আসক্ত থাকে, সে জন্য পুত্রের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এক মনোরম প্রাসাদে। সেখানে রহিল সকল প্রকার ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা, পুত্রের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ লোভনীয় দ্রব্যসম্ভার। তরুণী রূপসী নর্ত্তকীর দল বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া, সুচারু ছাঁদে কবরী বাঁধিয়া হাস্যে লাস্যে ভাষ্যে সঙ্গীতে দিবানিশি কত চেষ্টাই না করিতে লাগিল বোধিসত্ত্বের মনকে বিমুগ্ধ রাখিবার জন্য! পুত্র যাহাতে প্রাসাদের নিম্নতলে না আসিতে পারেন, সে জন্য শুদ্ধোধন প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু নিয়তি পিতার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। বোধিসত্ত্বের চোখে একে একে সবই পড়িল,—বৃদ্ধ, রোগাতুর এবং মৃত। কি করিয়া সকল দুঃখের অতীত হওয়া যায় এবং দুঃখ-হেতুর উচ্ছেদ সাধন করা যায়, তাহাই হইল ঊনত্রিশ বৎসরের যুবকের একমাত্র চিন্তা। তার পর এক দিন এক আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে বোধিসত্ত্ব দেখিলেন এক শান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া এবং সন্ন্যাসি-জীবনের আনন্দের কথা শুনিয়া তিনি বড় তৃপ্তি পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি সত্যকার পথের সন্ধান পাইয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি গিয়া বসিলেন রাজোদ্যানের বাপীতীরে। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সংবাদ পাইলেন যশোধরার গর্ভে তাঁহার পুত্র রাহুলের জন্ম হইয়াছে। এ আবার এক নূতন মায়ার বন্ধন! আর নয়, এবার তাঁহাকে যাইতে হইবে, সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। ধীরে ধীরে গৌতম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে বীণার ঝঙ্কারে, নূপুরের নিক্বণে, গানের মূর্চ্ছনায় মুখরিত হইয়া উঠিল সমগ্র প্রাসাদ। কিন্তু বোধিসত্ত্বের এ সকল প্রমোদ তখন তিক্ত মনে হইল। তিনি শয্যায় গিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন। অর্দ্ধ রজনীতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দীপালোকে বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, নর্ত্তকীগণ ঘুমে অচেতন। কেহ কেহ ঘুমঘোরে বিড়-বিড় করিয়া কত কি কহিতেছে, কাহারও বসন অসংযত, আর কতগুলির বিকট দেহে কি ঘৃণ্য কদর্য্যতাই না প্রকাশ পাইতেছে! দেখিয়া গৌতমের মনে হইল, তিনি বুঝি পূতিগন্ধময় গলিত শবরাশিতে ভরা এক শ্মশানক্ষেত্রে রহিয়াছেন, আর বাড়ীর চারি দিক্ ঘিরিয়া বুঝি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে লেলিহান বহ্নি! তাঁহার নির্দ্দেশে বাহিরে রথ প্রস্তুত। গেলেই হয়। গৌতম উঠিলেন, কিন্তু প্রাসাদ-ত্যাগের পূর্ব্বে কি যেন ভাবিয়া যশোধরার সূতিকাগৃহে গেলেন। দ্বারপথে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, মাতৃত্বের অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি। দেখিলেন, যূথিকার ফুলশয্যায় শুইয়া যশোধরা পুত্রের মাথার উপরে নিজের বাহুলতা প্রসারিত করিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছেন। যে লোভে গৌতম গেলেন সেই গৃহাভিমুখে, তাহা পূর্ণ হইল কি না, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার গোপন হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল কি না, কে বলিবে! কিন্তু যশোধরার আরও নিকটে যাইতে তাঁহার সাহস হইল না,—কি জানি, যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়! বোধিসত্ত্ব আর বিলম্ব না করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

* * * *

ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের পরে গৌতমবুদ্ধ রাজগৃহের বেলুবন হইতে প্রথমবার আসিলেন কপিলবাস্তু নগরীতে। সঙ্গে শত সহস্র অনুচর। কেন আসিলেন, জানি না। কাহিনীতে বলে, পিতার একান্ত অনুরোধে হইতে পারে। হয়তো সত্যই তাঁহার মনে আর কোন বাসনা বা অভিপ্রায় ছিল না। কপিলবাস্তুতে প্রবেশ করিয়া তিনি রহিলেন নগরীর প্রান্তে ন্যগ্রোধারামে, এবং পরের দিন বাহির হইলেন কপিলবাস্তুরই রাজপথে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল নিমেষে বায়ুবেগে নগরীর সর্ব্বত্র। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই নিস্পন্দ হইয়া শুনিল অপূর্ব্ব বিস্ময়কর কথা। কথাটা যশোধরাও শুনিলেন!

স্খলিত পদে কম্পমান বক্ষে এক পাগলিনী গিয়া দাঁড়াইলেন প্রাসাদের গবাক্ষ-পথে,—যদি দেখা যায়! কিন্তু যদি না যায়? বিচিত্র কি, নির্ম্মম যদি এ পথে না আসেন? কিন্তু ঐ যে, ঐ তো দেখা যায় সেই মানুষ,—সেই মুখ, সেই অঙ্গ, সেই চলনভঙ্গী! আগের চেয়েও দেহকান্তি যেন অনেক বাড়িয়াছে! ঐ তিনি! আর পিছনে—একেবারে লোকারণ্য! যশোধরার বুক হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল! তাঁহার দেবতা আজ আর তাঁহার একার নয়, এখন তিনি সকল বিশ্বমানবের দেবতা। তাঁহার উপর যশোধরার নিজস্ব কোন দাবীই আজ নাই, তিনি এখন সকলের মধ্যে এক জন মাত্র। বাতায়ন হইতে যশোধরা নিঃশব্দে সরিয়া আসিলেন।

সেই দিনই আবার শুদ্ধোধনের নিমন্ত্রণে গৌতমবুদ্ধ আসিলেন পিতৃভবনে অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া। আহার-শেষে তাঁহাকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে পুররমণীগণ প্রত্যেকে গেল সেই স্থানে, কেহ বাকী রহিল না। রহিল শুধু এক জন। তিনি যাইবেন না, কিছুতেই না। তাঁহার যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কেন? তিনি আসিতে পারেন না যশোধরার নিকটে? যদি না পারেন, তের বৎসর ধরিয়া প্রাণপ্রিয়া বলিয়া অত ভালবাসার অভিনয়ের কি প্রয়োজন ছিল? প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া পুরানো দিনের সকল কথাই ভুলিতে হয়? বেশ, এক জন যদি ইচ্ছা করিয়া এত পাষাণ হইতে পারেন, যশোধরাও বধিরা হইতে জানেন। কিন্তু যশোধরা সেই মহানিশার পর হইতে এত দিন ধরিয়া একান্ত চিত্তে নারীধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন,

তাহা যদি ব্যর্থ না হইয়া থাকে, তবে আজিকার দিনে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠকে আসিতেই হইবে তাঁহার সান্নিধ্যে।

যশোধরার কল্পনাস্রোত কত দূরে কোথায় গিয়া গড়াইত কে জানে! অকস্মাৎ বুদ্ধের আগমন-বার্ত্তায় বাধা পড়িল সেই সুখ-স্বপ্নে। যশোধরা শুনিলেন, বুদ্ধদেব সত্যই আসিতেছেন তাঁহারই নিকটে। এতক্ষণ মনে মনে যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সম্ভব-অসম্ভব কত কল্পনা, তাঁহারই আগমন-সংবাদে যশোধরা হঠাৎ বিবশা হইয়া পড়িলেন। বুক ফাটিয়া কান্না আসে! অন্তর্যামীর উদ্দেশ্যে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন—"করুণাময়, আমাকে শক্তি দাও, আমাকে বলিয়া দাও কেমন করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিব?" যশোধরা উঠিলেন। তিনি বুঝি আসিয়া পড়িলেন। শশব্যস্তে উঠিয়া গিয়া,—তাঁহার ভবনে যত নর্ত্তকী ছিল, সকলকে যশোধরা আদেশ দিলেন তাড়াতাড়ি কাষায়বস্ত্র পরিধান করিতে। আর সেই ক্ষমাসুন্দর আসিয়া যে আসনে বসিবেন, সেই আসন-সজ্জা যশোধরা নিজে ততোধিক ক্ষিপ্রহস্তে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন।

তিনি আসিলেন। সঙ্গে দুই জন ভিক্ষু (অগ্রশ্রাবক) আর ভিক্ষাপাত্র লইয়া স্বয়ং শুদ্ধোধন। তাঁহার সম্মুখে যশোধরা গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কেমন করিয়া, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। গিয়া স্থাণুর মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেন এক পাষাণ-প্রতিমা, চোখে-মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই, দেহে প্রাণবায়ুর স্পন্দন নাই! তথাগত কহিলেন,—"তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে পার, যশোধরা!" যশোধরা নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, সেই মুহূর্ত্তে স্বামীর পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন, আর পা দুইখানি দুই হাতে জড়াইয়া চরণযুগলে স্থাপন করিলেন নিজের শির!

সময় বুঝিয়া শুদ্ধোধন কহিতে লাগিলেন,—"ভদন্ত! আমার পুত্রবধূ যে দিন শুনিলেন তুমি কাষায় বসন পরিয়াছ, তখন ইনিও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন তুমি মাল্যাদি পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন ইনিও বিলাসের সকল সামগ্রী ত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন আরম্ভ করিলেন। যখন জানিলেন, তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, তখন হইতে ইনিও বিধবারই মত শুদ্ধাচারে ও নিষ্ঠায় দিন যাপন করিতেছেন। ইনি তোমার প্রতি এমনই নিবদ্ধচিত্তা ও অনন্যনেয়া।"

বুদ্ধ কহিলেন,—"জানি। এ শুধু আমার এই শেষ জন্মে নয়, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি আমার প্রতি এরূপ নিবদ্ধচিত্তা ও স্নেহশীলা ছিলেন। শুনুন সেই অতীত কাহিনী।"

* * * *

পাঁচ দিন পরের কথা।

যশোধরা ডাকিল, "রাহুল!"

পুত্র উত্তর দিল, "মা!"

—"কে রে?"

—"চিনিনে ত মা!"

মাতা পুত্রের চোখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল,—"ঐ তোর বাবা।"

রাহুল কোনও মতে চোখ সরাইয়া সেই প্রশ্নই করিল,—"আমার বাবা?"

—"হ্যাঁ। তোর স্বর্গ, তোর ধর্ম্ম, তোর পরম তপস্যা। তুই গেলিনে রাহুল ওঁর কাছে?"

প্রশ্ন শুনিয়া শিশুর অন্তরে ভয় জাগে। কোন্ ভরসায় সে যাইবে ঐ একান্ত অপরিচিতের কাছে, এক অজানা অচেনা সন্ন্যাসীর কাছে? যাইবেই বা কেন সে? আর গিয়া কি বলিবে? তাহার মা যেন কেমনতর, কিছুই বোঝে না!

কিন্তু মাতা চেনেন পুত্রকে। সাত বৎসরের দুলালের বক্ষে কি তুফান উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে মাতার এতটুকু দেরী হইল না। চোখ মুছিয়া মাতা সস্নেহে কহিলেন,—"ওরে বোকা ছেলে! আমি বল্‌ছি, যা। গিয়ে বল্, আমার উত্তরাধিকার (দায়জ্জ) কই?"

পুত্র চলিল পিতৃসন্দর্শনে। শুদ্ধোধনের ভবনে ভোজনরত পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া মায়ের শিখানো কথাগুলিই আবৃত্তি করিল। বুদ্ধ আত্মজের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রশান্ত দৃষ্টি। কই, ভয় ত লাগে না! তাহার বাবা ত বেশ! কিন্তু তাহার প্রশ্নের উত্তর কৈ? রাহুলের বাবা তাহার দিকে আর একবার তাকাইলেনও না, প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না, ভোজনশেষে পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া চলিলেন। অবোধ বালক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, —তাহার মাতার কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে পিতার পশ্চাদনুসরণ করিল। অবশেষে বুদ্ধ নন্দনকে উত্তরাধিকারই দিলেন। সারিপুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "রাহুলকে দীক্ষা দাও।"

* * *

সেইক্ষণে এ জন্মের মত পুত্রও যশোধরার পর হইয়া গেল। অর্থাৎ সংসারে তাঁহার যেটুকু আকর্ষণ ছিল, তাহারও সমাধি ঘটিল। তবে আর কেন? আর দেরী কিসের? যে পথে স্বামী গিয়াছেন, পুত্র গেল, সেই পথ তাঁহার পক্ষে আর কত দূর? শোনা গেল, সে পথের বাধা দূর হইয়াছে, নারীজাতিও প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি পাইয়াছে, আর ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নেত্রী হইয়াছেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। যশোধরা মন স্থির করিয়া ফেলিলেন।

ভগবান্ তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন, শ্রমণের রাহুলও তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। যশোধরা অনতিবিলম্বে প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিলেন, এবং কপিলবাস্তুর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অধীনে, ভিক্ষুণীদের এক উপাশ্রয়ে যশোধরা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তবু ত সেখানে দিনান্তে বার কয়েক স্বামী ও পুত্রকে চোখের দেখা দেখিবার সুযোগ আসে তাঁহার, তাহাই যে অভিশপ্ত নারী-জীবনে পরম লাভ। এটুকু না হইলে তিনি কাঙ্গালিনী বাঁচেন কেমন করিয়া?

রাহুলও আসে মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে। প্রকোষ্ঠের বাহিরে মাতাপুত্রে সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্ত্তা হয়। এক দিন আসিয়া সে শুনিল মায়ের অসুখ, তাঁহার উদরবায়ু কুপিত হইয়াছে। রাহুল মাতার শয্যাপার্শ্বে গিয়া প্রশ্ন করিল,—"কি খেলে ভাল হয়, মা?" রোগক্লিষ্টা ব্যথিত স্বরে কহিলেন,—"সে আর এখানে কোথায় পাব, রাহুল? কপিলবাস্তুতে যখন ছিলাম, তখনও এ অসুখই ত আমার। তখন আমের রসের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খেলেই সঙ্গে সঙ্গে সেরে উঠতাম। কিন্তু এখানে যে ভিক্ষা করে খেতে হয়, আম কে ভিক্ষা দেবে? কোথায় পাব তা?"

পুত্র গাত্রোত্থান করিল। উপাধ্যায় সারিপুত্রের নিকট সকল কথা বিবৃত করিয়া সারিপুত্রের সাহায্যে মহারাজ প্রসেনজিতের নিকট হইতে রাজোদ্যানের সুপক্ক আমের রস সংগ্রহ করিয়া মাতাকে দিল। সেই রস পান করিয়া যশোধরা সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অপর এক জাতকে অনুরূপ কাহিনী পাই। যশোধরার উদরের আন্ত্রিক যন্ত্রণা উপশমের নিমিত্ত রাহুলের অনুরোধে সারিপুত্র প্রসেনজিতের নিকট হইতে লাল মৎস্য দ্বারা সুবাসিত পোলাও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

যশোধরার জীবনের আর বেশী কথা অবগত হওয়া যায় না। সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া ভদ্দকচ্চানা থেরী নামেই বোধ হয় তিনি সমধিক পরিচিতা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার কাঞ্চনের মত উজ্জল দেহের বর্ণই এই নামের কারণ। 'থেরী অপদানে'র এক স্থানে থেরী যশোধরার উল্লেখও আছে। ভিক্ষুণী হইয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হতী হইয়াছিলেন। তার পর ক্রমশঃ সাধনমার্গের আরও উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া ভিক্ষুণীশ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সারিপুত্ত, মোগল্লান এবং বক্কুল ব্যতীত আর কেহই না কি যশোধরার মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন নাই!

সম্ভবতঃ ৭৮ বৎসর বয়সে বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বেই যশোধরার নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইয়াছিল। মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্ব্বে বুদ্ধের নিকট হইতে তিনি বিদায় লইয়া আসেন, তার পর না কি কতকগুলি আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিয়া লোকান্তর গমন করেন।

এ সংবাদ কখন এবং কেমন ভাবে শাস্তার কানে গেল জানি না! কিন্তু এ সংবাদে তথাগতের একটুকুও বিচলিত হওয়ার কথা নয়, কারণ তিনি সম্যক্ সম্বুদ্ধ। এক জন নারীর মৃত্যু সংবাদে কেন তিনি চঞ্চল হইবেন? সকল দুঃখের অতীত হইয়াছেন বলিয়াই ত তিনি বুদ্ধ, ভগবান্!

শ্রীসাধনা দাশগুপ্ত

অতিরিক্ত লাভকর ও নূতন যৌথ মূলধন আইন

অজস্র জরুরী আইন (Ordinances) জারীর ফলে লর্ড লিন্‌লিথগোর ভারত-শাসন কাল ভারতের ইতিহাসে একটি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে। ব্যবস্থা পরিষদকে ব্যাবহারিক বিধি-বিধানের বহির্ভূত করিয়া, বড়লাট বাহাদুর মামুলী রীতির আইন-কানুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভ হইতে ক্রমবর্দ্ধমান জরুরী আইন দ্বারা ভারত শাসন করিতেছেন। এত দিন এই জরুরী আইন রাজনৈতিক বিধি-বিধানে নিবদ্ধ ছিল; তার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে; এখন করনির্দ্ধারণ ক্ষেত্রেও প্রকট হইল।

গত মে মাসের প্রারম্ভে বাজারে গুজব রটিয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই যদৃচ্ছা লভ্যাংশ বিতরণ করিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া, অল্পতর পরিমাণে কারবারী লভ্যাংশ বণ্টনের নির্দ্দেশ দিয়া একটি জরুরী আইন জারী করিবেন। তার কিছুদিন পরে গুজব রটিয়াছিল যে, সরকার অতিরিক্ত লাভকরের (Excess Profits Tax) হার বৃদ্ধি করিবেন। যাহা হউক, গত জুন মাসের মধ্যভাগে সরকার দুইটি জরুরী আইন জারী করিয়াছেন,—প্রথমটি অতিরিক্ত লাভকর সম্বন্ধে; এবং অপরটি যৌথ কারবারের নূতন মূলধন সম্পর্কে। প্রথমোক্তটি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬নং অর্ডিনান্স।) প্রচলিত আইন অনুসারে অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৬৬⅔ অংশ সরকার গ্রহণ করিতেন। ইহা ব্যতীত শতকরা ১৩⅓ আয়-কর (Income Tax) এবং অতিরিক্ত কর (Super Tax) দিতে হইত। ইহাতে ব্যবসায়ীদিগের হাতে শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত লাভ থাকিত। নূতন আইন অনুসারে এই শতকরা ২০ অংশ হইতে শতকরা ১৩⅓ অংশ সরকারের হাতে দিতে হইবে। অবশিষ্ট শতকরা ৬⅔ অংশ হইতে কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ বিতরণ করিবেন। সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক ভাবে যে লভ্যাংশ জমা থাকিবে, তাহার পূর্ব্বোক্ত শতকরা ২০ অংশের উপর সরকার শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে সুদ দিবেন। আবার এই শতকরা ২০ অংশের মধ্যে যে শতকরা ১৩⅓ অংশ সরকারের নিকট জমা থাকিবে, যুদ্ধ শেষ হইবার এক বৎসর পরে অথবা ঐ গচ্ছিত টাকা রাখিবার দুই বৎসর পরে কারবারীরা ঐ টাকা ফেরত পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার তিন বৎসর পরে সরকার ঐ টাকা ফেরত দিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রায় এক শত কোটি টাকা সরকারের হাতে আসিবে। সুতরাং ঐ পরিমাণ টাকা বাজারে প্রচলিত হইতে না পারিলে মুদ্রাস্ফীতির কিছু সঙ্কোচ ঘটিবে।

(দ্বিতীয় অর্ডিনান্সটি ভারতরক্ষা আইনের (Defence of India Act) নূতন বিধি।) এই বিধির ফলে ভারত সরকারের সম্মতি ব্যতীত কেহ কোন কারবারের নিমিত্ত নূতন মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।) বৃটিশ-শাসিত ভারতে কেহ কোন প্রকার ঋণপত্র (Debenture) বিক্রয় করিতে পারিবেন না; কিংবা কোন কারবারের অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) বাহির করিয়া অংশ বিক্রয় দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। কার্য্যতঃ কেবল কেন্দ্রীয় সরকার জন-সাধারণের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ফলে, ভারতরক্ষা ঋণ সংগ্রহ সুলভ ও সুকর হইবে।

এই হইল নূতন বিধান দুইটির সার মর্ম্ম। এখন আমরা পারিভাষিক খুঁটিনাটি পরিত্যাগ করিয়া, যথাসম্ভব সহজ-বোধ্য সরল ভাষায় উভয়ের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অতিরিক্ত লাভকরের পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত শতকরা ২০ অংশ হইতে মাত্র ৬⅔ অংশ পরিত্যাগ করিয়া, বাধ্যতামূলক ভাবে ১৩⅓ অংশ গ্রহণের ফলে দেশাভ্যন্তরে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হইবে। কারণ, অর্থের অনটনে শিল্পে নিযুক্ত কারবারীর পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার আগ্রহের কোন হেতু থাকিবে না। অন্যান্য দেশের ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে এরূপ বিধানের কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্যান্য অধিকাংশ দেশই, ভারতের তুলনায় সমধিক শিল্প-সমৃদ্ধি সম্পন্ন এবং তাহাদের জাতীয় আয়ও প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত শতকরা ২০ অংশের ১৩⅓ অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া বহু প্রতিষ্ঠানকে "জাল গুটাইতে" হইবে। কারণ, অধিকাংশ মাঝারি

ও ছোট প্রতিষ্ঠানে লব্ধ লাভ কারবারে খাটে। ভবিষ্যতে, দীর্ঘ-কালের নিমিত্ত, এই লাভের টাকা সরকারের নিকট গচ্ছিত থাকিবে, এবং তাহার জামিনে ঋণ সংগ্রহও সম্ভব হইবে না। যথা-সময়ের পূর্ব্বে অনুমান সিদ্ধান্ত অনুসারে, সরাসরি অতিরিক্ত লাভকর নিরূপণ যথেচ্ছ দাবীর সৃষ্টি করিতে পারে। ইতিমধ্যে যদি কোন কারণে শেষ নিরূপণে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে করদাতৃগণের প্রতি অযথা পীড়নের হেতু ঘটিতে পারে। অতিরিক্ত আদায়ের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ প্রদান, অসুবিধা ও ক্ষতির অনুপাতে অনিষ্ট নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টায় অভিজ্ঞতা ভারতীয় বণিক্ সম্প্রদায়ের পক্ষে কখনই প্রীতিকর হয় নাই। কর্ম্মচারীর সংখ্যার তুলনায় হিসাব-নিকাশের বিলি-ব্যবস্থায় বিলম্ব ঘটে প্রচুর। কর্ম্মচারীর অদল-বদলও অনেক সময় বিভ্রাট ঘটায়। কখন কখন নথীপত্রও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হয়। ফলে, হিসাব চুকাইবার বিঘ্নবিলম্বে করদাতৃগণের ক্ষতি ও দুর্ভোগ ঘটে প্রচুর। কারণ, অনেক সময় করদাতাগণকে শতকরা ৫৲ টাকার অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয়। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী কালের নিমিত্ত সরাসরি কর নির্দ্ধারণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি হিসাব-নিকাশ চুকাইবার ব্যবস্থাই অধিকতর সমীচীন। আয়কর বিভাগের আভ্যন্তরীণ বিঘ্ন-বিলম্ব এবং খাম-খেয়ালের নালিশও কর্ত্তৃপক্ষের অবিদিত নহে। কেহ কেহ এরূপ ধারণাও মনে পোষণ করেন যে, কর নিরূপণ ও সংগ্রহ বিভাগের যথোপযুক্ত সংস্কার সমধিক হইলে অর্থ-বিভাগ যে এক শত কোটি টাকা বাকি পড়ার অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার কোন হেতু ঘটিত না।

নূতন আইন অনুযায়ী, অল্পকালীন কর নিরূপণের (Provisional assessment) ফলে করদাতৃগণের আরও একটি অসুবিধা ঘটিবে। আমরা শুনিয়াছি, বহু করদাতৃ ইতিমধ্যে ঘটনা-চক্রের অসাধারণত্ব হেতু অতিরিক্ত লাভকর আইনের ৬ (৩) ধারা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকারক মণ্ডলীর (Board of Referees) নিকট এবং ২৬ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় রাজস্ব-মণ্ডলীর (Central Board of Revenue) নিকট উচ্চতর লাভমানের (Higher Standard Profits) নিরিখ নির্দ্ধারণের দাবী দাখিল করিয়াছেন। অল্পকালীন কর নিরূপণ, অতিরিক্ত লাভকর আইনের নূতন ১৪-এ ধারা অনুযায়ী নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট লাভের ভিত্তি-ভূমিতে (on the basis of standard profits) নির্দ্ধারিত হইবে। ফলে, নিষ্পত্তিকারক-মণ্ডলী, কিংবা কেন্দ্রীয় রাজস্ব-মণ্ডলীর বিচারাধীন আবেদনগুলি নিষ্ফল হইবে। বস্তুতঃ, এই আবেদনকারীদিগের প্রতি কর নির্দ্ধারণ, অতিরিক্ত লাভকর আইনের নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট লাভ অনুযায়ী হইলে তাহাদের প্রতি অবিচার হইবে। অধিকাংশ করদাতৃগণের পক্ষে এই অনিশ্চিত নির্দ্ধারণের (Provisional assessment) পুরা দাবী মিটান দুঃসাধ্য হইবে। এই নিমিত্ত দেয় অর্থের শতকরা ৮০ অংশ লইয়া বাকী ২০ অংশ চূড়ান্ত নির্দ্ধারণের পরে লওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে দাবীর নির্দ্দিষ্ট কাল (Chargeable accounting periods) বিভিন্ন হইবে; কারণ, সকল প্রতিষ্ঠান একই নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে বৎসর গণনা করে না। অতিরিক্ত লাভকর আইন বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে অর্থ-সচিব ব্যবস্থা পরিষদে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, এই করের দাবী মিটাইবার সুবিধার্থ যুক্তিসঙ্গত কিস্তির ব্যবস্থা হইতে পারিবে। প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ এতই সামান্য যে, চূড়ান্ত নির্দ্ধারণে অযথা বিলম্ব ঘটিলেও সরকারের বিশেষ অসুবিধা হইবে না; বিলক্ষণ অসুবিধা এবং যথার্থ ক্ষতি ঘটিবে মন্দভাগ্য করদাতৃগণের। এই অসুবিধা ও ক্ষতি নিবারণার্থ কঠোর বিধি-বিধানের প্রয়োজন।

নূতন অর্ডিনান্স জারীর পূর্ব্বে অতিরিক্ত লাভ-কর আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী করদাতা শতকরা ২০ অংশ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জমা দিতে পারিতেন। জমা দিবার এক বৎসর পরে শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে সুদসহ এই টাকা ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল; এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত লাভ-করের এক-দশমাংশ তাহার প্রাপ্তব্য ছিল। নূতন বিধান অনুসারে এই স্বেচ্ছাকৃত জমাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই বাধ্যতার ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ঘটিবে; এমন কি, অনেককে ঋণদায়-গ্রস্ত হইতে হইবে। এই বাধ্যতামূলক জমা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-বিশেষের প্রতি কিরূপ ক্লেশকর হইবে, অঙ্কের সাহায্যে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। মনে করুন, কোন করদাতার

	(টাকা)
দাবী-কালের আয় (Income in chargeable accounting period)	৪,৫০,০০০৲
নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট কালের লাভ (Standard period profits)	৩,৬০,০০০৲
আধিক্য	৯০,০০০৲
অতিরিক্ত লাভকর (Excess profits tax)	৬০,০০০৲
জমা (Deposit)	১২,০০০৲
	৭২,০০০৲
আয় (Income)	৪,৫০,০০০৲
বাদ (Less excess profits tax)	৬০,০০০৲
	৩,৯০,০০০৲
আধিক্য (Excess)	৯০,০০০৲
বাদ (Less excess profits tax)	৬০,০০০৲
	৩০,০০০৲
৫০ পাই হিসাবে ৩০,০০০৲ টাকার উপর আয়কর (Income tax on Rs 30,000 at 50 pies)	৭,৮১২৲
১০৮ পাই হিসাবে ৩০,০০০৲ টাকার উপর বাড়তি কর (Super tax on 30,000 at 108 pies)	১৬,৮৭৫৲
	২৪,৬৮৭৲

আধিক্য (Excess)		৯০,০০০৲
অতিরিক্ত লাভকর (Excess profits tax)	৬০,০০০৲	
জমা (Deposit)	১২,০০০৲	৯৬,৬০০৲
আধিক্যের উপর আয় ও বাড়তি কর (Income tax and super-tax on excess)	২৪,৬০০৲	
	ঘাটতি	৬,৬০০৲

এই ক্ষেত্রে করদাতাকে তাহার নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট লাভের অতিরিক্ত ৬,০০০৲ টাকার ঘাটতি বহন করিতে হইবে। এই সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ একটি বিষয় বিবেচনা করিতে ভুলিয়াছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে, সার্ব্বলৌকিক যৌথ কারবারের (Public Joint Stock Companies) টাকায় দুই আনা হিসাবে একটি সম-পরিমাণ সমিতি করের (Flat Corporation Tax) তুলনায়, ক্রমবর্দ্ধনশীল প্রথায় (by the slab system) উচ্চতর হারে বাড়তি কর দিতে হয়। বাধ্যতামূলক ভাবে টাকা জমা দিবার প্রথা সার্ব্বলৌকিক (public) যৌথ কারবার অপেক্ষা ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীগত সীমাবদ্ধ (Private limited) কারবারকে অধিকতর বিপন্ন করিবে। কারণ, ভারতীয় আয়কর আইনের (Indian Income Tax Act) ২৩-এ ধারা অনুযায়ী ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীগত সীমাবদ্ধ কারবারকে অন্ততঃ শতকরা ৬০ অংশ করনির্দ্ধারণোপযোগী আয়ের উপর লভ্যাংশ (Dividend) ঘোষণা করিতে হয়। এবং বাধ্যতামূলক গচ্ছিত টাকা এই আয়ের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত অঙ্ক-তালিকায় ইহা প্রকট :—

করনির্দ্ধারণযোগ্য হিসাব-নিকাশ কালে	(টাকা)
অর্জ্জিত আয় (Profit during the Chargeable Accounting period)	১০,০০,০০০৲
নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট কালের লাভ (Standard Period Profits)	১,০০,০০০৲
অতিরিক্ত লাভ (Excess Profits)	৯,০০,০০০৲

মোট ১০,০০,০০০৲ টাকা হইতে যে যে বাবদ যত দিতে হইবে :—

৯,০০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৬৬⅔ অংশ অতিরিক্ত আয়কর	৬,০০,০০০৲
৬,০০,০০০৲ টাকার শতকরা ২০ অংশ বাধ্যতামূলক জমা	১,২০,০০০৲
১০,০০,০০০ − ৬,০০,০০০ = ৪,০০,০০০৲ টাকার উপর প্রদেয় আয়কর ও বাড়তি কর	১,৫৪,১৬৬৲
আইন অনুযায়ী শতকরা ৬০ অংশ লভ্যাংশ	১,৪৭,৫০০৲
	১০,২১,৬৬৬৲

সুতরাং এই শ্রেণীর কারবারকে শুধু যে লাভ হইতেই টাকা জমা দিতে হইবে তাহা নয়, মূলধন হইতেও দিতে হইবে। এই নিমিত্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীগত সীমাবদ্ধ কারবারগুলির ক্ষেত্রে টাকা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক না হইয়া, স্বেচ্ছামূলক হওয়া উচিত। এবং অতিরিক্ত লাভকর আইনের দ্বিতীয় তালিকা অনুযায়ী এই জমা টাকা কারবারে নিযুক্ত মূলধন রূপে গণ্য হওয়া উচিত। সুখের বিষয় যে, বাধ্যতামূলক জমার টাকা চূড়ান্ত কর-নির্দ্ধারণের পরে দিতে হইবে।

কারবারে নিযুক্ত কর্ম্মচারী ও শ্রমিকগণকে লাভের অঙ্ক হইতে যে পুরস্কার (Bonus) ও দস্তুরি (Commission) দেওয়া হয়, সরকার তাহাও সীমাবদ্ধ করিতে উদ্যত। সাধারণতঃ মোট লাভের অঙ্ক হইতে বোনাস্ ও কমিশন বাদ দিয়া কর ধার্য্য করা হয়। সরকার "নিজের কোলে অধিকতর ঝোল টানিবার" নিমিত্ত দুর্মূল্য-প্রপীড়িত শ্রমিক, কারিকর ও অন্যান্য কর্ম্মীদিগের যৎকিঞ্চিৎ উপরি পাওনাও খর্ব্ব করিয়া করনির্দ্ধারণযোগ্য অঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সরকার নিজের কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চ বেতনের উপর দুর্মূল্য-ভাতা (dearness allowance) দিতেছেন এবং কোন কোন কারবারী প্রতিষ্ঠান হইতে লোক লইয়া তাহাদিগকেও উচ্চতর বেতন দিতেছেন। যাহা হউক, আয়কর আইনের ১০ (২) ধারায় কিরূপ পরিমাণ বোনাস্ ও কমিশন কারবারী ব্যয় বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। ঐ নির্দ্দেশগুলি সরকারকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার যথেষ্ট প্রতিকূলে। তাছাড়া, বিভিন্ন কারবারে বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা। সুতরাং একটি সর্ব্বজনীন নিয়ম নির্দ্ধারণ সম্ভবপর নহে। আয়কর কর্ম্মচারীরাও মোট লাভের অঙ্ক হইতে বোনাস ও কমিশনের অংশ বাদ দিতে কঠোরতা ব্যতীত কখন কোমলতা প্রকাশ করেন না।

নির্ব্বিঘ্নে কারবার পরিচালনার নিমিত্ত ভাণ্ডারে কিরূপ পরিমাণ কাঁচা মাল মজুত থাকিবে, সে সম্বন্ধেও সরকার নিয়ম নির্দ্ধারণে উদ্যত। কারবারে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও গুদামে কি পরিমাণ মজুত রাখা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধেও বিধান নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই সকল কাঁচা ও পাকা মালের মূল্য কারবারে নিযুক্ত মূলধনের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তাহা লাভ-করের পরিধির বহির্ভূত। কাঁচা ও পাকা মালের মজুত পরিমাণ খর্ব্ব করিয়া, লাভ-করের অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে গেলে কারবারকে পঙ্গু করা হইবে। গতাগতির অসুবিধা হেতু প্রয়োজন-মত কাঁচা মাল পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা অধিক পরিমাণে মজুত রাখিতে হয়। পক্ষান্তরে, পাকা মাল চালান দিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেই যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ মাল চালান দেওয়া যায়, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। কাঁচা মাল এবং পাথুরিয়া কয়লার অভাবে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প ইতিমধ্যে অচল অবস্থার সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করিলে সরকারের যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ-কার্য্যও ব্যাহত হইবে। অতিরিক্ত লাভকর এবং বাধ্যতামূলক জমার টাকা দাখিল করিয়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত কাঁচা কিংবা পাকা মাল মজুত রাখা কখনই সম্ভবপর হইবে না। বিশেষতঃ মজুত কাঁচা মাল হইতে উৎপন্ন পাকা মাল বিক্রীত হইলেই তদুপরি প্রাপ্য সরকারী পাওনা-গণ্ডা আদায় হইবে, সুতরাং সরকারের উৎকণ্ঠার কারণ কি?

ভারতরক্ষা বিধিনিচয়ে (Defence of India Rules) একটি নূতন নিয়ম (৯৪-এ) সন্নিবেশিত করিয়া ভারত সরকার নূতন কারবারী মূলধন সংগ্রহের সঙ্কোচ সাধনপূর্ব্বক ভারতে বিভিন্ন শিল্প সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাকে অকারণ খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ, কিংবা সমবায় ভারত সরকারের সম্মতি ব্যতীত বৃটিশ-ভারতে নূতন মূলধন যাচিতে, কিংবা সার্ব্বলৌকিক ভাবে খৎ, তমসুক, কর্জ্জপত্র প্রভৃতি (Securities) বিক্রয় কিংবা মেয়াদ পূর্ণোন্মুখ খৎ, তমসুক, ঋণস্বীকারপত্রকে পুনরুজ্জীবিত অথবা পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে এ দেশে এমন কোন দ্বৈধ বাণিজ্যমূলক যৌথ কারবার সংগঠিত হয় নাই, কিংবা এমন কোন ঋণ-পত্র পুনরুজ্জীবিত অথবা পরিশোধিত হয় নাই, যাহাতে আতঙ্কের কারণ ঘটিতে পারে। সম্প্রতি কয়েকটি

ব্যাঙ্কিং, বীমা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে "ব্যাঙের ছাতার ন্যায়" যৌথ কারবার গজাইবার কোন লক্ষণ এখন প্রকাশ পায় নাই। বস্তুতঃ, মূলধন-বাজারের হাবভাব বুঝিবার নিমিত্তই ইহাদের আবির্ভাব মনে হয়।

যুদ্ধ প্রয়োজনে সম্প্রতি যে সকল বিভিন্ন শিল্পের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি সাধিবার নিদারুণ অভাব অনুভূত হইয়াছে, সেই গুলিকেই প্রচলিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এখনও যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র বর্ত্তমান প্রয়োজন সাধন হেতু নহে, ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও তাহাদের যেরূপ বনিয়াদ আবশ্যক, তদুপযুক্ত অর্থ-সংগ্রহ, সময় ও সুযোগ-সাপেক্ষ। এই শুভ-প্রচেষ্টার প্রারম্ভে বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি নিদারুণ প্রতিকূলতা। এইরূপ অনেক প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত মূলধনের অভাবে খর্ব্বাবস্থায় কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে এবং তাহার ফলে যুদ্ধকার্য্যই ব্যাহত হইবে। সরকার অবশ্য নূতন যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রবর্ত্তন একেবারে নিষিদ্ধ করেন নাই; কিংবা প্রতিষ্ঠিত কারবারের প্রবর্দ্ধিত অংশ বিক্রয়ের পথ রুদ্ধ করেন নাই। পরন্তু, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান-পত্র বিচার-বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটি বিভাগীয় সদস্য-মণ্ডলী (Departmental Committee) প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু সরকারের কোন দৃঢ় নিয়ম-নীতি এবং যুক্তিসঙ্গত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সুসম্পূর্ণ পরিকল্পনার অভাবে ভারতের বর্ত্তমান যুদ্ধোদ্যম-প্রসূত শিল্প-বাণিজ্য ও বৃত্তি-ব্যবসায়-সম্প্রসারণের সুবর্ণ সুযোগ চিরতরে অন্তর্হিত হইবে।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যখন ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্র সর্ব্ব প্রযত্নে সেই সকল দেশে শিল্প-সম্প্রসারণ নীতির সম্যক্ অনুসরণ করিতেছেন, পরাধীন ভারতের পরিচালকবর্গ তখন অত্যাবশ্যক অতি প্রয়োজনীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষীণ প্রচেষ্টাকে সবলে সংহত করিবার উপায় নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত! গত বৎসরে একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া রাজস্ব হইতে ৪২,২৩০,০০০ মিলিয়ন (নিযুত) পাউণ্ড ব্যতীত, শিল্প-সম্প্রসারণের নিমিত্ত ৪৭,২৬০,০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড ঋণ প্রদান ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বায়ত্তশাসনশীল ও স্বায়ত্তশাসনহীন রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রবল পার্থক্য এখানে প্রকৃষ্টরূপে প্রকট।

প্রবর্ত্তিত নিয়মের সুপরিচালিত প্রয়োগের নিরপেক্ষ ব্যবস্থা ব্যতীত, এই বিধানের বিধি-নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া, স্বল্প বিত্ত ও সম্পদ্-সম্পন্ন ভারতীয় শিল্পনিষ্ঠ উদ্যোগী পুরুষের পক্ষে সুপরিমিত শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অসম্ভব। কিন্তু জনসাধারণ এবং বণিক্-সম্প্রদায়ের মনে দারুণ সংশয় আছে যে, এই অস্বাভাবিক এবং অত্যদ্ভুত ক্ষমতার পরিচালন-ফল ভারতের ও ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল হইবে না। বিভাগীয় সদস্যমণ্ডলীর সহিত বে-সরকারী শিল্পব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সংযোগের অভাবে যৌথ কারবারের যথোপযুক্ত বৃদ্ধি ব্যাহত হইবার আশঙ্কাই আমাদের মনে প্রবল। এই বিধি-নিষেধের পশ্চাতে সরকারের কি গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, জানি না। সম্প্রতি সংগঠিত কয়েকটি অর্থ সংক্রান্ত যৌথ প্রতিষ্ঠানের মূলে প্রবর্ত্তকগণের ব্যক্তিগত অহমিকা কারবারের দৃঢ়তা নিশ্চয়াত্মক সঙ্কল্পকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে; এ অভিযোগ আমাদের কর্ণেও পৌঁছিয়াছে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন, তাহাই যথেষ্ট মনে হয়, এবং সরকার যদি ঐ প্রতিষ্ঠানের মারফত অর্থ সংক্রান্ত নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্ত্তন কঠোরতর সূক্ষ্মানুসন্ধান এবং দৃঢ়তর শাসনের অনুবর্ত্তী করেন, তাহা হইলে অপপ্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা প্রতিহত হইতে পারে। পরন্তু, স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত ভারতীয় মূলধনের শিল্পবাণিজ্যাভিমুখে উন্মুখ অবাধ গতিকে প্রতিহত করা কোন প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে, যৌথ কারবার ক্ষেত্রে অপরিমিত আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসান কত দিনে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। পক্ষান্তরে, দুই যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালে সরকার এবং জনসাধারণ, বিশেষতঃ শিল্প বাণিজ্য ও বৃত্তিব্যবসায়ী সম্প্রদায়, প্রচুর ও প্রচণ্ড প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে যে কঠোর শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে শিক্ষানবীশ শিল্পোৎসাহী অথচ কাজ-কারবারে অনভিজ্ঞ যুবক-সম্প্রদায় অর্থের অনর্থ এবং প্রকৃষ্ট প্রচেষ্টার নিকৃষ্ট ব্যর্থতা ঘটাইয়াছিল। এবার যুদ্ধকালেই প্রয়োজনের তাগিদে অপরিহার্য্য এবং অত্যাবশ্যক গুরু ও লঘু, মূল ও স্থূল শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে প্রবৃত্ত শিল্পোদ্যোগী পুরুষদের উৎসাহ ও উদ্যমের পশ্চাতে প্রয়োজনানুযায়ী অভিজ্ঞতা এবং সাফল্য লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প আছে। প্রয়োজনের তাগিদে সরকারেরও পৃষ্ঠপোষকতা আছে। অর্থের অনটন নাই, বরং সুপ্রাচুর্য্য আছে; সুতরাং সুযোগ ও সুলক্ষণের শুভ সংযোগ। এরূপ অবস্থায় সুপর্য্যাপ্ত অর্থের শিল্পে বিনিয়োজন ব্যাহত করিলে সেই অর্থের গুরু চাপ স্বল্পপরিমিত ক্ষীয়মাণ ভোজ্য ও ভোগ্য দ্রব্যের উপর আপতিত হইবে। তাহাতে সরকারের উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল প্রদান করিবে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি উভয়ই প্রচণ্ডতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।

নূতন অতিরিক্ত লাভ-কর অর্ডিনান্সের সাহায্যে শতকরা ৬২⁄₃ অংশ ব্যতীত সমস্ত লাভের অঙ্ক সরকারের তহবিলে টানিয়া লইলে এবং ভারতরক্ষা নিয়ম-নিচয়ের নূতন ধারা অনুযায়ী নিত্য-নূতন যৌথ-কারবারের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠিত-প্রচলিত পুরাতনের প্রসার হেতু সুপ্রচুর অর্থের বিনিয়োজন প্রতিহত করিলে কি মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি অনিষ্টের সংশোধন হইবে? ভারত সরকার কিছু কাল হইতে যে আর্থিক নীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহাই কি এই দুর্দ্দৈবের নিমিত্ত দায়ী নহে? প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ভারতীয় পণ্যের বিদেশে বিক্রয় এবং ইউনাইটেড কিংডম্ কমার্শিয়াল করপোরেশনকে অযথা সুবিধা ও বিশেষ অধিকার কিংবা অনুগ্রহ প্রদর্শন কি ভারতীয় শিল্পী ও বণিক্-সম্প্রদায়ের মনে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্য ও বৃত্তি-ব্যবসায় বিস্তার সম্পর্কে অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে না? বৃটিশ-ভারতে ব্যতীত, বৃটিশ-ভারতের বহির্ভাগে, এমন কি দেশীয় রাজ্যসমূহে অবস্থিত যৌথ কারবার সম্পর্কে বৃটিশ ভারতীয় ধনিক ও অংশীদারগণের অধিকার খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্য কি? প্রচলিত যৌথ-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এরূপ অধিকার-খর্ব্বের অর্থ কি অধিকার-বঞ্চনা (Expropriation) নহে? বিশেষতঃ, যেখানে বৈদেশিক কিংবা দেশীয় রাজ্যাভ্যন্তরস্থ যৌথ কারবার, তাহাদিগকে অংশ প্রদান করিতে উৎসুক ও উদ্যত? এই দুইটি কঠোর বিধান অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পী-বণিক্ সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করা সরকারের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল।

অসামরিক সম্প্রদায়ের ভোজ্য ও ভোগ্য দ্রব্যের (Consumer's Goods) একান্ত অনটন ও অভাব এবং তাহার উপর অপরিসীম মুদ্রাস্ফীতির প্রচণ্ড চাপে দ্রব্যাদির অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে যে জটিল ও কুটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রতিকারকল্পে শিল্পোন্নতি ও উৎপাদন-বৃদ্ধি প্রয়োজন। বিলাতে ভারতের অনুকূলে যে ষ্টার্লিং-সংস্থিতি পুঞ্জীভূত হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে ভারতে অজস্র কাগজের নোট প্রচলিত হইতেছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার, বৃটিশ ও মিত্রশক্তিসঙ্ঘ কর্তৃক ক্রীত ভারতীয় রসদ, বস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের বিনিময়ে, ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সম্পত্তিকে ভারতীয় অধিকারে হস্তান্তরণ। বিলাতে আমাদের ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া কর্তব্য ছিল। এখনও এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব, সমীচীন ও স্বাভাবিক। ইহাই ভারতীয় জনসাধারণের এবং শিল্পী-বণিক্ সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত সুদৃঢ় অভিমত। সরকারের মারফতে এই হস্তান্তরণে অনেক জটিল ও কুটিল প্রশ্ন ও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিতে পারে। এই নিমিত্ত বেসরকারী জন-সংসদ অথবা শিল্পী-বণিক্-সঙ্ঘ-সম্প্রদায়ের মারফতে এই আদান-প্রদান অনুষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সরকারী তদারক তত্ত্বাবধানই যথেষ্ট হইবে। কিছু ষ্টার্লিং, কিছু ডলার এবং আমাদের সহিত বাণিজ্য-সংসৃষ্ট অন্যান্য দুই একটি দেশের মুদ্রা প্রকারের কিছু সংস্থিতি অবশ্য থাকিবে। কিন্তু শুনিতেছি, সরকার এই অতি সমীচীন উপায়ের পরিবর্ত্তে আমাদের বিলাতী পরিচারকবর্গের পেনসন, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রভৃতি অনাগত প্রাপ্যের নিমিত্ত আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি হইতে ২৪০ মিলিয়ন পাউণ্ড একটি কায়েমী ভাণ্ডারে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের হেফাজতে রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এ প্রস্তাব গত বাজেটে ছিল। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি নিবারণের ইহাই কি প্রতিকার?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারের বর্ষা

এবারের বর্ষা
সব আশা-ভরসা
করে দিল ফর্শা!
অর্থাৎ রবি-শশি-তারকার চিহ্ন
একেবারে লুপ্ত—ছিন্ন ও ভিন্ন!
সকাল কি সন্ধ্যা, নিশি-মধ্যাহ্ন—
ঘড়ি ছাড়া নির্ণয়ে পন্থা নান্য!
ঊর্দ্ধে চাহিলে দেখি আকাশ তো নাই!
পথে পথ ছিল কি না, খুঁজিয়া না পাই।
জলে-জলে জলময়—যেতে চাই গাম্‌লা!
ট্রামগাড়ী বন্ধ! বাসে প্রাণ সাম্‌লা!
পার্কেতে যাবো কি? শুধু পাঁক-কর্দ্দম!
জামা-জুতো পচে ঢোল ভিজে-ভিজে হরদম্!
পৃথিবীর চার-ভাগে এক-ভাগ থল্ ভার—
এবারের বর্ষায় ধুয়ে মুছে একাকার!
বন্ধুরা—বেণী, ভোলা, অম্বর গুপ্ত—
দেখা নাই। কোথা গেল? টিকি সব লুপ্ত!
ঘরে বসে পচে মরি নিজ্‌ঝুম্ নিশ্‌চুপ!
বাহিরেতে অবিরাম জল ঝরে ঝুপ্‌ঝুপ!
ভোজ্যের চাল-আটা মিলছিল মাগ্যি—
জলে তার আশা গেল—কম দুর্ভাগ্যি!
কন্‌ট্রোলে যেতে হলে প্রাণ হা-হা-হস্ত
রিফাইন্ সে-লাইন জল তলগস্ত!
হাসি নাই, আলো নাই, নাই সুখ-শান্তি
ঘন ঘোর আঁধিয়ার—অবসাদ-শ্রান্তি!
এবারের বর্ষায় ভগ্ন অদৃষ্টে
বন্ধন চারি দিকে আষ্টে ও পৃষ্ঠে!
এ বাঁধন হতে ত্রাণ নাই ইহ-জন্মে—
ঘটে যা, তা দেখে বেশ বুঝিতেছি মর্ম্মে!
এত চাপ, এত দাপ—নাই আর রক্ষে!
দায় হলো প্রাণটাকে ধরে রাখা বক্ষে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ঝড়

ঝড় উঠিয়াছে অস্ত-সাগর-পারে,
প্রলয়-আরাবে কম্পন লাগে ধরণীর চারি ধারে।
যে পথে সে চলে, ওঠে বসবাস, লোটে মানবের ধাম,
আকাশের পথে আগুন ঢালিয়া পোড়ায় নগর-গ্রাম;
গৃহে, রাজপথে, বনে, গহ্বরে, কোনোখানে নাহি ত্রাণ,
লক্ষ বক্ষ বিদারি ক্ষণেকে খেলাছলে নাশে প্রাণ,
জননীর বুকে শিশু উড়ে যায় ধূলি-ধূমে আঁধিয়ারে,
অস্ত-সাগর-পারে।

তারি এক ভাগ ছুটিয়া আসিছে পূর্ব্ব-আকাশ হতে,
শ্যামল মানুষে রাঙিয়া রক্ত-স্রোতে;
মোরা অসহায়, কম্পিত বুকে প্রতি মুহূর্ত্ত গণি,
যত দিন যায় ঘনাইয়া আসে, কাণে উঠে রণরণি
তারি তাণ্ডব, আকাশে-বাতাসে মহা-আশঙ্কা রাজে,
কোটি কোটি জন অতি অশরণ, কোথা যাবে জানে না যে!
অকূল সাগরে কে ভিড়াবে তরী? বড় আঁধি, দিশা নাই!
মাঝি, কোথা তুমি ভাই?

আকাশ কি নীল? ধরণী কি শ্যাম? আজি ত যায় না বলা,
বড় দুর্গম জীবনের পথে চলা।
কে দিবে অন্ন? কে দিবে বস্ত্র? ডাক পড়িয়াছে তার!
মহান্ সেবার হেন মহাক্ষণ আসে নাই আর বার!
অকপট বীর-পুরুষরা কোথা? শ্রম-স্নেহশীলা নারী?
ডাক পড়িয়াছে তারি।
আশ্বাস দাও, বিশ্বাস দাও, শক্তি-সাহস দাও,
আঁধার নেমেছে, প্রভাতও আসিবে এ-হেন অভয় গাও!
মরণে বাঁচার পথ খুঁজে দিতে, বিদায় করিতে নিশা,
দিশারি, দেখাও দিশা।

শ্রীগোপাললাল দে

ঠাকুর্দ্দা

(গল্প)

সুধীরচন্দ্র দাঁ আর সুধীশচন্দ্র খাঁ দু'জনেই আই, এস্, সি পাশ করে কলকাতার মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে ঢুকলো। এবং দু'জনেই মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে এক হোটেলে পাশাপাশি ঘরে থাকতো। কালীতারা হোটেলটি নামে হোটেল হলেও কার্য্যত: মেডিকেল কলেজ-হোষ্টেলের মত হয়ে গিয়েছিল। অনেকগুলি সিঙ্গল-সিটেড ঘর এবং প্রায় প্রত্যেকটিতেই মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ২৭নং ঘরে থাকতো সুধীরচন্দ্র দাঁ আর ২৮এ থাকতো সুধীশচন্দ্র খাঁ। দু'জনেরই ডাক-নাম সুধা। সেই নামেই সকলের কাছে তারা পরিচিত। পরস্পরকে তারা স্যাঙ্গাত বলে ডাকে। দু'জনেরই পয়সা আছে—বড় লোকের ছেলে—মফঃস্বলে বাড়ী; এবং দু'জনে বন্ধুত্ব বেশ নিবিড়।

এক দিন সুধীর দাঁ ঘরে বসে একখানা নভেল পড়ছে, শরীর খারাপ বলে সে দিন বেড়াতে বেরোয়নি, এমন সময় মোটা বেঁটে মাথা-জোড়া-টাক খোঁচা-খোঁচা-দাড়ি এক বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে বছর তিনেক বয়সের একটি ছেলে। ঘরে ঢুকেই এক-গাল হেসে তিনি বললেন, "কি সুধা, ভাল তো?" আগন্তুককে সুধীর জীবনে কখনও দেখেনি! এমন পরিচিত আহ্বানে সে বিস্মিত হলো। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললে—"আপনাকে চিনতে পারছি না তো!"

হো-হো করে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে তিনি বললেন—"চিনতে পারবে কোত্থেকে? তোমার বাবা যখন এই এতটুকু (সঙ্গের ছেলেটিকে দেখালেন), তখন আমি ব্যবসা করতে বর্ম্মায় যাই। যুদ্ধের হিড়িকে এই কিছু দিন আগে প্রায়-পদব্রজে ফিরে এসেছি বললে ভুল হবে না। সম্পর্কে আমি তোমার বাবার পিসে হই অর্থাৎ তোমার দাদু। দাদা, তোমার আর এক জন দাদাকে প্রণাম করো।"

খোকাটি এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে বিস্কুট খাচ্ছিল। বিস্কুট শেষ হতে বলে উঠলো, "বাবার কাছে যাব।" সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কি ক্রন্দন। গলার এবং ফুসফুসের জোর দেখে সুধীর অবাক! এইটুকু ছেলের গলার যখন এমন ভলিউম, তখন কালে ও-একটা বড় দরের ওস্তাদ না হয়ে যায় না! যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে সুধীর বললে—"আপনি বসুন দাদু। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?" দাদু বসলেন এবং সঙ্গী নাতিটিকে সুধীরের খাটের ওপর বসিয়ে দিলেন। তার নোংরা পায়ে সুধীরের ফর্সা বিছানা বিচিত্র রাগে রঞ্জিত হলো। মুখে ক'টা কড়া কথা এসে পড়েছিল—কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে চেপে গেল। দাদু স্মিত হাস্যে বললেন—"তার পর সব ভাল তো? বাড়ীর সকলে ভাল আছে?" বিনীত ভাবে সুধীর বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" খোকার নন-ষ্টপ গলা-সাধা চলেছে! বৃদ্ধ বললেন—"দাদা-ভাইয়ের বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে।" ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সুধীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে যখন ফিরলো, তখন তার হাতে এক-চ্যাঙ্গারী খাবার। বৃদ্ধ এবং তাঁর ক্ষুদ্র নাতিটি এমন রেটে আহার আরম্ভ করলে যেন ফাঁসীর খাওয়া! ভোজন-পর্ব্ব চুকলে বৃদ্ধ বললেন—"দাদা, বড় আপ্যায়িত করলে। বুড়ো মানুষ, এই এক পেট খেয়ে এখন তো নড়তে পারব না। বাইরে গাড়ী দাঁড় করিয়ে এসেছি। ভেবেছিলুম, তোমার দেখা না পেলে চলে যাব। তাকে পাওনাটা মিটিয়ে দিয়ে আসি। আমার কাছে দশ টাকার নোট রয়েছে। তুমি যদি খুচরো একটা টাকা দাও তো বড় সুবিধা হয়।" টাকা দিতে সুধীরের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু করে কি! বর্ম্মার দাদু! বাবার পিসে-মশাই! দিতে হলো। ভদ্রতা!

বৃদ্ধ ফিরে এসে আবার গট্ হয়ে বসলেন। এ-কথা সে-কথা চলতে লাগল। এমন সময় স্যাঙ্গাত সুধীশচন্দ্র খাঁ এসে ঘরে ঢুকল। সুধীর পরিচয় করিয়ে দিলে—"ইনি আমার দাদু আর এ হলো আমার বন্ধু সুধীশচন্দ্র খাঁ।" বৃদ্ধকে সুধীশ প্রণাম করলে। বৃদ্ধ তার দিকে এক-দৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—"এ্যাঁ, তোমার নাম সুধীশচন্দ্র খাঁ! সুধা?" সুধীশ উত্তর দিলে—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" বৃদ্ধ চটে লাল! "তবে ও কে? ও তো আমার নাতি নয়! অথচ ও বললে ওর নাম সুধা। এ রকম মিথ্যা বলার মানে?" সুধীশ বললে—"আপনি অনর্থক রাগ করছেন। ওর নামও সুধা, সুধীরচন্দ্র দাঁ। এ রকম ভুল অনেকেরই হয়।" বৃদ্ধ বললেন—"সে যাই হোক, এখন তোমার ঘরে চলো। এখানে আমি আর এক দণ্ড থাকব না।" অতঃপর খোকা-নাতিসহ বৃদ্ধ ট্রান্সফার্ড হলেন সুধীশের ঘরে। খোকার কান্না তখন থেমে গেছে, কারণ, তার দু'হাতে এবং মুখের মধ্যে একটি করে রসগোল্লা। সুধীর বেচারীর বিছানা রস-সিক্ত হলো।

সুধীশের ঘরে এসে বৃদ্ধ নিজের পরিচয় দিলেন—"আমায় বোধ হয় চিনতে পারছ না দাদা! আমার নাম অধমতারণ তা। চিনবেই বা কি করে? তুমি তখন জন্মাওনি! তোমার বাবাই তখন এতটুকু এইটুকু (সঙ্গের ছেলেটিকে দেখালেন)। আমি ব্যবসা করতে বর্ম্মায় যাই। যুদ্ধের হিড়িকে এই কিছু দিন আগে প্রায়-পদব্রজে এখানে ফিরে এসেছি। সম্পর্কে আমি তোমার বাবার পিসে হই, অর্থাৎ তোমার দাদু।" তার পর মামুলি কিছুক্ষণ সাংসারিক কথাবার্ত্তা হলো। ততক্ষণে রাক্ষুসে নাতির রসগোল্লা ভোজন পরি-সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং আবার তার ক্রন্দন সুরু হলো। বৃদ্ধ বললেন—"দাদা-ভাই, তুমি যদি এই টাকাটা নিয়ে কিছু লেবেঞ্চুস আর পাণ নিয়ে এসো তো বড় ভাল হয়। ছেলেটা চুপ করে, আমারও মুখ-শুদ্ধি হয়।" সুধীশ বললে—"আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। গলির মোড়ে দোকান আছে। আমি এনে দিচ্ছি। আপনি বসে বিশ্রাম করুন।" এই কথা বলে সে ঘর থেকে বেরি

পাণ এবং লজেঞ্চেস নিয়ে ঘরে ফিরে এসে সুধীশ দেখে, দাদু নেই। ছেলেটা একলা বসে তার ঘরে "বাবার কাছে যাব" বলে চীৎকার করে কাঁদছে। বৃদ্ধ কোথাও গেছে এখনই আসবে—মনে করে ক্রন্দন-রত ক্ষুদে-রাক্ষসের হাতে লজেঞ্চেসের ঠোঙাটা দিয়ে সুধীশ বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু বৃদ্ধ আর ফেরে না। তখন সুধীরের ঘরে গিয়ে বললে—"আমি পাণ আর লজেঞ্চেশ্ আনতে গিয়াছিলুম—ফিরে এসে দেখি, দাদু নেই। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, তিনি ফিরছেন না। ওদিকে যে-নাতিটিকে রেখে গেছেন, কেঁদে সে বাড়ী ফাটিয়ে ফেললে!"

ততক্ষণে হোটেলের অন্য ছেলেরাও এসে পড়েছে। এক জন বললে—"থানায় চল। যদি কোন এ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে!" সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলে। জামা-কাপড় পরতে গিয়ে সুধীশ দেখে, সর্ব্বনাশ! তার রিষ্ট-ওয়াচ, পার্কার পেন এবং মনি-ব্যাগ গায়েব! সুধীশ স্তম্ভিত। তবে কি ঠাকুর্দ্দা চুরি করেছে? কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে? চুরি করে কেউ ছেলে রেখে যায়? ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠলো। শেষে পুলিশে খবর দেওয়াই স্থির হলো।

ছেলে নিয়ে সুধীশ, সুধীর এবং হোটেলের আরও ক'জন ছাত্র থানায় গিয়ে হাজির! যাবার সময় হোটেলের ম্যানেজারকে বলে যাবার কথা কারও মনে হলো না। সব শুনে ইন্সপেক্টর বললেন—"আপনার ঠাকুর্দ্দা বলে যিনি পরিচয় দিলেন, তাঁকে আপনি চেনেন?" সুধীশ উত্তর দিল—"আজ্ঞে না। জীবনে কখনও তাঁকে দেখিনি। দেখবো কি করে? বললেন, আমার জন্মাবার আগেই তিনি বর্ম্মায় গিয়েছিলেন ব্যবসা করতে!" তিনি বললেন—"তা হলে কোন জোচ্চোর আপনাকে ঠকিয়েছে নিশ্চয়। ছেলেটিকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেছলো হয়তো!" ঠিক সেই সময় এক জন হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। এসে বললে, "মশাই, আমার ছেলে হারিয়েছে!" তার পর হঠাৎ হারানো দাদুর এই নাতিকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটিও "বাবা" বলে ছুটে তাঁর কাছে গেল। ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন—"আপনার ছেলে?" তিনি উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপিসে গেছি, হঠাৎ চাকর গিয়ে খবর দিলে, খোকাকে পাওয়া যাচ্ছে না! সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ কি! খোকার গলার হার?"

ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। জাল-ঠাকুর্দ্দা ছেলে ভুলিয়ে এনে তার গলার হার চুরি করেছে এবং হোটেলে এসে সুধীশকেও বেকুব বানিয়ে চম্পট দেছে! যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। থানায় ডায়েরি করে সকলে ফিরে এলো।

ঠাকুর্দ্দা ওরফে অধমতারণ তা হোটেলের সামনে এক রেস্তরাঁয় চা পান করছিলেন এবং দরজার পিছনে বসে হোস্টেলের ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন। সুধীর, সুধীশ এবং আরও অনেকগুলি ছেলে তাঁর আনীত সেই খোকাকে নিয়ে হল্লা করতে করতে চলে গেল—দেখে তিনি মনে মনে খুবই প্রীত হলেন। চা পান শেষ করে ধীর-পদক্ষেপে বৃদ্ধের মত ঠুকঠুক করতে-করতে আবার তিনি হোটেলে প্রবেশ করলেন। এবার কিন্তু কোন বাসিন্দার ঘরে নয়, একেবারে ম্যানেজারের আপিসে এসে হাজির। ম্যানেজার নমস্কার করে চেয়ারে বসতে বলে প্রশ্ন করলেন—"কাকে চান?" প্রতি-নমস্কার করে বৃদ্ধ বললেন—"আমার নাম জ্যোতির্ষার্ণব দিব্যেন্দ্রসুন্দর চতুর্ব্বেদী শঙ্খচক্র-গদাপদ্মনিধি। সুধীশচন্দ্র দাঁর কুল-গুরু। তার সঙ্গে একবার দেখা করব।" ম্যানেজার নকুড়চন্দ্র কন্থুই অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। কপালে চন্দন-তিলক গলায় তুলসীর মালা। তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি বললেন—"বসুন. আমি দেখে আসছি।" ভক্তিতে তিনি এমন গদগদ হয়ে পড়লেন যে, চাকরকে ডেকে খোঁজ করতে না বলে নিজেই চললেন দেখতে। উঠে দাঁড়াতেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মনিধি মহাশয় বলে উঠলেন—"দাঁড়ান।" কন্থুই মশাই ব্রেক-কষা গাড়ীর মত হঠাৎ নিষ্কম্প স্থির হয়ে দাঁড়ালেন—একেবারে নট-নড়ন-চড়ন নট্‌-কিচ্ছু। নকুড়চন্দ্রের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে জ্যোতির্ষার্ণব নিজের মনে বললেন—আশ্চর্য্য! ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য! নকুড় বাবু ভীত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"কি আশ্চর্য্য দেখলেন?" চতুর্ব্বেদী উত্তর দিলেন—"আপনার ললাটে রয়েছে রাজ-টীকা। শীঘ্রই ধন-প্রাপ্তির সম্ভাবনা।" নকুড়চন্দ্র বিনয়ে কুঁকড়ি হয়ে বললেন, "কবে আর পাব বলুন! বয়স তো কম হলো না।" জ্যোতির্ষার্ণব বললেন, "শীঘ্রই পাবেন। আচ্ছা, আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আমি ধ্যানে দেখে নিচ্ছি প্রাপ্তি-যোগ কবে।" নকুড়চন্দ্র বাইরে গেলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-নিধি চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। মিনিট খানেক পরেই নকুড় বাবুকে ডাকলেন। তিনি ভিতরে আসবামাত্র নিধি মহাশয় তাঁর হাত ধরে একটু চিন্তা করবার পর বললেন—"আচ্ছা, আপনি হাতের মুঠো বন্ধ করে ভগবানের নাম করুন। যতক্ষণ না বলি, মুঠো খুলবেন না।"

একটু পরে নিধি বললেন—"এবার মুঠোটা খুলুন।" নকুড়চন্দ্র মুঠো খুললেন—কিন্তু আশ্চর্য্য! হাতের তালুতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ১৩৫০! নকুড়ের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া এবং শঙ্খচক্রগদা-পদ্মনিধি ভক্তিতে শিবনেত্র! নিধি বললেন—"এই বছরেই প্রাপ্তি-যোগ! সবই তাঁর ইচ্ছা!" গদগদ নকুড়চন্দ্র পাঁচটি টাকা প্রণামী দিয়ে বললেন—"এ অধমের উপর এতই যখন দয়া করলেন, তখন আরও একটু অনুগ্রহ করুন। কি উপায়ে ধন লাভ হবে, সেটা বলে দিন।" অত্যন্ত বিনয়-সহকারে নিধি বললেন—"আমি তার কি বলব! কর্ত্তা তিনি, আমি উপলক্ষ মাত্র। তবে যখন ধরে বসেছেন, বলছি—যদিও আমার গুরুর নিষেধ। কষে বার করতে হবে। একটু দেরী লাগবে। আপনি ততক্ষণ সুধাকে ডেকে আনুন।" "বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি।" এই কথা বলে নকুড়চন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরে সুধীশকে না পেয়ে নকুড়চন্দ্র ঘরে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মনিধি মহাশয় নেই! একখানি চিঠি পড়ে আছে। পড়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে—"আমি ধ্যানে জানতে পারলুম, সুধীশ হোটেলে নেই। আপনি লটারীর টিকিট কিনুন। ধন-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।" নকুড়চন্দ্রের ভক্তি-রস গাঢ়তর হয়ে উঠল!

সুধীর, সুধীশ এবং অন্যান্য ছেলেরা ততক্ষণে হোটেলে ফিরে এসেছে। তাদের দেখে নকুড়চন্দ্র বললেন—"কোথায় গিছলেন সুধীশ বাবু?" "থানায়"—বলে সুধীশ সমস্ত ঘটনা খুলে বললে। সব শুনে নকুড় বাবু বললেন—"বটে! ব্যাপার তো তাহলে রীতিমত ঘোরালো। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, আপনাদের গুরুদেব এসেছিলেন।"

"আমাদের গুরুদেব!" বিস্মিত হয়ে সুধীশ বললে।

নকুড় বাবু উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। নাম বললেন জ্যোতির্ষার্ণব শ্রীদিব্যেন্দ্রসুন্দর চতুর্ব্বেদী, শঙ্খচক্রগদাপদ্মনিধি।" সুধীশ অবাক!—"ও নামের কাউকে আমি চিনি না।" এমন সময় মুদীর লোক এসে হাজির—"বাবু, আজ টাকা দেবেন বলেছিলেন—দেবেন কি?" নকুড়চন্দ্র বললেন—"নিশ্চয়। তোমাদের টাকা আমি আনিয়ে রেখেছি। দেরাজে আছে, দিচ্ছি। কৈ, চাবীটা কোথায় গেল? টেবিলের ওপরই রেখেছিলুম যে।"

খুঁজতে খুঁজতে চাবী মিললো টেবিলের তলা থেকে। দেরাজ খুলে ম্যানেজার আর্ত্তনাদ করে উঠলেন—"সর্ব্বনাশ!"

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন! ছেলেরা প্রশ্ন করলে—"কি হলো নকুড় বাবু?" তিনি প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর দিলেন—"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক থেকে আজ দুশ' টাকা এনে রেখেছিলুম। তার একটি কাণাকড়ি নেই,—সব গেছে!" সুধীশ প্রশ্ন করলে—"আপনি সমস্ত ক্ষণ ঘরে ছিলেন?" তিনি জবাব দিলেন—"প্রায় সমস্ত সময়ই ছিলুম বৈ কি! মধ্যে মিনিট দশেকের জন্য শুধু আপনাকে খুঁজতে গেছলুম।" সুধীর জিগ্যেস করলে—"ঘরে তখন আর কেউ ছিল?" নকুড়চন্দ্র উত্তর দিলেন—"আপনার গুরুদেব ছিলেন।" সুধীশ চটে উঠল—"থামুন। আমার গুরুটুরু কেউ নেই!" "তবে?" তবে আর কি! থানায় খবর দেওয়াই সাব্যস্ত হলো।

সব শুনে থানার ইন্সপেক্টর বললেন—"এ দেখছি সেই ঠাকুর্দ্দার কাজ! আপনি যখন ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, চাবী আপনার সঙ্গে ছিল?" নকুড় বাবু উত্তর দিলেন—"না, টেবিলের উপর পড়েছিল। নিয়ে যেতে ভুলে গিছলুম। কিন্তু তিনি এক জন সাধুপুরুষ!" ইন্সপেক্টর বললেন—"সাধুপুরুষ না ছাই! ভক্তিগদগদ লোককে ঠকাবার জন্য অনেক জোচ্চোরই সাধু সেজে ঘোরে!" নকুড়চন্দ্র এ-কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন—"কিন্তু আমার হাতে লেখা ফুটে উঠলো!

ইন্সপেক্টর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"সে আবার কি ব্যাপার?" নকুড়চন্দ্র তখন তাঁর ধনপ্রাপ্তির শুভ সংবাদের কথা জ্ঞাপন করলেন। শুনে ইন্সপেক্টর হেসে বললেন—"এ অতি সহজ ব্যাপার! নিজের হাতের বুড়ো আঙ্গুলে উলটো করে ১৩৫০ লিখে আপনার হাত চেপে ধরেছিল। তাই লেখা ফুটে উঠেছিল।" নকুড়চন্দ্র রেগে বললেন—"ব্যাটাকে আমি আবার পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়েছি মশাই। তাকে আমি জেলে দেবো।" ইন্সপেক্টর বললে—"ধরতে পারলে তবে তো!"

সকলে হোটেলে ফিরে এল। ঠাকুর্দ্দাকে আর পাওয়া গেল না! সুতরাং সুধীশের ঘড়ি, পেন, মণিব্যাগ কিম্বা নকুড়চন্দ্রের টাকারও আর উদ্ধার হলো না। সুধীরের একটা টাকা আর কিছু মিষ্টান্নের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে! কিন্তু এর পরে হোটেলে-কলেজে টেঁকা সুধীশ আর সুধীর দু'জনের পক্ষেই মুস্কিল হয়ে উঠলো! কলেজ শুদ্ধ ছেলেরা তাদের ক্ষেপাতে লাগলো—"কি হে, ঠাকুর্দ্দার খবর কি?" এ দিকে নকুড়চন্দ্রও উঠতে-বসতে বলতে লাগলেন—"আপনাদের ঠাকুর্দ্দার জন্যই আমার এই সর্ব্বনাশ হলো! দু'দুশো টাকা, মশাই।" শেষে অতিষ্ঠ হয়ে দু'জনেই ট্রান্সফার নিয়ে ঢাকায় চলে গেল।

শ্রীযামিনীমোহন কর

—

জলের বুকে বন্ধু

এ বর্ষায় বাংলা দেশের চারি দিকে আবার বন্যার প্রাদুর্ভাব। ঘর-বাড়ী ক্ষেত-খামার ডুবে কত লোকের অকাল-বিয়োগ ঘটছে, ভাবলে জ্ঞান থাকে না!

বন্যার জলে ডুবে যাঁরা গতাসু হ'চ্ছেন, সাঁতার না জানার দরুণ যে তাঁদের অনেকের অপমৃত্যু ঘটেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই! সাঁতার জানা থাকলেও বন্যার খরস্রোতে প্রাণ রক্ষা করা কঠিন সত্য; তবু সাঁতার জানা থাকলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা কতক সম্ভব হয়!

সাঁতার সকলের শেখা উচিত! কারণ, জলযানে ভ্রমণ করতে বিপদ ঘটা বিচিত্র নয়! সাঁতার জানা থাকলে জলমগ্ন মানুষ বা পশুর জীবন রক্ষা করা যেতে পারে!

১। তোলা একখানি হাত ধরিয়া

খুব ভালো সাঁতার জানা থাকলেও জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারকল্পে জলে নামতে হলে কলা-কৌশল দুরস্ত থাকা প্রয়োজন: নচেৎ রক্ষা করতে গিয়ে রক্ষা-কর্ত্তাকেও অনেক সময় জলমগ্ন ব্যক্তির সঙ্গে অতল জলে তলিয়ে যেতে হয়! এমন ঘটনা অনেক ঘটে।

২। জলমগ্নের মূর্চ্ছা হইলে

চোখের সামনে মানুষ বা পশু-পাখী জলে ডুবে মরছে দেখলে কার প্রাণ না চঞ্চল হয়ে ওঠে? তাদের উদ্ধার করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে মানুষ কাতর হয় না। কিন্তু যিনি সাঁতার জানেন না, এ দায়ে তিনি যদি উদ্ধার করতে জলে নামেন, তাহলে জলে যিনি ডুবছেন, তাঁর সঙ্গে উদ্ধার-কর্ত্তারও রক্ষা পাবার আশা থাকে কম।

সাঁতারে যিনি পটু, তিনিও জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে জলে ঝাঁপ দিলে কতকগুলি বিষয়ে যেন হুঁশিয়ার থাকেন! কি সে বিষয়, তারই সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলছি।

'জলে-ডুবি'র মত বিপত্তি ঘটলে মানুষের জ্ঞান থাকে না, আঁকু-পাঁকু করে রক্ষা পাবার প্রয়াস পান উগ্র-রকম। তার ফলে দু'দণ্ড যদি বা ভেসে থাকা যেতো, সে-উপায় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। এ অবস্থায় সাঁতার-জানা কোনো ব্যক্তি উদ্ধারের জন্য জলে নামলে জলমগ্ন ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে এমন জড়িয়ে ধরেন যে, সে-চাপে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে উদ্ধার-কর্ত্তার পক্ষে রক্ষা পাওয়া দায় হয়। যিনি উদ্ধার করতে জলে নামবেন, এ কথা মনে রাখা তাঁর উচিত, জলগ্নম ব্যক্তি যদি সচেতন থাকেন, তাহলে তাঁর নাগাল থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা। জলমগ্ন ব্যক্তিরও উচিত ১নং ছবির ভঙ্গীতে দু' হাত তুলে মাথা উঁচু করে জলে চুপচাপ থাকা। উদ্ধার-কর্ত্তা তাঁর একখানি উত্তোলিত হাত ধরে তাঁর নাগাল থেকে নিজেকে সতর্ক ভাবে যথাসম্ভব দূরে রেখে কূলের দিকে জলমগ্ন ব্যক্তিকে টেনে আনবেন। জলমগ্ন ব্যক্তি যদি নিশ্চেতন বা দুর্ব্বল হন, তাহলে ২নং ছবির ভঙ্গীতে তাঁর বুকের উপর দিয়ে হাত চালিয়ে তাঁকে বক্ষলগ্ন করে কূলে নিয়ে আসতে হবে। জলমগ্ন ব্যক্তি যদি উদ্ধার-কর্ত্তাকে চেপে ধরেন, তাহলে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে জলমগ্ন

৩। সবলে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া

৪। কূল হইতে দূরে—সারবন্দী ভাবে

ব্যক্তিকে সবলে ঠেলে সরিয়ে তাঁর আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে—নচেৎ দু'জনেরই মরণ সুনিশ্চিত।

জলের স্রোত যদি প্রখর হয় এবং যদি দেখেন, কূল থেকে বেশ খানিকটা দূরে কেউ জলমগ্ন হচ্ছে, তাহলে ভালো রকম সাঁতার জানলেও এক জনের পক্ষে রক্ষা-কার্য্যে নামা খুব নিরাপদ নয়। এমন অবস্থায় চার-পাঁচ জন সাঁতার-জানা ব্যক্তি বিপত্তিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে সাঁতার-জানা উদ্ধার-কর্ত্তারা ৪নং ছবির মতো লাইন-বন্দী ভাবে অবস্থান করে জলমগ্ন ব্যক্তিকে তীরে আনবার ব্যবস্থা করবেন।

——

বড় হওয়া

বড় হওয়ার মানে বয়সে বা মাথায় বাড়িয়া বড় হওয়া নয়; কৃতিত্বের জোরে পৃথিবীতে নিজেকে বড় করিয়া তোলা। কি করিয়া মানুষকে বড় করিয়া তোলা যায়, সে সম্বন্ধে আমেরিকায় অনু-শীলনাদির সীমা নাই! অনুশীলন এবং পরীক্ষা করিয়া মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা বলেন—বড় হইতে হইলে জ্ঞানানুশীলন ছাড়া অন্য উপায় আর নাই!

আমাদের দেশে কথা আছে—বিদ্যা মহা-ধন; এ ধন যত দান করিবে, তত বাড়িবে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানোপার্জ্জনের মত উপার্জ্জন আর নাই; জ্ঞানোপার্জ্জন করিলে সে উপার্জ্জনের সুদ দিন-দিন বাড়িবে—সে সুদের মার নাই। আমেরিকার এক জন ক্রোড়পতি অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন—যদি প্রচুর টাকা রোজগার করিতে চাও, তাহা হইলে কৃপণতা নয়! টাকা খরচ করিয়ো। এক পয়সা বাঁচাইবার দিকে যার ঝোঁক, ঐ এক পয়সার উপরে তার পুঁজি আর কোনো দিন বাড়িয়া দু'পয়সা হইবে না। যে দু'পয়সা রোজগার করিতে চায়, তার আকাঙ্ক্ষাও ঐ দু'পয়সাতে পর্য্যবসিত হইবে—দশ পয়সা তার ভাগ্যে কদাচ ঘটিবে! মারি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার—এই নীতিই ভালো। ইংরেজীতে কথা আছে—Make thy projects high.

অর্থ বা কৃতিত্ব, খ্যাতি বা প্রতিপত্তি যদি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে দেহ-মনের স্বাস্থ্য ভালো করো। জগতে যাঁরা কৃতী হইয়াছেন, তাঁরা একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন, ভালো স্বাস্থ্য এবং শিক্ষিত মন—এ দু'টির মত মূলধন আর নাই! তাছাড়া সবার উর্দ্ধে বড় হইয়া যদি দাঁড়াইতে চাও তো জানিয়ো, ঐ অক্ষুন্ন

ভালো স্বাস্থ্য এবং শিক্ষিত মন—ইহাদের উপর ভর করিয়াই শুধু বড় হইয়া দাঁড়ানো যায়। স্বাস্থ্যকে ভালো এবং মনকে শিক্ষিত করিতে চাহিলে নিয়ম মানিতে হইবে—সব বিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তী হইতে হইবে।

যে-সব কৃতী মহাজন নব নব আবিষ্কারে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁরা ধনীর গৃহে জন্ম লন নাই। তাঁরা ছিলেন দরিদ্র ঘরের সন্তান। টাকা থাকিলেই মানুষ শিক্ষা লাভ করিতে পারে, নচেৎ পারে না—এ ধারণা যে কতখানি ভুল, আবিষ্কারক এই সব কৃতী মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিলে তাহার অকাট্য প্রমাণ মিলিবে।

যে হেনরি ফোর্ড পৃথিবীর মধ্যে আজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি ছিলেন প্রথম জীবনে সামান্য এক জন মিস্ত্রী। কিন্তু মিস্ত্রীর কাজ করিয়াই তিনি দিন কাটাইতেন না—ঘরে বসিয়া জ্ঞান-চর্চ্চা করিতেন। তাই তাঁহার কৃতিত্বে পৃথিবী আজ ধন্য হইয়াছে।

এডিশন প্রথম জীবনে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্যে বিজড়িত থাকিলেও জ্ঞান-লাভের জন্য তাঁর স্পৃহা, আগ্রহ এবং চেষ্টা ছিল অসাধারণ রকম! বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারও ইঁহারা মাড়ান নাই—মাড়াইবার সামর্থ্য ছিল না। ঘরে বসিয়া জ্ঞানানুশীলন করিয়া ইঁহারা বড় হইয়াছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও ঘরে বসিয়া জ্ঞানানুশীলন করিয়াছেন; পাশ করিয়া মেডেলের মালা গলায় ঢুলান্ নাই! কিন্তু তাঁর শিক্ষা, কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কাছে ইউনিভার্সিটির মেডেল-মার্কা কোনো দিগ্‌গজ দাঁড়াইতে পারেন না!

স্কুল-কলেজে পড়া উচিত। সে সুযোগ যাদের মেলে, তাদের উচিত, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। তাই বলিয়া কলেজে পড়িবার সুযোগ না মিলিলে শিক্ষা লাভ হইবে না—এ কথা ঠিক নয়। শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া এগজামিন পাশ করিয়াই যারা ভাবে, চূড়ান্ত শিক্ষা লাভ করিলাম, আসলে তারা হয় পণ্ডিত-মূর্খ! তাদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় ছোট গণ্ডীর মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই জন্যই দেখি, ইউনিভার্সিটির পাশের তক্‌মা-আঁটা বহু ছাত্রের পর-জীবন নামহীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত থাকে!

আসল যে শিক্ষা, সে শিক্ষায় মনের কোনোখানে অজ্ঞান-অন্ধকার থাকিতে পারে না। জীবন-যাত্রার উপযোগী হইতে হইলে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা লাভ প্রয়োজন। সেক্সপীয়রের নাটক বা ব্রাউনিংয়ের কবিতার মর্ম্ম বুঝিলেই চলিবে না—কি করিলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, বিবিধ রোগে প্রতিকার কি, আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় কেন? অমাবস্যা-পূর্ণিমা কি? সূর্য্যগ্রহণের অর্থ কি—অর্থাৎ জীবনে যাহা কিছু দেখি শুনি, সে সব বিষয় জানিতে হইবে! ও-সবে বিমূঢ়ের মত অবাক হইয়া থাকিলে চলিবে না। এক দিক দিয়া পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া অন্য সব ব্যাপারে অজ্ঞ থাকিলে জীবন-যাত্রায় পদে পদে বাধা ঘটিবে—জীবনে সাফল্য বা কৃতিত্ব লাভের আশা থাকিবে না।

জীবনকে সফল করিতে চাহিলে, কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া নিজের নামকে বরণীয়-স্মরণীয় করিতে চাহিলে আলস্যে বা বিলাসে এক-তিল সময় নষ্ট করা নয়! শুধু জিওমেট্রি এ্যালজেব্রা বা গ্রামার শেখা নয়—ছুতার, কামার, মুচি, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর কাজও কিছু-কিছু জানা চাই। নহিলে বহু ক্ষেত্রে শুধু যে বেকুব বনিতে হইবে, তা নয়—লেখাপড়া শিখিলেও পরের হাতে পুতুল বনিয়া দিন কাটিবে।

ভবিষ্যতের ভাবনা

যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধের জন্য আজ চারি বৎসর কাল ভারতবাসীদিগকে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এ কষ্ট দ্বিবিধ। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার প্রয়োগে এবং অপপ্রয়োগে ভারতবাসীর সামান্য যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, তাহাও বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিসে অপরাধ হয়, কিসে হয় না, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন। কাজেই লোকে প্রাণ খুলিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছে না। কিন্তু ইহার চেয়ে আর্থিক দিক্ দিয়াই লোকের কষ্ট আরও ভীষণ হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রদেশে বহু লোক খাদ্য-অভাবে মৃতপ্রায়—অনেকে মরিয়া যাইতেছে। এরূপ অনাহারে কত লোক মরিতেছে, কে বলিবে? এই সে দিন—২রা শ্রাবণ সহর কলিকাতার রাজপথ হইতে ২৭টিরও অধিক হিন্দুর শব সরানো হইয়াছিল! অহিন্দু কত, তাহা প্রকাশ পায় নাই। সরকার সে সংবাদ দিতে পারিতেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টই বা প্রকাশ হইল না কেন? মফঃস্বলে যে অনেক লোক মরিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকলেই নিজ নিজ সঙ্কট অবস্থা লইয়া ব্যস্ত, এ অবস্থায় তাহারা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে কি করিয়া? সুতরাং রাজনীতিক সঙ্কট যত দারুণ হউক, আর্থিক সঙ্কট যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! এখন সাধারণের পক্ষে উভয়বিধ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ-লাভের ইচ্ছা এবং চেষ্টা স্বাভাবিক। তন্মধ্যে রাজনীতিক দিক্ হইতে আমাদের মুক্তি পাইবার আশা অতি অল্প। কারণ, উহা আমাদের শাসকদিগের ইচ্ছা এবং প্রসন্নতার উপর নির্ভর করিতেছে। এবং আমরা গত চারি বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারা কোন মতেই ভারতবাসীকে রাজনীতিক মুক্তি দিতে সম্মত নহেন। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত-সচিবের উক্তি হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। আর্থিক উন্নতির দিক্ হইতেও আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারি না। যাঁহাদের হস্তে রাজনীতিক অধিকার ন্যস্ত, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে ভারতবাসীর যে কোন প্রচেষ্টায় বাধা দিতে পারেন, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য না করেন, তাহা হইলে প্রায় কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাহা হইলেও আমরা আর্থিক দিকে কিছু হয়তো করিতে পারি, শাসকগণ তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বাধা দিতে পারেন না।

রাজনীতিক দিক্ হইতে কেহ কেহ আশার ক্ষীণ আলোক দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেছেন। আমাদের বিশ্বাস, এ বিষয়ে বিশেষ উৎফুল্ল বা আশান্বিত হইবার কোন কারণ ঘটে নাই। অনেকে

বলিতেছেন, এই যুদ্ধের পরে যখন শান্তি-স্থাপন হইবে, তখন সমস্ত সম্মিলিত শক্তির মত লইয়াই যাহা করা উচিত, তাহা করা হইবে। তাহা আমরা এখন ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী ব্যাপার দেখিয়া সকলের তাহা বুঝা উচিত। বিগত মহাযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিবর্গের অন্যতম প্রবল শক্তি মার্কিণের প্রেসিডেণ্ট উইলসন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা যদি যথাযথ ভাবে গৃহীত ও প্রতিপালিত হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের এই ভীষণ লোকক্ষয়কর এবং জগৎ-জোড়া যুদ্ধ কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। কিন্তু সে যুদ্ধ-শেষে যখন মীমাংসার কথা উঠিয়াছিল, তখন মিত্রপক্ষের অন্যান্য শক্তিবর্গ বিজয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া প্রেসিডেণ্ট উইলসনের কথা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট উইলসন অন্যান্য মিত্রশক্তিবর্গের চক্রান্তে একেবারে 'বোকা বনিয়া' গিয়াছিলেন। গ্রেট বৃটেনের এবং ফ্রান্সের সাধারণ লোক যে প্রতিহিংসামূলক সন্ধি করিয়াছিলেন,—সেইরূপ প্রতিহিংসামূলক সন্ধি যদি এবারও করা হয়, তাহা হইলে এ যুদ্ধেই ভবিষ্যৎ শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না। মিষ্টার হ্যামডেন জ্যাকসন বিগত যুদ্ধের সন্ধি সম্বন্ধে তাঁহার The Post-war World গ্রন্থে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল (১)। ঐরূপ প্রতিহিংসামূলক সন্ধির জন্যই যে বর্ত্তমান যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রেসিডেণ্ট উইলসন সেই জন্য সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, এই ভবিষ্যদ্‌-বাণী করিয়াছিলেন। এবারও কিরূপ ভাবে সন্ধি হয়,—সর্ব্ব দেশের সকল লোকের রাজনীতিক স্বার্থ কিরূপ ভাবে রক্ষিত হয়,—তাহা না দেখিলে কিছুই বলা যাইতেছে না। কেবলমাত্র বিজয়ী জাতির গৌরব প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অন্যের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া কোন ব্যবস্থা করিলে কোন লাভই হইবে না। আবার বহু লোকের শোণিতে ধরণী প্লাবিত করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। ইহাই অনেক মনস্বী নর-নারীর মত। শ্রীমতী পার্ল বাক যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন। বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে তাঁহার সেই বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। শুনিতে পাই, উহা লইয়া নিউইয়র্ক সহরে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। পার্ল বাক বলেন—বর্ত্তমান যুদ্ধ যে সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল,—উহা এখন সে ভাব পরিত্যাগ করিতেছে। তিনিই শুধু এ কথা বলেন নাই, য়ুরোপের আরও অনেক মনস্বী লেখক এ কথা বলিয়াছেন। মিষ্টার বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন যে, যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ যুদ্ধের পর আবার যুদ্ধ হইবে। গত ১০ই এপ্রিল তারিখে 'নিউ লীডার' পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ধনিক-শাসিত মার্কিণ এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত শেষ পর্য্যন্ত অন্য শক্তিবর্গের মতের কতটা মিল হইবে, তাহা অনুমান করা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু বিলাতের সাম্রাজ্যবাদীর দল ইঁহাদের এই হিতবাণী শুনিবেন বলিয়া মনে হয় না। মহামায়ার মায়াচক্রে বিঘূর্ণিত এবং ঐশ্বর্য্য-মদে প্রমত্ত ব্যক্তিরা সহজে হিত-বচন শুনিতে সম্মত হন না। সেই জন্য সংসারে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, এত বাদ-বিসম্বাদ। গত বারের অভিজ্ঞতায় সম্মিলিত শক্তিবর্গের যদি প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা আমাদের এবং ধরাবাসী সমস্ত মানব জাতির ঘোর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। মিষ্টার বার্ণার্ড শয়ের মতে রুশিয়া এবং চীনই প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। ইংলণ্ড ধনিক-শাসিত, সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী। মার্কিণও বোধ হয় অনেকটা ঐরূপ। তথাকার চিন্তাশীল লোকরা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেও পদস্থ লোকেরা তাহা নন। আটলাণ্টিক চার্টারের ঘোষণা-বাণী ভারতের সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি না, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এ পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া বৃটেনের অপ্রীতিভাজন হইতে চাহেন না। কিন্তু বৃটেনের প্রধান-সচিব মিষ্টার উইনষ্টন চার্চ্চিল স্পষ্ট ভাষায় এবং অকুতোভয়ে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের কিংবা এসিয়ায় কোন জাতির সম্বন্ধে এই চার্টারের প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইবে না। ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র গ্রেট বৃটেনই দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহা দিবেন না। চার্চ্চিলের উক্তিতেই তাহা সুপ্রকাশ। অতএব ভারতবাসীর রাজনীতিক আশা সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

মার্কিণের জনগণ ইদানীং ভারতের অবস্থা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া এদেশে অনেকে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে মনে বিপুল আশা পোষণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, দূর হইতে সহানুভূতি প্রকাশ করা যত সহজ, ভিন্ন দেশকে স্বাধীনতা প্রদানের চেষ্টা তত সহজ নয়। মার্কিণের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক এদেশের অবস্থা জানিবার জন্য ব্যগ্র এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এদেশবাসীর উপর সহানুভূতি-সম্পন্ন, তাহাও সত্য। কিন্তু তাঁহারা কি করিতে পারেন? তাঁহারা বড় জোর গ্রেট বৃটেনকে তাঁহাদের ভুল দেখাইতে পারেন, হয়ত বা বিশেষ অনুরোধ করিতে পারেন,—কিন্তু তাহার অধিক আর কিছুই করিতে পারেন না। মার্কিণের বিগত প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচনের সময় যে মিষ্টার ওয়েণ্ডেল উইল্‌কী নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে রিপাবলিক্যান দলের মুখপাত্র হইয়া রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন,—"তিনিও ভারতবাসীর পক্ষে কতকগুলি সহানুভূতি-সূচক উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই সহানুভূতি-সূচক বাক্য কেবল ভারতবাসীর সম্বন্ধে নহে, ধরাবাসী সমস্ত অশ্বেত জাতির সম্বন্ধে। তিনি 'কৃশ্চিয়ান এডভোকেট' এই কথাই লিখিয়াছেন যে, এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, এই পৃথিবীর সমস্ত নরনারীই জাতি, ধর্ম্ম এবং বর্ণনির্ব্বিশেষে রাজনীতিক চেতনা লাভ করিয়াছে। তাঁহার আসল কথা এই যে, যে সকল ব্যক্তি সেই সেকেলে ধূয়া ধরিয়া আছেন," যে, বর্ণী জাতিরা শ্বেতকায় জাতির ভারস্বরূপ, এবং সহর্ষে বলিয়া থাকেন যে, এই বিষয়ে যুদ্ধের

(১) The readers of Northcliff (The Times and the Daily Mail) wanted a vindictive peace and helped to win the election of a vindictive House of Commons. The French public wanted a vindictive peace and even blamed the octogenarian Clemenceau for being too lenient. They got the peace they deserved.—The Post-war World, page 31.

পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল পরেও সেই অবস্থায় থাকিবে, তাঁহারা হয় হিসাব জানেন না, অথবা জানিয়াও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন! বহু শতাব্দী ধরিয়া নির্ব্বিঘ্ন ভাবে বশ্যতা স্বীকার করিয়া এসিয়ার কোটি কোটি লোক উজ্জ্বল আলোক দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা আর পাশ্চাত্ত্য জাতির প্রাচ্য-ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে চাহে না। আফ্রিকায়, মধ্য প্রাচীতে, চীনে এবং সমস্ত প্রাচ্যখণ্ডে জনগণের মতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উচ্ছেদই স্বাধীনতার অর্থ। সার্ব্বত্রিক যুদ্ধের ইহাই প্রথম লক্ষ্য ছিল, এ কথা বলিলে অধিক বলা হইবে না। সম্প্রতি আমাদেরও উহাই লক্ষ্য, ইহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই।" তাঁহার এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, প্রাচ্যখণ্ডের সর্ব্বত্রই রাজনীতিক এবং আর্থিক স্বাধীনতার জন্য লোক জাগ্রত হইয়াছে,—ইহা তিনি বেশ বুঝেন। কিন্তু সে কথা কে না বুঝে? মিষ্টার চার্চ্চিল এবং মিষ্টার আমেরী প্রভৃতি সকলেই তাহা বুঝেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা পশুবলে তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। আমরা অহিংসার পথে আমাদের মুক্তি পাইবার জন্য চেষ্টা করিব। অহিংসার পথে ফললাভ করিতে বিলম্ব ঘটে। কাজেই এ যুদ্ধের পর আমরা রাজনীতিক-মার্গে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারিব, এ আশা উপস্থিত দুরাশামাত্র!

আমরা যখন সাত্ত্বিক ভাবে আমাদের অভীষ্ট লাভ করিতে চাহি, তখন আমাদের ব্যস্ত হইলে কাজ হইবে না। আমাদের মন হইতে শত্রু, মিত্র সকলের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। সাত্ত্বিক পথ সহিষ্ণুতার পথ। কিন্তু এই পথে থাকিয়া সাধনা করিতে পারিলে ভগবানের আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হইবে। ইহার ফলে আমরা যে কল্যাণের অধিকারী হইব, তাহা স্থায়ী হইবেই হইবে। প্রতিহিংসার প্রণোদনে যাহা করা যায়, তাহা সফল হইলেও তাহার সেই আশুফল ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। য়ুরোপের বর্ত্তমান অশান্তি তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। আমরা সেই জন্য অহিংসার পথে, সাত্ত্বিকতার পথে, মনুষ্যোচিত পথে আমাদের দেশবাসীকে মুক্তির সন্ধান করিতে বলি।

কিন্তু রাজনীতিক অধীনতা অপেক্ষা আর্থিক বিষয়ে পরবশ্যতা অত্যন্ত ভীষণ। এ পর্য্যন্ত বহু বলদৃপ্ত জাতিই সাম্রাজ্যবাদী হইয়াছে। রোম আদি সাম্রাজ্যবাদী। গ্রীসে মেসিডন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। প্রাচীন কালে রোমক সাম্রাজ্য অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের জন্যই রোমকদিগের অধঃপতন ঘটিয়াছিল, ইতিহাস-পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। কালের ফুৎকারে এবং স্বকীয় কর্ম্মদোষেই সেই রোমক সাম্রাজ্যের সব গিয়াছে,—আছে কেবল অত্যাচারের স্মৃতি আর সাম্রাজ্যের নাম। স্পেনের সাম্রাজ্য আমেরিকায় বিশেষ বিস্তার-লাভ করিয়াছিল, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। উহা যেন ঐন্দ্রজালিকের দণ্ড-স্পর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দমকা বাতাসে নিবিয়া গিয়াছে। ভগবান্ স্পেনকে যে সুবিধা দিয়াছিলেন, সেই সুবিধা পাইয়া স্পেনবাসীদের মাথা এত দূর টলিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা এক দিকে অত্যাচারে অতিসম্পাত অর্জ্জন করিয়া অন্য দিকে বিলাসে আত্মহারা হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিধাতার নিশ্বাসে যে দিন অজেয় স্পেনিস রণতরী (Armada) সাগর-বক্ষে নিমজ্জিত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে যদি স্পেনবাসীরা সাবধান হইতে পারিত, তাহা হইলে এখন তাহাদিগকে এমন দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না। স্পেনের পর পর্ত্তুগালের রাজ্যবিস্তার-কাহিনীও বিস্ময়জনক। পর্ত্তুগালও ভগবানের প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া আজ অতীত গৌরবের নামশেষ মাত্র হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার ব্রাজিল রাজ্য এখন স্বাধীন। এই তিনটি সাম্রাজ্যবাদী জাতি তাহাদের অধীন দুর্ব্বল জাতিদিগের উপর অত্যাচার করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিল। রোমকরা বরং কতকটা ভাল ছিল। তাহারা অধীন দেশে সভ্যতার বিস্তার সাধন করিয়াছিল। সাড়ে তিন শত বৎসর কাল রোমকদিগের অধীনে থাকিয়া গ্রেট বৃটেনের—বিশেষতঃ দক্ষিণ বৃটেনের—অধিবাসীরা সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রোমকদিগের আমলে বৃটেনের অধিবাসীরা সম্মিলিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা বৃটেনের বন্দীদিগের এক দিকে যেমন লাভ হইয়াছিল, অন্য দিকে তাহারা দুর্ব্বল এবং আত্মরক্ষায় অক্ষম হয়। সেই জন্য তাহারা অ্যাঙ্গলো জাতি কর্ত্তৃক সহজে পরাভূত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। রোমক-অধিকারে বৃটেনগণ সুখে ছিল বলিয়া রোমক সাম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইয়াছিল। তথাপি রোমকরা যে কোনরূপ অত্যাচার করে নাই, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। বোডেসিয়ার কাহিনী তাহার বিশেষ উদাহরণ। স্পেন এবং পর্ত্তুগাল তাঁহাদের অধীন রাজ্যে চেষ্টা করিয়া বিশেষ উপকার করেন নাই,—সেই জন্য তাঁহাদের রাজ্য অতি অল্প দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

পর্ত্তুগালের পর ইংরেজ জাতিই জগতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। রোমক, স্পেন এবং পর্ত্তুগালের সাম্রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা বৃটিশ জাতির সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৃটিশজাতি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া অধীন রাজ্যের ধন সবলে অধিকার করিবার জন্য কখনই চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের প্রথম হইতেই উদ্দেশ্য ছিল, এই বিস্তীর্ণ দেশে বাণিজ্য-বিস্তার। বাণিজ্য করিতে হইলে দেশে শান্তি স্থাপন করিতে হয়। সেই জন্য ইঁহারা যখন যে দেশ অধিকার করিয়াছেন, তখনই সেই দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার এবং আমাদের জাতীয়তা-বোধের উচ্ছেদ সাধন করেন নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু আমাদের দারিদ্র্য-মোচনের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

অভাব এবং দারিদ্র্য মানুষের মনে ঘোর তিক্ততা এবং অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এদেশে একটি প্রাচীন প্রবচন প্রচলিত আছে যে, "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্" অর্থাৎ ক্ষুধা-কাতর লোক সর্ব্বপ্রকার পাপই করিয়া থাকে। এদেশে এই দারিদ্র্যের প্রবল কারণ শিল্প-বাণিজ্যের অতিমাত্র সঙ্কোচ-সাধন। সরকারী নীতির ফলেই যে এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ কথা সত্য যে, গ্রেট বৃটেনে ধনের এবং ধনিকের সম্মান অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ধন-জনিত কৌলীন্য বৃদ্ধির ফলে বিলাতের সকলেই ধন-উপার্জ্জনে অতিশয় যত্নশীল হইয়াছেন। ঐ দেশে শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উন্নতি হওয়ায় সেখানে অল্প ব্যয়ে অত্যন্ত অধিক পণ্য উৎপাদন করা যাইতেছে। এই উৎপন্ন পণ্যের সামান্য ভগ্নাংশও তাঁহাদের স্বদেশে প্রয়োজন হয় না। সুতরাং উহা তাঁহারা বিদেশেই কাটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য বৃটিশ ধনিক এবং কারবারের

অধিকারীরা ঐ সকল উদ্বৃত্ত পণ্য তাঁহাদের অধিকৃত দেশে বিক্রয় করিতে বদ্ধপরিকর। উহার সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ দরিদ্র এবং অসহায় জাতিদিগের শিল্প-বাণিজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ফলে ঐ সকল দেশে দারিদ্র্য অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সঙ্গে তথাকার লোকের মনে দারিদ্র্য-জনিত বেদনা এবং অসন্তোষ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে শাসক জাতির মধ্যে যে সকল ধনিক আছেন, তাঁহারা অর্থার্জ্জনের জন্য এতই লোলুপ যে, ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা চিন্তা করিতে পারিতেছেন না। দুই-এক জন চিন্তা করিলেও কি হইবে, ইহার প্রতিকারের উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কাজেই এ সমস্যার সমাধান তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় কঠিন। তবে অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থলোলুপ ধনিকই এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নহেন। কারণ, তাঁহারা সামরিক লোক-সংহারক যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল অধীন দেশকে চির-পরাধীন করিয়া রাখিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর ভারতবর্ষ বৃটিশের অধিকারে আছে। এই দীর্ঘকালে ভারতের আর্থিক দিকে যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা কোন মতেই বলা যায় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক্‌রা যখন এদেশে প্রথম বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, তখন এদেশে শিল্প-বাণিজ্য অনেক উন্নত ছিল, তাহা তৎকালীন অনেক লেখকের লেখা হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু আজ সে শিল্প-বাণিজ্য কোথায়? উহা একে একে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহা যখন বৈদেশিক পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেছিল, তখন এদেশের লোক এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিতে পারে নাই।

পক্ষান্তরে, বহু কাল অরাজকতার পর ইংরেজ যখন কতকটা এই দেশবাসীর ধর্ম্মকার্য্য অবাধে করিতে দিয়াছিলেন, এবং দেশীয়দিগের মধ্যে অনেকটা ন্যায় বিচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন এ দেশের লোক তাহাতে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিল। সেই জন্য জার্ম্মাণ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারও বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজ জাতি কেবল দেশজয় করিতে জানে না, তাহারা দেশ শাসন করিতেও জানে।

বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত এই অবস্থা বেশ চলিয়াছিল। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে যখন এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন হয় এবং দেশে বেকার লোকের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পায়, তখনই জঠরজ্বালায় কাতর ভারতবাসীর দৃষ্টি এদিকে পতিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন যখন সরকার কর্ত্তৃক নির্ম্মম ভাবে উপেক্ষিত হইতে লাগিল, তখনই এ বিষয়ে এদেশের লোকের চৈতন্য সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, এই সময়ে তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বেকারের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের বহু লোক দুই বেলা আহার সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। বহু লোক অন্নাভাবে মরিয়া যাইতেছে। পৌনে দুই শত বৎসর কাল বাঙ্গালা দেশ, তথা ভারতবর্ষ, বিবিধ সাংঘাতিক রোগ-বীজাণুর (microbes) লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ্যে ভেদনীতি প্রচারিত এবং সমর্থিত হইতেছে। ভারতবাসীর যেন নাভিশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা একে একে অপহৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু এই চৈতন্য লাভের মূল কারণ জঠরজ্বালা। ধনিক সাম্রাজ্যবাদীদিগের শোষণ-নীতিই ইহার কারণ। এই অবস্থা যখন সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত করিতেছিল, তখনই মহাত্মা গান্ধী অহিংসানীতি এবং ক্রিয়াহীন প্রতিরোধ নীতি (passive resistance) প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু বিলাতী ধনিকদিগের মধ্যে যাহারা সাম্রাজ্যবাদী এবং অতিমাত্র অর্থলোভী, তাহারা সকল বিষয়ে প্রধান থাকায় ভারতের শাসন-নীতি পরিবর্ত্তন করা কিছুতেই সম্ভব হয় নাই।

এইরূপ আর্থিক এবং রাজনীতিক কারণে ভারতীয় জনসাধারণের মনে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। তাহার পর বিগত যুদ্ধের সময় মিষ্টার মণ্টেগু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের মন কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা এদেশের রাজনীতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনের মত হয় নাই। সেই জন্য লোকের মনে অসন্তোষ আবার তীব্র ভাবে দেখা গিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদীদিগের নকিবরা কঠোর পশুবল প্রয়োগে এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেনাপতি ডায়ার এই সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিরস্ত্র ব্যক্তিদিগের এক সভায় গুলী চালাইয়া ৪ শত নিরীহ লোককে নিহত এবং ১২ শত লোককে আহত করিয়াছিল। তাহার সেই ঘোর নিষ্ঠুরতার কার্য্যের জন্য ধনিক-চালিত বিলাতের লর্ড-সভা ডায়ারের এই বীরত্বের জন্য ২৬ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ভারতীয় ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন! ইহাতেই বুঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদী ধনিক ইংরেজরা এদেশবাসীর অসন্তোষ কি প্রকারে নিবারণ করিতে চাহেন! কিন্তু ইহার ফল যে বিপরীত হইয়াছে, তাহা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও বুঝিয়াও বুঝেন না, দেখিয়াও দেখেন না! ইহার ফলে আব্রহ্ম ভারতের সর্ব্বত্রই যে অসন্তোষের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কালে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে কি না, বুঝা কঠিন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেষ্টারের পিটার্লু প্রান্তরে (পিটার্স ফিল্ড) নিরীহ আন্দোলনকারীদিগের উপর গুলী চালাইবার ফলে বিলাতে কিরূপ অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা ইংরেজমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু সেই হাঙ্গামায় ১৩ জন মাত্র নিহত এবং ৬ শত জন আহত হইয়াছিলেন। গ্রেট বৃটেনে যাহারা এই ঘোর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদিগকে কেহই পুরস্কৃত করে নাই, সকলেই তিরস্কার করিয়াছিল।

কিন্তু বিগত যুদ্ধের পর একটা শুভ লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। এই সময়েও ভারতে শ্রমশিল্পের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। দেশের লোকের হাতে কিছু অধিক অর্থ আসিতেছিল,—অর্থাৎ দেশের টাকা অনেকটা দেশের লোকের হাতে থাকিতেছিল, বিদেশী শিল্পজীবীদিগের হাতে চলিয়া যাইত না। এখনও সেই অবস্থা আছে। ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি পূর্ব্বে গড়ে ১ শত কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত করিত,—বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহা সাড়ে ৪ শত কোটি গজে পরিণত হয়। এই সাড়ে তিন শত কোটি গজের কাপড়ের মূল্য ত ভারতেই থাকিয়া যাইতেছিল। জাতীয়তার দিক দিয়া এ লাভ সামান্য নয়। অন্যান্য আরও কতকগুলি শিল্পজ পণ্য ভারতে এইরূপ অধিক প্রস্তুত হইতেছিল। সেই জন্য এই বিস্তীর্ণ দারিদ্র্য-দগ্ধ দেশবাসীর মন অনেক শান্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজনীতিক দিক হইতে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবাসীর অগ্রগতি-সম্পাদনে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সে জন্য ভারতে রাজনীতিক ভাবে ভাবিত

অর্থাৎ শিক্ষিত জনসাধারণের মনের তৃপ্তি তাদৃশ ঘটে নাই। কংগ্রেস স্বায়ত্ত-শাসন এবং মুক্তির আশ্বাস পাইলে তবে যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কংগ্রেস বৃটিশ জাতির সমরায়োজনে বাধা দিবেন না, এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন। গান্ধীজী সিভিল ডিসোবীডিয়ান্স চালাইবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু চালান নাই। এদিকে জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করে। প্রায় নিখিল য়ুরোপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জার্ম্মাণীর করতলগত হইয়াছে। এখন এই যুদ্ধ কত দিন চলিবে তাহা বুঝা কঠিন। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন, ইহা আরও কয়েক বৎসর চলিতে পারে। ইহার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরেজকে এই যুদ্ধের ব্যয় বিশেষ ভাবে বহন করিতে হইতেছে। সামরিক প্রয়োজনে ইংরেজ ভারত হইতে যুদ্ধের জন্য আবশ্যক পণ্য লইতেছেন। এমন কি, খাদ্যদ্রব্য পর্য্যন্ত তাঁহারা বিদেশে চালান দিতেছেন। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কল্পনাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। ইহার ফলে যাহারা রাজনীতিক কারণে শাসকদিগের উপর অসন্তুষ্ট হয় নাই,—তাহারা অনাহারে মরিতেছে বলিয়া অসন্তুষ্ট এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ইংরেজ বিগত যুদ্ধের পর হইতে যে বৈদেশিক বাণিজ্য হারাইয়াছেন, এবার তাহার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য স্বতঃ এবং পরতঃ চেষ্টা করিতেছেন। বৃটিশ-বাণিজ্য অন্যান্য দেশেও সঙ্কুচিত হইয়াছে, ভারতেও সঙ্কুচিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে বৃটিশ-বাণিজ্যের সঙ্কোচ নিবারণ করা সহজ হইবে না,—বৃটিশ জাতির অধীন ভারতে তাহা করা কতকটা সম্ভব হইবে। কিন্তু এদেশের শিল্প-বাণিজ্য যাহাতে সঙ্কুচিত না হয়, ভারতবাসীকে তাহার জন্য প্রাণান্ত পণে চেষ্টা করিতে হইবে। আত্মরক্ষার জন্য, জাতির সম্পদ্ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবাসীকে তাহা করিতে হইবে।

কিন্তু এই যুদ্ধের সময় সামরিক এবং অন্যান্য কারণে ভারতীয় শিল্প সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলি নূতন। কিন্তু কয়লা সরবরাহের অভাবে সেগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কলগুলি বন্ধ হইলে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইবে। কারণ, উহাতে যে সকল মজুর কাজ করিতেছে তাহাদের কাজ যাইবে। তাহারা নানা দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং কেহ অনাহারে মরিবে এবং কেহ ক্ষুধার জ্বালায় অন্য কর্ম্মে এবং অপকর্ম্মে লিপ্ত হইবে। এই প্রকারে অনেক কলওয়ালারা দক্ষ শিল্পী হারাইবে। কেবল বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় নাই। কাচ-শিল্প প্রভৃতি বহু শিল্পেরই এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। এ জন্য দায়ী কে?

দায়ী সরকার। কারণ, সরকার যদি এদেশে মালগাড়ী এবং রেলওয়ে এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার কিছু ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে কখনই আজ এ দশা উপস্থিত হইত না। সরকার তাহা না করিয়াই এই দশা ঘটাইয়াছেন। তাই সমগ্র বঙ্গ-প্রদেশ জুড়িয়া রন্ধনের কয়লার অভাবে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, —কলিকাতায় লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনস্বরূপ জলের কল অচল হইবার শঙ্কা উঠিতেছে। তবে এই সকল ব্যাপারে বুঝা যায় যে, সরকার ইচ্ছা করিলে অথবা ভুল করিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিলে তাহারা শিল্পের বাধা ঘটাইতে পারেন। মানুষ অনিচ্ছায় যে ভুল করে, সরকারও সে ভুল করিতে পারেন। তাহার ফলও মন্দ হইতে পারে। অনেক সাধারণ লোকের ভ্রান্তি বা প্রমাদ-জনিত নীতির ফলে কুফল যেরূপ ফলে, সরকারের ভ্রান্তিজনিত কর্ম্মের কুফল তদপেক্ষা প্রবল ও স্থায়ী ভাবে প্রকাশ পায়। কারণ, সরকারের কার্য্য বহু লোকের বিবেচনা-প্রসূত এবং বহু প্রজার উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইংরেজ জাতি এই দেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কৃষির কিছু উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, —কিন্তু ভ্রমেও কোন প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করেন নাই।

সরকারের রাজ-নীতিক এবং অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা কিরূপ খাতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, এ প্রবন্ধে স্থূলভাবে সেই কথাই বলিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমরা এখনও ভবিষ্যতের আশা-ব্যঞ্জক কোন ক্ষীণ আলোকও দেখিতে পাইতেছি না। অর্থনীতিক দিকেও আমরা তিমিরান্ধকারে দিশাহারা হইয়া বসিয়া আছি।

এ কথা সত্য, গ্রেট বৃটেনের সহিত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য অধিক হইতেছে। ভারতের সহিত গ্রেট বৃটেনের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে তাহা হইবেই। ঘরখরচা এবং ঋণের সুদ বাবদ ভারতকে প্রতি বৎসর অনেক টাকা দিতে হয়। ইদানীং ঘরখরচা (Home charge) অনেক কমিয়াছে এবং সরকারের বিলাতী ঋণ প্রায় পরিশোধ হইয়াছে। ইহাতে বিলাতী দেনার পরিমাণ অনেক কমিবে। কিন্তু ভারতে গ্রেট বৃটেনের ধনিকদিগের প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ ২ শত ৭০ লক্ষ টাকা মূলধন নানা ব্যবসায়ে ও কারবারে নিযুক্ত আছে। উহার লভ্যাংশের প্রায় সমস্তই বিলাতে যায়। ভারতে এই যুদ্ধের সময় যে পাউণ্ড ষ্টার্লিং জমিয়াছে, তাহা দিয়া উহার কতক অংশ পরিশোধ করিবার প্রস্তাবে বিলাতের ধনিক নাছোড়বান্দা সাম্রাজ্যবাদীরা কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন, যুদ্ধের পরে পুনর্গঠনের সময় ঐ পাউণ্ড ষ্টার্লিং হইতে যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু কেনা হইবে। আপাততঃ ঐ টাকা জমা রহিল। তাহা হইলে ভারতের পক্ষে শিল্পক্ষেত্রে ঐরূপ করিলে বিশেষ উপকার হইবে না,—বরং ক্ষতির সম্ভাবনা। ইহা ভিন্ন মূল্যস্ফীতি প্রভৃতির ফলে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে কি না, বলা কঠিন। সেই জন্য ভারতবাসীকে ঐ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। ফলে আর্থিক ব্যাপারেও আমাদের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ নহে। এক্‌স্‌পোর্ট ইনষ্টিটিউটে মিষ্টার আমেরী এবং মিষ্টার ওয়াট্‌সনের বক্তৃতা পড়িয়া অতিমাত্র আশ্বাম্বিত হইলে চলিবে না। তবে রাজনীতিক ক্ষেত্রে এদেশে যেমন চোরা বালির সৃষ্টি সম্ভব—জনসাধারণের আস্থাহীন ব্যক্তিকে যেমন জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানে কৌশলে বা অন্য উপায়ে বসান সম্ভব,—আর্থিক ব্যাপারে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আর্থিক ক্ষেত্রে দেশের লোকের কতকটা প্রভাব থাকিবেই। সেই জন্য আর্থিক ব্যাপারে কথা কহিতে গিয়া আমেরী-ওয়াটসন কোম্পানীর সুর অত খাদে নামিয়াছে। এখন ভারতবাসী যদি আপন স্বার্থ বুঝিয়া চলিতে পারে, তবেই এ দুর্দ্দিনে টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে—নচেৎ অতল তলে ডুবিয়া যাইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বন্যা

আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিন—প্রবল বন্যায় দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ বন্যায় বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ঐ সকল স্থানে আশুধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, হৈমন্তিক ধান্যের চারারও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই বটে, কিন্তু এখনও যে বাঁধের ভাঙ্গন বন্ধ করা ও বহু পথের সংস্কার সম্ভব হয় নাই, তাহাতেই বন্যার প্রকোপ কিরূপ হইয়াছিল তাহা বুঝা গিয়াছে। কেবল দামোদরেই বন্যা হয় নাই—অজয়, ময়ূরাক্ষী ও কাঁসাইও কূল প্লাবিত করিয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অভাব যেরূপ তীব্র, তাহাতে যে আশুধান্যের উপর অনেক আশা স্থাপিত হইয়াছিল, নানা স্থানে তাহার নাশে সে অবস্থার জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইল, তাহা বলা বাহুল্য। হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষতিও বিশেষ আশঙ্কার কারণ, সন্দেহ নাই। এখনও অনেক স্থান জলমগ্ন। এই বন্যায় প্রাণহানি অধিক হয় নাই—কিন্তু বন্যার ফলে যে অনাহারে বহু প্রাণনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে সর্ব্বস্বান্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য সাহায্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা আপনারা নানারূপে বিপন্ন, তাহারা কিরূপ সাহায্য করিতে পারে? তাহাদিগের সাহায্যের পরিমাণ কিরূপ হইতে পারে? বাঙ্গালা সরকার কি এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দায়িত্ব সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন? বাঙ্গালায় যখন এই অবস্থা, সেই সময় বাঙ্গালার বাহিরে কোন কোন স্থান হইতেও প্রবল বন্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার উপকণ্ঠে ঘাটশিলা প্রভৃতি অঞ্চলেও বন্যায় প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। গত ১৩ই শ্রাবণ স্বভাবতঃ বিরলবর্ষণ আজমীর মাড়বার ও মেবারে প্রবল বন্যা আরম্ভ হয়। এই বন্যায় প্রায় ৪ শত বর্গ-মাইল স্থান জলমগ্ন হয়—৫০খানি গ্রাম বিধ্বস্ত হয়। একটি মাত্র নগরে ৭ হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৪ হাজার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—বহু গবাদি পশু ভাসিয়া গিয়াছে; শব অপসারণের জন্য সৈনিকদিগকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। উড়িষ্যায়ও বন্যা হইয়াছে। দামোদরের বন্যা যে বাঁধের জন্য অধিক প্রবল হয় ও অধিক ক্ষতি করে, তাহা এখন আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু বন্যার প্রাবল্য বৃদ্ধির যে কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে যে ভাবে গাছ কাটা হইয়াছে—সে ভাবে নূতন গাছ লাগান হয় নাই। গাছ যখন ঘন-সন্নিবিষ্ট থাকে, তখন তাহার শিকড়ে বাধা পাইয়া যেমন পাতরে বাধা পাইয়াও তেমনই বৃষ্টির জল দ্রুত নামিয়া আসিতে পারে না। কিন্তু গাছের অভাবে কেবল যে জল দ্রুত নামিয়া আসে, তাহাই নহে, পরন্তু শিকড়ে বাধা না পাওয়ায় পাতর ও জলের বেগে মাটী লইয়া নদীর খাতে আসিয়া পড়ে—নদীর গর্ভ উচ্চ হয়। একে উচ্চ হইলে খাতে পূর্ব্ববৎ অধিক জল থাকিতে পারে না, তাহাতে আবার জলরাশি দ্রুত খাতে পড়ায় সহজেই বন্যা প্রবল হয়। কাযেই স্বাভাবিক নিয়মের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং বৎসর বৎসর বর্ষায় বন্যায় লোকের বিশেষ ক্ষতি হয়। মেদিনীপুরে পূর্ব্ব বন্যায় ক্ষতির ক্ষত শুকাইবার পূর্ব্বেই যে আবার ক্ষতি হইল, তাহার ফল ভয়াবহই হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। সরকার দেশে খাদ্য-শস্যের হিসাব রাখেন নাই—এমন কি, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেও তাহা করা হয় নাই। সুতরাং এই সকল বন্যায় শস্যহানি কিরূপ হইবে এবং তাহার ফলে, অন্ততঃ বাঙ্গালায়, অবস্থা আরও কিরূপ ভয়াবহ হইবে, তাহা বুঝিবার উপায়ও হইতেছে না। সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য প্রদানে যে সহযোগ ঘটিলে কায সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়, সে সহযোগ সংগঠিত হইতেছে, তাহা মনে হয় না। তাহার কারণ, সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে এবং যেরূপ ভাবে কায করিলে জনসাধারণের সাগ্রহ সহযোগ লাভ করা যায়, সে ভাবে যে সচিবরা সকলে কায করিতেছেন বা করিতে পারিতেছেন, তাহাও মনে হয় না।

সদাব্রত

দুর্ভিক্ষের সময় সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করা এ দেশে প্রাচীন প্রথা। যে সময় লোক অর্থ পরমার্থ জ্ঞান করিত না এবং হিন্দু সমাজ ধনিকবাদের সহিত ধন-সাম্যবাদের বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছিল—সেই সময়ে মানুষ অর্থ অর্জ্জন করিলে তাহাতে সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে অবহিত হইত। এখনও গঙ্গার কূলে বহু ঘাট, অসংখ্য দেবায়তন ও বহু পুষ্করিণী, পান্থশালা, পথ প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। লোকের অন্নকষ্ট কালে সদাব্রত প্রতিষ্ঠা সেই সকলের অন্যতম কায। গত উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষে যখন নিরন্ন উড়িয়ারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল—তখন কলিকাতার একাধিক ধনী সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া লোককে অকাতরে অন্নদান করিয়াছিলেন।

এ বার আবার সেই কায আমরা লক্ষ্য করিতেছি। সিংহের গর্জ্জন যদি মেষশিশুর রবে পরিণতি সম্ভব হয়, তবে, তাহা যেরূপ হয়—বাঙ্গালার খাদ্য-সচিবের উক্তি তেমনই হইয়াছে। তিনি কয় মাস পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, আজ আর তাহা বলিতেছেন না। আজ তিনি বলিতেছেন, ধনীরা সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া লোককে রক্ষা করুন। তিনি সে সদুপদেশ দিবার বহু পূর্ব্বেই কলিকাতায় কোন কোন ধনী ও প্রতিষ্ঠান সে কায করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বার অবস্থা অন্যান্য বারের অবস্থা হইতে ভিন্ন—এ বার খাদ্য-শস্যের অভাব এবং সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সরকারের সাহায্য ব্যতীত খাদ্য-দ্রব্যের উপকরণ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু যাঁহারা সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে সরকারের নিকট খাদ্য-দ্রব্যের উপকরণ সংগ্রহে আবশ্যক সাহায্যলাভ করিয়াছেন, তাহাও আমরা বলিতে পারি না।

সরকার এখনও "আপনি আচরি" লোককে শিক্ষা দিতেছেন না; মনে করিতেছেন না—উপদেশ অপেক্ষা আদর্শ অধিক ফলোপধায়ী।

কিন্তু সুখের বিষয়, দেশের বেসরকারী লোকরা আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছেন। সার বদরীদাস গোয়েঙ্কাকে সভাপতি, ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সহকারী সভাপতি ও শ্রীযুত ভগীরথ কানোড়িয়াকে সম্পাদক করিয়া বাঙ্গালায় "রিলিফ কমিটী" গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি কলিকাতায় দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রায় ৭০ হাজার লোককে সুলভ মূল্যে চাউল ও আটা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সকল পরিবারে জনপ্রতি মাসিক আয় ২০ টাকার

অধিক নহে, সেই সকল পরিবারকে ১৫ টাকা মণ দরে চাউল ও ১৬ টাকা ৮ আনা মণ দরে আটা বিক্রয় করা হইবে। কলিকাতার প্রত্যেক ওয়ার্ডে এক হাজার লোক এইরূপ সাহায্য লাভ করিবে।

বাঙ্গালার বাহির হইতেও এই কমিটীর কার্য্যে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। বোম্বাইয়ের টাটা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদিগের আশা আছে, আরও সাহায্য পাওয়া যাইবে।

এ দিকে বাঙ্গালা সরকারের ব্যবস্থায় যে নানা ত্রুটি সংশোধিত হইতেছে না, তাহা পরিতাপের বিষয়। কয় দিন মাত্র পূর্ব্বে কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন :—

"অদ্য (১১ই আগষ্ট) প্রাতে বেলা প্রায় ৯টার সময় আমি টালিগঞ্জ থানার সম্মুখে ফুটপাতের উপর একটি প্রায় ৮ বৎসর বয়স্ক নিরাশ্রয় বালককে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত দেখি। মনে হয়, তাহার অবস্থার জন্য অনাহার যেমন আংশিকরূপে দায়ী, বৃষ্টিতে আচ্ছাদনহীন স্থানে পতিত থাকাও তেমনই দায়ী। আমি থানায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারি, পূর্ব্বরাত্রিতেই পল্লীর কয় জন লোক থানার দারোগাকে এ বিষয় জানান। দারোগা এম্বুলেন্স আনাইয়া বালকটিকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ও পরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। কোথাও তাহার স্থান হয় নাই—হাসপাতাল হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়—স্থান নাই। কাযেই এম্বুলেন্সের চালক বালককে আনিয়া যে স্থান হইতে লইয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে রাখিয়া যায়। সেই সময় হইতে বালক তথায় পড়িয়াছিল। পুলিসের দারোগা জানান, তিনি মৃতের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার নির্দ্দেশ পাইয়াছেন বটে, কিন্তু মরণাহত সম্বন্ধে কি করিবেন, সে নির্দ্দেশ লাভ করেন নাই।"

এ বিষয়ে কি কাহারও দায়িত্ব নাই?

সে যাহাই হউক, কলিকাতায় নানা স্থানে লোকের বদান্যতায় সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কোন ধনী যে অন্ততঃ ২ আনা না লইয়া লোককে খাদ্য দিতেছেন না, তাহাতে বহু লোক আহার্য্যে বঞ্চিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে বিনামূল্যে—প্রকৃত সদাব্রতে—লোককে অন্নদান করা হইতেছে।

তদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে বালক-বালিকাদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে লেডী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী হেমলতা মিত্রের আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত সদাব্রত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সদাব্রত শ্রীযুত মহাদেব বিড়লার ব্যয়ে পরিচালিত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন—দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" দেখা গিয়াছিল—দুর্ভিক্ষের সময় শিশুরাই সর্ব্বাগ্রে গতপ্রাণ হয়—তাহারাই অনাহার-ক্লেশ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সহ্য করিতে পারে। সেই জন্য সেই মন্বন্তরের পরে বাঙ্গালার লোকক্ষয় নিবারণ হইতে বহু দিন লাগিয়াছিল। আমরা জানি, দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য—সুতরাং দুর্ম্মূল্য। কিন্তু শিশুদিগের জন্য কোন ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এ বিষয়েও আমরা বাঙ্গালা সরকারের কোন ব্যবস্থা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। যে সিপাহী বলিয়াছিল—তাহার এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তরবার ছিল, সুতরাং সে কিরূপে যুদ্ধ করিতে পারে—তাহারই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কি বাঙ্গালা সরকার বলিবেন—তাঁহারা এক দিকে বন্যা আর এক দিকে গম প্রভৃতি সংগ্রহ এই দুই কার্য্যে ব্যস্ত, সদাব্রতের ব্যবস্থা করিবার সময় পাইবেন কিরূপে?

আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না যে, এইরূপ সময়ে লোক সরকারের নিকট যে সাহায্য পাইবার আশা স্বভাবতঃ করে ও করিতে পারে, বাঙ্গালার লোক বাঙ্গালা সরকারের নিকট সে সাহায্য আজও লাভ করিতে পারে নাই।

——

পরের কথা

বাল্মীকি না কি রামের অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে—যুদ্ধের পরে কি হইবে—কি ভাবে পুনর্গঠন হইবে—তাহা লইয়া গবেষণার অন্ত নাই। সম্প্রতি বিলাতে 'অবজারভার' পত্রে সার উইলিয়ম বেভারিজ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন—জাতীয় ঐক্য যেমন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর নির্ভর করে না; জাতির সকলের এক ও তুল্য লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে, তেমনই আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য সকল জাতির সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে অবহিত ভাবের উপর নির্ভর করে। তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত ছাড় বা চার্টারের উপর সম্মিলিত জাতিরা যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয় নাই—সকল জাতির অধিকারের ও দাবীর সুমীমাংসা ও সকলের নির্ব্বিঘ্নতার ভিত্তি দৃঢ় করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বিশ্বাস, কি যুদ্ধকালে, কি শান্তির সময়ে যাহাতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিও সুখে-শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন—কোন বা কোন কোন জাতির গৌরববৃদ্ধি প্রয়োজন নহে। তাহারা যদি সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে তাহাদিগের বিজয় কখন সার্থক ও সফল হইবে না।

এ সকল কথা প্রয়োজনকালে রাজনীতিক বেদী হইতে বহু বার বহু ভাবেই ব্যক্ত ও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের স্বার্থের সম্মুখে সে সবই ফুৎকারে জলবিম্বের মত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় যখন অনেক চেষ্টায় মার্কিণের রাষ্ট্রপতি উইলসনকে মিত্র-শক্তির পক্ষাবলম্বী করা সম্ভব হইয়াছিল, তখন আমরা এমনই অনেক কথা শুনিয়াছিলাম—তখন আমরা শুনিয়াছিলাম, পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করা—দুর্ব্বল জাতিসমূহকেও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা মার্কিণের যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য। সে বার যে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবেই য়ুরোপের যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সে বার যুক্ত-রাষ্ট্রের সাহায্যলাভ না করিলে যে মিত্রশক্তির বিপদ ঘটিতে পারিত, তাহা মিসেস্ হামফ্রে ওয়ার্ডের পুস্তকে সরল ভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছিল। কারণ, সে বার রুশিয়া যুদ্ধের প্রথম ভাগেই খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়—ফ্রান্স ও বৃটেনকেই যুদ্ধের বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইটালী তখন তুচ্ছ। কিন্তু যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হইলে কি হইয়াছিল? কোন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন, যুক্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলশন পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ না করিয়া ছলনার জন্য নিরাপদ করিয়াছিলেন। কোন দুর্ব্বল জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে নাই। যে

শান্তি অস্ত্রমুখে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই অশান্তির বীজ উপ্ত ছিল।

গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আজ কেবল ভারতের নহে, পরন্তু সমগ্র জগতের নিরপেক্ষ লোক বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আটলান্টিক চার্টারে বা চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার উক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিলে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিবে না। বিশেষ গত যুদ্ধে যদিও দেশভেদে ব্যবহার-ভেদের কথা বলা হয় নাই, এ বার তাহাও হইয়াছে। মিষ্টার চার্চ্চিল বলিয়াছেন, আটলান্টিক চার্টার ভারতবর্ষ (বোধ হয় অধীন দেশ মাত্রই) সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট যে চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়াছেন, তাহা যদি সকল দেশ সম্বন্ধে প্রযুক্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি হয়ত—মিষ্টার চার্চ্চিলের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন—আটলান্টিক চার্টার সকল অঞ্চলের সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য—ভারতবর্ষ তাহার সীমাবহির্ভূত নহে। আর তাহা হইলে বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য ('টকিং পয়েণ্টস' ও 'ফিফটি ফ্যাক্টস'—প্রভৃতি) পরিচালিত হইতে পারিত না। কি ভাবে যে সে প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকা আজ ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতেছে, তাহারও উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যায়। কাযেই সকলের তুল্যাধিকারের কথা যত না বলা হয়, ততই ভাল। গণতন্ত্রের মর্য্যাদা সম্বন্ধেও তাহাই।

আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ যুদ্ধে পরাভূত হইলে করিবার আর কিছুই থাকিবে না, কিন্তু তাহাদিগের জয় হইলে গঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কারণ, এই যুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহা বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অনিবার্য্য। গত যুদ্ধের সময়, বিলাতে "শেলে" উপকরণ পূর্ণ করিবার জন্য জর্জ্জ টাউন নামক স্থানে যে সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ১০ হাজারেরও অধিক তরুণী কায করিত। সেই সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাদিগের এক জন পরিদর্শিকা বলিয়াছিলেন—এই যে সহস্র সহস্র ভদ্রঘরের কন্যা বিপজ্জনক শ্রমিকের কায করিয়া অর্থার্জ্জন করিতেছে, ইহারাই কি সমাজের ব্যবস্থায় বিপ্লব প্রবর্ত্তিত করিবে না? সেই যুদ্ধের সময় তরুণীরা "জাতির তরুণ ত্রাতা" সৈনিকদিগকে যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহাতে তাহাদিগকে বুঝাইতে ও নিবৃত্ত করিতে "গার্ল গাইড" সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। আর সে সময় বিলাতের আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করিয়া বিশপ ওয়েলডন লিখিয়াছিলেন—পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব নষ্ট হইতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ যে গত যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও ভয়াবহ, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই এই যুদ্ধের পর সমাজের অবস্থা কি হইবে, তাহা মনে করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে এখনও প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। তথাপি "কণ্ট্রোল" দোকানে ও সদাব্রতে (কিচেনে) আমরা যে একাকার লক্ষ্য করিতেছি, তাহাও সমাজের ভিত্তি দুর্ব্বল করিতেছে, বলা যায়।

যুদ্ধের পর আরও একটি বিষয় বিশেষ বিবেচ্য হইবে। যুদ্ধের পরে যে বেকার-সমস্যা আরও বিকট আকারে প্রকট হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। য়ুরোপে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের অবসানে আয়র্লণ্ডের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। আজ যাহারা যুদ্ধে ও যুদ্ধের প্রয়োজনে নানা শিল্পে অন্নার্জ্জন করিতেছে, তাহারা যে বেকার-বাহিনী পুষ্ট করিবে এবং সমগ্র দেশে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। সময় থাকিতে সে বিষয়ে সতর্ক হইয়া আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই রাজনীতিকোচিত কার্য্য।

আমরা দেখিতেছি, বিলাতে সে বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। কিন্তু এ দেশে? যে দেশে লোককে অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য খাদ্য-দ্রব্যের পরিমাণ-বৃদ্ধির আবশ্যক ব্যবস্থাও হয় নাই—সে দেশে যুদ্ধের পর যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই যে থাকিবে না এমন আশা কিরূপে করা যায়? অর্থাৎ যুদ্ধের পরেও এ দেশ অর্থনীতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিক ব্যবস্থারই মত "যে তিমিরে সে তিমিরে" থাকিবে—সেই সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হইতেছে।

সে বিষয়ে আমরা যে বাহির হইতে কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য লাভ করিব, সে আশা মনে পোষণ না করিয়া আপনাদিগের চেষ্টায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করাই আমাদিগের পক্ষে প্রয়োজন—সেই প্রয়োজনই আমাদিগকে আমাদিগের কর্ত্তব্যের সন্ধান দিবে।

যুদ্ধের পরে কি হইবে, তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়—হয়ত আশঙ্কার বিষয়ও বলা যায়। কিন্তু আপাততঃ যুদ্ধের সময় কি হইবে, তাহাই আমাদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয়—আতঙ্কের বিষয়ও বটে। যে সকল দেশ স্বায়ত্ত-শাসনাধীন তাহারা ইতোমধ্যেই যুদ্ধের পর কি হইবে ও কি করা প্রয়োজন তাহা চিন্তা করিতেছে। আমরা সে বিষয়ে চিন্তা করিলেও সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা কোন পরাধীন দেশের নাই।

ভারতীয়ের লাঞ্ছনা

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা কাহারও অবিদিত না হইলেও বৃটেন তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করে নাই ও করিতেছে না। যে সকল অঞ্চল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, সে সকলে ভারতীয়গণ সম্পত্তি করিতে—বাস করা ত পরের কথা—পারিবে না। নূতন ব্যবস্থায় বহু ভারতীয় যে ভাবে সম্পত্তি ত্যাগে বাধ্য ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে এ দেশে কেন্দ্রী রাষ্ট্রীয় পরিষদেও আইন-বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। তবে সে আইনের বিধান যেরূপ, তাহাতে উপযুক্ত প্রতিশোধ-গ্রহণ সম্ভব নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করে, এ দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদিগকে সেইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য করাই প্রয়োজন ছিল এবং তাহা করিতে পারিলে হয়ত, তাহাদিগের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইত। কিন্তু এ দেশে যে সেরূপ কার্য্যের পথে অনেক বাধা আছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে নূতন আইন হইল, তাহার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিযোগ জানাইবার জন্য জেনারল স্মাটসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে

অস্বীকার করিয়াছেন। জাতিগর্ব্বে—অর্থাৎ বর্ণগর্ব্বে গর্ব্বান্ধ শ্বেতাঙ্গরা যে শ্বেতাতিরিক্ত জাতিসমূহের সম্বন্ধে এইরূপ অশিষ্টাচারের পরিচয় পূর্ব্বেও অনেক ক্ষেত্রে দিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন।

এ বার জেনারল স্মাট্‌স তাঁহার কার্য্যের যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা যেমন ঔদ্ধত্যের তেমনই অশিষ্টতার পরিচায়ক। বলা হইয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কংগ্রেস যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, সে সকল অন্যান্য দেশের নিকট প্রতীকারজন্য আবেদন করা বলা যায়।

আমরা জানি, কংগ্রেস একটি প্রস্তাবে বৃটেনে ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া সে-দেশদ্বয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের অবস্থা অবগত করাইতে চাহিয়াছেন। ইহাকে যদি বিদেশে প্রতীকারের জন্য আবেদন বলিতে হয়, তবে তাহাতে নিশ্চয়ই লোক বিস্ময়ানুভব করিবে। কারণ, এই প্রস্তাবের যথাসম্ভব কদর্থ করিলেও ইহাতে এমন বুঝায় না যে, ভারতীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের স্বায়ত্ত-শাসনশীলতা অস্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা অস্বীকার করিলেও যে দক্ষিণ আফ্রিকা পরাধীন হইত, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই।

যে সকল দেশের লোকমত সর্ব্বত্র সম্মানিত ও প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত, সে সকল দেশে আপনাদিগের অভাব অভিযোগের আলোচনা করা—সে সকল সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য পরিচালিত করা যে কখনই অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাহা বলা বাহুল্য। যদি জেনারল স্মাট্‌সের সরকারের ভারতীয়দিগের সম্বন্ধীয় ব্যবহারে লজ্জিত হইবার কোন কারণ না থাকিত, তবে তাঁহারা বৃটেনে ও মার্কিণে ভারতীয়দিগের প্রচারকার্য্যের কল্পনায় ক্রুদ্ধ হইবেন কেন? জেনারল স্মাট্‌সের, বোধ হয়, মনে আছে, অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি নাৎসীদিগের দ্বারা ইহুদীদিগের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের পরে হিসাব-নিকাশ হইবে, তখন যদি হিটলারের দল বলেন, ইহুদীরা বিদেশের লোকমত আপনাদিগের পক্ষে সৃষ্ট ও আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করায় ইহুদীদিগকে লাঞ্ছনা করা হইয়াছে—তবে তাহা কি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে বা হইতে পারে? আজ যদি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে অবিচার হইতেছে, তাহা জানাইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের সহানুভূতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন মনে করেন, তবে জেনারল স্মাট্‌সের সরকারের ব্যবহারই তাহার কারণ।

জেনারল স্মাট্‌স্ নিশ্চয়ই জানেন, সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনার কার্য্যের সমর্থনে মার্কিণে ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার-বিস্তারবিরোধী প্রচারকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে? সে জন্য কি বৃটিশ সরকারের কর্ম্মচারীরাও মার্কিণে প্রচারকার্য্য পরিচালনার্থ প্রেরিত হন নাই এবং তাঁহাদিগের জন্য পুস্তিকা প্রচার করাও হইতেছে না? সে সকল প্রচারকার্য্যে কি অনেক অসত্য ও অর্দ্ধসত্য সংগৃহীত হয় নাই?

যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ আপনাদিগের সম্বন্ধে সরকারের ব্যবহার অসঙ্গত মনে করেন, তবে কি তাঁহাদিগের তাহা সভ্য জগতের গোচর করিবার অধিকারও শ্বেতাঙ্গগণ অস্বীকার করিবে?

জেনারল স্মাট্‌স ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—মানুষের সরকার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইবার সময় সমুপস্থিত। যদি তাহা করা না হয়, তবে (জার্ম্মাণ) যুদ্ধ বৃথা হইবে।

কিন্তু যাঁহারা সে জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী, জেনারল স্মাট্‌স্ কি তাঁহাদিগের অন্যতম নহেন? তিনি সে দিন যে নীতির প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আজ কি—ক্ষমতা পাইয়া—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে সেই নীতিই পদদলিত করিয়া স্বৈর মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছেন না? তিনি কি মনে করেন, রাজনৈতিক অধিকার শ্বেতাঙ্গরাই সম্ভোগ করিবার অধিকারী এবং শ্বেতাতিরিক্ত জাতিরা তাহা সম্ভোগের আশাও কল্পনা করিতে পারে না?

পুলিস ও হাইকোর্ট

অল্প দিন পূর্ব্বে হাইকোর্টের জজরা আদালতে কয় জন পুলিস চাকরীয়ার ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছিলেন। জজদিগের মধ্যে এক জন এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, এক জন দারোগার ব্যবহার আদালতের অপমান বলা যায়। সেই সকল পুলিস কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে পুলিস কমিশনার ও বাঙ্গালা সরকার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কলিকাতার পুলিস কমিশনার হাইকোর্ট কর্ত্তৃক ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

"সম্প্রতি হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে ভয়ানক অপরাধীদিগের সম্বন্ধে ভারতরক্ষা নিয়মের ২৬ ধারা ব্যবহার চলিবে না। ভারতরক্ষা নিয়মের ১২১ ধারার বলে ধৃত ঐরূপ কতকগুলি লোককে—২৬ ধারা অনুসারে ধরিয়া রাখা যায় না, বলিয়া—ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতায় অপরাধ এবং আইন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে যখন সহরে আলোক-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন যে অপরাধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে, সে ঐ ২৬ ধারা প্রয়োগের ফলে।"

যত দিন ভারতরক্ষা নিয়মের কোন ধারাই ছিল না, তখন কি পুলিসের পক্ষে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার পথ বিঘ্নবহুল ছিল? সে যাহাই হউক, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত সহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অন্তরায় হইতে পারে—পুলিস কমিশনারের সেইরূপ মত প্রচার করিবার অধিকার থাকিলেও তাহা আদালতের সম্ভ্রমে আঘাত দান করে কি না, তাহা নিশ্চয়ই বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সে যেন আসবে আমার মন বলেছে"

—রবীন্দ্রনাথ

[শিল্পী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ আচার্য্য

২২

শিবাদ্বৈতবাদ

আজকাল দেশে আবার দার্শনিক চিন্তাস্রোত ফিরিয়া আসিতেছে। অনেক মনীষীই সাগ্রহে এবং সাদরে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন। বহু সুপ্রাচীন এবং মূল্যবান পুস্তক—যাহা ইতঃপূর্ব্বে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছিল মনে হইত—এখন তাহা আবিষ্কৃত হইয়া মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। বস্তুতঃ, অল্পদিনের মধ্যেই দার্শনিক আলোচনা এদেশে যথেষ্ট সমুন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দুই চারিটি বিষয় এখনও অনালোচিত রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তন্মধ্যে প্রধান—তন্ত্র বা আগমশাস্ত্র, অথচ অনেক দিক্ হইতে বিচার করিলে মনে হয়, তন্ত্রালোচনার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। তন্ত্রশাস্ত্র যেরূপ বিশাল, উহার বিষয়ও তেমনি গম্ভীর। তার পর আমাদের সামাজিক আচার, ব্যবহার, সাধনা, সবই মুখ্যতঃ তন্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে তন্ত্রেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। সেই বাঙ্গালাদেশও অধুনা তন্ত্রের প্রতি বড় হতাদর। অবশ্য ইহার অন্যতম কারণ, কতকগুলি অজ্ঞ তন্ত্রোপজীবীর তন্ত্রের অপব্যবহার। অপর কারণ, 'ষড়্দর্শন' শব্দটি এমন ভাবে রূঢ় হইয়া গিয়াছে যে, অনেকেই মনে করেন, ন্যায়াদি ছয়টি বিশিষ্ট দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন আর দর্শন এদেশে নাই। অবশ্য কোন্ দিন হইতে যে ষড়্দর্শন শব্দটি তাদৃশ ছয়খানি দর্শনকেই বুঝাইতেছে, তাহা বলা দুষ্কর। প্রাচীন কালে যে এদেশের লোকের তাদৃশ ধারণা ছিল না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে মনে হয় না। প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রেও ষড়্দর্শন শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারাও সেস্থলে ঐ শব্দ দ্বারা বর্ত্তমান বিশিষ্ট ছয়খানি দর্শন বুঝিতেন না। অবশ্য ষট্‌তন্ত্রী, ষড়্দর্শন ইত্যাদি শব্দ সুপ্রাচীন। প্রাচীন জৈনগ্রন্থেও ষট্‌তন্ত্রী শব্দের উল্লেখ আছে। তাঁহারাও সেই স্থলে বর্ত্তমান ছয় দর্শন মনে করেন নাই। অন্ততঃপক্ষে যে সময় হরিভদ্র তাঁহার ষড়্দর্শনসমুচ্চয় লিখিয়াছিলেন, তখনও ষড়্দর্শন শব্দে ঐ কয়খানি বিশিষ্ট দর্শন, ষড়্দর্শন নামে খ্যাত ছিল না।

সুবিশাল তন্ত্রশাস্ত্র নানাশাখাভেদে ভিন্ন। তন্মধ্যে মাহেশ্বর-শাখা আবার দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈত-দৃষ্টিতে শৈব রৌদ্র এবং ভৈরবনামে ত্রিধা বিভক্ত। অবশ্য দৃষ্টিভেদই ঐ ভেদের প্রতি নিমিত্ত। কোন বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে, প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ হইতেই তাহার বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক, নতুবা আলোচনার পূর্ণতা হয় না। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণও ঐ নিমিত্তই দৃষ্টিভেদ বশতঃ প্রস্থানভেদ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভৈরবাগম মূলতঃ চতুঃষষ্টিসংখ্যক, * এবং ইহাই অদ্বৈতদৃষ্টিপ্রধান এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য-শিবাদ্বৈতবাদের মূল উপজীব্য। আগমশাস্ত্র সাম্প্রদায়িকগণ কর্ত্তৃক বেদেরই ন্যায় অপৌরুষেয়রূপে সমাদৃত। কিছুদিন পূর্ব্বেও পণ্ডিতগণের মধ্যে তন্ত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। অনেকে মনে করিতেন, বৌদ্ধ মহাযানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, এবং তৎপর, ক্রমশঃ ঐ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে; কিন্তু আর আজকাল পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের তদ্রূপ ধারণা নাই। মোহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানে যে সব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা কেহ কেহ অনুমান করেন, তন্ত্র বেদ হইতেও প্রাচীনতর। আমরা অপ্রাসঙ্গিক বোধে ঐ সকল মতবাদের আলোচনা করিব না। প্রকৃত স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, প্রাচীন কালে অর্থাৎ উপনিষদের যুগেও বেদ-তন্ত্রের তাদৃশ মার্গভেদ স্বীকৃত হইত না। রহস্যময় বৈদিক সাধনাই তান্ত্রিকসাধনা নামে পরিচিত ছিল, ইহাই আমাদের ধারণা। বৃহদারণ্যক (৬।২) এবং ছান্দোগ্যে (৫।৮) বর্ণিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। ছান্দোগ্যের উদ্গীথবিদ্যার আলোচনায় (২।১৩) যে বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃই তান্ত্রিকসাধনা। ঐ উপনিষদেরই (৩।১—১০) মধুবিদ্যার আলোচনায় সূর্য্যের পূর্ব্বাদি রশ্মিরূপ—মধুনাড়ীচক্রের মধু-বুদ্বুদরূপে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্বাদি—রসের বর্ণনা করিয়া, ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং ইতিহাস-পুরাণকে তাহাদের

---

* বিস্তৃত বিবরণ সৌন্দর্য্যলহরীর ৩১ শ্লোঃ লক্ষ্মীধরটীকা দ্রষ্টব্য।

চার্য্য

দায়েরও বহু পুস্তক আজকাল
সম্প্রতি অনেকগুলি অমূল্য
অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি
নাম উল্লিখিত হইয়াছে,
লোচনা করিলে মনে
অত্যল্প ভাগই মাত্র
স্বচ্ছন্দ, মালিনী-
র অত্যন্ত সমাদৃত
। সোমানন্দের
বহুদিন পর্য্যন্ত
শিবাদিষ্ট হইয়া
গুলি সূত্র উৎকীর্ণ
তাহার ছায়াচিত্র
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাই

কা৮৮
প্রকাশ করিয়া ৮..
লোককল্যাণকারিণী অনুগ্রহশক্তির কার্য্য। অতঃপর আমরা দেখিব, পরমেশ্বর নিয়ত, প্রতিক্ষণেই অনুগ্রহাদি পঞ্চকৃত্যকারী; অতএব তাঁহার এই অদ্বৈতজ্ঞানপ্রকাশের সহিত কালিকসম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, এবং ফলতঃ প্রকৃতস্থলে তাহা ইতিহাসের উপযোগীও হইবে না। সোমানন্দনাথ-বিরচিত শিবদৃষ্টির সপ্তম আহ্নিকে 'কালে' এই জ্ঞান প্রচারের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত দেওয়া আছে, আমরা তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

পুরাকালে মহামুনি দুর্ব্বাসা একদা কৈলাসাদ্রিতে বিচরণ করিতেছিলেন। তখন পরমেশ্বর শ্রীকণ্ঠ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া রহস্য-সম্প্রদায়ের যেন বিচ্ছেদ না হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে পৃথিবীতে প্রচারের জন্য শিবজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। দুর্ব্বাসা ত্র্যম্বক, আমর্দ্দক এবং শ্রীনাথনামক মানসপুত্রত্রয় সৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞান শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে ত্র্যম্বককে অদ্বৈত, আমর্দ্দককে দ্বৈতাদ্বৈত, এবং শ্রীনাথকে দ্বৈতমতবাদ উপদেশ করেন। ত্র্যম্বকদ্বারা প্রচারিত হওয়ায় এই মতকে ত্রৈয়ম্বকমতও বলা হইয়া থাকে। ত্র্যম্বক হইতে পঞ্চদশ পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ বিদ্যা মানসপুত্রক্রমেই উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। পঞ্চদশ পুরুষ কোন ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং তাঁহারই গর্ভে সঙ্গমাদিত্য নামক পুত্রের জন্ম হয়। সঙ্গমাদিত্য ভ্রমণ করিতে করিতে কাশ্মীরদেশে চলিয়া আসেন এবং তখন হইতে কাশ্মীরই ঐ দর্শনের প্রধান পীঠরূপে পরিগণিত হয়। সঙ্গমাদিত্যের পুত্র বর্ষাদিত্য, বর্ষাদিত্যের পুত্র অরুণাদিত্য, অরুণাদিত্যের পুত্র আনন্দ এবং আনন্দেরই পুত্র সোমানন্দ। সোমানন্দের কাল ৮৫০ খৃষ্টাব্দ, এইরূপ পণ্ডিতগণ স্থির করেন। ইনি ত্র্যম্বকাদিত্য হইতে বিংশপুরুষ। প্রতিপুরুষে ২৫ বর্ষ হিসাবে গণনা করিলে ত্র্যম্বকের কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হয়, অতএব ঐ সময় অদ্বৈত শৈবদর্শনের প্রচার হইয়াছিল—বলা যাইতে পারে। এই সোমানন্দের গুরু বসুগুপ্ত, এই বসুগুপ্ত হইতেই কাশ্মীর-শৈবদর্শন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার পর হইতেই এই মতবাদের বহু দার্শনিক গ্রন্থাদি বিরচিত হইয়াছে।

...খ্যাত। বসুগুপ্তের অপর গ্রন্থ স্পন্দকারিকা, ইহাতে তিনি স্পন্দতত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন, এই স্পন্দই সর্ব্বমূলা শক্তি। তিনি গীতার উপরও টীকা লিখিয়াছিলেন, উহা বাসবী টীকা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন পর্য্যন্ত ঐ টীকা প্রকাশিত হয় নাই। বসুগুপ্তের শিষ্য সোমানন্দ, বিখ্যাত শিবদৃষ্টি গ্রন্থ রচনা করেন। রুদ্রযামলান্তর্গত পরাত্রিংশিকা বা পরাত্রীশিকা খণ্ডেরও তিনি টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বসুগুপ্তের দ্বিতীয় শিষ্য কল্লটাচার্য্য, স্পন্দকারিকার উপর 'স্পন্দসর্ব্বস্ব' নামক অত্যন্ত উপাদেয় এক বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। সোমানন্দের শিষ্য উৎপলাচার্য্য প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা নামক কতকগুলি কারিকা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ অত্যন্ত প্রৌঢ় এবং কাশ্মীরাদ্বৈতবাদবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার প্রমেয় এবং যুক্তিতে সুসমৃদ্ধ। শিবাদ্বৈতবাদ মননের জন্য বৃত্তিসহিত ইহার আলোচনা পরমাবশ্যক। এতদ্ভিন্ন সিদ্ধিত্রয়ী (অজড়প্রমাতৃসিদ্ধি, ঈশ্বরসিদ্ধি এবং সম্বন্ধসিদ্ধি) এবং শিবস্তোত্রাবলী নামক ভক্তিরসে পরিপূর্ণ কতকগুলি স্তোত্রও তিনি রচনা করেন। উৎপলের প্রশিষ্য এবং লক্ষ্মণগুপ্তের শিষ্য অভিনবগুপ্তের নাম সংস্কৃত সাহিত্যে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। ইঁহার সমকক্ষ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ভারতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। নাট্যশাস্ত্রটীকা, ধ্বন্যালোকটীকা প্রভৃতি হইতেই অভিনবের প্রতিভার পরিচয় সুধী-সমাজ পাইয়া আসিয়াছেন। অভিনবের আরও বহু কীর্ত্তি আছে, তাহারাও তেমনি গৌরবময়। তন্মধ্যে বিশালকায় তন্ত্রালোক তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয় বিশ্বকোষ। ইহা ত্রয়োদশ ভাগে কাশ্মীর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞাকারিকার উপর দুইটি বৃত্তি রচনা করেন—একটি প্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী বা বৃহতী বৃত্তি, অপরটি প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী বা লঘুবৃত্তি। এতদ্ব্যতীত মালিনীবিজয়বার্ত্তিক, পরাত্রিংশিকাবৃত্তি, তন্ত্রসার, পরমার্থসার-কারিকা, প্রবোধপঞ্চদশিকা, রহস্যপঞ্চদশিকা, অনুত্তরতত্ত্ববিমর্শিনী, লঘুবৃত্তি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ অভিনবগুপ্তেরই অমর কীর্ত্তি। ইহার মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশিত হইলেও অনেকগুলি এখনও অপ্রকাশিত আছে। পাণ্ডিত্য এবং সাধনা অভিনবে অপূর্ব্বভাবে সমন্বিত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহাকে মহাসিদ্ধরূপেই গণনা

---

* অথ যেঽস্যোর্দ্ধা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্দ্ধা মধুনাড্যো—গুহ্য এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পম্—ছান্দোগ্য ৩।৫।১।

করিয়া থাকেন। অভিনবগুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ। ইঁহার গ্রন্থের মধ্যে শিবসূত্রবিমর্শিনী নামক শিবসূত্রটীকা, স্বচ্ছন্দ, বিজ্ঞানভৈরব, এবং নেত্রতন্ত্রের টীকা, প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, স্পন্দসন্দোহ, স্পন্দনির্ণয়, এবং শিবস্তোত্রাবলী-টীকা প্রধান। ক্ষেমরাজের শিষ্য যোগরাজ, পরমার্থসারের টীকা প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত দেবরাজ, বরদরাজ এবং ভাস্করকৃত শিবসূত্রবার্ত্তিক, উৎপলবৈষ্ণবের স্পন্দপ্রদীপিকা, জয়রথের তন্ত্রালোকটীকা, মহেশ্বরানন্দকৃত পরিমল সহিত মহার্থমঞ্জরী ইত্যাদি এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ। উৎপলাচার্য্যের সময় দশমশতকের প্রথম ভাগ। ইহাই হইল এই মতবাদের আচার্য্য এবং গ্রন্থাবলীর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দার্শনিক মতবাদ। তত্ত্বাতীত পরমশিব, প্রকাশবিমর্শ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কাশ্মীর-শৈবদর্শনের মূলে অদ্বৈতদৃষ্টি বর্ত্তমান। এই মতে সমগ্র ভাবরাশি একমাত্র প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের স্বাত্মপ্রকাশ মাত্র। প্রকাশভিত্তি লগ্ন না হইয়া কোন পদার্থেরই সত্তা সিদ্ধ হয় না, অতএব ভেদ, অভেদ, ভাব, অভাব, সাকার, নিরাকার ইত্যাদি যাবতীয় বিকল্পই অর্থাৎ ভাবই পরমার্থতঃ একমাত্র প্রকাশ-স্বরূপ। এইরূপে উপায়োপেয়ভাব, কার্য্যকারণভাব, দেশকাল প্রভৃতি সবই যেহেতু প্রকাশাব্যতিরিক্ত, সেই হেতু উহারা সকলেই পরমার্থভূত; কারণ, ঐ সকল পদার্থ কখনও প্রকাশরূপতা হইতে প্রচ্যুত হয় না। প্রকাশই ভাবসমূহের স্বভাব; অতএব ভাব সকলে যেহেতু কখনই তদিতরস্বভাবের যোগ হয় না, সেই হেতু প্রকাশে ভেদও কল্পিত হইতে পারে না। দেশ কালও প্রকাশের ভেদসাধক হইতে পারে না; কারণ, দেশ এবং কাল—উভয়ই প্রকাশ-স্বভাব। অতএব প্রকাশ এক এবং অদ্বিতীয়। উহাকেই সংবিৎ বলা হইয়া থাকে; কারণ, অর্থের প্রকাশই যে সংবিদের রূপ—এ বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি নাই। ঐ প্রকাশ পরতন্ত্র নহে; কারণ, প্রকাশ্যতাই পারতন্ত্র্য। প্রকাশ্যতা আবার প্রকাশান্তর-সাপেক্ষ। প্রকাশে ভেদ কল্পিত হইতে পারে না—ইহা এই মাত্রই বলা হইল। অতএব প্রকাশ এক এবং স্বতন্ত্র। স্বাতন্ত্র্য বশতঃই দেশ, কাল এবং আকারদ্বারা প্রকাশের পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না। অতএব বলিতে হইবে প্রকাশ ব্যাপক, নিত্য এবং সর্ব্বাকারনিরাকার-স্বভাব। দেশ এবং কাল—প্রকাশমাত্ররূপে বিবেচিত হইলে তাহাতে যে ক্রম আছে, তাহাও আর পাওয়া যাইবে না, অথবা আরও পরিশুদ্ধ ভাবে বলিলে বলিতে হইবে, ঐ ক্রম অক্রমেরই গর্ভস্থিত হইয়া পড়িবে; কারণ, প্রকাশ অক্রমপদ। তদ্রূপ কার্য্যকারণভাবও প্রকাশগর্ভস্থ হইয়া পারমার্থিকপদবাচ্য হইবে বটে, কিন্তু সেই পারমার্থিক কার্য্যকারণভাবে কারণ এবং কার্য্যের ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইবে, অথবা প্রকাশ্য-ভিন্ন হওয়াতে কার্য্য, কারণ এবং ব্যবধান—সমস্তই এককক্ষণোপারূঢ় হইয়া যাইবে। প্রকাশস্থ, প্রকাশের স্বরূপভূত, এবং অত্যন্ত অভিন্ন—এই যে ভাববৈচিত্র্যাধায়ক স্বাতন্ত্র্য শক্তির কথা বলা হইল, ইহারই অপর নাম বিমর্শ। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশের প্রকাশতাও সিদ্ধ হয় না, অতএব বিমর্শই প্রকাশের প্রাণ। অভিনবগুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনীতে বলিয়াছেন, বিমর্শশূন্য প্রকাশ অপ্রকাশকল্প *। এই কথাই ভর্তৃহরিও তাঁহার বাক্যপদীয়ে বলিয়াছেন যথা—বাগ্‌রূপা-বিমর্শই প্রকাশের প্রকাশত্ববিধায়ক, প্রকাশ হইতে বাক্ উৎক্রান্ত হইলে প্রকাশও অপ্রকাশকল্প হইয়া পড়ে। *

এই বিমর্শকে শাস্ত্রে পরাশক্তি, পরাবাক্, হৃদয়, হৃল্লেখা ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ প্রকাশই আগমোক্ত শিবতত্ত্ব। প্রকাশের আত্মবিশ্রান্তিই 'অহম্' রূপী বিমর্শ এবং এই বিমর্শ অন্যা-পেক্ষিতাশূন্য হওয়ায় ইহাই পূর্ণতা-স্বরূপ। এই নিমিত্ত ইহাকে 'পূর্ণাহন্তা' অর্থাৎ 'আমি' ভাবের পূর্ণতা-নামেও অভিহিত করা হয়। 'আমি পূর্ণ' ইহাই নিত্যসিদ্ধ আত্মজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ। এই পূর্ণাহন্তাপদ শিবশক্তির সামরস্যস্বরূপ হইলেও ইহা তত্ত্বাতীত। ইহারই নামান্তর অনুত্তর, পরাসংবিৎ, পরমেশ্বর, পরমশিব ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সামরস্য শব্দদ্বারা কেহ মনে করিবেন না—শিবশক্তি দুইটি পৃথক্ তত্ত্বের মিলিতরূপই পরমশিব; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিবশক্তির পৃথক্ ব্যপদেশ হইলেও এই মতে উভয়ের অত্যন্ত অভেদেই স্বীকৃত হইয়াছে—শিবশক্তিরিতি হ্যেকং তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ। প্রকাশের স্ববিশ্রান্তিরূপ সমপদকে বুঝাইবার জন্যই সামরস্য শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই পরমশিবদশা অপর পক্ষে অভিন্নদৃক্-ক্রিয়াস্বরূপ; কারণ, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার পারমার্থিক ভেদ এই মতে স্বীকৃত হয় না †—প্রকাশবিমর্শের অত্যন্ত অভেদ বলাতে—এই কথাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মায়াতত্ত্বে যে জ্ঞান ও ক্রিয়ার ভেদ পরে প্রদর্শিত হইবে, সেই ভেদের নিরসনই এই মতে মুক্তির সাধনা। যে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রকাশের স্বাত্মানুভব সিদ্ধ হওয়ায় প্রকাশের জড়বিলক্ষণতা সিদ্ধ হয়, তাহাই বিমর্শ। এই বিমর্শকেই শিবের স্বভাব বলা হইয়া থাকে।

ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তত্ত্বাতীত অনুত্তর হইতেই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বময় বিশ্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাদের নাম (১) শিব, (২) শক্তি, (৩) সদাশিব, (৪) ঈশ্বর, (৫) শুদ্ধবিদ্যা, (৬) মায়া, (৭) কাল, (৮) বিদ্যা, (৯) কলা, (১০) রাগ, (১১) নিয়তি, (১২) পুরুষ, (১৩) প্রকৃতি, (১৪) বুদ্ধি, (১৫) অহঙ্কার, (১৬) মন, (১৭) শ্রোত্র, (১৮) ত্বক্, (১৯) চক্ষুঃ, (২০) জিহ্বা, (২১) ঘ্রাণ, (২২) বাক্, (২৩) পাণি, (২৪) পাদ, (২৫) পায়ু, (২৬) উপস্থ, (২৭) শব্দ, (২৮) স্পর্শ, (২৯) রূপ, (৩০) রস, (৩১) গন্ধ, (৩২) আকাশ, (৩৩) বায়ু, (৩৪) তেজ, (৩৫) জল এবং (৩৬) পৃথিবী। সদাশিব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বগুলি আবার অন্য প্রকার বিভাগ-বশতঃ চারিটি অণ্ডে বিভক্ত যথা—শক্ত্যণ্ডে সদাশিব ঈশ্বর শুদ্ধবিদ্যা এই তিন তত্ত্ব, মায়াণ্ডে মায়া হইতে পুরুষ পর্য্যন্ত ৭ তত্ত্ব, এবং প্রকৃত্যণ্ডে প্রকৃতি হইতে জল পর্য্যন্ত ২৩টি তত্ত্ব অন্তর্গত। পৃথিবী তত্ত্বকেই পৃথ্যণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড বলা হইয়া থাকে, ইহাতে পৃথিবীরূপ একটি মাত্র তত্ত্ব বিদ্যমান। এইরূপে এই চারিটি অণ্ডের মধ্যে উক্ত ৩৬টি তত্ত্ব অন্তর্গত। আমরা এখন ক্রমশঃ ঐ তত্ত্বগুলির বিবরণ প্রদান করিব। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, উপর্য্যুক্ত বিভাগে তত্ত্ব হিসাবে শিবশক্তি কোন

* (বাকৃতত্ত্বাবমর্শশূন্যস্য চ প্রকাশস্য অপ্রকাশকল্পত্বাৎ—প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী—উপোদ্ঘাত—কাশ্মীর ১৯১৮ ইং ৯ পৃষ্ঠা)।

* (বাগ্‌রূপতা চেদুৎক্রামেত্তাববোধস্য শাশ্বতী ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী—বাক্যপদীয় ব্রহ্মকাণ্ড)।

† জ্ঞানং বিমর্শানুপ্রাণিতং বিমর্শ এব ক্রিয়েতি, ন চ জ্ঞান-শক্তিবিহীনস্য ক্রিয়াযোগঃ—প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ৩।১।১।

অঙ্গমধ্যে বিন্যস্ত নহে। ইহার কারণ, বিশ্ব, শিবাভিন্না মহাশক্তিরই বিলাস। সমুদয় তত্ত্বগ্রাম ঐ শক্তিগর্ভেই নিহিত। জ্ঞানক্রিয়ার বৈষম্য বশতঃ প্রথম যে তত্ত্বের উদয় হয়, উহাই সদাশিবতত্ত্ব—সদাশিবাবধি তত্ত্বগ্রাম সমুদায়ই শক্তিতে অবস্থিত, এই জন্য ব্যাপকতম অঙ্গের নাম শক্তি, সদাশিবাদি স্বয়ং অঙ্গমধ্যে বিন্যস্ত। অতঃপর আমরা ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বান্তর্গত শিব এবং শক্তির আলোচনা করিব।

শিবশক্তি

পরমেশ্বর তাঁহার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণ মাহেশ্বর্য্যরূপা শক্তিদ্বারা নিত্য আলিঙ্গিত। স্বাতন্ত্র্যশক্তি অনন্তশক্তি চক্রের একমাত্র অধিষ্ঠান হইলেও সামান্যতঃ মুখ্য পঞ্চ শক্তিতে নিয়তবিলসনশীলা। অতএব প্রতিক্ষণেই পরমেশ্বর পঞ্চকৃত্যবিধায়ক—এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ঐ শক্তিপঞ্চককে যথাক্রমে চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়। প্রকাশবিমর্শময় অনুত্তরের প্রকাশাংশ পৃথগ্‌রূপে বিবেচিত হইলে উহাকেই চিচ্ছক্তিপ্রধান শিবতত্ত্ব বলা হয়। ইহাই ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের অন্তর্গত প্রথম তত্ত্ব। এই দশায় বিশ্বোত্তীর্ণতার বিমর্শমাত্র হইয়া থাকে। বিশ্বোত্তীর্ণতা-মাত্রের বিমর্শ, আগম মতে পূর্ণতার স্বরূপ হইতে পারে না। যে স্বাত্মানুভবে বিশ্বোত্তীর্ণতা এবং বিশ্বময়তার ভেদ বিগলিত হইয়া "আমি পূর্ণ' এইরূপ একমাত্র বিমর্শ অবশিষ্ট থাকে, সেই মহাবিমর্শই পূর্ণপদবাচ্য। বিশ্ব অনন্তশক্তিরূপে স্বাতন্ত্র্য-শক্তির গর্ভে অভেদে বিদ্যমান, অতএব বিশ্বময়তার বিমর্শযুক্ত প্রকাশ-দশাকেই শক্তিতত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। ইহা আনন্দ-প্রধান দ্বিতীয় তত্ত্ব। বিমর্শলক্ষণে বলা হইয়াছে, প্রকাশের আত্মবিশ্রান্তিই বিমর্শ। যাঁহার ক্রোড়ে অনন্তশক্তি বিদ্যমান সেই স্বাতন্ত্র্যশক্তি প্রকাশে বিশ্রান্ত হইলে তাহা অহন্তার পূর্ণতাসাধনপূর্ব্বক আনন্দরূপতাই প্রাপ্ত হইবে; কারণ, এই দশা ইদংরূপতার বিকল্পশূন্য, অতএব স্বাত্মপ্রথার প্রাতিকূল্য-লেশবর্জ্জিত। প্রথান্তরব্যবধানশূন্য নিরর্গল স্বাত্মপ্রথাই আনন্দ। ন্যায়াদিশাস্ত্রেও বেদনের অনুকূলতাকেই সুখনামে অভিহিত করা হই-য়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, নিয়ত অভিন্ন-স্বরূপ অথচ প্রকাশ-বিমর্শের বিশ্লেষণযুক্তিতে বিবেচনমাত্র দ্বারা পৃথক্‌কৃত, প্রকাশা-বস্থাকেই শিবতত্ত্ব এবং বিমর্শাবস্থাকে শক্তিতত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। বিমর্শবিরহিত প্রকাশকে শিব নামে অভিহিত করায় ঐ অবস্থাকে শূন্যাতিশূন্য পদও বলা হয়। এই শিবতত্ত্ব এক অদ্বিতীয়, বিশ্বোত্তীর্ণ প্রকাশস্বরূপ হইলেও ইহা শাঙ্কর-বেদান্তের ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব; কারণ, শাঙ্কর-বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের পারমার্থিক কর্ত্তৃত্ব সম্ভাবিত হয় না। ব্রহ্ম প্রপঞ্চাধিকরণ মাত্র; কিন্তু কাশ্মীর-দর্শনের শিব, নিয়ত সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহরূপ পঞ্চকৃত্যকারী, অতএব কর্ত্তৃত্ব তাঁহার স্বভাব, উহা আরোপিত নহে। বিশ্বসিসৃক্ষা বশতঃ জ্ঞানক্রিয়ার বৈষম্যহেতু অদ্বৈত ভূমিতেই যে তত্ত্ব-ত্রয় আবির্ভূত হয়, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনা করিব। তাহাকেই শক্ত্যণ্ড বলা হয়।

শক্ত্যণ্ড—সদাশিব, ঈশ্বর এবং শুদ্ধবিদ্যা

পূর্ব্বোক্ত স্বাতন্ত্র্যশক্তি নিমেষোন্মেষরূপ ব্যাপারদ্বয়যুক্তা। স্বরূপ-বিমর্শরূপা ঐ শক্তির আন্তর বৃত্তিকেই নিমেষ অথবা জ্ঞান-শক্তি এবং উহার বহির্বৃত্তিকে উন্মেষ অথবা ক্রিয়াশক্তি বলা হইয়া থাকে। নিমেষোন্মেষের সমতাই মহাসামরস্য বা পূর্ণতানামক তত্ত্বাতীত পদ। মহাশক্তি নিজ স্বাতন্ত্র্যমহিমায় যখন স্বভিত্তিতে বিশ্বকে উন্মীলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহাতে 'অহমিদম্' এইরূপ অস্ফুট ইদন্তা-গর্ভিত অহন্তার বিমর্শ হইয়া থাকে। এতাদৃশ বিমর্শময় প্রকাশই সদাশিবতত্ত্বনামে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এই তত্ত্বে অহংতা প্রধান, ইদন্তা- অত্যন্ত অস্ফুট। ইহা আন্তর জ্ঞানদশার সমুদ্রেকস্বরূপ, ক্রিয়া এস্থলে গৌণতাপ্রাপ্ত। এই তত্ত্বে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রমহেশ্বর নামক প্রমাতৃবর্গ অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা সৃষ্টিক্রমো-পদেশে প্রথম উল্লেখ্য সাদাখ্য তত্ত্ব।

অতঃপর প্রকাশের 'ইদমহম্' রূপ, ইদন্তাপ্রধান অহন্তাগর্ভিত যে বিমর্শদশা; সেই বিমর্শযুক্ত প্রকাশকেই ঈশ্বরতত্ত্ব বলা হয়। এই দশায় ইদন্তা প্রধান হওয়াতে ক্রিয়াশক্তিময় বহির্ভাগের সমুদ্রেক স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে, এইজন্য এই ঈশ্বরপদ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান। এই তত্ত্ব বক্ষ্যমাণ মন্ত্রেশ্বরনামক প্রমাতৃবর্গ দ্বারা অধিষ্ঠিত। বস্তুজাত আমাদের অন্তঃকরণমাত্রবেদ্য হইলে অথবা কোন চিত্রফলক অত্যস্ফুট রেখামাত্রবিচিত্র হইলে যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, সদাশিব-দশায় বিশ্বও তদ্রূপ অস্ফুটরূপে প্রোন্মীলিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্বে ঐ বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতের ন্যায় অথবা নানাবর্ণে বিচিত্র চিত্রের ন্যায় স্ফুট প্রতিভাত হয়। মনে রাখিতে হইবে, উভয়ত্রই বিশ্ব প্রকাশের স্বাঙ্গকল্পরূপে অথবা প্রতিবিম্ব-কল্পরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকে; কারণ, আমরা এযাবৎ অদ্বৈত ভূমিরই প্রসঙ্গ করিতেছি।

মায়া প্রমাতায় অর্থাৎ বদ্ধজীবে, অহন্তা এবং ইদন্তা—এতদুভয় পৃথক্ পৃথক্ অধিকরণনিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু যে দশায় সেই পৃথগধিকরণত্ব নিরসিত হইয়া একই অধিকরণে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে তাহারা সম্বদ্ধ হয়, সেই দশাকেই শুদ্ধবিদ্যা বা বিদ্যাতত্ত্ব বলা হয়। এই বিদ্যাতত্ত্বেই যখন অহংএর চিন্মাত্র-স্বরূপ অধিকরণে ইদমংশ উল্লসিত হয় তখনই 'অহমিদম্' এই আকারের বিমর্শাশ্রয় প্রকাশকে সদাশিব এবং তাহাতেই যখন সেই ইদমংশের অধিকরণে অহম্-অংশের বিমর্শ নিষিক্ত হইয়া 'ইদমহম্' এই প্রকার আকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাদৃশ বিমর্শাশ্রয় প্রকাশকে, ঈশ্বরতত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। এই তত্ত্বকে শুদ্ধবিদ্যা বলা হয়, তাহার কারণ, ইহা দ্বারা বস্তুর যথাবৎ বিদ্যা অর্থাৎ বোধ হইয়া থাকে। ভাব মাত্রের বোধ অর্থপ্রকাশ। ইতঃপূর্ব্বে অন্যোন্যোন্মুখ বিমর্শরূপ অহম্‌ই যে প্রকাশ—ইহা দেখান হইয়াছে। অতএব বস্তুর ইদন্তারূপে যে বিপরীত ভাণ; তাহার নিষেধক বলিয়া ঐ বেদন শুদ্ধ, অতএব উহা শুদ্ধবিদ্যা নামে আখ্যাত। বেদ্যভাবনিষ্ঠদশাকেই তত্ত্ব বলা হয়। মন্ত্রেশ্বরাদি শুদ্ধপ্রমাতৃবর্গ কর্ত্তৃকই ঐ বেদ্য সকল বিদিত হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রমাতৃগণের যে বেদনদশা, তাহাই শুদ্ধবিদ্যা এবং ঐ প্রমাতৃবর্গের অধিষ্ঠাতৃত্বই সদাশিব বা ঈশ্বররূপ দশা ইহাই প্রভেদ *। অনন্যাপেক্ষ অহম্‌রূপ পূর্ণাহন্তাপদ পরদশা, এবং অন্যাপেক্ষ ইদংরূপ অপূর্ণতাদশাই অপর দশা,

---

* বেদ্যভাবনিষ্ঠা দশা তত্ত্বস্বরূপা, তদবভাসয়িতৃমন্ত্রেশ্বরাদিশুদ্ধ-প্রমাতৃ-সংবেদ্যবস্তুসারা। যা তু তন্নিষ্ঠসংবেদনদশা সা শুদ্ধা বিদ্যা, তৎপ্রমাতৃবর্গাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রীসদাশিবেশ্বরভট্টারকরূপতা—(প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী—৩।১।৫)।

—এই উভয় দশার মধ্যবর্ত্তী শুদ্ধবিদ্যাদশায় সদাশিব এবং ঈশ্বরতত্ত্বে অহম্ এবং ইদম্‌এর স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতারূপ, উভয় অংশেরই স্পর্শ থাকায় এই দশাকে পরাপরদশাও বলা হইয়া থাকে *।

প্রমাতৃপ্রমেয়রূপ বিশ্ব পরাহন্তাচমৎকারসার হইলেও মহাশক্তির স্বরূপাপোহনের ইচ্ছাই ইদন্তার অবভাসনদ্বারা প্রমাতৃপ্রমেয়ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। সেইজন্য স্বাত্মনিষেধব্যাপার-রূপা সেই পারমেশ্বরী শক্তিই স্বয়ং শক্ত্যণ্ড। ইহাই ব্যাপকতম অণ্ড। কোশরূপে আচ্ছাদক বলিয়া ইহাদিগের অণ্ড নাম দেওয়া হইয়াছে। সদাশিব এবং ঈশ্বরই শক্ত্যণ্ডের অধিপতি †। স্বাত্মতিরোধানকরী স্বাতন্ত্র্যশক্তি, সঙ্কোচের অবভাসবশতঃ কিঞ্চিৎ মাত্র ভেদের উল্লাস করিলেও বিদ্যাপদে অভেদপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বথা তিরোহিত হয় না। এই নিমিত্ত বিদ্যাপদ ভেদাভেদদশাস্বরূপ। অতঃপর সঙ্কোচ আরও অগ্রসর হইলে যে পদে অ-ভেদ প্রতিষ্ঠা আত্যন্তিক ভাবেই তিরোহিত হইয়া যায় তাহাই মায়াপদ। এই মায়া স্বকীয় ব্যাপারদ্বারা শাঙ্করবেদান্তের অনুরূপ হইলেও, সর্ব্বথা অভিন্ন নহে। যে অংশে ভেদ লক্ষিত হইবে, তাহা আমরা এখনই মায়াতত্ত্বের আলোচনায় দেখিতে পাইব।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, শাস্ত্রী।

* অত্র চ তত্ত্বদ্বয়ে ভাবানাং ধ্যামলাধ্যামলরূপাণামুভয়াংশস্পর্শাৎ পরাপরত্বমিতি—(প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ৩।১।৫)।

† বিশ্বস্য প্রমাতৃপ্রমেয়রূপস্য পরাহন্তাচমৎকারসারস্যাপি স্বস্বরূপাপোহকাখ্যাতিময়ী নিষেধব্যাপাররূপা যা পারমেশ্বরী শক্তিঃ, সৈব আচ্ছাদকত্বেন বন্ধকতয়া শক্ত্যণ্ডম্ ইত্যুচ্যতে। সদাশিবেশ্বর-শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্বপর্য্যন্তদলং সৎ বক্ষ্যমাণমণ্ডত্রিতয়মন্তঃ সমন্তাৎ গর্ভীকৃত্য অবতিষ্ঠতে ইতি কোশরূপতয়া এষা শক্তিরনেন শব্দেন সংজ্ঞিতা। এতস্মিন্ অণ্ডে সদাশিবেশ্বরাবেবাধিপতী। (পরমার্থসার ৪র্থ কারিকা।)

বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনে

শ্রীচৈতন্যদেব যে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীগুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে—"মহাপ্রভু আমাকে গুঞ্জামালা দান করিয়া আমাকে শ্রীরাধিকার চরণে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার পরিকরভুক্ত করিয়া দিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়া আমাকে শ্রীগিরিরাজের আশ্রয় দান করিলেন।" এই জন্যই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে নিপতিত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনপাদমূলে আত্মদেহ বিসর্জ্জন দিবেন বলিয়া শ্রীপুরীধাম হইতে স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীও এক দিন পুরীধামে গমন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথচক্রতলে নিজদেহ বিসর্জ্জন দিবেন স্থির করিয়াছিলেন; অন্তর্য্যামী শ্রীচৈতন্যদেব তাহা জানিতে পারিয়াই শ্রীল সনাতনকে বলিয়াছিলেন—

—তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে?
* * * *
নিজ প্রিয় স্থান—মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাঁহা এক ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজ বলে।
এত সব কর্ম্ম আমি যে—দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমতে সহিব?

এই বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল সনাতনের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনধামে যে যে কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তাহার উল্লেখ করেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীও শ্রীল মহাপ্রভুর পদপল্লবে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—ত্যাগ, বৈরাগ্য ও আদর্শ বৈষ্ণবের সদাচার এবং ভজনপদ্ধতির মূর্ত্তিমান আদর্শরূপে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরঘুনাথ দাসকে গড়িয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব সম্পত্তি রঘুনাথ নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? এই জন্য শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গদান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সংকল্পের পরিবর্ত্তন-সাধন করাইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত অতি প্রিয়তম স্থল শ্রীরাধাকুণ্ডে স্থাপন করিয়া জগতের জীবের ভবিষ্যৎ চরমপথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই অত্যুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। শ্রীল রঘুনাথ যখন দেখিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দিষ্ট কার্য্যসাধনের জন্যই তাঁহার জীবন—তখন অন্তঃকরণে তাঁহারই প্রেরণা অনুভব করিয়া এই সর্ব্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন ভগবদেকপ্রাণ মহাপুরুষ শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীশ্রীরাধিকাজীর প্রিয়কুণ্ডের তটে আগমন করিলেন। এই স্থানেই তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা স্মরণ-মননে কালযাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু শ্রীব্রজমণ্ডলের সমস্ত ভার শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উপরে ন্যস্ত—এই জন্য আত্মহারা রঘুনাথের আত্ম-রক্ষার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীও অলক্ষিতে শ্রীল দাস-গোস্বামীর

'ক্রিয়ামুদ্রা' দর্শন করিতে ও তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়া দেখিতে পাইলেন, আত্মহারা রঘুনাথ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নামগানে ও লীলাস্মরণে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিকটবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যে বৃক্ষমূলে আবিষ্ট অবস্থায় উপবেশন করিয়া আছেন। যে স্থানে রঘুনাথ বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন, তাহার নিকট দিয়া একটি প্রচণ্ড ব্যাঘ্র চলিয়া গেল। যে কারণেই হউক, আত্মসমাহিত রঘুনাথের দিকে শ্বাপদ-প্রবর আর অগ্রসর না হইয়া শ্রীল রাধাকুণ্ডের মানসপাবন ঘাট হইতে জল পান করিয়া চলিয়া গেল *। শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং রঘুনাথকে বলিয়া তাঁহাকে কুটীরে বাস করিতে সম্মত করাইলেন। রঘুনাথ কুটীরে থাকিতে সম্মত হইলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আরিট্ গ্রামের ব্রজবাসিগণকে আহ্বান করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে শ্রীল দাস-গোস্বামীর জন্য একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল দাস-গোস্বামীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার জন্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। জগৎপাবন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পবিত্র চরিত্রে ও ভজনপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া শ্রীদাস নামক একটি ভক্ত ব্রজবাসী শ্রীল রঘুনাথের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এই ব্রজবাসী ভক্তপ্রবরই শ্রীল রঘুনাথ দাসের ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সেবার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিবার ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীল দাস-গোস্বামী যখন রাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাহার মাত্র ১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণে আসিয়া আরিট্ গ্রামের দুইটি ধান্যক্ষেত্রে এই রাধাকুণ্ডের ও শ্যামকুণ্ডের আবিষ্কার করেন। যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা সম্বরণ করেন, তখন তাঁহার প্রপৌত্র বজ্রনাভ মথুরামণ্ডলের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই তাঁহার মাতা শ্রীমতী উষা দেবীর ও মহর্ষি গালবের সাহায্যে ব্রজমণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলার স্মারক যাবতীয় তীর্থাবলী রক্ষা করেন ও উপযুক্ত স্থানে যথাযোগ্য দেববিগ্রহ স্থাপন করেন। কিন্তু কালক্রমে মথুরাধামে জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ঘটায় এবং পরবর্ত্তী কালে মুসলমানগণের নিদারুণ অত্যাচারে মথুরামণ্ডল একরূপ জনহীন হইয়া পড়ায় বহু তীর্থ লোপ পাইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীলোক-নাথ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীল সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ ভট্ট-প্রমুখ ভক্তগণের চেষ্টায় ব্রজমণ্ডলের এই লুপ্ত তীর্থাবলীর উদ্ধার সাধিত হয় এবং বহু স্থানে দেবসেবা প্রবর্ত্তিত হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবই এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের ও শ্যামকুণ্ডের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখনও কুণ্ডদ্বয় অসংস্কৃত অরণ্যে পরিবেষ্টিত। শ্রীল রঘুনাথের হৃদয়ে কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের বাসনা জাগিল। শ্রীভগবান্ কি নিষ্কিঞ্চন ভক্তের মনের বাসনা অপূর্ণ রাখিতে পারেন?

এক ধনী শেঠের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ছিল। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শ্রীবদ্রীনারায়ণজীর শ্রীপাদপদ্মে ঐ ঐশ্বর্য্যসম্ভার উৎসর্গ করিবার সংকল্প করিয়া তিনি শ্রীবদ্রীনারায়ণে গমন করেন। তিনি শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণকে বহু অর্থ ভেট দিবার বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তীর্থে উপস্থিত হইবামাত্র বদ্রীনারায়ণ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া বলেন, "পরমবৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-কুণ্ডের তীরে বাস করিতেছেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নামক তীর্থদ্বয় অসংস্কৃত দর্শন করিয়া উহার সংস্কারের বাসনা করিয়াছেন। তুমি অবিলম্বে এই অর্থ লইয়া তাঁহার নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে এই স্বপ্নের বিষয় বলিয়া এই অর্থের দ্বারা তাঁহাকে কুণ্ডদ্বয় সংস্কার করিতে বলিও।*"

যখন এই কুণ্ড সংস্কারের জন্য অর্থ আসে, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য লীলায় সমাগত হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর কাল শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীল দাস-গোস্বামী ইঁহাদের স্নেহে, যত্নে ও সৌহৃদ্যে লালিত পালিত হইতেছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শেষ বয়সে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মানসগঙ্গার তীরে, চক্রেশ্বর শিবের সন্নিকটস্থ বৈঠানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, শ্রীল দাস-গোস্বামী ঐ সময়ে প্রায়ই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গ-লাভে তৃপ্ত হইতেন। শ্রীরূপও অনেক সময় আসিয়া শ্রীল সনাতনের নিকট অবস্থান করিতেন এবং শ্রীদাস গোস্বামীও ঐ সুযোগে শ্রীরূপের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইতেন। তিনি পুরুষোত্তম ধাম হইতে আগমন করিয়াই শ্রীল সনাতনের নিকট শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে প্রথমে কিছু কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; তাহার পরেই তিনি শ্রীল সনাতনের ও শ্রীরূপের অনুমতি লইয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের পাদমূলে শ্রীল রাধাকুণ্ড-তীরে আগমন করেন। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিবার পরই শ্রীল সনাতন আসিয়া তাঁহার জন্য ভজন-কুটীর নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিয়া যান। শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের জলে পাদস্পর্শ করাইতেন না। শৌচাদি ক্রিয়ার জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটে শ্রীল দাস গোস্বামীর জন্য একটি কূপ খনিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তিনি শ্রীগোবর্দ্ধনের উপর হইতে ভৃগুপাত করিবার সংকল্প করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেও শ্রীল সনাতনের ও শ্রীরূপের সংসর্গে এবং তাঁহাদের উপদেশে তাঁহার সে সংকল্প দূর হইয়াছিল এবং তিনি আর পাদস্পর্শ ভয়ে গিরিরাজে আরোহণ করেন নাই। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ধন শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ নানা স্থলে গোবর্দ্ধনশীর্ষ হইতে অবতরণ

---

* ভক্তিরত্নাকর। প্রবাদ এইরূপ যে, সনাতন গোস্বামী দেখিতে পান—যাহাতে ব্যাঘ্র রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দিকে অগ্রসর না হয়—তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপবালকবেশে এক লগুড় হস্তে ব্যাঘ্রকে অন্য দিকে বিতাড়িত করেন। শ্রীল রঘুনাথকে রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এইরূপ কষ্ট পান, শ্রীল সনাতনের মুখে এই ঘটনা অবগত হইয়াই অগত্যা রঘুনাথ দাস-গোস্বামী কুটীরের মধ্যে বাস করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কারের বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কারণ, শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কারের সময়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রকট দেহে থাকিলে শ্রীজীবের নামে কুণ্ডের জমি ক্রয় করা সম্ভবপর হইত না।

* ভক্তিরত্নাকর।

করিয়া শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রমুখ ভক্তগণকে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

বৈরাগ্যের প্রকট মূর্ত্তি শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীপুরীধামে পসারীর পরিত্যক্ত অন্ন ধুইয়া তাহার সারভাগ লবণ সহযোগে ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর ও শ্রীদাস গোস্বামীর যুবক পদকর্ত্তা শ্রীল রাধাবল্লভ দাস বলিতেছেন যে, দাস-গোস্বামী শ্রীল মহাপ্রভুর ও শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অদর্শনে অন্নাহার ত্যাগ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার পর হইতে তিনি ফলমূল ও কিয়ৎপরিমাণ মাঠা ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। তাঁহার প্রিয় সেবক ও শেষ বয়সের সঙ্গী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বলিতেছেন—

"অন্নজল ত্যাগ কৈল অনন্তকথন।
পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ।"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি। ১০ম পরিচ্ছেদ

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তিনি এই প্রকারে এতদপেক্ষা কঠোর নিয়মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ আছে *।

শ্রীল রাধাকুণ্ড সংস্কারের ইতিহাস বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ঐ সময়ে শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবা কি ভাবে চলিতেছিল তাহা জানা প্রয়োজন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বপ্নাদেশে শ্রীবজ্রনাভের স্থাপিত শ্রীগোবর্দ্ধননাথ গোপালকে এক কুঞ্জ হইতে আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী শ্রীল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময়ে গোপালজীর ছোট একটি মন্দির ছিল। গোপালজীর প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পরেই শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী পশ্চিমের লোককে "মূঢ় ও অনাচারী" দেখিয়া গৌড় হইতে তীর্থ দর্শনে আগত দুই জন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে গোপালজীর সেবার ভার দিয়া গোপালজীর স্বপ্নাদেশে তাঁহার জন্য চন্দন আনয়ন করিতে শ্রীপুরীধামে গমন করেন এবং উহার পরে আর তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিবার কয়েক বৎসর পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন এবং গোবর্দ্ধনে গোবর্দ্ধননাথ গোপালকে দেখিয়া তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করেন এবং সেবার সৌষ্ঠবাদি বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন। কিছু দিন পরে আম্বালার পূর্ণমল্ল নামক এক জন ক্ষত্রিয় ভক্ত বহু অর্থব্যয় করিয়া গোপালের জন্য এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ১৪২২ শতাব্দের বৈশাখ মাসে এই মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৪৪২ শকাব্দের বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে এই মন্দিরে শ্রীগোপাল স্থাপিত হন। প্রবাদ এইরূপ যে, গোবর্দ্ধননাথ নিজেই পূর্ণমল্লের গৃহে গমন করিয়া তাহাকে স্বপ্নাদেশ দান করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে বলেন এবং ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণকর্ত্তা মিস্ত্রী হীরামণকেও স্বপ্নে এই মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ দান করেন। এই মন্দিরে গোপালজী প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দশ বৎসর পরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের তিরোভাব হয়, এবং ১৪৫৫ শকাব্দে যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পুরীধাম ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন শ্রীবল্লভাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীল বিঠ্ঠলনাথজীই শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালজীর সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন *। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া যখন শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীহরি-তনুজ্ঞানে গোবর্দ্ধন আরোহণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আর পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতেন না। কিন্তু বল্লভাচার্য্যের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের ঐ বাধা ছিল না—সুতরাং শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের অধিনায়কতায় তাঁহারাই গোবর্দ্ধননাথজীর সেবা-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। শ্রীল বল্লভাচার্য্যজী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি সুবোধিনী গীতা রচনা শেষ করিবার পরে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতজীর নিকট হইতে কিশোর-গোপালের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পুষ্টিমার্গের প্রচার করেন। এই হইতেই বল্লভাচার্য্যজীর তিলক শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের পরিবারের তিলকের আকার ধারণ করে। এখনও শ্রীল বল্লভাচার্য্যজীর শেষ বয়সের শিষ্য ও পুত্রস্থানীয় শ্রীজলধরিয়া গোস্বামীর পরিবারের তিলক এই জন্যই শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পরিবারের তিলকের সদৃশ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে কথিত ইতিহাস বিশেষ প্রামাণিক। যাহা হউক, যখন শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন এই আদর্শ-ভক্তকে পরম প্রেমিক শ্রীল বিঠ্ঠলেশ্বর বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। ভক্তিরত্নাকরে এ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান কালে একদা শ্রীল দাস-গোস্বামী অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী দুই জন বিচক্ষণ কবিরাজকে লইয়া শ্রীল দাস-গোস্বামীকে দেখিতে আসেন। সে কালের কবিরাজী চিকিৎসকগণের অতি সুন্দররূপ নাড়ীজ্ঞান ছিল। তাঁহারা দাস-গোস্বামীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যে কোনও গোদুগ্ধজাত গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে শ্রীমদ্দাস-গোস্বামীর এই অজীর্ণ দেখা দিয়াছে। দাস-গোস্বামী মাত্র ২।৩ পল মাঠা ভক্ষণ করিতেন, তাঁহার মত সংযমী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের পক্ষে গুরুপাক গব্যদ্রব্য ভোজনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ঐ স্থানে সমাগত ভক্তগণের কবিরাজের কথায় সন্দেহ হইল। তখন শ্রীল দাস-গোস্বামী নিজেই কহিলেন যে—চিকিৎসকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ,—তিনি মানসসেবায় পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দকে ভোগ নিবেদন করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহার অজীর্ণ

* ভক্তিরত্নাকরে আছে, পথে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাবের পর শ্রীল দাস-গোস্বামী মাঠা খাওয়াও ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

* পরবর্ত্তী সময়ে বল্লভ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যে হিন্দী গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত গোবর্দ্ধননাথজীর সম্বন্ধ সযত্নে মুছিয়া ফেলিয়া গোপাল আবিষ্কারের অন্য উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শ্রীল বল্লভাচার্য্যজী ও শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী শ্রীচৈতন্যদেবকে ও তৎসম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের তিরোভাবের পরেই এই সকল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

হইয়াছে। এইরূপে লোকোত্তর-চরিত্রসম্পন্ন মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে সাধারণ শারীরিক নিয়ম ও স্বাস্থ্যবিধি প্রযোজ্য নহে।

যাহা হউক, শ্রীল বিঠ্‌ঠলনাথ পরম ভক্ত ছিলেন এবং তিনি গোবর্দ্ধনের সন্নিহিত পাচুনিগ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন *। শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ শ্রীল দাস-গোস্বামীর ও শ্রীজীব গোস্বামীর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীগোপালরাজস্তোত্রে শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ যে পরম প্রেমভরে শ্রীগোপালজীর সেবা করিতেন—একাধিক স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যখন শ্রীরূপ-সনাতনের তিরোধান হইল, তখন শ্রীজীব গোস্বামি-প্রমুখ শ্রীবৃন্দাবনের নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল দাস-গোস্বামীর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া শ্রীল বিঠ্‌ঠলনাথের হস্তেই শ্রীগোপালজীর সেবার সমস্ত ভার অর্পণ করেন। যথা—

"শ্রীমদ্দাস গোস্বামী আদি পরামর্শ করি।
শ্রীবিঠ্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী॥"

ভঃ রঃ ২১৩ পৃঃ।

পরমভাগবত শ্রীল দাস-গোস্বামী এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন—তখন তিনি বিনয়ের পরাকাষ্ঠায় ও ভজনের আদর্শে সর্ব্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবমাত্রের পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ও বল্লভ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই প্রধানতঃ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিলেও সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার অপেক্ষা প্রকৃত বৈষ্ণবতার দিকেই বৈষ্ণবপ্রধানগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। নিম্বার্ক সম্প্রদায়, বল্লভ সম্প্রদায় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন অতীব সুদৃঢ় ছিল। বিশেষতঃ, সর্ব্বত্যাগী বিনয়ের অবতার শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ গোস্বামিগণের মনোরম ব্যবহারে সকলেই তাঁহাদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই সময়ে শ্রীরূপ-সনাতনের তিরোভাবের পরেই শ্রীল দাস-গোস্বামীর উপর যখন কার্য্যতঃ শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবের নেতৃত্ব-ভার অর্পিত হইল—তখনই শ্রীল দাস-গোস্বামীর মনে শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীবদ্রীনারায়ণের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শেঠজী বহু অর্থ লইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিলেন। নিরন্তর অন্তর্দ্দশায় ভজনপরায়ণ দাস-গোস্বামীর অবসর সময়ে শেঠজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। তখনই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীল রাধাকুণ্ডে আগমন করিয়া শ্রীবিঠ্‌ঠলেশ-প্রমুখ বৈষ্ণবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কারের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি সর্ব্বপ্রথমে আরিট্ গ্রামের যে যে কৃষক শ্রীল রাধাকুণ্ডের ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের ভূমি নিজ নিজ স্বত্বে দখলিকার আছে বলিয়া দাবী জানাইল, তাহাদিগের সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট অর্থদান করিয়া ঐ স্থানের ভূমি ক্রয় করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য যে, নিষ্কিঞ্চন দাস-গোস্বামী নিজ নামে এই ক্রয়ের দলিল করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না—তখন শ্রীজীব গোস্বামী নিজ নামে এই স্থানের দলিল করাইয়া লইলেন। তখনকার রাজদ্বারে প্রচলিত উর্দ্দু ভাষাতেই এই সমস্ত দলিল লিখিত হইয়াছিল। শ্রীশ্যামকুণ্ডের ও শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বত্ব লইয়া প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে মথুরার আদালতে আভাগড়ের মহারাজের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে এই সমস্ত দলিল নিত্যধামগত শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজীর ও ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের চেষ্টায় দাখিল হইয়াছিল।

শ্রীজীব গোস্বামী ব্রজবাসিগণের সমবেত চেষ্টায় ও শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ-প্রমুখ স্থানীয় বৈষ্ণবগণের সহযোগিতায় যখন শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড খনন করেন, তখন শ্রীশ্যামকুণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বজ্রনাথকুণ্ড আবিষ্কৃত হইয়া কুণ্ডদ্বয়ের স্থান-নির্ণয় যে অভ্রান্ত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। কথিত আছে, স্থানীয় খনকগণ যখন শ্রীশ্যামকুণ্ড চতুষ্কোণাকারে খনন করিতে যাইতেছিল, তখন পাঁচটি সুবৃহৎ প্রাচীন বৃক্ষ স্বপ্নযোগে শ্রীল দাস-গোস্বামীর সহিত রাত্রিকালে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা পঞ্চপাণ্ডব—বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া বহু দিন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন—তাঁহাদিগকে ছেদন করিয়া যেন তাঁহাদিগের শ্রীবৃন্দাবন-বাস বন্ধ না করা হয়। স্বপ্নে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া শ্রীল দাস-গোস্বামী খননকারিগণকে এই প্রাচীন বৃক্ষগুলি ছেদন করিতে নিষেধ করেন, এই জন্য শ্যামকুণ্ড চতুষ্কোণ হইতে পারিল না। তদবধি শ্যামকুণ্ডের তীরে এই পঞ্চবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে।

চিরকাল-নিয়মানুগত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিয়াও তাঁহার ভজনের নিয়ম বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র শিথিল করেন নাই। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য তাঁহার এই নিয়মানুষ্ঠান সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম॥
রাত্রি-দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে পতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১০ম অধ্যায়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই ভাবে স্বীয় গুরুর নিত্যকৃত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে আত্মহারা হইয়া বলিতেছেন—

"তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার॥"

শ্রীল দাস-গোস্বামী এই প্রকারে প্রতিদিন লক্ষ নাম জপ করিতেন এবং প্রতিবার অষ্টোত্তরশত নাম-জপের অবসানে একবার করিয়া দণ্ডবৎ করিতেন, এই ভাবে সহস্র দণ্ডবৎ করা হইত। তিনি শাস্ত্রের লিখিত, দৃষ্ট, শ্রুত প্রায় দুই সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ প্রণাম করিতেন। দিবারাত্রির অষ্ট-প্রহরে তিনি প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণসখিগণ সঙ্গে থাকিয়া যে লীলা করিতেন, ধ্যানে তাহার চিন্তা

* ভক্তিরত্নাকর।

করিয়া নিজ মানসিক সিদ্ধদেহে তাঁহাদের সেবা করিতেন। শ্রীপুরুষোত্তমে পার্ষদগণবেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে যে লীলা তিনি দর্শন করিয়াছেন—শ্রবণেচ্ছু ভক্তদিগের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন অথবা শ্রবণ করিবার লোক না থাকিলে মনে মনে তাহা এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেন। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে পাদস্পর্শ না করাইয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় তিন বার শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিতেন। ব্রজবাসী বৈষ্ণব দর্শন করিলেই তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনাদির দ্বারা সেবা ও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য মর্য্যাদাদান করিতেন। দিবসের অষ্ট প্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহর তিনি এই প্রকার ভক্তিসাধনে রত থাকিয়া চারি দণ্ড কাল মাত্র নিদ্রা যাইতেন, তাহার মধ্যেও স্বপ্নাবস্থায় মানসসেবায় সংস্কারানুযায়ী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা দর্শন করিতেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাবের পরে গৌড়, বঙ্গ, উৎকল হইতে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর নামে যাঁহারা উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই তিনটি যুবক শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া যখন ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করেন, তখন তাঁহারা শ্রীল দাস-গোস্বামীকে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিয়া দর্শন করিয়া যাইতেন। এই তিন জনের মধ্যে দুঃখী কৃষ্ণদাস (উত্তরকালে যিনি শ্যামানন্দ ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ হন) আগে শ্রীবৃন্দাবনে না আসিয়া আগেই শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইয়া শ্রীল দাস-গোস্বামীর চরণে যাইয়া শরণ গ্রহণ করেন; শ্রীল দাস-গোস্বামী অধ্যয়ন ও ভজনাদি শিক্ষার জন্য তাঁহাকে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। যখন এই তিন জনে অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণ বহু গোস্বামি-গ্রন্থ ও বৈষ্ণব-গ্রন্থ ইঁহাদিগের সহিত গৌড়ে প্রেরণ করেন। শ্রীবৃন্দাবনের যাবতীয় গোস্বামিগণ ও বৈষ্ণবগণ শ্রীজীবের আহ্বানে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে সমবেত হইয়া ইঁহাদিগকে বিদায় দান করেন। শ্রীল দাস-গোস্বামীর তখন শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত আসিবার সাধ্য নাই, এই জন্য তিনি প্রিয়শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজকে শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে প্রেরণ করিয়া ইঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ জানান। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সময় নিয়ত শ্রীদাস গোস্বামীর নিকট বাস করিতেন এবং তাঁহারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবন যাতায়াত করিতেন। 'প্রেমবিলাস' নামক একখানি অনৈতিহাসিক বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখা যায় যে, বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বির যখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত গ্রন্থরাজি লুণ্ঠন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মনের দুঃখে শ্রীরাধাকুণ্ডে পতিত হন এবং অচেতন অবস্থায় সে স্থান হইতে ইঁহাকে উঠাইলে তিনি শ্রীদাস গোস্বামীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণ উৎক্রামণ করেন। কিন্তু এই উপাখ্যান আদৌ প্রমাণসহ নহে। কারণ, বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বিরের রাজসভায় অপহৃত গ্রন্থরাজির সন্ধানে যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য উপস্থিত হন, তখন তাঁহার শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং ভক্তি-প্রভাব দর্শন করিয়া বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বির তাঁহার পুরোহিত ব্যাস আচার্য্যের সহিত সস্ত্রীক শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গ্রন্থরাজি প্রত্যর্পণ করেন। ইহার কিছু পরেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়ে খেতুরীতে মহোৎসব সম্পন্ন করেন। এই মহামহোৎসবে তৎকালীন বৈষ্ণব-প্রধানগণের সহিত শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীল জাহ্নবা দেবীও উপস্থিত হন। তিনি খেতুরীর উৎসবের কিছু পরেই শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। তিনি সপরিকরে মথুরা পর্য্যন্ত আসিলে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রমুখ তাৎকালিক বৈষ্ণব-প্রধানগণ মথুরায় গমন করিয়া শ্রীল জাহ্নবা দেবীকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ভক্তিরত্নাকরে এই সময়ে স্পষ্ট ভাবেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নাম দেখা যায়, ইহার পরেও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন, তখনও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে তাঁহার সঙ্গিরূপে দেখিতে পাওয়া যায় *। অধিক কি, শ্রীজীব গোস্বামীর পত্রাবলী সমস্তই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীল বৃন্দাবন আচার্য্যের জন্মের পরে লিখিত। ঐ পত্রের মধ্যেও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ-প্রমুখ বৈষ্ণবগণকে লিখিত চতুর্থ পত্রে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উল্লেখ আছে †। সুতরাং প্রেমবিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসে বর্ণিত শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর গ্রন্থরাজির সংবাদ শ্রবণে শ্রীরাধাকুণ্ডে পতিত হইয়া "মুদিত নয়নে প্রাণ নিষ্ক্রামণের" কথা নিতান্তই অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক। "কর্ণানন্দ" নামক একখানি নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থেও এই ব্যাপারের প্রতিবাদ পরিদৃষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

---

* শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী

"গোবর্দ্ধন হইতে গেলেন ধীরে ধীরে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে।
তথা হইতে বৃন্দাবন দুই দিনে গেলা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ সঙ্গেই চলিলা।

—ভক্তিরত্নাকর, ত্রয়োদশ তরঙ্গ, ১০২২ পৃষ্ঠা।

† এই পত্রখানি প্রেম-বিলাসে ও (যশোদানন্দ তালুকদারের সংস্করণ) চতুর্ব্বিংশ বিলাসের পর অর্দ্ধবিলাসে ষষ্ঠ পত্ররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে আছে—"ইহ কৃষ্ণদাসস্য নমস্কারা ইতি।" শ্রীপ্রেমবিলাসে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে—"এখানে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সমাজ।"

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

২১

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি তা হলে ফোন করো কল্পনা। ছাখো, পারুল যদি এখন আসতে পারে।

কল্পনা উঠিয়া দাঁড়াইল।

গোস্বামী সাহেব এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এখন পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—কল্পনা কাকে ফোন করবে লীলা?

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, কথাগুলো কি এতক্ষণ শুনছিলে না?

—শুনছিলুম! তবে তোমার ব্যবস্থায় হাত দেওয়া উচিত নয় ভেবে নীরব শ্রোতা হয়েছিলুম।

হাসিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—হঠাৎ তা হলে এখন বক্তা হয়ে উঠলে যে!

গোস্বামী কহিলেন,—মহাভারতের উপদেশ মনে পড়লো।

গ্যাংলি রঙ্গ করিয়া কহিল,—গোস্বামী এতক্ষণ ধরে অষ্টাদশ পর্ব্ব হাতড়াচ্ছিলে না কি?

—হ্যাঁ, বামুনের ছেলে! ধড়া-চুড়োয় যতই সাহেব সাজি, ভিতরে রক্তের পোকাগুলো মাঝে-মাঝে বন্ বন্ করে ওঠে।

বাক্‌চি হাসিয়া কহিলেন,—তা সত্যি! কিন্তু হঠাৎ সে পোকা-গুলো এমন সময়ে মাথা নাড়া দিলে কেন?

গোস্বামী সাহেব মাথা নাড়িলেন। কহিলেন,—ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। বিচারকের কাছে গজ্‌গজ করা পেশা—নীরবতা তাই হঠাৎ কেমন বিঁধলো। মনে পড়ে গেল, মহাভারতের অনুশাসন।

মিসেস্ গোস্বামী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে তাকাইলেন, কহি-লেন,—সে অনুশাসনটা কি, শুনি।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—সভায় উপস্থিত থাকলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়, না হলে পতিত হবো।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কোথায় কি অন্যায় পেলে?

ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—একটু যেন পাচ্ছি মনে হচ্ছে!

সকলেই উদ্‌গ্রীব নেত্রে গোস্বামীর পানে চাহিল।

অমিয়, অনিল মনে মনে শঙ্কিত হইল। মা নিজের মত বাহাল রাখিতে কতখানি দৃঢ়, ভালরূপেই তাহা তাহারা জানে।

মৃদু হাস্যে কোমল কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—সে অপ্রিয় আলোচনা বাদ দাও না, লীলা! আমি বলি, তোমার সিলেকসন কখনো ভুল হয় না। তুমি যাকে যে ভূমিকা দিয়েছো, তার যেন অদল-বদল না হয়! তাতে যে যেমন পারে!

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—ভালো যুক্তি! কিন্তু গোল বাধবে ওইখানে, যারা নিমন্ত্রণ পেয়ে দেখতে আসবে। তারা জানবে, আমার পরিচালনায় এ নাটক অভিনয় হচ্ছে—কাজেই তার দোষ-গুণের জন্য আমাকেই তারা দায়ী করবে।

হাসিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—করুক না, এ তো একটা উৎসব। এখানে শুধু আনন্দের পরিমাপ-বিচার।

অবাক্ হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অভিনয়টা ফেলিয়োর হবে?

সহাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—এতগুলো শিল্পীর সাফল্য, তোমার এতখানি উৎসাহ, চেষ্টা—এ সব একটি মানুষের জন্য ফেল্ হতে পারে না। আমি বলি, রত্নাকে তুমি নিজের হাতে যে পার্ট দিয়েছো, তার বদল না করাই ভালো।

মিসেস্ গোস্বামী মনে মনে বিরক্তি বোধ করিলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া শান্ত স্বরেই তিনি বলিলেন—তোমার কথা রাখতে পারলে খুশী হতুম। কিন্তু এত বড় একটা ভূমিকা এমন এক জন আনাড়ীর হাতে দিয়ে মাটী করতে পারি না।

পত্নীর মনের দৃঢ়তা গোস্বামী বুঝিলেন। তথাপি ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না; অনুরোধের কণ্ঠে কহিলেন,—আজ না পারলেও সে দিন যে পারবে না, তার মানে নেই।

অসহিষ্ণু স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি বুঝছো না! পাঁচ জনকে দেখলে রত্না ভেবড়ে যাবে। যাওয়া স্বাভাবিক।

গোস্বামী হাসিলেন। কহিলেন,—সে সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম। তুমি দেখো, রত্না উর্ব্বশীর ভূমিকা সে দিন ভালোই করবে লীলা।

মিসেস্ গোস্বামী নীরব রহিলেন।

নিজের আসনে বসিয়া কল্পনা কহিল,—মাসিমা আমিও বলি, সেই ভালো।

গোস্বামী সাহেব কল্পনার দিকে চাহিলেন। কহিলেন,—আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল তো কল্পনা! বলিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—রত্না কোথা গেল?

মিসেস্ গোস্বামী রত্নার শূন্য আসনের দিকে চাহিলেন, সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল।

বিস্মিত কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—রত্না কখন উঠে গেল?

কল্পনা উত্তর দিল,—সে তো বসেনি! তার নাচ শেষ হতেই সে চলে গেছে।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখে রোষের রক্ত আভা ফুটিল। নীরস কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—আমায় না জানিয়ে চলে গেল!

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—বোধ হয় তোমার অনুমতি নেবার মত শরীর তার ছিল না। পাছে তুমি ভাবো, তাই নিঃশব্দে চলে গেছে! তার মুখ আজ ভারী শুকনো দেখাচ্ছিল।

মিসেস্ গোস্বামী স্বামীর এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কোন জবাব না দিয়া শুধু কহিলেন,—কল্পনা তুমি পারুলকেই আনবে—সে উর্ব্বশী সাজবে।

—তা হতে পারে না লীলা! গোস্বামী সাহেবের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

সচকিত হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কেন হতে পারে না?

—এটুকু তুমি ভুলে যাচ্ছ, সেটা আমার জন্মদিন!

হতভম্বের মত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তাতে কি হয়েছে?

মৃদু হাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তুমি এত বড় উৎসবের আয়োজন কচ্ছ আমায় তৃপ্তি দিতে, আনন্দ দিতে! যাকে কেন্দ্র করে এই নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করলে, আজ তাকে বাদ দিলে লক্ষ্যচ্যুত হবে।

অস্ফুট কণ্ঠে প্রতিবাদের মত মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কিন্তু—

গোস্বামী কহিলেন,—না লীলা, কিন্তু নয়! আমার জন্মদিনে আমি প্রত্যেককে আনন্দ দিতে চাই! সে আনন্দে কেউ যেন না বাদ পড়ে। তা ছাড়া ফেলে-আসা একটা দিনকে স্মরণ করেই না এই উৎসব! কাজেই রত্নাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না!

অধীর কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—বাদ তো তাকে দিচ্ছি না।

দৃঢ় স্বরে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—বাদ দেবার কথা হচ্ছে না! রত্নাকে তুমি যে ভূমিকা দিয়েছিলে, তার বদল হবে না। রত্নাকে ক্ষুণ্ণ করার অর্থ আমার জন্মদিনে আমাকে ক্ষুণ্ণ করা। কারণ, রত্নাকে আমি সব চেয়ে বেশী ভালোবাসি। সকলের চাইতে সে আমার স্নেহের পাত্রী!

একটা অতি সামান্য উত্তরও কাহারও মুখে ফুটিল না।

মিসেস্ গোস্বামী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

২২

পরাভবের ধিক্কার, লজ্জা ও গ্লানি মাখিয়া রত্না যখন হল-ঘর ছাড়িয়া আসিল—তাহার কর্ণে শুধু এইটুকু পশিল, মিসেস্ গোস্বামী কহিতেছেন,—ভূমিকা বদলানো চাই! তাঁহার স্বর বেশ তপ্ত!

বাকী কথাগুলো রত্না দাঁড়াইয়া আর শুনিতে পারিল না। দ্রুত-পদে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। পথে পড়িল গোস্বামি-গৃহের প্রধানা পরিচারিকা মঙ্গলা।

তাহাকে দেখিয়া রত্না কহিল,—মঙ্গলা-দি, মাসিমাকে বলো, আজ আমি কিছু খাবো না।

মঙ্গলা ভদ্র-ঘরের বিধবা। গোস্বামি-প্রাসাদের গৃহিণীপণা, সকল-কার আহারের পরিচর্য্যার ভার তাহার উপর।

মঙ্গলা কহিল,—কিছু খাবে না। একটু দুধ-মিষ্টি বা কিছু ফল?

শ্রান্ত কণ্ঠে রত্না কহিল,—না, আমার বড্ড মাথা ধরেছে। কিছুই খাবো না।

নিজের ঘরে পা দিয়া রত্না কপাট বন্ধ করিয়া জুতা-মোজা খুলিয়া আলো নিবাইয়া একেবারে বিছানায় গিয়া এলাইয়া পড়িল।

একটা নিশ্বাস পড়িল। যাক্, আজিকার মত অব্যাহতি! গোস্বামি-গৃহে খাইবার অনিচ্ছা জানাইয়া দিলে আহারের আর তাগিদ আসে না! এবং অভুক্ত থাকার জন্য কৈফিয়ৎ লইতেও কেহ ছুটিয়া আসে না। একটু বিশ্রাম ও বিরাম পাওয়া যায়।

কিন্তু এখন আহারে বিতৃষ্ণা লইয়া বালিশে মাথা রাখিতেই দপ্ করিয়া নিজের বাড়ীর কথা মনে পড়িল। সেখানে কোন মান-অভিমান লইয়া দু'দণ্ড উপবাসী থাকিলে মায়ের আহারের তাগিদ, জিদ, জবরদস্তি যেন উৎপাতের মত অস্থির করিয়া অনশন-সঙ্কল্পকে ভাঙ্গিয়া দিত।

বাড়ীর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রত্নার মনে পড়িল—মা তাহাকে বাড়ী যাইতে কত করিয়া লিখিয়াছিল। মায়ের আহ্বানকে রত্না উপেক্ষা করিয়াছে গোস্বামি-গৃহের তীব্রতম আকর্ষণে! মন ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু অন্তরে সে জন্য অনুতাপ জাগিল না। সমস্ত চিন্তাকে সরাইয়া ঠেলিয়া মিসেস্ গোস্বামীর সেই অন্ধকার মুখ রত্নার মানস-দৃষ্টিতে ভাসিতে লাগিল। ইহা লইয়া মিসেস্ গোস্বামীকে অভিযুক্ত করিতেও মন পরাঙ্মুখ হইতেছিল। মন বলিতেছিল, তিনি যে রত্নার উপর অনেকখানি আশা রাখিয়াছিলেন! আশা-ভঙ্গের মনঃ-পীড়া ক্ষুব্ধ অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার করে; সেই জন্যই মিসেস্ গোস্বামীর আচরণ রত্নার অন্তরে তেমন ক্লেশ দিতে পারিতেছিল না। শুধু ঐ কল্পনার জন্য মর্ম্ম-দাহ হইতেছিল, সমস্ত মন যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল।

কল্পনা যখন দেবেন্দ্রাণী সাজিয়া অনিলের পাশে বসিল, মন তখন পীড়া অনুভব করিলেও, এমন করিয়া জ্বলিয়া ওঠে নাই! কিন্তু অমিয় যে মুহূর্ত্তে কল্পনার বাঁয়ে বসিল, সে দুঃসহ দৃশ্যে রত্নার বুক যেন হু-হু করিয়া উঠিয়াছে!

দূরে বসিয়া রত্না তাহাদের এতটুকু কথা শুনিতে পায় নাই। কিন্তু অমিয়র মুখের মৃদু হাসি ও কল্পনার সেই ক্ষণে-ক্ষণে আরক্ত মুখ রত্নার মনে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল!

রত্না স্থির নেত্রে দু'জনের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। এবং দুর্জ্জয় আগ্নেয়গিরি যেমন অন্তরে কালান্তক অনল-প্রবাহকে ভরিয়া বাহিরে শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে, তেমনি বহু আয়াসে সে নিজেকে শান্ত রাখিয়াছিল। এবং তাহারই প্রতিক্রিয়ায় হৃত-সর্বস্বের দীনতা লইয়া নত-শিরে সে অভিনয়-স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

রত্নার মাথার মধ্যে দপ দপ্ করিতেছিল। দুই হাতে রগ চাপিয়া নিদ্রার চেষ্টায় সে চক্ষু মুদিল। কিন্তু নিমীলিত নেত্রের দুই পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল অশ্রু-প্রবাহ। মনকে নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। এ নিষ্ফল কান্নায় কেন নিজেকে অপমানিত করা! কিন্তু ক্রন্দন কিছুতেই নিষেধ মানিল না, উৎসের মত ঝরিতে লাগিল।

ঘড়ির বাজনায় অনেকক্ষণ পরে রত্না চক্ষু মুদিল। মধ্য-রাত্রি। গোস্বামি-প্রাসাদ নিস্তব্ধ। রত্না বুঝিল, আগন্তুকের দল গৃহে ফিরিয়াছে।

দৃষ্টির বাহিরে যাহা অতীন্দ্রিয়, রত্নার দৃষ্টিপথে তাহাই যেন ভাসিতে লাগিল! মানস-চক্ষে সে দেখিল,—কল্পনার আনন্দ-দীপ্ত মুখ! তাহার সাফল্যে পুলকিত অমিয় নিজে তাহাকে মোটরে তুলিয়া দিবার জন্য আসন ত্যাগ করিল। প্রত্যেকের সপ্রশংস দৃষ্টি কল্পনার উপর ন্যস্ত! বিদায়-সম্ভাষণে মিসেস্ গোস্বামী আহ্লাদের সহিত তাহার গাল দু'টি টিপিয়া দিলেন! 'মা' বলিয়া একটু আদর করিলেন। কল্পনার দুই গাল পাকা আপেলের মত রাঙা হইল, অমিয়র মুগ্ধ দৃষ্টি সেইখানে নিবদ্ধ! উঃ! বলিয়া রত্না পাশ ফিরিল।

রত্না ঠিক করিল,—কাল সকালে মিসেস্ গোস্বামীকে সে জানা-ইয়া দিবে, উর্ব্বশীর ভূমিকা অভিনয় করিবার সামর্থ্য তার নাই! কল্পনা যেখানে রাণী, অভিসারিকার মত রত্না সেখানে দাঁড়াইতে পারিবে না।

মনে হইল, তাহার জীবনটা মিথ্যা! সকলে তাহার রূপের যে এত প্রশংসা করে, সে রূপ মিথ্যা। উজ্জ্বল রবি-কিরণের মত এই রূপ শুধু তাহাকে দগ্ধ করিবে! স্নিগ্ধ শরৎ-কৌমুদীর মত কোনো দিন মনে প্রীতি বা আরাম দিবে না!

রত্না ভাবিল, কেন এমন হইল? চোখে আঙুল দিয়া মন বলিল, সামাজিক মর্য্যাদা! মিসেস্ গোস্বামী কল্পনার পরিচয় দিতে নিজেই যে গৌরবে দুলিয়া ওঠেন। কল্পনা যে সেই নিমেষের জন্য তাহার পানে চাহিয়াছিল, সে দৃষ্টিতে কি করুণাই না মাখানো ছিল। গোস্বামী সাহেবের সস্নেহ আহ্বানে যখন সকলের সামনে আসিল, তখন সকলের বিস্মিত দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন জাগিল, মিসেস্ গোস্বামী এই বলিয়া তাহার উত্তর দিলেন,—ও আমাদের একটি মেয়ে—বাস্তবিক, এই পদগৌরবশালীদের সামনে কোন অখ্যাত গ্রামের এক মাষ্টারের মেয়ে বলিতে গৌরবের কি আছে? সে পরিচয় দিলে সভ্য-সম্প্রদায়ের কাছে রত্নাকে যেন খর্ব্ব করা হইত!

২৩

এমনি মর্ম্মান্তিক বেদনায় নিদ্রাহীন চক্ষে রত্না যখন বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল, ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে জর্জ্জরিত হইতেছিল, সেই সময়ে অন্য এক প্রাসাদের সুরম্য প্রকোষ্ঠে আর একটি তরুণীও জটিল সমস্যা লইয়া বিনিদ্র নেত্রে নিজের শয্যায় জাগিয়াছিল,—সে কল্পনা।

কল্পনা যখন বাড়ী ফিরিল, উল্লাসে তাহার মন তখন পরিপূর্ণ।

দাদার ঘরে ঢুকিয়া দাদা ও বৌদিকে সম্ভাষণ করিয়া উৎসাহিত কণ্ঠে কল্পনা বলিল,—তোমরা যাচ্ছ তো পরশু?

সুশীল এবং ইভা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—নিশ্চয়।

সুশীল কহিল,—আজ তোদের ফুল রিহার্শাল ছিল তো!

কল্পনা কহিল,—হ্যাঁ, দিয়ে এলুম।

ইভা তাহার সস্মিত মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—তোমার পার্ট বুঝি খুব সুন্দর হয়েছে?

হাসিতে হাসিতে কল্পনা কহিল,—হ্যাঁ, সকলের চেয়ে ভালো। তোমরা তো যাচ্ছ, দেখতেই পাবে। পারুলদিরও বোধ হয় ওখানে ডাক পড়বে।

সুশীল কহিল—পারুলকে কেন?

—উর্ব্বশী সাজবার জন্য। উর্ব্বশী নিয়ে মিসেস্ গোস্বামী ভারী বিপদে পড়েছেন। যেন সাপের ছুঁচো-গেলা! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ইভা কহিল,—কি রকম? উর্ব্বশীর অসুখ করলো না কি? তোমার দাদার তা হলে থিয়েটার দেখা মাটী! উর্ব্বশীর নামে উনি একেবারে পাগল।

মুখ বিকৃত করিয়া কল্পনা কহিল,—অসুখ না হাতী! সে একটা পাড়াগেঁয়ে জংলী, বুঝলে কি না বৌদি!

ইভা গালে হাত দিল। কহিল,—অবাক্ করলে! বলো কি? এমন রূপসীকে কেউ উর্ব্বশীর পার্ট সিলেক্ট করে! এরা পাগল না কি?

উৎসাহিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—বলে কে, বলো! আজ তেমনি জব্দ।

বিমূঢ় কণ্ঠে সুশীল কহিল,—সে কি রে! উর্ব্বশী জংলী কি রকম?

—চেহারাতে বলছি কি! তা নয়। জংলী চাল-চলনে! রীতিমত বুনো! সেই যে বৌদি রত্না, আমাদের বোর্ডিংএ থাকতো, তোমায় গল্প বলতুম।

ইভা মাথা নাড়িল! কহিল,—ওঃ! বুঝেছি! তাই বলো, তা সে তো খুব সুন্দরী!

তাচ্ছল্য-সহকারে কল্পনা কহিল,—রংটা একটু কটা বটে!

সুশীল কহিল—তোদের উর্ব্বশী শুধু গায়ের রংএ কি রে, সব দিকেই তো পরমা সুন্দরী!

অবজ্ঞাভরে কল্পনা কহিল,—কে জানে বাপু, তোমরা সব কি চোখে তাকে দেখেছো! আমি তো এমন কিছু দেখি না। তবে হ্যাঁ, মুখখানা মন্দ নয়!

সুশীল হাসিল। কহিল,—মেয়েরা কখনও অন্য মেয়েকে সুন্দরী দেখে না। হাঁ রে, অমিয় তো তাকে বিয়ে করবে?

ইভা হাসিয়া কহিল,—'দুষ্মন্ত-শকুন্তলা' বলো।

দু'চোখ কপালে তুলিয়া কল্পনা কহিল,—কি যে বলো বৌদি! ঐ জংলী পাড়াগেঁয়ের সঙ্গে! এ তোমরা ভাবতে পারো?

সুশীল কহিল,—আমাদের ভাবতে কিছু হবে না! যিনি ভাববার, তিনিই ভাবে বিভোর।

ইভা কহিল,—তোর কথাই ধরি—আপত্তি কিসের?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—আপত্তি! বলি, মত কে দিলে? মাসিমা আগে রত্নার নামে গলে যেতেন! এ ক'দিন দেখছি যেন চটে আছেন! তবে খুব চাপা কি না উনি। আমাদের চোখে এড়ায় না কিছু!

সুশীল প্রশ্ন করিল,—চটে আছেন কেন?

কল্পনা হাসিয়া দাদার খাটের উপর বসিল! কহিল—একটা কথা আছে না—নাই দিলে কারা মাথায় ওঠে!

আশ্চর্য্য হইয়া সুশীল কহিল,—অর্থাৎ? সে-দিন তো মিসেস্ গোস্বামী আমাদের বল্লেন, খুব ভালো মেয়ে! এম্পায়ারে মন্দির দেখতে গেছে। থাকলে আলাপ করে দিতুম!

ঘাড় নাড়িয়া পুলকিত স্বরে কল্পনা কহিল,—এমনি বলতেন বটে! আমাকেও বলেছেন! এখন মেয়ের গুণ বেরিয়েছে, মাসিমাকেও ডিঙিয়ে চলে।

ইভা কহিল,—অবাক্ করলে কল্পনা!

—হ্যাঁ, বৌদি সত্যি! মনে করে, সে যেন ধিঙ্গি! কিছু এটিকেট জানে না।

সুশীল কহিল,—তা যা হোক, মেয়েটির কিন্তু বাহাদুরী আছে, অমিয়র প্রতিজ্ঞা ও ভেঙ্গে দেছে তো!

বিস্ফারিত চক্ষে কল্পনা কহিল,—কিসের প্রতিজ্ঞা?

—বিয়ে না করবার! আমরা তাগাদা দিলে ঠাট্টা করলে বলতো, কাকে বিয়ে করি খুঁজে পাই না!

—এখন পেয়েছে?

হাসিতে হাসিতে সুশীল কহিল,—তা জানি না। পরন্তু দেখা হলে একটা অভিনন্দন দেবো, কি বলিস্?

বলিবার যে কি, কল্পনা তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সে যেন হেঁয়ালির মধ্যে পড়িয়াছিল! সত্রাস দৃষ্টিতে কহিল,—কি বলছো দাদা?

সুশীল হাসিতেছিল, কহিল—অমিয় ভারী চাপা ছেলে! সহজে কিছু ভাঙ্গে না। কিন্তু ধর্ম্মের কল!

ইভা কহিল,—কি রকম? দৃষ্টিতে তাহার কৌতুক উছলিয়া পড়িতেছে।

পত্নীর পানে চাহিয়া সুশীল কহিল,—তোমাদের আদর্শ মানুষ গো,—যাকে শুকদেব ব্রহ্মচারী উপাধি দেবে ভাবছিলে—একেবারে হাতে-নাতে ধরা! ধর-সাহেব বামাল-সমেত তাকে ধরে ফেলেছে। বলে, অমিয় এত দিনে জালে পড়লো হে।

কল্পনা প্রশ্ন করিল,—কেন ধর-সাহেব কি ধরেছেন?

ভগিনীর পানে চাহিয়া সুশীল কহিল,—তারা স্বামি-স্ত্রী স্বচক্ষে দেখেছে। মিসেস্ ধর বললেন,—মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, আপনি যদি মিষ্টার গোস্বামীর মুখ দেখতেন, যেন আষাঢ়ের আকাশ! ঠাট্টা করে আমরাই যেন দোষী! এমনি ভাবখানা তিনি প্রকাশ করে চলে গেলেন।

কল্পনার উদ্বেগ বাড়িল। সে কহিল,—কোথায় ধরের সঙ্গে মিষ্টার গোস্বামীর দেখা হলো?

হাসিতে হাসিতে সুশীল কহিল,—কেন, স্থানের অভাব আছে? ফারপোয়। উর্ব্বশীকে নিয়ে উনি সে দিন সেখানে উঠেছিলেন। হাত ধরাধরি করে যাচ্ছিল, ধরকে দেখে অবশ্য পালাবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ধর হলো ঝানু ছেলে—সে সুযোগ না দিয়ে একেবারে তাদের সামনে—

নিগূঢ় বিস্ময়ে কল্পনা কহিল,—রত্নার সঙ্গে? নিশ্বাস যেন তাহার বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

সুশীল ভগিনীর মুখের বিবর্ণতার অন্য অর্থ না বুঝিয়া কহিল,—ওই তোমাদের স্বভাব। অমিয়র সম্বন্ধে কোন কথা বিশ্বাস করতে চাও না। ভাবো সে একটি জন্তু,—বলিয়া হাসিল; হাসিয়া কহিল,—অবশ্য আমিও ভাবতুম, ও হয়তো বিয়ে-থা করবে না! কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙ্গেছে। সকালে বালিগঞ্জ থেকে ফিরছি, দেখি, লেকের ধারে বেঞ্চে পাশাপাশি দু'টিতে বসে প্রভাত-বায়ু সেবন করছেন! আমি আর তাদের বিরক্ত করতে গেলুম না।

—মিসেস্ গোস্বামী যে বললেন, রত্নাকে মোটর ড্রাইভ শেখাতে নিয়ে গেছেন।

সুশীল কহিল,—আর কি বলবে? তা অমিয়র মন যা-তা দেখে যে টলেনি, এটা সত্যি চাক্ষুষ করলুম। সেই যে বলে,—মুনিজন-মনোহরী! হ্যাঁ, রূপ বটে। উর্ব্বশী বলতে হয়। একটি সোনালী কোট গায়ে দিয়ে বসেছিল! চার্মিং!

কল্পনা আর কোন কথা কহিল না! ধীর পদবিক্ষেপে সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজের ঘরে আসিল এবং সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া বেশভূষা মোচনের সময় সুবৃহৎ দর্পণে প্রতিফলিত নিজের আবরণ-মুক্ত অবয়বের পানে চাহিল। সুন্দরী না হইলেও সুদর্শনা সে! রূপের দরবারে অনেক রূপসীর সে আসন অধিকার করিতে পারে।

কেন সকলে রত্নাকে এত রূপসী বলিয়া স্তুতিগান করে—রত্নার কাছে কোথায় সে নিরেস বুঝিতে পারিল না!

নির্জ্জন ঘরে ছোট একটা নিশ্বাস কল্পনা কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না।

পৃথিবীতে সকলেই রূপের কাঙাল। সৌন্দর্য্যের পূজা চলিয়া আসিতেছে আবহমান কাল। নারীর রূপ লইয়া কত সিংহাসন কত রাজ্য ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে! কত মুনি-ঋষি-যোগী-তাপসের কঠোর তপস্যা ভঙ্গ হইয়াছে এই নারীর রূপে! সেখানে তুচ্ছ অমিয়, তুচ্ছ তাহার সংযমী চিত্ত। তাহার জ্ঞান, বিদ্যা, পদগৌরব সমস্তই মূল্যহীন! কল্পনার মনের মধ্যে এমনি চিন্তা তীব্র হইয়া তাহাকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলিল।

বালিশে মাথা রাখিয়া কল্পনা মনে মনে আঁকিতে লাগিল নিজের ছবি, অমিয়র ছবি, রত্নার ছবি। এবং এমনি ছবি আঁকিতে আঁকিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল,—অনিল যেন ইন্দ্র সাজিয়া পারিজাতের হার আনিয়া তাহার কণ্ঠে দুলাইয়া দিল! ইন্দ্রের চোখের পরিপূর্ণ মুগ্ধ দৃষ্টি কিন্তু নৃত্যশীলা সভা-নর্ত্তকী উর্ব্বশীর উপর নিবদ্ধ।

ঘুমের ঘোরেই কল্পনা চমকিয়া উঠিল!

২৪

গোস্বামী সাহেবের গৃহে নিয়ম ছিল, সকালে চায়ের টেবলে পরিবারস্থ সকলকে উপস্থিত হইতে হইবে। অন্য সময়ে না হইলে ক্ষতি ছিল না! কিন্তু এই সময়টায় আত্মীয়বর্গ সকলের ভালো-মন্দ তত্ত্ব লইয়া তবে কর্ম্মের গহন অরণ্যে তিনি প্রবেশ করিতেন।

প্রথামত আজও তিনি আসিয়া চায়ের টেবলে বসিলেন। একে একে সকলে আসিল এবং সকলের শেষে আসিল রত্না।

গোস্বামী সাহেব তাহাকে স্নেহ-কণ্ঠে 'সুপ্রভাত' জ্ঞাপন করিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—এ কি রত্না! তুমি করেছো কি?

সবিস্ময়ে সকলে রত্নার পানে চাহিল। পৌষের এই কন্‌কনে ঠাণ্ডায় সকালেই সে স্নান সারিয়াছে। তাহার নিবিড় ঘন কুন্তলরাশি এলাইয়া পৃষ্ঠে বাহুতে পড়িয়া জানু স্পর্শ করিয়া কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় ঝুলিতেছে! সেই কুঞ্চিত কেশদাম, শুভ্র ললাটের চূর্ণ অলকগুচ্ছ তাহাকে অপূর্ব্ব শ্রীতে ভূষিত করিয়াছে! পরণে একখানা সাদা লালপাড় শাড়ী, সুডৌল বাহু অনাবৃত রাখিয়া গায়ে একটা হাতকাটা সেমিজ; শীত নিবারণ করিতে লাল রংএর ফ্লানেল স্কার্ফ! পায়ে সবুজ রংএর শ্লিপার,—সমস্তই তাহাকে ঘিরিয়া অপূর্ব্ব রূপের হিল্লোল তুলিয়াছে।

মিসেস্ গোস্বামী তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—এতে অসুখ করবে না, রত্না? তাঁহার কণ্ঠ বিরস।

ঈষৎ ম্লান হাস্যে রত্না মুখ নীচু করিল। মৃদু স্বরে কহিল,—খুব ভোরে স্নান করা আমার অভ্যাস আছে। দেশে আমি তাই করতুম।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—সে পাড়াগাঁ, টান জায়গা। আর অসুখ-বিসুখ কিছু হলে, ভাবনা ছিল তাঁদের। কিন্তু এ হলো সহর, এমন করে ঠাণ্ডা লাগালে এখানে সহ্য হবে না। এখানে অসুখ-বিসুখ হলে দায়িত্ব আমার! কাজেই আমায় ব্যস্ত হতে হবে।

অমিয় কহিল,—এত ভোরে স্নানের হেতু?

চকিতে চোখ তুলিয়া রত্না আবার তখনি দৃষ্টি নত করিল।

রত্না তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে গেলে গোস্বামী সাহেব

সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন,—ওখানে নয় মা, আমার পাশে এইখানে তুমি বসো।

রত্না তাঁহার পাশে গিয়া বসিল। মুখে ঈষৎ তৃপ্তি ফুটিল; পক্ষি-শাবক যেন তাহার নিরাপদ নীড়ে আশ্রয় পাইল।

গোস্বামী সাহেব কৌতুক হাস্যে কহিলেন,—তোমার বাবা তোমার নাম রেখেছে রত্না। আমি হলে কি নাম রাখতুম জানো? হংসেশ্বরী!

সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস উজ্জল প্রভাতকে যেন আনন্দময় করিয়া তুলিল।

গোস্বামী সাহেবের দিকে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি যখন কলেজে পড়তে তখন কাব্যচর্চ্চা করতে না? কি সব কবিতা লিখতে!

—যখন কলেজে পড়তুম তখন কি, তার পরেও কত লিখেছি! যত দিন—ব্রীফলেশ ছিলুম, তত দিন কবিতা লিখেছি। আচ্ছা অমিয়, দেবীর রূপ বর্ণনা করতে হলে ঋষিরা মুক্তকুন্তলা বলেন, নয় কি? সমস্ত শোভা ওই খোলা চুলেই।

রত্নার কেশের পানে চাহিয়া অমিয় একটু হাসিল। এবং তাহার সামনের আসন অধিকার করিয়া লজ্জিতা রত্না আরক্তিম মুখ আরও নত করিল।

মিসেস্ গোস্বামী সহাস্যে কহিলেন,—আজ রত্নাকে দেখে হঠাৎ অতীতের কাব্য চেপে ধরলো তোমায়!

মাথা নাড়িয়া সহাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তাই হয় গো—তাই হয়। আমরা নাতী-পুতিকে এত ভালবাসি কেন? আমাদের শৈশবের প্রতীক তারা! আচ্ছা, তুমি তো এক জন সাইকলজিষ্ট অমিয়, এ বিষয়ে তুমি কি বলো?

কিছু বলিবার জন্যই বোধ করি অমিয় মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু মিসেস্ গোস্বামী তাহাকে থামাইয়া দিলেন। কহিলেন,—আবার ওই উদ্ভুটে তর্ক। ও আমার মোটে ভালো লাগে না। হ্যাঁ রত্না, কাল তুমি খেলে না কেন? কি অসুখ করেছিল?

নত-মুখে রত্না কহিল,—মাথাটা বড্ড—

অনিল যেন লাফাইয়া উঠিল। সে কহিল,—দেখলে তো মা! আমি তখনই মনে করেছি, রত্নার শরীর ভালো নেই!

গোস্বামী সাহেব সায় দিয়া কহিলেন,—আমিও তা বুঝেছিলুম—ওর শুক্নো মুখ!

স্নেহার্দ্র স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—বলতে হয়! না জানি কাল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে নাচতে কত কষ্ট হয়েছিল! বোকা মেয়ে! আমায় জানাতে নেই?

একটু খুশীর আমেজে গত রজনীর গুমোট-ক্লেশ সকলের চিত্ত হইতে নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সদয় কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী জ্যেষ্ঠ সন্তানের পানে চাহিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ অমিয়, তুমি রত্নাকে নিয়ে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরিয়ে আনো না! মনটা তাজা হবে ওর—শরীর ভালো হবে।

রত্না চকিতে অমিয়র পানে চাহিল। নিমেষের জন্য দেখিল,—নিজের প্রাতরাশের প্রতি অমিয় সুগভীর মনোযোগী। মুখ না তুলিয়াই সে উত্তর দিল,—আজ তো আমার ফুরসৎ নেই মা।

এমনি উত্তরই যেন মিসেস্ গোস্বামী খুঁজিতেছিলেন। প্রীত কণ্ঠে কহিলেন,—তা বটে, আমারও আজ মরবার অবকাশ নেই। কল্পনাকে এখনি আসতে বলে দিয়েছি। অনিলেরও অনেক কাজ—

রত্না ভিতরে ভিতরে চমকিয়া উঠিল। সহসা মনে হইল, কল্পনার প্রতীক্ষাতেই অমিয় নড়িল না। মনের মধ্যে একটা নিষ্ফল অভিমানের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল।

এমনি হয়। সংশয়-পীড়িত মন নিজের অশান্তি সৃষ্টি করিতে যেমন মজবুত, অপরকে তেমনি কারণে-অকারণে দোষী করিতেও সে পটু!

কথাগুলা অবশ্য এমন কিছু নয়—খুবই ছোট! সামান্য! তথাপি ছোট ছোট সংলাপে এবং হাসি-পরিহাসে মন লঘু হয়, তাই রহস্যালাপে মানুষ মাতিয়া ওঠে! এই টুক্‌রা-টুক্‌রা কথাবার্ত্তাগুলা রত্নার মনে বায়ুহিল্লোলে তরুশাখার ন্যায় মাতন তুলিতেছিল। কিন্তু অমিয়র এই ঔদাস্য ও মৌনতা সহসা বায়ুহীন গুমোট দিনের মত রত্নার সমস্ত দেহ-মনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—বণ্টু আসতে পারবে না রত্না! আমায় জানিয়েছে। কিন্তু সে এলে—

বেয়ারা আসিয়া জানাইল, দর্জ্জি আসিয়াছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—রত্নার নাচের পোষাক এলো।

ড্রইং-রুমে টেবলে সুবৃহৎ পিজ-বোর্ডের বাক্স-অভ্যন্তরে যে মূল্যবান পোষাক পাতলা কাগজে ঢাকা ছিল, সকলের আগে অনিল সেটা বাহির করিল। এবং তারিফের সুরে কহিল,—ছাখো মা, ডিজাইন্‌টি কেমন দিয়েছিলুম!

মিসেস্ গোস্বামী পোষাকের দিকে চাহিলেন। প্রফুল্ল মুখে কহিলেন,—চমৎকার হয়েছে।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—ভেরী নাইস্। রংটা কে পছন্দ করেছিল?

অনিল কহিল,—আমরা।

অমিয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া পোষাক দেখিতেছিল, কহিল,—এইগুলো সবচেয়ে ভালো হয়েছে অনিল! এই সার-বন্দী শলমার হাঁসগুলো! হ্যাঁ, নাচের মুখে এই তার দেওয়া আছে, পার্ট-পার্ট খুলে যাবে, চমৎকার দেখতে হবে মা, সব তাক্ লেগে যাবে!

প্রদীপ্ত মুখে রত্না নত হইয়া পোষাক দেখিতে লাগিল। অন্তরের সমস্ত অভিমান পুলকের বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া গেল।

রত্না কহিল,—কত বিল হলো মাসিমা?

করিম বিলের কাগজ সকলের চোখের সামনে বাড়াইয়া দিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—ইস্! দু'শো পঁচাত্তর ধরেছে! করেছে কি!

অমিয় হাসিয়া কহিল,—তুমি যেমন কাজ দেবে, তোমার ফরমাস তো সাধারণ নয়!

অনিল সহাস্যে রত্নার পানে চাহিল, কহিল,—রত্না তোমার দাম বেড়ে যাবে।

দ্বারের পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—এই যে কল্পনা এসেছে! কেমন পোষাক হলো উর্ব্বশীর, দেখো তো!

কল্পনার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বিস্ময়ভরা স্বরে কহিল,—আপনি উর্ব্বশীর পোষাক করতে দিয়েছিলেন, মাসিমা!

উৎফুল্ল কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—নাচের ড্রেস চাই

বৈ কি মা। আমি, অমিয়, অনিল—সবাই মিলে পাঁচখানা বই দেখে এই ডিজাইন ঠিক করলুম। তোমার কেমন লাগছে ?

কল্পনার মুখের চেহারা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে কহিল,—এর উপর আর কার কথা চলে ? এমন পোষাক পরা ভাগ্য !

মিসেস্ গোস্বামী খুব খুশী হইলেন। কহিলেন,—মাপ আমরা দিয়েছিলুম। কিন্তু রত্নার সাধ্য নেই নিজে এ পোষাক পরে। তুমি যাও তো, ও ঘরে রত্নাকে পোষাক পরিয়ে দাও গে। ও এসে আমাদের দেখাক, ঠিক হলো কি না। রত্না, তুমি কল্পনার সঙ্গে যাও মা।

মিসেস্ গোস্বামীর আদেশে রত্না ও কল্পনা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—করিম, পাশের কামরায় পোষাকটা দিয়ে এসো।

নীরবে দুই তরুণী করিমের অনুবর্ত্তী হইল। এক জনের মুখ প্রভাত-রবির মত উজ্জ্বল, অপরের মুখ সন্ধ্যা-তপনের ন্যায় মলিন।

২৪

আজ আটাশে পৌষ। গোস্বামী সাহেবের জন্মদিন। সুবৃহৎ পুরী পত্র-পুষ্পে উৎসব-সজ্জায় বিভূষিত! আলোক-মালায় উদ্ভাসিত।

রত্না মিসেস্ গোস্বামীর প্রদত্ত সেই বহুমূল্য শাড়ী পরিয়াছে। মিসেস্ গোস্বামীর ক'খানা সৌখীন গহনাও পরিয়াছে।

এই দামী গহনাগুলি অঙ্গে তুলিতে তাহার কতখানি আনন্দ হইতেছিল! শঙ্কাও জাগিতেছিল অনেকখানি। তাহার কুণ্ঠা দেখিয়া মিসেস্ গোস্বামী স্নেহার্দ্র স্বরে কহিলেন,—সঙ্কোচ কিসের? আমি পরতে দিচ্ছি, তুমি পরবে! না, না, অত ভয় কেন? কিছু খোয়া যাবে না! যত বড় ঘরের মেয়ে-বৌ সব আজ আসবে! গিন্নীরা আসবে। তাদের সামনে তোমায় নিরাভরণ রাখতে পারি? না, ছোট হতে দিতে পারি? হলোই বা হীরে-মুক্তো।

রত্নার চোখ সজল হইয়া উঠিল। মিসেস্ গোস্বামী পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—যাও তোমার ঘরে সব নিয়ে।

আহ্লাদে গলিয়া যেন নাচিতে নাচিতে অলঙ্কারের কেসগুলা বুকে ধরিয়া রত্না নিজের ঘরে আসিল। এবং প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা সে যখন ড্রইংরুমে আসিয়া দেখা দিল, তখন অস্তগামী রবিরশ্মি-জালের পানে উদাস নেত্রে তাকাইয়া অমিয় একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়াছিল। উৎসবে, ব্যসনে, কাজকর্ম্মে অনিলের যেমন দক্ষতা, অমিয়র ছিল তেমনি অক্ষমতা—তাই কোন কর্ম্মে বা ফরমাসে মিসেস্ গোস্বামী তাহাকে ডাকিতেন না।

অমিয় রত্নার আগমন জানিতে পারিল না। রত্না মিসেস্ গোস্বামীর সন্ধানে হল-ঘরে যাইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঈষৎ হাসির সুরে রত্না কহিল,—

ধ্যানমগ্ন যোগীন্দ্র বসি যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু'নয়নে
কাহারে ধেয়াও ?

অমিয় চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। চিত্রার্পিতের ন্যায় রত্নার অনিন্দ্য-সুন্দর মাধুরী-মূর্ত্তির পানে মুহূর্ত্তের জন্য সে অভিভূত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চোখে পলক পড়ে না।

সলজ্জ হাস্যে গাঢ় রক্তিম কপোলে রত্না কহিল,—অমন করে কি দেখছো ?

অমিয় হাসিল। কহিল,—তোমাকে! সত্যি রত্না! আজ মডেল করে ছবি আঁকতে লোভ হচ্ছে! বলিয়া রত্নার শাড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল,—এইটে না তোমার জন্য অনিল সে দিন কিনে এনেছে ?

পুলকিত দীপ্ত মুখে রত্না কহিল—হ্যাঁ।

অমিয় কহিল,—আমার মত তুমিও এখন বেকার! কি বলো ?

রত্না হাসিল।

অমিয় কহিল,—তবে বসে পড়ো,—একটু গল্প করা যাক।

মিসেস্ গোস্বামী কল্পনার সহিত কথা বলিতে বলিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিসেস্ গোস্বামী বলিতেছিলেন,—তুমি বাছা খুব উপকার করলে—যেমনটি আমি ভালবাসি! তুমি ঠিক তেমনি একটা হাতের দোসর হলে!

কল্পনা উত্তর দিল,—সত্যি মাসিমা, তাই আমি ভাবি, মাসিমা ক্ষণজন্মা মেয়ে। এ দিকে গিন্নীপণা, ওদিকে ইস্কুল, তার উপর আবার এই থিয়েটার!

মিসেস্ গোস্বামী আত্মপ্রশংসা শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইলেন। কহিলেন,—তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই সব কাজে তোমার পরামর্শ নিই। রত্না তো এ সব কিছু বোঝে না,—পেরেও ওঠে না।

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কল্পনা কহিল,—তা সত্যি! এ সব বিলি-ব্যবস্থা তো কেতাবে লেখা থাকে না যে মুখস্থ করে মানুষ শিখবে! যে যেমন সংসারে মানুষ হয়! রত্না আবার হয়তো যে সমস্ত কাজ পারবে, আমরা তাতে একেবারে আনাড়ি।

সংক্ষেপে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তা বটে। আজ কথার মাত্রার মাঝেও যে কেহ কোনরূপ ক্ষুণ্ণতা বোধ করে, তাহাও তিনি চাহেন না। কহিলেন,—হ্যাঁ, তুমি যে প্রত্যেক মেয়ের মাথায় বেলফুলের মালা আর গলায় গোলাপের হার দেবার ব্যবস্থা করলে, এ আমার খুব সুন্দর লেগেছে।

অনিল আসিয়া খবর দিল, ফুল আসিয়াছে। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—মালাগুলা সকলকে দেবে কে ? রত্না তো ?

মিসেস্ গোস্বামী দ্বিধায় পড়িলেন। এত বড় একটা অভ্যর্থনার ব্যাপার! চিন্তিত নেত্রে মুখ ফিরাইতেই রত্নাকে দেখিলেন,—ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাশের চেয়ারে রত্না প্রতিমার মত বসিয়া আছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—এই যে অমিয়, তুমি কি বলো ? সকলকে ফুল দিয়ে, মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করবে কে ? রত্না পারবে কি ?

সহাস্যে অমিয় একবার রত্নার পানে তাকাইল। তার পর কহিল,—না, মা, ও কাজটি তুমি মিস্ চ্যাটার্জ্জিকে দাও—অত ঝক্কির মধ্যে রত্না যেতে পারবে না।

মা খুশী হইলেন! কহিলেন,—সেই ভালো। কল্পনা, তুমি তো আমার মেয়ের মত, তুমিই এ কাজের ভার নাও মা!

যেন সমস্ত দ্বন্দ্ব ঘুচিল। পুলকিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল—আপনি যেমন বলবেন!

গোল মিটিল! কিন্তু মেঘ কাটিল না।

২৫

আহারাদির পর অভিনয়ের ব্যবস্থা। ভোজন-পর্ব্ব শেষ হইতেই নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলারা আসিয়া হলঘরের অভিনয়-মঞ্চের সম্মুখে সার-বন্দী গদি-আঁটা চেয়ারে বসিলেন।

শিল্পীর দল প্রবেশ করিলেন গ্রীণ-রুমে।

মিসেস্ গোস্বামীও সজ্জা-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে-দিকে কিছুক্ষণ তদারক করিয়া, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন।

যন্ত্রি-সঙ্ঘের একতান আরম্ভ হইল। মিসেস্ গোস্বামী গিয়া স্বামীর হাত ধরিলেন। কহিলেন—একবার এদিকে এসো!

সবিস্ময়ে গোস্বামী সাহেব কহিলেন—কোথায়?

মঞ্চের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—ওই পর্দ্দার ভিতরে।

গোস্বামী সাহেব পত্নীর অনুবর্ত্তী হইলেন।

একতান থামিল। পর্দ্দা উঠিল। দর্শকদলের উৎসুক দৃষ্টি সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল, পত্র-পুষ্পে সজ্জিত এক সুবৃহৎ চেয়ারে গোস্বামী সাহেব আসীন! এবং দুই পার্শ্বে নারী ও পুরুষ শিল্পিবৃন্দ সার বাঁধিয়া দণ্ডায়মান! হাতে সকলের পুষ্পমাল্য! কুসুম-স্তবক!

সগর্ব্বে মিসেস্ গোস্বামী ধীর-পদবিক্ষেপে স্বামীর নিকটে গিয়া তাঁহার কণ্ঠে মালা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

গোস্বামী সাহেবের বন্ধুদল করতালি দিয়া উঠিল।

তাহার পর অমিয়, অনিল, রত্না, কল্পনা একে একে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী আসিয়া গোস্বামী সাহেবের গলায় পুষ্পমাল্য, হস্তে কুসুম-গুচ্ছ দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

গোস্বামী সাহেব সস্নেহে সকলের পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নাট্যমঞ্চ ত্যাগ করিয়া তিনি আসিয়া বন্ধুদের সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

যবনিকা পড়িল।

গ্যাংলি এবং বাকৃচি গোস্বামী সাহেবের দুই পার্শ্বে দু'জনে বসিয়াছিলেন। বন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন,—উর্ব্বশী কি সেই মেয়েটি হবে?

গোস্বামী সাহেব জবাব দিলেন,—হ্যাঁ! রত্না আমার বাল্যবন্ধুর কন্যা।

বাকৃচি কহিলেন,—তিনি জীবিত?

—নিশ্চয়! এবং সুস্থ। কর্ম্মঠ। পণ্ডিত ব্যক্তি। নিমন্ত্রণ করেছিলুম তাকে কিন্তু বিশেষ কাজে সে আসতে পারেনি।

ঘণ্টা পড়িবার সঙ্গে পর্দ্দা উঠিল। কথা বন্ধ করিয়া সকলে চাহিল নাট্যমঞ্চের দিকে। সেখানে তখন ইন্দ্রের সভা। চিন্তিত মুখে সিংহাসনে বসিয়া বাসব—পাশে ইন্দ্রাণী শচী।

অপ্সরার দল নাচিয়া গাহিয়া চলিয়া গেল।

এবার দেখা দিল, পরামর্শ-সভা। মন্ত্রণা বৈঠক! সপারিষদ দেবেন্দ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত শত্রু-নিপাত-ব্যবস্থার আলোচনা করিতেছেন।

কালনেমি দৈত্যের প্রচণ্ড বিক্রমে, নিষ্ঠুর অত্যাচারে স্বর্গের সুখ-শান্তি বিনষ্ট! আনন্দ বিলুপ্ত! স্বর্গ ম্লান।

একে একে বহু উপায়ের কথার পর অবশেষে স্থির হইল, একমাত্র পার্থ ধনুর্দ্ধর এই দুর্দ্দান্ত দানবকে দমন করিতে সমর্থ; তাঁহাকেই আনা প্রয়োজন।

গাণ্ডীবীকে নিমন্ত্রণ করিতে নারদকে পাঠানো হইল।

দৃশ্যপট বদলাইয়া গেল।

এবার দেখা দিলেন গাণ্ডীবধারী ফাল্গুনি। নাট্যমঞ্চে অর্জ্জুনের সহিত অমিয়র কোন সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অর্জ্জুনের অভিনয়ে বাহবা পড়িল।

ইন্দ্রাণী স্বয়ং আসন হইতে উঠিয়া স্মিত-মধুর হাস্যে কিরীটীকে অভ্যর্থনা করিলেন।

দেবেন্দ্র বলিলেন স্বর্গের বিপদ্-বার্ত্তা! দেবগণকে শঙ্কাশূন্য করিতে তিনি সব্যসাচীর শরণাপন্ন হইয়াছেন!

অর্জ্জুন গাণ্ডীব স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, অমরাবতীকে অরাতি-মুক্ত করিবে।

সভায় ধন্য-ধন্য রব উঠিল। অপ্সরারা পুষ্পবৃষ্টি করিল! বাসব মন্দাকিনীর পূত-সলিলে গাণ্ডীবীর অভিষেক করিলেন। ব্রহ্মা বারি দিলেন। স্তাবক গাহিল। যন্ত্রী বাদ্য করিল। দেবনারীরা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি করিলেন। দেব-ঋষিগণ স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন।

ইন্দ্রাণী নিজের পারিজাতের হার হইতে একটি পারিজাত লইয়া সাদরে অর্জ্জুনের হাতে দিলেন।

নত মস্তকে সসম্মানে অর্জ্জুন অভিবাদন করিয়া পারিজাত গ্রহণ করিলেন; মস্তকে স্পর্শ করিয়া পারিজাতের আঘ্রাণ লইলেন।

পটক্ষেপের পর আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল।

প্রলয়-ত্রাস-সঞ্চারী অদ্ভুত রণ-বীর অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতেছে, কালান্তকারী কালনেমির সহিত। অসুর-নাশ হইল। স্বর্গ নির্বিঘ্ন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন। সভা। অমরগণ প্রফুল্ল! স্বর্গের মালিন্য ঘুচিয়াছে। এখন পরামর্শ চলিল,—কি অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ পার্থকে অভিনন্দন করা হইবে; তাহাকে গৌরবান্বিত করিতে কিরূপ উৎসব হইবে।

ভরতমুনি উপদেশ দিলেন,—উর্ব্বশীকে আহ্বান করা হোক! অমরাপুরীর শ্রেষ্ঠ রত্ন। স্বর্গের নিষ্প্রভতায় সে অপসৃত হইয়াছিল। আজ স্বর্গে আনন্দ ফিরিয়াছে! স্বর্গ এখন নিষ্কণ্টক! শত্রুশূন্য! এখন সেই অপ্সরা-কুল-গরীয়সী নর্ত্তকীর তো বাসবের সভায় নৃত্যে বাধা রহিল না।

দেবরাজ মালা-চন্দন দিয়া প্রতিহারীকে উর্ব্বশীর কাছে পাঠাইলেন! ভরতমুনি দিলেন ধান-দূর্ব্বা।

ইন্‌টারভ্যাল। একতান সুরু হইল।

দর্শকগণ সমস্বরে অভিনয়ের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। মিসেস্ গোস্বামীর পরিচালনার প্রশংসা উঠিল। সকলেই এখন ব্যস্ত উর্ব্বশীকে দেখিবার জন্য।

নাটকখানি লিখিয়াছে অমিয়। তাহার যশ হইল। অনিলের গানের সুরও যে মধুর হইয়াছে, সকলে গানের সুখ্যাতি করিল।

মিসেস্ গোস্বামীর উৎফুল্ল মুখে তবু কেমন উৎকণ্ঠার ছায়া! মনের সংশয় ঘুচিতেছিল না। রত্না কেমন অভিনয় করিবে, স্বামীর জিদে রত্নাকে তিনি উর্ব্বশীর ভূমিকা হইতে খারিজ করিতে পারেন নাই। নহিলে তাহার উপর তিনি এতটুকু আস্থা রাখেন না! কৃষ্ণনগরের কারিগরের গড়া পুতুলের মত মেয়েটির অপরূপ তনু ছাড়া ইহার ভিতরের কোন গুণ কোন কর্ম্মদক্ষতা যেন মিসেস্ গোস্বামীর চোখে পড়ে না।

কল্পনা এখন তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়াছে। কাজে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায় রত্নার চেয়ে কল্পনাকেই অনেকখানি শ্রেষ্ঠ মনে হয়! এবং কল্পনাও তাঁহাদের সমযোগ্য ঘর—কুটুম্বিতায় এখানে নিজেকে খাটো করা হয় না। হ্যাঁ, অমিয়কে লইয়া,—

তার পর অনিল ! একা আর ভাল লাগে না ! রত্নাকে কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন ! কিন্তু রত্না তাঁহার হইবার নয় ! শুধু স্নেহের পাত্রী !

২৬

ইন্‌টারভ্যাল শেষ হইল। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে একতান থামিল।

মিসেস্ গোস্বামী কম্পিত বুকে সম্মুখে চাহিলেন। এইবার উর্ব্বশী রত্না তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে কি ম্লান করিবে, কে জানে? মিসেস্ গোস্বামীর ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

পট উত্তোলনে নূতন দৃশ্য দেখা দিল।

নন্দন কানন। উর্ব্বশী পারিজাত বৃক্ষের তলে প্রজাপতির সহিত খেলা করিতেছে। মাঝে মাঝে লোভীর মত পারিজাত-পাপড়ি বায়ু-হিল্লোলে সেই কমনীয় বরতনুকে স্পর্শ করিতে তাহার কোমল অঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছে।

উর্ব্বশী কখনও আনমনা, কখনও হাস্যময়ী! তাহার মুখে কমল-জ্ঞানে মধুলোভী ভ্রমর ছুটিয়া আসিতেছে! রত্নখচিত অঞ্চল উড়াইয়া উর্ব্বশী ভ্রমরকে তাড়াইতেছে। শিথিল কবরী হইতে পুষ্প খশিয়া পড়িতেছে, সে দিকে উর্ব্বশীর হুঁশ নাই! প্রজাপতি ধরিতে ব্যস্ত! খেলায় সে বিভোর। তাহার রক্ত-পেলব চরণ-ক্ষেপে মৃণাল-বাহুর আন্দোলনে, চারি পাশে যেন সৌন্দর্য্যের হিল্লোল বহিতেছে। মাঝে মাঝে প্রফুল্ল মুখে চিন্তার ছায়াপাত হইতেছে। করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া উর্ব্বশী চিন্তিত।

অমরপুরী শত্রু-কবলে ম্লান। তাই ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশী আর নাচিতে যায় না। তাহার নৃত্য যে বৈজয়ন্তীর চিহ্ন, জয়ন্তীর আনন্দেই উর্ব্বশী হয় বাসবের সভায় নৃত্যশালিনী।

প্রতিহারী প্রবেশ করিল। ভূমিষ্ঠ প্রণামে উর্ব্বশীকে সম্মান জ্ঞাপন করিল।

উর্ব্বশী দেবরাজের কুশল জানিতে চাহিলেন।

প্রতিহারী মালা-চন্দন দিয়া জানাইল, দেবরাজের বাণী সে বহন করিয়া আনিয়াছে। বৈজয়ন্তী পুরী শত্রু-বিমুক্ত, অমরগণ শঙ্কাশূন্য, দেবগণ উর্ব্বশীর নৃত্য-দর্শনের জন্য ব্যাকুল।

উর্ব্বশী জানিতে চাহিল,—কোন্ রথি-শ্রেষ্ঠের বিক্রমে স্বর্গের গৌরব দীপ্ত উজ্জ্বল হইল?

প্রতিহারী উত্তর দিল,—সে মহামানব কুরুবংশ-সম্ভূত অর্জ্জুন।

উর্ব্বশী চমকিত। বিস্মিত দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে কহিল,—কুরুবংশ-সম্ভূত অর্জ্জুন,—তৃতীয় পাণ্ডব—

নত মস্তকে প্রতিহারী জানাইল,—ধনঞ্জয় ব্যতীত এত শৌর্য্য কার?

উর্ব্বশী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। আত্মগত কহিল,—শ্রেষ্ঠ বীর অর্জ্জুন! তার পর কহিলেন,—দেবরাজ আমার প্রতি কি আদেশ জানিয়েছেন?

বিনীত কণ্ঠে প্রতিহারী কহিল,—পার্থের অভিনন্দন-উৎসবে অপ্সরকুলাগ্রগণ্যা উর্ব্বশীর নৃত্য তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন। কারণ, কিরীটী নিজেও এক জন শ্রেষ্ঠ নট, নৃত্য-গীত-বাদ্য-বিশারদ।

উর্ব্বশী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। মিসেস্ গোস্বামী এতক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে বসিয়াছিলেন। দু'চোখ আনন্দ-দীপ্ত হইয়া উঠিল। রত্না নিখুঁত অভিনয় করিয়াছে। রত্না ছাড়া কাহারও সাধ্য ছিল না, উর্ব্বশী সাজিতে। মিসেস্ গোস্বামী মনে মনে প্রশংসা করিলেন। এই তো সত্যকার নন্দন-কানন-বাসিনী উর্ব্বশী! কল্পনা সুরূপা বটে—কিন্তু রত্না?

পট উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ গোস্বামী ব্যগ্র চক্ষে দেখিতে লাগিলেন,—উর্ব্বশী সহচরীদের আদেশ দিলেন, মনোহারী পরিচ্ছদে তাহাকে বিভূষিতা করিতে! মনে দর্প, পার্থ নট-কুল-চূড়ামণি হইলেও উর্ব্বশীর কাছে তাহাকে পরাজয় মানিতে হইবে।

দৃশ্য পরিবর্ত্তনের পর দেখা দিল,—দেব-সভা। স্বর্গ উৎসবে মাতোয়ারা। সুরলোকের বৈভব! ইন্দ্রাণী শচী অপরূপ সজ্জায় বাসবের পাশে—অমরগণ নিজ নিজ আসনে সমাসীন।

পার্থ প্রবেশ করিয়া দেবগণকে প্রণাম করিল। দেবসেনারা শঙ্খধ্বনি করিলেন! কুঙ্কুম রাগে ললাটে জয়স্তিকা অঙ্কিত করিলেন। দেবরাজ স্বয়ং গাণ্ডীবীর হাত ধরিয়া মণিময় সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইলেন।

বৈতালিক গান গাহিল। অপ্সরারা নৃত্য করিল। ভরত-মুনি, নারদ মুনি স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন।

দেবরাজ কহিলেন,—হে বীর-শ্রেষ্ঠ, স্বর্গের অগ্রগণ্যা নর্ত্তকী উর্ব্বশী তাঁর নৃত্যকলায় তোমার তৃপ্তি সাধন করিবে! শুনেছি, তুমিও নট-শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন হাস্য করিলেন।

অমর-সভায় এতক্ষণে মনোহর গতিচ্ছন্দে উর্ব্বশী প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র-দেবেন্দ্রাণীকে প্রণাম দিয়া সভাসদ্‌বর্গকে অভিবাদন দিল। ঋষিগণের পদধূলি গ্রহণ করিল! তাঁহারা কহিলেন,—জয়োঽস্তু।

দর্শকদের উৎসুক দৃষ্টি সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল, উর্ব্বশীর রূপজ্যোতি, কমনীয় তনু রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। উর্ব্বশীর বহুমূল্য নৃত্য-পরিচ্ছদ—অঙ্গের মণি-আভরণ, পৃষ্ঠের কৃষ্ণ সর্পাকৃতি বিলম্বিত বেণী, চরণের নূপুর—সমস্ত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের তরঙ্গে দর্শক-দৃষ্টিকে বিমোহিত করিল।

এমনি করিয়া সমাগত দল চাহিয়া রহিল। যেন সুরাসুর বিহ্বল নেত্রে মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতেছে!

বাদ্য-যন্ত্রের সহিত উর্ব্বশীর নৃত্য আরম্ভ হইল। প্রতি চরণ-বিন্যাসে মাধুরী ঝরিয়া পড়িল। সকল অবয়বের মনোহর ভঙ্গীতে ছন্দ ফুটাইয়া, চারু নৃত্যকলার প্রতি মুদ্রা প্রদর্শনে যেন রূপের হিল্লোল বহিয়া চলিল।

উর্ব্বশী নাচিতেছে। স্বর্গের গৌরব-দীপ্তি ম্লান বলিয়া বাসবের সভায় সে ছিল অন্তর্ধান! আজ লুপ্ত গৌরব সমুজ্জ্বল, উর্ব্বশী তাই নৃত্যশীলা। অন্তরের অভিলাষ ফাল্গুনিকে বুঝাইয়া দিবে, উর্ব্বশীই কেবল উর্ব্বশীর তুলনা! মানুষকে সে চারুকলার নৈপুণ্যে মুগ্ধ অভিভূত করবে। তাহা না হইলে, উর্ব্বশী মিথ্যা! তাহার নৃত্য মিথ্যা! তাহার মুনিজন-মনোহারী সৌন্দর্য্য মিথ্যা!

জয়স্তিকা শুধু উর্ব্বশীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত ললাটেরই শোভা!

অর্জ্জুন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে স্তব্ধের মত বসিয়া নৃত্য অবলোকন করিতেছেন। তাঁহার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঝরিতেছে আনন্দ।

দেবসভায় সকলেই নিস্পন্দ-প্রায়।

গাঙ্গুলী কহিলেন,—চমৎকার!

রায় কহিলেন,—এ-যে আমাদের দিশী প্যাভলোভা হে!

গোস্বামী সাহেব হাসিলেন। কহিলেন,—উর্ব্বশী নয়, প্যাভলোভা।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখ প্রদীপ্ত। স্বামীকে তিনি মনে মনে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছিলেন।

নৃত্য-শেষে সভা হইতে উর্ব্বশী বিদায় গ্রহণ করিলেন। পার্থের বিহ্বল দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিল।

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেখা দিল,—বাসবের কক্ষ। পার্ষদের পরামর্শে দেবেন্দ্র উর্ব্বশীকে অর্জ্জুনের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রেরণ করিলেন।

পার্ষদ একবাক্যে দেবরাজকে জানাইল,—ফাল্গুনির মনোরঞ্জন করিতে একমাত্র উর্ব্বশীই সমর্থ। পার্থের নির্নিমেষ দৃষ্টি উর্ব্বশীতে আবদ্ধ ছিল।

নিশীথ রাত্রে অভিসারিকার বেশে উর্ব্বশী দেখা দিল,—অর্জ্জুনের নিভৃত শয়ন-কক্ষে।

অর্জ্জুন স্তম্ভিত! বিমূঢ়! বিভ্রান্ত নেত্রে সে উর্ব্বশীর অলৌকিক রূপরাশি অবলোকন করিতে লাগিল। এই দেবভোগ্যা অপ্সরী, মানুষের ভোগের জন্য আসিয়াছে! এ কি বিচিত্র রহস্য!

উর্ব্বশী চঞ্চল হইল। অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে অনুরাগ নাই, আসক্তি নাই! রহিয়াছে শুধু গভীর বিস্ময়! তথাপি উর্ব্বশী ক্ষান্ত হইল না! অকুণ্ঠ কণ্ঠে সে নিজের প্রেম নিবেদন করিল। পার্থের শৌর্য্যে-বীর্য্যে অপূর্ব্ব রূপচ্ছটায় উর্ব্বশী বিমুগ্ধ!

জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—অদ্ভুত! বরাননে, অদ্ভুত বাসনা তব! দেবভোগ্যা তুমি, হে কুরুকুলের আদি জননি, পার্থ নহে যোগ্য তব। অর্জ্জুনের তুমি শুধু লহ নমস্কার।

অর্জ্জুনের বিমুখতায় উর্ব্বশী কুপিতা হইল। নয়নে জ্বলিল বহ্নি।

উর্ব্বশীর অভিসার ব্যর্থ, অর্জ্জুন তাহাকে উপেক্ষা করিল। অপ্সরা-সমাজে এ যেন কলঙ্কের মত তাহাকে হেয় করিল। যুগে-যুগে সে পুরুষের চিত্তে চির-অভীপ্সিতা—আজ তাহার এ কি পরাজয়! মর্ম্মাহতা উর্ব্বশী ভুজঙ্গীর ন্যায় ফুঁশিয়া অর্জ্জুনকে অভিশাপ দিল।

যবনিকা-পাত হইল। নাট্যমঞ্চের আলো নিবিল। সুবৃহৎ হল-ঘর উর্ব্বশীর প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল।

অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল বেশভূষা ত্যাগ করিয়া সমাগতদের সহিত আসিয়া মিলিল।

গোস্বামী সাহেব রত্নার মাথায় হাত দিলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

নিশি-পদ্ম

ভালো বেসেছিনু সখি এক দিন বিপুল আগ্রহে,
উদ্দাম নদীর মত ভীম নাদে তীব্র করি' গতি
ভাসাইয়াছিনু তরী লঙ্ঘি' বাধা উপল-বিরতি,
লভি নাই প্রেম তবু কেঁদেছিনু বিধুর বিরহে,
নির্ম্মম কটূক্তি-নিন্দা গেছে মোর সারা প্রাণ দহে'
বেসেছিনু শুধু ভালো! স্পর্শ-সুখ স্বরগের প্রতি
লোভ নাই,—চেয়েছিনু স্নেহকৃপা সহি' শত ক্ষতি,
তার চেয়ে আরো কিছু জানিতাম মোর প্রাপ্য নহে।

সেদিন চলিয়া গেছে। আজো তবু ভাবি আমি বসি'
যে লগ্ন হারায়ে যায়, নিশি-পদ্ম স্বপ্ন-ভারানত
উর্দ্ধমুখে বার-বার আঁখি তুলি ভূমে পড়ে খশি,—
জানি, সে ফেরে না কভু রহি তবু স্মর-ধ্যানরত।

আজি নাই সে চাপল্য—জরাগ্রস্ত,—গত বহু দিন,
ধ্যানময়ী এলো কাছে যবে আমি মণি-রত্নহীন।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত।

দুঃসময়ে

আনন্দের রুদ্ধ গতি, প্রাণের অঙ্কুর এবে আপনারে করে না প্রকাশ,
আছে কি স্থিরতা কিছু যাবে দূরে এক দিন আজিকার অশ্রু-জলোচ্ছ্বাস!
এখনো কি আছে আশা কম্পিত-কুণ্ঠিত মোর জন্মভূমি লভিবে বৈভব!
জীবন-ঐশ্বর্য্য পাবে ঝঞ্ঝা-রাত্রি-অবসানে লক্ষ্মীহীনা শূন্য পুরী সব?
পান্থের নয়ন 'পরে ভবিষ্যের বৈজয়ন্তী উড়িবে কি সূর্য্যকরঘাতে?
সেদিন শারদ-প্রাতে হাসিবে কি শতদল ভাস্করের কিরণ-সম্পাতে!

পুষ্পফুল্ল নহে পথ, আজি তার প্রান্তে হেরি বিনিদ্রিত প্রেমতীর্থ বট!
সুখের সৌরভ কোথা? দুঃখের বিকট গন্ধ সংসারের শবাচ্ছন্ন তট।
রোষ-দীপ্ত বিভীষিকা রাত্রির বীভৎস ছায়ে স্পর্দ্ধাভরা হিংসার আবেগে
স্তব্ধতার বিস্তৃতির স্তরে স্তরে সভ্যতার আনে মৃত্যু-শঠতারে ডেকে।

গৃহচ্যুত নর-নারী, শঙ্কিত ক্ষুধিত প্রাণ, দেবতা যে কঠিন পাষাণ,
ন্যায়ধর্ম্ম অরক্ষিত, অন্যায়ের সমাদর, সবলের আছে শুধু স্থান!
শতাব্দীর রুদ্র রূপ অদৃষ্টের পরিহাস! ঘরে সদা শোকের শেফালি,
ত্রাণকর্ত্তা আসিবে কি! শ্মশানের পথপ্রান্তে দিব তারে কঙ্কালের ডালি।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

সূর্য্য

প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে সূর্য্যকে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার এবং উজ্জ্বল বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষুদ্রতম তারকা ছাড়া আর কিছু নয়। তবু যে খুব বড় বলে মনে হয়, তার কারণ, সূর্য্য পৃথিবীর খুবই নিকটাবস্থিত। তার তুলনায় নিকটতম তারকার দূরত্ব ৩০০,০০০ গুণ।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে সূর্য্যকে প্রকাণ্ড উজ্জ্বল একখানি থালার মত দেখায়, যার ব্যাস চোখে ½ ডিগ্রীর কোণ সৃষ্টি করে। এই ব্যাস নিয়মিত ভাবে বাড়ে এবং কমে, যার থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দূরত্ব সমান নয়, কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। যদি পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণের কক্ষ বৃত্তাকার হতো, তাহলে দূরত্ব সব সময়েই এক থাকতো, কারণ, সূর্য্য এই কক্ষের কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু দূরত্ব পরিবর্ত্তনশীল, অতএব কক্ষ একটি উপবৃত্ত (ellipse) এবং সূর্য্য সেই উপবৃত্তের (ellipse) নাভিতে (Focus) অবস্থিত। মোটামুটি পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দূরত্ব প্রায় ৯২,৯০০,০০০ মাইল এবং সূর্য্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৪,০০০ মাইল। প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু তারকার তুলনায় নগণ্য। সূর্য্যের ভর (mass) পৃথিবীর ৩৩২,০০০ গুণ,কিন্তু আয়তন ১,৩৩১,০০০ গুণ। ঘনাঙ্ক (density) ১'৪১, পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ।

ভাল ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, হারকিউলিসের (Hercules) চতুর্দ্দিকের নক্ষত্রগুলি একধারে ফাঁক্-ফাঁক্ হয়ে যাচ্ছে আবার অপর ধারে কাছাকাছি হচ্ছে। তার অর্থ হলো যে, সৌরমণ্ডল (সূর্য্য এবং গ্রহের দল) ক্রমেই হারকিউলিসের (Hercules) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সূর্য্যের ভূমি ঠিক সমতল নয়, মনে হয় যেন একটা থালার উপর চাল ছড়ানো রয়েছে! কিন্তু সেই চালের কণার আয়তন দৈর্ঘ্যে হাজার মাইল আর প্রস্থে তিন শত মাইলেরও অধিক। উজ্জ্বলতাও সর্ব্বত্র সমান নয়, মধ্য-ভাগ বেশী এবং ধারগুলি কম উজ্জ্বল। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে কালো কালো দাগ আছে, যাকে সৌরকলঙ্ক (sun-spot) বলে। দাগের মধ্য-ভাগ গাঢ় (umbra) এবং চারি ধার ফিকে কালো (penumbra)। আসলে কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ স্থানগুলিও আলোকিত, তবে সূর্য্যের অপর স্থানগুলি এত বেশী উজ্জ্বল যে, তুলনায় দাগগুলি কালো মনে হয়। অনুমান, কম আলোকিত গভীর গর্ত্তের জন্য এই রকম দেখায়। গভীরতা প্রায় ছ' হাজার মাইলের কিছু কম। কলঙ্ক প্রায়ই একত্র হয়ে পড়ে, কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, তারা জোড়ে থাকে। সূর্য্যের থালার উপর দিয়ে কলঙ্কের এক ধার থেকে আর এক ধারে সরে যাওয়া দেখে স্পষ্ট মনে হয় যে, সূর্য্য নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে। অতএব সূর্য্য পৃথিবীর মত প্রায় গোলাকার। তার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের নাম ফটোস্ফীয়ার (Photosphere); তবে পৃথিবীর ঘোরার সঙ্গে সূর্য্যের ঘোরার এক বিরাট পার্থক্য আছে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থান একই বেগে ঘোরে (angular velocity), কিন্তু সূর্য্যের ঘূর্ণাবেগ যত তার বিষুবরেখার দিকে যাওয়া যাবে, ততই বেশী হতে থাকবে। বেশীর ভাগ সৌর-কলঙ্কই মধ্য-ভাগে অবস্থিত। মোটামুটি সৌর-কলঙ্কের অক্ষের চারি ধারে একবার ঘুরতে সময় লাগে ২৫'৩৮ দিন—যদিও বিষুবরেখার কাছে হলে লাগে মাত্র ২৪'৫ দিন।

কোন একটি সৌর-কলঙ্কের দাগ ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ক' দিন অথবা ক' মাস পরে সেই দাগ অদৃশ্য হয়। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি ১১ বছর চার মাস অন্তর সৌর-কলঙ্কের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী হয়। পৃথিবীর চৌম্বক ক্রিয়ার জন্য সৌর-কলঙ্কের তারতম্য ঘটে বলে অনুমিত হয়।

পৃথিবীর গতি দু' রকম। প্রথম—আহ্নিক গতি, নিজ কক্ষের ওপর ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে একবার ঘোরে। দ্বিতীয়—বার্ষিক গতি, সূর্য্যের চারি ধারে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। আহ্নিক গতির জন্য মনে হয়, আকাশস্থিত তারকারাশি পূব থেকে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে, আবার ঘুরে পূর্ব্বস্থানে আসতে সময় লাগছে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪ সেকেণ্ড। কিন্তু ঐ ভাবে সূর্য্যের ঘুরে আসতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ৩ মিঃ ৫৬ সেকেণ্ড (১ ডিগ্রী) পেছিয়ে পড়ছে। ফলে আকাশে সূর্য্যের একটি পৃথক্ গতি-পথ অঙ্কিত হচ্ছে—যার নাম ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic)। অতএব নক্ষত্রের তুলনায় সূর্য্য ঠিক পূর্ব্বেকার স্থান দিয়ে আসবে এক বৎসর অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা পরে (২৪ ঘণ্টা · মিঃ ৫৬ সেকেণ্ড) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-কক্ষই হলো সূর্য্যের গতি-পথ, আর পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য মনে হয়, সূর্য্য প্রদক্ষিণ করছে। ক্রান্তি-বৃত্তের উপর ১২ রাশি অবস্থিত। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এক রাশি থেকে আর এক রাশি পর্য্যন্ত যেতে এক মাস সময় লাগে। মেষ রাশি থেকে বর্ষের প্রথম মাস আরম্ভ হয় আর মীন রাশিতে বর্ষ শেষ হয়। ৩১শে ডিসেম্বর পৃথিবী সূর্য্যের সব চেয়ে নিকটে এবং ১লা জুলাই সব চেয়ে দূরে থাকে।

ছবিতে সূর্য্যের গতি—বামে ঐ কালো দাগ ছ'দিনে মাঝখানে ; আরো ছ'দিনে ডাহিনে

পৃথিবীর কক্ষের আর বিষুবরেখার ভূমির (Plane) মধ্যের কোণ ২৩°২৮'। অক্ষ সর্ব্বক্ষণ কক্ষের ওপর হেলে থাকে ৬৬°৩২' কোণে এই হেলান থাকার জন্যই পৃথিবীতে ঋতু-পরিবর্ত্তন ঘটে। ২১ জুন গ্রীষ্ম, ২২ সেপ্টেম্বর শরৎ, ২৬ ডিসেম্বর শীত এবং ২১ মার্চ বসন্ত। গ্রীষ্ম ৯৬ দিন ১৪ ঘণ্টা, শরৎ ৮৯ দিন ১৮ ঘণ্টা, শীত ৮৯ দিন ১ ঘণ্টা এবং বসন্ত ৯২ দিন ২১ ঘণ্টা।

আহ্নিক গতির জন্য দিন বা রাত হয় ; কিন্তু তাদের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে সূর্য্যের বিষুব লম্ব (destination) পৃথিবীর উপর দর্শকের অক্ষাংশের (latitude) উপর। বিষুবরেখার উপর যাদের বাস তাদের দিন-রাত সমান ; আবার উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরুবাসীদের দিন ছ'মাস আর রাত ছ'মাস। ২৩ ডিসেম্বর দিন সব চেয়ে ছোট, রাত সব চেয়ে বড় ; আর ২১ জুন রাত সব চেয়ে ছোট, দিন সব চেয়ে বড়।

সূর্য্য অস্ত গেলে রাত এবং উদয় হলে দিন হয়। কিন্তু উদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যকে না দেখা গেলেও তার আলো পাওয়া যায়। সেই সময়কে বলে উষা। তেমনি সূর্য্যাস্তের পরও কিছুক্ষণ আলো থাকে। তাকে বলে গোধূলি। এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে সমস্ত রাত্রি ধরে গোধূলি থাকে ; অর্থাৎ সূর্য্য দেখা যায় না বটে, কিন্তু আলো থাকে।
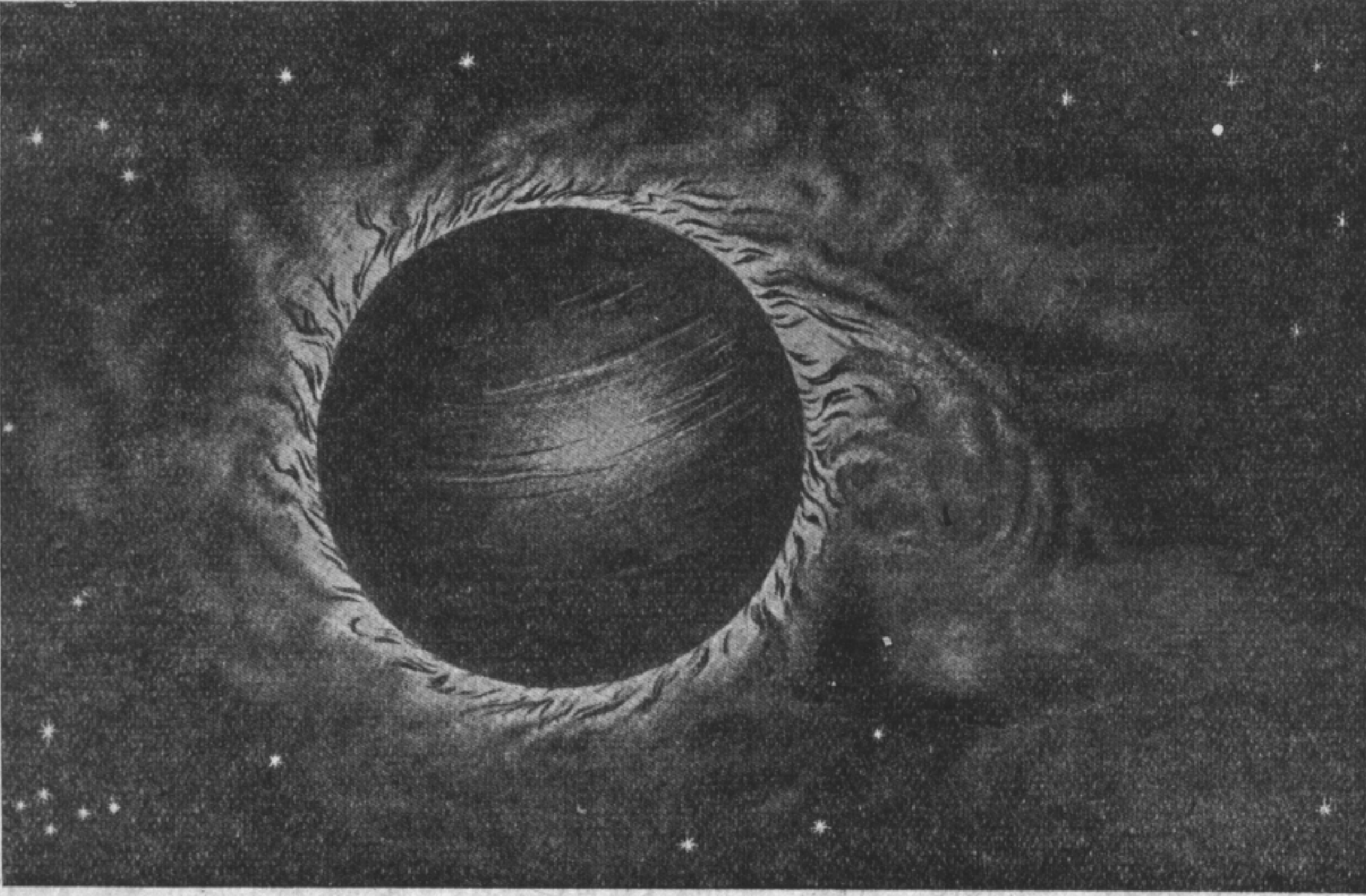
আদিম অগ্নি-গোলক—এখনকার পৃথিবী

পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় যখন নিষ্প্রভ চন্দ্র ভাস্বর সূর্য্যের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন মনে হয়, চন্দ্রের চারি ধার দিয়ে লেলিহান অগ্নিশিখা বার হচ্ছে। আসলে কিন্তু সে অগ্নিশিখা সূর্য্যের, চন্দ্রের কালো পর্দ্দার পিছন থেকে উঁকি মারছে বলে ঐ রকম দেখায়। অন্য সময় এ শিখা দেখা যায় না, তার কারণ, সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোয় চারি ধার আলো হয়ে থাকে। এই শিখার উচ্চতা অনেক সময় লক্ষাধিক মাইল পর্য্যন্ত হয়। আর একটি লক্ষ্য করবার বস্তু—পূর্ণ-গ্রাসের সময় আচ্ছাদিত সূর্য্যের চারি ধারে আলোর ঝকমকে একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল (halo)। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল কিন্তু প্রত্যেক বারই নতুন রকমের হয়। সৌর-কলঙ্কের সঙ্গে এর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়। কারণ, সৌর-কলঙ্ক কম-বেশী হলে এই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের (halo) আলোর পরিমাণও কম বেশী হয়।

স্পেক্টোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে সাদা আলোক-রশ্মিকে সাত রঙে বিভক্ত এবং প্রত্যেক রঙকে পাতলা খাড়া রেখায় পরিণত করা হয়। ফলে (স্পেকট্রাম লাইন) বর্ণালী রেখার সৃষ্টি হয়। কোন পদার্থ বাষ্পে (vapour) পরিণত করলে যদি আলো নির্গত হয়, স্পেক্টোস্কোপের সাহায্যে তার লিখন হবে কয়েকটি রেখা মাত্র (isolated lines), যাদের থাকবার স্থান নির্ভর করছে পদার্থের উপর। যদি কোন ঘন তরল অথবা অত্যন্ত বেশী চাপের বাষ্পীয় (gas) পদার্থ (যেমন তারকা) থেকে আলোক নির্গত হয়, তাহলে লিখন হবে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী লাল থেকে বেগুনে পর্য্যন্ত, ঠিক রামধনুর মত। যদি এই ধরণের আলো কোন অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাষ্পের স্তর ভেদ করে আসে, তবে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর মধ্যে কালো কালো রেখা দেখা যাবে। সেই রেখাগুলি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাষ্পের রেখার অনুরূপ ; তবে উজ্জ্বল না হয়ে হ'ল কালো। এরূপ ঠাণ্ডা বাষ্প নিজের রেখাগুলি শোষণ (absorb) করে নিয়েছে। এর নাম হল শোষণ বর্ণালী (absorbtion spectrum)। সূর্য্যের স্পেকট্রাম ও এই শ্রেণীর মধ্যে কালো কালো রেখা থাকে, যার নাম ফ্রনহফার রেখা। দূরবীক্ষণ দিয়ে যে তথ্য ধরা পড়ে না, এই লিখনের সাহায্যে তা সম্ভবপর হয়েছে।

একই পদার্থের বিভিন্ন স্পেকট্রাম লিখন পাওয়া যেতে পারে, উত্তাপের (temperature) চৌম্বক ক্ষেত্রের (magnetic field) এবং আলোক-উৎসের গতির তারতম্যের জন্য। উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে যৌগ (compound) ভেঙ্গে মৌলে (element) পরিণত হয়। পূর্ব্বেকার লিখন ধীরে ধীরে নূতন লিখনকে স্থান ছেড়ে দেয়। অতএব কম উত্তাপের (low temp) লিখন এবং বেশী উত্তাপের (high temp) লিখন বিভিন্ন হতে পারে। পৃথিবীর মত সূর্য্যও একটি বিরাট চুম্বক। সে জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের তারতম্যে লিখনের তারতম্য হয়। তৃতীয় কারণটির নাম হলো Doppler's effect : যখন আলোক-উৎস দর্শকের (observer) দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ তাদের মধ্যের দূরত্ব কমে যায়, তখন প্রত্যেক লিখন-রেখার তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও (wave length) কমতে থাকে। এই কমাটা নির্ভর করে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং অগ্রগতি-বেগের উপর। দূরত্ব বাড়লে সেই রকম তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। সুতরাং লিখনের নড়া-চড়ায় দূরত্বের হিসাব পাওয়া যায়। এই উপায়ে তারকার মধ্য দিয়ে সূর্য্যের গতিবেগ নিরূপণ করা হয়েছে এবং কষে বেরিয়েছে যে, আমাদের সৌরমণ্ডল আকাশে প্রতি সেকেণ্ডে ১২ মাইল সরে যাচ্ছে। ডপলার্স এফেক্ট থেকে আর একটা তথ্য

নির্দ্ধারিত হয়েছে—সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) স্রোত। সূর্য্যের দেশে আমাদের দেশের মত প্রায়ই ঝড় ওঠে, কিন্তু সেই ঝড়ের বেগের তুলনায় আমাদের প্রচণ্ড ঝটিকাও মৃদুমন্দ সমীরণ মাত্র! ঝড়ে সূর্য্যের চারি ধার দিয়ে অগ্নিশিখা লক্‌-লক্‌ করে বেরিয়ে পড়ে।

কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখে দেখবার লেন্সের স্থানে যদি এমন একটা স্পেকট্রোস্কোপ এঁটে দেওয়া যায়—যার সামনে আলোকের নিয়ন্ত্রণের জন্য ছোট একটি ছিদ্র (Camera slit) আছে, তাহলেই মোটামুটি স্পেকট্রো-হিলিওগ্রাফ তৈরী হয়ে গেল। এই যন্ত্রের সাহায্যে এক-রঙা আলোয় সূর্য্যের ছবি তোলা হয় এবং স্পেকট্রামের লিখন থেকে সূর্য্যের আবহাওয়ার হদিশ মেলে ও তার থেকে সূর্য্যের মধ্যে কি কি পদার্থ আছে তারও সন্ধান পাওয়া যায়।

সূর্য্য প্রতি সেকেণ্ডে ৩'৭১ × ১০৩৩ আর্গস শক্তি (energy) আলোক, উত্তাপ এবং অন্যান্য তরঙ্গে চারি দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ এবং উপগ্রহ মিলিয়ে এই বিরাট শক্তির ১২ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পাচ্ছে। বিলিয়ে দেবার (radiation) শক্তি সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থেরই বেশী থাকে ; সুতরাং সূর্য্যের রঙও কালো এ কথা মনে করলে ভুল হবে না। অত্যন্ত উত্তপ্ত বলে রঙটা লাল দেখায় ; আরও বেশী প্রতপ্ত হলে সাদা দেখাতো। এই শক্তি-বিকিরণ থেকে সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ মাপা হয়েছে এবং গাত্রের উত্তাপ প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী।

অসংখ্য ভাঙ্গাচোরা পরমাণু প্রচণ্ড গতিতে হুড়োহুড়ি করে বেড়াচ্ছে আর মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা তাদের আটকে রাখা হয়েছে, এই হলো সূর্য্যের ভিতরকার হাল-চাল। পরমাণুগুলি যেন এক একটি সৌরমণ্ডল! মধ্যে সূর্য্যস্থানে ধনাত্মক (positive) নিউক্লিয়াস এবং চারি দিকে প্রদক্ষিণ করছে গ্রহের দল, ঋণাত্মক (negative) ইলেকট্রন্স। হাইড্রোজেনে একটি চার্জ্জের নিউক্লিয়াস একটি চার্জ্জের ইলেকট্রন, হিলিয়ামে দু'টি চার্জ্জের নিউক্লিয়াস দুই চার্জ্জের ইলেকট্রন্স আবার ইউরেনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভারী এলিমেন্টের ৯২ চার্জ্জের নিউক্লিয়াস আর ৯২ চার্জ্জের ইলেকট্রন্স। নানাবিধ উপায়ে ইলেকট্রনদের কক্ষচ্যুত করা যায়। অবশিষ্ট পরমাণুকে আয়ওনাইজড পরমাণু বলা হয়। সুযোগ পেলেই ইলেকট্রন টেনে নিয়ে ক্ষতি-পূরণ করে পরমাণু আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ভাঙ্গা-চোরায় শক্তি (energy) সৃষ্টি হচ্ছে আর আমরা পাচ্ছি আলো এবং তাপ। ক্রমে এই শক্তি কমে যাবে। সূর্য্যের দেহের ক্ষয়ের পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে ৪,০০০,০০০ টন। এক দিন সূর্য্যও পৃথিবী চন্দ্র ইত্যাদির ন্যায় জড় পদার্থে পরিণত হবে। তবে সে অবস্থা আসতে সময় লাগবে কোটি কোটি বৎসর!

সূর্য্যমণ্ডলের আকার এবং জ্যোতি

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

নারীর দ্বন্দ্ব

জীবনের এক ঘাটে স্বচ্ছ ভালোবাসা
লভিবারে আগ্রহ অপার
অন্য দিকে শূন্য সব, ব্যর্থতায় ভরা—
আছে শুধু কর্ত্তব্যের ভার।

আজি বিকশিত তার যৌবন-কুসুম
চপল-চটুল আজি প্রাণ—
তবুও সে পরিম্লান! ভাবে শুধু মনে
কোন্‌ পথে দ্বন্দ্ব অবসান!

শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য

শবরীর প্রতীক্ষা

[গল্প]

১

যুক্তপ্রদেশের এক প্রসিদ্ধ সহরের ঘটনা।

টালি-ছাওয়া একখানি বাড়ীর বাহিরের ঘরে বসিয়া দু'টি যুবক কথা কহিতেছিল। আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় দু'জনের মুখেই মলিন ছায়া। এক জনের বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ আর এক জনের বয়স বাইশ-তেইশ।

বড় কীর্ত্তিপ্রকাশ বলিতেছিল,—বড় প্রলোভনের দেশ, খুব সাবধানে থাকবে। যেমন যাচ্ছ, এমনি ফিরে এসো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

দু' হাত কপালে ঠেকাইয়া ঈষৎ আর্দ্র কণ্ঠে ছোট দীপচন্দ বলিল,—আপনার আশীর্ব্বাদ আমি যেন সফল করতে পারি।

কীর্ত্তি বলিল,—সেখানে নিরামিষ খাওয়া চলবে না। সে চেষ্টা করো না। তবে যতটা পারো, শুদ্ধাচারে থেকো। আর তুমি ছোট, কি আর বলবো, স্ত্রীলোক আর সুরা—এ দু'টিকে খুব সাবধান! চাঁদনীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়নি, কিন্তু বিবাহের কথা পাকা।

দীপ বলিল,—আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে। তার পর দু'জনেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ পরে কীর্ত্তি বলিল,—কাল এতক্ষণে ট্রেণে থাকবে, পরশু বম্বে, তার পরদিন এমন সময় জাহাজের বুকে!

আর্দ্র কণ্ঠে দীপচন্দ বলিল,—হ্যাঁ।

কীর্ত্তি বলিল,—দেশের মুখ উজ্জ্বল করো।

আর একটু বসিয়া দীপ উঠিয়া পড়িল, বলিল—চাঁদনীর সঙ্গে এই বেলা দেখা করে আসি, কাল আর সময় হবে না।

দীপচন্দ ভিতরে গেল।

উঠানে প্রকাণ্ড নিম গাছে দোলা খাটানো। সেই দোলায় কুড়ি-একুশ বৎসরের শ্যামা যুবতী বসিয়া পায়ের টিপে মৃদু-মন্দ দোল খাইতে খাইতে অলস কণ্ঠে গাহিতেছিল—

উমড়ি ঘুমড়ি আই কারীরে বদরীয়া
যায় রহে পিয়া মোর কৌন নগরীয়া।
যব্ সে গয়ে মোরী সুধ হুঁ নলিনি
এ হি সোচ মোরী বারী রে উমরিয়া। *

শ্রাবণ মাস—পশ্চিমে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী এ সময় দোলা খাটানো হয়। মেয়েরা দোলনায় বসিয়া দোল খায়, গান গায়। 'কাজরী' গান।

মৃদু পায়ে কাছে আসিয়া দীপচন্দ দোলার দড়ি ধরিয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিল,—ও অলক্ষুণে গানটা আজ আর কেন গাইছ চাঁদনী? বিদেশে যাচ্ছি, কি জানি সেখানে কি হবে।···আজ যাবার দিনে ও-গানটা আর গেয়ো না!

চাঁদনী দোলা হইতে নামিল। দু' চোখে জল টল্‌টল্ ঝরিতেছিল, ধানীরংয়ের ছোপানো কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

দীপ বলিল,—এসো, ভিতরে বসি।

শ্রাবণের আকাশ সীসা-রং ধরিয়াছে। দুই একটা বড় বড় ফোঁটা দু'জনের গায়ে পড়িল। চাঁদনী নিরুত্তরে দীপের সহিত ভিতরে গেল।

চাঁদনীর পিতা আর্য্য-সমাজী প্রচারক ছিলেন, দীপচন্দ তাঁহার বন্ধুর পুত্র। দু'জনেই যখন শিশু, দু'জনের বিবাহ দিতে তখন তাঁহারা বাগ্‌বদ্ধ হন। তবে স্থির হয়, দীপচন্দ উপার্জ্জনশীল হইলে তখন বিবাহ হইবে।

তাহার পর প্রায় দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চাঁদনীর পিতার লোকান্তর হইয়াছে—অবস্থাও পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু গিরিধারীলাল তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলেন নাই। স্থির ছিল, এই আষাঢ়েই বিবাহ হইবে। কিন্তু দীপচন্দ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৈদেশিক শিক্ষার বৃত্তি পাওয়ায় গিরিধারীলাল ও চাঁদনীর দাদা কীর্ত্তিপ্রকাশ দু'জনেই স্থির করিলেন, সে ফিরিয়া আসিলে বিবাহ হইবে।

কীর্ত্তি কাংড়া গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিক্ষা শেষ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্য বরণ করিয়া লইয়াছিল। বিবাহ করে নাই। অন্য ভগিনীদের বিবাহ হইয়াছে; তাহারা শ্বশুরালয়ে আছে, শুধু অনূঢ়া চাঁদনী তাহার কাছে থাকে। ভ্রাতার আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় বলিয়া চাঁদনী স্থানীয় আর্য্যকন্যা-পাঠশালায় শিক্ষয়িত্রীর চাকরী লইয়াছে। ভাবী শ্বশুর গিরিধারীলাল তাহাতে অমত করেন নাই।

দীপচন্দ খাটিয়ার উপর বসিয়া চাঁদনীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—এসো, এখানে বসো। পরস্পরকে স্বামি-স্ত্রী জানিলেও তাহারা কখনও বাড়াবাড়ি করে নাই, তাই চাঁদনী দীপচন্দের মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

দীপ তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া বলিল,—কখনও বলিনি। কত দিনের মত যাচ্ছি, কত দিন দেখতে পাবে না, আজ একটু কাছে এসে বসো।

চাঁদনী নিরুত্তরে তাহার কাছে আসিয়া বসিল,—কপোলের উপর দিয়া জলবিন্দু গড়াইয়া পড়িল।

দীপ তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সযত্নে সে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া সজল কণ্ঠে বলিল,—চুপ করো চাঁদনী। আড়াইটে কি বড় জোর তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মন খারাপ করো না। প্রতি মেলে যেন চিঠি পাই।

চাঁদনী অস্ফুট স্বরে বলিল,—আমি লিখবই,—তুমি ভুলো না।

দীপ বলিল, কেন এখন থেকেই সে ভয় করছ না কি?

রুদ্ধ কণ্ঠে চাঁদনী বলিল, জানি না। আমার কেমন কেবলই মনে হচ্ছে, তোমায় যেন আর আমি পাবো না।

হাসিয়া দীপ বলিল, তুমি একেবারে পাগল হয়ে গেছ। এমন ভয় করলে এই আড়াই বছর তিন বছর তুমি কি করে কাটাবে? ছি, মন খারাপ করো না, আমি ঠিক তোমার কাছে ফিরে আসবো।

---

* "আকাশ ঘনঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। আমার প্রিয় বিদেশে যাইতেছেন। বিদেশে গিয়া পর্য্যন্ত আমায় স্মরণ করেন নাই। আমার বালিকা বয়স, ইহাই চিন্তার কারণ।"

আজ বিশ বছর থেকে তুমি আমার, তোমায় কি ভুলতে পারি? চাঁদনীর সিক্ত আঁখিপাতে দীপ চুম্বন করিল।

২

অজস্র পত্র আসিতে লাগিল—বম্বে, এডেন, পোর্টসৈয়দ, মাল্টা, জিব্রাল্টার হইতে। কীর্ত্তিও চিঠি পাইতেছিল। হাসিয়া এক দিন কীর্ত্তি চাঁদনীকে বলিল,—এত চিঠি কিন্তু বিলেত পৌঁছে দেবে না, কি বলিস্ চাঁদনী?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চাঁদনী লজ্জানত মুখে বলিল,—না। এখন দূরে গেছেন, মায়া বেশী।

কীর্ত্তি বলিল, তাছাড়া এখনও বাইরের কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়নি। সেখানে গিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ হলে এত চিঠি দেবার সময় আর পাবে না। কি বলিস্?

কীর্ত্তির অনুমান মিথ্যা হইল না। কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হইবার পর হইতেই দীপচন্দের পত্র আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল, এবং সে সব পত্র আকারে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে লাগিল। যাহা আসিত, অর্দ্ধেকটা সে দেশের নারীজাতির গুণকীর্ত্তনে পূর্ণ থাকিত।

গিরিধারীলাল এক দিন কীর্ত্তিকে বলিলেন,—দীপ দেখছি ওদেশের মেয়েদের ভারী ভক্ত হয়ে পড়েছে! একটা কিন্তু ভা'লো নয়!

ভালো কীর্ত্তি-প্রকাশেরও লাগিতেছিল না। কিন্তু উপায় কি! বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে বলিল,—এতে আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন কাকা? এদেশের তুলনায় তারা কত আলাদা, ও ছেলেমানুষ,—ওর কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে বলেই লেখে।

একটু মৌন থাকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—তোমার কথাই যেন সত্য হয়। চাঁদনীকে চিঠিপত্র লেখে তো?

কীর্ত্তিপ্রকাশ বলিল,—লেখে।

গিরিধারীলাল একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন,—তোমার বাবার কাছে আমি সত্যে বদ্ধ আছি। দীপ তা থেকে কি করে আমায় মুক্তি দেবে, তাই আমার ভাবনা। সে ফিরলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ইহারই পরের মেলে কিন্তু একখানি পত্র পাইয়া কীর্ত্তি স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার পরিচিত একটি ছেলে বিলাতে ছিল। সে দীপচন্দ ও চাঁদনীর সম্পর্কের বিষয় অবগত ছিল। সে লিখিতেছে, আট-দশ দিন পূর্ব্বে উইক এণ্ডে দীপকে একটি স্ত্রীলোকের সহিত সে গ্রামে যাইতে দেখিয়াছে,—দু'জনের আচরণ তেমন ছিল না ইত্যাদি।

কীর্ত্তি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। চাঁদনী দীপচন্দের পত্র না পাইয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া আছে, সে যদি এ কথা জানিতে পারে?······

কীর্ত্তিপ্রকাশ চিন্তায় এমন মগ্ন ছিল যে, গিরিধারীলাল কখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, জানিতে পারে নাই!

বিলাতী ছাপ-মারা পত্র দেখিয়া গিরিধারীলাল বলিলেন,—কার চিঠি কীর্ত্তি?

কীর্ত্তি সহসা কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

গিরিধারীলাল বলিলেন,—দীপ ভাল আছে ত?

কীর্ত্তি কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, দীপর চিঠি নয় কাকা!

গিরিধারীলাল একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—দীপর কোনো খবর আছে না কি?

কীর্ত্তি তখন অগত্যা পত্রখানা পড়িয়া শুনাইল।

গিরিধারীলাল বহুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিবার পর সক্ষোভে বলিলেন, চাঁদনীকে যেন কিছু জানাইও না। আমি আজই তাকে চিঠি দেব। হুঁ! ছেলে আমার মানুষ হচ্ছে বটে! এই তার উচ্চ শিক্ষা!

কীর্ত্তি নিশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

গিরিধারীলাল চলিয়া গেলে কীর্ত্তি ভিতরে আসিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,—চাঁদনীর কাছে লুকানো চলে নাই। সে ভিতরে দ্বারের গায়ে মাথা হেলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, মুখখানি তাহার বেদনার ছায়ায় মলিন। কীর্ত্তিকে দেখিয়া সে নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

৩

কিন্তু ঐটুকুতেই নিষ্কৃতি মিলিল না। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে দীপচন্দ একটা নারী-ঘটিত মামলায় জড়িত হইয়া পড়িল। ধনবান পিতা জলের মত অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু কথাটা গোপন রহিল না। সংবাদপত্রের দ্বারা রাষ্ট্র হইয়া গেল। আত্মীয়-স্বজনের এত দিন চিন্তার অবধি ছিল না, যে দিন কেবলে জানা গেল দীপ মুক্তি পাইয়াছে, সে দিন সকলেই যেন নূতন হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! চাঁদনী দীপচন্দের ছবিখানি বাহির করিয়া বহুক্ষণ সে দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, গালের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল অবিরল জলধারা। ব্যথিত মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, আমাকে ভুলেছ, তার জন্যে অনুযোগ করি না! কিন্তু নিজেকে এমন করে বিপন্ন করলে কেন?

ইহার দুই তিন দিন পরে গিরিধারীলাল আসিয়া কীর্ত্তিকে বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।

কীর্ত্তি সসম্ভ্রমে বলিল, বলুন।

গিরিধারীলাল ক্ষণকাল মৌন থাকিবার পর নিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন, আমার চোখে দীপচন্দ মরে গেছে, তার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু আমি তোমার বাপের কাছে যে সত্য করেছিলুম, সে সত্য আমি জীবিত থাকতে অটুট থাকবেই—কি বলো?

কীর্ত্তি নীরব রহিল। কত বড় মনোবেদনায় যে বাপের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয়, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার মুখে ভাষা ফুটিল না।

গিরিধারীলাল বলিলেন, আমার সত্য আমার কাছে। আমি একটা প্রস্তাব করছি—তুমি কি বল শুনি।

কীর্ত্তি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বলুন।

গিরিধারীলাল বলিলেন, প্রেমচন্দ চাঁদনীর চেয়ে ছোট, আমার সে জন্য অমত আছে। কিন্তু ধ্যানচন্দের সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, আমি মনে কচ্ছি, তার সঙ্গে চাঁদনীর বিয়ে দিয়ে মৃত বন্ধুর কাছে সত্য-মুক্ত হই। একটু থামিয়া বলিলেন, ধ্যানচন্দ তোমারই সবচেয়ে বন্ধু, কাজেই তার সম্বন্ধে আমার চেয়েও তুমিই বেশী জানো। অবশ্য তার একটি মেয়ে আছে, তবে আশা করি, চাঁদনীর কাছে তার অযত্ন হবে না।

কীর্ত্তি ক্ষণকাল মৌন থাকিবার পর গিরিধারীলালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, চাঁদনী কি রাজী হবে?

গিরিধারীলাল বলিলেন, মেয়ে আছে বলে বলছ ?

কীর্ত্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে জন্য নয়। দীপচন্দ্রের সঙ্গে তার কুড়ি বছরের সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে অন্যকে বিয়ে করতে—

গিরিধারীলাল বলিলেন, আমি তার বাপের বয়সী। আমি কি ন্যায়-অন্যায় বুঝি না ? তাকে বলো, এতে ধর্ম্মের কোন হানি হবে না। তুমি চাঁদনীকে একবার জিজ্ঞাসা করো।

কীর্ত্তি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, বৃদ্ধ গিরিধারীলালের কাছে ধর্ম্মই একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছে, কিন্তু তরুণী চাঁদনীর কাছে ইহারও উপর একটা জিনিস আছে—অন্তর,—সে যদি গিরিধারীলালের প্রস্তাবিত বিবাহে সায় না দেয়, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে কি ? তথাপি সে নিজেও স্বীকার করিল, গিরিধারীলালের প্রস্তাব চাঁদনীর পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু বলি বলি করিয়াও সে চাঁদনীর নিকট কথাটা সে দিন বলিতে পারিল না। পরদিন এক সময় চাঁদনী রন্ধন করিতেছে দেখিয়া সে রন্ধনাগারের দ্বারের নিকট গিয়া বসিল। চাঁদনী বাঁ হাতে একখানা পিঁড়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ওঠ, পিঁড়েটায় বোস।

কীর্ত্তি একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিল, কাল কাকা এসেছিল।

চাঁদনী তরকারী নাড়িতে নাড়িতে বলিল, জানি। তাঁর গলা পাচ্ছিলুম।

কীর্ত্তি তখন চোখ-কাণ বুজিয়া তাঁহার প্রস্তাবটি চাঁদনীর কাছে বলিয়া ফেলিল। কথা সমাপ্ত করিয়া সে চাঁদনীর দিকে চাহিয়া দেখিল, চাঁদনী পলকহীন প্রস্তরীভূত দৃষ্টি তাহার মুখে নিবদ্ধ করিয়া আছে। সে এত স্থির যে, প্রাণের চিহ্ন তাহার দেহে নাই। কীর্ত্তি ব্যথিত ভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। সে সবই বোঝে, তবু তাহার কর্ত্তব্য ও মঙ্গলেচ্ছা তাহাকে কঠোর হইতে বাধ্য করিতেছে। মিনিট পাঁচ-সাত পরে আবার টুংটাং শব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইয়া কীর্ত্তি দেখিল, চাঁদনী আবার তাহার আরব্ধ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে। কীর্ত্তি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাকাকে কি বলব চাঁদনী ? তিনি তোমার উত্তরের অপেক্ষা করছেন।

চাঁদনী চাপা-গলায় বলিল, কাকা পাগল হয়েছেন।

কীর্ত্তি বলিল, পাগলামী নয় চাঁদনী, জ্ঞানীর কথা। দীপ ত বয়ে গেল, ওর ওপর আর আশা করা যায় না, কিন্তু তোমার ত একটা উপায় করা চাই !

চাঁদনী উনানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, আমি ত উপার্জ্জন করেই খাচ্ছি, আমার আর উপায় কি ?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কীর্ত্তি বলিল, আমরা বেঁচে থাকতে ঐ ব্যবস্থাকে তোমার শেষ ব্যবস্থা বলে স্বীকার করে নিতে পারি না।

চাঁদনী মৃদু কণ্ঠে বলিল, তাই তোমরা এই ব্যবস্থা ঠিক করেছ ?

কীর্ত্তি বলিল, তাছাড়া উপায় কি ? তাছাড়া কাকা আমাদের গুরুজন, তিনি বিচক্ষণ, তিনি কি অন্যায় কথা বলতে পারেন ?

চাঁদনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা সত্যি, কিন্তু ছেলের ব্যবহারে কাকা মর্ম্মাহত হয়ে এ প্রস্তাব করেছেন। বাবার সঙ্গে কাকা যে সত্যবদ্ধ ছিলেন, তা তিনি ভাঙ্গেননি, ভবিতব্য ভেঙ্গেছে। অন্য ছেলের সঙ্গে তিনি বাগ্‌দান করেননি, কাজেই তাঁর দায়িত্ব কেটে গেছে। কাকা তাঁর ছেলেকে মৃত জ্ঞান করতে পারেন,—কিন্তু আমি তা পারব না। কুড়ি বছরের সম্বন্ধ, জলের আঁক নয়।

শেষের দিকটা তাহার গলা ধরিয়া আসিল।

৪

ইহার পর দীপচন্দ্রের পত্র আসিল। আষ্টে-পৃষ্ঠে ভরিয়া আট পাতা পত্র লিখিয়া সে আপনাকে যতটা পারিয়াছে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়াছে, এবং চাঁদনী যেটুকু অবশ্য জানে, সেটুকুর জন্য বার বার ক্ষমা চাহিয়া পত্র শেষ করিয়াছে। কুৎসিত ব্যাপারের যবনিকা পাত হওয়ায় সকলেই স্বস্তি বোধ করিল, শুধু চাঁদনী ম্লান হাসি হাসিয়া পত্রখানা তুলিয়া রাখিল। দীপচন্দ্রের আট পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রের বিষয়ে না করিল কোন জেরা, না চাহিল কোন কৈফিয়ৎ ! যেন কিছুই হয় নাই এমনই করিয়া তাহাকে উত্তর দিল।

নিশ্চিন্ত হইল না শুধু কীর্ত্তি। সে দীপচন্দ্রের খোঁজ-খবর খুব বেশী করিয়া লইতে লাগিল, এবং তাহার নৈতিক অবনতির সংবাদ প্রায় প্রতি মেলেই পাইতে লাগিল। তাই তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, চাঁদনীর সহিত তাহার সূক্ষ্ম যোগসূত্রটিকে ছিন্ন করিয়া দিয়া তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করে।

সুযোগ মিলিল। এই সময় কীর্ত্তির বাল্যবন্ধু মহেন্দ্র সিং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিল। মহেন্দ্র অকৃতদার। কীর্ত্তি তাহার সহিত চাঁদনীর পরিচয় করিয়া দিল, এবং ঘন ঘন আসিবার নিমন্ত্রণ দিল। মনে করিল, অনুপস্থিত উচ্ছৃঙ্খল দীপচন্দ্রের ছায়া চরিত্রবান্ সুদর্শন মহেন্দ্র সিং যদি ঢাকিয়া দিতে পারে,—হয়ত চাঁদনীর জীবন ব্যর্থ না হইয়া সার্থক হইতে পারে।

আকর্ষণীয় বস্তুর অভাব না পাইয়া মহেন্দ্র সিং তাহার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিল না।

অস্বস্তি বোধ করিল চাঁদনী। সে কীর্ত্তির আন্তরিক ইচ্ছা অনুমান করিতে পারিয়াছিল,—কীর্ত্তির উপর সে জন্য রাগ করিতে পারিল না, বরং স্নেহময় অগ্রজের মঙ্গলেচ্ছা তাহাকে অভিভূত করিল, তথাপি সে ভাবিয়া পাইল না—এমন অসম্ভব কাজ সে কি করিয়া করিতে পারে ! মহেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গ তাহার ভালো লাগে না, তাহার বিবেকে আঘাত লাগে,—মনে হয়, দীপ যে দেশেই থাকুক, তাহাদের কুড়ি বৎসরের সম্পর্ক চাঁদনীর চারি পাশে একটি গণ্ডী টানিয়া রাখিয়াছে, সেখানে মহেন্দ্র সিংয়ের প্রবেশাধিকার নাই। তথাপি শিষ্ট, ভদ্র মহেন্দ্র সিংয়ের ব্যবহার এমনই মার্জ্জিত ও সম্ভ্রমপূর্ণ যে, তাহাকে এড়ানো চলে না। অথচ নির্ব্বিবাদে এই ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দিলে ক্রমে তাহা ঘনিষ্ঠতর হইয়া জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে !

মহেন্দ্র সিং এক দিন কীর্ত্তিকে বলিল,—তুমি যদি রাজী হও, তাহলে চাঁদনীকে আমার হাতে দাও।

কীর্ত্তি বলিল,—তোমার হাতে চাঁদনীকে দিতে পারলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান্ মনে করব মহেন্দ্র, কিন্তু মুস্কিল কি জান, আমি চাঁদনীর অমতে কিছু করতে পারি না। তুমি চাঁদনীর মত নাও, আর এ কথাও তাকে বলো, আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি তাকে বিবাহ করো।

মহেন্দ্র সিং প্রীত হইয়া বলিল,—আচ্ছা।

ইহারই কয়েক দিন পরে এক দিন মহেন্দ্র সিং চাঁদনীর কাছে প্রস্তাব করিল। চাঁদনী কীর্ত্তির জন্য পুল-ওভার বুনিতেছিল। বোনা থামাইয়া মহেন্দ্র সিংয়ের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিন্তু

বিস্মিত হইল না। সে ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—আপনি জানেন, আমি বাগ্‌দত্তা ?

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল,—না, তা-ত' জানি না। কার বাগ্‌দত্তা আপনি ?

চাঁদনী বোনা গুটাইতে গুটাইতে বলিল,—গিরিধারীলাল রইসের ছেলে দীপচন্দের—যিনি বিলেত গেছেন।

মহেন্দ্র সিং একটু খোঁচা দিয়া বলিল,—যিনি মিস্ গার্ডিনীরকে নিয়ে একটা মকর্দ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ?

চাঁদনীর মুখ কালো হইয়া গেল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সেই বটে !

মহেন্দ্র এক মিনিট নীরব থাকিবার পর বলিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

চাঁদনী চোখ তুলিয়া চাহিল।

মহেন্দ্র সিং বলিল,—তিনি কি সে সম্পর্কের মর্য্যাদা রেখেছেন ?

চাঁদনী শ্লেষের সহিত বলিল,—চোখের আড়াল হলে ক'জন পুরুষ রাখে ?

মহেন্দ্র আহত ভাবে বলিল,—সমস্ত জাতকে দোষ দেবেন না চাঁদনীজী ! কেউ কি রাখে না ?

চাঁদনী নির্লিপ্ত স্বরে বলিল,—হবে, সকলে হয়ত সমান নয়।

মহেন্দ্র কথাটাকে ঐখানেই শেষ হইতে দিল না, জের টানিয়া বলিল,—কিন্তু তাঁর দিক্ থেকে যখন কথার মর্য্যাদা রাখা হয়নি তখন তার মূল্য কি ? এ একটা পবিত্র কনট্রাক্ট, এক জন ভাঙ্গলে দ্বিতীয়ের আর কোন দায় থাকে না।

ঈষৎ হাসিয়া চাঁদনী বলিল,—মহেন্দ্রজী, আপনি আইন নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা নাড়াচাড়া করেন বলে আপনার কাছে আইনের ফাঁকি সহ্য হয় না। কিন্তু এ কনট্রাক্ট আমরা সই করিনি, এ কনট্রাক্ট স্থির করে রেখেছিলেন, আমাদের দু'জনের পিতা। কাজেই সই করা না থাকলেও পাকা দলিল। এর নাম আইন নয়, ধর্ম্ম।

মহেন্দ্র সিং বলিল, ধর্ম্মের অন্য নাম কি জানেন ? ঠকানো। মানুষকে ধর্ম্মের নাম শুনিয়ে যত মূঢ়-বুদ্ধি করে দেওয়া যায় তত আর কিছুতেই নয়। প্রাচীন কালের লোক বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাই ধর্ম্মের নাগপাশে মনুষ্য-সমাজের হাত-পা বেঁধে রেখে গেছেন।

চাঁদনী বলিল, অতএব তাকে অগ্রাহ্য করা মানুষের সাধ্য নয় ? মিছিমিছি কতকটা অশান্তির সৃষ্টি হয় মাত্র ?

মহেন্দ্র সিং বলিল, আপনি ভুল বলছেন। এ ক্ষেত্রে আপনার জীবনে অশান্তি এনে দিচ্ছে আপনার ধর্ম্মের প্রেরণা। আপনি যদি ঐ অকিঞ্চিৎকর দুই বৃদ্ধের মুখের কথাকে অগ্রাহ্য করেন, তা হলে আপনার জীবনে সুখ এবং শান্তির অভাব হবে না।

চাঁদনী বলিল, তাঁরা দু'জনেই আমার পূজনীয়। তাঁরা আমার শুভ কামনাই করেছিলেন, সার্থক হলো না—সে আমার ভাগ্য ! তাঁরা তার দায়িত্ব নিতে পারেন না।

মহেন্দ্র সিং বলিল, কিন্তু জেনে-শুনে এমন দুশ্চরিত্রকে—

বাধা দিয়া চাঁদনী বলিল, মহেন্দ্রজী, আপনার আর আমার মত মিলবে না, আপনি দেখছেন আইনের দিক থেকে, তাই আমার কথা আপনার অযৌক্তিক লাগছে। কিন্তু আমি দেখছি ধর্ম্মের দিক থেকে, তাই আমার কাছে এটা অসহনীয় লাগছে না, আমি ভাগ্য বলে এটা স্বীকার করে নিচ্ছি।

মহেন্দ্র বলিল, এ ভাবে ভাগ্য মেনে নেওয়া জড়তার নামান্তর নয় কি ? পুরুষকার বলে কি কিছু নেই ? আপনার ভবিষ্যৎ আপনার হাতে, আপনি ইচ্ছে করলেই তাকে নিতে পারেন। তবু আপনি তা না নিয়ে ভাগ্যকে আঁকড়ে থাকবেন ? এ ভাগ্যনিষ্ঠা শুধু আপনাকে বিড়ম্বনা দেবে। জলের আঁক, সহজেই মোছা যায় চাঁদনী।

চাঁদনীজী ম্লান হাসিয়া বলিল, জলের আঁক হলে আপনি মুছে যায়, মুছতে হয় না মহেন্দ্রজী। সব জিনিষ কি পরকে বোঝানো যায় ?

মহেন্দ্র বলিল, আপনি এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই মনে কচ্ছেন জগৎ বুঝি চিরদিন এমনি থাকবে। কিন্তু তা তো থাকে না। মানুষের অসুখ-বিসুখ বিপদ্-আপদ্ সবই আছে। একলা সে ঝড়-ঝাপটা সহ্য করা কঠিন হয় বলেই মানুষের চিরজীবনের সাথীর প্রয়োজন হয়—যে দুর্দ্দিনে পাশে এসে দাঁড়াবে। আপনি একলা পথ চলতে চাইছেন, কিন্তু দুর্দ্দিনে আপনার রক্ষক কে ?

চাঁদনী শুষ্ক হাসিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিল। বলিল, ওঁর চেয়ে বড় রক্ষক কেউ নাই মহেন্দ্রজী। স্বামীও নয়। উনি স্বামীরও রক্ষক। তাহার পর এক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিল, আপনি দাদার বন্ধু, দাদার মতনই আপনিও আমার মাননীয়, এ কথা আর উত্থাপন করবেন না। ছোট বোন বলেই মনে করবেন।

৫

সময় পুরা হইয়া গেলে দীপ দেশে ফিরিল। ইদানীং তাহার সম্বন্ধে তেমন কিছু মন্দ সংবাদ না পাইয়া সকলেই তাহার সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছিল।

কিন্তু সকলের আশাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া দীপচন্দ একেবারে বিবাহ করিয়া ফিরিল।

গিরিধারীলাল অন্য দুই পুত্র ও কীর্ত্তিসহ ষ্টেশনে গিয়াছিলেন তাহাকে আনিতে, সকলে মুখ কালো করিয়া গৃহে ফিরিলেন। দীপচন্দ সস্ত্রীক হোটেলে গেল।

* * * *

বাড়ী ফিরিয়া কীর্ত্তি দেখিল, চাঁদনী অত্যন্ত প্রত্যাশাপন্ন মুখে জানলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার উৎসুক দৃষ্টির পানে চাহিয়া কীর্ত্তির যেন চোখ ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম হইল! কেমন করিয়া কীর্ত্তি তাহার বুকভরা আশায় বজ্রাঘাত করিবে! চাঁদনী ক্ষণকাল কীর্ত্তিপ্রকাশের বেদনাহত স্তব্ধ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন অনুমান করিয়া লইয়া মৃদু পদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কীর্ত্তি বাহিরের ঘরে বসিয়াই আত্মসম্বরণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, চাঁদনী কত উৎকণ্ঠায় আছে! এ উৎকণ্ঠার অপেক্ষা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সঠিক ভাবে জানিয়া লওয়াই ভাল। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভিতরে গেল। শয়ন-কক্ষের দ্বারে পিঠ দিয়া চাঁদনী নিমগাছটার দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, কীর্ত্তিকে দেখিয়া শিথিল অঞ্চল কাঁধে তুলিয়া দিল।

তাহার শুষ্ক, করুণ মুখের পানে চাহিয়া কীর্ত্তির বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিল, মুহূর্ত্ত কাল তাহার কণ্ঠে শব্দ ফুটিল না, তাহার পর কাতর স্বরে বলিল, দীপচন্দ বিয়ে করে ফিরল চাঁদনী!

চাঁদনী এমনই একটা কিছু অপ্রিয় সংবাদ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাই বিস্মিত হইল না। শান্ত শোকাচ্ছন্ন দৃষ্টি তুলিয়া কীর্ত্তিপ্রকাশের মুখপানে মিনিটখানেক চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলিল, উপায় কি? যার যা রুচি!

ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু মেয়েটির দিকে কীর্ত্তি ক্ষণকাল অবাঙ্মুখে চাহিয়া থাকিবার পর ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে কীর্ত্তিপ্রকাশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি কানে যাইতে সে উঠিয়া বাহিরে আসিল। চাঁদনীর কক্ষের মুক্ত দ্বারপথে দেখিতে পাইল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছোট একখানি টিপয়ের উপর, দীপচন্দের একখানি ছবি রহিয়াছে এবং চাঁদনী মৃদু স্বরে তুলসীকৃত রামায়ণ হইতে শবরীর প্রতীক্ষা পড়িতেছে। গালের উপর দিয়া গড়াইতেছে জলধারা। কীর্ত্তির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল!

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

বৈষ্ণব-পদাবলী

বৈষ্ণব-পদাবলী লইয়া আলোচনা করিলে মনে হয়—এইগুলি যেন একটি রসগোষ্ঠীর সমবেত সৃষ্টি। একটা ভণিতা দেওয়ার প্রথা ছিল, তাই যেন একটা ভণিতা দ্বারা পদগুলি পরিসমাপ্ত। বহু কবি তাঁহাদের রচিত পদে বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের ভণিতা চালাইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন—সেই জন্যই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নামে পদসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে। একই নামের কবি একাধিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আপন আপন ভণিতাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টাও করেন নাই। আত্মবিলোপই যে তাঁহাদের সাধনার অঙ্গীভূত। পদগুলি যেন একটি রসধারার কতকগুলি কলবিম্ব। রসধারার প্রবাহ-রক্ষাই সেকালের সাধক কবিদের লক্ষ্য ছিল। রসস্রোতের সোণার তরীতে সোণার ফশল তুলিয়া দিয়াই তাঁহারা দায়মুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "রাতের তারা স্বপ্নপ্রদীপখানি ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে যায় চ'লে তার দেয় না ঠিকানা।"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনাই অধিকাংশ কবির আদর্শ ছিল। তাঁহাদের কথাই পরবর্ত্তী কবিরা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়াছেন। একই বক্তব্যকে কেহ বা নূতন অলঙ্কারে—কেহ বা নূতন ছন্দে—কেহ বা অভিনব রীতিতে বাণী-রূপ দিয়াছেন। বলিবার ভঙ্গীটাকেই তাঁহারা প্রাধান্য দিয়াছেন। যাঁহার যাহা নিজস্ব ছিল—অনেক সময় সেটুকুকেও তাঁহার রচনায় রূপ দেওয়ার সুযোগ সুবিধা হয় নাই, প্রচলিত রসাদর্শ ও বিধি-বিধানের অনুগত হইয়া তাঁহাদের চলিতে হইত। পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে সুরসৌষম্য নষ্ট হয়—পাছে গোষ্ঠী-ধর্ম্ম ক্ষুণ্ন হয়—পাছে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুশাসন লঙ্ঘিত হয়, এ আশঙ্কা তাঁহাদের লেখনীকে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। একটা বিরাট মহাসংকীর্ত্তনে দুই এক জন মূল-গায়নের কণ্ঠের সঙ্গে সকলে সুর মিলাইয়া গিয়াছেন।

পদাবলী-সাহিত্যকে গীতি-কবিতা (lyric) আখ্যা দেওয়া চলে না। গীতি-কবিতার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকে। কবি তাহাতে নিজের প্রাণের কথাই বলেন, নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকেই ছন্দে রূপ দান করেন। পদাবলীর মত একটা গোষ্ঠী, সমাজ বা সম্প্রদায়ের ভাব-ধারাই তাহার উপজীব্য হয় না। অন্ততঃ রচনাশৈলী বা ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী গীতি-কবির নিজস্ব থাকে—অন্ধ ভাবে একটা অনুশাসনের বিধিবদ্ধ রীতি বা ভঙ্গীর অনুসরণ গীতি-কবিতা নয়। গায়কের কণ্ঠের মুখাপেক্ষী হইয়া গীতি-কবিতা রচিত হয় না। পদাবলী যেন অর্দ্ধ সৃষ্টি—পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে গায়কের কণ্ঠে। গানের সুরের দিকে উৎকর্ণ হইয়া অথবা মনে মনে গাহিয়া পদকর্ত্তারা পদ রচনা করিতেন বলিয়া মনে হয়। তাই বোধ হয় তাঁহাদের কাছে সে সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে হইত।

পদগুলি যেন এক একটি শ্লোকের মত। শ্লোকের মতই যেন ইহাদের চতুঃসীমা বিধিবদ্ধ। অনেক পদ রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপুর ইত্যাদি কবিদের বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ। কোন একটি বিশেষ ভাবকে বিকসিত করিয়া তোলাই বহু পদের উদ্দিষ্ট নয়, সনেটের মত নির্দ্দিষ্ট সীমা-বন্ধনের মধ্যে সুরের প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই পদকর্ত্তারা স্বকীয় ভণিতা দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতেন; —গীতি-কবিতার বিকাশ-ধারা অনুসরণ করিতেন না। অনেক সময় কোন একটি বিশিষ্ট ভাবের বিকাশ সাধন না করিয়া তিন চারিটি বিভিন্ন ভাবের অন্তরার সাহায্যে পদটিকে পরিপূর্ণতা দান করিতেন। পদের গঠনে একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী থাকায় বাধ্য হইয়া কবিদের ভাবাবেগ সংবরণ করিতে হইয়াছে। অনেক পদে একই লেখার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অনেক পদ একই অলঙ্কারের ভিন্নভিন্ন দৃষ্টান্তের একত্র গুম্ফিত রূপ। অলঙ্কার-শ্লেষের প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই অনেক পদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

শব্দালঙ্কার ও প্রাণহীন অর্থালঙ্কারের আতিশয্য বহু সংস্কৃত কাব্যকে অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা হৃদয়-মাধুর্য্যের মহা মহোৎসব। ইহাতে ঐ শ্রেণীর আলঙ্কারিক-আতিশয্য আমরা প্রত্যাশা করি নাই। চৈতন্যোত্তর কবিদের বহু পদে আমরা ক্লিষ্ট কল্পনা ও শ্লিষ্ট কল্পনার আলঙ্কারিক-প্রাধান্য দেখিতে পাই। রূপ-বর্ণনার ত কথাই নাই—অভিসার, বিহার ইত্যাদি বর্ণনাতেও আলঙ্কারিক-চাতুর্য্যের প্রসাধন অত্যন্ত বেশী। অভিসারের আয়োজন ও অভিযানের বর্ণনা একেবারে conventional, ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই বক্রোক্তি ও শ্লেষের আতিশয্য। তৃণাদপি সুনীচ কামিনী-কাঞ্চন-বিরাগী দীনদাসের দল অলঙ্কারের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই কেন? ইহার একটা উত্তর আছে। ভক্ত কবিরা শাব্দিক কলাচাতুর্য্য-সৃষ্টিকেও উপাসনা বা সাধনার অঙ্গীভূত মনে করিতেন।

গায়ক ভক্ত যেমন গানের দ্বারা নটী, উপাসিকা বা দেবদাসীরা যেমন নৃত্যের দ্বারা শিল্পী, ভক্ত যেমন অঙ্গরাগ ও ভক্তি রচনার দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তেমনি ভাষা-ছন্দের মণ্ডন-শিল্পের দ্বারা তাঁহাদের উপাস্যের উপাসনা করিতেন। যাহার যাহা সম্বল, ভগবানের উদ্দেশে তাহার সমর্পণই উপাসনা। দেবতার শৃঙ্গার-বেশ রচনা যেমন পরিচর্য্যা ও উপাসনার অঙ্গ, আলঙ্কারিক-চাতুর্য্য সৃষ্টিও তেমনি সাধনারই অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। যাঁহার এইরূপ আলঙ্কারিক-চাতুর্য্যসৃষ্টির শক্তি আছে—তিনি যদি তাহা রাধাশ্যামের সেবায় সমর্পণ না করেন—তাহা হইলে সেবাপরাধ হইবে —ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের ধারণা ছিল।

যেখানে বিহার ও সম্ভোগ-লীলার বর্ণনা করিতে হইয়াছে, সেখানে তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইয়াছে। সর্বজনোচ্ছিষ্ট অনলঙ্কৃত ভাষায় সে বর্ণনা দিলে অনধিকারী প্রাকৃত জনের পক্ষে সহজে অধিগম্য হইয়া উঠিবে। তাই তাঁহারা সম্ভোগ বর্ণনার পদগুলির ভাষাকে অতিরিক্তরূপ অলঙ্কৃত, পুষ্পিত, বক্রোক্তিময় ও বিদগ্ধজনের অধিগম্য করিয়া রাখিয়াছেন। অলঙ্কারের আবরণে ও আভরণে তাঁহারা অশ্লীলতার দোষ খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে পদকর্ত্তারা নিজেদেরও ব্রজলীলার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। ইঁহারা গোষ্ঠ-সঙ্গীতে নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং মধুর-রসের পদাবলীতে নিজেদের সখীস্থানীয় মনে করিতেন। ভণিতায় ইঁহারা সখীভাবে শ্রীরাধাকে উপদেশ, আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়াছেন এবং কোথাও কোথাও অগেয়ানী বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন, রাধার প্রতি অবিচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণকেও টিট্‌কারি দিয়াছেন। ইঁহারা জানিতেন—'গোকুলকুলজয়ন্তীনাং পরুষা বাগপি যথা প্রমোদয়তি। স্তুতিরপি মহামুনীনাং মধুরপদা মাং সখে ন তথা।' এ সব ভক্তিরসের অতি উচ্চ স্তরের কথা। বিশাখা বৃন্দা ইত্যাদি সখীরা রাধা-শ্যামের প্রেমলীলার দৌত্য, সহায়তা, পরিচর্য্যা ইত্যাদির মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া যে লীলা-রস উপভোগ করিয়াছেন, ইঁহারাও সেই লীলারসেরই আস্বাদ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সখীর সহায়তা এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা।
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণসমর্পণম্।
নর্ম্মাশ্বাসনতঃ পথ্যং হৃদয়োদ্‌ঘাটপাটবম্।
ছিদ্রসংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা॥
শিক্ষাসংগমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা।
নায়িকা প্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ।

কবিরাজ গোস্বামী লীলাসহচরী সখীর গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।
সবে এই সখীগণের ইহা অধিকার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।
সখী বিনা এ লীলার নাহি অন্য গতি।
সখী ভাবে তাহা যেই করে অনুগতি।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।
সখীর স্বভাব এই অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন।
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়।

পদকর্ত্তারা এই সখীর ভাবে বিভাবিত হইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী সখীর মহিমা-কীর্ত্তনচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, পদকর্ত্তাদের সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথাই বলা চলে।

পদাবলী-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে মাধুর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-ভাব কোথাও মিশ্রিত করা হয় নাই। তাহা করিলে বৈষ্ণব-রসতত্ত্বজ্ঞদের মতে রসাভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যভাব আরোপ করিলে যে রসের সৃষ্টি হয়, তাহা দেবাদিরতি শ্রেণীর সাধারণ ভক্তিভাব—তাহা নিম্নস্তরের বস্তু। মধুর ভাবের ত কথাই নাই—সখ্য-বাৎসল্যভাবও উচ্চতর রসবস্তু। সখ্যবাৎসল্য রসের সহিতও ভক্তিভাব মিশ্রিত করা হয় নাই। সে জন্য পদাবলীকে অনেকে মিষ্টিক কবিতা বলেন না। পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করা হয় নাই এবং রাগ-রসকে ঐশ্বর্য্য-শিথিল করা হয় নাই বলিয়া সাহিত্যের দিক হইতে যথেষ্ট লাভই হইয়াছে। অভিসার, মান, অভিমান, প্রণয়, কলহ ইত্যাদির সহিত নায়িকা-জীবনের বৈচিত্র্য মিলিত হইয়া রাধাশ্যামের প্রেমলীলাকে অপূর্ব্ব সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাব নিগূহিত হইলেও এইগুলির মিষ্টিক সার্থকতাও আছে। অবশ্য এ মিস্‌টিসিজম অন্তর্নিহিত নয়—আরোপিত। বৈষ্ণব পরাতত্ত্ব, সাধকতা ও সাত্ত্বিকতার আবেষ্টনী, শ্রীচৈতন্যদেবের মহাভাবাবিষ্ট লীলা-বৈচিত্র্য, পদকর্ত্তাদের শুদ্ধসত্ত্ব ভাগবত-জীবন হইতে সংক্রামিত। পদাবলীকে যদি আধ্যাত্মিক বা নিমিষ্টিক কবিতা বলিয়া ধরা না-ই হয়—ইহাকে সাধারণ আদিরসের কবিতাও বলা যায় না। তামিল আলোয়ারদের রস-কবিতা ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষার যত আদিরসের কবিতা আছে, তাহাদের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই এ পার্থক্য উপলব্ধ হইবে।

ইহা শুধু নরনারীর অনুরাগ, সম্ভোগ, মিলন, বিপ্রলম্ভ ও অন্যান্য লীলাবিলাসের অভিব্যক্তি নয়। ইহার মধ্যে যে আত্মসত্তাবিলোপ, সর্ব্বস্ববিসর্জ্জন, সর্ব্বসংস্কার-মুক্তি, সর্ব্ববন্ধচ্ছেদ, দ্বৈতভাবের বিলোপ, সর্ব্ববাধাবিঘ্নজয়, বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা ইত্যাদির ভাব আছে—তাহা সাধারণ আদিরসের রচনা হইতে ইহাকে অনেক ঊর্দ্ধে তুলিয়া ইহার উপাদান উপকরণগুলিকেও একটা লোকোত্তরতার মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রাকৃত প্রেমের সকল বিভাব, অনুভাব ও সকল লীলা-বৈচিত্র্যের কথা আছে—কিন্তু সব যেন অপ্রাকৃত বর্ণে অতিরঞ্জিত। সাধারণ রাগ-রসের কবিতায় যে অনৌচিত্যের জন্য রসাভাস হয়—মহারাগ রসের পদাবলীতে তাহা হয় না। যে স্বপতিনিষ্ঠতার অভাব সাধারণ আদিরসের কবিতায় রসাভাস ঘটায়—তাহাই পদাবলীতে রসের পরিপোষক—'অলৌকিকসিদ্ধের্ভূষণমেব ন তু দূষণমিতি'—যেখানে সবই অপ্রাকৃত, সেখানে প্রেমের অভিব্যক্তিতে কোথাও কবিদের বিধিনিষেধ মানিতে হয় নাই।

প্রেমলীলা-বৈচিত্র্যে পদাবলীর কবি যেরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন—সংস্কৃত কবিগণ তাহা পান নাই।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কবিতায় প্রণয়ের প্রকৃত ভাব আমরা যতই লক্ষ্য করি না কেন—শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরতা আমরা যতই ভুলিয়া যাই না কেন—লীলাক্ষেত্রটা যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন,—বিদিশা বা অবন্তীর পুষ্পবাটিকা নয়, গোপীগণ যে সাধারণ গোয়ালিনী মাত্র নয়—মায়াকল্পিত বিগ্রহ, বংশীধ্বনিটা যে সাধারণ বাথানিয়া বাঁশীর তান মাত্র নয়, এ কথা ভুলিবার উপায় নাই।

যে ভাবস্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্যে এই বৃন্দাবনী-লীলা—তাহার মধ্যে চিরন্তন মানব-হৃদয় ছাড়া বাস্তব কিছু নাই—রক্ত-মাংসের একটা মানুষ নাই—সবই মায়া-বিগ্রহ। যে স্বপ্নলোকে সকল তরুই কল্পতরু, সকল মৃগই স্বর্ণ-মৃগ, সকল পুষ্পই পারিজাত, সকল ধেনুই সুরভি. এ যেন সেই স্বপ্নলোক; বৈষ্ণবকবিগণ সেই স্বপ্নলোকের স্বপ্ন-মাধুরীর গান গাহিয়াছেন—স্বপ্নাবেশই তাঁহাদের কবিধর্ম্ম। এই স্বপ্ন যাহাতে আঘাত পায়, তাহাই রসাভাস; তাঁহারা সেই রসাভাস এড়াইয়া গিয়াছেন। সুদর্শনচক্রের আঘাতে যাহাতে এই স্বপ্নপুরী ভাঙ্গিয়া না যায়—সে দিকে তাঁহাদের অবহিত দৃষ্টি ছিল।

এই স্বপ্নলোকের আবেষ্টনী পদাবলী-সাহিত্যকে এক ভাবে লোকোত্তরবিচ্ছিত্তি দান করিয়াছে। অন্য ভাবে বৈষ্ণব ঐতিহ্যধারী বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব সমাজ, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনমুকুরে মহাভাবের ছায়াপাত, পদকর্ত্তাদের সাধকজীবন, ভাগবতের অনুবৃত্তি সমস্ত মিলিয়া বৈষ্ণবপদাবলীকে লোকোত্তর করিয়া তুলিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্য প্রধানতঃ মধুররসের রচনা, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া একটা অলৌকিক কারুণ্য-ধারা প্রবাহিত। এই কারুণ্য এই শোক-দুঃখ-সঙ্কুল সংসারের প্রাকৃত কারুণ্য নয়। যে ধামকে অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচিত, তাহা ত আনন্দধাম, সেখানে প্রাকৃত বেদনার স্থান নাই। সে ধামে "নাগুস্তাপঃ কুসুম-শরজারিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ, নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ।" এ কারুণ্য কি তবে মিলন-বাধার কারুণ্য? তাহা ত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলিয়া ডাকিতে যে শ্রীদামের চোখে জল আসে, গোপালের গায়ে হাত দিতে যশোদা যে কাঁদিয়া ফেলেন, ইহা কোন্ কারুণ্য? বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজগোপীরা কোন্ অজ্ঞেয় রহস্যময় বেদনায় উন্মনা হইয়া উঠে? ইহা কোন্ বেদনা? যে কারুণ্যে রাধা-শ্যাম দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে;···নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মাগি ···সে কারুণ্য কিসের? ভাবসম্মিলনের উল্লাস ও গভীর কারুণ্যেরই ছলনাময় রূপ।

'চীর চন্দন উরে হার না দেলা। সো অব গিরি নদী আঁতর ভেলা' যাহার সঙ্গে ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে বলিয়া বুকে বসন, চন্দন, হার পর্য্যন্ত রাখি নাই, আজ তাহার সঙ্গে গিরি-নদীর ব্যবধান হইয়া গেল। এই যে হাহাকার, এ কি যমুনার এপার ওপারের দূরত্বের জন্য? জনম অবধি রূপ দেখিয়াও নয়ন যে তৃপ্তি লাভ করে না। লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়াও যে হৃদয় জুড়ায় না, এ কি সেই অতৃপ্তির বাণী নয়? সে প্রেমসম্ভোগে তৃপ্তি পায় না, বিরহেও দীপ্তি হারায় না, এ কি সেই প্রেমের কথা নয়? মানব-জীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, অসীমতা, অসহায়তা, অস্বস্তি ও অশক্তির বেদনার সুরই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে আমরা শুনিতে পাই। মানবাত্মার এই Tragedyই পদাবলীর মাথুর। হৃদয়ে যে কোন বৃত্তি গভীর, গাঢ় ও অন্তর্গূঢ় হইলেই আমরা পূর্ণের সান্নিধ্যলাভ করি, তখনই আমরা নিজেদের অপূর্ণতাও উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধি যে কারুণ্যের সৃষ্টি করে, তাহা প্রাকৃত কারুণ্য নয়!

পদাবলীর মধুর রস এক হিসাবে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের শান্তরসের সহোদর। পদাবলী-সাহিত্যে যে বংশীধ্বনির আকর্ষণীর কথা বার বার আছে—তাহা ব্রহ্মাণ্ড ভুলাইয়া দিতেছে—নিজের দেহ ও জীবনকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত করাইতেছে! যে প্রেমের গভীরতা পদাবলী-সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন, তাহা কুল শীল মান লজ্জা ভয় গৃহসংসার প্রিয়পরিজন সুখদুঃখ সমস্তকেই তুচ্ছ অসার ও অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলে। সে প্রেমে কোন বাস্তবস্তুর প্রতি কোন সমতা থাকে না—কোন সংস্কারের বন্ধন থাকে না। ইহাই ত বৈরাগ্য। রাধা ত ভোগিনী নয়—রাধা যোগিনী। রাধা বার বার যোগিনী হইবার সংকল্প জানাইয়াছেন, কিন্তু তিনি ত রূপানুরাগা হইতেই যোগিনী। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "মহাযোগিনীর পারা।" পদাবলী-সাহিত্যে বাচ্যার্থে যাহা শৃঙ্গার-রস, লক্ষ্যার্থে তাহাই করুণরস আর ব্যঙ্গার্থে তাহাই শান্তরসের উদ্দীপন করিতেছে! এই রসের ব্যঞ্জনা রাধার সর্ব্বস্ব সমর্পণ ও আত্মবিস্মরণে আছে বলিয়াই পদাবলী-সাহিত্য ধর্ম্ম-সাহিত্য। সে জন্য বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী সাধক কবিদের জীবনের সহিত ইহার সংযোগ ও সামঞ্জস্য ঘটিতে পারিয়াছে এবং শ্রীচৈতন্য-দেবের সাধক-জীবনে ইহা আশ্রয় লাভ করিয়া নূতন রূপ, নবকলেবর ও অভিনব প্রেরণা ও সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিদের রূপানুরূপ প্রাকৃত প্রেমের রূপানুরাগের অনেক ঊর্দ্ধে। যে রূপ দেখিয়া রাধা মুগ্ধ। সে রূপ কামনার দেহকেই আশ্রয় করিয়া থাকে নাই—তাহা দেহকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রূপ আকাশে মেঘমালায়, বনের তমালশ্রীতে, যমুনার জলোচ্ছ্বাসে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠের চিক্কণতায় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে। এই Pantheistic conception বহু কবিতাতেই দেখা যায়। রাধা বলেন—"দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।" এই রূপদর্শনের অনুরাগ প্রাকৃত অনুরাগের মত নয়। এই অনুরাগের যে বেদনা তাহা সাধারণ প্রেমার্ত্তি মাত্র নয়। প্রেমার্ত্তির বর্ণনা আমরা সংস্কৃত কাব্যে-নাট্যে যথেষ্টই পড়িয়াছি। ইহার সঙ্গে তাহার মিল হয় না। কালিদাস এ প্রেমার্ত্তির কবি নহেন। চণ্ডীদাসই ইহার যথার্থ কবি। চণ্ডীদাস এ বেদনাকে যে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাও অভিনব। এই যে অনুরাগ—এ অনুরাগ একের প্রতি অনুরাগ কিন্তু সমগ্র জগতের প্রতি—নিজের দেহ—এমন কি, নিজের জীবনের প্রতিও বিরাগ! এ অনুরাগ রাধাকে যোগিনী মহা-বৈরাগিণী করিয়াছে।

এই অনুরাগের বেদনা অনির্বচনীয়। ইহা বেদনা বটে, কিন্তু ইহাতে মন ত জ্বলিয়া পুড়িয়া যায় না—কোন অনাস্বাদিত আনন্দের আভাসে মনে শিহরণ জাগে। এ যেন—'বিষামৃতে একত্র মিলন'—তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। 'চরণ তপত কুশারি'।

সখীর সহিতে জলেরে যাইতে সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝলমল তাহে কি পরাণ রয়।

কিন্তু কিছুই বলা হইল না—কারণ, সে কথা কহিবার নয়। সাহিত্য হিসাবে বৈষ্ণব-পদাবলী যে অপূর্ব্ব সে বিষয়ে অবৈষ্ণব ও আধুনিক

শিক্ষিত লোকদেরও কোন সংশয় নাই। যাঁহারা এ সাহিত্য পড়িবেন, তাঁহাদের অন্ততঃ বিলাস-কলার কুতূহল ইহাতে চরিতার্থ হইবে। পড়িতে পড়িতে একটা প্রশ্ন মনে জাগিবে, যাঁহারা এই সকল রসলীলায় পদ রচনা করিয়াছেন—তাঁহারা কেহই ভোগী গৃহস্থ ছিলেন না। তাঁহাদের অনেকেই বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী সাধক পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের সহিত এই রস-সাহিত্যের মিল কোথায়? পাঠক পড়িতে পড়িতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইবেন—ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধের বিস্তার হয়, অনুশীলনের ফলে সেইরূপ ঐগুলির লোকোত্তর সার্থকতা স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন; কোন কবিতারই রসবোধের ক্রিয়া এক দিনেই পরিসমাপ্ত হয় না। একই কবিতা কাল, যুগধর্ম্ম, জীবনের গতি-প্রকৃতি ও মনের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব অর্থের দ্যোতনা করে। জীবনের দশা, প্রকৃতি ও গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে নূতন নূতন সার্থকতার আবিষ্কার করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

নানা জনে লবে তার নানা অর্থ টানি। তোমা পানে যায় তার শেষ অর্থখানি। বৈষ্ণব কবিতার শেষ অর্থখানিও এক দিন আবিষ্কৃত হয় সকল পাঠকেরই জীবনে। যদি রসবোধের আদর্শের পরিবর্ত্তনের ফলে বা জীবনের দশা-বিপর্য্যয়ে তাহা না ঘটে, জীবনের অপরাহ্নে যখন মানুষ স্বতঃই নূতন দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখিতে থাকে, জীবন ও ভুবন দুই-ই যখন স্বতঃই গেরুয়া রঙে রঞ্জিত হইয়া যায়—তখন তদুপযোগী সার্থকতা আপনিই আবিষ্কৃত হয়। এ জন্য ভাগবত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না—এ জন্য রূপ-সনাতন জীব গোস্বামীর বৈষ্ণবতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন হয় না বা বৈষ্ণব মঠ-মন্দিরের আবেষ্টনীর প্রয়োজন হয় না। এই অর্থের আধা দেয় ঐ পদাবলী—আধা দেয় ঘাতপ্রতিঘাতে সুপরিণত পাঠকের মন।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বৈষ্ণব কবিতার উপরে একটি কবিতা লেখেন—তাহার প্রথম পংক্তি "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?" এই কবিতায় তিনি বৈষ্ণব কবিতার প্রচলিত আধ্যাত্মিক সার্থকতা স্বীকার করিয়া লইয়াই বলিয়াছিলেন—এ কি শুধু দেবতার?

প্রশ্নচ্ছলে তিনি আধ্যাত্মিকতাকে বৈষ্ণব কবিতার মুখ্য উপজীব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াই বলিয়াছিলেন—প্রাকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হিসাবে ইহার গৌণ সার্থকতা আছে। ঐ কবিতায় তিনি আধ্যাত্মিকতার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন—কোন আধ্যাত্মিক অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। সে অর্থের ইঙ্গিত যে একেবারে নাই, তাহা নয়!

এ গীত-উৎসব মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কোন একটি রচনায় অভিসারকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর একটি আধ্যাত্মিক অর্থ কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে বোধগম্য হইবে।

তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নব নব পর্য্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে নিত্যপুষ্প নিত্যচন্দ্রালোকে
নিত্যই সে একা, সেই ত একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা, তারই জয়। আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
সেও ত নেই স্থির হ'য়ে যে পরিপূর্ণ
সে যে বাজায় বাঁশী প্রতীক্ষার বাঁশী
সুর তার এগিয়ে চলে—অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলেছে এক তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে—
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। (পুনশ্চ, বিচ্ছেদ)

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।' অল্পে সুখ নাই। এই অল্প কি? যাহা অনিত্য তাহাই অল্প—যাহা নিত্য তাহাই ভূমা। কুলশীল, সমাজ-সংস্কারের বন্ধন, ধনজন গৃহসুখ এ সকলে অত্যাসক্ত হইয়া থাকিলে বেদনার অবধি থাকে না। এক দিন দারুণ আঘাতে সব চূর্ণ হইয়া যায়। এ সমস্তে সুখ নাই। যাহা নিত্য, সত্য ও ধ্রুব তাহাকে আশ্রয় করিলে স্বপ্ন ভঙ্গ হয় না—অক্ষয় দিব্যানন্দ লাভ করা যায়। জীব যখন এই সত্য উপলব্ধি করে, তখন তাহার নিত্যের প্রতি প্রেম জন্মে—অনিত্যের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। সে তখন দুর্ব্বার গতিতে নিত্যের পানে ধাবিত হয়। এই মহিমার কথাই বৈষ্ণব-সাহিত্যে রূপ-মুগ্ধতার ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। শ্যামের পক্ষে যাহা রূপ, নিত্যের পক্ষে তাহাই মহিমা। রাধার পক্ষে যাহা মিলনাগ্রহ—জীবের পক্ষে তাহাই নিত্যানন্দ লাভের জন্য সাধনা। যে পথে জীব নিত্যের অভিমুখে ধাবিত হয়—সে পথে ক্ষুরের ধারের ন্যায় নিশিত দুরত্যয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে অভিসারের পথ তাই অতি দুর্গম, বিঘ্নসঙ্কুল, মন্দির বাহির কঠিন কবাট। চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট।

তঁহি অতি দুরতর বাদর দোল্য। বাধে কি বারই নীল নিচোল।

বিনা সাধনায় এ পথে চলিবার শক্তি ও সাহস পাওয়া যায় না। তাই কবি বলিয়াছেন—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
মাধব, তুয়া অভিসার মাগি
দুস্তর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনি জাগি।

নিত্যের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে এই ভাবে তপস্যা করিতে হয়।

যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ নন্দের বাধা বহন করেন, যে প্রেমে নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে গোরু চরাইতে মাঠে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করেন না, যে প্রেমে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধিয়া শাসন করেন, যে প্রেমে শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িয়া খেলার পরাজয়ের দণ্ডবিধান করেন এবং উচ্ছিষ্ট খাওয়ান, যে প্রেমে ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে চোর, শঠ, লম্পট, শতঘরিয়া, গোপগোভার ইত্যাদি বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না আর শ্রীরাধা যে প্রেমে মানিনী হইয়া পায়ে ধরাইয়া তবে শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্কৃতি দেন, সেই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানবর্জ্জিত প্রেমই বৈষ্ণব কবিদের একমাত্র অবলম্বন। কবিদের রচনার বিষয়বস্তু আর কিছু নাই। কাব্যের দিক হইতে ইহা আত্ম-গোপাত্মক প্রেমের পরাকাষ্ঠা—সাধনার দিক হইতে ইহাই রাগানুগা ভক্তি। পদাবলী-সাহিত্যে এই রাগানুগা ভক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লীলা-বৈচিত্র্য দেখানো হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-সাহিত্যে প্রেমের সেই ভিন্ন ভিন্ন স্তর লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"আমরা যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না—সমস্ত হৃদয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না—তখন সে আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।"

নিত্য, শাশ্বত, পরিপূর্ণ, অনন্ত, অসীম যে নামেই ব্রহ্মকে আমরা অভিহিত করি—তাহার প্রতি প্রেম একটা alshaclion মাত্র, ইহার কোন সার্থকতা নাই। তাহাকে সীমার বন্ধনে উপলব্ধি করিলেই তাহার সার্থকতা। বৈষ্ণব কবিগণ এই ভাবে অসীম অখণ্ডকে প্রেমের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রহ্ম গোপালবেশে আমাদের প্রিয়তম হইয়া উঠিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও অসীম এবং আকাশই, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন।

মানব-মনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই তাহা প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই—প্রেমও নাই। সঙ্গিহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ চায়, প্রেমের জন্য। ব্রজের কৃষ্ণরূপও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়া সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।"

এত অল্প কথায় অল্প পরিসরের মধ্যে পদাবলীর আধ্যাত্মিক অর্থ আর কেহ দিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।

পদাবলী-সাহিত্যকে আধ্যাত্মিক সাহিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলেও সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে তাহার দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের মহাধারাকে পদাবলী-সাহিত্যের ধারা কত দূর পুষ্ট করিয়াছে—তাহাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি—

"শাক্তধর্ম্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্ম্মে এই ভেদকেই নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্য স্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাঙ্গালা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে—যাহা পূর্ব্বাপরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা। উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে বিদূরিত হইল। ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়? ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নয়। প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নয়, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জ্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত-প্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।"

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কাব্যধারাকেই বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান ঝরণা-ধারা বলিয়াছেন—এই ধারার সঙ্গে অন্যান্য ধারা মিশিয়া সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব-কাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎ ভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। কিন্তু নানা দিক হইতে নানা ধারা আসিয়া না জুটিলে নদী হয় না। নানা দিক হইতে নানা ধারা আসিয়া বৈষ্ণব-কবিতার ঝরণাধারায় মিলিত হইয়াছে। তাহার ফলেই আজ বাঙ্গালায় গদ্যে পদ্যে সম্মিলিত সাহিত্য বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় হইতে বিচিত্র ভাবস্রোত বিবিধ জ্ঞানপ্রবাহ অহরহঃ আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত সাহিত্য সম্বন্ধেও বৈষ্ণব-কবিদের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। *

শ্রীকালিদাস রায়।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেঙ্গলি এসোসিয়েসনের বিশিষ্ট অধিবেশনে পঠিত।

প্রিয়া

যে ফুল দলেছ পথে যেতে যেতে সে ফুল কুড়ায়ে মরি
যে কথা কহিয়া বেদনা দিয়েছ বারে বারে তাহা স্মরি!

চোখের জলেতে ব্যথার না হয় শেষ তাই ত বাদল ঝরে
মরীচিকা সম তোমায় খুঁজিয়া মরি বিরহের বালু-চরে!

ফাগুন-বাতাসে মদিরা নাহিকো আজি চাঁদে কোথা রোশ্‌নাই!
রজনীগন্ধা বৃথা তুমি ফুটিয়াছ—প্রিয়া মোর কাছে নাই!

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

কথাশিল্পীর হত্যারহস্য

[উপন্যাস]

একাদশ পল্লব

মামলা মুলতবির পর

পরদিন আদালতে ট্রেন্টন-হত্যার মামলা উঠিলে ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্সিলী সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবি জজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মি লর্ড, আজ এই মামলা আরম্ভ হইবার কথা; কিন্তু আমি জানিতে পারিলাম, যে সকল জুরির নিকট এই মামলার বিচার চলিতেছিল, তাঁহাদের এক জন হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছেন; তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই মামলার বিচার চলিতে পারে না। এ অবস্থায় আমার প্রার্থনা, উক্ত ভদ্রলোক সুস্থ হইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে না পারা পর্য্যন্ত এই মামলা মুলতবি রাখিবার আদেশ হউক।"

জজ আসামী পক্ষের কৌন্সিলী জন গারসাইডকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই মামলা ঐ সময়ের জন্য মুলতবি রাখিতে আপনার কি আপত্তি আছে মিঃ গারসাইড?"

জন গারসাইড বলিলেন, "না মি লর্ড, আমাদের পক্ষে আপত্তির কোন কারণ নাই, বরং ইহা মুলতবি রাখা আমরাও প্রার্থনীয় মনে করি। মি লর্ড, আমি আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, এই মামলার পরিচালনে ইহা অপেক্ষাও সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। মিঃ ডেভিড গারসাইড এই মামলায় আসামী পক্ষের এক জন প্রধান সাক্ষী। আজ প্রথম আদালতেই তাঁহার সাক্ষ্য-দানের কথা ছিল; কিন্তু সহসা তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন!"

জজ তাঁহার চেয়ারের সম্মুখে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! অদৃশ্য হইয়াছেন?"

কৌন্সিলী বলিলেন, "মি লর্ড, প্রকৃত ঘটনা যেরূপ, তাহাতে 'অদৃশ্য' হইয়াছেন বলিলে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে না। আমি সংবাদ পাইয়াছি, মিঃ গারসাইড গত রাত্রিতে এজ অয়ার রোডের সন্নিহিত সিয়ার ষ্ট্রীটে দুই জন গুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইলে তাঁহাকে দ্রুতগামী মোটর-কারে তুলিয়া লইয়া অন্যত্র প্রেরণ করা হয়! আমার এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে যে, তাঁহাকে কোন গুপ্ত আড্ডায় লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। এমন কি, তাঁহার জীবন ইতিমধ্যে বিপন্ন হইয়া থাকিলেও বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।"

জজ তাঁহার সম্মুখস্থ 'ব্লটিং প্যাডের' উপর চশমার এক প্রান্ত ঠুকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এ যে দেখিতেছি গীতিনাট্যের ন্যায় অদ্ভুত ব্যাপার! সে যাহাই হউক, আমি আপনার অনুরোধে এই মামলা মুলতবি রাখিলাম সার এডমণ্ড!—কৌন্সিলী মিঃ গারসাইডের আপত্তি যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই!" গারসাইড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

* * * *

ডেভিড গারসাইডকে গুণ্ডাটা বলিতে লাগিল,—"তোমার যে সকল বন্ধু খবরের কাগজে চাকরী করে, তোমার বিপদের জন্য তাহারাই দায়ী। তাহারা আজ 'অয়ারে' তোমার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা না হইলে তোমার আরও এক দিন জীবিত থাকিবার আশা থাকিত; কিন্তু আর তোমার প্রাণের আশা নাই। তোমার সম্বন্ধে আমি কর্ত্তব্য পালনের আদেশ পাইয়াছি।"

অতঃপর নরহন্তা সাগ্রিনের হাতের রিভলভারে টর্চের আলোক প্রতিফলিত হইল। সে তাহা ডেভিডের বক্ষঃস্থলে উদ্যত করিল। ডেভিডের তখন নড়িবারও শক্তি ছিল না, সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল।

সাগ্রিন তাহার হস্তস্থিত পিস্তলের ঘোড়া স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই একখানি হাত আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাহার মস্তকে এরূপ প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই সাগ্রিনের প্রাণহীন দেহ ডেভিডের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যুকালে তাহার কণ্ঠ-নিঃসৃত অস্ফুট আর্ত্তনাদ শূন্যে বিলীন হইল।

সাগ্রিনের আততায়ী আড়াল হইতে বাহির হইয়া ডেভিডের সম্মুখে দাঁড়াইলে ডেভিড তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া উৎসাহ-ভরে বলিল,—"বেন মরফি! তুমি?"

ডিটেক্টিভ-সার্জ্জেণ্ট মরফি প্রসন্ন মনে বলিল, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিয়াছি ডেভি! আমার এখানে আসিতে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে তোমাকে জীবিত দেখিতে পাইতাম না!"

ডেভিড বলিল, "তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য।"

ডিটেক্টিভ-সার্জ্জেণ্ট মরফি ডেভিডকে যে কথা বলিল, তাহা অদ্ভুত। মেড্‌লি তাহাকে আহ্বান করিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা প্রথমে তাহাকে জানাইয়া অবশেষে বলিতে লাগিল, "কিন্তু আমি ভাবিতে লাগিলাম—কোথায় তোমার সন্ধান মিলিবে? সোহো পল্লীর সর্ব্বস্থান আমি খুঁজিয়া দেখিব—ইহা অসম্ভব বলিয়া আমার মনে হইল। যদি এক মাস সময় পাইতাম, তাহা হইলে হয়ত সেই চেষ্টাই করিতাম। আমি তোমার সংবাদ-সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া কলড়নে দশ মিনিট কাল অতিবাহিত করিলাম। সেখানে গমন করিয়া আমি এই বদমায়েস গুণ্ডাটাকে দেখিতে পাইলাম"—এই কথা বলিয়া সে পদপ্রান্তবর্ত্তী সাগ্রিনের মৃতদেহে পদাঘাত করিল।

"আমি সেখানে উহাকে ধড়িবাজ বদমায়েস 'কাউণ্টের' সহিত আলাপ করিতে দেখি।"

ডেভিড বলিল, "ভাল কথা, তোমার কাছে ছুরি আছে? ছুরি থাকিলে আমার হাতের বাঁধনটা শীঘ্র কাটিয়া দাও।"

ডেভিডের হাতের বাঁধন ছিন্ন হইলে সে মরফিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কিরূপে জানিলে যে সাগ্রিন যাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল —সে সেই বদমায়েস কাউণ্ট?"

মরফি তাহার প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "তুমি কি অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিতে চাও? না, তাহা শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ নাই?"

ডেভিড বলিল, "হাঁ শুনিব। তুমি সব কথা খুলিয়া বল।"

মরফি বলিল, "সেখানে উহাদিগকে গল্প করিতে দেখিয়া আমার মনে হইল, এই গুণ্ডাদলই সিয়ার ষ্ট্রীটে তোমাকে প্রহারে অচেতন

করিয়া, মোটর-গাড়ীতে তুলিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল। তুমি ট্রেনটনের হত্যারহস্য সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা জান—এই সন্দেহে উহারা দলপতির আদেশে তোমাকে কোন স্থানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। তুমি গুণ্ডাগুলার অপকার্য্য সম্বন্ধে 'অয়ারে' যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলে, তাহা পাঠ করিয়া উহারা ঐ কাজ করিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।"

"এখন সময় কত বেন ?"

মরফি বলিল, "আমি যে সময় কলড্রনে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় একটা। কিন্তু তুমি এখন কোথায় পড়িয়া আছ, তাহা কি ধারণা করিতে পারিয়াছ ?"

ডেভিড বলিল, "না, আমার তাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই।"

মরফি বলিল, "তুমি গ্রীক ষ্ট্রীটে ভূগর্ভস্থ একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, কিন্তু এ কথা বোধ হয় তুমি বিশ্বাস করিতে পারিবে না। তোমার ধারণা, তুমি শত শত মাইল দূরে নির্ব্বাসিত হইয়াছ !"

ডেভিড ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না বেন, আমার আর কিছু ধারণা করিবার শক্তি নাই। আমার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।"

মরফি বলিল, "সে যাহাই হউক, আমি আমার কথা সংক্ষেপে শেষ করি ; কারণ, আমার বিশ্বাস, এই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য তুমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছ।—সাগ্রিন ও তাহার মুরুব্বি 'কাউণ্ট' কলড্রন ত্যাগ করিলে আমি গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিলাম। তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে গ্রেটার নিউপোর্ট ষ্ট্রীটে সাগ্রিনের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইল। আমি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থানে গমন করিয়া একটা পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের অবশিষ্ট কথা শুনিতে লাগিলাম।

"তাহাদের পরামর্শের মধ্যে তোমার নাম শুনিতে পাইলাম। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের মতলব বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, তাহারা তোমাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। কিন্তু আমার যাহা জানিবার ছিল, তাহা তাহাদের মুখে শুনিতে পাইলাম না, তাহারা তোমাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছিল। অবশেষে বহু চেষ্টায় আমার আশা পূর্ণ হইয়াছিল, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমি তাহা জানিতে পারি। এই ভাবে তোমার সন্ধান পাইয়া আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

মরফির কথা শেষ হইলে ডেভিড বলিল, "বেন, তোমার এই উপকার আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না। কিন্তু কিরূপে আমি প্রত্যুপকার করিব—তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না !"

* * * *

অসুস্থ জুরি সুস্থ হইয়া যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইলে ট্রেনটন-হত্যার মামলার বিচার আরম্ভ হইল। বিচার-কার্য্য কয়েক দিন মুলতবি থাকিবার পর বিচার আরম্ভ হওয়ায় বিচার দেখিবার জন্য জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা রহিল না। আসামীর প্রতি সকলেরই সহানুভূতি লক্ষিত হইল।

আসামী পক্ষের কৌন্সিলী সংবাদপত্রের লেখক ডেভিড গারসাইডকে সাক্ষীর কাঠরায় উঠিবার জন্য আহ্বান করিলে সকলের দৃষ্টি ডেভিডের দিকে আকৃষ্ট হইল। দর্শকগণের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া ডেভিড গারসাইড সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিল। তাহার মস্তকের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র পটি আঁটা ছিল, তাহা ব্যতীত আঘাতের কোন নিদর্শনই তাহার মস্তকে লক্ষিত হইল না। বিচারক মিঃ স্কার্থডেল তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও তাহার মুখ-ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না।

কৌন্সিলী বলিলেন, "তোমার নাম ডেভিড গারসাইড ?"

"হাঁ, উহাই আমার নাম।"

কৌন্সিলী এবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোয়ানেস নামক এক ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছে ; তুমি পূর্ব্বে কোন দিন কি তাহার সঙ্গে এই মামলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলে ? কোন্ তারিখে কোন্ সময় কোথায় সে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা কি তুমি আদালতে প্রকাশ করিবে ?"

"হাঁ ; গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে সোহো পল্লীর ৫১৬ নং কার্থ ষ্ট্রীটস্থ ভোজনাগারের দ্বিতলস্থ কক্ষে এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হইয়াছিল।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "সাক্ষী সোয়ানেস তোমার সঙ্গে আলোচনা করিবার সময় যে সকল কথা বিবৃত করিয়াছিল, এবং সাক্ষ্যদান কালে যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল কি ?"

"না।"

প্রশ্ন হইল, "আসামীর সহিত তাহার মনিবের কলহের সময় সোয়ানেস কোথায় থাকিয়া তাহাদের কলহ শুনিয়াছিল, তাহা কি সে তোমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল ?"

ডেভিড বলিল, "আমার সহিত আলোচনা কালে সে স্বীকার করিয়াছিল, সে দ্বারের বাহিরে 'গাঁটা দিয়া' তাহাদের ঝগড়া শুনিয়াছিল।" (eavesdropping outside the door.)

আসামীর কৌন্সিলী বলিলেন, "তোমাকে আমার আরও দুই একটি প্রশ্ন আছে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি কোথায় ছিলে ?"

এই প্রশ্নে সকলেই উৎকর্ণ হইয়া সাক্ষীর মুখের দিকে চাহিল।

সাক্ষী বলিল, "উহার অধিকাংশ সময় আমি গ্রীক ষ্ট্রীটের কোন ভূবিবরে আটক ছিলাম। এজ অয়ার রোড-সন্নিহিত সিয়ার ষ্ট্রীটে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাট হইতে গত পরশু সন্ধ্যার পর আমি বাহিরে যাইবার সময় দুই জন লোক পশ্চাৎ হইতে আমাকে আক্রমণ করিয়া মাথায় আঘাত করায় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। জ্ঞানসঞ্চার হইলে বুঝিতে পারি, হাতে-পায়ে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় আমি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে পড়িয়া আছি !"

প্রশ্ন হইল, "সে লোক দুইটি যে সময় তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময় কি তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলে ?"

ডেভিড বলিল, "না, সে সময় তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই ; পরে আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম তাহাদের এক জন গুণ্ডাদলের সর্দ্দার, তাহার নাম সাগ্রিন।"

প্রশ্ন হইল, "এই ব্যক্তি কি তোমাকে খুন করিবার ভয় দেখাইয়াছিল ?"

"সাগ্রিন গত রাত্রে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তখন রাত্রি

কত, তাহা ঠিক বলিতে পারিব না। সে আমাকে রিভলভার দিয়া গুলী করিবার ভয় দেখাইয়াছিল। সে আমাকে হত্যা করিবার জন্য রিভলভার উদ্যত করিবামাত্র তাহাকে নিহত হইতে হইয়াছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট মরফি সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, নতুবা আজ তোমাকে এই সকল কথা বলিতে আমি জীবিত থাকিতাম না।"

আসামী পক্ষের কৌন্সিলী এবার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি হাকিমকে বলিবে কি কারণে তোমাকে ঐ ভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে তোমার নিজের ধারণা কি?"

ডেভিড বলিল, "হাঁ, আমি বলিতে পারি। কিন্তু আমার তাহা বলিবার ইচ্ছা নাই।"

জজ স্বার্থডেল এ কথা শুনিয়া সাক্ষীকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ গারসাইড, তোমার বোধ হয় ধারণা করিবার শক্তি আছে যে, আমি ইচ্ছা করিলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমাকে বাধ্য করিতে পারি?"

"হাঁ মাই লর্ড, আমার তাহা জানা আছে; কিন্তু আমি সসম্মানে বলিতে চাই যে, আমার এই সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হইবে না।"

জজ বলিলেন, "আর যদি আমি তোমাকে আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের অভিযোগে কারাগারে প্রেরণ করি?"

"হাঁ মাই লর্ড, আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের অভিযোগে আপনি আমাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেও আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না।"

যে অভিযুক্তা তরুণী সাক্ষীর কাঠরা হইতে আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়াছিল, সকলের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু ডেভিডের কথা শুনিয়া সকলেই সাগ্রহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সে দর্শকগণের মনে নূতন কৌতূহলের সৃষ্টি করিল।

জজ সাক্ষীকে নীরস স্বরে বলিলেন, "তুমি নামিয়া যাও, কিন্তু আমার আদেশ ব্যতীত আদালত ত্যাগ করিবে না।"

ডেভিড যখন সাক্ষীর কাঠরা ত্যাগ করে, তখন তাহার মুখে বিদ্রূপ-হাস্য লক্ষিত হইল।

অতঃপর দুইটি মহিলা সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া আসামীর অনুকূলে সাক্ষ্য দিলেন। তাঁহারা উভয়েই রূপবতী তরুণী এবং কিছু দিন ঔপন্যাসিক ট্রেন্টনের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিলেন যে, ট্রেন্টন অসৎ অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করায় তাঁহারা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সেই 'বিখ্যাত' ঔপন্যাসিকের চাকরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ট্রেন্টন নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করিতে জানিতেন না। তিনি মাতাল ও লম্পট ছিলেন।

জন গারসাইড এবার উঠিয়া বলিলেন, "আমার আর কিছুই বলিবার নাই—মাই লর্ড!"

দ্বাদশ পল্লব

জুরি সমক্ষে বিচারকের বিবৃতি

উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা শেষ হইলে বিচারক মিঃ স্বার্থডেল জুরিদিগকে মামলা বুঝাইতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "এই মামলার ঘটনা-পরম্পরায় বিন্দুমাত্র জটিলতা নাই, সুতরাং তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এক ব্যক্তি তাঁহার অবলম্বিত বৃত্তিতে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এক দিন হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে ডাক্তার তাঁহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে—এই অভিমত প্রকাশ করেন। আসামীর কাঠরায় সংস্থাপিত তরুণীকে তাঁহার হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে—এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনাই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে।"

এই সকল কথা বলিয়া বিচারক তাঁহার সম্মুখে সংরক্ষিত নথিপত্র দেখিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ করিবার সময় আমাদিগকে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। ফরিয়াদী পক্ষের ও আসামী পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দীতে এতই পার্থক্য লক্ষিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সাক্ষীর উক্তি আপনাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচনার পর গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীরা তাহাদের সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে—এই যুবতীই প্রকৃত অপরাধী; অন্য দিকে আসামীর সুবিজ্ঞ কৌন্সিলী তাঁহার মক্কেলের অনুকূলে ফরিয়াদী পক্ষের প্রত্যেক যুক্তি যথেষ্ট দক্ষতা সহকারে খণ্ডন করিয়াছেন। আপনারা যখন আপনাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একযোগে পরামর্শ করিবেন, সেই সময় সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনাদিগকে কিরূপ গুরু দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

"এখন কথা এই যে, হত্যাপরাধে অভিযুক্তা এই দুর্ভাগিনী তরুণী যদি মৃত ঔপন্যাসিকের জঘন্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুরোধে নানা ভাবে নিগ্রহ সহ্য করিতে বাধ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহার চাকরীতে লিপ্ত থাকা তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন। বর্ত্তমান কালে অধিক বেতনের উৎকৃষ্ট চাকরী সংগ্রহ করা যে অত্যন্ত কঠিন, ইহা আপনাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, কোন সচ্চরিত্রা তরুণী ঐ প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থায় নিপতিত হইয়াও চাকরীর অনুরোধে ঐরূপ দুশ্চরিত্র মনিবের বাসগৃহে গমন করিত; তদ্ভিন্ন এ কথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, উক্ত দুর্ঘটনার রাত্রিতে আসামী অপমানের ভয়ে তাহার মনিবের বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার পর অধিকতর অপমান ও বিড়ম্বনা সহ্য করিবার আশঙ্কা সত্ত্বেও সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। ইহা কত দূর সম্ভব তাহাও আপনাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

"এইবার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। কি কারণে এই নিষ্ঠুর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? আততায়ীর উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? সাক্ষী সোয়ানেসের জবানবন্দী নিশ্চিতই আপনাদের স্মরণ আছে। আসামী পক্ষ হইতে তাহার সাক্ষ্যের তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। তাহার সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হয় যে, মিঃ ট্রেন্টন কয়েক দিনের জন্য প্যারিস গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় এই তরুণী আসামীর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। যদি আমরা মুহূর্ত্তের জন্য স্বীকার করি, সোয়ানেসের সাক্ষ্যে বিন্দুমাত্র সত্য থাকিতেও পারে—তাহা হইলে আমরা যে সকল ঘটনার বিবরণ জানিতে পারিয়াছি—তাহাদের সহিত উহার কোন সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

"এই প্রসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। সেই বিষয়টি অভিযুক্তা যুবতীর বংশ-পরিচয়। আসামীর পিতা নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তারের আশঙ্কা সত্ত্বেও সম্ভবতঃ সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীকার করিয়াছিল যে, সে বহু বৎসর হইতে নানা অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত ছিল। জুরিগণ, আপনাদিগকে ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য যে, যে অপরাধ-প্রবণতা সেই ব্যক্তির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাহার দুর্ভাগিনী কন্যা—এই আসামী উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহা লাভ করিয়াছিল, এরূপ ধারণা করা কি অযৌক্তিক বা অসঙ্গত ?"

বিচারকের এই পক্ষপাতমূলক অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য শ্রবণ করিয়া আসামীর কৌন্সিলী জন গারসাইড বিরক্তি দমন করিতে পারিলেন না; তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "মাই লর্ড, আপনি এই মাত্র যে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, অত্যন্ত আপত্তিজনক বলিয়া আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।"

মিঃ গারসাইডের এই প্রতিবাদে দর্শকগণের গ্যালারী হইতে বহু কণ্ঠনিঃসৃত হর্ষধ্বনিতে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। দর্শকগণের এই ব্যবহারে বিচারক মিঃ স্বার্থডেল এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইল, এবং তাঁহার আত্মসংযমের শক্তি বিলুপ্ত হইল; কিন্তু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংযম করিয়া কোন কথা বলিবার জন্য মুখ তুলিয়া মিঃ গারসাইডের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভ্রূভঙ্গিতে মিঃ গারসাইড বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বা তাঁহার দাবী ত্যাগ করিলেন না।

মিঃ স্বার্থডেল নীরস স্বরে বলিলেন, "মিঃ গারসাইড, আপনি আসামীর অনুকূলে যে ভাবে মামলা পরিচালিত করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন কৌন্সিলী বিচারক কর্ত্তৃক জুরিদিগকে মামলা বুঝাইয়া দেওয়ার সময় তাঁহার উক্তিতে বাধাদান করিয়া অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারে, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। আপনি এখন উপবেশন করুন মহাশয়!"

মিঃ গারসাইড বলিলেন, "আপনার আদেশ পালন করিতেছি বটে, কিন্তু আমার আপত্তি আমি পরিহার করিলাম না।"

মিঃ স্বার্থডেল কৌন্সিলীর এই উক্তিতে এরূপ বিচলিত হইলেন যে, মনস্থির করিতে তাঁহার সময় লাগিল। তিনি মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে ইহাই বলিতে পারি যে, পিটার ট্রেনটনের উক্তিতে তাঁহার হত্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য আসামীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার প্যারিস গমনেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি সত্যই প্যারিসে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কি উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

"আসামী যখন তাহার মনিবের সহিত কলহে লিপ্ত ছিল, সেই সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসামী একখানি পত্র পাইয়াছিল, এই সংবাদ আমাদের সুবিদিত। আসামীর পিতাই সেই পত্র লিখিয়াছিল—ইহা পরে জানিতে পারা গিয়াছে। মিস্ ডেন মিঃ ট্রেনটনের মনে ঈর্ষা উৎপাদনের জন্য সেই পত্র তাঁহাকে দেখাইয়াছিল, এরূপ ধারণার কোন কারণ নাই! আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, আসামী বলিয়াছিল, মিঃ ট্রেনটন অত্যন্ত অভদ্র ভাবে পত্রখানি তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া পাঠ করিয়াছিলেন এবং তিনি এই সংবাদ তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাই যে, এই মামলায় আসামীপক্ষ কর্ত্তৃক এতই অধিক পরিমাণে নাট্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে যে, ঘটনাসমূহের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন বলিয়াই মনে হয়। আসামী তাহার মনিব পিটার ট্রেনটনের প্রসঙ্গে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছে তাহা কত দূর সত্য—নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

"যাহা হউক, আমার আর অধিক কিছুই বলিবার নাই। উপসংহারে আমার ইহাই বক্তব্য-যে, আপনাদের বিবেচনায় আসামী নিরপরাধ হইলে আপনাদের তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রমাণগুলি যদি অকাট্য ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া আপনাদের ধারণা হয়, এবং আসামীই তাহার মনিবকে হত্যা করিয়াছে, এই বিশ্বাস যদি আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে আসামীই প্রকৃত অপরাধী—এই অভিমত প্রকাশ করাই আপনাদের উচিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপারের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। পিটার ট্রেনটন অন্য কোন ভাবে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলে আসামী পক্ষ সে সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করে নাই। আসামীর কৌন্সিলী আপনাদের নিকট কেবল ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার মক্কেল এই তরুণী নিরপরাধ, সে নরহত্যা করে নাই; কিন্তু আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ দিতে চাহি যে, উহা প্রতিপন্ন করা আসামী পক্ষের অবশ্য-প্রয়োজনীয়।"

বিচারক অতঃপর ঘড়ির দিকে চাহিয়া জুরিদের জানাইলেন—পরদিন তিনি তাঁহার অবশিষ্ট বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিবেন।

বিচারক এজলাস হইতে উঠিয়া পড়িলে আদালতের কার্য্য বন্ধ হইল

[ক্রমশঃ

দীনেন্দ্রকুমার রায়

অন্নহীনের অন্নপূর্ণা-আবাহন

এবার আশ্বিনে অন্নহীনের আর্ত্তনাদে যখন মেদিনী পূর্ণ, তখন অম্বিকা অন্নপূর্ণার শুভাগমন ঘটিতেছে। জগৎ-জোড়া যুদ্ধের অভিঘাতে, নৃশংস হত্যা ও নিষ্ঠুর ধ্বংসের প্রকোপে, প্রভুত ধন-জন-নাশের ফলে, মানবের সুখ-শান্তি তিরোধানের সঙ্গে, অন্ন-বস্ত্রের নিদারুণ অভাব-অনটন এবং ক্ষয়িষ্ণু স্বল্প-পরিমিত আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের অপরিসীম দুর্ম্মূল্যতা হেতু যেমন ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোণার বাঙ্গালায়, তেমনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী বিশাল ভারতের এবং ততোধিক বিশাল-বিস্তৃত নিখিল জগতের প্রায় সর্ব্বত্র দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার নিরবচ্ছিন্ন নিপীড়ন ঘটিতেছে। জগজ্জননীর শুভাগমন এবার নৌকায় এবং শুভযাত্রা দোলায়; সুতরাং আগমনে পৃথিবী জলপ্লুতা হইবে এবং গমনে মড়ক! বর্ত্তমান বর্ষে শনি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী। রাজ্যাধিপতির ফল :—

শনৈশ্চরে ভূমিপতৌ সকুজ্জলং প্রভূতরোগৈঃ পরিপীড্যতে জনঃ।
যুদ্ধং নৃপাণাং গদতস্করাগ্নৈর্ভ্রমন্তি লোকাঃ ক্ষুধিতাশ্চ দেশান্‌॥

মন্ত্রীর প্রভাবে—

বিগ্রহোপহতা লোকা ভবেদন্যোঽন্যদুর্জ্জয়ঃ।
কুতর্কানুগতা ভূপা যত্র মন্ত্রী ধরাত্মজঃ॥

ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের আকাশে শনি, মঙ্গল, প্রজাপতির প্রভাব এবং বৃহস্পতি শনি মহাসংযোগের (ইং ১৯৪১) সহিত পশ্চিমাকাশস্থ রাহুগ্রস্ত রবি-চন্দ্রের রেখা পুষ্যানক্ষত্র হইতে মঘানক্ষত্রাবধি প্রায় লম্বাংশে থাকায় ভারতে ও বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, শস্যহানি, চোর-দস্যুভয়, আতঙ্ক, প্রাকৃতিক উৎপাত, শত্রুভয় এবং ব্যাপক ভাবে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিবে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, কাশ্মীর, সুরাট, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, সিন্ধু ও নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী দেশসমূহের অবস্থা শুভ নহে। বঙ্গোপসাগরে ও সমুদ্রের উপকূলভাগে প্রবল ঝটিকা দুর্য্যোগকারক হইতে পারে। ভূকম্পনেরও সম্ভাবনা আছে। কৃষির অবস্থা অনুকূল নহে। কৃষির উপযোগী সুনিয়মিত বৃষ্টির অভাব, প্রবল ঝটিকা এবং অতিবৃষ্টি হেতু বন্যায় দেশের ও শস্যের ক্ষতি অনিবার্য্য। জলবায়ু ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। তাই বোধ হয়, ভগবতী অন্নপূর্ণা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার তিন দিনও থাকিবেন না। তৃতীয় দিনেই নবমী ও দশমীর পূজা গ্রহণ করিয়া কৈলাসে প্রত্যাগমন করিবেন।

বর্ষশেষে চৈত্র মাসে বাসন্তীরূপে দেবীর শুভাগমন হইবে দোলায় —ফল মড়ক। দেবী তখন পূর্ণ তিন দিন অবস্থান করিয়া প্রস্থান করিবেন গজে; ফল —"গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।" আশার কথা। আশাই মানুষের জীবন। আমাদের মধ্যে যাহারা তত দিন বাঁচিবে, তাহারা আশায় বুক বাঁধিয়া থাকিবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ আমাদের মুখ্য বিচার্য্য নহে। বর্ত্তমানকে লইয়াই আমাদের কাজ-কারবার। এই নিমিত্ত আমরা বর্ত্তমান দেশব্যাপী অন্ন-বস্ত্রের অভাব-অনটনের হেতু ও প্রতিকারের উপায় আলোচনা করিব। দৈব প্রতিকূল, পুরুষকারের দ্বারা তাহাকে যতটুকু প্রশমিত করিতে পারা যায়, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের অবশ্য প্রতিপাল্য। কিন্তু পুরুষকারহীন দৈবের ন্যায় দৈবহীন পুরুষকারও নিষ্ফল।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং সেই জন্য শতকরা ৮৯ জন লোক গ্রামে এবং মাত্র ১১ জন সহরে বাস করে। এই নিমিত্ত এত বড় দেশ হইলেও ভারতে সহরের সংখ্যা কম। এক লক্ষ বা অধিক লোক বাস করে এরূপ সহর ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৩৮টি আছে। কৃষিপ্রধান ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে রপ্তানী-পণ্যের অধিকাংশই কৃষিজ দ্রব্য,—চাউল, গম, তৈলবীজ, চা, কফি, মশলা, তামাক, তূলা, পাট, শণ প্রভৃতি। এক সময় ভারত খাদ্য-শস্যের আত্ম-প্রাচুর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন আর ভারতের সে দিন নাই। আপাতরম্য পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে স্বল্পে-সন্তুষ্ট, নিরাড়ম্বর প্রাচ্য সংস্কৃতি পরাভূত। ফলে, ভারত এখন খাদ্যদ্রব্যেও আত্মনির্ভরশীল নহে—পরমুখাপেক্ষী। অন্নপূর্ণার অন্নক্ষেত্রে তাই আজ অন্নের নিমিত্ত হাহাকার!

বর্ত্তমান যুদ্ধের অভিঘাতে, সামরিক প্রয়োজনে প্রভুত পরিমাণে ক্রমবর্দ্ধমান রসদ, পরিচ্ছদ ও বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহ করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই অ-সামরিক জনমণ্ডলীর নিত্য-প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের স্বল্পতা ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে, বৃটিশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তির নিকট যুদ্ধার্থে আবশ্যক দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে প্রচুর অর্থ প্রাপ্য হইতেছে, তাহা বিলাতে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ষ্টার্লিং-সংস্থিতিতে জমা হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তদ্বিনিময়ে এদেশে প্রচুর কাগজের নোট ছাপিয়া অযথা অপরিমিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতেছেন। ফলে, স্বল্প পরিমিত অসামরিক ক্ষয়িষ্ণু দ্রব্যসম্ভারের জন্য বাজারে অপরিমিত অর্থের আমদানী হওয়াতে দ্রব্যমূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং অর্থবান্ ব্যক্তিবর্গ অতি উচ্চমূল্যে স্বল্প পরিমাণে প্রাপ্তব্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য চাউলের প্রয়োজন যেমন অধিক, তাহার অভাব-অনটনও তত বেশী ঘটিয়াছে। ফলে, দেশে অন্নের নিমিত্ত হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। তাই এবার অন্নহীনের অন্নপূর্ণার আবাহন!

যুদ্ধের জটিল ও কুটিল পরিস্থিতিজনিত সমুদ্র-বাণিজ্যবর্ত্মের সঙ্কট হেতু বিদেশ হইতে খাদ্য-সামগ্রীর আমদানী রুদ্ধ হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে সমর বিভাগের খাদ্য-দ্রব্যের ব্যয় শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমর বিভাগের প্রয়োজন পূরণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহা অসামরিক জন-মণ্ডলীর পক্ষে অত্যন্ত কম। যুদ্ধের অগ্রগতির সহিত যুদ্ধের স্থিতিকাল যত বৃদ্ধি পাইবে, খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও অনটন তত বৃদ্ধি পাইবে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্য। দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেরই এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের শান্তিকামী রাজশক্তি যুদ্ধের বিরাট আয়োজনের নিমিত্ত আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং যখন যুদ্ধ বিঘোষিত হইল এবং ক্ষিপ্রগতিতে শত্রুপক্ষ দেশের পর দেশ গ্রাস করিতে লাগিল, তখন আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ আত্মহারা হইয়া যুদ্ধোদ্যমে মনোযোগী হইলেন। সামরিক প্রয়োজন ব্যতীত অপরিহার্য্য অসামরিক প্রয়োজনের দিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দান করিবার অবকাশ পাইলেন না। ফলে, যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে যুদ্ধযাত্রীদের প্রধান সহায় ও সম্বল যে বিপুল অসামরিক জনসাধারণ, তাহাদের তুষ্টি ও পুষ্টির প্রতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

বিলাতে কিংবা আমেরিকায় কিন্তু এরূপ অদূরদর্শিতা ঘটে নাই। সেখানে কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের সূচনা ও উদ্যোগপর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহকারী জন-সাধারণের খাদ্য-পেয় ও স্বাস্থ্য-সন্তোষের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ফলে, সমুদ্র-পথের বিষম সঙ্কট এবং মালবাহী জাহাজের যথেষ্ট অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তথায় যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্যাপেক্ষা অনধিক উচ্চ মূল্যে অসামরিক জনসাধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য-সম্ভারের যথোপযুক্ত সরবরাহ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, ভারত সরকার অচিরে ভারতে যে দুর্গতি ঘটিবে, তৎপ্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্পাত না করিয়া ইরাক, ইরাণ, মিশর, মরিসাস্ এবং সিংহল প্রভৃতি দেশে প্রভূত পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিতে-ছিলেন। দেশবাসীর তীব্র প্রতিবাদেও তাঁহারা প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে যখন বাঙ্গালা প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশের অবস্থা অতিমাত্র সঙ্কটাত্মক হইয়া উঠিল, তখনও তাঁহারা সিংহলকে প্রচুর পরিমাণে চাউল সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া-ছিলেন। স্বগৃহেই যে দাতব্যের আরম্ভ,—সে নীতি তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এমন কি, দেশাভ্যন্তরে যখন খাদ্য-সঙ্কট চরমে পৌঁছিয়াছিল, তখনও তাঁহারা খাদ্য-দ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ করেন নাই। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে অন্যূন ৪৮ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য-দ্রব্য ভারতের বাহিরে গিয়াছে! ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে মাল-চলাচলের মুস্কিল বৃদ্ধি পাইতেছিল; এবং কয়েকটি প্রদেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গলায় খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষের সীমান্ত-সান্নিধ্যে উপনীত হইল। দেশে কিরূপ খাদ্যদ্রব্য মজুত আছে, তাহার হিসাব না লইয়া কেন্দ্রীয় ও কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার এমন বিধি-বিরুদ্ধ মূল্য-শাসন নীতি অবলম্বন করিলেন যে, কৃষিজীবীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া মাল বাঁধাই করিতে আরম্ভ করিল। ফলে, বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের সহজ ধারা রুদ্ধ হইল। এরূপ অবস্থায় দ্রব্য-মূল্য যে অযথা উচ্চাভিমুখী হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক আহার্য্য-দ্রব্য অতি উচ্চ মূল্যেও দুর্ল্লভ হইল। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার তাহাদের কদাচিৎ জুটিয়া উঠে। অতি কায়ক্লেশে অর্জ্জিত স্বল্পাহারের উপর নিদারুণ দুর্ম্মূল্যের তীব্রতা আপতিত হইয়া তাহাদের অতি হীন ও ক্ষীণ জীবনযাত্রার ধারাকে অনশনের উপান্তে পৌঁছাইয়া দিল। তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা চরমে উঠিল।

ভারতবাসীর নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রীর অধিকাংশ ভারতে উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডকে তাহার অত্যাবশ্যক খাদ্য-দ্রব্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সাগর-পার হইতে আমদানী করিতে হয়। তথাপি ইংলণ্ডে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য শতকরা ২৫ অংশের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই; আর দুর্ভাগ্য ভারতের কলিকাতা নগরীতে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা আট শত অংশ! আমাদের প্রধান খাদ্য-দ্রব্যের ঘাটতির পরিমাণ অন্যূন ৭০ নিযুত মণ। সরকার লোক-প্রতি প্রতিদিন ৬ ছটাক চাউল যথেষ্ট মনে করেন। এই চাউলের খাদ্য-তাপ পরিমাণ ১৫০০ ক্যালরীর (Calories) অধিক নহে। অথচ এক জন সাধারণ মনুষ্যের খাদ্য-তাপের প্রয়োজন অন্ততঃ ২৫০০ ক্যালরী। কৃষকদের পক্ষে এই প্রয়োজন জন-প্রতি ৩,৫০০ ক্যালরী। যে ভাতের মণ্ড (Rice gruel) ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার খাদ্য-তাপ পরিমাণ ৫০০ ক্যালরী মাত্র, কারণ, ইহার প্রকৃষ্টাংশ মাত্র জল। ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে খাদ্য-তাপের জন-প্রতি নিরিখ ইহার অন্ততঃ দেড় গুণ অধিক। জার্ম্মাণীতে সাধারণ লোকের জন্য খাদ্য-তাপের জন-প্রতি নিরিখ ৪,০০০ ক্যালরী এবং গুরু পরিশ্রমকারী শ্রমজীবীদের পক্ষে ৫,০০০ হইতে ৭,০০০ ক্যালরী। আমাদের দেশের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; সুতরাং স্বভাবতঃই ক্ষীণজীবী। বর্ত্তমান মন্বন্তরে অনাহারে ও সিকি আহারে তাহাদের জীবনীশক্তির কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে? ফলে, মৃত্যুই তাহাদের একমাত্র নিয়তি! ঘটিতেছেও তাহাই!

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটি খাদ্য-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন। এক জন খাদ্য-মন্ত্রীও নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিভাগ সাতটি উপায়-সম্বলিত একটি নীতি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অভাবগ্রস্ত প্রদেশগুলির নিমিত্ত ১০০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য কিনিবার একটি নির্দ্ধারণ আছে। সৌভাগ্যক্রমে পঞ্জাব প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে গমের উত্তম ফসল ফলনের ফলে সঙ্কটের কিঞ্চিৎ প্রশমন ঘটিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালার অবস্থা ভীষণ হইতে ভীষণতর পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার সহিত ভূতপূর্ব্ব হক্ মন্ত্রিমণ্ডলীর এ বিষয়ে সংঘর্ষ ও তাহার পরিণাম সকলেরই সুবিদিত। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী শাসনকর্ত্তার এবং শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সম্প্রদায়ের "নেক্ নজর" লাভ করিয়াও বিশেষ কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না; কারণ, রোগীর শ্বাস যখন কণ্ঠাগত, তখন কোন ডাক্তার, বৈদ্য, অথবা হাকিমের তীব্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগেরও উপায় থাকে না; প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইলেও কদাচিৎ ফল-প্রসূ হয়। বাঙ্গালার শ্বাস এখন কণ্ঠাগত!

বাঙ্গালার নব-নিযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, খাদ্য-দ্রব্যের যথার্থ অভাব ঘটে নাই; কৃষক ও মজুতদারগণের মাল বাঁধাই প্রক্রিয়ার ফলে অনটন ঘটিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহারা একটি প্রচণ্ড মজুত-বিরোধী তাড়না (Anti-hoarding Drive) পরিচালনার ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে, মফঃস্বলে মজুত অপেক্ষা —অভাবই অধিক! এই তাড়নার ফলে যে ১৫ লক্ষ মণ চাউলের আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহা উদ্বৃত্তও নয়; প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুরও নয়। এই মজুত মাল বাজারে উপস্থিত করা হয় নাই মাত্র। সে দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং তাহার পরেও খাদ্য-মন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে, যথার্থই অভাব ঘটিয়াছে। এই ঘাটতির পরিমাণ সমগ্র উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালাকে যে ৫½ কোটি টাকার খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিবার প্রতি-শ্রুতি দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য-শস্য যোগাইতে পারেন নাই। ফলে, খাদ্য-মন্ত্রী বাঙ্গালায় শাসন-নিয়ন্ত্রিত (Controlled) দোকানে বুভুক্ষু জন-সাধারণকে যে পরিমাণ চাউল যোগাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও পারেন নাই। এখন মুস্লীম লীগ-দল বলিতেছেন, এই খাদ্য-সঙ্কটের দায়িত্ব বাঙ্গালার লাট কিংবা ভূতপূর্ব্ব অথবা বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলীর নহে,—দোষ কেন্দ্রীয় সরকারের! কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু বাঙ্গালার সরকারকেই দায়ী করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালা সরকার সহরে ও মফঃস্বলে যে আট শত সরকারী দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন,—তাহাতে কি ফলোদয় হইবে? চাউলেরই যখন যথার্থ অভাব, তখন তাহার যোগান কোথা হইতে

চলিবে? এবং এরূপ অবস্থায় নীতিসঙ্গত বণ্টনই বা কি প্রকারে সম্ভব? কেবল মাত্র চাউল নহে,—গম, যব প্রভৃতি অন্যান্য শস্য-দানাও প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে কম!

বাঙ্গালায় নব-নিযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক ভারত সরকারের আনুকূল্যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কিয়দংশ লইয়া একটি পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী অবাধ-ব্যবসা-মণ্ডলীর (Eastern Free Trade Zone) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ এই অংশ হইতে যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু প্রবর্ত্তিত খাদ্য-সামগ্রীর অবাধ চলাচল প্রতিরোধক নিয়মাবলির প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, প্রতিবেশী-প্রাদেশিক বাজার হইতে বাঙ্গালার নিমিত্ত খাদ্য-সামগ্রী কিনিবার অবাধ অধিকার বিঘোষিত হইবামাত্র বাঙ্গালা হইতে ধনিক ও বণিক যাইয়া যদৃচ্ছা উচ্চ মূল্যে ঐ সকল স্থানে খাদ্যদ্রব্য কিনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ফলে ঐ সকল স্থানে দ্রব্য-মূল্য যে অকস্মাৎ উর্দ্ধগামী হইল তাহা নহে; অচিরে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব-অনটন ঘটিবার নিদারুণ সম্ভাবনা দেখা দিল। সুতরাং প্রতিবেশী-প্রদেশের শাসনতন্ত্রগুলি অবিলম্বে ভারত সরকারকে তাহাদের আসন্ন বিপদের গুরুত্বের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া অবাধ-কেনাবেচা বন্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলেন এবং নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে যতটুকু অবাধ-রপ্তানী বন্ধ করা সম্ভব, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ভারত সরকার সর্ব্ব প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া নয়া দিল্লীতে একটি বৈঠক বসাইলেন এবং তাহাতে এই অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রত্যাহার করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। কেবল বাঙ্গালার কাকুতি-মিনতিতে এইটুকু অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইল যে, যত দিন বাঙ্গালা তাহার বিষম বিপদ হইতে কিঞ্চিৎ প্রশমন লাভ না করে, তত দিন অবাধ ক্রয়-বিক্রয় চলিবে; এবং বিভিন্ন প্রদেশে যে ক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, সেগুলিকেও কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। এই অবাধ ক্রয়-বিক্রয় নীতি গত ১৬ই আগষ্ট হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে সমগ্র ভারতে এই নীতি অবলম্বিত হইলে, বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য দরিদ্র জন-মণ্ডলীকে তীব্র অনশন-ক্লেশ সহ্য করিতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুকে বরণ করিতে হইত না! কিন্তু মন্দভাগ্য ভারতের যথার্থ শাসন-কর্ত্তা সাগর-পারে অবস্থিত; স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাহাতে অধিকার—নামে মাত্র। ইতিমধ্যে সাগর-পার হইতে এক জন খাদ্যনিয়ন্তা ও এক জন খাদ্য-শাসন-উপদেষ্টা মোটা বেতনে ভারতে শুভাগমন করিয়াছেন! অতএব 'মা ভৈঃ!'

[যাহা হউক, নয়া দিল্লীর বৈঠকে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অবধারিত হইয়াছে; ক্রমে অবলম্বিত হইবে, সূচী পরে প্রকাশ্য।]

(১) যত শীঘ্র সম্ভব সহর অঞ্চলে জনসংখ্যানুযায়ী খাদ্য-সামগ্রীর নীতি-সঙ্গত বণ্টন (Rationing) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং তাহার ক্রম-প্রসারণ।

(২) বর্ত্তমানে বাধ্যতামূলক ভাবে অর্থাৎ আইনের সাহায্যে দ্রব্যমূল্যের কোন নিম্নতম ক্রম (minimum prices) নির্দ্ধারিত হইবে না; তবে সর্ব্বপ্রকার পণ্যের মূল্য কমাইবার এবং তাহা যুক্তিসঙ্গত পর্য্যায়ে দৃঢ় রাখিবার সর্ব্ববিধ চেষ্টা অনুসৃত হইবে। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাহাদের স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে অবস্থা অনুযায়ী মূল্যমানকে আয়ত্তান্তর্গত করিবার নিমিত্ত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।

(৩) অতিরিক্ত লাভের উদ্দেশ্যে গুপ্ত-সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে কঠোর বিধি-বিধান প্রযুক্ত হইবে,—যেমন প্রদেশগুলিতে, তেমনি দেশীয় রাজ্যগুলিতে।

(৪) স্বাভাবিক অবস্থা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অবাধ ব্যবসায়ের প্রস্তাব বিবেচিত হইতে পারিবে না।

(৫) সরাসরি সরকার কর্ত্তৃক অথবা প্রদেশগুলির কিম্বা দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পূর্ণ শাসনাধীন গোমস্তা (Agencies) দ্বারা মূল নীতি (Basic plan)-অনুবর্ত্তী খাদ্যদ্রব্য-সংগ্রহ প্রচেষ্টা (Procuration) পরিচালিত হইবে।

(৬) অভাবগ্রস্ত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন ভাবে তাহাদের মৌলিক হিস্যার (Basic quota) পরিধির মধ্যে প্রাচুর্য্য-সম্পন্ন অঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ এবং রেল ও ষ্টীমার-কর্তৃপক্ষের সহিত সংগৃহীত মাল স্থানান্তর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৭) ভারত সরকার সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবেন—যাহাতে জনসাধারণের ভোজ্য ও ভোগ্য দ্রব্যের (Consumers' goods) স্বল্পতার যথাসম্ভব ত্বরিত প্রতিকার ঘটে।

(৮) বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার (Long-range planning) বিষয়, সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির একটি প্রতিনিধি-বৈঠকে আলোচিত হইবে।

আলোচনার অন্ত নাই। জনসাধারণের দুঃখেরও অন্ত নাই। উপরোক্ত বিধানগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্ব্বতন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী (সার আজিজুল হক্) বলিয়াছেন যে, সর্ব্ব প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে খাদ্যদ্রব্য-শাসন হুকুমের (Food-grains Control Order) প্রবল প্রয়োগ ব্যতীত মৌলিক সঙ্কল্প (Basic plan), অর্থাৎ উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের যোগান কিংবা সুশৃঙ্খল ভাবে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের (Procurement operations) কার্য্য-পরিচালনা সম্ভবপর নহে। ইহা অবশ্য সর্ব্ববাদিসম্মত যে, অভাবগ্রস্ত প্রদেশগুলির অভাব পূরণ করিতে না পারিলে সমগ্র দেশের শান্তিই বিক্ষুব্ধ হইবে। উদ্বৃত্ত ও অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের মধ্যে আর্থিক বন্দোবস্ত তাহাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে; কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সুতরাং উদ্বৃত্ত অঞ্চলের ক্রয়কারী গোমস্তা-গিরির অধীনে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের নিমিত্ত ক্রয় এবং ক্রীত খাদ্য-সামগ্রীর স্থানান্তরকরণ নিষ্পন্ন হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মত আদেশ-উপদেশ দ্বারা সাহায্য করিবেন। অভাবগ্রস্ত অঞ্চলগুলিরও কয়েকটি সাধারণ নীতির পরিসরে সর্ব্বপ্রকার উপায় অন্বেষণের অধিকার থাকিবে। খাদ্যদ্রব্য-শাসন হুকুমেরও কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন কি না, তাহাও বর্ত্তমানে ভারত সরকারের বিচারাধীন আছে। কারণ, খাদ্য-সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র দিক্ নহে। ইহার বিভিন্ন দিক্ হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক, শাসন-সম্বন্ধীয়, ব্যবস্থা-সম্মত ও আইন-সঙ্গত বিচার-বিবেচনা প্রয়োজন।

চাহিদা, যোগান ও মূল্যসমস্যাগুলিই প্রবল। কেন্দ্রীয় সরকার যথাসম্ভব তিনটি বিষয়েই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কিন্তু "গয়ং গচ্ছ" ভাবে লক্ষ্য রাখিবার দিন চলিয়া গিয়াছে; এখন ত্বরিত প্রতিকার প্রয়োজন। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরেও অভাব অনটন প্রবল; পরন্তু

বাঙ্গালার দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। সমগ্র ভারতে উচ্চতম মূল্যমান নির্দ্ধারণ ব্যতীত কি মূল্য-প্রশমন সম্ভব? চাহিদা হইতে যোগান যত দিন অধিকতর না হইবে, তত দিন স্বাভাবিক গতিতে মূল্য হ্রাস কবি-কল্পনা বলিয়াই অনুমিত হয়। অধিকতর হওয়া দূরে থাকুক, চাহিদা ও যোগানে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইতে এখনও দীর্ঘ দিন প্রয়োজন। মিত্র ও সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহ হইতে অবিলম্বে প্রচুর খাদ্য-শস্য আমদানী ব্যতীত তাহা কখনই সম্ভব নহে। সুখের বিষয়, মূল্যস্ফীতির মূলে যে মুদ্রাস্ফীতি, তৎপ্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এত দিনে চৈতন্য সমুদ্ধ হইয়াছে। মূল্যমানকে সংযত ও সঙ্গত পর্য্যায়ে অবনমিত করিবার শুভ ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ-কল্পে দৃঢ় ভাবে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু যে একমাত্র সহজ সরল উপায় অবলম্বন করিলে সব দিক্ রক্ষা পায়, তাহার অন্তরালে দৃঢ়-অধিকৃত স্বার্থের (Vested interests) প্রবল সংঘর্ষ। বিলাতে সঞ্চিত ষ্টার্লিং-সংস্থিতির বিনিময়ে ভারতে অর্জ্জিত বিলাতী সম্পত্তিকে ভারতবাসীর হস্তে সমর্পণ ব্যতীত অনর্থের আমূল সংশোধন সম্ভব নহে। জোড়াতালি দিয়া বিপদ কাটাইবার প্রচেষ্টা বিফল।

বাঙ্গালার খাদ্যমন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেব শাসাইয়াছেন যে, অক্টোবর-নবেম্বরের মধ্যে ভারত সরকারের অযথাস্ফীত-মুদ্রা-প্রকরণ-সঙ্কোচের সুফল পরিস্ফুট হইবে। ইতিমধ্যে কলিকাতায় ও হাওড়ায় কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত আছে, তাহারও হিসাব লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় মজুত মালের পরিমাণ বিশেষ আশাপ্রদ মনে হয় না। যাহা হউক, সরকার খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যশাসন নীতি পুনরায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে মূল্য হ্রাস করিতে কৃতসঙ্কল্প! কিন্তু খাদ্য-দ্রব্যের যথার্থ ই অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে, এবং সে অভাব পূরণ করিবার উপায় নির্ভর করিতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙ্গালাকে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিবার সক্ষমতার উপর। ভারত সরকার এ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে যে পারিবেন, সে সম্ভাবনাও অনিশ্চিত; কারণ, প্রতি-বেশী-প্রদেশ সমূহ পূর্ব্ব-প্রাপ্ত মণ্ডলে অবাধ-বাণিজ্যের অভিঘাতে তাহাদের প্রাদেশিক স্বার্থের প্রতিকূল যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহারা সর্ব্বপ্রযত্নে অবাধ বাণিজ্যকে প্রতিহত ও প্রতিরুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভীতি-প্রদ। প্রাদেশিক সরকার বাঙ্গালাকে "দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত" স্বীকার করিতে অস্বীকার করিতেছেন। কিন্তু সরকারের অস্বীকৃতিতে দুর্ভিক্ষ পশ্চাৎপদ নহে। সম্মুখে ভীষণ দুর্ভিক্ষ! মাত্র "দুর্ভিক্ষের অনুরূপ" প্রতিকার-প্রচেষ্টায় মরণোন্মুখ অনশনক্লিষ্ট নরনারী ও বালক-বালিকাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা যাইবে না। এখনও দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিলে কিছু প্রতিকার হইতে পারে। কয়েকটি পরিবেষণ-কেন্দ্র (Distributing centres) এবং মণ্ড-বিতরণকারী রন্ধনশালা (Gruel kitchens) সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যদান, কিংবা বদনার জলে দাবানল, কিংবা বাড়বানল নির্ব্বাপণের প্রচেষ্টার ন্যায় প্রহসনে পরিণত হইবে।

অচিরাৎ প্রদেশান্তর ও দেশান্তর হইতে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যুক্তিসঙ্গত মূল্যে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে সহরে-মফঃস্বলে সর্ব্বত্র ত্বরিত বণ্টনের ব্যবস্থা ব্যতীত সাক্ষাৎ ও আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। ঠিকা-মজুরী কার্য্য (Test Relief Work) কিংবা কৃষিঋণ প্রদান এবং অধিকতর পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি পরের কার্য্য। আশু আহার্য্য যোগাইয়া কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদের প্রাণ রক্ষা না করিলে কৃষি-কার্য্য, কুটীর-শিল্প ও শ্রম-শিল্পের কার্য্য করিবে কে? বন্যার প্রকোপে আউস ফসল বিনষ্ট-প্রায়। আমন ফসল পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্নহীনের অন্ন-সংস্থান এবং বস্ত্র-হীনের বস্ত্র-সংস্থানই সাক্ষাৎ বর্ত্তমানের জটিল সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান মন্ত্রিমণ্ডলী কিংবা শাসক ও শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ আয়ত্ত-বহির্ভূত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, মনে হয়। সম্মুখে ঘোর অন্ধকার! মৃত্যুর বিভীষিকা ব্যতীত,—আশার আলোকের মৃদু রশ্মিও দ্রষ্টব্য নহে। জগৎপালিনী জগদীশ্বরী ব্যতীত এ সঙ্কটে ত্রাণ করিতে পারে, এমন শক্তি কোথায়?

কিন্তু জগজ্জননী আশ্বিনে নৌকায় আসিয়া দোলায় গমন করি-বেন এবং পুনরায় চৈত্র মাসে দোলায় আসিয়া গজে গমন করিবেন। এই নৌকায় আগমন ও গজে গমনের মধ্যবর্ত্তী সময় অতি সঙ্কটের কাল,—ইহার অন্তরে মৃত্যু তাহার তাণ্ডবলীলা সম্পাদন করিবে! কিন্তু সকলেই কিছু মরিবে না। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেও লোক বাঁচিয়াছিল এবং পৃথিবী পুনরায় ধনজন ও শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণা হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধের পর শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুখের পর যেমন দুঃখ, দুঃখের অন্তেও তেমনি সুখ। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সুখের ন্যায় দুঃখও চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং সেই অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দুঃখের মধ্যেও আমাদিগকে ভবিষ্যৎ সুখের সংস্থান করিতে হইবে। এই নিমিত্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনার (Long-term planaing) প্রয়োজন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন-অভিযানের সার্থকতা। এই প্রয়োজন কেবল মাত্র বাঙ্গালার, কিংবা ভারতের নহে;—নিখিল জগতের। সম্প্রতি মার্কিণে মিত্রশক্তি-সম্মিলনের খাদ্য-বৈঠকের (Food Conference) অধিবেশন হইয়াছিল। সাক্ষিগোপালস্বরূপ ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত কয়েকটি কর্ম্মচারী "ভারতের প্রতিনিধি" অছিলায় উপস্থিত ছিলেন। কিছু বাক্যব্যয়ও তাঁহারা করিয়াছিলেন। এই বৈঠকের দৃষ্টি যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের প্রতি নিবদ্ধ,—বর্ত্তমানের সহিত সম্পর্কশূন্য। এই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে যে ত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা এখন ওয়াশিংটনে অবস্থিত একটি কার্য্যকরী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিনিধি-মণ্ডলীর (Interim International Commission) বিবেচনা-ধীন। এই মণ্ডলীতে "ভারতের প্রতিনিধি"রূপে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী স্থান পাইয়াছেন। যুদ্ধান্তে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও একটি আন্তর্জ্জাতিক শস্য-ভাণ্ডার (International Granary) প্রতিষ্ঠাই এই মণ্ডলীর বিবেচনার মুখ্য বিষয়।

অধুনা শত্রুমিত্র সকল দেশেই খাদ্যাভাব-সমস্যার সমাধান হেতু প্রবল প্রচেষ্টা চলিতেছে। কেবল বর্ত্তমানের জন্য নহে, ভবিষ্যতের জন্যও উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। আমাদের ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলিও দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষের সহযোগে আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য অধিকতর শস্যোৎপাদন প্রচেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন। ভারত

সরকার একটি দূরপ্রসারী ভবিষ্যদ্দর্শী সমিতিও (Lon-range Committee) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ কার্য্যে জনসাধারণের, বিশেষতঃ কৃষি, শিল্পজীবী ও বণিক্ সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগ ও সমর্থন অবশ্য প্রয়োজন। অধিকতর শস্য উৎপাদনার্থ উৎকৃষ্ট বীজ, উৎকৃষ্ট সার, উন্নততর সেচ-ব্যবস্থা এবং দেশ, কাল ও পাত্র হিসাবে ঋণ, অথবা অর্থ-সাহায্য (Subsidies) প্রয়োজন। কেবলমাত্র প্রচার প্রভাবে কার্য্য হইবে না। 'শুধু কথায় চিঁড়া ভিজে না।' ভারতের বিশাল আয়তনে বহু জমি পতিত রহিয়াছে। তাহাদিগকে কর্ষণোপযোগী করিয়া তাহাতে শস্য ফলাইতে হইবে। নতুবা নিস্তার নাই। দুর্ভাগ্য ভারতের উপর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নিপতিত হইয়াছে;—প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও মহামারী তাহার সঙ্গী! অন্তরীক্ষে গ্রহবৈরিতার প্রচণ্ড দুর্যোগ! ক্ষিতিতলে দুর্দ্ধর্ষ শত্রু বাঙ্গালার সীমান্তে সমুপাগত!

প্রচুর শস্যের প্রয়োজন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, To grow two blades of corn where one grew before, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেখানে একটি শস্যশীর্ষ জন্মিত, সেখানে দুইটি জন্মাইতে হইবে। সম্প্রতি যুদ্ধপরিস্থিতি হেতু ভারতে বহু লোক-সমাগম ঘটিয়াছে। অগণ্য বৈদেশিক বন্দী, সৈন্য এবং বর্ম্মা, সিঙ্গাপুর, মালয় প্রভৃতি জাপান-পর্য্যুদস্ত দেশ হইতে প্রত্যাগত জনসমূহে ভারতের লোকসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে খাদ্যব্যয়ও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের খাদ্য-শস্যের উৎপাদন যথার্থই দ্বিগুণ না করিলে উপায় নাই। কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষিই আমাদের প্রধান সম্বল; শিল্প তাহার অনুগামী ও অনুষঙ্গী। ভূমিই আমাদের জনয়িত্রী ও পালয়িত্রী। এই নিমিত্তই জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। শস্যের মধ্যে ধান্যই প্রধান; কারণ, ভারতে চাউলই প্রধান খাদ্য। অধুনা নহে, সেই ত্রেতাযুগ হইতে ধান্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন। ধান্যই আমাদের লক্ষ্মী। শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের পরে রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভরতকে প্রথম কুশল-প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

উৎপত্তিবিষমা যস্য নিত্যং যস্য ব্যয়ো ভবেৎ।
সর্ব্বশস্যপ্রধানস্য ধান্যস্য কুশলং বদ॥

এই ধান্যের কুশলেই প্রজাবর্গের কুশল। ধান জন্মিলে প্রকৃতি-পুঞ্জ সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের সংস্থান করিতে পারে। অতএব ধান্যই আমাদের প্রকৃত ধন। এই হেতু ধনের সহিত ধান্যের নিত্য সংযোগ। "ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ কর"—আমাদের আশীর্ব্বচন। এই ধান্য ও ধনের অধিকারী যিনি, সেই জগজ্জননী জগদীশ্বরী দুর্গা দেবীর অর্চ্চনা-আবাহন এই সুনির্ম্মল শরৎকালে সুখে-দুঃখে আমরা সম্পন্ন করিয়া থাকি। মায়ের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না, তাঁহার হৃতসর্ব্বস্বা নগ্নিকা কালী মূর্ত্তিই আজ আমাদের সম্মুখে প্রকট; চণ্ডিকা মূর্ত্তিতে আজ তিনি রণোন্মাদে প্রমত্ত! কিন্তু এই ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীমা মূর্ত্তির পশ্চাতে তাঁহার জগৎপালন-কারিণী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি বিরাজিত। তিনি অন্নপূর্ণা; আমরা আজ অন্নহীন; সুতরাং তিনি ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় উপায় নাই। তাই এ বৎসর অন্নহীনের অন্নপূর্ণার আবাহন

শ্রীদুর্গাং ধনদামন্নপূর্ণাং পদ্মাং সুরেশ্বরীম্।
শস্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ শস্যায়ৈ চ নমো নমঃ॥

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যযুগ

হে যুগ-শ্রেষ্ঠ, তোমারে প্রণাম করি!
এসো অনাগত সুকাল তোমারে স্মরি।
সত্য পুণ্য আনো আরোগ্য আয়ু,
পবিত্র মন, পবিত্র জল-বায়ু,
এসো এ ধরায় ধর্ম্মের ডোর ধরি।

কোন্ সে জনমে দেখিব—তা ঠিক নাই!
অকাল বোধনে বন্দনা গেয়ে যাই।
এ জীবনে যাহা হবে না, তাহাই হোক!
এসো মহাযুগ এসো হে পুণ্যশ্লোক,
সব পাপ-তাপ, সব গ্লানি লও হরি।

নূতন করিয়া গড় মানবের মন।
পরশে হউক সব লোহা কাঞ্চন!
ঘুচাও হিংসা, ঘুচাও পাতিত্য,
মানুষে-মানুষে বাড়ুক জ্ঞাতিত্ব,
দাও স্বাধীনতা, শৃঙ্খল অপসরি।

ঝঞ্ঝা বন্যা প্রলয় চাহে না লোক—
অমৃত-বৃষ্টি পুষ্প-বৃষ্টি হোক!
সাগর রাঙায়ে সবিতা যেমন আসে,
আসে পূর্ণিমা গৌরবে নীলাকাশে—
এসো প্রতিপদে পারিজাত মুঞ্জরি!

তোমার চেয়ে ত কোন যুগ নাই বড়!
মানুষ ভাঙিয়া ধরায় দেবতা গড়।
একই জীবনে নূতন জীবন দাও,
ক্ষুদ্র, ক্ষণিক, ক্ষীণ যাহা তাহা নাও,—
দুর্ব্বলে দাও শক্তি মহেশ্বরি!

জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুগ, তব জয় জয়!
সত্য ধর্ম্ম পুণ্যেরই আশ্রয়!
রেখো না রেখো না ভগবানে এত দূর—
গাও তব মহা সঙ্গীত সুমধুর!
দম্ভ দর্প লুটাক ধূলায় পড়ি!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মিস্ বকু

মিস্ বকুকে আমার খুব ভালো লেগেছিল—তাকে ভালোবেসে ছিলাম বললেও অত্যুক্তি হয় না!

যখন তার সঙ্গে পরিচয়, তখন তার বয়স কেবলমাত্র চৌদ্দ—কৃশ, তন্বী বালিকার দেহটি সবেমাত্র বয়ঃসন্ধির মাদকতা ও বিকাশোন্মুখ যৌবনের কোমলতায় ভরে উঠেছে। কৈশোরের প্রগল্ভ একটা সরলতা ও চাঞ্চল্য তখনও দেহে-মনে রয়ে গেছে। ক্লাস নাইনের ছাত্রী সে—পড়ায় বেশ ভালো। হাঁটবার চেয়ে ছোটবার দিকেই ঝোঁকটা তার তখন বেশী, কথা বলার চেয়ে শোনবার দিকেই আগ্রহ অধিকতর। লিক্‌লিকে শরীরে একটা দুর্লভ রংএর প্রলেপ—জরদ রংএর পাতলা শাড়ীর ফাঁকে সেটা যেন আরও সুন্দর দেখায়।

আমার সঙ্গে পরিচয় তার আকস্মিক নয়—অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে। দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য আগেই বলে রাখা ভালো যে, তখন আমার বয়স তিরিশের কোঠায়। কেবলমাত্র বিবাহিত নয়, পিতাও বটে—তবু স্বীকার করতে ক্ষতি নেই তাকে ভালোবেসে ছিলাম।

পরিচয়টা ছিল তার দিদির সঙ্গে; কারণ, তিনি আমার সহপাঠিনী। এক বার বড়দিনের পূর্ব্বে আলাপ-প্রসঙ্গে জানা গেল, তাঁর বাড়ী যে জেলার সদর সহরে, আমার শ্বশুর-গৃহও হুবহু সেখানে; এবং বড়দিনে শ্বশুর-গৃহে অবস্থান করবো শুনে তিনি সাদরে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কলকাতায় এই আড়ষ্টতার মাঝে নৈকট্য জন্মায় না, ওখানে গেলে অনেকখানি যেন আপনার মনে হবে।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম এবং সঙ্গিহীন কয়েকটি দিনে তাঁদের মত পরিচিত লোক পেয়ে মনটা বেশ একটা তৃপ্তি পেয়েছিল। শ্বশুর-গৃহের অনতিদূরেই ওদের বাসা, অতএব সকাল-বিকাল আড্ডাটা বেশ জম্‌তো।

প্রথম দিনে শ্বশুর-গৃহে প্রচুর জলযোগ করে সকালে তাদের ওখানে উপস্থিত হলাম। সহপাঠিনী মিস্ দাশগুপ্তা বললেন,—তাও কি হয়, আমাদের দেশের জামাই, প্রথম দিন একটু মিষ্টিমুখ না করলে লোকে নিন্দে করবে যে!

বাধ্য হয়ে কিছু খেতে হলো। তার পর নানা কথা—অবান্তর এবং প্রসঙ্গহীন। আমি লেখক না হলেও কিছু কিছু লিখি—তাই মিস্ বকু জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, আপনি কি করে লেখেন?

আমি একটু হেসে জবাব দিলাম—প্রশ্নটা বড় শক্ত। উত্তর দিচ্ছি; কিন্তু তার পূর্ব্বে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে। তুমি গান করতে পারো?

মিস্ বকু বললে,—না, গলা-সাধা আরম্ভ করেছি।

মিস্ দাশগুপ্তা বললেন,—না না, ও বেশ গাইতে পারে এবং নাচে বহু মেডেল পেয়েছে।

আমি অভিমান করে বললাম,—আমাকে গান শুনোতে হবে সে-ভয়ে মিথ্যা কথাটা না বললেও পারতে। ইচ্ছে করে আমাকে গান না শোনালে আমি সে গান শুনি না। অতএব তুমি যত দিন পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় আমাকে গান না শোনাবে, তত দিন আমি বলবো না যে গান শোনাও। আচ্ছা যাক্—তুমি গান গাও কেমন করে, বুঝিয়ে দিতে পারো?

—গেয়ে যাই। কেমন করে গাই তা কি করে বলবো!

—আমার অবস্থা গুরুতর, হারমোনিয়ামের কোন পর্দ্দায় আমার গলা মেলে না। তোমাদের যে কি করে অমন হয়, ভেবে আশ্চর্য্য হই।

সকলে হেসে উঠ্‌ল। বকু বললে,—বেশ, তাতে কি হলো?

—তুমি কেমন করে গান করো যেমন বলতে পারলে না, আমিও তেমনি কেমন করে লিখি বলতে পারি না। তুমিও যন্ত্র ধরে গান গাও, আমিও কলম ধরে লিখি।

আবার সকলে হেসে উঠলো। মিস্ দাশগুপ্তা খানিকটা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলে উঠলেন—আমার ভাই-বোন সকলেই কিন্তু গান করতে পারে।

—আপনি?

মিস্ দাশগুপ্তা ব্যঙ্গ করলেন—আপনার মত! কোন পর্দ্দাতেই গলা মেলে না।

আমি পরিহাস করলাম,—আপনার ভাই-বোন সকলে গান করতে পারে, এ কথা আপাততঃ বিশ্বাস করলাম না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে বিশ্বাস অবশ্যই করবো।

মিস্ বকু উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আচ্ছা দাঁড়ান, গান শোনাচ্ছি; কিন্তু যতক্ষণ গান গাইব বসতে হবে, উঠে যেতে পারবেন না।

—নিশ্চয়ই যাবো না, কিন্তু সিগারেট খাবো। ঘড়ি দেখে বললাম,—সাড়ে দশটায়, সাড়ে বারোটায়, আড়াইটেয় ও সাড়ে পাঁচটায় চা দিতে হবে।

—হ্যাঁ, দেবো।

মিস্ বকু চাকর দিয়ে হারমোনিয়ামটা এনে বললে—কি গান শুনবেন? আধুনিক? কাব্য-সঙ্গীত? না ক্লাসিক?

—আমি ত শুনবো না, তুমি শোনাবে। অতএব।

—আমার ইচ্ছা ত? বেশ।

বকু একটু হেসে বললে,—আপনি ভারি দুষ্টু! সে আর কোনো কথা না বলে গান শুরু করলে। সত্যি ভাল গায়, কচি শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কথার মত মধুর। আমি শুনছিলাম। গান শেষ করে সে বললে,—কেমন? আর গাইবো? না—কাকের কণ্ঠের রবে?

—প্রশংসা যদি করতেই হয়, তোমার সামনে নিশ্চয় করবো না।

গান চললো প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত। বকু কিছুতেই থামে না, আমাকে জব্দ করবে বলে আমারও আসা হয় না প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে। অবশেষে মিস্ দাসগুপ্তা বললেন,—বকু তোর না হয় নাওয়া-খাওয়া বাদ দিলে চলবে! উনি এখানে জামাই, সকলে ওঁর জন্যে বসে আছেন।

বকু বললে—আচ্ছা তবে থাক এখন যতীন বাবু, কেমন?

—তোমার ইচ্ছা।

বকু আমার হাতের ঘড়িটা দেখে বললে,—সাড়ে এগারো। তা চা খেতে হবে ত আর একবার?

—প্রতিশ্রুতি অনুসারে খাওয়া উচিত।

বকু চা আনতে গেল, সহপাঠিনী বান্ধবীকে বললাম,—বাস্তবিক

বকু গান গাইতে পারে। সুর আর কথার একটা সমাবেশ ওর গানেই যেন প্রথম পেলাম। ও নাচ শিখ্‌লে কোথায় ?

নাম-করা এক জন নাচিয়ে মেয়ের নাম করে বান্ধবী বল্‌লেন,—তিনি ওঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং স্বেচ্ছায় নাচ শিখিয়ে গেছেন।

বল্‌লুম, ওকে ভাল না বাসা একটা মস্ত বড় সংযম সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার মধ্যে কি ওর সারল্য আর সুকণ্ঠের কিছুই নেই ?

—প্রথমটার অভাব দেখ্‌লেন—এর মানে ?

—দেখলাম ত। সরল ভাবে গান করতে আপনিও পারতেন।

—আমি সত্যি গাইতে পারি না। তবে তার আফ্‌শোষ আপনাকে মিটিয়ে দেব। কাল-পরশু ওর নাচটাও দেখিয়ে দেব—তার জন্য একটু জোগাড় দরকার।

—দেখলে আনন্দিত হব, এবং মনে মনে ধন্যবাদ দেব।

বকু চা নিয়ে এল। চা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—আচ্ছা তা হলে উঠি এখন, নমস্কার।

—বিকেলে আস্‌বেন কিন্তু।

—বিকেলে নয়, সন্ধ্যার পরে আস্‌বো। বেরুতে বেরুতেই সন্ধ্যা হয়, তা ছাড়া একটু বেড়ানোও দরকার। শ্বশুর-গৃহে ভূরি-ভোজনের পরে সেটা স্বাস্থ্যকর। চলে আস্‌ছিলাম, কে যেন পিছন থেকে হাত ধরে আকর্ষণ করলে। বকু হাতখানা ধরে ফেলেছে। এই নিঃসঙ্কোচ সারল্যের প্রশংসা করবো কি নিন্দা করবো বুঝ্‌লাম না, তবে মনে মনে একটু খুশী হলাম। বকু বল্‌লে, বেশ লোক আপনি! এত গান শোনালুম অথচ যাবার সময় একটা কিছুই বলা দরকার মনে করলেন না? দিদি আপনার বন্ধু, তার সঙ্গে ভদ্রতা না করলেও ক্ষতি ছিল না। আমার সঙ্গেই বরং প্রথম পরিচয়, কিছু বলা উচিত ছিল।

আমি পরিহাস করলাম,—ওহো! তুমি যে এক জন রেস্‌পেক্টেবল লেডি তা ভুলে গিয়েছিলাম। নমস্কার মিস্ বকু, অনুমতি করলে আস্‌তে পারি।

বকু অপ্রাকৃত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্‌লে,—সেধে ভজে এ নমস্কারের কোনো দাম আছে ?

আমি হাত জোড় করে বল্‌লাম,—ভুল হয়েছে। ক্ষমা চাচ্ছি।

বকু হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লে,—ক্ষমা চাইলেন একেবারে! ছিঃ ছিঃ!

আমার হাত ধরে আমার অতি সন্নিকটে দাঁড়িয়ে সে বল্‌লে—সন্ধ্যায় আস্‌বেন ত ?

—হাঁা, আস্‌বো। নিম্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,—তোমার দিদি গান করেন না ?

বকু বল্‌লে,—ছেড়ে দিয়েছে। এখন গান লেখে।

বান্ধবী তিরস্কার করলেন,—আমি আবার গান লিখ্‌লাম কবে রে মিথ্যাবাদী ?

—বা, 'জীবন-ছায়ায় বসে' গানটা যে গাইলাম, সেটা তোমার লেখা না ?

বান্ধবী একটু লজ্জিত হলেন, আমি বকুর হাতখানা আকর্ষণ করে বল্‌লাম,—সত্য ভাষণে অপরাধ নেই।

কেবল অনুরোধে নয়, যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গেই সন্ধ্যার পর বান্ধবীর ওখানে উপস্থিত হলাম। বাহিরের ঘরে বকু একা কি যেন করছিল, আমাকে দেখে বল্‌লে,—এই যে এসেছেন, বেশ! এত দেরী করতে হয়! অন্দরের উদ্দেশ্যে উচ্চ কণ্ঠে কহিল,—ছোড়দা, যতীন বাবু এসেছেন।

একটু হেসে আমাকে বললে,—কিন্তু দিদি এখন নেই। কেমন জব্দ। সে বড় দিদির ওখানে বেড়াতে গেছে।

জব্দ হওয়ার কি সঙ্গত হেতু আছে বুঝলাম না, তাই প্রশ্ন করলাম,—জব্দ কেন ?

—বাঃ দিদি নেই, কে অভ্যর্থনা করে, আলাপ করে? ফিরে যেতে হবে ত!

—কেন? তুমি আছ! না, সেটাও ভুল দেখ্‌ছি ?

সে অকারণ হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লে,—আমি আছি তা হলে।

—সেই রকমই অনুমান করছি।

—আচ্ছা, তা হলে বসুন। সে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দিল।

—না, এই শীতে চেয়ারে বসবার যো নেই। ফরাসের উপরই জড়োসড়ো হয়ে বস্‌তে হবে।

—চা আন্‌তে হবে ?

—তোমার অতিথি-সেবায় আন্তরিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে।

—আমার অতিথি ত নন্, দিদির অতিথি। না, আমারই অতিথি ?

—যাই হোক, চা-খরচ একটু অদৃষ্টে আছে।

তথাকথিত ছোড়দা এলেন। তিনি আই-এ ক্লাসের ছাত্র। বকু বললে,—তুমি গান শোনাও ছোড়দা, আমি চা আনি। কেমন ?

—যা, চা নিয়ে আয়। ছোড়দা ওরফে গেঁদু বাবু বললেন,—দিদির মুখে আপনার কত কথা শুনেছি! ও-বেলা আমি একটু বেরিয়েছিলাম তাই দেখা হয়নি। আপনি কেবল লেখক নন্, ভালো অভিনয়ও করেন।

হেসে বললাম,—গুণপনার অন্ত নেই! কিন্তু বকু আপনাকে যে আদেশ করে গেল, তার কি হবে ?

—গান? আচ্ছা গাইছি। গান গাইতে আমার লজ্জাসরম নেই। হয় ভাল হবে না হয় খারাপ হবে। গাইব তা হলে ?

—অবশ্যই।

ফরাসের উপরই হারমোনিয়াম ছিল। সে গান করতে সুরু করলে। ভূমিকায় বললে—গানটা লেখা দিদির, আর সুর আমার। অপটু হাতে তৈরী জলবৎ এক কাপ চা বকু এনে দিল। গান চলছিল, তার মাঝে সেটা গলাধঃকরণ করে সঙ্গীতান্তে বকুকে বললাম,—তোমার তৈরী চা, খেয়েই বুঝলাম।

—কেমন করে ?

—চায়ে নাচিয়ে-মেয়ের হাতের একটু স্বাদ পেলাম।

বকু তার টানা-টানা চোখ দু'টির বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে একটু লজ্জিত কণ্ঠে বললে,—ওঃ, ভালো হয়নি বুঝি, তাই ঠাট্টা কচ্ছেন! ঠাকুর যে জল গরম করে দিলে তা ঠাণ্ডাই রয়েছে, তাতে চা ভাল হবে কেমন করে? তাই পাতলা হয়েছে। সে

হেসে উঠলো। ব্যঙ্গ করে বল্‌লে,—দিদি এলে ভালো চা খাওয়াবে। আমি ত প্রশ্নী।

আমি পরিহাস করলাম,—যথেষ্ট করেছ! বসতে না বল্‌লেও আমার বলার কিছু ছিল না।

বকু বললে,—উঃ, আপনি এত বড় অকৃতজ্ঞ!

কৃতজ্ঞতার অভাব ছিল সত্য, কিন্তু আন্তরিকতার অভাব ছিল না, তাই কটূক্তিকে হেসে হাল্‌কা করেছিলাম। ছোড়দা পুনরায় গান করলেন। বকু কখন্ আমার ঠিক পাশে এসে বসেছে—বিজলী-বাতির নীলাভ আলোয় একটা জিনিষ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে দেখলাম—বকুর হাতখানা তারই কোলের মাঝে অত্যন্ত অচপল ভাবে পড়েছিল—আঙুলগুলো চাঁপার কলির মত মসৃণ ও সুন্দর। নীলাভ আলোয় সেগুলো অত্যন্ত শুভ্র দেখাচ্ছিল। আমি বকুর হাতখানা হাতে নিয়ে বললাম,—তোমার আঙুলগুলি কি সুন্দর!

হাতখানা সে ছিনিয়ে নিয়ে বল্‌লে,—যান্! আর ঠাট্টা করতে হবে না।

গান শেষ হলে বললাম,—তোমাদের নাচের মাঝে কি সমস্ত মুদ্রা ব্যবহার হয় সে সব কিছু বুঝি না, আর ওরিয়েণ্টাল ডান্সের মাঝে দেখি কেবল সাপের মত দেহটা জোড়ামোড়া করে! এর অর্থটা বুঝিয়ে দিতে পারো? এ শাস্ত্রের কিছুই বুঝলাম না জীবনে।

বকু একটু দুঃখিত হয়ে বললে,—ওই ত আপনাদের দোষ। না জেনেও সমালোচনা করেন।

—সমালোচনা করিনি, অজ্ঞতা প্রকাশ করেছি।

—আচ্ছা দাঁড়ান, আমি যা জানি বলছি। নৃত্যকলা সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা সে মুখস্থ কবিতার মত বলে গেল, তার পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললে,—আচ্ছা দেখাচ্ছি।

অত্যন্ত সংক্ষেপে কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে সে তার ছোড়দাকে বল্‌লে,—কেদারার কন্‌সার্টটা বাজাও না ছোড়দা—ওঁকে বুঝিয়ে দেব।

বকু নৃত্যের সঙ্গে মুদ্রা ও দৈহিক অভিব্যক্তির টীকা করে যেতে লাগলো,—হঠাৎ হেসে বললে, একটু অসুবিধে হবে বুঝতে, তবলা ত নেই। আচ্ছা, তার পরে—

নৃত্যকলা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল না, বকু কি বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারিনি, কিন্তু মনে মনে ওর কথাই ভাবছিলাম। ওর অসঙ্কোচ সারল্য ও নির্ভীক আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল! ও যেন ঠিক খাঁচার পাখীর মত নয়, প্রজাপতির মত রঙীন লঘুপক্ষভরে চলেছে। এই সামান্য পরিচয়ে আপনার গুণে ও বয়সের দূরত্বকে উপেক্ষা করে আমাকে অত্যন্ত নিকটে টেনে নিয়েছে—তাতে আমার কোন নৈপুণ্য নেই! তার দুর্ব্বার বাহুর আকর্ষণে আমাকে সে নিজেই আপনার করে ফেলেছে। তাই ভাবলুম, মানুষ ভালোবাসে না, অসহায় ভাবে ভালোবাসতে বাধ্য হয়।

বকু শ্রান্ত হয়ে এসে বসলো। শ্রমে মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে, তাতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মকণা সঞ্চিত হয়ে আলোয় অভ্ররেণুর মত চিক্‌মিক্ করছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—কেমন বুঝলেন?

বলা বাহুল্য, কিছুই বুঝিনি! তাই বল্‌লাম,—সামান্য একটু আলোর আভাস যেন পেয়েছি!

—না, আপনার দ্বারা হবে না।

—না না, রক্ষে কর, নাচ শেখবার দুরাকাঙ্ক্ষা জীবনে কখনও হয়নি। নিজের শরীরের শীর্ণতা এবং দৈর্ঘ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বল্‌লাম,—আমি নাচ যদি শিখিই, তবে একমাত্র ভূশণ্ডীর মাঠেই তা দেখানো সম্ভব হবে।

ঘরের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠলো। মিস্ দাশগুপ্তা ফিরে এসে বললেন,—ওঃ, আপনি এসেছেন! যা হোক্, আপনারও কথার ঠিক আছে তা হলে!

আমি বললাম,—আয়নায় নিজের মুখ দেখছেন না ত?

—যাক্, বকু থাকতে আপনার অযত্ন নিশ্চয় হয়নি। গেঁদুর গান শুনেছেন?

—হ্যাঁ, কিছুই বাকী নেই। আপনাকে বিদায়-নমস্কার করাটা শুধু বাকী।

মিস্ দাশগুপ্তা হাত জোড় করে বল্‌লেন,—ক্ষমা চাইছি আর কখনও বিকেলে বেরুবো না, হলো তো?

শ্বশুর-গৃহের ভূরি-ভোজন ও ওদের বাড়ীর ভাইবোন ক'টির অসঙ্কোচ ও সহৃদয় ব্যবহারের মাঝে বড়দিনের ছোট দিন ক'টি কেটে গেল। এবার বিদায় নিতে হবে—কিন্তু এবারকার বন্ধটা যেন অনাবশ্যকরূপে সংক্ষিপ্ত বলে মনে হলো।

বকুর গান-নাচ প্রভৃতি দেখা সমাপ্ত, এক দিন প্রসঙ্গক্রমে সে বলেছিল,—এত গান করলুম, আমাকে কি পুরস্কার দেবেন?

—কি চাও?

—আপনার নতুন বই বেরুলে একখানা বই দেবেন, তাতে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে।

—প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম দেবো এবং ভুল হবে না, তাও জানিয়ে দিলাম।

বিদায়ের দিনে জানা গেল, মিস্ দাশগুপ্তা সেই দিনই কলকাতা যাবেন এবং আমি যাবো পরের দিন। আমি প্রশ্ন করলাম,—আজই যাবেন তা হলে?

—হ্যাঁ, আপনার রংপুর ত্যাগ দু'-চার দিনে হবে বলে মনে হয় না।

—শ্বশুর-গৃহের প্রতি আকর্ষণ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করতে হবে।

বিদায়-নমস্কার করে আসছিলাম, বকু পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে,—কাল আসবেন কিন্তু।

আমি জবাব দিতে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম। বকু ব্যঙ্গ করলে,—ওঃ, দিদি চলে যাচ্ছে, কাল আবার কেমন করে আসবেন, তাও ত বটে!

আমি বললাম,—আমার বাধা এখন আর নেই তোমার কৃপায়। তবে আসা হবে কি না সন্দেহ, কারণ, কাল নানা স্থানে আত্মীয়-সন্দর্শনে যেতে হবে।

আরও কিছু আলাপের পরে আসবার সময় বকু আমার অতি সন্নিকটে দাঁড়িয়ে হাত ধরে বল্‌লে—কাল আসবেন কিন্তু! আসবেন ত?

বল্‌লাম—আসবো!

বকুর সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছিলাম—ইচ্ছা না ছিল এমন নয়, কিন্তু একটা সঙ্কোচ বোধ করেছিলাম। কলেজে এক দিন তাই মিস্ দাশগুপ্তা বল্লেন,—আপনি ত আসবার দিন আমাদের ওখানে যাননি।

—না, যাওয়া হয়নি, কিন্তু আপনি জান্‌লেন কি করে?

—বকু লিখেছে, "তোমার বন্ধুকে জানিও যে তিনি মিথ্যাবাদী।"

আনন্দ হলো,—বকু অন্ততঃ আমাকে ভুলে যায়নি।

বৎসরাধিক পরের কথা।

পুনরায় রংপুর যেতে হলো। তার পর এক দিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ওদের বাড়ীতে বেড়াতে গেলাম। যে ঘরটায় সাধারণতঃ বসতাম, সেটায় বসে পড়লাম—বাইরে কেউ নেই। উচ্চ কণ্ঠে ডাক্‌ব, কিন্তু কাকে? সকালের কাগজ ও উচ্ছিষ্ট চায়ের কাপ পড়ে রয়েছে। কাগজটা হাতে নিয়ে পড়বার ভাণ কর্‌ছিলাম।

বাড়ীর ভিতরে একটা কোলাহল হচ্ছিল। জনৈক বর্ষীয়সী মহিলা বল্‌ছিলেন,—এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে—কোন কিছুই করতে পারো না। এক কাপ চা তৈরী করার যোগ্যতা নেই, কেবল নাচ-গান করলেই চলবে? সংসার করতে হবে না? এক দিন রাঁধতে পারো না? ঠাকুরের অসুখ!

—সংসার করবো কিসের দুঃখে?

—না? বিয়ে হবে না? তখন দেখবি।

—বিয়ে আমি করবো না।

কে যেন আস্‌ছে—পদশব্দ নিকটবর্ত্তী হলে দেখলাম, বকু। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আপনি এসেছেন?

কোনরূপ ভদ্রতা না করে সে অত্যন্ত দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। বুঝলাম, খবর দিতে গেছে। পরক্ষণেই ফিরে এসে বল্‌লে,—দিদিকে বলে এলাম। কিন্তু আপনার কথার ঠিক নেই, যাবার দিনে এলেন না। সমস্ত বিকেলটা বসেছিলাম।

—বসেছিলে? আশ্চর্য্য হয়েছিলাম তার কথা শুনে, তার মত মেয়ের পক্ষে আমার মত বয়স্ক লোকের জন্য প্রতীক্ষা করার মাঝে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, সেটা না থাকাই উচিত ছিল। তাই একটু পরিহাস করে বল্‌লাম,—তোমার বয়সে তোমার বসে থাকা উচিত, তোমার ছোড়দার বন্ধু-বান্ধবদের জন্য। আমার জন্যে বসে থাকাটা ত খুব সঙ্গত নয়!

বকু ভ্রূ কুঞ্চিত করে অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন কর্‌লে, কেন?

—আমরা বুড়ো হয়েছি,—উপন্যাসে যেমন পড়ি তাই বল্‌ছি। সেইটেই স্বাভাবিক।

বকু কিছুক্ষণ চিন্তা করে অর্থটা বুঝে নিয়ে বল্‌লে,—ওঃ, মাঝে মাঝে অস্বাভাবিকও ত ঘটে। সে আগের মতই অত্যন্ত প্রগল্‌ভ ভাবে হেসে উঠল।

মিস্ দাশগুপ্তা এসে বল্‌লেন,—কবে এলেন?

—দিন তিনেক।

—তিন দিন পরে মনে হলো?

—মনে করাটা আর আসাটার মাঝে কিছু সময় থাকাই ভাল। আপনি আছেন কি না খোঁজ নিতে হবে ত!

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পরে বকুকে একটু একান্তে বললাম,—তোমার একটা গোপন কথা শুনে ফেলেছি—অবশ্য অন্যায় ভাবেই!

—কি?

—বিয়ে করবে না বলে তোমার মায়ের সঙ্গে তুমি বচসা করেছিলে, আমি শুনে ফেলেছি।

—শুনেছেন, ভালোই।

—বিয়ে সত্যি করবে না, না কি?

—কি হবে বিয়ে করে? স্বাধীন জীবনই ভাল।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম তার মুখস্থ-করা কথা কয়েকটি শুনে। বললাম,—এমন কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি জীবনে যে বলেছে যে, সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে? বাপ-মায়ে ধরে-বেঁধে দিয়েছে আর তারা অত্যন্ত অনিচ্ছায় বিষ-বড়ি খাওয়ার মত বিবাহ কার্য্যটি শেষ করেছে?

বকু আগের চেয়ে একটু বড় হয়েছিল, তাই বললে,—যদি ঘর-সংসার করাই জীবনের মোক্ষলাভ হয় তবে লেখাপড়া গান-নাচ ছেড়ে রান্না-বান্না দেখাই উচিত।

—তা কেন? ওগুলো হবে ঘর-সংসারকে সম্পূর্ণ করতে। যার চাকরী করার দরকার নেই, সে পুরুষ-মানুষ কি লেখাপড়া শিখবে না? লেখাপড়া শেখে ভদ্র হতে, মানুষ হতে।

আরও কিছু তর্ক-বিতর্কের পর বকু একটু হেসে বললে,—আপনার ideaগুলো সব সেকেলে রয়ে গেছে, কিন্তু লেখার মধ্যে ত তেমন নেই।

—হবে। কিন্তু এবার অতিথিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করা হচ্ছে না!

—কেন? গান শোনাতে হবে?

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

কয়েক দিনের মধ্যেই বিদায় নিতে হলো। আসবার দিনে বারান্দায় আমার অতি-সন্নিকটে দাঁড়িয়ে হাত ধরে সে বললে,—দিদি থাক্ না থাক্, যখনই আসেন, এখানে আসবেন। কেমন?

তার কণ্ঠে এবং বিস্ফারিত দু'টি চোখে কাতর মিনতি প্রকাশ পেয়েছে, তার মাঝে চপলতা নেই। একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম,—আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে এমন অনুরোধ তুমি কেন কর?

সে অবনত মস্তকে পায়ের আঙুল ক'টা দিয়ে বারান্দার উপর অর্দ্ধবৃত্ত আঁক্‌তে আঁক্‌তে বললে,—কেন, জানি না।

—এলে খুশী হও?

—হ্যাঁ, খুব খুশী হই।

—তবে অবশ্যই আসবো।

প্রায় বিশ বৎসর পরের কথা হবে।

সময়ের গতি রোধ করা সম্ভব নয়, তাই চুলও পেকেছে এবং শরীরও জীর্ণ হয়েছে। অর্থের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, শারীরিক অপটুতার জন্য রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। মধ্যম শ্রেণীতেই ভ্রমণ করি। স্থানান্তরে যাচ্ছিলাম। মধ্যম শ্রেণীর

কামরাখানা একেবারে খালি, এক কোণে বসে কাগজ পড়ছিলাম। একটা বড় জংসনে এসে গাড়ীটা থামলো।

একটি ভদ্রলোক গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, গাড়ীটা ফাঁকা, তাই উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করলেন—এদিকে—এদিকে এসো সব।

দেখতে দেখতে চার-পাঁচটা কুলি বিরাট্ লটবহর নিয়ে এসে ঘরখানার শ্বাসরুদ্ধ করে দিলে। তার পিছনে এলেন তাঁর পত্নী এবং গণ্ডাদেড়েক সন্তান-সন্ততি। এক কোণে বিছানা করে নিয়ে জিনিষ-পত্র ঠিক আছে কি না দেখতেই সময় চলে গেল। গাড়ী ছাড়লো।

সন্তানগুলির বড়টি মেয়ে, বছর তের। তার পরে ছ'বছরের পার্থক্য রেখে বাকী ছ'টি। কনিষ্ঠটির বয়স বছর ছ'য়েক হবে। ছেলে-মেয়েগুলি খুব বিবেচক বলা যায় না।

বড় মেয়েটি আমার দিকে একটু তাকিয়ে কাঁধের পিন্ আর খোঁপা ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখলে। তার পরে ভ্রাতাটি জানালায় মাথা গলিয়ে কি দেখতে গিয়েছিল, চোখে কয়লার গুঁড়ো খেয়ে চোখ রগড়াতে লাগলো; তার পরেরটি বাঙ্কের চেন ধরে ঝুলতে সুরু করেছে, তার পরেরটি বায়না ধরেছে জল খাবো ইত্যাদি এবং সর্ব্বকনিষ্ঠটির ইজের-পরিবর্ত্তনের আশু প্রয়োজন হয়েছে।

ছেলেটি বললে—দিদি, চোখে কি পড়লো, ছাখ্। মা বল্লেন, খোকার ইজের বের করে দে। আর অন্য ছেলে বললে, দিদি জল দে। ইতিমধ্যে দোদুল্যমান ছেলেটির পদাঘাতে তার ভ্রাতা ধরাশায়ী হয়ে তারস্বরে কেঁদে উঠলো,—এই সংসারের যিনি মূল কর্ত্তা, তিনি সমস্ত দুর্ঘটনা উপেক্ষা করে জিনিষপত্র বার-বার গুণ্তি করছিলেন। ধরাশায়ী বালকটি ক্রমবর্দ্ধিত উচ্চগ্রামে কাঁদ্‌ছে।

মহা রুষ্ট হয়ে বল্লেন,—এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে হয়েছ কিছু পারো না! মন্টু কাঁদছে দেখ্‌ছো,—ধরে তুল্‌তেও পারো না একটু! কেবল নাচ আর গান পরমার্থ হয়েছে!

কন্যা জবাব দিল,—একসঙ্গে কত কাজ করবো? ইজের বের করবো—

—চুপ কর্! আবার তর্ক!

তথাকথিত ধরাশায়ী মন্টু বিস্কুট-আহারান্তে শান্ত চিত্তে বাইরের দিকে ধাবমান বৃক্ষশ্রেণী দেখতে লাগলো। ছোট খোকা বললে, মা, বি—বি অর্থাৎ বিস্কুট।

মা বললেন, ছাখো তো গো, ঘীয়ের পাত্রটা ভাঙ্গলো না কি। কুলিটা যে আছাড় দিয়েছে—মশলার কৌটোগুলোই কি আর আছে?

কর্ত্তা পরীক্ষা করে বল্লেন,—না ভাঙ্গেনি, কিন্তু কিছু ঘি পড়ে গেছে।

কর্ত্রী একটা হাঁড়ি পরীক্ষা করে বল্লেন,—দেখলে, হাঁড়িটা ভেঙ্গে সব ডাল পড়ে গেছে।

বড় মেয়ে হেসে উঠ্‌লো। টিপ্পনি করলে, বালাই গেছে!

মাতা বল্লেন, তোমার ত কিছুই লাগে না, বিবি হয়ে ঘুরে বেড়ালেই চলবে!

—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কুড়িয়ে আন্‌লে অমন একটু ভাঙ্গেই।

কন্যার প্রতি একটু বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মা করুণ সুরে বল্লেন,—আহা, এমন ডাল কি আর মিলবে!

রেল-ভ্রমণের প্রথম দুর্য্যোগটা কাটলো।

চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিলাম। এই গৃহবধূটিকে কোথায় যেন দেখেছি সাম্‌নের দাঁত দু'টির মাঝখানে পোকায় খাওয়া কালো দাগটুকু—কথা বলার সময় ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিরক্তি প্রকাশ করা যেন আমার পরিচিত। জীবনের অতীত পৃষ্ঠাগুলি দ্রুত ওলটাতে লাগ্‌লাম, কিন্তু ঐ মুখখানি কবে কখন্ বিস্মৃতির মাঝে ডুবে গেছে!

মাতা-কন্যায় বচসা হচ্ছিল, মা বল্লেন,—সংসার করা শেখো, নাচ-গান কোন কাজে লাগবে না। সংসার করতে হবে ত!

—না।

—না, তবে কি সিনেমায় নেচে বেড়াবে! বিয়ে হবে না?

—দরকার নেই।

হঠাৎ মনে পড়ল, এই গৃহ-বধূ সেই মিস্ বকু! শ্রাবণের সেই নাতিপরিপূর্ণ নদীস্রোতের মত চঞ্চল বকু আজ শীতের শুষ্ক শীর্ণ স্থির জলকল্লোলের মত অচঞ্চল—আষাঢ়ের শ্যামল ভূপৃষ্ঠ যেন শীতের নিষ্ঠুর পাণ্ডুরতায় পর্য্যবসিত হয়ে গেছে! মনে পড়ে, অত্যন্ত স্বল্প-পরিচয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ও আমাকে নৃত্যকলা ব্যাখ্যা করে-ছিল। আর আজ মেয়ের সঙ্গে এমনি বচসা করছে সেই বকু! তার জীবনেই এ দৃশ্যের অভিনয়! হেসে উঠ্‌লাম।

হাসিটা সম্ভবতঃ সশব্দে হয়েছিল, তাই বকু ও অন্য সকলে আমার দিকে ফিরে তাকালো। চোখোচোখি হতেই বকুকে বল্‌লাম,—চিন্‌তে পারো বকু?

বকু মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে সহাস্যে এগিয়ে এসে বল্‌লে, আপনি? যতীনদা? উঃ, চুল পেকে কি হয়েছে! চেন্‌বার যো নেই যে! এত বুড়ো হয়েছেন!

দাদা সম্বোধন নতুন, তবু প্রতিবাদ করলাম না,—হেসে বল্‌লাম,—আমি কি ভেবেছি যে, যে-বকু এক দিন আমাকে নৃত্যকলা বোঝাবার জন্য নেচে ঘর্ম্মাক্ত হয়েছে, সে আজ তার মেয়ের সঙ্গে নাচ-গান নিয়ে বচসা করছে!

—সে কথা বলে লজ্জা দেবেন না। বিয়ের আগে পর্য্যন্ত ঐ সব করেছি বলেই ত এখন সংসার সামলাতে হিমসিম হতে হয়। তখন বুঝিনি যে, ও সব কোন কাজেই লাগে না!

পুত্র-কন্যাগুলি কৌতূহল-পরতন্ত্র হয়ে আমাদের নিকটে এসে ভীড় করলে। বকু বল্‌লে, বিন্নু, প্রণাম কর। বড় মেয়ে বিন্নু প্রণাম করলে। তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বল্‌লাম, বোসো মা-লক্ষ্মী।

তার পর বকুর কথার জবাব দিলাম,—নাচ-গান কি জীবনের কোনো কাজে লাগেনি?

—কৈ লাগলো?

—লেগেছে। 'যে নদী মরু-পথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' তোমাকে চেনা আজ কিছুতেই সম্ভব হতো না; যদি না তোমার সেই মুদ্রাব্যাখ্যার দৃশ্যটা মনে পড়তো! আমার মনের কোণে সেটুকু ধরা পড়ে রয়েছে কালজয়ী হয়ে! আর তার চেয়েও বেশী হয়ে আছে ওঁর কাছে।

আমি বকুর স্বামীকে ইঙ্গিত করেছিলাম। বকু লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, যান্—কি বলছেন সব!

—তোমার মেয়ে আজ ঘীয়ের পাত্র আর হাঁড়ির ডালের কথা চিন্তা করে হাস্‌ছে, আবার এক দিন সযত্নে ও মসলার কৌটো বেঁধে আস্‌বে।

—কিন্তু ও যে সংসারের কিছুই শিখলো না।

হেসে উঠলাম। গম্ভীর ভাবে বললাম—জগতে এই বিধি। যৌবনের সঙ্গে বার্দ্ধক্যের এ বচসা চিরদিন চলেছে, কিন্তু সে বচসার সম্পূর্ণ অপচয় হয়নি জগতে। যৌবনের বেগবান্ অশ্বের পৃষ্ঠে যদি বার্দ্ধক্যের ভারী সওয়ার না থাকতো, তাহলে অশ্বটি ওখানে পড়ে মরতো।

বকু আনমিত চোখে বললে,—হ্যাঁ, আজ আপনার সঙ্গে পরিচয়ের দিনটা মনে পড়লে হাসিই পায়।

গাড়ীখানা অকারণ দ্রুত ছুটে আমাকে গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী করে দিল।

বহু দিন পরে বকুকে পেয়ে এত শীঘ্র ছেড়ে যেতে হবে ভেবে দুঃখ হচ্ছিল। বল্লাম—আমাকে এই ষ্টেশনে নামতে হবে বকু।

—এখানেই?

—হ্যাঁ। কত দিন পরে দেখা!

প্লাটফরমে নেমে দাঁড়ালাম। বকু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে,—এখানে সেখানে ত যান। যদি পাবনা যান, তবে আমার ওখানে যাবেন নিশ্চয়—উনি কো-অপারেটিভ ইনস্‌পেক্টর।

আর এক দিন অত্যন্ত করুণ মিনতি-ভরা কণ্ঠে সে বলেছিল—যখনই আসবেন, এখানে আসবেন কিন্তু! আজও তেমনি মিনতি-ভরা কণ্ঠে অনুরোধ জানালো।

গাড়ী চলে গেল। এই শ্লথগতি-মন্থর বকু যেন আমার জীবনের বিশ বছরের ব্যবধানটিকে অকস্মাৎ অত্যন্ত দীর্ঘ করে দিয়ে গেল। অজ্ঞাত বেদনায় মনটা ভারী হয়ে উঠলো। ভাবলাম—মিনতিভরা কণ্ঠে বার-বার আমাকে ও আমন্ত্রণ করে কেন? হাত ধরে কেন পিছু টানতে চায়?

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ)।

শান্তির স্বরূপ

শান্তির কথা উঠিতেছে। বাহিরের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইতেছে, এই নৃশংস নরমেধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। যত দিন গিয়াছে তত দিন আর যাইবে না, ইহার অবসান হইলে মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। গত মহাযুদ্ধের পর যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাকে স্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। কেন স্থায়ী হইল না, তাহার কারণ অনুসন্ধানের ফলে অনেক ত্রুটি, অনেক প্রমাদ ধরা পড়িতেছে। এবার যাহাতে সেরূপ ত্রুটি না থাকে, সেরূপ ভ্রান্তি না ঘটে, তাহার জন্য চেষ্টা হইতেছে। বড় বড় ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিৎ এবং অর্থশাস্ত্রবিৎ সুধীগণ এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন এবং রাজনীতিকদিগকে বিনামূল্যে অনেক পরামর্শ-সুধা বণ্টন করিতেছেন। উপযাচক হইয়া বিনামূল্যে সাধারণ উপদেশ দানের যে গতি হইয়া থাকে,—এই সকল বিজ্ঞচয়ের উপদেশেরও সেইরূপ গতি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এখন যেমন রণ-ডঙ্কার ভৈরব রবে তাঁহাদের সেই উপদেশাবলি সাম্রাজ্যচালক ব্যক্তিদিগের কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে না,—যুদ্ধান্তে বিজয়োৎসবে আত্মহারা রাজনীতিকদিগের বিজয়-বাদ্যের মধ্যে সেইরূপ বাহিরের লোকের সদুপদেশরাজি যে আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহার প্রমাণ এখন হইতে কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে।

এই যুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিবর্গের প্রতিপক্ষ অক্ষশক্তির মধ্যে জার্ম্মাণীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পক্ষ। এই জার্ম্মাণীর সহিত কিরূপ সন্ধি করা উচিত, তাহাই হইতেছে এখন প্রধান সমস্যা। ইটালীকে লইয়া সমস্যা তেমন প্রবল নয়। জাপান প্রাচ্য শক্তি। উহার কথা শ্বেতাঙ্গের নিকট বিশেষ গুরু নয়। এই জার্ম্মাণীর সহিত কিরূপ ভাবে সন্ধি করা হইবে, তাহাই হইতেছে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এমন কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যাহাতে এই বিংশ-শতাব্দীর বৃত্রাসুরকে চিরকাল লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ রাখা যায়! কি প্রকারে এই কালানল-সদৃশ বিষবর্ষী মহারগের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া বহু যুগ ধরিয়া তাহাকে পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভবে, তাহা লইয়াই ইদানীং রাজনীতিক পণ্ডিত-মহলে ঘোর বিতণ্ডা ও গবেষণা উপস্থিত হইয়াছে। এখনও যত দিন এই সংগ্রাম চলিবে, তত দিন সজীব খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থাকারী ভ্রাতুষ্পুত্রের মত কতকগুলি লোক এইরূপ পরামর্শ-সুধা বণ্টন করিতে থাকিবেন। শেষকালে যাহা বিধাতা-দেবের ইচ্ছা তাহাই হইবে। যিনি ভ্রান্তিরূপে কর্ত্তৃত্বকারী রাজনীতিকদিগের হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে বিপথে আগাইয়া দেন, তিনি যদি এবার শক্তিশালী রাজনীতিকদিগের মন হইতে ভ্রান্তির কুহেলিকা অপসারিত করেন, তাহা হইলে অবশ্য ইহার একটা স্থায়ী মীমাংসা হইবেই।

গত বারে ভার্সাই সন্ধিতে যে সকল ভুল করা হইয়াছিল, মনীষিগণ এবার একে একে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, কোন মনীষীই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। মানুষের মনের মধ্যে স্বভাবজাত যে দুইটা দৈত্য আছে, অহঙ্কার এবং ক্ষমতা-প্রিয়তা—সেই দুইটাই যত গোল বাধাইতেছে। রাজনীতিকরা যে তাহা বুঝেন না, তাহা নয়। তাঁহারা গত বারের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, ক্ষিপ্রতার সহিত সন্ধি করিলে তাহাতে অনেক দোষ এবং ত্রুটি থাকিয়া যায়। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা তখন বিজয়ী পক্ষের মনে প্রবল থাকাতে তাহারা নিরপেক্ষ ভাবে সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। সেই জন্য ভার্সাইয়ের সন্ধি স্থায়ী হয় নাই। সেই জন্য অধ্যাপক সিডনী

বি ফে (Sidney B Fay) বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের বিরতি হইলেই সন্ধি করা কর্ত্তব্য হইবে না। যুদ্ধবিরতি হইবার দুই-তিন বৎসর পরেই সন্ধির সর্ত্তগুলি নির্দ্ধারিত করা সমুচিত হইবে। এই দুই-তিন বৎসর কাল লোকের মস্তিষ্ক শীতল করা আবশ্যক হইবে। এই দুই-তিন বৎসর কাল অনশনক্লিষ্ট লোকদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে—পারিবারিক ব্যবস্থা করিতে হইবে,—স্বাভাবিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং সমস্ত য়ুরোপে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সংশোধন করিতে হইবে। ইহা সত্য যে, যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মাণীতে স্থায়ী কোন শাসনযন্ত্র থাকিবে না। জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে তখন কেহ সমীচীন ব্যবস্থার কথা বলিতে পারিবে না। মিষ্টার হেরল্ড নিকলসন তাঁহার Peace-making গ্রন্থে বলিয়াছেন, "যখন যুদ্ধজনিত ঘৃণা এবং মনের বিকার থাকে, তখন অবিলম্বে স্থায়ী সন্ধি করা সম্ভব হয় না।" এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এ কথা শুনিবে কয় জন? মার্কিণের এবং বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদিগণ যখন প্রতিপক্ষের গলা টিপিয়া ধরিবেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের দুষ্পূরণীয় স্বার্থ-সাধন করিবার প্রলোভন কিছুমাত্র সঙ্কুচিত করিতে চাহিবেন কি না, তাহা দ্রষ্টব্য। তাঁহারা যদি ত্যাগ-স্বীকার করিতে চাহেন, তবেই স্থায়ী সন্ধি সম্ভব হইবে; নতুবা কিছুতেই তাহা হইবে না।

আজ-কাল আর্থিক ব্যাপার লইয়াই যুদ্ধ হয়। সকল যুদ্ধের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহার ভিতরে একটা আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা লুকাইয়া রহিয়াছে। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের অন্তরালেও এই প্রকার একটা উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল, এবারও তাহা আছে। আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের সংবাদ লইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এবার এই যুদ্ধে ভারত-বাসী যত ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছে বা করিতে বাধ্য হইয়াছে, এত আর কোন জাতিই করিতে বাধ্য হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সন্ধির সময় কোন ভারতীয় প্রকৃত জন-নায়ককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বা সন্ধি বিষয়ে কোন মত প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হইল না—এরূপ মনে করিবার কারণ যে নাই তাহা বলা যায় না। প্রতীচ্য শাসন-কর্ত্তারা কোন কালেই প্রাচ্য-জাতির মতামতের যে কোন মূল্য আছে তাহা মনে করেন না। তবে এ বিষয় লইয়া আমাদের শিরঃ-পীড়ার কারণ কি? কারণ আছে। কারণ, আবার যদি কোন কারণে এইরূপ একটা ব্যাপক যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে আমা-দিগকে আবার এইরূপ দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। হয়ত বা ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। কাজেই সন্ধির ব্যাপারে ভারতবাসীর স্বার্থ যে আছে, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্য এই গুরু বিষয়টি আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে সন্ধি করিবার সময় জার্ম্মাণীকে নানা-রূপে দমিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে জার্ম্মাণী ঠিক দমিত হয় নাই। তাই আজ এক-পাদ-শতাব্দী যাইতে না যাইতেই সেই রণনির্জিত নির্জীবপ্রায় জার্ম্মাণী অতিকায় দৈত্যের মত উত্থিত হইয়া সমস্ত য়ুরোপকে মথিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগের সমস্ত যুদ্ধেরই মূল কারণ শিল্প এবং বাণিজ্য-বিস্তার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিল তাহা জানেন, রুজভেল্টও তাহা বুঝেন। তাই আটলাণ্টিক চার্টারের ঘোষণায় তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "ছোটই হউন আর বড়ই হউন, বিজয়ীই হউন আর বিজিতই হউন, সকলেই তাঁহাদের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর সকল দেশ হইতে শ্রমশিল্পের জন্য কাঁচা মাল লইতে পারিবেন; তাঁহাদের মধ্যে অধিকারের কোন তারতম্য করা হইবে না।" অধ্যাপক ফে বলেন যে, এই সর্ত্তটি অত্যন্ত সমীচীন হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যতে যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প হইতে পারে। কিন্তু যে সময়ে এই আটলাণ্টিক চার্টার লিখিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল, সে সময়ে জার্ম্মাণীর বা অক্ষশক্তির প্রতাপ এত দূর হ্রাস পায় নাই। তখনকার প্রতিশ্রুতি সমরান্তে প্রতি-পালিত হইবে কি না, তাহা বুঝা কঠিন। মুসোলিনীর পদ-ত্যাগের বা পদচ্যুতির পর এত দিনেও ইটালী আত্মসমর্পণ করিল না কেন, ইহা এক বিষম সমস্যা। যাহা হউক, যদি এই সমস্যার সমাধান হয় এবং যুদ্ধের পরও সন্ধি করিবার সময় এই সর্ত্ত ঠিকমত প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় যুদ্ধ ঘটিবার একটা বড় কারণ যে অপসৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আটলাণ্টিক চার্টারের ঘোষণার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, যাঁহারা ঐ সনদে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা সত্য সত্যই পৃথিবী হইতে রাজনীতিক অত্যাচারের এবং সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ-সাধনে বিশেষ অবহিত। তিনি বলিয়াছেন যে, উহাতে দুইটি উদ্দেশ্যের এবং নীতির কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, সকল মানুষের ইচ্ছামত শাসন-ব্যবস্থা বাছিয়া লইবার প্রতি শ্রদ্ধা; দ্বিতীয়তঃ, সকলের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষা করিবার জন্য এই বিশ্বে সর্ব্ব-জনীন সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা। কথাগুলি শুনিতে অতি সুন্দর—বলি-তেও প্রাণে একটা উৎসাহের সঞ্চার হয়ত হয়। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করা অতিশয় কঠিন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা অত্যাচার করে এবং নির্ব্বিঘ্নতার এবং সুবিচারের ক্ষতি করে, তাহারা সকলেই আমাদের শত্রু। কারণ, তাহারা সভ্যতার অগ্রগতির হন্তারক। কথাগুলি সবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু নিহিত স্বার্থে স্বার্থবান্ ক্ষমতাশালী লোকদিগকে বাধা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। উহাদের কূট কৌশল ভেদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পূর্ব্বে সাম্রাজ্য-বাদীরা সরল কথা বলিত, এখন আর তাহারা তাহা বলে না। এখন তাহারা নীতিধর্ম্মের দোহাই দিতে আরম্ভ করিয়াছে; নানারূপ ভাঁওতায় লোক-লোচনে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ এত দূর অবনত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা সয়তানীকেই ভগবানের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। সেই জন্য এই জাতীয় বিড়ালব্রতিক সাম্রাজ্যবাদীর উল্লেখ বাহিরের লোকের পক্ষে বুঝা কঠিন। পৃথিবীতে যত দিন প্রভাবশালী ব্যক্তি-দিগের মন হইতে লালসা সমূলে উৎপাটিত না হইতেছে, যত দিন মানুষ বিশ্ব-মানবতার মধ্যে ভগবান্‌কে না দেখিতে পাইতেছে, তত দিন এই পৃথিবী হইতে ঐ প্রকার দানবীয় অত্যাচারের তিরোধান করা সম্ভব হইবে না। মার্কিণ ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জকে কার্য্যতঃ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ উদারতার জন্য ফিলিপাইনের অধিবাসীদিগের চিরকৃতজ্ঞ থাকা স্বাভাবিক। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ফিলিপাইন যতই

দুর্ব্বল হউক না কেন, উহা মার্কিণের একটা অতি প্রবল সহায় হইবে। সত্য বটে, এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসি-সংখ্যা অধিক নয়; দেড় কোটিরও কম। দেড় কোটি মানবকে সুহৃদ্‌রূপে পাওয়া নিতান্ত অল্প সুবিধার কথা নয়। কিন্তু মার্কিণ যাহা করিয়াছে, সম্মিলিত শক্তিবর্গের অন্য সকলে তাহা করিতে পারিয়াছে কি? গ্রেট বৃটেন ধনিক-চালিত দেশ। সেখানকার ধনিকরা অধিকাংশই উৎকট সাম্রাজ্যবাদী। মার্কিণের অধিবাসীদিগকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। মার্কিণরা বরং বিদেশে প্রচুর খাদ্যশস্য রপ্তানী করিতে পারে। মার্কিণে যে পরিমাণ গম জন্মায়,—নিখিল ভারতবর্ষে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণও গম জন্মায় না। মার্কিণে ধান্যও জন্মায়—তবে ভারতের তুলনায় অল্প জন্মায়। অন্যান্য খাদ্যশস্যও মার্কিণে প্রচুর জন্মায়! এরূপ অবস্থায় মার্কিণ যাহা করিতে পারে, গ্রেট বৃটেন তাহা করিতে ভরসা পায় না। সেই জন্য এবং দূরদৃষ্টির অভাব-বশতঃ তাহারা মার্কিণের ন্যায় উদার হইতে সাহস করে না। গ্রেট বৃটেনের ধনিক সম্প্রদায় অন্যরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে বদ্ধ। এবং তাহাদের অর্থাকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল। সেই জন্য তাহারা ছলে বলে কৌশলে অধীন রাজ্যগুলিকে মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ রাখিতে উৎসুক। কাজেই মার্কিণের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বর্জ্জন সহজ হইতে পারে, কিন্তু গ্রেট বৃটেনের পক্ষে তাহা সহজ নয়। গ্রেট বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝে না যে, শোষণ নীতি অপেক্ষা সখিত্ব পরিণামে অধিক ফলপ্রদ। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, Conscience does make cowards of us all. যাহারা স্বার্থপরতার জন্য অন্যের উপর অসঙ্গত ব্যবহার করে, তাহারা সেই ভাবে ব্যবহৃত লোককে কখনই মন খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। এই সকল কারণে আমাদের শঙ্কা হয়, সম্মিলিত শক্তিবর্গের মধ্যে সকলেই এক-মতে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত চলিতে সমর্থ হইবেন না! যুদ্ধের পর তাঁহাদের পরস্পরের স্বার্থ লইয়া সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইবেই।

এখন এ কথা জানিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয় যে, এই যুদ্ধের পরে কি বহুকালস্থায়িনী শান্তির প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব? আমাদের ধারণা, তাহা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সম্মিলিত শক্তি-চতুষ্টয় অক্ষশক্তিত্রয়কে সম্পূর্ণ নির্জ্জিত করিতে পারেন, যদি অক্ষশক্তিবর্গ ধরা-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়াও যায়,—তাহা হইলেও কি পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির প্রচেষ্টা সম্ভব হইবে? যাঁহারা পশুবলে অতি-বিশ্বাসী, তাঁহারা তাহা মনে করিতে পারেন,—কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা একেবারেই ভুল। জার্ম্মাণী, ইটালী এবং জাপান চূর্ণ হইয়া গেলেও লোকের মনে হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা কখনই লোপ পাইবে না। এক জাতি সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা অতি প্রবল হইলে অন্য জাতি তাহাকে হিংসা করিবেই করিবে এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। জগতের জাতিসমূহ যে রাতারাতি নিতান্ত নিষ্কাম কর্ম্মে আসক্ত হইবে, এ ভরসা আমাদের নাই। সুতরাং কোন্ দিক্ দিয়া ব্যাধ আসিয়া সাম্রাজ্যবাদরূপ এক-চক্ষু হরিণকে মর্ম্মাহত করিবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বর্ত্তমান সময়ে গ্রেট বৃটেনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী জাতি। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ওলন্দাজ এবং জাপানও সাম্রাজ্যবাদী। মার্কিণও সাম্রাজ্যবাদী। অবশ্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে যদি মার্কিণ এই যুদ্ধান্তে স্বাধীনতা দেন, তাহা হইলে মার্কিণে অধিক সাম্রাজ্য থাকিবে না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও শিল্প ও বাণিজ্য-বিস্তার বিষয়ে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী। বিজেতাই হউন, বিজিতই হউন,—ছোটই হউন, আর বড়ই হউন, সকল জাতিই সকল দেশ হইতে সমান দরে এবং সমান সুবিধায় ব্যবহার্য্য পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচা মাল লইতে পারিবেন,—আটলাণ্টিক চার্টারের এই সর্ত্ত হইতেই বুঝা যায় যে, শিল্প বিষয়ে অগ্রসর জাতিদিগকে তুল্য সুবিধাদানই মার্কিণের উদ্দেশ্য। মার্কিণ মহাযন্ত্রযোগে শিল্পজাত বস্তুর উন্নতিসাধন করিয়া পশ্চাৎপদ জাতিকে যেন কতকটা পঙ্গু করিয়া রাখিতে চাহেন। কতকগুলি দেশ বা জাতি কেবল ভবের হাটে বেচিবার জন্য কাঁচা মালের উৎপাদন করিতে থাকিবে, আর কতকগুলি শিল্পপ্রধান জাতি কেবল সেই কাঁচা মাল হইতে পাকা মাল (finished article) প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগের নিকট চড়া দরে সেই পাকা মাল চিরকালই বেচিতে থাকিবে—আশা করি, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাহা আশা করেন না। যুরোপের এক জন বিশিষ্ট বার্ত্তাতত্ত্ববিশারদ বলিয়াছেন যে, যে দেশের লোক অন্য দেশের শিল্পীদিগের জন্য কাঁচা মাল মাত্র উৎপাদন করিয়া তাহা বিকায়—সে দেশের লোক এক-হস্ত-বিশিষ্ট লোকের সহিত তুলনীয়। অর্থাৎ তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি অর্দ্ধমাত্রা মাত্র। আর যাহারা বিদেশীদিগের নিকট কাঁচা মাল বিক্রয় করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পাকা মাল বা ব্যবহার্য্য পণ্য ক্রয় করে,—তাহাদের সেই একটিমাত্র হস্তও পরের নিকট বন্ধক দেওয়া বা বাঁধা আছে। অর্থাৎ আর্থিক বিষয়ে সেই জাতি বা দেশ একেবারে ক্ষমতাহীন। পরাজিত জার্ম্মাণীকে কাঁচা মাল পাইবার সুবিধা দেওয়া হইবে,—এ কথা বলিবার জন্য হয়ত এই সর্ত্তটি আটলাণ্টিক চার্টারে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ-শান্তির পর ইহার যে অন্যরূপ অর্থ করা যাইবে না, তাহা মনে হয় না। বরং শিল্প ব্যাপারে পশ্চাৎপদ জাতি যে কোন উপায়ে আপনাদের শ্রমশিল্পের উন্নতি সাধন-কল্পে চেষ্টা করিবে, তাহাদিগকে তাহাতে উৎসাহ দান ভিন্ন বাধা দান কেহ করিতে পারিবেন না—এইরূপ একটা সর্ত্ত আটলাণ্টিক চার্টারে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। আমরা যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমনি আর্থিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন করি না। যাহা হউক, বাণিজ্যবিষয়ে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী কি না, তাহা এই যুদ্ধশেষে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।

এখন ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অক্ষশক্তিত্রয় নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেলেও পৃথিবী হইতে সাম্রাজ্যবাদ লোপ হইবে না। সাম্রাজ্যবাদী জাতি থাকিতেও ধরাতল হইতে হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা ঘুচিবে না, মানব-সমাজে তাহা থাকিবেই থাকিবে। কাজেই বর্ত্তমান যুদ্ধের পরে যাঁহারা চিরশান্তি স্থাপনের আশা করিতেছেন, তাঁহাদের সে আশা সফল হইবার কোন সম্ভাবনাই বুঝা যাইতেছে না। এক জাতির পতন হইলে অন্য জাতি মস্তক উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিবে। নির্জ্জিত জাতিও মনে মনে বিজেতা জাতির উপর বিদ্বেষ এবং বৈরভাব পোষণ করিবে। সেই জন্য আমাদের মনে হয় যে, পশুশক্তি-বলে সাম্রাজ্যবাদ যত দিন ধরাতলে থাকিবে,—যত দিন মানুষ অন্য জাতির স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ষোল আনার উপর আঠার আনা মাত্রায় আত্মস্বার্থ সাধন করিতে রত থাকিবে, তত দিন মানব-সমাজ হইতে সমর একেবারে নির্ব্বাসিত

করা সম্ভব হইবে না,—শান্তিও মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। দ্বিতীয় কথা, জার্ম্মাণী বা জাপানকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলা সম্ভব হইবে না। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর তারিখে ষ্ট্যালিন তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "জার্ম্মাণীকে নষ্ট করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কারণ, জার্ম্মাণীকে ধ্বংস করা রুশিয়াকে ধ্বংস করার স্থায় অসম্ভব। কিন্তু হিটলার-পরিচালিত রাষ্ট্রকে উচ্ছিন্ন করা যায় এবং উহাকে উচ্ছিন্ন করা আবশ্যক।" কথা সত্য। হিটলারের সৈন্যদল এবং হিটলারী নীতির পরিচালকবর্গের উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, মানুষ যাহা সম্ভব এবং আবশ্যক মনে করে, তাহা করিয়া উঠা সম্ভব হয় না—যেন কোন দুর্ভেদ্য কুহেলিকা আসিয়া তাহাতে বাধা ঘটায়। ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তদ্ভিন্ন আর একটা কথাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা বিধেয়। কোন একটা মতবাদকে সাময়িক ভাবে উচ্ছিন্ন করিলেও উহা একেবারে উচ্ছিন্ন হয় না। উহা কেমন অলক্ষ্য ভাবে আত্মগোপন করিয়া কাল-সহকারে এবং সুবিধা-মতে বিশেষ জনসমাজে আত্মপ্রকাশ করে। আজ জার্ম্মাণ জাতি যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পায়, তাহা হইলেও যে ঐ মতবাদ এবং ঐ প্রকার দানবীয় শক্তি এবং মত যে অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে প্রকট হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? ইতিহাসে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা জানা কথা। সমস্ত সভ্যজাতির বিশেষজ্ঞগণ তাহা ভালরূপ জানেন। যে জাপান বুদ্ধদেবের সর্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের উপাসক, সেই জাপান কঠোর সাম্রাজ্যবাদ প্রসার লাভ করিল কি জন্য, তাহা বুঝা কঠিন। যে গ্রেট বৃটেন ক্রীতদাসদিগের কষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া ক্রীতদাস-প্রথা তিরোহিত করিবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, সেই গ্রেট বৃটেনের নিজ সাম্রাজ্যে আজ সহস্র সহস্র নেত্র হইতে অভাবের দুঃখজনিত অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেলেও রাজধানীর রাজপথে অভুক্ত নরনারীর মৃতদেহ পতিত দেখিলেও তাহার প্রতিকার জন্য কোন জরুরী পন্থা অবলম্বন করিতেছেন না কেন? খৃষ্টান-ধর্ম্মশাস্ত্র বলে যে He that hateth his brother whom he hath seen how can he love God whom he hath not seen? কিন্তু সভ্য সমাজের মানুষের মনের ভিতর যে ক্ষমতা লাভের লালসা পুতনা রাক্ষসীর ন্যায় ওত পাতিয়া আছে, তাহা নানা বেশ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষকে পশুত্বে অবনমিত করিয়া তাহাকে সাম্রাজ্যবাদে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং যতক্ষণ এই লালসাগুলি মানবের মানসক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত না হইতেছে, তত দিন স্বয়ং ভগবান্‌ও এই ধরাধামে আসিয়া মানব-সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এখন কেবল গণতন্ত্রবাদের ধুয়া ধরিয়া নাৎসীবাদ এবং ফাসীবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হইতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে বাদ দিয়া ঐ কার্য্য করিতে গেলে তাহা নিষ্ফল হইবে। সাম্রাজ্যবাদ নাৎসীবাদ হইতে কিছু ভাল হইলেও বহু অনর্থের কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই সকল কারণে আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিগত যুদ্ধের ফল যেরূপ হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলও সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ ইহার পর চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ইতোমধ্যেই তাহার ঈষৎ আভাস প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু সে কথা লইয়া আমরা এখন কোন কথা বলিব না। সম্মিলিত শক্তিবর্গের বিজয় লাভ যতই স্পষ্ট হউক, সাম্রাজ্যবাদ থাকিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বিগত যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রবাদ এবং কমিউনিজম বা সর্ব্বস্বত্ববাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এবার হয়ত ঐ মত আরও প্রবল হইতে পারে। কিন্তু বিজয়ী পক্ষ যে সাম্রাজ্যবাদে অধিক ভরপুর হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সেই জন্য ভারতবাসীর মন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে শক্তি-চতুষ্টয় সম্মিলিত হইয়া অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন। তন্মধ্যে স্থল-যুদ্ধে রুশিয়াই প্রধান। জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে স্থল-যুদ্ধে রুশিয়া যেরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, অন্য কোন শক্তিই তাহা করে নাই। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, যুদ্ধ পরিচালনা এবং সন্ধি সংস্থাপন বিষয়ে যে সমস্ত পরামর্শ হইতেছে, তাহাতে ইংরেজ ও মার্কিণই রহিয়াছেন; রুশিয়া নাই। কি কাসাব্লাঙ্কায়, কি আদানায়, কি কুইবেকেও ষ্ট্যালিন নাই। ইহা যেন কেমন একটা প্রহেলিকার মত মনে হয়। প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিন সামরিক কার্য্য পরিচালনার জন্য এত ব্যস্ত যে, দেশ ছাড়িয়া তিনি এখন কুইবেকে যাইতে পারেন না। তিনি না যাইতে পারেন, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কি কেহই যাইতে পারেন না? বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে সকল কথা জানান হইবে। সকল কথা জানান হইলেই যদি কাজ মিটিত, তাহা হইলে রুজভেল্টকে মার্কিণ হইতে কুইবেকে যাইতে হইল কেন? এ দিকে কাসাব্লাঙ্কায় সম্মিলনের সময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটি কথা এই বলিয়াছিলেন যে It is just a British and American Conference অর্থাৎ "ইহা ইংরেজ ও মার্কিণের পরামর্শ-পরিষদ।" অন্য দিকে রুশিয়ার টাস্ নিউজ এজেন্সি সংবাদ দিয়াছেন যে, "আগামী কুইবেক পরামর্শ-বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিলের যে সম্মেলন বসিবে, তাহাতে কেবল চার্চ্চিল এবং রুজভেল্ট সদলে যোগ দিবেন, সোভিয়েট সরকারকে ঐ বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই।" এ কথা শুনিয়া কেবল এ দেশের নয়, বিলাতের অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বৈঠকে যদি ষ্ট্যালিনের যোগ দেওয়া অসম্ভবই হইয়া থাকে, তাহা হইলে মলোটোভ, মৈস্কি বা লিট্‌ভিনফই বা অন্য কোন ব্যক্তিই বা যাইতে পারিলেন না কেন? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা এই যুদ্ধ কেন বিলম্বিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, অনেকের মনে এইরূপ ধারণাই জন্মিতেছে। ষ্ট্যালিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত জিদ ধরিয়াছেন। কিন্তু কি জানি কেন, মার্কিণ এবং ইংরেজ তাহাতে বিশেষ অগ্রসর হইতেছেন না। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি হইলে জার্ম্মাণীকে পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে অনেক সৈন্য সরাইয়া লইতে হইত; তাহাতে বিপদও কিছু ছিল। কিন্তু যুদ্ধ বিলম্বিত হইলে রুশিয়াকেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, ইহাই রুশিয়ার ধারণা। চীন প্রাচ্য শক্তি। কাজেই এই কুইবেক-সংসদে জাপানের সহিত কিরূপ ভাবে সংগ্রাম চালাইতে হইবে, কেবল তাহার পরামর্শ করিবার জন্য চীনকে কুইবেক পরামর্শ-পরিষদে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। চীনের পররাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার টি ভি সুঙ্গ এই সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন। যত দূর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে অনুমান, প্রাচ্য এসিয়াখণ্ডে জাপানের সহিত সংগ্রাম পরিচালনার সকল

কথাই রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল ডক্টর সুঙ্গের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ফলে এবার যুদ্ধের জাল গুটাইবার জন্ত কতকটা ব্যবস্থা যেন কুইবেকে করা হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। য়ুরোপ-খণ্ডে নানা দিকে রণাঙ্গনের এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপান্তে ব্যাপক ভাবে যুদ্ধের আয়োজনে বোধ হয় এইবার যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে এবং যুদ্ধান্তে বিধাতা মিত্রশক্তিকে জয়-মাল্য দিবেন। অবশ্য এ সকল অনুমানের কথা। তবে লক্ষণে এই অনুমানেরই সমর্থন পাই। এখন যত শীঘ্র এ সংগ্রামের অবসান হয় ততই মঙ্গল।

কিন্তু ইহার আর একটা দিকও যে নাই তাহা নয়। মুসোলিনীর পতনের পর রাজা ইমানুয়েল এবং মন্ত্রী বডোগিলিও সম্মিলিত শক্তির সহিত সন্ধি করিবেন, অনেকে ইহাই আশা করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধে ইটালীই দেখিতেছি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু ইটালী সন্ধি করিল না। এই ভাঙ্গা বাজারে ইটালী কিসের আশায় সংগ্রাম করিতেছে? ব্যাপার বুঝা কঠিন। অবশ্য সম্মিলিত শক্তিবর্গ অর্থাৎ মার্কিণ ও বৃটেন তাহাকে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরম পরাজয় হইলে ইটালীকেও শেষে তাহাই করিতে হইবে। ইটালীও তাহা বুঝে। তবে এ অহেতুক বিলম্ব কেন? তবে কি ইটালীর মনে এখনও সংশয় আছে যে, অক্ষশক্তিবর্গ হয়তো পরিণামে জয়লাভ করিতে পারে? এবারকার নৈদাঘ অভিযানে জার্ম্মাণী রুশিয়ার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, ইহা ত ইটালী দেখিতেছে। তবে তাহার আশা কোথায়? কেবল জার্ম্মাণীর অনুরোধে বা ভয়ে যে ইটালী এখনও নৈরাশ্যময় যুদ্ধে যোগ দিয়া রহিয়াছে—ইহা মনে করা কঠিন। তবে ইটালী এখন আর কিসের আশায় সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে—তাহা বুঝা কঠিন। ইতোমধ্যে জার্ম্মাণী জাপান ও ইটালীর একটা পরামর্শ-পরিষদ হইয়া গিয়াছে। শুনা গিয়াছে, তাহার কথা বিশেষ জানিতে পারা যায় নাই।

জাপান এদিকে সাগরবক্ষে যতটা স্থান দখল করিয়া লইয়াছে, —ততটা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু পূর্ব্ব উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রাদি রক্ষা করিবার জন্ত সে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সিঙ্গাপুর রক্ষা করিতে পারিবে মনে না করিলে জাপান কখনই অত্যন্ত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া সিঙ্গাপুরের ডুবা ডক আবার ভাসাইত না। ফলে সম্মিলিত পক্ষের জয়লাভের লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও অক্ষপক্ষ যে একেবারে হতাশ হইয়াছে, এমন মনে হয় না।

'ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।' বিধাতার মনে কি আছে, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। আর যুদ্ধের পরে আমাদের দশা কি হইবে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ভারতবর্ষ যদি কেবল চাষার দেশে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। উহাতে ভারতেরও ক্ষতি, পৃথিবীরও ক্ষতি। তাহা বুঝিবার মত মনোবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদীদিগের নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

দৃষ্টি-রহস্য

দুঃখ পেয়েছ ধরণীর কোলে বুঝি?
তাই বুঝি তব আঁখি দু'টি ছল-ছল?
ভুলে যাও প্রিয়ে—নহিলে উপায় নাহি
হিসাব খতায়ে কি ফল পাইবে বল!

ক্ষুদ্রতা আর ঈর্ষা দিয়াছে পীড়া?
কহিছ সে কথা? কহিয়া লাভ কি আছে?
জীবন-দ্বন্দ্বে যত কিছু হলাহল—
নহে তা অজানা মোর বুদ্ধির কাছে।

এই সংসার—এ যেন বনাত কালো—
ময়ূর-কণ্ঠী রঙ আছে তারি মাঝে,—
সামনে দেখিলে দেখিবে শুধুই কালো—
বাঁকায়ে ধরিলে সুন্দর রঙে সাজে!

যে কবি গাহিছে "ছিন্ন করিয়া লহ
বিলম্ব আর সহিছে না এ জীবনে"—
সেই তো গাহিছে আনন্দ-বিহ্বল
"মরিতে চাহি না সুন্দর এ ভুবনে!"

অঙ্গার আর হীরক—বস্তু একই—
আলোর খেলায় তফাৎ অনেক তবু!
মনের রঙেতে যেমন রঙাবে তুমি—
বিষাদ-তিমির এ ধরা মোহন কভু!

শিল্পীর চোখে শিল্পের সেরা দারু—
আর কারো চোখে কাষ্ঠ মাত্র তাই!
লোষ্ট্র বলিয়া তুচ্ছ ভাবিবে যাবে
শিল্পেতে তারি তুলনা হয়তো নাই!

চিত্তে তোমার রসের পিপাসা আছে,
সরস চক্ষে হের জগতের রূপ—
দৈনন্দিন আঘাতে জীর্ণ ধরা
দৈন্য লুকায়ে প্রভাতিবে অপরূপ!

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী।

বিজ্ঞান-জগৎ

কার্টুন পুতুল

ফিল্মে যে কার্টুন-ছবি আমরা দেখি,—সূক্ষ্ম এবং পর্য্যায়-সঙ্গত গতিভঙ্গীসহ প্রাণী ও বস্তু-নিচয়ের ছবি আঁকিয়া তাহারি ফটো তুলিয়া সে কার্টুন-ছবির সৃষ্টি হয় বলিয়া জানি। কিন্তু জর্জ্জ প্যাল্ নামে এক জন হাঙ্গারিয়ান্ ফটোগ্রাফার আঁকা ছবির সাহায্যে নয়,

পুতুলের বিধাতা
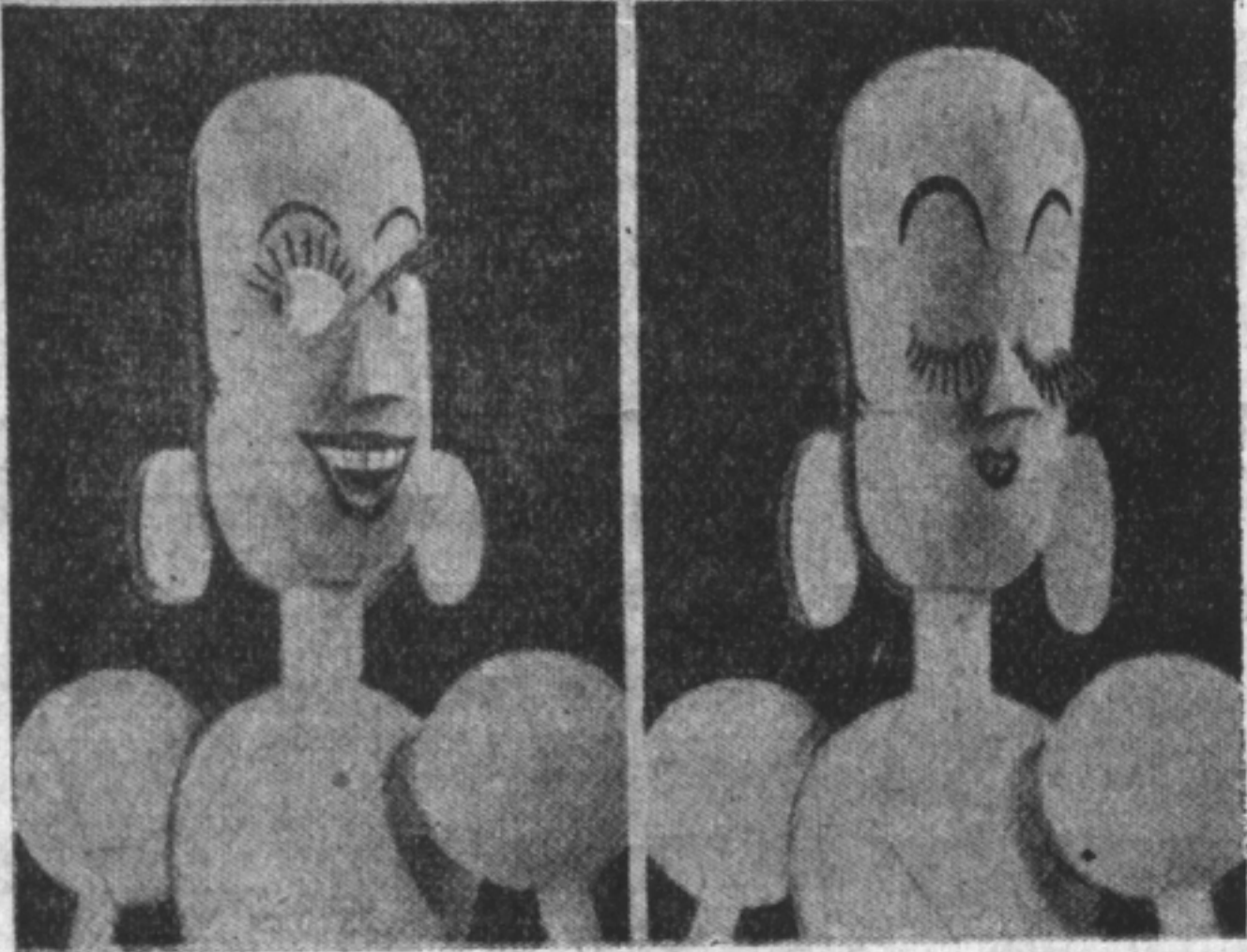
ভঙ্গী-ভরা পুতুল

হাতের তৈয়ারী পুতুল লইয়া এমনি কার্টুন-টকি-ফিল্ম তৈয়ারী করিতেছেন। প্রত্যেকটি পুতুল-প্রাণী অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ রকম মুখ-চোখের বিচিত্র ভঙ্গীসহ তিনি তৈয়ারী করেন এবং প্রয়োজন-মত দৃশ্য ও ভাবসঙ্গত ভঙ্গী-চিত্রিত পুতুলকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র-সাহায্যে গতি দিয়া সচল সজীব মূর্ত্তিতে ক্যামেরার সামনে অভিনয় করাইয়া তাদের ছবি তুলিতেছেন।

নিশি-চশমা

জাপানের এক চক্ষু-চিকিৎসক বিচিত্র চশমা তৈয়ারী করিয়াছেন। এ চশমা চোখে দিলে রাত্রির অন্ধকারেও লেখাপড়া করা কিংবা কোনো কিছু দেখার কাজ খুব সহজ ও অনায়াস হইবে। রিফ্লেক্টরে তিনি চশমার লেন্সের দু'ধার মুড়িয়া দিতেছেন, এবং এই রিফ্লেক্টরের উপর বসাইতেছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকারের বাল্‌ব্। লেন্সের ঐ ধার-মুড়ির সঙ্গে চুলের মত মিহি তার লাগাইয়া তাহার এক প্রান্তে আঁটিয়াছেন পকেট-ড্রাই-সেল ব্যাটারি। ব্যাটারির গড়ন পেণ্ডাণ্টের মত; কাজেই ইহাতে সৌখীনতার ত্রুটি ঘটিবে না। সুইচ টিপিবামাত্র বাল্‌ব্ জ্বলে এবং সে আলো রিফ্লেক্টরে প্রতিচ্ছুরিত হইয়া দ্রষ্টব্য কাগজ প্রভৃতিতে গিয়া পড়ে—কাজেই সব কিছু সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

চশমার আলো

দন্তরুচিকৌমুদী

দাঁতের স্বাস্থ্যের উপর আমাদের দেহের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরমায়ু নির্ভর করে—প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা এ যুগের বৈজ্ঞানিকেরা এ সত্য
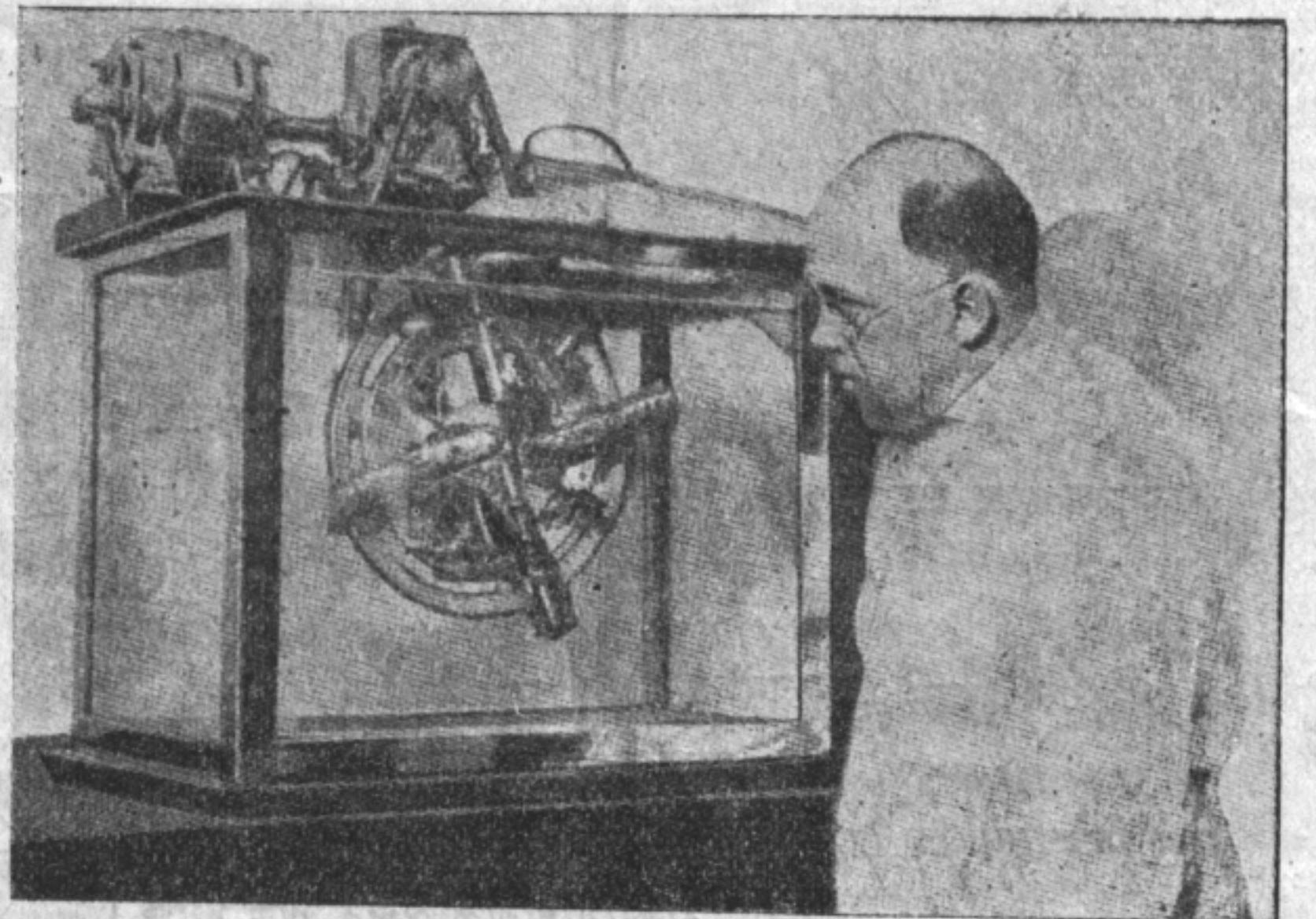
দাঁত পরীক্ষা

সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। রোগ-বীজাণুর শক্তি-প্রতিরোধে আমাদের দাঁতের শক্তি অসাধারণ। দিনে পাঁচ-সাত বার করিয়া দন্ত-মার্জ্জনা করা উচিত। কোনো কিছু আহার করিলে—পাণ-সিগারেট সেবন করিলেও তখনি দন্ত-মার্জ্জনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে খাদ্যের অতি ক্ষুদ্র কণাও না জমিয়া থাকে, সাবধান! মাঝে মাঝে দন্ত-চিকিৎসকের কাছে গিয়া দাঁত দেখানো খুব ভালো। দাঁতে ব্যথা হোক না হোক, তবু! পরিপাক-শক্তির গোলযোগের মূলে আছে দাঁতের অস্বাস্থ্য, এ-কথা ভালো করিয়া জানিয়া রাখিবেন। দাঁতের গায়ে যে টার্টার জমে, সে টার্টারকে বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। টার্টার জমিলেই যোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা সমূলে তার বিনাশ-সাধন করিতে হইবে। দাঁতের গায়ে যে এনামেল আছে, সে এনামেল দাঁতের অপচয় ঘটিতে দেয় না। এই এনামেলে প্রচুর ফশ্‌ফরাশ্‌ আছে। দন্ত-মঞ্জনের জন্য যা-তা পাউডার বা পেষ্ট কদাচ ব্যবহার করিবেন না। সর্ষপ তৈল এবং লবণ দন্ত-মার্জ্জনার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। দাঁতের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ যন্ত্র-সাহায্যে থুতু পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞেরা বলিতে পারেন—দাঁতের স্বাস্থ্য কেমন, দাঁতের কিরূপ অপচয়ই বা কি ভাবে সংঘটিত হইতেছে। টিউবের মধ্যে থাকে দাঁতের এনামেল-চূর্ণ; যে ব্যক্তির দাঁতের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইবে, তাহার থুতু লইয়া এই টিউবের ঐ চূর্ণের সঙ্গে মিশাইয়া যন্ত্রমধ্যে টিউবটিকে চার ঘণ্টা কাল ঘ্রানো হয়। যদি দেখা যায়, থুতুর সঙ্গে মিশিয়া টিউবের এনামেল-চূর্ণ গলিয়া গিয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে, মুখে বিষ আছে; সেই বিষের ক্রিয়াবশতঃ স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া দাঁতের ক্ষয় হইতেছে। পরীক্ষান্তে যথারীতি চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

মোটর-মেরামতির চলন্ত কারখানা

মোটর-গাড়ী বিগড়ায়—কল-কব্জা ভাঙ্গে, বিকল হয় এবং নানা উপসর্গাদিও ঘটে। যুদ্ধে যে সব ট্যাঙ্ক ও ট্রাক চলে, সেগুলি পথে বিগড়াইলে মেরামতির জন্য কারখানায় পাঠানো—ভয়ানক ব্যাপার। এ বিপত্তি মোচনের জন্য জার্ম্মান সমর-বিভাগ মেরামতির সর্ব্ববিধ সরঞ্জামপত্র সঙ্গে লইয়া চলে। এ সব সরঞ্জাম থাকে ঐ ট্রেলারে। ট্রেলারে ওয়েল্ড করিবার উপযোগী অক্সি-এসেটিলিন সরঞ্জাম, ড্রিল-প্রেস, শাণ-যন্ত্র প্রভৃতির পাকা ব্যবস্থা মোতায়েন থাকে। নিপুণ মিস্ত্রীর দল ট্রেলার হইতে কারখানার এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করিয়া যথানুরূপ মেরামতির কাজ করে।
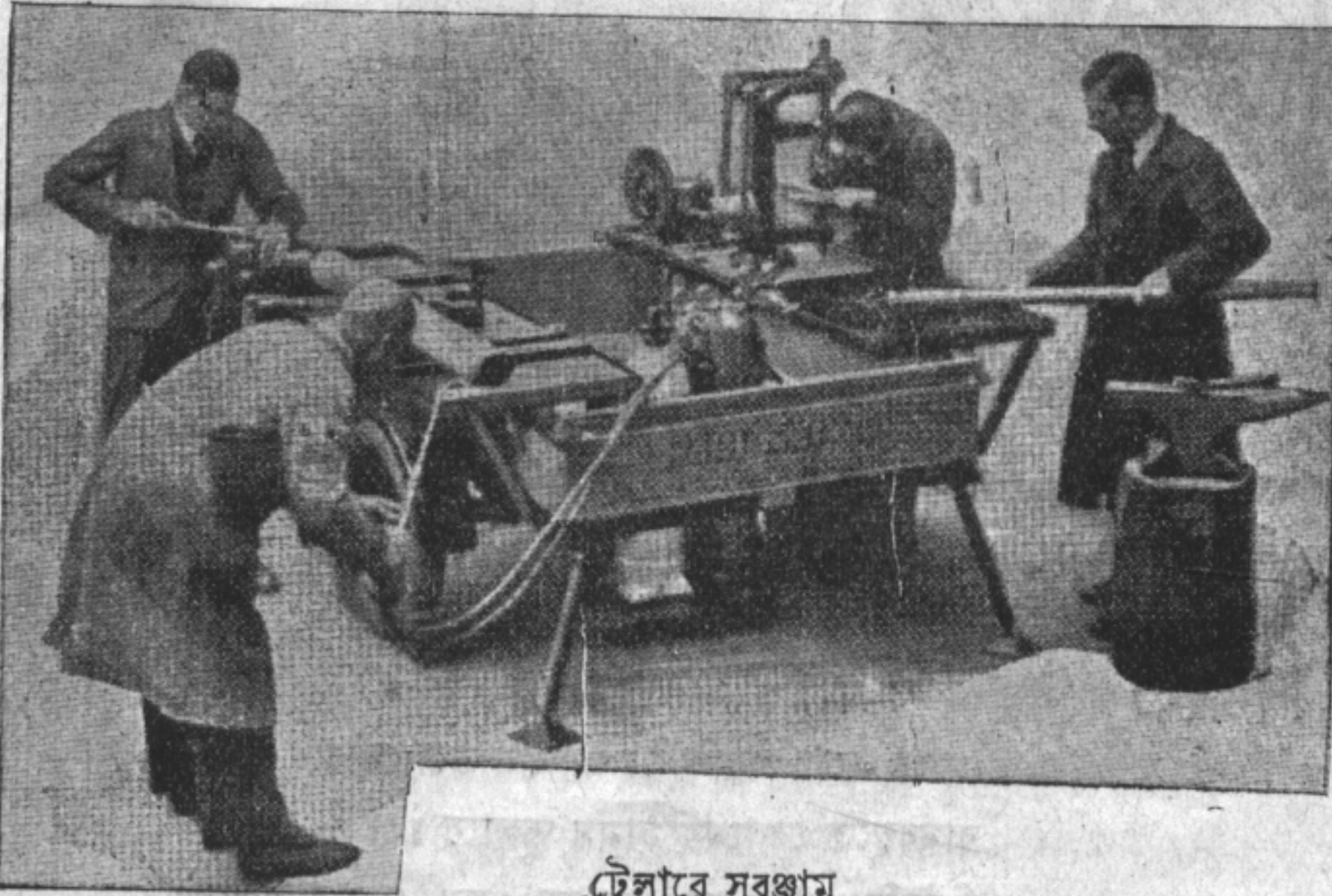
ট্রেলারে সরঞ্জাম

নিরাপদ্ ফটোগ্রাফার

ফিল্ম-ক্যামেরায় যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফটো তুলিয়া তাহা দেখাইলে ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এ সব ব্যাপারের ফটো তোলা নিরাপদ্ নয়। কি করিয়া এ সব ছবি তোলা যায়, তাহারি উপায় সংসাধনকল্পে মার্কিন সংবাদচিত্র-গৃহীতা আর্ভিং স্মিথ চর্ম্মাবরণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মুখে গ্যাস-মাস্ক—মাথায় ইস্পাতের টুপি এবং অঙ্গে গোলাগুলী-বারক প্যাণ্ট কোট ভেষ্ট। এ পোষাকে আত্মরক্ষা করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘনঘটার মধ্যে দাঁড়াইয়া ক্যামেরায় ইনি সে সব ব্যাপারের ছবি তুলিতেছেন নিরাপদে।

ক্যামেরাম্যানের পোষাক

পাল-তোলা বাইক

সৌখীন ফরাশী শিল্পীর মস্তিষ্কবলে সাইকেলের জন্য পালের ব্যবস্থা হইয়াছে। শীটের পিছনে তিনি ক্যাম্বিশের পাল খাটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দিকে চলিয়াছি বাতাস যদি সেই দিকে বহে, তবে এ-পালে বাতাস লাগিয়া বাইকের গতিকে সহজ ও বর্দ্ধিত করিবে; বাতাসের বিপরীত দিকে চলিবার সময় তেমনি সামনে চার-ব্লেডযুক্ত প্রোপেলারের তিনি ব্যবস্থা

পাল-তোলা বাইক

করিয়াছেন। হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে এই প্রোপেলার সংযুক্ত। প্রোপেলারের গুণে প্রখর বায়ুবেগ কাটাইয়া স্বচ্ছন্দে বাইসিকেল চালানো যায়।

—

ফৌজের নদী পার

নদী পার

অসংখ্য বাহিনীকে একসঙ্গে ও চকিতে বড় বড় নদী বা জলাশয় পার করাইবার জন্য জার্মান সমর-বিভাগ রবারের প্রশস্ত ভেলা তৈয়ারী করিয়াছে। ভেলাগুলিকে একত্র সংযুক্ত করিয়া মোটর-লঞ্চের সহিত বাঁধিয়া দিলে সহজেই ফৌজ-বাহিনীকে পার করার কাজ সুসিদ্ধ হয়। প্রশস্ততা হেতু যে সব বড় বড় নদী বা হ্রদ প্রভৃতির উপর দিয়া কোনো রকম সেতু তৈরী করা সম্ভব হয় না, কিংবা সেতু রচনা করিতে কালবিলম্ব ঘটে, সেই সব নদী ও হ্রদ পার করার পক্ষে রবারের ভেলার উপযোগিতা অপরিসীম।

—

ইলেক্‌ট্রিক টুথ-ব্রাশ

বিদ্যুৎকে লইয়া মানুষ আজ কি সেবা-পরিচর্য্যার কাজই না করাইয়া লইতেছে! আমেরিকায় বিদ্যুৎশক্তি-বাহিত নূতন টুথ ব্রাশের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাশটি চক্রের মত সুগোল। প্লাগে আঁটিয়া এ ব্রাশ লইয়া মুখের ভিতর ধরিলে দাঁত এবং দাঁতের মাড়ি পরিষ্কার করা যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের গুণে মুখ-বিবরের শিরা-উপশিরাগুলির মেশাজও (massage) সুনির্বাহিত হয়; দাঁত কোনো দিন অসুস্থ হইবে না—দেহের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এ টুথ-ব্রাশ হাতে ধরিয়া দাঁতে ঘষিতে হয় না। দাঁতে ব্রাশ ধরিয়া প্লাগে সংযুক্ত করিলে ব্রাশ আপনা হইতে পরিমার্জ্জনা-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবে।

ইলেক্‌ট্রিক টুথ-ব্রাশ

শরতে

নদীর বুকে শরৎ এলো ভরা পালের নৌকাতে,
কূলে তাহার কেশের চামর দুলায়ে।
বন-বাগানে শরৎ এলো ছাতিম ফুলের মৌতাতে
মধুকরের নয়ন নেশায় ঢুলায়ে।
হ্রদের জলে শরৎ এলো সারস হাঁসের উৎসবে,
মাঠে মাঠে পীবর আশায় চিকণ-শ্যামল বৈভবে।

গোষ্ঠে এলো পয়স্বিনীর আপীন-ভরা গৌরবে
রামধনুতে ব্যোমের মানস ভুলায়ে॥
শিউলি ফুলের লাজ ছড়ায়ে এলো মেঘের অঙ্গনে
আলিম্পনের চিত্র-শোভায় ডালিম বনের রঙ্গনে,
অঙ্গনাদের অঙ্গে এলো লাবণ্যে হার-কঙ্কণে,
কূজন তুলে এলো পাখীর কুলায়ে॥

শ্রীকালিদাস রায়

গার্গী

[গল্প]

বিবাহের পরে বাসব জানিতে পারিল, বধূ পাগল !

ফুলশয্যার রাত্রি। ফুলের শয্যায় গার্গী হঠাৎ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। বিস্ফারিত নেত্রে বাসবের মুখের পানে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, এই মালাগুলো যদি আমি ছিঁড়ে ফেলি ? আর এই আলমারীর কাচখানা যদি ভাঙ্গি, ভারী মজা হয়, না ? বলিয়া হি-হি করিয়া সে হাসিতে লাগিল।

চমকিয়া বাসব শয্যায় উঠিয়া বসিল। কথার সঙ্গে গার্গীর দুই চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি—তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, সে বিকৃত-মস্তিষ্কা কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে।

টেবলের উপর হইতে তাড়াতাড়ি গোলাপের ডিক্যান্টারটা লইয়া গার্গীর মাথায় খানিকটা জল ঢালিয়া দিল। গাজিপুরের উৎকৃষ্ট গোলাপের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল।

বাসব কহিল,—নাও, শুয়ে পড়ো। মাথা তোমার বড্ড গরম হয়েছে ! আমি বাতাস করছি।

স্থির দৃষ্টিতে গার্গী কিছুক্ষণ বাসবের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—তুমি তো বর ! তুমি আমাকে বাতাস করবে ? তোমায় দেখতে বেশ !

এ-সব কথার উত্তর না দিয়া বাসব কহিল,—হাঁ, বেশ ! এখন তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকিনি। বাসবের সর্ব্বাঙ্গ ছম্-ছম্ করিতেছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া গার্গী বাসবের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। যেন কত কি ভাবিতেছে—তার পর দুম্ করিয়া বাসবের উরুর উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাসবের সমস্ত রাত্রি কিন্তু জাগিয়া কাটিল।

শ্বশুর-বাড়ীর স্নেহ-মমতা, যত্ন-আদর সমস্তই মনের মধ্যে তাজা রহিয়াছে। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদের মমতাসিক্ত আচার-ব্যবহার-গুলা বাসবের অন্তরকে প্রীতিমুগ্ধ করিতেছিল,—এখন সেই তাহাদেরই উপর মন একেবারে বিষাইয়া উঠিল। প্রতারণা করিয়া একটা পাগল মেয়েকে তার ঘাড়ে তারা চাপাইয়া দিয়াছে ! এ বোঝা এখন তাহাকে বহিতে হইবে সারা জীবন !

বাসর-ঘরেও গার্গী ঘুমাইতেছিল। পাঁচ জন যখন ফুলশয্যা করাইতে বসিয়াছিল,—তখনো সে নিদ্রায় ঢুলিয়া পড়িতেছিল ! ঘুমের ঝোঁকে সকলের সম্মুখে বাসবের বাঁ কাঁধে মাথা রাখিয়াছিল। সকলে হাসিয়াছিল ; কিন্তু গার্গী লজ্জা পায় নাই। এখন সে নিদ্রা-বিহ্বলা।

গার্গীর সেই ঘুমন্ত মুখের পানে বাসব বার-বার চাহিয়া দেখিতে-ছিল। যেন সরল শিশুর মুখ ! দেখিলে মমতা হয় ! সুডৌল ললাটে অলকগুচ্ছ ছড়াইয়া পড়িয়াছে ! খোঁপায়-আটা গোলাপ, কণ্ঠে ফুলের মালা, সুগঠিত সুঠাম মূর্ত্তি—দেখিলেই ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে ! কিন্তু জ্ঞানহীনা উন্মাদ !

বাসবের পা টন্‌টন্ করিতেছিল। মনে হইল, উরুর উপর হইতে গার্গীর মাথা তুলিয়া ফুটন্ত ফুলের মত মুখখানি উপাধানে রাখিয়া দেয় ! তখনি মায়া জাগিল,—যদি ঘুম ভাঙিয়া যায় ? না, না, এমনি থাক্।

আরও খানিকটা গোলাপ-জল গার্গীর মাথায় ঢালিয়া দিয়া নীরবে সে বসিয়া তাকে বাতাস করিতে লাগিল।

গার্গী চিৎ হইয়া শুইয়াছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসে বক্ষের উঠা-নামাতে বাসব নিদ্রার গাঢ়তা বুঝিল। তথাপি প্রস্তর-মূর্ত্তির মত সে বসিয়া রহিল। চোখে ঘুমের বাষ্পও আসিল না।

ভোরের আলোয় ঘর ভরিয়া গেল। গার্গীর ঘুম কিন্তু ভাঙ্গিল না। ওদিকে বাহিরে আর সকলকার জাগরণের সাড়া ; ক্রমে কাজ-কর্ম্মের কলরব জাগিল। এইবার উঠিতে হইবে। বাসব দুই হাতে সযত্নে ধরিয়া গার্গীর মাথা বালিশের উপর রাখিল ! গাঢ় নিদ্রা এতটুকু ভাঙ্গিল না।

ঘরের দ্বার খুলিয়া বাসব বারান্দায় পা দিবা মাত্র ভ্রাতৃজায়া ঊর্ম্মিলা সহাস্যে কহিল,—উঃ, এত বেলাতে উঠতে হয় ঠাকুরপো ! মা গো, কি বেহায়া ছেলে তুমি—না হয় বুড়ো বয়সেই বিয়ে হয়েছে ! এ কথা বলিয়া ঊর্ম্মিলা হাসিতে লাগিল।

—হুঁ—বলিয়া বাসব বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল। নিজের পড়িবার ঘরে ইজিচেয়ারে শুইয়া ছোট টেবলের উপর পা দু'টা তুলিয়া সে সমস্ত রাত্রির অনিদ্রা পোষাইয়া লইতে চক্ষু মুদিল।

* * * *

—ইস্, বেলা দশটা বেজে গেল—এখনো ঘুমোচ্ছিস্। ওঠ্ ! ওঠ্ ! আচ্ছা ছেলে যা হোক্ ! সঞ্জয় আসিয়া বন্ধুকে ধাক্কা দিল। বাসব চোখ মেলিয়া চাহিতে সঞ্জয় কহিল,—কি রে, আমাদের বিয়ে হয়নি ? না, আমরা ফুলশয্যা করিনি ? বাবা, বাইরে এসে যেন কুম্ভকর্ণ ! ওরে অধর, বাবুর চা নিয়ে আয়। তুই উঠেছিস্ ? না তোরও কাল ফুলশয্যা গেছে ?

বাসব উঠিয়া বসিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল,—ইস্, দশটা !

অধর চা লইয়া আসিল।

—বোস্ ভাই ! মুখটা ধুয়ে আসি। বলিয়া বাসব উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তোয়ালেতে মুখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। বসিয়া কহিল,—হুঁ ! আমার মত যদি রাত জাগতে হতো, সব মিয়াই বুঝতেন তাহলে !

—থাম্ ! নিজের মুখে আর জাঁক করতে হবে না ! তুই কি রকম রাত জেগেছিস্—খাড়া এক পায়ে দাঁড়িয়ে গিন্নীকে বাতাস করেছিস্ না কি ?

চায়ের পেয়ালা অধরের হাত হইতে লইয়া বাসব কহিল,—তারও বেশী।

—কি রকম ? বল্ ভাই সত্যি !

—সে বলবার নয় ! ভয়ঙ্কর রোমান্স ! বলিয়া মুচ্‌কাইয়া হাসিল।

—ননসেন্স ! খালি বকামি ! জানি তো তোকে চিরকাল কুম্ভ-কর্ণের পকেট-এডিশন তুই ! আজ সে নিরীহ বেচারার কাঁধে দোষ চাপাচ্ছিস্ ? বলিয়া সে তখনি আবার কহিল,—তোর গিন্নীও তো

খুব ঘুমোতে পারে—আমায় গিয়ে বল্লে—তোরা তাহলে মাণিক-জোড় মিলেছিস্ দেখছি!

বাসব উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

সঞ্জয় কহিল,—বল্ না, প্রথম রাত্রির কথা। আমার বউ আমার সঙ্গে প্রথম কি বলেছিল, জানিস্? অনেক সাধ্য-সাধনার পর কথা কইলে,—বললে,—কাল আমি বাপের বাড়ী যাবো! কিন্তু সে ছিল তখন তেরো বছরের মেয়ে—তাও আবার আট বছর আগে; কিন্তু তোর তো তা নয়! তোর বৌ কি বললে বল্?

রহস্যের সুরে বাসব কহিল,—তোর ভারী আপশোষ হচ্ছে না সঞ্জয়—ছোট বেলা বিয়ে হয়েছিল বলে?

—নিশ্চয়! কম দুঃখ! দিদিমার ওপর কম রাগ হয়। নাত-বৌয়ের মুখ না দেখে বৈকুণ্ঠে যেতে পারছিল না! হুঁঃ! একটু রোমান্স করতে পারলুম না! এমন একটা কচি মেয়ে!

বাধা দিয়া বাসব কহিল,—তুই নিজে বুঝি তখন মস্ত লায়েক ছিলি!

—আরে ভাই, দুঃখ তো ওইখানেই। আমার বয়স তখন সবে আঠারো। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি। বৌয়ের সঙ্গে কথা কইতে গেলে লজ্জা হতো। পাছে কেউ কোথা দিয়ে দেখে ফেলে! বৌদি ডেকে যতক্ষণ না ঘরে শুতে দিয়েছে, যেতে পারিনি! আরে ছ্যা, ছ্যা। তার পর বি-এ পড়লুম! এল-এ, পাশ করলুম। জীবনে কত স্বপ্ন জাগলো, কিন্তু সব মাটী—সেই বালিকা-বধূ তখন মস্ত গিন্নী—একেবারে যৌবন-সায়াহ্নে উপনীতা—গোটা পাঁচেক কাচ্চা-বাচ্চার মা! হাঁড়ি-মুখ করে সংসার কচ্ছেন। না আছে সখ, না আমোদ!

বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া বাসব হাসিতে লাগিল।

সঞ্জয় কহিল,—সত্যি বলছি বাসব, তোদের সুখের দিকে চেয়েই আমার এখন বেঁচে থাকা। ডাক্তারী ফাইনাল দিয়ে তবে বিয়ে করলি! এর জন্যে তোকে ধন্যবাদ। বেশ করেছিস্,—জীবনে এই তো তোদের বসন্ত এলো!

বাসব সুরে গাহিল,—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী;
সখি জাগো জাগো!!"

সঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল, বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া মহানন্দে কহিল,—ব্রাভো! ব্রাভো! সত্যি রে,—"মেলি রাগ-অলক-আঁখি—সখি জাগো, জাগো—।" এই যে তুই যখন কলে বেরুবি, বউ এসে তোর গলায় টাই বেঁধে দেবে। আমার মত বলবে না, খুকী, তোর অমুকের কাপড়গুলো গুছিয়ে দে, আমি ঠাকুর-ঘরে যাচ্ছি!

বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া বাসব কহিল,—তা হলে আমি ভাগ্যবান্ বল্!

—নিশ্চয়! এ কথা আবার জিজ্ঞেস করছিস্! অমন সুন্দরী বউ—আজ যুগল মূর্ত্তি দর্শন করে চক্ষু সার্থক করে যাবো। বাসব হাসিতে লাগিল।

* * * *

ঠাকুর-ঘর হইতে রমলাকে আজ একটু সকাল সকাল নামিতে হইল। ভাঁড়ার দেখিতে হইবে। বাড়ীতে আজ পুরুষ-যজ্ঞি। বাসবের বৌ-ভাত! কাল ফুলশয্যায় মেয়ে-নিমন্ত্রণ শেষ হইয়াছে!

বাসব আসিয়া ডাকিল, মা—

পুত্রের আহ্বান কাণে বাজিতেই রমলা মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—কি রে, ডাকছিস্?

—হ্যাঁ মা, একবার শুনে যাও।

রমলা চমকিত হইলেন। কহিলেন,—এখনি যেতে হবে?

পুত্র কহিল—হ্যাঁ, একবার এ ঘরে এসো।

—যাই! ও বড় বৌমা, তোমার জা ঘুম থেকে উঠেছে—তা হলে তার জল-খাবারের ব্যবস্থা করে দাও। সরবৎ ভিজুনো আছে। বলিয়া তিনি পুত্রের সহিত নিজের শয়ন-কক্ষে আসিলেন।

বাসব জননীর পালঙ্কে বসিল। মায়ের পানে চাহিয়া কহিল,—পাগলের সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে দিয়েছ?

রমলার মুখে বেদনার ছায়া! তিনি কহিলেন,—আমি কিছু জানি না বাছা।

—তুমি জান্‌তে না, ও পাগল?

—আমি? হ্যাঁ, আমি? না! বিয়ের আগে শুনেছিলুম, শক্ত ব্যামোর মাথা কেমন একটু—

—তবু রাজী হয়েছিলে?

থতমত খাইয়া রমলা কহিলেন,—আমি নই বাবা—তোমার উনি।

—কিন্তু তুমি আমায় সে কথা জানাওনি কেন মা?

—উনি শক্ত নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, বাসবের কাণে কথাটা তুলো না—বেঁকে বসতে পারে।

—চমৎকার! আমার বিয়ে হবে—অথচ আমি জানবো না যে, একটা পাগলকে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ! তোমার পেটে আমি জন্মেছি, তুমি তো আমার বিমাতা নও, মা!

রমলার মুখ কালো হইয়া গেল। আহত স্বরে তিনি কহিলেন,—অমন করে বলিস্‌নি বাসু—আটটা দিন কোনো রকমে সয়ে থাক্ বাবা।

অবাক্ হইয়া বাসব কহিল,—তার মানে? আট দিন পরে কি এমন মিরাক্‌ল্ ঘটবে যে—

ইতস্ততঃ করিয়া ঢোঁক গিলিয়া রমলা কহিলেন,—পাগল নিয়ে কি মানুষ ঘর করতে পারে বাবা? আমি ওঁকে অনেক মানা করেছিলুম। বলেছিলুম,—বাসু জন্মের মত অসুখী হবে। তাতে জবাব দিলেন,—চোখ-কাণ বুজিয়ে আটটা দিন কাটিয়ে দিও।

—এই আটটা দিনের মানে আমি এখনও বুঝতে পাচ্ছি না মা। বাসবের কণ্ঠ রুক্ষ, নীরস।

—আহা, বুঝছিস্ না! তার পর বৌমা বাপের বাড়ী চলে যাবে—বাস! তা না হলে আমরা গেরস্ত-মানুষ—এত যজ্ঞি জালা সাত দিন ধরে করবার মানে কি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাসব প্রশ্ন করিল,—এর মানে কি? কি তোমাদের প্ল্যান? আমায় স্পষ্ট বুঝিয়ে বলো।

রমলা একটু রাগ করিলেন। কহিলেন,—ছাখো বাসু, অমন গোঁয়ারের মত আমার সঙ্গে কথা কয়ো না। আমি কি জানি? আমাকে দোষী করা। যা বলতে হয়, ওঁর কাছে গিয়ে বলো।

—বেশ, বাবার কাছেই আমি যাচ্ছি।

* * * *

পিতৃ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিনা-ভূমিকাতে বাসব কহিল,—আমার সঙ্গে আপনি এক পাগলের বিয়ে দিয়েছেন ?

মেডিক্যাল জার্ণালখানা হাত হইতে নামাইয়া টেবলে রাখিয়া চারু বাবু কহিলেন,—চুপ ! চুপ !!

অসহিষ্ণু কণ্ঠে পুত্র কহিল,—কি চুপ করবো বাবা ?

—আহা, এ ব্যাপার নিয়ে এত গোলমাল কেন ? আমি কাঁচা কাজ করিনি। এই ক'টা দিন পরেই ও চলে যাবে তো।

—কেন চলে যাবে ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চারু বাবু কহিলেন—পাগল কখনো স্বামীর ঘর করে ?

—তবে বিয়ে হলো কেন ?

বিরক্ত কণ্ঠে চারু বাবু কহিলেন—অমন জেরার মত কথা কইছো কেন ? ওকে যে ঘুমোবার ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছিলুম, তার এ্যাক্‌সন কি কেটে গেছে ? তা হলে বড় বৌমাকে বলো, জলের সঙ্গে গুলে আরও দু'টো দিতে। ঘুমিয়ে পড়বে'খন। কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না।

বাসব ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল। কণ্ঠে ভাষা যোগাইল না। তাহার চিকিৎসক পিতা জানিয়া শুনিয়া এক বিকৃত-মস্তিষ্ক মেয়েকে পুত্রের কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছেন !

চারু বাবু পুত্রের পানে চাহিয়া সগর্ব্বে ঈষৎ হাস্য করিলেন। কহিলেন—দেবেন মল্লিক কি শুধু শুধু চল্লিশ হাজার টাকা নাতনীর বিয়েতে বার করেছে বাপু ? পঁচিশ হাজার যা নগদ দিয়েছে, তা থেকে তোমায় আমি পনেরো হাজার দিচ্ছি বিলেতের খরচা, তুমি তো আই, এম, এস পড়তে যেতে চাইছ। বাকী টাকা রইল—ফিরলে তোমার মোটর গাড়ী ইত্যাদি আরও পাঁচ রকম খরচ আছে তার জন্য ! আমার গাড়ীতে তোমার কিছু প্র্যাক্‌টিস করা চলবে না ! বলিয়া পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—শুধু লেখাপড়া শেখা আর পুঁথিগত পণ্ডিত হলেই দুনিয়ায় চলা যায় না। একটু খেলোয়াড়ী বুদ্ধি পুঁজি রাখতে হয় ! বুড়োর এই সদুপদেশটুকু মনে রেখো।

বাসব চুপ করিয়া রহিল।

চারু বাবু বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। কহিলেন—একটা পাগলের অত্যাচার ! তাও তেমন নয়। আমি জানি, ও মারধর করে না কখনো ! ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি ! কেউ বুঝতে পারবে না। এই সব হাঙ্গাম চুকলে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। ল্যাঠা চুকে যাবে। বাস্‌ !

—ওরা তা হলে আপনাকে জানিয়েছিল যে মেয়ে পাগল ?

—বিলক্ষণ ! জানিয়েছিল মানে ? ওর টাইফয়েডে আমিই তো চিকিৎসা করেছিলুম। বাঁচবার আশা ছিল না ! বাঁচলো, কিন্তু ব্রেন হয়ে গেল নষ্ট। দেবেন বাবু খুব ভয় পেলেন। বল্লেন, —কি হবে ? এই একটা নাতনীই আমার সম্বল—এ যে মরার বাড়া হলো ডাক্তার বাবু ! কে একে নেবে ? আমি তাঁকে অভয় দিয়ে বল্লুম, আমি নেবো আমার ছোট ছেলের জন্যে। দেবেন মল্লিক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে একেবারে গলে গেলেন ! তাই তো বাড়ীখানি উদ্ধার করতে পেরেছি। ছিল তো ওরই কাছে মর্টগেজ ! একটা পয়সা না নিয়ে তোমার নামে লিখে দিলে ! এত উদারতা ! স্বার্থ না থাকলে—

বাধা দিয়া বাসব প্রশ্ন করিল,—দেবেন বাবুর সঙ্গে আপনি কি বন্দোবস্ত করেছেন যে, বিয়ের আটটা দিন কেটে গেলেই ওকে পাঠিয়ে দেবেন ?

—না বাসব ! তুমি এম-ডি পাশ করলে হবে কি—এদিকে জ্ঞান কিছু নেই ! এ কথা কেউ বলে ? না, ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে ? এ আমার মনোগত অভিপ্রায়। তুমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছো, তাই বললুম—সান্ত্বনা পাবে।

—কি বলে ফেরত দেবেন ?

—সোজা উত্তর—বলবো, পাগল নিয়ে কি ঘর করা যায় ? অসম্ভব !

—কিন্তু তিনি তো এ কথা গোপন করেননি।

—ও, কন্‌সেন্সে বাধছে ! তুমি আবার সেণ্টিমেণ্ট্যালিষ্ট ! আচ্ছা, সে আমি বুঝবো ! তুমি এখন এসো।

বাসব প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যায় নিমন্ত্রিতবর্গ সকলেই সমুপস্থিত। কিন্তু নব-বধূর সন্দর্শন কেহই পাইল না। ত্রিতলের এক নির্জ্জন নিরিবিলি কক্ষে বধূ গভীর নিদ্রায় নিমগ্না। চারু বাবু জাহির করিয়া দিলেন,—বধূ হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছে, তাই তিনিই এ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিকিৎসকের উপর কে আর কথা কহিবে !

* * *

কি একটা প্রয়োজনে বাসব ভিতরে আসিয়াছিল। ছোট বোন অনুজা কহিল,—বৌ বাপের বাড়ী যাচ্ছে বলে তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেছে।

—হুঁ ! বলিয়া বাসব ফিরিয়া যাইতেছিল,—সম্মুখে পড়িল গার্গী। পরনে বিবাহের লাল বেনারসী শাড়ী ! বাসবকে দেখিয়া টিপ করিয়া গার্গী তাহার পায়ে একটা প্রণাম করিল।

অনুজা হাসিয়া উঠিল।

গার্গী মুখ তুলিল। অনুজার পানে চাহিয়া কহিল,—হাসছো যে ! বরকে প্রণাম করবো না ? দাদু বলে দিয়েছে, দেবতা !

কপট গাম্ভীর্য্যে অনুজা কহিল,—হ্যাঁ, দেবতাই তো ! বরকে খুব ভক্তি করবে।

বাসব কিন্তু এ সকল কথা কানে তুলিল না, বা এতটুকু লজ্জিত হইল না ! গার্গীকে কহিল,—বাপের বাড়ী যাচ্ছো ! স্বর মমতাসিক্ত।

গার্গী উত্তর দিল,—হ্যাঁ।

—আবার কবে আসবে ?

—শাশুড়ী বললে—

বাসব কহিল,—শাশুড়ী বলতে নেই। বলো, মা ! কেমন ? মা বলো !

—মা তো নেই ! স্বর্গে গেছেন। বলিয়া গার্গী আকাশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইল।

বাসব কহিল,—না, আমার মা তোমারও মা ! মা বলতে হয়। মা বলো।

অপ্রসন্ন মুখে গার্গী কহিল,—মা !

রমলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাসব কহিল,—মাকে নমস্কার করো গার্গী!

বাসবের মুখের পানে চাহিয়া গার্গী রমলাকে প্রণাম করিল।

বাসব কহিল,—জিজ্ঞেস করো, কবে আবার তুমি আসবে!

কথাটা বলিয়া বাসব চাহিল মায়ের মুখের পানে।

যন্ত্র-চালিতের মত গার্গী কহিল,—কবে আবার আসবো মা?

একটা ঢোক গিলিয়া রমলা কহিলেন, যখন ইচ্ছা হবে, এসো মা। তোমারই তো ঘর! রমলার কণ্ঠ শেষের দিকে আর্দ্র হইয়া আসিল। চক্ষু সজল হইল।

বাসব কহিল,—চলো, বাবাকে নমস্কার করবে। বলিয়া মায়ের সম্মুখেই সে ডান হাত বাড়াইয়া গার্গীর বাম করপল্লব ধারণ করিল। ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া কহিল;—বাবার কাছে চলো।

ধীর পদে গার্গী স্বামীর সহগামিনী হইল।

ডাকে বাহির হইবার পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া চারু বাবু বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন।

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল পুত্র, পুত্রবধূ। গার্গী তাঁহাকে প্রণাম করিল।

চারু বাবু কহিলেন,—চল্‌লে বৌমা।

কবে আবার আসবো বাবা? দম্‌-দেওয়া গ্রামোফোনের মত কথাটা গার্গী উচ্চারণ করিল। পথে আসিতে বাসব এ কথাটা শত বার তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে।

—আসবে! হ্যাঁ, আসবে বই কি! চারু বাবু কটাক্ষে পুত্রের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, পুত্র গম্ভীর মুখে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তিনি কহিলেন, আমার মোটর তোমাকে আনতে যাবে। দাদুকে বলো, বাবা আসতে বলেছেন।

—হ্যাঁ, আপনি তো ডাক্তার বাবু! আমার বাবা তো স্বর্গে।

—হ্যাঁ রে বেটী, হ্যাঁ! ডাক্তার বাবু। এখন সে ডাক্তার বাবু তোমার শ্বশুর। দাদুকে বলো, শ্বশুর বলেছেন আসবেন তোমার কাছে। কেমন? বলিয়া চারু বাবু পুত্রবধূর পিঠ চাপড়াইলেন। কহিলেন, চলো, তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

বধূকে লইয়া যাইবার সময় বক্র দৃষ্টিতে তিনি একবার পুত্রের পানে তাকাইলেন। দেখিলেন, সে মুখের অন্ধকার যেন ঈষৎ লঘু দেখাইতেছে।

* * * *

ক'বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক রকম উলট-পালটও হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের এক মাসের মধ্যে চারু বাবু এক রকম জোর করিয়া পুত্রকে বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ দেবেন্দ্র বাবু বাসবের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন—ছেলে বৌ দু'জনেই যখন বুড়োকে ফাঁকি দিলে, তখন গার্গী তিন বছরের মেয়ে, ওকেই সর্ব্বস্ব করে মানুষ করেছি, ওই সোনার পুতুল আমার নয়ন-মণি হয়েছিল। কিন্তু কি রোগ যে ষোল বছর বয়সে ওকে ধরলো,—এগজামিনের টাকা জমা দেওয়া—আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখলুম! জানি তো কি দুরন্ত ব্যাধি। আমার ছেলে-বৌ দু'জনকে খেয়েছে। সহরের ডাক্তার কাকেও আর আমি বাকী রাখিনি তাদের দেখাতে! সেই রাক্ষস আবার ধরলো আমার গার্গীকে। কিন্তু বাসব, তোমার বাবার দয়াতেই ওকে ফিরে পেলুম! তাঁর চিকিৎসাতেই ওকে বাঁচালুম! কিন্তু মরার বাড়া হলো। জ্ঞান কোথায়? ওর মাতামহ আধ-পাগলা ছিল, বিয়ের আগে জানতুম না! বৌমার রূপ দেখেই ঘরে এনেছিলুম। কিন্তু ভাই, মহৎ প্রাণ তোমার বাপের। মানুষের যে এত বড় ছাতি হয়, আমি জানতুম না। চারু বাবু আমায় প্রতিশ্রুতি দিলেন, গার্গীকে তিনি নেবেন তোমার জন্য। আমি দেখেছি বাসব, ভগবান্ গার্গীকে যেমন দুঃখী করেছেন, তেমনি সৌভাগ্যও তাকে দিয়েছেন! তোমার মত দেবতাকে সে পেয়েছে; কিন্তু আমার পাপ কতখানি!—তোমার ঘাড়ে আমি পাগল চাপিয়ে দিয়েছি!

মৃদু হাস্যে বাসব কহিল,—যদি বিয়ের পর পাগল হতো? ওকে আমি ফেলে দিতুম?

তরু-পল্লবে সঞ্চিত বৃষ্টির জল বাতাসের মৃদু আঘাতে যেমন ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, বাসবের কথায় দেবেন বাবুর চক্ষু হইতে তেমনি অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। দুই হাত বাড়াইয়া বাসবকে আলিঙ্গনে বুকে টানিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—ওরে, যতীশের জন্য বুকটা আমার দিনরাত জ্বলছে। তুমি আমার সেই জ্বালা এত দিনে জুড়িয়ে দিলে ভাই। তুমি বেঁচে থাকো, বাসব, সুখী হও! জয়ী হয়ো। আমার যা কিছু সব তোমার বাসব। কান্নায় দেবেন বাবুর স্বর ভাঙ্গিয়া গেল।

ত্বরিত কণ্ঠে বাসব ডাকিল,—দাদু! দাদু! ও কি, অমন অস্থির হচ্ছেন কেন?

দেবেন বাবু বাসবের হাত চাপিয়া ধরিলেন। অনুনয়ের সহিত কহিলেন,—আমি কি তোমাকেই নিত্য-পূজা করি? ধ্যান করি? তুমিই কি আমার গুপীনাথ? গার্গীর স্বামী হয়ে দেখা দিয়েছো দাদা!

বাসব দাদা-শ্বশুরের হাত চাপিয়া ধরিল। দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—এত উতলা হবেন না, দাদু! আমি দেবতা নই, গুপীনাথ নই! আমি আপনার নাত-জামাই, গার্গীর স্বামী।

* * * *

বিলাতে বসিয়া দেবেন বাবুর নিকট হইতে বাসব যে ক'খানা পত্র পাইয়াছিল,—গার্গী কুশলেই আছে। দেবেন বাবু লিখিয়াছেন,—গার্গী মাঝে মাঝে তোমায় খোঁজে! তোমাকে দেখিতে চায়! অত্যন্ত অস্থির হয়। সে জন্য দেবেন বাবু লিখিয়াছিলেন,—তুমি গার্গীকে চিঠি লিখো বাসব, আমায় সে কেবল তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।

বাসব গার্গীকে চিঠি লিখিয়াছিল,—

গার্গী! আমার ফটো তোমায় পাঠালুম! আসবার সময় যে আংটি তোমার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে এসেছি, সেটা আঙুলে রেখো! কেমন? এ দেশ খুব ঠাণ্ডা! বরফ পড়ে। তুমি আমায় চিঠি দিও! দেবে তো? তা হলে আমার খুব আহ্লাদ হবে। এবার থেকে তুমি নিয়মিত আমার চিঠি পাবে।

হ্যাঁ, আমি যখন ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরবো, তখন তোমায় এ দেশে আনবো। আসবে তো তুমি? ইতি

তোমারই

বাসব।

বাসবের খানকয়েক চিঠির মধ্যে একখানার সে উত্তর দিয়াছিল। গার্গী লিখিয়াছিল,—

'তুমি কবে আসবে ? তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করে.!'

উত্তরে বাসব গার্গীর নামে নিজের একখানা ফটো আবার পাঠাইল।

পিতার পত্রে বাসব জানিতে পারিল, দেবেন বাবু পীড়িত, শয্যাশায়ী ; চারু বাবু তাহার চিকিৎসা করিতেছেন।

বাসব উদ্বিগ্ন রহিল গর্গীর কথা ভাবিয়া, গার্গীর কি হইবে ? ক্রমে পিতার পত্রে দেবেন বাবুর পীড়া বৃদ্ধি ; তাঁহার পরলোক যাত্রা সমস্ত সমাচার সে অবগত হইল। চারু বাবু পুত্রকে জানাইলেন, দেবেন বাবু তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির একজিউটার করিয়া গিয়াছেন চারু বাবুকে। বাসব যত দিন না শিক্ষা শেষ করিয়া দেশে ফিরিবে, তিনি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবেন। তিনি এবং গার্গী যদি হঠাৎ মরিয়া যান ; বাসব আবার বিবাহ করিলে বাসবের পুত্র-কন্যারা এ সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

পত্র শেষ করিয়া বাসব নিশ্বাস ফেলিল। গার্গী তাহার পরম শুভাকাঙ্ক্ষীকে জন্মের মত হারাইয়াছে !

পিতা-মাতাকে বাসব জানাইল, এই মুহূর্ত্তে তাহার গার্গীর নিকটে যাওয়া উচিত, কিন্তু তাহা যখন পারিল না, তখন পিতা-মাতাকে প্রবাসী পুত্রের একটি মাত্র অনুরোধ—গার্গীর সেবা, পরিচর্য্যা ও যত্নের যেন সামান্য ত্রুটিও না হয় !

পিতা আশ্বাস দিয়া পত্র দিলেন, গার্গীর দায়িত্ব , স্বামী বলিয়া একা বাসবেরই নয়। দেবেন বাবু শেষ নিশ্বাস ফেলিবার সময় গার্গীর দু'হাত ধরিয়া তাকে তাঁদের হাতে দিয়া গিয়াছেন।

বাসব নিশ্চিন্ত হইল। পড়াশুনায় মন দিল। ফিরিতে বাকী আর আটটা মাত্র মাস।

* * * *

বাসবের দেশে ফিরিতে আর দু'মাস বাকী, অকস্মাৎ চারু বাবুর পত্র আসিল—গার্গী মারা গিয়াছে। দুঃখ করিয়া চারু বাবু লিখিয়াছেন,—বাঁচাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু মৃত্যু যাহাকে লইবার জন্য হাত বাড়ায়, তাহাকে কে রক্ষা করিবে ?

পত্র-হাতে বাসব বহুক্ষণ আবিষ্টের মত বসিয়া রহিল। গার্গীর মৃত্যু—সে জন্য চোখে অশ্রু আসিল না, হৃদয়ে উল্লাসও জাগিল না। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, চিন্তা-শক্তি সমস্তই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যালোকের মত কেমন আচ্ছন্ন, আবৃত থাকিয়া তাহাকে জড়-পুতুলের মত করিয়া দিল।

সমস্তই নিয়তির বিধান ! ভাগ্যচক্র ! উপায় কি ?

দেখিতে দেখিতে দু'টি মাস কাটিয়া গেল। বিলাতের বড় ডিগ্রী লইয়া বাসব দেশে ফিরিল।

* * * *

মহোল্লাসে চারু বাবু পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। বাড়ী, গাড়ী, সার্ভিস—সমস্তই বাসবের জন্য গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন।

দেহের ত্বক্ মোচনের মত বিদ্রোহী ভাবগুলা বাসবের নিজের অজ্ঞাতেই মন হইতে ক্রমশঃ চলিয়া গেল। অন্তরের মালিন্যও মুছিয়া গেল।

এবার উঠিল বাসবের বিবাহের প্রস্তাব।

রমলা কহিলেন—উনি বলছেন তুমি নিজে দেখে-শুনে—তা হ্যাঁ রে বাসু, তোর মামিমার বোন-ঝি তিনটে পাশ করা ! খরচ-পত্তরও বেশ করবে, আমাকে ধরেছে বড্ড।

বাসব হাসিল, উত্তর দিল না।

শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কলেজে যাইবার জন্য বাসব প্রস্তুত হইতেছিল। গৃহের প্রত্যেকটা আসবাব গার্গীর পিতামহের প্রদত্ত। কোথায় আজ তাঁরা ? গলার টাই বাঁধা স্থগিত রাখিয়া কিছুক্ষণ সে জিনিষগুলার দিকে চাহিয়া রহিল।

কনে দেখা হইল। বাসব নিজে দেখিতে গিয়াছিল, মামিমার বোন-ঝি তিনটি পাশ-করা, সুদর্শনা হইলেও বাসবের পছন্দ হইল না। ডাক্তার চৌধুরীর মেয়ের কপাল ফিরিল।

বাসব এখন দস্তুরমত বড়লোক। বিবাহে ধুমধাম হইল। ইন্দ্রাকে পাইয়া বাসব নিজেকে যেন কৃতার্থ বোধ করিল।

দুঃস্বপ্নের মত গার্গীর স্মৃতি-বিস্মৃতিতেই আজ সুখ, আনন্দ !

* * * *

কারমাইকেল মেডিকেল্ কলেজের জুবিলী-উৎসবে চিকিৎসক-সম্মিলন হইয়াছে। রাঁচী মেণ্টাল হসপিট্যালের ডাক্তার সেন—কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। উৎসবে আহূত হইয়া তিনি আসিয়াছেন।

বাসবের খুড়তুত শালীর সে স্বামী। অর্থাৎ ইন্দ্রার কাকার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। বাসবের বিবাহে সে উপস্থিত হইতে পারে নাই। এখন শ্বশুরবাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসিয়া বাসবের সহিত পরিচয় হইল। বাসবের মুখের পানে চাহিয়া প্রথমে কেমন চমকিত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া নূতন ভায়রাভাইয়ের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল।

দিন কয়েকের মধ্যে বাসবের সহিত তাহার সৌহার্দ্দ্য বেশ জমিয়া উঠিল। বাসব নিজের গৃহে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইল। বিদায়ের প্রাক্কালে বাসবকে বিশেষ করিয়া ডাক্তার সেন অনুরোধ করিল,—তাঁহার কর্ম্মস্থানে গিয়া দিন-কয়েক অতিথি হইবার জন্য।

ইন্দ্রা কহিল,—দিনরাত পাগল দেখতে আপনার ভাল লাগে জামাই বাবু ? বিরক্তি ধরে না ?

—না ভাই, তাদের সুখ-দুঃখের কথা আমি শুনি। অনেক কথায়, অনেক ব্যথায় আমি তাদের বন্ধু হতে চাই ! তারা আমায় ভালোবাসে।

—উপকার সত্য কিছু হয় ?

—হয় বই কি। অনেকে সেরেও যায়।

—তবু পাগল। মা গো, মনে হলেই কেমন ভয় হয়।

—না, না, পাগল বলে অমন আঁতকে উঠো না ইন্দ্রা ! তাদের কথা ভাবতে হয়। দরদ দিয়ে তাদের দেখতে হয়। আহা, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করেছে। একটু ভালোবাসা তাদের জন্য রাখতে হয় বই কি ! মমতা নিয়ে চিকিৎসা করলে ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

বাসব এ আলোচনায় যোগ দেয় নাই। এখন উঠিয়া দাঁড়াইতে ডাক্তার সেন কহিল,—উঠছো ?

—হ্যাঁ, ঘরটা বড্ড গরম ঠেকছে।

বাসব বারান্দায় আসিল।

বাসবের পিতার ব্লাডপ্রেসার বাড়িয়াছে।

বাসব কহিল,—চেঞ্জে চলুন! ফুল রেষ্ট চাই।

—হুঁ, কিন্তু যাই কোথায়?

একটু চিন্তা করিয়া বাসব কহিল,—রাঁচী চলুন! শীতকাল, ওখানে ভাল বাড়ীও পাওয়া যাবে! ডাক্তার মিত্তির রয়েছেন!

—না, না, রাঁচী নয়! বাপ রে, রাঁচী! হঠাৎ দুই চোখ রক্তবর্ণ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে চারু বাবু কহিলেন,—কেন বলো তো, মতলব কি? আমায় পাগল পেয়েছো যে রাঁচী পাঠাতে চাও!

পিতার কথায় বাসব চমকিত হইল। পিতাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল,—তা বেশ তো, আপনার যেখানে ভালো লাগে চলুন। পাহাড়ে যেতে চান,—সমুদ্রের ধারে যেতে চান,—

এক অদ্ভুত হাসি হাসিয়া চারু বাবু কহিলেন,—আমি সব বুঝি বাসব! রাঁচী কথাটা তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো, তার মানে তুমি ভেবেছো আমার মাথা খারাপ! আমি পাগল হয়েছি!

—না! বেশ তো, আপনার ইচ্ছা না হয় আপনি কোথাও যাবেন না।

রমলা স্বামীর মাথায় বরফের ব্যাগ চাপিয়া ধরিলেন।

কক্ষ অন্ধকার করিয়া ফ্যানের রেগুলেটারটা বাড়াইয়া দিয়া বাসব পিতাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্লাডপ্রেসারের ঝোঁকে অস্থির চারু বাবু বকিতে লাগিলেন,—রাঁচী, না—খবর্দার। ও সব চলবে না আমার কাছে। আমি যা করেছি, বাসব, তোমার জন্যই করেছি। পুত্র-স্নেহ!

অসংলগ্ন এ কথার অর্থ না বুঝিয়া বাসব নীরব রহিল।

* * * *

ব্লাডপ্রেসারের জন্য শেষে চারু বাবুর মস্তিষ্ক সত্যই বিকৃত হইল। ধমনীতে রক্তের চাপ বৃদ্ধির জন্য একটা না একটা ঝোঁক অহরহ চাপিয়া ধরিতেছে, বাসব তাহা বুঝিল। পিতার চিকিৎসা স্বয়ং সে করিতে লাগিল। বায়ু-পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গে পিতা যেন ক্ষেপিয়া উঠেন! সে কথায় ক্ষিপ্ততা এমন বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহাকে শান্ত করা মুস্কিল হয়।

রমলা কাছে যাইতে ভয় পায়। বলে,—বাপ্স, যে রকম রাগ ওঁর বেড়েছে, ভয় করে।

ইন্দ্রা বলে, না, আর এখানে এ বাড়ীতে আমি থাকতে পারবো না।

—কেন? বাবা তো নিজের ঘরেই থাকেন। তোমার এলাকা মাড়ান না তো।

ক্ষুণ্ণ স্বরে ইন্দ্রা বলে,—কি রকম রাগারাগি চেঁচামেচি করেন! তুমি তো থাকো কলেজে, কিংবা কলে,—তার জানবে কি?

বাসব বলে,—আমি না জানলেও সব বুঝি, ও ব্লাডপ্রেসারের ঝোঁক ছাড়া আর কিছু নয়।

—তা হোক, আমার এই কচি ছেলেমেয়ে—ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি সর্ব্বক্ষণ। পাগলের সম্পত্তি নিয়েই তোমাদের ঐশ্বর্য্য! তাই আমার ভারী ভয় করে!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাসব নিরুত্তরে ইন্দ্রার পানে চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রা কহিল—আমি শুনেছি। দেবেন বাবু মেসোমশায়ের বাবার বন্ধু ছিলেন। মেসোমশাই কত কি বলতেন। ত্যাখো, সেই অভিসম্পাতে বুঝি বা—

বিস্মিত বাসব কহিল—অভিসম্পাত!

একটি ঢোক গিলিয়া ইন্দ্রা কহিল—ওঁর মাথা গরম হয়েছে শুনে মেসোমশাই সে দিন বলছিলেন—দেবেন বাবুর নাতনীর টাইফয়েডে মাথা খারাপ হলো। বাবা ঢের বলেছিলেন যে দেবেন, ওকে ঠাণ্ডা পাহাড়ে কিছু কাল ফেলে রাখো, সেরে যাবে। তখন মেসোমশাই জলপাইগুড়িতে। বল্লেন, অনাদির কাছে রাখো! কিম্বা আমার পুরীর বাড়ীতে থাকুক। দেবেন বাবু ডাক্তারের মত চাইলেন, তিনি মত দিলেন না। দেবেন বাবুও রাজি হলেন না। ডাক্তারের উপর দেবেন বাবুর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। তাঁর ছেলে-বৌ কেউ তো বাঁচেনি টাইফয়েডে। মেসোমশাই বল্লেন—পাগল সারাবার মত কৈ, তেমন কিছু করা হয়নি।

এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিতে পারিলেই বাসব যেন বাঁচে! তাহার ভিতরটা হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। কহিল, যাক, যে বিষয়ে সঠিক কিছু জানি না, তার আলোচনায় দরকার নেই।

* * * *

হঠাৎ একটা কাজে বাসবকে ছুটিতে হইল রাঁচী। ডাক্তার সেনের গৃহে সে অতিথি হইল।

সাদর সম্বর্দ্ধনায় ডাক্তার সেন কহিল—নিমন্ত্রণ তো পূর্ব্বাহ্নেই করে রেখেছি। এখন পেয়ে ভারী খুশী হলুম। ভেবেছিলুম, প্রতিশ্রুতি বুঝি রাখতে পারবে না!

সবিস্ময়ে বাসব কহিল—এমন ভাবনার অর্থ?

মৃদু হাস্যে ডাক্তার সেন কহিলেন—গিন্নী ছাড়বে না!

—কেন? না ছাড়ার তো কিছু কারণ নেই।

—ওঃ বলিয়া ডাক্তার সেন চুপ করিয়া গেল এবং কথা পাল্টাইয়া অন্য প্রসঙ্গ আনিল।

পরের দিন সকালে চা খাওয়ার পর ডাক্তার সেন কহিল—চলো হে, আমার রাজত্বে একটু ঘুরে আসবে। একটা নতুন জগৎ দেখবে, চলো।

ডাক্তার সেনের সহিত বাসব আসিল—সেণ্ট্রাল হস্‌পিটালে। অনেক মহামহিম, রাজাধিরাজের সঙ্গে ডাক্তার সেন পরিচয় করাইয়া দিল। কেহ জানাইল, সে রাজা প্রতাপ সিংহ! কেহ বলিল, আমি সম্রাট্ আকবর খাঁ। কেহ বলিল, আমি জার্ম্মাণ সম্রাট্। একজন কতকগুলা সূতা আর গাছের পাতা লইয়া নিবিষ্ট ছিল, সেনকে দেখিয়া কহিল, ডাক্তার আমার এই নতুন আবিষ্কারটা।

এদিক্-সেদিক্ ঘুরিয়া ডাক্তার সেন কহিল, স্ত্রীলোকের বিভাগে চলো।

বাসব চলিল।

দু'-একটি রমণীর সহিত হ্যাঁ, না সংক্ষিপ্ত উত্তরে কথা কহিয়া কোথাও ক্ষুদ্র অভিবাদন দিয়া ডাক্তার সেন একটি ঘরের মধ্যে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

চাপরাশি আসিয়া তাহার হাতে দুইটা গোলাপের তোড়া দিল।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাসব চাহিল।

ডাক্তার সেন কহিল, আমার বাগানের ফুল! আমি নিজের ব্যয়ে এর জন্য ফুলের তোড়া আনি। বাস্তবিক এর দুরদৃষ্টের জন্য

আমি ব্যথা বোধ করি বাসব! এসো। বলিয়া একটি ঘরের পর্দ্দা সরাইয়া ডাক্তার সেন বাসবকে লইয়া প্রবেশ করিল! নত মস্তকে অভিবাদন জানাইয়া কহিল, আপনার ফুল।

গোলাপের তোড়া দু'টা রমণীর দিকে বাড়াইয়া দিল।

ফুল? দিন! দিন! বলিয়া যুবতী ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার সেনের হাত হইতে চিলের মত ছোঁ মারিয়া সে গোলাপের তোড়া দু'টা লইয়া গৃহ-কোণে ছুটিল। সেখানে টেবিলের উপর ফটো। ফুল লইয়া গিয়া ফটোর সামনে রাখিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল,—নাও দেবতা, ফুল নাও। দাদু যেন বেঁচে থাকে।

বাসব ছবির পানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। নিমেষে মুখ পাংশু হইয়া গেল।

ফটোতে ফুল দিয়া প্রণাম শেষ করিয়া যুবতী বাসবের দিকে ফিরিয়া চাহিল। কহিল,—এঁকে চেনেন না? ওমা, দেবতা! দাদু রোজ ফুল দিতে বলেছে! দাদু বলেছে,—ফুল দিলেই দেবতা আসে—বলিয়া ডাক্তার সেনের দিকে চাহিয়া কহিল,—সত্যি, আমি এক দিন এই বড় বড় গোলাপ ফুল খোঁপায় পরেছিলুম। গলায় পরেছিলুম! সে দিন দেবতা এসেছিল। আমাকে বাতাস করলে—আচ্ছা, আসেনি? এই দ্যাখো, দেবতার চিঠি!

ময়লা জীর্ণ একখানা পত্র সে জামার অভ্যন্তরে বুকের নিকট হইতে টানিয়া বাহির করিয়া কহিল,—দেখ তার চিঠি! বিলেত থেকে লিখেছে। বলিয়া চিঠিখানা ডাক্তার সেনের হাতে দিল। এমন সে বহু বার দিয়াছে! বলিয়াছে, পড়ে দেখ।

পত্রখানা বাসবের হাতে দিয়া ডাক্তার কহিল—অভাগিনীর স্বামীর পত্র!

স্তম্ভিত বাসব দেখিল, তাহারই লেখা চিঠি।

সংশয়ের পর্দ্দা সরিয়া গেল।

বাসব প্রশ্ন করিল,—একে কোথা পেলেন?

—ভালো কথা, তোমাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে যে! তোমার বাবা চারু বাবুই আমার কাছে রেখেছেন। মাসে একশো করে টাকা দেন! একে আপনি চেনেন? এখন বেশ প্রকৃতিস্থ হয়েছে। এই ফটো আর চিঠি নিয়ে সময় কাটায়। বলে, দাদু বলেছে, দেবতা! আমি চারু বাবুকে লিখেছিলুম, কোন উৎপাত ঝঞ্ঝাট নেই, প্রায় সহজ—এঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যান! তিনি রাজী হন না! আর রাজী হবেন কি? এঁকে যখন দিয়ে গেলেন,—তখন তো ঝক্কি-ওলা পাগল ছিল না। পাগল ছিল বটে, এঁর স্বামীর কাছে আনা হচ্ছে বল্লেই একে এখানে দিয়ে গেলেন। আমার হাত ধরে কি কান্না,—বলে, দেবতা কই? আমি কথা দিলুম, বল্লুম। আমার কথা শুনে বললে, দেবতাকে আপনারা এনে দেবেন? সেই থেকে আমার ভারী বাধ্য। এর উপর আমায় অত্যন্ত মমতা জন্মেছে। কি ভাবছেন?

—কিছু নয়। কি বলছেন ডাক্তার সেন, এঁকে চিনি কি না? চিনি! এ আমার কে, জানেন? আমার স্ত্রী! এঁর পিতামহের সম্পত্তিতে আমি আজ বড়লোক। হ্যাঁ, আমি জানি, এঁর টাইফয়েড হয়েছিল, তাতে ব্রেন্ উইক হয়। সে দিকটার চিকিৎসা হয়নি—যা করা উচিত ছিল। হয়েছিল তার বদলে আমার সঙ্গে বিবাহ। আমিও ওকে ছেড়ে চলে গেলুম। ভাবিনি পর্দ্দার আড়ালে এতখানি রহস্য আছে। আজ আমার বাবাও ব্লাড্‌প্রেসারে পাগল।

ডাক্তার সেন স্তম্ভিত নয়নের পলকহীন দৃষ্টিতে বাসবের পানে চাহিয়া রহিল।

বাসব ডাকিল,—গার্গী—

চমকিয়া গার্গী মুখ ফিরাইল। বহুক্ষণ পলকহীন চোখের স্থির দৃষ্টি বাসবের মুখে নিবদ্ধ রাখিয়া পাথরের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর এক পা, এক পা করিয়া বাসবের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

বাসব কহিল,—আমায় চিনতে পারছো গার্গী?

মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে গার্গী কহিল,—হ্যাঁ।

—বলো তো, কে? আমি তোমার কে হই?

গার্গীর মুখ সিঁদুরের মত রাঙা হইল।

বাসব কহিল,—বলো, আমি কে?

বাম হস্তে মস্তকে কাপড় তুলিয়া গার্গী কহিল,—আমার স্বামী।

বাসবকে দেখিয়া গার্গী এই প্রথম কথা কহিল।

বাসব গার্গীর হাত ধরিল। কহিল,—তুমি আমার সঙ্গে চলো গার্গী!

বাসবের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাত সবেগে টানিয়া লইয়া গার্গী চীৎকার করিয়া উঠিল,—না গো, না! আমি যাবো না। আবার জোর করে তারা আমায় পাগলা-গারদে দেবে! ফাঁকি দিয়ে আবার তারা আমায় নিয়ে যাবে। দাদু! দাদু গো! বেতস পত্রের মত গার্গীর দেহ কাঁপিতেছিল। বাসব ধরিবার পূর্ব্বেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

উভয় চিকিৎসকই নত হইয়া গার্গীর সংজ্ঞাহীন দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

ডাক্তার সেনের মুখ দিয়া বাহির হইল,—হোপলেস্।

* * * *

বাসব ফিরিয়া আসিয়াছে।

চারু বাবু উন্মাদ।

রমলা আসিয়া পুত্রের কাছে কাঁদিয়া কহিলেন,—কি মানুষ কি হয়ে গেল! আমাকে মেরেছেন। এই ছাখ বাসব, ফুলো দাগ। এ বাড়ীতে থাকতে ভয় করে। আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে।

বাসব কহিল, এ বাড়ীতে থাকতে হবে না মা, এ-বাড়ী আমাদের ছাড়তে হবে।

দুঃখ, শোক, তাপ সব ভুলিয়া রমলা চাহিলেন পুত্রের পানে,—যে-গৃহের প্রতি বীতরাগে তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন, সেই গৃহ পরিত্যাগের কথায় কহিলেন,—তার মানে?

—ঠিক কথাই বলছি! তুমি তো জানো সব, এ সম্পত্তি গার্গীর পিতামহের,—তাই আজ বাবা পাগল। কিন্তু তোমরা আমার মা-বাপ—তোমরা—

বাসবের কথা শেষ হইল না। রমলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি বাসব—মুখ কালো করিয়া তিনি কহিলেন,—আমি মেয়ে-মানুষ, বাবা।

—কিন্তু আমায় তুমি বলতে পারতে। ভেবেছিলে, পাছে আমি অসুখী হই! আমার সুখের পথ তাই পরিষ্কার করে রেখেছিলে।

জানো মা, গার্গী আমার চোখের উপরে মরে গেল। বলিয়া বাসব কক্ষ ত্যাগ করিল।

বাড়ী ছাড়ার কথা যথাসময়ে ইন্দ্রার কর্ণগোচর হইল। বজ্রাহতের মত সে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল,—মাথা গুঁজে থাকবো কোথায়! আর তুমিই বা এমন নতুন বাড়ী কোন্ দুঃখে ছাড়বে, তোমার প্রাণটা কাঁদবে না?

প্রাণ কাঁদচে বলেই এ বাড়ীতে থাকবো না ইন্দ্রা। পরের পয়সা ভোগ করবো না। এ বাড়ী আমি বেচে ফেলবো।

—মানে?

—মানে, এ বাড়ীকে করবো "গার্গী মেণ্টাল হস্পিট্যাল" আর রায়েদের কাছে সব বিক্রী করে পাঁচ লাখ টাকা পাচ্ছি,—সে টাকা জমা হবে "গার্গী ফণ্ডে" এই হস্পিট্যালের জন্য।

ভগ্ন কণ্ঠে ইন্দ্রা কহিল,—বাবা অনেক আশা করে তোমার হাতে আমায় দিয়েছিলেন। আমিও সুখী হবো ভেবেছিলুম। ইন্দ্রার চক্ষু সজল হইল।

বাসব কহিল,—কাঁদচো কেন ইন্দ্রা? আমি তোমারই রইলুম। গার্গী বেঁচে নেই। কিন্তু পরের সম্পত্তি এ ভাবে ভোগ করা যায় না। তাতে পাপ হয়।

বাসব হইল উন্মাদ রোগের চিকিৎসক। বিকৃত-মস্তিষ্কদের লইয়াই সে জীবন কাটাইতে চায়।

শুভাকাঙ্ক্ষীর দল কহিল,—সে কি!

বাসব কহিল,—বুঝছো না, আমার বাবাই যখন পাগল হলেন—

বন্ধুরা অন্তরালে কহিল,—পাগলা বাপের পাগলা ছেলে! অত প্র্যাকটিস্, অত পয়সা—চিরকাল জানি, ও ভয়ঙ্কর সেণ্টিমেণ্টাল!

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের অবসানের ও ইংরেজ শাসনের আরম্ভের সন্ধিকালে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল—যে দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার অর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা—"বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে ঘটিয়াছিল বলিয়া"—"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে অভিহিত। এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার জনবহুল বহু স্থানে এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কিন্তু এই দারুণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে লিখিত হয় নাই। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, ইংরেজের লিখিত এ দেশের ইতিহাসগুলি "আমরা সাধ করিয়াই ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ পূরণ মাত্র"—"আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজী গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।" কারণ, "বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই।" মার্শম্যানের যে ইতিহাস দীর্ঘকাল এ দেশের প্রামাণ্য ইতিহাস বলিয়া বিবেচিত ছিল, তাহাতে লেখক ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় শাসন-পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল—অসামঞ্জস্য ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া একটি অধ্যায়ের শেষে তিন ছত্রে এই দারুণ দুর্ভিক্ষের কথায় বলিয়াছেন—"বঙ্গের নিম্নাংশের অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যে বিষম দুর্ভিক্ষে বিনষ্ট হয়, তাহাতে দেশের দুর্দ্দশা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।" এই কয় ছত্র পাঠ করিয়া ঐ দুর্ভিক্ষের স্বরূপ কি অনুমান করা যায়? ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে—অর্থাৎ ঐ দুর্ভিক্ষের প্রায় এক শত বৎসর পরে ঐ দুর্ভিক্ষের বিবরণ—ইংরেজ দপ্তরের বিবরণ হইতে—রচনা করিবার সময় ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখিয়াছিলেন—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহু উৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। যে কেহ ভারতে আমাদিগের স্বদেশীয়দিগের কার্য্যের বিষয় জানিতে পারেন; আমরা তাঁহাদিগের অনুসৃত নীতি ও যুদ্ধ-ব্যবস্থা অবগত আছি * * কিন্তু আমাদিগের ইতিহাস ইংরেজের দেশ জয়ের ও বিজেতৃগণের বিবরণ, ভারতের লোকের ইতিহাস নহে।" তিনি যখন ইহা বলিয়াছিলেন—তখনই ঐ দুর্ভিক্ষ কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল এবং উহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকরা উহার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন বা উহা উপেক্ষা করিয়াছেন।

ইহাতেই দেশের লোকের দ্বারা দেশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন ও সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়; বিদেশীর রচিত ইতিহাসে জাতির মর্ম্মকথা স্থানলাভ করে না—স্থানলাভ করিলেও তাহাতে আবশ্যক গুরুত্ব আরোপিত হয় না। কারণ—

"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যা'রে?"

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সরকারের দপ্তরখানায় কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি মন্বন্তরের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ বর্ণনা—তাহাতে কল্পনার অনুরঞ্জন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:—

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই; সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। * * * অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না; মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর একসন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল। বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তার পরে ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর বা বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল; যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

"রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকামধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।"

এই এক বর্ণনা।

আর এক বর্ণনা জন শোরের। তিনি তখন চাকরী লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন; পরে প্রতিভাবলে উচ্চ পদ লাভ করিয়া লর্ড টেনমাউথ হয়েন। তিনি ঐ সময়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, একটি কবিতায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন :—

"এখন(ও) মানস-ক্ষেত্রে সেই দৃশ্য করি নিরীক্ষণ—
নয়ন কোটরগত, শীর্ণ দেহ, শবের বরণ।
শুনি—মাতৃ-আর্ত্তনাদ, শিশু-কণ্ঠে কাতর ক্রন্দন,
নিরাশের হাহাকার, যাতনায় অস্ফুট রোদন।
মৃত ও মরণাহত এক সাথে গড়াগড়ি যায়;
শিবার অশিব রবে শকুনির চীৎকার মিশায়;
কুক্কুর ডাকিয়া ফিরে,—দিবাভাগে খর রবিকরে
স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করে মৃত ও মুমূর্ষু স্তরে স্তরে।
সে দৃশ্য লেখনী-মুখে বর্ণনায় ব্যক্ত নাহি হয়,
কালে তাহা স্মৃতি হ'তে কোন দিন মুছিবার নয়।"

হাণ্টার বলিয়াছেন, এই পদ্যে ঘটনার স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, গদ্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইতে পারিত না।

হাণ্টার বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের ২০ বৎসর পরে বাঙ্গালার অবশিষ্ট লোকের সংখ্যা ২ কোটি ৪০ লক্ষ হইতে ৩ কোটি বলিয়া নির্ণীত হয়; কাযেই আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এক বৎসর অন্নকষ্টের পর এক বৎসর শস্যহানিতে ৯ মাসে এক কোটি লোকের মৃত্যু হইয়াছিল।

কিন্তু এক বৎসর ফসল ভাল না হইবার পর এক বৎসর অজন্মায় কিরূপে বাঙ্গালার মত স্থানে লোকের এমন দুর্গতি হইতে পারে? সেই কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শতবর্ষে বাঙ্গালার—সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার কথা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এই দারুণ দুর্ভিক্ষ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তাহার শতবর্ষ পূর্ব্বে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট্। তাঁহার রাজত্ব ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বিদেশী পর্য্যটক বার্ণিয়ার এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং তিনি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আগমন করেন। বার্ণিয়ার বাঙ্গালার উর্ব্বরতা, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ বর্ণনা হইতে আমরা কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

সকল সময়েই মিশরকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর দেশ বলা হইয়াছে; কিন্তু দুই বার বাঙ্গালায় যাইয়া আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সৌন্দর্য্যে ও উর্ব্বরতায় বাঙ্গালারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গালায় এত চাউল হয় যে, উহা কেবল নিকটস্থই নহে, পরন্তু দূরস্থ দেশসমূহেও সরবরাহ করা হয়। জলপথে বাঙ্গালায়, পাটনায় এবং সমুদ্রপথে মৌছলীপটম ও করমণ্ডল উপকূলে বহু বন্দরে চাউল চালান যায়। সিংহলে ও মালদ্বীপেও চাউল প্রেরিত হয়। বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে চিনিও প্রস্তুত হয় এবং ঐ চিনি গোলকণ্ডায়, কর্ণাটে, আরবে, মোকা ও বসোরার পথে মেসোপোটেমিয়ায় ও বন্দর-আবাসের পথে পারস্যেও প্রেরিত হয়।

বাঙ্গালার আম্র প্রভৃতি নানারূপ ফলের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বাঙ্গালায় মিশরের মত অধিক পরিমাণ গম উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু তাহার কারণ, বাঙ্গালার লোক চাউলই অধিক আহার করে।

তাহার পর কার্পাস ও রেশমের কাপড়। বাঙ্গালাই এ সকল দ্রব্যের প্রধান কেন্দ্র। বিদেশী বণিকরাও বাঙ্গালা হইতে কত সূতী ও রেশমী কাপড় রপ্তানী করে, তাহা দেখিয়া বার্ণিয়ার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, রাজমহল হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই দিকে অসংখ্য খাল আছে। সে সকল পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কালে অসীম পরিশ্রমে খনিত হইয়াছিল—সেই সকল খাতে বাণিজ্যতরী যায় এবং সেই জলে ধান্য, ইক্ষু, ডাইল, তৈল-শস্য ও রেশম-কীটের খাদ্য তুঁত গাছের চাষ হয়।

বহু কাল পরে—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়া প্রসিদ্ধ সেচ-এঞ্জিনিয়ার উইলকক্স এই সকল খালের উল্লেখ করিয়া বলেন—যেন ভগীরথ শঙ্খনাদ করিতে করিতে গিয়াছেন, আর গঙ্গার প্রবাহ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে!

বাঙ্গালার উর্ব্বরতার আরও অনেক প্রমাণ আছে।

আকবর বাদশাহের সময়ে ঈশা খাঁর শাসনে চাউল টাকায় ৪ মণ বিক্রীত হইত। তাহার পর শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার শাসক হইয়া ঢাকায় আসিয়া যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শোভাযাত্রা করিয়া নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া ঢাকা ত্যাগ করিয়া নির্দ্দেশ দেন, ঐ দ্বার বন্ধ করা হইবে এবং তাহার উপর লিখিত থাকিবে—চাউলের মূল্য ঐরূপ (টাকায় ৮ মণ) না হইলে ঐ দ্বার মুক্ত করা হইবে না। তাঁহার গমনের পরে যিনি ঐ মূল্যে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি ঐ দ্বার মুক্ত করেন। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে—ঢাকা ত্যাগের ৫ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং মনে করা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তদশ

শতাব্দীতেও বাঙ্গালায় কোন কোন স্থানে চাউল ঐরূপ মূল্যে বিক্রীত হইত।

আমরা বাঙ্গালার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁন বাঙ্গালার দেওয়ান ও নাজিম উভয় পদের সকল কায করিতে থাকেন। দেওয়ান ও নাজিম হইয়া তিনি প্রথম পুণ্যাহের পরে দিল্লীতে যাহা প্রেরণ করেন, তাহার হিসাব এইরূপ :—

তোসাখানার দারোগার অধীনে ৩ শত অশ্বারোহী ও ৫ শত পদাতিক সৈনিকের হেপাজতে ২ শত গোযানে এক কোটি ৩০ লক্ষ নগদ টাকা প্রেরিত হয়। জায়গীরের ও খাস নবিসীর টাকা স্বতন্ত্র দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন হস্তী, টাঙ্গন ও গুন্থনামক এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পার্ব্বত্য অশ্ব, মহিষ, হরিণ, বাজপাখী, জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) বয়ন করা পাদশাহের ব্যবহার্য্য সূক্ষ্ম বস্ত্র, গণ্ডার-চর্ম্মের ঢাল, শ্রীহট্টের মাদুর (স্বর্ণ ও গজদন্তের), মৃগনাভি, আসামের বস্ত্র, তরবারের ফলক, য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বহুবিধ দ্রব্য প্রেরণ করা হয়।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অবস্থা এইরূপ ছিল।

তাহার পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাসীতে সিরাজদ্দৌলা পরাভূত হইলে ইংরেজ বণিক মীরজাফরকে নবাব করিয়া ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন; বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হয়।

১১৭৬ বঙ্গাব্দে—যখন মন্বন্তর হয়, তখন অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় এইরূপ—

"১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লয়েন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লিখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

মীরজাফরের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা স্কটের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, মীরজাফর মসনদ লাভের পূর্ব্বে যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, মীর্জ্জা সামসুদ্দীন তাঁহাদিগের অন্যতম। এক দিন মীর্জ্জার বিরোধীরা মীরজাফরকে জানান যে, মীর্জ্জার অনুচরগণ কর্ণেল ক্লাইভের অনুচরদিগের সহিত কলহ করিয়াছে এবং ক্লাইভ তাহাতে রুষ্ট হইয়াছেন। অল্পক্ষণ পরে মীর্জ্জা মীরজাফরের নিকটে উপস্থিত হইলে মীরজাফর তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন—"তুমি কি কর্ণেলের মর্য্যাদা জান না যে, তোমার লোকরা তাঁহার বন্ধুদিগকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে?" মীর্জ্জা কৃত্রিম কাতরতার ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠেন, "প্রতিপালক আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৩ বার কর্ণেলের গর্দ্দভকে সেলাম করিয়া থাকি; আমি কি মুখ তুলিয়া কর্ণেলের দিকে চাহিতে সাহস করিতে পারি?" মীরজাফর আর কোন কথা না বলিয়া—যেন মীর্জ্জার কথার অর্থবোধ করিতে পারেন নাই, এমনই ভাব দেখান।

এই মীরজাফর সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া নবাব হইয়া আবার ইংরেজের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদিগের (অর্থাৎ হল্যাণ্ডের অধিবাসী বা ডাচ) সহিত ষড়যন্ত্র করেন। সেই সংবাদ পাইয়া ক্লাইভ চুঁচুড়া আক্রমণ করিয়া ওলন্দাজদিগকে লাঞ্ছিত করেন। তাহার পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভ্যান্‌সিটার্ট তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কায করিতে থাকেন। মীরজাফর ইংরেজদিগকে প্রতিশ্রুত টাকা দিতে না পারায় তাঁহার জামাতা মীরকাশিম কলিকাতায় যাইয়া মীমাংসা করেন। তাঁহার কার্য্য-দক্ষতায় প্রীত হইয়া ইংরেজরা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরকে অপসৃত করিয়া তাঁহাকেই নবাব করেন।

যে কারণে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ এই ত্রয়োদশ বর্ষকালের মধ্যে বাঙ্গালায় দারুণ দুর্ভিক্ষ সম্ভব হইয়াছিল, সেই কারণেই মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ বাধে। সে কারণ—ইংরেজ কর্ত্তৃক এ দেশ শোষণ। তখনও এ দেশে রেলপথ স্থাপিত হইতে শতবর্ষ বিলম্ব ছিল—শস্য-সঞ্চয় তখন রীতি ছিল—বাঙ্গালার লোক অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া বাস করা পরম সুখ মনে করিত। সে অবস্থায় যে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অন্নাভাবে বাঙ্গালার লোকের এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ইংরেজের শোষণই তাহার কারণ। সেই শোষণ বাঙ্গালার সার-শস্য গ্রাস করিয়াছিল—মাত্র ১০ বৎসরই সে জন্য যথেষ্ট ছিল।

বাদশাহী সনন্দবলে ইংরেজ কোম্পানী এ দেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিতেন। সেই অধিকারের সুযোগ লইয়া আপন আপন নৌকায় কোম্পানীর নিশান তুলিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও বিনা মাশুলে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের নিকট হইতে "ছাড়" কিনিয়া অনেক ভারতীয় বণিকও শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন। তাহার প্রতীকার-প্রচেষ্ট হইয়া মীরকাশিম ইংরেজের বিরাগভাজন হয়েন এবং ইংরেজরা আবার মীরজাফরকে নবাব করিয়া বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে) মীরকাশিমকে পরাভূত করেন।

এই সময় ইংরেজের অত্যাচার ও এ দেশের লোকের তজ্জনিত দুর্দ্দশার বর্ণনা ওয়ারেণ হেষ্টিংস গভর্ণরকে লিখিত তাঁহার পত্রে করিয়াছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে নদীপথে পাটনা পর্য্যন্ত যাইতে তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—প্রত্যেক নৌকায় এমন কি কূলে নানা স্থানেও—ইংরেজের নিশান উড্ডীন ছিল অর্থাৎ ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতেছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ী ও তাহাদিগের অনুচরদিগের অত্যাচারের ভয়ে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দোকান বন্ধ ও অধিবাসীরা পলায়িত দেখা গিয়াছিল। ইংরেজদিগের বে-আইনী কায নবাবের রাজস্ব, দেশের শান্তি ও ইংরেজের সম্ভ্রম—সকলই নষ্ট করিতেছিল। শক্তিশালী ভাগ্যান্বেষীরা (ইংরেজরা) ভীত, শঙ্কিত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। ইংরেজরা বাঙ্গালার লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছিল।

ডীন ইঞ্জে লিখিয়াছেন—যে অতর্কিত শিল্পবিপ্লবে বিলাতের আকৃতি ও বিলাতের লোকের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ক্লাইভের ভারতে জয়লাভ-ফলে যে লুণ্ঠিত অর্থ ৩০ বৎসরকাল স্রোতের মত বিলাতে আসিয়াছিল, তাহাতেই তাহার উদ্ভব। তিনি এই অর্থ পাপলব্ধ বলিতে দ্বিধানুভব করেন নাই।

মেকলে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহাতে যে এক দল ইংরেজের উদ্ভব হয়, বিলাতের লোক তাহাদিগকে "নবাব" বলিত। তাহাদিগের অধিকাংশই ধনী বা সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিল না, অল্প-বয়সে ভারতে প্রেরিত হইয়া তথা হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাদিগের "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছে"র ধৃষ্ট ব্যবহারে বিলাতের লোক যেমন বিরক্ত হইত, তাহারা সমাজে অর্থের অনুপাতে সম্ভ্রম না পাইয়া তেমনই বিরক্ত হইত। ক্লাইভও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। জলৌকা যেমন জীবদেহে আপনাকে সংযুক্ত করিতে পারিলেই রক্ত শোষণ করিয়া পুষ্ট হয়, এই সকল ইংরেজ তেমনই ভারতের রক্ত শোষণ করিয়া পুষ্ট হইত।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সে জন্য কাহারা দায়ী তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না।

হাণ্টার স্বীকার করিয়াছেন, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" প্রভাব অনুভূত না হওয়া পর্য্যন্ত বিলাতের লোক বাঙ্গালাকে বহুভাগ্যান্বেষী ইংরেজের প্রভূত অর্থার্জ্জনের ক্ষেত্র—মালের গুদাম বলিয়াই বিবেচনা করিত। অবশ্য তাহারা জানিত, সে দেশে বহুসংখ্যক লোক বাস করিত—কিন্তু তাহারা যে বিবেচনার বিষয় হইতে পারে, তাহা বিলাতের লোকের ধারণায় আসিত না। অর্থাৎ বাঙ্গালায় লোক ছিল, ইহাই তাহারা জানিত এবং সে সকল লোক তাহাদিগের স্বার্থ-সাধনের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত।

বিলাতের প্রসিদ্ধ মনীষী মিল বলিয়াছেন—এক জাতির দ্বারা অপর জাতির শাসনের অর্থ বা সার্থকতা কিছুই থাকিতে পারে না; কারণ, সে অবস্থায় শাসক জাতি শাসিত জাতিকে তাহার পশুক্ষেত্ররূপে—স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে, আর কিছুই মনে করে না।

ক্লাইভ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যাইয়া—বাঙ্গালা-শোষিত অর্থে "নবাব" হইয়া বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মীরজাফরকে সরাইয়া মীরকাশিমকে নবাবী প্রদান ও তাঁহাকে পদচ্যুত করা এই সকলে আপনাদিগের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে মনে করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে আবার বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। তিনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, মীরজাফর মৃত ও তাঁহার এক পুত্র নাজিমুদ্দৌলা গদীতে উপবিষ্ট।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দ ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ—মধ্যবর্ত্তী ৫ বৎসরে বাঙ্গালার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছিল। মেকলে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক জাহাজেই বাঙ্গালা হইতে শঙ্কাজনক সংবাদ বিলাতে যাইতেছিল। বাঙ্গালা প্রদেশে শাসন ব্যাপারের বিশৃঙ্খলা চরমে উঠিয়াছিল। ক্লাইভের মতে মানুষ যে প্রলোভন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না, সেই প্রলোভনে প্রলুব্ধ, অবাধ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্ম্মচারীদিগের নিকট আর কি আশা করা যায়? তাহারা যে কোম্পানীর নিকট কৈফিয়তের দায়ী সেই কোম্পানীও অসাধু, উচ্ছৃঙ্খল ও অজ্ঞ; বিশেষ তাহা এত দূরে অবস্থিত যে, পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর পাইতে দেড় বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হয়। কাযেই ঐ ৫ বৎসরে বাঙ্গালায় ইংরেজ-শাসন যে অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা সমাজের অবস্থিতির সহিতও সামঞ্জস্যশূন্য। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা নিষ্ঠুর না হইলেও আপনারা ধনী হইবার চেষ্টায় যাহা করিত, তাহা নিষ্ঠুরতাকে পরাভূত করিত। তাহারা তাহাদিগেরই সৃষ্ট নবাব মীরজাফরকে গদী হইতে ফেলিয়া দিয়া মীরকাশিমকে নবাব করিয়াছিল। মীরকাশিম স্বয়ং তাঁহার প্রজাদিগকে অত্যাচার করিতে প্রস্তুত হইলেও অপরের যে অত্যাচারে বাঙ্গালার লোক পিষ্ট ও চূর্ণ হইতেছিল এবং তাঁহার রাজস্বের ক্ষতি হইতেছিল, সে অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেই জন্য ইংরেজরা মীর কাশিমকে গদীচ্যুত করিয়া আবার মীরজাফরকে নবাব করেন। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই রাজকোষ শূন্য করিয়া বিদেশী প্রভুদিগকে অর্থ দিতে হইয়াছিল। যে ইংরেজরা নবাব করিতে ও নবাবকে বিতাড়িত করিতে পারিত, তাহাদিগকে বাঙ্গালার জনগণের উপর যথেচ্ছ উৎপীড়ন করিবার অধিকার দিতে হইত। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের জন্য প্রদেশে ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার লইয়াছিল। তাহারা দেশের লোককে অল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে ও অধিক মূল্যে কিনিতে বাধ্য করিত। তাহারা অনায়াসে দেশের বিচারক, পুলিস ও অর্থ বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে অপমান করিত—তাহাদিগের অনুগৃহীত এক দল দেশীয় লোক সমগ্র প্রদেশে সর্ব্বনাশ ও আতঙ্ক বিস্তার করিতেছিল। বৃটিশ কুঠীর প্রত্যেক কর্ম্মচারী তাহার প্রভুর সকল ক্ষমতা এবং তাহার প্রভু কোম্পানীর সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিত। যখন বাঙ্গালায় ৩ কোটি লোকের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, সেই সময় কলিকাতায় কেহ কেহ দ্রুত প্রভূত ধন সঞ্চিত করিতেছিল। দেশের লোক শাসকের অত্যাচারে অভ্যস্ত হইলেও কখন এমন অত্যাচারে পীড়িত হয় নাই। কোম্পানীর অত্যাচার সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারের তুলনায় দুঃসহ বলিয়া বোধ হইত। পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকদিগের সময়ে তাহাদিগের নিষ্কৃতিলাভের একটি উপায় ছিল—অত্যাচার অসহনীয় হইলে লোক শাসনের পরিবর্ত্তন-সাধন করিত। কিন্তু ইংরেজ-শাসন নষ্ট করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজ সরকার বর্ব্বরদিগের অত্যাচার-দ্যোতক সরকার অপেক্ষাও হীন হইলেও—সভ্যতার শক্তিতে শক্তিশালী ছিল। তাহা অত্যাচারী শাসকের শাসন অপেক্ষা দানবের শাসনের মত বোধ হইত। বাঙ্গালীরা কখন সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত; কখন বা পলাইয়া যাইত—ইংরেজের আগমন-সংবাদে গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাইত।

এই অবস্থায় যে লোক মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না।

ক্লাইভ নবাবের সহিত ব্যবস্থা করিলেন—"সৈন্য"-সংক্রান্ত ও রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় ভার ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের হস্তে থাকিবে; কর-সংগ্রহ, বিচার, দণ্ড-বিধান প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য যেমন নবাবের নামে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছিল, তেমনই চলিবে; এবং সাংসারিক ও বিচারালয়াদি সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন।" তিনি বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" গ্রহণ করেন (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট)।

দেওয়ানী লাভের পরে রাজস্ব সম্বন্ধীয় সব ব্যবস্থা করিবার অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়। কিন্তু নবাবের সহিত রাজকার্য্য

নির্ব্বাহের যে সকল চুক্তি হইয়াছিল, ক্লাইভ সে সকলের ব্যতিক্রম করিলেন না। মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গালার এবং রাজা সিতাব রায় বিহারের নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহাদিগের হস্তে সমুদায় কর্ম্মভার অর্পিত হইল।

ক্লাইভ কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের অনাচারে ও অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া সে সকলের যথাসম্ভব প্রতীকার করিলেন। তাহাতে তিনি ইংরেজ কর্ম্মচারী ও ইংরেজ সৈনিক সকলেরই বিরাগ-ভাজন হইলেন।

ক্লাইভ ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ভেরেলষ্ট তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কায করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অসাধু না হইলেও কর্ম্মচারীদিগের অসাধুতা দমন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কর্ম্মচারীরাও সুযোগ লাভ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অনাচারের ও অত্যাচারের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক দিকে দ্বৈত শাসন, আর এক দিকে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার বাঙ্গালীকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় যখন পর্জ্জন্য বিমুখ হইলেন, তখন দেবতার রোষ ও মানুষের অত্যাচার বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে আরম্ভ করিল। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"—দেখা দিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে এক দিকে যেমন দেশের শিল্প নষ্ট করিয়া সমগ্র বাঙ্গালাকে বিলাতের পণ্যোৎপাদনের জন্য উপকরণ উৎপন্ন করিবার ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই বাঙ্গালা হইতে অর্থ বিলাতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

কোম্পানী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ্চ এ দেশে যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল—বাঙ্গালায় রেশমী বস্ত্র বয়নের পথ বিঘ্নাস্তৃত করিয়া লোককে কেবল রেশম উৎপন্ন করিতে উৎসাহিত করা হউক, আর যাহারা রেশমী সূতা "কাটে", তাহাদিগকে কোম্পানীর কুঠীতে কায করিতে বাধ্য করিয়া—স্ব স্ব গৃহে কায করিতে নিষেধ করা হউক।

বিলাতের পার্লামেণ্টের 'নাইনথ রিপোর্টে' দেখা যায়—সিলেক্ট কমিটী স্বীকার করিয়াছিলেন—বাঙ্গালার শিল্প নষ্ট করাই অভিপ্রেত ছিল। কোম্পানীর নীতিতে শিল্পপ্রধান বাঙ্গালাকে বিলাতের জন্য পণ্যোপকরণ উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। বাঙ্গালা কৃষিপ্রাণ হয়।

এ দেশ হইতে ধন বিলাতে লইয়া যাওয়া কি ভাবে হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির সময় হইতে ৬ বৎসরের হিসাবে পাওয়া যায়:—

বৎসর (খৃঃ)	মোট আদায় (পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ টাকা)	খাঁটী মুনাফা (পাউণ্ড)
১৭৬৫—৬৬	২,২৫৮,২২৭	৪৭১,০৬৭
১৭৬৬—৬৭	৩,৮০৫,৮১৭	১,২৫৩,৫০১
১৭৬৭—৬৮	৩,৬০৮,০০১	৮৭১,৬২২
১৭৬৮—৬৯	৩,৭৮৭,২০৭	৮২৯,০৬২
১৭৬৯—৭০	৩,৩৪১,৯৭৬	৩৩৬,৮১২
১৭৭০—৭১	৩,৩৩২,৩৪৩	২৭৫,০৮৮

সুতরাং দেখা যাইতেছে—দারুণ দুর্ভিক্ষের বৎসরেও আদায় হ্রাস পায় নাই এবং ঐ ৬ বৎসরে—বাদশাহের প্রাপ্য, নবাবকে দেয় প্রভৃতি ও দুর্গাদির ব্যয় বাদ দিয়াও মুনাফা ৬ কোটি ৩৭ হাজার ১ শত ৫২ টাকা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল যে রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশই বিদেশে গিয়াছিল, তাহা নহে—যে সকল বেসামরিক ও সামরিক কর্ম্মচারীর বেতনে বহু অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহাদিগের সঞ্চয় বিলাতে প্রেরিত হইত, আর এ দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া শিল্প ও ব্যবসায়ে ইংরেজরা যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিত, তাহার এক কপর্দ্দকও এ দেশে থাকিত না। গভর্ণর ভেরেলষ্ট ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ এই তিন বৎসরে বাঙ্গালায় আমদানী-রপ্তানীর যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, ঐ কয় বৎসরে—

আমদানী দ্রব্যের মূল্য ৬২৪,৩৭৫ পাউণ্ড
রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ৬,৩১১,২৫০ পাউণ্ড

অর্থাৎ কোম্পানী যে টাকার মাল আমদানী করিতেন, তাহার দশ গুণ টাকার মাল রপ্তানী করিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভেরেলষ্ট কোম্পানীর কর্ত্তাদিগকে লিখিয়াছিলেন:—

"পূর্ব্বে যে টাকা রাজস্বরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইত, তাহা বাঙ্গালার বিপুল বাণিজ্যে আবার বাঙ্গালা লাভ করিত। এখন সে অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সকল য়ুরোপীয় কোম্পানীই এ দেশে ব্যবসা করিয়া প্রতি বৎসর অধিক ধন সঞ্চয় করিতেছে—অথচ তাহাতে দেশের সম্পদ্ এক কপর্দ্দকও বর্দ্ধিত হইতেছে না।"

এই সকল কোম্পানী কিরূপ হীনতা স্বীকার করিয়াও প্রাচীতে ব্যবসার অধিকার লাভ বা রক্ষা করিতে চাহিত, তাহা বিবেচনা করিলে তাহাদিগের লোভের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগের সহিত যে ইংরেজদিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, তাহাদিগের হীনতা স্বীকারের দুইটি দৃষ্টান্তমাত্র দিয়া আমরা নিরস্ত হইব:—

(১) সুমাত্রার রাজা একটি শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কোন "সম্ভ্রান্ত" ইংরেজ স্বীয় কন্যাকে দিতে চাহিয়াছিলেন। যদি রাজার অন্য পত্নীরা ঈর্ষাবশে তাহাকে বিষদানে হত্যা করে, সে কথা উত্থাপিত হইলে পিতা সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেও সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

(২) ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে কয় জন ইংরেজ বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার ছাড় পাইবার চেষ্টায় উড়িষ্যায় উপনীত হইলে—উড়িষ্যার শাসক (বাঙ্গালার নবাবের প্রতিনিধি) তাঁহার চরণ অগ্রসর করিয়া দিলে তাহাদিগের নেতা কার্টরাইট সেই চরণ চুম্বনও করিয়াছিল।

য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল এবং লবঙ্গের ক্ষেত্র এম্বয়নায় ওলন্দাজগণ ইংরেজদিগের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

সেইরূপ কষ্টে যে অধিকার লাভ করিতে হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে কোন য়ুরোপীয় ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়েরই দ্বিধা ছিল না।

১৭৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে শস্যের মূল্য কিছু অধিক ছিল বটে, কিন্তু অভাব হয় নাই। তাহার পরবৎসর ফসল ভাল হয় নাই। কিন্তু ইংরেজরা সে দিকে মনোযোগ দেয় নাই—সাবধান হওয়া ত পরের কথা। মহম্মদ রেজা খাঁর পরামর্শে ইংরেজ রাজস্ব শতকরা ১০ টাকা বর্দ্ধিত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। হাণ্টার বলিয়াছেন, বাহিরের

অবস্থা দেখিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝাও সহজসাধ্য নহে। কারণ, বাঙ্গালী ঘটনা-পরিবর্ত্তনে সহজে বিচলিত হয় না; সে ধনী হইলেও যেমন দরিদ্র হইলেও তেমনই নীরবে অবস্থা-পরিবর্ত্তন গ্রহণ করে। তাহার প্রকৃতির ভাবপ্রবণতা দমন করিয়া রাখা হয়। বিশেষ পারিবারিক ব্যাপার প্রকাশ করা তাহার পক্ষে রীতিবিরুদ্ধ। এমন কি, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষেও বহু পরিবারে মহিলারা অনাহারে তিলে তিলে মরিয়াছেন—সে কথা প্রকাশ পায় নাই—তাঁহাদিগকে সাহায্য-প্রদান করাও সম্ভব হয় নাই।

বিষ্ণুপুরের দেশীয় কর্ম্মচারী সংবাদ দেন—মাঠে ধান শুকাইয়া খড় হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা কলিকাতায় আতঙ্কজনক বিবরণ প্রদান করিলেও সরকার সে সব সংবাদ বিলাতে প্রেরণ করিলেন না। এমন কি, যে পত্রে বিলাতে প্রথম দুর্ভিক্ষের আগমন-সংবাদ প্রেরিত হয়, প্রেসিডেণ্ট ভেরেলষ্ট তাহাতে স্বাক্ষর দেন নাই। তিনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর—বিলাতে দুর্ভিক্ষের কোন সংবাদ প্রদান না করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। কার্টিয়ার তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে প্রথমে একটি জিলায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়া ১০ দিন পরে লিখিলেন—লোকের কষ্ট তীব্র হইলেও রাজস্বের কোন ক্ষতি দেখা যায় নাই। ইংরেজ কেবল রাজস্বের কথাই ভাবিতেছিল—লোকের জীবনরক্ষায় অবহিত হয় নাই।

সেনাদলের জন্য শস্য-সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত। তাহাও হইল এবং সেনাদলকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল—কৃষকরা বলিতে লাগিল, তাহারাই লোকের জীবনধারণের উপায় নষ্ট করিতে লাগিল।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লিখিত হয়, দুর্গের কাযের জন্য শ্রমিক সংগ্রহ ও রক্ষা করা দুষ্কর হইতেছে; সুতরাং তাহাদিগকে চাউল দিবার ব্যবস্থা করা হউক। হিসাব করিয়া বলা হয়, ৮ হাজার শ্রমিককে ৮ মাস প্রতিদিন এক সের হিসাবে চাউল দিলে মোট ৪৯ হাজার মণের অধিক চাউল প্রয়োজন হইবে না। সেই পরিমাণ চাউল সরবরাহের নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছিল—কতক চাউল মজুৎও ছিল। বক্সীকে তদনুসারে আদেশ করাও হয়।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে লোক মরিতে লাগিল। কৃষকগণ গরু ও লাঙ্গল প্রভৃতি বিক্রয় করিল, বীজ-ধান খাইয়া ফেলিল, পুত্রকন্যা বিক্রয় করিল—শেষে ক্রেতা রহিল না। তাহারা গাছের পাতা ও মাঠের ঘাস খাইতে লাগিল। জুন মাসে দরবারে রেসিডেণ্ট লিখিলেন—জীবিতগণ মৃতদিগকে আহার করিতেছে। গ্রীষ্মের আরম্ভেই মুর্শিদাবাদে বসন্ত দেখা দিয়াছিল। রাজপথে মৃতস্তূপ—কুক্কুর ও শৃগাল শব খাইয়া শেষ করিতে পারিতেছিল না—গলিত শবে লোকের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল।

মেকলে লিখিয়াছেন—দুর্ভিক্ষ সমগ্র প্রদেশে দুর্দ্দশা ও মৃত্যু ব্যাপ্ত করিল। শ্রমে অনভ্যস্তা যে সকল নারী কখন জনগণের সম্মুখে অনবগুণ্ঠিতা হয়েন নাই—তাঁহারা অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া পথিকদিগের সম্মুখে পতিত হইয়া শিশু-সন্তানের জন্য এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নদীতে—ইংরেজদিগের গৃহের সম্মুখ দিয়া সহস্র সহস্র শব ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কলিকাতার রাজপথ মৃতে ও মুমূর্ষুতে পূর্ণ হইয়া গেল। দুর্ব্বল জীবিতগণের দেহে মৃতদিগকে সৎকারার্থ লইয়া যাইবার শক্তি না থাকায় শব পচিতে লাগিল—দিবাভাগেও শৃগাল ও শকুন শবের নিকট হইতে কেহ তাড়াইত না।

জনরব ব্যাপ্ত হয়—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সব চাউল "ধরিয়া" দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহারা শস্য কিনিয়া ৮, ১০, ১২ গুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল এবং এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারীর এক বৎসর পূর্ব্বে দেড় হাজার টাকা না থাকিলেও সে ঐ দুর্ভিক্ষকালে ১ লক্ষ টাকা বিলাতে পাঠাইয়াছিল। মেকলে এই সকল অভিযোগ বিশ্বাস করেন নাই; কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন—কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা হয়ত চাউলের ব্যবসা করিয়াছে এবং যদি তাহা করিয়া থাকে, তবে প্রভূত লাভও করিয়া থাকিতে পারে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা কিন্তু কর্ম্মচারীদিগকে দোষী বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ৩ কোটি নিরন্নকে অন্ন দানের জন্য মাত্র ৬০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। দেশের ধনীরা তদপেক্ষাও কিছু অধিক টাকা ব্যয় করেন। এই টাকা লোকের সংখ্যার তুলনায় যৎসামান্য। আর তাহা লোককে খয়রাতী দানে ও শস্য আমদানীর জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। হাণ্টার বলিয়াছেন, যখন নিরন্নদিগের জন্য শস্য আমদানীর কথার আলোচনা করা যায়, তখন যে ঘৃণ্য অনাচারের ও নির্ম্মমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, যে সামান্য সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহাও বিপন্ন ব্যক্তিরা পাইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সমগ্র সরকারের অর্থাৎ সরকারের প্রত্যেক লোকের সম্বন্ধে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য খাদ্য-শস্যের ব্যবসা করার অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল। বিলাত হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস, পত্রের পর পত্রে অপরাধীদিগের নাম জানিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সে বিষয়ে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। অপরাধি-নির্দ্ধারণের জন্য সন্তোষজনক অনুসন্ধান হয় নাই এবং যে সকল দেশীয় লোকের দ্বারা ইংরেজরা কায চালাইত, তাহাদিগের সম্বন্ধে অদ্যাপি এই সকল অভিযোগের কারণ রহিয়াছে:—

(১) তাহারা তাহাদিগের ইচ্ছামত অল্প মূল্য দিয়া কৃষকের সামান্য শস্য-সঞ্চয় লইয়া যাইত।

(২) যে সকল নৌকায় অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাউল আমদানী করা হইত, তাহারা সে সকল আটকাইয়া চাউল লইয়া যাইত।

(৩) তাহারা কৃষকদিগকে পরবর্ত্তী ফসলের জন্য রক্ষিত বীজধানও বিক্রয় করিতে বাধ্য করিত।

বলা বাহুল্য, কৃষকের অন্নাভাবে বীজধান খাইয়া ফেলা অপেক্ষাও তৃতীয় দফার কথা ভয়ানক।

কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পদস্থ কর্ম্মচারীরাই অপরাধী, তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল।

কোর্টের এইরূপ কথায় রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন, কোর্ট কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারের যত নিন্দাই কেন করুন না, আপনারা যে কায করিয়াছিলেন, তাহা অল্প নিন্দনীয় নহে—তাঁহারা আপনাদিগের স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন—তখন বদান্যতার প্রভাব তাঁহাদিগের কার্য্য স্পর্শও করিতে পারে নাই। ভূমি-রাজস্ব ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব হইলেও কোর্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। যে বৎসর দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার লোকের শতকরা ৩৫ জন ও কৃষকদিগের শতকরা ৫৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল, সে বৎসর ভূমি-রাজস্ব শতকরা ৫ টাকাও কমান হয় নাই—পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য শতকরা ১০ টাকা বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কোম্পানী যেন যে কোন প্রকারে আপনাদিগের অর্থ-লাভ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ ও ১১শে এপ্রিল দরবারে রেসিডেণ্ট রিচার্ড বেচার সিলেক্ট কমিটীকে লিখিয়াছিলেন—

"আমার প্রভুরা যাহাতে (দারুণ দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থায়) রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় অসুবিধা ভোগ না করেন, আমি সর্ব্বদাই সে চেষ্টা করিতেছি।"

ঐ বৎসর মে মাসে কলিকাতা কাউন্সিল বিলাতে লিখেন :—

"যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহার তীব্রতা, মৃত্যু-সংখ্যা, ভিক্ষুকের আধিক্য—এ সব বর্ণনাতীত। পূর্ণিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; তথায় অধিবাসীদিগের এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; অন্যান্য স্থানেও অবস্থা ঐরূপ।"

তাহার পর ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা লিখেন :—

"লোকের দুর্দ্দশা অতিরঞ্জিত করা সম্ভব নহে। এই অবস্থার প্রভাব রাজস্ব সংগ্রহে পতিত হওয়ায় বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু সুখের বিষয়, আমরা রাজস্ব যেরূপ হ্রাস পাইবে মনে করিয়াছিলাম, তাহা হয় নাই।"

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁহারা লিখেন :—

"দুর্ভিক্ষের তীব্রতা ও তাহার জন্য লোকক্ষয় সত্ত্বেও বর্ত্তমান বৎসরের জন্য রাজস্ব বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।"

পরবৎসর ১০ই জানুয়ারী তারিখে লিখিত হয় !—

"রাজস্বের প্রত্যেক বিভাগে আদায় আশানুরূপ ভাবে হইয়াছে।"

রাজস্ব আদায় আশানুরূপ হয় নাই—আশাতিরিক্ত হইয়াছিল। কারণ, মুর্শিদাবাদ হইতে বোর্ড অব রেভিনিউ যে হিসাব দাখিল করেন, তাহাতে দেখা যায়, ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহা ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের আদায় অপেক্ষা অধিক—দুর্ভিক্ষের বৎসরও আদায় কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাজস্ব আদায়ে উৎপীড়নই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা বলা বাহুল্য।

কয় বৎসরের রাজস্ব আদায়ের হিসাব এইরূপ :—

মোট আদায়—	টাকা—
১১৭৫ বঙ্গাব্দ (১৭৬৮-৬৯ খৃঃ)	১,৫২,৫৪,৮৫৬…৯…৪…৩
১১৭৬ বঙ্গাব্দ (১৭৬৯ খৃঃ—এই বৎসরের শস্যহানিতে পর-বৎসর দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়)…	১,৩১,৪৯,১৪৮…৬…৩…২
১১৭৭ বঙ্গাব্দ (১৭৭০ খৃঃ—ইহাই দুর্ভিক্ষের ও মড়কের বৎসর)	১,৪০,০৬,০৩০…৭…৩…২
১১৭৮ বঙ্গাব্দ (১৭৭১ খৃঃ)	১,৫২,২৬,৫৭৬,…১…২…১

১১৭৮ বঙ্গাব্দের এই রাজস্ব হইতে নানা কারণে সরকারের ক্ষতি (মোট ৩,৯২,৯১৫…১১…১২…৩)

বাদ দিলেও পাওয়া যায়………১৫৩,৩৩,৬৬০…১৪…৯…২ টাকা

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর বাঙ্গালার রাজস্ব বিভাগের পত্রে দেখা যায়—অত্যুগ্র চেষ্টায় রাজস্ব ঐরূপে আদায় করা হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে (১৫ই মে) মহম্মদ রেজা খান তাঁহার প্রভুদিগকে লিখিয়াছিলেন—রাজস্বের সকল বিভাগে আদায় জন্য তিনি মানুষের যতটা সাধ্য তত চেষ্টা করিয়াছেন—কোন ত্রুটি করেন নাই। অথচ তিনি ঐ পত্রেই লিখিয়াছিলেন—"পুষ্করিণী ও উৎস শুকাইয়া গিয়াছে—জল সংগ্রহ করা দিন দিন অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র অগ্নিদাহে বহু পরিবার নিঃস্ব হইতেছে ও বহু লোক মরিতেছে।"

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা কোর্ট অব ডিরেক্টারসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেশের এরূপ দুরবস্থায়ও রাজস্ব হ্রাস না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন :—

"যে সকল কারণে ইহা হইয়াছিল, সে সকল কারণের নির্দ্দেশ সহজসাধ্য নহে—যে সকল জটিল উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হয় এমন কি, রাজস্বের উপকরণ সকল কিরূপ, তাহা নির্দ্দেশ করা দুষ্কর। তবে আমরা একটি কারণের উল্লেখ এই স্থানে করিব। ইহাকে 'নাজাই' বলে। ইহাতে মৃত বা পলায়িত প্রজাদিগের দেয় খাজনা গ্রামের অন্যান্য প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়।"

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বলেন, এই ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত নহে; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময়েও ইহা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তাহাতে রাজস্বের পরিমাণ-বৃদ্ধিতে সহায়তা হইয়াছিল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতির এই পত্রে রাজস্ব আদায় ব্যাপারে বিশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়। কোম্পানী দেওয়ানী পাইবার পূর্ব্বেও বিশৃঙ্খলা ছিল। নাজিমরা জমিদারদিগের নিকট হইতে যত টাকা পারিতেন, তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া, আদায় করিতেন; জমিদাররা আবার প্রজার নিকট হইতে অর্থ লুণ্ঠন করিয়া ধনশালী হইতেন এবং আবার নাজিমদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইতেন। নাজিম ও জমিদার উভয়ের মধ্যে যেমন জমিদার ও প্রজার মধ্যে তেমনই মুৎসুদ্দীরা ছিলেন। তাঁহারাও ঐ সব আয়ের অংশ পাইতেন। এ সবই বে-আইনী বলিয়া গোপন রাখা হইত। যে যাহা পারিত লুণ্ঠন করিয়া লইত। হেষ্টিংস প্রভৃতি বলেন, ইহাতে মন্দের ভাল এই হইত যে, অনেক টাকা দেশে থাকিত। পূর্ব্ববর্ত্তী এই সকল বিশৃঙ্খলা সরকারের বিশৃঙ্খলায় আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বাগ্মিবর বার্ক বলিয়াছিলেন—

"তাতারদিগের আক্রমণ অনিষ্টকর ছিল; ইংরেজের রক্ষাদান ভারতবর্ষ বিনষ্ট করিতেছে।"

ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, প্রথম আঘাত জমিদারদিগের উপর পতিত হইয়াছিল। ইংরেজদিগের রাজস্ব আদায়ে দেশের জমিদার ও প্রজা উভয় সম্প্রদায়ের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা কয়টি কথা বলিব।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আপনাদিগের স্বার্থ "ষোল আনা" অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যখন কর্ম্মচারীদিগের অনাচারে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, তখন রাজা সিতাব রায় ও মহম্মদ রেজা খাঁনকেই বিরাগভাজন করিয়া সকলের অপরাধ চাপা দিবার চেষ্টা হইল। রাজা সিতাব রায়কে ও মহম্মদ রেজা খাঁনকে পদচ্যুত করিয়া কোম্পানীর অর্থাপহরণের ও নানা অনাচারের অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিবার জন্য কলিকাতায় আনিবার আদেশ পাইয়া হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে জানাইলেন, তিনি অনিচ্ছায় প্রভুদিগের আদেশ পালন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উভয়কেই আত্মপক্ষ সমর্থনের সব সুবিধা দিবেন। তাঁহারা নামেমাত্র নজরবন্দী থাকিলেন! উভয়েই পরে নিরপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

কোম্পানীর কার্য্যও যে দুর্ভিক্ষের কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় কি?

হাণ্টার ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে পরবর্ত্তী দুর্ভিক্ষের তুলনায় অধিক লোকক্ষয়ের ৩টি কারণ প্রধান বলিয়াছেন :—

(১) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের আরম্ভেই সরকার অসঙ্গত ভাবে ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিয়া সব শস্য বাজারে আনাইয়াছিলেন। পরবৎসরের জন্য চাউল মজুৎ রাখা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; যে কেহ চাউল মজুৎ করিলে জনগণের শত্রু বলিয়া অভিহিত হইতেন—জনতা তাঁহার মাল লুণ্ঠন করিত, তাঁহার গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা ছিল। শস্যের ব্যবসা বিপজ্জনক হয়; যে সময় ব্যবসা-বৃদ্ধিতেই দেশ রক্ষা পাইতে পারিত, সেই সময় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ব্যবসা করিতে বাধা দেওয়া হইয়াছিল বা ব্যবসা ত্যাগ করিতে

বাধ্য করা হইয়াছিল। কাহাকেও সঞ্চয় করিতে না দেওয়ায় অচিরে দর-বৃদ্ধিতে যে সুফল ফলিতে পারিত তাহা ফলিতে পারে নাই। ঐরূপ দর-বৃদ্ধিতে লোক সময় থাকিতে সতর্ক হয়, ব্যবহার হ্রাস করিয়া সঞ্চয় রক্ষা করিবার চেষ্টা করে এবং অভাব দীর্ঘকাল বিস্তৃত করায় অভাবের শেষ সময়ে তাহার তীব্রতা হ্রাস হয়।

(২) পথের অসুবিধায় খাদ্য-শস্য বণ্টনের সুব্যবস্থা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত অসুবিধায় অন্য স্থান হইতে আবশ্যক পরিমাণ শস্য আমদানী করা অসম্ভব হয়।

(৩) স্থলপথে ও জলপথে মাল আমদানী করা সম্ভব হইলেও বাঙ্গালায় তাহা কিনিবার টাকা ছিল না। বাঙ্গালা হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য যেন ঝাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

প্রথম কারণের সমর্থন করা যায়। সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে—আপনারা বা ঠিকাদার প্রভৃতির দ্বারা ব্যবসার স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা না দিলে ব্যবসায়ীরা বাজারের অবস্থা বুঝিয়া যেমন অধিক মাল কিনিতে থাকে, তেমনই দর অধিক হওয়ায় লোক ব্যবহার হ্রাস করিয়া সঞ্চয়ে পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত চালাইবার ব্যবস্থা করে। সরকার ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় রাজপথের অবস্থা যেমনই কেন থাকুক না, জলপথের অভাব ছিল না। কিন্তু হাণ্টারই স্বীকার করিয়াছেন, রাজকর্ম্মচারীরা ও তাহাদিগের লোকরা স্থানান্তর হইতে আমদানী চাউলের নৌকা ধরিয়া মাল তুলিয়া লইয়াছিল —যে কোন মূল্য দিয়া কৃষকের নিকট হইতে চাউল লইয়াছিল—ইত্যাদি। সেরূপ অবস্থায় কে ব্যবসা করিতে আগ্রহশীল হয়?

তৃতীয় কারণ—পূর্ব্ববর্ত্তী ১০।১২ বৎসরের লুণ্ঠনের ফল। লোকের ঘরে অর্থ ছিল না—ধান্য বা চাউল বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কাষেই অবস্থা শোচনীয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" বাঙ্গালার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপ্লব হইয়াছিল।

আমরা বলিয়াছি, প্রথমে জমিদারদিগকে উৎপীড়িত করিয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তখনও জমিদারদিগের ঘরে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত কিছু অর্থ ছিল এবং তাঁহারাও সম্পত্তি ও সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টায় সেই অর্থ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দিনাজপুরের রাজা তাঁহার জমিদারীর নিম্নলিখিতরূপ হস্তবুদ দাখিল করিয়া এবং ১২ লক্ষ টাকা দিয়াও অবশিষ্ট টাকা দিবার জন্য সময় চাহিয়া তাহা পায়েন নাই—

১১৭৬ বঙ্গাব্দে রামচন্দ্র সেনের হিসাবে হস্তবুদ···
১৮,৬৫,৬৬১ টাকা ১২ আনা ২ পাই ৩ গণ্ডা।

আমীন রেয়াল রমাস লাহিড়ী তাহা বাড়াইয়া—
২০,৮৩,১৪১ টাকা ১৪ আনা ১১ গণ্ডা ১ কড়া করেন।

ঐ হস্তবুদ হইতে সরঞ্জামী খরচ প্রভৃতি বাদ দিলে
১৮,৪৬,৯১৪ টাকা ২ আনা ৩ গণ্ডা ১ কড়া থাকে।

রাজা প্রজাদিগের মৃত্যুতে ও পলায়নে যে টাকা কম হয় তাহা বাদ পাইয়া ১৩,৭০,৯০২ টাকা ৩ আনা ৬ গণ্ডা ৩ কড়া ধার্য্য করিতে বলিলে সরকার সে হিসাবে বিশ্বাস করিতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে আনিয়া সর্ত্তানুযায়ী টাকা দিতে বাধ্য করিবার ভয় দেখান।

বর্দ্ধমানের জমিদার মহারাজ দুর্ভিক্ষের শেষ ভাগে যখন পরলোকগত হয়েন, তখন তাঁহার অর্থের এমনই অভাব যে, তাঁহার উত্তরাধিকারী মূল্যবান্ তৈজসপত্র গলাইয়াও পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবার জন্য সরকারের নিকট ঋণ চাহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৬ বৎসর পরেও তিনি রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতাহেতু আপনার গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নদীয়ার (কৃষ্ণনগরের) রাজা আর্থিক দুরবস্থাহেতু জমিদারীর ভার পুত্রকে দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাণী ভবানী (রাজসাহী) অসাধারণ দক্ষতাসহকারে জমিদারী রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্প দিন পরে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায় তাঁহাকে জমিদারীভ্রষ্ট করার ও তাঁহার জমিদারী বিক্রয় করার ভয় দেখান হইয়াছিল।

বীরভূমের মুসলমান রাজা সাবালক হইয়াই রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতাহেতু বন্দী হয়েন।

বিষ্ণুপুরের বৃদ্ধ রাজা অধমর্ণের কারাগার হইতে মুক্তি পাইবার পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

বাঙ্গালার যে সকল পুরাতন জমিদার-বংশ মোগল সম্রাট-দিগের শাসনকালে আংশিকরূপে স্বাধীন শাসকের অধিকার সম্ভোগ করিতেন এবং যাঁহাদিগকে বৃটিশ শাসকগণও পরে ভূমির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। তাঁহাদিগের দুই-তৃতীয়াংশের সর্ব্বনাশ হয়; কেহ বা নাম-শেষ হয়েন, কেহ বা ভূমি সম্পত্তির অধিকাংশ হারাইয়া বা ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আর বহু ক্ষুদ্র জমিদারের জমিদারী বিক্রীত হয়; অনেককে কারারুদ্ধ হইতে হয়। বাঙ্গালায় নূতন জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ও সমাজে প্রভাবশূন্য জমিদাররা তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজপতি, প্রজাপালক ও প্রজাশাসক জমিদার-দিগের স্থান অধিকার করেন। বাঙ্গালার সমাজ-ব্যবস্থায় অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থান আভিজাত্য-হীন ধনীরা গ্রহণ করেন। এই পরিবর্ত্তন পরবর্ত্তী সমাজ-ব্যবস্থায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর বাঙ্গালার জনগণ? যে কৃষকের কথায় লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, তাহারাই রাজস্বের অধিকাংশ প্রদান করে, তাহাদিগের শ্রমেই শস্য উৎপন্ন হয়, তাহারাই দেশের মেরুদণ্ড, সেই কৃষক সম্প্রদায়ের এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। কবির কথা—অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি মুখের কথায় হইতে পারে, কিন্তু যে কৃষক-সম্প্রদায় দেশের গৌরব সেই সম্প্রদায় এক বার নষ্ট হইলে আর তাহা-দিগের স্থান পূর্ণ করা যায় না। অবশ্য এ দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত বিলাতের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভেদ আছে এবং সেই প্রভেদ সামাজিক ব্যবস্থার ও পবিত্রতার ফল। বিলাতে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ব্যভিচারের ফল—পুত্রগণ অভিজাত সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিল। তিনি বারবারা পামারকে ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ড করেন এবং গ্রাফটনের ডিউক-পরিবার সেই অনাচার হইতে উদ্ভূত। বারাঙ্গনা ও অভিনেত্রী নেল গুইনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইতে সেণ্ট আলবান্সের ডিউকদিগের উৎপত্তি। ফ্রান্স হইতে তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য প্রেরিত লুই ডি কুইরোইল্লী ডাবেস অব পোর্টস-মাউথ ও রিচমণ্ড পরিবারের আদি জননী। লুসী ওয়াণ্টারসের গর্ভজাত পুত্রকে তিনি ডিউক অব মনমাউথ করেন। বাঙ্গালায় কখন এইরূপ ব্যাপার সম্ভব হইত না। কিন্তু সকল দেশে ও সর্ব্ব-কালেই কৃষকগণ দেশের গৌরব ও শক্তি। এই দুর্ভিক্ষে সেই সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ হয়। মেকলে লিখিয়াছেন—মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় নাই; কিন্তু লোক বলিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বলেন—তিনি চারি দিকে এই দুর্ভিক্ষের ক্ষতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন: বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ জমি বন্য পশুর বাসস্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। এই অবস্থায়ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব বর্দ্ধিত করিতে

দ্বিধানুভব করেন নাই। কাযেই দেখা যায়, বীরভূম জিলায় ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে আবাদযোগ্য জমির এক-তৃতীয়াংশের প্রজা ফেরার বলিয়া লিখিত হইলেও এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে অর্দ্ধেক জমিই পতিত এবং বহু জমিতে চাষের লোক না থাকিলেও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হস্তবুদ যে স্থানে ১ লক্ষ পাউণ্ড (পাউণ্ড ১৫ টাকা) ছিল ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সেই স্থানে প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ড হয়। প্রজাদিগকে মুসলমান সৈনিকদিগের দ্বারা উৎপীড়িত করিয়া খাজনা আদায়ের চেষ্টা হয়। কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই। আমরা নিম্নে বীরভূমের কয় বৎসরের হস্তবুদ ও আদায়ের হিসাব দিতেছি :—

বৎসর (খৃষ্টাব্দ)	হস্তবুদ (পাউণ্ড)	আদায় (পাউণ্ড)
১৭৭২	৯১,৪১৩	৫৫,২০৭
১৭৭৩	১০৩,০৮৯	৬২,৩৬৫
১৭৭৪	১০১,৭৯৯	৫২,৫৩৩
১৭৭৫	১০০,৯৮৩	৫৩,৯১৭
১৭৭৬	১১৪,৪৮২	৬৩,৩৫০

গ্রামের চারিদিকে জঙ্গল—ব্যাঘ্রাদির আশ্রয়স্থান হয়। পূর্ব্বে যে পথে সেনাদল গতায়াত করিত ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তথায় এক দল সিপাহী দুর্গম জঙ্গল ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিল। ঐ বৎসর 'হিকিস গেজেট' পত্রে এক জন লিখিয়াছিলেন, প্রতি রাত্রিতে তাঁহাদিগের শিবিরের কাছে ব্যাঘ্র ও ভল্লুক আসিত। দেওঘরে যাইতেও পথে বন্যহস্তীর কৃত ধ্বংসচিহ্ন দেখা যাইত। "পতিত" জমি চাষের জন্য অন্যান্য স্থান হইতে কৃষক আনিয়া "পত্তন" করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল।

লোকক্ষয় দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল চলিয়াছিল। তাহার কারণ, দুর্ভিক্ষের সময় প্রথমেই শিশুরা অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কাযেই যত দিন আবার শিশুরা জাত ও বর্দ্ধিত না হয়, তত দিন বৃদ্ধদিগের মৃত্যুতে যে লোকক্ষয় হয়, তাহা পূর্ণ করিবার কোন উপায় হয় না।

লোকক্ষয়হেতু জমিদাররা খাজনা হ্রাস করিয়া "পতিত" জমি "উঠিত" করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কৃষককে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় পরস্পর দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে লাগিলেন এবং নূতন প্রজারা অল্প খাজনায় "পত্তন" হওয়ায় পুরাতন প্রজারা তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাভূত হইয়া জমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

বাঙ্গালার কৃষকের পক্ষে পরিচিত সমাজ ও পূর্ব্বপুরুষের গৃহ গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাওয়া কিরূপ কষ্টকর ও দুঃসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া বাঙ্গালার কৃষকগণ দলে দলে তাহাই করিতে লাগিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টমাশ লিখেন,—"প্রত্যেক জমিদার জমির উন্নতিসাধন জন্য পাহাড় হইতে লোক আনিবার চেষ্টা করিতেছেন।" বাঙ্গালায় কত কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি এই সূত্রে আসিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি সহজে পতিত এক-তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধেক ভাগ জমিতে আবাদ হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল।

অভিজাত সম্প্রদায় ও কৃষকদিগের পর আমরা বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের কথা বলিব। এই সম্প্রদায় স্বচ্ছল অবস্থায়—জমির আয়, ব্যবসার মুনাফা ও চাকরীর বেতন লাভ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যার চর্চ্চা হইত। এই সম্প্রদায়ই গ্রামে বাস করিয়া গ্রামে যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সহায় হইতেন, তেমনই গ্রামের শ্রী সম্পাদিত করিতেন। দেশে যে অবস্থা ঘটিল তাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে জমি চাষ করিবার লোক লাভ করা দুঃসাধ্য হইল, ব্যবসার প্রবাহ শুষ্ক হইয়া আসিল, চাকরী দুর্লভ হইল। বীরভূমের বিবরণে আমরা দেখিতে পাই—দুর্ভিক্ষের ২০ বৎসর পরে কারাগার খাজনা প্রদানে অক্ষম বন্দীতে পূর্ণ—তাঁহাদিগের কাহারও দেয় খাজনা দিয়া মুক্তিলাভের কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না।

বাঙ্গালার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তাহাতে যে বাঙ্গালা "সোণার বাঙ্গালা" বলিয়া অভিহিত হইত, সে বাঙ্গালা ইতিহাসের পৃষ্ঠাগত হইল; যে বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যে ও প্রাচুর্য্যে বিস্মিত হইয়া বার্ণিয়ার বলিয়াছিলেন, প্রবাদ ছিল, বাঙ্গালায় প্রবেশের শত দ্বার ছিল—বাঙ্গালা হইতে বাহির হইবার একটি দ্বারও ছিল না অর্থাৎ যে এক বার বাঙ্গালায় আসিত সে আর যাইতে চাহিত না; যে বাঙ্গালা দেশ-বিদেশে অন্ন বিতরণ করিত বলিয়া যে কেহ বাঙ্গালায় আসিলে অন্নাভাবমুক্ত হইত এবং কেবল দুর্ভাগ্য ব্যক্তিরাই বাঙ্গালায় আসিলেও দুর্দ্দশাভোগ করে, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রবাদ ছিল—

"আমি যা'ব বঙ্গে,
আমার কপাল যা'বে সঙ্গে"

সে বাঙ্গালা আর রহিল না। বাঙ্গালার যে জমিদারগণ—আইন-আকবরীতে লিখিত বিবরণে সম্রাটের সাহায্যার্থ ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৭০ হস্তী, ৪,২৬০ কামান ও ৪,৪০০ নৌকা যোগাইতেন—যাঁহাদিগের হস্তিশালায় হস্তী, অশ্বশালায় অশ্ব ছিল, যাঁহারা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, সদাব্রত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—যাঁহাদিগের দ্বার হইতে প্রার্থী কখন বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিত না, সেই জমিদার সম্প্রদায় উচ্ছিন্ন হইলেন। বাঙ্গালার যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের গর্ব্ব ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। বাঙ্গালার যে কৃষক সম্প্রদায় দেশের সমৃদ্ধির কারণ ছিল—নানারূপ দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া দেশের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির উপায় করিত, সেই কৃষক সম্প্রদায়ের যাহারা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইল, তাহারা শ্রমিকে পরিণত হইল—দারিদ্র্য তাহাদিগের নিত্য-সহচর হইল, মহাজনের ঋণ তাহারা আর শোধ করিতে পারিল না। বাঙ্গালার যে বাণিজ্যে "শতমুখে" অর্থাগম হইত সেই বাণিজ্য বিদেশীর হস্তগত হইল—দেশের লোকের ভাগ্যে "খোশা ভূষী" মাত্র রহিল। সংস্কারের অভাবে বাঙ্গালার যে সকল জলপথের প্রশংসা বার্ণিয়ার করিয়াছিলেন, সে সকল শুষ্ক হইতে লাগিল—রোগকেন্দ্র হইতে লাগিল। "শস্যশ্যামলা" বাঙ্গালার কৃষির যে দুর্গতি হইতে লাগিল, তাহাতে শতবর্ষ পরে যখন ইংরেজ শাসক সার চার্লস ইলিয়ট ও ইংরেজ ঐতিহাসিক সার উইলিয়ম হাণ্টার তখন মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন, এ দেশের অধিকাংশ কৃষক পূর্ণাহার পায় না, তখন তাঁহারা বাঙ্গালার কৃষককে সেই মতের ব্যতিক্রম বলিতে পারিলেন না। রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সুযোগ লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা পঙ্গপাল যেমন শস্যক্ষেত্র নিঃশেষ করিয়া খাইয়া ফেলে তেমনই বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য ও শ্রী শোষণ করিবার পর "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" এক বৎসর সুবর্ষণের অভাবের পর এক বৎসর বর্ষণাভাব বাঙ্গালার যে দুর্দ্দশার কারণ হইল তাহাতে জনবহুল বাঙ্গালায় কৃষিকার্য্যের লোকাভাব হইল, বহু ভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হইল, বহু জলাশয় শুকাইয়া গেল, বহু খাল মজিয়া গেল। সেই বাঙ্গালায়—সেই নূতন ও শ্রীহীন বাঙ্গালায় নূতন শাসন আরম্ভ হইল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মিনিয়া কোঙ্কা

জাপানীরা বর্ম্মারোড অধিকার করিলে চীনের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক রাখা মিত্র-শক্তির পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। এখন কিন্তু চীনের বুকে নূতন করিয়া আবার প্রাণের স্পন্দন জাগিয়াছে। এ প্রাণ-বায়ু বহিয়া আনিয়াছে আমেরিকা। অর্থাৎ ভারত হইতে মার্কিণ প্লেনে চীনে পৌঁছিবার নূতন পথ বাহির হইয়াছে তিব্বতের পূর্ব্বপ্রান্ত ভাগে।

এ অঞ্চলে গিরিপর্ব্বত তুর্লজ্ঘ্য এবং প্লেনের পক্ষে সে পথে চলা ত্বঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তার গায়ে আবার পাহাড়—এ সব পাহাড়ে মেঘ আর তুষার-পাতের নিমেষ-বিরাম নাই। এই ত্বরন্ত মেঘ ঠেলিয়া মার্কিণ পাইলটের দল আসিয়া মিনিয়া কোঙ্কা গিরির কোলে সমতল উপত্যকা-ভূমির উপর প্লেন নামাইতেছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া বৃষ্টি-প্লাবিত অল্প-পরিসর খাদের গা বহিয়া পথ গিয়া মিশিয়াছে সেই চুঙ-কিঙের গায়ে। সারা বৎসর এ পথ কুয়াশায় ঢাকা থাকে; সে কুয়াশা ভেদ করিয়া সূর্য্য এখানে ক্বচিৎ কখনো দর্শন দেন!

মিনিয়া কোঙ্কা

যাত্রীদের পথ-রেখা

মিনিয়া কোঙ্কা গিরির শিখর-দেশ ২৪৯০০ ফুট উঁচু। তিব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে এ শিখর আবার সব চেয়ে উঁচু।

বর্ত্তমান যুদ্ধের কয় বৎসর মাত্র পূর্ব্বে মার্কিণ পর্য্যটকের দল আসিয়া এ পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন। এ দলের অধিনায়ক ছিলেন রিচার্ড বার্ডশল এবং টেরিশ মুর।

মিনিয়া কোঙ্কা গিরি এবং গিরির কোলে অবস্থিত মালভূমি সম্বন্ধে তাঁরা লিখিয়াছেন, আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই যে, এ অঞ্চলে প্লেন বা মোটর-গাড়ী কোনো দিন আসিতে পারিবে! ক'বৎসরে কালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সত্য—কিন্তু ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র ঘটে নাই।

মিনিয়া কোঙ্কার পশ্চিম গায়ে তিনটি বড় বড় খরস্রোতা নদী আছে। নদীগুলির প্রত্যেকটি পঞ্চাশ মাইলেব ব্যবধান রাখিয়া পাহাড়ের কোল বহিয়া নামিয়া তিনটি প্রদেশে বড় বড় তিনটি নদী-রূপে প্রাণের উৎস জোগাইতেছে। সে তিনটি নদী—চীনে ইয়াংসী; ইন্দো-চীনে সেমকঙ্ এবং বর্ম্মায় শালুইন।

এ তিনটি নদীর ত্ব'শো মাইল দূরে এবং এই তিন নদীর সমরেখায় তিব্বত হইতে নামিয়াছে ব্রহ্মপুত্র—নামিয়া ভারতের বুকে গিয়াছে।

দক্ষিণ-তিব্বতের যে অঞ্চলে এই ত্রিবেণী-সঙ্গম, সে অঞ্চলটুকু চীনের অধিকারভুক্ত; এবং এ অঞ্চল শিকাঙং নামে পরিচিত। অধিবাসীর সংখ্যা এখানে খুব অল্প; এবং অধিবাসীরা সকলেই তিব্বতী। যুদ্ধের পূর্ব্বে শিকাঙে আসিবার পথ ছিল তিনটি—বর্ম্মায় ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত ভামো হইতে জল-পথে; দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে কুনমিঙ হইতে রেল-পথে; এবং সাংহাই হইতে ইয়াংসী নদীর উপর দিয়া নৌকাযোগে। প্রথম ত্ব'টি পথ ছিল সুদীর্ঘ এবং ত্বর্গম; তৃতীয় পথটি সুদীর্ঘ ছিল না বলিয়া এই পথেই তাঁরা এখানে আসিয়াছিলেন। দলে ছিলেন চার জন—বার্ডশল এঞ্জিনীয়ার; ইয়ং চীনাম্যান—মার্কিন মুল্লুকে ইঁহার জন্ম; মুর এবং এমন্স। শেষোক্ত ত্ব'জন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, মিনিয়া কোঙ্কার উচ্চতা মাপিবেন এবং এ পাহাড়ে সকলের আগে তাঁরা চড়িবেন; পাহাড়ে উঠিয়া পাহাড়ের উদ্ভিদ্ ও প্রাণিসমূহের তত্ত্বানুশীলনও করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

তাঁদের পূর্ব্বে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এক দল পর্য্যটক মিনিয়া কোঙ্কার পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত সোঙ্গো পাহাড় পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে তাঁরা মিনিয়া কোঙ্কার দর্শন লাভ করেন। মিনিয়া কোঙ্কার নাম তাঁরা শুনিয়াছিলেন বো কোঙ্কা। তারপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আর দু'জন পর্য্যটক থিয়োডোর এবং কামিট রুজভেল্ট এ-অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পাহাড়ের উচ্চতা অনুমান করিয়াছিলেন, ৩০০০০ ফুট। মিনিয়া কোঙ্কায় তাঁরা আসেন নাই। ইহার প্রায় পাঁচ-সাত বৎসর পরে বার্ডশল দলের এই অভিযান।

সেমি গিরিদ্বার

বার্ডশল লিখিয়াছেন—জুন মাসের মাঝামাঝি সাংহাই হইতে আমরা যাত্রা সুরু করি। ইয়াংসী নদীর বুকের উপর দিয়া মোটর বোটে চড়িয়া ন' দিনে ১৫০০ মাইলের পাড়ি শেষ করিয়া চুংকিঙে পৌঁছিয়াছিলাম। তার পর ইচাঙের পাশ দিয়া পার্ব্বত্য নদী-নির্ঝর বহিয়া অগ্রসর হই। গ্রীষ্মে ও বর্ষান্তে এই সব পার্ব্বত্য নদী জলে পরিপূর্ণ থাকে। সে জলে প্রখর স্রোত; এবং সে স্রোত সবেগে চলিয়াছে ইয়াংসীর বুকে। পাথর ঠেলিয়া এ জলস্রোত পাহাড়ের দুই কূল প্লাবিত করিতে পারে না; সে জন্য এখানে জলের গভীরতা অপরিসীম। এক জায়গায় মাপিয়া দেখি, জলের গভীরতা ১০৫ ফুট। শুনিলাম, সময়-সময় জল এত বাড়ে যে, ২৮০ ফুট গভীর হয়। স্রোতের বিপরীত মুখে চলিতে আমাদের মোটর-বোটের দু'খানি এঞ্জিনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল; এবং বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা কূলের কাছে ভিড়িতে পারি নাই।
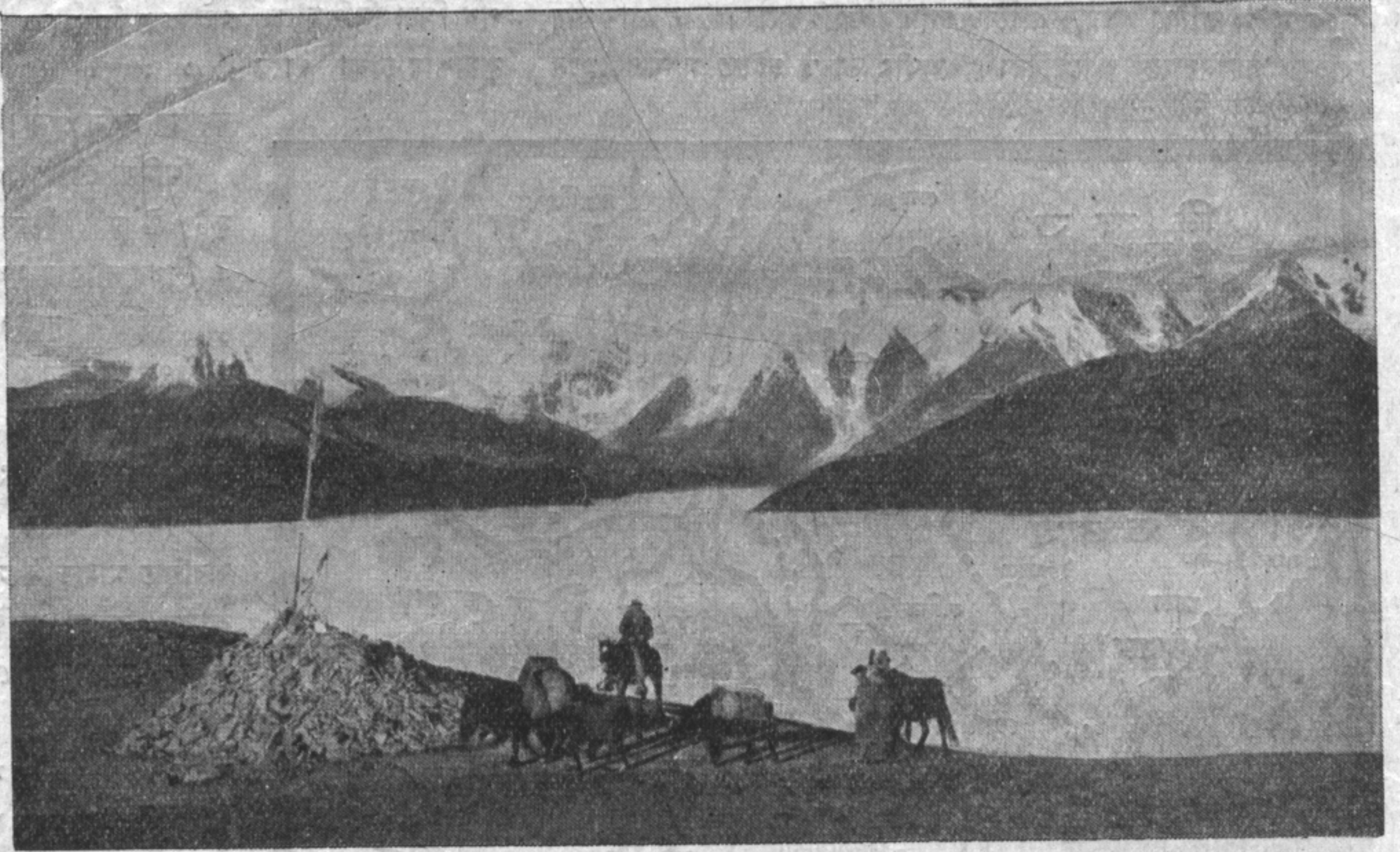
বৌদ্ধ মঠ—কোঙ্কা গম্ফা

চুঙকিঙে আমরা মোটর-বোট ছাড়িয়া ছোট ষ্টীমার লইলাম এবং ষ্টীমারে চড়িয়া চার দিনে আসিলাম ইপানে। তার পর আর তিন দিনে মিন নদীর বুক বহিয়া লোশানে আসিয়া পৌঁছিলাম। লোশানে নদীর পূর্ব্ব-তীরে পাহাড়ের শিলাখণ্ডে বিরাট এক বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটি আসনোপবেশনে অবস্থিত এবং ১১৬ ফুট উঁচু। ১০০ খৃষ্টাব্দে এ মূর্ত্তিটি খোদিত হইয়াছিল।

লোশান হইতে বাসে চড়িয়া খাড়া পাহাড়-পথে আমরা আসিলাম চেঙতু। চীনের জন-বহুল জেচোয়ান প্রদেশের প্রধান সহর চেঙতু। এখানে দু'-তিন দিন বাস করিয়া বাস এবং রিক্‌সাযোগে আমরা ইয়াংচৌয়ে আসিলাম। ইয়াংচৌয়ে আসিয়া দেখি, সামরিক কর্ম্মচারীদের জিম্মায় কুলির মাথায় আমাদের মালপত্র আমাদের পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইয়াংচৌ হইতে তাৎসিয়েন্‌লুর পথে

আমাদের মালপত্রের ওজন ছিল প্রায় ১৮ মণ। আঠারো জন কুলির মাথায় এই মালপত্র চাপাইয়া এখান হইতে যাত্রা করিলাম কানটিঙের (তাৎসিয়েন্‌লু) দিকে। ইয়াংচৌয়ের মেয়র আমাদের সঙ্গে পাহারাদারীর জন্য দু'জন সশস্ত্র সেনা দিয়াছিলেন। তাৎসিয়েনলুতে যাইবার পথ আছে দু'টি; যেটি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং যে পথে লোকচলাচল বেশী, আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। এই পথেই পূর্ব্বে পাইপিং-লাশার বাণিজ্য পণ্যাদির আদান-প্রদান চলিত। প্রখর রৌদ্র-তাপে পথ দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। বড় বড় ছাতার নীচে মাথা রক্ষা না করিয়া দু'পা চলিবার উপায় ছিল

যাত্রীদের ছাউনি—এখান হইতে পাহাড়ের উচ্চতা মাপা হইয়াছিল

না। এ পথে গাড়ী চলে না। অশ্বতর এ পথে একমাত্র বাহন। অশ্বতরের পিঠে কামান-বন্দুকও বহা হয়, দেখিলাম।

এক এক জায়গায় গিরি-দ্বার খাড়া ৯০০০ ফুট উঁচু। পাথরের সোপান বহিয়া ওঠা-নামা করিতে হয়। প্রথম গিরি-দ্বার তাশিয়াং লিঙ। এখান হইতে মিনিয়া কোঙ্কা বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায়। পাইপিং হইতে লাশায় যাইতে ঠিক মধ্যপথে একটি বৌদ্ধ-মন্দির আছে। পুরাকালে লাশায় যখন চীনের রাজকর্ম্মচারীরা বাস করিতেন, তখন এই পথে চীন ও তিব্বতের ডাক যাতায়াত করিত। যাতায়াতে সময় লাগিত উনিশ দিন।

পনিঘোড়া এবং অশ্বতর এখন এ পথের বাহন। তিব্বতে চা যায় অশ্বতরের পিঠে—চায়ের বহু প্যাকেট। কুলিরাও চায়ের ভারী মোট মাথায় বহিয়া লইয়া যায়। ইংরেজী T অক্ষরের ছাঁদে তৈয়ারী মোটা লাঠির গায়ে চায়ের ভারী প্যাকেট বাঁধিয়া কুলিরা সেই মোট বহিয়া পাহাড়-পথে চলে। চায়ের ব্যবসায়ের জন্য তাংসিয়েনলুর সমৃদ্ধি এবং প্রাধান্য অপরিসীম। এখানকার নিসর্গ-দৃশ্যও অপরূপ। ৩০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের গা কাটিয়া বিপুল বেগে খরস্রোতা নদী বহিয়া চলিয়াছে। ১৫ মাইল পথ বহিয়া পূর্ব্ব চীনের দিকে ওয়াশেজকোয় আসিয়া এ নদী মিশিয়াছে তুঙ নদীর গায়ে। পথে বহু ছোট ছোট নদী-নির্ঝর ও খাদ আছে। সে-সব উত্তীর্ণ হইবার জন্য পুল আছে—দড়ির পুল, বাঁশ-বাখারির পুল।

পাহাড়-পথে চায়ের কুলি

লেখক লিখিতেছেন—তাংসিয়েনলু হইতে দু'জন তিব্বতী ড্রাইভার এবং ১৬টি ঘোড়া ও ইয়াক্ সহ আমরা যাত্রা করিলাম। এখানে পথ একেবারে ৮৫০০ ফুট নীচে নামিয়াছে।

নীচে ধরণীর শ্যাম শোভা অপরূপ—অজস্র তৃণ-পল্লবে চারি দিক্ সমাচ্ছন্ন। উপরের সে রূঢ় কর্কশতার বাষ্পও নাই! ফল-ফুলও এখানে বিচিত্র এবং অজস্র। এ্যাষ্টার, বাটার-কাপ, ডাণ্ডেলিয়ন, পিঙ্ক, ফরগেট-মি-নট—সব রকমের ফুলই অজস্র ফুটিয়া আছে! এ-সব ফুল ছাড়া নাম-না-জানা কত ফুল যে বর্ণে-গন্ধে দশ দিক্ আকুল করিয়া আছে, তার সংখ্যা নাই। এ অঞ্চলে নানা জাতের গাছপালা দেখিলাম।

তৃতীয় দিনের সকালে আমরা জেশি গিরি-দ্বারে উঠিলাম। পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে দেখিলাম প্রার্থনা-পতাকা। এ বর্ত্মের শিখর ১৫৬৮৫ ফুট উঁচু। কুয়াশা এবং সেই সঙ্গে করকাপাত বশতঃ সামনে পিছনে বা পাশে কোনো কিছু দেখা যায় না।

ইয়ুং এবং বার্ডশল্

এই বর্ত্ম পার হইয়া আমরা আসিলাম তিব্বতে। আমাদের সঙ্গে যথাযোগ্য ছাড়পত্র ছিল। আসিয়া সামনে দেখি, বিরাট্ প্রসারিত মালভূমি। এখানে তৃণশস্য আছে—কিন্তু বড় গাছের চিহ্ন দেখিলাম না। এত উঁচুতে ফশল ফলে না। গ্রীষ্মকালে সামান্য যে তৃণ-গুল্ম জন্মায়, তাহা খাইবে বলিয়া তিব্বতীরা তাদের ইয়াকদের আনিয়া এইখানে ছাড়িয়া দেয়। পাহাড়ের গায়ে বহু ইয়াক চরিতেছে, দেখিলাম।
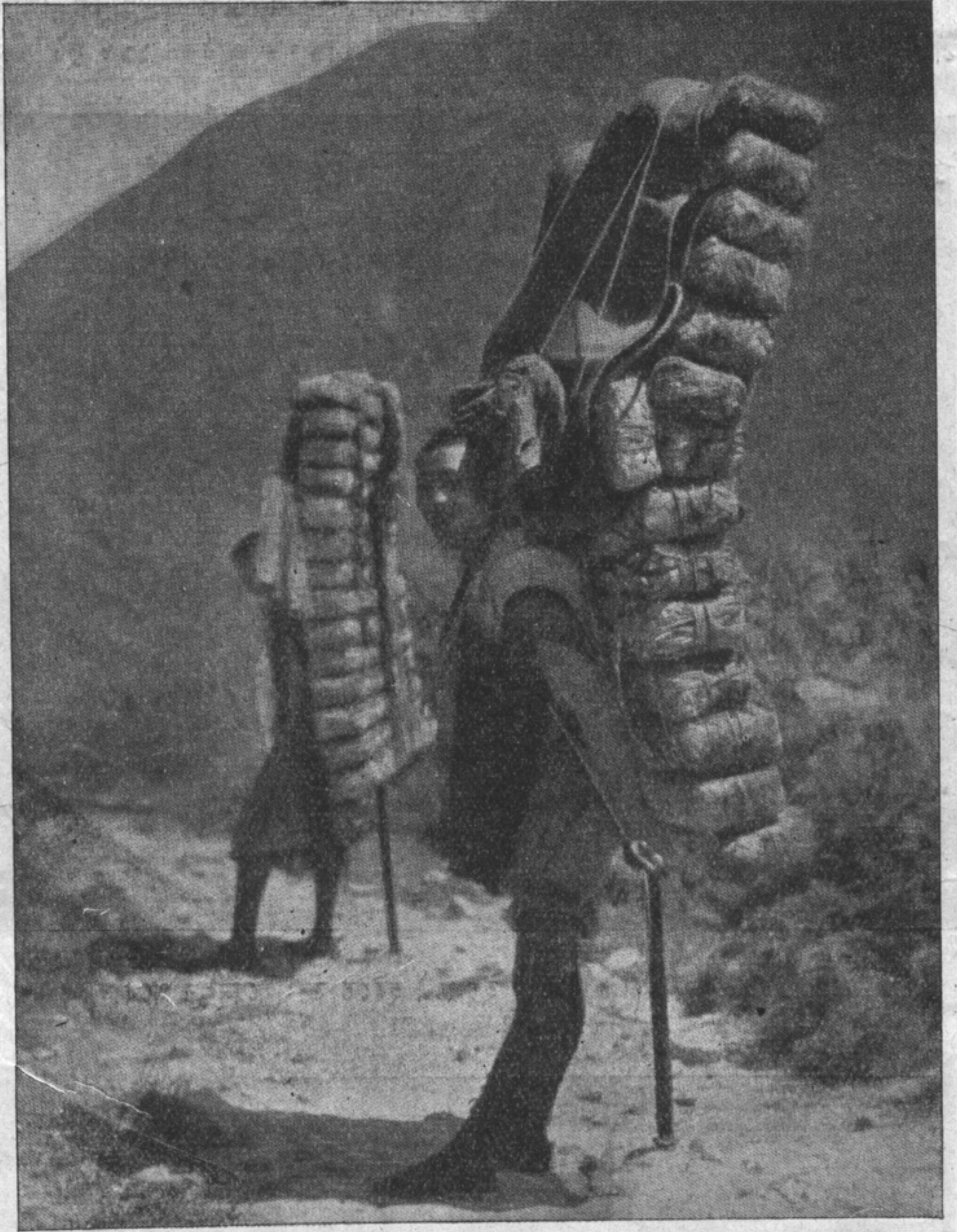
জীব! পুরাতন পথে বিরাগ—নূতন পথেই সর্ব্বদা চলিতে চায়; এবং পাহাড় বা খাদ ও খানা-খোন্দলের কোনো বাধা তারা মানিতে জানে না।

লেখক লিখিতেছেন, এ পথে আমরা আসিলাম য়ুলোরশি গ্রামে। এখানে বহু লোকের বাস। বাড়ী-ঘর পাথরের তৈয়ারী। প্রতি গৃহের ছাদে দু'টি করিয়া খুঁটীর উপর পতাকা সংলগ্ন—এ পতাকা উপাসনা-নিবেদনের সঙ্কেত। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, ছাদে যেন রেডিয়োর বাঁশ খাড়া করা হইয়াছে। ইহার উপর প্রতি গৃহে বহু শিলাখণ্ড স্তূপাকারে সংরক্ষিত থাকে। সেগুলির প্রত্যেকটিতে মন্ত্র খোদা—'ওঁ মণিপদ্মে হুম্!'

য়ুলোরশির ক'মাইল উত্তর-পূর্ব্বে একটি পর্ব্বত-শিখরে এক হ্রদের তীরে রাত্রি-বাসের জন্য আমরা ছাউনি ফেলিলাম। এ শিখরটি ১৪৯০০ ফুট উঁচু। আমাদের সঙ্গে ছিল তিব্বতী পাচক। তার নাম গাওমো। সে চীনা ভাষায় কথা বলিতে পারে। জলের ধারে ছাউনি ফেলিতে চাহিলে সে ভীষণ প্রতিবাদ তুলিল। বলিল, জলের ধারে ভূতপ্রেত-দানার বাস! আমরা তার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলাম না। নিরুপায়ে সে আমাদের ছাউনিতে না থাকিয়া বহু দূরে ছোট ছাউনি ফেলিয়া সেখানে গিয়া রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করিল।

উনিশ হাজার পাঁচশো ফুট উপরে মুর (আগে), বার্ডশল্ (নীচে)

বর্ষা ছিল আসন্ন। সে জন্য আমরা কোথাও কাল-বিলম্ব করিলাম না। ১লা অগষ্ট তারিখে আমরা দু'টি শিখরে নির্দ্দেশক দণ্ড পুঁতিয়া মিনিয়া কোঙ্কার উচ্চতা পরিমাপের ব্যবস্থা করিলাম।

আমাদের ছাউনি হইতে মিনিয়া কোঙ্কা ছিল সাত মাইল মাত্র দূরে—বুচু উপত্যকার গায়ে।

পরিমাপ-কার্য্যে আমাদের সময় লাগিল প্রায় তিন সপ্তাহ। তার পর ২২শে অগষ্ট দারুণ তুষারপাত সুরু হইল। আমরা ছাউনির মধ্যে আশ্রয় লইলাম। পরিমাপের অঙ্ক কষিয়া দেখা গেল, মিনিয়া কোঙ্কা ২৪৯০০ ফুট উঁচু।

তখন ভাবিলাম, ও-পাহাড়ে চড়া কি সম্ভব হইবে না? কাছে আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিব?

না! তুষার-বর্ষণ কমিবামাত্র আমরা পাহাড়ে চড়িবার উদ্যোগ-আয়োজন করিলাম। ইয়াকের দল জড়ো করিয়া সকাল সকাল পাহাড় হইতে নামিয়া বুচু উপত্যকায় আসিলাম। এ পথে পাইলাম সেমি গিরিদ্বার। চারি দিক মেঘে ঢাকা। ছোট একটি নদী আছে। সে নদীর কল্যাণে একটা কল চলিতেছে, দেখিলাম!

চীনা পতাকা পোঁতা

এখানকার ইয়াকগুলি আকারে গোরুর মত। রঙ কালো, পুচ্ছ লোমশ এবং শিং বেশ দীর্ঘ। ইয়াক চলে খুব মৃদু-মন্থর গমনে; তবু এ পথে তার মত বাহন আর মিলিবে না। তবে ইয়াক খুব মেজাজী

সেমিতে ইয়াক বদল করিতে হইবে; তাই রাত্রে আমরা কোঙ্কা পম্পায় যে-মঠ আছে, সেই মঠ দেখিবার ব্যবস্থা করিলাম।

মঠটি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। মঠে প্রধান আচার্য্যের সঙ্গে

দেখা হইল না। শুনিলাম, তিনি লাশায় গিয়াছেন। মঠের অধিবাসীরা আমাদিগকে সুমধুর আতিথ্যে আপ্যায়িত করিলেন। আমাদের তিব্বতী পাচক গাওমো দোভাষীরূপে মঠের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ যেন উপভোগ্য করিয়া তুলিল। মঠে আমরা তিব্বতী চা পান করিলাম। ভোজের জন্য ছিল,—শাম্বা—বার্লির পিষ্টক; লবণ এবং মাখন; সবজীও ছিল। মঠে রাত্রি কাটাইলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল সাদা দাঁড়কাকের ডাকে! উঠিয়া শুনিলাম, বালকের দল পাঠাভ্যাস করিতেছে। তিব্বতের বিধি—প্রতি পরিবারের একটি ছেলেকে মঠে পাঠানো চাই—মঠে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একটি বালক হইবে লামা।

প্রাতরাশ সারিয়া আমরা মিনিয়া-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দারুণ তুষারপাতে আমাদের গতি অবরুদ্ধ হইল। বাধ্য হইয়া কোনো মতে আবার মঠে ফিরিয়া আসিলাম। মঠের অধিবাসীরা নিষেধ করিলেন; বলিলেন, ও-পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিও না। ও-পাহাড়ে দেবতাদের বাস। পাহাড়ে চড়িলে তাঁহাদের শান্তি ভঙ্গ হইবে। তাঁহারা বিরক্ত হইবেন।

তুষারাচ্ছন্ন শিখর—মিনিয়া কোঙ্কা

ফেরার মুখে—ইয়া নদীর বরফ-জমা বুকে নৌকা

তাঁরা বলিলেন, কিছু কাল পূর্ব্বে সুইশ ভূতত্ত্ববিদ্ ডক্টর হিম একবার ও-পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নাই। দারুণ তুষার-বর্ষণে তাঁর বহু সঙ্গী মারা যায় এবং তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন।
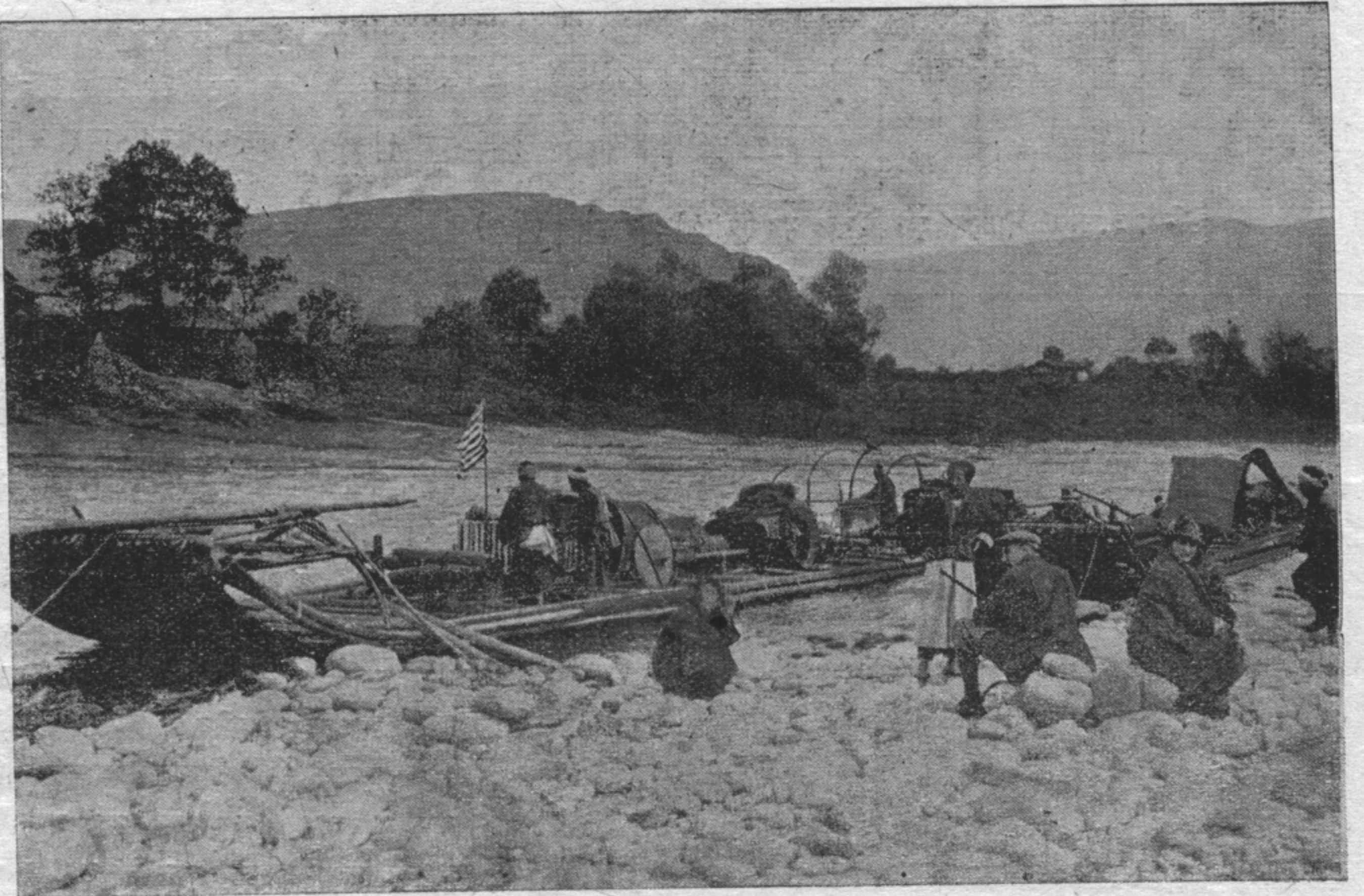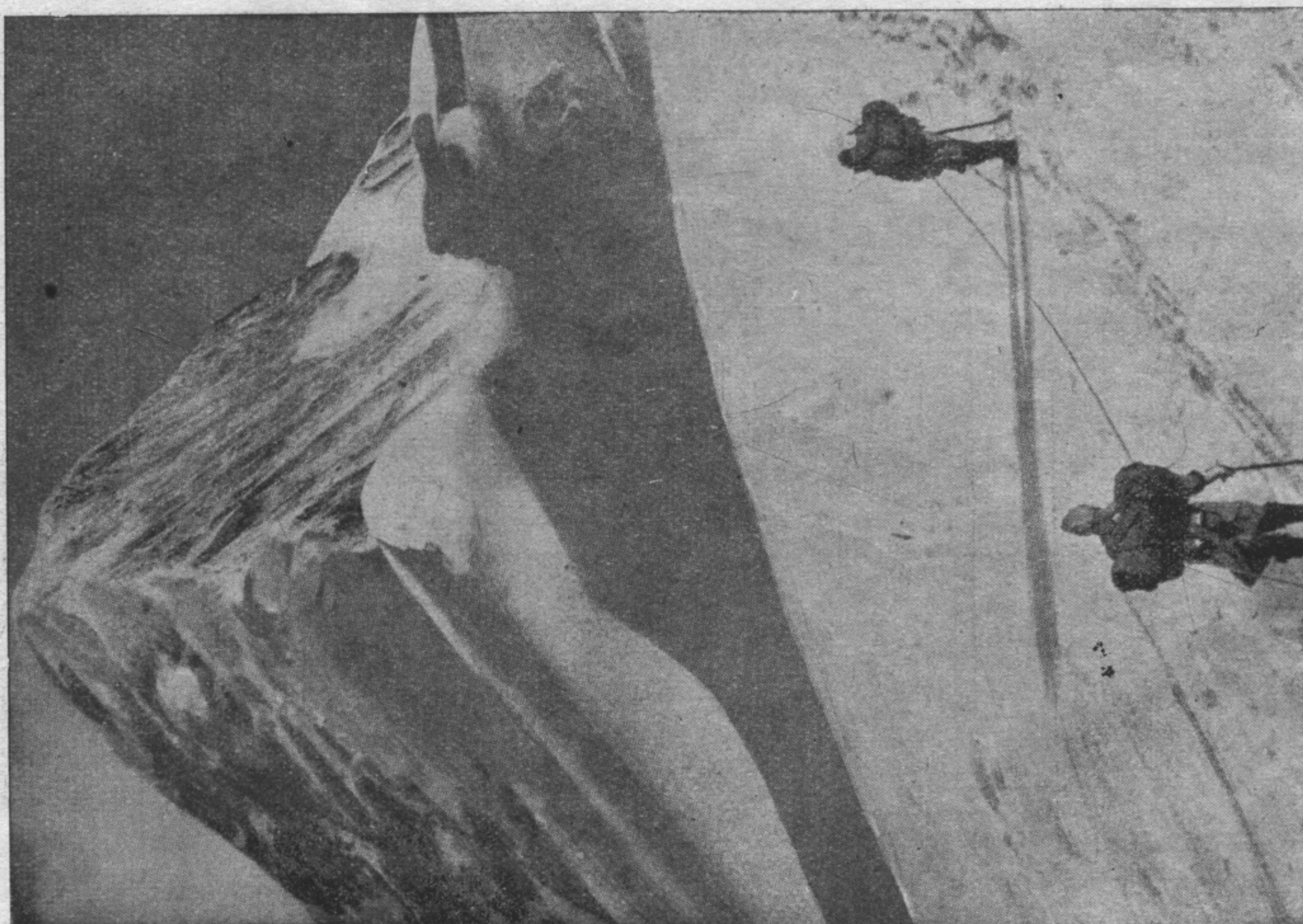
বারো হাজার ফুট উপরে

তাংসিয়েনলু

জমাট বরফ ঘেঁষিয়া পাহাড় হইতে নামা

চা ও পশমের ভারবাহী ইয়াকদল

এ কথায় আমরা নিবৃত্তি মানিলাম না। আমাদের সঙ্গী ইয়ং বলিলেন—আমরা গিরি-দেবতার পূজা করিব। এখানে গিরি-দেবতার পূজার জন্য আসিয়াছি। পূজা না দিয়া আমরা ফিরিব না। এ কথা বলিয়া পূজার জন্য মঠে প্রণামী দিলাম এবং ধূপধূনা জ্বালিলাম। তখন যাইবার অনুমতি মিলিল। পাচক গাওমো যাইতে চাহিল না; তাকে খরচপত্র দিয়া আমরা তাৎসিয়েনলুতে ফেরত পাঠাইলাম!

২রা অক্টোবর ছ'জন কুলি (কুলিদের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক) সঙ্গে লইয়া আমরা যাত্রা করিলাম। প্রথমেই বহু কষ্টে খরস্রোতা একটি তুষার-নদী পার হইলাম; তার পর পশ্চিম দিকে এক বিরাট্ তুষার-হ্রদের উপর দিয়া আমরা চলিলাম মিনিয়া কোঙ্কা অভিযানে।

পশ্চিম দিক দিয়া উপরে প্রায় পাঁচ মাইল পথ উঠিয়া সামনে দেখি, পাহাড়ের গায়ে তৃণ-সমাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। গা ঘেঁষিয়া ছোট একটি নদী বহিতেছে। এ জায়গাটি ১৪৪১৫ ফুট উঁচু। রাত্রে এ পথে প্রচুর তুষার-বর্ষণ হয়। দিনের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে সে তুষার গলিয়া শুকাইয়া যায়। আমরা সমতল ভূমিতে ছাউনি ফেলিলাম।

তার পর ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠা। সাত দিনে উঠিলাম ১৮০০০ ফুট; তার পর তিন দিনে ১৯৮০০ ফুট; এবং আরো

পাহাড়ের তিব্বতী অধিবাসী

সাত দিনে উঠিলাম ২২০০০ ফুট। এখনো উঠিতে প্রায় ৩০০০ ফুট বাকী।

আমাদের গতি যেমন মন্থর তেমনি প্রতি-পদে অবরুদ্ধ হইতেছিল।

প্লেনে চড়িয়া এ পথে আসিতে অক্সিজেন বাষ্পের প্রয়োজন হয়। আমাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় নাই। বোধ হয় ধীরে ধীরে উঠিতেছিলাম বলিয়া এখানকার ঘন বায়ুভার আমাদের অভ্যস্ত হইতেছিল!

তার পর বহু প্রয়াসে আরো এক হাজার ফুট উপরে উঠিলাম। উদর-তৃপ্তির জন্য সঙ্গে ছিল চীনা বিস্কুট—বরফে জমিয়া সেগুলা পাথরের মত শক্ত হইয়া গিয়াছিল—ভাঙ্গিয়া ষ্টোভের আগুনে তাতাইয়া তাহাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলাম।

২৮শে অক্টোবর তারিখে রাত্রি তখন ৩-৪০ মিনিট, দারুণ তুষার-বর্ষণ সুরু হইল। ছাউনির মধ্যে আমাদের হাত-পা সব জমিয়া যাইবার জো। ষ্টোভ জালিয়া তাহারি তাপে হাত-পা সেঁকিতে লাগিলাম। রাত্রিটা এমনি করিয়া কাটিল। সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুষার-বর্ষণের বিরাম এবং সূর্য্য-কিরণে আবার আমরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলাম।

প্রাতরাশ সারিয়া হামা দিয়া বাহিরে আসিলাম। শীত-নিবারক আচ্ছাদনীতে আপাদ-মস্তক ঢাকা ছিল—হামা দিয়া প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আবার হাঁটিয়া চলা সুরু।

বেলা ৮৷৷টায় আরো ৫০০ ফুট উৰ্দ্ধে উঠিলাম। এবার পথ বেশ খাড়া। লোহার সরু রড ছুড়িয়া কঠিন বরফে সেগুলা পুঁতিয়া দড়ির বন্ধনী ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। এখান হইতে আগাগোড়া এমনি দড়ি ধরিয়া উপরে ওঠা। বেলা ২-৪০ মিনিটে অনেকখানি উৰ্দ্ধে উঠিলাম; এবং তিন দিন পরে আসিয়া পৌছিলাম মিনিয়া কোঙ্কার সর্ব্বোচ্চ শিখরে।

এ পাহাড় হইতে ৫৫ মাইল দূরে জারা গিরিশ্রেণী; পূর্ব্ব দিকে চেংতু-উপত্যকা; দক্ষিণে তুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণী এবং পশ্চিমে নীল সাগরের মত তিব্বতের গিরিমালা—অপরূপ দৃশ্য!

চীনা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি-পত্র লইয়া আমাদের এ পাহাড়ে আসা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া এখানে চীনা পতাকা পুঁতিয়া আমরা চীনের বিজয় ঘোষণা করিলাম।

তার পর পাহাড় হইতে নামিয়া আভিযাত্রিকের দল এ কাহিনী দিকে দিকে প্রচার করিলেন। ইয়াংচৌয়ে আসিয়া নৌকা-যোগে ইয়া নদী-বক্ষ বহিয়া তাঁরা নানকিং-এ আসিয়া পৌছিলেন। তাঁরা যখন নানকিং-এ আসিয়াছেন, জাপান তখন দানবী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে!

এই আভিযাত্রিকদের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই মার্কিন সমর-বিভাগ আজ বর্ম্মারোড জাপানী-অধিকারভুক্ত হইলে মিনিয়া কোঙ্কার পথে প্লেনযোগে চীনের সাহায্যকল্পে সামরিক সরঞ্জাম পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছে। এ সামরিক দলে আছেন জ্যাক ইয়ং এবং মুর। ইয়ং

পাচক গাওমো

আছেন চুঙকিঙে চীনা সমর-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে; মুর আছেন এ যুদ্ধে চীনের পক্ষে কোয়ার্টার-মাষ্টার জেনারেলের পদে। এ পথে বিজয়লক্ষ্মী আসিয়া চীনকে অভিনন্দিত করিবেন, সে আশা মার্কিন দুরাশা বলিয়া মনে করে না!

শতকরা ৯৯ জনের প্রতি

খ্যাতির আসনে নাহিকো তোমার ঠাঁই,
কাগজে ছাপেনি কখনো তোমার নাম!
চাকরি-বাকরি লয়ে দিন কেটে যায়—
কেহ কষিবে না তোমার কাজের দাম!
জীবনের পথে তুমি চলিয়াছ তবু
কোনো কলরব ঘেরেনি তোমারে কভু!
কবে কি বলেছো, কার কি করেছো হিত—
বিশাল ধরণী জানিবে না কিছু তার—

গৃহে ছেলে-মেয়ে-পত্নী-স্বজন আছে—
দুঃখ না পায়—সাধনা করেছো সার!
তাদেরি সুখের লাগি দিন-রাত খেটে
তোমার জন্ম-জীবনটা গেল কেটে!
তোমার মরণে সভা ডাকিবে না কেহ,
বাগ্মীর মুখে ফুটিবে না মৃত্যু-বাণী!
আত্মজনেরা নীরবে সহিবে ব্যথা—
ভুলিবে না কভু—এ কথা ভালোই জানি!

পাখী গেয়ে যায়; ফুল ঝরে গৃহ-কোণে—
—তাদেরে ভুলিতে পারে বলো কোন্ জনে?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ছোটদের আসর

দর্পচূর্ণ

(গল্প)

১

"সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! আপনারা শুনছেন? বাড়ীতে ভীষণ চুরি!"

সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত-মুখর হল-ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ছুঁচ পড়লে শোনা যায়, এমন গভীর নিস্তব্ধতা! সকলের গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। মহিলারা বার-বার চমকে উঠে পিছন-দিকে দেখতে লাগলেন, কেউ আসছে না তো!

প্রতি বছর ঝুলন-পূর্ণিমার দিন হীরক-নগরীর মহারাজ যতীন্দ্র-বিমল পাল চৌধুরী প্রাসাদে বিরাট্ উৎসবের আয়োজন করেন। বহু ধনী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হয়। মহারাজ নিজে সৌখীন—বাছা-বাছা গাইয়ে-বাজিয়ে এবং নর্ত্তকীদের আমন্ত্রণ করে নিমন্ত্রিতদের চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করেন। খাওয়া-দাওয়া যা হয়, যাকে বলে ভূরিভোজন! এবারও বহু ধনী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছেন। মজলিস পূরো দমে চলছে, এমন সময় মহারাজ নিজে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে উপস্থিত! কম্পিত ক্লিষ্ট স্বরে বললেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে! শুনছেন? বাড়ীতে ভীষণ চুরি!" ঘর নিস্তব্ধ। ভীত শঙ্কিত চিত্তে সকলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি বললেন—"আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা কত দূর হলো মহারাণী দেখতে গেছলেন। তাঁর দেরী হচ্ছে দেখে আমি তাঁকে ডাকতে যাই। এ-কথা আপনারা জানেন। গিয়ে দেখি, হাত-পা-বাঁধা তিনি নিজের ঘরে পড়ে আছেন! জ্ঞান নেই। অঙ্গে একখানি অলঙ্কার নেই। বিলেত থেকে আমি যে দামী হীরার নেকলেস এনেছিলুম, সেটি আজ তিনি পরেছিলেন। সেটিও গেছে।"

ঘরে যেন বোমা পড়েছে বা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত! সকলে স্তব্ধ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। কারও মুখে কথা নেই। এ যে একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার! মহারাজ বললেন, "চোর বাড়ী থেকে বেরুবার সুযোগ পায়নি! দেউড়ীতে দরোয়ানকে বলে এসেছি, যেন কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে বা বাড়ী থেকে বেরুতে সে না দেয়। আজ রাত্রে আপনাদের বাড়ী ফেরা নিরাপদ হবে না। কে জানে, বাড়ীর বাইরে তার কোনও সঙ্গী লুকিয়ে আছে কি না! অবশ্য বাড়ীর ভিতরেও ভয়ের কারণ বিলক্ষণ রয়েছে।" মহারাজ বললেন—"আমার বিশ্বাস, সে এখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে পারেনি। আমার মনে হয়, আপনাদের দামী যা-সব জিনিষ, তা আজকের মত আমার সিন্দুকে রাখাই কর্ত্তব্য। আপনারা কি বলেন?"

সকলেই তাঁকে সমর্থন করলেন। তখন মহারাজ যতীন্দ্রবিমল পকেট থেকে রুমাল বার করে টেবিলের উপর রাখলেন। যার কাছে যা বেশী দামের সামগ্রী ছিল, সব রুমালে জড়ো করে দিলে। পুঁটলি বেঁধে তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে দু'-এক জন জোয়ান লোক আসুন। আপনারা আবার আগেকার মতন গান-বাজনা চালান, কিন্তু কান খাড়া রাখবেন—একটু সতর্ক থাকবেন। একেবারে চুপচাপ বসে থাকলে চোর বেরুবে না।"

দু'জন লোক নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হল-ঘর পার হয়ে সিঁড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ বাড়ীশুদ্ধ আলো নিবে গেল। সকলে "আলো আলো" করে চেঁচিয়ে উঠলেন, মহিলারা ভয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। চাকররা হুড়োহুড়ি করে টর্চ্চ নিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দেখলে, কে মেন্-সুইচ্ অফ্ করে দিয়েছে। সুইচ্ জ্বালতেই বাড়ীশুদ্ধ আলো জ্বলে উঠল। যে দু'জন লোক মহারাজের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা বিস্মিত হয়ে এদিক্ ওদিক্ চাইতে লাগলেন! মহারাজ কোথায়? তখনি চারি দিকে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, একটা ঘরে মহারাজ অজ্ঞান-অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর হাত-পা বাঁধা। তখনি তাঁর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান করাবার চেষ্টা হলো। অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পর মহারাজ চোখ মেলে চাইলেন। এক জন প্রশ্ন করলেন,—এখন কি রকম বোধ করছেন? তিনি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলেন,—একটু ভাল। আর এক জন জিগ্যেস করলেন,—আপনাকে সিঁড়ির কাছে আক্রমণ করলে? তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, না। ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় কে রুমাল দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলে। লোকটা অত্যন্ত জোয়ান বলে মনে হলো। আমি ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারলুম না। রুমালে বোধ হয় ক্লোরোফর্ম ছিল। আর এক জন প্রশ্ন করলে, আলো নেববার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, "আলো নেবা? আলো নিবল কখন?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আর এক জন জিগ্যেস করলেন—"গহনার পুঁটলি?" মহারাজ কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"গহনার পুঁটলি মানে?" ভদ্রলোক শঙ্কিত ভাবে বললেন—"গহনার পুঁটলির কথা আপনি কিছু জানেন না?" মহারাজ যতীন্দ্রবিমল উত্তর দিলেন—"না। ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তখন তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলা হলো। সব শুনে তিনি বললেন—"এ নিশ্চয় সেই চোরের কারসাজি! এই মুহূর্ত্তে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।" পুলিশকে খবর দিয়ে মহারাণীর উদ্দেশ্যে সকলে যাত্রা করলেন। গিয়ে দেখলেন, জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু তাঁর হাত-পা-মুখ বাঁধা।

পুলিশের লোক আসবার সময় রাস্তায় দেখলে, এক জন টেলিগ্রাফ-পিয়ন সাইকেলে করে যাচ্ছে। মহারাজের প্রাসাদে এসে গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা প্রশ্ন করলেন—"আপনার কাছে এখন কোন টেলিগ্রাম এসেছিল?" তিনি বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"না। হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করছেন কেন?"

কথাবার্ত্তার পর পরিষ্কার বোঝা গেল যে, চোর জাল মহারাজ সেজে সকলের গহনা এবং আর দামী জিনিষপত্র নিয়ে টেলিগ্রাফ-পিয়নের বেশে চম্পট দেছে! পুলিশ তখনই চারিধারে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলে, কিন্তু পিয়নকে পাওয়া গেল না, গহনারও উদ্ধার হলো না।

মহারাজের ছদ্মবেশ ধরে তাঁরই গৃহ থেকে তাঁর অতিথিদের ঠকিয়ে চলে গেছে—সে জন্য মহারাজ যতীন্দ্রবিমল নিজেকে অনেকটা দায়ী মনে করলেন। মহারাণীর অলঙ্কার ছাড়া অভ্যাগতদের প্রায়

হাজার ত্রিশেক টাকার জিনিষ গেছে। তাই তিনি পুলিশের মারফৎ ঘোষণা করে দিলেন, চোরকে যে ধরে দিতে পারবে অথবা যে কোন ব্যক্তি তার সন্ধান বলে দিতে পারবে যাতে চোর ধরা সম্ভব হয়, তাকে তিনি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। পুলিশ থেকেও হাজার দু'য়েক টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষিত হলো। তারাও চেষ্টার ত্রুটি করলে না। কিন্তু সব মিথ্যা হলো। •দু'মাসের ওপর কেটে গেল, চোর ধরা পড়ল না।

দু'মাস পরের ঘটনা। চোর ধরা বা অলঙ্কারাদি উদ্ধারের আশা সকলেই ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় এক দিন সকালে মহারাজ যতীন্দ্রবিমল একখানি চিঠি পেলেন। সাদা কাগজে ছাপা অক্ষর কেটে কেটে তাই জুড়ে চিঠি লেখা। চিঠি পড়ে মহারাজ অবাক্ হয়ে গেলেন। লোকটা পাগল না কি? চিঠিতে লেখা ছিল—শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রবিমল পাল চৌধুরী সমীপেষু—"আপনাদের চোখের সামনে দিয়ে গহনাপত্র চুরি করে এনেছি। ৩রা আশ্বিন রাত্রি নটার সময় আবার আপনার ঘরে গহনাপত্র রেখে আসব। চুরি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বুদ্ধির কৌশল দেখানোয় আমার আনন্দ! পূজোর সময় কেউ মন-মরা হয়ে থাকে আমার ইচ্ছা নয়। মনে রাখবেন, আমার কথার নড়চড় হয় না।

আপনার একান্ত অনুগত

ভদ্রবেশী চোর।"

মহারাজ তখনই চিঠি নিয়ে পুলিশের কর্ম্মকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হলেন। সেই দিনই ৩রা আশ্বিন! ঠিক হলো, তিনি নিজে গিয়ে রাত আটটা থেকে বারোটা অবধি মহারাজের কাছে থাকবেন; বাড়ীর চারিধারে পুলিশ মোতায়েন থাকবে এবং তারা তাঁকে এবং মহারাজকে ছাড়া আর কাউকে বাড়ীর মধ্যে যেতে অথবা বাড়ী থেকে বেরোতে দেবে না! একটা মারামারিও হতে পারে। মহারাণীকে রাত্রের জন্য অন্যত্র রাখলে ভাল হয়!

বিকেল পাঁচটার সময়ে মোটরে করে মহারাণীকে এক জন বিশ্বস্ত দরোয়ান এবং ঝি-সহ মহারাজের পিসীমার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তার একটু পরেই এক জন লোক এসে গেটে দরোয়ানকে বললে—"মহারাণী আমাকে আজ আসতে বলে দিয়েছিলেন। পূজোর জন্য তিনি কিছু গহনা কিনবেন। তাই আমি ক্যাটালগ নিয়ে এসেছি।" এই বলে সে দরোয়ানকে তার দোকানের কার্ড আর ক্যাটালগ দেখালে। দরোয়ান উত্তর দিলে—"আজ মহারাণীর সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি এইমাত্র পিসীমার বাড়ীতে গেলেন। কাল আসবেন।" "তাই তো, আজ তবে কাজটা হলো না! আচ্ছা কাল আসব।" এই কথা বলে আগন্তুক প্রস্থান করল।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় পুলিশের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ মজুমদার মহারাজ যতীন্দ্রবিমলের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন। দু'জনে হল-ঘরে বসে চা এবং ধূমপান করতে করতে ভদ্রবেশী চোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিষ্টার মজুমদার মহারাজের পরিচিত লোক। জলসার দিন বিশেষ কাজে আটক পড়ায় তিনি আসতে পারেননি। সেই দিন রাত্রের ঘটনার কথা মহারাজ পুনরাবৃত্তি করলেন। মজুমদার সাহেব বললেন—"আজকে মেন্ সুইচের কাছে এক জন বিশ্বাসী লোককে মোতায়েন রাখুন। সেদিন-কার ঘটনা আজ আবার না ঘটে।"

তখনই মহারাজ এক জন পুরাতন-ভৃত্যকে সেখানে বসিয়ে দিলেন। তাকে বলে দিলেন, কাউকে যেন সুইচের কাছে আসতে না দেয়।

রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। মহারাজ উঠে গিয়ে পাশের ঘরে ফোন্ ধরলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন—"মুস্কিল হয়েছে। আমাকে এখনই একবার পিসীমার বাড়ী যেতে হবে।" মজুমদার সাহেব প্রশ্ন করলেন—"কেন? কি হয়েছে?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"সেখান থেকে ফোন্ করেছে মহারাণীর ভয়ানক অসুখ। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ডাক্তাররা ভয় করছে হার্টফেল না করে! ডাক্তার আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বসে থাকবেন।" মিষ্টার মজুমদার বললেন—"এ ক্ষেত্রে আপ-নার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, টেলিফোনের সংবাদ মিথ্যা নয় তো? মহারাণীর কি হার্টের অসুখ আছে?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"ছিল। মধ্যে একটু কমেছিল, কিন্তু সেদিনকার চুরি ঘটনার পর থেকে আবার বেড়েছে। ডাক্তাররা বলেন, যে-কোন মুহূর্ত্তে উত্তেজনা-বশতঃ হার্টফেল হতে পারে!" মজুমদার সাহেব প্রশ্ন করলেন—"আজকের ব্যাপারটা তিনি জানেন?" যতীন্দ্রবিমল উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, তাঁকে বলেছি। আমাকে তিনি এখানে একলা রেখে যেতে চাইছিলেন না। জোর করে পাঠিয়েছি। বোধ হয় সেই জন্য এ রকম হয়েছে।" মজুমদার সাহেব বললেন—"তা হতে পারে। তাঁকে আজকের বিষয় কিছু না বললেই ভাল হতো। আচ্ছা, আপনি তা হলে চট্ করে ঘুরে আসুন। আমি এইখানে রাত বারোটা অবধি জেগে বসে থাকব। যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসবেন।"

মিনিট দু'য়েকের মধ্যে মহারাজের গাড়ী ফটক পার হয়ে বেরিয়ে গেল। মজুমদার একলা পাইপ টানতে টানতে একটা উপন্যাস পড়তে লাগলেন।

ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট। মজুমদার সাহেব বই রেখে পাইপ মুখে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। এমন সময় একটা গাড়ী ফটকে ঢুকল। মহারাজ হল-ঘরে ঢুকে অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বললেন—"আপনি ঠিক বলেছিলেন। টেলিফোনের খবর একেবারে মিথ্যা—সর্ব্বৈব মিথ্যা। মহারাণীর কিছুই হয়নি। গিয়ে দেখলুম, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন! মিছিমিছি কর্ম্মভোগ। আমি এখনই আসছি।" এই কথা বলে তিনি হল-ঘর পার হয়ে অন্দরে চলে গেলেন। ঘড়ীতে ঢং-ঢং করে ন'টা বাজল। ভদ্রবেশী চোরের দেখা নেই! একটু পরে মহারাজ হল-ঘরে ঢুকে বললেন—"বুঝলেন মজুমদার সাহেব, সব ধাপ্পাবাজী! চোরের তো দেখা-সাক্ষাৎ নেই!" মজুমদার সাহেব হেসে বললেন—"তাই দেখছি। অনর্থক কর্ম্ম-ভোগ। তবে এখনও বলা যায় না। রাত বারোটা অবধি আমি অপেক্ষা করে দেখব।" মহারাজ বললেন—"এখন ন'টা। আপনি কিছু খাবেন?" মজুমদার সাহেব উত্তর দিলেন—"না, আমি একেবারে খেয়ে বেরিয়েছি।" মহারাজ বললেন—"এখনও তিন ঘণ্টা বাকী। কাছেই এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁরা দুই ভাই। ভাল ব্রীজ খেলতে পারেন। তাঁদের নিয়ে আসছি। সময় কাটাতে

হবে তো। কি বলেন?" মজুমদার সাহেব মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"মন্দ কি! সময়টা তাহলে একটু ভাল ভাবেই কাটে। এ ভাবে চুপ-চাপ বসে থাকা অত্যন্ত একঘেয়ে।" "আমি এখনই আসছি। ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন! ভদ্রবেশী চোরের কথার নড়চড় হয় না, লিখেছে।" এই কথা বলে মহারাজ মোটর হাঁকিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে আবার একখানা মোটর এসে বাড়ীর ফটকে ঢুকল। নেমে এসে হল-ঘরে প্রবেশ করলেন মহারাজ যতীন্দ্রবিমল। তাঁকে দেখেই মজুমদার সাহেব প্রশ্ন করলেন—"এ কি! একলা ফিরলেন? আপনার বন্ধুরা?" বিস্মিত ভাবে মহারাজ উত্তর দিলেন—"বন্ধু! তার মানে? একটা মিথ্যা টেলিফোনের জন্য এই রাত্রে পিসীমার বাড়ী ছুটতে হলো। গিয়ে দেখি মহারাণীর কিছুই হয়নি। সম্পূর্ণ সুস্থ। মাঝ থেকে যাবার সময় পথে কোথাকার কে গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখেছিল। ধাক্কা খেয়ে একটা টায়ার বার্স্ট করল। বদলাতে এতখানি সময় নষ্ট হলো। কর্ম্মভোগ আর কি! এ কি! আপনি এমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছেন কেন?" দু'বার ঢোক গিলে মিষ্টার মজুমদার বললেন—"এতক্ষণ তবে বাড়ীতে কে ছিল? আপনি নন্? একটু আগে আপনি উপরে গেলেন আবার বন্ধুদের ডাকতে বেরিয়ে গেলেন!" বাধা দিয়ে মহারাজ বললেন—"কি অসম্ভব কথা বলছেন আপনি! আমি তো এই ফিরছি।"

দু'জনে দু'জনের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। তবে কি? একই সঙ্গে দু'জনের কাছে ব্যাপারটা জলের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। আগন্তুক জাল যতীন্দ্রবিমল—সেই ভদ্রবেশী চোর! দু'জনে তখনই উপরে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন, টেবিলের ওপর অলঙ্কারের রাশি। ঠিক যেগুলি চুরি গেছলো সেইগুলিই অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। সঙ্গে একটি চিঠি। খুলে পড়লেন—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রবিমল পাল চৌধুরী সমীপেষু—

ঠিক ন'টার সময় আমার কথামত গহনা ফেরত দিলুম। এক দিন আপনি ও পুলিশ কর্ম্মাধ্যক্ষ মিষ্টার মজুমদার বলাবলি করছিলেন যে, আপনাদের কেউ ঠকাতে পারবে না। মজুমদার সাহেব সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা, আর আপনি এক জন মহারাজ। দু'জনেরই ধারণা, আপনাদের মত বুদ্ধিমান্ আর কেউ নেই। তাই সে দর্প চূর্ণ করবার জন্য একটু সামান্য খেলা দেখালুম মাত্র। ভবিষ্যতে আমার আরও পরিচয় পাবেন। নমস্কার।

বিনীত
এবং আপনাদের একান্ত অনুগত
ভদ্রবেশী চোর।"

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)

মরণের মুখে

এবারকারের যুদ্ধে মানুষ যেমন রাক্ষসের মত নৃশংস হইয়াছে, তেমনি আবার সে নৃশংসতার দমন এবং প্রতিকারকল্পে তার শক্তি এবং সাহসও দেখা যাইতেছে অনেকখানি।

স্থলে-জলে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষ যুদ্ধ করিতেছে,—তাদের পিছনে খবরাখবর লইয়া তেমনি লক্ষ লক্ষ লোক ছুটাছুটি করিতেছে। স্থলপথে যারা ছুটাছুটি করিতেছে, বাহন-স্বরূপ তাদের অবলম্বন মোটর-বাইক। এ সব মোটর-বাইক চালাইবার জন্য কলিকাতা-সহরের পাকা চৌরঙ্গী-রাস্তার মত এমন পাকা পথ তাঁদের মেলে না! পথ বলিতে তাঁদের ভাগ্যে মেলে বন-জঙ্গল, পাহাড়-নালা! কাজেই সে-পথে মোটর-বাইক চালানো কি ভয়ানক দুঃসাহসিকতার কাজ, সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারো! অনেক সময় বনপথে পদে-পদে নালা-খানা-ডোবা দেখা দেয় এবং বাইকবাহী দূতের পক্ষে বাইক-সমেত লাফ দিয়া সে সব নালা-খানা-ডোবা পার হইয়া দৌত্যকার্য্য সম্পাদন সাংঘাতিক হইয়া ওঠে।
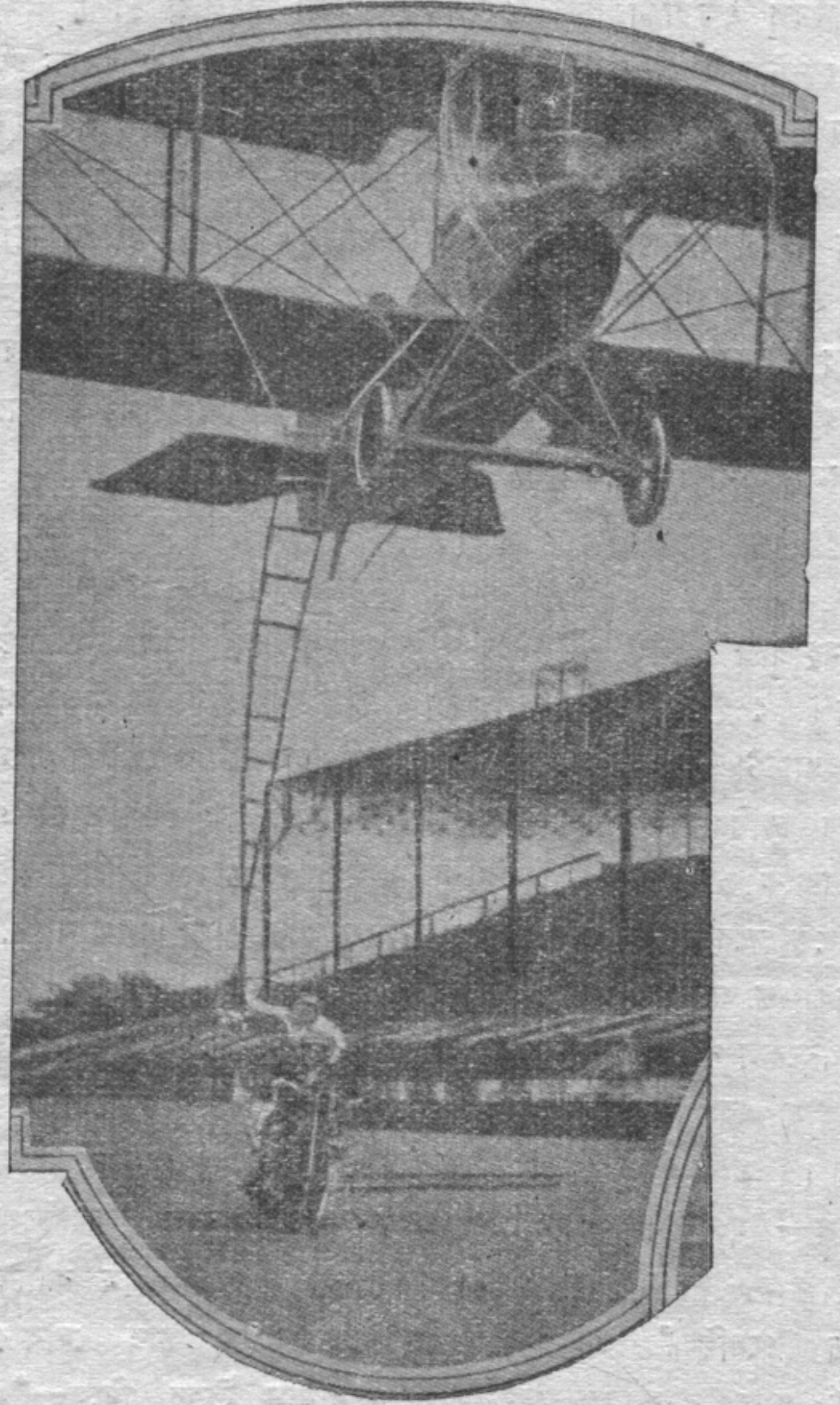
চলন্ত বাইক হইতে উড়ন্ত প্লেনে

মোটর-বাইকবাহী দূতদের বাইক-চালনা শিক্ষার ধারাই স্বতন্ত্র! নালা বা খানা ডিঙ্গানোর মত মোটর-বাইকে চড়িয়া ঢালু পাহাড়ে ওঠা-নামা করাও সহজ ব্যাপার নয়—ইহাকে বলে মরণের মুখে অগ্রসর হওয়া!

সখের জন্য বা বাহাদুর বলিয়া খ্যাতি কিনিবার জন্য অনেকে মোটর-বাইকে চড়িয়া এমনি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। কিন্তু এ সখ নয়,—কঠিন কর্ত্তব্য! এ কর্ত্তব্য-সম্পাদনের উপর জাতির জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে।

খেলার ছলে মোটর-বাইকে চড়িয়া পাহাড়ে চড়ায় বিপদের ভয় অল্প! পথের দুর্গমতা বুঝিবামাত্র ও-কাজে নিবৃত্ত হওয়া যায়।

কিন্তু যুদ্ধে দূতের কাজে বাহির হইয়া তো নিরস্ত হইলে নিস্তার মিলিবে না! তবু খেলার ছলে এ নেশায় যাঁরা মজিয়াছেন, তাঁরাও দুঃসাহসিকতায় হঠিতে চান্ না! আমেরিকায় খেলার ছলে মোটর-বাইকে চড়িয়া পাহাড়ে 'ওঠা-নামার প্রতিযোগিতা চলে। সে প্রতিযোগিতা দেখিতে দর্শক জড়ো হয় হাজার-হাজার; এবং এ প্রতিযোগিতায় ব্যালান্স রাখিতে না পারিয়া চলন্ত বাইক-সমেত ডিগবাজী খাইয়া কত বাইক-বাহী যে হাড়-পাঁজরা ভাঙ্গিয়া মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছে, তার সংখ্যা নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন দুঃসাহসিক বাইক-বাহী মোটর-বাইকে চড়িয়া প্রশান্ত মহাসাগরবর্ত্তী এক তুঙ্গ গিরির শিখরদেশে উঠিয়াছিলেন। পাহাড়টি ছিল খুব ঢালু।

এদিক হইতে ওদিকে লাফ

ষ্টীল নামে আর এক জন সাহসী ভদ্রলোক পম্পটন পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন মোটর-বাইকে চড়িয়া। পাহাড়ের অনেকখানি উপরে উঠিয়া তিনি দেখেন—এদিককার পথ হইতে ওদিককার পথের মাঝখানে প্রায় পাঁচ-ছ' হাত চওড়া খাদ। জোরে বাইক চালাইয়াছিলেন—থামিবার উপায় ছিল না। তাঁর মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। চোখের সামনে দেখিলেন মরণের ছায়া! উপায় ছিল না। সজোরে বাইক সমেত তিনি লম্ফ দিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এ লম্ফ মৃত্যুর গহ্বরে। কিন্তু ভাগ্যগুণে বাঁচিয়া গেলেন! লাফ দিয়া বাইক-সমেত তিনি খাদ পার হইয়া ওপারের পাহাড়-পথে নামিলেন! গাড়ীর বেগ কমাইলেন না—দ্রুতবেগে ওদিককার পথে চলিলেন।

পাইপের উপর দিয়া চলা

চলন্ত মোটর-বাইক-সমেত লাফ দিয়া পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে যাঁরা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁদের মধ্যে কানাডাবাসী মরিশ জোসেফের নাম উল্লেখযোগ্য। অনটারিয়ো হ্রদের কিনারা হইতে মোটর-বাইক-সমেত লাফ দিয়া তিনি ২১০ ফুট চওড়া এক গভীর গহ্বর অতিক্রম করিয়াছিলেন।

সিনেমা-ছবিতে মোটর-বাইকে চড়িয়া দুঃসাহসিক কশরতি দেখাইতে প্যারিশ নামে এক মার্কিণ বাইক-বাহীর পটুতা ছিল অসাধারণ। চলন্ত মোটর-বাইক হইতে তিনি দড়ির সিঁড়ি ধরিয়া উড়ন্ত প্লেনে উঠিয়া যাইতেন! বাইক-সমেত মাঠের মধ্যে শূন্যমার্গে লাফ দেওয়া ছিল তাঁর অশেষ সহজসাধ্য। সার্কাশের রঙ্গক্ষেত্রে তক্তার উপর দিয়া বাইক চালাইতে চালাইতে ঝাঁপ খাওয়া—এ খেলা দেখাইয়া তিনি বহু দর্শকের তাক লাগাইয়া ছিলেন! শেষে একবার জলার ধারে মোটা পাইপের উপর দিয়া তিনি চলিয়াছিলেন মোটর-বাইকে চড়িয়া—বেশ বেগে। পাইপ হইতে যেখানে সমতল ভূমে নামিবেন, সেখানে একটি রমণী ও বালক আসিয়া উপস্থিত। পাইপের উপর দিয়া মোটর-বাইকে চড়িয়া মানুষ আসিতেছে দেখিয়া তারা দু'জনে হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া পড়িল। প্যারিশ দেখিলেন, ওদিকে গাড়ী থামাইবার উপায় নাই—যেখানে নামিবেন সেখানে ঐ স্ত্রীলোক এবং বালক দাঁড়াইয়া আছে। সোজা নামিলে তাদের ঘাড়ে পড়িবেন,—তাদের প্রাণ যাইবে। তখন তাদের প্রাণ রক্ষা করিতে তিনি বিপথে ঝাঁপ দিলেন। গাড়ী-সমেত তিনি গিয়া পড়িলেন পাথরের স্তূপে। গাড়ী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল; সঙ্গে সঙ্গে প্যারিশের দুই পা ভাঙ্গিল। সে ভাঙ্গা পা জীবনে আর জোড়া লাগে নাই!
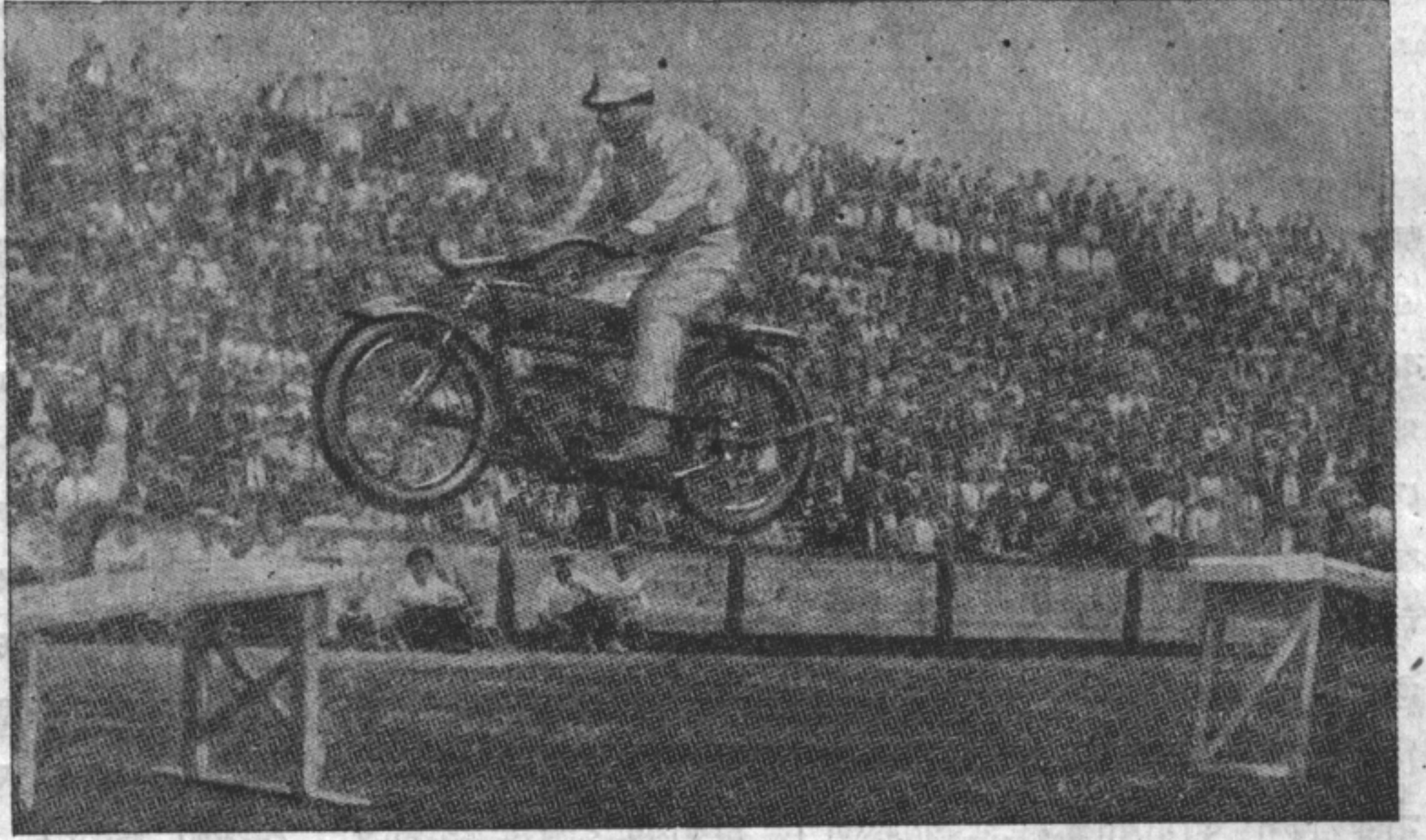
মাঠে চলিতে চলিতে উর্দ্ধে লম্ফ দান

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

১৯

জয়ার কাছে একটু আগে অতখানি আস্ফালন করিলেও সামনে এখন অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজীবকে দেখিয়া কামাখ্যা সাহেবের বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল! মনে পড়িল, উমাপ্রসন্ন বাঁচিয়া থাকিতে এই রাজীবের প্রতাপ ছিল কতখানি! উমাপ্রসন্নর মেজাজ যখন তাতিয়া উঠিত, তখন কামাখ্যা সাহেব তো জামাই, জামাইয়েরও সাধ্য ছিল না, সে তপ্ত মেজাজের সামনে গিয়া দাঁড়ায়! এই রাজীবকে ধরিয়াই কামাখ্যা সাহেব এক দিন উমাপ্রসন্নর কাছে কত আবেদন-নিবেদন পেশ করিয়াছে! তখন বিলাতী কারখানায় কাজ শিখিয়া আসার সার্টিফিকেটখানি মাত্র ছিল কামাখ্যা সাহেবের সম্বল! চাকরির ধান্দায় এ-দ্বারে ও-দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত! উমাপ্রসন্নই তার চাকরি করিয়া দেন; এবং সে চাকরির উমেদারী করিতে কামাখ্যা সাহেব এই রাজীবকেই মুরুব্বি ধরিয়াছিল! তার পর উমাপ্রসন্নর দেওয়া লাইট-রেলওয়ের চাকরি হইতে এখানে বাদস্তীতে এই চাকরির জোগাড়! উমাপ্রসন্ন চটিয়া আগুন হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, পাখা গজাইয়াছে—পাখা গজাইলেই ওড়ার চেষ্টা! বটে!

সাফল্যের চাপে এ সব কথা মনের মধ্যে ঢাকা ছিল! আজ পুরানো দিনের পুরানো লোক সেই রাজীবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে সব কথা মনে পড়িল।

রাজীব বলিল,—মহীনদার ছেলেদের দেখে এলুম। খাশা হয়েছে ছেলেগুলি!

কামাখ্যা সাহেব কাগজ-পত্রের মধ্যে মনঃসংযোগ করিয়াছিল, রাজীবের কথার জবাব দিল না। জবাব দিবার প্রয়োজন মনে করিল না।

রাজীব একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কি দুঃখ-কষ্টই না পেয়ে গেছে!···যেমন মামা, তেমনি ভাগনে! দু'জনের বরাতেই সমান দুঃখ-ভোগ হলো!···বড় ছেলেটি শুনলুম পড়া ছেড়ে দেছে!···কথার শেষে আবার একটা নিশ্বাস!

সে-নিশ্বাসে যেন আগুনের হল্‌কা! কামাখ্যা সাহেবের মনে হইল, নিশ্বাসের ও-হল্‌কা যেন তাকে স্পর্শ করিয়াছে।

রাজীব বলিল—আচ্ছা জামাইবাবু, ওদের পয়সা-কড়ি···কর্ত্তা-বাবু মারা যাবার সময় যা দিয়ে গেলেন, সে টাকা ওদের তুমি দিয়েছো?

কামাখ্যা সাহেবের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! ভাবিল, নগণ্য চাকর হইয়া এতখানি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে! এক দিন যে-মনিবের প্রশ্রয়ে মাথায় চড়িয়াছিল, সে-মনিব বাঁচিয়া থাকিলেও নয় কথা ছিল,—তা বলিয়া এখনো? সে-কাল আজ আর নাই—চাকরকে একালে মানুষ চাকর করিয়াই রাখে—তাকে মাথায় তোলে না! তুলিলেই তো এমনি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া বসিবে!

একটা উত্তর অথচ না দিলে নয়! কামাখ্যা সাহেব বলিল—এ খপর কে দিলে?

স্বরে তাচ্ছিল্য ভাব···রাজীব বুঝিল। রাজীব বলিল—আমিই কথায় কথায় বৌমাকে জিজ্ঞাসা করলুম কি না! বৌমা বললেন, টাকার কোনো কথা তিনি জানেন না।

কাগজ-পত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই কামাখ্যা সাহেব বলিল—টাকা তোমার বৌমাকে দেবার ব্যবস্থা ছিল কি?

রাজীব বলিল—বৌমাকে নয়। মহীনদাকে দেবার কথা ছিল—মহীনদা টাকা পেলে বৌমা সে-টাকার কথা জানতেন না?

কামাখ্যা সাহেব বিরক্ত হইল, বলিল—তোমার সঙ্গে এখন সে সব কথা কইতে হবে না কি?

রাজীবের বয়স হইয়াছে। মানুষের মনে কত ঘোর-প্যাঁচ দুরভিসন্ধি জমে, তার তা একেবারে অবিদিত নয়! সে বলিল—সে-কথা জানতে আমার ইচ্ছা হবে বৈ কি জামাইবাবু! তুমি জানো না···তুমি তো এ বাড়ীতে এসেছো অনেক পরে—দুই ভাই-বোনকে কোলে-পিঠে করে আমি মানুষ করেছি। ওদের সেই এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি। দু'জনে ছিল যেন কর্ত্তার দু'চোখের তারা! মহীনদার উপরে কর্ত্তা রাগ করলেন···মহীনদা চাকরি নিয়ে চলে গেল বলে'! তার পর কর্ত্তা আমার কাছে কত দুঃখই জানাতেন!···শেষে শেষ সময় এগিয়ে আসছে বুঝে আমাকে ডেকে ধমকে বললেন, খুঁজে ডেকে নিয়ে আয় মহীনকে। ···আমি পারলুম না। তখন আমাকে বললেন, জয়াকে চিঠি লেখ্, আসতে বল্···মহীনের বিষয়-সম্পত্তি জয়াকে বুঝিয়ে তার হাতে আমি দিয়ে যাবো। তাই তোমাদের হাজারিবাগে আসতে লেখা হয়েছিল। কর্ত্তার কথায় বিষয়ের নতুন ব্যবস্থা করা হলো। তার জন্য সেই উইল লেখানো! চোখের সামনে আমি সব দেখতে পাচ্ছি জামাই-বাবু! আমার চোখের সামনে সে-সব জ্বল্‌জ্বল্ করছে! তুমি উইল পড়ে শোনালে···তার পর সই করতে গিয়ে কর্ত্তার চোখ এলো ঝাপ্‌সা হয়ে! তখন আমাকে তাঁর সেই ধমক···কোথা থেকে কম-জোরের আলো এনেছিস্. চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না···!

আবেগের উচ্ছ্বাসে রাজীবের স্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিল; কথা শেষ হইল না!

কথাগুলা কামাখ্যা সাহেবের মনে তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিঁধিয়া তাকে জর্জ্জরিত করিতেছিল। কামাখ্যা সাহেব বিরক্ত হইল। একে বাড়ীতে ছেলেদের জন্য অশান্তি জমিয়াছে অনেকখানি! তার উপর এ আবার কি নূতন দুর্গ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইল! রাজীবের কথা কোনো দিন তার মনে হয় নাই! সামান্য একটা ভৃত্য··· কোথায় কাহার গৃহে চাকরি করিতেছিল···ঘটনাচক্রে সে এখানে আসিয়া জুটিয়াছে!

কিন্তু চটাচটি-বকাবকি করিয়া লাভ হইবে না! উমাপ্রসন্নর প্রশ্রয়ের প্রভাব এখনো কাটে নাই! এখনো সে প্রশ্রয়ের স্মৃতি প্রখর হইয়া রাজীবকে এমন দুর্দ্ধর্ষ রাখিয়াছে! এ সব কথার একটা জুৎসই জবাব দিয়া রাজীবকে চুপ করাইতে না পারিলে সহজে ও এ-প্রসঙ্গ ছাড়িবে বলিয়া মনে হয় না! জুৎসই জবাব ভাবিয়া ঠিক করা দরকার! কড়া মেজাজে চট্ করিয়া কিছু বলা ঠিক হইবে না।

তাই কোনো মতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কামাখ্যা সাহেব শান্ত স্বরে বলিল—এর মধ্যে অনেক কথা আছে রাজীব। আইন-কানুনের কথা। এখন কাজের সময় সে সব কথা হতে পারে না। তুমি দু'-চার দিন এখানে আছো তো···সামনের রবিবারে এসো। সে সময় সব ব্যাপার তোমাকে বুঝিয়ে দেবো···বুঝলে!

কথাটা রাজীবের খুব মনঃপূত হইল না। বুঝিল, ভিতরে মস্ত অভিসন্ধির খেলা আছে! কথায় বলে, জামাই কখনো আপনার হয় না···কামাখ্যা সাহেব তো সেই জামাই! রাজীব বলিল—আমি কি অত দিন থাকবো, জামাইবাবু? কালই বোধ হয় চলে যাবো। আমার এ কথা বলার মানে, কর্ত্তার কাছে তুমি আর জয়াদি—দু'জনে বাক্যদত্ত আছো! মারা যাবার সময় তাঁকে কথা দিয়েছিলে। আমি সে কথার সাক্ষী! আমার মনে সে জন্য কি অস্বস্তি যে জেগে আছে! তোমার সঙ্গে উইলের কথা ঐ দিনই হয়েছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে হামেশা এই সব কথা হতো! বলতেন, উকিল ডেকে আন্···উইল লেখাবো···সব মহীনকে দিয়ে যাবো···তার উপর অবিচার করেছি··· জানি, যেচে অভাব নিয়েছে সে···বৌ-ছেলেমেয়ে···সকলকে নিয়ে অনেক দুঃখ পাবে রে! আমিই আরো বলতুম—তাকে সব দেবে কেন বাবু? জয়াদিকেও মানুষ করেছো···উইলে জয়াদিকে একবার যখন সব-কিছু দেছ···ওরা জানে, জয়াদিই তোমার সব কিছু পাবে, জয়াদির ছেলেমেয়েরা পাবে, এখন সব কেড়ে নিলে তাদের নিশ্বাস পড়বে না?

একসঙ্গে এতগুলা কথা বলিয়া রাজীব যেন হাঁপাইয়া পড়িল···সে চুপ করিল। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল, —আমার কাছে তোমরা যা, মহীনদাও তাই। তাছাড়া আইন-কানুন নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি আমি! চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি, কর্ত্তা সেই পড়ে আছেন···মুখে কথা নেই, অথচ ভিতরে টন্‌টনে জ্ঞান! জয়াদির পানে কি-চোখে চেয়েছিলেন! জয়াদি' যখন বললে, কিসের ভয় জ্যাঠামশাই? উইল সই না করলেও মহীনের টাকা আমি মহীনকে দেবো···তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! জয়াদির এ কথায় মনে শান্তি পেয়ে তবে তিনি চোখ বুজলেন!

রাজীবের কথায় উমাপ্রসন্নর অন্তিম-ক্ষণের দৃশ্য কামাখ্যা সাহেবের চোখের সামনে জ্বল্-জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল!···বুকের মধ্যে যেন শ্রাবণ-মেঘের গর্জ্জন চলিয়াছে···মুখ পাংশু বিবর্ণ···কামাখ্যা সাহেবের কণ্ঠে কথা বাহির হইল না।···কি কথা কহিবে?

রাজীব বলিল—আমি শুধু জানতে চাই, ওদের ভাগ ওদের তোমরা দিয়েছো কি না। জয়াদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম···জয়াদি বললে, বিষয়-আশয়ের কথা তোমার জামাইবাবু জানেন—আমি মেয়েমানুষ ও-সব কিছু জানি না, রাজীব। তাই···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—বেশ, তাহলে আজ সন্ধ্যার সময় এসো। সব ব্যাপার তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেবো।

রাজীব বলিল—আমি মুখ্যু মানুষ···বোঝাবার কি-বা আছে এতে যে বোঝাবে বলো? ও-বাড়ীতে বৌদি বললেন, মামাবাবুর দেওয়া একটা কাণাকড়ি তাঁরা পাননি! পেলে হয়তো মহীনদার চিকিৎসা হতো···দেহে রোগ নিয়ে ভুগে খেটে ছেলেটা মারা যেতো না!···তুমি তাহলে সে-টাকা ওদের দাওনি!

কামাখ্যা সাহেবের মনের মধ্যে বৈশাখী মেঘে-মেঘে ঠোকাঠুকি লাগিয়া বিদ্যুতের আগুন বাহির হইল। বিদ্যুতের সে আলোয় কামাখ্যা সাহেব যেন উপায় দেখিতে পাইল! জোর গলায় বলিল—সে লেখাকে উইল বলে না রাজীব। কোনো আদালত তা গ্রাহ্য করতো না। উকিলদের সঙ্গে ও-সম্বন্ধে আমি অনেক পরামর্শ করেছি। তাঁরা সকলেই বললেন, আদালতে ও-লেখা বার করলে হেসে আদালত সে-লেখা ছিঁড়ে ফেলবে। আইন নিয়ে আদালতের কাজ···আইন না মেনে পৃথিবীতে আজ এক-পা চলবার জো নেই!

কথাটা বলিয়া বিজয়ীর মতো দীপ্ত দৃষ্টিতে কামাখ্যা সাহেব চাহিল রাজীবের পানে।

কামাখ্যা সাহেবের পানে রাজীব অবিচল নেত্রে চাহিয়া রহিল···ক্ষণ কাল। তার পর একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তাঁর মৃত্যুকালে জয়াদি তাঁকে যে-কথা বলেছিল···তাঁর শেষ ইচ্ছা···জয়াদি সে-কথা মানবে না? একটা ধর্ম্ম আছে তো!

কামাখ্যা সাহেবের আর সহ্য হইল না···খ্যাঁক করিয়া উঠিল। বলিল—ধর্ম্ম শিখবো আমি একটা খানশামা চাকরের কাছে! আস্পর্দ্ধা কম নয়, দেখছি। যাও···চলে যাও এখান থেকে···বিরক্ত করো না। এটা আমার বাড়ী, কাছারি নয় যে এখানে এসে মোক্তারি করবে!

রাজীব চমকিয়া উঠিল। সেই জামাইবাবু···এক দিন যে এই খানশামা চাকরকে মুরুব্বি ধরিয়া কর্ত্তার কাছে বায়না জানাইত···

শান্ত স্বরে রাজীব বলিল—যাচ্ছি জামাইবাবু! কিন্তু একটা কথা বলে যাচ্ছি, এখনো চন্দর-সূয্যি উঠছে। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ নয়।

রাজীব ধীরে ধীরে নিক্রান্ত হইল। কামাখ্যা সাহেব বসিয়া রহিল নিঃশব্দে···যেন কাঠ!

একটু পরে ঘরে আসিয়া ঢুকিল জয়া।

জয়া বলিল—কার সঙ্গে চেঁচামেচি করছিলে?

বিরক্ত কণ্ঠে কামাখ্যা সাহেব বলিল—তোমার মামাবাবুর সেই পেয়ারের খানশামা রাজীব···লেকচার দিতে এসেছেন···আমাকে দেন ধর্ম্ম-উপদেশ! ইমপার্টিনেণ্ট র‍্যাস্কেল!

জয়া বলিল—জ্যাঠাবাবুর উইলের কথা বলছিল বুঝি?

—হ্যাঁ। বলে, ওদের ভাগ ওদের বুঝিয়ে দেছো তো? তোমার কাছেও এসেছিল, শুনলুম!···তুমি নিশ্চয় আস্কারা দিয়েছো!

জয়া বলিল—আস্কারা দিয়েছি!···তার মানে?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—মানে-টানে বুঝি না। বললে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি বলেছো, বিষয়-সম্পত্তির কথা···মেয়েমানুষ তুমি কিছু জানো না···জানে জামাইবাবু।

জয়া বলিল—বলেছি ও-কথা।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—হুঁঃ! উইল! ওকে উইল বলে না! কোনো আইনে বলে না! সই নেই, কিছু না···হুঁঃ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো গে!

স্বামী আশ্বাস দিলেও জয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। পুরানো দিনের প্রত্যেকটি কথা কাঁটার মতো অহর্নিশি বুকে বিঁধিয়া মনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল!······

কিন্তু উপায় কি ? কত দিন কাটিয়া গিয়াছে···এখন জয়া কি করিতে পারে ?

করিবার কথা যখন মনে জাগিয়াছিল, তখন কোথায় ছিল মহীন ? তার সন্ধান জানিলে হয়তো বা···

২০

রাজীব আসিয়া গৌরী ঠাকুরাণীর কাছে কামাখ্যা সাহেবের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। নিজে হইতে বলিতে হইল না ! গৌরী ঠাকুরাণীই তাকে উস্কাইয়া দিয়াছিলেন···বলিয়াছিলেন,—তুমি যাও রাজীব, গিয়ে তোমাদের জামাই সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ও-কথা বলো গে ! কিসের ভয় ! তুমি সে সময় কাছে ছিলে··· সব জানো-শোনো ! কেনই বা বলবে না ? তুমি থাকতে এদের ফাঁকি দেবে, এ কেমন কথা !

সুভাষিণী মানা করিয়াছিল,—না দিদি ! থাক্ ! কি হবে আমার ও-টাকায় ! যাঁর টাকা, তাঁর কাজে লাগলো না যখন ? ···মামাবাবুর রাগটুকু মাথায় নিয়ে তিনি যখন চলে গেলেন···

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তুমি চুপ করো। এ কথায় চুপ করে থাকলে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হবে ! শুনিই না কামাখ্যা সাহেব কি জবাব দেয় !

কাজেই গৌরী ঠাকুরাণীর প্রশ্নে তাঁর কাছে রাজীবকে কথাটা প্রকাশ করিতে হইল।

শুনিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আইন দেখিয়েছে ! বটে ! আচ্ছা, ও টাকা আদায় হয় কি না, দেখে নেবো ! আমি গৌরী বামনী···উনি কত বড় সাহেব, আমিও দেখে নেবো।

এখানে রাজীবের আর থাকা হইল না। সুরুচিকে দেখাশুনার সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ীতে বিবাহের কথা এক-রকম পাকা হইয়া গেল। ছেলে দেখিয়া জানকী বাবুর পছন্দ হইল। আর পাত্রী ? পাত্রীর তো কথাই নাই। সুরুচির মতো মেয়ে···জানকী বাবুর মতো কুটুম···বহু সৌভাগ্য না থাকিলে এমন মেলে না !

পরের দিন বাসন্তী ত্যাগ করিয়া পাত্র-পক্ষ চলিয়া গেল ! জানকী বাবু বলিলেন—যত শীঘ্র হয় দিন-ক্ষণ দেখিয়ে স্থির করে জানাবেন···আমি সব সময়ে তৈরী আছি !

গৌরী ঠাকুরাণীর এখানে থাকা হইল না। সেখানে সত্যবানের মার সনির্বন্ধ অনুরোধ ! তাছাড়া এখানে একলা পড়িয়া থাকা ! তিনিও কলিকাতায় ফিরিলেন। যাইবার সময় সুভাষিণীকে বলিয়া গেলেন,—বিয়ের সময় এখানে আসবো বৌ···দিলুর বিয়ের ঠিক করে আসবো। মেয়ে আমার দেখা···চমৎকার বৌ হবে···রূপে-গুণে যাকে বলে, লক্ষ্মী !

সজল চক্ষে সুভাষিণী বলিল—তোমার ছেলে !···আমি কি মানুষ, দিদি ? তুমি ওদের মানুষ করে সংসারে থিতু করে দিয়ো। আমি তো বসে বসে যাবার দিন গুণছি !

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—এর মধ্যে যাওয়া কি ! ছেলেদের মানুষ করলে···ছেলে-বৌ নিয়ে দু'দিন সুখভোগ্ করো, তার পর যাবার কথা মনে এনো। সংসারে এসেছিলে কেবল দুঃখ-কষ্ট সইতে ! ···বুকের রক্ত দিয়ে ছেলেদের মানুষ করেছো···হোমরা-চোমরা পুরুষমানুষে পারে না ছেলে মানুষ করতে ! তুমি মেয়েমানুষ হয়ে সে-কাজ করেছো। তোমার গুণেই ছেলেরা আজ মাথা তুলে পাঁচ জনের মাঝখানে দাঁড়াবার মতো হয়েছে···

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুভাষিণী বলিল—আমার গুণে নয় দিদি···ওদের নিজের গুণে আর তোমাদের আশীর্ব্বাদে ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে !··· না হলে আমি কে ? শুধু দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি !···সব সময় ভয়ে যেন কাঁটা হয়ে আছি !

—না, না, কিসের ভয় ! তোমার মন ভালো···তার ফল পাবেই বোন্ !

পরের দিন অফিসে একটা কলরব শুনা গেল। জানকী বাবু বাহিরের যে নূতন কোম্পানির ভার লইয়াছেন, সেটি চালশার ওদিকে মস্ত এক চা-বাগান। চালশা ডুয়ার্স লাইনে। গুজব, সেখানে ম্যানেজারের আসনে দিলীপকে বসানো হইবে।

অফিসে আসিয়া পিনাকী এ কথা শুনিল। শুনিয়া হিংসায় রাগে সে জ্বলিতে লাগিল !···ওদিকে বাড়ীতে বরাবর শুনিয়া আসিয়াছে, জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচির সঙ্গে তার বিবাহ হইবে এবং সে-বিবাহের দৌলতে পিনাকী এক দিন···

ওদিককার আশার রঙীন ফানুশ ছিঁড়িয়া চুরমার হইয়াছে ! জানকী বাবু তাঁর মেয়ের বিবাহ স্থির করিয়াছেন কোথাকার এক বিলাত-ফেরত এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে ! তার পর এদিকেও নূতন অফিসে তার ম্যানেজারীর আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল !···

বাপের উপর রাগ হইল। শুধু নিজের স্বার্থ, নিজের পোজিশন লইয়া মত্ত। ছেলের উপর বাপের যে একটা কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এতখানি উদাসীন ! স্বার্থপর বাপ !···

তার পর ঐ দিলীপ···অবস্থা যেমন, কোথায় পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিবে, না, মোসাহেবীতে জানকী বাবুকে তুষ্ট করিয়া আজ এতখানি উচ্চাসন লাভের স্পর্দ্ধা হইয়াছে তার ! ম্যানেজারী করিতে হইলে যে শিক্ষা-দীক্ষা, যে সোশাল পোজিশন থাকা প্রয়োজন, সে শিক্ষা-দীক্ষা, সে পোজিশন···উহার আছে না কি ? উহাকেই কি না জানকী বাবু ম্যানেজারের আসনে বসাইবেন ! অবিচার আর কাহাকে বলে !

নিজের চেয়ারে বসিয়া পিনাকী সিগারেট টানিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আগুনের চাকা ঘুরিতেছে ! টেবিলের উপর ক'খানা কাগজ পড়িয়া আছে···খাতা দেখিয়া রেফারেন্সের নম্বর নোট্ করিয়া দিতে হইবে, সে-দিকে তার হুঁশ নাই !

বেয়ারা আসিয়া দু'-তিন বার ঘুরিয়া গেল। দেখিয়া গেল, পিনাকী কাগজের তাড়ায় হাত দেয় নাই !

দিলীপ ডাকিল বেয়ারাকে। বলিল,—সে কাগজগুলো আনলে রঘু ?

বেয়ারা রঘু বলিল—পিনাকী বাবু, কাগজ এখনো দেখেননি। কাগজ যেমন, তেমনি পড়ে আছে।

দিলীপ বলিল—দু'ঘণ্টা আগে দেবার কথা যে ! যাও, যাও, বাবুকে বলো কাগজগুলো ঠিক করে আনো ! এখনি ডাক যাবে। ও কাগজ আজ পাঠানো চাই-ই। বাবুকে তুমি বলো গে···খুব জরুরি কাগজ। ওঁর বোধ হয় মনে নেই !

রঘু বলিল—টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে বাবু বসে সিগারেট খাচ্ছেন!

দিলীপ বলিল—তুমি বলো গে যাও···আমার নাম করে বলো, কাগজগুলো এখনি না দিলে নয়!

এ সব কাজের দায়িত্ব এখন দিলীপের···অফিসের ডাক যায় তার হাত দিয়া।

রঘু গিয়া পিনাকীকে বলিল—কাগজ···দিলীপ বাবু বললেন, এখনি দরকার।

—কে বলেছে?

—দিলীপ বাবু।

মনের মধ্যে বারুদ জমানো ছিল! দিলীপের নাম···সে বারুদে পড়িল যেন দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি! পিনাকী জ্বলিয়া উঠিল এবং সশব্দে গর্জ্জন তুলিল—দিলীপ বাবু! তিনি হুকুম করেছেন আমাকে! বলো গে, আমার শরীর ভালো নয়···সুস্থ হলে কাগজ দেখে পাঠাবো।

পিনাকীর মেজাজ রঘু জানে। তার উপর পিনাকী এখানকার ম্যানেজার সাহেবের পুত্র···ভয়ে সিঁটাইয়া রঘু দাঁড়াইয়া রহিল।

পিনাকীর গ্রাহ্য নাই! সে যেমন, তেমনি সিগারেট টানিতে লাগিল।

রঘু বলিল—বাবু···

পিনাকী ধমক দিল, বলিল—যাও···

রঘু অফিসের বেয়ারা, বাড়ীর নয়। অফিসের চাকরি নিরাপদ, তা সে জানে; এবং জানকী বাবুর মতো মনিবের নিমক খায়, কাজেই ও-ধমকে সে দমিল না। নিমকের মর্য্যাদা রাখিয়া আবার বলিল—এখনি ডাক যাবে···কাগজ না দিলে নয় বাবু, দিলীপ বাবু বলে দিলেন।

চেয়ার ঠেলিয়া পিনাকী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—কাগজ যাবে না···আমার হুকুম!···যাও! গিয়ে তোমার দিলীপ বাবুকে বলো, তিনি আমার মনিব নন্ যে মুখের কথা খশাবামাত্র তাঁর হুকুম আমি তামিল করবো! দিলীপ বাবু চালাবেন আমার উপর হুকুম! বটে!···গেট্ আউট্···

কথাটা বেশ উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ পাইল এবং সে কণ্ঠ শুনিয়া ঘরে ঢুকিলেন জানকী বাবু। জানকী বাবু বলিলেন—ব্যাপার কি পিনাকী? এমন ধমক-চমক?

হাতের সিগারেট সতর্ক ভাবে মেঝেয় ফেলিয়া জুতা দিয়া মাড়াইয়া পিনাকী বলিল—আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে···তাই খাতা দেখে কটা রেফারেন্স দিতে দেরী হয়েছে···দিলীপ বাবু জোর তাগাদা দিচ্ছে! তাই বলছিলুম রঘুকে···

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জানকী বাবু চাহিলেন রঘুর পানে, বলিলেন—কি হয়েছে রঘু?

রঘু সব কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া জানকী বাবু বলিলেন—অফিসের কাজ কারো জন্ম পড়ে থাকতে পারে না পিনাকী! তোমার শরীর অসুস্থ হয়ে থাকে, সে কথা দিলীপকে বলে তোমার কাজের ব্যবস্থা আর কাকেও দিয়ে করাতে পারো!···তাছাড়া অফিসের মধ্যে এমন তর্জ্জন-গর্জ্জন··· এতে ডিসিপ্লিন নষ্ট হয়!

পিনাকী একেবারে কাঠ! তার মুখে কথা ফুটিল না। জানকী বাবু বলিলেন—তোমার কথা আমার কাণে গেছে! তুমি বলছিলে, দিলীপ বাবু তোমার মনিব নন যে, তোমাকে তিনি হুকুম করবেন! অফিসের মধ্যে যিনি যে-ডিপার্টমেণ্টের হেড, সে-ডিপার্টমেণ্টের আর-সকলে অফিসের কাজে সে-হেডের আণ্ডারে সাবর্ডিনেট। হেড যা বলবে, সাবর্ডিনেটরা তা মানতে বাধ্য। হেডের উপর ডিপার্টমেণ্টের দায়িত্ব।···অফিসের মধ্যে সামাজিক পদ-মর্য্যাদা কিম্বা পৈত্রিক ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের কথা উঠতে পারে না! তোমার বাবা অফিসের ম্যানেজার ···তাঁর বিধি-নিয়ম ভেঙ্গে আমিও নিজের ইচ্ছায় অফিসে কিছু করতে পারি না। তার কারণ, তা করলে অফিসের ডিসিপ্লিন ভাঙ্গবে ···অফিস অচল হবে।

পিনাকী নিঃশব্দে এ কথা শুনিল। মনে হইতেছিল, ভাগ্য বিরূপ! নহিলে কাজের দিক্ দিয়া এতখানি বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইবে কেন?

জানকী বাবু বলিলেন—আজ তোমার মুখে যে-কথা শুনলুম, এবং ঘরে এসে যে-মেজাজ দেখলুম, ভবিষ্যতে এমন যেন আর না হয়! হলে এ অফিসে তোমাকে রাখা অফিসের পক্ষে নিরাপদ মনে করতে পারবো না!

তার পর রঘুর পানে চাহিয়া বলিলেন—কি কাগজ দরকার?

রঘু বলিল—কলকাতার এ্যাণ্ডার্সন কোম্পানির বিল আর অন্য কি সব কোম্পানির চিঠি। ঐ যে ফাইল···ঐ ফাইলে আছে!

জানকী বাবু সে-ফাইল হাতে লইলেন এবং পিনাকীর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—পারবে তুমি দেখে দিতে? না, তোমার শরীর অসুস্থ···আর কাকেও এ কাজের ভার দেবো?

পিনাকী যেন জালে-পড়া বাঘের মতো! হুঙ্কার থামিয়াছে! শান্ত স্বরে পিনাকী বলিল—মাথাটা আমার ভয়ানক ধরে রয়েছে··· হিসেবে পাছে ভুল হয়···

—বেশ···আমি প্রকাশ বাবুকে বলছি, তিনি দেখে দেবেন! তুমি অসুস্থ বোধ করো, ছুটী দিচ্ছি···বাড়ী যেতে পারো। ইউ বেটার গো হোম্ এ্যাণ্ড টেক্ রেষ্ট!

ফণা তুলিয়া ছোবল দিতে গিয়া প্রহারে জর্জ্জরিত হইলে সাপও নির্জীব হইয়া পড়ে···পিনাকী তো মানুষ!—জানকী বাবুর এ কথার পর অফিস ত্যাগ করিয়া ইজ্জৎ বাঁচাইতে পাইয়া সে যেন বর্ত্তাইয়া গেল।

পাঁচ-সাত দিন পরে পিনাকীর মাথায় আবার বজ্রাঘাত হইল। কামাখ্যা সাহেবের অফিস-কামরায় বেলা দু'টার সময় পিনাকীর ডাক পড়িল। পিনাকী আসিয়া কামাখ্যা সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল।

কামাখ্যা সাহেবের মূর্ত্তি গম্ভীর! বলিল,—বসো।

পিনাকী বসিল কামাখ্যা সাহেবের সামনের চেয়ারে। নিজের খাশ-বেয়ারা নাথুকে কামাখ্যা সাহেব বলিল—তুই বাইরে যা। দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যা। কেউ যেন এ ঘরে এখন না আসে···দরজায় তুই মোতায়েন থাকবি।

নাথু অক্ষরে-অক্ষরে মনিবের আদেশ পালন করিল। সে চলিয়া গেলে ঘরে রহিল শুধু পিতা কামাখ্যা সাহেব এবং পুত্র পিনাকী।

কামাখ্যা সাহেব একখানা চেক এবং চেকের সঙ্গে ব্যাঙ্কের

স্লিপ পিনাকীর হাতে দিল। দিয়া বলিল—এর মানে বলতে পারো পিনাকী বাবু?

চেক দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে পিনাকীর বিলম্ব হইল না। সে বলিল—কি জানতে চান্ বলুন?

কামাখ্যা সাহেব বলিল,—এ দেখছি পাঁচশো টাকার চেক! তোমার নামে আমি ড্ করেছি···নীচে আমার নাম সই এবং তারিখও দেখছি হপ্তা-খানেকের মধ্যে!

কথাটা বলিয়া কামাখ্যা সাহেব চাহিল পিনাকীর পানে··· তার দু'চোখের দৃষ্টি গম্ভীর।

পিনাকী বলিল—ওতে তাই লেখাও আছে।

কামাখ্যা সাহেবের মুখ আরো গম্ভীর হইল এবং গম্ভীর কণ্ঠে কামাখ্যা সাহেব কহিল,—আমার যত দূর মনে হয়, দু'মাসের মধ্যে তোমাকে আমি একটি পয়সার চেক দিইনি! আমার স্মরণ-শক্তি প্রখর বলেই আমার বিশ্বাস! এ চেক আমি তোমাকে দিয়েছি, তুমি বলতে চাও?

পিনাকী বলিল—আপনি আমাকে দ্যাননি। আমার টাকার খুব দরকার হয়েছিল···আপনার কাছ থেকে টাকা চাইলে আপনি দেবেন না, কাজেই নিজে থেকে এ টাকার ব্যবস্থা আমাকে করে নিতে হয়েছে।

—তার মানে?···এ সই আমার, তুমি বলতে চাও?

নদীর জলে জোয়ারের বেগ ক্ষণে ক্ষণে যেমন বাড়ে, পিনাকীর সাহস তেমনি ক্ষণে ক্ষণে আশ্চর্য্য রেটে বাড়িয়া উঠিতেছিল!

পিনাকী বলিল—সে-সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ হচ্ছে? হবার কথা নয় কিন্তু! It is so alike.

রাগে কামাখ্যা সাহেবের অস্থিমজ্জা জ্বলিয়া উঠিল। কামাখ্যা সাহেব বলিল—এ জাল সই! তুমিই তাহলে জাল করেছো আমার নাম!

পিনাকী বলিল—করেছি।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এই চিঠি···এ-চিঠি লিখে পাঠিয়েছে এখানকার সিল্ক-শাড়ীওলা সাতরামলের ম্যানেজার। লিখেছে, আপনার ছেলে আপনার ড্-করা ক্রশচেক আমাদের কাছে দিয়ে নগদ পাঁচশো টাকা নিয়ে গেছেন···জরুরি দরকার বলে। চেক কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এসেছে···নাম-সই ঠিক মেলেনি বলে!

পিনাকী এতক্ষণে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে! সে বলিল,—হ্যাঁ! আপনার ড্রয়ার থেকে চেক-বই বার করে' নিয়ে ও-চেকে আপনার নাম আমি সই করে আমার নামে পাঁচশো টাকার চেক কেটেছি। সে-চেক সাতরামলের ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বলেছিলুম নগদ টাকার এখনি দরকার···এ চেক রেখে আমাকে আপনারা পাঁচশো টাকা দিন···তার পর ব্যাঙ্কে চেক পাঠিয়ে ভাঙ্গিয়ে আপনারা টাকা নেবেন। তাই বিশ্বাস করে ঐ চেক রেখে তিনি আমাকে পাঁচশো টাকা দেছেন।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এখন সে চেক ফেরত এসেছে! টাকাটা তুমি ওদের পাঠিয়ে দাও।

পিনাকী বলিল—আমার টাকা কোথায় যে পাঠাবো?

—সাত দিনে পাঁচশো টাকা খরচ করে বসেছো! বাপের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করেছো না কি?

পিনাকী বলিল—পোষাকের বিল এসেছিল···দু'শো চব্বিশ টাকা। আরো কতকগুলো খুচরো দেনা ছিল···আপনি আমার এ্যালাওয়েন্স বন্ধ করে দেছেন! যার কাছে টাকা চেয়েছিলুম, মা জবাব দিলে, যার হাতে টাকা নেই। কাজেই···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কাজেই আমার নাম জাল করে চেক কাটবে! Downright forgery!

পিনাকী চলিয়া যাইতেছিল, কামাখ্যা সাহেব ডাকিল—শোনো···

পিনাকী ফিরিল।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এ টাকা কে দেবে?

—আপনার চেক···আপনি দেবেন। আপনার ইজ্জৎ···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—নেভার! জানো, তুমি যা করেছো, এর জন্য তোমার জেল হতে পারে?

পিনাকী বলিল—দিন আমাকে জেলে! কি ভালো আমার করেছেন আপনি যার জন্য আমি আপনাকে মেনে চলবো? বাড়ী আমার জেলখানা বলে' মনে হয়। আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দেছেন···ভাবেন, আমার পোজিশন নেই?···তার উপর আমাকে ডিঙ্গিয়ে কাঙ্গালী-ভিখিরীর ছেলেরা অফিসে উঁচু পোষ্ট পাচ্ছে! আপনি আমায় জেলে দিন। জেলে গেলে বাড়ীর চেয়ে আমি বেশী আরামে থাকবো। তাতে আপনারো প্রেষ্টিজ বাড়বে···কীর্ত্তি থাকবে!

দুঃখে রাগে কামাখ্যা সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিল—স্কাউণ্ড্রেল!

সঙ্গে সঙ্গে পিনাকীর গালে সবেগে চপেটাঘাত পড়িল। এ আঘাতের জন্য পিনাকী প্রস্তুত ছিল না, বেগ সামলাইতে না পারিয়া দুম্ করিয়া সে কামরার মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

নিরুপায় রোষে কাঁপিতে কাঁপিতে কামাখ্যা সাহেব চেয়ার টানিয়া চেয়ারে বসিল।

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভাঙা পূরবী

পূরবীর অনেক পুরানো তান হেথা বসে শুনি,
সন্ধ্যার আকাশে তারা সকরুণ ভাঙা সুরে কাঁপে;
কত হাসা শেষ হলো, কত কান্না এলো, তাই গুণি—
অন্ধকার কত রাত একা একা বসে বসে যাপে।

হিসাবের শূন্য খাতা পূর্ণ শুধু ব্যর্থ আর্ত্ত স্বরে,
যুগান্তের সেই ছবি চিরদিন রুক্ষ শুষ্ক ম্লান,
যত গান যত আলো, তবে হায় ছিল কার তরে?
আজিকে সন্ধ্যায় তাই শোনা যায় ভাঙা-চোরা তান!

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব-সংগ্রাম পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। দারুণ উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তায় সুদীর্ঘ তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পর চতুর্থ বৎসরের শেষভাগে যুদ্ধের গতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ ঘোষণার দিন স্মরণ করা হইয়াছিল, তখন এত শীঘ্র যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার পর গত এক বৎসরের মধ্যেই জার্ম্মাণীর আক্রমণ-শক্তি চূর্ণ হইয়াছে, ফ্যাসিজমের জন্মদাতা মুসোলিনীর পতন ঘটিয়াছে; সর্ব্বোপরি, অক্ষশক্তির অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সহচর ইটালী জার্ম্মাণীর অজ্ঞাতসারে ত্রিশক্তির চুক্তি ভঙ্গ করিয়া সম্মিলিত পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রাচীতে যুদ্ধের অবস্থা এখনও সম্মিলিত পক্ষের বিশেষ অনুকূল না হইলেও য়ুরোপীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এই অঞ্চলের অবস্থাও আশাপ্রদ হইয়া উঠিতেছে। সামরিক অবস্থার এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ কারণ—মৃত্যুঞ্জয়ী রুশ সেনার অপরিসীম দৃঢ়তা। ষ্ট্যালিনগ্রাডে তাহারা হিমালয়ের ন্যায় যে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল, তাহা ভেদ করিয়া প্রতীচীর অক্ষশক্তি তাহার প্রাচ্য সহচরের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই। অক্ষশক্তির দুই বাহুর ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগের পথে এই অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন তাহাদের চরম পরাজয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত করিয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাড-রক্ষীদের অতুলনীয় বীরত্বের জন্যই অক্ষশক্তি মিশর জয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনানুরূপ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে নাই; সম্মিলিত পক্ষ ঐ সময়ে শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়া সজোর প্রত্যাঘাত করিতে পারিয়াছে।

ইটালীর আত্মসমর্পণ—

গত ৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববাসী অকস্মাৎ শ্রবণ করিয়াছে—পাঁচ দিন পূর্ব্বেই ইটালীর সহিত সম্মিলিত পক্ষের যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে; খাস ইটালীতে বৃটিশ ও ক্যানাডীয় সৈন্যের অবতরণ এবং দক্ষিণ ইটালীতে তাহাদের যুদ্ধ—এই সকলই অভিনয় মাত্র। জার্ম্মাণীকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই এই গোপনতা ও অভিনয়। বাদোগলিও-সরকার না কি বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁহাদিগকে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। ইটালীর সহিত যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কিত আলোচনা না কি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল।

জেনারল আইসেন-হাওয়ারের বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে—যুদ্ধ-বিরতি নিছক্ সামরিক ব্যাপার; ইহাতে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সর্ত্ত নাই। স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সর্ত্ত না থাকিলেও ইটালী যে কোনরূপ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি লাভ করে নাই—ইহা বিশ্বাস করা দুষ্কর। ইটালীর পক্ষ হইতে যখন যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন তাহার সামরিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হয় নাই। সৈন্য ও সমরোপকরণ ব্যয় না করিয়া সেই শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করায় সম্মিলিত পক্ষের সামরিক স্বার্থ ছিল। কাজেই, বাদোগলিও-সরকারের পক্ষে পরাভূত নিস্তেজ শত্রুর ন্যায় আচরণ করা স্বাভাবিক নহে। ইটালীর সমর-যন্ত্র যদি সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া যাইত, তাহার জন্য সম্মিলিত পক্ষের সময় ও শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন যদি একেবারেই শেষ হইত, তাহা হইলে ইটালীয় রাজনীতিকদের পক্ষে "ব্ল্যাঙ্ক চেকে" স্বাক্ষর দান ব্যতীত গত্যন্তর থাকিত না। কিন্তু সেরূপ অবস্থায় ইটালীর সহিত সম্মিলিত পক্ষের যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা হয় নাই। এই সকল কারণে মনে হয়, ইটালীর এই আত্মসমর্পণ হয়ত সম্পূর্ণ বিনা সর্ত্তে নহে।

এই সর্ত্ত কি, তাহা নিশ্চিত বলা সম্ভব নহে। তবে অনুমান করা যায়, মার্শাল বাদোগলিও হয়ত আশ্বাস পাইয়াছেন—ফ্যাসিষ্ট সরকারের কৃত অন্যায়ের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে ও অন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়ী করা হইবে না; ফ্যাসিষ্ট-তন্ত্রের সহযোগী বলিয়া ইটালীর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁহারা অপাংক্তেয় হইবেন না। সর্ব্বোপরি, এই নিশ্চিন্ত আশ্বাস হয়ত বাদোগলিও কোম্পানী পাইয়াছেন যে,—এত দিন যে সকল বামপন্থী ইটালীয় ফ্যাসিষ্টতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। বর্ণচোরা বাদোগলিও বুঝিয়াছিলেন—অক্ষশক্তির জয়ের আশা আর নাই; সময় থাকিতে "রং বদলাইয়া" ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির তাঁবেদারী করিতে পারিলে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিপত্তি বজায় থাকিবে। এই সম্পর্কে তিনি আশ্বাস পাইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

ইটালীর আত্মসমর্পণের কথা প্রকাশিত হইবামাত্র জার্ম্মাণী কালবিলম্ব না করিয়া ইটালীতে নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ করিয়াছে। সমগ্র ইটালীকে সামরিক ঘাঁটীরূপে ব্যবহৃত হইবার সুযোগ জার্ম্মাণী কখনই দিতে পারে না, এই জন্য জার্ম্মাণী উত্তরাঞ্চলে তাহার নিজের প্রভুত্বাধীনে "ফ্যাসিষ্ট ইটালী" গঠন করিতে প্রয়াসী। ইটালীর বর্ত্তমান অবস্থা হয়ত ক্রমে চীনের অবস্থার সহিত তুলনীয় হইতে পারিবে।

হিট্‌লার তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় মুসোলিনীর উচ্ছ্বসিত গুণগান করিয়াছেন এবং ইটালীর আত্মসমর্পণের জন্য বাদোগলিও-সরকারকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিয়াছেন। জার্ম্মাণী যে ইটালীকে সাহায্য দানে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নাই, তাহাও তিনি উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়াছেন। তাহার পর জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণীর প্যারাসুটধারী সৈন্যরা মুসোলিনীকে মুক্ত করিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি এখন জার্ম্মাণীর অধিকৃত ইটালীতে নীত হইয়াছেন। ইতোমধ্যে জার্ম্মাণী উত্তর ইটালীতে একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর রোম অধিকারে মনে হয়, সে তাহার অধিকৃত অঞ্চল ঐ পর্য্যন্ত প্রসারিত করিবে; রোমই জার্ম্মাণীর প্রভুত্বাধীন ফ্যাসিষ্ট ইটালীর রাজধানী হইবে। মুসোলিনীর প্রশংসা করিয়া হিট্‌লার ইটালীর ফ্যাসিষ্ট মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এখন তাঁবেদার সরকারের শীর্ষস্থানে মুসোলিনীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি ঐ সরকারকে শক্তিশালী করিতে প্রয়াসী হইবেন।

এখন প্রশ্ন—ইটালীর আত্মসমর্পণে জার্ম্মাণীর সামরিক অবস্থা কিরূপ হইল? হিট্‌লার বলিয়াছেন—সামরিক দিক্ হইতে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই; কারণ, ইটালীকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ জার্ম্মাণীকেই বহন করিতে হইত। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। দক্ষিণ ইটালীতে সম্মিলিতপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন বল্‌কান্ অঞ্চল বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইতেছে। সম্মিলিত পক্ষের রণপোত এখন স্বচ্ছন্দে আড্রিয়াতিকে বিচরণ করিবে। টাইরানিয়ান্ সাগরে ইটালীর

নৌ ও বিমান ঘাঁটী হইতে দক্ষিণ ফ্রান্সে আঘাত করা সম্ভব হইবে। সর্ব্বো পরি, উত্তর দিকে ইটালীর অর্দ্ধাংশে জার্ম্মাণীর তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইটালীর সমরোপকরণ, জাহাজ বা বিমানের দ্বারা জার্ম্মাণরা আদৌ উপকৃত হইবে না ; ঐ অঞ্চলে জার্ম্মাণীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের শক্তিতে যুদ্ধ করিতে হইবে। ইটালীর নৌবহর সম্মিলিত পক্ষের হস্তে পতিত হওয়ায় ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-মার্কিণ নৌবাহিনী এখন একরূপ নিরঙ্কুশ। সাধারণ ভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির নৌবলও শত্রুর নৌবল অপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। জার্ম্মাণী সহজে উত্তর ইটালী ত্যাগ করিতেও পারিবে না ; কারণ, তাহাতে ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়া বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িবে, ঐ অঞ্চলের বিমান-ঘাঁটী হইতে অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও যুগোশ্লেভিয়ায় প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ চলিতে পারিবে। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয়—সম্মিলিত পক্ষ জার্ম্মাণীর অধিকৃত অঞ্চলে সৈন্য অবতরণ করাইবার গুরু দায়িত্ব না লইয়াই ইটালীতে শত্রুকে এখন ব্যাপৃত করাইবার সুযোগ পাইবে। জার্ম্মাণী যদি উত্তর ইটালীতে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষ তখন অন্য দিক্ হইতে জার্ম্মাণীকে আঘাত করিবার অধিকতর সুযোগ পাইবেন।

কুইবেক্ সম্মিলনী—

মিঃ চার্চ্চিল মাসাধিক কাল আট্‌লাণ্টিকের পশ্চিম তীরে অবস্থান করিতেছেন। ইতোমধ্যে কুইবেকে ঘটা করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনৈতিক ও সমর-নায়কদের সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আলোচনান্তে যে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বলা হয়,—আলোচনার সিদ্ধান্ত কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল—পূর্ব্ব-এশিয়ার সেনাপতিপদে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ। তাহার পর প্রকাশিত হইয়াছে যে, ফরাসী জাতীয় মুক্তি পরিষদকে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন্ এত দিন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অখ্যাত ছিলেন। শুনা যায়, জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের যুদ্ধে সামঞ্জস্য বিধানের কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা অপরিসীম। জাপানের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব-এশিয়ায় আক্রমণ-পরিচালনের জন্য এই তিন দল সেনাবাহিনীর তৎপরতায় সামঞ্জস্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন্ যদি সত্যই এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষ হন, তাহা হইলে পূর্ব্ব-এশিয়ার সেনাপতি-পদে যোগ্য ব্যক্তিই নিযুক্ত হইয়াছেন বলিতে হইবে। অবশ্য, এই যোগ্যতার প্রকৃত পরিচয় কার্য্যক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে।

বৃটেন, আমেরিকা ও রুশিয়া কর্ত্তৃক ফরাসী জাতীয় পরিষদের স্বীকৃতিতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বৃটেন ও রুশিয়া পূর্ব্ব হইতে জেনারল দ্য-গলের স্বাধীন ফরাসী সমিতিকে মানিয়া লইয়াছিল ; জেনারল জিরো আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট। কাজেই, দ্য-গল ও জিরো যখন নিজেদের মধ্যে আপোষ করিয়া উভয়ে জাতীয় মুক্তি-পরিষদে স্থান গ্রহণ করেন, তখনই বৃটেন, আমেরিকা ও রুশিয়ার পক্ষে ঐ পরিষদকে মানিয়া লইবার পথ সুগম হয়। অবশ্য, জিরো ও দ্য-গলের মধ্যে যে ভাবে মীমাংসা হইয়াছে, তাহাতে এই মীমাংসা স্থায়ী হওয়া দুষ্কর। সম্মিলিত পক্ষ জাতীয় মুক্তি পরিষদকে ফ্রান্সের বৈধ সরকার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তবে, ফ্রান্সের পক্ষ হইতে যুদ্ধ চালাইবার এবং সমগ্র বিশ্বে ফ্রান্সের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অধিকার যে এই প্রতিষ্ঠানের আছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে খাস ফ্রান্স যখন শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইবে, তখন নূতন রাজনৈতিক সমস্যা যে জটিলতা সৃষ্টি করিবে না, জাতীয় মুক্তি পরিষদকে মানিয়া লওয়ায় সে আশ্বাস পাওয়া যায় নাই।

মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—প্রধানতঃ জাপানের সহিত যুদ্ধ পরিচালন-প্রসঙ্গই কুইবেকে আলোচিত হইয়াছিল। অথচ, এই সম্পর্কে লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ ব্যতীত সম্মিলিত পক্ষের আর কোনরূপ ব্যবস্থা এখনও প্রকাশ পায় নাই। কুইবেকে কোন রুশ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না ; মিঃ চার্চ্চিলের কৈফিয়ৎ—জাপানের সহিত রুশিয়া অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ, তাই জাপ-বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনার সময় রুশ প্রতিনিধি স্বভাবতঃ অনুপস্থিত ছিলেন। এই কৈফিয়ৎ যুক্তিসহ নহে। কুইবেকে কেবল প্রাচ্য অঞ্চলের যুদ্ধ সম্পর্কেই আলোচনা হয় নাই ; অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রসঙ্গও আলোচিত হইয়াছে। জাপানের সহিত রুশিয়ার অনাক্রমণ-চুক্তি সত্ত্বেও জাপানের শত্রু বৃটেন ও আমেরিকার সহিত তাহার মিত্রতা যখন সম্ভব হইয়াছে, তখন কুইবেকে রুশ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলেই "ভাগবত অশুদ্ধ" হইয়া যাইত না।

সম্প্রতি যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কুইবেক্ বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ইটালী স্বতন্ত্র সন্ধি সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। অন্ততঃ কুইবেক্ বৈঠকে আলোচনা চলিবার সময় সম্মিলিত পক্ষ যে ইটালীর প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ ইডেন্ হয়ত ইটালীর প্রস্তাব লইয়া এবং এই সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই কুইবেকে ছুটিয়াছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার সময় রুশ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় নাই। সঙ্গত ভাবেই মনে করা যায়, ইটালীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং জার্ম্মাণীর অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কুইবেকে আলোচনা হইয়াছে এবং ইচ্ছা করিয়া এই আলোচনা হইতে রুশিয়াকে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনৈতিকগণ জানেন যে, য়ুরোপে যুদ্ধ প্রসারিত হইবার পর শত্রুর কবল হইতে মুক্ত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণে তাঁহাদের দীর্ঘসূত্রতা যেন ইচ্ছাকৃত। ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনৈতিকগণ যেন এই বিষয়ে রুশিয়ার সহিত এক-মত হইতে পারিবেন না বলিয়া আশঙ্কা করেন এবং সেই জন্য "বর্ত্তমানে কেবল অস্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে"—এই কথা বলিয়া তাঁহারা রুশিয়াকে দূরে রাখিতেছেন। কুইবেকে তাঁহাদের কৌশলে রুশিয়া বিরক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে ওয়াশিংটনের রুশ প্রতিনিধি মঃ লিটভিনফকে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে। লণ্ডন হইতে মঃ মেইস্কির অপসারণের অব্যবহিত পরেই মঃ লিটভিনফের অপসারণ নিশ্চয়ই গুরুত্বহীন বিষয় নহে। কুইবেক্ সম্মিলনের সময় রুশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "টাস্ এজেন্সী" মন্তব্য করিয়াছিল —রুশিয়া এই সম্মিলনীতে আমন্ত্রিত হয় নাই ; এই সম্মিলনে রুশিয়ার যোগদান অভীপ্সিতও ছিল না। মস্কোর 'যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণী' নামক পাক্ষিক পত্র এই সময় ত্রিশক্তির সম্মিলনীর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, লণ্ডনে

অবস্থিত বিভিন্ন দেশের সরকারের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির ব্যবহার রুশিয়ার পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—কুইবেক্ সম্মিলনীর পর তাঁহার ও মিঃ চার্চ্চিলের সহিত মঃ ষ্ট্যালিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কিত আয়োজন বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। হয়ত অতি সত্বর এই তিন জনের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইবে। তিন জন রাষ্ট্রনায়কের প্রত্যক্ষ আলোচনার ফলে য়ুরোপের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল। নতুবা, সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে এই ক্রমবর্দ্ধমান মতানৈক্যের কুফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইতে পারে।

রুশ রণাঙ্গন—

রুশ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য সাফল্য তাহাদের খারকভ অধিকার। খারকভ ইউক্রেণের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া পরিচিত; ইহা দক্ষিণ রুশিয়ার অন্যতম প্রধান শ্রমশিল্প-কেন্দ্র। দক্ষিণাঞ্চলে খারকভই জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান আক্রমণ-ঘাঁটী ছিল। খারকভ অধিকারের পর রুশ সেনা ডোনেৎস্ অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে; উত্তর ইউক্রেণে কিয়েভ লক্ষ্য করিয়াও তাহাদের আক্রমণ বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর প্রধান ঘাঁটী স্মলেনস্ক অভিমুখে তিন দিক হইতে সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণ চলিতেছে। রুশ রণক্ষেত্রের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আশা হয়—আগামী শীতকালে সমগ্র রুশ-ভূমি জার্ম্মাণীর কবল হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

রুশিয়ার সাম্প্রতিক সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও সোভিয়েট বাহিনী কোথাও জার্ম্মাণীর বিপুল সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহাদিগকে নিষ্পিষ্ট করিতে পারে নাই। ওরেলে বিপন্ন ২॥ লক্ষ জার্ম্মাণ সেনা সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল; তাহার পর, খারকভ, ডোনেৎস্ অববাহিকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও জার্ম্মাণী তাহার সেনাবাহিনী অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাজেই, সোভিয়েট বাহিনীর সাম্প্রতিক সাফল্য জার্ম্মাণীর সংগ্রাম-শক্তিতে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই; জার্ম্মাণীর সমর-শক্তি চূর্ণ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। আশা করা যায়, রণক্ষেত্র হইতে ইটালীর অপসৃতির পর ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি এখন জার্ম্মাণীকে প্রবল ভাবে আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবে; রুশ সৈন্যের মধ্য য়ুরোপে প্রবেশের আশঙ্কা এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে আর দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিবে না। যদি দ্বিধাশূন্য ভাবে তাঁহাদের এই অভিযান আরম্ভ হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর সমর-শক্তি দ্রুত চূর্ণ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—জার্ম্মাণী এখন দীর্ঘকাল প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে রত থাকিয়া সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে রাজনৈতিক মতদ্বৈধ ও সন্ধির আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করিতে চাহে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিসর স্থানে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ সন্নিবেশ করিতে পারিলেই প্রতিরোধাত্মক সংগ্রাম পরিচালন সহজসাধ্য হয়। রুশ রণাঙ্গন হইতে জার্ম্মাণী যদি অক্ষত অবস্থায় তাহার সৈন্য ও সমরোপকরণ অপসারণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই সামরিক সুবিধা লাভ অসম্ভব নহে। অবশ্য, যুদ্ধ পরিচালনে সামরিক দিক্ই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে; উহার নৈতিক দিক্ও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। জার্ম্মাণী যদি কেবলই তাহার অধিকৃত অঞ্চলগুলি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ জাতির প্রতি উহার বিশেষ কুপ্রভাব পতিত হইবে। বিশেষতঃ যুদ্ধ-পরিচালনে জার্ম্মাণ জাতির কোন আদর্শগত ভিত্তি নাই; নাৎসীরা কেবল পরস্বাপহরণে পুষ্ট হইবার স্বপ্নই জার্ম্মাণ জাতিকে দেখাইয়াছে। এই স্বপ্নে জাতি বিভোর থাকিতে পারে যতক্ষণ, যতক্ষণ রণক্ষেত্র হইতে নূতন নূতন জয়ের সংবাদ আসে—নূতন নূতন অঞ্চল অধিকারে রাজ্যের সীমান্ত বিস্তৃত হইবার সুখবর মিলে। রণক্ষেত্র হইতে ক্রমাগত নৈরাশ্যজনক সংবাদ আসিলে আদর্শহীন জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনাই অধিক। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে মনে হইবে, জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি অটুট থাকিতেও জার্ম্মাণ রাজ্যের অভ্যন্তরে আকস্মিক নাৎসী-বিরোধী বিপ্লব সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে।

রুশ-ভূমি হইতে সমস্ত জার্ম্মাণ সৈন্য অপসারিত হইবার পরও জার্ম্মাণ জাতি যদি অচঞ্চল থাকে, তাহা হইলে তখন জার্ম্মাণী হয়ত শেষবার তাহার কূটনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। তত দিনে রুশিয়ার সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির মতানৈক্য যদি দূরীভূত না হয় ও নূতন নূতন রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া যদি সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে মত-বিরোধ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী তখন রুশিয়াকে স্বতন্ত্র সন্ধিতে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রবল প্রয়াস করিবে। বর্ত্তমানে এই সম্পর্কে যে সকল জনরব মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইয়া থাকে, তাহার কোন মূল্য নাই। সমগ্র রুশ-ভূমি জার্ম্মাণীর কবল হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্বে এই সম্পর্কে কোন কথা উঠিতেই পারে না।

অবশ্য, রুশ-ভূমি জার্ম্মাণীর কবল হইতে মুক্ত হইলেই রুশিয়া যে জার্ম্মাণীর সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর যে বিরোধ—ইহা আদর্শগত। কাজেই, ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মাণীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির আগ্রহ অপেক্ষা রুশিয়ার আগ্রহই অধিক। তবে, দুর্ভাগ্য বশতঃ রুশিয়ার যদি এইরূপ সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ ঘটে যে, তাহার প্রতি ও য়ুরোপের গণশক্তির প্রতি অবিশ্বাসহেতু ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি হিটলার-মুসোলিনীর পরিবর্ত্তে নূতন ফ্যাসিষ্ট দলকে য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তখন এই প্রয়াস ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে রুশিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছায় অপ্রত্যাশিত কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিতে পারে।

সুদূর প্রাচী—

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়ন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মুবো পুনরধিকার—ইহাই প্রাচ্য অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক ঘটনা। বর্ত্তমানে নিউগিনিতে লে ও সালামুয়ায় ২০ হাজার জাপানী সৈন্যকে সম্মিলিত পক্ষের সেনা পরিবেষ্টিত করিয়াছে। হয়ত জাপানের এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী সত্বর সম্মিলিত পক্ষের অধিকার-ভুক্ত হইবে।

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর হইতে জাপান বিতাড়িত হওয়ায় পশ্চিম গোলার্দ্ধের বিপদ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্ব করিবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীতেও জাপান

বঞ্চিত হইল। আর, সম্মিলিত পক্ষও আলিউসিয়ান অঞ্চল হইতে খাস জাপানে বিমান আক্রমণ চালাইতে পারিবেন। ইতোমধ্যেই মার্কিণী দূরপাল্লার বিমান দুই বার কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে হানা দিয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্যের গতি অত্যন্ত মন্থর। এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক সাফল্যে অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। তবে ঐ অঞ্চলে জাপানের বিশালতম ঘাঁটী রবাউলে যত দিন সে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তত দিন অষ্ট্রেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইবে না। তবে অন্য দিক্ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের গুরুত্ব আছে। সম্মিলিত পক্ষ দাবী করেন—এই অঞ্চলে শক্তিক্ষয়কারী যুদ্ধ (War of attrition) চলিতেছে। যদি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের নৌ ও বিমান শক্তি সত্যই বিশেষ আঘাত পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্যের গতি মন্থর হইলেও ঐ অঞ্চলের যুদ্ধের গুরুত্ব অল্প নহে, সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধে উহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হইবে।

পূর্ব্ব এশিয়ার সেনাপতি পদে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগে এবং সম্মিলিত পক্ষের রাজনীতিকদিগের বিভিন্ন উক্তিতে ইহা এখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সম্মিলিত পক্ষ ব্রহ্মদেশে ও মালয়ে ব্যাপক অভিযান পরিচালনের আয়োজন করিতেছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি—জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাত করিবার ক্ষেত্র ব্রহ্মদেশ; ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনের শক্তি বৃদ্ধি করাই জাপানকে পরাভূত করিবার প্রকৃত উপায়। আমরা এই কথাও বলিয়াছি যে, ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিতে হইলে ভারত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের বিশাল নৌবাহিনী সন্নিবিষ্ট করা প্রয়োজন; ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তপথে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে ইটালীর আত্মসমর্পণে ভূমধ্য সাগরে সম্মিলিত পক্ষের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। কাজেই, সঙ্গত ভাবে আশা করা যায় যে, সম্মিলিত পক্ষ এখন ভারত মহাসাগরে প্রয়োজনানুরূপ নৌশক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এই নৌ-বাহিনীর সহযোগে পূর্ব্ব-ভারত হইতে স্থলপথেও অভিযান চলিবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ব্রহ্মদেশে অভিযান পরিচালনের অনুকূল রাজনৈতিক অবস্থা বৃটেন এখনও সৃষ্টি করিতে পারে নাই; ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটেনের প্রতিশ্রুতি এখনও স্পষ্ট নহে। বৃটিশ রাজনীতিকদের এই অযোগ্যতা সম্মিলিত পক্ষের সামরিক তৎপরতায় বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। গত বৎসর জাপান যখন ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে, তখন তাহাকে প্রতিরোধের জন্য বৃটেন ব্রহ্মবাসীর সহযোগিতা লাভ করে নাই; বরং বেসামরিক বর্ম্মীরা জাপানের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে বলিয়াই শ্রুত হইয়াছে। জাপান ব্রহ্মবাসীর স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী; সে বৃটিশের কবল হইতে ব্রহ্মদেশকে মুক্ত করিয়া বর্ম্মীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে—ইহাই বর্ম্মীরা আশা করিয়াছিল। সম্প্রতি শুনা গিয়াছে যে, জাপান ব্রহ্মদেশকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিয়াছে। এই স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ কেমন এবং বর্ম্মীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে, জাপানীদিগের সহিত বর্ম্মীদের বিরোধের ও অসহযোগের সংবাদও শ্রুত হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সম্মিলিত পক্ষের আসন্ন অভিযানের সময়, বর্ম্মীদের বিরোধিতা নিবারণ করিতে হইলে তাহাদিগকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বৃটিশ ধুরন্ধরগণ যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন, উহা জাপ-বিরোধী বর্ম্মীদের পক্ষেও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। জাপান জানে, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ তাহার পক্ষে জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম। কাজেই, ব্রহ্মদেশ রক্ষার জন্য সে তাহার সামরিক শক্তি বিশেষ ভাবেই প্রয়োগ করিবে; সেই সঙ্গে যদি সমগ্র ব্রহ্মবাসীকে সে বৃটিশ-বিরোধী সমর-প্রচেষ্টায় নিয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর পক্ষে ব্রহ্মভূমি হইতে শত্রুকে বিতাড়িত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইবে।

১০।৯।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

চরণ-যুগল

পায়ের পরিচর্য্যার কথা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। যাঁরা নিত্য ব্যায়াম-চর্চ্চা করেন, চরণ-পরিচর্য্যায় তাঁদেরো ঔদাসীন্য দেখিতে পাই অত্যন্ত অধিক। অথচ পায়ের স্বাস্থ্যের উপর, অটুট গঠনের উপর আমাদের দেহের গঠন ও সৌকুমার্য্য নির্ভর করে। জুতা পায়ে দিই,—দোকানে গিয়া সাইজ দেখিয়া জুতা কিনি! জুতা পায়ে কষিয়া চাপিয়া ধরে, অথচ সে জুতা পায়ে দিয়া চলাফেরা করি, তবু তাহা ত্যাগ করি না। জুতার এ অস্বাচ্ছন্দ্যে স্বাস্থ্য যে ক্ষুণ্ণ হয়, এ কথা আমাদের মনে উদয় হয় না!

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আমাদের হাত আমরা যেমন খুশী যে ভাবে খুশী নাড়িতে পারি; পা দু'খানিও যদি তেমনি ভাবে নাড়িতে-চাড়িতে পারি, তবেই বুঝিবেন, পায়ের স্বাস্থ্য অটুট আছে। যে-সব মানুষ সভ্যতা এবং ফ্যাশনের দাস্ত জানে না, আজো তারা পা দিয়া নৌকার দাঁড় টানে, পায়ের আঙুল দিয়া ঝুড়ি বোনে, পায়ের আঙুলে ধরিয়া মাটী হইতে মার্বেল, ছুঁচ-সূতা কুড়াইয়া তুলিতে পারে। এ সব লোকের পায়ের স্বাস্থ্য ভালো, গড়নও ভালো। তাদের পায়ে কড়া পড়ে না. হাঁটিতে-খাটিতে পা টনটন করে না; এবং পায়ের স্বাস্থ্য ভালো বলিয়া দেহও তাদের নানা উপসর্গ হইতে বিমুক্ত থাকে।

সার্কাশে দেখিয়াছি, খোঁটায়-খাটানো তারের উপর দিয়া মানুষ দেহের ব্যালান্স রক্ষা করিয়া দিব্য চলাফেরা করে। পা দু'খানি যে দোলা তারের উপর দেহের ভার রক্ষা করিতে পারে, তার কারণ তাদের পায়ের স্বাস্থ্য অটুট—গড়নে খুঁৎ নাই, তাই। পায়ের ব্যায়াম-পরিচর্য্যা করিলে নিয়মিত খানিকটা অভ্যাসে আমরা সকলেই তারের উপর দিয়া অমনি স্বচ্ছন্দ ভাবে চলাফেরা করিতে পারিব।

পায়ের ব্যায়াম-পরিচর্য্যায় পায়ের গড়ন মজবুত এবং সুছাঁদের

হইবে ; তার ফলে দেহও নড়বড়ে হইতে পারিবে না এবং চলার নিখুঁত ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়া দেহের গড়নকে সুকুমার রাখিতে পারিব। পায়ের পরিচর্য্যার সঙ্গে পায়ের জুতার সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। যে জুতা পায়ে দিলে পায়ে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে, এমন জুতা কদাচ পায়ে দিবেন না।

এবার পায়ের ব্যায়াম-বিধির কথা বলি :—

১। প্রথমে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দু'পায়ের আঙুলে মাত্র ভর রাখিয়া ১নং ছবির ভঙ্গীতে ধীর ভাবে ঘরের মেঝেয় পাঁচ মিনিট পায়চারি করিয়া বেড়াইবেন। বেড়াইবার সময় গ্রীবা থাকিবে সরল এবং সামনের দিকে প্রসারিত দুই হাতের উপর দু'চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন।

২। এবারে চেয়ারে, খাটে বা তক্তাপোষে বসুন, ডান পায়ের ভর রাখুন গোড়ালি তুলিয়া শুধু আঙুলগুলির উপর—তার পর ডান হাঁটুর উপর মুড়িয়া বাঁ পা ডান দিকে আনিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ পায়ের আঙুল মুড়িয়া সেই আঙুলগুলির সাহায্যে মেঝে হইতে কাগজ, রুমাল কিম্বা মার্বেল কুড়াইয়া তুলিবার অভ্যাস করিবেন। তার পর এই প্রণালীতে ডান পায়ের আঙুল দিয়া রুমাল কুড়াইয়া তুলিবার অভ্যাস করা চাই। আঙুল মুড়িয়া রুমাল প্রভৃতি তোলার এই যে প্রয়াস, এ প্রয়াসে আঙুলগুলির গড়ন হইবে সুশ্রী, নধর—পায়ের আঙুল কোনো দিন কাঠের মতো কঠিন হইবে না।

১। দুই হাত প্রসারিত করিয়া পায়চারি

২। আঙুল দিয়া রুমাল তোলা

৩। এবার চেয়ারে বসুন। ডান পা রাখুন গোড়ালি তুলিয়া শুধু আঙুলগুলির উপর ভর দিয়া—গোড়ালি তুলিয়া রাখিবেন। এবার ডান পায়ের হাঁটুর উপর দিয়া বাঁ পা ডান দিকে আনিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে পায়ের তলদেশটুকু—গোড়ালি হইতে আঙুল পর্য্যন্ত উপরে-নীচে সামনে-পিছনে ঘুরান। পাঁচ মিনিট কাল ঘুরাইবেন। বাঁ পায়ের তলদেশ ঘুরানোর পর ঠিক এই প্রণালীতে ডান পায়ের তলদেশ ঘুরাইবেন। এ ব্যায়ামে হাঁটু মজবুত এবং সবল হইবে—হাঁটিতে খাটিতে পা শ্রান্ত হইবে না ; "ডিম" হইবে সুডৌল।

৩। পায়ের তলা ঘুরানো

৪। চেয়ারে বসুন ; দু'পা মেঝে ছুঁইয়া থাকিবে। এবার মেঝেয় গোড়ালি ঠেকাইয়া রাখিয়া দু'পায়েরই সামনের দিক্ অর্থাৎ আঙুলের দিক্ উপরে তুলিয়া (৪নং ছবির ভঙ্গীতে) পা নাড়ুন—প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট ধরিয়া নাড়িবেন অবিচ্ছেদে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এবং চিৎ হইয়া বিছানায় শুইয়া যখন-তখন এ ব্যায়াম সাধনা করিবেন। এ ব্যায়ামের ফলে যত দীর্ঘ পথই চলুন না কেন,

যতক্ষণই দাঁড়াইয়া থাকুন, শ্রান্তিভরে পা টাটাইয়া ভারী হইবে না—পায়ের স্বাস্থ্য এবং গড়নও মজবুত থাকিবে।

৫। এবারে বসিয়া থাকিয়া দু'পায়ের গোড়ালি তুলুন—আঙুলগুলির উপর পায়ের ভর রাখুন (৫নং ছবির মত)। ভর রাখিয়া ঝাঁকি দিয়া দু'পায়ের গোড়ালি ঘন-ঘন নাড়ুন—উপর দিকে আর নীচের দিকে।

এ কয়টি ব্যায়াম-বিধি-পালনে পায়ের ছাঁদ ও শক্তি যেমন অটুট থাকিবে, দেহের ছাঁদও তেমনি সুঠাম সুকুমার থাকিবে।

৪। গোড়ালি ঠেকাইয়া

৫। দু'পায়ের গোড়ালি তুলিয়া

তার পর বেশী হাঁটাহাঁটি বা পরিশ্রমের পর পদ-পরিচর্য্যার কয়েকটি উপায়ের কথা বলি। ঈষৎ গরম জলে এক ছিটা লবণ এবং এক-চামচ (চায়ের চামচ) সোডা ফেলিয়া দিন। দিয়া সেই জলে পা দু'খানি ডুবাইয়া পাঁচ মিনিট বসিয়া থাকুন ; তার পর পা তুলিয়া ঠাণ্ডা জলে ডুবান—পাঁচ সেকেণ্ড। পাঁচ সেকেণ্ড পরে ঠাণ্ডা জল হইতে পা তুলিয়া নরম তোয়ালে বা গামছায় ঘষিয়া পা মুছুন। পা মুছিয়া পায়ের তলায় ঘষিয়া ঘষিয়া একটু সরিষার তৈল বা ভ্যাসেলিন মর্দ্দন করুন। ইহাতে প্রচুর আরাম পাইবেন এবং শ্রান্তি মোচন হইবে।

পায়ের নখ যথারীতি কাটিবেন—নখ বড় রাখিবেন না।
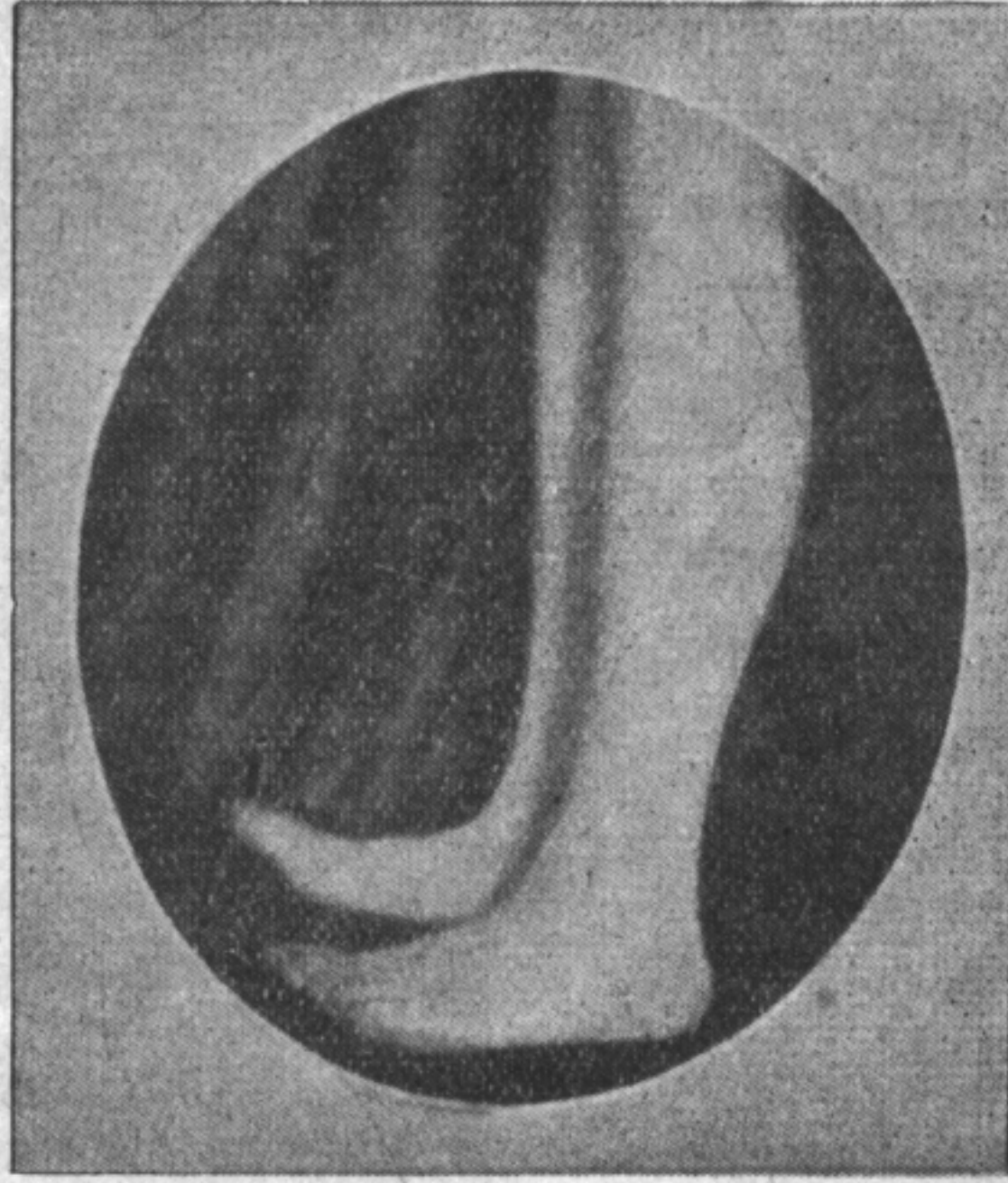
অশ্রু-অর্ঘ্য

রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব

দেশহিতে আত্মনিবেদিত-প্রাণ রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় ৬৩ বৎসর বয়সে ১৪ই ভাদ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ছাত্র-জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, দারপরিগ্রহ না করিয়া তিনি মহান্ আদর্শদীপ্ত জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন যুগে সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি দেশ-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জাতির জয়-যাত্রায় অগ্রণী হইতেন। বঙ্গভঙ্গ—অসহযোগ—স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি কোন আন্দোলনেই তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নাই—এ জন্য বহু বার সাদরে কারাবরণ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির সভাপতি ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠায়—কর্ম্মিগণের বিরোধ মীমাংসায় তিনি চিরদিন উৎসাহী ছিলেন। যে পতাকা তিনি দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন—মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাহা ত্যাগ করেন নাই। দেশবাসীকে সেই পতাকার গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার ভার সাদরে অর্পণ করিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।
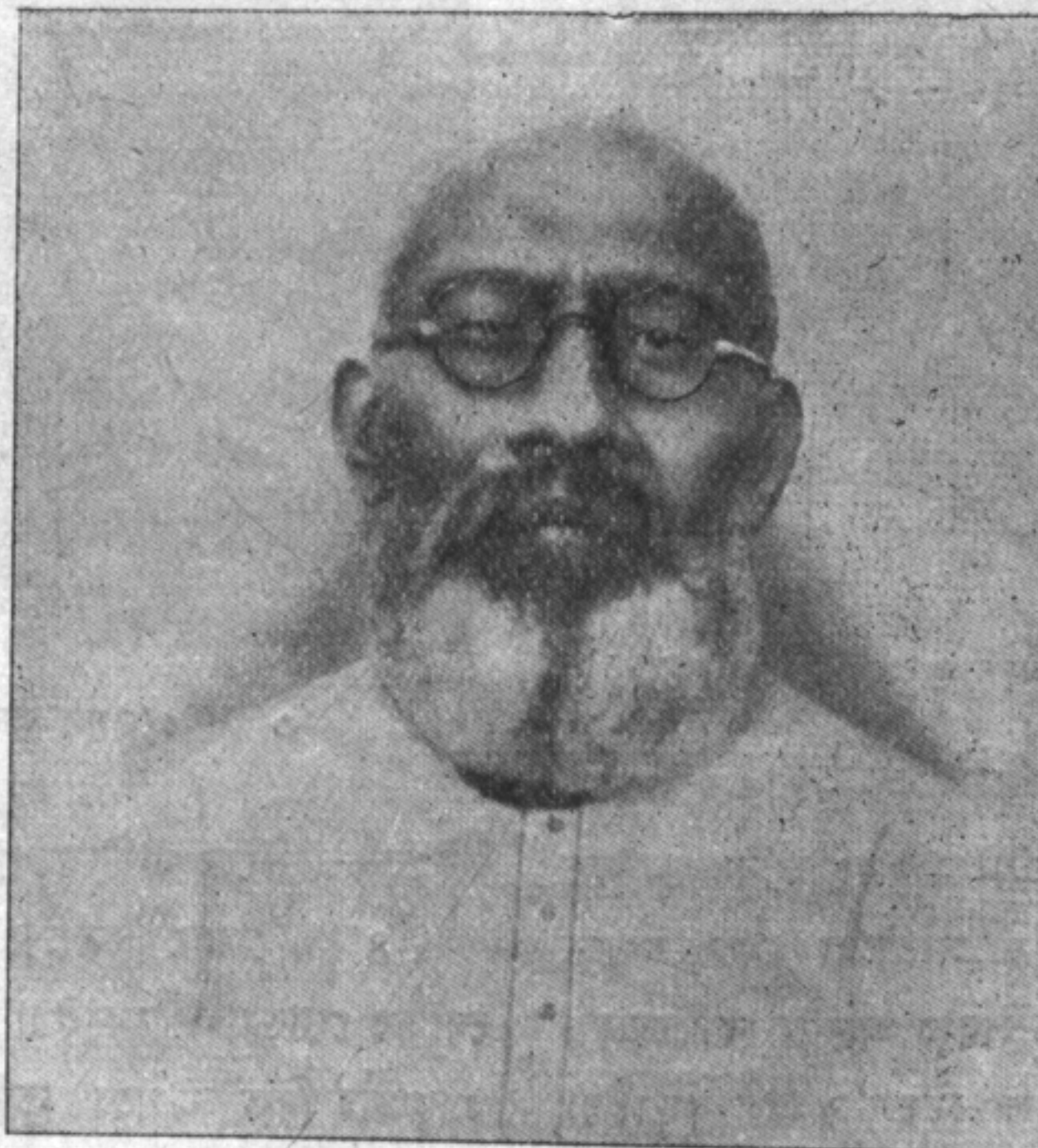
রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব

প্রভাবতী দাসী

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হরিপদ অধিকারীর পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী প্রভাবতী দাসী ২৬শে শ্রাবণ ৫৫ বৎসর বয়সে স্বর্গীয়া হইয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পোলার্ডের মামলা

মিষ্টার আর, সি, পোলার্ড পুলিসের বড়কর্ত্তা—বহরমপুরের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস। বহরমপুরের উকিল শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল মজুমদারকে প্রহার করার অভিযোগে ইনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে বহরমপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস, কে, চ্যাটার্জ্জি মিষ্টার পোলার্ড, উকিল মজুমদারকে প্রহার করিয়াছিলেন, ইহা সত্য মনে করিয়া তাঁহার দুই শত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। মিষ্টার পোলার্ড এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন এবং হাইকোর্টের সাহায্যে ঐ আপীলের মামলা নদীয়ার জিলা জজের এজলাসে উঠাইয়া লইয়া যান। নদীয়ার দায়রা জজ আপীল ডিস্‌মিস্ করেন। মিষ্টার পোলার্ড হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তখন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডার্ব্বিশায়ার, বিচারপতি খন্দকার এবং বিচারপতি লজকে লইয়া গঠিত এক বিশেষ বিচারাসনের অধিবেশনে মিষ্টার পোলার্ডকে দণ্ডের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই মামলা লইয়া এ দেশের সংবাদপত্রে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, দেশের অধিকাংশ লোক হাইকোর্টের এই রায়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সত্য সত্যই সত্যগোপাল মজুমদারকে প্রহার করিয়াছিলেন কি না,—এবং যদি প্রহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই প্রহার আইন অনুসারে সঙ্গত হইয়াছিল কি? কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, বিচারপতি ডার্ব্বিশায়ারের রায়ে সে বিষয়ের আলোচনা দেখিলাম না। তাঁহার রায় কেবল জিয়াগঞ্জ চাউল-লুণ্ঠন মামলা সম্বন্ধে তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার ফজলুল হক বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সমালোচনায় পূর্ণ। অথচ প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন যে, বাহিরের কোন লোককে বিচারকের উপর চাপ দিয়া বিচার-কার্য্যে কোনরূপ বাধা ঘটান কর্ত্তব্য নহে। কথা খুবই সত্য। কিন্তু কেবল লোকের অনুরোধে বা চাপেই যে বিচারপতির বিচার-বুদ্ধি ব্যাহত হয় তাহা নহে—বাল্যকালের পরিচয়, পূর্ব্বকালের বন্ধুত্ব এবং আনুগত্যও অনেকের মনকে কর্ত্তব্যসাধনে বিচলিত করিতে পারে। বিচারপতি লজ যখন ময়মনসিংহে ছিলেন, তখন ঐ মিষ্টার পোলার্ডও তথায় পুলিসের জুনিয়ার কর্ম্মচারী ছিলেন। ময়মনসিংহের ন্যায় সুদূর মফঃস্বলে ভিন্ন-জাতীয় আবেষ্টনের মধ্যে মুষ্টিমেয় য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে বয়সের পার্থক্য থাকিলেও প্রগাঢ় সখ্য ঘটা স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় বিচারক লজকে এই বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতিরূপে গ্রহণ না করাই কি সঙ্গত ও শোভন হইত না? মিঃ হক ও মিঃ চাটার্জ্জীর পত্র-ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে চাহি না। জিয়াগঞ্জ চাউল লুঠের মামলার সহিত এই মামলার এত কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা বুঝা গেল না। এই মামলা সম্বন্ধে কি মিঃ ফজলুল হক ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন?

সরকারের মঞ্জুরী ব্যতীত এই মামলায় আপীল করা যাইতে পারিবে না, এই মাত্র নির্দ্দেশ দিয়া কি বিচারপতি ডার্ব্বিশায়ার ফরিয়াদীর বিচার-প্রাপ্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নাই? মজুমদার মহাশয় পোলার্ডের হস্তে প্রহৃত হইয়াছিলেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহার ত বিচার হইল না। এখন জিয়াগঞ্জের চাউল লুঠের মামলার দায়ে তাঁহাকে যে কেন পোলার্ডের প্রহার নীরবে হজম করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিলাম না।

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালায় যে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কলিকাতায় প্রতিদিন রাজপথে বহু মৃতদেহ পতিত থাকিতেছে,—বহু মুমূর্ষু লোক রাজপথে পড়িয়া দীর্ঘ শ্বাস টানিতেছে। পুলিস প্রতিদিন যে সকল শব লইয়া যাইতেছে, কেবল তাহারই হিসাব প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দু সৎকার-সমিতি এবং মুসলমানদিগের শব সমাহিত করিবার সমিতি যে সকল শব দাহ বা সমাহিত করিতেছে, তাহার সঠিক হিসাব প্রকাশিত হয় নাই। হাসপাতালে মুমূর্ষু লোকের স্থানাভাব।

যাহারা কলিকাতায় রাজপথে মরিয়া পড়িয়া রহিতেছে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় খাবি খাইতেছে, তাহারা সকলেই না হউক,—অনেকেই মফঃস্বলের গৃহস্থ সম্প্রদায়ের। উহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য রাজার সহর কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু হতাশ হইয়া তাহারা নিরাশ্রয়ে ও অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতেছে। যাহারা একটু সাহসী ও শক্তিশালী, তাহারাই কলিকাতায় আসিতেছে, অবশিষ্ট সকলে গ্রামে ও পল্লীগ্রামে থাকিয়া মরিতেছে। এরূপ মৃতের সংখ্যা যে কত, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। সরকার নিয়ন্ত্রিত দরে যে চাউল বা আটা দিতেছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, উহাতে অর্দ্ধাশনও হয় না,—এবং এক দিন দেওয়া হয় ত তিন দিন দেওয়া হয় না। মফঃস্বলে কোন কোন স্থলে শুনিতেছি, কোন পরিবারে যত লোকই থাকুক না কেন, কাহাকেও সপ্তাহে তিন সেরের অধিক চাউল দেওয়া হইবে না,—যাহাদিগকে চাউল দেওয়া হইবে, তাহাদিগকে আটা বা ময়দা দেওয়া হইবে না নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অথচ মোটা বেতনের সচিবরা বলিয়া আসিতেছিলেন—ভয় নাই চাউল যথেষ্ট আছে! এ সকল মিথ্যা বাক্য দ্বারা লোককে প্রতারিত করিবার সার্থকতা কি? মৌলভী ফজলুল হকের অদৃষ্ট ভাল, তাই তিনি পদত্যাগে বাধ্য হইয়া, এই সহস্র সহস্র লোকের জীবনত্যাগের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সচিব স্যর জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইবার সময় বলিয়াছেন,—"প্রকৃত কথা এই যে, আমরা সকলেই ভুল করিয়াছি।" পাইকারী হিসাবে এক সময়ে সকল সরকারী কর্ম্মচারীই কেন ঠিক একই ভুল করিলেন, স্যর জওলাপ্রসাদ সে কথা বলেন নাই। যাঁহারা সরকারী নোকরি করে নাই,—বা করেন না, তাঁহাদের কিন্তু ঠিক ঐরূপ ভুল হয় না। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু সকলেরই একই রকম হইতে দেখা যায় না। যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার কোন কারণ আছে।

সে কারণ কি, তাহা স্যর জওলাপ্রসাদ যদি বলিতে পারিতেন,

তাহা হইলে ভাল হইত। তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন,—"আসুন আমরা এখন একযোগে যাহা কর্ত্তব্য তাহা যথাসাধ্য করি।" আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সরকারী পুরুষরা যে ভ্রান্তির মালা গাঁথিয়া আসিতেছেন, এবার তাঁহারা সেই মালায় আরও যে কয়েকটা ভ্রান্তির ঘেঁটুফুল সংযোগ করিবেন না, কে বলিতে পারে? যাঁহারা সরকারী নোক্‌রি করেন না, তাঁহাদের সহিত তাঁহারা যে একমত হইবেন, তাহার প্রমাণ কি? আসল কথা, যেরূপ ভাবে সরকারী কর্ম্মচারীরা নির্ব্বাচিত এবং কাজে নিযুক্ত হন, তাহাতে তাঁহাদের ভুল হইবেই। সার জওলাপ্রসাদ কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন,—বাঙ্গালায় কি কারণে এই জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল? ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যুদ্ধের জন্য দুর্ম্মূল্যতা তীক্ষ্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেও বাঙ্গালার মত এত সাংঘাতিক হয় নাই কেন? বাঙ্গালায় যখন খাদ্যশস্যের দারুণ অভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া জনসাধারণের মধ্য হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সরকারকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন,—তখন বেসরকারী ইংরেজদল বাঙ্গালায় এই খাদ্য-সমস্যার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর না হইয়া উহাকে তদানীন্তন লোকের কতকটা আস্থাভাজন সচিবসঙ্ঘকে অপসারিত করিবার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন কেন? সার জওলাপ্রসাদ কি নির্ভীক ভাবে বলিয়া দিবেন যে, পঞ্জাবের ব্যেপার-মণ্ডল যখন বলিয়াছিলেন, যদি সরকার মাল চালান নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলি শিথিল করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা বাঙ্গালায় প্রভূত পরিমাণে চাউল চালান দিতে পারেন, তখন সে কথা শুনা হয় নাই কেন? লাহোরের আর্য্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি-সভা, রাওয়ালপিণ্ডির ব্যবসায়ী দল ঐরূপ সর্ত্তে বাঙ্গালায় চাউল ও গম পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন,—সিন্ধু ও বোম্বাই অঞ্চল হইতেও ঐরূপ সর্ত্তে বাঙ্গালায় চাউল ও গম পাঠাইবার প্রস্তাব আসিয়াছিল,—কিন্তু কেন্দ্রী সরকার ও বাঙ্গালা সরকার উহাতে সম্মত হন নাই কেন? বাঙ্গালায় এবারের এই দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যুক্ত প্রদেশের চল্লিশের মন্বন্তর এবং উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষকেও অতিক্রম করিবে বলিয়া শঙ্কা হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য, ভগবানের বিচারে এ ভুলের কি মার্জ্জনা মিলিবে?

সরকারী কনট্রোলের দোকান

বাঙ্গালা সরকারের বে-সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ভাগ্যবান্ কর্ত্তা মিষ্টার সুরাবর্দ্দী কলিকাতা ও মফঃস্বলের স্থানে স্থানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য-শস্যাদি প্রদানের যে দোকান খুলিতেছেন, তাহা লোককে প্রকৃত সাহায্যদানের জন্য খোলা হইতেছে কি না,সন্দেহ! কারণ, নিয়ম করা হইয়াছে যে, কোন পরিবারকে সপ্তাহে তিন সেরের অধিক চাউল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দেওয়া হইবে না এবং যাহাকে চাউল দেওয়া হইবে তাহাকে আর আটা দেওয়া হইবে না। ইহার অর্থ কি? ইহাতে কি গৃহস্থের খাদ্যাভাব ঘুচিতে পারে? যে পরিবারে ৬ জন লোক, সেই পরিবারের এক দিনে তিন সের চাউলে কুলায় না। সাত দিন উহাতে চলিবে কি প্রকারে? যাহাদের পরিবারে ৩ জন মাত্র লোক, তাহাদের তিন সের চাউলে বড় জোর দুই দিন চলিতে পারে,—আর পাঁচ দিন তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে? এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে তিলে তিলে মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য কি? গত বার অজন্মা হয় নাই। কিছু শস্য নষ্ট হইলেও উহাতে এত অভাব হইতে পারে না। বে-সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগ এক এক স্থানে দুই-তিন শত মণ চাউল দিয়া তাহা দশ সহস্র দুঃস্থ লোকদিগের মধ্যে বণ্টনের নির্দ্দেশ দিতেছেন। ইহা কি সম্ভব? এ দিকে লোক ত মরিয়া উজাড় হইয়া যাইতেছে। মফঃস্বলে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সরকারী সরবরাহ বিভাগের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একটা লোক-দেখান ভাণ মাত্র। যাহাদের পয়সা নাই,—তাহারা ত নগদ মূল্য দিয়া খাদ্য কিনিতে পায় না। তাহাদের উপায়? সর্ব্বত্র লঙ্গরখানা নাই। যাহা আছে তাহা এতই একাকার ব্যাপার যে, সকলে সেখানে যাইতে চাহে না—যাহারা যায়, তাহাদেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া খাদ্য দেওয়া হয় না। দুই বা তিন ছটাক মাত্রায় যে, মণ্ড বিতরিত হয়, তাহা সুরাবর্দ্দী-সুধা নামে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। উহাতে জঠর-জ্বালা নিবৃত্ত না হইয়া মহামারীর বিস্তারে ভবজ্বালার অবসানই ঘটাইতেছে! যত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহাতে অজন্মাহেতু খাদ্য-শস্যেরই অভাব হইয়াছে এবং মূল্য বাড়িয়াছে। এবার সকল জিনিষের মূল্যই অতিশয় অধিক। চারি আনার সাগু না হইলে এক জন রোগীর এক বেলার পথ্যও সম্ভব হয় না। তাহাও দুষ্প্রাপ্য। সমস্যা সঙ্গীন। অমর না হইলে এই সুরাবর্দ্দী মার্কা সুধাপানে বলক্ষয়ের ফলে ধীরে ধীরে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

অনাহারে মৃত্যু

কলিকাতার রাজপথে প্রত্যহ বহু লোকের মৃত্যু হইতেছে। কত লোক এই প্রকার শোচনীয় ভাবে মরিতেছে, তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। ২১শে শ্রাবণ হইতে ২৬শে ভাদ্র পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজপথে ৫৫০ জন লোক মরিয়া পড়িয়াছিল এবং ২৮০৫ জন হাসপাতালে নীত হইয়াছিল—সেখানে ৬১১ জন মরিয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় এ পর্য্যন্ত অনশনে মৃতের সংখ্যা ৯০৪২ বলিয়া অসম্পূর্ণ হিসাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা বাইশ জন মাত্র ছিল বলিয়া সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ। কলিকাতার 'ষ্টেটস্‌ম্যান' এবার ভীষণ মরণের কয়েকখানি চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া সাম্রাজ্যবাদীদিগের পোঁ-ধরা লোকেরা 'ষ্টেটস্‌ম্যান'কে তীব্র ভাবে তিরস্কার করিয়াছেন। যাহাদের কৃপায় রাজপথ শ্মশানে পরিণত হইতেছে, তাহাদের কোন দোষ নাই, যে তাহা দেখে বা দেখায়, তাহারই যত দোষ! ইহাই সাম্রাজ্যবাদীদিগের গণতন্ত্র-নিষ্ঠার স্বরূপ। গণতন্ত্রের কাছে রাজা ও রাখালের প্রাণের মূল্য সমান। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এ দিক্‌টার মর্ম্ম কতখানি বুঝেন, তাহা এই বীভৎস ব্যাপারেই সুপ্রকাশ। দেশের লোক এই দুঃসময়ে সার্ব্বভৌম দুর্ম্মূল্যতার চাপে অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইলেও স্বদেশবাসীদিগের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারিগণ, বিদেশী সওদাগরগণ, বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী এবং বে-সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীরা এ ব্যাপারে এক কপর্দ্দকও দিয়াছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত শুনি নাই!

মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী এখন বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলিতেছেন,—চাউলের মণ ৩০ টাকাই হউক আর ৪০ টাকাই হউক, উহা যে লোক কিনিতে পাইতেছে, ইহাতেই তাঁহার কেরামতি শত-সূর্য্য-সম তেজে ভাস্বর! আজ যদি হকের সচিবমণ্ডলী থাকিত, তাহা হইলে তাহাও

পাইতে পারিত না। একমাত্র লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ ত্রিভুবন-বিজয়ী হইতে চায়। পল্লী-অঞ্চল হইতে ৮০ হাজার ক্ষুধার্ত্ত লোক অন্নের আশায় কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহাদের ৪০ হাজার নিঃস্ব ও ১৮ হাজার লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সরকারী হিসাবে প্রকাশ। নিরন্ন লোকদিগকে কলিকাতা হইতে সরাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতায় লোক মরিলে তাহা একেবারে চাপা দিবার উপায় নাই। তাই কি মফঃস্বলে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহাদিগকে সরাইবার চেষ্টা হইতেছে? ইহাদিগের অধিকাংশকেই ২৪ পরগণা (প্রায় ৩১ হাজার) আলমডাঙ্গা শিবিরে লইয়া যাওয়া হইবে। তদ্ভিন্ন হাওড়া, ডোমজুড়, জগদ্বল্লভপুর, পতিহাল, মুন্সিরহাট প্রভৃতি ১১টি স্থানে ৫২ হাজার ২ শত লোককে কলিকাতা হইতে সরাইয়া পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ শ্যাম বনবিটপি-বহুল, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইবে। ইহাতে কলিকাতায় এই কুদৃশ্য কতক ঢাকা পড়িতে পারে, কিন্তু আরও লোক যে অন্নাভাবে কলিকাতায় আসিবে না তাহার প্রমাণ কি? এখনও যাহারা হাতা-কাঁথা বেচিয়া অন্নের যোগাড় করিতেছে,—তাহা ফুরাইলে তাহাদের কি হইবে? নূতন আমন ধান উঠিলেই যে এই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা নহে। তখন সিংহলও থাকিবে,—দক্ষিণ আফ্রিকাও থাকিবে। থাকিবে না কেবল বাঙ্গালীর গোলায় ধান-চাল! আর ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি? হনোজ দিল্লী দূরাস্ত! যে সময় বাঙ্গালায় মানুষের সহিত কুকুরের খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছে, অন্নের জন্য জননী সন্তানকে বিসর্জ্জন দিতেছে, তখন সেই সব মৃত্যুপথযাত্রীর অর্থে যে সচিবমণ্ডলী মোটা বেতন ও ভাতা লইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না, দেশের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক আছে কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। এই বেতন গ্রহণ কি আইন-সঙ্গত লুণ্ঠন নয়?

—

বে-আইনী আটক

ভারতে প্রত্যক্ষ ভাবে খাস বৃটিশ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, এ দেশের লোক উহা ন্যায়সঙ্গত আইন-মতে পরিচালিত হইবে বলিয়াই আশা করিয়াছিল। সেই জন্য প্রায় সকলেই ইংরেজ শাসনের অনুরক্তও হইয়া পড়ে। কারণ, প্রকৃত আইন—নিরপেক্ষ মানবের পক্ষপাত-বর্জ্জিত বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত সত্য। কোন্ কার্য্য সৎ এবং কোন্ কার্য্য অসৎ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যাহা শাশ্বত এবং অপরিবর্ত্তনীয় তাহারই নির্দ্ধারণ হইল আদর্শ আইনের বনিয়াদ। সুতরাং আইনের শাসন সুশাসন বলিয়াই গণ্য। তবে ইহা সত্য যে, মদ ও পদ-গর্ব্বিত মানুষ নীচ স্বার্থপরতা অথবা ভ্রান্তির বশে অবৈধ আইনও প্রণয়ন করে। উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অসন্তোষ ও অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শাসকগণ শুধু যেন জিদের বশে বে-আইনী আইন রচিয়া তদনুসারে দেশ শাসন করিতে চান! পাঠক জানেন, ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অসিদ্ধ—হাইকোর্ট এইরূপ রায় দিলে কেন্দ্রী সরকার ঐ ধারা অনুসারে আটক সিদ্ধ করিবার জন্য আবার এক অর্ডিনান্স জারি করেন। সে অর্ডিনান্স যে অসিদ্ধ, এখন কলিকাতা হাইকোর্ট এবং ফেডারাল কোর্টও তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। ফেডারাল কোর্ট রায় দিয়াছেন যে, "ভারতরক্ষা নিয়মের ২৬ ধারা অনুসারে লোককে আটক রাখিবার যে সকল হুকুম জারি করা হইয়াছে, তাহা সমস্তই অসিদ্ধ,—অতএব আটক আসামীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে।" সরকার সে সিদ্ধান্ত মানিতে সম্মত হইতেছেন না। তাঁহারা ফেডারাল কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিতেছেন। কিন্তু ভারতের দুইটি উচ্চ আদালত যে নির্দ্ধারণ দিয়াছেন বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল যদি তাহাই ঠিক বহাল রাখেন, তখন কি হইবে? বে-আইনী ভাবে লোকের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য সরকার কি তাঁহাদিগকে খেশারৎ দিবেন?

এই অর্ডিনান্স অনুসারে কি ভাবে কার্য্য করা হয়, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পুলিস আটক ব্যক্তিদিগের তালিকা দিয়া তাহাদিগকে ২৬ ধারা মতে গ্রেপ্তার করিতে বলে। তখনই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করিবার পর পুলিস ঐ আটক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ পাঠায়। উহা সচিবদিগের নিকট পাঠান হয়। ধৃত ব্যক্তিকে আটক না রাখার কোন কারণ আছে কি না, সচিবই তাহা দেখেন। সচিব যদি মনে করেন, আটকের হুকুম বাতিল করিবার হেতু আছে, তাহা হইলে তিনি গবর্ণরকে সে কথা বলিবেন। ফলে দেখা যায়, এই ব্যাপারে পুলিসই সর্ব্বেসর্ব্বা! তাহারা আদালতে আটক ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না। যাহাকে আটক করিবার জন্য পুলিস নামের ফর্দ্দ দেয়, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কত দূর সত্য কি ভাবে তাহার যাচাই হয়, বুঝা যায় না। ফলে পুলিস ইচ্ছা করিলে তাহাদের অপ্রিয় ব্যক্তিকে আটক করিতে পারে। এই মামলা উপলক্ষে বিচারপতিরা বলিয়াছেন যে, "এই সকল ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা অতীব নিন্দনীয়। আইনের নির্দ্দেশের এবং লোকের স্বাধীনতা-সম্বন্ধে নির্ম্মম উপেক্ষার অধিকতর গুরু দৃষ্টান্ত আর ধারণা করা যায় না।" এই মন্তব্য চূড়ান্ত। বিচারপতি বরদাচারী এবং জাফরুল্লা বলিয়াছেন, "যে সকল আদেশ সম্বন্ধে বিচার হইতেছে,—তাহার প্রত্যেকটিই আইনের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ।" আরও বলা হইয়াছে যে, ১লা অক্টোবর হইতে এ পর্য্যন্ত ১২৯ ধারা মতে যাহাদিগকে আটক করা হইয়াছে, তাহাদিগের আটক আইন মতে সিদ্ধ বলা যায় না। এখন আমরা বিলাতে আপীলের ফল দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীমতী নেলী সেন গুপ্তা রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে বে-সরকারী য়ুরোপীয় দলের নেতা বলেন,—"আবার—বল কি? সরকার যেন সাধারণ ভাবে মুক্তি বিতরণ-বিলাসে গা ভাসাইয়া না দেন!" মিষ্টার এ, আর, সিদ্দিকী কেবল ব্যুরোক্রেসীর বাঁধা বুলিই আওড়াইয়াছিলেন। সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন যে, তিনি আটক বন্দীদিগের খোরাকীর ব্যয় দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যখন চতুর্গুণ হইয়াছে,—তখন ব্যয়ের বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হইয়াছে! অর্থাৎ খাদ্যের পরিমাণ অর্দ্ধেক করা হইয়াছে! পারিবারিক বরাদ্দ সম্বন্ধেও তাহাই! ভারতীয় উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে যখন এই আটক-আইন অসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তখন এ সব বন্দীর বন্দিত্ব কেন ঘুচিতেছে না, ইহা ভাবিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই! সচিবের গদিনশীন হইবার পূর্ব্বে সার নাজিমুদ্দীন উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, রাজবন্দীদের মুক্তি দান সম্বন্ধেও তিনি অবহিত হইবেন। কিন্তু গদি তিনি পাইয়াছেন

চার মাস পূর্ব্বে—এ চার মাসের মধ্যে ২১৬ জন মাত্র আটক-বন্দী মুক্তি পাইয়াছেন—অর্থাৎ গড়ে মুক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় মাসে ৫৪ জন হিসাবে! ইহা তাঁহার জাঁকের জম্‌কালো পরিচয় বটে!

লাট বদল

বাঙ্গালার লাট সার জন হার্ব্বার্ট পীড়িত হইয়া পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন। লেডি মেরি হার্ব্বার্ট ইহার মধ্যে মালপত্র লইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে গিয়া স্বামীর অসুস্থতার সংবাদ পাইবামাত্র বিমানে চড়িয়া অচিরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। অকস্মাৎ তাঁহার এই বিলাতযাত্রা—বাঙ্গালার লোক সে সংবাদ আদৌ জানিত না,—জানিল, তাঁহার প্রত্যাগমন-সংবাদে। সকলেই এখন আশা করিতেছেন, অতঃপর সুস্থ হইয়া সার জন হার্ব্বার্ট পত্নীসহ স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন! সার জন হার্ব্বার্টের স্থানে বিহার প্রদেশের গবর্ণর সার টমাস রাদারফোর্ড অস্থায়িভাবে কার্য্য করিবেন। সম্প্রতি তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, "বাঙ্গালায় যে অবস্থা চলিতেছে, আমরা অবশ্যই যে কোন প্রকারে তাহার প্রতিকার করিব।" তিনি আশা করেন, এই কার্য্যে তিনি ব্যবসায়ীদিগের সহযোগিতা লাভ করিবেন। ফলে জানুয়ারী মাসের শেষ নাগাদ তিনি মোটা চাউলের মূল্য ৯ টাকা মণ, আর মাঝারি চাউলের মণ ১০ টাকায় দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিবেন। জানুয়ারী মাস আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এ পর্য্যন্ত ত চাউলের বাজার নামিল না। সম্প্রতি বঙ্গীয় বে-সরকারী সরবরাহ বিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১১ই ভাদ্র হইতে ২৩শে ভাদ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ধান ১৫ টাকা মণ এবং চাউল ৩০ টাকা মণ দরে বেচিতে হইবে। ইহাই উচ্চতম বাজার-দর। তাহার পর ১০ই ভাদ্র হইতে ৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ধানের মূল্য প্রতি মণ ১২ টাকা ২ আনা এবং চাউলের মূল্য প্রতি মণ ২৪ টাকার অধিক দরে কেহ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। তাহার পর ৮ই আশ্বিন হইতে ধানের দর ১০ টাকা এবং চাউলের দর ২০ টাকায় নামিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ দরে সর্ব্বত্র বাজারে চাউল কিনিতে পাওয়া যাইতেছে কি? আমরা যত দুর জানি, সর্ব্বত্র তাহা পাওয়া যাইতেছে না। খুচরা মণ-করা ২ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে না—এই আদেশ অবহেলিত হইতেছে কি প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা দেখিবার ভার কেবল পুলিসের হাতে দিয়া রাখিলেই কি তাহা প্রতিপালিত হইবে? এ আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু দোকান হইতে চাল যে অন্তর্ধান হইয়াছে সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইতেছে? দেশের লোক এখন জীবন্মৃত। তাহারা দোকানদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বিশ্বস্ত গোয়েন্দা পুলিস দ্বারা সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করাইলে কি ফল হইবে? দোকানদারের বিরুদ্ধে থানায় গিয়া নালিশ জানাইলে চাল মিলিবে না। কাগজে-কলমে হুকুম নিবদ্ধ রাখিলেও লোকে চাল পাইবে না এবং লোকের প্রাণ বাঁচিবে না। আর এক কথা, ধানের দর ১০ টাকা হইলে চাউলের দর ২০ টাকা হইবে কেন? এক মণ ধানে প্রায় ২৬ সের চাউল হয়,—কোন কোন স্থলে দুই-এক সের কম হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে চাউলের মণ ১৮ টাকার অধিক হইতে পারে না। তাহার পর ইহাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই সমভাবে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘুষের ব্যবস্থার ন্যায় ইহার দ্বারা সাক্ষ্য প্রমাণের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং দুর্নীতি যেমন অবাধে চলিতেছে,—চাউলের অধিক দরও তেমনি অধিক থাকিবে। প্রতিকার হইবে না। বাঙ্গালায় বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত! এরূপ অবস্থায় সার টমাস কি করিবেন? সার টমাস রাদারফোর্ড ২০শে ভাদ্র বাঙ্গালার শাসন-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, তিনি কি ভাবে খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন!

পরলোকে কুমুদিনী বসু

যশস্বিনী সুলেখিকা সমাজসেবিকা কুমুদিনী বসু বি-এ ৬৫ বৎসর বয়সে ১৮ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিনি স্বনামধন্য কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা—'ব্যবসা-বাণিজ্য' সম্পাদক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর সহধর্ম্মিণী। তাঁহার রচিত 'শিখের বলিদান' 'মেরী কার্পেণ্টার' 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী' প্রভৃতি সমাদৃত। তিনি 'সুপ্রভাত' মাসিক পত্র ও স্বামীর মৃত্যুর পর 'ব্যবসা বাণিজ্য' সম্পাদনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

কুমুদিনী বসু

তিনি নারীরক্ষা-সমিতি ও নারী-কল্যাণ আশ্রমের সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার—১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে মহিলা বিভাগের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ভারত স্ত্রী-শিক্ষা-সদনের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। নারীর ভোটাধিকার লাভ তাঁহার আন্দোলনের সাফল্য। নারী সমাজের কল্যাণ সাধন তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"জীবনের দুঃখদৈন্য অতৃপ্তির পর
করুণকোমল আভা গভীর সুন্দর।"

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস

মাসিক বসুমতী
২২শ বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৫০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

"শ্মশান ভালবাসিস্ বলে"

দীর্ঘ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এক নিশীথে চিতোরের প্রাসাদে স্তম্ভ-শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথে অশরীরী বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল—"মৈঁ ভুখা হো !—মৈঁ "ভুখা হো।" আজ শরতের মেঘালোকবিচিত্র বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে সেই বাণী ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"মৈঁ ভুখা হুঁ—মৈঁ ভুখা হুঁ।" শঙ্কায় স্তম্ভিত বিক্লবে বিব্রত বাঙ্গালী সেই ধ্বনিতে মৃত্যুর আহ্বান শুনিতেছে।

রাজপথে শব—আর শতছিদ্র মলিন-বাস কঙ্কালসার নরনারী বালক-বালিকা—যেন প্রেতপুরীর দ্বার মুক্ত পাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহাদিগের মুখে রক্ত নাই—কোটরগত চক্ষুতে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা। দেখিলে মনে হয়, এই কি বাঙ্গালা—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা! এই ত মা যাহা হইয়াছেন—"কালী অন্ধকার-সমাচ্ছন্না—কালিমাময়ী।" দেশের সর্ব্বত্র শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল-মালিনী—আপনার শিব আপনি পদে দলিতেছেন।

সমাজ, সংসার, সংস্থান, সংস্কার, নীতিজ্ঞান সবই অভাবের তাড়-নায় নষ্ট হইতেছে, কেবল বাঙ্গালীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হয় নাই। সেই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই এক জন ইংরেজ লিখিয়াছেন—বাহিরের অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গালীর প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। সেই জন্যই বাঙ্গালী না খাইয়া মরে, তথাপি আপনার অভাব প্রকাশ করিতে চাহে না। অন্য দেশ হইলে লোক অনাহারে মরিবার ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যু দেখিবার পূর্ব্বে যাহাদিগের অন্ন আছে, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া খাইবার চেষ্টা করিত—সে চেষ্টায় প্রাণ দিতেও ইতস্ততঃ করিত না। বাঙ্গালায় তাহা হয় নাই! বাঙ্গালায় যে বিপ্লব হইতেছে, তাহাতে হিংসার বিকাশ নাই; তাহা মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতেছে, তাহা জড়বাদ-জর্জ্জরিত মানবের সভ্যতাকে ধিক্কার দিতেছে। তাহা যুদ্ধ অপেক্ষাও ভয়ানক—কারণ, তাহা মানুষকে পশুর অধম করিতে পারে—করিতেছে। তাহা ঝটিকা নহে—আগ্নেয়গিরির গৈরিক প্রবাহ।

বাঙ্গালীর স্বভাবের যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আমরা করিয়াছি, তাহারই জন্য প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া ও যে স্থানে প্রতীকার প্রয়োজন সেই স্থানে তাহা করা যাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা যে তাহা করেন নাই, তাহা আমরা ফল দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি।

বর্ষার বর্ষণারম্ভের পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল—বাঙ্গালার কোন কোন অংশ হইতে বোমা বর্ষণে সর্ব্বস্বান্ত বা অনশনে পীড়িত নরনারী আসামে যাইতেছিল—কেহ ট্রেণের কামরায়, কেহ ষ্টেশনের প্রাঙ্গণে, কেহ বৃক্ষতলে প্রাণত্যাগ করিতেছিল—তাহাদিগের দেহে জীবনী-শক্তির অভাব, আর যাহারা বাঁচিয়া থাকিতেছিল, তাহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতেছিল।

কিন্তু কেহ তাহাদিগের সম্বন্ধে মনোযোগী হয় নাই। যাহারা দরিদ্র, অসহায় তাহাদিগের সম্বন্ধে কয় জন—বিশেষ কয় জন বিদেশী অবহিত হয়? তাহাদিগের জীবনের মূল্য কি? বিশেষ তাহারা যদি নেতৃহীন হয়, তবে তাহাদিগের দুর্দ্দশা আরও শোচনীয় হয়, তাহারা আপনাদিগের অবস্থার প্রতীকারের চেষ্টাও করিতে পারে না।

অথচ এ বার যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহার জন্য প্রকৃতিকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করা যায় না। বন্যা ও বাত্যা বাঙ্গালার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারা যে ক্ষতি করিয়াছে, সে ক্ষতি চেষ্টা- উপযুক্ত চেষ্টা করিলে পূর্ণ করা যাইত। মানুষের অবজ্ঞা ও অবহেলাই এই অবস্থার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। তাহা না হইলে আজ বাঙ্গালা শ্মশান হইত না—সেই শ্মশানে ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইত না—"মৈঁ ভুখা হুঁ! মৈঁ ভুখা হুঁ!"

এ দিকে যে বাঙ্গালার শাসকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, তাহাও বলা যায় না—তাঁহারা অজ্ঞতার পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না—যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, এমনও বলিতে পারেন না। তাহার প্রমাণ, বাঙ্গালার গভর্ণর চাউলের মূল্য-বৃদ্ধিতে সচিবসঙ্ঘকে

অপসারিত করিয়াছিলেন—কিন্তু লোকের অন্নাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। আর কেন্দ্রী সরকার প্রকৃত সংবাদ বৃটেনে ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে যাইতে দেন নাই, তাহা নিষিদ্ধ ছিল। মাদ্রাজে দারুণ দুর্ভিক্ষকালে যখন ভারত সরকারের নিকট হইতে আবশ্যক সাহায্য পাওয়া যায় নাই, তখন মাদ্রাজের গভর্ণর ভারত সরকারের অপেক্ষা না রাখিয়া বিলাতে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক ও পরে বড় লাট লর্ড কার্জ্জন—বিদেশেও সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া সাহায্য পাইয়াছিলেন।

এ বার বিদেশে সংবাদ-প্রেরণ নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু বিদেশ হইতে সাহায্য না পাইলেও ভারতের খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে বণ্টনের আবশ্যক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিলেই যে বাঙ্গালার সহস্র সহস্র নরনারীর মৃত্যুর দায়িত্ব কাহাকেও গ্রহণ করিতে হইত না, তাহাও অনায়াসে বলা যায়। প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ করিবার পরেই যাহা হইয়াছে, তাহাতে নির্ভর করিয়া আমরা এ কথা অনায়াসে বলিতে পারি।

বাঙ্গালা প্রদেশ এখনও দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিয়া সরকার লোকরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই—দুর্ভিক্ষ কমিশনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ নির্দ্দেশ এখনও সর্ব্বোতোভাবে কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই—যে সচিবের হস্তে খাদ্য বিভাগের ভার আছে, তিনি দুর্ভিক্ষ "কোডের" নিয়ম পালন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই—লোককে যে খাদ্য-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু মানুষ জীবন্মৃত হইয়া আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকে—পরে আর কখন পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি পুনরায় লাভ করিতে পারে না। তিনি লোকের গৃহ হইতে সঞ্চিত খাদ্য-শস্য বলপূর্ব্বক টানিয়া আনিয়া—লোকের ভাণ্ডার শূন্য করিবার পরে তাহাদিগকে তাহাদিগের চিরাগত ও সংস্কারগত দয়ার অনুশীলন করিতে—নিরন্নকে অন্ন দিতে বলিয়া নিষ্ঠুর নির্লজ্জতার পূর্ণ পরিচয় প্রকট করিয়াছেন—মানুষের জীবন যেন তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মানবোচিত সহানুভূতির কোন পরিচয় আজও বাঙ্গালী পায় নাই। আর কবে পাইবে? পরে যদি কখন পায়, তত দিনে বহু লোক ভবযন্ত্রণা-মুক্ত হইবে এবং যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারাও যে জীবন-সংগ্রামের জন্য আবশ্যক শক্তি হারাইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মানুষ কিরূপে মানুষের বৈশিষ্ট্যও হারাইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সার জগদীশপ্রসাদ লিখিয়াছেন, ফরিদপুরে একটি লোক অনাহারে থাকিয়া গ্রাম হইতে সহরে আসিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহ-দ্বারেই সে পতিত হয় ও প্রাণ হারায়। যখন তাহার শব অপসারণ করা হইতেছিল, সেই সময় অদূরে উপবিষ্টা একটি স্ত্রীলোক একটি পুটুলী ঠেলিয়া দিয়া বলে—"এটিও লইয়া যাও।" তাহাতে তাহার মৃত শিশু ছিল। জননীর নেত্রে অশ্রু নাই—বুঝি মনে বেদনার অনুভূতিও সে হারাইয়াছে! কলিকাতার শ্মশানে চিতানল নির্ব্বাপিত হইতেছে না।

অথচ ইংরেজ সরকারের নিয়ম, কতকগুলি লক্ষণ প্রকট হইলেই দুর্ভিক্ষ-সম্ভাবনা বুঝিয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা পরিশ্রম করিতে পারে, তাহাদিগকে কায করাইয়া বিনিময়ে সাহায্য দিতে হইবে। যে সকল স্ত্রীলোক সামাজিক নিয়মহেতু গৃহের বাহিরে আসিয়া এবং যে সকল অক্ষম পুরুষ শারীরিক দৌর্ব্বল্যহেতু সাহায্য-দান কেন্দ্রে আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে সাহায্য-গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষেও সরকার—যাহারা কাযের বিনিময়ে সাহায্য লইবে, তাহাদিগের জন্য একরূপ "টোকন" মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা দিলে তাহারা এক টাকা মূল্যের খাদ্য-শস্য পাইত।
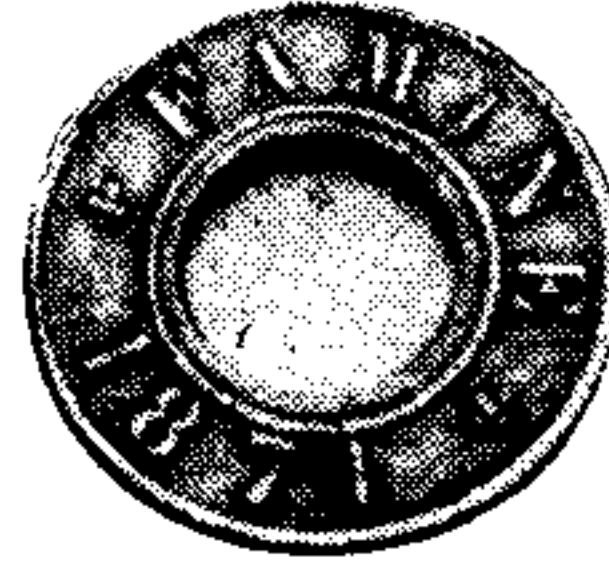
সে বার এত বিবেচনা করিয়া সাহায্যদান ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আর এ বার? এ বার এমনই অব্যবস্থা হইয়াছে যে, যে শস্য (বাজরা) দ্বাদশ ঘণ্টাকাল না ভিজিলে রন্ধনের উপযুক্ত হয় না, তাহাই চাউল ও ডাইলের সঙ্গে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লোককে প্রদান করা হইয়াছে! তাহাতে যে লোকের স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য্য, তাহাও বিবেচনা করা হয় না!

কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালার অভাবমোচনকল্পে পঞ্জাবের যে সরকার গম, আটা ও ময়দা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে সরকারকে দিতেছেন, সেই সরকারের এক জন সচিব হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকার সেই সকল দ্রব্যে অযথা লাভ করিতেছেন—আর এক জন হিসাব করিয়া সেই লাভের পরিমাণ পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়াছেন।

আহার্য্যের অভাবে কি হইতেছে, তাহা বাঙ্গালা সরকার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ব্যবস্থা পরিষদে এক জন মুসলমান সদস্য বলিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, বালিকাদিগকে বিক্রয়ার্থ পটুয়াখালীতে আনয়ন করা হইতেছে—লোক আহার্য্য দিতে না পারিয়া স্ত্রী ত্যাগ করিতেছে। কিন্তু সে কথাও যেন লোকরক্ষার দায়িত্ব যাঁহাদিগের, তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্ম্ম স্পর্শ করে নাই! তখনও বলা হইয়াছে—অভাব নাই, অভাব হইবেও না! যেন ইংরেজ সরকার যে নিয়ম করিয়াছিলেন—যে উপায়েই কেন হউক না, লোককে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে হইবে—সে নিয়ম পদতলে পিষ্ট করা হইবে।

যে সকল দেশ যুদ্ধে শত্রুর করতলগত হয়, সে সকল দেশে জনগণের যে অবস্থা ঘটে, তাহার তুলনায়ও কি বাঙ্গালার অবস্থা অধিক শোচনীয় বলা যায় না? বাঙ্গালায় আজ কত লোক মৃত্যুকেই মুক্তি বলিয়া মনে করিতেছে!

বাঙ্গালার সচিবগণ বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করিয়া—দুর্ভিক্ষে লোকরক্ষার দায়িত্ব কাহার, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে ব্যবস্থা ও ব্যবহার করিয়াছেন, ও করিতেছেন, সে সকল সম্বন্ধে অভিযোগের অন্ত নাই।

পঞ্জাব সরকারের দুই জন সচিবের অভিযোগের উল্লেখ আমরা করিয়াছি। উড়িষ্যা সরকারেরও অভিযোগ আছে। আসাম সরকারের ব্যবহার রহস্যাচ্ছন্ন। প্রতিদিন যে খাদ্য-শস্য ও খাদ্য-দ্রব্য বাঙ্গালায় আসিতেছে, তাহাতেও যে অবস্থার উল্লেখযোগ্য—

পরিবর্ত্তন হইতেছে না, তাহা কেন্দ্রী সরকারের বিস্ময়ের ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। কিন্তু তবুও তাঁহারা বাঙ্গালায় লোকরক্ষার ভার গ্রহণ করেন নাই। তথা-কথিত স্বায়ত্ত-শাসনে রাজনীতিক পরীক্ষা হইতেছে—জনগণ ও সরকার উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সচিব রাখিয়া—তাহাদিগের যোগ্যতা ও উপযোগিতা থাকুক আর না থাকুক—ইংরেজীতে যাহাকে "shcck absorber" বলে তাহারই ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বড় লাট লর্ড লিন্‌লিথগো তাঁহার বিদায়ী বক্তৃতায় তাঁহার দীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী শাসনকালের অনেক ব্যাপারেরই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু যে দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালা শ্মশান হইতেছে, তাহার উল্লেখও করেন নাই। আর যে লর্ড ওয়াভেল তাঁহার স্থানে বড় লাট হইয়া আসিতেছেন, তিনি তাঁহার মানসিক আধারে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, বাঙ্গালার লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ সে সকলের মধ্যে নাই। যেন বাঙ্গালায় অনাহারে লোকক্ষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা কাহারও অভিপ্রেত নহে। যেন—

"যুদ্ধের গরুড় যবে ঝটিকায় উপেক্ষিয়া উড়ে—
কে দেখে ধরায় কোথা শস্যক্ষেত্র বজ্রাঘাতে পুড়ে?"

অথচ বাঙ্গালা যে যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষেত্র হইবে, তাহার আয়োজনের অন্ত নাই! সে জন্য বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনও যেন অনুভূত হয় না—বাঙ্গালা শ্মশান হইলেও তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন নহে!

বাঙ্গালার এই শ্মশান-দৃশ্য এ বার বাঙ্গালীর পূজার উপহার। আজ আর বাঙ্গালীর কণ্ঠে আগমনী ধ্বনিত হইতেছে না—

"উঠ, মা, উঠ, মা, বাঁধ, মা, কুন্তল
ঐ এল তোর ঈশানী—পাষাণী,"

বাঙ্গালী আজ মৃত্যুর ঘনায়িত অন্ধকারে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"শ্মশানে কেন, মা, গিরিকুমারী
কেন, মা, তোমার এমন বেশ?"

এই প্রশ্নই আজ বাঙ্গালী করিতেছে। যাঁহাকে আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি, তিনিই ইহার উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু শ্মশানের যে নিস্তব্ধতা কেবল মানবের আর্ত্ত চীৎকারে মধ্যে মধ্যে যেন ছিন্ন—বিচ্ছিন্ন হইতেছে, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া—প্রলয়ের গর্জ্জনের মত তাঁহার উত্তর এখনও শ্রুত হইতেছে না। যত দিন—যতক্ষণ সে উত্তর শুনা না যাইবে; ততক্ষণ আমরা কেবল বলিতে পারি :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মৃত্যুরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

মানবের দীর্ঘদিনের ইতিহাস স্বার্থে ও ত্যাগে, নিষ্ঠুরতায় ও করুণায়, পাপে ও পুণ্যে যুদ্ধের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজ আমরা পৃথিবীতে যাহা লক্ষ্য করিতেছি তাহাও তাহাই। আমাদিগের দেশে যাহারা মনুষ্যচরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন—যাঁহারা ত্রিকালের সীমা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই সংগ্রাম ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে সংগ্রাম বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই যে কুরুক্ষেত্রে মানুষের রক্তে ধরণীর পাপ প্রক্ষালিত হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মক্ষেত্র নামে পরিচিত এবং সেই ধর্ম্মক্ষেত্রেই যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডবদলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে অস্ত্র-ঝনৎকার স্তম্ভিত করিয়া মানুষকে আশা ও আশ্বাস দিয়াছিলেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে।" তিনিই মানুষকে ক্লৈব্যাভিভূত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ কবি রোমের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—যে দিন রোমের পতন হইবে, সে দিন পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইবে। সে কথা কবি-কল্পনার অতিরঞ্জন। রোম তাহার বিলাস-সাগরে ডুবিয়া মরিয়াছে; য়ুরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীস আজ মৃত্যুর সুপ্তিতে মগ্ন; প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি মিশর আজ তাহার মরুকান্তারে পিরামীডের অন্ধকার অন্তরে সমাহিত। কিন্তু ভারতবর্ষ জীবিত—সে ইহকাল-সর্ব্বস্ব নহে বলিয়াই তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাকে মানবের সকল ধ্বংস-প্রচেষ্টা উপেক্ষা করিবার বল দিয়াছে।

আর রোমের সম্বন্ধে কবির উক্তি কল্পনার অতিরঞ্জন হইলেও বাঙ্গালা সম্বন্ধে তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালা যদি ধ্বংস হয়, তবে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইবে, তাহা কখন পূর্ণ হইবে না। সে ক্ষতি কি কেবল ভারতবর্ষেরই হইবে? যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের জন্মভূমি—সেই ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ্ গণতন্ত্রানুরাগ বাঙ্গালাই—অগ্নিহোত্র দ্বিজ যে নিষ্ঠাসহকারে আপনার অগ্নি রক্ষা করে, সেই নিষ্ঠাসহকারে—রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং যখনই সুযোগ আসিয়াছে, তখনই বাঙ্গালার গোমুখী-মুখে জাতীয়তার পাবনী ধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশের কল্যাণ ও উদ্ধার-সাধনে সহায় হইয়াছে। বাঙ্গালা নবভারতের ভাবকেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে।

এই বাঙ্গালা বিনষ্ট হইতে পারে না। ইহার বিনাশ-সাধন মানুষের ক্ষমতাতীত—বাঙ্গালা যুগে যুগে তাহার বিনাশ-সাধন-চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে—তাহাতে উপহাস করিয়া সেই চেষ্টার ভগ্নস্তূপের উপর আপনার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই আজ আশা ও বিশ্বাস ত্যাগ করিব না—এই অকল্যাণসৃষ্ট প্রলয়ের পরে আবার বাঙ্গালার মেঘমুক্ত আকাশ উন্নতির ভাস্কর-করে সমুজ্জল হইয়া সমগ্র ভারতে সেই আলোক বিস্তৃত করিবে। সে জন্য ক্লৈব্যাভিভূত না হইয়া—বাঙ্গালীকেই বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবার কর্ত্তব্য ধর্ম্মজ্ঞানে পালন করিতে হইবে। সে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া আজ বাঙ্গালীকে ভক্তিভরে যুক্তকরে আবেদন করিতে হইবে—

"যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটিমূর্ত্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।"

এই আর্ত্তনাদ-মুখরিত—অকল্যাণের অন্ধকারে আপনার মন ও আপনার দেশ প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। যুগে যুগে বাঙ্গালী যে সময়ে দুর্গতিনাশিনীর পূজা করিয়াছে, সেই সময়েই তাঁহার অভয়বাণী শ্রুত হইবে—"মাভৈঃ।"

অন্ধকার—একাকার—অনাচার—অত্যাচার—এই সব মৃত্যু-সহচরকে দূর করিতে হইবে—জীবনের আবির্ভাবে নব যুগারম্ভ হইবে। যে শক্তির লীলা এই পৃথিবীতে আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেই শক্তি কেবল জীবনেই প্রকট হয় না—তাহা মৃত্যুতেও প্রকট হয়। সেই জন্যই—সৃষ্টির জন্য—পরিবর্ত্তনের জন্য—শ্মশানের সৃষ্টি প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই সাধকের উক্তি শক্তিরূপিণী শ্মশান ভালবাসেন।

শ্মশানে অকল্যাণ দলিত—মর্দ্দিত—নষ্ট করিয়া—মৃত্যুর পরে নব-জীবনের আরম্ভ হয়! তাহাকেই যুগ-পরিবর্ত্তন বলা যায়।

পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাসে ইহা লক্ষিত হইয়াছে। ভারতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। যে জীবন মৃত্যুর নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না, সে জীবনের স্থানে যদি নব-জীবনের প্রতিষ্ঠাই অভিপ্রেত হয়, তবে মৃত্যুর মধ্য দিয়াই সেই মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। দলে দলে যাত্রী সেই মোক্ষের পথেই প্রাণ হারায়—কিন্তু তাহাদিগের মৃত্যু কখন ব্যর্থ হয় না। স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইংরেজ কবি যাহা লিখিয়াছেন—মোক্ষ ও মুক্তি সম্বন্ধে তাহা আরও প্রযোজ্য। স্বাধীনতার সংগ্রাম এক বার আরম্ভ হইলে রক্তসিক্তদিগের মৃত্যুশিথিল হস্ত হইতে পতাকা পরবর্ত্তীরা গ্রহণ করে—বার বার পরাভূত হইলেও জয় অবশ্যম্ভাবী হয়। মুক্তি যে আরও অধিক কাম্য তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত যে পথে বাঙ্গালী মুক্তির সন্ধান করিতেছিল, তাহা প্রকৃত পথ নহে; তাই তাহাকে অন্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে যে মৃত্যুর মধ্যে জীবনের বীজ উপ্ত হইবে—অকল্যাণের পঙ্কে কল্যাণের শতদল জন্মলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহারা এই মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাহাদিগের কি হইবে এবং তাহাদিগের পরিণাম কি, তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই মৃত্যুকেই আমরা শেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না—করিবও না।

এই শ্মশানেই আবার স্বর্ণদীপ প্রজ্বলিত হইবে; সেই দীপালোকে আমরা দেখিতে পাইব, যে নূতন বাঙ্গালার উদ্ভব হইবে, তাহাতে দৌর্ব্বল্যের, দুঃখের, দৈন্যের স্থান থাকিবে না।

আজ শক্তিপূজার সময়ে তাহাই বাঙ্গালীর একমাত্র কামনা।

বাঙ্গালী বহু পরীক্ষায়—অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া—হিংস্র জন্তুর আপদ নিবারণ করিয়া গঙ্গার পূতধারাবাহিত মৃত্তিকায় গঠিত এই বদ্বীপকে মানবের কর্ম্মকেন্দ্র—লক্ষ্মী-সরস্বতীর অনুগ্রহশ্রীসম্পন্ন দেশে পরিণত করিয়াছে। এই বাঙ্গালায় ভাগ্যপরীক্ষা করিবার জন্য বিদেশ হইতে বহু লোক—উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল সাগর ও তুষারমণ্ডিত হিমগিরি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। এই বাঙ্গালায় সুদূর প্রাচী হইতে মানুষ জ্ঞানের অন্বেষণে আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের জন্য অকাতরে রক্তদান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছে। আর এই বাঙ্গালার কবি, বাগ্মী, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, ধর্ম্মগুরু মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই বাঙ্গালা কখন বিনষ্ট হইতে পারে না। আজ আমরা সেই বিশ্বাসে বলী হইয়া শক্তির উৎসে স্নান করিয়া—কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইব। আমাদিগের সে যাত্রা জয়যাত্রাই হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

উমা ও মেনকা

"আমি যত কাল জীব আর না মা পাঠাইব
ফলভারে ভাঙ্গেনাক ডাল।"
রামেশ্বরের শিবায়ন।

উমারে রাখিয়া বুকে চুমা দিয়া চাঁদমুখে
গিরিরাণী কেঁদে কেঁদে কয়,—
"মা তোরে বিদায় দিতে বাসনা হয় না চিতে,
শুধু ভয় কি জানি কি হয়।
ভিখারী হরের ঘরে কত ক্লেশে অনাদরে
অযতনে কাটে তোর দিন,
আলুথালু তোর বেশ, তৈলহীন রুক্ষ কেশ,
ভোলানাথ সদা উদাসীন।
কেন বাছা চাস্ যেতে? হয়ত পাস্ না খেতে,
দুই বেলা উদর পূরিয়া।
রাজার ভাণ্ডার ভরা হেথা সবই ফেলা ছড়া,
মরি মা গো ঝুরিয়া ঝুরিয়া।

যাস্ না মা মাথা খাস্, দিব তোরে যাহা চাস্,
এই ঘরে থাক চিরকাল,
পুষিতে সংসার তোর কোন ক্লেশ নাই মোর,
ফলভারে ভাঙ্গেনাক ডাল।"

আপন অঞ্চল দিয়া মার চোখ মুছাইয়া
কয় উমা "ব'লো না ব'লো না
মা হ'য়ে অমন কথা, ব্যথার উপরে ব্যথা
দিয়ে মা গো ক'রো না ছলনা।
কি ফল ও ফল ভার ফলাবার বহিবার
বিফল যে ফলের জীবন?
দেবতার ভোগে রাগে যদি তাহা নাহি লাগে,
যদি তা না কর নিবেদন।

কন্যা হ'য়ে জননীরে এ সহজ কথাটিরে
বুঝাইতে মা গো লজ্জা করে,
ফলাবার অধিকার আছে শুধু মা তোমার,
ফল শুধু সঁপিবারই তরে।"

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্মশানে কেন মা ?

শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারি !

আজ বঙ্গভূমি শ্মশানে পরিণত ! শস্য-শ্যামলা সুজলা সুফলা বঙ্গজননীকে আজ দেখিতেছি—দীনা—হৃতসর্ব্বস্বা—কাঙ্গালিনী। তার নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হাহাকার ! পথে পথে দ্বারে দ্বারে কঙ্কালসার বুভুক্ষু নরনারী-মূর্ত্তি প্রেতপিশাচের বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে !

গ্রামে শুধু অন্ন নাই—তাহা নহে, বন্যার ধ্বংসলীলায় গৃহগুলিও বিধ্বস্ত। ধান্যের ক্ষেত্রগুলি জলমগ্ন থাকিয়া তৃণহীন হইয়াছে। গো-জাতির আহার্য্য নাই—বাসস্থান নাই—পালন করিবার লোক নাই,—কসাই-হস্তে আত্মদান করিয়া তাহারা দুঃখ হইতে মুক্ত হইতেছে।

সহস্র সহস্র নিরন্ন নরনারী গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিতেছে—পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে, দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে, জনে জনে নিজ দুঃখ-দুর্দ্দশার আবেদন জানাইতেছে ! কেহ কিছু পায়—কেহ পায় না। বিড়াল কুক্কুরের মত নর্দ্দমা হইতে পাত কুড়াইয়া একটু তরকারীর কণা খাইবার জন্য ছুটিতেছে !

নগরের পথে পথে মৃতদেহ পতিত, কে কাহার সৎকার করে ! মুমূর্ষুর কাতর ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ, ক্ষুধাতুর শিশুগণের ক্রন্দনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত, নগ্নপ্রায় রমণীশ্রেণি—একমুষ্টি তণ্ডুলের আশায় পথের উপর শয়ন করিয়া রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় পাতিয়া লইতেছে ! দুঃসহ পূতিগন্ধে নগর পরিব্যাপ্ত। ক্ষুধার জ্বালায় স্নেহময়ী জননী নিজ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তার মত চলিয়াছে—এক কণিকা অন্নের জন্য। মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশু এক বিন্দু দুগ্ধের অভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে !

এক দিকে এইরূপ হৃদয়বিদারক চিত্র, অন্য দিকে সমরানলের লেলিহান শিখা—নরনারীর প্রাণাহুতি-লোভে দিনে দিনে বিস্তার লাভ করিতেছে। শ্মশানের পূর্ণ ছবিখানি আজ চক্ষুর সম্মুখে বাস্তব মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আজ এই বঙ্গভূমির শ্মশান-প্রাঙ্গণে বিশ্বজননীর আগমনবার্ত্তায় সাধক চকিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারি !

কেন মা এই ভীষণ দুর্দ্দিনে—এই ভয়াবহ শ্মশানে—তোমার ঐ কোকনদবিনিন্দি-চরণযুগল স্থাপন করিতে চাহিতেছ ? প্রতিবর্ষে তোমার আগমন-সূচনায় দুর্দ্দিনের করাল ছায়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়, দুঃখ-ম্লানমুখে সুখের হাস্যরশ্মি ফুটিয়া উঠে। অন্ততঃ পূজার এই তিন দিনের জন্য বঙ্গগগন আনন্দ-কোলাহলে মুখর হইয়া উঠে, কিন্তু আজ যেন সমস্তই নিস্তব্ধ—নিষ্ক্রিয় ! তোমার আগমনেও হর্ষস্পন্দন নাই—চিন্তা-স্তিমিত মুখে আনন্দরেখা ফুটিতেছে না, প্রকৃতিও যেন আজ বিষাদ-গম্ভীর। শারদ প্রভাতের সে উজ্জ্বলতা নাই, হরিৎক্ষেত্রে সে শ্যামলতা নাই, নদনদীতে সে নির্ম্মলতা নাই। সর্ব্বত্র আতঙ্ক—শঙ্কা—বিষাদের ঘন ছায়া ঘেরিয়া আছে।

প্রকৃতি-প্রদত্ত জল ও ফলফুলই তোমার পূজার প্রধান উপকরণ। দূর্ব্বা-চন্দন-বিল্বপত্রে তোমার অর্ঘ্যরচনা, সাগর-সরোবর-নদনদীর জলে তোমার পাদ্য ও স্নান, লবঙ্গ-জায়ফল-কক্কোলের সুরভি সলিলে তোমার আচমন, ঘৃত দধি মধু-শর্করায় তোমার মধুপর্ক,—অরণ্যজাত শালবৃক্ষের নির্য্যাসে তোমার ধূপদান, ঘৃতস্নিগ্ধ কার্পাসবর্ত্তিতে তোমার দীপশিখা, কদলী-নারিকেল-কণ্ডুক-শোভিত হৈমন্তিক শুভ্রতণ্ডুলে তোমার নৈবেদ্য, পূগকর্পূর-যোজিত তাম্বূলে তোমার মুখশুদ্ধি, ভারতের ভূমি হইতে স্বভাবোৎপন্ন সুলভ-দ্রব্যদ্বারাই তোমার পূজার উপচার, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাংস্য-করতালের ধ্বনি—তোমার সন্তোষ-নিদান বাদ্য। কিন্তু আজ কোথায় লুকাইল—সেই অনায়াসলভ্য দ্রব্যবিতান ? আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বায়ুযান ও বিমানরাশির সঞ্চারে—বৃক্ষলতা গুল্ম পর্য্যন্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ফল—ফুল প্রদানে বিরত, দূর্ব্বাদল দলিত, বিল্ববৃক্ষ উৎপাটিত, ধান্যক্ষেত্র বিমান-উড্ডয়ন-ভূমিতে পরিণত, গোজাতি উৎসন্ন,—তদুপরি ঘৃতদুগ্ধ অপব্যয়িত, তণ্ডুল নিঃশেষে অপহৃত, নদনদী কলুষিত—শঙ্খঘণ্টাধ্বনির বিনিময়ে বিমানের কর্ণপটহবিদারী ঘর্ঘর শব্দ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে।

কোন্ প্রভাবে আজ তোমার পূজার উপচার বঙ্গজননীর বক্ষঃ হইতে এমন ভাবে তিরোহিত হইল ? কোন্ অচিন্তনীয় বিপৎ আসিয়া ভারতের এই দৈবী সম্পৎকে আবৃত করিয়া ফেলিল—আজ তাই সাধক-চিত্তে চিন্তার অন্ত নাই। সাধক বলিল—মা, তুমি 'উমা হৈমবতী বহু শোভমানা' রূপে দেবতাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের সংশয় অপনোদন করিয়া থাক, আজ আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র সংশয়টুকু বিদূরিত করিবে না কি ? আজ দেশের দুর্দ্দশা দর্শনে মনে হইতেছে—তুমি কি তোমার সেই 'ভীষণং ভীষণানাম্'—মূর্ত্তি প্রকট করিয়া তোমার ব্রহ্মস্বরূপতা জ্ঞাপন করিতেছ !

'ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ'—তোমারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হইয়া থাকে, তোমারই ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র ও যম স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকেন। তোমার এই ভয়াবহ রূপের মধ্যেও মাধুরীর পরিচয় পাই, কেন না—'ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ হুতাশন যম তপন—তোমারই আজ্ঞাবহ হইয়া জগৎ রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও তোমার ভীষণ রূপ প্রলয়ের সূচনা করিবে, তখন জগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সৈব কালে মহামারী·········।

* * *

সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে।

তুমি মহামারী মূর্ত্তিতে—অলক্ষ্মীস্বরূপে সমস্ত বিশ্বের বিনাশের কারণ হইবে।

মা ! আজ কি তাহারই সূচনা দেখিতেছি ? অথবা এই যে দুর্দ্দিন—ইহা তোমার ইঙ্গিতে হয় নাই,—হইয়াছে—কোন আসুর-ভাবের বিকাশ হইতে। কেন না—দেবীভাগবতে দেখিতে পাই, তারকাসুরের অভ্যুদয়কালে বিশ্বের এইরূপই এক ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল।

আনন্দঃ শুষ্কতাং যাতঃ সর্ব্বেষাং হৃদয়ান্তরে।
উদাসীনাঃ সর্ব্বলোকাশ্চিন্তাজর্জ্জরচেতসঃ।
সদা দুঃখোদধৌ মগ্না রোগগ্রস্তাস্তদাভবন্। ৭।৩১।৭—৮

আজও দেখিতেছি—সকলের হৃদয় নিরানন্দময়, সমস্ত মানব চিন্তায় জর্জ্জর ; দুঃখ-সমুদ্রে মগ্ন হইতেছে।

সাধক নয়ন নিমীলিত করিয়া মাতৃ-চরণ ধ্যান করিতে করিতে অর্দ্ধ জাগ্রৎ অর্দ্ধ-সুপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাইল—সত্যই আসুর ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে জগৎ জর্জ্জরিত হইতেছে। একের অন্ন অপরে কাড়িয়া লইতেছে, মানুষ মানুষকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যতাস্ত্র হইয়া ধাবমান হইতেছে। ব্যভিচার, হিংসা, চৌর্য্য ও বঞ্চনা, শৌর্য্যরূপে

প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। নারীর কোমলতা, শালীনতা, সতীধর্ম ও পতিচিন্তানুবর্ত্তিতা—কুসংস্কার বলিয়া পরিগণিত। আর্য্য ভাব বিলুপ্ত হইয়া অনার্য্যতা ও নিষ্ঠুরতার আসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; সম্মুখে মা বিশ্বরূপে দণ্ডায়মানা।

সাধক ভীতি-কম্পিত হইল এবং কথঞ্চিৎ আশ্বস্তও হইল। ভীতির কারণ এই যে,—এই আসুর ভাব কিরূপে প্রশমিত হইবে, ইহার দারুণ প্রকোপে পৃথিবীর কোন্ অংশ রক্ষা পাইবে এবং কোন্ অংশ যে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে—তাহা কে জানে?

আশ্বাসের কারণ,—মায়ের অভয় বাণী—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।

দানবের কৃত কার্য্য যত ভয়ঙ্করই হউক না কেন,—জগদম্বার অনুগ্রহে তাহার অন্ত হইবেই—সাময়িক আধিব্যাধি—অত্যাচার—উৎপীড়ন কালে প্রশমিত হইবেই। ইহার ভার গ্রহণ করিয়া—দেবগণ-সম্মুখে স্বয়ং জগদীশ্বরী তাঁহায় প্রতিজ্ঞা-বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি কালে কালে এইরূপ আবির্ভূতা হইয়া দানব ভাবের ধ্বংস করিয়াছেন। তিনি যে পূর্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপিণী—তাহা শাস্ত্রে নানা ভাবে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। শক্তিই তাঁহার স্বরূপ, শক্তিই তাঁহার লীলা-বিলাস—শক্তিই তাঁহার প্রকাশ। তিনি যখন তারকাসুর বধের জন্ত দেবতাদিগের প্রার্থনায় হিমালয়গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বমুখে বলিয়াছিলেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা।

যা কিছু জগতে বস্তুরূপে দেখা যায় বা শুনা যায়, তাহার অন্তর ও বহিঃ ব্যাপিয়া আমিই সর্ব্বদা বিরাজমানা।

ইহা শুনিয়া হিমালয় কৌতুহলী হইয়া বলিলেন,—দেবি, সমস্ত বস্তুর সমষ্টিরূপে তোমাকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। দেবতারা ছিলেন—সন্নিধানে, তাঁহারাও পরম আনন্দ সহকারে হিমালয়ের প্রার্থনা-বাক্য সমর্থন করিলেন। তখন দেবী বিরাট্ রূপ ধারণ করিলেন।

সে বিরাট্ রূপের মস্তক হইল দ্যৌঃ, চক্ষুর্দ্বয়, চন্দ্রসূর্য্য—দিক্ শ্রোত্র, বেদ হইল বাক্য, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব হৃদয়, পৃথিবী জঘনদেশ, নভস্তল—নাভিবিবর, জ্যোতিষ্কমণ্ডল—বক্ষঃস্থল। মহর্লোক গ্রীবা, জনোলোক মুখ, ইন্দ্রাদি বাহু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নাসিকা, যম দন্তশ্রেণি, হাস্য হইল মায়া। মেঘমালা তাঁহার কেশপাশ, উভয় সন্ধ্যা—বস্ত্রযুগ্ম, উদর—সমুদ্র, গিরিসমূহ অস্থি, নদীসমূহ—নাড়ী, চন্দ্র—মনঃ, শ্রীহরি—বিজ্ঞানশক্তি, রুদ্র—অন্তঃকরণ, অশ্ব প্রভৃতি তাঁহার শ্রোণিদেশের ভূষণ; তাঁহার জিহ্বা—লেলিহান স্বয়ং শত শত অগ্নিজ্বালায় সমুজ্জ্বল, দন্তে কটকটাশব্দ, নানায়ুধধারিণী, সহস্রশীর্ষা, সহস্রনয়না, সহস্রচরণা কোটিসূর্য্য-প্রকাশা, বিদ্যুৎকোটিপ্রভা সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিদর্শনে দেবতা-দিগেরও ভয় উপস্থিত হইল, তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হইল এবং মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। (দেবীভাগবত, ৭।৩৩)

এই প্রকার বিরাট্ রূপ দর্শনে অর্জ্জুনও এক দিন বিমূঢ় হইয়াছিলেন; যুদ্ধকালে বা অসুরের অত্যাচারে মানব যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই এই বিরাটরূপ বা বিশ্বরূপের প্রকটন আবশ্যক হইয়া উঠে। আজ তাই সাধকের চক্ষে—শ্মশানে গিরিকুমারী ও 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ'—লোকক্ষয়কারী কালমূর্ত্তির সঙ্গে কোন ভেদ প্রতিভাত হয় না। কাল শব্দে কাল্যা অর্থং এই অর্থে কালী সম্বন্ধীয় রূপবিশেষকে বুঝাইতে পারে। তাই অর্জ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপ ও দেবগণদৃষ্ট দেবীর বিরাট্ রূপে কোন ভেদ নাই। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।

হে অর্জ্জুন! আমার দুর্ল্লভ-দর্শন যে রূপ তুমি দর্শন করিলে—এই রূপ-দর্শনের জন্য দেবগণও আকাঙ্ক্ষা করেন।

শ্রীভগবানের এই উক্তিতে স্পষ্ট বুঝা যায়;—দেবগণ ঈদৃশ রূপ একবার দর্শন করিয়াছেন—তাই নিত্য দর্শন-আকাঙ্ক্ষা করেন, যদি একেবারেই দর্শন না ঘটিত, তাহা হইলে 'নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ' না বলিয়া শুধু 'দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ' ইহা বলাই সঙ্গত হইত। দেবগণ ঈদৃশ রূপ কোথায় দর্শন করিলেন? অর্জ্জুনপক্ষীয় দূতরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্য্যোধন সমীপে সন্ধিপ্রস্তাব লইয়া গমন করিয়াছিলেন, তখন একবার তাঁহাকে বিরাট্ রূপ ধারণ করিয়া ভীষ্মাদি বীরবৃন্দকে মোহিত করিতে হইয়াছিল, সেখানে দেবতাদের উপস্থিতি বর্ণিত হয় নাই। দেবীভাগবতে হিমালয় সন্নিধানে কেবলমাত্র দেবগণের সাক্ষাতে দেবীর বিরাট্ রূপ ধারণ উল্লিখিত আছে, সুতরাং এই বিরাট্ রূপ দেবতারা দর্শন করিয়াছিলেন এবং গীতোক্ত বিশ্বরূপ গ্রহণের সময়ে যে দেবতাদের নিত্য দর্শনাকাঙ্ক্ষার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার হেতু ঐ দেবীর বিরাট্ রূপ একবার দেবতাদের দর্শনীয় হওয়ায় পুনরায় দেবগণের তাদৃশ রূপ সতত দর্শনের ইচ্ছা সম্ভবপর।

গীতায় কথিত হইয়াছে—'লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্-সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ' লেলিহান মুখে সমস্ত লোক গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত সেই বিশ্বরূপ, যাহা দেখিয়া অর্জ্জুনও ভীতি-কম্পিত হইয়াছিল।

শুধু বঙ্গের বক্ষে নহে, পৃথিবীর বিরাট্ রণাঙ্গনে দেবী বিরাট্ রূপে লোকক্ষয়কর কালরূপে আজ প্রকটিত হইয়াছেন। এই কালরূপকে সংহার করাইতে হইলে চাই—সাধনা, কাতর প্রার্থনা ও শরণাগতি। ভ্রষ্টরাজ্য সুরথ মহারাজকে এক দিন মেধসমুনি উপদেশ দিয়াছিলেন—

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।

মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হউন, তিনি আরাধিতা হইলে মানবের ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ এই ত্রিবিধ কল্যাণই প্রদান করিয়া থাকেন।

বিশ্বের এই সঙ্কটকালে মা তুমি প্রসন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হও, তোমার সংহারকারী ভীষণ বিরাট্ রূপদর্শনে—দেবগণও কম্পিত হইয়াছিলেন, অর্জ্জুনের মত শক্তিশালী বীরের হৃদয়ও স্পন্দিত হইয়াছিল, মন্দমতি সাধারণ মানব যে ভীত—বিমূঢ় হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? আজ কাতর-কণ্ঠে তোমাকে আবাহন করিতেছি—

এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয়জয়প্রদে!

তোমার পদ-কোকনদস্পর্শে এই শ্মশানসদৃশ বঙ্গভূমি আবার শস্য-সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক—তোমার করুণা-সম্পদ্ লাভ করুক, আর দানব ভাব বিদূরিত হউক। তোমার অভয়বাণীতে সকলের শ্রদ্ধা অঙ্কুরিত হউক। ব্রহ্মরূপিণি মা, তোমার অদেয় কি আছে, তোমার প্রসন্নতায় বিশ্ব ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে, দীনতা বিদূরিত হয়, মুমূর্ষুর প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়া উঠে।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম-এ, অধ্যাপক)।

ক্রমশ-প্রকাশ্য

[গল্প]

গেল-বছর ইভাকুয়েশনের হিড়িকে সহর কলিকাতার বুক যখন অর্দ্ধেকের উপর খালি হইয়া গেল, মৃগাঙ্কর তখন ভয় হইল! জোর করিয়া বিধবা মা এবং ভাইবোনদের বহুকালের পরিত্যক্ত পল্লী-ভবনে পাঠাইয়া সে এখানে রহিল একা। রহিল অবশ্য চাকরির দায়ে।

তিন-বছরের চাকরি। ইভাকুয়েশনের দৌলতে উপরের দু'-তিন ধাপ হইতে লোক সরিয়া গেলে টক্ করিয়া মৃগাঙ্কর হইল প্রোমোশন্ ষাট টাকা হইতে একেবারে একশো টাকা মাহিনায়।

মৃগাঙ্কর তরুণ বয়স। এই বয়সে একশো টাকা মাহিনা···জাপানী বোমার ভয় মন হইতে মিলাইয়া গেল! চোখে সে দেখিল ভবিষ্যৎ রঙে-রঙে রঙীন!

মৃগাঙ্ক থাকে ভবানীপুরের বাড়ীতে,—সঙ্গে ভৃত্য দামু। একাধারে সে ভৃত্য, পাচক এবং সুখ-দুঃখের সহচর। মৃগাঙ্কর এখনো বিবাহ হয় নাই। বিবাহের কথা চলিতেছিল; সে-কথা পাকিবার উপক্রম করিয়াছে এমন সময় সাইরেনের ভেঁপু বাজিয়া উঠিল! কাজেই বিবাহের কথা সিকায় তুলিয়া পাত্রীর পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন! পাত্তা দিয়া যান্ নাই; সুতরাং বিবাহের সম্ভাবনা কোন্ সুদূর ক্ষণে তিরোহিত হইয়াছে!

বন্ধুদের মধ্যে কেহ পলাতক, কেহ বা নানা কারণে বাহিরে যোগ্য আশ্রয়ের অভাবের জন্য কিম্বা পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ্য-মোচনার্থে কলিকাতায় রহিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় যারা আছে, তাদের মধ্যে বন্ধু উমাকান্তর নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—কারণ ক্রমশঃ-প্রকাশ্য!

বৈশাখ মাস। ক'মাসে কলিকাতার পথের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে,—রূপে-রসে বেশ রমণীয়তার সমাবেশ ঘটিয়াছে। মৃগাঙ্ক তাহাতে বিমুগ্ধ। পেট্রোলের ট্যাঙ্কে চাবি পড়িয়াছে, কাজেই ট্রামে-বাসে অসূর্য্যম্পশ্যা বঙ্গ-ললনাদের সহজ এবং নিঃসঙ্কোচ বিচরণ সহরের পথ-চারণাকে এমন কমনীয়তায় ভরিয়া তুলিয়াছে যে, মৃগাঙ্কর মনে মাঝে মাঝে বিভ্রম জাগে—এ সত্য? না, স্বপ্ন? না, মায়া? আধুনিক উপন্যাসের ক'খানা ছেঁড়া পাতা যেন বৈশাখী বাতাসে চোখের সামনে উড়িয়া বেড়াইতেছে! ট্রামে-বাসে যাইতে আঁচলের বাতাস গায়ে লাগে, মৃগাঙ্ক ভাবে···

অনেক কথা ভাবে!

সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঐ ময়দান···কার্জ্জন গার্ডনস্···এস্প্লানেড···সিনেমা-হাউসগুলার লাউঞ্জ···রকমারি শাড়ীর অঞ্চল-বীজনে, হাসি-কথার ঝাপটায় সহর যেন মায়াপুরীতে রূপান্তরিত হইয়াছে!

সে-দিন সন্ধ্যার পর গম্ভীর মুখে মৃগাঙ্ক আসিল উমাকান্তর গৃহে···রেডিয়ো-সেট্ খুলিয়া উমাকান্ত শুনিতেছিল অর্কেষ্ট্রা।

মৃগাঙ্ক আসিয়া নিঃশব্দে বসিল। তার মুখে চিন্তার কালো ছায়া···দেখিয়া উমাকান্তর মনে কৌতূহল জাগিল! উমাকান্ত কহিল—ব্যাপার কি মৃগাঙ্ক? বাড়ী থেকে কোনো দুঃসংবাদ এলো না কি? না, অফিসে সাহেবের খিঁচুনী?

একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া মৃগাঙ্ক কহিল—না।

—তবে?

মৃগাঙ্ক বলিল—তুমি তো বিয়ে করেছো উমাকান্ত···

হাসিয়া উমাকান্ত বলিল—নিশ্চয়! এবং স্ত্রীর গরবে আমি গরবী!

মৃগাঙ্ক বলিল,—হুঁ···নারী-চরিত্র সম্বন্ধে তাহলে তোমার খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে, নিশ্চয়!

কথা শুনিয়া উমাকান্ত অবাক্! মুখে বলিল—নারী-চরিত্র কি সহজ বস্তু, ভাই! উপনিষদ্ পড়ে তার অর্থ যদি বা বুঝতে পারি, কিন্তু নারী-চরিত্র?···তবে হ্যাঁ, নারী-চরিত্রে বর্ণ-পরিচয় সবে মাত্র আরম্ভ করেছি, তা অস্বীকার করবো না···এখনো 'ঐক্য'-'বাক্য' পাঠ পর্য্যন্ত এগুতে পারিনি!

মৃগাঙ্ক বলিল—ওতেই হবে!···আচ্ছা, বলতে পারো সম্পূর্ণ অপরিচিতা তরুণী···ট্রামে তাঁর সঙ্গে নিত্য ক'দিন দেখা হচ্ছে···তাঁকে আমি ভালো করে জানতে চাই! তার উপায়?

উমাকান্ত বলিল—তার মানে, তাঁর নাম-ধাম-পরিচয় জানতে চাও? না, তাঁর মন জানতে চাও?

মৃগাঙ্ক বলিল—সব আমি জানতে চাই। বলতে পারো কি করে জানা যায়? অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় ক'দিনই দেখা হচ্ছে···ট্রামে তিনি লেডিজ শীটে বসেন···ভিড় ঠেলে আমি ট্রামে উঠে দাঁড়াই ঠিক তাঁর পিছনে! বাঁধা টাইম···সন্ধ্যা ছটায় আমি উঠি ডালহৌসি স্কোয়ারে···দেখি, তিনি বসে আছেন লেডিজ্ শীটে। কালীঘাটের ট্রাম···তিনি নামেন বকুলবাগানের মোড়ে···ভিড় সরিয়ে তাঁর জন্য আমি পথ ক্লীয়ার করে দি'।

উমাকান্ত বলিল—কিন্তু তোমার তো নামবার কথা জোগুবাবুর বাজারের মোড়ে···যেহেতু তোমার বাড়ী পদ্মপুকুরে! অতখানি পথ তোমার এগিয়ে যাবার হেতু?

মৃগাঙ্ক বলিল—আমি এগিয়ে যাই তার মানে, তাঁর জন্য! মানুষগুলো ট্রামে প্যাসেজ জুড়ে এমন ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে···সব রীতিমত অসভ্য···তাই তাঁর নামতে অসুবিধা হয়! তিনি ক'দিন লক্ষ্য করেছেন, ট্রাম থেকে নামবার সময় তাঁর পথ কি ভাবে আমি ক্লীয়ার করে দি'। আমিও লক্ষ্য করেছি, তাঁর দুই চোখে কেমন একটু যেন···কিন্তু ভয়ে আমি এমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি যে, তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি মেশবামাত্র আমার চোখে চারিধার কেমন ঝাপ্‌সা হয়ে আসে! তাঁর তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের কোনো সাড়া কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পাইনি! বলতে পারো কি করলে বুঝতে পারবো তাঁর মনোযোগ আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে···এবং ভাষায় তিনি তা প্রকাশ করবেন কবে?

উমাকান্ত বলিল—খুব সহজ উপায় আছে। ভয়ে তুমি অমন কুণ্ঠিত হয়ো না। ট্রাম থেকে নামবার সময় তুমি যখন পথ ক্লীয়ার করে দেবে, তোমার পানে তখন তিনি তো একবার চেয়ে দেখেন, বললে,—সে সময় অর্থাৎ তোমার চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হবার আগে তুমি ধাঁ করে একটু হেসো···যাকে বলে মৃদু হাসি! অর্থাৎ অধর-প্রান্তে হাসির বিদ্যুৎ-শিখা! বুঝলে?

কথা শুনিয়া মৃগাঙ্ক কি যেন ভাবিল···দু'মিনিট। তার পর একটা *নিশ্বাস চাপিয়া বলিল—তাই করবো। এবার একটু হাসবো।···*

পরের দিন অফিসের ছুটীর পর সেই বাঁধা টাইম···অপরাহ্ণ ছটায় মৃগাঙ্ক আসিয়া ডালহৌসি স্কোয়ারে কালীঘাটের ট্রামে উঠিল···এবং উঠিয়া দেখে, নিত্যদিনের মতো সে-ট্রামে লেডিজ্ সীটে বসিয়া আছেন সেই তরুণী! সারা পথ মৃগাঙ্ক নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিল—আজ উমাকান্তর উপদেশ মানিয়া চলিবে! সে চাহিয়া রহিল অপরিচিতার পানে···কখন আসিবে বকুলবাগানের মোড়, অপরিচিতা নামিবেন···সে প্যাসেজ ক্লীয়ার করিয়া দিবে! এবং তখন···

এস্প্লানেড, পার্ক-ষ্ট্রীট, লোয়ার সার্কুলার রোড, এল্‌গিন রোড··· সব কটা মোড় পার হইয়া ট্রাম চলিয়াছে। কিন্তু ট্রামে আজ ভিড় নাই। যাত্রীরা সব সীটে বসিয়া···কেহ দাঁড়াইয়া নাই। প্যাসেজ ক্লীয়ার! কাজেই মৃগাঙ্কর আজ ওয়ালটার র‍্যালের ভূমিকাভিনয়ের প্রয়োজনও নাই!

কি মনে হইল···মনের মধ্যে যে-যুদ্ধ চলিয়াছিল, বুঝি তাহারি বেয়নেটের খোঁচা লাগিল!···মৃগাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইল লেডিজ সীটের ঠিক পিছনে।

এলগিন রোডের মোড় ছাড়িয়া ট্রাম চলিল···কণ্ডাক্টর বলিল—সীট খালি রয়েছে, বসুন স্যর···প্যাসেজে দাঁড়াবেন না। ইন্‌স্পেক্টর দেখলে আমার নামে রিপোর্ট করবে।

মৃগাঙ্কর গা ছমছম্ করিয়া উঠিল! ট্রামের কামরায় ক'জন যাত্রী কণ্ডাক্টরের কথায় তাহারি পানে চাহিয়া আছে! সে বলিল—একটু আগেই আমি নামবো!

বন্ধু উমাকান্তর গৃহে আসিয়া মৃগাঙ্ক রিপোর্ট দাখিল করিল।

শুনিয়া উমাকান্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—আচ্ছা, এঁর বিবাহ হয়েছে? না, কুমারী?

মৃগাঙ্ক বলিল—কি করে তা বলবো? তাঁর সঙ্গে আমার আলাপই হলো না মোটে!

উমাকান্ত বলিল—বাঙালীর ঘরের মেয়ে···আলাপ না হলে এটুকু বুঝতে পারো না? মুখ্যু কোথাকারের! তাঁর সীঁথেয় সিঁদুর দেখেছো?

মৃগাঙ্ক অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল! তার পর বলিল—কৈ, সীঁথেয় সিঁদুর দেখেছি বলে তো মনে হয় না! যত দূর মনে পড়ছে, সিঁদুর যেন দেখিনি!

উমাকান্ত বলিল—তাহলে কথা কয়ে ফ্যালো! সাহস আনো মনে! রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' পড়েছো নিশ্চয়! সেই চিরকুমার সভায় পূর্ণ যেমন বলেছিল—গড়ের মাঠে বেলুন উড়েছিল দেখেছেন? তেমনি ধরণের একটা কথা···

মৃগাঙ্ক বলিল—কিন্তু বেলুন এখন ওড়ে না। প্লেন ওড়ে··· অসংখ্য। প্লেনের কথা বলা চলে না।···আচ্ছা, কি কথা বলবো, বলতে পারো?···মানে, সে-কথার একটা মানে থাকা চাই তো!

উমাকান্ত বলিল—মানেওলা যে-কথা বলতে চাইছো, সে-কথা দুম করে গোড়ায় বলে বসা ঠিক হবে না! প্রথমে যা-তা কথা বলে ফ্যালো। তার মানে যত না থাকে, ততই ভালো! মানে, মানে-না-থাকা কথায় চট্ করে ওঁদের যেমন সিম্প্যাথি পাওয়া যায়, *অর্থযুক্ত কথায় তার সিকির সিকি সিম্প্যাথি মেলে না।*

এ কথা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কাজ করিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলিল—ঠিক হয়েছে। জিজ্ঞাসা করবো, আপনাদের পাড়ায় কাল রাত্রে সাইরেন বেজেছিল, শুনেছিলেন?

উমাকান্ত বলিল—কিন্তু সাইরেন তো সত্যি বাজেনি মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক বলিল—না বাজুক, ঐ সাইরেনই হলো আজকালকার মোষ্ট ইন্‌টারেষ্টিং টপিক! ঐ সাইরেন ধরে নানা কথা উঠতে পারে···ওঁর বাড়ীর কথা···উনি এখানে কেন আছেন···কোথায় আছেন···ইভাকুয়েট করেননি কেন···এমনি নানা কথা।

উমাকান্ত বলিল—এই তো, তোমার ইন্‌স্পিরেশন এসেছে, দেখছি!···আচ্ছা, তিনি দেখতে কেমন?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলিল,—মোষ্ট চার্মিং! মানে, যে-সব বাঙালী মেয়েদের পথে-ঘাটে হামেশা এখন ছাখো—কারো বিপর্য্যয় স্থূল বপু···কারো বা অস্থিসার দেহ···মুখে কেউ জ্যাবড়া করে রঙ মাখে···ইনি তাদের কারো মতো নন্! এঁর রূপ-লাবণ্য আর তারুণ্য···সে-সব বিধাতা এঁকে দেছেন যেন ম্যাথেমেটিক্স্ কষে··· নিক্তির ওজনে! কোথাও এ-সবে এক-তিল কম-বেশী হয়নি।

উমাকান্ত বলিল,—বটে! তা হলে অসামান্যা! সাহস করে সাধনায় লেগে যাও, বন্ধু! জানো তো none but the brave···

মৃগাঙ্কর বুকের মধ্যে যেন হাজার দীপের ঝাড় জ্বলিয়া উঠিল··· সে আলো তার দুই চোখে প্রদীপ্ত ছটায় উদ্ভাসিত হইল!

পরের দিন ট্রামে আবার দেখা। ট্রামে আজ খুব ভিড়। ঠেলিয়া-ঠুলিয়া মৃগাঙ্ক আসিয়া দাঁড়াইল লেডিজ্ সীটের পিছনে। মন বলিল, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—

> অলি বারম্বার ফিরে যায়
> অলি বার-বার ফিরে আসে,
> তবে তো ফুল বিকাশে···

এ-কথা কি মিথ্যা? এই যে বারে-বারে আমাদের দেখা হইতেছে, ইহার কি কোনো গভীর অর্থ নাই? এমন তো পূর্ব্বে কখনো হয় নাই! কেন এখন এমন ঘটিতেছে? ট্রামে তো কত লোক যায়-আসে···এত লোকের মধ্যে দু'জনের এই একই ট্রামে নিত্য যাওয়া-আসা···একই সময়ে···নিশ্চয় ইহাতে চতুর বিধাতার কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে!

এস্‌প্লানেড! ট্রাম ছাড়িয়া দু'পা চলিবামাত্র সামনে কি উপসর্গ বুঝি, ড্রাইভার কষিয়া ব্রেক্ টানিল। দাঁড়ানো-প্যাসেঞ্জারের দল গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি লাগাইয়া একটা বিপর্য্যয় ব্যাপারের সৃষ্টি করিল। এ ঠোকাঠুকির জন্য মৃগাঙ্ক প্রস্তুত ছিল না···হুমড়ি খাইয়া পড়িল সে এমন ভাবে যে তার মাথা ঠুকিয়া গেল অপরিচিতার মাথার সঙ্গে। অপরিচিতা তার পানে চাহিল···দু'চোখে যেন অগ্নি-দৃষ্টি! মৃগাঙ্ক ভয়ে একেবারে এতটুকু! সবিনয়ে কোনো মতে বলিল,—মাপ করবেন।

অপরিচিতার কাণে সে-প্রার্থনা পৌঁছিল কি না, বুঝা গেল না। ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া তার মধ্য হইতে ছোট আয়না বাহির করিয়া

অপরিচিতা নিজের কেশগুলা ঠিক করিয়া লইল। মৃগাঙ্ক পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল যেন শুষ্ক কাঠ! তার মনের মধ্যে ছিল যে আবেগ-রস-ধারা, অপরিচিতার দৃষ্টির আগুনে সে ধারা শুষিয়া লইয়াছে!

পার্ক ষ্ট্রীট···কোনো মতে মৃগাঙ্ক নিজেকে আবার ঠিক করিয়া তুলিয়াছে। উমাকান্তর উপদেশ মনে জাগিতেছে, সাহস আনা চাই···None but the brave···বলিবে না কি সেই সাইরেনের কথা?

থিয়েটার রোডের মোড় পর্য্যন্ত মনের সঙ্গে বহু তর্কাতর্কি চলিল। তার পর মুখ নামাইয়া অপরিচিতার কাণের কাছে মুখ আনিয়া হুম্ করিয়া সে বলিয়া বসিল,—কাল রাত্রে সাইরেন বেজেছিল আপনাদের পাড়ায়?

কথাটা বলিবামাত্র নিজের সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল···নিজের কাণেই কথাটা অত্যন্ত বিশ্রী—বিসদৃশ ঠেকিল!

এ কথায় অপরিচিতা ফিরিয়া চাহিল মৃগাঙ্কর পানে···মৃগাঙ্কর দৃষ্টির সহিত অপরিচিতার দৃষ্টি মিলিল। মৃগাঙ্ক লক্ষ্য করিল, অপরিচিতার এবারকারের দৃষ্টিতে আগুন নাই! আগুনের বদলে যা আছে, সে কি···মৃগাঙ্ক বুঝিতে পারিল না। সে-দৃষ্টি যেন তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার মতো বিঁধিতেছে···মুখ ফিরাইয়া চাহিল প্যাসেজে-দাঁড়ানো যাত্রীর পানে। যাত্রীর হাতে একটা থলি···থলির মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া আছে কতকগুলা শাক-পাতা।···

বকুলবাগানের মোড়ে অন্য দিনকার মতো মৃগাঙ্ক প্যাসেজ ক্লীয়ার করিয়া দিল। ক্লীয়ার প্যাসেজ দিয়া অপরিচিতা নামিল ট্রাম হইতে···মৃগাঙ্কর পানে ভুলিয়াও আজ চাহিয়া দেখিল না। নিমেষের জন্য না!

সন্ধ্যার পর উমাকান্তর কাছে আসিয়া মৃগাঙ্ক রিপোর্ট পেশ করিল। বলিল—সাইরেনের কথায় রাগ করেছেন হয়তো। নাহলে প্যাসেজ ক্লীয়ার করে দেবার সময় আজ একবার নোটিশও করলেন না আমায়! শী রাদার ইগনোর্ড মী।

গম্ভীর কণ্ঠে উমাকান্ত বলিল,—হুঁ···

মৃগাঙ্ক বলিল—এখন তুমি কি পরামর্শ দাও?

উমাকান্ত বলিল—তোমাকে নিয়ে তিনি খেলা করছেন!

—তার মানে?

—তার মানে তিনি বুঝেছেন তুমি ওঁর ভয়ঙ্কর অনুগত হয়ে পড়েছো! এক-ট্রামে রোজ দেখা···হয়তো উনি ভেবেছেন, তুমি তাগ্ করে' থাকো ওঁর ট্রামের প্রত্যাশায়!

উমাকান্ত চুপ করিল।

উমাকান্তর কথায় অনেকখানি সাসপেন্স।

মৃগাঙ্ক বলিল—কথাটা শেষ করো! তুমি বুঝছো না হাউ আই ফীল্!

উমাকান্ত বলিল—আমি খুব বুঝছি মৃগাঙ্ক! এক কাজ করতে পারো?

উৎসাহভরে মৃগাঙ্ক বলিল—বলো···একটা কি, আমি লক্ষ কাজ করতে পারি···একেবারে সহস্রবাহু হয়ে। কি কাজ তুমি করতে বলো আমাকে?

উমাকান্ত বলিল—তাঁর সঙ্গে ছাতা থাকে?

স্মৃতির গহন হাতড়াইয়া মৃগাঙ্ক বলিল—না।

উমাকান্ত বলিল—ঠিক হয়েছে! তুমি ছাতা নিয়ে বেরোও?

মৃগাঙ্ক বলিল—না। ছাতা নিলেই হারাই। অনেক ছাতা হারিয়েছি। তাই ছাতা আর নিই না।

উমাকান্ত বলিল—কাল থেকে ছাতা নিয়ে বেরুবে! নতুন একটা ছাতা কেনো। যা-তা ছাতা নয়···একটু ফ্যাশনেব্‌ল্ হয় দেখতে, এমন ছাতা!

মৃগাঙ্ক বলিল—ছাতা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে?

উমাকান্ত বলিল—বুঝছো না, বোশেখ মাস···সন্ধ্যার সময় হঠাৎ এর মধ্যে যদি কালবোশেখীর দুর্য্যোগ নামে, তিনি তো ছাতা নিয়ে বেরোন না···তোমার ঐ ছাতা ধরে তাঁর মাথা বাঁচিয়ো··· তাহলেই···আঃ···চমৎকার আইডিয়া!

নিজের আইডিয়ার চমৎকারিত্বে উমাকান্ত এতখানি বিমুগ্ধ হইল যে, এইখানেই তার কথা বন্ধ হইয়া গেল···কিছুক্ষণ তার মুখে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না!

মৃগাঙ্ক ভাবিতে লাগিল।···

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—মোষ্ট রিমোট পশিবিলিটি!···এ বছর যদি কালবোশেখী না নামে?

উমাকান্ত বলিল—কালবোশেখী নামবে না কি? আলবৎ নামবে! ল অফ্ নেচার! তোমার সঙ্গে নেচার নিশ্চয় নিষ্ঠুর তামাসা করবে না!

দু'চোখের সামনে মৃগাঙ্ক দেখিল যেন নৈরাশ্যের অকূল পাথার! ভাবিল, উমাকান্ত পাগল—নহিলে কালবৈশাখীর উপর নির্ভর করিতে বলে···অর্থাৎ দৈব? বিশেষ ইন্ সিরিয়াস্ এ্যাফেয়ার্স অফ্ দী হার্ট!

উমাকান্ত বলিল—অপেক্ষা তোমাকে করতেই হবে! নিরাশ হচ্ছো কেন? স্যর ওয়ালটার র‍্যালের ভাগ্য খুলেছিল বৃষ্টি-ভেজা কাদা-মাটার দৌলতে। আর এ হলো বাঙ্‌লা দেশ···এবং বোশেখ মাস। বোশেখ মাসে এ দেশে চিরকাল ঝড়-বৃষ্টির বিপর্য্যয় উৎপাত ঘটে···তোমার বেলায় নেচারের ল' যাবে উল্টে? তা যদি ভাবো, তাহলে ইউ মাষ্ট বী এ গ্রেট্ ফুল!

উপায় কি! কালবৈশাখীর উপর নির্ভর করিতেই হইবে! সভ্য জগতে বাস···আইন-কানুনের রাজ্য···এ যুগে অপরিচিতার কাছে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করার অন্য উপায়ও যখন নাই···

অবশেষে আকাশের মেঘের করুণা হইল। চার দিন পরে কাল-বৈশাখী নামিল। অফিস হইতে বাহির হইয়া মৃগাঙ্ক দেখে, সারা আকাশ মেঘে অন্ধকার! মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিল, দুর্য্যোগ চাহিয়া! তার জানা সমস্ত ঠাকুর-দেবতাকে ডাকিল···ডাকিয়া প্রার্থনা জানাইল···ট্রামে যেন তাঁকে দেখি, আর ট্রামে ওঠবার পরে ঢালিয়ো জল, আকাশ ফাঁশাইয়া কলিকাতা-সহরের বুকে···সহরকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া একশা করিয়া দাও!

ডালহৌসি স্কোয়ারে ট্রাম। লেডিজ্ শীটে সেই অপরিচিতা! কালো মেঘ আকাশের বুকে এখনো অটুট রহিয়াছে···আকাশের কোনো কোণ এখনো জমাট মেঘের চাপে একটুকু ফাঁশে নাই!

মৃগাঙ্ক বলিল—ঠাকুর, ঠাকুর এইবার···

লালদীঘি ঘুরিয়া ট্রাম আসিল গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সামনে···

ট্রামের ক'জন প্যাসেঞ্জার উচ্চকণ্ঠে মা-কালীকে ডাকিতে সুরু করিয়াছে,—ডিপোয় ট্রাম পৌঁছুবার আগে পর্য্যন্ত জলটুকুকে আকাশের বুকে ধরিয়া রাখো ঠাকুর···তার আগে জল ঢালিয়ো না!

মৃগাঙ্ক চমকিয়া উঠিল! কাউণ্টার-প্রার্থনা! মনে মনে সে ডাকিতে লাগিল, মেঘের বুকে যত জল আছে, আর দেরী নয় প্রভু··· ঢালো, ঢালো···এবার ঢালো!

পরম ভক্তিভাজন এবং অতি-গম্ভীর ঠাকুর-দেবতা হইলেও তাঁদের কৌতুকবোধ এখনো এ-যুগে ক্ষয় পায় নাই! কৌতুক দেখিবার জন্য দেবতারা আকাশের একটা কোণে খোঁচা দিয়া আকাশ ফাঁশাইয়া দিলেন! মৃগাঙ্কর ট্রাম তখন লাট-সাহেবের বাড়ীর সামনে ঘুরিয়া এসপ্লানেডের পথ ধরিয়াছে···মুষলধারে বর্ষণ সুরু হইল রমরম্ করিয়া!···মৃগাঙ্কর মনের মধ্যে যেন ব্যাণ্ড, কনসার্ট, ঢাকের বাদ্য,—একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল! বৃষ্টির জলে অসম্ভব তোড়। মৃগাঙ্ক যে প্রার্থনা জানাইয়াছিল, তাই! অর্থাৎ কলিকাতা সহর বুঝি এ জলে ডুবিয়া ভাসিয়া একশা হইবে!

যাত্রীদের মনে বিপুল ত্রাস। ট্রাম চলিয়াছে বৃষ্টির মধ্য দিয়া, যেন নদীর বুকে ষ্টীমার চলিয়াছে!···নদীর জলে যেমন ঢেউ ওঠে, পথের জলে তেমনি ঢেউ! সে ঢেউয়ের দোলায় মৃগাঙ্কর বুক দুলিতে লাগিল।

থিয়েটার রোডের মোড় পার হইবার পর বেগ একটু কমিল! জোগুবাবুর বাজারের পর আরো একটু···

তার পর চড়কডাঙ্গার মোড়ের পর বকুলবাগানের মোড়! বৃষ্টি পড়িতেছে···তোড় এখন অনেক কম!

ভয়ে ভয়ে অপরিচিতা বাহিরের পানে চাহিল। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃগাঙ্ক ট্রামের দড়ি ধরিয়া টানিল—প্যাসেঞ্জ ক্লীয়ার করিয়া দিল। শাড়ী চাপিয়া-ধরিয়া জড়ো-সড়ো মূর্ত্তিতে অপরিচিতা ট্রাম হইতে নামিল।

মৃগাঙ্ক আজ আর ট্রামে দাঁড়াইয়া রহিল না। সেও নামিল বকুলবাগানের মোড়ে। বৃষ্টির ফোঁটা···তার মনে হইতেছিল, ও যেন ফোটা ফুলের রাশীকৃত পাপড়ি! আকাশের দেবতারা সহরের বুকে আজ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন!

নামিয়া ছাতা খুলিয়া মৃগাঙ্ক বলিল অপরিচিতাকে উদ্দেশ করিয়া—ভিজবেন না। আপত্তি না থাকলে আমার ছাতা···

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাতা খুলিয়া সম্পূর্ণ ভাবে আগাইয়া সে অপরিচিতার মাথায় ধরিল···নিজে ভিজিয়া কাদা।

অপরিচিতা বলিল—আপনি যে ভিজে ঢোল হয়ে গেলেন!

মৃগাঙ্ক বলিল—আমার ভেজা অভ্যাস আছে। আপনারা··· মানে···কোথায় যাবেন আপনি?

অপরিচিতা বলিল—আমি যাবো টাউনশেণ্ড রোডে।

মৃগাঙ্ক বলিল,—ও! আমিও ঐ দিকে যাবো। তাহলে এ ছাতা আপনি মাথায় দিন।

অপরিচিতা বলিল—আপনি?

মৃগাঙ্ক বলিল—আমার কিছু হবে না।

অপরিচিতা বলিল—দু'জনেই তাহলে ছাতা শেয়ার করি, আসুন।

এমন সৌভাগ্য···দু'জনে পাশাপাশি চলিবে! বিপুল উল্লাসে মন বলিল,—ঠাকুর, তুমি আছো!

টাউনশেণ্ড রোডে একটা বাড়ী দেখাইয়া অপরিচিতা বলিল—ঐ বাড়ীতে আমি যাবো!

বাড়ীর নম্বর মৃগাঙ্ক লক্ষ্য করিল, বলিল—আপনার বাড়ী!

অপরিচিতা বলিল,—না, আমার বাড়ী নয়। এ বাড়ীতে আমি গান শিখতে আসি। গানের ক্লাশ হয়···রোজ। বাঁধা টাইম।

—ও! কিন্তু গান শিখে এর পর বাড়ী ফিরবেন কি করে?

অপরিচিতা বলিল—বৃষ্টি যদি না থামে, একখানা রিকশ নিয়ে যাবো। না হয় আরো অনেকে গান শিখতে আসে, তাদের কারো গাড়ীতে।

মৃগাঙ্কর মনে হইতেছিল সে বলে, বাড়ী আপনার কোথায়? কিন্তু বলিতে পারিল না। কি মনে করিবেন! সাইরেনের কথা বলিয়া চোখে যে অগ্নি-দৃষ্টি দেখিয়াছে, আজ বর্ষার জলে আগুন নিবিয়া সে দৃষ্টি স্নিগ্ধ হইয়াছে! এ স্নিগ্ধতার উপর আবার যদি আগুন জ্বলিয়া ওঠে? সে শুধু বলিল—আচ্ছা, নমস্কার।

অপরিচিতা বলিল—নমস্কার! নমস্কার! আমার অজস্র ধন্যবাদ জানবেন!

কণ্ঠে যেমন উচ্ছ্বাস, চোখের দৃষ্টিতে তেমনি প্রীতি বিগলিত! মৃগাঙ্ক মুগ্ধ হইল। ও-দৃষ্টির জন্য বৃষ্টিতে ভেজা কি, সে বোধ হয় অথৈ সাগরের জলে ডুব দিতে পারে।

রিপোর্ট শুনিয়া উমাকান্ত বলিল—কেমন···বলেছিলুম তো··· শুধু একটি ছাতা···কালবোশেখী নামা পর্য্যন্ত ওয়েট করো! আজ দেখলে তো?

গদগদ কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলিল—হুঁ···কিন্তু এর পর?

উমাকান্ত বলিল—এর পর ট্রামে এ আলাপটুকু জমিয়ে ঘন করে তোলো। তবে এ-সব ব্যাপারে ধৈর্য্য চাই! আর তার সঙ্গে সময়! টাইম এ্যাণ্ড পেসেন্স উড্ ডু ওয়াণ্ডার্স। এ-কথা মনে রেখো।

—নিশ্চয় মনে রাখবো।

একটু একটু করিয়া আলাপ জমিল।

শনিবারে মৃগাঙ্ক বলিল—রবিবারেও আপনি গান শিখতে যান?

অপরিচিতা বলিল—না। রবিবারে ছুটী।

মৃগাঙ্ক বলিল—সিনেমা আপনার কেমন লাগে?

দু'চোখে উল্লাস! অপরিচিতা বলিল—চমৎকার।

—যাবেন কাল? একখানা ভালো বিলিতি ছবি দেখাচ্ছে। আমি কাল যাবো ভাবছি। তবে একা···ছবি তেমন ভালো লাগে না! আপনি যদি যান···

অপরিচিতা বলিল—বেশ। কটার শো?

মৃগাঙ্ক বলিল—সন্ধ্যা ছটা।

—বেশ!···কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

মৃগাঙ্ক বলিল—আপনি বলুন···

অপরিচিতা কি ভাবিল, ভাবিয়া বলিল—কালীঘাট ট্রাম ডিপোয় আমি আসবো। স' পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। কেমন?

মৃগাঙ্ক বলিল—এ কথা তাহলে পাকা!

—নিশ্চয়।

মৃগাঙ্ক বলিল—আমি দু'খানা সীট রিজার্ভ করে রাখবো!

—বেশ।

সিনেমা! ইন্টারভালের সময় বয় আসিয়া সামনে দাঁড়াইল··· ট্রেতে চকোলেট, কোল্ডড্রিঙ্ক, আইসক্রীম···

মৃগাঙ্ক কিনিল দু' প্লেট আইসক্রীম।

অপরিচিতা বলিল—কেন আবার বাজে খরচ করছেন?

মৃগাঙ্ক বলিল—আপনার তেষ্টা পায়নি?

অপরিচিতা বলিল—তা পেয়েছে···মিথ্যা বলবো না।

—আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ!

দু'জনের হাতে আইস-ক্রীমের প্লেট···

মৃগাঙ্ক বলিল—একটা কথা···মানে, আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগে!

অপরিচিতা বলিল—কি?

—আমার অফিস আছে···ছুটীর পর ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে রোজ ট্রাম ধরি···বাঁধা টাইম। কিন্তু আপনাকেও ঐ ট্রামে রোজ দেখি···আপনার বুঝি একেবারে ঘড়ি ধরে ট্রামে বেড়াতে বেরুনো অভ্যাস?

অপরিচিতা বলিল—না, আমিও চাকরি করি। ছুটী হয় পাঁচটায়। অফিস থেকে বেরিয়ে কারেন্সি-অফিসের সামনে ট্রামে উঠি।

—কোথায় চাকরি করেন, জানতে পারি?

অপরিচিতা বলিল—এ-আর-পীতে!

—ও!

পরের দিন মৃগাঙ্ক আসিয়া রিপোর্ট দিল উমাকান্তকে—কাল সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলুম···গিয়েছিলেন।···কথা হলো···বললেন, চাকরি করেন।

উমাকান্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিল···বলিল—তার পর?

—তার পর আর কি!

—মনের কথা তুমি বললে যে, তুমি তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছো? ভয়ঙ্কর রকম ভালোবাসা!

লজ্জায় মৃগাঙ্কর কাণ-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। মৃদু-কণ্ঠে সে বলিল,—না।

—সে-কথা বলো।

—বড় লজ্জা করে! মনে হয়, এমন হঠাৎ···দু'দিনের আলাপেই এ কথা···

উমাকান্ত হাসিল, হাসিয়া বলিল—আর বেশী অগ্রসর হবার আগে ওটা বোঝাপড়া করে নেওয়া উচিত। যে দিনকাল পড়েছে, এমন হতে পারে যে, উনি কাকেও ভালোবাসেন। হয়তো তার সঙ্গে ওঁর বিবাহের কথা ঠিক হয়ে আছে। তা যদি হয়, তাহলে তোমার পক্ষে আর বেশী অগ্রসর হওয়া···মানে, যার নাম চার-তলা বাড়ী থেকে ধুপ্‌ করে হবে নীচেয় পতন!

এ কথা মৃগাঙ্কর মনে জাগে নাই। এখন জাগিল; এবং এ কথা মনে জাগিতে মন মুহূর্ত্তে এতটুকু হইয়া গেল!

উমাকান্ত বলিল—স্পষ্ট ভাষায় না বলে বলতে পারো তো যে, তুমি নিঃসঙ্গ···বিবাহের জন্য সঙ্গিনীর সন্ধান করছো···এমনি নানা কথা আর কি!

মৃগাঙ্ক বলিল—দেখবো চেষ্টা করে'?

উমাকান্ত বলিল—হুঁ। নাহলে তুমিই ভেবে ছাখো, তিনি যদি আর কারো বাক্যদত্তা হন, তাহলে তোমার পক্ষে···মানে, বী সিরিয়স্ এ্যাণ্ড প্র্যাকটিক্যাল ইন্ লাভ্! তাহলে মনস্তাপ-অনুতাপ···এ সব উপসর্গ থেকে রক্ষা পাবে!

মৃগাঙ্ক বলিল—যা বলেছো!

সেদিন ট্রামে দেখা।

অপরিচিতাই আগে কথা কহিল। বলিল—আজ যাবেন সিনেমায়?

—আপনার গানের ক্লাশ?

—মিউজিক-টীচারের অসুখ···তাই আজ ছুটী। অফিসে বসে ভাবছিলুম, আপনার সঙ্গে দেখা হলে বলবো আপনি যদি সিনেমায় যান!

মৃগাঙ্কর মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সে বলিল—বেশ···

—আপনার কোনো অসুবিধা হবে না?

—না।

—কাজের কোনো ক্ষতি?

—না···না।

অপরিচিতা বলিল—কিন্তু একটা অনুরোধ···

—বলুন···

অপরিচিতা বলিল—আজ আমি টিকিট কিনবো।

মৃদু হাস্যে মৃগাঙ্ক বলিল—আমার সেদিনকার টিকিটের শোধ?

অপরিচিতা হাসিল, বলিল—শোধ নয়,···এমনি। মানে, আজ মাইনে পেয়েছি কি না। আমার নিমন্ত্রণে আজ আপনি যাচ্ছেন সিনেমায়, তাই।

—বেশ···

দু'জনে সিনেমায় আসিল। অপরিচিতা কিনিল দু'খানা টিকিট।

ইনটারভ্যালে মৃগাঙ্ক দিল আইসক্রীমের দাম।

তার পর সিনেমা ভাঙ্গিল সাড়ে আটটায়।

মৃগাঙ্ক ভাবিল, কথাটা এবার বলিবে? কিন্তু পথে সে-কথা বলা চলে না! তার চেয়ে···

মৃগাঙ্ক বলিল—আমার একটি মিনতি আছে···

অপরিচিতা বলিল—তা অত সঙ্কোচ করছেন কেন? আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে···আপনি বন্ধু···যা বলবার, বলুন।

মৃগাঙ্কর মনের মধ্যে রঙমশালের আলো! বন্ধুত্ব! সে বলিল—যদি কোনো রেস্তরায় যাই এখন? ধরুন, ক্যাশানোভা কিম্বা মোণিকা?

অপরিচিতা যেন শিহরিয়া উঠিল! বলিল—ও···না, না। আজ আর হয় না। মানে, সাড়ে আটটা বেজে গেছে···রাত নটার মধ্যে আমাকে বাড়ী পৌঁছুতেই হবে। না হলে আমার স্বামী অস্থির হয়ে উঠবেন। এই কনডিশনে আমাকে তিনি একলা বেরুতে দেছেন।

স্বামী! মৃগাঙ্কর মনে হইল, তার মাথায় সবলে কে যেন লাঠি মারিয়াছে!

সে বলিল—আপনার স্বামী! কিন্তু এ কথা তো কোনো দিন বলেননি যে আপনার বিবাহ হয়েছে! যে আপনি···মানে, আপনার স্বামী আছেন!

অপরিচিতা বলিল—না বলায় আমাদের বন্ধুত্বে কোনো অসুবিধা হয়েছে কোনো দিন? আপনার ভদ্রতা আর সৌজন্য দেখে এ-কালের-আপনাদের সম্বন্ধে আমার কি মস্ত বড় ভুলই ভেঙ্গে গেছে! আমার স্বামীকে আমি বলি যে ওগো, আমি এক জন বন্ধু পেয়েছি···তোমাদের বয়সী···কি চমৎকার তাঁর ভদ্রতা!

মৃগাঙ্কর বুকের উপর দিয়া যেন ষ্টীম-রোলার চলিতেছে···

অপরিচিতা বলিল,—তার চেয়ে আমার সঙ্গে আসুন আমার ওখানে। আমার স্বামী বলেন, তোমার বন্ধুকে এক দিন নেমন্তন্ন করে এখানে আনো ···আপনি তো এখানে একলা থাকেন, বলেছেন··· সো লোন্‌লি···আসুন আমার সঙ্গে আমাদের ওখানে!···

মৃগাঙ্ক কোনো কথা বলিল না।

অপরিচিতা তার হাত ধরিল, বলিল,—না, আমি শুনবো না! আপনাকে টেনে নিয়ে যাবো। বেশী দূরে নয়, উল্টো দিকেও নয়। ভবানীপুরে আমাদের বাড়ী···ল্যান্সডাউন রোড।

মৃগাঙ্কর মুখে কথা নাই!

অপরিচিতা বলিল—আপনি তো থাকেন পদ্মপুকুরে। আমাদের বাড়ী পদ্মপুকুর থেকে পাঁচ-সাতখানা বাড়ীর পর। উমাকান্ত রায়ের নাম শুনেছেন? প্রোফেশর?

মৃগাঙ্কর পিঠে যেন চাবুক পড়িল!

অপরিচিতা তাকে ধরিয়া টানিল···বলিল,—আসুন···

মৃগাঙ্ক বলিল—মাপ করবেন। আজ থাক। কাল বরং যাবো। আজ মানে, মাথাটা বড্ড ধরে রয়েছে···বেশীক্ষণ বসতে পারবো না ···তার চেয়ে কাল বরং···

অপরিচিতা বলিল—এ-কথা তাহলে পাকা? বেশ হবে। কালও আমার গানের ক্লাশ নেই···ছুটী। অফিস থেকে দু'জনে এক-ট্রামে তো ফিরি···আপনি আমার সঙ্গে আমাদের ওখানে যাবেন। ঐখানেই কাল রাত্রে খাবেন। বাড়ীতে চাকরকে বলে আসবেন। আমিও সেই বন্দোবস্ত করবো। আমার স্বামী খুব খুশী হবেন আপনাকে পেলে। আমার কাছে আপনার কথা শুনে রোজ তিনি বলেন, তোমার বন্ধুকে এক দিন আনো। আপনার উপর তাঁর ভয়ঙ্কর রিগার্ড। আপনারো তাঁকে ভালো লাগবে···নিশ্চয়।

মৃগাঙ্ক বলিল—আপনাকে তাহলে ধরে রাখবো না···নটায় আপনার এ্যাটেণ্ডান্স। আমার একটু দেরী হবে···মানে, মিউনিসিপাল মার্কেটটা একবার ঘুরে যাবো, ভাবছি। সকালে চায়ের সঙ্গে রুটি খাই কি না, তাই রুটি আর মাখন কিনে নিয়ে যাবো।

অপরিচিতা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

মৃগাঙ্ক কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···অনেকক্ষণ!

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাসের সঙ্গে তার গোটা মনখানাই শুধু বাহির হইয়া গেল না, আলো-ভরা পৃথিবীখানাই যেন চোখের সামনে হইতে মুছিয়া গেল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আশাবাদ

দুঃখ শ্রাবণ-শর্ব্বরী যদি না পোহায়
অন্ধ আবেগে তামস চিহ্ন আঁকে,
অশ্রু সুচির সঞ্চিত যদি না শুকায়,
ক্লান্ত বিহগ তিমিরে পক্ষ ঢাকে!
বিশ্ব কি রবে কৃষ্ণ-ছায়ায় গুণ্ঠিত,
নিঃস্ব মলিন ধূসর-ধূলায় কুণ্ঠিত,
কে খুলিবে দ্বার? কে করিবে সুধা লুণ্ঠিত?
পূর্ব্ব-তোরণে উদয়-সূর্য্য হাঁকে।

নিষ্ঠুর-মাঘে যদি ফুল-কলি ঝরে যায়,
শীত-জর্জ্জর পৌষ-মুখর রাতে,
পল্লবদল পিঙ্গল ম্লান মরে যায়
তীক্ষ্ণ কঠোর তুহিন-খড়্গাঘাতে।
বসন্ত পুনঃ জাগিবে ধ্বান্ত আবরি'
চম্পক-রচা দুলাইয়া নব-কবরী,
চিররাধা যাবে যমুনাতে লয়ে গাগরী,
শত সখী সহ সুখ বসন্ত-প্রাতে।

দুয়ারে মৃত্যু করে যদি ঘন করাঘাত,
ভীতি-বিহ্বল আতুর চিত্ত মূরছায়,
মাভৈঃ-মন্ত্র জপ বসি' কবি সারা রাত,
অভয়-শঙ্খ মেঘ-কন্দরে গরজায়!
মৃত্যু আনিবে নব জীবনের জয়-গান,
পৌষ-রজনী নব বসন্তে অবসান,
শরৎ আনিবে শ্রাবণ-অন্তে কলতান,
দুঃখ-সুখের চক্র নিয়ত ঘুরে যায়।

শ্রীসুরেন্দ্র বিশ্বাস (এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল)।

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

২৭

নিমন্ত্রিতের দল আসিয়া রত্নাকে ঘিরিয়া ধরিল। রত্নার নৃত্য আর অভিনয় এত চমৎকার হইয়াছে যে, বিলাতের কোন কোন ফেমশ্ আর্টিষ্টের সহিত রত্নার তুলনা করা চলে! শতমুখে সেই কথা, সেই আলোচনা! তরুণের দল রত্নার সঙ্গ-লাভের জন্য অধীর আকুল হইয়া উঠিল।

কল্পনার কাণে-কাণে অনিল বলিল—ইন্দ্রাণী, আমাদের যশোভাতি উর্ব্বশী ম্লান করে দিয়েছে।

মুখখানা বিকৃত করিয়া কল্পনা উত্তর দিল,—প্রধান ভূমিকাই ওকে দেওয়া হয়েছিল! বরাতে সেটা কোন মতে উতরে গেছে।

অনিল কহিল,—হ্যাঁ, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের তফাৎ নেই! রত্নাকে নিয়ে ওরা একেবারে মত্ত! চলো, আমরা একটু বিশ্রাম করিগে।

অনিল ও কল্পনা ড্রইংরুমের বারান্দায় আসিল। সুদীর্ঘ বারান্দায় সাজানো টবে পাতা-বাহার গাছের ছায়া—খণ্ড খণ্ড স্থানে ম্লান আলো যেন আঁধার রচনা করিয়াছে! তাহারই নিভৃত এক অংশের ছায়া যেখানে সুনিবিড়, সেইখানে আসিয়া কল্পনার হাত ধরিয়া অনিল কহিল,—এখানটা বেশ নির্জ্জন কল্পনা, একদম ভীড় নেই। কথাবার্ত্তা ক'বার পক্ষে চমৎকার জায়গা!

মধুর কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—আমারও আর-পাঁচ জনের সঙ্গ ভালো লাগছে না। ক'দিনের পরিশ্রমে নিজেকে ভারি ক্লান্ত বোধ হচ্ছে অনিল! বলিয়া মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল, একখানা ইজিচেয়ারে আলো-আঁধারে মিশিয়া অমিয় অর্দ্ধ-শয়ান রহিয়াছে। চকিতে অনিলের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাতখানা টানিয়া লইয়া স্বরে উদ্বেগ মিশাইয়া কল্পনা কহিল,—মিষ্টার গোস্বামী এখানে এমন করে' একলা যে!

অমিয় উঠিয়া বসিল, উত্তর দিল,—হ্যাঁ, আমার বিশ্রাম করা হয়ে গেছে! তোমরা বসে গল্প করো। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনিলের মুখ লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিল,—উঠছো কেন দাদা?

—ও-দিকটা একটু ঘুরে আসি। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অমিয় সে স্থান ত্যাগ করিল।

চাঁদের উপর মেঘের আবরণের ন্যায় কল্পনার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুণ্ন দৃষ্টিতে অনিলের দিকে চাহিয়া সে কহিল,—তুমি আমায় এমন অপ্রতিভ করে দিলে! কে জানে, মিষ্টার গোস্বামী এখানে আছেন!

হাসিয়া অনিল কহিল,—তাতে কি হয়েছে! দাদা তো আমাদের দেখেই সরে গেলেন! তিনি তো অবুঝ নন্।

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া কল্পনা কহিল,—যাও! তোমার সব তাতে কেবল ঠাট্টা!

অভিনয়ের ভঙ্গীতে অনিল কহিল,—কোথায় যাবো বলো দেখি? ওধারে উর্ব্বশী এখন স্তাবক-পরিবেষ্টিতা—দেবেন্দ্রের তুমিই আশ্রয় শুধু!

ক'দিন ধরিয়া বসিবার ঘরে চায়ের টেবলে,—অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনার তুমুল ঝড় বহিল। গোস্বামী সাহেব গর্ব্বিত-কণ্ঠে কহিলেন,—কেমন লীলা, আমি তোমায় বলেছিলুম রত্নার কথা। দেখলে, সে কেমন কোহিনূর!

হাসিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তা আমি স্বীকার করি। তোমার জন্যেই সে-দিন এতটা সাকসেসফুল হলো!

চা খাওয়া শেষ হইল।

উঠিবার সময় অমিয় কহিল,—আজ দু'টোর গাড়ীতে আমি যাচ্ছি মা।

গোস্বামী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন,—আজই! কেন? তোমার ছুটী তো এখনও দু'দিন রয়েছে। বলিয়া পুত্রের পানে চাহিলেন।

টেবলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অমিয় কহিল,—এখানটা আর আমার ভালো লাগছে না। শুধু অপেক্ষা করছিলুম আপনার বার্থডের জন্য! সে তো হয়ে গেছে! বলিয়া হাসিয়া সে আবার কহিল,—আর সবচেয়ে আনন্দের মধ্যেই সেটা হয়েছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পিতা কহিলেন,—আজ তাহলে তোমার যাওয়া স্থির?

—হ্যাঁ, সকালে উঠেই আমি বেয়ারাকে বলে দিয়েছি সব গুছোতে।

মিসেস্ গোস্বামী নীরবে পিতা ও পুত্রের কথা শুনিতেছিলেন। এতক্ষণে তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন,—তুমি যদি আজই যাবে, তাহলে আগে আমায় সে কথা জানাওনি কেন?

—আগে কিছু স্থির ছিল না। আজ ঘুম থেকে উঠেই স্থির করলুম। বলিয়া একটু থামিয়া সে কহিল,—এতে অসুবিধার কিছু নেই তো।

গম্ভীর মুখে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—একটু আছে বই কি। এ-কথা জানলে আমি কল্পনাদের আজ নিমন্ত্রণ করতুম না। সে, তার বৌদিদিরা, তবে সুশীল—সন্ধ্যার পর সবাই আসবে।

মৃদু হাস্যে অমিয় কহিল,—তাতে তো ক্ষতি নেই। আমি যাচ্ছি বেলা দু'টোর গাড়ীতে।

—কিন্তু তুমি তো জানতে, তারা আসবে! মিসেস্ গোস্বামী প্রদীপ্ত চক্ষে পুত্রের পানে চাহিলেন। কহিলেন,—তুমি আমায় স্পষ্ট জানিয়ে যাও অমিয়, তোমার ইচ্ছা কি!

—কোন্ বিষয়ে?

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কোন্ বিষয়ের জন্য আমি ব্যস্ত, তুমি জানো না! তুমি হলে বড় ছেলে।

অমিয় নীরব রহিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি আমায় খোলাখুলি জবাব দিয়ে যাও।

অমিয় মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিল। কহিল,—এ বিষয়ে কোন রকম আলোচনা করতে আমি এখন পারবো না মা।

—বুঝেছি। মিসেস্ গোস্বামীর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ!

অমিয়র সুগৌর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। স্তব্ধ ভাবে সে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল।

গোস্বামী সাহেব নির্ব্বাক্ ছিলেন, এইবার কথা কহিলেন। বলিলেন,—কত দিনে তুমি ফিরছো?

অমিয় উত্তর দিল,—আবার এমনি সময়ে।

গোস্বামী সাহেব একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—এক বছরের মধ্যে তোমার আসার সম্ভাবনা তাহলে নেই?

অমিয় কহিল,—সম্ভব তাই! বলিয়া পিতামাতাকে অভিবাদন করিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

রত্না এতক্ষণ নির্ব্বাক্ পুতুলের মত বসিয়া ছিল। অমিয় প্রস্থান করিতেই ব্যাকুল কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—অমিয়-দা কি আর এক বছরের মধ্যে আসবেন না—সত্যি?

তাহার ব্যাকুল স্বরে গোস্বামি-দম্পতি তাহার দিকে একবার চাহিলেন; কোন উত্তর দিলেন না। কথা বলিল অনিল। অনিল উত্তর দিল,—দাদা সহজে আসে না। এবার এসে যে এত দিন ছিল, এই যথেষ্ট!

২৮

নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়া টেবলের দিকে ঝুঁকিয়া অনিল কি লিখিতেছিল। অবসর-মত সে সাহিত্যচর্চ্চা করে, নাটক লেখে। অর্জ্জুন-উর্ব্বশী নাটকখানি তাহারই রচনা! এ নাটক সে মায়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছে।

এখন তেমনি পিনে-আঁটা কতকগুলা কাগজপত্র কাটিয়া-কুটিয়া সংশোধন করিতেছিল। সামনের সেল্‌ফে সাজানো মহাভারতগুলার পানে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

ঘরে ঢুকিবার দরজা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। তাই পর্দ্দা ঠেলিয়া কে এক জন যখন ঘরে ঢুকিল, অমিয় তার কিছুই জানিতে পারিল না। যে আসিল, তাহার পদবিক্ষেপ লঘু—তাই মেঝেয় পাতা কার্পেটের উপর এতটুকু শব্দ হইল না। যে আসিল, সে একেবারে অমিয়র পিঠে মৃণাল বাহুর দুই কর-পল্লব স্থাপিত করিয়া ডাকিল,—অমিয়-দা—

ভীষণ চমকিয়া অমিয় ফিরিয়া চাহিল। প্রচণ্ড বিস্ময়ে কহিল,—এ কি! রত্না! তুমি! ইহা ছাড়া আর কোন ভাষা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পূর্ব্বে রত্না কোন দিন অমিয়র এ ঘরে প্রবেশ করে নাই। বসিবার ঘরে, বারান্দায়, লাইব্রেরী-ঘরে অমিয় রত্নার সহিত আলাপ করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, বসিয়া গল্প জুড়িয়াছে! কিন্তু নিজের ঘরে কখনো নয়। তথাপি এমন করিয়া বিনা-প্রশ্নে প্রবেশ-অনুমতি না লইয়া রত্না এমন অনাহূত ভাবে তাহার ঘরে প্রবেশ করিবে, এই অসঙ্গতি অমিয়কে অবাক্ করিয়া দিল! এবং এই রীতি-গর্হিত কাজটা তাহার চিত্তকে বিচলিত করিলেও নিজেকে সংযত করিয়া অমিয় কহিল,—কি হয়েছে রত্না? তোমার মুখ-চোখ অমন কেন? কেঁদেছো না কি? বসো—বসো।

ক্রন্দন-বিবশা রত্না কহিল,—না, বসবো না। আগে তুমি বলো, তুমি আজ যাবে না! গভীর মিনতিতে রত্না অমিয়র হাত চাপিয়া ধরিল।

রত্নার দিকে চেয়ারখানা ফিরাইয়া তাহাতে বসিয়া অমিয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাস্যে কহিল,—কেন বল তো, আমাকে ধরে রাখবার জন্য তোমার এত জিদ?

বেদনা-বিজড়িত কণ্ঠে রত্না কহিল,—মাসিমা, মেসোমশাই সকলের ইচ্ছা, তুমি এখানে থাকো! না অমিয়-দা, এত শীগ্‌গির তুমি যেও না। লক্ষ্মীটি, থাকো। বলিয়া সে অমিয়র হাত চাপিয়া ধরিল।

অমিয় নিজের হাতখানা রত্নার কুসুম-পেলব হাতের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া লইল। একখানা চেয়ার টানিয়া রত্নাকে বসিতে দিয়া ধীর স্বরে কহিল,—তুমি ভুলে যাচ্ছ রত্না, আমি পার্থ।

এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে রত্না আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু থামিতে পারিল না। নিজেকে এখন সম্বরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। হিষ্টিরিয়া-আক্রান্ত রোগী যেমন আত্মদমন করিতে পারে না, ধৈর্য্যকে আড়ষ্ট করিয়া ভিতরের বিপুল খেদ মানুষকে যেমন কাঁদায়, ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে, রত্নাকেও যেন তেমনি কিসের উন্মত্ততা ভয়ানক বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল! তাহার বিচার-বোধ তখন বিলুপ্ত।

রত্না কানে যা শুনিয়াছিল, তাহার সে সন্দেহ সত্য! সগোষ্ঠী কল্পনার আজিকার আসার নিবিড় কারণ আছে! আত্মীয়তা-বন্ধনের জন্য কথা পাকা করিবার সাদর আহ্বান! কল্পনা আজ বিজয়িনী! অমিয়র কল্পনা—আজ তাহারি প্রতিশ্রুতি-দান হইবে। এই উগ্র চিন্তা রত্নাকে যেন অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল! মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া বাঁচিবার আকুল প্রচেষ্টায় সে অমিয়র কাছে আসিয়াছে! বুকের মাঝে স্তিমিত দীপশিখার ন্যায় বিশ্বাসের ম্লান একটা আলো এখনো জ্বলে—অমিয়ও রত্নাতে আকৃষ্ট! তাই সে আজ মুখরা, চপলা।

গভীর মিনতি-ভরে রত্না কহিল,—অমি-দা তুমি যেও না—থাকো।

গম্ভীর সুরে অমিয় কহিল,—কেন, তা তুমি বলোনি! অমিয়র কণ্ঠে যেন কৈফিয়ৎ-তলবের সুর!

—বললুম তো! আর কত বার করে বলবো? মাসিমা, মেসোমশাই—সকলের ইচ্ছা।

একটু হাসির সুরে অমিয় কহিল,—সে-কথা তাঁরা আমায় জানিয়েছেন, সে তো তাঁদের কথা! তোমার কথা বলো।

—আমার কথা? রত্না একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—আমার কথা? আমি তোমায় ছাড়তে চাই না! ছেড়ে দেবো না।

অমিয় স্তম্ভিত! ক্ষণকাল নিষ্পলক নেত্রে সে রত্নার শিশির-সিক্ত রক্তোৎপলের মত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এই ক্ষণিক সময়টুকুর মধ্যে বিদ্যুৎ-গতিতে মন কত কি ভাবিয়া লইল! তার পর অতি ধীর শান্ত কণ্ঠে সে কহিল,—না রত্না, তা হয় না!

—কি হয় না? তোমার এখানে থাকা?

অমিয় কহিল,—হ্যাঁ। তুমি এখানে লেখাপড়া শিখতে এসেছো রত্না, লেখাপড়া শেখো! আর তা যদি ভালো না লাগে, তাহলে দেশে ফিরে যাও! আমার কথা শোনো রত্না! অমিয়র স্বরে আকুতি!

প্রচ্ছন্ন শ্লেষ-বোধে রত্না নিমেষে জ্বলিয়া উঠিল। তিক্ত স্বরে কহিল,—তোমাকে ধন্যবাদ! আমার অভিভাবকদের যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি

আছে আমার শুভাশুভ চিন্তা করবার! সেখানে তোমার সদুপদেশ দেবার প্রয়োজন নেই।

অমিয় যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। রত্নার কটূক্তি, অসঙ্গত আচরণ তাহাকে যেন বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। হতভম্বের মত সে শুধু চাহিয়া রহিল।

একটা মাসও পূর্ণ হয় নাই। প্রথম দিন যে-রত্নার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছিল, যে ব্রীড়াবনত-মুখী লজ্জাশীলা নিরীহ-প্রকৃতি রত্নাকে অমিয়র ভালো লাগিয়াছিল, এ কি সেই রত্না? এমন অদ্ভুত আমূল-পরিবর্তন তাহার কি করিয়া ঘটিল? কিছুই যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

মানুষের প্রকৃতিতে যখন একটা ওলট্-পালট্ ঘটে, অন্তরালে যখন ঝড় ওঠে, বন্যা বহে, তখন সেই উন্মত্ততার মাঝে তাহার আসল রূপ এমন বিকৃত হইয়া ওঠে যে, তাহাকে চেনা অসাধ্য হয়! নূতন অনুভূতি তড়িৎ-বেগের মত তীব্র ও দুঃসহ হইয়া মনোজগতে যে মাতন জাগায়, তাহাতে পূর্ব্বেকার শিষ্ট মানুষটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যে বিরল হইবে, ইহা স্বাভাবিক! বিপ্লবের নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, পদ্ধতি নাই, নীতি নাই! অনুশাসনকে দু'পায়ে সে দলন করে—তাই তার ধর্ম্ম! তাই তার নাম বিপ্লব।

রত্নার বুকে তেমনি বিপ্লবের ঝড়, বিদ্রোহের বন্যা বহিতেছিল। অমিয়কে হারাইতে হইবে, এই শঙ্কা যেন ভিতরে ভিতরে তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। যে-অমিয়কে সে সবার অজ্ঞাতে, হয়তো অমিয়রও অজ্ঞাতে নিঃশেষে এমন করিয়া ভালোবাসিয়াছে, সে যে এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া যাইবে তাহা সহ্য করা যেন মৃত্যুর মত! রত্নার নিকট যন্ত্রণাময় বিভীষিকা-পূর্ণ!

সূর্য্যাস্ত-রাগের মত রত্নার রাঙা মুখের পানে চাহিয়া শান্ত স্বরে অমিয় কহিল,—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না রত্না তুমি কি করছো, কি বলছো! তোমার মন সুস্থ নেই।

তীব্র স্বরে রত্না কহিল,—না, সুস্থ নেই। আজ আমি পাগল। আজ আমার সর্ব্বস্ব হারাবার দিন! আমি কেমন করে স্থির থাকবো? তুমি—অমিয়-দা, আমি বিশ্বাস করতুম, তুমি উদার, তোমার বিবেচনা-বোধ আছে। কিন্তু আজ বুঝতে পারলুম, সে মন তোমার মুখোস! আসলে তুমি ভণ্ড—স্বার্থপর—লোভী!

শান্ত কণ্ঠে অমিয় বলিল,—ভণ্ড! লোভী!

কঠিন কণ্ঠে রত্না কহিল,—হ্যাঁ তাই। আমি গরীব বলে তুমি আমায় অবহেলা করলে! কল্পনা জজের মেয়ে, তুমি চাও টাকা, সামাজিক মর্য্যাদা, তাই তুমি আমার হবে না? তুমিই না এক দিন বলেছিলে, আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে, যত দূরেই থাকি যেখানেই থাকি, আমার প্রয়োজন তোমায় জানাবো! নিজেকে কখনো অভাব-গ্রস্ত মনে করবো না!

বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে অমিয় কহিল,—আজও সেই কথা বলছি! তুমি বিশ্বাস করো রত্না, তোমার অর্থ নেই বলে তোমাকে আমি অবহেলা করছি না। আমি তোমার কল্যাণ-কামী!

ব্যঙ্গোক্তিতে রত্না কহিল,—যথেষ্ট! ধন্যবাদ তোমায়? জেনে কৃতার্থ হলুম, তুমি আমার কল্যাণকামী! পরম সুহৃদ্! তোমার বদান্যতা দেখে সুখী হয়ে—কি বলো, কল্পনার দরবারে আমি ভিখিরীর মত হাত পেতে দাঁড়াবো, এই তুমি চাও? না অমি-দা, আমি কাঙাল নই। ভিখিরী নই। অভাব হয়, মাসিমা মেসোমশাই আছেন তাঁরা দেখবেন। তুমি নও!—বলিতে বলিতে রত্না কাঁদিয়া সহস্রধারে যেন ফাটিয়া পড়িল! নিজের দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া মূর্ত্তিমতী বিষাদের মত সে বসিয়া রহিল। এবং তাহার চম্পক-অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া অশ্রু-উৎসের ধারা অমিয়র সম্মুখে বহিতে লাগিল। একান্ত নিরুপায় দৃষ্টিতে, বিবর্ণ মুখে সামনের আসনে ভাস্বর-মূর্ত্তির ন্যায় অমিয় নিশ্চল বসিয়া সেই ক্রন্দন-বিবশা প্রতিমার পানে চাহিয়া রহিল।

সেই সময়ে দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া মিসেস্ গোস্বামী ঘরে প্রবেশ করিলেন; এবং রত্না ও অমিয়কে তদবস্থায় দেখিয়া সামনে সাপ দেখার মত ভীষণ চমকিয়া দু'পা তিনি পিছাইয়া গেলেন।

২৯

কঠোর কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী ডাকিলেন,—রত্না—

চমকিয়া রত্না মুখ তুলিল। অশ্রু-লাঞ্ছিত মুখের উপর হইতে শোণিতের শেষ-বিন্দু অবধি সরিয়া মৃতের মত সে মুখ যেন সাদা হইয়া গিয়াছে।

অমিয় চকিত হইয়া ফিরিয়া কহিল,—মা—

শ্লেষের সহিত মিসেস্ গোস্বামী কহিল,—অতি অবাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে আমি এসেছি! না?

নিমেষে অমিয়র মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। অবিচলিত কণ্ঠে কহিল,—না। অবাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে নয়—এখনই আসার দরকার ছিল।

রত্নার পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তোমার বাবা এসেছেন তোমায় নিতে। তোমার মার অসুখ। অফিস্-কামরায় তিনি আছেন। যাও।

রত্না উঠিয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী পুত্রের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—আমি কৈফিয়ৎ চাই অমিয়! এমন সময়ে রত্না তোমার এ ঘরে কেন?

মায়ের দিকে চেয়ারখানা ঠেলিয়া দিয়া অমিয় কহিল,—তুমি বসো, আমি বলছি।

মিসেস্ গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন।

অমিয় কহিল,—রত্না আমাকে বোঝাতে এসেছিল আমি যেন আজ না যাই! এই কথা বলতেই ও এ ঘরে এসেছিল।

বিদ্রূপের স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—রত্নার এত মাথা-ব্যথার কারণ? ওর এত অনুরোধ কেন?

অমিয় কহিল,—আমিও সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। ও জবাব দিলে, মাসিমা, মেসোমশাই যখন ক্ষুণ্ণ হবেন—

—তুমি তার কি উত্তর দিলে?

—আমি? অমিয়র মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইল। সে কহিল,—আমি বললুম, তোমার এ অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব? মিসেস্ গোস্বামীর সুরে ব্যঙ্গের আভাস! অমিয়র মনের ভিতরটা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে তপ্ত বাতাসের ঝাপটা-মারার মত জ্বালা করিয়া উঠিল। সযত্নে সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল,—আমি যদি থাকতুম, তোমার নিষেধই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অন্য কারও উপরোধ দরকার হতো না! কিন্তু আমি তো থাকবো না।

—কেন থাকবে না, জানতে পারি অমিয় ?

অবিচল কণ্ঠে অমিয় কহিল,—পারো। আজ তুমি কল্পনাদের নিমন্ত্রণ করেছো! আমায় না জিজ্ঞেস করেই যে কথা তুমি দিয়েছ, তারা স-গোষ্ঠী আসবে সেই কথা প্যাকা করে নিতে! কিন্তু আমার পক্ষে তা একেবারে অসম্ভব!

ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অসম্ভব কিসে ?

দৃঢ়-স্বরে অমিয় কহিল,—হ্যাঁ, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন মতেই এ প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি না। কাল সারারাত আমি এই নিয়ে অনেক ভেবেছি! এই আমার সিদ্ধান্ত মা। কোন মতেই কোন অনুরোধ-উপরোধে এর নড়-চড় হবে না? আমি তোমাকে মিনতি কচ্ছি—তোমরা আমায় অনুরোধ করো না।

মিসেস্ গোস্বামী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বুদ্ধি-বিবেচনায় চিরদিন তাঁর গভীর আস্থা। এমন ধীর প্রকৃতি শান্ত স্বভাব গম্ভীর তীক্ষ্ণধী পুত্রের জননী বলিয়া মনে মনে তাঁহার গর্ব্ব ছিল। কিন্তু সেই একান্ত প্রিয় পুত্র অকস্মাৎ যখন তাঁহার মতের সহিত প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতে বসিল, তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি হতবাক্ হইয়া জড়ের মত ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বুদ্ধি যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল! চিন্তাশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

মিসেস্ গোস্বামীর অন্তরের আশার বর্ত্তিকা—অমিয় শেষ অবধি পরাভব স্বীকার করিবে! সংসারে স্বামী-পুত্র তাঁহার একান্ত বশীভূত! আর অবস্থা একান্ত সঙ্গীন হয়, অমিয় নিতান্ত বাঁকিয়া থাকে তো তিনি স্বামীর সাহায্য লইবেন। সেখানে তাঁহার এই চিরদিনের বিনয়ী পুত্র ট্যাঁ-ফোঁ করিতে পারিবে না।

'কিন্তু এখন বুঝিলেন, অমিয়র সঙ্কল্প ধনুকভাঙা পণের মতই সুদৃঢ়। মিসেস্ গোস্বামী কিছুক্ষণের জন্য হতবাক্ হইয়া রহিলেন। চোখের সামনে যেন আশায় গড়া সাত-তলা বাড়ীখানা ভূমিকম্পের দুঃসহ আঘাতে হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী মুখ তুলিলেন। জবাবদিহি চাওয়ার সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কল্পনা কি তোমার চেয়ে কোন অংশে খাটো ?

অমিয় নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল,—আমি তো তা বলিনি।

—তবে তোমার এমন সুদৃঢ় আপত্তির অর্থ আমি কি বুঝবো ?

শান্ত স্বরে অমিয় কহিল,—আমার ভালো লাগল না। কেবল এই।

মিসেস্ গোস্বামী উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। পর্ণকুটীরবহুল পল্লীতে আগুন লাগার ন্যায় মনের ভিতরটা চক্ষের নিমেষে হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—তবে কি ভালো লাগে রত্নাকে ?

অমিয়র গায়ে যেন কাঁটার চাবুক পড়িল। আহত স্বরে সে ডাকিল,—মা—

মিসেস্ গোস্বামী তখন দারুণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলের এই বেদনা-বিদ্ধ স্বরে তিনি কর্ণপাত না করিয়া ঘৃণার সহিত কহিলেন,—তুমি জেনো অমিয়, তুমি যদি সারাজীবন বিয়ে না করো, তবু রত্নাকে বিয়ে করবার অনুমতি আমি দেবো না। আর যদি জোর করে বিয়ে করো, জানবো, আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই! তুমি বাপ-মার মর্য্যাদা রাখলে না।

অমিয়র মুখ সাদা হইয়া গেল। জননীর কটূক্তিপূর্ণ তিরস্কার তাহার জীবনে এই প্রথম! তথাপি নিজের সহিষ্ণুতার জোরে আত্মদমন করিয়া শান্ত স্বরে সে কহিল,—এ তুমি কি বলছো মা!

মিসেস্ গোস্বামীর মনে তখন প্রচণ্ড ক্রোধ সাপের মত ফুঁশিয়া গর্জ্জন করিতেছে! অগ্নি-চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—আমি সব বুঝি। এই জন্যেই তুমি রত্নাকে মোটরে নিয়ে যেতে! তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস কর্‌তুম না! ভাবতুম, অমিয় আমার ভালো ছেলে! এখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, অমিয় তা নয়!

অমিয়র মুখের মত কণ্ঠস্বরও বিষাদ-গম্ভীর। সে কহিল,—আমি মন্দ ?

উত্তেজিত কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—হ্যাঁ, নিশ্চয়! প্রমাণ হলো বৈ কি! তাই তুমি কল্পনাকে বিয়ে করতে পারবে না—পালিয়ে যাচ্ছো! জেনে রেখো, কল্পনা আমার পুত্রবধূ হবেই! আমার কথার নড়চড় নেই! তুমি আমার এক ছেলে নও অমিয়!

অমিয় উত্তর দিল,—বেশ তো, তাতে আমি সুখী হবো। সে-দিন আশীর্ব্বাদ করতে আসবো।

মধ্যাহ্নে বিদায়-প্রাক্কালে অমিয় মাতৃ-সন্নিধানে আসিয়া জননীর পদধূলি লইল।

মিসেস্ গোস্বামী কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। হাতটা শুধু মাথায় ঠেকাইয়া সংসার-খরচের খাতা দেখিতে ব্যস্ত রহিলেন।

একটু অপেক্ষা করিয়া,—চল্লুম মা, বলিয়া অমিয় মাতৃকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতার লাইব্রেরীতে আসিয়া ঢুকিল।

গোস্বামী সাহেব রাশীকৃত পুস্তক লইয়া জটিল মামলার কূট অর্থ অন্বেষণ করিতেছিলেন। অনিল এবং আর এক জন তরুণ ব্যারিষ্টার তাঁহার সহকারি-রূপে এ কাজে সাহায্য করিতেছে।

পুত্রকে দেখিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—চল্‌লে!

প্রণাম করিয়া পুত্র কহিল,—হ্যাঁ।

অনিল মুখ তুলিল। কহিল,—দু'টো পঁয়তাল্লিশে গাড়ী না ?

—তাই।

—কিন্তু আর একটা ছিল,—আটটা দশে।

একটু হাসিয়া অমিয় কহিল,—হ্যাঁ। সেটাতে গেলে অনেক রাত্রে গাড়ী চেঞ্জ করতে ঝঞ্ঝাট—ভোর বেলায় নামা!

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তা ঠিক! যাওয়াই যখন স্থির, তখন এইটেতে যাওয়াই ভালো! অত রাত্রে নামা-ওঠায় ঝক্কি লাগে। আমি এই সুন্দরলালের পুষ্যি ক্যানসেলের কেসটা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। মানুষ যে কেন পুষ্যি নেয়,—বুঝি না। একটা খুনো-খুনী কাণ্ড ঘটে গেল।

গমন-উদ্যত অমিয় কহিল,—দুধের তেষ্টা ঘোলে মেটায়।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—ঠিক বলেছো! যত ঝঞ্ঝাট জড়ায় সেইখানে। ভগবান্ যা দেন্‌নি, জোর করে তা তৈরী করতে গেলে ফল হয় বিপত্তি বরণ করা!

জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের সহিত করমর্দ্দন করিয়া কনিষ্ঠের পিঠ চাপড়াইয়া অমিয় ঘরের বাহিরে আসিল। মোটরের ফুটবোর্ডে পা দিতে দুই চোখের কোণ সজল হইল। ত্রস্তে রুমালে চোখ-মুখ

মুছিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়িল,—দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর দিকে। মনে হইল, গাছগুলার পিছনে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। শাড়ীর একটা অংশ যেন দৃষ্টিগোচর হইল। গাড়ী হইতে নামিয়া অমিয় বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইল। দেখিল, রত্না নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

অমিয়র পদশব্দে মুখ তুলিতেই চারি চক্ষে মিলন হইল।

—মাপ করো অমিয়-দা,—তুমি আমায় দেখতে পাবে বুঝতে পারিনি! বলিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। ধীর পদ-বিক্ষেপে আসিয়া মোটরে উঠিল। গাড়ী ষ্টার্ট দিল। অমিয় মুখ ফিরাইয়া গৃহের পানে চাহিল। দৃষ্টিতে পড়িল গর্ভধারিণী মা গবাক্ষ ধরিয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছেন! মুখ তাঁহার অন্ধকার! মাথা নাড়িয়া অমিয় জননীকে অভিবাদন জানাইল।

৩০

দিন কয়েক পরেই অমলার পীড়ার উপশম হইল। রমেশ কহিলেন,—চলো রত্না, তোমায় রেখে আসি।

নির্জ্জীবের মত অমলা বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। অনুরোধের স্বরে কহিলেন,—আর দু'টো দিন থাকুক না!

বিরক্তির সহিত রমেশ কহিলেন,—পার্সেণ্টেজ সর্ট পড়ছে। ক'দিন কলেজ কামাই হলো!

—কিন্তু আজ যে ভরা অমাবস্যা গো!

—রাখো তোমার অমাবস্যা! কি ভেদ-বমি হলো না হলো, ওগো খুকীকে দেখাও গো, আমি আর বাঁচবো না! হুঁ, মানুষের অন্তর্জ্জলী হবার সময়েও কেউ অমন করে বলে না যে মরে যাবো! কৈ, মরতে পারলে না তো! তখন তেরস্পর্শ, অমাবস্যা, প্রতিপদ শুনতে পাইনি তো!

অমলা নীরব রহিলেন। বিসূচিকার আক্রমণ তেমন নিদারুণ হয় নাই; মৃত্যু গ্রাস করিল না! এজন্য অবশ্য সে অপরাধী, কতকগুলা অর্থব্যয় করিয়া বাঁচিয়া উঠিল!

গর্ভধারিণীর জন্য রত্না বার্লি প্রস্তুত করিতেছিল! মুখ তুলিয়া সে বলিল,—আজকের দিনটা—

—তবে থাক! কিন্তু বলে দিলুম, তোমার মা'টিকে চেনো না, ও আবার প্রতিপদের হাঙ্গামা তুলবে।

বিরক্ত হইয়া দুর্ব্বল কণ্ঠে অমলা কহিল,—ঘাট মানচি—তুমি নিয়ে যাও তোমার মেয়েকে। মরণ হলেও আর ডাকবো না।

—না, ডেকো না! তোমার মুখে জল দিতে ও আসতে পারবে না। নে খুকী, আজই তোর জামা-কাপড় গুছিয়ে নে।

ডাক দিয়া হরিশ উঠানে আসিল।—রত্না সরস্বতী কোথায় রে? এ কি রত্না, তুই উনুনের সামনে!

রত্না যেন ভয়ানক কি অপকর্ম্ম করিয়াছে, এমনি বিস্ময় তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ফুটিল।

—না কাকাবাবু, রান্নাবান্না নয়। মার জন্যে বার্লি করছি।

—কেন, ও-বাড়ীতে বলে পাঠালেই হতো।

—বামুন পিসী রান্না করে! এ আর কি এমন! কাকিমা আবার ব্যস্ত হবেন।

—না গো মা-লক্ষ্মী, কিছু ব্যস্ত নয়। তোমার কাকিমার হাড় রেঁধে রেঁধেই পেকেছে। হ্যাঁ রত্না, তোর কাকিমা দুঃখ করছিল, মেয়ে এলো, তা একবার দেখা করলে না!

বিস্মিত রমেশ প্রশ্ন করিলেন,—তুই ও-বাড়ী যাস্‌নে রত্না?

লজ্জাবতী লতার ন্যায় রত্না যেন কুঁচকাইয়া গেল। কহিল,—কিছু আনা হলো না তাড়াতাড়িতে। পূজোর বন্ধে যখন আসবো—

হরিশ হাসিলেন।—দূর পাগলী—নাই বা জিনিস হলো—তবু তোকে দেখলে—হ্যাঁ রত্না, থিয়েটার তো করলি! আপিসে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পড়লুম—তাতে তোর খুব সুখ্যাতি দেখলুম।

রমেশ ব্যস্ত কণ্ঠে কহিলেন,—এ্যাঁ, দেখলে না কি? আরে আমায় বলতে হয়! না হয় একখানা কাগজ কিনে আনতে, দাম কি আমি দিতুম না? না হরিশ, অত কঞ্জুষ-বৃত্তি ভালো নয়!

ভ্রাতার কথায় হরিশ লজ্জায় যেন এতটুকু হইয়া গেল। মাথা চুলকাইয়া কহিল,—হ্যাঁ, ইয়ে—আমার মাথায় অতটা এই—যাকে বলে ষ্ট্রাইক করেনি।

ক্ষুন্ন কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—ইস্‌, তারিখটা মনে আছে? ডেট্‌ না পেলে কাগজ সংগ্রহ করবো কি করে? একটা কাটিং রাখবো। আর কি-কি লিখেছে?

—রত্নার খুব সুখ্যাতি। সাধনা বোসের সঙ্গে তুলনা করেছে। অফিস্‌-শুদ্ধ লোক আমায় ঘিরে ধরলে! বলে, এ্যাঁ, হরিশ বাবু, মিস্‌ রত্না বোস আপনার ভাইঝী! বলেন কি?

গর্ব্বিত দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া আনন্দ-বিগলিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—হুঁ, বুঝলে না, সেটা কলকাতা—আর্টের কদর তারা বোঝে।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়! এ কি আমাদের পাড়া-গাঁ? গুণের মধ্যে পরের কুচ্ছো! কাজ বলতে দল-পাকাপাকি! তা ওদের গ্রুপ্‌-ফটোও যে বেরিয়েছে।

আনন্দে বালকের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে রমেশ কহিলেন,—তাই না কি! এ্যাঁ সত্যি?

রত্না পিতার সেই আনন্দ-দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া উৎফুল্ল স্বরে কহিল,—আচ্ছা বাবা, আমি যখন পূজার সময়ে আসবো—সব ফটো এক কপি করে আনবো।

পিতা কহিলেন,—আরও ছবি তোলা হয়েছে না কি তোমাদের?

বার্লিটা জুড়াইতে জুড়াইতে রত্না কহিল,—হ্যাঁ, আমরা যে যে অভিনয় করেছি, সকলকার ছবিই উঠেছে। আবার অভিনয় করছি, সে-ছবিও উঠেছে।

—ইস্‌, বলিস্‌ কি! বলিয়া পিতা অবাক্‌ হইয়া কন্যার মুখের পানে চাহিলেন।

খুল্লতাত হরষিত কণ্ঠে কহিলেন,—এবার তোর পরিচয়েই আমাদের পরিচয় দিতে হবে!

উভয় ভ্রাতাই হরষিত!

মধ্যাহ্নে সারা গ্রাম তোলপাড় করিয়া রমেশ কন্যার বিজয়বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া গৃহে ফিরিয়া অপরাহ্নে দুহিতাকে ডাকিয়া কহিলেন,—খুকী, তোর একখানা চিঠি রে। দেবু হরকরা দিয়ে গেল।

পিতার হাত হইতে পত্র লইতে হাত বাড়াইতেই রত্নার বুকখানা দুলিয়া উঠিল! এ পত্র? না, অসম্ভব! তা কেন হইবে?

খামখানা হাতে করিয়া গৃহে আসিয়া সে হস্তাক্ষরের পানে চাহিল। হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত পত্র খুলিয়া দিবা-অবসানে গৃহের স্বল্পালোকের জন্য সে সরিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল ; এবং আগে পত্র-লেখকের স্বাক্ষরটা পাঠ করিল। পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিল! অলক রায়! যে সেই নারদ মুনি সাজিয়াছিল! সে কেন রত্নাকে চিঠি লিখিল?

রুদ্ধ নিশ্বাসে রত্না পত্র পড়িল। বিস্ময়ের সহিত খানিকটা অসঙ্গতি মনে জাগিল।

অলক লিখিয়াছে,—

প্রিয় উর্ব্বশী

নারদ কলহপ্রিয় হলেও স্বর্গ-মর্ত্ত্যের খবর আদান-প্রদানে সে ছিল ওস্তাদ। আমার পত্র তোমায় আশ্চর্য্য করলেও বিরক্ত করবে না। কারণ দূতের কাছ থেকেই সংবাদ নিতে হয়। তোমাদের নৃত্য-কলা সে-দিন যে বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়েছিল, তারই শব্দ-রোলে আমরা বিমোহিত। সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি, প্রার্থনা নিবেদন করছি—আমাদের বন্যা-রিলিফের জন্য যে অভিনয় আয়োজন চলছে, তার নৃত্য-ভূমিকাতে তোমাকে চাই। আর কত দিন বনবাসে থাকবে? অমরাপুরী অন্ধকার হয়ে আছে। এসো ফিরে এসো উর্ব্বশী ইতি

নৃত্যমুগ্ধ

নারদ (অলক রায়)।

পত্র হাতে বিমূঢ়ের মত রত্না ক্ষণকাল বাতায়ন-পথে সন্ধ্যায় বিলীয়মান রক্তালোকের পানে চাহিয়া রহিল।

অমলা এ পাশ ফিরিয়া আবিষ্টের মত কন্যাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন,—কার চিঠি রে?

রত্না মুখ ফিরাইল। তাহার মুখে গোধূলির আলোক-রাগ!

সে কহিল,—কলকাতার এমনি চিঠি। তোমায় বালি দিই মা।

অমলা বুঝিল, কথাটা কন্যা এড়াইয়া গেল! দুর্ব্বল দেহ—অল্পেই মনে অভিমান হয়! অনাসক্ত থাকিতে চায়।

ক্ষুব্ধ অভিমানে অমলা অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিলেন,—দাও।

পেটের মেয়েও যদি মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে সংসারের ভালো-মন্দয় কিসের আসক্তি!

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

পি, ডবলিউ, ডি

নহি দেশ-নেতা, দশের কর্ত্তা, তাহাতে নাহিক ক্ষতি—
আমরা রয়েছি তবুও সতত দেশেরি কার্য্যে ব্রতী।
করি সুন্দর, করি নিরাপদ
দশের লাগিয়া গড়ে দিই পথ,
দুর্জ্জয় নদী বাঁধি সেতু দিয়া শিশু করে গতায়তি।

পাহাড়ের গায়ে সুরঙ্গ কাটি, সোপান গিরির শিরে,
স্তম্ভ বসাই পদ্মার বুকে, দমি দুর্দ্দম নীরে।
ঘন-অরণ্যে গিরি-সঙ্কটে,
পাগলা-ঝোরার নেহাৎ নিকটে,
বিপদ মরণ তুচ্ছ করিয়া ভ্রমিতেছি ঘুরে ফিরে।

দেশকে আমরা সজ্জিত করি, সুশোভিত মনোরম,
জন-সেবা তরে সদা উন্মুখ প্রস্তুত, সক্ষম।
সাড়া দিই মোরা সবার ডাকেই,
রূপ দিয়ে ফিরি কল্পনাকেই,
কঠিন লইয়া কারবার করি অবসর বড় কম।

আমরা জাতির গৌরব গড়ি, উন্নত করি দেশ,
স্থপতিতে রাখি যুগের কৃষ্টি, প্রতিভার উন্মেষ!
মৌর্য্য মোগল গ্রীক ও রোমান
যুগের যুগের শ্রেষ্ঠ যে দান,
হূণ ও গথের সেরা অবদান করি হেথা সমাবেশ।

প্রতি পথে, প্রতি দেউলে, সৌধে, রেখে যাই ভালবাসা,
অনাগত কত যুগের মানব করিবে যে যাওয়া-আসা।
কত আনন্দ কত উৎসব
অনুরঞ্জিত করিবে এ সব,
আমরা তখন কোন্ দূরে রব শেষ করে কাঁদা-হাসা!

কর্ম্মই করি, অধিকার নাই মোটেই কর্ম্ম-ফলে।
রচিয়া এবং সাজাইয়া গৃহ মোরা দূরে যাই চলে।
জনতার ধারা ধরে যেই পথ,
সরে যাই মোরা ছোট ভগীরথ
পাতাইয়া উপনিবেশ, নিজেরা ত্যাগ করি সিংহলে।

আমরা মোদের সৃষ্টির পানে যখন ফিরাই আঁখি,
হেরি অপূর্ব্ব চারুতা তাহার বিমোহিত হয়ে থাকি।
উহাতে মোদের কতটুকু দাবী,
হাত ধরে কে যে গড়ায় তা ভাবি,
পাষাণে রচিয়া ভক্তি-অর্ঘ্য রেখে যাই তাঁরি লাগি!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভাস্কর রায় ও শাক্তাদ্বৈত-বাদ

মহামতি ভাস্কর রায় (১) বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শাক্ত দার্শনিক ও সাধক। শক্তি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে স্বীয় অতুলনীয় গ্রন্থ 'বরিবস্যা-রহস্যে' তিনি সংক্ষেপে বহু বিষয় অতি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। শাক্তাগম-সম্প্রদায়ের রহস্য অবগত হইতে হইলে তাঁহার এই গ্রন্থখানি সর্বাগ্রে আলোচ্য।

শ্রুত্যুক্ত নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়-নির্ব্বিকার-নিরবয়ব-নিরবদ্য-নিরঞ্জন পরম ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। ইনি সকলের আত্মরূপে প্রসিদ্ধ। ইনি অতি মহান্—মহতো মহীয়ান্—ভূমা। দেশ বা কাল ইঁহার ইয়ত্তা-পরিচ্ছেদে সমর্থ নহে। ইনি সর্ব্বদা অনাবৃত আত্মস্বরূপ-জ্যোতিঃ (২)।—ইহাই উপনিষদ্‌গুলির সার মর্ম। এখন এ বিষয়ে তান্ত্রিকী প্রক্রিয়া কি—তাহা ভাস্কর উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন।

'আমি ইচ্ছা করি', 'আমি জানি'—ইত্যাদি বাক্যে যে জ্ঞান উহার অন্তরে উত্তমপুরুষ-একবচন (অর্থাৎ 'আমি') ভাসমান থাকে। এই জ্ঞান স্ফুরণাত্মিয় (অর্থাৎ স্বপ্রকাশ)। এই জ্ঞানই তন্ত্রের 'প্রকাশ'-নামক ব্রহ্ম-স্বরূপ। ঐ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বকর্তৃত্ব-পূর্ণত্ব-ব্যাপকত্বাদি-শক্তি-সম্বলিত। ব্রহ্মের স্বরূপ—সৎ-চিৎ-আনন্দ। ইহার মধ্যগত আনন্দ-রূপ অংশই 'স্ফুরণ', 'পরাহন্তা' 'বিমর্শ', 'পরা', 'ললিতা', 'ভট্টারিকা', 'ত্রিপুরসুন্দরী', ইত্যাদি পদ-দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'বিরূপাক্ষ-পঞ্চাশিকা'র 'বিশ্বশরীর-স্কন্ধে' বলা হইয়াছে—'ঈশ্বরতা, কর্তৃত্ব, স্বতন্ত্রতা ও চিৎস্বরূপতা—এইগুলি অহন্তার পর্য্যায়রূপে সজ্জনগণ-কর্তৃক কথিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ 'অহন্তা'-পদের বাচ্য মহাশক্তি ঐশ্বর্য্যময়ী, কর্তৃস্বরূপিণী, স্বতন্ত্রা ও চিদ্রূপা বলিয়াই একবাক্যে সকল শাক্তাগমে কথিত হইয়া থাকে—ইহাই ভাস্করের উক্তির তাৎপর্য্য (৩)।

এই 'পরাহন্তা' ব্যতিরেকে 'ইদন্তা'র স্ফুরণ দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ—'ইদং'-পদ-বাচ্য দৃশ্য বিষয়সমূহ এই 'পরাহন্তা'-পদ-বাচ্য মহাশক্তির সাহায্যেই দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া থাকে। এই কারণে তান্ত্রিকাগমের সিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু 'অহং'-বোধ ('আমি'—এই জ্ঞান) ও ইদং-বোধ ('এই'—এবম্প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞান) পরস্পর সম্বদ্ধ, অতএব 'ইদং'-পদ-গম্য দৃশ্য-পদার্থ-সমূহ 'অহংতা-রূপ' শক্তি-দ্বারা অথবা তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম-দ্বারা জনিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ—এক কথায় দৃশ্য বিষয়সমূহ শক্তির পরিণাম। অথবা, এ কথাও বলা চলে যে—শক্তি পরাহন্তা, শক্তিমান্ ব্রহ্ম, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—অতএব দৃশ্য বিষয়সমূহ সশক্তিক ব্রহ্মেরই পরিণাম। বামকেশ্বর-তন্ত্রে ইহাই বলা হইয়াছে—'সেই শক্তির পরিণাম স্বীকার করিলে আর তদতিরিক্ত অপর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'। অর্থাৎ—শক্তির পরিণাম এই দৃশ্য জগৎ—ইহাই তান্ত্রিক-সিদ্ধান্ত বটে। তথাপি এ কথা মনে করা উচিত নহে যে, দৃশ্য প্রপঞ্চ শক্তি-পরিণাম হয় হউক, শক্তি ব্যতীত ব্রহ্ম অপরিণত অবস্থায় থাকেন—তাঁহার কদাপি পরিণাম হয় না। কারণ, তান্ত্রিক-সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। শক্তির পরিণাম হইলেই শক্তিমান্‌ও সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হইয়া যান। শক্তি হইতে অতিরিক্ত শক্তিমান্ অপরিণত অবস্থায় থাকেন—এরূপ কখনও সম্ভব হয় না (৪)।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—'সকল বিকারই বাক্যমাত্র-দ্বারা আরব্ধ—কারণমাত্রই সত্য' ইত্যাদি—উহার স্বারসিক তাৎপর্য্য এই অর্থে ধরিতে হইবে। শক্তি উপাদান, শক্তিমান্ উপাদেয়—উভয়ের অত্যন্ত অভেদ—উপনিষদ্ (অর্থাৎ বেদান্ত) মতে যেরূপ ভেদাভেদ—সেরূপ নহে। অর্থাৎ—জগৎ ব্রহ্মশক্তির বিকার বা পরিণাম। এই ব্রহ্মশক্তি আবার শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত অভিন্ন। কোন কোন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মতে (৫) যেমন শক্তি ও

---

(১) ভাস্কর রায় বা ভাসুরানন্দনাথ দাক্ষিণাত্যনিবাসী বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম গম্ভীর রায় ও মাতা কোনমাম্বা। তিনি ৺কাশীধামে নৃসিংহাধ্বরীর নিকট অষ্টাদশ বিদ্যা আয়ত্ত করেন। গৌড়তর্কে তাঁহার গুরু ছিলেন গঙ্গাধর বাজপেয়ী। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম আনন্দী ও দ্বিতীয়ার নাম পার্ব্বতী। প্রথমা পত্নীর গর্ভে পাণ্ডুরঙ্গ নামে তাঁহার এক সন্তান জন্মে। তিনি নৃসিংহ বা নৃসিংহানন্দনাথ গুরুর নিকট শ্রীবিদ্যা-পঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন ও শিবদত্ত গুরুর নিকট তাঁহার পূর্ণাভিষেক হয়। বারাণসীতে তিনি সোম-যাগ সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বেদ ও আগমের সমন্বয়-বাদী। আগম যে বেদমূলক—ইহা প্রতিপাদনেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কাব্য-ব্যাকরণ-ছন্দঃ-স্তোত্র-স্মৃতি-বেদ-বেদান্ত-মীমাংসা-ন্যায়-মন্ত্রশাস্ত্রাদি বিষয়ে তিনি অন্যূন ৪২খানি মহামূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। তাঁহার অন্যতম শিষ্য উমানন্দনাথ 'ভাস্কর-বিলাস' নামে তাঁহার যে জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, উহা নির্ণয়সাগর প্রেস (বোম্বাই) হইতে সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) "স জয়তি মহান্ প্রকাশঃ" (বরিবস্যারহস্য ১।৩)—"স সর্ব্বেষামাত্মত্বেন প্রসিদ্ধঃ মহান্ দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নঃ পরাপ্রকাশ্যঃ, প্রকাশঃ সর্ব্বদানাবৃতাত্মস্বরূপজ্যোতিঃ"—বরিবস্যারহস্য-প্রকাশ (ভাস্কর-কৃত) (১।৩)।

(৩) "'ইচ্ছামি' 'জানামি' ইত্যাদাবুত্তমপুরুষান্তর্ভাসমানং স্ফুরণাত্মিয় জ্ঞানমেব প্রকাশাভিধং ব্রহ্ম। তচ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বকর্তৃত্বপূর্ণত্বব্যাপকত্বাদিশক্তিসম্বলিতম্। তস্য চানন্দরূপাংশ এব স্ফুরণং পরাহন্তা বিমর্শঃ পরা ললিতা ভট্টারিকা ত্রিপুরসুন্দরীত্যাদি পদৈর্ব্যবহ্রিয়তে। উক্তঞ্চ বিরূপাক্ষপঞ্চাশিকায়াং বিশ্বশরীরস্কন্ধে—ঈশ্বরতা কর্তৃত্বং স্বতন্ত্রতা চিৎস্বরূপতা চেতি। এতেঽহন্তায়াঃ কিল পর্য্যায়াঃ সদ্ভিরুচ্যন্তে।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৪।

(৪) "পরাহন্তামন্তরেণেদন্তায়া অসংস্ফুরণাদহমিদমোঃ সসম্বন্ধিকত্বাদিদম্পদগম্যস্য দৃশ্যস্যাহন্তারূপশক্ত্যা তদ্বিশিষ্টব্রহ্মণা বা জন্যত্বম্। তচ্চ দৃশ্যং তৎপরিণাম এব, 'তস্যাঃ পরিণতায়াস্তু ন কশ্চিৎ পর ইষ্যতে' ইতি বামকেশ্বরতন্ত্রাৎ।"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৪-৫

(৫) ইহা অদ্বৈত-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত নহে—'ভেদাভেদবাদীর সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত মতে—কারণ হইতে কার্য্য অনন্য অর্থাৎ কারণ সত্তা ব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই—ইহাই বলা হইয়া থাকে। শক্তিকেও কার্য্য-স্থানীয় ধরিলে উহাও কারণ হইতে অনন্যই হইবে।

শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ—তন্ত্রাদ্বৈত-মতে সেরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না—উভয়ের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধই উক্ত হইয়া থাকে। অতএব, ব্রহ্মশক্তি জগদাকারে পরিণত হইলে ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হন। অতএব, জগৎ যথার্থ পক্ষে ব্রহ্ম-শক্তি হইতে অভিন্ন—এ কারণে ব্রহ্ম হইতেও অভিন্ন। এতেক্ষ উহা নামেই মাত্র জগৎ, কিন্তু বস্তুতঃ উহা মহাশক্তির (ও তদভিন্ন ব্রহ্মের) রূপান্তর মাত্র (৬)।

এই হেতু ছান্দোগ্য উপনিষদের—'এই সকলই ব্রহ্ম'—ইত্যাদি বাক্যে 'এই'-পদ-বাচ্য জগৎ ও ব্রহ্মের 'অভেদে সামানাধিকরণ্য' বুঝিতে হইবে—'বাধায় সামানাধিকরণ্য' নহে। কেবল ছান্দোগ্য শ্রুতি নহে, অপর সকল অদ্বৈত-শ্রুতিরই তাৎপর্য্য এইরূপ—ইহা বুঝিতে হইবে (৭)। সকল প্রমাণের শিরোমণি-ভূত শ্রুতি-প্রমাণ ও শ্রুত্যনুসারী তন্ত্র-প্রমাণ হইতে অদ্বৈতই যে তত্ত্ব, তাহা নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়। এই অদ্বৈতের বিরোধিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে—কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণের, (ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির) ভেদাংশ মাত্র। পক্ষান্তরে, সমগ্র প্রপঞ্চই অদ্বৈত-বিরোধী নহে। 'ইহ (জগতে) নানা কিছুই নাই'—ইত্যাদি শ্রুতিতেও পূর্ব্বকথিত ভেদাংশেরই নিষেধ উক্ত হইয়াছে—প্রপঞ্চ-নিষেধ নহে। তবে যদি এ কথা বলা যায় যে, 'একই—অদ্বিতীয়' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে ভেদ-বিশিষ্ট প্রপঞ্চেরই অভাব বুঝাইতেছে, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যায় যে—এই ভেদ-বিশিষ্ট প্রপঞ্চের অভাব-প্রতীতিও বিশেষণের অভাব-প্রযুক্ত হইয়া থাকে (৮)। অতএব, ভামতী-গ্রন্থে যে স্থলে হাটক-মুক... ভেদ বিচার করা হইয়াছে, সে স্থলেও ভেদকেই স্বর্ণ হইতে ন... বলা হইয়াছে—মুকুটকে স্বর্ণ অপেক্ষা ন্যূন-সত্তাক ... নাই; কারণ, পরিণাম পরিণামীর সম-সত্তাক হইতে বা...

এইরূপ 'গৌড়পাদ-কারিকা'য় 'এই দ্বৈ... ...মাত্র' ইত্যাদি কারিকায় 'দ্বৈত'-শব্দ-দ্বারা ভেদাংশকেই বুঝাইতেছে। উক্ত ভেদাংশই মিথ্যা—ভেদ-যুক্ত বস্তুটি (জগৎ) মিথ্যা নহে (১০)।

ইহার কারণ-স্বরূপে ভাস্কর রায় বলিয়াছেন—যদি বলা যায় যে, ভেদ-বিশিষ্টও মিথ্যা, তাহা হইলে নানারূপ দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, ভেদবত্তা-রূপ ধর্ম্মটি উভয়নিষ্ঠ। যাহার ভেদ ও যাহাতে ভেদ—এই উভয় বস্তুতেই ভেদ বর্ত্তমান থাকে। যাহার ভেদ, তাহাকে বলা হয় ভেদের 'প্রতিযোগী'; আর যাহাতে ভেদ বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে বলা হয় ভেদের 'অনুযোগী'। অথচ সাধারণ ভাবে এই ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়কেই ভেদবান্ বা ভেদ-বিশিষ্ট বলা চলে, অর্থাৎ এক কথায় ভেদবত্ত্ব ধর্ম্ম ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়েই বর্ত্তমান। ভাস্কর বলিতে চাহেন—ভেদবানের মিথ্যাত্ব বলিলে প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে যাহাতে ভেদ বিদ্যমান, সেই জগতের যেরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ অনুযোগিতা-সম্বন্ধে ব্রহ্মে ভেদ অবস্থান করায় ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বও সম্ভব বলিয়া আশঙ্কার উদয় হইতে পারে। অতএব, ভেদবানের মিথ্যাত্ব স্বীকার না করিয়া ভেদের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে আর এ সকল আপত্তি উঠে না (১১)।

জগদুপাদানভূতা মায়াশক্তি ও তৎপ্রপঞ্চ এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে অনন্য। তবে তন্ত্রমতে মহাশক্তি মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন—ইহা পরে বলা হইবে। মহাশক্তি চিদ্রূপা, মায়া জড়।

(৬) "'বাচারম্ভণং বিকারঃ' (ছাঃ উঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি শ্রুতীনাং তত্রৈব স্বারস্যাচ্চ। শক্তিশক্তিমতোরুপাদানোপাদেয়য়োরত্যন্তাভেদঃ, ন পুনরৌপনিষদাদিবদ্ভেদাভেদৌ।"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫

(৭) "অতএব 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১) ইতি সামানাধিকরণ্যমভেদে, ন পুনর্বাধায়াম্। অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ সর্ব্বা অপ্যেতদভিপ্রায়িকা এবাবিরুদ্ধাঃ"। সামানাধিকরণ্য—সমান (এক) অধিকরণে (আশ্রয়ে) বর্ত্তমান থাকার ভাব। ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি-বিশিষ্ট পদসমূহের একই অর্থে পর্য্যবসিত হওয়ার নাম সামানাধিকরণ্য। আলোচ্য স্থলে 'ইদং সর্ব্বং' (এই সব) বলিলে বুঝায় সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চ। আর 'ব্রহ্ম' পদের অর্থ পরমাত্মা। 'জগৎ' অর্থে 'ব্রহ্ম' নহে, 'ব্রহ্ম' অর্থেও 'জগৎ' নহে। তথাপি উভয়ের সামাধিকরণ্য (অর্থাৎ একার্থতা বা তাদাত্ম্য) কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তরে অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের কোন কোন আচার্য্য বলিয়া থাকেন, 'ইদং'-পদ-বাচ্য জগৎ ও 'ব্রহ্ম'-পদ-বাচ্য পরমাত্মার মধ্যে যথাশ্রুত অর্থানুসারে সামানাধিকরণ্য না হইলেও 'ইদং'-পদের 'জগৎ' অর্থটি বাধিত হইয়া 'ব্রহ্ম'-অর্থেই পর্য্যবসিত হয়। ইহারই নাম 'বাধায় সামানাধিকরণ্য'। যে স্থলে পদদ্বয়ের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণে সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে কোন একটি পদের যথাশ্রুত অর্থ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অন্য পদের অর্থের সহিত তাদাত্ম্য-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই বাধায় সামানাধিকরণ্য। আর যে ক্ষেত্রে এরূপ বাধা উৎপন্ন না হইয়াই উভয় পদের একার্থকতা-নিবন্ধন তাদাত্ম্য সম্ভব, সে স্থলে 'অভেদে সামানাধিকরণ্য'। ভাস্করের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—যেহেতু জগৎ ব্রহ্ম-পরিণাম, অতএব জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। সেহেতু 'ইদং'-পদ-বাচ্য জগৎ আর 'ব্রহ্ম'-পদ-বাচ্য পরমাত্মা অত্যন্ত অভিন্ন। তাহাদের অভেদেই সামানাধিকরণ্য—কারণ, এরূপ স্থলে ইদং-পদের অর্থ জগৎ বাধা প্রাপ্ত না হইয়াই ব্রহ্মের সহিত উহার অভিন্নতা বুঝাইতেছে।

(৮) "সর্ব্বপ্রমাণমূর্দ্ধন্যয়া শ্রুত্যা তদনুসারিতন্ত্রৈশ্চাদ্বৈতে কথিতে তদ্বিরুদ্ধত্বেন ভাসমানঃ কার্য্যকারণয়োর্ভেদাংশ এব কল্পিত আস্তাং ন পুনঃ সর্ব্বোঽপি প্রপঞ্চঃ। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিষ্বপি ভেদাংশস্যৈব নিষেধো ন প্রপঞ্চস্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ উঃ ৬।২।১) ইত্যাদৌ শ্রূয়মাণো ভেদবৎপ্রপঞ্চাভাবোঽপি বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত এব"।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫ (ইহা হইতে বুঝা যায়—ভাস্কর-মতে তন্ত্র স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে—স্মৃতি-তুল্য শ্রুত্যনুসারী প্রমাণ।

(৯) "অতএব ভামত্যাং হাটকমুকুটগ্রন্থে ভেদস্যৈব হাটকন্যূনসত্তাকত্বং ন মুকুটস্যোক্তম্, পরিণামস্য পরিণামিসমানসত্তাকত্বাবশ্যকত্বাৎ"।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫

(১০) "মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতম্' (গৌঃ কাঃ ১।১৭) ইত্যত্রাপি দ্বৈতশব্দেন ভেদস্যৈব মিথ্যাত্বমুচ্যতে ন পুনর্ভেদবতঃ"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫

(১১) "তথাত্বে তু প্রতিযোগিতাসম্বন্ধেন জগত ইবানুযোগিতাসম্বন্ধেন ব্রহ্মণো ভেদবত্ত্বস্য সত্ত্বাৎ সদসত্ত্বামভাবো নিরূপ্যত ইতি ন্যায়সিদ্ধত্বাবিশেষান্মিথ্যাত্বাপত্তেঃ"।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫ (ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে—তাঁহারা প্রতিযোগি-সম্বন্ধেই হউক আর অনুযোগি-সম্বন্ধেই হউক, কোন সম্বন্ধেই ভেদ বা কোন ধর্ম্মেরই সত্তা ব্রহ্মে স্বীকার করেন না।

অতএব, মোটামুটি বুঝা যায় যে, শ্রুতির স্বারসিক সিদ্ধান্ত পরিণাম-বাদেরই অনুকূল (১২)।

ভগবান্ ব্যাসদেবও ব্রহ্মসূত্রে নিম্নোক্ত যুক্তিজালের সাহায্যে পরিণাম-বাদের সমর্থন করিয়াছেন। শ্রুতিতে একটি প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলা হইয়াছে—'সেই একটি বিষয়ের জ্ঞান জন্মিলেই সকল বিষয়ের বিজ্ঞান জন্মিবে'। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় যে—একটিমাত্র পরিণামী বস্তুর জ্ঞান হইলে ঐ বস্তু হইতে যত পরিণাম উৎপন্ন হয়, সে সকলেরই জ্ঞান স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, শ্রুতির উক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্য পরিণামবাদ-পক্ষেই সার্থক। তাহার পর শ্রুতিতে ইহার দৃষ্টান্তরূপে মৃত্তিকা ও ঘট প্রভৃতির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র মৃত্তিকার স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলে ঘটাদি যাবতীয় মৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ঘট ত মৃত্তিকার বিকার বা পরিণাম—ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন (১৩)। অতএব, পরিণাম-পক্ষেই দৃষ্টান্তগুলি সার্থক। ইহা ব্যতীত তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'আমি বহু হইয়া জন্মাইতে ইচ্ছা করি,' ইত্যাদি। এই সকল উপদেশেরও তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে—সূত্রকারের অভিপ্রেত পরিণামবাদই। কারণ, এক বহু হইলে একের বহুতে পরিণামই হইয়া থাকে। আবার প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ষড়্‌বিংশ সূত্রে সূত্রকার 'পরিণাম'-শব্দটিই ব্যবহার করিয়াছেন (১৪)।

ভাস্কর আরও বলিয়াছেন—কেবল শ্রুতি ও সূত্রকার নহেন, স্বয়ং ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্যও পরিণামবাদের সমর্থন করিয়াছেন। যদিও তিনি বিবর্ত্তবাদ-পক্ষেই (১৫) শ্রুতি-সূত্রাদি যোজনা করিয়াছেন, তথাপি স্ব-রচিত 'সৌন্দর্য্যলহরী' (বা আনন্দলহরী) নামক শক্তি-স্তোত্র-মধ্যে—'তুমি মন, তুমিই ব্যোম' ইত্যাদি শ্লোকে—'তুমি পরিণত হইলে'—এইরূপ উক্তি-দ্বারা শক্তি-পরিণামবাদ যে স্বাভিমত—ইহা স্বীকার করিয়াছেন (১৬)।

পরিণামবাদীও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অভিমত মিথ্যাত্বের লক্ষণ—'নিজাতিরিক্ত রূপের অভাব'। রহস্যনাম-সহস্রে-'মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠানভূতা'—বলিয়া শক্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই তত্ত্বই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যে বস্তু স্বরূপ ব্যতিরিক্ত রূপান্তরেও প্রকাশ পাইতে পারে, তাহাই সত্য; আর যাহা নিজ রূপ ব্যতীত অন্য কোন রূপে প্রকাশ পায় না, তাহা মিথ্যা। মৃত্তিকা ও ঘট—ইহাদিগের মধ্যে মৃত্তিকার পক্ষে স্বরূপ (মৃদ্রূপ) ব্যতীতও ঘটাদি-রূপ সম্ভব। অতএব, মৃত্তিকা সৎ বস্তু। পক্ষান্তরে, ঘটের নিজ ঘট-রূপ ব্যতীত রূপান্তরে প্রকাশের যোগ্যতা নাই—এ কারণে ঘট-রূপটি মিথ্যা। কারণ, মৃত্তিকার ঘট-রূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও উহার মৃদ্রূপ বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু ঘটের ঘট-রূপটি ধ্বংস হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 'শাম্ভবানন্দকল্পলতা'-গ্রন্থে ইহা সবিস্তরে উক্ত হইয়াছে (১৭)।

যে মহান্ প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মের কথা ভাস্কর প্রথমে বলিয়াছেন, তাঁহারই বিমর্শরূপিণী শক্তি বিদ্যমান—ইঁহার স্বভাব স্ফুরণ। তাঁহারই সংযোগে শিব (পরমাত্মা) জগৎ উৎপাদন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন (১৮)।

বরিবস্যা-রহস্যে ভাস্কর রায় বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে অভিন্না এই ব্রহ্ম-শক্তির উপাসনা-পদ্ধতি মূলতঃ দ্বিবিধ—(১) বাহ্য উপাসনা ও (২) আন্তর উপাসনা। বাহ্য উপাসনায় প্রতিমা, চক্র (যন্ত্র) প্রভৃতি নানারূপ বস্তু উপাস্যের প্রতীক-রূপে ব্যবহৃত হয় ও নানাবিধ উপচার

---

(১২) "ততশ্চ শ্রুতেরপি পরিণামবাদ এব সম্মতঃ সিধ্যতি"।
—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫

(১৩) "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"
—ছাঃ উঃ (৬।১।৪)

(১৪) "ভগবতা ব্যাসেনাপি 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩) ইত্যস্মিন্নধিকরণে একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাং, মৃদ্‌ঘটনখনিকৃন্তনাদিদৃষ্টান্তম্, 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তৈঃ উঃ ২।৭) ইত্যভিধ্যোপদেশাদিকং চানুসন্ধানেন পরিণামবাদ এবাভিপ্রেতঃ, কণ্ঠরবেণোক্তশ্চ 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৬) ইতি সূত্রে। বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫-৬

(১৫) বিবর্ত্ত—নিজ স্বরূপের বা তত্ত্বের অন্যথা-করণ ব্যতিরেকে রূপান্তরে প্রতীয়মান হওয়ার নাম 'বিবর্ত্ত'। পরিণাম—নিজ স্বরূপের (তত্ত্বের) অন্যথাকরণ-দ্বারা রূপান্তরে প্রতীতি। রজ্জু তাহার নিজ স্বরূপটি অবিকৃত রাখিয়া সর্পাদি রূপান্তরে প্রতীয়মান হইলে সর্পকে রজ্জুর বিবর্ত্ত বলা হয়। আর দুগ্ধ নিজ স্বরূপের পরিবর্ত্তন সহকারে দধির আকারে রূপান্তরিত হইলে দধিকে দুগ্ধের বিকার বা পরিণাম বলা চলে। মৃত্তিকা ঘটাকার ধারণ করিলে মৃৎস্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় না। এ কারণে ঘটকে মৃত্তিকার পরিণাম না বলিয়া বিবর্ত্ত বলাই সঙ্গত। তথাপি শ্রুতিতে যখন 'বিকার' পদটি রহিয়াছে, তখন অনেকে ঘট মৃত্তিকার বিকার—ইহাই বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, এ ক্ষেত্রে 'বিকার' পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই—সাধারণ ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১৬) 'মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি, ত্বমাপস্ত্বং ভূমিস্ত্বয়ি পরিণতায়াং ন হি পরম্' (আনন্দলহরী—৩৫)। "ভাষ্যকারৈরপি তত্র বিবর্ত্তবাদানুসারেণ ব্যাচক্ষাণৈরপি সৌন্দর্য্যলহর্য্যাম্ 'মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং—' (৩৫) ইতি শ্লোকে 'ত্বয়ি পরিণতায়াম্' ইতি স্বাভিমতঃ পরিণামবাদ এব স্ফুটীকৃতঃ"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৬। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের মতে জগৎ ব্রহ্ম-শক্তির পরিণাম—ইহা স্বীকারে বাধা নাই—জগৎ ব্রহ্ম-পরিণাম—ইহা স্বীকারেই তাঁহাদিগের আপত্তি।

(১৭) "অস্মিন্ পক্ষে রহস্যনামসহস্রে 'মিথ্যাজগদধিষ্ঠানা' (৭৩৫) ইত্যাদৌ শ্রূয়মাণং মিথ্যাত্বং তু স্বানতিরিক্ত-রূপত্বং, ঘটাদিরূপেণানিত্যত্বং ব্রহ্মরূপেণ নিত্যত্বম্, মৃদ্‌ঘটয়োরভেদেঽপি ঘটরূপেণ ধ্বস্তত্বং মৃদ্রূপেণাধ্বস্তত্বং চেত্যাদিবদ্‌বিরুদ্ধধর্ম্মনিরাসাদিকমূহ্যমিত্যাদিকঃ শাম্ভবানন্দকল্পলতায়াং বিস্তরঃ"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৬। শ্রীবিদ্যাপঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্রে ভাস্করের দীক্ষাদাতা গুরু-নৃসিংহানন্দনাথ শাম্ভবানন্দকল্পলতার গ্রন্থকার।

(১৮) নৈসর্গিকী স্ফুরত্তা বিমর্শরূপাঽস্য বিদ্যতে শক্তিঃ।
তদ্যোগাদেব শিবো জগদুৎপাদয়তি পাতি সংহরতি"।
বঃ রঃ (১।৪)।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যও আনন্দলহরীর প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন—"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি চ শক্তঃ প্রভবিতুং ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি"।

প্রদান-পূর্ব্বক পূজাদি সাধন হইয়া থাকে। আন্তর উপাসনা-পদ্ধতির প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, এই পদ্ধতির অনুসরণকারী সাধক দেবীর ত্রিবিধ রূপের অন্যতর রূপকে আলিম্বনরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। আন্তর উপাসনায় স্থুল সূক্ষ্ম পর ভেদে দেবীর ত্রিবিধ রূপ। স্থুল রূপে দেবীর বিশিষ্ট আকৃতি কল্পিত হইয়া থাকে। হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট এই স্থুল রূপ মন্ত্রসিদ্ধ সাধকের দর্শনগোচর হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে, তিনিই যে পরম ভাগ্যবান্—এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। তাঁহার এই স্থুল রূপ সাধকের হিতার্থ কল্পিত রূপমাত্র; উহাই তাঁহার স্বরূপ নহে। স্থুল ব্যতীত তাঁহার সূক্ষ্ম একটি রূপও বিদ্যমান। উহা মাতৃকাময়ী মূর্ত্তি—সংস্কৃত-বর্ণ-মালার অক্ষরগুলি-দ্বারা গঠিত—দেবীর এ সূক্ষ্ম রূপ নানা-মন্ত্রময়। যাঁহারা উচ্চতর স্তরের সাধক, তাঁহারা এই মন্ত্রময়ী মূর্ত্তির শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নহে। ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর পরমরূপে দেবী চিন্ময়ী কেবল মনোমাত্র-গম্যা। কিন্তু ইহাও তাঁহার কল্পিত রূপ—যথার্থ স্বরূপ নহে। এই রূপত্রয়াতীত দেবীর যে তুরীয় স্বরূপ—উহাই শ্রীদেবীর (বা শ্রীবিদ্যার) আনন্দাত্মিকা মূর্ত্তি। এই আনন্দচিন্ময়-স্বরূপানু-ভূতিই চরম পুরুষার্থ। ইহারই উদ্দেশ্যে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং ঈশ্বর চতুর্দ্দশ বিদ্যা লোকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা হইতেছে—চারি বেদ (ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব), ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ), ন্যায়, মীমাংসা, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র (১৯)। এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার সার চতুর্বেদ। চতুর্বেদের সারভূতা গায়ত্রী (২০)।

গায়ত্রীর আবার দুইটি রূপ—(১) অপর ও (২) পর। অপর রূপটিরও দুইটি বিভাগ—(১) স্পষ্ট ও (২) অস্পষ্ট। স্পষ্ট রূপটি সকলেরই প্রায় পরিচিত। উহাই ব্রাহ্মণের নিত্য জপ্য ত্রিপদা গায়ত্রী। অস্পষ্টরূপে একটি চতুর্থ চরণ আছে, উহা সাধারণের বিজ্ঞাত নহে বলিয়াই 'অস্পষ্ট' নামে কথিত হইয়া থাকে (২১)।

গায়ত্রীর যে পর-রূপ—উহা চতুর্বেদে অতি গোপনে রক্ষিত হইয়াছে—উহাই 'শ্রীবিদ্যা-পঞ্চদশাক্ষরী' মন্ত্র (২২)। এই মন্ত্র কেবল যে তন্ত্রেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নহে। স্বয়ং বেদপুরুষও সঙ্কেত-দ্বারা অত্যন্ত গোপনীয় রূপে এই মন্ত্রটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সাংখ্যায়ন-শ্রুতিতে এই সঙ্কেত-গর্ভ শ্রীবিদ্যামন্ত্র কূট-ভাষায় উক্ত হইয়াছে (২৩)।

এই মহাবিদ্যা-মধ্যে ষট্ত্রিংশত্তত্ত্ব ও তদতীত সপ্তত্রিংশত্তম এক মহাতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়—(১) শিব (২) শক্তি (৩) সদাশিব (৪) ঈশ্বর (৫) শুদ্ধবিদ্যা (৬) মায়া (৭) কলা (৮) বিদ্যা (৯) রাগ (১০) কাল (১১) নিয়তি (১২) পুরুষ (১৩) প্রকৃতি (১৪) অহঙ্কার (১৫) বুদ্ধি (১৬) মনঃ (১৭) শ্রোত্র (১৮) ত্বক্ (১৯) নেত্র (২০) জিহ্বা (২১) ঘ্রাণ (২২) বাক্ (২৩) পাণি (২৪) পাদ (২৫) পায়ু (২৬) উপস্থ (২৭) শব্দ (২৮) স্পর্শ (২৯) রূপ (৩০) রস (৩১) গন্ধ (৩২) আকাশ (৩৩) বায়ু (৩৪) তেজঃ (৩৫) অপ্ ও (৩৬) পৃথিবী। ইহাদিগের স্বরূপ ও উৎপত্তির ক্রম ভাস্কর 'সৌভাগ্যসুধোদয়ে' দেখিতে বলিয়াছেন (২৪)। ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বাতীত এক পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম। ইনিই ব্রহ্মশক্তি হইতে অভিন্ন। অতএব ব্রহ্ম-শক্তি শ্রীবিদ্যাই তত্ত্বাতীতস্বভাবা (২৫)।

ভাস্কর বলিয়াছেন যে, কোন মন্ত্রের ঋষি-ছন্দঃ-দেবতা-বিনি-য়োগাদি জানিয়া উহার বীজ-শক্তি-কীলকাদি পরিজ্ঞাত হইয়া নানাবিধ ন্যাস-ধ্যান-নিয়মাদির অনুষ্ঠান-যুক্ত যে বহিরঙ্গ পূজা তাহা ত ইহলোকে প্রায়ই প্রসিদ্ধ (২৬)। প্রকাশ-বরিবস্যা-বিধিতে ভাস্কর স্বয়ং এ সকলের বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন (২৭)। পক্ষান্তরে, বিষয়ে অনাসক্ত অন্তর্মুখ জনগণই পূর্ব্বোক্ত সাধারণের দুর্লভ অন্তরঙ্গ পূজার আদর করিয়া থাকেন। বরিবস্যা-রহস্যে এই অন্তরঙ্গ-পূজার বিধিই উক্ত হইয়াছে। এই অন্তরঙ্গ-পূজা পরিত্যাগ করিয়া জড়-বুদ্ধিগণ যে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ বহিরঙ্গ-পূজা করিয়া থাকে, তাহা প্রাণহীন দেহ ও বিগলিত-সূত্র পুত্তলিকার মতই অন্তঃসারশূন্য (২৮)—ইহা বলিয়া ভাস্কর কেবল বাহ্য-পূজার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। পরমদেবতা (ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা), শ্রীবিদ্যা-পঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্র, চক্ররাজ (ত্রিপুরসুন্দরী যন্ত্র), শ্রীগুরু ও নিজ আত্মার অভিন্নার্থ-ভাবনাই এই রহস্য-বরিবস্যার সার মর্ম্ম। কারণ, এই পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকটিই মূল ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন—ইহাই ভাস্কর তাঁহার শাক্তাদ্বৈত-বাদের চরম সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী (এম-এ, পি আর এস, অধ্যাপক)

(১৯) "তজ্জ্ঞানার্থমুপায়াঃ বিদ্যা লোকে চতুর্দ্দশ প্রোক্তাঃ"।—বঃ রঃ (১৷৬)। তন্ত্রাণাং ধর্ম্মশাস্ত্রেঽন্তর্ভাবঃ" ।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৭। ভাস্কর তন্ত্ররাজের ব্যাখ্যায় তন্ত্র যে স্মৃতি-মধ্যে গণ্য—তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

(২০) "তেষ্বপি চ সারভূতা বেদাস্তত্রাপি গায়ত্রী"—বঃ রঃ (১৷৬)।

(২১) "তস্যা রূপদ্বিতয়ং তত্রৈকং যৎ প্রপঠ্যতে (২) স্পষ্টম্"।—বঃ রঃ (১৷৭)। "তস্যাঃ গায়ত্র্যাঃ। স্পষ্টমস্পষ্টং চেতি পদচ্ছেদ আবৃত্ত্যা। চরণত্রয়ং—'তৎসবিতুঃ' ইত্যাদি স্পষ্টম্। "পরোরজসে সাবদোম্" ইতি চতুর্থচরণং ত্বস্পষ্টমিত্যর্থঃ"। বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৭।

(২২) "বেদেষু চতুর্ষ্বপি পরমত্যন্তং গোপনীয়তরম্"—বঃ রঃ (১৷৭)। "পরং শ্রীবিদ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং রূপম্"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৭।

(২৩) "কামো যোনিঃ কমলেত্যেবং সঙ্কেতিতৈঃ শব্দৈঃ। ব্যবহরতি ন তু প্রকটং যাং বিদ্যাং বেদপুরুষোঽপি।"—বঃ রঃ (১৷৮)। "কামো-যোনিঃ কমলা বজ্রপাণির্গুহাহসা মাতরিশ্বাভ্রমিন্দ্রঃ। পুনর্গুহাসকলা মায়য়া চ পুরুচ্যেষা বিশ্বমাতাদিবিদ্যা"।—ইতি সাংখ্যায়ন-শ্রুতিঃ"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৮।

(২৪) বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৬৫—৬৬।

(২৫) "স্বরব্যঞ্জনভেদেন সপ্তত্রিংশৎপ্রভেদিনী। সপ্তত্রিংশৎ-প্রভেদেন ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বরূপিণী। তত্ত্বাতীতস্বভাবা চ বিদ্যৈষা ভাব্যতে ময়া"।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৬৬।

(২৬) ঋষয়শ্ছন্দোদৈবতবিনিয়োগা বীজশক্তিকীলানি। ন্যাস-ধ্যানং নিয়মাঃ পূজাদীনি তু বহিরঙ্গানি। বাহ্যান্যঙ্গানি পুনঃ প্রায়ো লোকে প্রসিদ্ধকল্পানি"। বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ১১৩।

(২৭) তানি চ প্রকাশবরিবস্যাবিধৌ প্রপঞ্চিতান্যস্মাভিঃ। বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ১১৩

(২৮) "দুর্লভমান্তরমঙ্গং প্রায়োঽন্তর্মুখজনৈস্তদাদৃত্যম্। তেষাম্বৈষা তেষামতঃ প্রদিষ্টা রহস্যবরিবস্যা। এতামুৎসৃজ্য জড়ৈঃ ক্রিয়মাণা বাহ্যাড়ম্বরোপাস্তিঃ। প্রাণবিহীনেব তনুর্বিগলিতসূত্রেব পুত্তলিকা"। বঃ রঃ (২৷৬২—৬৩)। যতক্ষণ পুতুলের হাত-পা সূতায় বাঁধা থাকে, ততক্ষণই পুতুল জীবন্তের মত হাত-পা নাড়িয়া থাকে; ঐ সূত্র ছিন্ন হইলে উহা তখন আর খেলা দেখায় না।

মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন

[গল্প]

১

জাপান বৃটেনের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করায় প্রথমেই কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে আলোক-নিয়ন্ত্রণের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। যে কলিকাতা "দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিত" থাকিয়া রাত্রির অন্ধকারকে উপহাস করিত, সেই নগরে উজ্জ্বল আলোক বিকাশ অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। হাওড়া রেল ষ্টেশনে আলোকমালা অবগুণ্ঠনে আপনাদিগের দীপ্তি আবৃত করিয়াছে—ট্রেণের কামরায় আলোক আছে; কিন্তু তাহা জীবিত হইলেও জীবন্মৃত রোগীর জীবনের মত।

নির্ম্মলচন্দ্র রায় কলিকাতা হইতে যাইবেন। প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি ষ্টেশনে উপনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কয় জন ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যে কামরায় তাঁহার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, সে কামরাটি অধিকার করিবেন—বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা সামরিক প্রয়োজনে দিল্লীতে যাইতেছেন—পথে অনেক কায করিয়া লইতে হইবে, তাঁহাদিগের সঙ্গে কোন বে-সামরিক যাত্রীকে যাইতে দিবেন না। রেলের কর্ম্মচারীরা সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছুটাছুটি করিয়া শেষে এঞ্জিনের কয়খানি গাড়ীর পরেই একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা পাইলেন এবং তাহাতেই নির্ম্মলচন্দ্রকে স্থান দিয়া—পাছে আবার কেহ তাহা অধিকার করে সেই ভয়ে, তাহাতে—সমগ্র কামরা ভাড়া করা হইয়াছে, এই মর্ম্মে কাগজ আঁটিয়া দিলেন।

নির্ম্মলচন্দ্র সেই কামরায় বসিলেন।

ট্রেণ ষ্টেশন ত্যাগ করিবার মাত্র ৫ মিনিট পূর্ব্বে যে রেল-কর্ম্মচারীটি তাঁহাকে শেষের কামরায় আনিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া কামরার দ্বার খুলিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "প্রথম শ্রেণীর যে কামরা মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে এক জন মাত্র মহিলা—ভারতীয়া ছিলেন। সামরিক কর্ম্মচারীরা সেটিও চাহিতেছেন—কাযেই মহিলাটিকে এই কামরায় স্থান দিতে হইতেছে। আশা করি, আপনার কোন আপত্তি হইবে না—অসুবিধা হয়ত হইবে, কিন্তু উপায় নাই।"

নির্ম্মলচন্দ্র বিব্রত হইলেন। তাঁহার জীবনে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন ও যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কামরায় এক জন অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে গমনের কথায় তিনি আতঙ্কই অনুভব করিলেন। তিনি রেলের কর্ম্মচারীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি দ্বিতীয় শ্রেণীতেও স্থান দিতে পারেন না?"

কর্ম্মচারীটি বলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, আর কোথাও স্থান নাই।"

নির্ম্মলচন্দ্র জানিতেন, আইনতঃ তিনি আর এক জন যাত্রীর সে কামরায় ভ্রমণে আপত্তি করিতে পারেন না। তিনি দার্শনিকের মত ভাবে বলিলেন, "যাহার প্রতীকার করা যায় না, তাহা সহ্য করিতেই হইবে।" তিনি মনে মনে ভাবিলেন, পরবর্ত্তী কোন ষ্টেশনে আপনি নামিয়া অন্য কামরায় স্থান সন্ধান করিবেন।

যে মহিলাটি কর্ম্মচারীটির সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া কামরায় দ্বিতীয় বেঞ্চে বসিলেন। তিনি নির্ম্মলচন্দ্রের কথা শুনিয়াছিলেন—শুনিয়া যেন কেমন অন্যমনস্কা হইয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে কোথাও শ্রুত গানের সুর যদি বিস্মৃতির দূরত্বে ক্ষীণ হইয়া কর্ণে প্রবেশ করে, তবে মানুষের যেমন ভাব হয়, তাঁহার যেন তেমনই ভাব হইয়াছিল।

নির্ম্মলচন্দ্র ও কুমারী যূথিকা রায় উভয়েই কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। নিশীথে—অপরিচিত স্থানে—অন্ধকারে মানুষের মনে যেরূপ অস্বস্তির উদ্ভব হয়—এ সেইরূপ অস্বস্তি। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে কিছুই পাওয়া যায় না; কিন্তু মনে হয় যেন অন্ধকার অশরীরী সম্ভাবনায় পূর্ণ।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ চলিবার সঙ্কেত-ধ্বনি শ্রুত হইল—ট্রেণ উগ্র বংশীধ্বনি করিয়া—যেন জড়ত্ব-শাপমুক্ত জীবের মত আপনার চলিবার শক্তি প্রাপ্তি সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে মৃদু গতিতে অগ্রসর হইল; তাহার পর আপনার শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া—তাহারই আনন্দে মন্থর গতি ত্যাগ করিয়া দ্রুত-গতিতে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া যেন ছুটিয়া চলিল।

২

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ছাড়াইয়া ট্রেণ অগ্রসর হইল এবং এক ঘণ্টা অতীত হইবার পর যখন প্রথম থামিবার ষ্টেশন—বর্দ্ধমানে উপনীত হইল, তখন ষ্টেশনে দীপ আর অবগুণ্ঠিত নহে; আর ট্রেণের কামরায় যে আলোক অতি মৃদু ভাবে জ্বলিতেছিল, তাহা সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অন্য কোন কামরায় স্থান পাইতে পারেন কি না, দেখিবার জন্য নির্ম্মলচন্দ্র কামরা ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় তাঁহার দৃষ্টি সহযাত্রীর উপর পতিত হইল। তিনি তাঁহার দিকেই চাহিয়া ছিলেন। কেহই দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। সহযাত্রীর দৃষ্টি যেন নির্ম্মলচন্দ্রকে নিশ্চল করিল—তিনি আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কমল!"

সহযাত্রী যেন আপনার চাঞ্চল্য সংযত করিয়া লইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "হাঁ। কিন্তু সে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে।"

"কেন?"

"আজ আমি যূথিকা রায়।"

নির্ম্মলচন্দ্র ভাবিলেন, বিবাহের পর কোন কারণে—হয়ত শ্বশুরালয়ে কাহারও 'কমল' নাম থাকায় নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একা?"

"হাঁ। আমি কুমারী যূথিকা রায়, একা যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"কর্ম্মস্থান পঞ্জাবে।"

বিষয়টি রহস্যাচ্ছন্ন মনে হইতে লাগিল। তবে ৩০ বৎসর—সে, জীবনের মধ্যাহ্ন, আর আজ অপরাহ্ন। এই দীর্ঘকালে কি হইয়াছে, সে বলিতে পারে?

নির্ম্মলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিবাহ হয় নাই?"

কমল বলিলেন, "আমি বিবাহ করি নাই।"—তিনি মনে মনে ভাবিলেন, পুরুষের ভালবাসা কি এতই অসার ও অস্থির যে, সে নারীর ভালবাসাকে সেই আদর্শে বিচার করে ?

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে তোমার স্ত্রীপুত্রাদি নাই ?"

নির্ম্মলচন্দ্র হাসিলেন—সে হাসি বেদনাকে আবৃত করিবার চেষ্টা। তিনি বলিলেন, "আমি বিবাহ করি নাই।"

"কেন ?"

"সে আজ ৩০ বৎসর আগের কথা। তুমি জান, তখন আমি বিবাহ করতেই চেয়েছিলাম—বিবাহ হয় নাই। তা'র পর আর বিবাহের কথা কল্পনা করতেও পারি নাই; যা'র যে স্থানে ব্যথা, সে সেই স্থানটা স্পর্শ করতে ভয় পায়।"

নির্ম্মলচন্দ্রের মনে হইল, কমলের চক্ষুতে নূতন দীপ্তি বিকশিত হইল।

সেই দীর্ঘ ৩০ বৎসর পূর্ব্বের যে ঘটনা উভয়ের জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল, তাহার বিষয় উভয়েই জানিতেন। তাহার পরবর্ত্তী ৩০ বৎসরের কথাই পরস্পরের অজ্ঞাত।

নির্ম্মলচন্দ্রের বয়স তখন ২২ বৎসর—কমলের ১৫ পার হইয়া ১৬ বৎসর। নির্ম্মলচন্দ্রের পিতা উত্তরবঙ্গে স্কুল-মাষ্টার—হেড মাষ্টার; তিনি বিপত্নীক—এক কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া তাঁহার পত্নী লোকান্তরিতা হইলে তিনি তাহাদিগের মাতার ও পিতার কায করিয়াছিলেন—তাহার পর সুশিক্ষিত পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। পুত্র তখন কলিকাতায় পড়িতেছে—প্রাথমিক পরীক্ষায় ও তাহার পরবর্ত্তী সব পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে—পরীক্ষা শেষ করিয়া কি করিবে, তাহাই ভাবিতেছে। সে তখন ছাত্রাবাসে থাকিয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন করে। কমলের এক ভ্রাতা তাহার সতীর্থ। উভয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সেই ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া নির্ম্মলচন্দ্র বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বস্ব ধনী রামময় বসুর গৃহে যাইত। কমল তাঁহার কন্যা। রামময় তিনটি বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন—তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি, প্রভূত ধন, দুর্জ্জয় ক্রোধ।

বহু দিন সতীর্থের গৃহে আসিয়া নির্ম্মলচন্দ্র সে বাড়ীতে কতকটা "ঘরের ছেলের" মত হইয়া গিয়াছিল। মাতৃহীন নির্ম্মলচন্দ্র সতীর্থের মাতার নিকট যে স্নেহ পাইত, তাহা সে তাহার জীবন-মরুভূমিতে স্রোতস্বতীর সলিলের মত মনে করিত। কমলের মাতার ইচ্ছা ছিল, সেই তীক্ষ্ণধী তরুণের সহিত কমলের বিবাহ দিবেন। প্রায় তিন বৎসরে তাঁহার সেই ইচ্ছা গৃহে প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। কেবল রামময় তাহা জানিতেন না। কথাটা বিস্ময়কর হইলেও সত্য। রামময় সংসারের কর্ত্তা হইলেও তাঁহার সংসারের কোন কাযে অগ্রণী হইবার অবসর বা আগ্রহ কিছুই ছিল না এবং তাঁহার পত্নীর গৃহিণীপণার কৃতিত্বে তাঁহার সে বিষয়ে আগ্রহের কোন কারণও ঘটে নাই। গৃহিণীর গৃহিণীপণায় সংসারের কায উপলবিহীন খাতে নদীর মত প্রবাহিত হইতেছিল। গৃহিণী স্বামীর প্রকৃতি অবগত ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি নির্ম্মলের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব পূর্ব্বে স্বামীর নিকট করেন নাই। তিনি জানিতেন, সে প্রস্তাব করিলেই রামময় তাহাতে আপত্তি করিবেন—তাহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে আঘাত করিবে; কিন্তু যাহাতে স্বামীর আপত্তি-সম্ভাবনা অনিবার্য্য, কিরূপে—ক্রমে সে বিষয়ে তাঁহার আপত্তি দূর করা যায় তাহাও কমলের মাতা জানিতেন। সেই জন্য তিনি সময় সময় স্বামীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে—বিশেষ পুত্রদিগের শিক্ষা-সংক্রান্ত কথার সময় নির্ম্মলের প্রশংসা করিতেন। তিনি যে ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেই সময় একটি অতর্কিত ঘটনা ঘটিল—রামময়ের কোন পরিচিত ব্যক্তি কমলের সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব রামময়ের নিকট করিলেন। স্বামীর নিকট সেই প্রস্তাব শুনিয়া কমলের মাতা যখন নির্ম্মলের সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর মত জানিতে চাহিলেন, তখন রামময় সেই প্রস্তাব অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া উঠিলেন।

সাধারণতঃ স্বামীর এইরূপ মত প্রকাশে তাঁহার পত্নী বিশেষ বিচলিত হইতেন না। তিনি জানিতেন, স্বামীর মতের পরিবর্ত্তন তিনি ঘটাইতে পারেন—কেবল সে কায সময়সাধ্য। তাঁহার ক্রোধ যেমন "খড়ের আগুনের" মত সহসা জ্বলিয়া উঠে, তেমনই সহজেই নির্ব্বাপিত হয়, সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার মত সেইরূপ প্রথমে দৃঢ় হইলেও গৃহিণীর চেষ্টায় সহজে শিথিল হয়। কিন্তু এ বার অবস্থা অন্যরূপ হইল। দামোদরের বন্যা যেমন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়ে, ঘটনার পর ঘটনা তেমনই ভাবে আসিয়া কমলের মাতাকে বিব্রত করিল। রামময় স্ত্রীকে বলিলেন, তিনি যে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন তাহা যদি ভাল মনে না হয়, তবে তিনি অন্য সম্বন্ধ দেখিবেন—নির্ম্মলের মত "চালচুলাহীন" ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন না; কারণ, বিদ্যার এখন মূল্য কি ?—কেবল বিদ্যা থাকিলে ছেলে"রাঙ্গা মূলা" মাত্র হয়। তিনি শেষে বলিলেন, তিনি সাত দিনের মধ্যে মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবেন। এক দিকে এই—আর এক দিকে তিনি জানিতে পারিলেন, কন্যার মনে নির্ম্মলের চিত্র ভালবাসার বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিষয় অবগত হইয়া কমলের মাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তিতা ও শঙ্কিতা হইলেন। তিনি মনে করিলেন, সে জন্য সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব তাঁহার। কারণ, তিনিই নির্ম্মলের সহিত কমলের বিবাহ দিবার কথা কেবল মনেই করেন নাই, পরন্তু প্রকাশও করিয়াছিলেন; কন্যাও এই কয় বৎসর মনে করিয়াছে—নির্ম্মলের সহিতই তাহার বিবাহ হইবে। তিনি জানিতেন, এইরূপ সম্বন্ধে তাঁহার স্বামীর আপত্তি হইবে; কিন্তু মনে করিয়াছিলেন—বিশ্বাস করিয়াছিলেন, বহু বিষয়ে তিনি যেমন আপনার মতের অনুকূলে স্বামীর মতের পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। সেই বিশ্বাসেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু এবার যেন আর তাহা হইল না—যেন দর্পহারী তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়া দিতেছেন।

৩

কমলের মাতা প্রথমা পুত্রবধূর নিকটে প্রথম কমলের মনোভাবের কথা জানিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই নির্ম্মলের সতীর্থ ও বন্ধু। তাহার স্ত্রীর সহিতই কমলের অধিক ঘনিষ্ঠতা এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে সে-ই এই ভগিনীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করে। রামময়ের কথার বিষয় যখন প্রকাশ পাইল এবং তাহা পরিবারে ব্যাপ্ত হইল তখন কমলের বৌদিদিই সর্ব্বাপেক্ষা কমলের ভাবান্তর লক্ষ্য করিল—

কমলকে দেখিয়া মনে হইল, যেন অকাল-জলদোদয়ে বিকশিত কমল ম্লান হইয়া গেল ! কারণ-সন্ধানের স্বাভাবিক আগ্রহে সে কমলকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহার সহানুভূতি তাহাকে সহজেই সে সন্ধান দিল—মনোভাব গোপনে অনভ্যস্তা তরুণী তাহার নিকট আপনার আতঙ্কের কারণ ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

কমলের বৌদিদি প্রথমে তাহাকে বুঝাইয়া তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না, কমল ক্রোধে ও দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল ; বলিল, "বৌদিদি, তুমি আমাকে কি বলছ ? আমার পক্ষে কি বিবাহ করা সম্ভব ? তা' হ'তে পারে না।" বৌদিদি তাহাকে বুঝাইবার যে চেষ্টা করিতেছিল, সে চেষ্টা তাহার সংস্কারে পদে পদে বাধা পাইয়া তাহাকেই পীড়িত করিতেছিল। শেষে সে সকল কথা প্রথমে তাহার স্বামীকে ও তাহার পর, স্বামীর পরামর্শে, শাশুড়ীকে বলিল। তখন মাতা ও পুত্র পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গৃহে যেন আসন্ন বিপদের ছায়া অস্বস্তির রূপ ধরিয়া পতিত হইল।

সে দিন শনিবার।—মধ্যাহ্নের পরেই গৃহে ফিরিয়া রামময় জানাইয়া দিলেন, পরদিন অপরাহ্ণে কেহ কেহ কমলকে দেখিতে আসিবেন। শুনিয়া কমলের মাতার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, সব কথা স্বামীকে বলেন ; কিন্তু তাহা করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না—কারণ, তিনি স্বামীর প্রকৃতি জানিতেন—সে সব কথা বলিলে, স্বামীর ক্রোধ যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহাতে বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে।

তিনি আসিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকাইলেন। সে তখন তাহার বসিবার ঘরে নির্ম্মলের সহিত কি একটা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। সে আসিয়া দেখিল তাহার মাতা কাঁদিতেছেন। সে মা'র কাছে সব কথা শুনিয়া যে সঙ্কল্প করিল, তাহা সম্ভব কি না এবং সম্ভব হইলেও তাহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা সে সহসা বুঝিতে পারিল না। সে ফিরিয়া যাইয়া নির্ম্মলকে সকল কথা বলিল ; প্রস্তাব করিল, নির্ম্মল কমলকে লইয়া তাহার পিতার নিকটে যাইবে এবং সে যাইয়া তথায় তাহাদিগের বিবাহ দিবে—সে-ই তাহার পিতাকে সব বুঝাইয়া বলিবে। তাহার সে কাযের ফলে তাহার অবস্থা কি হইতে পারে তাহা সে যে মনে করিতে পারিল না, তাহা নহে। কিন্তু সে তাহাতেও বিচলিত হইল না। যৌবন স্বভাবতঃ অসাধ্য-সাধনে উৎসাহ দেয়। জন্মাবধি সুখে, প্রাচুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যের পরিবেষ্টনে পালিত কমলের দাদার যে উৎসাহ প্রকাশ পাইল, তাহা যে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন—মফঃস্বলের স্কুলের শিক্ষকের পুত্র নির্ম্মলের পক্ষে সংযত ছিল তাহা বলা বাহুল্য। কাযেই কমলের দাদার প্রস্তাবে নির্ম্মল এক কথায় সাগ্রহে সম্মতি দিতে পারিল না। কিন্তু সে-ও যুবক এবং সে কমলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার বিবেচনা সেই আকর্ষণে প্রভাবিত হইল এবং শেষে সে সেই প্রস্তাবে প্রায় সম্মতি দিল। সে জানিত, তাহার পিতা তাহার কথা কখন অবিশ্বাস করিবেন না—সে যাহা বলিবে তাহাতে কখন সন্দেহ করিবেন না।

নির্ম্মল যখন তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল, তখন কমলের দাদা মাতাকে তাহা জানাইবার পূর্ব্বে পত্নীকে জানাইয়া—কমলকে জানাইতে বলিল। কমলের কথায় সে প্রস্তাব ফুৎকারে জলবিম্বের মত নষ্ট হইয়া গেল। সে প্রস্তাবে কমলের সংস্কার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল ; সে বলিল, "বৌদিদি, তুমি কি বলছ ! আমি আর কাউকে বিবাহ করতে পারি না—করব না ; কিন্তু যাঁ'র সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নাই, তাঁ'র সঙ্গে আমি যেতে পারি না।" সে বিষয়ে সে বৌদিদির কোন যুক্তিতে কর্ণপাত করিল না।

পত্নীর নিকট সে কথা শুনিয়া কমলের দাদা ভাবিল, তাহাকে অন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

নির্ম্মল সে দিনের মত বিদায় লইল। সে ভাবিতে ভাবিতে বিচলিতচিত্তে ছাত্রাবাসে ফিরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার জীবন-নাটকে যে অঙ্কের অভিনয় হইল, তাহা সে কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার সহিত কমলের বিবাহ তাহার স্বপ্নাতীতই ছিল। সে যে কমলকে ভালবাসিয়াছিল, তাহা সে আপনিও মনে করিতে পারে নাই—কেন না, সে ভালবাসা যে কখন কল্পনালোক অতিক্রম করিয়া বাস্তবরাজ্যে আসিতে পারে, তাহা সে কখন সম্ভব মনে করিতে পারে নাই। বাস্তবিক সে ভালবাসা তাহার হৃদয়পটে অদৃশ্য কালীতে লিখিত ছিল—কমলের দাদার কথায় ও প্রস্তাবেও হয়ত তাহা সপ্রকাশ হইত না ; কিন্তু কমলের অভিপ্রায় যেন নূতন ভাবের উত্তাপে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। আর সেই জন্যই সে কমলের দাদার প্রস্তাবে প্রায় সম্মতি দিয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া শেষে সে মনে করিল, পিতার নিকটে যাইবে এবং তাঁহাকে এ সব কথা বলিয়া মনের গুরুভার লঘু করিবার চেষ্টা করিবে।

৪

সেই পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর পূর্ব্বের—জীবনের মধ্যাহ্নের কথা। সে সব কথা উভয়েরই জানা ছিল। আজ জীবনের অপরাহ্ণ। দীর্ঘ ৩০ বৎসরের পরে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে উভয়ে সাক্ষাৎ। অল্প সময়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের কথা যেটুকু শুনিয়াছে, তাহাতে আরও জানিবার কৌতূহল উভয়েই অনুভব করিতেছিল।

কমলই প্রথম জিজ্ঞাসা করিল, "যে দিন তুমি চলে গেলে, তার পর এই ৩০ বৎসরে কি আর পূর্ব্বের কথা মনে পড়েছে।"

নির্ম্মল হাসিল,—"বোধ হয়, তুমি—তুমিও তা' বুঝতে পারবে না।"

"কেন ?"

নির্ম্মল কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

কমল বলিল, "তা'র পর তুমি কি করলে ?"

নির্ম্মল সেই দীর্ঘ কথা বলিতে লাগিল।

নির্ম্মল যে দিন শেষ কমলের পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া আসে, তাহার পরদিন রবিবার। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে কমলের পিতৃগৃহের সরকার আসিয়া তাহাকে জানাইয়া যাইলেন—রামময় বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সে যেন আর তাঁহার গৃহে না যায়। কথাটা তাহাকে অত্যন্ত পীড়িত করিল। যে নিরপরাধ, সে যদি অপরাধীর কশাঘাত লাভ করে, তবে যেমন হয়, তাহার তেমনই হইল। অবশ্য সে গৃহে যাইবার কোন অধিকার তাহার ছিল না। কিন্তু অপরাধীর দণ্ড-ভোগের কি কায সে করিয়াছে ?

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল। ছাত্রাবাসের অধিকাংশ ছাত্রই কেহ বা চলচ্চিত্র দেখিতে, কেহ বা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। এক জন লোক আসিয়া ডাকিল, "নির্ম্মলচন্দ্র রায় আছেন ?" শুনিয়া নির্ম্মল

বলিল, "আমি—আছি।" আগন্তুক গৃহের দ্বিতলে আসিলেন—তাঁহার সঙ্গে এক জন উর্দ্দীপরিহিত পাহারাওয়ালা। তিনি নির্ম্মলকে বলিলেন, তাহাকে তাঁহার সঙ্গে থানায় যাইতে হইবে। নির্ম্মল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "সে ত আপনিই ভাল জানেন।" ততক্ষণে কয় জন ছাত্র তথায় আসিয়াছিল। অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া নির্ম্মল আগন্তুকের সঙ্গে থানায় গেল।

তথায় তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইল—তিরস্কার, ভীতি-প্রদর্শন, শেষে প্রহারও হইল। তাহার সম্বন্ধে অভিযোগ, সে রামময় বাবুর অবিবাহিতা ও নাবালিকা কন্যাকে গৃহত্যাগ করাইয়াছে।

যে কয় জন সঙ্গী তাহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা অভিযোগের কথা শুনিয়া চলিয়া গেল। অনাহারে—দুই জন চোরের সঙ্গে নির্ম্মল সে রাত্রিতে গারদে বদ্ধ রহিল। সে যে অপবাদের কথা শুনিল, তাহাতে সে আপনার কাছে আপনি লজ্জানুভব করিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে আলোকপাতের মত একটি চিন্তা তাহাকে সান্ত্বনা দিল—কমল তাহার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহার তুলনায় তাহার সেই লাঞ্ছনা তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

পরদিন প্রভাতে কিন্তু পুলিস কোন কারণ না দেখাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তখন সে তাহার কারণ অনুমানও করিতে পারিল না বটে, কিন্তু থানার বাহিরে আসিয়াই সে যখন কমলের দাদাকে দেখিতে পাইল, তখন তাহার নিকট শুনিল, কমল নিরুদ্দেশ হইবার পরে রামময়ের ক্রোধে গৃহে যেন ভূমিকম্প সৃষ্ট হয়। তিনি তখনই পুলিসে সংবাদ দিয়া নির্ম্মলকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সন্ধ্যার পরে যখন তাঁহার উকীল আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন—বিষয়টি গোপন রাখাই সুবুদ্ধির কায এবং তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন না হইলে নির্ম্মল তাঁহাকে অনেক টাকা খেসারতের জন্য দায়ী করিতে পারে, তখন রামময়ের ক্রোধের খড়ের অগ্নিতে বারিবর্ষণ হয় এবং তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহারাজীবের সহিত থানায় গমন করেন। তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করিলেন বটে, কিন্তু তখন গারদ ঘর বন্ধ করিয়া চাবি লইয়া দারোগা তাঁহার হুদ্দায় সন্দেহজনক স্থানসমূহ পরিদর্শনে গিয়াছেন। কাযেই নির্ম্মল তখন মুক্তি পাইল না—পরদিন প্রাতে মুক্ত হইল।

মুক্তি পাইয়া সে ছাত্রাবাসে আসিল। তথায় আসিয়া সে সকলের ব্যবহারে বুঝিল, তাহারা তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করিতেছে—যেন সে অপরাধের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। সে অবস্থায় তথায় বাস করা যায় না।

কমল সে কথা শুনিতেছিল। নির্ম্মল যখন থানায় তাহার দৈহিক লাঞ্ছনার কথা বলিয়াছিল, তখনই কমলের দুই চক্ষুতে অশ্রু টলটল করিতেছিল—ছাত্রাবাসে তাহার অপমানের কথায় সেই অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। নির্ম্মলের কথা শুনিবার আগ্রহে সে অশ্রু মুছিতেও ভুলিয়া গেল

নির্ম্মল বলিল, সে অবস্থায় তাহার গমনের একমাত্র স্থান—শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের তীর্থ পিতা। তাঁহাকে সকল বিষয় জানানও তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য। সে তাঁহার নিকটে গেল। পিতা পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেন; তাহার ব্যথার কণ্টক সহানুভূতি দিয়া তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, "বাবা, মানুষের জীবন পরীক্ষাক্ষেত্র—যে সাহস হারায়—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। তুমি নিরপরাধ—তোমার সেই বিশ্বাসই তোমাকে সবল রাখুক। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এক দিন সুখী হ'বে।"

সে কি করিতে চাহে, তাহার পিতা তাহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আপাততঃ সে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া—সকল অপবাদগুঞ্জনের সীমার বাহিরে যাইতে চাহে। পিতা সম্মত হইলেন। তিনি তাহারই জন্য এবং কাযের আনন্দে চাকরী করিতেছিলেন; সে চাকরী ত্যাগ করিয়া পুত্রকে লইয়া প্রথমে জামাতার কর্ম্মস্থান বারাণসীতে কন্যা-জামাতার কাছে আসিলেন।

সে কি করিবে, নির্ম্মল কলিকাতা-ত্যাগের দিন হইতেই তাহা ভাবিতেছিল। কাশীতে উপনীত হইয়া সে স্থির করিল, রুড়কী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইবে। পিতা তাহাতে আপত্তি করিলেন না। প্রথম বৎসর পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল এবং বৃত্তি পাইল—পিতার নিকট হইতে আর অধিক অর্থ লইবার প্রয়োজন হইল না। তাহার পিতা সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকিবার অভ্যাসে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বারাণসীতে আসিয়া তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে পরীক্ষায় পুরস্কার পাইয়া নির্ম্মল পিতার নিকট য়ুরোপে যাইয়া এঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়া আসিবার প্রস্তাব করিল। পিতা তাহাকে তাঁহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয়ের পরিমাণ জানাইলেন—মাত্র ১০ হাজার টাকা। তাহার অর্দ্ধেক সে লইবে স্থির করিয়া নির্ম্মল য়ুরোপ যাত্রা করিল; সঙ্কল্প করিয়া গেল, যত অল্প ব্যয়ে সম্ভব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—যত অল্পকালে সম্ভব ফিরিয়া আসিবে। কারণ, পিতার অর্থ অল্প, আর তিনি তাহার প্রত্যাবর্ত্তন-পথ চাহিয়া থাকিবেন।

সে তাহাই করিল—তৃতীয় বৎসরে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সে স্বদেশে ফিরিল—সেচ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিল। সে আসিয়াই চাকরী করিতে আমন্ত্রিত হইল; কিন্তু চাকরী না করিয়া পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ার হইল—এই দীর্ঘকাল সে সেই কাযই করিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহার অর্থ ও যশ কিছুরই অভাব হয় নাই। এখন সে অবসর গ্রহণ করিতে চাহে; কিন্তু যে সামন্ত রাজ্যে সেচের ব্যবস্থা করিয়া সে বহু "পতিত" জমি "উঠিত" করিতেছে, সে রাজ্যের রাজা যেমন তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না—তাহারও তেমনই কাযের শেষ দেখিতে আগ্রহ রহিয়াছে। সেই জন্যই সে অবসর লইবে লইবে মনে করিলেও লইতে পারিতেছে না।

ইহাই তাহার জীবনের ইতিহাস। ইহাতে বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই—সবই যেন স্রোতোহীন জলের বিস্তার।

৫

কমল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত বিবাহ কর নাই; তোমার বাবা কি তোমাকে বিবাহ করিতে বলেন নাই?"

নির্ম্মল বলিল, "না। আমার ভগিনী দু' এক বার সে কথা বলেছিলেন। আমি অনিচ্ছা জানা'লে বাবা আমার পক্ষ সমর্থন ক'রে তাঁ'কে ব'লেছিলেন, 'তুই জিদ করিস না। মেয়েটির কথা এক বার ভেবে দেখ,—সে ওকে না পেলেও ওর প্রতি ভালবাসার মর্য্যাদা রাখবার সঙ্কল্পে বিপদের অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে। নির্ম্মল

যদি তা'র সেই ভালবাসার মর্য্যাদা রাখতে পারে, তবে আমি তা'তে ওর জন্ম গর্ব্বই অনুভব করব।"

কমলের মনে হইতে লাগিল, সে যেন তাহার অন্তরে আনন্দ ও বেদনার দ্বন্দ্বে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

আপনার অভিভূত ভাব সে দমন করিল—তাহার জীবনে অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সে নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায় ?"

নির্ম্মল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; বলিল, "দু' বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁর ছেলের গীতাপাঠ শুনতে শুনতে তাঁ'র সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। তা'র পর হ'তেই আর এ বৈচিত্রহীন জীবন ভাল লাগছে না ব'লে অবসর নেব নেব করছি।"

"কেন এমন ভাবে জীবন কাটা'লে ?"

"এ-ই আমার নিয়তি।"

"কেন ?"

"ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমার সঙ্গে তোমার আসবার কথা হয়েছিল, তখন তা' হ'লে কি হ'ত বলতে পারি না। তা' হয় নাই—সুতরাং যে জীবন যাপন করেছি, তা'-ই কি আমার নিয়তি নহে ?"

"সে অভিমান কি আজও ত্যাগ করতে পার নাই ?"

"আমার কথায় বিশ্বাস কর—সে জীবনের মধ্যাহ্নের কথা; সে দিনও আমি তোমার সমাজের ও সংস্কারের মর্য্যাদা রক্ষার তৎপরতার প্রশংসা করেছি, তা'কে শ্রদ্ধা করেছি; আজ জীবনের অপরাহ্ণেও তা'-ই করি। এ আমার অভিমান নহে।"

কমলের অন্তর আবার আনন্দে ও বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল—এ বার আনন্দে ও বেদনায় দ্বন্দ্ব নাই—উভয়ে নির্ম্মলের প্রতি প্রশংসার সঙ্গে—যেন ত্রিবেণী-সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে।

৬

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল। ট্রেণ তখনও চলিতেছে।

নির্ম্মলকে কমল জিজ্ঞাসা করিল, "কলিকাতায় গিয়াছিলে কেন ?"

"বোধ হয়, তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে বলেই। নহিলে এত দিন পরে এক বার পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান দেখবার জন্ম আগ্রহ হ'ল কেন ?"

"কি দেখলে ?"

"কিছুই আর চিনা যায় না—এত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। মনে হ'ল—যা' মনে আছে, তা'-ই রক্ষা করাই ভাল: কারণ, পুরাতনই ভাল লাগে। তোমাদের বাড়ীর অবস্থা দেখবার—তোমার দাদার সংবাদ ল'বার ইচ্ছা হয়েছিল—সাহস হ'ল না।"

"কেন ?"

"ভয় হ'ল—কি জানি, তোমার সম্বন্ধে কি সংবাদ শুনব।"

তাহার পরে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কলিকাতাতেই ছিলে ?"

কমল বলিল, "না।"

"তবে ?"

তখন কমল তাহার এই ৩০ বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিল।

৭

যে দিন রামময় সরকারকে পাঠাইয়া নির্ম্মলকে তাঁহার গৃহে আর প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই দিনই তিনি বলেন, পরদিন প্রাতে কয় জন কমলকে দেখিতে আসিবেন—বলা বাহুল্য, সে বিবাহের জন্ম মনোনীত হইতে পারে কি না, তাহাই দেখা। পরদিন প্রভাতেই রামময় তাঁহার স্ত্রীকে বলেন, যেন কমলকে কয়খানি মূল্যবান্ অলঙ্কার পরাইয়া দেখান হয়; যে স্থানে রূপ ও গুণ আকর্ষণ হয় না, সে স্থানেও অর্থ লোককে আকৃষ্ট করিতে পারে—অন্ততঃ মানুষের বিচার প্রভাবিত করিতে পারে। পূর্ব্বরাত্রিতে কমল ঘুমাইতে পারে নাই এবং প্রভাতে তাহাকে দেখিয়া তাহার বৌদিদি তাঁহার শাশুড়ীকে বলিয়াছিল, "মা, কমলের যে চেহারা হয়েছে, তা'তে দেখাবেন কি ক'রে ?" মা কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তবে, বোধ হয়, তাঁহার মনে হইতেছিল, যাঁহারা দেখিতে আসিবেন, তাঁহারা যদি পসন্দ না করেন—তবে ভালই হয়। কারণ, কমল রাত্রিতে শুনিয়াছিল, তাহার মা ও দাদা বলাবলি করিতেছিলেন, যখন রামময় জিদ করিয়াছেন তখন কমলকে দেখাইতেই হইবে; তবে দেখাইলেই যে বিবাহ হইবে তাহা যখন নহে, তখন—দেখান হইবার পরে আবার কি করা যায় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

কমল কিন্তু স্থির করিয়াছিল, সে কিছুতেই আপনাকে দেখাইবে না।

যখন গহনাগুলি লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া রামময়কে সংবাদ দেওয়া হইল, তখন তিনি আসিয়া কমলকে কোন্ কোন্ গহনা পরান হইবে, তাহা বলিয়া বৈঠকখানায় ফিরিয়া যাইলেন।

সেই সময় তাহার মাতা যখন যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদিগের আহার্য্য সাজাইবার জন্ম রৌপ্যের পাত্রগুলি বাহির করিয়া দিতে গমন করিলেন, সেই অবসরে কমল কয়খানি অলঙ্কার পরিধান করিল—সে পাথেয় হিসাবে। সে মনে করিয়াছিল, হাঁটিয়াই চলিয়া যাইবে। কিন্তু অঙ্গে একখানি চাদর জড়াইয়া সে যখন গৃহের পশ্চাদ্দিকের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নামিয়া পশ্চাতের দ্বারে উপনীত হইল, তখনই দেখিতে পাইল, একখানি ভাড়াটিয়া মোটরযান সেই গলীতে যাত্রী নামাইয়া চলিয়া যাইবার জন্ম যাত্রা করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া বসিল; যে দাসী বাজারে কি আনিতে যাইতেছিল, তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলে সে কোন প্রশ্ন না করিয়া যানে উঠিল। যান চলিল। কোথায় যাইতে হইবে, তাহা কমলই বলিয়া দিল।

গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে তাহার ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল; কারণ, তাহার পরিচিত পরিবেষ্টনই অল্প। সে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের যে বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিল, তাহারই শিক্ষয়িত্রীদিগের বাসগৃহের নিকটে আসিয়া সে যান থামাইতে বলিল—নামিয়া যান-চালককে তাহার প্রাপ্য টাকা দিল এবং সে চলিয়া যাইলে দাসীকে একখানি দশ টাকার "নোট" দিয়া বলিল, "বাড়ী যা, হারার মা; আমার কোন কথা কাউকে বলিস্ না—বললে তোরই বিপদ হ'বে; পুলিসে দিবে।" সে যে পুলিসকে অত্যন্ত ভয় করিত, তাহা কমল জানিত।

কমল শিক্ষয়িত্রীদিগের আবাসে যাইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ দিয়াছিলেন, সেই "সিষ্টার" আগনেশের সন্ধানে গেল। সে তাঁহাকে সকল কথা বলিলে তিনি তাহাকে অভয় দিলেন বটে, কিন্তু আশ্রয় দিতে ভয় পাইলেন।

"সিষ্টার আগনেশ স্থির করিলেন, কমলের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য তিনি তাহাকে লইয়া আসানসোলে তাঁহাদিগের কেন্দ্রে বৃদ্ধা "মাদারের" নিকটে যাইবেন। উভয়ে মোটরে যাত্রা করিলেন।

তাহার পর—সব শুনিয়া "মাদার" তাহাকে গৃহে ফিরিতে বলিলেন এবং সে যাইতে অসম্মত হওয়ায় শেষে তাহাকে ছাত্রীদিগের আবাসে থাকিয়া পড়িবার অনুমতি দিলেন। গহনার জন্য অর্থের অভাব হইল না।

ছয় মাস পরে প্রবেশিকা পরীক্ষা। কমল সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তখন বিদ্যাই তাহার একমাত্র আকর্ষণ—জীবনের অবলম্বন হইয়াছে। সে পিত্রালয়ের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছে—তথায় আর তাহার ফিরিবার উপায় নাই; সে অন্য অবলম্বন পায় নাই। সে পড়িবে। কিন্তু কলিকাতায় যাইতে তাহার সাহস হইল না। ""মাদারের" সহিত পরামর্শ করিয়া সে তাঁহার এক পরিচিতা মহিলার নিকট পঞ্জাবে যাইয়া তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে স্থির করিল। সেই মহিলাটি লাহোরে ডাক্তার—তাঁহার স্বামীও তাহাই।

তাহার পরে কয় বৎসর কাটিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যতীত সেই পাঁচ ছয় বৎসরে আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। প্রত্যেক পরীক্ষায় সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পদক সবই লাভ করিত। শেষ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবার পরেই সে শিক্ষা বিভাগে চাকরী পাইল। সে এখনও চাকরী করিতেছে। তাহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য নাই। তবে তাহার ভাগ্যে লাঞ্ছনা বা উৎপীড়ন হয় নাই—হইয়াছে—

কমল কথাটি বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া নির্ম্মল সেই কথাটি যোগাইয়া দিবার জন্য বলিল—"প্রলোভন ?"

কমল হাসিল, বলিল, "তা' বলতে পার। মানুষের যেন বিশ্বাস, বিবাহই সংসারে মানুষের নিয়তি আর সেই জন্যই তা' অনিবার্য্য।"

নির্ম্মল বলিল, "তা'ই বটে, কমল! জীবনের মধ্যাহ্ন আজ স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই স্মৃতিই এই অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত আমাদের দু' জনেরই জীবন-পথ নির্দ্দিষ্ট করেছে। সেই মধ্যাহ্নে যে কারণে তুমি আমার বাবার কথায় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিলে আর আমি তোমার মত সাহসের পরিচয় না দিলেও তোমারই আদর্শ অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি—সেই কারণ স্মরণ করলেই ত তা' বুঝতে পারবে। তা'তেই কি আমাদের নিয়তির সন্ধান মিলে না ?"

কমল ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনা জীবন-মধ্যাহ্নের যে ভাবের সৌরভে আমোদিত, সে ভাব ত তাহার সমস্ত জীবন সৌরভে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে!

কিছুক্ষণ পরে নির্ম্মল বলিল, "সে-ই ত বিবাহ, কমল! সমাজের নিয়মের শেষ সাজটুকু তা'তে না পরান হ'লেও তা'তে যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে।"

কমল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

নির্ম্মল বলিল, তাহার পর কি হইয়াছে ? কমল বলিল, যাহার সঙ্কল্প দৃঢ় থাকে, সে বিচলিত হয় না—যাহাকে নির্ম্মল প্রলোভন বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, তাহা তাহার নিকট রাজহংসের গাত্রে জলের মত পড়িলে গড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যূথিকা রায় হ'লে কেমন ক'রে ?"

কমল বলিল, "যখন আসানসোলে স্কুলে ভর্ত্তি হ'লাম, তখনই নাম-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন প্রথম বুঝলাম। কি নাম হ'বে। তখন মনে পড়ল, দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে এসে যে দিন প্রথম তুমি আমার নাম জানলে, সে দিন ব্যঙ্গ ক'রে দাদাকে বলেছিলে, "কমল কেন ? কমলে ত কণ্টক থাকে; ও যেরূপ নম্র দেখছি, তা'তে ওর নাম যূথিকা হ'লেই ঠিক হয়। সেই কথা স্মরণ ক'রে ঐ নামই গ্রহণ করি।"

নির্ম্মল মনে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কলিকাতায় এসেছিলে কেন ?"

চাকরীর কাযে অনেক বার কলিকাতায়—সম্মিলনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যা'বার কারণ হয়েছে বটে, কিন্তু যেতে সাহস হয় নাই। আমি যাই নাই। এ বার যখন কারণ হ'ল, তখন ভাবলাম, ত্রিশ বৎসর আগে ত কমলের মৃত্যু হয়েছে। আর ভয় কেন ? ত্রিশ বৎসরে পরিচিত পুরাতনের কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, দেখবার কৌতূহলও আমাকে আকৃষ্ট করছিল।"

"কিন্তু কমল যে মরে নাই, তা' অন্ততঃ দেড় জন লোক ত জানে।"

বিস্মিত ভাবে কমল জিজ্ঞাসা করিল, "দেড় জন!"

নির্ম্মল বলিল, "হাঁ। আমি—এক জন! আমি কখন মনে করি নাই যে, কমলের মৃত্যু হয়েছে। আর তুমি—তুমি যূথিকা হ'বার চেষ্টা করেছ ব'লে তুমি আধখানা।"

কমল হাসিল।

নির্ম্মল বিস্মিত হইল—দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সে কমলের মুখে যে হাসি লক্ষ্য করিয়াছিল—যে হাসি তাহাকে মুগ্ধ করিত, এ যে সেই হাসি। তবে কি এই দীর্ঘ কালের কথা—স্বপ্নমাত্র ? না—এই দীর্ঘ কাল তাহার প্রলেপে সেই হাসি আবৃত করিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াছি ? কিন্তু সে জানিত না, তাহাকে দেখিয়া কমলের মনেও সেইরূপ ভাব উদ্রিক্ত হইতেছিল।

কমল বলিল, "নূতন নামে দোষই থা'ক আর গুণই থা'ক, তা'র দায়িত্ব তুমি অস্বীকার করতে পার না।"

নির্ম্মল বলিল, "হয়ত দু'জনে এই সাক্ষাতের জন্যই দু'জনই কলিকাতায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম।"

কমল বলিল, "তা অসম্ভব নহে। কারণ, আমাদের বুদ্ধির ও কল্পনার অগোচর ব্যাপারও পৃথিবীতে ও হয়ত অন্যত্র হয়।"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে কি গিয়াছিলে ?"

"বাড়ীতে যাই নাই—বাড়ীর দিকে গিয়াছিলাম। বাড়ীর কাছেই গাড়ী রেখে নেমে গেলাম। দেখে চিনা যায় না। সম্মুখে যে বাগান ছিল—তা' আর নাই; সেই অরিওডক্স গাছ, সেই চাঁপা আর করবীর গাছ, সে সব কেটে সেই জমিতে ঘর হয়েছে—তা'তে দোকান। বাড়ীর গেট আর মাঝখানে নাই—এক পাশে হয়েছে। দেখলাম, সেই গেটের মধ্যে সেই পুরাণ দ্বারবান বলবন্ত তেওয়ারী; খুব বুড়া হয়েছে। এগিয়ে গিয়ে তা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, তা'দের যে দিদিমণির সন্ধান পাওয়া যায় নাই—তিনি এখন কোথায় ?
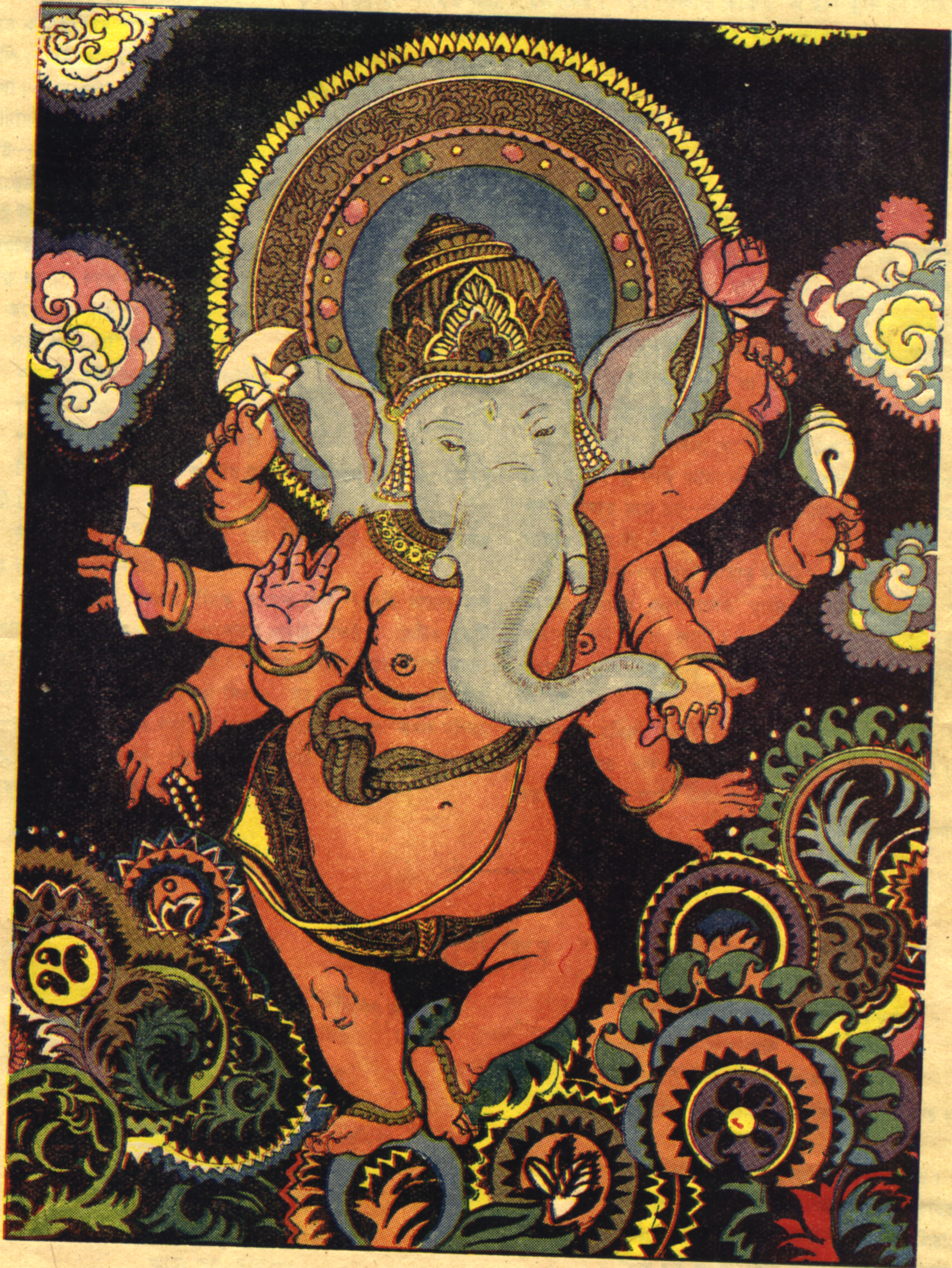
"গণেশ-শৈশব বিভূতি-বৈভব দিগম্বর।"

—ভারতচন্দ্র

[শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দ্বারবান যেন চমকে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কে? আমি বললাম, আমি তা'র সঙ্গে পাদরীদের স্কুলে পড়তাম—অনেক দিন পরে কলিকাতায় এসেছি। সে বলল, তা'র কথা যেন আর না তুলি। সে তা'কে কোলে করে 'মানুষ' করেছিল—সে কত দিনের কথা। সে এখন আর চোখে দেখতে পায় না; দেশে ছিল—চোখ কাটাবার জন্য এসেছে। কথায় কথায় জানলাম, বাবা মা কেউই নাই—দাদারা ভিন্ন হয়েছেন—সে বাড়ীতে দাদা আর ছোট ভাই আছেন—বাড়ীর মধ্যে প্রাচীর উঠেছে। বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল—আমার কথা যেন অধিক মন দিয়ে শুনতে লাগল। আমার ভয় হ'ল—যা'দের দৃষ্টি থাকে না, তা'দের শ্রবণশক্তি অধিক তীক্ষ্ণ হয়। হয়ত সে আমার কণ্ঠস্বর চিন্‌তে পারছে। আর বিলম্ব না করে এসে গাড়ীতে উঠলাম—গাড়ী চালাতে বললাম। ভাবলাম, যা' সত্য ছিল, তা' স্বপ্ন হয়েছে।"

কমলের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

গাড়ী চলিতে লাগিল।

পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিয়া ছিল।

নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমার জন্য জীবন ব্যর্থ করেছ—আমিই দায়ী।"

কমল বলিল, "আমি কিন্তু এক দিন—এক মুহূর্ত্তও তা' মনে করি নাই। কেন জান?"

কমল তাহার জামার নিম্নে আঙ্গুল দিল—একটি অত্যন্ত সরু সোণার হার বাহির করিল, তাহাতে একটি লকেট। সেটির একটি স্থান টিপিলেই ডালা খুলিয়া গেল। কমল সেটি হাতে লইয়া হাত খানি নির্ম্মলের দিকে বাড়াইয়া দিল। দূর হইতে ভাল দেখা যায় না—তাই নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর যে বেঞ্চে কমল বসিয়া ছিল, তাহাতে তাহার পার্শ্বে বসিয়া সেটি হাতে লইয়া দেখিল। উভয়ের হস্তে স্পর্শ হইল।

নির্ম্মল দেখিল, তাহারই প্রতিকৃতি—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের—যৌবনের। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছবি তুমি কোথায় পেলে?"

কমল বলিল, "দাদার ঘরে তোমাদের ক' বন্ধুর একখানি ছবি ছিল। আমি আসবার সময় সেখানি চুরী করে আনবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারি নাই! তাতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে—তবে আমি অপরাধী।"

পাশাপাশি বসিয়া উভয়েরই মনে হইতেছিল, ত্রিশ বৎসরের মিথ্যা আবরণ ঘটনার পবনে সরিয়া গিয়াছে—তাহারা সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের পরিবেষ্টনে পরস্পরকে দেখিতেছে।

নির্ম্মল বলিল, "কমল, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জীবনের মধ্যাহ্নে সংস্কার-সম্ভ্রমে শ্রদ্ধাহেতু যা' বলতে পারি নাই আজ জীবনের অপরাহ্ণে যদি তা' বলি, তবে কি তুমি আমার উপর রাগ করবে?"

কমল বলিল, "তোমার কি মনে হয়, আমি তোমার উপর রাগ করতে পারি? আমার ত তা' মনে হয় না।"

"আমি যা' বলব তা' করতে সম্মত হ'বে?"

"আমার যে দৌর্ব্বল্য আমি এই ত্রিশ বৎসর দমিত ক'রে রেখেছিলাম, তা'-ই আজ আমাকে অভিভূত করছে—তা'-ই প্রবল হচ্ছে। আজ আমার মনে হয়—তুমি কিছু বললে তা'তে 'না' করবার ক্ষমতা আমার হ'বে না।"

"তবে চল—আমরা আমার ভগিনীর বাড়ীতে যাই; যে সংস্কারে আমরা সমাজে আপনাদের স্বামি-স্ত্রী পরিচয় দিতে পারি, সেই সংস্কার শেষ করে আসি। তা'র পর যূথিকা আবার কমল হয়ে পঞ্জাবে তা'র কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে তা'র নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে আসবে। কি বল?"

কমল বলিল, "চল।"

নির্ম্মলের একখানি বাহু কমলকে বেষ্টিত করিল। কমলের মস্তক নির্ম্মলের বক্ষের উপর আসিয়া পড়িল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

যাত্রা শেষ

আনন্দ-পিয়াসী মন অভিসারে বাহিরিল কবে
কল্পিত গৌরবে;
কিংশুক রক্তিমরাগ সায়াহ্ন-বেলায়
কিম্বা হায়,—
ছিন্ন করি' আঁধারের ঘন যবনিকা
সধীর সঞ্চারে যবে আলোক-লিপিকা
ধরণীর দ্বারে এলো সুবর্ণ অক্ষরে;
সে-কথা গিয়াছি ভুলে' চিরদিন তরে।
আছে শুধু মনে,—
যেই ক্ষণে,
সন্ধানী নয়ন মেলি' যেদিকে চাহি রে
আনন্দ! আনন্দ শুধু! তাহা ছাড়া কিছুই নাহি রে!

আনন্দ বিহীন নাহি ধরণীর লেশতম ঠাঁই।
পত্রে-পুষ্পে জলে-স্থলে যেদিকে তাকাই
অনন্ত আকাশ হতে
আনন্দের বন্যা নামে অনাবিল ধূলির মরতে!
সে-প্লাবনে
নিয়ত গাহন করে নর-নারী উল্লসিত মনে।
বিকাইনু সেই তীর্থে আপনারে নিঃশেষ করিয়া
একত্বের অনাহত বাণী যেথা ওঠে আন্দোলিয়া,—
"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ···" (বৃক্ষের সমান
মহাকাশে স্তব্ধ যিনি রাত্রি দিনমান)!
সেথা আমি ধীরে ধীরে
আনন্দের মধু স্পর্শে খুঁজে পাই আমার আমিরে!

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার

কথাশিল্পীর হত্যা-রহস্য

[উপন্যাস]

ত্রয়োদশ পল্লব

অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ঘটনা

ডেভিড গারসাইড সেই দিন রাত্রিকালে বিচারক মিঃ স্বার্থডেলের বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া পকেট হইতে একটি রিভলবার বাহির করিল। সে তাহা তাহার সম্মুখস্থ টেবলের উপর রাখিতেই মিঃ স্বার্থডেল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মিঃ গারসাইড, আজ আপনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াই আমার স্মরণ হইতেছে; সুতরাং আমার ধারণা, আপনাদের মামলার নাটকসুলভ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া আমি বিরক্তিবশতঃ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে।"

ডেভিড বলিল, "হাঁ মাই লর্ড, আমি তাহা শুনিয়াছিলাম; তবে এখন একটি কথা আমি জানিতে চাই। আমি আদালতের বাহিরে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি; এখনও কি আপনাকে 'মাই লর্ড' বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রয়োজন হইবে?"

মিষ্টার স্বার্থডেল বলিলেন, "এখন আপনি আমাকে আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে পারেন; কিন্তু আপনি কি কারণে এই রাত্রিকালে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন তাহা আমাকে বলিবেন কি?"

ডেভিড ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ মিঃ স্বার্থডেল, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া এই কথা বলিতে আসিয়াছি যে, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেনটন মিস্ ওলিভিয়া ডেন কর্ত্তৃক নিহত হন নাই, ইহার অকাট্য প্রমাণ আমার হস্তগত হইয়াছে।"

জজ বিরক্তিভরে বলিলেন, "আপনি কি আমার উপর প্রভাব-বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিতে আসিয়াছেন?

ডেভিড এই প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু এ কথা আপনার অজ্ঞাত নহে যে, আমাকে হত্যা করিবার জন্ম পূর্ব্বে একবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। পুনর্ব্বার ঐরূপ চেষ্টা হইবে না—এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। পুনর্ব্বার ঐরূপ চেষ্টা হইলে আমি যাহা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশের আর সম্ভাবনা থাকিবে না এবং অপরাধী নরহত্যা করিয়াও শাস্তি পাইবে না। সে তখন আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইবে। এই কারণে আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছি, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন গুপ্তস্থানে সুরক্ষিত করিয়াছি, এবং আমার কৌঁসুলীকে এই উপদেশ দিয়াছি যে, যদি আগামী কল্য আদালতে উপস্থিত হওয়া আমার অসাধ্য হয়, তাহা হইলে পুরু লেফাফায় সংরক্ষিত সেই বিবরণ তিনি উক্ত গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া 'অয়ার' নামক দৈনিক পত্রিকার কার্য্যালয়ে লইয়া যাইবেন, এবং সংবাদ বিভাগের সম্পাদকের হস্তে তাহা প্রদান করিবেন। মিঃ স্বার্থডেল, মামলার নাটক-সুলভ বৈশিষ্ট্যের প্রতি আপনার উৎকট ঘৃণার কথা জানি বলিয়াই এই অসময়ে আপনার গৃহে আসিয়া এ কথা আপনার গোচর করিতে বাধ্য হইলাম।"

মিঃ স্বার্থডেল গভীর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না! দুই রাত্রি পূর্ব্বে আপনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কি আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে? আপনার অদ্ভুত কথা (extraordinary words) শুনিয়া তাহার কারণ সম্বন্ধে ইহা ভিন্ন আর কিছু ধারণা করা যায় কি? যাহা হউক, আপনার বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে বলিবার জন্ম আমি আপনাকে আরও পাঁচ মিনিট সময় দিতেছি; তাহার পর আমার খানসামাকে ডাকিয়া আপনাকে এই কক্ষের বাহিরে রাখিয়া আসিতে বলিব। আপনি আমার দয়ার অপব্যবহার করিতেছেন, এবং আমার ভদ্রতাজ্ঞানের অমর্য্যাদা করিতেও আপনার কুণ্ঠা নাই!"

ডেভিড বলিল, "বুঝিয়াছি। আমার এই রিভলবার আপনার আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া থাকিলে আমি অবিলম্বেই ইহা স্থানান্তরিত করিতেছি। কিন্তু যে কথা আপনাকে বলিয়াছি, তাহা প্রত্যাহার করিতে আমি প্রস্তুত নহি মহাশয়!"

মিঃ স্বার্থডেল ডেভিডের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি কি কারণে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে? তুমি এক মিনিটের মধ্যে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, নতুবা আমি তোমাকে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইব।"

ডেভিড এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "ফরিয়াদী পক্ষের যে সকল বর্ণনার কিছু মূল্য আছে বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, আসামী পক্ষ হইতে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন হওয়ায় আমি আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি যে, আপনি জুরিদিগকে মামলা বুঝাইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই যেরূপ একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, প্রত্যেক বিজ্ঞ পুরুষ ও নারী তাহা অত্যন্ত অবজ্ঞা-জনক বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। এমন কি, আপনি এই মামলা সম্পর্কে যেরূপ আপত্তিজনক ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, 'অয়ার' পত্রিকার অফিসে তাহার তীব্র প্রতিবাদসূচক বিস্তর টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। এই পত্রিকার সম্পাদক আমাকে বলিয়াছেন, এই সকল কথা আপনাকে জানাইবার সম্পূর্ণ অধিকার তিনি আমাকে প্রদান করিলেন।"

মিঃ স্বার্থডেল উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, সংবাদপত্রসমূহে আমার সম্বন্ধে যদি কোন মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহা গ্রাহ্য না করাই আমার অভ্যাস; তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া থাকে, এবং আমি তাহা চিরদিনই অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছি।"

ডেভিড বলিল, "ট্রেনটন-হত্যার মামলার আসামী যে নিরপরাধ, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু তাহা ব্যতীত এই মামলার অতীব চিত্তাকর্ষক ও অনন্যসাধারণ একটি দিক্ আছে, তাহার গুরুত্ব ও মৌলিকতার কথা চিন্তা করিয়াই আসামী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌঁসুলীকে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।"

"আসামী পক্ষের কৌঁসুলী তাঁহার মক্কেলের অনুকূলে যে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন—তাহা অকাট্য ও অখণ্ডনীয় প্রতিপন্ন হওয়ায়

কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন—তাহা নির্দ্ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। তাঁহার মক্কেল যে মিঃ ট্রেনটনকে হত্যা করে নাই, সে নিরপরাধ—ইহার সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং কেবল তাহাই নহে, কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী, অর্থাৎ কে স্বহস্তে মিঃ ট্রেনটনকে হত্যা করিয়াছে তাহাও তিনি সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নাই। আমি অতি অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি; আমি চলিয়া আসিবার সময় তিনি আমাকে জানাইয়াছেন—তাঁহাকে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের অভিমত জিজ্ঞাসা করায় এটর্ণী-জেনারেলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বলা হইয়াছে। আপনি দীর্ঘকাল ফৌজদারী আদালতে মামলা পরিচালিত করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা হইতে আপনি বুঝিতে পারিবেন—তিনি উপযুক্ত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।"

কিছুকাল চিন্তার পর মিঃ স্কার্থডেল বলিলেন, "তোমার ভাই উপদেশ গ্রহণের জন্য যদি এটর্ণী-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন—তবে তাঁহার এই কার্য্য অসঙ্গত হইবে না বটে, কিন্তু এটর্ণী-জেনারেল যদি মনে করেন, অকারণে তাঁহার সময় নষ্ট করা হইয়াছে—তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতে পারেন—এ কথাও স্মরণ রাখা তোমার ভ্রাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, তোমার ভাই বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব, তিনি তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন—এরূপ মনে করিতে পারি; কিন্তু তুমি যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ—তাহা কি তুমি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে কর?"

ডেভিড দৃঢ় স্বরে বলিল, "হাঁ, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য; প্রকৃত অপরাধী তাহা হইতে কোন উপায়ে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; এবং প্রকৃত অপরাধী কে, জনসমাজ যখন তাহা জানিতে পারিবে, তখন তাহাদের মধ্যে কিরূপ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। অপরাধী আত্মসমর্পণে অক্ষম হইয়া কি উপায়ে সমাজে মুখ দেখাইবে—তাহাও আমার বুঝিবার শক্তি নাই।"

ডেভিডের কথা শুনিয়া বিচারক মিঃ স্কার্থডেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন; তাহার পর তিনি ঘণ্টাধ্বনি করিলে তাঁহার চাপরাসী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং তাঁহার ইঙ্গিতে ডেভিড গারসাইডকে বাহিরে লইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ-পল্লব

জুরির অভিমত

বিচারক মিঃ স্কার্থডেল পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরিয়া তাঁহার এজলাসের অদূরে উপবিষ্ট জুরিগণকে মামলা বুঝাইবার সময় সংবাদদাতাদের আসনের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত অগ্রাহ্য করেন বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করিলেও যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার চঞ্চল চক্ষু এক ব্যক্তির মুখের উপর পুনঃ পুনঃ সন্নিবিষ্ট হইতেছিল; সেই ব্যক্তি 'অয়ার' নামক দৈনিক পত্রিকার প্রতিনিধি এবং অপরাধিগণের অপরাধের বিবরণ-সংগ্রহে সুদক্ষ ডেভিড গারসাইড।

মিঃ স্কার্থডেল এজলাসে উপবিষ্ট হইয়া জুরিগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিলেন। তিনি বলিলেন, "জুরিগণ, গতকল্য আমি আপনাদের নিকট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, আসামী পক্ষের কৌশুলী তাঁহার মক্কেলের অনুকূলে এই মামলা পরিচালিত করিবার সময় একবারও এ কথার অবতারণা করেন নাই যে, অন্য কোন ব্যক্তি পিটার ট্রেনটনকে হত্যা করিয়াছিল। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, তাঁহার মক্কেল নিরপরাধ। এ অবস্থায় আমি আপনাদিগকে এই শেষ উপদেশ দান করিতেছি যে, আপনারা এই মামলার প্রকৃত বিচার্য্য বিষয়ের (issue) প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিবেন। তদতিরিক্ত কোন বিষয়ে (false issues) আপনাদের মন যেন আকৃষ্ট না হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, পিটার ট্রেনটনের হত্যার অভিযোগে অভিযুক্তা নারী প্রকৃতই নিরপরাধ, কি অপরাধী? এই প্রশ্নের উত্তর নির্দ্ধারণের জন্য একযোগে পরামর্শ করিতে আপনারা আদালত-কক্ষের বাহিরে গমন করুন। আপনাদের কর্ত্তব্য কিরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র। আপনারা শপথ করিয়া যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব আপনারা নিশ্চিতই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এতদ্ভিন্ন নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশের জন্যই আপনারা দেশের জনসাধারণের নিকট এবং আইনের নিকটও দায়ী! সেই আইনে ইহা সুস্পষ্টরূপেই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, নরহন্তা চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য, সুতরাং তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে।"

বিচারকের এই শেষ মন্তব্য শুনিয়া দর্শকগণের মধ্যে তুমুল গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ! আসামীকে ফাঁসে ঝুলাইবার জন্য জজ জুরিদের আদেশ করিল! এই খুনে জজের কাছে কোন আসামীর পরিত্রাণ নাই! উহার মতলব পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল?"

* * * *

কয়েক মিনিট পরামর্শের পর জুরিরা একযোগে এজলাসে ফিরিয়া আসিলেন। দর্শকগণ কৌতূহলভরে প্রধান জুরির মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া কেহই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না। প্রায় দশ মিনিট পরামর্শের পর তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

জজের পেস্কার জুরিদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আসামী অপরাধী না নিরপরাধ?"

প্রধান জুরি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "নিরপরাধ।"

তাঁহার অভিমত শ্রবণে আদালত-কক্ষে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। প্রহরী দর্শকগণকে নিস্তব্ধ থাকিতে আদেশ করিলেও কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না; আদালতে যেন হাট বসিল!

বিচারক মিঃ স্কার্থডেল ভ্রূভঙ্গি-সহকারে কঠোর স্বরে বলিলেন, "আদালত-কক্ষ গুণ্ডার আড্ডায় পরিণত হইবে, আমি ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। যদি তোমরা ভদ্র ব্যবহার করিতে না পার, তাহা হইলে আমি সকলকে এই কক্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইব।"

অতঃপর তিনি তরুণী আসামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাকে নরহত্যার অভিযোগ হইতে মুক্তি দান করা হইল।"

রায় প্রকাশ করিয়াই বিচারক মিঃ স্কার্থডেল দীর্ঘকালের কঠোর শ্রমে যেন ক্লান্ত হইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উভয় হস্তে মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ডেভিড গারসাইড অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ স্কার্থডেলের সম্মুখে উপবিষ্ট ব্যবহারাজীবগণকে লক্ষ্য করিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "উঁহার হাত ধরিয়া উঁহাকে বাধা দান করুন, ঐ ভয়ানক কার্য্য উঁহাকে করিতে দিবেন না; উনি যে এ চেষ্টা করিবেন—ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই মুহূর্ত্তে উঁহাকে বাধাদান না করিলে—"

ডেভিডের কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই সকলে ভাবিল—লোকটা কি ক্ষেপিয়া গিয়াছে? উহার ঐরূপ প্রলাপের অর্থ কি?"—কেহই তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না, এবং তাহার এই আদেশেও কর্ণপাত করিল না। সকলকেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ডেভিড এক লম্ফে বিচারকের আসনের অভিমুখে ধাবিত হইল।

মুহূর্ত্তের জন্য এই চাঞ্চল্যজনক নাটকের প্রধান নায়ক বিচারক মিঃ স্কার্থডেল ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ডেভিড গারসাইডের দৃষ্টি-বিনিময় হইল। যেন উভয়ে পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে উদ্যত! অবশেষে এই গভীর রহস্যপূর্ণ ও চাঞ্চল্যজনক মামলার বিচারক—যিনি প্রথম হইতেই নাটক-সুলভ ঘটনার প্রতি আন্তরিক বিরাগ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন—তিনি দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলির ফাঁকের ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র বটিকা বাহির করিয়া মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিলেন! মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বিবর্ণ মুখ ঘৃণার হাস্যে অনুরঞ্জিত হইল।

বিচারক হোরেসিও স্কার্থডেলের প্রাণহীন দেহ মুহূর্ত্তমধ্যে চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িল। সকলেই স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল—যেন কোন রঙ্গমঞ্চে বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয়ে যবনিকা-পাত হইল। ডেভিড গারসাইড ভিন্ন অন্য কেহই বিচারাসনে উপবিষ্ট বিচারকের আত্মহত্যার কারণ বুঝিতে পারিল না।

[ক্রমশঃ।

দীনেন্দ্রকুমার রায়।

কথা

কথা কভু নয় শুধু কথার কথা—
কথাতেই আছে সুখ-দুঃখ-ব্যথা।

কথাতেই ভদ্রতা কথায় অধম
কথা আনে নিতি কত লজ্জা-সরম।
কথায় কথায় লোকে কত কথা কয়,
কথা দিয়ে কথা-ছলে কত কথা লয়।
কথা রাখিবারে কেহ হয় সব-হারা,
কথা ভেঙ্গে কেহ নীচ ছন্ন-ছাড়া।
কথায় কথায় বাড়ে কথা-জঞ্জাল
কথাই তো বেড়ে হয় তিল থেকে তাল।
কথায় ভুলিয়া কেহ খায় ঘুরপাক,
কথা বেচে খায় লোক কত লাখ লাখ।
কথা ক্ষয় কথা ভয় কথা সংশয়
কথা স্নেহ প্রীতি মোহ জয়-পরাজয়।
নীরস মুখের কথা মরম দহে
সরস কথায় লোক সকল সহে,
মিষ্ট মধুর কথা হরে ব্যথা-মন,
ধরণীরে গ'ড়ে তোলে স্বরগ সমান।
বেশী কথা বলা যার বেশী অভ্যাস,
মূল্যহীন সেই জন—কথার সে দাস।
দুনিয়াটা বাঁধা শুধু কথা-বাঁধনে
কথা-বিশ্বাসে চলে জগত-জনে।
কথাতেই সংসারে শান্তি আসে,
ভাইয়ে ভাইয়ে দলাদলি কথারি ভাগে।
সংসার ভেঙ্গে চুরে কঙ্কালসার—
শতখান্ ক'রে তোলে কথা বার-বার।

বশীভূত হয় কেহ মুখের কথায়—
কেহ বা কাঁদিয়া মরে কথার জ্বালায়!
সকলেই সব পারে সব সহিতে
কথা-সহা কারো নাহি হয় মহীতে।
সামান্য মুখের কথা বাহিরিলে, হায়!
কভু তো তাহারে আর ফিরানো না যায়।
তা হতেই হতে পারে বিবাদ বিষম,
লাঠালাঠি খুনোখুনি, বেহুঁস জখম।
কান পাতি শুনে যাও যে যাহাই বলে,
সাবধানে রায় দিয়ো—যাইয়ো না গ'লে।
যতটুকু প্রয়োজন সংক্ষেপ সার—
মৃদু ভাষে ক'বে মন তুষি সবাকার।
বাক্-সংযমী সদা পায় সম্মান,
কথাধিক্যে নাহি রহে কোন কিছু দাম।
কথা দিয়ে কথা রাখে অচল অটল
ধরায় মহৎ সেই—হোক হীনবল।
কথা আর কাজ সদা সমান রাখি,
ক'রে যাও নিজ কাজ যা আছে বাকী।
কথার মতন কথা কহিয়ো সবে—
প্রাণ খুলে কাহারেও কিছু নাহি ক'বে।
যে কথা কহিতে হবে কহ নির্ভয়—
মিথ্যার কভু নাহি দিবে গো প্রশ্রয়।
ভাবিয়ো না কথা শুধু কথার কথা!
কথাতেই আনে সুখ-বেদনা-ব্যথা!

শ্রীহরেকৃষ্ণ অধিকারী।

বিজ্ঞান-জগৎ

মহাকাল ট্যাঙ্ক

যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য শত্রু-নিপাত। এ উদ্দেশ্য আবহমান কাল ধরিয়া সমান রহিয়াছে। পৌরাণিক যুগে রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; তার পর ঐতিহাসিক যুগে সেকন্দর শাহের বা রাজা পুরুর যুদ্ধ—সকল যুদ্ধেই বিপক্ষ-পক্ষের ধ্বংস-সাধনকল্পে অস্ত্রশস্ত্র বা ছলা-কলা-কৌশলের ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নাই! তার উপর নিজেদের যথাসম্ভব নিরাপদ্ রাখিয়া—সদলে বিপক্ষের উপর পড়িয়া আক্রমণে তাহাদের চূর্ণবিচূর্ণ করা; এবং সকল শক্তি যেন রণক্ষেত্রে না পর্য্যবসিত হয়—এ-সব দিকে রণোন্মত্ত সকল পক্ষের লক্ষ্য থাকিত। এ যুগের যুদ্ধেও এ কয় দিকে সকলের লক্ষ্য আছে; তার উপর এ
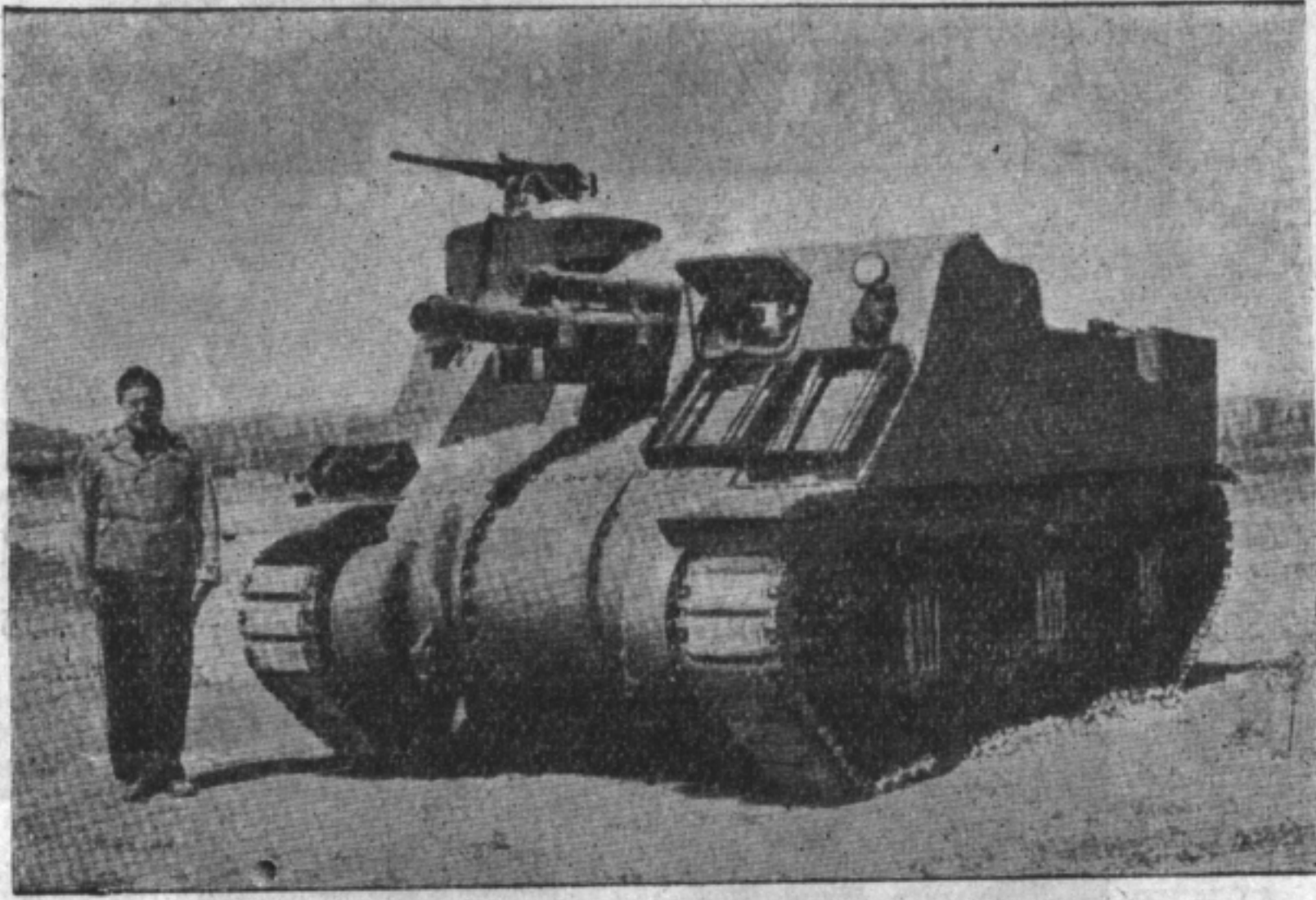
এম্-৭ মহাকাল-ট্যাঙ্ক

যুগে অগ্র-গতির বেগের দিকে লক্ষ্য ঘটিয়াছে। পদাতিক দলের গতি মন্থর, তার উপর তার গতি প্রতিপদে রুদ্ধ হয়; এ যুগে পদাতিক-শক্তির উপর নির্ভর না রাখিয়া শূন্যপথে প্লেন এবং স্থলপথে দুর্দ্ধর্ষ ট্যাঙ্ককে সহায়-স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ঘোড়ায়-ঘোড়ায়, গজে-গজে যুদ্ধ হইত,—এ যুগে যুদ্ধ হয় প্লেনে-প্লেনে, ট্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে! যে পক্ষের ট্যাঙ্ক যত দুর্দ্ধর্ষ হয়, তার বিজয়-লাভের আশাও হয় ততখানি অমোঘ এবং অব্যর্থ! মার্কিণ রণ-বিভাগ সম্প্রতি এম-৩ মিডিয়াম ট্যাঙ্কের উপর ১০৫-এম্ এম্ হাউইটজার চাপাইয়া যে নূতন ছাঁদের এম্-৭ ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিয়াছে, সে একেবারে বিশ্ববিজয়ী। সাত মাইল দূরে অবস্থিত সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্য—ট্যাঙ্ক, কামান, দুর্গ প্রভৃতিকে এ ট্যাঙ্ক নিমেষে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে; এবং ডাইভ-বমারের চেয়েও এ ট্যাঙ্কের গতি ক্ষিপ্রতর। এ ট্যাঙ্ক চলে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল রেটে; এবং গাছপালা খানা-ডোবার বাধাকে এ ট্যাঙ্ক বাধা বলিয়া মানিতে জানে না।

মহাকালের দোশর

আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনীয়ার লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ফ্রাঙ্ক মিকুল্ তৈয়ারী করিয়াছেন সর্ব্বজয়ী ট্যাঙ্ক। এ ট্যাঙ্কের নাম টি-এ-সি। এখানিকে এম্-৭ ট্যাঙ্কের 'যমজ-ভাই' বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এক-একখানি ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিতে প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন এঞ্জিন, চাকা এবং ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন অংশ লাগে সংখ্যায় প্রায় ৩০০০০ এবং যন্ত্র লাগে প্রায় ২০০। কোনো অংশ যদি ভাঙ্গে বা বিকল হয়, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে সে অংশের পূরণ ঘটানো সম্ভব ছিল না। এ বিপত্তি-মোচনকল্পে টি-এ-সি ট্যাঙ্কের সৃষ্টি। এ ট্যাঙ্কের জন্য তৈয়ারী হইয়াছে এক-ছাঁদের এঞ্জিন
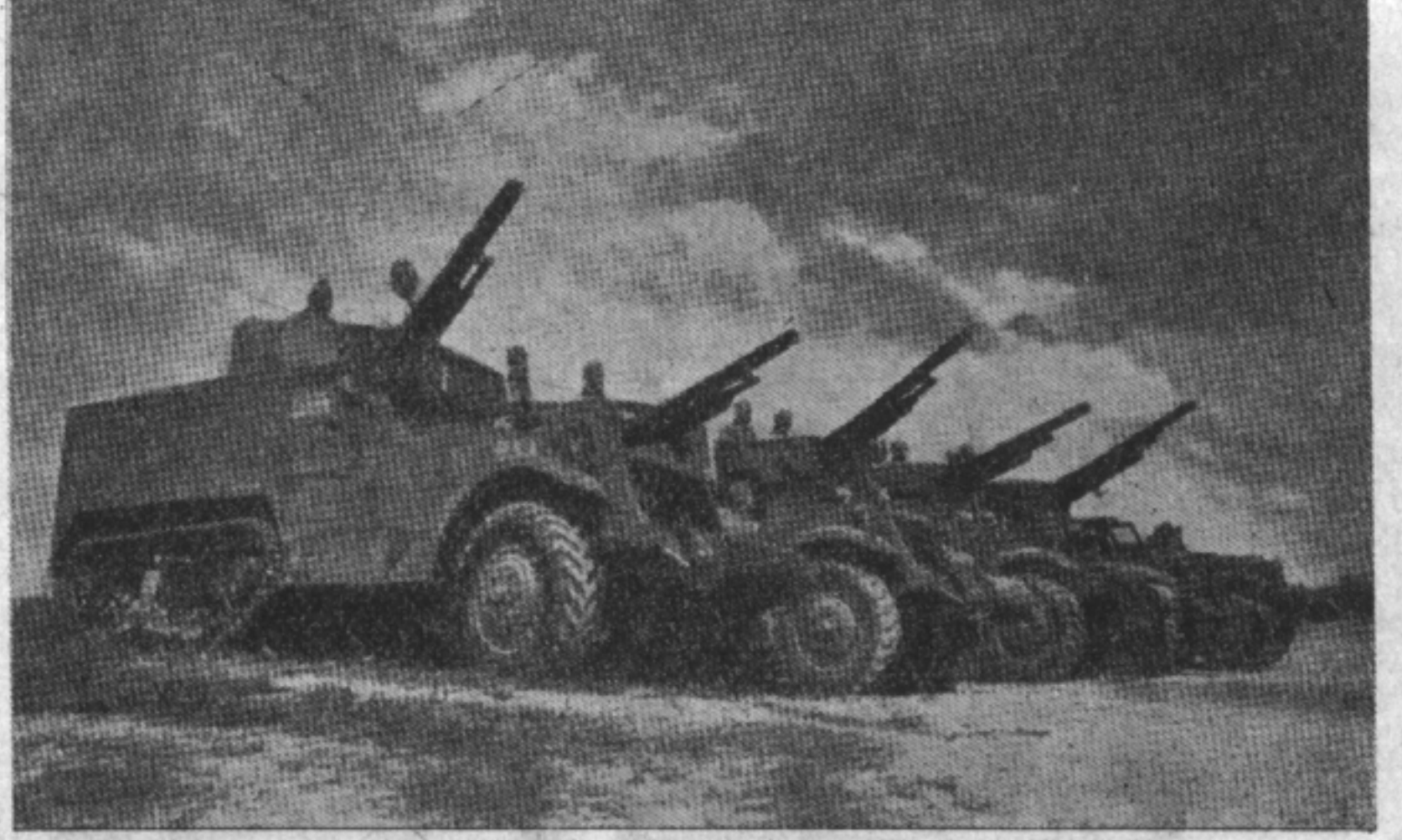
যমের দোশর

এবং অপর অংশগুলির সংখ্যাও কমানো হইয়াছে; এবং সে সব অংশে জটিলতা নাই। এ জন্য কোনো অংশ ভাঙ্গিলে বা অকর্ম্মণ্য হইলে ট্যাঙ্ককে সারাইয়া তুলিতে যেমন বিলম্ব ঘটে না, তেমনি অসুবিধাও এতটুকু ভোগ করিতে হয় না। এ ট্যাঙ্ক জলা-জঙ্গলেও চলে এবং চলে ঘণ্টায় ৫৫ মাইল রেটে। এ ট্যাঙ্কের শক্তি অসামান্য।

কামানবাহী গাড়ী

আমেরিকার সমর-বিভাগের আর এক কীর্ত্তি, কামান বহিবার জন্য বিশ্বম্ভর-ছাঁদের ট্রাক্টর। ঝোপ-জলা, জঙ্গল-পাহাড়, বিল—সর্ব্বত্রই
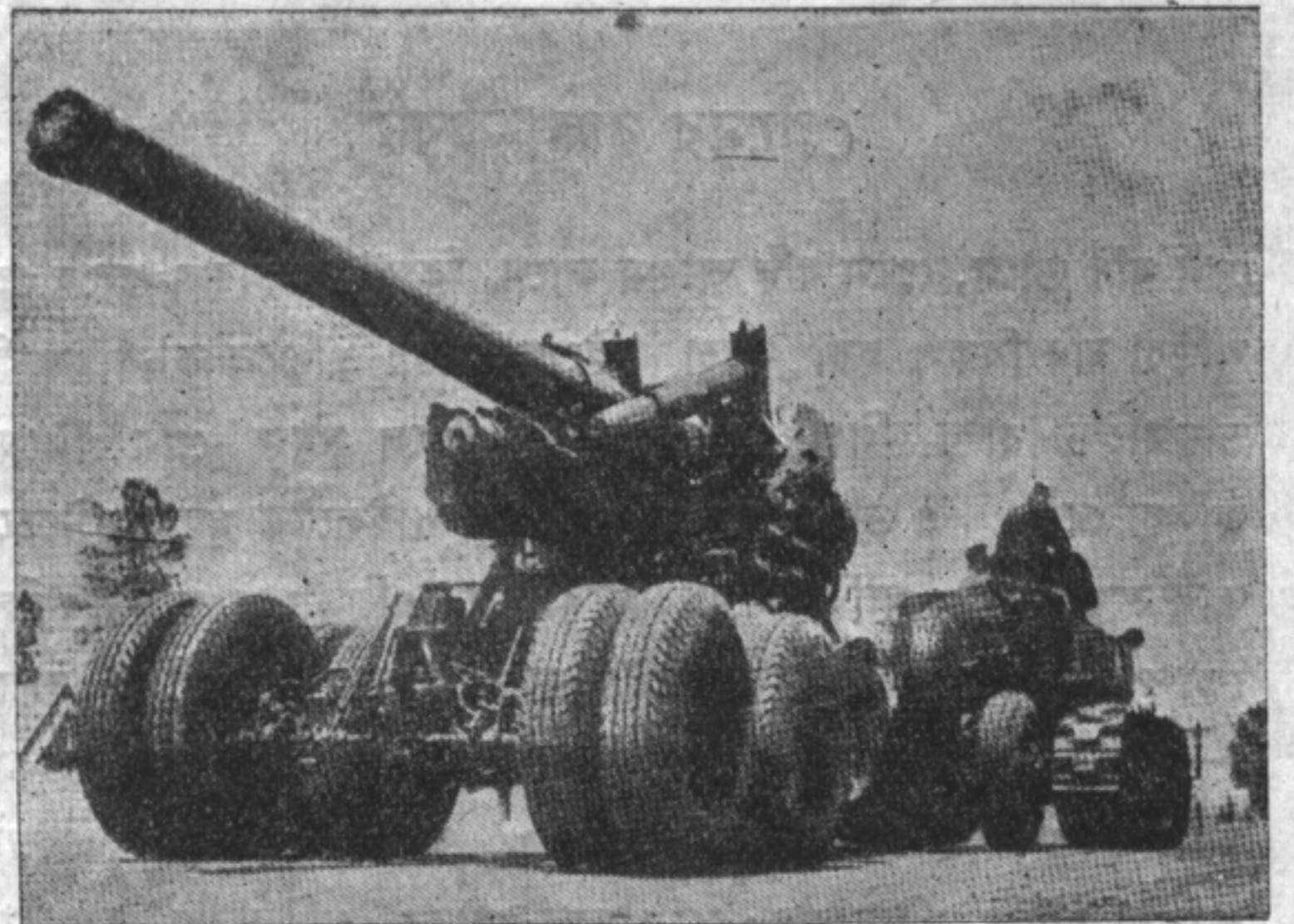
কামানবাহী ট্রাক্টর

এ ট্রাক্টরের গতি অবাধ এবং অব্যাহত। এ ট্রাক্টর চলে ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে।

মশা-মারা গাড়ী

আমেরিকার পল্লীগ্রাম-সমূহের সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে। বহু গ্রামে ম্যালেরিয়ার উৎপাত ঘটিয়াছিল। ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে এ্যানো-ফেলিশ-জাতীয় মশা। সে মশার বংশ নাশ করিতে আমেরিকা কামান
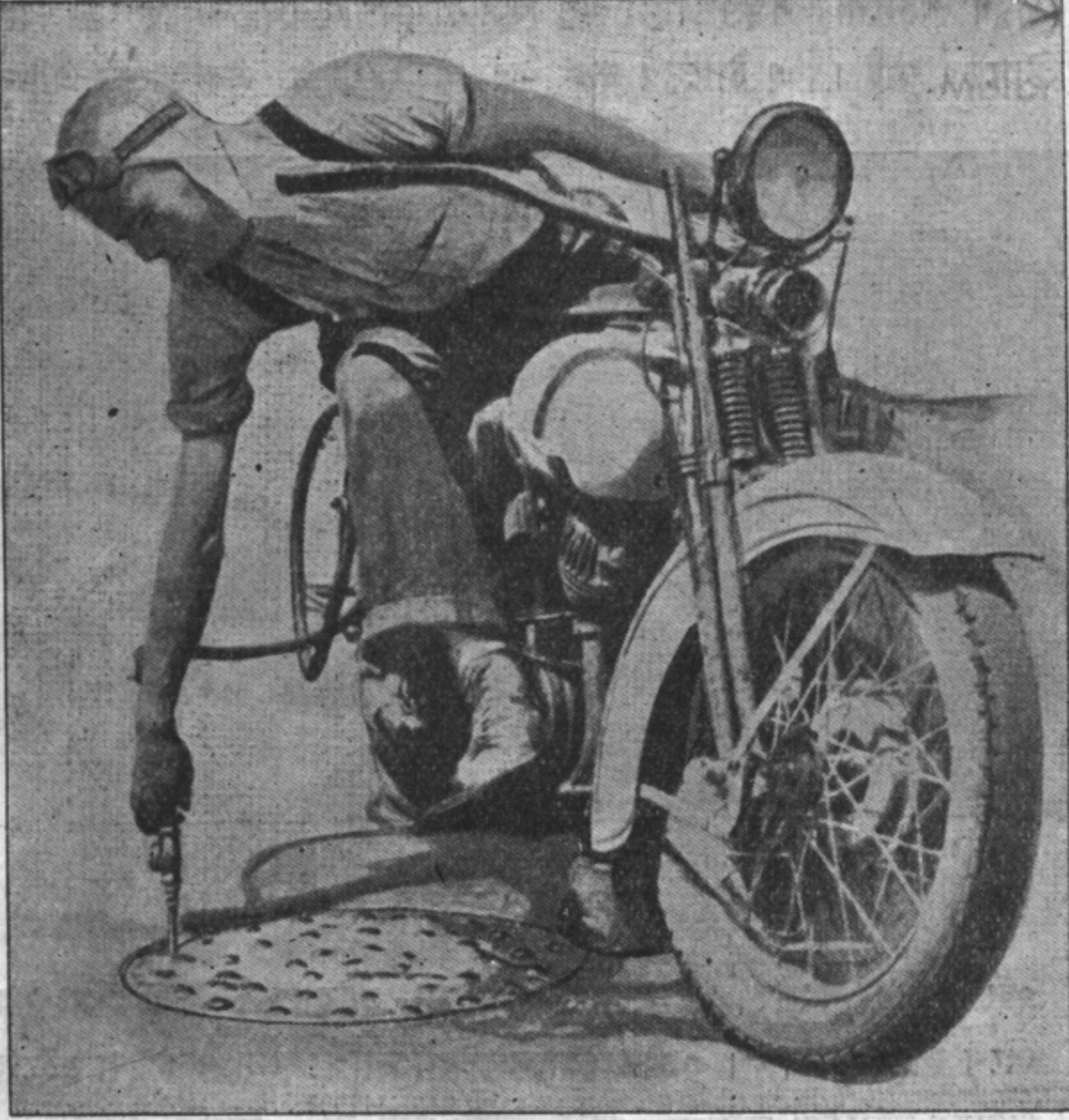
মশা-মারা

পাতে নাই,—তবে এক দল কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে। মোটর-বাইকে চড়িয়া এ সব কর্ম্মচারী স্প্রে করিয়া জলায়-নালায় ঝোপে-ঝাপে মশা-মারা আরক বর্ষণ করিয়া মশা মারিয়া বেড়াইতেছে।

প্লেনের রক্ষা-কবচ

প্লেন যদি ভাঙ্গে, প্লেনে যদি আগুন লাগে, কিম্বা অসমতল স্থানে প্লেন পড়িয়া যদি বিকল হয়, তাহা হইলে প্লেনের এঞ্জিনে তরল কার্বন-ডায়ক্সাইড বাষ্প গিয়া ঢোকে; তার ফলে সমস্ত প্লেন নিমেষে জ্বলিয়া ওঠে! এ ভাবে প্লেন জ্বলিয়া কত পাইলটের মৃত্যু ঘটিতেছে, তার সংখ্যা নাই। মার্কিণ সামরিক বিভাগের এঞ্জিনীয়ার ওয়াল্টার জিডি কোম্পানি সম্প্রতি এক রকম সুইচ বা রক্ষা-কবচ তৈয়ারী করিয়াছেন—সে সুইচ সংলগ্ন রাখিলে শত বিপাকেও প্লেন জ্বলিয়া লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকিবে না। অঘটন ঘটিবামাত্র এ সুইচ আপনা হইতে সক্রিয় হয়; তার ফলে প্লেনের অগ্নিবারক বাষ্পরাশি এঞ্জিন-কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি নিবারণ করে। পাইলট যদি অচেতন হইয়া পড়ে, তথাপি এ সুইচ আপনা হইতে ক্রিয়া করিবে। সুতরাং প্লেনে এ সুইচ রাখিলে পুড়িয়া মরিবার আশঙ্কা আদৌ থাকিবে না।

রক্ষা-কবচ

ঝালাইকরের চশমা

মার্কিন চক্ষু-চিকিৎসক ডক্টর টিলিয়ার নূতন কাচের চশমা তৈয়ারী করিয়াছেন। সে চশমা চোখে দিয়া ঝালাইয়ের কাজ করিতে

ঝালাইকরের চশমা

অসুবিধা ঘটিবে না, চোখেরও কোনোরূপ পীড়া হইবে না। রেল, প্লেন, ট্যাঙ্ক, জাহাজ প্রভৃতি তৈয়ারী ও মেরামত করিতে লোহা প্রভৃতি ধাতু তাতাইয়া গলাইয়া তাহাতে বাঁধন বা জোড় দিতে হয়। তাতানোর সময় যে তীক্ষ্ণ তীব্র অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়, তাহার তেজে চোখ নষ্ট হয় জন্মের মত। এ চশমা চোখে দিয়া ওয়েল্ডিং বা ঝালাইয়ের কাজ করিলে চোখের সম্বন্ধে কোনরূপ আশঙ্কা থাকিবে না।

পোষাকের মাপ-কল

আমেরিকার দর্জীরা যন্ত্র-যোগে মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদের মাপ লইতেছে। যন্ত্রের সঙ্গে ইস্পাতের ফিতা সংলগ্ন আছে—এ যন্ত্রের সাহায্যে গলা, ছাতি, হাতি, কোমর প্রভৃতি সর্ব্ব অঙ্গের নিখুঁত
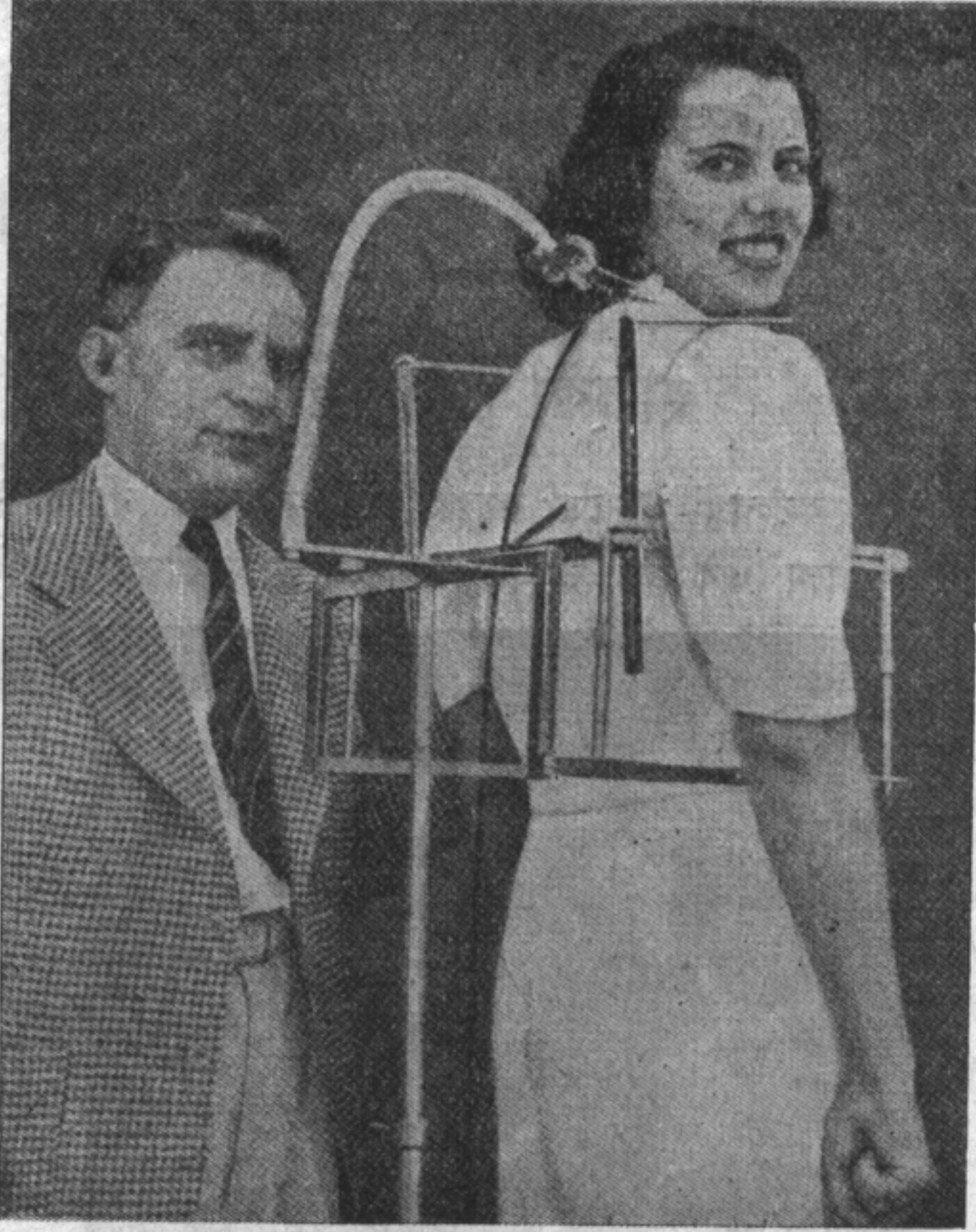
মাপের যন্ত্র

মাপ লওয়া যায়। এ যন্ত্রের মাপে ছাঁটকাট প্রভৃতিতে এতটুকু ভুল হইবার উপায় নাই—পোষাক গায়ে ফিট করিবেই—অব্যর্থ ভাবে।

অতিক্ষুদ্র প্লেন

শত্রুর অবস্থিতি-নির্ণয়ের জন্য টনি লেভিয়ার নামে এক জন মার্কিন শিল্পী অতি ক্ষুদ্রকায় প্লেন তৈয়ারী করিতেছেন। এ প্লেন আকারে মাত্র বারো ফুট—চলে ঘণ্টায় ২২৫ মাইল রেটে; এবং ১২ গ্যালন পেট্রোলে ৫২৫ মাইল
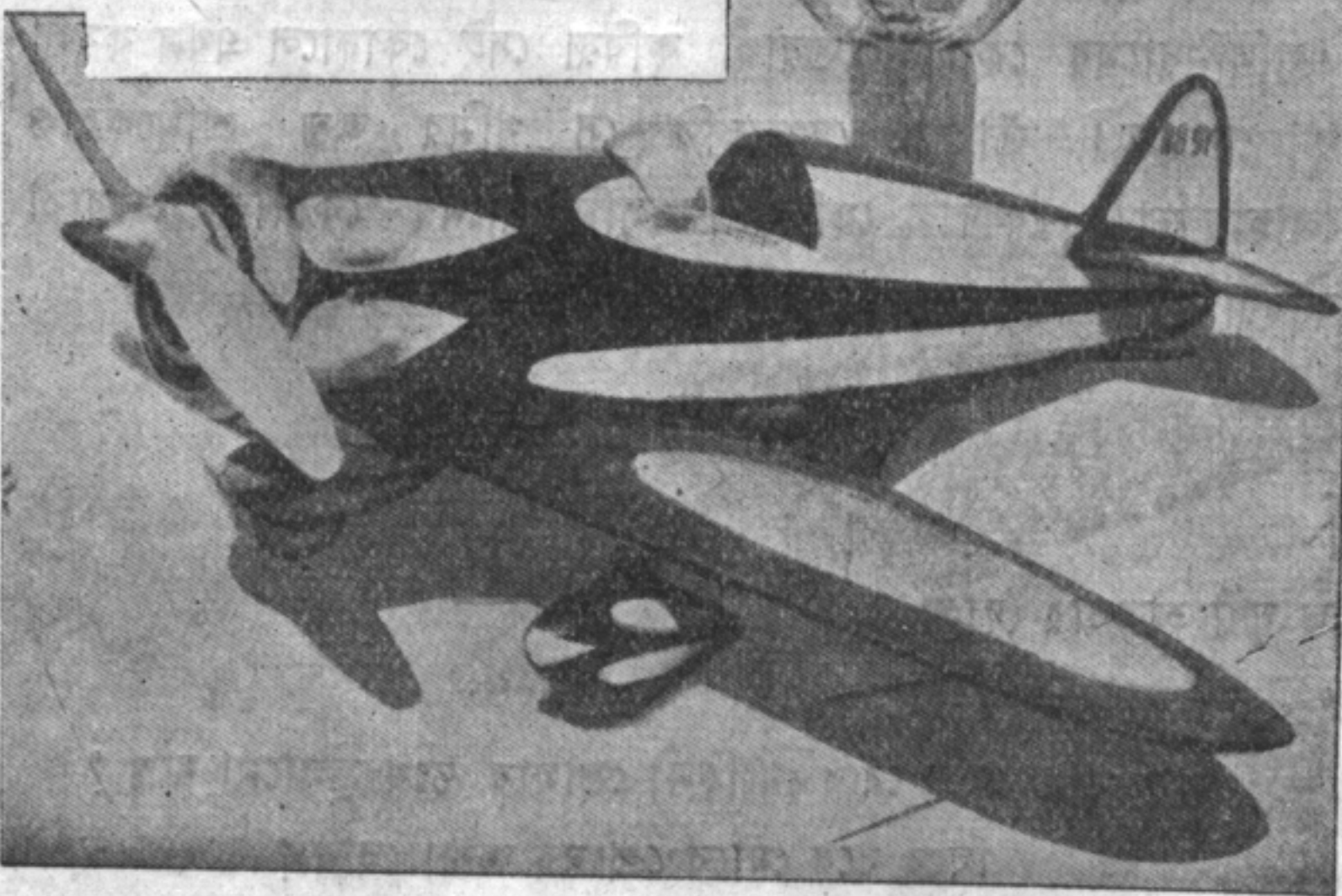
অতিক্ষুদ্র প্লেন

চলে। এ প্লেনে যে এঞ্জিন আছে, সে এঞ্জিনের শক্তি ৯০ অশ্বশক্তির সমতুল্য। আকাশের গায়ে মাছির মতো ওড়ে—নীচে হইতে সহজে কাহারো চোখে পড়ে না—কাজেই শূন্যপথ ধরিয়া এ প্লেন বিপক্ষ-ব্যূহমধ্যে ঘোরাফেরা করিলে কাহারো নজরে পড়িবার আশঙ্কাও নাই!

এরোপ্লেনে চেয়ার

মার্কিন শিল্পীরা প্লেনে বসিবার উপযোগী চেয়ার তৈয়ারী করিতেছেন,—এ চেয়ারের নাম বেলুন চেয়ার। প্লেনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট যতগুলি আসন থাকে, তার অতিরিক্ত আসনের প্রয়োজন হইলে এই বেলুন চেয়ার আসনের সে অভাব

খোলা চেয়ার

মোড়া চেয়ার

পূরণ করিবে। চেয়ারগুলি ফাঁপা রবারের তৈয়ারী; অপ্রয়োজনে ছোট ব্যাগের মত করিয়া হাতে ঝুলাইয়া যত্র-তত্র বহন করা চলে; এবং প্রয়োজন ঘটিলে বাঁধন খুলিয়া বাতাস ভরিয়া দিলে—নিমেষে বসিবার উপযোগী দিব্য আরামপ্রদ চেয়ার আত্মপ্রকাশ করিবে।

স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তি

আমাদের মনে এই যে দ্বিধা, ভয়, সংশয়, আনন্দ, ক্রোধ, হিংসা, দুঃখ প্রভৃতি নানা বৃত্তির উদয় হয়,—আমাদের স্বাস্থ্যের উপর এ সব বৃত্তির প্রভাব বড় সামান্য নয়। রাগ প্রকাশ করিলাম না, মনে চাপিয়া গেলাম; অত্যধিক আনন্দে নৃত্য করিলাম না, সংযত রহিলাম; হিংসার আগুন বাক্যে-আচরণে ফুটিল না, মনের মধ্যে প্রধূমিত রহিল; তবু এ সব বৃত্তি আমাদের স্বাস্থ্যকে বেশ গভীর ভাবে আঘাত দেয়। আজিকার এই যুদ্ধের সংবাদ, খাদ্য-সমস্যা এবং তাহার প্রতিকারের উপায় নাই—এ সব চিন্তা আমাদের স্বাস্থ্যকে রীতিমত বিক্ষুব্ধ করিতেছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—এ সব মনোবৃত্তি আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রতিনিয়ত ক্ষয় করিতেছে। ভয় হইলে গায়ে ছমছমানি ভাব, মাথায় রক্ত ছলাৎ করিয়া ওঠে! যেন গভীর দুঃখে মাথা ভারী হইয়া ওঠে, বুকের উপর যেন পাথরের ভার চাপানো মনে হয়। রসাল খাদ্য-পানীয় দেখিলে মুখে জল আসে, তার কারণ আমাদের লালাগ্রন্থি সক্রিয় হইয়া ওঠে। ভয়ে রক্ত শুকাইয়া মুখ সাদা হয়,—তার কারণ আমাদের

দেহের রক্তকোষগুলি (blood-vessels) সঙ্কুচিত হয়। মনের ভাব যতই চাপিয়া থাকি না কেন, এ সব বিভিন্ন ভাবের উদয়মাত্র আমাদের গ্রন্থিমূল, পেশী বা রক্তকোষে প্রতিক্রিয়া ঘটে। দীর্ঘকাল ব্যথা বেদনা বা দুশ্চিন্তা ভোগ করিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়; অনিদ্রা, যাতনা, ক্লান্তি, অনশন বা সুগভীর দুঃখ-শোকেও মস্তিষ্কের বিপর্য্যয় গোলযোগ ঘটে; এ সব উপসর্গে সুনিদ্রায় ও আহারে আবার আমাদের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই। মনের এ সব বৃত্তির উদয়াস্তের সঙ্গে আমাদের দেহযন্ত্রের সর্ব্ব বিভাগ—অর্থাৎ একেবারে সেই লিভার, পাকস্থলী পর্য্যন্ত সহানুভূতির সূত্রে গাঁথা! এ সব বৃত্তির উদয়াস্তের সঙ্গে আমাদের ক্ষুধা, শ্বাস-প্রশ্বাস, নিদ্রা, পরিপাক-শক্তিতেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

কাচ কাটা

কাচের গায়ে, বোতলের গায়ে তেকোণা উকো দিয়া দাগ কাটিয়া লউন। তার পর ঐ দাগের উপর দাগা বুলাইয়া অগ্নিতপ্ত লোহার

উকায় কাচ কাটা

কাঠি টানুন। দেখিবেন, লাইন ধরিয়া কাচে চিড় খাইবে। তখন সাবধানে কঠিন কোনো পদার্থ দিয়া ঐ লাইনের পাশাপাশি আঘাত করুন—কাচ ঠিক ঐ দাগে-দাগে কাটিয়া যাইবে। বোতলের গলা যদি কাটিয়া বাদ দিতে চান, তাহা হইলেও ঠিক এই প্রণালী অবলম্বন করিবেন।

হাল্‌কা কোদাল

আমেরিকার কয়লার খনিতে কয়লা তোলার কাজ করেন টমাস টেলফোজ নামে এক জন শ্রমিক। দিনে তাঁহাকে কয়লা তুলিতে

এলুমিনিয়ামের কোদাল

হইত ১৫।২০ টন। ভারী কোদাল লইয়া এ কয়লা তুলিতে শ্রম হইত খুব বেশী। ভদ্রলোক তাই মাথা খাটাইয়া শ্রম-লাঘবের জন্য এলুমিনিয়ামের কোদাল তৈয়ারী করিয়া সেই কোদালে এখন কয়লা তুলিতেছেন। তাঁহার দেখাদেখি সে খনির অন্য শ্রমিকেরাও লোহার ভারী কোদাল ফেলিয়া এলুমিনিয়ামের কোদাল তৈয়ারী করিয়া কাজ করিতেছে।

লগ্ন

চূর্ণ তোমার অলকে লেগেছে ঘূর্ণী হাওয়ার দোলা
আননে ঝলকে মুক্ত উষার আলো

ফাগের রক্তে রঙীন তোমার সুনীল কঞ্চুলিকা
নয়নে তোমার ভুবন লেগেছে ভালো!
জানি জানি তবু বক্ষে তোমার শত দাবানল জ্বলে
হৃদয়-গহনে শত সাহারার ক্ষুধা—
অধরে তোমার গুমরি মরিছে বিষের দহন জ্বালা
ব্যাধের বহ্নি আঁখিতে তোমার বাঁধা।
তুচ্ছ ধরারে বাঁধিবে ভেবেছ ঐ চরণের ছন্দে?
রূপদেউটীতে দহিবে দৃষ্টি মোর?
গতি দেবে বেঁধে মোহিনী তোমার দুঃখ-ভুলানো মন্ত্রে?
ঘিরে রবে মোরে প্রেমের তন্দ্রা ঘোর?
ভেবে থাকো যদি, আগে নেমে এসো অঙ্গন-তলে মোর
জীবন-দেবেরে দেখে নাও অপলকে—
অন্তরে তাঁর ছবি এঁকে নাও গভীর ব্যথার রঙে
তার পরে এসো আমার নয়নে তোমার নয়ন রেখে।
দৈন্য থাকুক দু'পায়ে জড়ানো—কিসের দুঃখ বলো?
অমানিশা-রাতে জেগে রবে শত মৌন তারার আলো!

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র (এম-এ)।

কিরীটী

[গল্প]

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে কিরীটীর গাড়ীখানা হঠাৎ বিগড়াইয়া গেল। গাড়ী হইতে নামিয়া এঞ্জিনটা সে পরীক্ষা করিতেছিল, সহসা কাণে আসিয়া লাগিল তরুণী-কণ্ঠের সুমিষ্ট গীতধ্বনি—

'বন্ধু আমার আসবে ও সে আসবে জানি,
সোনার অরুণ-রথে—'

কিরীটী চকিত হইল! ছায়াচ্ছন্ন তরুবীথি-তলে মধ্যাহ্নের নিঝুমতা ভেদ করিয়া সুরের আকুলতা চিত্তকে ঈষৎ চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু সে পলকের জন্য।

কাণে আসিল কতকগুলি নারী-কণ্ঠের উচ্চ হাস্য-রব। রেবা কহিল,—শান্তা, বন্ধু তোর এলো রে—ওই ভাঙ্গা মোটরে বুঝি!

কিরীটী নিমেষে মনের কৌতূহল দমন করিয়া এঞ্জিন-মেরামতি কাজে মনোনিবেশ করিল।

গানের দ্বিতীয় চরণ তখন চলিতেছে,—

'বরণ তারে করতে হবে
আলপনারই পথে',

—উঁহু, ভুল হলো শান্তা। বল্ বটপত্র-বিছানো পথে।

—ভুল অমন হয় রে মীরা। এই তো ভুলের দিনই এলো!

মীরা কহিল,—আহা, বেচারা শান্তা!

আবার হাসির রোল উঠিল।

—এই সুপ্রভা, থাম্। বেহায়াপনা করিস্‌নে—ভদ্রলোক শুনতে পাবে।

—ভয় নেই! আমি নিশ্চয় জানি ভদ্রলোক কালা। না হলে শান্তার গানে ফিরে একবার চাইলে না!

শান্তা তখন গাহিতেছিল,—

'শিশির-জলে গাহন করি
শুভ্র শিশির বসন পরি,
জ্বালিয়ে রাখি সারা সকাল
গন্ধ-ধূপের শিখা।'

কিরীটীর গাড়ী এতক্ষণে ঠিক হইল। সোজা হইয়া সে দাঁড়াইল। পকেট হইতে রুমাল লইয়া কপালের ঘাম মুছিল; তাহার পর গাড়ীর ভিতর হইতে বড় একটা চামড়ার বাক্স বাহির করিয়া সে অগ্রসর হইল তাহাদের দিকে, এতক্ষণ যাহারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রঙ্গ-কৌতুকের শরাঘাতে তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছিল।

শান্তা কহিল,—ব্যাগ হাতে আমাদের দিকে আসচে রে!

জ্যোতি কহিল,—কত বড় ব্যাগ! মা গো! ইন্‌সিওরের দালাল না কি?

কিরীটী আসিয়া ঐ ফুল্ল কমলদলের সম্মুখে দাঁড়াইল। হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বিনা ভূমিকাতেই কহিল,—আপনাদের একখানা গ্রূপ্ নিতে ইচ্ছা করি—পেতে পারি?

অযাচিত বর-প্রাপ্তির মত সকলের মুখ নিমেষে হর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সোল্লাসে কলরব তুলিয়া সকলে কহিল,—আপনি ক্যামেরা-ম্যান্—বেশ তো! আমাদের মনে হচ্ছিল একখানা গ্রূপ্ তোলাতে পারলে ভালো হতো! আমাদের খুব মত আছে।

—ধন্যবাদ! আপনারা সিটিং দিন্! আমি ততক্ষণ ক্যামেরা ফিট্ করি।

বড় চামড়ার বাক্স খুলিয়া কিরীটী ক্যামেরা বাহির করিয়া ষ্ট্যাণ্ডে চড়াইতে লাগিল।

তরুণীর দল অবাক্! স্যাণ্ডারসনের ফুল-সাইজ ক্যামেরা। ছবি তোলা বাতিকের মত পকেট-ক্যামেরা নয়। দস্তুরমত অর্থশালিতার পরিচয়।

বৈভবই মর্য্যাদা আদায় করে। এতক্ষণে তরুণীদলের মনে সম্ভ্রমের উদয় হইল। লোকটা তবে যে-সে নয়। হোমরা-চোমরা মানুষ হইতে পারে! চেহারাতেও আভিজাত্যের সৌন্দর্য্য যে জড়িত রহিয়াছে, সকলের চোখেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

মীরার কাণে-কাণে দীপ্তি কহিল,—ঠিক দাদার মত ক্যামেরা। দাম দু'হাজারের উপর হবে।

কালো সার্জে মাথা ঢাকিয়া কিরীটী কহিল,—আমি ফোকাস কচ্ছি। আপনারা রেডি?

—হ্যাঁ। বলিয়া বটবৃক্ষতলে উপবেশন, অর্দ্ধ উপবেশন ও দণ্ডায়মান থাকিয়া তরুণীর দল হরষিত মুখে বনমালার মত ছবি তুলাইতে প্রস্তুত হইল। সকলের অধরেই কৌতুকের হাসি।

পূরবী কহিল,—আমাদের একখানা করে কপি চাই।

কিরীটী হাসিল, বলিল—একখানা? না, প্রত্যেকের একখানা?

ব্যগ্র স্বরে মীরা কহিল,—একখানা পেলে একটা ধন্যবাদ দেব, আর প্রত্যেকে একখানা পেলে অজস্র ধন্যবাদ।

—ওঃ! মন্দ নয়! আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কে গান গাইছিলেন? ভারী মিষ্টি গলা তাঁর। কিরীটী হাসিল।

মীরা কহিল,—সে কোকিলকণ্ঠী এই আমাদের মিস্ শান্তা বোস—আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট।

—উনি আমায় কি দেবেন? কিরীটীর অধরে কৌতুকের হাসি—আমি ভাঙা মোটরে এসেছি।

তরুণীরা ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। চাঁদের উপর যেন এক-টুকরা পাতলা মেঘ আসিয়া জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিল।

কিরীটী কহিল,—এখন ছবি উঠুক। দেনা-পাওনার কথা পরে হবে।

সবাই বুঝিল সেইটাই সমীচীন।

ছবি তোলা শেষ হইল। ক্যামেরা খুলিতে খুলিতে কিরীটী কহিল—আপনাদের ফ্লাস্কে চা আছে,—পেতে পারি?

সাগ্রহে সমস্বরে সকলে উত্তর দিল,—নিশ্চয় পাবেন।

—ধন্যবাদ! এটা গাড়ীতে রেখে আসি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কিরীটী ফিরিল।

ত্বরিত হস্তে ফ্লাস্ক খুলিয়া শান্তা কিরীটীর হাতে চা দিল। পাঁউরুটি দিতে যাইলে কিরীটী কহিল,—ধন্যবাদ, ওটা আমার দরকার নেই।

শান্তা কহিল,—শুধু চা!

—তা হোক, এইতেই খুশী।

মীরা কহিল,—আপনি কোন্ ষ্টুডিওর?

—ষ্টুডিও! ষ্টুডিও কেন? সবিস্ময়ে কিরীটী জিজ্ঞাসা করিল। তার পর মৃদু হাসিয়া কহিল,—বুঝেছি, আপনারা পর্দ্দার বুকে তুলতে চান। কিন্তু দুঃখিত—আমি কোন ষ্টুডিওরই ক্যামেরাম্যান নই।

শান্তা কহিল—আপনার সখ?

—ওই রকম! বলিয়া কিরীটী ফিরিল,—শান্তার দিকে, কহিল,—আপনার গানে খুব আনন্দ পেয়েছি! সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি! ভাঙ্গা মোটরেই এসেছি। এবার বটপত্র-বিছানো পথে বরণ করতে হবে আপনাকে।

আবার হাসির উচ্চরোল উঠিল।

লেখা কহিল,—কথাগুলো আপনার কাণে গেছে বলে দুঃখিত।

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে,—আপনারা তারই চেষ্টা কচ্ছিলেন। আমারও খুব আমোদ হচ্ছিল। বলিয়া কিরীটী শূন্য চায়ের কাপ মাটীতে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মীরা কহিল,—আপনি উঠ্ছেন?

—হ্যাঁ, অনিচ্ছাতেই! কাজের তাড়া আছে। নমস্কার! আপনারা কোন্ কলেজ থেকে আসছেন—জানতে পারি?

তরুণীরা কলেজের নাম বলিল।

সুপ্রভা কহিল,—আপনার নাম জানতে পারি?

—নিশ্চয় পারেন। কিরীটী পকেট হইতে নামের কার্ডখানা বাহির করিয়া সুপ্রভার প্রসারিত হাতে দিল, কহিল,—আসি, নমস্কার!

—আসুন।

*   *   *   *

কিরীটীর মুখে গল্প শুনিয়া বন্ধুরা জেরা ধরিল।

কিরীটী কহিল,—হ্যাঁ, ছ'জন ছবি নিয়ে গেছে।

বিজয় কহিল,—রইলো বাকী এক—সে এলো না কেন?

কিরীটী কহিল,—ফলিত জ্যোতিষ জানি না।

ফাল্গুনী কহিল,—তুই না জানলেও আমি জানি। আমি দেখতে পাচ্ছি, লজ্জা তাকে আসতে দিচ্ছে না।

বিজয় কহিল,—লজ্জা আসে কখন?

—মানুষ যখন প্রেমে পড়ে!

সহাস্যে কিরীটী কহিল,—তাই না কি?

—নিশ্চয়! লভ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট! এত দিনে তুই লাভে পড়লি, কিরীটী।

জ্যোতিষ কহিল,—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে!

কিরীটী কহিল,—অশেষ ধন্যবাদ! শুনে খুশী হলুম জ্যোতিষ।

—শুধু খুশী নয়! আহ্লাদে হাত তুলে নাচবি ধেই-ধেই করে! ইস্, কি আমোদই হচ্ছে কিরীটী! এত দিনে যা হোক—

ললিত কহিল,—জানিস্ না? কিরীটী যে মা-দুর্গার কাছে ডাব-চিনি মানত করেছে।

—তাই না কি রে? সর্ব্বজনীনের সেক্রেটারী! বেশ! বেশ!

বিজয় কহিল,—ও কথা যাক্। দেখি কিরীটী, গ্রুপ্‌খানা। তার পর সেই রাজকন্যার উদ্দেশ নেবো।

পাশের ঘর হইতে কিরীটী ছবিখানা লইয়া আসিল।

ললিত কহিল,—নাইটিঙ্গেল কোন্‌টি রে?

বিজয় কহিল,—তেমন ভালো দেখতে তো নয় কেউ।

ফাল্গুনী কহিল,—আজও বুঝলি না বিজয়, সোজা কথা পড়ে আছে, কেন, কি এদের অভাব?

—বাঃ! এই মেয়েটির চোখ দু'টি তো খাসা! দিব্বি মুখখানি!

ললিত কহিল,—তোর কথার উত্তর দিই! এরা নয় কেউ নাক চ্যাপ্টা, কেউ কপাল উঁচু বলে ম্যারেজ মার্কেটে সুবিধা পাচ্ছে না! কিন্তু এই মৃগাক্ষী?

—হুঁ! তা বটে! মেয়েটি সুন্দরী! বল্ না কিরীটি, কে গান গাইছিল?

সহাস্যে কিরীটী কহিল,—ওই মৃগাক্ষী!

—এ্যাঁ! বলিস্ কি! চমৎকার!

ফাল্গুনী কহিল,—এমন মেয়ে, আজও তার বর জোটেনি। নাঃ, পরিচয় নিতে হবে।

বিজয় কহিল,—ঘটকালি কর্। কিরীটীর মা তোকে দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবেন।

ললিত কহিল—কিরীটীর ভারী অন্যায়! তোমার বাবা সে-দিন বললেন,—তোমরা বন্ধু-বান্ধব, তোমরা বোঝাও—অত রোজগার কচ্ছে, বিলেত থেকে অত বড় পাশ করে এলো, কি দুঃখে অমন করে আইবুড়ো থাকে? লোকের যে বউ মরে যায়, তা বলে তারা কি বিবাগী হয়?

বিজয় কহিল,—খাঁটি সত্য।

কিরীটী মুখ তুলিল। কহিল,—বৌ মারা গেলে বিয়ে করতে বাধে না! কিন্তু বাবাকে বলো, আবার বর সাজতে আমার বাধে। আমার ভায়েরা তো রয়েছে।

ললিত কহিল,—চিরকাল একটা কথা মনে রাখবি?

—শিলালিপি কি মুছে যায় ললিত? যুগ যুগ ধরেই সে বার্ত্তা বহন করে।

বন্ধুরা নীরব রহিল।

অতীতের এক আনন্দহীন স্মৃতি শরতের উল্লাস-মধুর প্রভাতকে আচ্ছন্ন নিরানন্দ করিয়া রাখিল।

*   *   *   *

সে অনেক বছর পূর্ব্বেকার কথা। কিরীটী তখন সবে শিবপুর হইতে এঞ্জিনীয়ারীং পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে।

দীনেশ বাবুর খুব আনন্দ। পুত্রের বিবাহ দিয়া মস্ত দাঁও মারিবেন। গৃহিণীর সহিত তাহারই জল্পনা-কল্পনা চলে। বড়-বড় ঘর হইতে দশ-বিশ হাজার টাকার ডাক আসে,—দীনেশ বাবু সে ডাক কাণে তোলেন না। তাঁর আশা আরও উঁচে। একটা বিষয়-সম্পত্তি-ওয়ালা মেয়ের সন্ধান তিনি গোপনে খুঁজিয়া ফেরেন। যদি একটা মিলে হয় তাহা হইলে—ছেলেটা—চিরকালের মত ধনী হইয়া যাইবে।

কিরীটীর বড় মামা আসিলেন দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণে। কিরীটীকে

কহিলেন,—দেখ্‌, টাকা-কড়ি নিয়ে বিয়ে করিস্‌নি। বিনা-পণে গরীবের মেয়ে নিবি। অন্তরের আশীর্ব্বাদে জীবন তোর মধুময় হবে।

কিরীটী হাসিল।

বড় মামা কহিলেন,—না, না, ছাখ্‌ না, তোর বাপ যেন কসাইয়ের মত দর-কষাকষি কচ্ছে। সে-দিন শুনে অবাক্‌ হলুম,—কারা দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, তাদের ফেরত দিলে, বল্লে,—বিশ-তিরিশ হাজার নিয়ে লোকে আমার পায়ে ধরছে!

বড় মামা কহিলেন,—তোরা ইয়ং মেন্‌—মন অত ছোট করিস্‌নি! এই যে তোর মামীকে গরীবের ঘর থেকে এনেছিলুম,—আজ আমার কিসের অভাব!

কিরীটী কহিল,—আমিও তাই চাই। বিয়েয় টাকা-কড়ি নেওয়া—সে ভারী ইতরের কাজ।

একটা ঢোক গিলিয়া বড় মামা কহিলেন,—তোরও কি যথার্থ অন্তরের ইচ্ছা—

— আমি বড় লোকের মেয়ে চাই না।

—দেখ্‌, আমার শালীর মেয়ে আছে। মেয়েটি পরমা সুন্দরী—আর অতি লক্ষ্মী। কিন্তু—

—অবস্থার জন্য চিন্তা করবেন না। শুধু দেখবেন যোগ্যতা—

—আশীর্ব্বাদ করি কিরীটি তুই বড় হ।

দীনেশ বাবুর কাছে কিরীটীর বড় মামা শিবচরণ প্রস্তাবটি আনিলেন; এবং অবশেষে ইঙ্গিতে জানাইলেন, কিরীটীর মত আছে।

নির্লিপ্ত সুরে দীনেশ বাবু কহিলেন,—এর চেয়ে কিছু ভালো কথা নেই। ওর যখন মত আছে, তখন তুমি বিয়ের আয়োজন অনায়াসে করতে পারো।

—আপনার সম্মতি—

কর্ত্তা হাসিলেন। কহিলেন,—ছেলের মা খুশী হলেই হলো।

কনে দেখা, আশীর্ব্বাদ হইতে শ্রাবণের একটা শুভ দিনে বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গেল। মেয়ে যে সুন্দরী, সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিল। নির্ব্বাক্‌ রহিলেন শুধু দীনেশ বাবু। অভিমান-বশে যে উদারতা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইটাই এখন মনের মধ্যে ব্যথার সঞ্চার করিয়া ফিরিতে লাগিল।

তবু নির্দ্দিষ্ট দিনে বর-বরযাত্রী লইয়া দীনেশ বাবু চলিলেন অখ্যাত পল্লীগ্রামে পুত্রের বিবাহ দিতে। খান দুই বাস ও গোটা তিন মোটর গাড়ীতে সকলে উঠিয়াছিল।

কনের বাড়ী সমাদরের ত্রুটি নাই। গৃহস্থ মানুষ, বড় লোকের সহিত কুটুম্বিতা করিতে যত দূর সাধ্য আয়োজন করিয়াছে। কিছু নয় বলিয়া পঞ্চাশ ভরি সোনা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু দীনেশ বাবু কেবলই প্রচার করিতেছিলেন যে, রাঙা সুতা দিয়া তিনি কন্যা লইতেছেন।

কথাটা কেমন করিয়া কন্যাপক্ষীয় কার মর্য্যাদায় হঠাৎ আঘাত করিল। মেজাজ গরম হইল। হাঁকিয়া সে শুনাইয়া দিল,—পঞ্চাশ ভরি গিনি সোনা, বেনারসীর জোড় ইত্যাদি—এর উপর আবার রাজত্ব চাই না কি?

দীনেশের ভগিনীপতির ছিল একটু গোলাপী নেশা। কথাটা কাণে আসিবামাত্র সে আঁতকাইয়া উঠিল। রুষ্ট স্বরে বুঝাইয়া দিল—শ্যালক-পুত্রের বিবাহ। পাঁঠার দরে নয়—জলের দরে ছেলে বিকাইতেছে।

এমনি কথা-ঠোকা-ঠুকিতে যে অগ্নি অকস্মাৎ দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল,—তাহার ইন্ধন সে আপনিই সংগ্রহ করিল।

অচিরাৎ দীনেশের ভগিনীপতি আসিয়া উপস্থিত হইল কিরীটীর কাছে! বরাসনে উপবিষ্ট চন্দন-চর্চ্চিত হাস্য-ফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া হৃদয়ে কোমলতার সঞ্চার হইল না! মনে মায়া জাগিল না! তীব্র স্বরে ভগিনীপতি কহিল,—উঠে আয় কিরীটি! এ চামারের বাড়ী কুটুম্বিতা নয়।

বিস্মিত কিরীটী পিসেমশায়ের পানে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিল। বিজয় কহিল,—কি বকছেন আপনি হরি বাবু?

—না, না, কখ্‌খনো না! এরা বাড়ী-শুদ্ধ ছোট লোক।

রুষ্ট স্বরে প্রত্যুত্তর হইল,—আপনারা কি রকম ভদ্রলোক মশাই, ব্যবহারেই তা বোঝা যাচ্ছে।

বিজয় হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—কি করেন? কি করেন?

উভয় পক্ষের রক্ত তখন গরম হইয়া টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।

দীনেশ আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—যে অপমান পাওনা ছিল, হয়ে গেল। কিরীটি তুই যদি আমার ছেলে হোস্‌, তবে উঠে চল্‌। যারা আমায় কসাই বলে, সেখানে ছেলের বিয়ে আমি দেবো না! উঠে আয় কিরীটি।

মূঢ়ের মত কিরীটী চাহিয়া ছিল। মন্ত্রাবিষ্টের মত পিতৃ-আদেশে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কন্যার পিতা আসিয়া করজোড়ে কহিলেন,—একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেবেন না দীনেশ বাবু। আমার বারো বছরের মেয়ে, সে কি অপরাধ করেছে আপনাদের কাছে?

—ভয়ানক অপরাধ! এমন ছোট লোকের ঘরে সে জন্ম নিয়েছে, তার ভোগ আছে তো। ও কি কিরীটি, থমকে দাঁড়ালি যে? চলে আয়।

দীনেশ পুত্রের হাত ধরিলেন।

যূপকাষ্ঠে নীত জীবের মত অনিচ্ছুক-চরণে কিরীটী অগ্রসর হইল।

বিজয় মিনতি-ভরে কহিল,—দীনেশ বাবু—

—না বিজয়; কথা রাখবো না। বাপান্ত দিব্যি করে এসেছি।

কন্যাপক্ষীয়দের অনুরোধ-উপরোধ জোয়ারের জলের মুখে তৃণগুচ্ছের মত ভাসিয়া গেল।

কিরীটী গিয়া মোটরে উঠিল। মাত্র দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যে গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছিল মনে ভরপূর আনন্দ লইয়া, সেই পত্রপুষ্পে সজ্জিত গাড়ী—তেমনি চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে, সেই মনোহর বসন-ভূষণেই কিরীটী আরোহণ করিল। কিন্তু সে আনন্দদীপ্ত মুখে বিষাদের কালি লেপিয়া গেছে। যে মর্ম্মান্তিক লজ্জা তাহার অন্তস্তলকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল, কিরীটীর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা বুঝিল না।

ক্রোধই অনর্থকে ডাকিয়া আনে। বিপত্তি-সৃষ্টিতেই তার আনন্দ।

* * * *

অনেকগুলা বছর কাটিয়া গিয়াছে। কিরীটীর বিবাহের অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সবই বৃথা। শ্রাবণের তেইশে যে লগ্নে পুত্রের

বিবাহ নিশ্চিত দিবেন, দম্ভভরে দীনেশ প্রচার করিয়াছিলেন, সেই তারিখেই কিরীটী বোম্বাইয়ে পাড়ি দিল। উদ্দেশ্য বিলাত-যাত্রা। পাথেয়ের সন্ধান লইতে দীনেশ জানিলেন, বন্ধু বিজয়ের নিকট কিরীটী হাজার কয়েক টাকা ধার লইয়াছে।

—হুঁ! বলিয়া মনের সমস্ত ক্ষোভ শেষে তিনি দমন করিতে প্রয়াস পাইলেন।

দীর্ঘ ক' বৎসরের অবসানে শিক্ষা শেষ করিয়া কিরীটী বিলাতের বড় ডিগ্রীই শুধু নয়, চাকুরী লইয়া দেশে ফিরিল।

উল্লাসের সাড়া জাগিল।

পুত্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত দীনেশ আবার নূতন করিয়া কোমর বাঁধিলেন।

মাতৃ-সকাশে কিরীটী জানাইল, এ বাতুলতা পিতা যেন না করেন। পিতাকে নিবৃত্ত হইতে বলিল।

কমলা কহিলেন,—সে কি, তুই বিয়ে করবি না?

দৃঢ় স্বরে কিরীটী কহিল,—না।

—সে কি! ইহার বেশী কমলা আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

কিরীটী কহিল,—একটা বারো বছরের মেয়ের তোমরা যে ক্ষতি করেছ, মনে করে দেখো।

—ক্ষতি! দাদার শালীর মেয়ে? হ্যাঁ, বিয়ে তার এখনও অবশ্য হয়নি। দাদার ভায়রাভাই মারা গেছে। মেয়ে আছে তার মামার বাড়ী। মামা ছোট আদালতের জজ্। মেয়ে কলেজে পড়ছে।

কিরীটী কোন সাড়া দিল না; বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর কাছে কমলা কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। বৃত্তান্ত বলিল।

দীনেশ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন,—হুঁ।

* * * *

দুর্গা ঘটক আসিয়া কহিলেন,—হলো না দীনেশ বাবু—মেয়ের মামার কি মুখ! চড়া চড়া সব কথা।

—বলেছিলে,—কিছু চাই না?

—তা আর বলিনি? বল্লুম, এখন সাতশ করে পাচ্ছে! তাতে কি বল্লে জানেন? বললে সাতশ পাক, আর সাতাশ-শই পাক, ওরা কসাই। হাঁকাই দশ-বিশ হাজার। আমি বল্লুম, স্বমুখে প্রতিশ্রুতি —বল্লেন, রাখো দুর্গা! হাকিমি করে ভাত খাই! বুদ্ধি একটু ঘটে আছে! ওরা সম্বন্ধ পাঠিয়েছে আমার বাড়ী, আমার গাড়ী দেখে। বিয়ের রাত্রে বলবে, এটা চাই, সেটা চাই! সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমায় দিতেই হবে তখন ঘাড় হেঁট করে।

দীনেশ নীরব রহিলেন।

দুর্গা কহিল,—এই শ্যামবাজারে হরলাল বাবুর মেয়ে রয়েছে। বি-এ পাশ। দেবেও ঢের। সুন্দরী মেয়ে।

গম্ভীর কণ্ঠে দীনেশ কহিলেন,—জানি সব। কনের অভাব কি? আমার ইচ্ছে ছিল, সুরেশ্বর বাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা করি।

—কিন্তু তাঁর যে তা ইচ্ছা নয়।

—তাই তো।

* * * *

মাতুল যে সম্বন্ধ কাটিয়া দিলেন, মামাতো বোন মীরার মারফতে শান্তার কাণে তার সংবাদ আসিল।

সহাস্যে মীরা কহিল,—সেই সে রে। আহা, "কাছে হতে দূর হলো রে"! আচ্ছা, বাবার কি অনাছিষ্টি রাগ, বল দিকি?

শান্তাকে সত্যবতী কহিলেন,—দাদা বলে, ওদের বিশ্বাস করো না সত্য! আবার ফাঁদ পাততে এসেছে! কি উত্তর দেবো? উনি সেটা পারেননি, ওই শোকেই তো শরীর ভাঙলো। বলতেন, বড্ড পছন্দ হয়েছিল ছেলেটিকে! কপাল! দেখ না, ঘুরে সেই এলো! আজ নেবার ভরসা পাচ্ছি না! মন পেছু হঠছে।

শান্তা নীরব রহিল। কি উত্তর দিবে? তবু সেই উজ্জ্বল আয়ত চক্ষুর দৃষ্টিপাতে তার কুমারী-বুকে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। একটা নিশ্বাস ভারী হইয়া ওঠে।

যে-দিন সে সরল গ্রাম্য বালিকা ছিল, সে-দিন সৌভাগ্য অতি নিকটে আসিয়াও দৈব-বিড়ম্বনার মত অকস্মাৎ সরিয়া গেল। মনে হইল, সবটাই মরীচিকা! আজ শিক্ষাদৃপ্ত মনে, আত্মসম্ভ্রম-সচেতন অন্তরে যখন জগৎকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়ে চিত্ত-দুয়ারে এ কে আসিয়া দাঁড়াইল? যাচিয়া হাত পাতিল। অতীতে যে এক দিন অপমান করিয়াছিল, সে—

তবু এই সুমোহন মূর্ত্তি উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহাকে বিবশ করিয়া ফেলে।

নিরুপায়! শান্তা সমর্থন করে, মাতুল ঠিক করিয়াছে! সে-ও মনকে সংযত করিবে। কিরীটী তাঁর কেহ নয়! অতীত অপমানের স্মৃতিমাত্র!

গ্রুপ্ হাতে মীরা সহাস্যে কহিল,—দেখ, মিষ্টার সেনের কাছে আমরা ছবি আনতে গেছলুম—কি খাতির আমাদের! তোর কথা জিজ্ঞেস করলেন। বল্লুম—আমার মামাতো বোন হয়—ভারী সে লাজুক, এলো না। বল্লেন, তবে রইলো তার ছবি। তাকে বলবেন,—তার অপেক্ষাতেই রইল। সত্যি শান্তা, অমন স্বামী পাওয়া ভাগ্য! বাবা যে কি বুঝেছে!

হাসিয়া শান্তা কহিল,—'কাছে গেলে চাঁদ সুধা নয়'! মামাবাবু ঠিকই করেছেন।

* * * *

নির্জ্জনে নীরদা স্বামীকে কহিল,—দেখ, অমন সম্বন্ধ তুমি ছাড়লে!

—পাগল! ভুলে গেছ আগেকার কথা।

—কিছু ভুলিনি। বেশ, শান্তাকে না দাও, মীরার সঙ্গে করতে আপত্তি কি?

—আশ্চর্য্য! যাকে ভাগ্নী দেব না, তাকে দেব মেয়ে!

—ভাগ্নীকে দেবে না, ভগ্নীপতির অপমান হয়েছিল বলে! কিন্তু তোমার তো তা নয়। স্বাধীন রোজগারী পাত্র, অমন চমৎকার দেখতে—এ কি ছাড়া যায়! আমি মীরার সঙ্গে কথা পাঠাব। আমি তার খবর রাখচি। শ্যামপুকুরের সর্ব্বজনীনের সেক্রেটারী ওই ছেলে! ছোড়দার সঙ্গে ভাব আছে।

সবিস্ময়ে সুরেশ্বর কহিল,—তাতে কি?

—কি, তুমি দেখতে পাবে।

* * * *

—ও কে রে মীরা, তোকে নমস্কার কল্লে? তুই নমস্কার কল্লি!

—ওই তো সেক্রেটারী এখানকার, মিষ্টার সেন।

কিরীটী মীরার নিকট আসিল।—আপনাদের কোন কষ্ট হয়নি?

—না! মা এসেছেন।

—মা! ও—নমস্কার!

নীরদা কহিল—তোমরা যে এই কাঙালীভোজনের ব্যবস্থা করেছ বাবা, খুব ভালো করেছ! আহা, এদের দয়া করা উচিত!

—দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ধন্য হওয়া।

—তা খিচুড়ি ব্যবস্থা করোনি কেন? এই ভাত, মাছের ছ্যাঁচড়া! এত বেশী খরচ—এখন চার দিকে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে।

—তা দিচ্ছে। কিন্তু আত্মতৃপ্তি নিয়ে সেবা করতে হয় তো।

নীরদা কহিল,—সুবিধাটাও দেখতে হয় বাবা!

কিরীটী জবাব দিল না।

নীরদা কহিল,—এই আমার ভাগ্নী নিজে রেঁধে রোজ পাঁচটি করে খাওয়াচ্ছে। বল্লুম, কেন অমন করিস্? যারা খাওয়াচ্ছে তাদের চাঁদা দে না। কিন্তু মামা-ভাগ্নী ওরাই জানে!

মীরা সহাস্যে কহিল,—সকলের বোধ এক নয় বলেই রক্ষে মা।

—জানি না, তোরা লেখাপড়া শিখে কি বুঝেছিস্?

কিরীটী কহিল,—আমার একটু কাজ আছে—যাচ্ছি। বলিয়া নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল।

গাড়ীতে উঠিবার প্রাক্কালে কিরীটী আর একবার আসিয়া দেখা দিল।

নীরদার দৃষ্টির আড়াল করিয়া মীরার হাতে একটা চিরকুট দিল।

মীরা কিরীটীর পানে চাহিল। চোখের ইঙ্গিতে কিরীটী মিনতি জানাইল।

বাড়ী আসিয়া কাপড়-জামা খুলিবার পূর্ব্বে মীরা চিরকুটখানা বাহির করিল।

'মীরা' শরণাগত আমি,—শান্তাকে আমায় দাও। ব্যবস্থা কর। কিরীটী।'

চিরকুটখানা হাতে লইয়া মীরা ছুটিল শান্তার কক্ষে—দেখ্, দেখ্ পাষাণী—কার উপর তুই বিমুখ!

চিরকুটখানা বিছানার উপর ফেলিয়া শান্তা হাসিল।

*   *   *   *

সে-দিন ছুটিয়া মীরা শান্তার ঘরে আসিল, কহিল,—খবর শুনেছিস্ শান্তা?

শান্তা চোখ তুলিয়া চাহিল।

—মিষ্টার সেনের খুব অসুখ।

চমকিত স্বরে শান্তা কহিল,—কি অসুখ?

—ক'দিন ভয়ানক পরিশ্রম করেছেন—দশমীর দিন রাত থেকে কলেরা।

—এ্যাঁ, তুই জানলি কি করে?

—বিজয় ডাক্তার দেখছে। সে বললে।

শান্তা উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মীরা কহিল,—দেখতে যাবি? এত অসুখ।

—আমি! বিহ্বলের মত শান্তা জিজ্ঞাসা করিল।

—হ্যাঁ তুমি। তোমার না শত্রু সে?

—আমার শত্রু!

—এখনও অভিমান শান্তা? এমন অসুখ? আচ্ছা, যদি না বাঁচে?

মৃদু স্বরে শান্তা কহিল,—কি করে যাবো?

—সে ব্যবস্থা আমি করেছি। বিজয় ডাক্তার বাবাকে দেখতে এলো—তাকেই ধরেছি।

*   *   *   *

কোজাগরী পূর্ণিমা। রজত-কিরণ-বন্যায় দশ দিক্ যেন ভাসিয়া যাইতেছে। প্রতিবেশি-গৃহে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ঘটা করিয়া হয়। নহবৎ বাজিতেছে।

রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কের মত কিরীটী সেই দিকে চাহিয়া ছিল। বাড়ীতে কেহ নাই। পূজা-উপলক্ষে সকলেই দেশে গিয়াছে। এবার তাহাদের পালা। যায় নাই শুধু কিরীটী। সর্ব্বজনীনের হাঙ্গামায়। দ্বারে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল।

কিরীটী চকিত হইল। আজ তো দেশ হইতে কাহারো ফিরিবার কথা নয়।

বিজয়ের গলা শোনা গেল,—কিরীটি!

—সোজা উঠে আয় বিজু!

বিজয় উঠিয়া আসিল। পশ্চাতে মীরা ও শান্তা।

বিজয় কহিল,—মিস্ বোস তোকে দেখতে এসেছেন, তুই কেমন আছিস্!

মীরা কহিল,—আপনার ভয়ানক অসুখ শুনলুম। দশমীর রাত থেকে কলেরার মত!

কিরীটী ব্যাপার বুঝিল। সহাস্যে কহিল,—নিশ্চয়। শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—এসো দেখ, দুর্ব্বল শরীর নিয়ে তোমার জন্যে উঠে এসেছি!

শান্তা কিরীটীর পানে চাহিল। স্বাস্থ্যের পূর্ণ দীপ্তি-বিজড়িত কান্তিমান মূর্ত্তি।

মীরা কহিল,—শরণাগতকে উদ্ধার করা আমার ধর্ম্ম মিষ্টার সেন! কেমন শান্তা, আমার বকসীস্?

শান্তা বলিল,—এই লুকিয়ে আসার পরে মামীমা যদি—

—কি, মা যদি বাড়ী ঢুকতে না দেয়, এই তোর ভাবনা? তা অঘ্রাণ মাসে যার ঘরে আসতেই হোত, পিসিমা তার জন্য চণ্ডীপাঠ করাচ্ছে—কোজাগরী পূর্ণিমা থেকে তার ঘরেই থাকবি! বলিয়া সেনের দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনার আপত্তি আছে?

কিরীটী হাসিল। কহিল,—এই বারো বছর ধরে যার প্রতীক্ষা করে আছি, যাকে চাইছি—না শান্তা, এখনও তোমার অভিমান!

শান্তা কোনো জবাব দিল না—আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিরীটী কহিল,—এই নাও তোমাদের গ্রূপ্‌খানা! বলিয়া আর একখানা ফটো লইয়া কহিল,—একে চিনতে পারো?

বারো বছরের বালিকা-মূর্ত্তি! শান্তারই প্রতিকৃতি।

কিরীটী হাসিল। কহিল,—বড় মামা যে দিন তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ করে, সে দিন ওই ছবি আমায় দিয়েছিল। বোটানিক্যাল গার্ডেনে সেই মুখেরই প্রতিকৃতি পেয়েছিলুম। কিন্তু ভাঙা মোটরে গেছলুম! ফুল-সাজানো গাড়ীতে গিয়ে তোমায় পাইনি শান্তা!

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

রাশিয়ার শক্তি-সঞ্চয়

আজ ছু'বৎসর ধরিয়া যে রাশিয়া শক্রর বিপুল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে, আঘাতে শক্রকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে,—এত শক্তি রাশিয়া কোথায় পাইল?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গেলে পনেরো বৎসরে রাশিয়া কি বিপুল যান্ত্রিক সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয় লইতে হয়। পনেরো বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ার বুক ছিল যেন রিক্ত প্রান্তর! পনেরো বৎসরে সে প্রান্তর কল-কারখানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

এশিয়ার সাইবেরিয়া এবং য়ুরোপের রাশিয়া—ছু'য়ে মিলিয়া রাশিয়ার পরিপূর্ণ সমগ্রতা। ছু'য়ে মিলিয়া আজ গড়িয়া উঠিয়াছে রাশিয়ান্ সোভিয়েট ফেডারেটেড সোশালিষ্ট রিপাব্লিক।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাশিয়ার যত-কিছু কারখানা—সে সব ছিল পশ্চিম-রাশিয়ায় এবং উক্রেনে। এবারকারের মহাযুদ্ধে গোড়ার দিকে জার্ম্মাণরা উক্রেন ও পশ্চিম-রাশিয়া অধিকার করিয়া বসিল এবং সেগুলি এক বৎসর যাবৎ ছিল জার্ম্মাণ অধিকারে। তার পর পূর্ব্ব-রাশিয়ায় কল-কারখানা গড়িয়া সেই সব কল-কারখানার কল্যাণে রাশিয়া শক্র-বিজয়ে সমর্থ হইতেছে।

মস্কো সহরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ষ্টালিন বলিয়াছিলেন, সামরিক এবং যান্ত্রিক দিক্ দিয়া পৃথিবীর অন্য পুরোবর্ত্তী জাতিদিগের বহু পিছনে আমরা পড়িয়া আছি। দশ বৎসরের মধ্যে এ ছুই দিক্ দিয়া শুধু তাহাদের সমকক্ষ হওয়া নয়—সে সব জাতির মতই আমাদের অগ্র-গতি প্রয়োজন, নহিলে যে-কোনো সবল জাতির আক্রমণে আমরা বিধ্বস্ত হইয়া যাইব—পৃথিবীতে আমাদের জাতির চিহ্নও থাকিবে না! বক্তৃতা দিয়াই ষ্টালিন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই; রাজস্ব হইতে আদায়ী-টাকায় যা-কিছু সঞ্চয়, সেই সঞ্চয় দিয়া ষ্টালিন গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। দিকে দিকে মিল এবং ফ্যাক্টরী খোলায় তাঁহার অধ্যবসায়ের সীমা রহিল না। জার্ম্মাণরা পূর্ব্বে একবার উক্রেন আক্রমণ করিয়াছিল, আবার করিতে পারে—এ জন্য তিনি সাইবেরিয়ায় এবং উরালে বহু মিল ও কারখানা গড়িয়া তুলিলেন। সীমান্ত দেশ হইতে লেনিনগ্রাড ক'মাইলেরই বা পথ! জার্ম্মাণরা রাশিয়া আক্রমণ করিলে লেনিনগ্রাডের যত ক্ষতিই হোক, রাশিয়ান্ জাতিকে বাঁচানো চাই! তাই রাশিয়ার মধ্য দিয়া গিয়া ছু'হাজার মাইল দূরে সাইবেরিয়া আক্রমণ সহজ হইবে না স্থির করিয়া ষ্টালিন সাইবেরিয়ায় ও উরালে মিল এবং কারখানা খুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জন স্কট নামে এক জন মার্কিন সুধী ১৯৩২ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাগনিতোগরস্কে ছিলেন। তিনি বলেন, পাঁচ বৎসরে তাঁর চোখের সামনে রাশিয়ার চেহারা বদলাইয়া গেছে! আলাদীন যেন প্রদীপ ঘষিয়া রাশিয়াকে কল-কারখানায় ভরিয়া তুলিয়াছে! আমেরিকায় চল্লিশ বৎসরে যাহা ঘটিয়াছে,—রেল-পথ নির্ম্মাণ হইতে স্থরু করিয়া কল-কারখানা, ডক প্রভৃতি তৈয়ারী—রাশিয়ায় তাহা ঘটিয়াছে পাঁচ বৎসরে—যেন চক্ষুর নিমেষে!
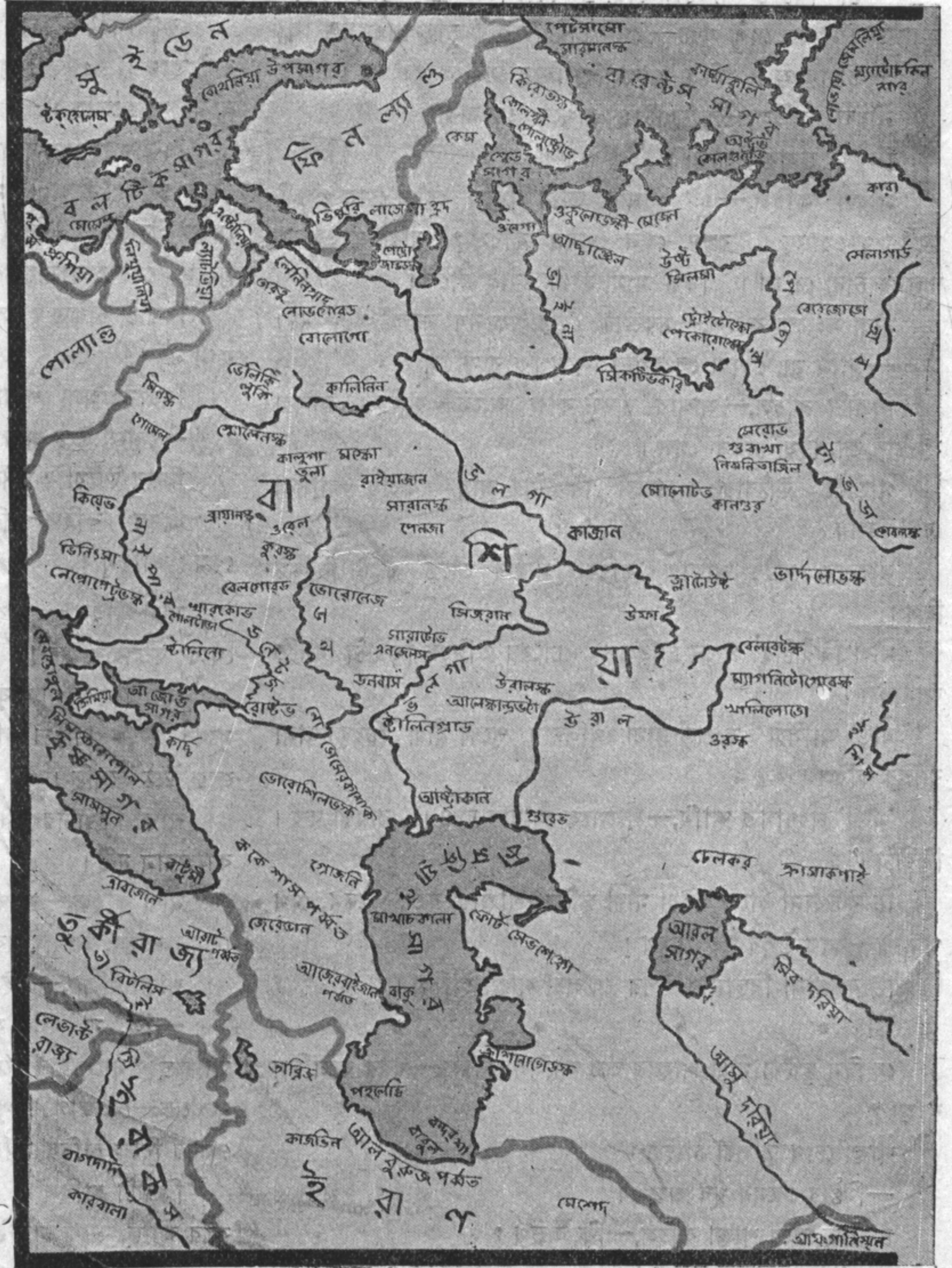
য়ুরোপীয় রাশিয়া

লাল ফৌজের জন্য শুধু মাগনিতোগরস্কেই বছরে এখন দশ লক্ষ

টন ওজনের লৌহ এবং ইস্পাত হইতে অজস্র রেটে ট্যাঙ্ক এবং কামান প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে।

মাগনিতোগরস্কের অবস্থান রাশিয়ার মাঝামাঝি, আইদারলী পাহাড়ের কোলে। কল-কারখানা-নির্ম্মাণের বহু বৎসর পূর্ব্বে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে এখানে এক জন পূর্ত্ত-শিল্পী জমির মাপ-জোপ করিতে আসিয়াছিলেন। মাপ-জোপ করিতে গিয়া দেখেন তাঁর কম্পাশের কাঁটায় বার-বার গোলযোগ ঘটিতেছে! দেখিয়া বহু কুলী আনিয়া তিনি পাহাড়ের গা কাটাইতে সুরু করিলেন। পাহাড় কাটিতে পাহাড়ের বুকে পাওয়া গেল লৌহ-সমৃদ্ধ বিপুল খনি।

রাশিয়ান ব্যবসায়ী মিয়াশনিকভ রুশ সম্রাজ্ঞীর কাছ হইতে এ পাহাড় ইজারা লন; এবং এখানকার খনি হইতে তিনি প্রচুর লৌহ তুলিয়াছিলেন। তার পর এখানকার খনির লৌহ ফুরাইয়া গেলে রাশিয়ানদের খনি-আবিষ্কারের উৎসাহও সঙ্গে সঙ্গে গেল কমিয়া; কাজেই রাশিয়ার খনিজ-সম্পদ্ আবার তিমিরাবৃত হইল।

সাইবেরিয়া

গতবারের মহাযুদ্ধে প্রয়োজনের তাগিদে আবার সকলের টনক নড়িল। রাশিয়া হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্বেতাঙ্গ রাশিয়ানরা দলে দলে লৌহের সন্ধানে পূর্ব্ব-রাশিয়ায় এবং সাইবেরিয়ায় আসিতে লাগিল। আইদারলী পাহাড় হইতে আবার তারা সংগ্রহ করিল অজস্র লৌহ। সে যুদ্ধ শেষ হইলে উরাল এবং সাইবেরিয়ার লোক-জন খনির কাজে উৎসাহী হইল। মস্কো হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এক দল ব্যবসায়ী আসিয়া মাগনিতানিয়ায় আস্তানা পাতিল। বড় বড় ব্যারাক নির্ম্মাণ করিয়া সেই সব ব্যারাকে তারা বাসের ব্যবস্থা করিল; এবং ল্যাবরেটরি খুলিয়া সেই সব ল্যাবরেটরিতে নানা রকম পরীক্ষা চলিতে লাগিল। বৃষ্টিপাতের পরিমাপ কষা—সে জলের পরীক্ষা; উরাল নদীর জল পরীক্ষা; সে জলে লৌহ-চূর্ণ আছে কি না—থাকিলেও কি-জাতের লৌহ—এমনি নানা বিষয়ের তাঁরা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এ অঞ্চলে ছিল বাশ্‌খীর ও কিরঘিজি জাতির বাস। এত রাশিয়ানের আগমনে তারা বিরক্ত হইল।

ইহার এক বৎসর পরে কিন্তু পরিবর্ত্তনের ধারা বহিতে সুরু করিল। দেশের বুক জুড়িয়া রেল-লাইন পাতা হইল। এঞ্জিন আসিল, রেল-গাড়ী আসিল। বাশ্‌খীর ও কিরঘিজি জাতির বিস্ময় এবং আশঙ্কা বাড়িল; কিন্তু তাদের সে ভয় ও বিস্ময় ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইল না! রেল-লাইন পাতা ও গাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গে কারখানা-নির্ম্মাণে সমারোহ বাধিল। যন্ত্রপাতি, কাঠ, লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট, খাদ্য, পানীয় জল—ভারে ভারে আসিতে লাগিল। গ্রামের লোক চাকরি পাইল; তাদের অভাব ঘুচিল। মনের বিরক্তি ঘুচাইয়া তারা আসিয়া দলে দলে নির্ম্মাণ-কার্য্যে যোগ দিল। সঙ্গে সঙ্গে নবস্থাপিত সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নিরুপদ্রবে বিনা-রক্তপাতে দেশবাসীর হৃদয় জয় করিল; তাদের মনে চেতনা জাগাইয়া কর্ম্মোদ্দীপনায় তাদের বুকে আনিয়া দিল নূতন জীবন-প্রবাহ!

উরালে এবং সাইবেরিয়ায় শুধু লৌহের খনি আবিষ্কার নয়—সেই সঙ্গে ১৫০০ মাইল দূরে পূর্ব্বে অবস্থিত কুজনেৎস্কে মিলিল কয়লার বিপুল খনি। এবং বিদেশের যেখানে যে যন্ত্র পাওয়া যায়, সেখান হইতে সেই সব যন্ত্র আনিয়া সোভিয়েট রাশিয়া একবারে সহস্রবাহু

হইয়া যান্ত্রিকতা গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। যন্ত্রযুগে যতখানি সম্ভব অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই হইল সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য।

এই কর্ম্মোৎসাহের ফলে মার্কিন সুধী জন স্কট লিখিয়াছেন, উরাল নদীর উপর যে-বাঁধ তৈয়ারী হইল, সে বাঁধের দৈর্ঘ্য দশ মাইল; প্রস্থে এ বাঁধ দুই মাইল। এই নদীর জল লইয়া অভ্যন্তর-দেশে কাজ তেমন স্বচ্ছন্দ ভাবে চলিত না, জলের অভাব ঘটিত; সে জন্য দেশের বহু স্থানে বিরাট্ জলাশয় খনন করা হইল। এই নদীর জলে সে সব জলাশয় সারাক্ষণ পরিপূর্ণ রাখিবার সুব্যবস্থা হইল; এবং আইদারলী পাহাড়ের কোল হইতে প্রায় এক হাজার মাইল দূর ব্যাপিয়া দিকে দিকে অসংখ্য মিল এবং কারখানা বসিল। এই সব কল-কারখানায় রাশিয়ান, উকরেনিয়ান, তাতার, বাশ্‌খীর, কিরঘিজী, উজবেক, তুর্কি, মোঙ্গল, মার্কিন, চীনা, ফিন, হাঙ্গেরিয়ান, মর্দ্দভিনিয়ান—সর্ব্ব জাতির প্রায় লক্ষাধিক লোক কাজ করিতেছে।

অস্ত্র কারখানা—চেলিয়াবিনস্ক

নদীর ঘাট—আধুনিক স্বার্ডলডস্ক

তাদের বাসের জন্য আছে ব্যারাক, তাঁবু, মাটীর কুটীর। এত জাতের লোক—তাদের ভাষাও প্রায় ত্রিশ-রকম—অথচ কাজে যেমন কাহারো উৎসাহ অল্প নয়, তেমনি হিংসা-দ্বেষও এ দলে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।
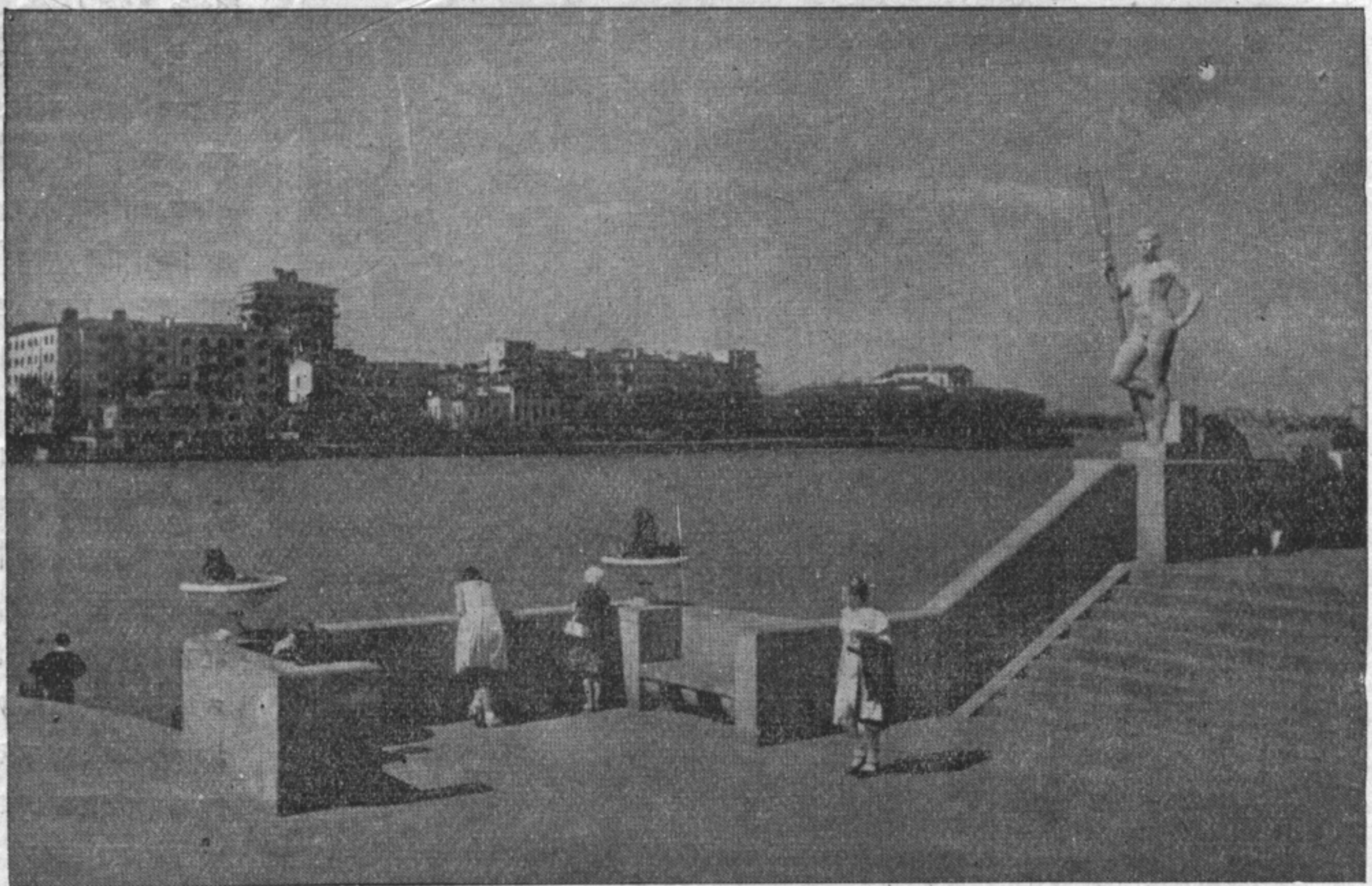
যে সব লোক চাষবাস ছাড়া আর কোনো কাজ জানিত না, পাঁচশো বৎসর ধরিয়া সনাতন সংস্কার-আচারের দাস্য করিয়া কষ্টে জীবন কাটাইয়াছে, আজ এই যন্ত্র-রাজ্যে কাজ করিতে তাদের অধ্যবসায়ের সীমা নাই! সাইমৎ নামে এক তাতার কুলি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কাজান্ গ্রাম হইতে এখানকার কারখানায় কাজ করিতে

আসে। গ্রামে সে ভেড়া চরাইত। জীবনে বৈদ্যুতিক আলো, রেলগাড়ী বা দোতলা বাড়ী সে চক্ষে দেখে নাই! হাতুড়ির চেহারা মাত্র দেখিয়াছিল, কিন্তু হাতুড়ি লইয়া মানুষ কি কাজ করে, তাহা সে জানিত না। রাশিয়ান ভাষাও ছিল তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! সে আসিয়া কারখানায় ইলেক্‌ট্রিসিয়ানের কাজে শিক্ষানবীশীতে ঢুকিল। তাকে দেওয়া হইয়াছিল দু'টি মোটর জেনারেটর। আনাড়ির হাতে এক সপ্তাহের মধ্যে সে দু'টি যন্ত্র বিকল হইল! সে জন্য তাকে খেশারতী দিতে হইল না বা তার চাকরিও গেল না—তাকে দেওয়া হইল আবার দু'টি নূতন জেনারেটর। এক সপ্তাহের মধ্যে সে-দু'টিও তার হাতে বিকল হইল! এই ভাবে ছ'মাস ধরিয়া যন্ত্রপাতি নাড়িয়া সেগুলিকে সে শুধু বিকলই করিল—তবু কাজে তার যেমন উৎসাহ—গবর্ণমেণ্টও তেমনি তাকে জেনারেটর এবং নূতন নূতন যন্ত্র জোগাইতে এতটুকু কার্পণ্য করে নাই। এক বৎসরে সে রুশ ভাষা শিখিল, যন্ত্রপাতির বিজ্ঞান এবং কলা-কৌশল শিখিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সে হইয়াছে কারখানার চীফ ইলেক্‌ট্রিসিয়ান!
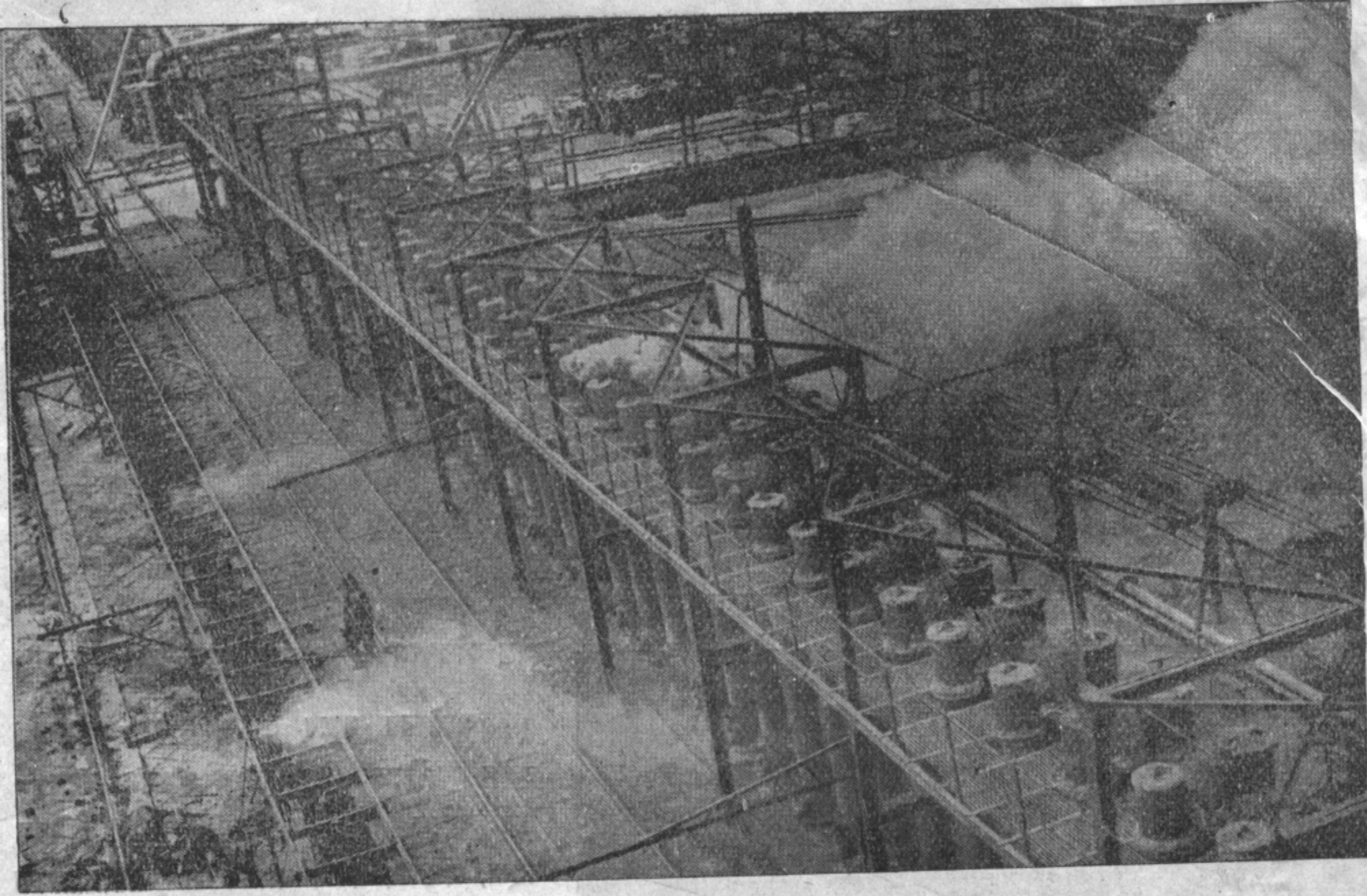
খনির কয়লা পুড়াইয়া কোক্‌-কয়লা ও কার্ব্বণ-বাষ্প-প্রভৃতি সৃষ্টি—কুজনেৎস্কের খনি
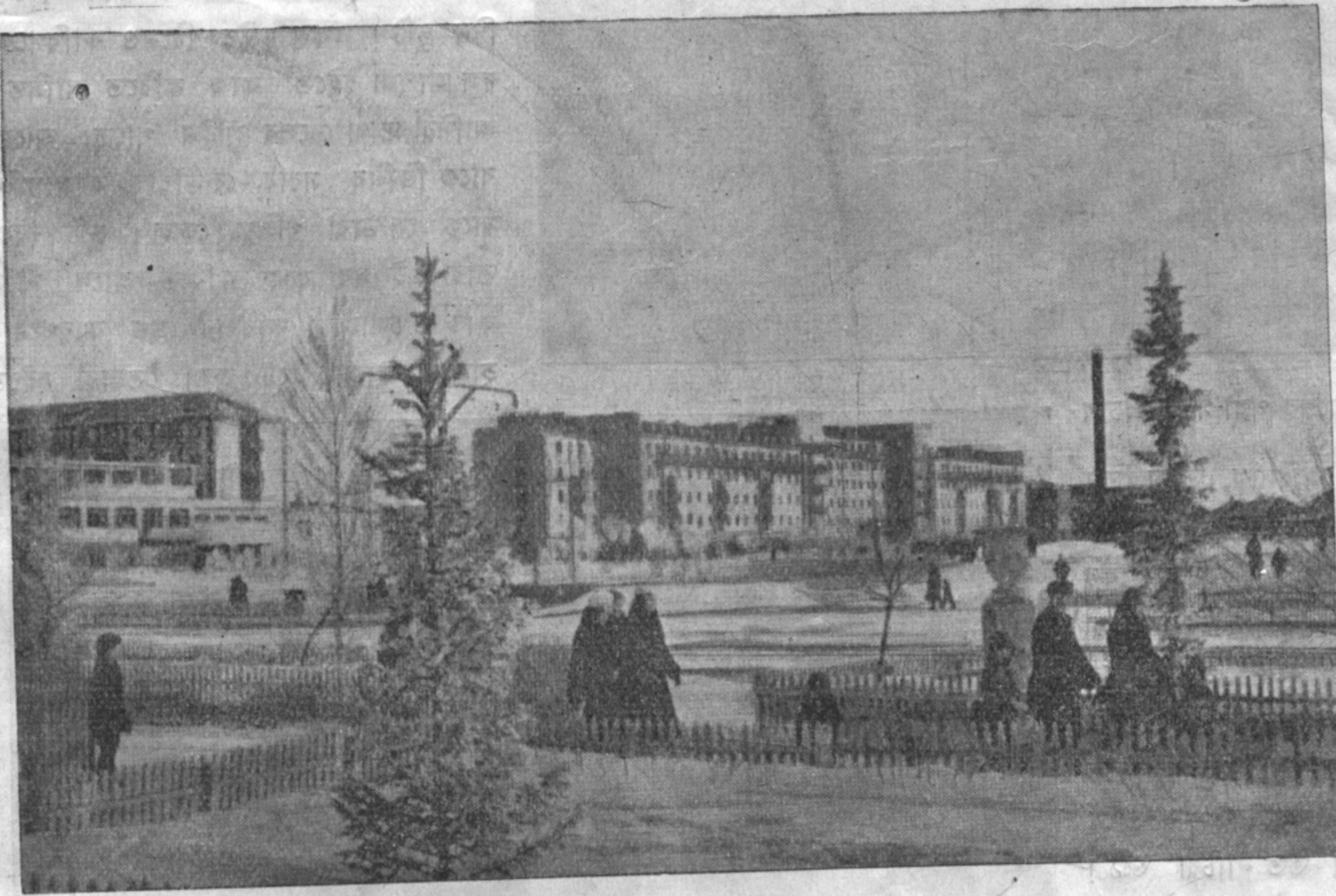
বরফ-ঢাকা সাইবেরিয়ার বুকে এ-কালের বাড়ী-ঘর—কুজনেৎস্ক

এই সব কল-কারখানা তৈয়ারী করিতে ভারা হইতে পড়িয়া কত লোক হাত-পা ভাঙ্গিয়াছে, মারা গিয়াছে; যন্ত্রপাতি নাড়া-চাড়া করিতে কত লোকের অপঘাত-মৃত্যু ঘটিয়াছে,—তবু ভয়ে কেহ কারখানা ছাড়িয়া পলাইয়া যায় নাই! ষ্টালিনের যেমন শাসন, তেমনি দরদ। অতি তুচ্ছ নগণ্য কুলিও যাহাতে কাজের দাম বুঝিতে পারে, তার কাজের দাম কষিয়া তাকে তাহা বুঝাইবার জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণের বিপুল পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়

ষ্টালিনের প্রবর্ত্তিত নীতির গুণেই ঘটিয়াছে। কারিগরদের মধ্যে নগণ্য কেহ নাই। তারা আলস্য জানে না, ফাঁকিবাজী জানে না—কাজে কাহারো শৈথিল্য বা ঔদাসীন্যের কথা শুনা যায় না!

যে ভাবে সাইবেরিয়ার তুষার-প্রান্তরে ময়দানবের পুরীর অনুরূপ এই যন্ত্রপুরী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারি বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক জন কর্ম্মী লিখিয়াছেন:

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আমি মাগনিতোগরস্কের কর্ম্মশালায় যোগ দিয়াছিলাম। মাঠ-বাট হইতে লোক-জনকে আনিয়া যন্ত্রের কাজে লাগানো হয়। তারা যেমন আনাড়ি, তেমনি অপদার্থ—সকলে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া থাকে, কিন্তু পলাইবার নাম করে না।

অস্ত্র-কারখানায় কর্ম্মীদের কার্য্য-সূচী-পাঠ

অক্টোবর মাসে প্রচণ্ড তুষার-বর্ষণ সুরু হইল। শীতে হাড়-পাঁজরা ঝন্‌ঝন্ করে—তবু কাজে কাহারো কামাই নাই! নিয়ম ছিল, সপ্তাহে এক দিন করিয়া ছুটি। রবিবার বলিয়া ছুটির জন্য সেই দিনটিই নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ছ'দিন কাজ করিলে সাত দিনের দিন ছুটি! কিন্তু ছুটির দিনেও কারিগরের দল আপনা হইতে কাজ করিতে আসিত! আসিয়া তারা রেলের লাইন পাতে, আজে-বাজে জিনিষ সরায়, যে-ভারার কাজ চুকিয়াছে সে-ভারা খুলিয়া ফেলে। ছুটির দিনে তারা এই সব কাজ করিতে আসে। শীতে কাজ ও চলাফেরা করিবার জন্য কারখানায় হাজার হাজার বুট জুতা তৈয়ারী হইতে

কিরঘিজের পল্লী-গীতি-প্রচার

আমি যখন কাজ সুরু করিলাম, তখন তিন নম্বরের অতিকায় চিমনীর ভিদ উঠিতেছে। ইস্পাতের প্লেট, ড্রেনের পাইপ, ইলেক্‌ট্রিকের তার, গ্যাস-পাইপ—সব স্তূপাকারে আসিয়া জমিয়াছে! প্রান্তরের বুকে প্রত্যহ মাল গাড়ী-বোঝাই হইয়া পাইপ, সিমেণ্ট, ইট আসিতেছে। মালপত্রের স্তূপ যত আসিতে দেখি, এক বিরাট্ সম্ভাবনার আভাসে আমাদের মন উল্লাসে তত নাচিয়া ওঠে! আমাদের আগ্রহের সীমা নাই! দেহে শক্তি যতখানি আছে, সব দিয়া সকলে কাজ করি। সকলের মনে কৌতূহল—দিনের শেষে আমাদের সকলের সম্মিলিত শক্তিতে না-জানি কি নূতন মূর্ত্তিতে রূপ পাইয়া গড়িয়া উঠিবে!

লাল-ফৌজের জন্য আর্মার্ড ট্রেণ-নির্ম্মাণ

ঝালাইকরদের মধ্যে শতকরা দশ জনের হইল অপঘাত-মৃত্যু। নূতন লোক আমদানি করা শক্ত—বাহিরে কোথায় লোক মিলিবে? পনেরো বয়সের উর্দ্ধ বয়সের কেহই বসিয়া নাই! কাজেই অন্য ঝালাইকরদের কাজের মাত্রা বাড়িল।

খাদ্যাভাবেরও সীমা ছিল না। প্রত্যেক কর্ম্মী বা কারিগরের জন্য ছিল খাবারের টিকিট। সেই টিকিট দেখাইয়া নির্দ্দিষ্ট রসুই-খানায় একবারের মাত্র আহার্য্য মিলিত। আহার্য্যের জন্য তাহাকে দাম দিতে হইত। কর্ম্মীদের মধ্যে সকলের টাকা-পয়সা ছিল প্রচুর, কিন্তু সে টাকা দিয়া খাদ্য কিনিবে কি, খাদ্যের অভাব! একবারের খোরাকে
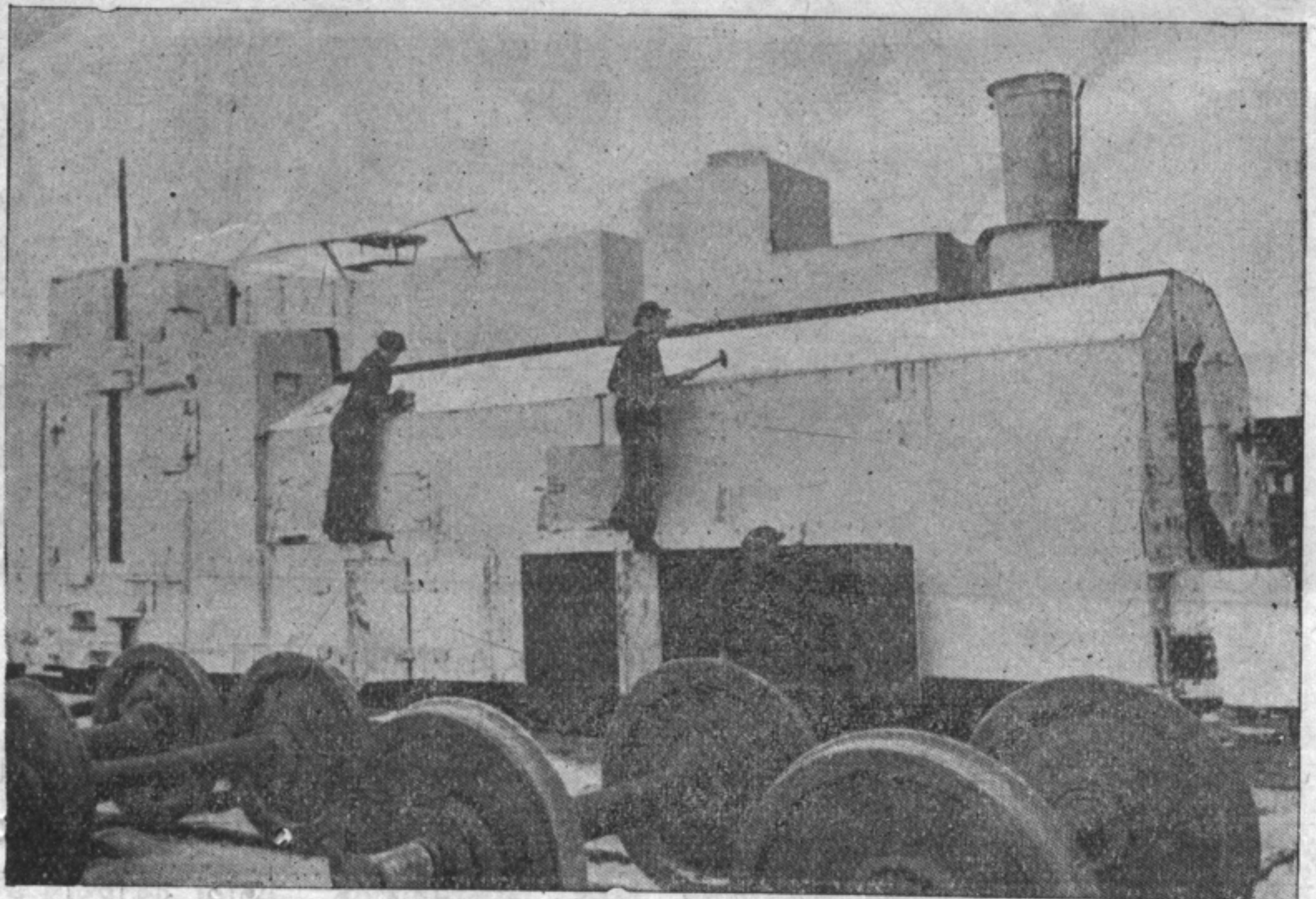
ক্রেমলিন রাজাদের আমলের দুর্গ—ঐ সব গির্জ্জা এখন মিউজিয়ম

লাগিল—ফেল্টের বুট জুতা। শীতে হাত অবশ হয়—আগুন জ্বালিয়া সে আগুনে হাত তাতাইয়া লোক-জন কাজ করে! মেয়েরাও আসিয়া পুরুষদের সঙ্গে নানা কাজে যোগ দিয়াছিল। শীতের জন্য আপাদ-মস্তক শালে ঢাকিয়া মুড়িয়া এমন বেশে তারা আসিত যে কারো সাধ্য ছিল না, তাদের চিনিতে পারে!

যন্ত্রপাতির কাজে সকলেই প্রায় আনাড়ি, তার উপর প্রচণ্ড শীত এবং তুষার-বর্ষণ—যারা লোহার কাজ করিতেছিল, তাদের মধ্যে বহু দৈব-দুর্বিপাক ঘটিতে লাগিল।

গায়ে তুলার ও লোমের কোট চড়াইয়া শ্রমিকদের রেল-লাইন পাতা

মিলিবে একখানা রুটি, এক প্লেট সুপ এবং এক প্লেট তরকারী! তরকারী মানে চার-পাঁচটা আলু, আর তার সঙ্গে যা-তা এক-টুকরা চারা-মাছ! দু'বারের খোরাক যাহাতে মেলে, সে জন্য আন্দোলন চলিত খুব, কিন্তু আন্দোলনেই তাহা পর্য্যবসিত হইত। এক বছর মাগনিতোগরস্কে চিনি, মাংস, মাখন, ডিম বা তৈল—কেহ চক্ষে দেখে নাই।

পোষাকেরও তেমনি অনটন! একটা প্যাণ্টের জন্য খরিদ্দার জুটিত দশ জন! কাজেই একটা প্যাণ্টের দাম ছিল একেবারে আগুন! এত দিকে এত যে অভাব তার কারণ—রাশিয়ান গভর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে

কয়লা-খনির মধ্যে আলোর লহর—ষ্টালিনস্ক

অজস্র যন্ত্রপাতি কিনিতেছে,—সে সবের দাম দিবার মত অর্থ সরকারী তহবিলে ছিল না; যন্ত্রপাতির দাম দেওয়া হইত ধান, চাল, গম, তুলা, চামড়া, পশুলোম এবং দুগ্ধ, পনীর ও মাখন বিনিময়ে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার রাজস্বের শতকরা ৫৬ ভাগ এই গঠন-কার্য্যে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল। বিদেশী কোন ফার্ম্ম রাশিয়াকে ধারে একটা ছুচ পর্য্যন্ত বেচিতে রাজী হয় নাই! কাজেই রাশিয়ানদের ললাটের ঘর্ম্ম এবং দেহের রক্ত নিংড়ানো ভিন্ন গঠনকার্য্য-সম্পাদন ছিল অসম্ভব ব্যাপার!

এ জন্য বিরক্তি অসন্তোষ প্রধূমিত হইতেছিল। অনেকে নায়কতা করিয়া প্রতিবাদ তুলিয়াছিল। কিন্তু ষ্টালিন তাহাতে এক তিল

গলিত ইস্পাত তোলা

বিচলিত হন নাই! সকলে বলিতেছিল—আমাদের প্রচুর খাদ্য দাও—আমাদের সকলের পায়ের জন্য মজবুত জুতা দাও, তার পর কল-কারখানা গড়িতে সুরু করো! দিকে দিকে অবশেষে বিদ্রোহ-বিপ্লবের আগুন জ্বলিল; কিন্তু তাহাতেও ষ্টালিন বিচলিত হইলেন না। তাঁহার বিধানে বিদ্রোহী বিক্ষুব্ধ দলের কাহারো হইল প্রাণদণ্ড, কাহারো বা নির্ব্বাসন। ১৯৩৬-১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টালিন ভ্রান্তপথে চলিয়াছেন বলিয়া বহু সুধী ও শিক্ষিত রাশিয়ান গর্জ্জন তুলিলেন—তাহার ফলে তাঁদেরো ঘটিল নির্ব্বাসন বা প্রাণদণ্ড। এ সময়ে রাশিয়ার ভাগ্য যেন সরু সুতায় ঝুলিতেছিল—কে থাকে, কে যায়,—তার যেন কোন হদিশ ছিল না!

ষ্টালিন

অন্নবস্ত্রের এমন অভাব অথচ পকেটে টাকা থাকিতে পেট ভরিয়া আহার মেলে না,—শীতের দিনে শীত নিবারণ
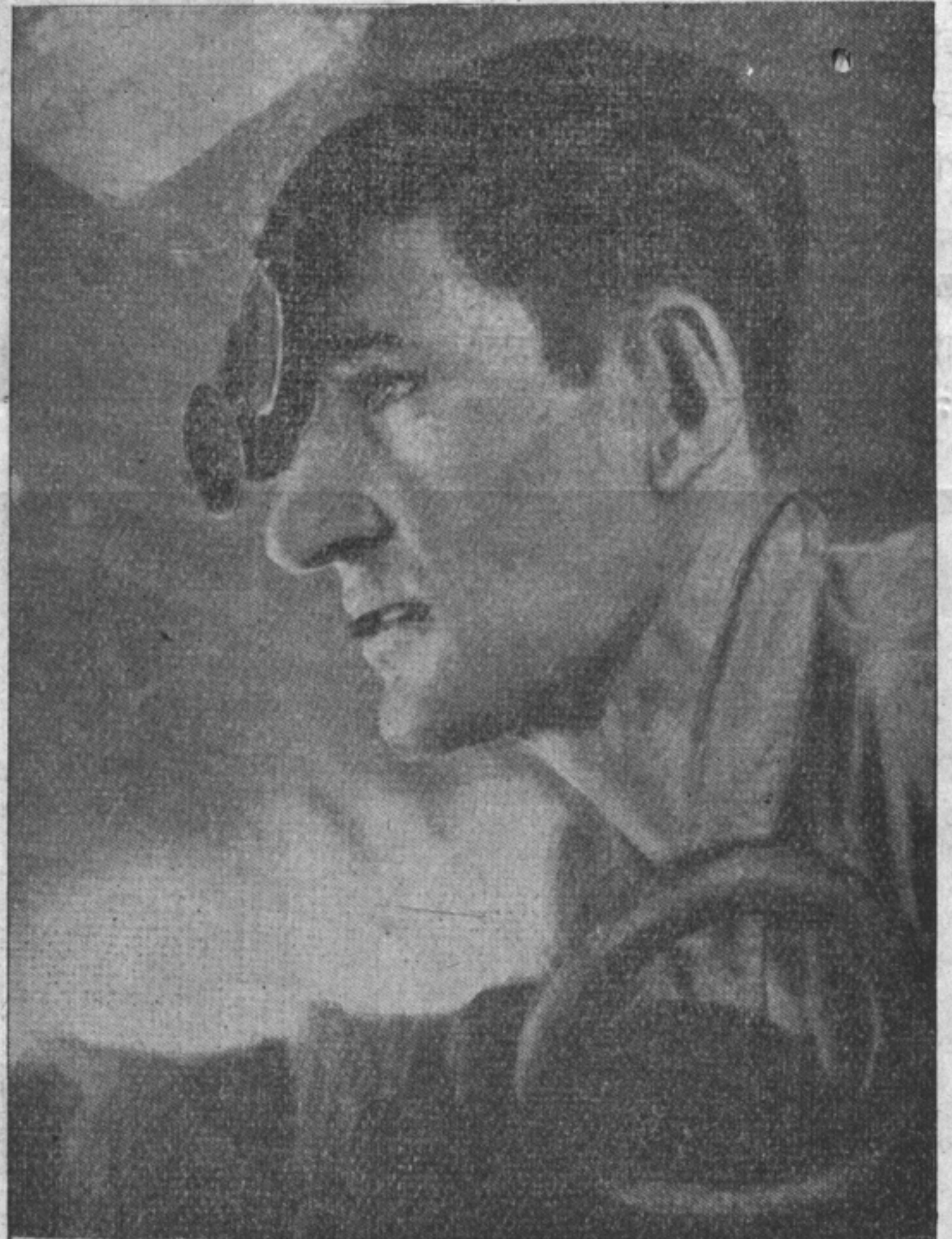
ইস্পাতের কারখানা—কারিগরের চোখে চশমা

করিতে আচ্ছাদন জোটে না! তবু ষ্টালিনের কার্য্য-পদ্ধতি ছিল অচল অটল! স্নান-পানের জন্য প্রত্যেককে জল আনিতে
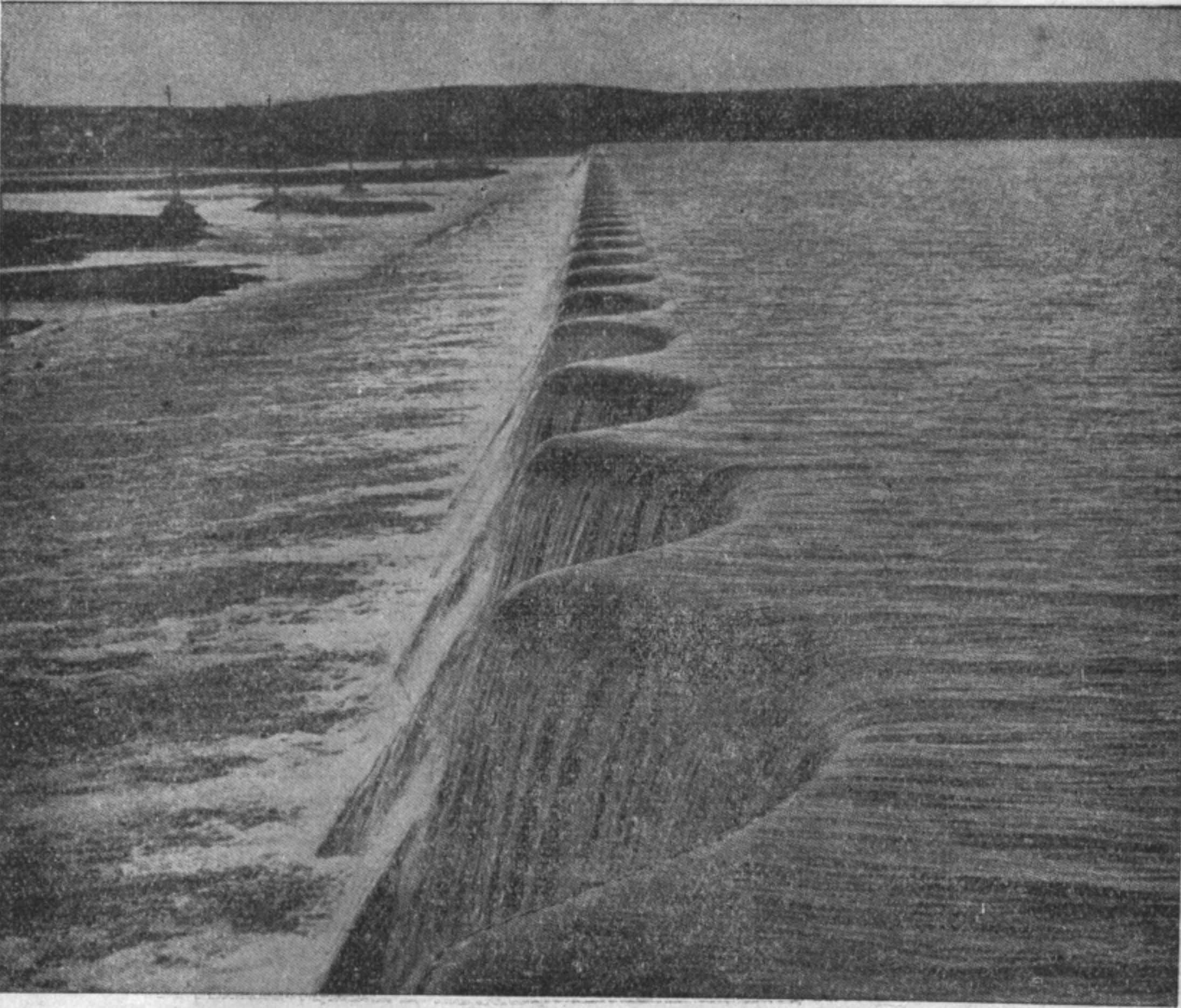
উরাল নদীর বাঁধ
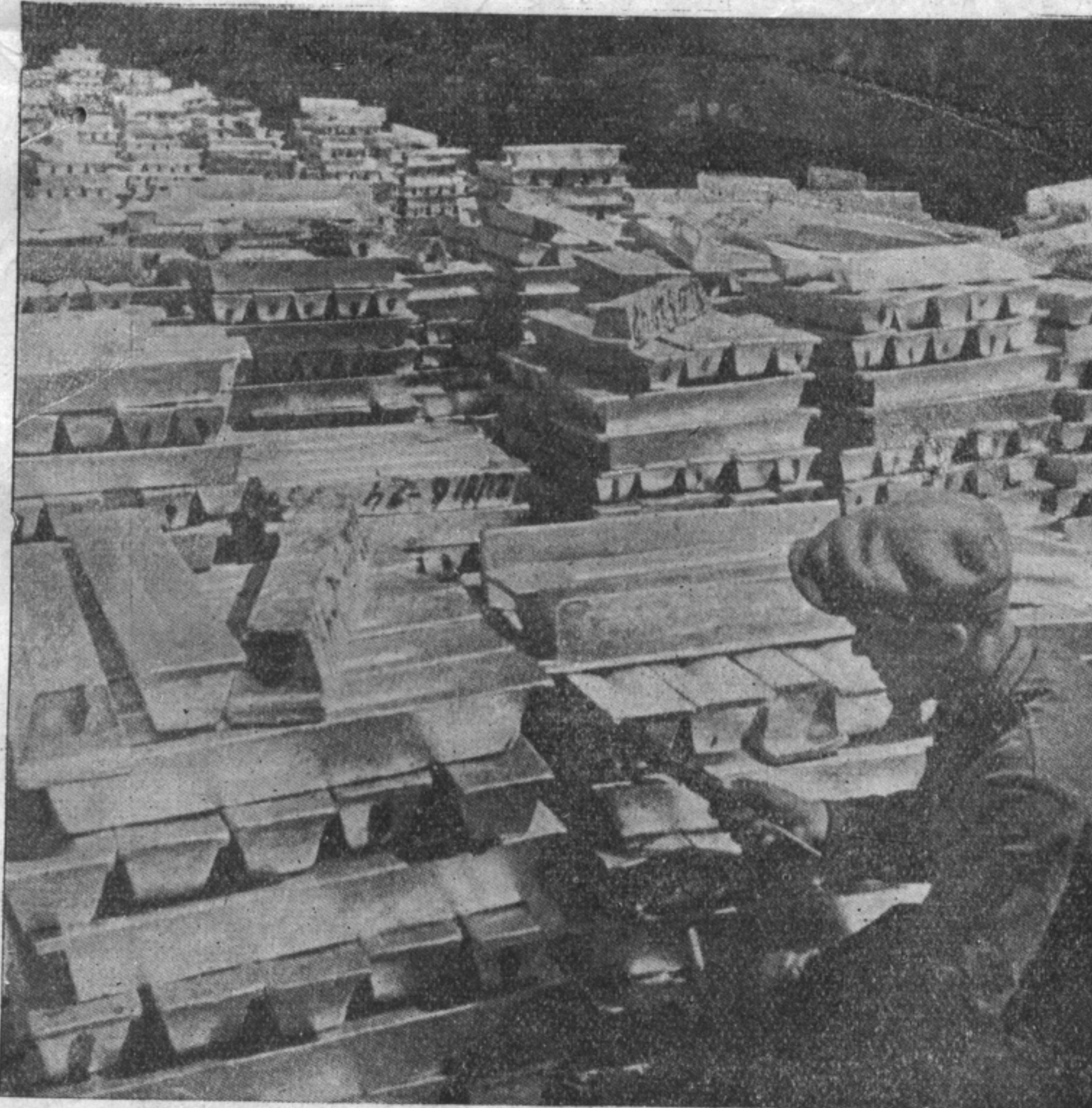
এলুমিনিয়ামের কারখানা—দনেপ্রোপেত্রোভস্ক

এক এক ঘরে তিন জন করিয়া লোকের বাস। কাজের ছুটি হইলে ব্যারাকে ফিরিয়া রাত্রে রুটিন ধরিয়া লেখাপড়া শেখার বিধি ছিল। লেখাপড়া জানা চাই—নিরক্ষরতার অবসান চাই—ষ্টালিনের আদেশ। ওদিকে কাজেরও এক নিমেষ কামাই ছিল না—দিন-রাত কাজ চলিত। চব্বিশ ঘণ্টাকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া কর্ম্মীদের পালা-ক্রমে আট ঘণ্টা করিয়া এক-টানে কাজ করিতে হইত।

রাত্রি তিনটা হইতে দিনের রুটিন সুরু। এক দল কাজে বাহির হইত রাত্রি তিনটায়; তারা ফিরিত বেলা এগারোটায়। বেলা এগারোটায় দ্বিতীয় দল কাজে বাহির হইত—তারা ফিরিত সন্ধ্যা সাতটায়। তার পর আবার প্রথম দলের পালা—৭টায় গিয়া রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত কাজ। অর্থাৎ প্রত্যেককে ষোল ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হইত।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ব্যারাকে চিনির আমদানি হইল। সপ্তাহে প্রত্যেকে এক পোয়া করিয়া চিনি পাইবে, ব্যবস্থা।

এমনি করিয়া পাঁচ বৎসর কাটিল কঠোর কর্ম্ম-সাধনায়। পাঁচ বৎসরে যে সব কারখানা সতেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তাদের প্রত্যেকটি হইতে লক্ষ লক্ষ টন ওজনের তৈয়ারী মাল এবং বারো-চিমনী-ওয়ালা কারখানা হইতে দিনে ৫০০০ টন ওজনের ইস্পাত তৈয়ারী হইতে লাগিল। যে রাশিয়া পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দু'হাত রেল কিনিত বিদেশ হইতে, পাঁচ বৎসরে সে রাশিয়া তৈয়ারী করিতে লাগিল সর্ব্বরকমের সামগ্রী—লক্ষ-কোটি মাইলব্যাপী দীর্ঘ রেল; এ্যাঙ্গল-আয়রণ, লোহার পাত, জয়েষ্ট, বীম্, চ্যানেল প্রভৃতি।

বরফে-ঢাকা রাশিয়া পাঁচ বৎসরে শুধু যে লোহা-ইস্পাতের কর্ম্মক্ষেত্রে ভূষিত হইল তা নয়; রাশিয়ার চাষা-ধীবর প্রভৃতি নিরক্ষর লোক-জনের মন জ্ঞানে-বুদ্ধিতে বিকশিত, স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে সকলের হইল যেমন প্রখর দৃষ্টি, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানেও তেমনি সকলের আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি। ইহার ফলে মরু-প্রান্তরে যে-নগর দেখা দিল, সে-নগরে ঘর-বাড়ী রচিত হইল সুদৃশ্য স্বচ্ছন্দময়, পথ-ঘাট

হইত বালতি ভরিয়া প্রায় আধ মাইল পথ হাঁটিয়া সুদূর জলাশয় হইতে। চাষীদিগকে ব্যারাক-বাড়ীতে থাকিতে হইত—

পরিষ্কার আবর্জ্জনাহীন; পথের দু'ধারে ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজির অভাব রহিল না। তার উপর পার্ক, দীঘি—শোভা-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

লেনিন-স্তম্ভ—মস্কো। তরুণ দল প্যারেড করিতেছে

স্বার্ডলভস্ক—জংশন-ষ্টেশন

জাতির কর্ম্ম-কুশলতাও আজ অসামান্য। মাগনিতোগরস্কের মতই চেলিয়াবিনস্ক, খালিলোভো, নোভোটাগিল—আজ বিপুল যন্ত্রাগারে পরিণত। উরাল, কুজনেৎস্ক, কারাগান্দার খনি হইতে অজস্র পরিমাণে কয়লা মিলিতেছে; পশ্চিম সাইবেরিয়া ও কাজাখ্ হইতে মিলিতেছে তামা, সীসা, জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, ভানাডিয়াম, টুঙ্গষ্টেন, মাঙ্গানীজ। ভলগা নদীর তীর হইতে সারা উরালে খনিজ তৈলের অমর-অক্ষয় প্রস্রবণ মিলিয়াছে। উফা এবং অর্স্কে যে পেট্রোল মিলিতেছে—সেখানকার কারখানায় যে লুব্রিকেটিং বা মেশিনের তৈল মিলিতেছে, শুধু তাহারি উপর নির্ভর করিলে সোভিয়েট প্লেন এবং ট্যাঙ্কগুলি এ যুদ্ধে ক্ষণেকের

রাশিয়ার মেয়েরা এ যুদ্ধে পুরুষের কাজে সহায়

শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে রাশিয়া আজ সমুজ্জ্বল—শক্তিতে রাশিয়া আজ প্রায় অপরাজেয়; এবং অতি নগণ্য সামান্য নাগরিকও আজ শিক্ষার গুণে এতখানি নিয়মানুবর্ত্তী হইয়াছে যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাশিয়ানের মুখের কথার দাম আজ প্রায় রেজিষ্ট্রী-করা ষ্ট্যাম্প-কাগজের একরার-নামার মত নির্ভর-যোগ্য। পূর্ব্বে যে হাজার-হাজার লোক লাঙ্গল ধরা ছাড়া আর কোনো কাজই জানিত না, আজ তারা জনে জনে নিপুণ মেকানিক্। তাদের শ্রমশক্তি অসাধারণ এবং আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধ-রীতিতে সমস্ত

কারখানায় বিরাম-অবসরে

জন্য পেট্রোলের অভাব অনুভব করিবে না! কৃষি-সম্পদেও রাশিয়ার ভাগ্য ফিরিয়াছে। মার্কিণ ট্রাক্টর আনাইয়া সে ট্রাক্টরের সাহায্যে উষর প্রান্তরকে আজ উর্ব্বর করিয়া তোলা হইয়াছে। ডিশেল-মোটরযুক্ত অগণিত ট্রাক্টর রাশিয়ার মাটীকে আজ উর্ব্বর এবং শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

তার পর অস্ত্রাগার এবং বারুদখানা। মধ্য উরালের বুকে পার্ম বা আধুনিক মোলোটভে বিরাট্ বিশাল বারুদখানা এবং অস্ত্র-নির্ম্মাণের কারখানা; তাছাড়া সর্ব্বত্র আজ বহু অস্ত্রশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। মধ্য উরালে বৃহত্তম অস্ত্রশালা-প্রতিষ্ঠার কারণ, কোনো বিদেশী শত্রু সারা রাশিয়া উত্তীর্ণ হইয়া চট্ করিয়া এখানে আসিতে

কারখানায় শিক্ষানবীশী—স্বার্ডলভস্ক

পারিবে না—কাজেই দুর্গমতার জন্য এ প্রদেশ সবচেয়ে নিরাপদ। এ সব বারুদখানায় সর্ব্ব রকমের মারণাস্ত্র, প্রতিরোধাস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। তার উপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে নব নব মারণাস্ত্র-নির্ম্মাণেও কর্ম্মীদের এতটুকু শৈথিল্য বা ঔদাসীন্য নাই।

নিজনি টাগিল দশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল জলা-জঙ্গলে পূর্ণ স্থান; এখন সৌধকিরীট এ-নগরটি হইয়াছে রেলোয়ের বহু-বিস্তীর্ণ কারখানা। এখানে চার-চক্র-দণ্ড-যুক্ত (four-axle) রেলগাড়ী তৈয়ারী হইতেছে বছরে ত্রিশ চল্লিশ হাজার করিয়া। এ সব গাড়ীর জন্য যে লোহা ও ইস্পাত লাগে, সে লোহা এবং ইস্পাতও ঐ কারখানায় তৈয়ারী হয়।

স্বার্ডলভস্কে—পূর্ব্ব নাম একাতেরিণবুর্জ—ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্‌কে সপরিবারে গুলী করিয়া মারা হইয়াছিল। এ সহরটি আজ হইয়াছে বিরাট্ যন্ত্রশালা। রাশিয়ার সাতটি বড় বড় রেলোয়ে-লাইন আসিয়া স্বার্ডলোভস্কে মিশিয়াছে। এ প্রদেশটিকে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সামরিক বিভাগ সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিয়াছে—এখানে ট্যাঙ্ক, প্লেন, কামান, বন্দুক, সাবমেরিন প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে।

কুজনেৎস্কের দক্ষিণে আলতাই পাহাড়ে মিলিতেছে অজস্র পরিমাণ সীসা, জিঙ্ক এবং রূপা। উত্তরে নরিলস্কে এবং কাজাখের বুকে যে বালখাশ হ্রদ, সেখানে—এ দুই জায়গায় তামা মিলিতেছে একেবারে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে

খনিজ-সম্পদে উরাল এবং সাইবেরিয়া সমৃদ্ধ—অথচ দশ বৎসর পূর্ব্বে এ সংবাদ সকলের অজ্ঞাত ছিল। দশ বৎসরে শুষ্ক রিক্ত রাশিয়া একেবারে রত্নমণির ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে—এ জন্য ষ্টালিনের কৃতিত্বের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

হিটলার যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ষ্টালিন তখনই নিজ-নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলেন। তাঁর ইঙ্গিত ছিল—রাশিয়ার যে জায়গা শত্রুরা অধিকার করিবে, সে জায়গা খালি করিয়া চলিয়া যাও—যাহা সঙ্গে লইতে পারিবে লইয়া যাইবে, যাহা লইয়া যাইতে পারিবে না,
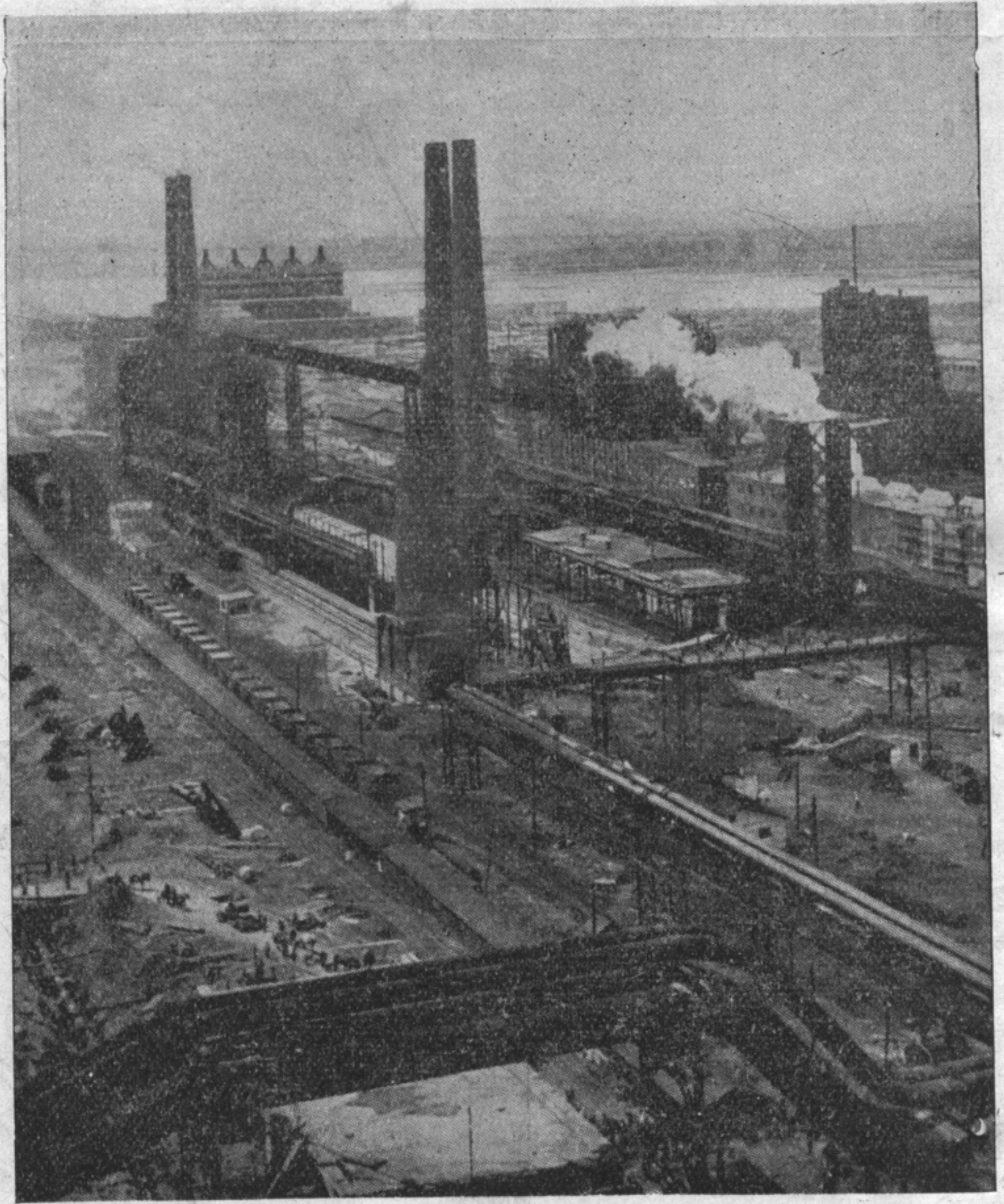
মাগনিতোগরস্কের কারখানা-শ্রেণী
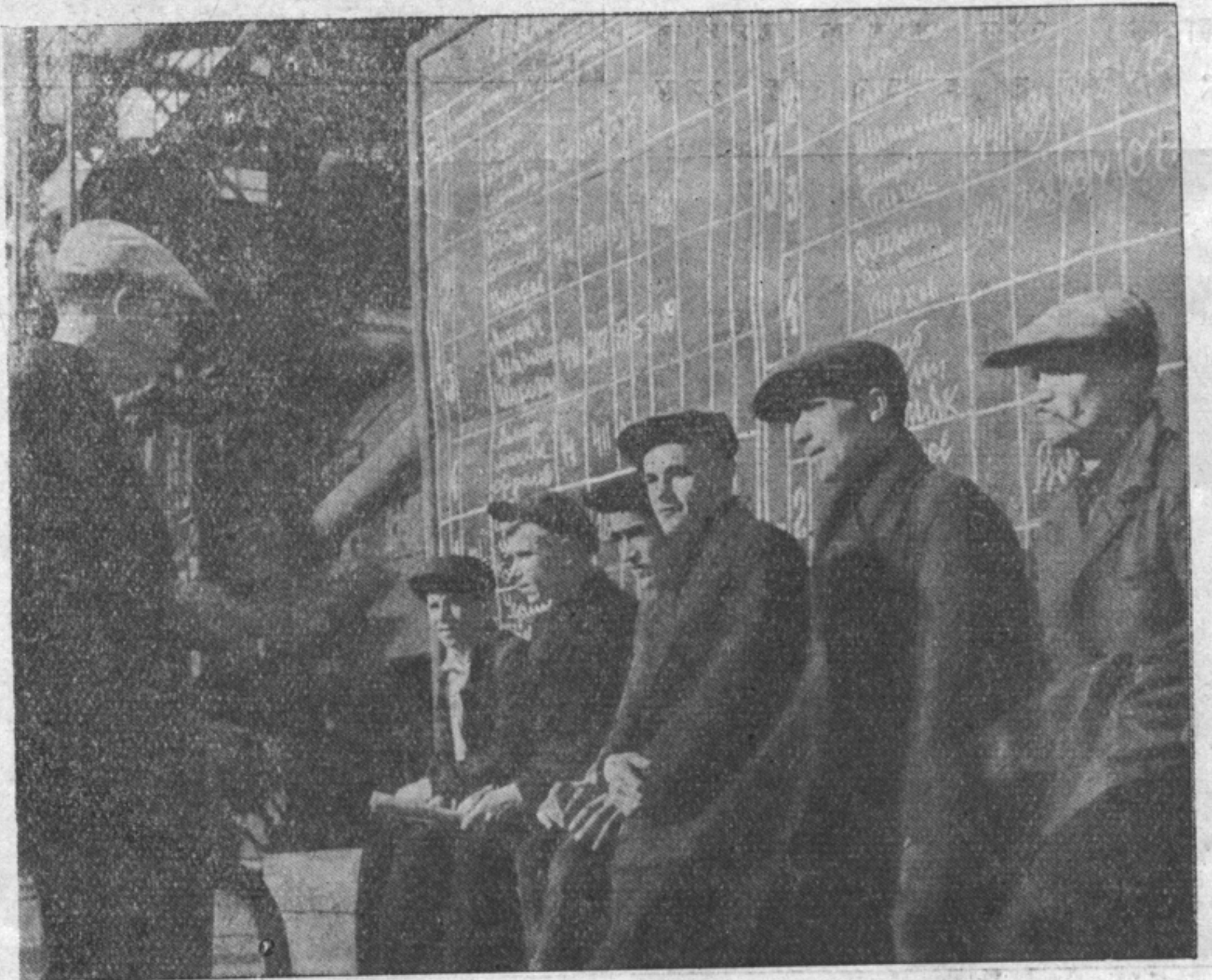
কারখানার দেওয়ালে বোর্ডে লেখা কারিকরদের কাজের হিসাব—মাগনিতোগরস্ক

সমূলে তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়া যাইবে। মায়া-মমতা করিয়া সে-জায়গা আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবে না বা সেখানে কিছু
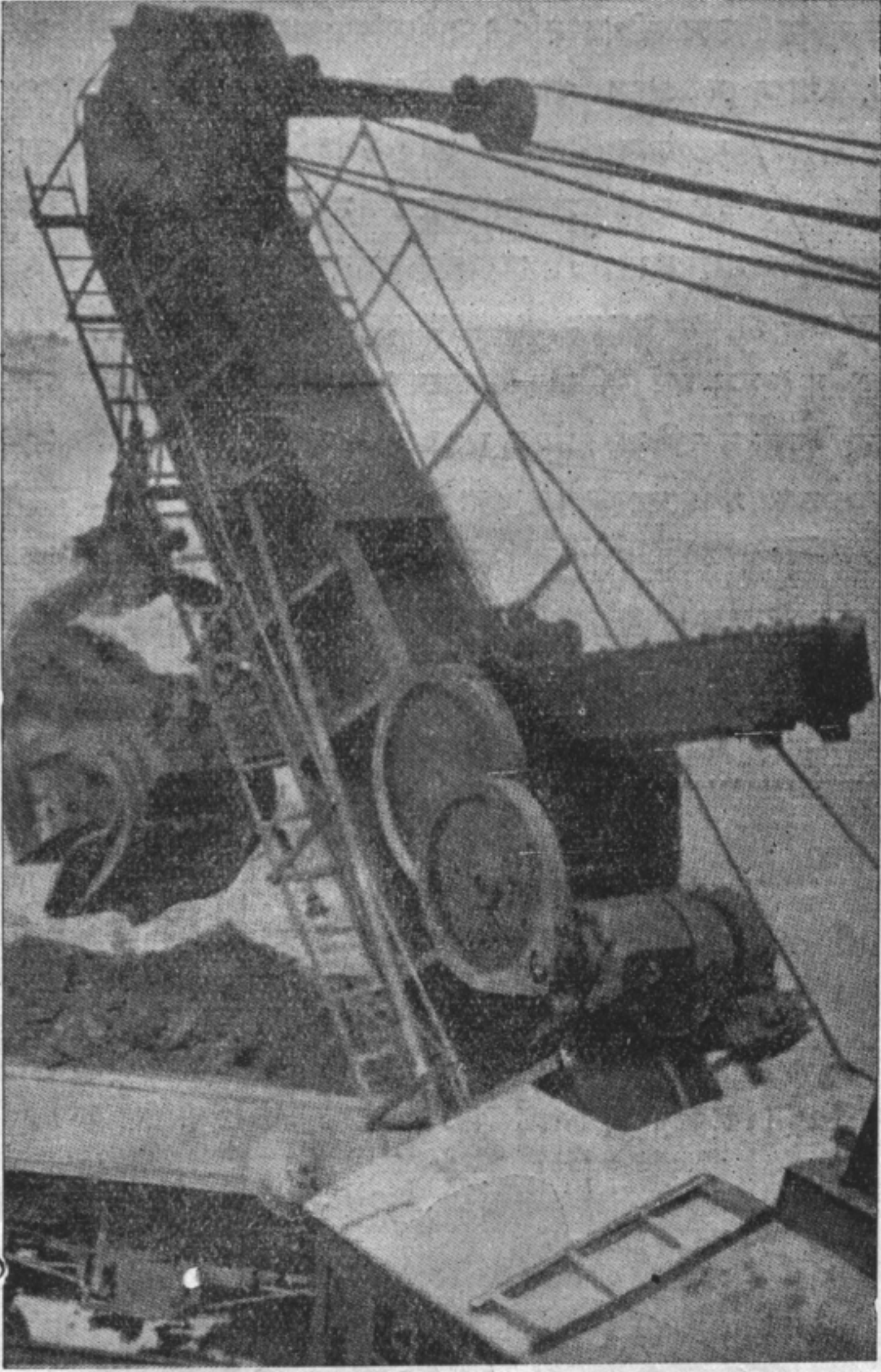
বৈদ্যুতিক যন্ত্রে পাহাড় কাটা—উরাল
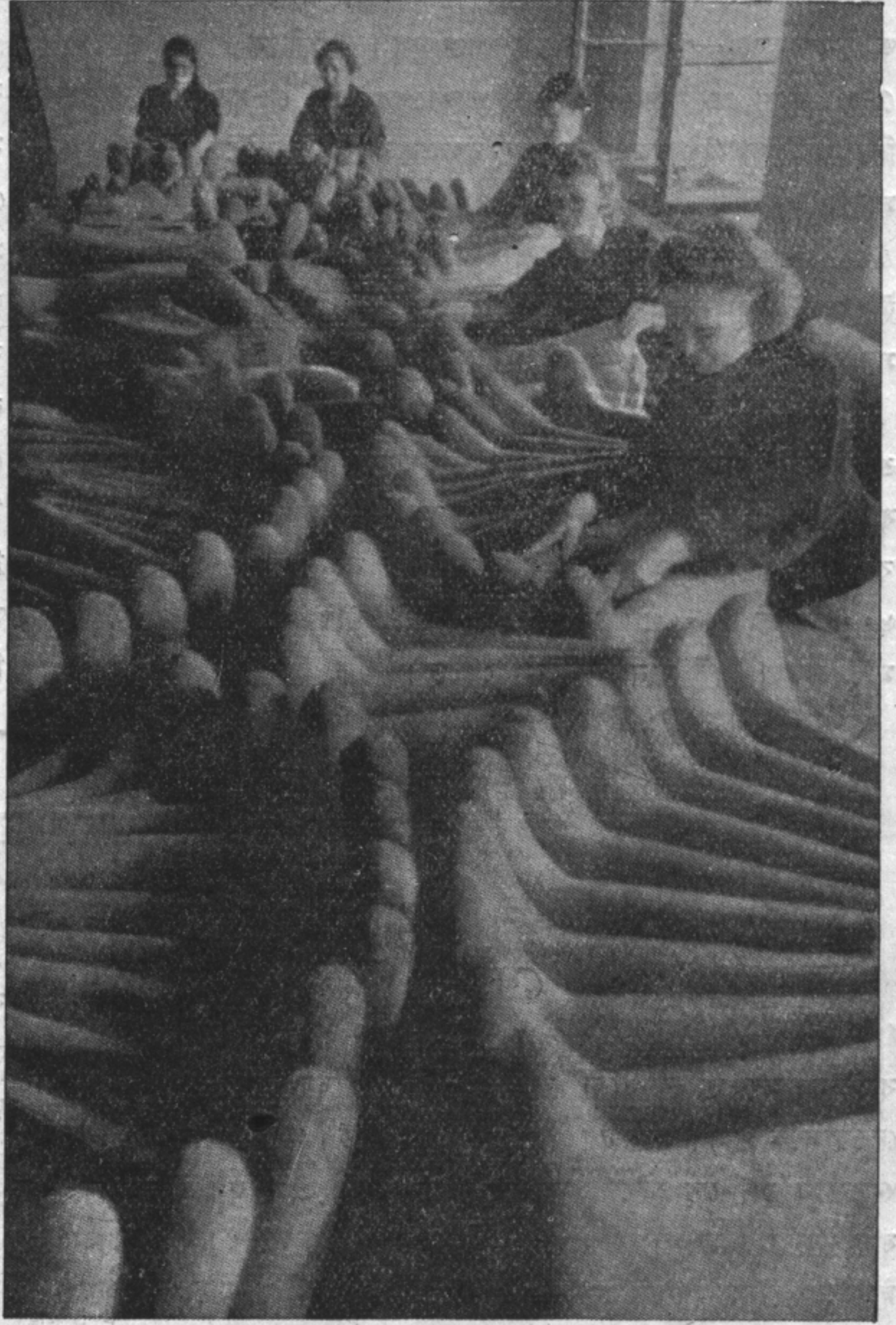
ফেল্ট-বুটের কারখানা

চিরচিক্ নদী—এ নদীর জলের শক্তিতে টাসখান্দের তুলার কল চলে

রাখিয়া যাইবে না। তাঁর এ-কথা রাশিয়ানরা শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেছে—সে জন্য অশেষ দুঃখ-দুর্গতি সহিলেও রাশিয়া আজো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে—শত্রুকে সবলে প্রতিরোধ করিয়াছে এবং দু'দিন পরে অধিকৃত প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিতেছে।

রাশিয়া হইতে এ যুদ্ধে যন্ত্রপাতিসহ অসংখ্য কল-কারখানা সশরীরে এশিয়াটিক রাশিয়ায় টানিয়া আনিয়া রাশিয়ানরা সেগুলিকে নিরাপদ, অক্ষয় ও সজীব রাখিতে পারিয়াছে। লেনিনগ্রাডের পুটি-লভ কারখানাটিকে তার সমস্ত যন্ত্রপাতি মায় মালপত্রের স্তূপ, মজুত মাল প্রভৃতি অক্ষত অটুট ভাবে রাশিয়া হইতে সরাইয়া ভল্‌গা নদীর ওপারে আনিয়া নিরাপদে রাখা হইয়াছে। রিবিনিস্কের প্লেনের বিরাট্ কারখানাকেও টানিয়া আনিয়াছে। হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট একটা

অতিকায় বস্তু—তাকে নড়ানো সহজ নয়। সেটিকেও আনিয়াছে। যে-সব অংশ আনিতে পারে নাই, তোপের মুখে সে-সব ধ্বংস করিয়া দিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি এ দু'বৎসরে রাশিয়া হইতে উরালে ও সাইবেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ রেলগাড়ী বহিয়া আনা হইয়াছে।

বড়-বড় কারখানাগুলির অধিকাংশই এমনি ভাবে সাইবেরিয়ায় ও উরালের নানা স্থানে আনা হইয়াছে। যেখানে আনা হইয়াছে, সে সব জায়গার নাম গোপন রাখা হইয়াছে।

ওদিকে যুদ্ধের বেগ যত বাড়িতেছে, কর্ম্মশালাগুলিতে কর্ম্মীদের শ্রমশক্তিও তত বাড়িতেছে। রাশিয়ান জাতি যেন এ যুদ্ধে সহস্র-বাহু হইয়া কাজ করিতেছে! অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটিতেছে, রাশিয়ান কর্ম্মীদিগের সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই! বহু স্থানে শ্রমিকদল দিনে ৬০০ হইতে ৮০০ গ্রাম মাত্র ওজনের রুটি, তার সঙ্গে দু'টুকরা কাঁটা-মাছ খাইয়া খুশী-মনে কাজ করিতেছে।

শস্য ও খনিজ সম্পদে য়ুরোপীয় রাশিয়া হইতে এশিয়াটিক রাশিয়া বহুগুণ সমৃদ্ধতর; সাইবেরিয়ার বড় বড় নদীগুলি যাতায়াতের পক্ষে মস্ত বড় সহায়; তার উপর দক্ষিণ সাইবেরিয়ার জমির উর্ব্বরতা এত বেশী যে, এখানে যে প্রচুর খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার কল্যাণে সমস্ত রাশিয়ার অন্নাভাব ঘোচে। তার উপর আবার সাইবেরিয়া দুর্গম দুর্দ্ধর্ষ,—ষ্টালিন তাই সাইবেরিয়াকে সকল দিক্ দিয়া নিরাপদ রাখিয়া এ যুদ্ধে নামিয়াছেন। য়ুরোপীয় রাশিয়া যদি জার্ম্মানির হস্তে জর্জ্জরিত হয়, ষ্টালিন জানেন, সে আঘাতের বেদনা হইবে সাময়িক! সে জ্বালা সে বেদনা সাইবেরিয়ার কল্যাণে ঘুচিবে! সাইবেরিয়ার উপর নির্ভর রাখিয়াছেন বলিয়া ষ্টালিন দৃপ্তকণ্ঠে আজো রাশিয়ানদের অভয় দিতেছেন, আশ্বাস দিতেছেন। এবং সে আশ্বাস যে অলীক নয়, তাহা রাশিয়ার লাল ফৌজের বিজয়-দুন্দুভিনাদে সারা পৃথিবীতে বিঘোষিত হইতেছে।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

মেরুদণ্ড

বাড়ী-ঘর মজবুত ও খাড়া রাখিতে হইলে যেমন তার ভিদ এবং দেওয়ালকে পাকা করা দরকার, আমাদের দেহের গড়নকে তেমনি সরল ও সুঠাম রাখিতে হইলে মেরুদণ্ডে জোর থাকা প্রয়োজন। মেরুদণ্ড যদি স্বচ্ছন্দ ও সরল থাকে, তবেই তার জোর! নচেৎ চলাফেরা বসা দাঁড়ানোর বেতালা ভঙ্গীতে আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়,—মেরুদণ্ড সরল স্বচ্ছন্দ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না—মেরুদণ্ড হয় পল্‌কা ও বে-মজবুত। এ জন্য সামান্য অসুখ-বিসুখ হইলে বা একটু বেশী পরিশ্রম করিলে আমাদের পিঠ টন্‌টন্ করিতে থাকে, শুইয়া বসিয়া পিঠের অস্বাচ্ছন্দ্য ঘুচাইতে অনেকখানি কশরৎ করিতে হয়!

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, মেরুদণ্ড যদি মজবুত থাকে, তাহা হইলে প্লুরিশি, নিউমোনিয়ার হাত হইতে যেমন রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেকখানি, তেমনি মেরুদণ্ডের অস্বাচ্ছন্দ্য বা বৈকল্য ঘটিলে প্লুরিশি নিউমোনিয়া যক্ষ্মা বাত ও পক্ষাঘাত রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে অনেকখানি। মেরুদণ্ডের অস্বাস্থ্য-হেতু পরিপাক-শক্তির গোলযোগ ঘটিয়া ডিস্‌পেপসিয়ার কবলে পড়া অনিবার্য্য হয়।

মেরুদণ্ডকে সরল স্বচ্ছন্দ এবং মজবুত রাখিতে হইলে কয়েকটি বিশেষ ব্যায়াম-বিধির প্রয়োজন। যে সব বিদেশিনী নৃত্যকলায় বিশ্বজয়ী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, মেরুদণ্ডের ব্যায়াম-সাধনায় তাঁদের আন্তরিক অধ্যবসায়ের সীমা নাই। মেরুদণ্ডকে সরল স্বচ্ছন্দ রাখিতে পারিলে দেহে কখনো মেদ জমিবে না—দেহের গঠন থাকিবে চিরদিনের জন্য যৌবন-সুকুমার; তার উপর স্বাস্থ্য হইবে অক্ষুণ্ণ, এবং পঞ্চাশ বছর বয়সেও দেহের তারুণ্য এতটুকু ক্ষয় পাইবে না। একটু পরিশ্রম করিলে যাঁদের সুগভীর ক্লান্তি ঘটে, যাঁরা হাঁফাইয়া ওঠেন, এ ব্যায়াম-সাধনায় তাঁদের সে উপসর্গ সম্পূর্ণ বিলোপ পাইবে।

এবারে মেরুদণ্ডের ব্যায়াম-বিধির কথা বলি।

১। সিধা খাড়া দাঁড়ান—তার পর হাঁটু মুড়িয়া উঁচু হইয়া বসুন। দুই পায়ের গোড়ালি তুলিয়া শুধু আঙুলের ডগাগুলির উপর ভর দিয়া ১নং ছবির ভঙ্গীতে বসিবেন। বুক যথাসম্ভব চিতাইয়া দুই হাত পিছন দিকে যত দূর পারেন ১নং ছবির মত প্রসারিত করিয়া

১। বুক চিতাইয়া দু'হাত পিছনে

দিন। তার পর বেশ দ্রুত তালে দুই হাত সামনে টানিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। দাঁড়াইবার পর ঠিক আবার এই ভাবেই বসিবেন,—এবং বসিয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ পর্য্যন্ত গণিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়ান। এই ভাবে পাঁচ মিনিটকাল বেশ দ্রুত ভাবে ওঠ্-বোস্ করিবেন। এ ব্যায়ামে সমস্ত অঙ্গ কমনীয়-নমনীয় ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে—বুক, পিঠ, পেট জঘনদেশের গঠন হইবে সুকুমার।

২। এবার মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ুন। বুক হইতে মাথা পর্য্যন্ত উঁচু করিয়া দুই হাত পিঠের উপরে আনিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত দিয়া দুই হাত ধরুন। উঠিবার পর দুই
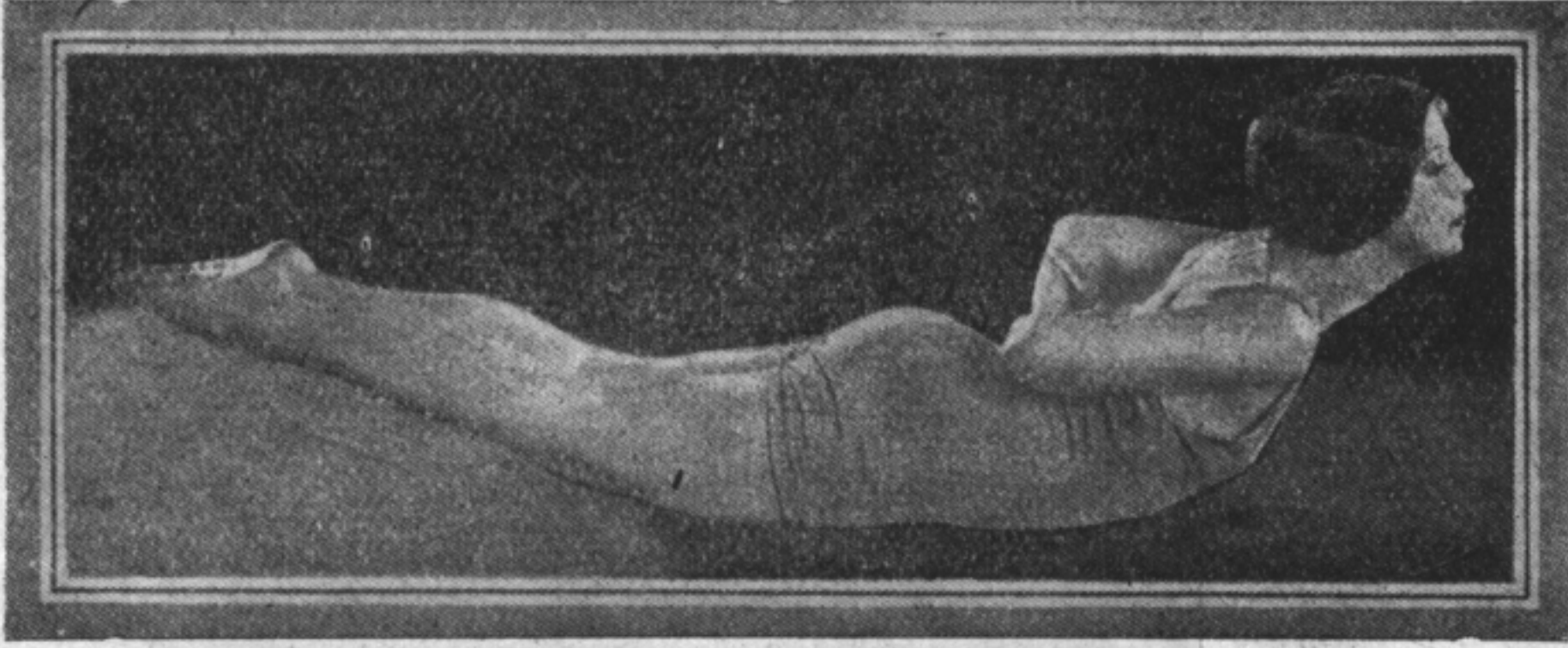
২। উপুড় হইয়া শুইয়া

হাত সংলগ্ন রাখিয়া উপরে-নীচে জোরে-জোরে তুলান—সঙ্গে সঙ্গে বুক হইতে মাথা পর্য্যন্ত পায়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া তুলাইতে হইবে—জলের ঢেউয়ে নৌকা যেমন দোলে তেমনি ভাবে তুলাইতে হইবে। এ ব্যায়ামে দেহ হইবে সুস্থ, সবল এবং স্বচ্ছন্দ।

৩। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইবেন—দাঁড়াইয়া হাঁটুর কাছে ডান পা মুড়িয়া তুলুন—পদ-তল বাঁকাইবেন ৩নং ছবির ভঙ্গীতে এবং
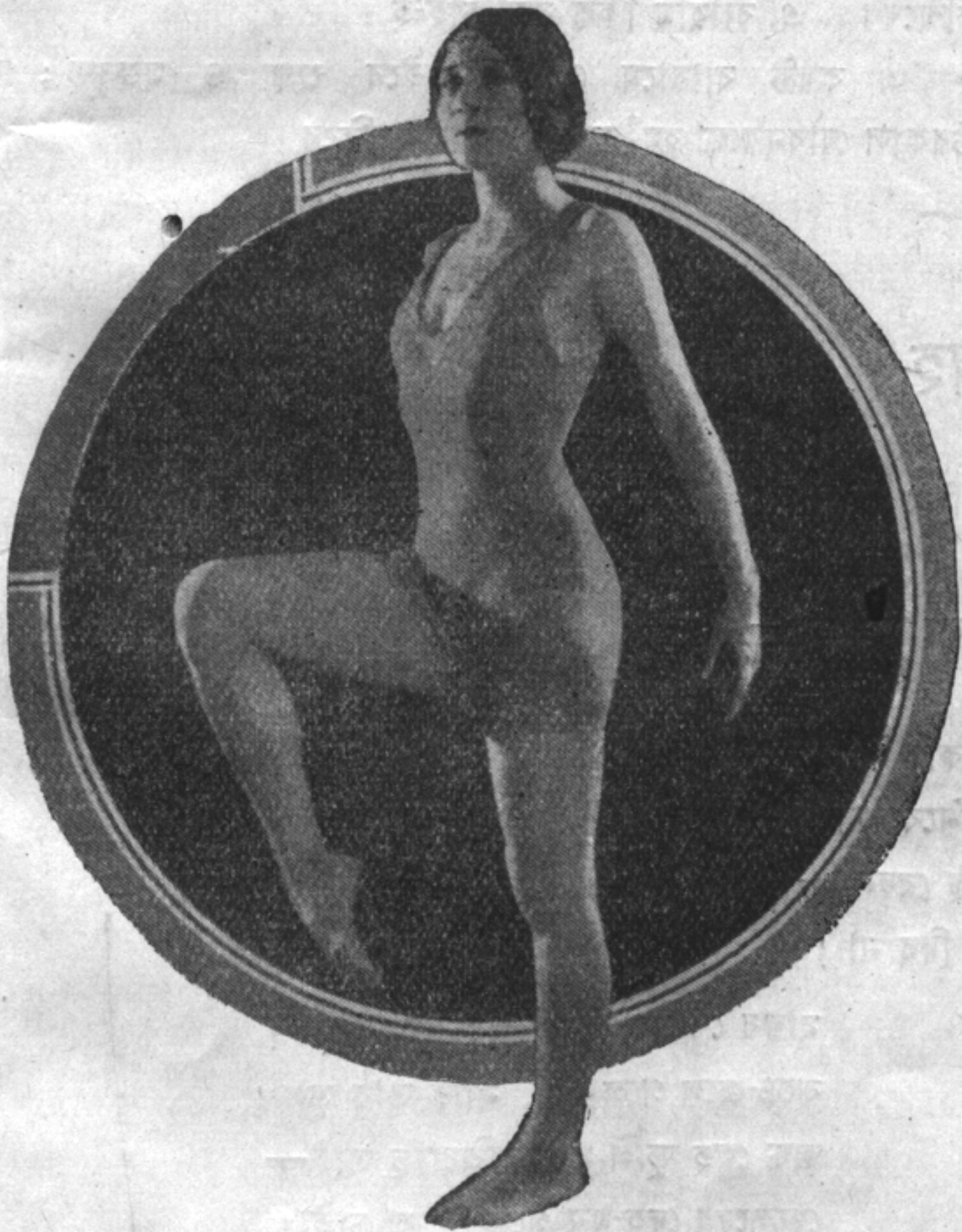
৩। ডান পা হাঁটুর কাছে মুড়িয়া

সেই সঙ্গে কাঁধও। এবার দুই হাত ৩নং ছবির ভঙ্গীতে পিছন দিকে হেলাইয়া বুক চিতাইয়া বেশ গভীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস লইবেন—দু'মিনিট কাল। তার পর দু'মিনিট ডান পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁটুর কাছে বাঁ পা মুড়িয়া তুলিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ।

৪। সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া দুই হাত উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া বাঁ দিকে একটু হেলিবেন ; দুই পা পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে—কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত হেলিবে না—সুদৃঢ় রাখিতে হইবে। এই ভাবে দাঁড়াইয়া দুই হাত এমনি ৪নং ছবির ভঙ্গীতে সংলগ্ন রাখিয়া আবার ডান দিকে হেলিতে হইবে। কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত না নাড়িয়া কোমর হইতে দেহের উপরার্দ্ধ ভাগমাত্র এই ভঙ্গীতে ডাহিনে-বাঁয়ে দুলাইতে হইবে। পাঁচ মিনিট ধরিয়া এ ব্যায়াম করা চাই।

৫। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া ৫নং ছবির ভঙ্গীতে কোমর হইতে মাথা একবার সামনের দিকে ধনুকের মত নোয়াইয়া দিবেন—দুই হাত ঠিক ঐ ছবির মত সংলগ্ন থাকিবে—তার পর আবার এই অবস্থা
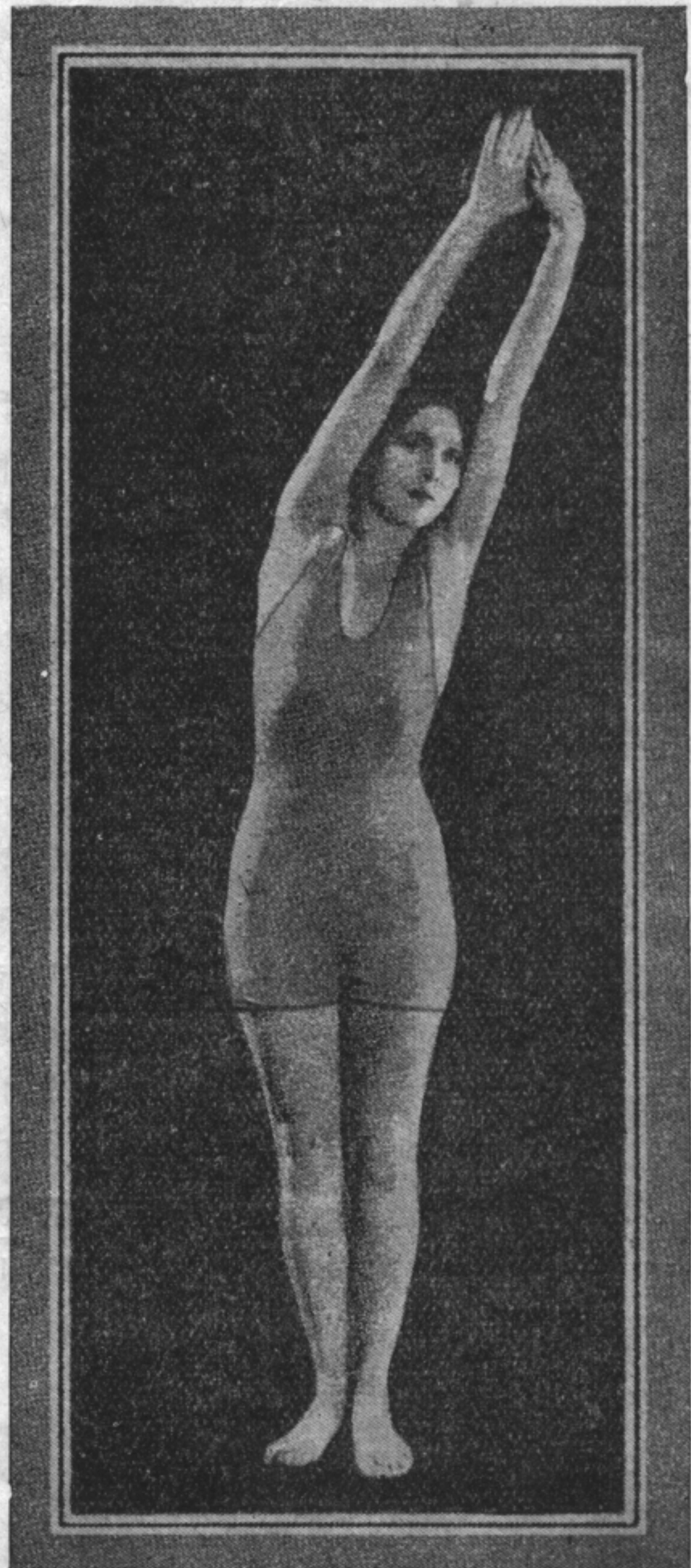
৪। বাঁ দিকে একটু হেলিবেন

হইতে খাড়া দাঁড়াইয়া পিছন-দিকে যথাসম্ভব উপরার্দ্ধ দেহ-ভাগ ৫নং ছবির ভঙ্গীতে হেলাইতে হইবে। বেশ দ্রুত তালে এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট। এ ব্যায়ামে মেরুদণ্ড সরল, সবল ও স্বচ্ছন্দ হইবে।

৫। ধনুকের মত নোয়াইয়া

৬। দুই হাত মেঝেয়

৬। এবার ৬নং ছবির ভঙ্গীতে উপরার্দ্ধ দেহ-ভাগ সামনের দিকে ঝুঁকিবে—এমন ভাবে যে, দুই হাত যেন ঐ ছবির মত মেঝে স্পর্শ করে—দু'হাত আসিবে দুই পায়ের যতখানি কাছাকাছি সম্ভব। এ ব্যায়াম অভ্যাসে কিছু সময় লাগিতে পারে। ৫নং ব্যায়ামে কতকটা অভ্যস্ত হইলে তবেই এ ব্যায়াম-সাধনায় সামর্থ্য জন্মিবে। এ ব্যায়াম কিন্তু করা চাই-ই।

এ কয়টি ব্যায়ামে মেরুদণ্ড হইবে সুস্থ ও মজবুত; দেহ চিরকাল যৌবনবন্ধে রমণীয় ও কমনীয় থাকিবে।

পিতৃস্নেহ

আগে মনে হতো টাকা রাখিব সঞ্চয়
পঞ্চাশ হাজার—যদি লাখ নাহি হয়!
ছেলেমেয়েদের লাগি রেখে যাবো টাকা—
স্বচ্ছন্দে থাকিবে তারা—এ ব্যবস্থা পাকা।
নিজে খাটিয়াছি এত যে-টাকার লাগি
তিলেক বিরাম-শান্তি পাইনিকো মাগি—
আশায় নৈরাশ্য, কত সহেছি বেদনা—
ছেলেমেয়েদের তাহা সহিতে দিব না!

আমার সঞ্চয় লয়ে তাদের জীবন
আরামে-বিলাসে তারা করিবে যাপন!
দেখে-শুনে মনে হয়, হবে বিপরীত!
অপরে রাখিলে ভর হয় নাকো হিত!
চাহিতেই পেয়েছে যে কাম্য সব-কিছু,
শ্রমভারে মাথা যার হয় নাই নীচু,
কোনো কাজে মাথা-হাত খাটে নাই মূলে,
দিন কাটে হাসি-গল্পে, শুয়ে হাই তুলে—

মানুষ সে হয় নাকো—খেলার পুতুল!
ঝড়ে-জলে গলে যায়, নাহি তায় ভুল!
অন্ধ স্নেহ ভুলি সার বুঝিয়াছি তাই—
ছেলেদের দেহ-মন গড়ে দেওয়া চাই!
দেহে-মনে শক্তি চাই—কাজে লজ্জা নয়—
তাহলে জীবনে তার সুনিশ্চিত জয়!
টাকা রাখিবার মত শক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান
না রহিলে সে টাকার কতটুকু জান!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শক্তিপূজা

এই জগৎপ্রপঞ্চের মূলে যে এক অদৃশ্য শক্তি নিহিত আছে, তাহা সর্ববাদিসম্মত। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রগণ শক্তি-পরিচালিত। শুধু শক্তি-পরিচালিত নহে, নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। সূর্য্য-চন্দ্র পর্য্যায়ক্রমে দিবাভাগে ও নিশাকালে কিরণ বিতরণ করেন। গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রভৃতি ষড় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে আমাদিগকে তাপ, বারি, শিশির ও শীত প্রদান করে। পৃথিবীতে যাবতীয় জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-গুল্ম, লতা-পাদপ শক্তি-প্রভাবে জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধি পায় এবং কালক্রমে শক্তি-হীন হইলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে শক্তি কার্য্যকরী,—তাহা জড় শক্তি মাত্র নহে; তাহাতে চিৎশক্তিও ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি অথবা মূলপ্রকৃতি।

এই শক্তি কে? কোথা হইতে, কিরূপে উৎপন্ন এবং তাঁহার সামর্থ্যই বা কি প্রকার?—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের মনে উদিত হয়। জ্ঞানিগণ বলেন এবং পুরাণ শাস্ত্রাদিতেও উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাতে সৃষ্টি-শক্তি, বিষ্ণুতে পালন-শক্তি, শিবে সংহার-শক্তি, সূর্য্যে প্রকাশ-শক্তি, বহ্নিতে দাহিকা-শক্তি, এবং সমীরণে সঞ্চালনী-শক্তি,—এ সকলই সেই একমাত্র আদ্যাশক্তির বিবিধ বিকাশ মাত্র। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি শিব, কি ইন্দ্র, কি অনল, কি সূর্য্য, কি বরুণ—সেই আদ্যাশক্তির সহযোগ ব্যতীত কেহই স্বয়ং স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ নহেন। এই আদ্যাশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা। বিষ্ণুতে সাত্ত্বিকী শক্তি আছে বলিয়াই তিনি পালন-কার্য্যে সক্ষম। ব্রহ্মাতে রাজসী শক্তি বিদ্যমান, তাই তিনি সৃজন-পটু। মহেশ্বরে তামসী শক্তি প্রচুর, তাই তিনি সংহারকর্ত্তা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনিই হউন, শক্তিহীন হইলে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। সেই আদ্যাশক্তিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও পালন করিতেছেন এবং তিনিই আবার প্রয়োজন-হেতু সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে সংহার করিতেছেন। বস্তুতঃ, শক্তিহীন হইলে সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কি আহার, কি গমন, কি যুদ্ধ-বিগ্রহ কেহই কোন কর্ম্মে সমর্থ হয় না। এমন কি, শিবও শক্তিহীন হইলে শবত্ব প্রাপ্ত হন। দুর্ব্বল মনুষ্যকে লোকে শক্তি-হীন বলে। শক্তিমান্ পুরুষ জগতে পূজনীয়—শক্তিহীন নিন্দনীয়। এই পৃথিবী শক্তিযুক্ত হইয়া নিখিল বস্তু-জাতকে ধারণ করিয়া আছে। শক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূল। শক্তিই বরেণ্যা, শক্তিই পূজনীয়া। আমরা সকলেই শক্তির উপাসক।

যিনি শক্তি—তিনিই পরমাত্মা; যিনি পরমাত্মা—তিনিই শক্তি। সর্ব্বভূতে যে চৈতন্য ও সর্ব্বত্রগ নিত্য তেজ তাহাই পরমাত্মা। সেই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্রগ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে এক—একে দুই। এই আদ্যাশক্তিই যোগমায়ারূপে অনন্ত শয্যায় বিষ্ণুকে নিদ্রাভিভূত রাখিয়াছিলেন। মায়াশক্তিরূপে তিনিই জীব-জগৎকে মোহিত রাখিয়াছেন। জ্ঞানিগণ এই সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। এই শক্তি দ্বিবিধা—সগুণা ও নির্গুণা। বিষয়-বিরাগী ব্যক্তিগণ নির্গুণা এবং বিষয়-অনুরাগী ব্যক্তিগণ সগুণার সেবা করেন। সেই চৈতন্যরূপিণী শক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গেরই অধীশ্বরী। তিনি যথাবিধি পূজিতা হইলেই সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টই প্রদান করেন। এই মায়া-শক্তিবিশিষ্ট ভগবতী নামে কথিত ব্রহ্মের দুই প্রকার রূপ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে অন্তর্ম্মুখ, মায়াশক্তিযুক্ত নিরাকার জ্ঞানরূপ যে রূপ, তাহাই সূক্ষ্ম। জ্ঞানিগণ ঐ রূপকেই সকলের নিদান বলেন। উত্তমাধিকারী জ্ঞানিগণই ঐ রূপের উপাসনায় সক্ষম। আর মধ্যমাদি উপাসকগণের উপাসনার উপযুক্ত বহির্ম্মুখ, মায়াশক্তিযুক্ত যে স্থূল রূপ, তাহাই মধ্যমাধম উপাসকগণ ধ্যানাদিতে অনুভব করিতে পারেন। এই দ্বিবিধ সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপই পরমাত্মার শরীর বলিয়া কথিত হয়।

> কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
> পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥
> পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
> কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু॥
> উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
> পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥—গীতা।

পুরুষ ও প্রকৃতি কি এবং পুরুষ কেমন করিয়া ও কেনই বা প্রকৃতিস্থ হন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ সকলই বা কেন ও কিরূপে ভোগ করেন এবং ঐ গুণত্রয়ের সঙ্গহেতু তাঁহার জন্মই বা কেন ও কিরূপে হয়, এই সকল বিষয় সদ্‌গুরুর উপদেশ দ্বারা সাধন-মার্গে উন্নতি লাভ করিলে সাধক ক্রমশঃ নিজেই বুঝিতে পারেন। তবে ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা প্রকৃতিস্থ ও গুণান্বিত হইয়া, মন উপাধি ধারণ পূর্ব্বক, সুখদুঃখ ভোগ করে এবং জীবভাবে সদসদ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

এই দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতী মহাবিদ্যা মহামায়ারূপিণী অব্যথা পূর্ণা প্রকৃতি অল্পবুদ্ধিদের দুর্জ্ঞেয়া। যোগিগণ ইঁহাকে যোগবলে দর্শন করিয়া থাকেন। ইনি নিত্য (ব্রহ্ম) ও অনিত্য (মায়া) রূপিণী পরমাত্মার ইচ্ছাস্বরূপা। ইনি জগতের আদিভূতা ঈশ্বরী।

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥
> এতদ্‌যোনী ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
> অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ গীতা।

যে পরমা আদ্যাশক্তি বেদমার্গে বিদ্যানামে অভিহিতা, যিনি সর্ব্বজ্ঞা, সকলের অন্তর্য্যামিনী এবং সংসার-বন্ধনচ্ছেদনে নিপুণা, দুরাত্মারা যাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু মুনিগণের ধ্যানমার্গে অধিষ্ঠিত হইয়া যিনি প্রত্যক্ষগোচর হন, তিনিই স্বীয় রজঃ সত্ত্ব এবং তমোগুণ দ্বারা যথাক্রমে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিয়া প্রলয়কালে একাকিনী বিরাজ করেন। তাঁহারই সত্ত্বগুণাবস্থায় সাত্ত্বিকী শক্তি মহালক্ষ্মী, রাজসী শক্তি মহাসরস্বতী এবং তামসী শক্তি মহাকালী। তাঁহারই ত্রিগুণ শক্তির পরিণতি ফলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি। মহাসরস্বতী ব্রহ্মার সহিত, মহালক্ষ্মী বিষ্ণুর সহিত এবং মহাকালী মহেশ্বরের সহিত লীলা-সহচরীরূপে সংযুক্ত। সেই সর্ব্বোত্তমা সর্ব্বপূজ্যা, আদ্যাশক্তি অখিল জগৎকে রজোগুণময়ী মহাসরস্বতীরূপে সৃজন ও পালন, সত্ত্বগুণময়ী মহালক্ষ্মীরূপে তমোগুণময়ী মহাকালীরূপে

সংহারকালে সংহার করেন বলিয়া মনীষিগণ তাঁহাকে ত্রিগুণময়ী আখ্যা দিয়াছেন। যিনি এই গুণত্রয়ের অতীতা সর্ব্বকামফলপ্রদা চতুর্থী পরমাশক্তি, তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ। যোগী ব্যতীত এই নির্গুণ শক্তিকে কেহই অবগত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তাঁহার সগুণ মূর্ত্তিই সহজসাধ্য ও সুখসেব্য। বুধগণ সর্ব্বদা সেই সগুণ মূর্ত্তিকেই চিন্তা করেন। মানবগণ এই মহামায়া আদ্যাশক্তির অংশসম্ভূতা এই সর্ব্বকার্য্যসাধিনী শক্তিত্রয় এবং অন্যান্য সর্ব্বকামপ্রদা শক্তি সকলকে প্রতিমা-মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

অর্থাৎ—

যে যে ভক্ত দেবতারূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই মূর্ত্তি-বিষয়ক দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি।

সেই আদ্যাশক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর সমস্ত পদার্থেই বিরাজ করিতেছেন; তিনিই বিবিধ শক্তিরূপে প্রকটিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি নিত্যা, সুতরাং এক রূপেই অবস্থিতা; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির জন্য কার্য্যগৌরব বশতঃ নানা রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যেমন রঙ্গালয়ে একই নট লোকরঞ্জনহেতু নানা রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ সেই আদ্যাশক্তি গুণাতীতা ও অরূপা হইলেও স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদি গুণময় বিবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কার্য্য-কর্ম্মানুসারে ধাতুর অর্থ ও গুণযুক্ত মুখ্যগৌণ ভেদে সেই লীলাময়ী বহুল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মুখ্যতঃ, এই মহামায়ার রূপ দ্বিবিধ,—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা প্রভাবে জীব মুক্তিলাভ করে। অবিদ্যার প্রকোপে জীব বদ্ধ হয়। কিন্তু এই ভাগবতী মায়াতে নির্দ্দয় ভাব বা বৈষম্য কিছুই নাই। দেব, দৈত্য, মানব সকলেই এই মায়ার অধীন। তিনি জীবের মুক্তির জন্যই সর্ব্বদা প্রযত্নশীল, কারণ, আত্মার গতি সর্ব্বথা ঊর্দ্ধ দিকে। এই জগদীশ্বরী যদি চরাচর জগতের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে এই জগৎ জড়বৎ হইয়া মায়ায় বিলীন হইয়া যাইত। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া নিখিল জগৎ ও জীবাদি সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মানুসারে সকলকে পরিচালিত করিতেছেন। জন্মজন্মান্তরে যাহার যেমন কর্ম্ম, পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়া তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবে পরিচালিত করিতেছেন। প্রথমে গুরুমুখে, তাহার পর বেদান্ত-শ্রবণাদি দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া সেই আত্মরূপিণী ভগবতীর পূজার্চ্চনা ও ধ্যান-ধারণা করিলে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে; নতুবা কোটি কোটি কর্ম্ম করিলেও মুক্তি লাভ দুর্ঘট। নির্ম্মলাশয় ঋষিগণ সেই আত্মরূপিণী ভগবতীকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ এবং গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরীর উপাসনা করিয়া থাকেন।

পূজা অথবা উপাসনা অধিকারি-ভেদে ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাধকগণের পক্ষে সাত্ত্বিক, বিষয়ীর পক্ষে রাজসিক এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকের নিমিত্ত তামসিক পূজা বিহিত। প্রশস্ত। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, যজমান ও মন্ত্র শুদ্ধ না হইলে, পূজা বা যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললাভ হয় না। সকলেই জানেন, পাণ্ডবগণ বহুল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজসূয় ভূরি-দক্ষিণাসহ সমাপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য বনবাস-ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের যজ্ঞে নিশ্চয়ই কোন বৈগুণ্য ঘটিয়াছিল; নতুবা তাঁহাদের ভাগ্যে এরূপ বিপরীত ফল ফলিবে কেন? যখন তাদৃশ শক্তিশালী ও গুণশালী মহাত্মগণের কর্ম্মে দ্রব্য, ক্রিয়া ও মন্ত্রের শুদ্ধিহানি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সাধারণ বিশেষতঃ কলির ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্মে যে বৈগুণ্য ঘটিবে, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। মানব সচরাচর দ্রোহাদির দ্বারা অর্জ্জিত দ্রব্যাদির দ্বারা এবং ঈর্ষা, দ্বেষ ও হিংসা-কলুষিত মন দ্বারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাই সুফল লাভে বঞ্চিত হয়। মন নির্ম্মল না হইলে পূজার্চ্চনা ফলদায়ক হয় না। এমন কি, ঋত্বিক্ ও আচার্য্যের মনও বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যজমানের শুভাশুভ তাঁহাদের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। যাহার মন যত নির্ম্মল, সে তত অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। শত্রু বিনাশ অথবা আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থোন্নতির নিমিত্ত কোন কার্য্য করিলে প্রায়ই তাহা বিপরীত ফল প্রদান করে।

শাস্ত্রে আছে, সাত্ত্বিক যজ্ঞ অতি দুর্ল্লভ, বৈখানস মুনিগণেরই উহা বিহিত, অন্যের পক্ষে নহে। যে সকল তাপস প্রতিদিন মুনিগণের হিতকর সুসংস্কৃত ফলমূলাদি সাত্ত্বিক বস্তু সকল ন্যায়মার্গানুসারে সংগ্রহপূর্ব্বক ভোজন করেন, তাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পুরোডাশাদি দ্রব্য দ্বারা পশুহিংসাবিহীন যে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তাহাই পরম সাত্ত্বিক যজ্ঞ। বিষয়ী ব্যক্তি অভিমানপূর্ণ হৃদয়ে বহুল উপকরণাদি সমন্বিত পশুহিংসাযুক্ত যে সুসংস্কৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা রাজস; আর দুর্বৃত্তগণ ক্রোধ, অমর্ষ, ক্রূরতা, স্পৃহাদিপূর্ণ হৃদয়ে যে গর্ব্বোদ্দীপক যজ্ঞ করিয়া থাকে, তাহাই তামস যজ্ঞ। সংসারবিরাগী মোক্ষাভিলাষী মহাত্মা সাধকগণ মনে মনে সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক যে যজ্ঞ করেন, তাহার নাম মানস যজ্ঞ। এই মানস পূজা যেমন সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হয়, অন্য কোন প্রকার যজ্ঞই সেরূপ হয় না। কারণ, অন্যান্য সমুদয় যজ্ঞই যথাবিহিত দ্রব্যাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা সাধিত হইলেও, দেশ-কাল ও দ্রব্যাদি সমস্ত উপকরণেই পার্থক্যবশতঃ ন্যূন হইয়া থাকে।

এই মানস যজ্ঞের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমে চিত্তকে গুণবিহীন করিয়া পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে দেহও শুদ্ধ হয়। দেহ ও মন পবিত্র হইলে মানব এই মানস অম্বা-যজ্ঞের অধিকারী হয়। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এইরূপ যে, দেহ ও মন শুদ্ধ হইলে যজ্ঞীয় পাদপস্বরূপ—চিত্তস্থৈর্য্যাদি সম্ভূত, সুবৃহৎ ও মসৃণ স্তম্ভসমূহ দ্বারা সুশোভিত, বহু যোজন বিস্তৃত মানস মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে মানসিক বিশদ বেদী কল্পনা পূর্ব্বক, মনে মনেই সেই বেদীমধ্যে যথাবিধি পঞ্চাগ্নি স্থাপন এবং ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, হোতা, প্রস্তোতা, উদ্গাতা, প্রতিহর্ত্তা ও সদস্যরূপে ব্রাহ্মণগণকে বরণান্তে, ঐরূপ মনে মনেই সেই দ্বিজবরগণকে যত্নাতিশয় সহকারে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও

যথাবিধি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে প্রাণ-বায়ুকে গার্হপত্যাগ্নি, অপান-বায়ুকে আহবনীয়াগ্নি, ব্যান-বায়ুকে দক্ষিণাগ্নি, সমান-বায়ুকে আবসথ্যাগ্নি ও উদান-বায়ুকে সভ্যাগ্নিরূপে ভাবনা করিতে হইবে এবং ঐ অগ্নিপঞ্চককে সাতিশয় প্রজ্বলিত বোধ করিবে। এইরূপে মনে মনে নির্গুণ পরম পবিত্র উপকরণ দ্রব্যাদিও ভাবনা করিতে হইবে।

মনই এই মানস যজ্ঞের হোতা ও মনই যজমান এবং নির্গুণ সনাতন ব্রহ্মই উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আধার ও ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী এবং যিনি সর্ব্বগুণান্বিতা, সেই কল্যাণরূপিণী আদ্যাশক্তিই সেই যজ্ঞের ফলদাত্রী। অনন্তর দ্বিজ(সাধক)গণ মনঃকল্পিত দ্রব্যনিচয় সেই যজ্ঞফলদাত্রী ভগবতীর উদ্দেশে প্রাণাগ্নিতে হোম করিবেন। পরে চিত্তকে নিরাশ্রয় করিয়া সুষুম্না-রন্ধ্র দিয়া প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুরূপ পঞ্চ অগ্নিকেও শাশ্বত ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে সমাধি উৎপন্ন হইলে, সেই সমাধি যোগবলে নির্ব্বিকল্পক চিত্তে স্বীয় অনুভূতি দ্বারা আত্মস্বরূপিণী সাক্ষাৎ মহেশ্বরীকে নিরাকুল চিত্তে ধ্যান করিতে হইবে। অনন্তর যখন আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং অখিল ভূতগণকেই আপনাতে অবস্থিত দেখিবে, তখনই সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মঙ্গলময়ী দেবীর সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইবে।

মানস পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। কিন্তু মানস পূজা সকলের সাধ্য নহে। সাধারণ মানব সংসার-ধর্ম্মে লিপ্ত, বাসনা কামনায় লুব্ধ। সাত্ত্বিক পূজাও তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে; রাজসিক পূজাই তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত। এই নিমিত্তই প্রতিমা মূর্ত্তিতে প্রতীক পূজা সাধন-পথের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন,—

উপাসকানাং কার্য্যায়, পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্।

সাত্ত্বিক পূজা উৎকৃষ্ট, রাজসিক অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট; তামসিক পূজা নিকৃষ্ট হইলেও নিরর্থক নহে। সকলেই সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা করে এবং স্ব স্ব জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সামর্থ্যানুযায়ী ফললাভ করে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—অবিধিপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে পূজা করিলেও সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করা হয় এবং

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ।।—গীতা।

পার্থক্য এই যে, দেবার্চ্চনাকারী দেবলোক, পিতৃগণের অর্চ্চনাকারী পিতৃলোক এবং ভূতপূজাকারিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হয়। যে যেরূপে যে রূপ কামনা করিয়া পূজা করে, তাহার সেইরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে। সেই আদিভূত সনাতনী বাঞ্ছাকল্পতরু। ভক্তের বাঞ্ছা পূরণই তাঁহার স্বভাব; তবে প্রযতাত্মা অর্থাৎ সংযতাত্মা হইয়া প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতে হইবে এবং আকাঙ্ক্ষা ও স্ব স্ব শক্তি ও ভক্তির অনুকূল হইবে। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্যহীন। আমরা এক নিশ্বাসে যাচ্ঞা করি,—

আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে ।।

আমরা প্রার্থনা করি,—

রাজ্যং দেহি শ্রিয়ং দেহি বলং দেহি সুরেশ্বরি।
কীর্ত্তিং দেহি ধনং দেহি যশঃ কান্তিঞ্চ দেহি মে ।।
কামং দেহি মতিং দেহি ভোগান্ দেহি মহেশ্বরি।
জ্ঞানং দেহি চ ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যমীপ্সিতম্ ।।
প্রভাবঞ্চ প্রতাপঞ্চ সর্ব্বাধিকারমেব চ।
জয়ং পরাক্রমং যুদ্ধে পরমৈশ্বর্য্যমেব চ ।।

এই যে "দেহি দেহি,"—এত দিলে তাঁহার কি থাকে? এবং এত পাইবার যোগ্যতাই বা কয় জনের আছে? ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ অনেক পাইয়াছিল, রাখিতে পারে নাই; হিরণ্যকশিপু প্রচুর পাইয়াছিল, রাখিতে পারে নাই; কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্য্যোধন প্রভৃতি অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল, রাখিতে পারে নাই। তাহার একমাত্র কারণ,—ঐশ্বর্য্য-লাভে ঘটে মদান্ধতা; ঐশ্বর্য্যকে সংযত ভাবে ভোগ করিবার এবং ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতার অভাব; ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্ব্বলের পীড়ন, নিরীহের নির্য্যাতন এবং নিরঙ্কুশ অনাচার ও অত্যাচার! পক্ষান্তরে, দেবী পূজা করিয়া সুরথ রাজা রাজ্যশ্রী লাভ করিয়াছিলেন, বৈশ্য সমাধি-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিল এবং শ্রীরামচন্দ্র বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং চাই—আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ—প্রার্থনার সমতুল যোগ্যতা ও সাধনা।

আমাদের বাসনা কামনা ও আমাদের সাধনা ও সুকৃতি এবং সামর্থ্য ও সঙ্গতির অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। শক্তি-সাধনা কখনও বিফল হয় না। সাধনায় সিদ্ধি সুনিশ্চিত। কিন্তু সাধনা ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিয়ম, শুচিতা ও সংযম-সাপেক্ষ। শরণাগতি সাধনার মুখ্য উপায়।

শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তব লাগি কাঁদে মম স্বপনের সাধ

ফুল হয়ে কেন প্রিয়, ফুটিলে না বনে?
মালা গেঁথে পরিতাম বুকে সযতনে!
চাঁদ হতে তুমি যদি আমি হয়ে ভরা নদী
সারা নিশি রাখিতাম নয়নে নয়নে।

তুমি নহো ফুল—নহো আকাশের চাঁদ—
তব লাগি কাঁদে মম স্বপনের সাধ,
ভালোবাসে যে যাহারে—কভু সে পায় না তারে
চাতকী কাঁদিয়া মরে নিশীথ-শয়নে।

বন্দে আলী মিঞা

ছোটদের আসর

রত্ন-ভাণ্ডার

অনেক দিন আগেকার কথা। এক দেশে ছিলেন রাজা। রাজার নাম নারায়ণচন্দ্র। তিনি যেমন সাহসী, তেমনই উদারচেতা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মহারাণী লক্ষ্মীদেবী ছিলেন রূপে-গুণে লক্ষ্মী। রাজদ্বার থেকে অতিথি কখনও না খেয়ে ফিরে যেত না। রাজ্যে কার কি অভাব, রাজা-রাণী তার তত্ত্বাবধান করতেন। এত বেশী দান-ধ্যানের জন্য অনেক সময় তাঁদের থাকতে হতো সামান্য গৃহস্থের মত—সে জন্য কারও মনে এতটুকু দুঃখ ছিল না।

প্রাসাদের সংস্কার হয়নি অনেক দিন। দেয়ালের চুণ-বালি খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে, দু'-চার যায়গায় ফাট ধরেছে, ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। লক্ষ্মীদেবী মহারাজকে বললেন—"প্রাসাদটা ভেঙ্গে পড়ছে। সবটা ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী করলে ভালো হয়। কি বলো?" নারায়ণচন্দ্র উত্তর দিলেন—"আমিও তো চাই তাই! কিন্তু একটা বাধা আছে। সেই জন্যই এত দিন সারাবো মনে করেও সারাতে আমার সাহস হয়নি।" লক্ষ্মীদেবী আশ্চর্য্য হয়ে জিগ্যেস করলেন—"কি এমন বাধা? কই, আমি তো কখনও শুনিনি!" মহারাজ বললেন—"কথাটা যত দূর সম্ভব আমরা গোপন রাখবার চেষ্টা করি। কেউ জানে না। বংশ-পরম্পরায় এক জনকে শুধু এ কথা জানানো হয়। বাবার কাছ থেকে আমি জেনেছি, বাবাকে বলেছিলেন আমার ঠাকুর্দা, তাঁকে জানিয়েছিলেন তাঁর বাবা। প্রাসাদের নীচে ক'টি গুপ্ত কুঠরী আছে। সেখানে এক দল ব্রহ্মদৈত্য বাস করে। তারা ভারী ভালো! আমাদের কখনও কোন অপকার করেনি বরং উপকারই করেছে! বহু দিন থেকে তারা এইখানে রয়েছে। বাড়ী ভেঙ্গে ফেলে আবার নতুন করে তৈরী করলে হয়তো তাদের অসুবিধা হতে পারে। অতিথিকে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। তাতে তারা রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে হয়তো। আমাদের সৌভাগ্যও হয়তো তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারে।"

সব শুনে মহারাণী লক্ষ্মীদেবী বললেন—"কথাটা ঠিক বলেছ। থাক্, তবে দরকার নেই! তার চেয়ে সে টাকায় গরীব-দুঃখীদের খাওয়ালে কাজ হবে।"

রাত্রে মহারাজ-মহারাণী ঘুমুচ্ছেন, এমন সময় অনেকগুলি পদ-শব্দে তাঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁরা উঠে বসলেন। একটু পরেই অর্গল-বন্ধ দরজা আপনি খুলে গেল। ক'জন ক্ষুদে লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। তাদের মধ্যে এক জন ছিল বৃদ্ধ। বৃদ্ধ এগিয়ে এসে সকলের মুখপাত্র হয়ে বলল—"তোমাদের কথা আমাদের কাণে গেছে। আমরা আদেশ দিচ্ছি, তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রাসাদ সংস্কার কর। আর আমাদের ঘরগুলি একটু ভাল করে সারিয়ে দিও, বড্ড স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। এর জন্য তোমাদের কোন অর্থ লাগবে না। তোমাদের অর্থে গরীব-দুঃখীদের খাইয়ো। বাড়ী তৈরী করবার অর্থ যা লাগে, সব আমরা দেব। সকালে উঠে দেখবে, মহারাণীর গহনার সিন্দুকে অর্থপূর্ণ একটি থলে রয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখে থাক।" এই কথা বলে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

মহারাজ-মহারাণী দু'জনেই অবাক্ হয়ে বসে রইলেন। নিজেদের চোখকে তাঁরা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। এ কি স্বপ্ন! বাকী রাতটুকু তাঁরা জেগেই কাটালেন। ভোর হতেই মহারাণী গহনার সিন্দুক খুললেন। এ কি! সত্যিই যে প্রকাণ্ড থলে রয়েছে! মোহরে ভরা! তবে তো স্বপ্ন নয়। এ সত্য! ব্রহ্মদৈত্যদের উদ্দেশে দু'জনে প্রণাম জানালেন। এ কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করলেন না।

সে দিন থেকেই প্রাসাদ ভাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে জীর্ণ পুরানো প্রাসাদের স্থানে নূতন সুদৃশ্য প্রাসাদ গড়ে উঠল। গৃহ-প্রবেশের দিন মহারাজ-মহারাণী রাজ্য-শুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করলেন। সমস্ত দিন ধরে যজ্ঞি—খাওয়া-দাওয়া চললো। সব চুকে গেলে মহারাণী বললেন—"যে এ-প্রাসাদে বাস করবে, প্রতি বছর এই দিনে রাজ্যশুদ্ধ লোকদের সে খাওয়াবে।"

তার পর থেকে প্রতি বৎসর গৃহ-প্রবেশের তারিখে রাজপ্রাসাদে রাজ্যশুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ হতো এবং সকলে হৈ-চৈ করে খেয়ে দেয়ে রাজপরিবারকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে বাড়ী ফিরত! কিছু-দিনের মধ্যে এই খাওয়ানোটা পূজা-পার্ব্বণের মত পবিত্র নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল।

বছর দশেক পরে মহারাণী লক্ষ্মীদেবী মারা গেলেন। মরবার সময় একটা কাগজে তিনি লিখে দিয়ে গেছেন—"প্রতি বৎসর গৃহ-প্রবেশের তারিখে যে এই প্রাসাদে বাস করবে, রাজ্যশুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করে তাকে খাওয়াতে হবে।" মহারাজকে বললেন—কাগজটিকে রাজ্যের দরকারী কাগজের সিন্দুকে রাখতে আর যাতে কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি দিতে। মহারাণীর মৃত্যুতে দেশশুদ্ধ লোক যেন নিজের মাকে হারিয়েছে এমনি ভাবে হাহাকার করতে লাগল।

সময়ে সব ব্যথাই সয়ে যায়, মানুষ সব কষ্ট ভুলে যায়; কিন্তু সুনাম চিরকাল থাকে! মৃতা মহারাণীকে কেউ ভুলতে পারল না। লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর মহারাজ বছর ছয়েক বেঁচেছিলেন। তার পর ওপার থেকে তাঁরও ডাক এল। তিনি চলে গেলেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র ভবানীপ্রসাদ রাজা হলেন। তিনি মহারাজের সকল সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। মায়ের কথামত তিনি প্রতি বৎসর সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন, তা ছাড়া প্রত্যেকের প্রত্যেক অভাব-অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

মহারাজ নারায়ণচন্দ্র মারা যেতে পাশের রাজ্যের রাজা ভীমসেন ঠিক করলেন, ভবানীপ্রসাদকে আক্রমণ করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নেবেন। কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রী বেঁচে থাকতে তা সম্ভব হয়ে উঠল না; কারণ, তিনি খুব চৌখস ব্যক্তি ছিলেন। মন্ত্রী মারা যেতেই রাজ্যের সেনাপতি অকৃতজ্ঞ রুদ্রপীড় বিপক্ষের দলে যোগদান করল। দেখতে দেখতে শত্রুসৈন্য দেশ ঘিরে ফেললে। ভবানীপ্রসাদ বীর, কিন্তু প্রজা-বৎসল ছিলেন। শত্রুদলে সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং যুদ্ধ জয়ের কোন আশা নেই, অনর্থক লোকক্ষয় হবে দেখে স্ত্রী-পুত্র সহ গোপনে তিনি দেশত্যাগ করলেন। বিপক্ষদলকে একটি চিঠি

লিখে পাঠালেন যে, তিনি বিনা-যুদ্ধে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, প্রজাদের ওপর যেন কোনরূপ অত্যাচার না করা হয়। প্রাসাদে একটি বৃদ্ধ ভৃত্য রইল। আক্রমণকারীরা বিনা ক্ষতিতে বিনা রক্তপাতে দেশ জয় হ'ল দেখে খুশীই হ'ল। রুদ্রপীড়কে তাঁরা রাজা করে দিলেন এবং প্রতি বৎসর আয়ের অর্দ্ধাংশ করস্বরূপ দেবার আদেশ দিয়ে ভীমসেন নিজরাজ্যে চলে গেলেন।

রাজা হয়ে রুদ্রপীড় ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগল। লোকদের পীড়ন করে রাজস্ব বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কারণ, অর্দ্ধাংশ কর দিলে তার আয় কমে যাবে। ক্রমে গৃহ-প্রবেশের তারিখ এল। বৃদ্ধ ভৃত্য প্রজাদের খাওয়াবার কথা বলাতে রুদ্রপীড় অট্টহাস্যসহ বললে,—"ও সব কথা ভুলে যাও। আগেকার রাজাদের মত পাঁচভূত খাইয়ে আমি অর্থ নষ্ট করতে ভালবাসি না। আমি রাজা, প্রজারা আমার ব্যয়ের জন্য অর্থ দেবে। ভবিষ্যতে এ রকম বেয়াদবির কথা আমার সামনে আর উচ্চারণ কোরো না।"

প্রজাদের নিমন্ত্রণ হলো না। রুদ্রপীড় বেশ খেয়ে-দেয়ে শুতে গেল। রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম গেল ভেঙ্গে! কার যেন পায়ের শব্দ! ধীরে ধীরে শোবার ঘরের বন্ধ-দরজা খুলে গেল। একটি মহিলা-মূর্ত্তি ঘরে ঢুকল! সে মূর্ত্তির এক হাতে একটি কাগজ আর এক হাতে জলন্ত প্রদীপ! রুদ্রপীড় ভয়ে কাঠ হয়ে গেল—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। খাটের কাছে এসে মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে পড়লো। কাগজের লেখাগুলি লক্ষ্মীদেবীর বাণী। ধীরে ধীরে সেগুলি প্রকাণ্ড হয়ে উঠল আর সেই লেখা থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগল। রুদ্রপীড় ভয়ে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। যখন জ্ঞান হল্লো তখন সব নিস্তব্ধ। সকাল হয়ে গেছে।

রাত্রের কথা কাউকে সে বললে না। সে দিন সন্ধ্যা থেকে প্রাসাদের পাহারা দ্বিগুণ করে দিলে। রাত্রে নিজের বাছাই বাছাই কয়েক জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে রুদ্রপীড় খেতে বসল—চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়। খাবার দেওয়া হয়েছে, সকলের পাতে সুগন্ধ পোলাও কালিয়া, কিন্তু রুদ্রপীড়ের পাতে মোটা চালের ভাত আর তেঁতুলের অম্বল। তিনি তো মহা খাপ্পা! এ কি ব্যাপার! কার এত বড় স্পর্দ্ধা! স্বয়ং রাজার সঙ্গে চালাকী। তখনই পাচকের ডাক পড়ল! বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে পাচক এসে হাজির। রুদ্রপীড় প্রশ্ন করলে,—"আমার পাতে এ সব কি দিয়েছ?" পাচক উত্তর দিলে—"আজ্ঞে মহারাজ, সকলের পাতে যা দিয়েছি আপনার পাতেও তাই দিয়েছিলুম।" রুদ্রপীড় রেগে বললে,—"এখানে এসে সব বদলে গেল—কেমন? মিথ্যা কথার জায়গা পাও নি!" বৃদ্ধ ভৃত্য কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। গম্ভীর ভাবে সে বললে—"পাচকের কথা সত্য মহারাজ! আমার সামনে ও খাবার পরিবেষণ করেছে।" এক জন বন্ধু বললে—"বেশ তো, খাবার বদলে দিয়ে দেখা যাক না।" তখনই পাচক আবার সব সাজিয়ে নিয়ে এল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, রুদ্রপীড়ের সামনে রাখতেই সুগন্ধ পোলাও কালিয়া শুকনো ভাত আর তেঁতুলের অম্বলে পরিণত হ'ল। সকলে অবাক্! এ কি করে সম্ভব! আর এক জন বন্ধু বললে—"পাত বদলাবদলি করলে কেমন হয়?" তাই করা হ'ল; কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের কথা, রুদ্রপীড় যে পাত্রে বসেছিল সেই পাত্রে আবার সুগন্ধ পোলাও কালিয়া, আর যে পাত্রে গিয়ে বসল তাতে শুকনো ভাত আর তেঁতুলের অম্বল। রাগে এবং ভয়ে রুদ্রপীড় আসন ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। বললে—"আমার খিদে নেই। একটু সরবত খাব।" তাকে লাল সরবত দেওয়া হলো। কিন্তু মুখে দিতেই সরবত জলে পরিণত হলো। সকলে হাঁ হয়ে রইলো। নিশ্চয় এ ভৌতিক ব্যাপার! কোন মতে খাওয়া সেরে সকলে উঠে পড়ল।

পরদিন ভোর হতেই রুদ্রপীড় রটিয়ে দিলে, বিশেষ কাজে মহারাজ ভীমসেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কথাটা অবশ্য সর্ব্বৈব মিথ্যা। সকলেই বুঝল ব্যাপারটা কি—যদিও মুখে কেউ কিছু বললে না। রুদ্রপীড় তল্পিতল্পা গুটিয়ে সেই দিনই সরে পড়ল।

মহারাজ ভীমসেনকে গিয়ে রুদ্রপীড় বললে—"মহারাজ, আমার শরীরটা বড় খারাপ। আমায় ছুটি দিন।" তার ওপর মহারাজ অসন্তুষ্টই ছিলেন। প্রজাদের প্রতি তার অত্যাচারের কাহিনী তিনি শুনেছিলেন! তা ছাড়া, বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করতে তাঁর মন উঠছিল না। কিন্তু উপকারীর অপকার তো করতে পারেন না! এই সুযোগে তিনি রুদ্রপীড়কে রাজ্যচ্যুত করলেন এবং কিছু মাসহরা দিয়ে তার অন্যত্র থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। উভয় পক্ষই বেঁচে গেল। বলা বাহুল্য, আসল ব্যাপারটা রুদ্রপীড় মহারাজকে জানায়নি, পাছে তাকে কাপুরুষ মনে করেন!

ভীমসেন নিজের ছোট ভাই লক্ষ্মণসেনকে সেই দেশের রাজা করে দিলেন। লক্ষ্মণসেন সেই দিনই একমাত্র কন্যা মঞ্জুলিকাকে নিয়ে চলে গেলেন। সঙ্গে গেলেন তাঁর এক বিশেষ বন্ধু মোহনলাল।

লক্ষ্মণসেন লোক ভাল। অতি সরল এবং সহৃদয়, কিন্তু ভয়ানক কান-পাতলা। তাঁর বন্ধু মোহনলাল নিজেকে খুব বীর এবং যোদ্ধা বলে মনে করেন এবং তাই বলেই পরিচয় দেন, কিন্তু আসলে তিনি ভারী ভীতু। বিরাট দেহ, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, সর্ব্বদা রণসজ্জায় সজ্জিত—দেখলেই ভয় হয়। লক্ষ্মণসেন তাঁকে করে দিলেন সেনাপতি।

দু'জনেই দেশের প্রথার কথা শুনলেন। লক্ষ্মণসেনের ইচ্ছা ছিল, গৃহ-প্রবেশের তারিখে সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন। মঞ্জুলিকাও তাঁকে ধরে বসেছিল। কিন্তু মোহনলাল বললে—"ছিঃ ছিঃ, এও কি একটা কথার কথা! যত সব আজগুবি ব্যাপার!" ছোটলোকদের খাইয়ে অর্থ নষ্ট করা ভস্মে ঘী ঢালার সমান। মহারাজ কান-পাতলা লোক। অপরের মতেই তাঁর মত। তিনি বললেন—"তা কথাটা ঠিকই বলেছ। পয়সা নষ্ট তো বটেই। সে টাকায় অনেক কাজ করা যাবে। কিন্তু এই যে সকলে বলছে, রাজপুরীর সৌভাগ্য এর ওপর নির্ভর করে—তার কি করা যায়?" মোহনলাল খাপের মধ্য থেকে তরোয়াল বার করে আবার সেটা খাপে ঢুকিয়ে রেখে বললে—"যত সব বাজে কথা! মানুষে এ কথা বিশ্বাস করে? কে বলেছে, শুনি? ঐ বুড়ো চাকরটা তো? ও ব্যাটা এই খাওয়ানোর ব্যাপার থেকে কিছু পয়সা মারে, তাই এত টান!" মহারাজ মাথা চুলকে বললেন—"কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মহারাণী লক্ষ্মীদেবীর কথা?" "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন।" মোহনলাল গর্জ্জে উঠল। "ও সব ভৌতিক ব্যাপার গল্পেই শোভা পায়। একবার বন্ধ করে দেখাই যাক না, কি হয়!" মহারাজ বললেন—"বেশ, যখন বলছ, তাই না হয় করছি। কিন্তু যদি কিছু হয়—" বুক ফুলিয়ে গোঁফে হাত বুলিয়ে মোহনলাল বললে—"কিছু ভাববেন না। আমি আছি।"

প্রজাদের নিমন্ত্রণের তারিখের সাত দিন পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের

শয়ন-কক্ষে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মধ্যরাত্রে কি এক শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। একখানি জ্বলন্ত হাত ঘরের মধ্যে এসে হাজির হলো। তার পর দেওয়ালের উপর আগুনের অক্ষরে লিখে দিলে—"সাবধান! মহারাণী লক্ষ্মীদেবীর আদেশ-পালনে যেন অন্যথা না হয়।" ঘর থেকে হাত বেরিয়ে গেল! দরজা আপনা-থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে লেখাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। লক্ষ্মণসেন ভীত বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন!

সকাল হতেই মহারাজ তাঁর বন্ধু মোহনলালকে ডেকে নিভৃতে রাত্রের কথা জানালেন। মোহনলাল নাক সিঁটকে বললে—"ও-সব অতিভোজনের ফল! নিশ্চয় আপনি স্বপ্ন দেখেছেন! আজ অল্প খেয়ে দেখবেন, কিছুই হবে না।" মহারাজ সে রাত্রে অল্প খেলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। পরদিন একেবারে উপবাস করলেন, তাতেও সেই অগ্নিময় হাত আসা বন্ধ হলো না। মহারাজ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন।

নির্দ্দিষ্ট তারিখের তিন দিন আগেকার কথা। সন্ধ্যার সময় মহারাজের সঙ্গে মোহনলালের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। মহারাজ বললেন—"প্রথামত প্রজাদের নিমন্ত্রণ করাই ভাল। ব্যাপারটা বড় সুবিধার ঠেকছে না। আমার রীতিমত ভয় হচ্ছে।" মোহন-লাল ঠাট্টা করে বললে—"ভয়! কি বলছেন আপনি? ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় হতে পারে, কিন্তু আপনি পুরুষ মানুষ—আপনার ভয়!" মহারাজ বিরক্ত হয়ে বললেন—"মুখে বলা খুব সহজ! আমার মত অবস্থায় পড়লে বুঝতে পারতে!" মোহনলাল হেসে বললে—"ও-সব ভৌতিক ব্যাপার আমি বিশ্বাস করি না। হয় চোখের ভুল, না হয় কোন দুষ্ট লোকের কারসাজি!" মহারাজ উত্তর দিলেন—"তুমি দেখনি তাই লম্বা-চওড়া কথা বলছ। একবার দেখলে বুঝতে পারতে, সে কি ভীষণ ব্যাপার।" মোহনলাল কোষ-বদ্ধ তরোয়াল নেড়ে বললে—"আমার সঙ্গে চালাকি করতে এলে এমন শিক্ষা দেব যে, ভবিষ্যতে আর জ্বালাতন করতে সাহস করবে না।" মহারাজ বললেন—"বেশ, এক কাজ কর।" মোহনলাল জিগ্যেস করলে—"কি কাজ বলুন?" মহারাজ বললেন—"তুমি এক রাত্রি আমার শোবার ঘরে থাকো। আর যদি পারো এই ভৌতিক ব্যাপারের হেস্তনেস্ত করে দাও।" মোহনলাল বললে—"বেশ। এক দিন করলেই হলো।"

এমন সময় প্রতিহারী এসে খবর দিলে, এক জন যুবক মহারাজের দর্শন-প্রার্থী। দেখে মনে হয় যেন রাজপুত্র। লক্ষ্মণসেন লোক ভাল ছিলেন, তা ছাড়া তাঁর মনে একটু ভয়ও ছিল। ভাবলেন, দরকার হলে যুবক হয়তো সাহায্য করতে পারবে! প্রতিহারীকে বললেন—"অবিলম্বে তাকে এখানে নিয়ে এসো।" প্রতিহারী চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরে যুবককে নিয়ে হাজির হলো।

অভিবাদন করে যুবক বললে—"মহারাজ, আমি বহু দূর থেকে আসছি। ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আজকের জন্য আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।" লক্ষ্মণসেন বললেন—"বেশ তো। কিন্তু তোমার পরিচয়?" যুবক উত্তর দিলে—"আমি এক জন সামান্য লোক—এমন কোন পরিচয় নেই যাতে আপনি আমায় চিনতে পারবেন।" মোহনলাল বললে—"কিন্তু এক জন অজ্ঞাত লোককে—" মহারাজ প্রতিধ্বনি করলেন—"বটেই তো! শাস্ত্রে বলেছে, অজ্ঞাত কুলশীলকে বিশ্বাস করবে না!" যুবক উত্তর দিলে—"আপনি উচিত কথাই বলেছেন। আমি যাচ্ছি।" যুবক গমনোদ্যত, ঠিক সেই সময়ে রাজকন্যা মঞ্জুলিকা ঘরে ঢুকলেন। এক জন অজানা লোককে দেখে তিনি একটু থমকে দাঁড়ালেন। যুবক মহারাজকে অভিবাদন করে বললে—"আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আমাকে যখন এক রাত্রির জন্য আশ্রয় দিতে আপনি অনিচ্ছুক, তখন অবিলম্বে আমার এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধান করবো।" মঞ্জুলিকা বলে উঠলেন—"বাবা, অতিথিকে কখনও তাড়াতে নেই। তাতে পাপ হয়। অতিথি নারায়ণ।" মহারাজ বললেন—"বটেই তো! যুবক, তুমি আজকের মত আমার আতিথ্য গ্রহণ কর।" নিকটেই দাঁড়িয়েছিল এক জন ভৃত্য। মহারাজ তাকে হুকুম দিলেন—"যাও, আমাদের খাবার দিতে বল! ইনিও আমাদের সঙ্গে খাবেন।" ভৃত্য চলে গেল।

খেতে খেতে আবার সেই কথা আরম্ভ হ'ল। সব শুনে যুবক বললে—"আর এক দিন কেন, আজ করলেই তো ভাল হয়!" মহারাজ খুশী হয়ে বললেন—"ঠিক বলেছ, আজই করা উচিত। শুভস্য শীঘ্রং।" মোহনলাল কটমট করে যুবকের দিকে চাইতে লাগল। যুবক সে দিকে দৃক্‌পাত না করেই বললে—"তবে খেয়ে উঠেই চেষ্টা করে দেখলে হয়।" মহারাজ বললেন—"নিশ্চয়ই। মোহনলাল তুমি খেয়ে নাও। আজ আমার শয়ন-কক্ষে রাত্রিযাপন করবে। দেখি, তুমি যা বলেছ তা করতে পার কি না?" মোহনলাল যুবকের ওপর অত্যন্ত চটে গিছল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে বললে—"আমার কথা-মত কাজ করতে আমি প্রস্তুত।" মহারাজ বললেন—"তুমি যদি কৃতকার্য্য হও, তবে যা পুরস্কার চাইবে, তাই দেব।" দুষ্টামীভরা হাসি হেসে মোহনলাল বললে—"ঠিক তো?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"আমার কথার নড়চড় নেই।" তখন মোহনলাল অতি গম্ভীর হয়ে বললে—"যদি পুরস্কারস্বরূপ আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী হই?" মহারাজ বললেন—"তাতেও আমার আপত্তি হবে না!" মঞ্জুলিকা কাছে বসে খাওয়ার তত্ত্বাবধান কর-ছিলেন। বলে উঠলেন—"বাবা"—বাধা দিয়া মহারাজ বললেন—"না মা, যা বলেছি তার নড়চড় হবে না। মোহনলাল, তুমি কৃতকার্য্য হলে তোমার হাতে আমি কন্যা দান করবো।" যুবক প্রশ্ন করলে—"উনি না পারলে যদি আর কেউ পারে তার জন্যও আপনার এই ব্যবস্থা?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়ই।" মোহনলাল রেগে ছিলেন। অত্যন্ত রূঢ় ভাবে বললেন—"এ কথার অর্থ! তুমি কি বলতে চাও যুবক, আমি পারবো না?" যুবক বিনীত ভাবে উত্তর দিলে—"আমি তো সে কথা বলিনি।" মোহনলাল চীৎকার করে উঠল—"বলিনি মানে? নিশ্চয় বলেছ! আমি না পারলে এমন আর কে আছে যে এ কাজে এগোবে, শুনি?"

যুবক দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলে—"আমি!"

একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটতে পারে দেখে মহারাজ বললেন—"সে পরের কথা। আগে মোহনলালের পালা! সে যদি পারে, তা হলে তোমার কথা উঠতেই পারে না!"

মোহনলাল সগর্ব্বে উত্তর দিলে—"সে তো বটেই। তবে আমার মনে হয়, মিথ্যা সময় নষ্ট করা হবে। আমি ঘরে থাকলে

ভূত কি প্রেত কেউ আসতে সাহস করবে না, তাদের বাবারাও পারবে না।"

যুবক হেসে বললে—"বলা যায় না, সাহস করতেও তো পারে।"

মহারাজ বললেন—"হাতে পাঁজী মঙ্গলবার। আজ রাত্রেই যা হবার হয়ে যাবে। আশা করি, মোহনলাল পারবে।"

ততক্ষণে আহার-পর্ব্ব শেষ হয়ে গেছে। যুবক ও মোহনলালকে নিয়ে মহারাজ নিজের শয়ন-কক্ষে গেলেন। মোহনলালকে বললেন —"তুমি এই ঘরে আজ রাত্রে থাকবে। দেখা যাক, কত দূর কি করতে পার!" যুবক ও মহারাজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। লক্ষ্মণসেন বাহির থেকে ঘরে তালা দিয়ে দিলেন এবং নিজ-নামাঙ্কিত শীল লাগিয়ে দিলেন।

ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে মোহনলালের মনে রীতিমত ভয় হতে লাগল। দরজা টেনে দেখলে, বন্ধ। জানালায় গরাদ দেওয়া। পালাবার কোন পথ নেই। চারিধারের দেয়ালে টোকা দিয়ে দেখলে, কোথাও ফাঁপা নেই অথবা গুপ্ত দরজা নেই। অগত্যা এক হাতে তরোয়াল নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বিছানার ওপর সে বসে রইল। আলোটা উজ্জ্বল করে দিলে, কিন্তু তবু এক অজানা ভয়ে বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল।

একটু ঢুলুনি—হঠাৎ খুট্ করে শব্দ—মোহনলালের ঘুম গেল ছুটে! চেয়ে সে দেখলে, দেয়ালের মধ্যে থেকে ক্ষুদে ক্ষুদে অনেক লোক পিল্‌পিল্ করে বেরিয়ে মেঝেয় হাজির হ'ল। তার পর দলবদ্ধ হয়ে লাইন বেঁধে সকলে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মোহনলাল পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে এক-দৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইল। হাত-পা ভয়ে এমন আড়ষ্ট যে নড়বার ক্ষমতাও ছিল না। লাইন থেমে গেল। এক জন বৃদ্ধ একটু এগিয়ে এসে বলল—"সেনাপতি মোহনলাল, তোমার মুখে বীরত্বের গল্প অনেক শুনতে পাই। বীরেরা মিথ্যা কথা বলেন না, অতএব ধরে নিতে হবে যে তুমি বীর। আমি তোমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করছি। আশা করি, ভয়ে পেছপাও হবে না। শুনেছি, তুমি আমাদের তাড়াবে বলে মহারাজকে কথা দিয়েছো। তোমার শক্তির পরিচয় দাও এখন!"

একটা দেড়-আঙুলে লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ! মোহনলালের লুপ্ত সাহস ফিরে এলো। হো হো করে হেসে সে বললে—"বেশ বেশ! হাতাহাতি লড়তে চাও? না, অস্ত্র নিয়ে?" রাজোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"বীরেরা মল্লযুদ্ধের চেয়ে অস্ত্র-যুদ্ধই বেশী পছন্দ করেন। তুমি তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করো।" মোহনলাল নিজের তরোয়াল একবার বার করে আবার কোষবদ্ধ করে বললে—"উত্তম কথা! কিন্তু তুমি কি অস্ত্র ব্যবহার করবে?" এক জন সঙ্গীর কাছ থেকে একটা প্রকাণ্ড লম্বা চাবুক নিয়ে বৃদ্ধ বললেন—"এই চাবুক!" মোহনলাল আশ্চর্য্য হয়ে বললে—"চাবুক! অন্য কোন অস্ত্র নয়?" বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"না। আগে চাবুকের শক্তি ছাখো, তার পর অন্য অস্ত্রের কথা!"

কোষ থেকে তলোয়ার বার করে মোহনলাল উঠে দাঁড়াল, সামনে চাবুক হাতে দেড়-আঙুলে বুড়ো। তার ক্ষুদে সঙ্গীরা সব সরে গিয়ে যুদ্ধের জন্য জায়গা প্রস্তুত করে দিলে। রণবাদ্য বেজে উঠল। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। মোহনলাল বৃদ্ধকে যতই আঘাতের চেষ্টা করে, কিছুতেই আর পারে না। আর বৃদ্ধ দূর থেকে চাবুকের আঘাতে আঘাতে মোহনলালকে জর্জ্জরিত করে ফেললেন। শেষে মোহনলাল প্রায় অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাত জোড় করে কাঁদ-কাঁদ স্বরে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বৃদ্ধ বললেন—"এই তোমার বীরত্ব! এরই এত গর্ব্ব করতে! তুমি নারীরও অধম। মিথ্যা গর্ব্ব করবার জন্য আমি সাজা দিচ্ছি, তুমি নারী হও! কাল প্রাতে যদি মহারাজকে আজ রাত্রের সমস্ত ঘটনা অকপটে বল, তবেই আবার পুরুষ হবে; কিন্তু যদি একটা কথা গোপন করবার বা মিথ্যা সাজিয়ে বলবার চেষ্টা করো তাহলে নারী থাকবে। আচ্ছা নমস্কার। ভবিষ্যতে আর বীরত্বের বড়াই করো না।" ক্ষুদে মানুষগুলি একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। তার পর সকলে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই!

পরদিন সকালে মহারাজ নিজে এসে শীল ভেঙ্গে দরজা খুললেন। সঙ্গে যুবক, রাজকন্যা মঞ্জুলিকা ও কয়েক জন পার্শ্বানুচর। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখেন মোহনলাল নেই! তার বদলে বসে আছে একটি স্ত্রীলোক! কি বিকট আর কিম্ভূতকিমাকার সে দেখতে! মহারাজ বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন—"তুমি কে? মোহনলাল কোথায়?" নারী মূর্ত্তি হেঁড়ে গলায় উত্তর দিলে—"আজ্ঞে আমিই মোহনলাল"। সকলে অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন। মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু তোমার এ অবস্থা কেন?" মোহনলাল আবোল-তাবোল অনেক কথা বলতে লাগল। সত্য কথা কিছুতেই বলে না। তখন অদৃশ্য কোন ব্যক্তি বলে উঠল—"মিথ্যা কথা বলে কোন লাভ নেই। সম্পূর্ণ সত্য কথা না বললে মেয়ে হয়ে থাকবে, পুরুষ হতে পারবে না আর।" সকলে স্তম্ভিত! কে কথা কইলে? মোহনলাল কিন্তু গলার স্বর চিনতে পারল। রাত্রের সেই দেড়-আঙুলে প্রতিদ্বন্দ্বী। অগত্যা তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে হলো! বলা মাত্রই নিজদেহ ফিরে পেল। তখন সে ভাবলো, এইবার, একটু টীকা-টিপ্পনী দিয়ে ব্যাপারটাকে যুতসই করে দেওয়া যাক! এই ভেবে যেমন দু'-একটা মিথ্যা কথা বলেছে, অমনি আবার নারী-মূর্ত্তিতে পরিণত হলো! মহারাজ হেসে বললেন—"ভূতই হোক আর প্রেতই হোক, তারা রসিক লোক বটে! তোমায় আচ্ছা জব্দ করেছে। যাক, মিথ্যা কথা বন্ধ কর। নইলে এই কদাকার নারী-মূর্ত্তিতেই তোমাকে থেকে যেতে হবে।" মোহনলাল নিজের মিথ্যা কথা স্বীকার করে নিতেই আবার নিজ মূর্ত্তি ফিরে পেল। পাবামাত্র এক ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল কেউ জানতে পারলে না। লজ্জায় অপমানে হয়তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! যাই হোক, মোহনলালকে কেউ কোন দিন সে রাজ্যে আর দেখতে পায়নি।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন তখন যুবককে বললেন—"যুবক, আজ রাত্রে তোমার পালা। এক জন নমুনা দেখালে, তাতে মনটা একেবারে দমে গেছে। তুমি এবার কি করতে পার দেখা যাক।" যুবক উত্তর দিলে—"চেষ্টা করে দেখব, ফল ভগবানের হাতে। কিন্তু আপনি যে কথা দিয়েছেন তা ঠিক থাকবে তো?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়। তবে একটা কথা তোমায় ভেবে দেখতে বলি। আমার কন্যার অনিচ্ছায় অথবা, বংশের অমর্য্যাদা করে কোন কাজ করা কি উচিত হবে?" যুবক উত্তর দিল—"নিশ্চয় নয়।"

সে রাত্রে যুবককে মহারাজের শয়নকক্ষে বন্ধ করে দেওয়া হলো। নির্ভীক মনে ঘরে ব'সে সে অপেক্ষা করিতে লাগল। বহুক্ষণ কেটে গেল, কিছুই ঘটল না। হঠাৎ তার পিছনে পদশব্দ হলো! কে যেন তার কাঁধে হাত রাখল! যুবক ফিরে দেখল, ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি! মূর্ত্তি বললেন—"দেবকুমার, আমি তোমার আচার-ব্যবহারে আর শিক্ষায় খুশী হয়েছি। রাজপুত্রের যে সকল সদ্‌গুণ থাকা দরকার, তোমার সবই আছে। মনে রেখ, বিনয় এবং উদার-হৃদয় মনুষ্যত্বের সব চেয়ে বড় পরিচয়। গরীবের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে শেখা ও দূর করবার চেষ্টা করার চেয়ে বড় কর্ত্তব্য মানুষের আর কিছু নেই।" এই বলে তিনি একটা দেয়ালে টোকা মারলেন। দেখতে দেখতে দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল, আর সেই গহ্বরের মধ্যে দেখা গেল অসংখ্য ধনরত্ন। আগের রাত্রের দেড়-আঙুলে বৃদ্ধ বেরিয়ে বললেন,—"বহু দিন থেকে আমি এই রাজপুরীতে বাস করছি, তোমাকে এই সব ধনরত্ন দেবো বলে এত দিন আগুলে ছিলুম। এই অর্থ দিয়ে তুমি গরীব প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। তুমি ছাড়া আর কেউ এ দেয়ালকে ফাঁক করতে পারবে না!"

দেয়াল তখনই আবার বেমালুম জোড়া লেগে গেল।

পরদিন সকালে মহারাজ লক্ষ্মণসেন এসে দরজা খুললেন। দেখলেন, যুবক বসে রয়েছে। তার ওপর কোনরূপ অত্যাচার হয়নি বরং তাকে উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে। মহারাজ বললেন—"যুবক, তোমার নাম দেবকুমার?" যুবক আশ্চর্য্য হয়ে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"কাল রাত্রে লক্ষ্মী-দেবী আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। তুমি তাঁর নাতি। তোমার বাবা ছিলেন ভবানীপ্রসাদ।" দেবকুমার বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যা স্বপ্ন দেখেছেন, তা সত্য। প্রমাণ-স্বরূপ দেখুন, এই দেয়ালের পিছনে কত ধন-রত্ন আছে! কেবল লক্ষ্মীদেবীর বংশধরেরাই তা নিতে পারে।" স্পর্শ করতেই দেয়াল ধীরে ধীরে দু'ফাঁক হয়ে গেল। মহারাজ লক্ষ্মণসেন বিস্মিত হয়ে দেখলেন, অসংখ্য হীরা মুক্তা চুনী পান্না—স্তূপাকার পড়ে আছে। আবার দেয়াল বেমালুম জোড়া লেগে গেল।

লক্ষ্মণসেন বললেন—"তুমিই এ রাজ্যের প্রকৃত মালিক। এ রাজ্য আমি তোমায় ফেরত দিচ্ছি; আর সেই সঙ্গে দক্ষিণা দিচ্ছি আমার একমাত্র কন্যা মঞ্জুলিকাকে!"

তার পর মহা সমারোহে দেবকুমারের সঙ্গে মঞ্জুলিকার বিবাহ হলো। সাত দিন ধরে রাজ্য জুড়ে সে কি ধূম-ধাম! প্রত্যেক প্রজাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হলো; আর সকলকে এক-জোড়া করে নতুন কাপড় দেওয়া হলো। এমন ধূমধাম না কি কেউ কোথাও চক্ষে কখনো দেখেনি!

শ্রীযামিনীমোহন কর।

বিনা-মাটীতে গাছপালা

আমাদের ছোটবেলায় এক ম্যাজিকওয়ালা ম্যাজিক দেখিয়েছিল—ক'টা গাছের বীজ টবের মাটীতে পুঁতে সে-টবকে পাঁচ মিনিট পর্দ্দায় ঢেকে তার পর সেই পর্দ্দা সরিয়ে দেখিয়েছিল, সেই টবে ফুলের গাছ গজিয়েছে; তার পর সে গাছে ফুল ফুটিয়ে সে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল! ম্যাজিকওয়ালার সে-গাছ তবু ডালপালা নিয়ে মাটীকে আশ্রয় করে গজিয়ে উঠেছিল,—কিন্তু আমেরিকার বৈজ্ঞানিকের দল মাটীর সংস্পর্শ ব্যতিরেকে কাচের টেষ্ট-টিউবে গাছকে লালনে বাড়িয়ে তুলেছেন। তাঁদের হাতে এ সব গাছ শুধু বাড়ছে না, এ সব গাছে অজস্র ফুল-ফল গজাচ্ছে!

১। টিউবের মধ্যে গাছের খাদ্য

কি করে তাঁরা এমন অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন, বলি। মাটীর বুকে থাকে গাছের শিকড়—সেই শিকড় বয়ে মাটী থেকে গাছ তার খাদ্য বা প্রাণ-রসের যোগান পায়—তাতে হয় গাছের পুষ্টি, এবং ফলন। মাটী থেকে গাছ যে খাদ্য বা প্রাণ-রস পায়, বৈজ্ঞানিকেরা সেই খাদ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তাতে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফশফরাশ, পোটাসিয়াম, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম্, ক্যালসিয়াম এবং লোহা। এগুলির মধ্যে এ অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন—তারা পায় বাতাস থেকে—জল এবং কার্বন-ডায়অক্সাইড বাষ্পরূপে। বাকী ঐ নাইট্রোজেন ফশ-ফরাশ, পোটাসিয়াম প্রভৃতি—বৈজ্ঞানিকেরা সেগুলির যোগান দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন,—এবং সে সঙ্কল্প তাঁরা বিদ্যাবুদ্ধিবলে সিদ্ধ করতে পেরেছেন। তার ফলে মাটীতে না পুঁতেও গাছকে তাঁরা সজীব সতেজ রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

বাঁচার জন্য এবং পুষ্টির জন্য ঐ সব গাছের প্রয়োজন খাদ্য। বৈজ্ঞানিকেরা সে-খাদ্য প্রস্তুত করেছেন; এবং এতটুকু মাটীর সংস্পর্শ না রেখে তাঁরা কি করছেন, জানো? রাসায়নিক উপায়ে গাছের ঐ সব প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরী করে সে-খাদ্য বোতলের মধ্যে কিম্বা কোনো পাত্রে রেখে তার মধ্যে রাখছেন খুব কচি চারা গাছ। এ-সব

কচি চারা গাছ রাখবার একটু কায়দা আছে। তারের জাল তৈরী করা হয়—মাটীর বুক থেকে কচি চারা তুলে নিয়ে জালে করে সাবধানে শিকড়গুলি ধুয়ে নিতে হবে—শিকড়ে যেন এতটুকু কাদা-মাটী না লেগে থাকে। তার পর শিকড়ের প্রত্যেকটি রেখা অতি সন্তর্পণে ঐ তারের জালের ফাঁকে-ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতে হবে—ঢোকানো হলে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে পাত্রের মধ্যে রাখা চাই। রেখে তারের উপরে এক ইঞ্চি পুরু শ্যাওলা এবং সে শ্যাওলার উপর খড় বিছিয়ে ঢাকা দিতে হবে—বাইরে থেকে যেন শিকড়ে আলো না লাগে। যে পাত্রে শিকড় এমনি ভাবে রাখা হবে, সে পাত্রের মধ্যে রাসায়নিক আরক দিয়ে তাতে শিকড়গুলি রাখা চাই। এ আরক তৈরী করার জন্য চাই,—এক গ্রাম করে' পোটাসিয়াম্ নাইট্রেট্, পোটাসিয়াম্ ফশফেট, ম্যাগনেসিয়াম্ সালফেট ; ৪ গ্রেণ ক্যালসিয়াম্ নাইট্রেট্ ;

২। বিনা-মাটীর গাছে ফুল

৩। তারের ফাঁকে ফাঁকে শিকড়

আলো-বাতাস যায়, এমন ঘরে ছায়ায় পাত্র বা শিকড়-ভেজানো বোতল রাখা চাই। শীতের মর্শুমী ফুল-গাছ যেমন ঠাণ্ডায়, তেমনি গ্রীষ্মের মর্শুমী ফুল-গাছ রাখা চাই একটু রৌদ্রতাপ মেলে, এমন জায়গায়। বেশী রৌদ্রে কদাচ রাখবে না।

৪। মাটী নেই—তবু গাছে এত ফুল!

৫। বোতলের মধ্যে গাছ

এবং এক-ছিটা মাত্র ফেরশ্ সালফেট। এগুলি যে কোন ডাক্তার-খানায় কিনতে পাবে—দাম সামান্যই!

করকচ-লবণের টুকরোর আকারে এগুলি কিনতে হবে। কিনে এনে এগুলি গুঁড়িয়ে কলের জলে গুলে নিতে হবে—গুলে গেলে পাত্রে ঢেলে সে-পাত্রে গাছের শিকড় ডুবিয়ে রাখবে। যে ঘরে

পচা পুকুরের জলে গাছের পুষ্টি হবে না। কলের জলে অল্প-পরিমাণে মাঙ্গানীজ, জিঙ্ক, তামা, বোরোন, এলুমিনিয়াম, লিথিয়াম,

নিকেল, কোবাল্ট, আয়োডিন এবং সোডিয়াম আছে বলে এই জলই ভালো। বৃষ্টির জল পেলেও ভালো হয়। পোটাসিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি যে মেশাবে, তার ওজন নিক্তির ওজনে যেন এক চুল বেশী না হয়—সে সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা চাই!

সাত-আট দিন অন্তর এই রাসায়নিক দ্রাবক বদল করবে এবং যখনি বদল করবে, পোটাসিয়াম প্রভৃতির মাত্রাও খুব সামান্য ভাবে অমনি বাড়িয়ে বাড়িয়ে যেতে হবে। তিন মাস পর্য্যন্ত এই আরক বদলানো এবং তার মাত্রা বাড়ানো চাই।

এ প্রণালীতে বৈজ্ঞানিকেরা গাছগুলিকে সতেজ করেছেন, তাদের সজীব রেখেছেন, এবং এ গাছের ফুল বর্ণে-গন্ধে ঢের বেশী উজ্জ্বল, প্রখর এবং আকারেও বড় হয়েছে। বেগোনিয়া ক্যানা দোপাটি প্রভৃতি যে সব গাছ গেঁড় (tuberous)-জাতের, সেগুলির শোভা-সমৃদ্ধিও হয়েছে একেবারে অতুলনীয়। তার উপর এ ভাবে লালিত গাছের পরমায়ুও খুব দীর্ঘ হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ঠিক এই রীতিতেই আলু এবং টোমাটোর ফলনেও তাঁরা আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করেছেন।

সামনে পূজার ছুটী। ছুটীর দিনে তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো, বিনা-মাটীতে তোমাদের হাতে কি কি গাছের লালন হয়—আর সে সব গাছে ফুল-ফলের ফশলই বা ফলে কেমন!

ভারতে দুর্ভিক্ষ-প্রতিকার ব্যবস্থা

প্রাচীন কালে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইত কি? প্রশ্ন শুনিয়া অনেকেই হাসিবেন। কেন না, দুর্ভিক্ষ সকল কালে সকল দেশেই হইয়া থাকে। অতি অল্প দেশেই সকল বৎসর সমান ভাবে পর্জ্জন্যদেব বারিবর্ষণ করেন না। সেই বারি-বর্ষণের তারতম্যেই অজন্মা ও শস্যহানি ঘটে। অধিক বর্ষণেও শস্য-নাশ হয়,—অল্প বর্ষণেও শস্য অল্প জন্মায়। উভয় অবস্থাই দুর্ভিক্ষের কারণ। সুতরাং প্রাচীন ভারতে যে দুর্ভিক্ষ হইত না, এমন দুঃসাহসের কথা সহসা বলা যায় না। তবে এ-কথাও স্বীকার্য্য যে, এখন যেমন ভারতে প্রায় দুর্ভিক্ষ হয়,—সে কালে তাহা হইত না। যে দেশ নদীতট হইতে দূরে অবস্থিত, সে দেশেও প্রাচীন কালে ক্বচিৎ কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তবে দুর্ভিক্ষ তখন বড় বিরল ছিল। প্রায় ঘটিত না। তখন অজন্মা এমন হইত না যে, দলে দলে লোক অনাহারে মরিত। যখন দেশে এরূপ অবস্থা হইত যে, ভিখারীকে সাধারণ গৃহস্থ ভিক্ষা দিতে পারিত না, তখনই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া লোকে মনে করিত। অজন্মা অধিক হইলেই লোক মরিত, কিন্তু সেরূপ ঘটনা ঘটিত ক্বচিৎ। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারত-বাসীর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহাদের নিকট প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থে-নিসের কথা বেদবাক্য অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য। মেগাস্থেনিসের কথার উপর নির্ভর করিয়া ডিওডোরাস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "অতএব এ-কথা দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে, ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই এবং সে দেশে কখনই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটে নাই।" পাদটীকায় আমি ডিওডোরাসের কথার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (১)। প্রায় সওয়া দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মেগাস্থেনিস মৌর্য্য রাজগণের রাজধানীতে বহু বৎসর ছিলেন এবং আপনাকে ভারতের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত সাক্ষ্যবাক্যে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতুই নাই। তিনি যখন ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন,—তখন তাঁহার সময়ে মনুষ্যের স্মৃতির গোচর কোন জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। তিনি কেবল পাটলিপুত্রেই ছিলেন না, ভার-তের তদানীন্তন পরিজ্ঞাত সকল স্থানেই তিনি পরিভ্রমণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। অগত্যা আমরা এখন অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বেও তিন চারি শত বৎসরের মধ্যেও কোন উল্লেখযোগ্য জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ ভারত-ভূমিতে আবির্ভূত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতের কথা উঠিলেই আমরা আজকাল কথায় কথায় বেদের বাক্য উদ্ধৃত করি,—এবং বৈদিক সমাজে কি ছিল না ছিল, তাহা লইয়া গবেষণা করিতে বসি। দুর্ভাগ্যক্রমে বেদের ভাষা কেহই বুঝে না। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় ঋষিরা তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকে সংস্কৃত ভাষায় অর্থাৎ মার্জ্জিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া উহা গুরুগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উহার অধিকাংশ শব্দই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়া বুঝিতে হয়।

এখানে আমি সেই অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনা করিব না। তবে এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনেক অসম্বদ্ধ এবং অসঙ্গত কথা বলেন বলিয়া বাধ্য হইয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিতে হইল। ঐ সকল পণ্ডিত বলেন যে, "ঋগ্বেদের সময় আর্য্য সমাজ গোষ্ঠীপতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। তাহারা সামান্য একটু সেচের ব্যবস্থাও করিত। তাহাদের সমাজে মানুষ অধিক ছিল না। দেশের চারি দিক্ নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। তখনও অজন্মা হইত,—তবে তখনকার লোক অজন্মা হইলে তদানীন্তন স্বচ্ছন্দ-বনজাত পুষ্পফল এবং মৃগাদি মারিয়া খাইত,—সুতরাং তখন অজন্মা হইলেও এখনকার দুর্ভিক্ষের মত লোক মরিত না বা দেশ উজাড় হইত না।" ঋগ্বেদের সময়ের যে চিত্র পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা অঙ্কিত করিয়াছেন,—তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহারা বার-বার তাঁহাদের মতের যে ভাবে পরিবর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ভূগর্ভ হইতে হারাপ্পা এবং মোহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা

---

(১) It is accordingly affirmed that famine has never visited India and that there has never been a general scarcity of the supply of nourishing food—Diodorus (II 36.)

বলিতেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-নামধেয় কয়েক দল লোক ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, এবং এখানকার আদিম অধিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া এই দেশে বাস করিয়াছিল। এ দেশের আদি বাসিন্দারা গারো, কুকী ও সাঁওতালদিগের ন্যায় অসভ্য ছিল। কাজেই তাহারা সহজেই আর্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছিল। পরে তাঁহারা বলেন, 'থুড়ি', ওটা ভুলই হইয়াছে! এ দেশে দ্রাবিড়ীদিগের একটা সভ্যতা ছিল। সে সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতা অপেক্ষা কম নহে। তবে আর্য্যদল এই দ্রাবিড়ীদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইল কেন? রোমের ন্যায় দ্রাবিড়ীরা ম্যালেরিয়া-নির্জ্জিতও হয় নাই,—বিলাসে ও আত্মকলহে আসক্ত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহা হউক, এই গোঁজামিলের পর মহেঞ্জোদোড়ো আবিষ্কারের পরবর্ত্তী প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তথাকথিত আর্য্য অভিযানের বহু পূর্ব্বেই ভারতের অন্ততঃ পশ্চিম প্রান্তে একটি অতি সভ্য জাতি বাস করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকার শীলমোহর প্রভৃতিতে যে অক্ষর উৎকীর্ণ আছে, তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই—হইবেও না। উহা যে আর্য্য সভ্যতার নিদর্শন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। য়ুরোপীয় পণ্ডিত এবং তাঁহাদের এদেশী পোঁ-ধরারা তথাপি সেই সাবেক বুলি ধরিয়া বসিয়া আছেন যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন। অতএব ঐ সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা হইতে পারে না! এখানে আর্য্যদল যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দেড় হাজার বৎসরে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এ-কথা যেন স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মনীষীরা (যথা বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি) আর্য্যগণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহা জ্যোতিষিক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় চার-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতে সভ্যতার আদিম স্তরে অবস্থিত লোকদিগের বাসস্থান ছিল না। তখন ছিল বহু স্থলে জনাকীর্ণ জনপদ। সুতরাং দুর্ভিক্ষ সংঘটনের সম্ভাবনা ছিল না,—ইহা মনে করা যায় না। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে কোন দুরন্ত দুর্ভিক্ষের আভাস পাওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের ১৫শ সূক্তে সুবৃষ্টির জন্য জাপ্য মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তখনকার লোক কৃষির দ্বারা সুফল লাভের জন্যই পর্জ্জন্যদেবের নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা করিতেন,—কিন্তু বৃষ্টির দ্বারা যে জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ দূর হয়, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই। উহার প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, "প্রাচ্যাদি দিক্-সমূহে সঞ্চিত বাষ্প-সমূহ বায়ু কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়া জলপূর্ণ মেঘে পরিণত হউক। ঋষভের নিনাদের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনকারী বায়ু-বিতাড়িত মেঘীয় জলরাশি ধরণীকে পরিতৃপ্ত করুক,—ধরণী ওষধিতে পূর্ণা হউক।"

উহার পঞ্চম মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—"সমুদ্র হইতে বৃষ্টির জল ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হউক। তাহাতে আকাশে দীপ্তিমান্ উদক (মেঘ) সঞ্চারিত হইয়া সেই জল ধরাপৃষ্ঠে পতিত হউক। যণ্ডের ন্যায় গভীর গর্জ্জনকারী বায়ু বিতাড়িত মেঘস্থিত জলরাশি পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করুক,—পৃথিবী ওষধিতে পূর্ণা হউক।"

এখানে সর্ব্বত্রই বৃষ্টির দ্বারা কৃষিকার্য্যে সুফল প্রাপ্তির আশা করা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও এমন কথা বলা হয় নাই যে, হে পর্জ্জন্য, আমাদিগকে জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর। ইহাতে অনুমান হয়, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের কথিত বৈদিক যুগে লোকের প্রাণহারী মারাত্মক দুর্ভিক্ষ হইত না। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তাহা বলা কঠিন। তখন দেশ স্বাধীন ছিল। কৃষি ছিল উন্নতিশীল। অধিক বনভূমি উচ্ছিন্ন না হওয়াতে বৃষ্টি প্রায় হইত। ভূমি জঙ্গলে আকীর্ণ থাকাতে বর্ষায় জল অতি মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইত। নদী সকল শীর্ণ হইত না। তখন সেচের সুব্যবস্থা ছিল। মহেঞ্জোদোড়োর ব্যবস্থা তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ। বাণিজ্য দ্বারা এক দেশের খাদ্যশস্য দেশকে রিক্ত করিয়া অন্য দেশে নীত হইত না। সুতরাং দুই-এক বৎসর বর্ষণের বিপর্য্যয় ঘটিলে কখনই লোক দলে দলে অনাহারে মরিত না। সেই জন্য সেই সময়ের সাহিত্যে এইরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষের কোন প্রতিচ্ছবি পতিত হয় নাই।

তাহার পর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতে মহাকাব্যের যুগ—যে যুগে রামায়ণ এবং মহাভারত লিখিত হইয়াছে। এই কালে দেশের জঙ্গল উচ্ছিন্ন করিয়া জনপদ বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। লোকসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। বাণিজ্যও বিস্তার লাভ করিতে দেখা যায়। কাজেই জঙ্গলের উচ্ছেদহেতু বারিবর্ষণের বিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ হয়। রামায়ণে এবং মহাভারতে বহু-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি এবং দ্বাদশ-বার্ষিকী অনাবৃষ্টির কথা দেখা যায়। এই শব্দ দুইটির অর্থ কি? কেহ কেহ বলেন যে, বহু বর্ষ ব্যতীতে যে অনাবৃষ্টি হয়, তাহাকে বহুবার্ষিকী অনাবৃষ্টি এবং দ্বাদশ বৎসর অন্তর যে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তাহাকে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি বলে। এ অর্থ অসঙ্গত নহে। কালচক্রের আবর্ত্তনে নিয়মিত কিছু কাল অন্তর বারিপাতের একটা নির্দ্ধারিত ব্যতিক্রম চিরকালই ঘটিয়া আসিতেছে। এখনও তাহা প্রায় সকল দেশেই ঘটে। উহাকে এক একটা cycle বলে। প্রথমে বোধ হয় এই অর্থে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে, দশ বৎসর উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী দগ্ধ হইলে অত্রিপত্নী অনসূয়া গঙ্গাকে ঐ স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি প্রভাবে ফলমূলের সৃষ্টি করিয়া ঋষিদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন (২)। এক এক অঞ্চলে এরূপ দুর্নিমিত্ত সে কালেও ঘটিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে দশ বৎসর কাল উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টি হইলে তবে লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, প্রকারান্তরে ইহা বলা হইয়াছে। এখনকার মত এক বৎসর বারি-বর্ষণের বিপর্য্যয়-ফলে লোক অনাহারে মরিত না। অবশ্য অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে করকাপাতে শস্য নষ্ট হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ হইত, লোক দেশত্যাগ করিয়া সন্নিহিত অন্য কোন দেশে যাইত। ছান্দোগ্য উপনিষদে এরূপ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে। হিমালয় হইতে কিছু দূরবর্ত্তী দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আর পঙ্গপালের আপতনে দুর্ভিক্ষ কখনও কখনও দেখা দিত। অন্য কারণে দুর্ভিক্ষ হইত না। মহাভারতেও এইরূপ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল আলো-চনা করিলে সেই যুগে যে বড় লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ ঘটিত, ইহার

(২) দশ বর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্
যথা মূলফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্ত্তিতা।
ধর্ম্মেণাগ্র্যেণসংযুক্তো নিয়মশ্চাপ্যলঙ্কৃতঃ। রামায়ণ ২।১১৭ অধ্যায়

প্রমাণাভাব। মহাভারতে অনেক কথা পরবর্ত্তী কালে সংযোগ করা হইয়াছে,—এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। সেই জন্ম মহাভারতে যে সামান্ত অজন্মার এবং দুর্ভিক্ষের কথা আছে, আমি এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। সে সময় অজন্মা এবং শস্তহানিজনিত যে দুর্ভিক্ষ ঘটিত, তাহা সঙ্কীর্ণ স্থান-মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত এবং পরবৎসরই সেই দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটিত। হিন্দুকুশের প্রত্যন্ত ভূমি হইতে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমাস্থিত সকল দেশেই দুর্ভিক্ষ কখনই উৎকট লোকসংহারক মূর্ত্তিতে দেখা দিত না। কারণ, তখন দেশও পরাধীন ছিল না, অন্ত দেশের জিগীষাপরায়ণ লোকদিগের জন্য খাদ্যশস্ত উৎপাদন করিয়া প্রবাদ-কথিত বৈরাগীর স্থায় গালে হাত দিয়া কাঁদিত না! কাজেই তখন আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে অথবা উহার কোন বিস্তীর্ণ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ-জনিত অনাহারে রাজপথে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক মরিয়া পড়িয়া থাকিত না!

তাহার পর জাতক গ্রন্থের কথা। জাতক পালি ভাষায় লিখিত। উহা তদানীন্তন ভারতের চলিত ভাষায় লিখিত। বৈদিক এবং রামায়ণী যুগে লোক-সমাজে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাকৃত ভাষা। কাল সহকারে প্রাকৃত ভাষায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। শেষে সেই প্রাকৃত ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া পালিতে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা উহা রামায়ণী এবং মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী প্রচলিত ভাষা বলিয়া থাকেন। ঐ ভাষায় লিখিত জাতক গ্রন্থাবলিতে ঐ ভাষায় দুর্ভিক্ষের বর্ণনা আছে। সে দুর্ভিক্ষ ক্বচিৎ ঘটিত সত্য,—কিন্তু তাহা সময় সময় বহু লোকের প্রাণসংহারক আকার ধারণ করিত। এই সময়ে ভারতের অনেক বনভূমি উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, লোকসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রায় তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ পালি ভাষা ভারতে চলিত ছিল। ঐ জাতক গ্রন্থে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক ঘটনাও বর্ণিত আছে। উহাতে অনেক দুর্ভিক্ষের কাহিনী উল্লিখিত এবং বর্ণিত আছে। তবে সে দুর্ভিক্ষ স্থানবিশেষে নিবদ্ধ থাকিত। জাতক পাঠে জানা যায় যে, শক্রের (ইন্দ্রের) কোপে এক বার কাশী অঞ্চলে তিন বৎসর বারিপাত হয় নাই, ফলে শস্যও জন্মে নাই,—যাহা জন্মিয়াছিল তাহাও পরিপক্ক হইতে পারে নাই। ঐ সময়ে লোক যে অধিক মরিয়াছিল তাহা মনে হয় না। আরও একবার কাশী অঞ্চলে অজন্মাজনিত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময়ে কাকগুলিও খাইতে না পাইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিল; এই শেষোক্ত বারে দুর্ভিক্ষ অধিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কলিঙ্গ দেশেও একদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সে সময়ে লোক অন্নাভাবে চৌর্য্যবৃত্তি ধরিয়াছিল!

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর কথা আছে। এই অর্থশাস্ত্র কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া আধুনিক কালে অতি-পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর রচিত বলিয়া আমি মনে করি। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তেরই মন্ত্রী ছিলেন। এই গ্রন্থে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কথা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। ইহাতে দুর্ভিক্ষে অধিক লোকক্ষয় হয়, এ কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সময় বা তাহার দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব্বে যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, তাহা মেগাস্থেনিসের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। আসল কথা, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব ঘটে না। অবশ্য প্রাচীন কালে দুর্ভিক্ষ দমনের একটা ঘোর বাধা ছিল। যে সকল অঞ্চলে নদী নাই অথবা নদী নিদাঘে অত্যন্ত শীর্ণা হইয়া যায়, সে সকল অঞ্চলে অন্য স্থান হইতে খাদ্য আমদানী করা কঠিন হইত। যে জন্ম ঐ সকল অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কোপ অত্যন্ত অধিক হইত। নদী-তীরস্থিত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রায় দেখা দিত না। ফলে পুরাকালে কোন কোন সময়ে ক্বচিৎ কোন কোন অঞ্চলে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তবে তাহা মনে রাখিবার মত ভীষণাকার ধারণ করিত কি না সন্দেহ! এ কথা সত্য যে, প্রাচীন কালে ভারতীয় ভূপতিরা প্রায়ই অজন্মা হইলে প্রজা-রক্ষা সম্বন্ধে অবহিত হইতেন এবং সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও প্রজা রক্ষা করিতেন। আবার কোন কোন একান্ত স্বার্থপর রাজা দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার দুঃখ-দারিদ্র্যের দিকে একান্ত উদাসীন থাকিতেন, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতে বিরল হইলেও যে একেবারে পাওয়া যায় না তাহা মনে হয় না। খৃষ্টীয় ৯১৭-১৮ অব্দে পঞ্চনদ প্রদেশের বিতস্তা নদীর জলপ্লাবনে বহু শস্যহানি হইয়াছিল। সেই সময় ঐ অঞ্চলে পার্থ নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন নাবালক। পঙ্গু নামে এক ব্যক্তি তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। এই সময়ে রাজপুরুষরা অতি উচ্চমূল্যে অনাহারক্লিষ্ট প্রজাদিগের নিকট খাদ্যশস্য বেচিয়া প্রভূত অর্থলাভ করিয়াছিলেন। বলহুনের রাজতরঙ্গিণীতে সেই পাপিষ্ঠ শাসকদিগের কথা বর্ণিত আছে। আবার ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে হর্ষ নামধেয় রাজার শাসন-কালে রাজ-সরকারের কায়স্থগণ অর্থাৎ খাজানা-আদায়কারী কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে অতিশয় পীড়ন করিয়াছিল। এরূপ ঘটনা ভারতের ইতিহাসে যে একেবারেই নাই, আমরা সে কথা বলি না। আসল কথা, সুশাসন হইলে এদেশে কখনই দুর্ভিক্ষ ঘটিত না—ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বাঙ্গালায় প্রায় দুর্ভিক্ষ হইত না। বাঙ্গালার লোক কস্মিন্ কালে অন্নকষ্ট ভোগ করে নাই। বার্ণিয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় এত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত যে, বাঙ্গালার লোক ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে বহু দেশে খাদ্যশস্য চালান দিত। ছিয়াত্তুরে মম্বন্তরের পূর্ব্বে বাঙ্গালার লোক কস্মিন্ কালেও জঠর জ্বালা অনুভব করে নাই। খাদ্যের জন্য যে চিন্তিত হইতে হয়, বাঙ্গালার লোক তাহা কখনও জানিত না। চিরকালই একটা নির্দ্দিষ্ট কালান্তরে—বর্ষার অভাব ঘটে। কিন্তু সে জন্ম লোক মরিয়া যাওয়াতে দেশ উজাড় হয় নাই!

এই সাময়িক অজন্মার প্রতিকারকল্পে প্রাচীন কালে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত, এক্ষণে আমি তাহারই আলোচনা করিব। এখনকার বিদেশী শাসকগণ এই বলিয়া গর্ব্ব করেন যে, তখন আমরা অসভ্য ছিলাম,—এখন আমরা সুসভ্য হইয়াছি! আমি দেখাইব যে, সে কালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তখনকার রাজা এবং রাজপুরুষরা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ-প্রশমনকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না—বরং কোন কোন বিষয়ে অধিক উন্নত ছিল। অত্রিপত্নী অনসূয়া দেবী যে তপস্যার দ্বারা দশবার্ষিক অনাবৃষ্টি-জনিত অজন্মার হস্ত হইতে মুনি-ঋষিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি জাহ্নবীকে অর্থাৎ গঙ্গাজলকে সেই সেই অঞ্চলে লইয়া গিয়া ঐ স্থানকে উর্ব্বর

এবং ফল-পুষ্পে শোভিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি সেচের খাল কাটিয়া ঐ অঞ্চলে গঙ্গোদক লইয়া গিয়াছিলেন এবং শস্যাদি বপন পূর্ব্বক তথায় প্রচুর আহার্য্য উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন কি করিয়া? তপস্যার দ্বারা। অর্থাৎ আয়াস স্বীকার করিয়া। তিনি গঙ্গা হইতে খাল কাটিয়া আনিয়া ঐ তপস্বীদিগের বাসভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিয়াছিলেন,—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার জল-সেচনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কথা বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে নারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে দেখা যায় যে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "হে রাজা যুধিষ্ঠির, তোমার রাজ্যে কৃষাণগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে ত? বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল জলপূর্ণ হইয়া বিভাগানুসারে স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে ত? কৃষিকার্য্যে বৃষ্টির নিতান্ত আবশ্যকতা নাই ত? কৃষিজীবীদিগের বীজ এবং অন্নের হানি হয় না ত? প্রত্যেক শতের প্রতি চতুর্থাংশ বৃদ্ধি লইয়া তাহাদিগকে সানুগ্রহ মনে ঋণদান কর ত?" ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়ে কৃষকদিগকে যাহাতে কেবল মেঘের দিকে জলের আশায় চাহিয়া থাকিতে না হয়, সে বিষয়ে রাজার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। প্রজারা অভাবে পড়িয়া বীজ-ধান প্রভৃতি খাইয়া না ফেলে, রাজার সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ছিল। ইহা ভিন্ন কৃষিঋণ দিবার ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রতি এক শত মাপ শস্য-বীজের এক মাপের সিকি পরিমাণ বৃদ্ধি লইয়া বীজ দিতে হইত। রামচন্দ্রও কোশল রাজ্যের এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন যে, কোশল দেশ দেবমাতৃক নহে,—উহা অদেবমাতৃক, অর্থাৎ ঐ রাজ্যের কৃষকদিগকে শস্যের জন্য কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয় না; তথাকার কৃষক সকল সেচের উপর অধিক নির্ভরশীল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও সুশাসিত দেশ সম্বন্ধে ঐরূপ কথাই আছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে সেচের (Irrigation) ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ইহা কত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। ঋগ্বেদেও সেচের ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায় (৩)। রামায়ণে এবং মহাভারতে উহার কথা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রেও সেচের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রের মধ্যে শুক্র-নীতি অতি প্রাচীন। বর্ত্তমান সময়ে যে গ্রন্থ 'শুক্রনীতিসার' বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা মূল শুক্রাচার্য্য-প্রণীত নহে। উহা অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত মূল শুক্রনীতির সজ্ক্ষিপ্তসার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র তাহার পরবর্ত্তী। কৌটিল্যের পরে তাঁহার জনৈক শিষ্য বা মতাবলম্বী ব্যক্তি কামন্দকীয় নীতিসার রচনা করেন। উহাও অতি প্রাচীন। সার ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড রাইফলস্‌ এবং ক্রফোর্ড বলেন যে, "যব দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্লাবন উপস্থিত হইলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তথাকার হিন্দুরা তাহাদের পুরাতন পুস্তক, গৃহদেবতা প্রভৃতি লইয়া বালী দ্বীপে গমন করে। তাহার পর ভারতের সহিত তাহাদের আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাহারা বালী দ্বীপে কামন্দকীয় নীতিসার লইয়া আসিয়াছিল।" ইহাতে বুঝা যায় যে, কামন্দকের নীতিসার খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের বহু কাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যে অতি প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ছয় প্রকারে দৈব-পীড়ন হইয়া থাকে, যথা—অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, মহামারী বা সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ এবং মড়ক। তন্মধ্যে সংক্রামক ব্যাধিই অধিক লোকহানিকর; অন্য নীতিশাস্ত্রকারও এই কথা বলিয়াছেন। অনেকেই উহা বলেন। কৌটিল্য কিন্তু সে কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, মহামারী অল্প স্থানমধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয় ব্যাপক অর্থাৎ বহু দূর বিস্তৃত। ইহাতে অনুমিত হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকের পূর্ব্বেও কোন না কোন সময়ে অত্যন্ত ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ডিওডোরাস-কথিত ম্যাগেস্থেনিসের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, কৌটিল্যের সময়ের স্মৃতির মধ্যে ভারতে কোন প্রবল দুর্ভিক্ষ হয় নাই। সম্ভবতঃ কৌটিল্য উহা কল্পনা করিয়াই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যের মতের খণ্ডন করিয়া থাকিবেন। শুক্রনীতিসারে দুর্ভিক্ষের কথা আছে,—কিন্তু তেমন ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কথা নাই। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রজারা যদি কোন জলাশয়, তড়াগ, খাল বা ইঁদারা খনন করে, তাহা হইলে তাহারা ঐ বাবদ যত ব্যয় করিয়াছে, তাহার দ্বিগুণ যত দিন লাভ না করিতে পারিবে, তত দিন রাজা ঐ বাবদ কোন কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শুক্রনীতিসারে কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য তুলাযন্ত্র নির্ম্মাণের কথা আছে। কৃষিকার্য্যের সাফল্য কিসে হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া রাজা প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। কৃষক কৃষির জন্য যে ব্যয় করিল, (ঐ ব্যয়ের যে সমস্ত রাজকর ধর্ত্তব্য) তাহার দ্বিগুণ অর্থ সে যদি লাভ করে, তাহা হইলে তাহার কৃষিকার্য্য সফল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কৃষিকার্য্য সফল হইলে তবে রাজা কৃষকের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। অন্যথা নহে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধিই বর্ত্তমান কালে দুর্ভিক্ষ সংঘটনের কারণ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু সে অনুমান সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয় না। পুরাকালে এ দেশে জনসংখ্যা কম ছিল সত্য,—কিন্তু সেইরূপ কৃষিক্ষেত্রও কম ছিল; কৃষি-প্রণালীও পশ্চাদ্‌পদ ছিল। এখন জনসংখ্যা বাড়িয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমিও বাড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-পদ্ধতিরও উন্নতি সাধিত হইতেছে। আসল কথা, পুরাকালে শাসন-পালনের ব্যয় অত্যন্ত অল্প ছিল। তখনকার রাজারা আপনাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য অকারণ পাল-পাল দর্শনধারী মন্ত্রী রাখিতেন না। তখন মন্ত্রী এবং বিচারপতিরা আপনাদের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য বেতন বা ভৃতি লইতেন না। তাঁহাদিগের যাহা প্রয়োজন তাহা সরকার হইতে প্রদত্ত হইত। ইঁহারা অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্ষত্রিয়রা প্রায়ই শাসন-বিভাগে এবং সমর-বিভাগে কাজ করিতেন। তাঁহারা জায়গীর পাইতেন। কেবল শিল্পী বণিক্‌ এবং শ্রমিকরাই ভৃতি বা বেতন পাইতেন। কাজেই তখন সর্ব্ববিধ শাসন-পালনের কাজই এখনকার তুলনায় অতি অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইত। সেই জন্য লোককে অধিক কর দিতে হইত না। দ্বিতীয়তঃ, রাজারা তখন উৎপন্ন পণ্যে ও ফসলেও কর গ্রহণ করিতেন। ঐ সকল ফসল প্রত্যেক বিভাগে রাজ-সরকারের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত; উহা হইতে বাজার-দরে কর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রভৃতিও প্রদত্ত হইয়া অবশিষ্ট কিছু থাকিত।" দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা হইলে জনসাধারণ সেই

(৩) ঋগ্বেদ (১০।৬১।১) ইত্যাদি

রাজ-ভাণ্ডারের শস্যাদি সাধারণ দরেই পাইত। সেই জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ হইতে পারিত না। অজন্মা হইলে প্রজারা শস্যের মূল্য অধিক দিতে বাধ্য হইত না। কাজেই তখন লোকের তেমন কষ্ট হইত না। তবে যদি রাজকোষের শস্যাদি ব্যয়িত হইয়া যাইত, তাহা হইলে হয়ত লোক কিছু মরিত। এরূপ হইলে লোক উহা 'রাজার পাপ' বলিয়া মনে করিত। জৈনদিগের সোমদেব-কৃত "নীতিবাক্যামৃত" গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, রাজা প্রজাদিগকে আপৎকালে সাহায্য করিবার জন্য নিজ ভাণ্ডারে শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন। কৌটিল্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রজাগণের আপদ্ প্রতিকারার্থ রাজা তাঁহাদের শস্যভাণ্ডারের সঞ্চিত শস্যের অর্দ্ধেক রাখিয়া দিবেন। তখন সকলেই শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত। রাজকোষের অর্দ্ধেক শস্য প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই সঞ্চিত থাকিত। প্রজারাও অজন্মার জন্য শস্য সঞ্চিত রাখিত। প্রজার তক্তপোষের তলা হইতে কোন রাজপুরুষই শস্য টানিয়া বাহির করিবার কল্পনাও করিত না।

পূর্ব্বকালে দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে উহা রাজার পাপে হইয়াছে বলিয়া লোক মনে করিত। অর্থাৎ লোক দুর্ভিক্ষের জন্য রাজাকেই দায়ী করিত। এখনও সাধারণ লোক "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট" এ-কথা বলিয়া থাকে। এবং সে জন্য শাসন-পদ্ধতির উপর অসন্তুষ্ট হয়। সাধারণের খাদ্য-শস্যের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, সে দিকে রাজগণের এবং রাজপুরুষগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত।

পূর্ব্বকালে দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধ-কল্পে (Preventive measure) এইগুলি অবলম্বন করা হইত—

(১) খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা।

(২) রাজকোষে শস্য-সঞ্চয়।

(৩) যাগ-যজ্ঞাদি।

দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে (Remedial measure) নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। যথা :—

(১) প্রজাগণকে বীজধান প্রদান (বীজভক্তোপগ্রহম্)

(২) কৃষিঋণ দান। কৌটিল্য ইহাকে অপমিত্যক বলিয়াছেন। ইহা কৃষক এবং অকৃষক-নির্ব্বিশেষে সকলকেই বিনামূল্যে দেওয়া হইত।

(৩) ইষ্টাপূর্ত্তাদি কার্য্য দ্বারা লোক প্রতিপালন (Relief work)। কৌটিল্য সে কথা বলিয়াছেন।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে ধনী লোকদিগের দ্বারা দরিদ্রদিগকে সাহায্য প্রদান। কল্পদ্রুম অবদানে কথিত আছে যে, একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া অনশনক্লিষ্ট লোকদিগকে খাদ্যবস্তু দান করিয়াছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। তবে তখন লোক দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে অর্দ্ধমাত্রা বা সিকিমাত্রা খাদ্য দিয়া জীবিত রাখিবার কল্পনাও করিতে পারিত না। দুর্ভিক্ষ-প্রশমনকল্পে তখন যে সকল উপায় অবলম্বিত হইত, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু হয় বলিয়া বোধ হয় না। তবে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে রাজা তাহা নিজেরই পাপজনিত বা ত্রুটীজনিত ঘটনা মনে করিতেন,—এখনকার রাজারা তাহা মনে করেন না। কারণ, তখন আমরা অসভ্য ছিলাম, এখন সভ্য হইয়াছি!

সে কালে এক দেশের সহিত অন্য দেশের যুদ্ধ বাধিলে কোন রাজাই শত্রু-রাজ্যের শস্য নাশ করিতেন না। শস্য নাশ করিয়া যে বিজয় লাভ হইত, তাহা অবশ্য বিজয় নামে নিন্দিত ছিল। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের চতুর্থ সর্গের ৩৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "ভীমসেন রামের শাসন জানিতে পারিয়া ভয়ে বানরগণ নগর ও জলপথের নিকট দিয়া যাইতেও সাহস পায় নাই।" বানরসৈন্য-গমনের ফলে পাছে সাধারণ প্রজার ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় রাম ঐরূপ শাসন বা নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। আর এখন সভ্যতার যুগে শত্রু-হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কামাত্রে দেশের শস্য-নাশই হইতেছে নিয়ম! ইহাই পোড়া-মাটি নীতি!

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

তবু

ভালোবেসে কভু আসো নাই কাছে, হয়তো করেছো ঘৃণা—
তবু সেই মোর অনন্ত গৌরব!
চিরন্তন অনুরাগ, অনির্ব্বাণ অমূল্য প্রতীক,—
যা' চেয়েছি, যা' দিয়েছি, যা' পেয়েছি—সব।
গরল অমৃত হোক্—দ্বিধাহীন ভালোবাসা দিয়ে;
প্রেমের উজ্জ্বল দীপ নিবায়ো না প্রভু।
কে বলে পাইনি কিছু? প্রেম-প্রীতি, অমৃত-গরল—
ঘৃণা করো, তুচ্ছ ভাবো, কিছু সে তো তবু!

শ্রীকানন রায়

প্রেম

তোমারে বাসিয়া ভালো প্রেমের স্বরূপ চিনিলাম!
মরি মরি কি মাধুরী! এ ধরণী এত মধুময়!
এত আলো এত প্রাণ কোনখানে নাহি ক্ষয়,
পূজার মন্দিরে তব আমারে হারায়ে ফেলিলাম।
হৃদয়ের রক্তপদ্মে তোমারে করিনু আবাহন—
নিঃশেষে করিনু তোমা তুচ্ছ করি লাজ-মান-ভয়!
প্রেমের মন্দিরে আমি পূজারী—এ চির-মৃত্যুঞ্জয়—
নয়নে তোমারি মূর্ত্তি—লুপ্ত সব—লুপ্ত ত্রিভুবন!

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য

ললিত-কলা

[নক্সা]

ননীগোপাল স্বর্গীয় বড়লোক পিতার একমাত্র পুত্র এবং জীবিতা আরও-বড়লোক পিসীর পুষ্যি। অতএব ননীগোপালের আর্থিক অবস্থা যে বেশ ভাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পিসীর তিন কুলে কেউ নেই। পিতৃমাতৃহীন একমাত্র ভাইপোই সব। স্নেহে এবং অর্থে ননীগোপালের কোনো অভাবই তিনি রাখেননি।

এহেন ননীগোপাল কেবল ননী খেয়ে গৃহে গোপাল সেজে বসে থাকলেও থাকতে পারত। কিন্তু সে আজকালকার ছেলে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ চুপ করে বসে থাকা এ যুগের ধর্ম্ম নয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো হলো এ কালের ফ্যাশন। সিনেমা, মিটিং, লাঞ্চ, ডিনার লেগেই আছে। তা ছাড়া ননীগোপালের টেষ্ট একটু আর্টিষ্টিক। ললিত-কলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যে তার প্রবল অনুরাগ।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—"ক্যালকাটা আর্ট এণ্ড কিউরীও মিউজিয়াম বহু দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী বিক্রয় করছেন। আর্ট-কলেক্টরদের বিরাট্ এবং অভাবনীয় সুযোগ। কলাকামীরা তৎপর হোন। বিলম্বে হতাশ হবেন।" বড় বড় অক্ষরে ছাপা—অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কাগজ পড়তে পড়তে ননীগোপালের দৃষ্টিও সেই দিকে আকৃষ্ট হলো। সে ঠিক করলো, পরদিন ঠিক ন'টার সময় গিয়ে হাজির হবে। লোকের ভীড় কম থাকলে সুবিধামত কম দামে দাঁও মারতে পারবে!

কাগজে ঠিকানা ছিল। ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর ননীগোপাল দোকান আবিষ্কার করলে। ছোট এঁদো-পড়া একটা কুঠ্‌রী। ভিতরে অনেক পুরানো ছবি, কালো হাঁড়ী ভাঙ্গা বেড়ী ইত্যাদি। কোনটা বাবরের, কোনটা রিজিয়া বেগমের, কোনটা চন্দ্রগুপ্তের! একটি ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি ননীগোপালের পছন্দ হল। প্রশ্ন করলে, "কত দাম?" দোকানী উত্তর দিলে—"পাঁচ টাকা। বৌদ্ধ যুগের তৈরী। পাঁচশ' টাকা হলেও কম হতো। নিলামে কত ডাক উঠতো বলা যায় না। কিন্তু এখন হাঁকবার লোক নেই। অতএব জলের দরে ছেড়ে দিতে হচ্ছে মশাই। দাঁড়ান, এখনই আসছি।"

এই কথা বলে দোকানী দোকানের পিছন দিকের ঘরে চলে গেল। একটু পরেই এক জন লোক বাহির থেকে এসে দোকানে ঢুকল। ময়লা কাপড়-জামার ওপর ফর্সা চাদর। ননীগোপালকে জিজ্ঞেস করলে—"এটা আপনি কিনেছেন মশাই?" ননীগোপাল উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, তা কিনেছি, বলতে পারেন।" ঠিক সেই সময় দোকানদার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। আগন্তুককে প্রশ্ন করলে—"কি চান?" আগন্তুক জবাব দিলে—"আমি এই বুদ্ধ মূর্ত্তিটা কিনতে চাই।" দোকানদার মাথা চুলকে বললে—"কিন্তু এ ভদ্রলোক মূর্ত্তিটা কিনবেন বলছিলেন। এঁকে আমি প্রায় কথা দিয়ে ফেলেছি—।" বাধা দিয়ে আগন্তুক বললে, "উনি কি দাম দিচ্ছেন?" দোকানী বললে—"এখনো দেননি, তবে দিতে যাচ্ছিলেন।" একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে আগন্তুক বললে—"তাহলে মূর্ত্তিটা এখনও বিক্রী হয়ে যায়নি। বেশ, উনি কত দিতে চেয়েছেন?" দোকানী উত্তর দিলে—"পাঁচ টাকা।" তিনি বললেন—"আমি দশ টাকা দেবো। বৌদ্ধ যুগের তৈরী মূর্ত্তি—পথ-ঘাটে মেলে না। যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন ছাড়ছি না।" ননীগোপালের তখন রোখ্ চেপে গেল। কি! চোখের সামনে হাতের জিনিষ অপরে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে! ননীগোপাল হাঁক দিল—"আমি দেবো পনেরো।" আগন্তুক চেঁচিয়ে উঠল—"আমি কুড়ি।" দু'জনেরই জেদ বাড়লো, জেদ বাড়ার সঙ্গে দামও হু-হু করে বাড়তে লাগলো। শেষে ননীগোপাল হাঁকলো—"পঞ্চাশ টাকা।" তখন তার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। জোরে নিশ্বাস পড়ছে। বিরস বদনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আগন্তুক বললে—"নাঃ, আর বাড়বার ক্ষমতা আমার নেই।" দোকানদার ননীগোপালের দিকে চেয়ে হেসে বললে—"দেখলেন তো জিনিষটার দাম! আপনি খুব ভাগ্যবান্। বেশ সস্তায় অতি দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি পেয়ে গেলেন।"

অতগুলো টাকা! ননীগোপালের মনটা দমে গিয়েছিল। দোকানদারের কথায় মরা-মন একটু চাঙ্গা হলো। যাক, একটা রেয়ার জিনিষ! কত আর্ট-কলেক্টর যে লক্ষ টাকা দিয়ে মাটীর হাঁড়ি কিনছে! এ তো পঞ্চাশটি মাত্র টাকায় একটা বুদ্ধ-মূর্ত্তি! পকেট থেকে পাঁচখানা করকরে দশ-টাকার নোট বার করে দোকানদারের হাতে দিয়ে মূর্ত্তিটি নিয়ে ননীগোপাল বাড়ী এলো।

ক'দিন পরের ঘটনা। কি এক কাজে ননীগোপাল ক্যালকাটা আর্ট এণ্ড কিউরীও মিউজিয়মের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যাবেলা। দোকান বন্ধ হবার সময়। দোকানে কোন খরিদ্দার ছিল না। ভিতরে নজর পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। দেখতে পেল তারই বুদ্ধ-মূর্ত্তির অনুরূপ অনেকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি টেবিলের ওপর বসানো। এক জন চাকর ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। দরজার দিকে মুখ করতেই দেখলে, চাকরটা অন্য কেউ নয়—সেদিনকার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী—যার জন্য পাঁচ টাকার মেকী বুদ্ধ-মূর্ত্তির জন্য তাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হয়েছে!

ননীগোপাল দ্রুত সে স্থান পরিত্যাগ করল। সেই থেকে ননীগোপালের আর্টের নেশা একেবারে কেটে গেছে!

রোজই রেডিয়োর বাঁশী বাজে। তোড়ী, কানাড়া, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী কত কি! ননীগোপালের ভারী সখ হলো, সে-ও বাঁশী বাজাবে। ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাঁশী কিনে ফেললে। বাড়ী গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও বাঁশী থেকে কোন রকম আওয়াজ বার করতে পারলে না! মানুষ ঠেকে শেখে। আর্টের ব্যাপারে ননীগোপাল একবার বড় ঠকান্ ঠকেছিল। তাই বাঁশীটা সে ট্রায়ালে কিনেছিল। বলে এসেছিল, পছন্দ না হলে ফেরত দেবে। নীরব বাঁশীতে আর বাঁশে কোন তফাৎ নেই! সে বুঝতে পারল, দোকানদার তাকে একটা ভাঙ্গা বাঁশী দিয়েছে। তখনই দোকানে ছুটল। মহা খাপ্পা হয়ে দোকানীকে বললে—"বাঁশীর বদলে বাঁশ দেবার অর্থ কি? এটা তো একদম ভাঙ্গা। কোন আওয়াজ বার হয় না।" দোকানী বাঁশী নেড়ে চেড়ে দেখে মুখে দিয়ে বিনা-আয়াসেই বাজাতে আরম্ভ করল। খাশা! ননীগোপাল বেবাক বেকুব বনে গেল। দোকানী হেসে বললে—"ক্ল্যারিওনেট বাজানো একটু শক্ত। অনেক দম লাগে আর ফুঁ দেবার একটা কায়দা

আছে।" ভদ্রলোক অতি যত্নসহকারে ননীগোপালকে কায়দা বাতলে দিলে।

রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়বার পর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে ননীগোপাল বংশী-শিক্ষায় মনোনিবেশ করলে। কায়দা করে গাল ফুলিয়ে দম বন্ধ করে ফুঁ দিয়ে বাঁশী থেকে আওয়াজ বার করলে। মন প্রসন্ন। অনুশীলনে সকল কার্য্যই আয়ত্ত করা যায়। ননীগোপাল নিবিষ্ট চিত্তে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হল। আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল ফলতে বিশেষ দেরী হলো না। অল্পক্ষণ পরেই একটা বিরাট্ রকম হৈচৈ শব্দ কানে গেল। বাঁশী বাজানো বন্ধ করে ননীগোপাল ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। কানে এল পিসীমার পরিত্রাহি চীৎকার—"ওরে ও ননে, ননে।" ব্যস্ত হয়ে ননীগোপাল ডাকলে—"পিসীমা, ও পিসীমা।" "কে? ননী? আঃ বাঁচালি!" পিসীমা ভয়ে কাঁপছেন! ননীগোপাল জিগ্যেস করলে—"কি হয়েছে পিসীমা? এত ভয় পেয়েছো কেন? ব্যাপার কি?" পিসীমা বললেন—"আর বলিস্ কেন? কিছুক্ষণ থেকে বিকট রকম একটা গোঙানী আওয়াজ পাচ্ছিলুম। হয়তো কেউ কাউকে খুন করেছে কিংবা আধমরা অবস্থায় কাছাকাছি কোথাও ফেলে রেখে গেছে। ভূতটুতও হতে পারে। তুই আসতেই কিন্তু আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল!"

ব্যাপারটা ননীগোপাল বুঝলে, কিন্তু পিসীমাকে কিছু বললে না। ওদিকে সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। দরজা খুলে দিতেই লাঠি-সোঁটা নিয়ে পাড়ার ক'জন যুবক বাড়ীতে ঢুকল। বললে—"আপনাদের বাড়ী থেকে বিশ্রী একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ আসছিল। তাই শুনে আমরা ছুটে এলুম। বাড়ীতে ডাকাত পড়েনি তো?" ননীগোপাল কি আর বলবে!

পরদিন সকালে বাঁশী ভেঙ্গে গঙ্গার জলে সে ভাসিয়ে দিলে। সেই থেকে ননীগোপালের সঙ্গীতের নেশা একেবারে ছুটে গেল। রেডিয়োতে বাঁশী বাজলেই সে এখন সেট্ বন্ধ করে দেয়।

ননীগোপালের সাহিত্যিক হবার ঝোঁক চাপলো। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করেও নাটক, নভেল, গল্প, কবিতা কিছুই মনের মত লিখে উঠতে পারল না। তখন সে ঠিক করলে, সমালোচক হবে। সুবিধা বিস্তর। পরের লেখা সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ। চিরকাল বাঙ্গালীর পরনিন্দা পরচর্চ্চা নিয়েই কাটছে। বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাতে সমালোচনা-বীজ নিহিত। ননীগোপাল ক্রিটিক হয়ে পড়লো।

প্রথম প্রথম বই কিনে সমালোচনা করতো। দু'-চারটে কাগজে ধরে-কয়ে সমালোচনা বার করলে। তার পর সেই কাগজওলারা কোন নীরস পুস্তক হাতে এলেই ননীগোপালকে পাঠিয়ে দিতে আরম্ভ করলে। কোন লেখকের সম্বন্ধে কখনও সে কোন কটু কথা লিখত না। "বইটি সুলিখিত। ছাপা ভাল। বাঁধাই মনোরম। দামেও বেশ সস্তা"—এই ধরণের সমালোচনাই বেশী থাকত।

কিছু দিনের মধ্যে বইয়ে ঘর ভরে গেল। ননীগোপাল সব সময় বই পড়ছে। পিসীমা রাগ করেন—"সব সময় বই-বই-বই! চোখের মাথা খাবি শেষে! শরীর যাবে যে।" ননীগোপাল চুপ করে থাকে। শেষে এক দিন ননীগোপালের সামান্য একটু সর্দ্দি লেগে জ্বর হ'ল। পিসীমা বললেন—"পড়ে পড়ে জ্বর করে তবে ছাড়লি! বইগুলো যদি বিদায় না করিস্, তবে আমায় বিদায় করে দে।" পিসীমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ননীগোপাল ঠিক করলে, কিছু বই কমিয়ে ফেলবে আর পড়াশুনা একটু রয়ে-সয়ে করবে।

দু'দিন পরেই ননীগোপাল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। এক দিন খানকয়েক বই বগলে করে সে এক পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে হাজির হ'ল। নতুন বই—কিন্তু নীরস প্রবন্ধ, ধর্ম্মকথা অথবা সমাজ-তত্ত্ব। দোকানদারের পছন্দ হলো না। আর এক দোকানে গেল। দোকানী বইগুলো নাড়া-চাড়া করে নাক সিঁটকে বললে—"কততে দেবেন?" ননীগোপাল ভয়ে ভয়ে এমন একটা দাম চাইলে, যে-দামে ও রকম আধখানা বইও হয় না! দোকানী তার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে—"চোরাই মাল আমরা কিনি না। বৌবাজারের চোরা-হাটে যান।" রাগে অপমানে ননীগোপাল বাড়ী ফিরে গেল।

বই কিন্তু বিদায় করতেই হবে, না হলে পিসীমা বিদায় নেবেন! সন্ধ্যার পর ননীগোপাল একটা চটের থলেয় কিছু বই ভরে রিক্সা করে টালার খালের দিকে গেল। তার পর রিক্সা ছেড়ে দিয়ে থলে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কেউ কোথাও নেই দেখে পুলের উপর থেকে টুপ করে থলেটা খালের জলে ফেলে দিলে। একটা পুলিশ-কনষ্টেবল ছিল পুলের একপ্রান্তে—দূর থেকে ননীগোপালের কার্য্যকলাপ সে দেখছিল। এ ব্যাপারের পর ননীগোপাল যে এক জন খুনী—থলেয় করে লাশ এনে খালের জলে ফেলেছে, এ বিশ্বাস তার বদ্ধমূল হলো। ননীগোপাল দু'পা যেতে না যেতে পুলিশ-পুঙ্গব ছুটে এসে তার হাত ধরে ফেললে। দেখতে দেখতে গোলমাল—লোকের ভীড়! শেষ পর্য্যন্ত ননীগোপালকে থানায় যেতে হলো। থানার ইন্সপেক্টর কনষ্টেবলের কথা শুনে বললেন—"তুমি যতই সাধু সাজবার চেষ্টা করো এখন আর পালাতে পারছ না। অমন লুকিয়ে-চুরিয়ে থলেয় করে বই নিয়ে মানুষ সন্ধ্যার সময় খালের জলে ফেলে না বাপু! ও সব খাটছে না।"

ননীগোপাল হাজতে বন্ধ রইলো।

পরের দিন সকালে জেলে আনিয়ে খালে জাল ফেলা হলো। অনেক মেহনতের পর থলেটা পাওয়া গেল। খবর হাওয়ায় ওড়ে! বহু লোক খালের ধারে এসে জড় হয়েছে। পুলিশ-ইন্সপেক্টর ধীরে ধীরে থলের সেলাই কাটছে। অধীর আগ্রহে বিস্ফারিত লোচনে দর্শকমণ্ডলী অপেক্ষা করছে—না জানি কি বীভৎস দৃশ্য নয়নগোচর হবে! সেলাই খোলা শেষ হতেই বেরিয়ে পড়লো জলে-ভেজা রং-ওঠা গাদাপ্রমাণ বই। ট্রাজেডী ফার্সে পরিণত হলো। ননীগোপালের স্বপক্ষে এবং পুলিশের বিপক্ষে বহু টীকা-টিপ্পনী বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হলো।

বলা বাহুল্য, ননীগোপাল ছাড়া পেল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার সাহিত্য-নেশাও গেল ছেড়ে। অবশিষ্ট বইগুলি জ্বালানি কয়লার এই অভাবের দিনে সংসারের কাজে লাগলো—পিসীমা সে-সব বই ছিঁড়ে দাসীর হাতে দিলেন উনুন ধরাতে।

শ্রীযামিনীমোহন কর।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

ইটালীর আত্মসমর্পণের কথা প্রকাশিত হইবামাত্র জার্ম্মাণী তাহার অভ্যস্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত উত্তর ও মধ্য ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর, নাটকীয় ভাবে মুসোলিনীকে উদ্ধার করিয়া ঐ অধিকৃত অঞ্চলে ফ্যাসিষ্ট-ইটালীর প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন করিয়াছে।

ইটালী এখন ফ্যাসিষ্ট অঞ্চলে ও গণতান্ত্রিক অঞ্চলে বিভক্ত। দক্ষিণ ইটালীতে সেলারণোর উত্তর হইতে ফোগিয়ার দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখার নিম্নে গণতান্ত্রিক ইটালী; তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল্ ইহার নিয়মানুগ নৃপতি বলিয়া পরিচিত, মার্শাল্ বাদোগলিও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী। ঐ রেখার উত্তরে সমগ্র অঞ্চল ফ্যাসিষ্ট-ইটালী; মুসোলিনী এই রাষ্ট্রীয় সৌধের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত, মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি তাঁহার প্রধান সহকারী।

সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, সেলারণোতে সম্মিলিত পক্ষের সেনার অবতরণের আয়োজন শেষ করিবার অন্যতম উদ্দেশ্যে ইটালীর আত্মসমর্পণের সংবাদ সপ্তাহকাল গোপন রাখা হইয়াছিল। এই সেলারণো হইতে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করিবার জন্ম জার্ম্মাণী যথাশক্তি প্রয়াস করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার সে প্রয়াস সফল হয় নাই; সেলারণো অধিকার করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনী এখন নেপ্‌ল্‌সের অদূরে পৌঁছিয়াছে। সেলারণোর যুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছে—জার্ম্মাণী এখন তাহার প্রতিপক্ষের তুলনায় কত দুর্ব্বল! এই অঞ্চলে তাহার প্রতি-আক্রমণের সহিত দুই বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসে তাহার প্রত্যাঘাত তুলনীয়।

সেলারণোতে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থানটি ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইলে তাঁহাদের সামরিক মর্য্যাদা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইত। এই অবমাননার হাত হইতে তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছেন; কিন্তু জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড প্রতিরোধ ভেদ করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের অগ্রগতিতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূল ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল—উভয় অঞ্চলে তাহাদের সাফল্যের গতি অত্যন্ত মন্থর। ফ্যাসিষ্ট-ইটালীর নূতন নূতন স্থানে সৈন্য অবতরণ করাইয়া জার্ম্মাণীকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করিবার চেষ্টাও আর হয় নাই।

ইটালীর সহিত সম্মিলিত পক্ষের যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুসারে তাঁহারা ইটালীর দ্বীপগুলিকে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ঘাঁটীরূপে ব্যবহারের অধিকারী। কিন্তু সার্ডিনিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার অবতরণের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই; তবে, জার্ম্মাণরা না কি সার্ডিনিয়া ত্যাগ করিয়া কর্সিকায় অপসরণ করিয়াছে। কর্সিকার ফরাসী অধিবাসীরা পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণদিগের বিরোধিতা করিতেছিল; পরে, ফরাসী সৈন্য তথায় অবতরণ করে। জার্ম্মাণরা এখন না কি কর্সিকা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। ঈজিয়ান সাগরের প্রবেশ-দ্বারে ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জ ইটালীর। গ্রীসে ও ক্রীটে আক্রমণ-পরিচালনের জন্ম এই দ্বীপাবলীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। যুদ্ধ-বিরতির সংবাদ সপ্তাহকাল গোপন থাকিলেও যথাসময়ে সম্মিলিত পক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। তবে, সম্প্রতি তাঁহারা ডোডেকেনীজের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়াছেন।

ইটালীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করাইয়া সামরিক দিক্ হইতে সম্মিলিত পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ে উপকৃত হইয়াছেন—প্রথমতঃ, ইটালীর নৌবহর লাভ করিয়া সমুদ্রবক্ষে তাঁহারা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়াছেন; ইটালীর নৌবাহিনী যদি ভূমধ্যসাগরের বাহিরে ব্যবহৃত না-ও হয়, তাহা হইলেও ইঙ্গ-মার্কিণী নৌবহর ঐ অঞ্চলের দায়িত্ব-মুক্ত হইয়া অন্যত্র অবহিত হইতে পারিবে। ইহাতে প্রাচ্য অঞ্চলে এবং আটলাণ্টিকে সম্মিলিত পক্ষের অবস্থা উন্নত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত পক্ষ ইটালীতে পাদভূমি লাভ করিয়াছেন; জার্ম্মাণীর সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছেন। এখানে তাহাকে বিশেষ ভাবে যুদ্ধে ব্যাপৃত করিতে পারিলে অন্যত্র শত্রুকে আঘাত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, কর্সিকায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তথা হইতে সমুদ্রপথে সম্মিলিত পক্ষের ফ্রান্স-অভিযান সহজসাধ্য হইবে। সমুদ্রবক্ষে সম্মিলিত পক্ষ এখন একরূপ নিষ্কণ্টক; বিমান-শক্তিতেও তাঁহারা প্রবল; কাজেই, "লুফ্‌ৎওয়াফের" সাহায্যে এই অভিযান-প্রচেষ্টায় বাধা দান জার্ম্মাণীর পক্ষে সহজ হইবে না। চতুর্থতঃ, ডোডেকেনীজ হইতে বল্‌কানে অভিযান-পরিচালনের সুবিধাও সম্মিলিত পক্ষ লাভ করিয়াছেন; একই সময়ে দক্ষিণ-ইটালী হইতে এবং ডোডেকেনীজ হইতে বলকানে আঘাত করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে।

অবশ্য, রাজনৈতিক কারণে সম্মিলিত পক্ষ এই সব সুবিধা গ্রহণে ইতস্ততঃ করিবেন কি না, সামরিক শক্তির অপ্রাচুর্য্য তাঁহাদিগকে এই সুবিধা গ্রহণে অশক্ত করিবে কি না, সে কথা স্বতন্ত্র। তবে, তখন পর্য্যন্ত ইটালীর আত্মসমর্পণে সৃষ্ট সামরিক সুবিধাগুলির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি করিতে পারে নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই তাহারা ইহা করে নাই।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ইটালীর আত্মসমর্পণের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। অক্ষশক্তির শিবিরে এই বিপর্য্যয়ে জার্ম্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ কুপ্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে। হিট্‌লারের যে সকল ক্রীড়নক ঐ সব রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। জার্ম্মাণীর অধিকৃত রাজ্যগুলিতে যাহারা চরম নির্য্যাতন সহিয়াও বিজয়ী শক্তির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত, তাহারা ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়াছে; জার্ম্মাণ ভূমিতেও ফ্যাসিষ্ট পক্ষের পরাজয়ের আশঙ্কা বর্দ্ধিত হইয়াছে। অবশ্য, রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর ক্রমবর্দ্ধমান পরাজয়ে পূর্ব্ব হইতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইতেছিল; ইটালীর আত্মসমর্পণে অক্ষশক্তির শিবিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আরও প্রবল হইল।

ইটালীয় ভূমি রণাঙ্গনে পরিণত হইয়া এই দেশটি আজ শ্মশান হইতেছে। কিন্তু এই বিরাট্ ধ্বংসকাণ্ডের মধ্য দিয়াই ইটালীর বিশেষ রাজনৈতিক কল্যাণও সাধিত হইতেছে। ইটালীয় গণ-শক্তি আজ গণতান্ত্রিক ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী উদ্দেশ্যে সমবেত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সামরিক তৎপরতায় এই শক্তিকে নিয়োজিত করা ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকদের একান্ত প্রয়োজন! ফ্যাসিষ্ট তন্ত্রের প্রাক্তন সহযোগী বাদোগলিও আজ ঘটনাচক্রে এই গণশক্তিরই মুখাপেক্ষী। তাঁহার আহ্বানে ইটালীয় জনসাধারণ যদি

ফ্যাসিষ্ট ইটালীর বিরুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা থাকিবে; নতুবা যুদ্ধ-বিরতির সময় তিনি যদি কোনরূপ ব্যক্তিগত আশ্বাস পাইয়াও থাকেন, তাহা হইলেও উহা কার্য্যতঃ বৃথা হইবে।

ফ্যাসিজম্ ও তাহারই নামান্তর নাৎসীবাদ গণশক্তির চরম শত্রু। ধনিকতন্ত্র হইতে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি; এই সাম্রাজ্যবাদের শেষ রূপ ফ্যাসিজম্। গত ২১ বৎসর ফ্যাসিজমের এই জগদ্দল পাথর ইটালীর গণশক্তির বুকে চাপিয়া ছিল। আজ ঘটনাচক্রে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমে সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে; এখন সেই সজ্ঘর্ষের একটি প্রধান ক্ষেত্র ইটালীয় ভূমি। ইটালীর জনসাধারণ যদি সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির সহায়তায় ফ্যাসিজমের অবসান ঘটাইতে পারে এবং এই সামরিক তৎপরতার কালে ইটালীর প্রকৃত গণ-নেতারা যদি রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইটালী ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদ—উভয়ের কবল হইতেই মুক্ত হইতে পারিবে। মার্শাল বাদোগলিও আজ ইটালীয় জনসাধারণকে নাৎসী জার্ম্মাণী ও ফ্যাসিষ্ট-ইটালীর বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। ইটালীর শ্রমিক ও কৃষক যদি গরিলা যোদ্ধার ত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়া নিজ মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে যুদ্ধোত্তরকালে তাহাদের যে সুসংগঠিত শক্তি প্রকাশ পাইবে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ইটালীতে বাদোগলিও-মার্কা দেশীয় ফ্যাসিজম্ অথবা বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদ কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। বিরাট্ ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে ইটালীয় গণশক্তির প্রতিষ্ঠিত হইবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ আজ উপস্থিত। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইটালীয় জাতির পক্ষে ইহা আশীর্ব্বাদস্বরূপ।

রুশ-রণাঙ্গন—

মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর বিশালতম ঘাঁটী স্মলেনস্ক সোভিয়েট বাহিনী অধিকার করিয়াছে; রুশ-রণাঙ্গনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইহাই। রুশ সেনা তিন দিক্ হইতে এই সহরের দিকে অগ্রসর হওয়ায় জার্ম্মাণ সেনা দ্রুত পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছিল। এখন রুশ সেনার হোয়াইট্ রাশিয়ায় প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত; কিছু রুশ সেনা ইতোমধ্যে এই প্রদেশে প্রবেশও করিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে হোয়াইট্ রাশিয়ার রাজধানী মিনস্কই এখন জার্ম্মাণীর শেষ ঘাঁটী। দক্ষিণ অঞ্চলে রুশ সেনা এখন ইউক্রেণের রাজধানী কিয়েভে প্রবল আঘাত হানিতেছে। কিয়েভ হইতে নীপ্রোপেট্রভস্কের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে ৬টি স্থানে রুশ সেনা নীপার নদীর তীরে পৌঁছিয়াছে। কুবান অঞ্চল এখন সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণশূন্য; সোভিয়েট বাহিনী সম্প্রতি কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্ব-উপকূলবর্ত্তী নভরোসিস্ক ও আনাপা অধিকার করায় কুবানের শেষ পাদভূমি হইতে জার্ম্মাণ সেনাবাহিনী এখন বিতাড়িত। ক্রিমিয়া পূর্ব্ব দিক্ হইতে বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়াছে। যে রেলপথটি ক্রিমিয়াকে রুশিয়ার অবশিষ্টাংশের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, তাহার উত্তরাংশ বহু পূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমানে রুশ সেনা ক্রিমিয়াকে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিবার উদ্দেশে মেলিটোপোলে প্রবল আঘাত করিতেছে। মেলিটোপোল্ অধিকার করিয়া রুশ সেনা যদি খারসন্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে হয়ত বিনা যুদ্ধেই সেবাস্তোপোল্, সিম-ফারোপোল্ তথা সমগ্র ক্রিমিয়া তাহাদের করায়ত্ত হইবে। পূর্ব্বাহ্নেই জার্ম্মাণী যদি ক্রিমিয়া ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তখন সমুদ্র-পথে অপসরণ-প্রচেষ্টায় বহু জার্ম্মাণ সেনার সলিল-সমাধিও অবশ্যম্ভাবী।

জার্ম্মাণ সেনানায়কেরা এখন কোন স্থানে দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইতেছেন না; সেনাবাহিনী বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিলেই দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতেছেন। রুশ সেনাও এক একটি জার্ম্মাণ কেন্দ্রে এইরূপ সুকৌশলে সাঁড়াশী আক্রমণ প্রসারিত করিতেছে যে, সেনাবাহিনীকে বাঁচাইবার জন্য জার্ম্মাণ সেনাপতির দ্রুত পশ্চাদপসরণ ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকিতেছে না। সেনা-বাহিনী বিপন্ন করিয়া কোন বিশেষ স্থান রক্ষায় প্রয়াসী হওয়া জার্ম্মাণ সেনাপতির পক্ষে আর বুদ্ধিমানের কাজও নহে; কারণ, রুশ-রণাঙ্গনের সামরিক অবস্থা জার্ম্মাণীর অনুকূল হইবার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও আর নাই। প্রতিপক্ষকে সমর-ক্ষেত্রে পরাভূত করিবার আশা জার্ম্মাণী ত্যাগ করিয়াছে; এখন প্রতিরোধমূলক সংগ্রামে কূটনৈতিক চাতুর্য্যে কোন প্রকারে টিকিয়া থাকাই তাহার উদ্দেশ্য। জার্ম্মাণ রাজনৈতিকেরা মনে করেন, প্রতিরোধ-সংগ্রামে সুদীর্ঘ কাল কাটাইতে পারিলে রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহাদের অনুকূল হইবে; সম্মিলিত পক্ষের সহিত আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা ঘটিবে।

রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর পুনঃ পুনঃ এই পরাজয় সত্ত্বেও তাহার সামরিক শক্তিতে চরম আঘাত লাগিতেছে না; কারণ, ষ্ট্যালিন-গ্রাডের পুনরভিনয় আর সম্ভব হয় নাই। কিন্তু জার্ম্মাণীর সামরিক মর্য্যাদা এই ভাবে বিনষ্ট হওয়ায় অক্ষশক্তির শিবিরে প্রবল নৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে। ইটালীর আত্মসমর্পণের সহিত রুশ-রণাঙ্গনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই সম্পর্কে জনৈক বিশিষ্ট রাজনৈতিক মন্তব্য করিয়াছেন—"ইটালী আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে; কারণ, মার্শাল বাদোগলিও জানিতেন যে, জার্ম্মাণীর নিকট হইতে তাঁহার আর কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই; জার্ম্মাণীর সেনাবাহিনী এখন রুশ-রণাঙ্গনে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত।" ফিন্‌ল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র সন্ধির আগ্রহ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইয়াছে। হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া—সকলেই এখন জার্ম্মাণীর সহিত গ্রথিত তাহাদের ভাগ্যসূত্র ছিন্ন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।

মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আভাস দিয়াছেন যে, সত্বর পশ্চিম-য়ুরোপে তাঁহারা জার্ম্মাণীকে আঘাত করিবেন। ইটালীর যুদ্ধ যে প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন নহে, তাহা বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যে অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীকে সত্যই প্রবল আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে য়ুরোপে সামরিক অবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে; ১৯৪১ ও ৪২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণবাহিনী বিজয়গর্ব্বে পূর্ব্ব-য়ুরোপে অগ্রসর হইতেছিল, আর প্রতিরোধরত রুশ সেনাপতি নিজ সেনাবাহিনীকে বাঁচাইয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছিলেন। আর আজ সোভিয়েট বাহিনী প্রবল বিক্রমে অগ্রসর হইতেছে; জার্ম্মাণ সেনা-পতি তাহার সৈন্য লইয়া পলায়নে ব্যস্ত! এখন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করাইবার প্রয়ো-জনীয়তা আর নাই। এখন য়ুরোপখণ্ডে অভিযান প্রসারিত করিয়া ভবিষ্যৎ য়ুরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে মাতব্বরি করিবার অধিকার বজায় রাখাই ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির স্বার্থ। পূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসই যদি পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করাইতে

না দিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন সেই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্যই জার্ম্মাণীকে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির আঘাত করা প্রয়োজন হইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী যদি তাহাদিগের নিজ ভূমি হইতে জার্ম্মাণদিগকে বিতাড়িত করিয়া মধ্য য়ুরোপে প্রবেশ করিতে পারে, অথচ ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যদি জার্ম্মাণীকে প্রবল আঘাত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের চরম সামরিক ব্যর্থতা প্রকাশ পাইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকগণ এই সামরিক মর্য্যাদাহানি সহজে স্বীকার করিতে চাহিবেন না। সর্ব্বোপরি, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা যদি য়ুরোপখণ্ডে অভিযান আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য অঞ্চল জার্ম্মাণীর কবলমুক্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে য়ুরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে সোভিয়েট রুশিয়া অপ্রতিহত অধিকার লাভ করিবে। এই সম্ভাবনা নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক।

সুদূর প্রাচী—

নিউগিনির সাল্যামুয়া ও লে অধিকারের পর সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী ফিনস্‌হাফেনের নিকট উপনীত হইয়াছে ; ফিন্‌স্হাফেনের বহির্ব্যূহ ভেদ হইয়াছে। সুদূর প্রাচীর রণাঙ্গনে ইহাই উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক ঘটনা। তবে, ব্রহ্মদেশে ও মালয়ে আঘাতের জন্য সম্মিলিত পক্ষের আয়োজন দ্রুত চলিতেছে। জাপানও যে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, তাহা সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। জাপান আশঙ্কা করে, এক দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর হইতে জাপানী দ্বীপপুঞ্জে প্রত্যক্ষ আঘাতের প্রয়াস হইবে, অন্য দিকে ব্রহ্মদেশে ও মালয়ে আক্রমণ পরিচালিত হইবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল হইতে জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাত করা আপাততঃ সম্ভব নহে বলিয়াই মনে হয়। তবে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের শ্রমশিল্পকেন্দ্রে ও অন্যান্য সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিমান-আক্রমণ পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সত্বর এই আক্রমণ প্রবল ভাবেই চলিবে বলিয়া মনে হয়। জাপানের সহিত প্রত্যক্ষ সজ্ঘর্ষের প্রকৃত ক্ষেত্র ব্রহ্মদেশ ও মালয়। এই অঞ্চলেই প্রত্যক্ষ সজ্ঘর্ষ হইবে।

আগামী শীতকালে সম্মিলিত পক্ষ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেছেন। ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া অবিলম্বে চীনের শক্তি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। সুদীর্ঘ ৬ বৎসরকাল চরম দুঃখ সহিয়া চীন শত্রুর সহিত সজ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চীনের কম্যুনিষ্ট দলের এবং চিয়াং-কাই-সেকের অনুগত একটি শ্রেণীর জাপ-বিরোধী মনোভাব সন্দেহাতীত। তবে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই সমগ্র চীন গঠিত নহে। অবশিষ্ট চীনারা এই "অন্তহীন" যুদ্ধে নৈরাশ্য ও ক্লান্তি বোধ করিতে পারে। বিশেষতঃ জাপান এখন চীনকে স্বদলে আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিতেছে ; সে যে মাঞ্চুকো ব্যতীত সমগ্র চীন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহাও জানাইয়াছে। ইহা ব্যতীত, চীনের সংগঠনের জন্য ঋণ-দানের প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি ত আছেই। মাদাম্ চিয়াং-কাই-সেক কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—জাপানের সমর-যন্ত্র অপেক্ষা তাহার কূটনৈতিক অস্ত্র অধিকতর ভয়াবহ। কাজেই আশঙ্কা হয়, এই বৎসর শীতকালের মধ্যে ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনকে শক্তিশালী করিয়া তোলা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জাপানের কূটনৈতিক কৌশল সফল হইবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। জাপান যদি চীনকে স্বদলে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে হয়ত অজেয় হইয়া উঠিবে।

২৭।৯।৪৩　　শ্রীঅতুল দত্ত।

বিরহ ও অভিসার

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া আজ আর বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যকে সরাইয়া রাখা সম্ভব নয়, ইহা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই স্বীকার করেন। বৈষ্ণব কবিতার রসই হইতেছে সাহিত্যের প্রাণ-বস্তু ; ক্ষণিকের উল্লাসে মানুষ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে সত্য, কিন্তু প্রিয়-বিরহের করুণ মূর্চ্ছনায় মানব-হৃদয়ে যে সুরটি এক বার বাজিয়া ওঠে, তাহা জল-বুদ্বুদের মত ক্ষণেকে মিলাইয়া যাইতে চাহে না। তুষের আগুনের মত রহিয়া রহিয়া তাহা জ্বলিতে থাকে—বাহিরে তাহার প্রকাশ থাকে না সত্য, কিন্তু অন্তরের অন্তরে প্রাণ-মন পুড়াইয়া খাঁটি সোনা করিয়া তোলে।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে আমরা নানা রস-পর্য্যায়ের পদ দেখিতে পাই। কিন্তু সে পদগুলিকে আর আমরা ভুলিতে পারি না—যেগুলি পড়িতে পড়িতে মানস-চক্ষে বিরহিণী শ্রীমতীর ক্লান্ত-করুণ যে মুখখানি প্রতিভাত হইয়া ওঠে সে মুখে প্রসাধনের চিহ্ন নাই, অধরে অলক্তক নাই, নয়নের কাজল বেদনার অশ্রুতে ধুইয়া মুছিয়া ভাসিয়া গিয়াছে! দৃষ্টিতে আর সে চটুলতা নাই—বিরহিণী শ্রীরাধার সে দিন প্রতিষ্ঠা হয় ভক্ত-হৃদয়ে ব্যথার বেদীতে।

আর এক জাতের পদাবলী আছে, যাহা আমাদের অন্তরে বেদনা, বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার করে। সে হইতেছে অভিসারের পদাবলী। দয়িতের আহ্বানে শঙ্কিতা নায়িকা চলিয়াছেন জীবন-দেবতার অভিসারে। শ্রাবণের সঘন বারি-ধারায় কেশ-বাস সিক্ত, ক্ষণে ক্ষণে বিজলীর ঝলকে নয়ন-পথে সব-কিছু ঝলসিয়া উঠিতেছে—বিষধর হিংস্র সর্পকুল ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, কিন্তু শ্রীমতীর আর কিছুতেই ভয় করিলে চলিবে না! তাঁহাকে প্রাণবল্লভের বুকে আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে হইবে! কোন কথা আর ভাবিলে চলিবে না—চিন্তা করিবার আর অবকাশ নাই! কোন্ মুখে কুল-কলঙ্কিনী হইয়া প্রভাতে তিনি লোক-সমাজে ফিরিয়া যাইবেন? কুটিলা-জটিলার জ্বালাময় বাক্যবাণ কি করিয়াই বা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিবেন?

আধ্যাত্মিকতার উপর বৈষ্ণব কবিতা সমগ্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত কিম্বা ইহাতে সাধারণ মানব-মনের ভাব-ধারার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, তাহা কাহারও অনুশাসন মানিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। সাধারণ হোক আর অসাধারণই হোক, পাঠককে এই ধরণীর বর্ণগন্ধ-স্পর্শের

ভিতর দিয়া ইহা এক অরূপলোকের অভিসারে টানিয়া লইয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অভিসারের পদগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, শ্রীমতীর সহচরী-হিসাবে পদকর্ত্তা এবং পাঠক উভয়েই বুঝি সেই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে শ্যামসুন্দরের অভিসারে ছুটিয়াছেন! অভিসারের পদগুলি যে ভাবে পাঠকের মনকে তাহার ছন্দ, বিষয়-বস্তু ও ভাবধারার সহিত টানিয়া ছুটিতে থাকে, তাহা আর অন্য কোন সাহিত্যে কোন কাব্যে পারে কি না জানি না।

চারি দিক ঝাঁপিয়া প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, অন্ধকার নিশি, কর্দ্দমময় আশঙ্কাচ্ছন্ন পথ বাহিয়া শ্রীমতী চলিয়াছেন শ্যামদর্শনে, প্রিয়-সহচরীবৃন্দ বার বার শ্রীমতীকে নিষেধ জানাইতেছেন—

"ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচ্‌কই লোচন তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥"

কিন্তু যে-বাণ একবার হাতের বাঁধন কাটিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, তাহাকে যেমন আর ফিরানো যায় না, তেমনি কান্ত-বিরহ-ব্যাকুল মন আর কোন যুক্তি জানিতে চাহিল না! উত্তরে শ্রীমতী শুধু বলিলেন—

"কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরক আগি।"

ভণিতায় অভিসার-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচয়িতা গোবিন্দদাস বলিতেছেন—

"গোবিন্দদাস কহই অভিসর ধনি সহচরি পাওল বোধ।"

মিলনের পথ, জীবন-দেবতাকে লাভ করিবার সাধনা অত্যন্ত কঠিন, কঠোর। শুধু অভিসারে বাহির হইলেই চলিবে না, সে অভিসারকে সার্থক করিতে চাহিলে সর্ব্বপ্রথমে অতিক্রম করিতে হইবে মনের বাধা এবং পথের সমস্ত বিঘ্ন। তাই শ্রীমতী অন্ধকার পথে চলিবার অভ্যাস করিতেছেন। দুই হাতে নয়ন রোধ করিয়া কলসী-কলসী জল ঢালিয়া নিজের হাতে কাঁটা পুতিয়া কণ্টকাকীর্ণ পিছল অন্ধকার-পথে চলিবার অভ্যাস করিতেছেন। সর্পসঙ্কুল পথে চলিতে হইবে বলিয়া ওঝাকে হাতের কঙ্কণ পুরস্কার দিয়া সাপের মন্ত্র-তন্ত্র শিখিয়া লইতেছেন—কখনও কালা সাজিয়া, কখনও বোবা সাজিয়া সমাজের সকল উক্তিকে উপেক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন।

আবার যে প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার জন্য এই কঠোর সাধনা, তিনি আপনি আসিয়া চোরের মত শ্রীমতীর হৃদয়-দুয়ারে ভিখারীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শ্রীমতী কহিতেছেন—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

কি বাঙ্গালা সাহিত্যে, কি বিশ্ব সাহিত্যে এই জাতীয় পদ একান্ত দুর্লভ। বৈষ্ণব কবি কখন বা বর্ষা-অভিসার, হিম-অভিসার, দিবা-অভিসার, জ্যোৎস্না-অভিসার, আবার কখনও উন্মত্তাভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি পদই কি ভাষার মাধুর্য্যে, কি রসের পরিবেশে, কি ভাবের ঐশ্বর্য্যে—সব দিক্ দিয়াই পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই আত্মবিহ্বলতা, আত্ম-নিবেদন, এই পূর্ণ-সমর্পণ যে সাহিত্যকে মহিমমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা যে বিশ্ব সাহিত্যের মণিকুট্টিমে কালজয়ী হইয়া আপন গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বিরহের পদগুলি বৈষ্ণব-পদাবলীর গর্ব্বের বস্তু। পদকর্ত্তাগণ তাঁহাদের আন্তরিকতাকে, তাঁহাদের তীব্র অনুভূতিকে, হৃদয়ের ব্যথাকে এই পদগুলির ভিতর দিয়া অতি নিপুণ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সখী গিয়া মথুরায় ব্রজনন্দনের নিকট কবিতার ভাষায় বিরহিণী শ্রীমতীর যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমন জীবন্ত, তেমনি সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে! এ পদগুলির ভিতর দিয়া আমরা কেবল শ্রীমতীর বাহিরের নহে, অন্তরের রূপটিও দেখিতে পাই!

"পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি রেহা
কলেবর কমল কাঁতি জিনি কামিনি
দিনে দিনে খিন ভেল দেহা।"

এই ত গেল বাহিরে! আর অন্তরে—

"অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই
ও নিজ ভাব সভাবহি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই।
মাধব অপরূপ তোহারি সুনেহ
আপন বিরহে আপন তনু জর-জর
জিবইতে ভেল সন্দেহ।"

বৃন্দাবনের সব কিছু শ্রীমতীর চোখে শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। শ্যাম-স্নিগ্ধ নিকুঞ্জ, সুনীল যমুনা কিছুই আজ আর তাঁহার নয়ন-মনে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। বিদ্যাপতি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার যাদু-স্পর্শে মাত্র কয়েকটি পংক্তিতে কান্ত-বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ও কৃষ্ণ-বিহীন ব্রজপুরের যে মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়াছেন, সাহিত্যে তাহা দুর্লভ।

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কে হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী॥
কৈসে হম যাওব যামুন-তীর।
কৈসে নিহারব কুঞ্জ-কুটীর॥

আর অধিক উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। রসজ্ঞ পাঠক অনুভব করিবেন, ভক্ত পদকর্ত্তাগণের ভাব ধারা কত উচ্চস্তরে উঠিলে এমন পদ রচনা সম্ভব হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র (এম-এ)।

ভেক-কদলী বটিকা

[নক্সা]

ঘরে চাল নাই, চালে খড় নাই, তার উপর খরস্রোতা নদীর স্ফীতি। এতে স্ফূর্ত্তির দম-বন্ধ হয়। কাজেই তুত্তোর ব'লে দাশরথি দেশ ছেড়ে সহরের দিকে রওনা হল। কিছু না হয় ধনী যজমানের প্রাসাদে নারায়ণের প্রসাদ খেয়ে দেহটাকে শুধরে নেবে। রায়েদের বাড়ী ঠাকুরের নিত্য সেবা হয়। তার গ্রাম থেকে সহর বারো মাইল দূরে বড় রাস্তার পথে। মাঠের উপর আল ধরে গেলে মাইল চার পথ কমে। কিন্তু সড়কে খড়ের গাড়ী যায়, মাঝে মাঝে টপ্পর-ছাওয়া। খালি গাড়ীও সহরে ফিরে যায়। তেমন গাড়ী এ-যাত্রা দাশু ভট্টাচার্য্যের ভাগ্যে জুটলো না। মিষ্ট কথা বলে দরদস্তুর ক'রে আঠারো পয়সায় খড়-বোঝাই এক গাড়ীতে সে সোয়ারী হলো। গাড়োয়ানের গো-ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা প্রকটিত হ'ল, যখন সে বলদের ভার কমাবার জন্ম নিজে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে আরম্ভ করলে এবং দাদাঠাকুরকে এক বার তামাক সেজে খাওয়ালে।

বগ্‌লাডাঙ্গার চৌমাথায় ঠিক ভোরের সময় যখন গাড়ী দাঁড়ালো, মাথায় খানিকটে লাল সালু বাঁধা, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি, পায়ের হাঁটু অবধি ধূলা, এক বরকন্দাজ গাড়ী থামালো। বোঝাপড়ার ফলে প্রতীয়মান হল যে, লোকটার অভিপ্রায় অসৎ নয়। সে টিক্‌রার ঘোষাল বাবুদের লোক। বড়মার হুকুম, ভোরের বেলায় পথে যে ব্রাহ্মণকে দেখবে তাকেই ধরে আন্‌তে হবে। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন।

দাশু ঠাকুর বল্লে—কি কাণ্ড বাবা বরকন্দাজ! স্বপ্নের বাকীটুকু যে আমিও দেখেছি। তা চল।

এখনও অর্দ্ধেক পথ বাকী। সে কিন্তু উদার। ক্যাম্বিসের ব্যাগে পয়সা খোঁজবার সময় যখন বরকন্দাজের প্রশ্ন তার কানে গেল, সে বল্লে—সিকি খুঁজছি বাবা। একে দিতে হবে।

সে বড়লোকের ভৃত্য। গিন্নিমার স্বপ্ন-দেখা ব্রাহ্মণকে পথ থেকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। ভাড়া দেবেন ঠাকুর? চার আনা পয়সা মাশুল দিয়ে দাশরথি ভট্টাচার্য্যকে সে খড়ের গাদা থেকে উদ্ধার করলে।

বগ্‌লাডাঙ্গা থেকে টিকরী ক্রোশ খানেক দূরে। কিন্তু বরকন্দাজ বল্লে—দাদাঠাকুর, যদি এখানে একটু বসেন তো আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি।

গ্রামের লোক তাকে বলত ফিচেল দাশু। ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্টর প্রহসনে সে নায়ক হবার মত অল্পবুদ্ধি মানুষ নয়! সে বল্লে—মোড়লের পো, গিন্নিমার স্বপ্নটাকে কি মাটি করতে চাও। তিনি যে কাজের জন্ম আমায় নিয়ে যাচ্ছেন, গাড়ীতে চড়লে সেটি একেবারে বিফল হবে।

সে ভাবলে, স্বপ্নটা একটা খেয়াল। হঠাৎ বদলে গেলে, কিন্তু বরকন্দাজের গাড়ী আন্‌তে যাওয়া হবে অগস্ত্য-যাত্রা। সে শুনেছিল ঘোষাল বাড়ীর পাচকের সুখ্যাতি। আজকের মত তো বিধি মাপালেন, তার পর যা আছে অদৃষ্টে!

মাদারতলায় দোঁয়াযাত্রা করবার সময় দাশু জিজ্ঞাসা করলে, বাবুদের কুশল সমাচার।

—সবই তো জানেন দাদাঠাকুর, ছোট বৌমার রোগের কথা। বড় বড় ডাক্তার বলে, কি জানি কি ছাই অষ্ট্রেলিয়া না কি!

অষ্ট্রেলিয়া! হুঁ! ওঃ! হিষ্টিরিয়া!

কিন্তু কথা কয় কম। কিন্তু একবার তার মুখ খুললে কষ্ট করে শ্রীমুখ বন্ধ করতে হয়। মুখ বন্ধ তো কথার কথা! মানে কথা বন্ধ, কারণ, কিন্তুর দাঁতের পাটি অপেক্ষা ঠোঁট ছোট—মুখ একেবারে বন্ধ হয় না।

সে বল্লে—বড় ঘরের বড় কথা দাদাঠাকুর। ও অষ্ট্রেলিয়াও না, মিরগীও না।

তার পর নাক-কান মলে—কোদাল-কুড়ুল দাঁতে জিভ কামড়ে বল্লে—অপি-দেবতা দাদা ঠাকুর—অপিদেবতা।

হুঁ! ছোট বউকে ভূতে পেয়েছে! কিন্তু গৃহকর্ত্রী তাকে কেন স্বপ্ন দেখে? রোগটা তাহলে দু'পুরুষে!

কিন্তুর কাছ থেকে রোগের লক্ষণগুলো সব সে জেনে নিলে। ছোট বৌঠাকুরাণীর আহারে অরুচি নাই, দেহও লাবণ্য-ভাণ্ড। কেবল মাঝে মাঝে তিনি গাছ-কোমর বেঁধে হুল্লোড় করেন। তার অট্টহাস্তে অট্টালিকা কেঁপে ওঠে। তার কারণ অষ্ট্রেলিয়া বা অপি-দেবতার কারসাজি!

কিন্তুকে ছেঁচে দাশু যখন সকল জ্ঞাতব্য আয়ত্ত করলে, তখন অকস্মাৎ মণ্ডলের আত্মগ্লানি সজাগ হ'ল। সে বল্লে—হেই দাদা-ঠাকুর। বড় ঘরের কথা বুঝলেন, আমরা মুকখু মানুষ।

—জলের মত বুঝেছি বাবা যে তুমি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পাশ করা পণ্ডিত নও। এই যে মুখ দেখছ মোড়লের পো, এ নট নড়ন-চড়ন, নট-কিচ্ছু! একেবারে স্পিকটি নট!

মোটামুটি কিন্তু বুঝলে যে দাদা ঠাকুর তার মনিব-চর্চ্চারূপ অপকর্ম্ম পেটের বাক্সয় তালা-বন্ধ করে রাখবে।

২

দাশরথি ভট্টাচার্য্য সুপুরুষ। কাজ-কর্ম্ম নাই, যজমান-বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে নগদ কিছু প্রাপ্য আছে, নিষ্কর জমি আছে। কথায় আসর জমাতে পারে! আহার, নিদ্রা, পরচর্চ্চা এবং কম-খরচায় দুঃখের ভাত সুখ করে খায়, ফিচেল-দাশু। এ বছর অজন্মায় কত ক্ষণ-জন্মাকে ঘায়েল হতে হয়েছে! তুচ্ছ ভট্টাচার্য্য গরীবের তো কথাই নাই। ঘোষাল-গৃহ যদি বধ্য-ভূমি না হয় তো কিছু একটা সুবিধার প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়—ভাবলে দাশু, যখন সে হাথি-ফটকের মধ্যে প্রবেশ কল্লে।

বড়বাবু ছোটবাবু, উভয়েই বসে ছিলেন বারান্দায়। মার স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা তাদের ভাল লাগেনি। যে রোগ সিবিল সার্জ্জনকে হিম্‌সিম খাওয়াচ্ছে, স্বপ্নে-পাওয়া ব্রাহ্মণ এসে তাকে দেশ-ছাড়া করবে, এ-দুঃস্বপ্ন কেবল জননীরাই দেখতে পারেন। তবে তাদের ভরসা ছিল এই যে, ভোরে বগলাডাঙ্গার চৌমাথায় ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে না। সুতরাং রাধাও নাচবে না, তিন মণ তেলও পুড়বে না। মাতৃ-আজ্ঞাও পালন হবে, বড় ঘরের কথা হাটে-বাজারে প্রসঙ্গেরও বিষয় হবে না!

কিন্তু গোছা-ভরা ধব্‌ধবে পৈতে ঝুলিয়ে মন্থর-গতিতে যখন দাশু ভট্টাচার্য্য তাদের সম্মুখস্থ হয়ে যুগপৎ হর্ষ এবং বিস্ময়ে তাদের অভিভূত করলে—তাইতো এক ব্রাহ্মণ যে সমাসীন! তার আরামের বন্দোবস্ত করে বড়বাবু কিম্নুকে জেরা করলেন—ঠাকুরকে কোথায় পেলি ?

—আজ্ঞা হুজুর, ঠিক চৌ-মাথায়।

—কখন ?

—ঠিক পিত্যুষে।

বড়বাবু তাকালো ছোটবাবুর মুখের দিকে।

ছোটবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখলে দাদাকে। ঠিক্ ঐ রকম চোখ ঠিকরে দাশু দেখলে তাদের জননীকে কিছুক্ষণ পরে।

প্রকৃতিস্থ হয়ে দাশু বল্লে—আশ্চর্য্য মা! লীলাময়ীর লীলা! ওঃ! কি দেখালি মা মহামায়া! সেই মুখ সেই চোখ! ভাগ্যিমানী মা—স্বপ্নে আপনাকে হুবহু দেখেছি! কি কাণ্ড-কারখানা!

কর্ত্রী-ঠাকুরাণী ধীরে ধীরে কথা কন। বল্লেন—বাবা, আমিও স্বপ্নে তোমাকে দেখেছি! হ্যাঁ, এই মুখ-চোখ, তবে আর একটু গৌরবর্ণ।

—খেতে না পেয়ে, রোদে পুড়ে মা আমার রঙটা একটু মাটো হয়েছে।

—আহা, তা হবে বাবা। আর যেন একটু লম্বা।

ফিচেল দাশু যখন কথা কয়, উত্তর তার জিহ্বাগ্রে এসে জোটে।

সে বল্লে—তা যদি বল্লেন মা তো অন্ন খুঁজতে হেঁটে হেঁটে বেঁটে হয়ে গেছি। বড় দুর্দ্দিন মা, গরীবের ছেলের বড় দুর্দ্দিন।

তার পর সে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে মৃদু স্বরে যুক্তপাণি হয়ে বল্লে—অপরাধ নেবেন না মা। স্বপ্ন মিথ্যাই হয়। কি দারুণ স্বপ্ন দেখেছি! বললে পরে—বাবুরা এখনি ঘাড় ধরে বাড়ীর বার করে দেবেন।

তাদের কুতূহল হল। সমস্ত ব্যাপারটার পটভূমি যেন দেবতার একখানা বিশাল হাতের লীলার ছবি!

বড় রমেন্দ্র বল্লে—বলুন না, কি স্বপ্ন দেখেছেন ?

ছোট বিমলেন্দ্র বল্লে—বলুন।

গৃহিণী বল্লেন—এতে আর দোষ কি ? বলুন তা হলে বোঝা যাবে।

তিনি বাকীটুকু বল্লেন না।

দাশরথি বল্লে—মা, বলতে কাঠ মেরে যেতে হয়। আপনাদের নামই শুনেছি। কিন্তু ছোটবাবু কে, তার বৌ-রাণী আছেন কি না, পিছনের বাগানে কাঁটাল-গাছ আছে কি না কিছুই জানি না। এখনও জানি না। কিন্তু মা ভয় হয়—থাক্।

আর এক-দফা অভয়-বাণীর পর সে বল্লে—দেখলাম মা, ঐ কাঁঠাল গাছ থেকে একটা অপদেবতা নেমে মা-লক্ষ্মীর কাঁধে বসলো। তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু মা, সে বাচ্ছা মেয়ে তো। পারে কি মা প্রবল অপদেবতার সঙ্গে যুঝতে ?

রোগের সব লক্ষণগুলো মিলে গেল—যখন সে বাকী স্বপ্নটুকু বিবৃত করলে। এ ঘটনা ঘটেছিল তিন দিন পূর্ব্বে।

—কিন্তু বাবা উপায় ?

—ব্যাপারটা কি মা সত্য ? না, খালি পেটের স্বপ্ন ? পেট গরমের স্বপ্ন নয়, কারণ, পেট শূন্য।

সত্যের খাতিরে ঘোষাল-পরিবারকে রোগ এবং তার লক্ষণের কথা স্বীকার করতে হল।

প্রশ্ন হল প্রতিকারের। স্বপ্নের দেবতা দাশরথিকে চিকিৎসাও শিখিয়েছেন।

৩

ছোট বৌ-রাণী মহামায়ার ব্যারাম বাড়তো এদের আধিক্যতায়। অসুখ করে অনেক তরুণ কুলবধূর। কিন্তু এদের চিকিৎসার ঘটায় তার মাথার ভিতর একটা হেলে সাপ প্রবিষ্ট করতো। সে যখন কিলবিল্ করত, বেচারার মাথা হত গরম! সে ছিল সম্ভ্রান্ত দরিদ্রের কন্যা। এদের যত্নকে সে ভাবতো বড়মানুষী দেখাবার আয়োজন। তা ভাবলেই তার মগজের ঘী ঢেউ খেলত। সারা অঙ্গের অন্তরে মহামায়া একটা শিহরণ উপলব্ধি করত। তার পর সে কি করতো তার মনে থাকতো না! সুস্থ হলে কেবল শুনতো তাদের চিকিৎসার কথা, যত্নের কথা, অর্থব্যয়ের কথা।

অম্বিকা দাসী যখন তাকে চুপি চুপি বল্লে—বৌ-রাণী, তোমাকে দেখতে রোজা এসেছে—সে প্রথমে হাসলে, তার পর কাঁদলে, অবশেষে মাথার ভিতর স্পন্দন অনুভব করলে। তার পর—

—ঐ গো!—বল্লেন গৃহিণী।

অতঃপর দাশরথিকে তৎপর হতে হল।

সে নদীতে স্নান করে তাদের দেওয়া গরদের জোড় পরলে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লাগালে, আঠা মাখিয়ে যজ্ঞোপবীতকে খড়-মড়ে করলে।

একখানা আসনে মহামায়া বসলো। সে তখনও আধা-বিভোর। মাঝে মাঝে চীৎকার করছে। কিন্তু একটু জ্ঞান ফিরেছে ব'লে লজ্জায় আসন ছেড়ে ঘুরতে পারছে না।

তার সামনে একখানা রূপার বড় থালায় একরাশ ফুল, কতক গুলো সরিষা, একটা খোলে। অবশ্য ধূপ-ধূনা জ্বলছিল। একটা ঘণ্টা ছিল থালার ডান দিকে। আর একখানা থালায় ছিল কাটা ফল।

লোকে বলত, দাশু গণ্ডমূর্খ। সেটা অপবাদ। সে লক্ষ্মী-পূজা, শিব-পূজা, সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা প্রভৃতি নানা মন্ত্র জানতো। তার অনুরোধে গৃহিণী দুই পুত্র নিয়ে ঘরের বাহিরে রইলো। তাদের দিকে পিছন করে বসে দাশরথি সব রকম মন্ত্র মিলিয়ে বিড়-বিড় করে, আর মাঝে মাঝে বৌকে টিক্ ক'রে সরষে ছোঁড়ে। তাতে মহামায়া মহা কুপিত হয়ে চীৎকার করতে লাগলো।

তখন ধীরে ধীরে দাশরথি বল্লে,—মা, চেঁচিয়ে কি ফল ? আমার বাপ, পিতামহ কেউ রোজা নয়। ভাল মানুষের মেয়ের মত বলো, সেরে গেছি, কিছু করব না,—আমিও সরে পড়ি।

যখন সে এ কথা বলছিল, তখন বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল। বাহিরে উৎসুক দর্শকেরা কিছু শুনলো না। কিন্তু তার কথায় মহা-মায়ার ক্রোধ দ্বিগুণ হল। সে তার স্বরে চীৎকার করতে লাগলো।

—পাজি, বদমায়েস, দূর হ' জুয়োচ্চোর।

বাহিরে ওরা বুঝলে, কাঁটাল গাছের ভূতের সঙ্গে রোজা ঠাকুরের একটা বোঝাপড়া হচ্ছে।

এবার দাশু চীৎকার করে বল্লে—যাবিনি ? আচ্ছা ন্যাথ তুই ভূতের বেটা ভূত—শাঁক-চুন্নীর বোনপো।

তার পর মুখে ষষ্ঠী পূজার মন্ত্র বিড়-বিড় করতে করতে কাপড়ের

কাঁসির ভিতর থেকে তিনটে ব্যাঙাচি বার করলে। একটা কলা চটকে তার ভিতর ভেক-শিশুদের পূরলে। পূরে তিনটে গোল-গোল বড়ি করলে।

মহামায়া নীরবে এ প্রক্রিয়া দর্শন করলে। আ মোলো! লোকটা পিশাচ-সিদ্ধ। কলার বড়ায় ব্যাঙাচির পুর!

দাশু বল্লে—বৌ-রাণী, মা-লক্ষ্মী, চুপচাপ মাথা ঠাণ্ডা করো তো মঙ্গল। না হলে দুধের অনুপান দিয়ে এই ভেক-কদলী বটিকা সেবন করতে হবে। তার বেগ প্রশমিত হয়েছিল। মহামায়া বুঝলে যে, এ পাষণ্ড যা বলবে শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা এখন তাই করবে।

সে বল্লে, দোহাই বাবা, যা বলবেন করব। ও সব খাওয়াবেন না। ছিঃ! ছিঃ! দোহাই বাবা রোজা কবিরাজ।

—দেখো। কথা রাখবে?

সে জোড় হাত করে বল্লে—হ্যাঁ বাবা। হাতটা একটু ধোও। ব্যাঙ্‌ ঘাঁটলে গরল হয়।

ঘোষাল-পরিবার অভিভূত হ'ল। সে চীৎকার নাই। লক্ষ্মী মেয়ের মত মহামায়া গল্প করছে।

রোজা আর এক ট্যাঁক থেকে একটা কোলা ব্যাঙ্‌ বার করলে; সেটাকে থলিতে পূরলে। বল্লে—ওরা ভাবতো তোমায় ভুতে পেয়েছে। ওদের দেখিয়ে বলবো—সেই ভূত এই থলিতে ধরা পড়েছে। বল, লক্ষ্মী মেয়ে হবে? না ভেক-কদলী বটিকা—

সর্ব্বনাশ! লোকটা একের নম্বরের জালিয়াত! মহামায়া বল্লে—তুমি আমার ধরম বাপ্‌। যা বলবে করব, বাবা! কিন্তু ও ওষুধ নয়।

সে বল্লে—যখন হিষ্টিরিয়ার বেগ আসবে, তখন এই ভেক-কদলী বটিকার কথা মনে করবে। কেমন?

—হ্যাঁ বাবা।

—নাও, একটা খাও। রোগটা একেবারে সেরে যাবে। আচ্ছা, চিনি মাখিয়ে মিষ্টি ক'রে দিচ্ছি।

সে কাতর হয়ে বল্লে—তোমার পায়ে পড়ি বাবা।

দাশরথি এবার ঘোষালদের ডাকলে। তিনটে বড়ী দেখালে।

তারা যখন দেখ্‌লে, ব্যাঙাচীরা একবার শেষ চেষ্টা করলে বাঁধন-মুক্ত হবার! কি কাণ্ড! মন্ত্র-পূত বড়ী নড়ে যে!

দাশু বল্লে—বৌমার ঘাড়ের অপদেবতা এই থলিতে।

সে একটু নাড়া দিলে। কারারুদ্ধ ভেক থলির মধ্যে একটা তুড়িলাফ্‌ দিলে!

ভয়ে সকলে সরে গেল।

আবার তাদের একত্র করে দাশু একটা রূপার পাণের কৌটো আনলে। ভেক-কদলী তার ভেতর পোরবার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করলে—কি বৌমা, ঘাড়ে কিছু নেই তো?

—কিছু নেই বা-বাবা।

দাশু বল্লে—কাজ নেই ছোটবাবু, দাও একটা বড়ী খাইয়ে।

বউ কাকুতি-মিনতি করলে।

দাশু বল্লে—আচ্ছা, এই ওষুধ লোহার সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখবেন। ভূতের লক্ষণ দেখা দিলেই রোগীকে একটা খাইয়ে দেবেন।

রোগী বল্লে—বাবা, এমন কথা কেন বলছেন? ভূত তো থলির ভিতর। আমায় ছেড়ে, আপনার হুকুমে, সুড়্‌-সুড়্‌ ক'রে থলিতে ঢুকেছে।

—আচ্ছা, চল। নিজের হাতে থলি খিড়কীর পুকুরে ফেলবে। থলির ওপর একটা সিঁদুরের স্বস্তিকা আঁকো।

সে মহা লক্ষ্মী মেয়ের মত তা-ই করলে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত (এম-এ, বি-এল)

ডিমের সেন্‌সাস্‌

ব্রহ্মাণ্ডই অণ্ড যখন অখণ্ড এই বিশ্ব,
ডিম্ব এবং বিম্ব লয়েই এই চরাচর দৃশ্য,
হলো সভা রাক্কুসে এক ছায়ার তলে নিম্বের,
অতি ত্বরিৎ করতে হবে সেন্‌সাস্‌ সব ডিম্বের।
যত রকম মুরগী আছে, যত রকম হংস,
পক্ষী, পশু, খেচর ভূচর জলচরের বংশ,
খুঁজতে হবে পগার-পাহাড় বন-বাদাড়ের গর্ত্ত,
নদীর চর ও পাঁকের তলায় রাখতে হবে ফর্দ্দ,
তক্তাপোষের তলার বিবর, পোড়ো-বাড়ীর ভিত্তি,
দলে দলে সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে নিত্যি।
অণুর মত ডিম্ব আছে ঝোপের মাঝে উহ্য,
মাইক্রস্‌কোপ শক্তিশালী সঙ্গে নেবে বুঝছো।
বোজাবে না গর্ত্ত কেহ, কাটবে না কেউ কাঠ,
দেবে নাকো রৌদ্রে চাটাই মাদুর কিম্বা খাট
সকল স্থানে সকল জীবকে জানিয়ে দেবে বেশ,
হচ্ছে আদমসুমারী আর থাকবে নাকো ক্লেশ।
ধরলে পরে ডিম্ব সহ রুই কি ইলিশ মাছ,
ট্যাংরা, কই কি তপসে হতে মৌরলাদি—বাস্‌,
অবিলম্বে করবে হাজির হোক্‌ না যত সের,
সম্মুখেতে মাননীয় স্কোয়াড মাষ্টারের।

তৎপরতার নাইকো সীমা চৌদিকে আশ্বাস
সুলভ হবে ডিম্ব—চলে ডিম্বেরি সেনসাস্‌।
অঙ্কেতে আর কুলায় নাকো, দীর্ঘ দু'মাস পর
সাঙ্গ হল ধুকপুকানি গণকদের সফর।
অনেক হিসাব-নিকাশ করে স্থিরটা হলো ভাই,
ডিম্ব তেমন সুখাদ্য নয়, ডিম্ব বেশী নাই!
ডিম্ব খাওয়া ত্যাগ করিলেই ঘুচবে এ আপদ—
সব সমস্যা সমাধানের এইটি সোজা পথ।
আঙ্‌ুর-ক্ষেতে হাস্‌লো শৃগাল, বার হলো গর্দ্দভ,
ভাবলে, আহা জুটলো কোথায় আত্মীয়েরা সব?
সবাই মিলে সাবাস দিলে—বললে, চমৎকার!
কীর্ত্তি এমন হয়নি এবং হবে নাকো আর!
যুক্তিটাও যেমন সহজ তেমনি যে সরস।
আবিষ্কারে অদ্বিতীয় কৃষ্ণ কলম্বস!
বংশীতে হায় তবু যে চিড়—পায় না তরী কূল,
বাহির হোল তালিকাটায় বেজায় বড় ভুল।
ঘোড়ার ডিমের সংখ্যা লয়ে বাধলো বিসম্বাদ—
এত বড় ডিম্ব পড়ে কোন্‌ কারণে বাদ?
ডিম্ব থেকে ছুটলো ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবা-বৎ—
নেংটি ইন্দুর করলে প্রসব প্রকাণ্ড পর্ব্বত।

কপিঞ্জল।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

২১

উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া পিনাকী এক বার শুধু চাহিল কামাখ্যা সাহেবের দিকে। তার চোখে যেন আগুন জ্বলিতেছে! সে আগুনের সবটুকু বাপের উপর বর্ষণ করিয়া পিনাকী বাহির হইয়া গেল।

অফিসে নিজের কামরায় গেল না, একেবারে বাহিরে চলিয়া গেল। ভাবিল, কিসের জন্য বাপকে সমিহ করিবে?

কামাখ্যা সাহেব বসিয়া রহিল যেন কাঠ! পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বিবেক—ছেলেবেলায় এই যে কথাগুলা শুনিত, অজস্র বুদ্‌বুদের মতো সে কথাগুলা মনের মধ্যে তালগোল পাকাইয়া ফুটিতেছে, পরক্ষণে মিলাইয়া যাইতেছে! এ সবের ভিড়ে অস্থির হইয়া মন এক একবার যেন অস্ফুটে প্রশ্ন করিতেছিল—ওগুলা সত্য? ঐ ধর্ম্মের জয়···অধর্ম্মের পরাজয় বলিয়া যে-কথা শুনা যায়? মনকে তখনি দু'-পায়ে মাড়াইয়া কামাখ্যা সাহেব বলে,—না, না, ও-সব অলসের যুক্তি··· দুর্ব্বলের আশ্বাস!

যে-সব মানুষ কৃতিত্ব লাভ করিতে চায়, তাদের কাছে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপপুণ্য বলিয়া কোনো-কিছু নাই···তাদের আছে শুধু বুদ্ধি আর সে বুদ্ধির চাতুর্য্য-কৌশল! মন বলিল, কিন্তু এই যে তোমার বাড়ীর ছেলেরা এমন···মানুষের মতো হইতে পারিল না···প্রশ্রয়ের কোথায় তাদের অভাব ঘটিয়াছিল? তাদের কি না দিয়াছ···চিরদিন? তবু যে এমন···ইহা তোমার অধর্ম্মের ফল! কামাখ্যা সাহেব বলিল, না, না···কিসের অধর্ম্ম! এত বড় সুযোগ-সুবিধা পাইয়াও ছেলেরা যদি তাহা গ্রহণ করিতে না পারে, তারা নির্ব্বোধ···তাদের বুদ্ধির অভাব!

ব্যাপারটা অফিসে একেবারে গোপন রহিল না। ঘরের মধ্যে অমন রূঢ় ভর্ৎসনা! অফিসের বেয়ারাদের কৌতূহল স্বভাবতঃ একটু বেশী; এবং প্রকাশ্যে যত কুণ্ঠিত ভাবেই তারা মনিবের সম্মান রক্ষা করিয়া চলুক, নেপথ্যে মনিবের দুঃখ-দুর্ব্বিপাকের রসালো বর্ণনায় একেবারে কবির মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে! যা দেখে বা শোনে, তার উপর চতুর্গুণ মিথ্যা রঙ চড়াইয়া দশ জনের সামনে সে ছবি ধরিয়া বাহবা লইয়া কৃতার্থ হয়! বেয়ারা নাথুর মারফৎ এ ব্যাপারের যে বিবরণ অফিসের কামরায়-কামরায় নিমেষে রটিয়া গেল, তাহাতে অফিসের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল!

অফিস হইতে পিনাকী আসিল গৃহে জননী জয়ার কাছে। পীড়নে জয়ার কাছ হইতে দেবকী সস্ত কিছু আদায় করিয়া চলিয়া গিয়াছে! জয়া দারুণ বিরক্তি-ভরে আলমারি বন্ধ করিতেছে···পিনাকী আসিয়া ডাকিল—মা···

জয়া ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া পিনাকীর মুখের যে-চেহারা দেখিল, তাহাতে বুঝিতে বাকী রহিল না, পিনাকী মস্ত কি একটা যেন কীর্ত্তি করিয়া আসিয়াছে!

ধনাঢ্য ঘরের অনেক মায়ের মনেই ছেলেদের মুখের এ-চেহারা গাঁথা আছে! জয়া ছেলের মুখের এ চেহারার মর্ম্ম জানে। জানে বলিয়াই ছেলের ডাকে সাড়া না দিয়া সে আলমারি বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি দিল। চাবি দিয়া চাবির রিঙ-বাঁধা আঁচলটা পিঠে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, পিনাকী পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

জয়া বলিল—সরো···

পিনাকী বলিল—সরবো···একেবারেই সরে যাবো। তবে যাবার আগে দু'টো কথা বলে যেতে চাই!

জয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল—কিন্তু তোমার কথা শোনবার মতো সময় এখন আমার নেই!

রাগে পিনাকী জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—তোমায় শুনতেই হবে। না শুনে এ ঘর থেকে তুমি যেতে পাবে না!

কণ্ঠ নয় যেন আকাশের বাজ!

দু'পা সরিয়া আসিয়া জয়া বলিল—এক মিনিটে তোমার কথা যদি বলে নিতে পারো তো বলো···তার বেশী আর এক সেকেণ্ড সময় আমি দিতে পারবো না!

পিনাকী হাসিল, কহিল,—দেবকী বাবু এসে কাজ গুছিয়ে গেল ···বুঝি?

ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে জয়া চাহিল পিনাকীর পানে; কোনো জবাব দিল না।

পিনাকী বলিল—দেখলুম হাসি-হাসি মুখ···হাতে কি একখানা গহনা! টাকার দরকার হয়েছিল নিশ্চয়···না হলে তিনি ইয়ারদের মজলিশ ছেড়ে এমন সময়ে বাড়ী আসবেন কেন?

জয়া বলিল—হয়েছে তোমার কথা?

পিনাকী বলিল—না,···এ তো সবে কথার উপক্রমণিকা! দায়ে পড়ে সে-দিন তোমার কাছে টাকা চেয়েছিলুম, আমাকে তুমি হাঁকিয়ে দিয়েছিলে! বলেছিলে, তোমার পয়সা-কড়ি নেই! আর এখন দেবকীর বেলায় গহনা বার করে দেওয়া হলো! এর কারণ জানতে পারি?

জয়া বলিল,—গহনা তাকে আমি দিইনি···আমার হাত মুচড়ে ডাকাতি করে দু'গাছা চুড়ি সে খুলে নিয়ে গেল। তাই বাকী চুড়িগুলো খুলে তুলে রেখে দিলুম। হাতে আর চুড়ি নেই···শুধু এই সোনার লোহাগাছটা! বলিয়া পিনাকীর সামনে জয়া নিজের হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল। হাতের মণিবন্ধ সিঁদুরের মতো রাঙা হইয়া আছে···তার উপর কাটা ছড়া দাগ! দেখিলে বুঝা যায়, জোর করিয়া হাতের গহনা খোলা হইয়াছে!

পিনাকী বলিল—জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে! তার মানে, ডাকাতি! রবারি! পুলিশে খবর দাও!

জয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। ক্ষোভে দুঃখে দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল। কোনো মতে জয়া বলিল—নেহাৎ মা, তাই। না হলে পুলিশে দেওয়াই উচিত।

পিনাকী বলিল—ব্রেভো! বাবা কিন্তু এটুকু করতে নারাজ! এইমাত্র বেশ এক-পশলা হয়ে গেছে আমার সঙ্গে। টাকার জন্য বাবা আমাকে জেলে দেবে! সেই পোষাকের টাকা···তোমার কাছে চেয়েছিলুম···দাওনি! ইজ্জৎ রাখতে বাবার চেক জাল করেছিলুম! সে জাল ধরা পড়ে গেছে। বাবা তা জানতে পেরে সাফ্ বলে দেছে, চেক্

জাল করেছো, জেলে যাও···টাকা আমি দেবো না। শুধু মুখের কথা নয়! আমাকে মেরেছে বাবা···চড়! আমার এই গালে!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পিনাকী নিজের বাঁ গালে হাত দিল।

জয়া দেখিল, গালে লাল দাগ। পাঁচ আঙুলের রেখা।

জয়া কিছু বলিল না।

পিনাকী বলিল—নাটক-নভেলের কথা মানলে বলতে হয়, এ চড় যদি ছেলেবেলায় মারতে, তাহলে আজ আর বাপের হাত চড় মেরে ব্যথা! পেতো না! কিন্তু তা যখন হয়নি, আমার এ দুর্গতির জন্য দায়ী বাবা। মানে, ও-চড়ের বদলে ছেলেরও উচিত বাপের গালে চড় মারা। আমি মারিনি···তার কারণ তেমন কুপুত্র আমি সত্যিই নই!···কিন্তু থাক্···এ কথা বলতে আসিনি। আমি বলতে এসেছি, এই ব্যবহার আর চড়ের পর এ বাড়ীতে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি এখান থেকে চলে যাবো। তারি জন্য কিছু টাকা চাইতে এসেছি। কিছু টাকা দাও···শ'খানেক। এ টাকা দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য।

জয়া বলিল—কোথায় যাবে, জানতে পারি?

—তা এখনো ঠিক করিনি।

শ্লেষ-ভরে জয়া কহিল—বৈরাগ্য!

পিনাকী বলিল,—তাও ঠিক করিনি···তবু যদি বলি, বৈরাগ্যই?

জয়া বলিল—বৈরাগ্য নিতে পয়সার দরকার হয় না! শোনো পিনু, যা খুশী তুমি করতে পারো, পয়সা আমি তোমাকে দেবো না···দিতে পারবো না!···যদি ভেবে থাকো আমার মনে করুণা জাগাবে, তাহলে শোনো, বলি—তোমরা সকলে মিলে আমাকে এমন করেছো, যে, আমার মনে স্নেহ দয়া মায়া কিছু আর নেই!···তুমি যদি আমার সামনে পড়ে আত্মঘাতী হও, তাহলেও বোধ হয় আমার প্রাণ তাতে এতটুকু কাতর হবে না।···মিথ্যা তুমি আমার কাছে দরবার করতে এসেছো! চারি দিকে সব দেখে-শুনে মন আমার পাথর হয়ে গেছে! পাথরের কাছে সব প্রত্যাশাই মিথ্যা হয়!

এ কথা বলিয়া জয়া গমনোদ্যত হইল। পিনাকী বলিল—দেবে না টাকা?

জয়া বলিল—না।

—দেবে না?

জয়া বলিল, না। মিছে চোখ রাঙাচ্ছো! তোমার ও চোখ-রাঙানিকে আমি গ্রাহ্য করি না।

জয়া অগ্রসর হইল; পিনাকী জয়ার হাত চাপিয়া ধরিল।

জয়া কহিল—মারবি না কি? মার্···ওটা আর বাকী থাকে কেন?

জয়ার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে! লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে মনে হইতেছিল, পৃথিবী যেন দুলিয়া পায়ের তলা হইতে সরিয়া নীচে নামিয়া চলিয়াছে!

পিনাকী জয়ার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল—না, মারবো না। তেমন কুপুত্র আমি সত্যি নই! তবে···না, তোমার কোনো দোষ নেই। বাবা···বাবাকে তুমি বলো, তাঁর কাছ থেকে যে ব্যবহার আজ পেয়েছি, তাতেই আমার পিতৃঋণ শোধ হয়ে গেছে। আজ থেকে আমি তাঁর ছেলে নই। তাঁর উপর নির্ভর না রাখলেও আমার দিন কোনো মতে কাটবে। নিজের বাপের চেক্ জাল করলেও আমি পরের টাকা ভাঙ্গি না···তাঁর মতো!···মানে, তিনি কোনো অভাবে না পড়েও তোমার ভাইয়ের যে এই সর্ব্বস্ব গাপ করেছেন···আমি তা করিনি। বাপ্‌কা বেটা হয়ে পরের সম্পত্তি থোড়া-থোড়াও লুঠ করে মেরে দিইনি!

কথাগুলো তাতানো লোহার মতো জয়ার দেহ-মন স্পর্শ করিয়া তাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল! জয়ার মুখ পাণ্ডুর বিবর্ণ পাংশু।

পিনাকী বলিল—আমি জানি। রাজীব বলে তোমার জ্যাঠা-মশাইয়ের পুরোনো খানশামা···এ-কথা এখানে অনেকের কাছে সে বলে গেছে। বলে গেছে, সে ছেড়ে কথা কইবে না! দরকার হলে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে বাবার মনিব জানকী বাবুর কাছে না কি সব হাতে-নাতে প্রমাণ করে দেবে! আমিও মরবো না। বাবাকে তুমি এ-কথা বলো মা, বুঝলে? আমাকে তিনি চেক-জালের জন্য চড় মারেন···আমি সে-দিন দেখবো, তাঁর গালখানা কি রকম থাকে!···

জয়ার সহ্য হইল না! রূঢ় ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা যে মানুষ বলে, তুই সে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর! এত বড় তোর আস্পর্দ্ধা হয়েছে, মা-বাপকে তুই করিস্ অপমান!

পিনাকী বলিল—অপমান নয়। ছেলে···তাই সত্য কথা বলে সাবধান করে দিচ্ছি। অপমান করবে এবার দেশের লোক···যাদের তুচ্ছ মনে করে চিরদিন তোমরা পায়ে মাড়িয়ে এসেছো! হুঁঃ! জাষ্ট লাইক্ এ ফিল্ম-ষ্টোরি···হা-হা-হা!

অট্টহাস্যে কথা শেষ করিয়া পিনাকী দাঁড়াইল না···গর্ব্ব-ভরে বাহির হইয়া গেল!

২২

পরের দিন সকালে রামহরি আসিয়া দেখা দিল কামাখ্যা সাহেবের গৃহে।

ফর্দ্দ দেখাইয়া বলিল—বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। এই দেখুন তারা ফর্দ্দ দেছে।

বলিয়া কামাখ্যা সাহেবের সামনে রামহরি মস্ত একখানা ফর্দ্দ রাখিল।

কামাখ্যা সাহেবের মনের অবস্থা শোচনীয়। পিনাকী চলিয়া গিয়াছে···জয়ার মুখে কামাখ্যা সাহেব সব কথাই শুনিয়াছে। শুনিয়াছে, রাজীব এখানে অনেকের কাছে সে-কথা লইয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছে···তার উপর পিনাকীর ঐ শাসনের ভঙ্গী। অফিসে জানকী বাবু কাল পিনাকীর সন্ধান করিয়াছিলেন···কেন, তা বলেন নাই! সে-ডাকের উত্তরে কামাখ্যা সাহেব জানাইয়া দিয়াছে, হঠাৎ তার শরীর খুব খারাপ হইয়াছে বলিয়া কামাখ্যা সাহেব ছুটী দিয়াছে···পিনাকী বাড়ী গিয়াছে! কাল যেন এ কথা বলিয়া নিজের মান রক্ষা করিয়াছে···কিন্তু আজ? পিনাকী বাড়ী নাই। জয়াকে বলিয়া গিয়াছে, এ বাড়ীতে সে আর বাস করিবে না! গেল কোথায়? যে রকম হতভাগা, তার পক্ষে বাপের শত্রুতাচরণ মোটেই অসম্ভব নয়! তাই সকালে উঠিয়া বেয়ারাকে চুপি চুপি বলিয়া দিয়াছে, বড় দাদাবাবুর খোঁজ কর্। খুঁজিয়া যেখানে পাস্, সেখান হইতে তাকে ধরিয়া আনিবি। বলিবি, সাহেব ডাকিতেছেন···জরুরি প্রয়োজন!

টেবিলের উপর অফিসের একরাশ ফাইল···কোনোটা খোলা হয় নাই। বসিয়া বসিয়া কামাখ্যা সাহেব অনেক কথাই ভাবিতেছিল···

পদ-মদ-গর্ব্বভরে যা খুশী করিয়া আসিয়াছে···ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে, সে চিন্তা কখনো মনে জাগে নাই! কখনো মনে হয় নাই, পৃথিবীতে আমরা যা-কিছু করি, সবগুলা মিলিয়া এমন জাল রচিয়া তোলে! মনে হইতেছিল, সে-জালের বাঁধন কামাখ্যা সাহেবকে চারি দিক্ হইতে যেন চাপিয়া কষিয়া বাঁধিয়া ধরিয়াছে··· সে বাঁধনের চাপে দেহ-মন ব্যথায় টন্‌টন্ করিতেছে! এ বাঁধন কাটিয়া নিজেকে মুক্ত করিবার উপায়ও যেন নাই!···কামাখ্যা সাহেবের চিরদিনকার পৃথিবীর কোথায় যেন মস্ত ফাট ধরিয়াছে··· সে ফাটের মধ্য হইতে সহসা যেন রাজ্যের সাপ বাহির হইয়া ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়াছে!

এমনি দুশ্চিন্তা-উদ্বেগের মধ্যে রামহরির উদয়! চোখের সামনে রামহরির ধরিয়া-দেওয়া ফর্দ্দ! ফর্দ্দের রাশি রাশি অক্ষরগুলা কালো পোকার মতো গিজ্‌গিজ্ করিয়া উঠিল! ফর্দ্দ পড়িয়া দেখিবে কি, দুই চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে! কোনো মতে এ পাপ বিদায় করিতে পারিলে বাঁচিয়া যায়, কামাখ্যা সাহেবের মনের ভাব এমনি ধারা!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কত টাকা চাও রামহরি?

বিনয়ে অবনত হইয়া মৃদু হাস্যে রামহরি বলিল—আজ্ঞে, বরাবরই বলছি তো দু'হাজার! আপনিও বলেছেন, দু' হাজার দেবেন!

কামাখ্যা সাহেব আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিল! স্পর্দ্ধা বটে! কহিল—মেয়ের বিয়ের জন্ম ভিক্ষে করে দু'হাজার টাকা মেলে না রামহরি···মেলে বড় জোর দু'-পাঁচশো! তা'ও মানুষ দায়ে নেহাৎ কারে পড়লে! দু'শো টাকা আমি দিচ্ছি···নিয়ে বিদায় হও!

রামহরির বুকের মধ্যে যেন কড়াৎ করিয়া বাজ পড়িল! এখানে দু'হাজার মিলিবে নিশ্চয় জানিয়া মনে-মনে সে রাজ্য গড়িতেছিল। এ দু'হাজারের এক-হাজার খরচ করিয়া বাকীটা···এখন কামাখ্যা সাহেবের কথায় মনের মধ্যকার সে-রাজ্য হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার জো! কোনো মতে সে বলিল,—আজ্ঞে, আপনিও আশা দিয়ে ছিলেন। সেই আশায় নির্ভর রেখে বড় মুখ করে' কথা দিয়েছি··· সব একেবারে পাকা···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—যেমন তোমার সামর্থ্য, এমনি ঘর দেখে মেয়ের বিয়ে দাও গে। তাঁদের বলো গে···ডার্বির স্বপ্ন দেখে কথা দিয়েছিলুম, মশাই···ডার্বির সে ঘোড়া পা মচ্‌কে পড়ে খোঁড়া হয়েছে!

রামহরির চোখের সামনে বিশ্ব-চরাচর যেন লাটিমের মতো ঘুরিতে লাগিল। রামহরি বলিল—কিন্তু আপনি তো জানেন সব···ভালো ঘরে আমার মেয়ের বিয়ে ভাঙ্গলো···কার অপরাধে!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—অপরাধ তোমার! যেমন অবস্থা, তেমনি চালে থাকতে পারোনি! বড়লোকের বখাটে ছেলেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মেয়েকে মিশতে দিয়েছিলে কেন?··· ভেবেছিলে, দাঁও মারবে! পিনাকী বলবে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে···আর আমিও হবো রাজী···এক ফুঁয়ে তোমার কন্যাদায় উদ্ধার হবে! ভুল করেছিলে রামহরি! বড়লোকের ঘরের যে সব বখা ছেলে পরের বাড়ীতে ঢুকে সে-বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায়, সে সব মেয়েকে তারা বিয়ে করে না। বিয়ের কথা তাদের মনে জাগে না! তারা চায়···যাক, ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সে সব কুবাক্য আর মুখে উচ্চারণ করতে চাই-না!···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া কামাখ্যা সাহেব চেকের বই বাহির করিল; এবং দু'শো টাকার একখানা চেক কাটিয়া রামহরির হাতে দিয়া বলিল,—এই দু'শো টাকা···নিয়ে···যাও, চলে যাও! এ টাকাও তোমাকে দেওয়া উচিত নয়···দিলে তোমার মতো যে-সব মেয়ের বাপের মন, তারা প্রশ্রয় পেতে পারে। যাও···তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করবার সময় আমার নেই। নো ননসেন্স, প্লীজ!

কথা শেষ করিয়া কামাখ্যা সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইল। রামহরি যেন কাঠ···চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ দু'শো টাকার চেক লইবে?

একবার ভাবিল, না···

আবার মনে হইল, কেন লইবে না? ছাড়িয়াই বা দিবে কেন? দুরাত্মার কাছ হইতে খেশারতীর যতটুকু পাওয়া যায়··

রামহরি চেক লইল; এবং কামাখ্যা সাহেবের দিকে কুণ্ঠিত একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

রামহরি চলিয়া গেলে কামাখ্যা সাহেব চেয়ারে বসিল। বসিয়া তাড়া-বাঁধা ফাইলের মধ্য হইতে উপরকার ফাইলখানা লইয়া খুলিয়া দেখিল।

চাল্‌শা চা-বাগানের মস্ত ফাইল।

সেখানকার অফিসের সঙ্গে জানকী বাবুর যে সব চিঠিপত্র চলিয়াছিল, সেই সব চিঠিপত্র; তাদের বারো বৎসরের হিসাবের উপর অডিটরের সার্টিফিকেট; রেজিষ্ট্রী-করা এ্যাসাইনমেন্টের দলিল···এবং এ সবের সঙ্গে জানকী বাবুর লেখা হুকুম—দিলীপকে সেখানকার অফিসের চার্জ্জে পাঠানো হইতেছে। কামাখ্যা সাহেব এখানকার অফিস-ম্যানেজার···তার অধীনে দিলীপ কাজ করে···তাই দিলীপকে এ নূতন পদে বাহাল করিতে কামাখ্যা সাহেবের মঞ্জুরী সহি চাই··· অফিসের দস্তুর!

সহি করিতেই হইবে। তার কারণ তারো যিনি মনিব, সেই মনিব এ ব্যবস্থা করিয়াছেন! কামাখ্যা সাহেব মঞ্জুরী নাম-সহি করিল। করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাস ফেলিয়া কামাখ্যা সাহেব চাহিল খোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়া বাহিরের পানে।

মনে হইল···

অনেক কথা মনে হইল···

নিজের প্রথম জীবনের কথা! প্রথম বয়সে সেই ঘনঘোর দারিদ্র্য···অভাবের কি সে পীড়ন! তখন হইতে একমাত্র চিন্তা ছিল, বড় হইয়া দশ জনের এক জন হইবে! মেশের সামনের পথ দিয়া গর্ব্বভরে যারা ঐ জুড়ি হাঁকাইয়া যায়, টাকা-পয়সা লইয়া যারা ছিনিমিনি খেলে, উহাদেরি মতো অমনি করিয়া তারো জুড়ি-গাড়ীর ঘোড়ার পদ-তাড়নায় পথ-ঘাট এক দিন যেন কাঁপিয়া ওঠে! টাকার গদি তৈয়ারী করিয়া সেই গদিতে তাকে বসিতে হইবে!···কোথা দিয়া কি সুযোগই না মিলিয়াছিল!···উমাপ্রসন্নর প্রসন্ন দৃষ্টি-লাভ··· এবং তাহার পরে একটু-একটু করিয়া শুধুই উপরে উঠিয়াছে! নীচের দিকে চাহিবার প্রয়োজন হয় নাই! নীচের কি আছে, কারা আছে, কখনো চাহিয়া দেখে নাই!

হঠাৎ আজ তাকে টানিয়া নীচের দিকে তার দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছে···ঐ রাজীব! নীচের দিকে চাহিবামাত্র উপরের যে-আসনকে কায়েমি ভাবিয়া নির্ব্বিকার ছিল, সে আসন টলমল

করিয়া উঠিয়াছে! এমন টলিতেছে যে, সে-আসনকে উপরে ঠেকাইয়া রাখা দায়!

মনে পড়িল পিনাকীর কথা! জয়ার কাছে পিনাকী যে-সব কথা বলিয়া গিয়াছে···

হতভাগা! বাপের সঙ্গে শত্রুতা সাধিতেছিস্! বাপ যদি যায়, কে দেখিবে তোকে? বাপের মানে তোর মান! এ বুদ্ধি যে-ছেলের ঘটে নাই···

বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, বড় দাদাবাবুর দেখা মিলিয়াছিল ষ্টেশনে। কলিকাতায় চলিয়াছে। অনেক বলা-কহাতেও বাড়ী ফিরিল না। বলিল, কলিকাতায় জরুরি কাজ আছে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—সঙ্গে লগেজপত্র আছে, দেখলি?

বেয়ারা বলিল—একটা সুটকেশ আছে আর বিছানা আছে।

—হুঁ···যা।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

কামাখ্যা সাহেব ভাবিল, কলিকাতায় চলিয়াছে! কার কাছে? রাজীবের কাছে নয় তো? ছাত্র-জীবনে থিয়েটারে দেখিয়াছিল নাটকের অভিনয়···বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি রাজ্য ছাড়িয়া শত্রুর দলে গিয়া যোগ দিয়াছিল···তার পর শত্রুর সঙ্গে ফিরিয়া রাজ্য-জয়ে সিংহাসনে দখল পাইয়াছিল! পিনাকীও তেমনি···

কিন্তু এখানে কি-রাজত্ব জয় করিবে? অফিসে ঢুকানো হইয়াছিল···অফিসের নিয়ম মানিয়া যদি চলিত···একবার জানকী বাবুর নজর পড়িলে পিনাকীর ভবিষ্যৎ কে মারে?

জয়ার কাছে লেকচার দিয়া গিয়াছে, ছেলেবেলায় চড় মারিলে মানুষ হইত!···হতভাগা! নির্ব্বোধ আর কাহাকে বলে!

দু'দিন পরে।

অফিসে কামাখ্যা সাহেবের ঘরে জানকী বাবু আসিলেন। জানকী বাবুর হাতে ডাকে-আসা একখানা চিঠি।

কামাখ্যা সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্মান-অভিবাদন জানাইল। তার পর দু'জনে চেয়ারে বসিল।

হাতের চিঠি কামাখ্যা সাহেবের হাতে দিয়া জানকী বাবু বলিলেন—পিনাকী লিখেছে। এখন পেলুম।

কম্পিত বক্ষে কামাখ্যা সাহেব চিঠি পড়িল। চিঠি পিনাকী লিখিয়াছে কলিকাতা হইতে। লিখিয়াছে, এখানকার অবিচার সহিতে না পারিয়া সে এখানকার কাজে রেজিগনেশন দিতে চায়। তাকে ঠেলিয়া মিস্ত্রী দিলীপকে চালশা অফিসের চার্জ্জ দেওয়া হইল—সুতরাং ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বাসন্তীর সিণ্ডিকেট-অফিসে সে কোনো আশা রাখিতে পারে না। তাকে যে এ্যালাউয়ান্স দেওয়া হয়, তা যেন নেহাৎ কৃপার দান! কামাখ্যা সাহেবের ছেলে বলিয়া কোনো মতে যেন তাকে প্রোভাইড করা···ছেলের হাতে মোয়া দেওয়ার মতো!···সে চায় বড় পোষ্ট···যে-পোষ্টে উন্নতির সম্ভাবনা। তার বয়স হইয়াছে, পয়সার জন্য বাপের কাছে হাত পাতিতে লজ্জা হয়। জানকী বাবু যদি তার সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করেন, তবেই সে বাসন্তীতে ফিরিবে; নচেৎ এখানকার কাজে তার রেজিগ্‌নেশন যেন মঞ্জুর করা হয় ইত্যাদি।

চিঠি শেষ করিয়া কামাখ্যা সাহেব জানকী বাবুর মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না···নত দৃষ্টিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

জানকী বাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন,—এর মধ্যে অনেক কথা আছে। আপনার ছেলে বলেই অফিসে তার চেয়ার। তাকে আমি অনেক বার অনেক রকমে বুঝিয়েছি, কিন্তু···

এ সব কথার সঙ্গে অপ্রীতিকর এত কথা বিজড়িত আছে···তার উপর কামাখ্যা সাহেব আর যাই হোক, তার বুদ্ধি আছে···বিচক্ষণ ব্যক্তি! এবং কামাখ্যা সাহেব জানে, পিনাকীর কি দাম!

বলিল—হতভাগা ছেলে! আমার কাছেও এ নিয়ে অনেক কাঁদুনী গেয়েছে। আমি বলছি, কাজ নিয়ে মানুষের দাম···বাপের খাতিরে অফিসের কাজে কারো দাম কষা হতে পারে না! বলেছি, কাজে তোমার যোগ্যতা আগে দেখাও, তার পর যদি তোমার দাবী অগ্রাহ্য হয় ছ্যাখো, তখন জানিয়ো তোমার নালিশ!

জানকী বাবু বলিলেন—রেজিগ্‌নেশনের কথা···

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কামাখ্যা সাহেব জবাব দিল। বলিল—লিখে দিতে বলুন, রেজিগ্‌নেশন এ্যাকসেপ্টেড!

জানকী বাবু ক্ষণেকের জন্য নীরব রহিলেন। তার পর বলিলেন—ছেলেমানুষ···রক্ত গরম···এ কথা লিখেছে বলে···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—না, না···আমার ছেলে বলে' আপনি তাকে অনেক বেশী চান্স দিয়েছিলেন। আমিও ঢের বুঝিয়েছি···কিন্তু কাজের দাম সে কখনো বুঝবে না! সে বুঝেছে, সেজে-গুজে হুকুম চালানোই হলো কাজের সেরা পরিচয়!···না, না, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি জানি, ও একেবারে অপদার্থ!···অফিস থেকে চলে গেছে, এতে আমার বুকের ভার অনেকখানি হাল্কা হয়েছে! পিনাকী হলো যাকে বলে, অত্যন্ত বেয়াড়া···মানে, মোষ্ট ইরেস্‌পন্সিব্‌ল্!

জানকী বাবু বলিলেন—কিন্তু···

তাঁর স্বরে অনেকখানি সঙ্কোচ।

কামাখ্যা সাহেব বলিলেন—আমরা লাকি যে, উই হ্যাভ্ গট্ রিড্ অফ্ এ ওয়ার্থলেস্ ড্রোন্!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সুজনের মেলে কম-ই সন্ধান

নিমগাছ দিকে-দিকে কতই তো দেখা যায়,
চন্দন-তরু দেখি অল্পই!
পাহাড়ে আর পাথরে তো বসুমতী ভরা হায়,
রত্ন-মণির দেখা পাই কই?

সর্ব্বদা কাণে আসে কাকের-ই তো কা-কা রব,
ক'দিন বা কোকিলের কুহু-তান?
ধরাতলে যত দেখি খলেরি তো উৎসব,—
সুজনের মেলে কম-ই সন্ধান!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বস্ত্র-সমস্যা

অন্নের স্থায় বস্ত্রের সমস্যাও বাঙ্গালার ভদ্র সমাজের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। সরকারের নির্দ্দিষ্ট উচ্চতম দরের অর্থ লোকে ঠিক বুঝিতেছে না। কাপড়ের ও সূতার সর্ব্বোচ্চ দর সরকার বাঁধিয়া দিয়াছেন। ঐ দরও অত্যন্ত অসঙ্গত ভাবে ধার্য্য করা হইয়াছে। ২০ নম্বর সূতার সর্ব্বোচ্চ দর ধার্য্য হইয়াছে প্রতি পাউণ্ড পৌনে ২ টাকা। অথচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলা হইতে যে-সে কলে সূতা প্রস্তুত করিতে হইলেও এখন ১ টাকা ২ আনার অধিক খরচা পড়ে না। সুতরাং কলওয়ালাদের লাভ হইবে প্রতি পাউণ্ড সূতায় দশ আনা,—খরচার উপর প্রায় অর্দ্ধেক লাভ অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকা লাভ। ইহাতে গৃহস্থ খরিদ্দাররা মরিতে বসিয়াছে। পূজার বাজারে বস্ত্রের মূল্য কিছু কমিলে গৃহস্থ-পরিবার লজ্জা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া বাঁচিতেন! কিন্তু আমাদের মুখ চাহিয়া, আমাদের সুখ-দুঃখ বুঝিয়া এ সমস্যার সমাধান কে করিবে? বয়নবোর্ডের সিদ্ধান্তে মিলের মালিকরা আমাদের লজ্জার মূল্যে প্রভূত অর্থ লাভ করিবেন। এবারকার এই মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ফলে মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারবর্গ সকল দিকে পিষ্ট হইতেছে। এ সব ব্যাপার ভ্রান্ত কল্পনায় অনুসৃত নীতির ফল।

—

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

বোম্বাই সহরের নিখিল ভারতীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকের পরিষদে ভারত সরকারের সংবাদ-সরবরাহ এবং প্রচার বিভাগের সদস্য স্যর সুলতান আমেদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "আপনারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যস্ত, আমার বিশ্বাস, আপনারা এখন তাহা পাইয়াছেন। সংবাদপত্রে যাহা ছাপা হয় তাহা পড়িয়া অন্ততঃ আমি তাহাই বুঝিয়াছি। তবে যুদ্ধের সময় সাময়িক ভাবে যে প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতেই আপনারা আপনাদিগকে অতিশয় পীড়িত বোধ করিতেছেন। যুদ্ধের সময়েও এ দেশের সংবাদপত্রগুলি স্বাধীনতা ভোগ করে,—ইহা আপনাদের সহিত আমারও ইচ্ছা। যদি আমি আপনাদিগকে সাহায্য করি,—আপনারাও আমাকে সাহায্য করিবেন।" স্যর সুলতানের মনে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির সম্বন্ধে শুভ বাসনা থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে সংবাদপত্রগুলি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, তাহা যে তিনি দেখিতে পাইতেছেন না, ইহাতেই আমরা বিস্মিত হইয়াছি! স্বাধীনতা অর্থে তিনি কি বুঝেন তাহা আমরা বুঝি না। যদি পাণ হইতে চূণ খসিলেই সংবাদপত্রগুলিকে অভিযুক্ত করা হয়, অথবা তাহাদের গচ্ছিত টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কি সেই স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে? অথচ যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যাহাতে সাহায্য হইতে পারে বা সুবিধা জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতেই প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় সংবাদপত্রই সেরূপ সংবাদ জানিয়া শুনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে ভুলের মার্জ্জনা নাই,—সেখানে স্বাধীনতারও কোন মূল্য নাই।

শিক্ষিত ছাত্রদিগের অজ্ঞতা

যে সকল ছাত্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞতার বিষয় নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় সার মির্জ্জা ইস্মাইল বক্তৃতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যাহারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের অজ্ঞতাও অত্যন্ত ভীষণ। কথাটা খুবই সত্য! কিন্তু সে জন্য দায়ী কে? বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই ত্রুটিযুক্ত যে, উহাতে চৌকোস জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। সেই জন্য এই সকল যুবক কতকগুলি বাঁধা বুলি শিখিয়া আসে,—এবং তাহাই ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচার করে। সেই জ্ঞান লইয়াই ইহারা আপনাদের বাহাদুরী দেখাইতে যায় এবং আপনারা মজে, দেশকেও মজায়। ইহার প্রতিকার কি?

—

সুবর্ণের মূল্য

ইদানীং সুবর্ণের মূল্য লইয়া সর্ব্বত্রই বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। সুবর্ণকে মৌদ্রিক ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করা হইলেও উহা এখনও মূল্যের ধারক হিসাবে লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া আছে। অর্থাৎ সোণা যাহার আছে তাহার পয়সা আছে, এ ধারণা এখনও প্রায় সকলেরই রহিয়াছে। সুতরাং সুবর্ণ কিনিবার জন্য লোকের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। সেই জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে খাঁটি সোণার ভরি এক শত আট টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এখন কমিয়া গিয়াছে। মধ্যে শুনা গিয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩০শে ও ৩১ শ্রাবণ এবং ১লা ভাদ্র পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজার তোলা বিদেশী সুবর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন। তাহার ফলে সুবর্ণ-মূল্য কমিয়াছে। এ দিকে ইংরেজ এবং মার্কিণ মিলিত হইয়া যুদ্ধের পর যে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা প্রচলনের পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহাতে সুবর্ণকে একেবারে মুদ্রার আসন হইতে বিচ্যুত করা হইবে না। সে জন্যও সুবর্ণের সম্মান অনেকটা বজায় আছে। তবে সুবর্ণের মূল্য আরও কমিতে পারে। রূপার মূল্য সুবর্ণের মূল্য-বৃদ্ধি হেতুই বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ভারতীয় মুদ্রা-মূল্যের ধারক হিসাবে যে সুবর্ণ আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সেই জন্য বিদেশে ভারতের যে পাউণ্ড ষ্টার্লিং জমা আছে, তাহা সুবর্ণে পরিণত করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখা আবশ্যক।

—

কলিকাতায় বুভুক্ষুদিগের মৃত্যু

সরকারী বিবরণে জানান হইয়াছে যে, ২৬শে ভাদ্র হইতে ৮ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ৩ হাজার ৪৩১ জন অনশন-শীর্ণ মরণাপন্ন নর নারীকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে ১১৪ জন হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং পুলিশ পথ হইতে ৬৮১ জনের মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় অনশনে মৃত্যুর যে অসম্পূর্ণ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই সময় মধ্যে ২২১৪ জন হতভাগ্য বাঙ্গালীর মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ সকল বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, সরকারী ও

বেসরকারী কোন ব্যবস্থাই মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিতেছে না। কর্পোরেশন হেল্থ কমিটীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কলিকাতার বিভিন্ন শ্মশানে যত মৃতদেহ দাহ করা হইতেছে, তাহার মধ্যে ৬০।৭০ জনই বুভুক্ষু দুঃস্থ ব্যক্তির। শ্মশানে মৃতদেহ প্রত্যহ স্তূপাকারে পড়িয়া পচিতেছে—দাহ করিবার স্থানাভাব! কলিকাতার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ম শ্মশানের প্রসার-বৃদ্ধি ও এই সব মৃতদেহ রাখিবার সুব্যবস্থা হওয়া অচিরে কর্ত্তব্য নয় কি?

—

ভারত সরকারের স্বস্তি-শ্বাস

বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনে সম্প্রতি মিষ্টার এডগার স্নো এক বেতার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—সামরিক দিক্ দিয়া ভারত এখন নিরাপদ, জাপানকে আক্রমণ করিবার সুযোগ এক্ষণে মিত্রপক্ষের মিলিয়াছে, আইন-অমান্ত আন্দোলন দমন করায় ভারত সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সমর-প্রচেষ্টায় বিশেষ কোন বাধা প্রদান করিবার শক্তি আর কংগ্রেসের নাই। ভারত এখন নিরাপদ এবং জাপানকে এখন ঠেলা সামলাইতে হইবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হউক। মিষ্টার স্নো কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন যে, আইন-অমান্ত আন্দোলনের ফলে ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, আন্দোলন প্রদমিত হওয়ায় সে কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্ত্তৃত্ব কিসের? ভারতের সামরিক নিরাপত্তা এবং জাপানকে পাল্টা আক্রমণের সুযোগ-বার্ত্তার সহিত একই নিশ্বাসে আইন-অমান্ত আন্দোলনের নাম উচ্চারিত হইতে দেখিয়া মনে হয়, এ আন্দোলন ভারত সরকারের সমর-প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ণ করিতেছিল। এ আন্দোলনে ভারত সরকারের শক্তি কতটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বা আন্দোলন দমনে সে শক্তি কতটা বাধামুক্ত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা আমরা ভাল করিয়াই জানি যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবীও নীতি, ন্যায় ও সুবিচার-সঙ্গত। এই দাবী পূরণ না করিয়াই যদি ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে সে কর্ত্তৃত্ব স্বাধীনতাকামী ৪০ কোটি ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া,—আটলাণ্টিক চার্টারের গালভরা প্রতিশ্রুতি যে ভারতের জন্ম নয়, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া!

—

রাজাগোপালাচারির সুযোগ সন্ধান

মাদ্রাজের 'হিন্দু'পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদ-দাতার নিকট মিষ্টার এডগার স্নো অভিমত প্রকাশ করেন যে, কতকটা ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবের অনুরূপ কোন প্রস্তাব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নিকট করা হইলে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, পণ্ডিত জওহরলাল এবং মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত হয়ত জাপানের বিরুদ্ধে আসন্ন অভিযানে মিত্রপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিবেন, বৃটিশ প্রচারকের এই কথাটি লুফিয়া লইয়া শ্রীযুত রাজাগোপালাচারি বলিয়াছেন—কথা যথার্থই। এইবার ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলি যদি এক-বাক্যে আপনাদের মত ব্যক্ত করেন, তাহা হইলেই সম্মিলিত জাতিবর্গের রাজনৈতিক কর্ণধারগণ লজ্জায় জিভ কাটিয়া সে দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন? তলে তলে যে শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারি ও তাঁহার নবলব্ধ উদারনৈতিক বন্ধুগণ প্রাদেশিক সচিবত্বের গদী পাইবার জন্ম ইংরেজের শ্রীপদে তৈল নিষেক করিতেছেন, তাহা সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেন্টের এক প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে। ২৫ জন ভারতীয় প্রতিনিধি ঘটকালি করিবার জন্ম বিলাত পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিলেন। ফল যে কিছু ফলে নাই, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন!

—

এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

পার্লামেন্টে ভারত-সচিব বলিয়াছেন—বাঙ্গালা দেশে চাউলের মূল্য কমিয়াছে। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণের পর যে বাঙ্গালা দেশের বাজার হইতে চাউল একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে,—সে সংবাদ ভারত-বিদ্বেষী ভারত-সচিব পান নাই। তিনি তাঁহার দেশের 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশন' পত্রের অভিমত পড়িয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিতেন। 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' লিখিয়াছেন—"কলিকাতার জনসাধারণের অবস্থার যে বিবরণ আমরা পাইতেছি, তাহা যেন মধ্যযুগের মহামারীর কলঙ্ক-কাহিনী। সরকার এই সর্ব্বনাশের প্রতিকারার্থ কি করিয়াছেন? ভারত শাসনের দায়িত্ব আজ প্রকৃত পক্ষে কাহার উপর অর্পিত? বড়লাটের শাসন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ভারতীয় হইলেও তাঁহারা বড়লাটেরই মনোনীত ব্যক্তি। ইঁহাদের কোন দল নাই। প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও অধিকাংশ প্রদেশে এ শাসন অচল। পঞ্জাব ব্যতীত যে সকল প্রদেশ সচিবসঙ্ঘ-নিয়ন্ত্রিত, সে সব প্রদেশেরও সচিবসভা প্রতিনিধি-মূলক নহে। ভারতের দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি দল (মসলেম লীগ) হিন্দুস্থান হইতে মসলেম-প্রধান প্রদেশগুলিকে পৃথক্ করা লইয়া ব্যস্ত; অপর দলের (কংগ্রেসের) সকল নেতাই কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ; সুতরাং অভিমত প্রকাশ সুযোগ-বর্জ্জিত।" ভারতের এহেন পরিস্থিতিতে নিরন্ন, বিপন্ন, মরণাচ্ছন্ন বাঙ্গালা তথা ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য কাহার প্রাণ কাঁদিবে? ইংরেজ সরকার যুদ্ধ লইয়াই ব্যস্ত। ভারতের এই আভ্যন্তরীণ সর্ব্বনাশের প্রতিকার-ভার যাঁহাদিগের উপর, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ শক্তি সমরায়োজনে ব্যাপৃত, সুতরাং ক্ষুধার্ত্ত দেশবাসীকে নিরন্ন দেশবাসীর অকিঞ্চিৎকর সাহায্য পাইয়াই তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

বাঙ্গালার এই নিরন্ন অবস্থা কি দুর্ভিক্ষ? ৭ই আশ্বিন বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার একটি প্রস্তাবে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়া সরকারকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণকে অন্নদান করিবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবটি অবশ্য নাজিমুদ্দীন-সুরাবর্দ্দী কোম্পানীর ভোট-প্রাবল্যে অগ্রাহ্য হয়। খাদ্য বিভাগের সচিব সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ হয় নাই, চাউলের মূল্য একটু বাড়িয়াছে মাত্র! নিরন্ন বাঙ্গালীর ছিন্ন ঝুলি হইতে তাহাদের শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া যাহারা মোটা বেতনভোগী মনসবদার হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট তণ্ডুলের ৮।১০ গুণ মূল্য বৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, কিন্তু যাহারা শেষ সম্বলটুকুও সরকারের কোষাগারে সেলামী দেয়, তাহাদিগের অন্নাভাব নিশ্চয় অকিঞ্চিৎকর নয়। সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, সার জগদীশপ্রসাদ, বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ, মার্কিণ সাংবাদিকগণ সকলেই বাঙ্গালার অবস্থাকে দুর্ভিক্ষই আখ্যা দিতেছেন। সরকারী ফেমিন কোডে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ এই:—(১) খাদ্য-পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধি; (২) খাদ্য-শস্য

ব্যবসায়ে অতিরিক্ত চাঞ্চল্য; (৩) লোকের স্থান-ত্যাগের আধিক্য; (৪) অস্বাভাবিক ভাবে জনতার ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা; (৫) ভিক্ষার অভাবে স্থানীয় ভিক্ষুকদিগের দূর-দূরান্তরে গমন; (৬) সমাজের আভ্যন্তরীণ চাঞ্চল্যে অপরাধের সংখ্যা-বৃদ্ধি। খাদ্য-সচিব সুরাবর্দ্দী বোধ হয় এ সকল কেতাবের পৃষ্ঠাও উল্টান নাই! রাজনৈতিক ধুরন্ধর অবাঙ্গালী জিন্না এবং অর্থনৈতিক রসদ্দার অবাঙ্গালী ইস্পাহানী কোম্পানী এবং নিজস্ব বাঙ্গালী বৃত্তি, বুদ্ধি, সমাজিকতা ও স্বদেশিকতার অভাব না হইলে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর এমন সর্ব্বনাশে নির্ম্মম উপহাস করিতেন না!

হিন্দুরাই মরিতেছে

দুর্ভিক্ষের তাড়নে ও প্রহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রায় এক লক্ষ নর-নারী কলিকাতার গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে 'অন্ন দাও অন্ন দাও' করিয়া ফিরিতেছে। বেসরকারী ও সরকারী অন্ন-বিতরণের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নয়। ফলে কলিকাতায় গড়ে অন্ততঃ প্রত্যহ ১ শত জনের মৃত্যু হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগ এ সকল নিরন্ন নরনারী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, নিমতলা, শিয়ালদহ, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হাওড়ার পুলের সমীপবর্ত্তী অঞ্চল ও বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানের প্রায় ৫ শত অনশনক্লিষ্ট পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ৫ শত পরিবারে লোকসংখ্যা ১৫৬৬ জন অর্থাৎ প্রতি পরিবারে—৩.১ জন। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৭১.১ জন ২৪ পরগণা, শতকরা ৯.৫ জন মেদিনীপুর, ৩.৭ জন নদীয়া, ২.৫ জন হুগলী, ২.৪ জন হাওড়া এবং ১.১ জন বর্দ্ধমান জিলার অধিবাসী। ইহাদিগের মধ্যে তপশীলভুক্ত হিন্দুদিগের সংখ্যা শতকরা ৫২.৭ জন, মুসলমান ৩০.১ জন, বর্ণ-হিন্দু ১৫.৪ জন, খৃষ্টান ১ জন। বিপন্নদিগের মধ্যে শতকরা ৫৫.৭ জন স্ত্রীলোক, ৪৪.৩ জন হিন্দু; পূর্ণবয়স্ক শতকরা ৪১.৬, বালক-বালিকা ২৭.৭, শিশু ২৬.৩ এবং বৃদ্ধ ৪.৪ জন। কলিকাতায় সমাগত অন্নহীনদিগের মধ্যে শতকরা ৭২.৭ জন কৃষিজীবী, ২.৪ জন মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র দোকানদার শতকরা ৭ জন, ভিক্ষুক ৬.৬ জন, অন্যান্য ১০.৭ জন। অন্নের অভাবে হিন্দুরাই কেন বেশী মরিতেছে, হিন্দুরাই কেন অধিক বিপন্ন, ইহা হিন্দু সমাজের কল্যাণকামী সকলেরই সন্ধান করা কর্ত্তব্য।

অনাচারের অভিযোগ

গত ২৩শে ভাদ্র লাহোর হইতে এই মর্ম্মে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়—"জানা গিয়াছে, বাঙ্গালা সরকার কেনা দর অপেক্ষা বেশী দরে বাঙ্গালায় গম বিক্রয় করিয়া লাভ করিতেছেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে ভারত সরকার তদন্ত-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।" লাহোরে এক সাংবাদিক-বৈঠকে সার জগদীশপ্রসাদ শ্রীবাস্তব "কোন প্রাদেশিক সরকারের" বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং ভারত সরকারের তদন্তের কথা ব্যক্ত করেন। ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয় পরিষদের অধিবেশনে খাদ্য-সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী স্বীকার করেন যে, বাহির হইতে যে গম আমদানী করা হইয়াছে, তাহার উপর সরকার কিছু লাভ করিয়াছেন। পঞ্জাবের সচিব স্যর ছোটু রাম এবং ফুড্-কনট্রোলার সার কলিন গার্বেটের হিসাবে এই লাভের পরিমাণ চল্লিশ লক্ষ টাকা। এই অভিযোগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সরকারের এক অর্ডিনান্সে আটা-ময়দার দাম সহসা কমিয়া আটা ৵১০ সের এবং ময়দা ।১০ সের দরে বিক্রয় হইতেছে। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বাঙ্গালার ব্যাপার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—কণ্ট্রোলের উপর কণ্ট্রোল বাড়িয়াছে। জাতিগত, সম্প্রদায়গত এবং নানা ভাবে অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ এজেণ্ট ও দালাল নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃত্রিম উপায়ে পণ্য-মূল্য বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও এ বিষয়ে তদন্তের জন্য নিরপেক্ষ এক ট্রাইবুনাল গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালার খাদ্যসঙ্কট-সম্পর্কে বিতর্ক-কালে বাঙ্গালা সরকারের অব্যবস্থার অনেক কাহিনী প্রকাশ পায়। ১০ই আশ্বিনের অধিবেশনে ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক সরকারের খাদ্যাভিযানের পরও ঘাটাল মহকুমা হইতে নৌকা-বোঝাই ধান্য বাহিরে চালান যাইতেছে এরূপ ফটো স্পীকারের নিকট দাখিল করেন। মিঃ ফজলুল হক—ইস্পাহানী কোম্পানীকে খাদ্যশস্য ক্রয়ের একচেটিয়া এজেন্সী দিবার জন্য বাঙ্গালা সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে সচিবসঙ্ঘ দোষী। ৮ই আশ্বিন পরিষদের অধিবেশনে বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিভাগের এক এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর গ্রেপ্তারের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষি-সচিব বলেন যে, বিতরণের উদ্দেশ্যে বীজ ক্রয়ের জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। এই বিতরণ সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মচারীটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কি না, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা অবগত হইয়াছেন যে, বাঙ্গালা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য সার গুথরি রাসেলের সভাপতিত্বে এক ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছে। এই ট্রাইবুনালে পঞ্জাবের এক জন এবং বাঙ্গালার এক জন বিচারক থাকিবেন। শুনা যাইতেছে, কেন্দ্রী সরকারের বাণিজ্য বিভাগের মিঃ এস এন রায়, লেবার ডিপার্টমেণ্টের মিঃ বি এল মজুমদার, সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের মিষ্টার সাইমনস্ এবং অপর পাঁচ জন আই-সি-এসকে অবিলম্বে বাঙ্গালায় আনয়ন করা হইবে।

বাঙ্গালায় প্রত্যহ ২ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হইলেও সে সকল শস্য কি ভাবে ব্যয় করা হইতেছে, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ বাঙ্গালা সরকার না কি কেন্দ্রী সরকারকে প্রদান করিতে পারিতেছেন না। আমরা ট্রাইবুনালের তদন্ত-ফলের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

মনুষ্যত্বের খাতিরেও এ সকল অনাচারের অবসান হওয়া আবশ্যক। বিপন্ন স্বজন ও স্বদেশবাসীর মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া শকুনি-বৃত্তি অবলম্বন সর্ব্বদা নিন্দনীয়। অভিযোগ যখন ব্যাপক, তখন সরকার নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণ কোন মতেই তুষ্ট হইতে পারে না।

পুলিসের গুলীতে হতাহতের হিসাব

১১ই আশ্বিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে কারারুদ্ধ সদস্য শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে সার নাজিমুদ্দীন জানান যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট হইতে ৩০শে নভেম্বর (৩ মাস ২৪ দিনে) মধ্যে বাঙ্গালায় পুলিসের গুলীবর্ষণে ৮৮ জন নিহত ও ৪৫৩ জন আহত হয়; কলিকাতায় ২০ জন নিহত ও ২৩৪ জন আহত; মেদিনীপুরে ৪৫ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। যে সকল স্থানে সৈন্যগণ গুলী চালায়, সে সকল স্থানের হতাহতের তালিকা দেওয়া হয় নাই। যাহারা নিহত ও আহত হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই দোষী, এ কথা খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলেন নাই এবং ইহাও ব্যক্ত করেন নাই যে, কোন নিরপরাধ ব্যক্তি হতাহত হইলে সরকার তাহাদিগকে বা তাহাদিগের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াছেন কি না!

বাঙ্গালার বাজেট—১৯৪৩-৪৪

১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা সরকারের বাজেটের কথা দেশবাসী বহু কাল মনে রাখিবে। গভর্ণর সার জন হার্বার্টের কৃপায় গত এপ্রিলে বাজেট সরাসরি ভাবে গৃহীত হয়। তবু নাজিমুদ্দীন সচিব-সঙ্ঘ দলগত ভোটের জোরে উহা পাশ করাইয়া লইয়া ইজ্জত রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। অর্থ-সচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী এ বৎসরের বাজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের বহর দেখাইয়া আপনার স্বভাব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এবং ঘাটতি পূরণের জন্য কৃষি-আয়-কর স্থাপন ও ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। বাজেটে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় আলোচ্য অভাব অনটনের বৎসরেও—১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ব্যয়-বৃদ্ধির বহর এইরূপ—

১। রাজস্ব—১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।
২। খাদ্যশস্য বিক্রয়ের লোকসান—সাড়ে তিন কোটি টাকা।
৩। দুর্ভিক্ষে সাহায্য—৩ কোটি টাকা।
৪। কৃষি—৬৬ লক্ষ টাকা।
৫। পূর্ত্ত—৫৫ লক্ষ টাকা।
৬। পুলিস—২৭ লক্ষ টাকা।
৭। সেচ—১১ লক্ষ টাকা।
৮। সুদ—১৫ লক্ষ টাকা।
৯। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ—৩১ লক্ষ টাকা।
১০। কলিকাতা কর্পোরেশনে সাহায্য—সাড়ে দশ লক্ষ টাকা।

কৃষিখাতে ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ, "আরও খাদ্য-শস্যের চাষ কর" আন্দোলন। গত বৎসর এ আন্দোলন ২১ লক্ষ টাকা গ্রাস করে, আলোচ্য বৎসরে ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। পুলিশ বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধির কারণ অতিরিক্ত ভাতা, সিভিক-গার্ড প্রভৃতির জন্য। অর্থ-সচিব কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—৭ কোটি টাকার ঘাটতি অভিনব। গত বৎসর সরকারী তহবিলে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা জমা ছিল। প্রাদেশিক সরকারের আয়ের সহিত ব্যয়ের পার্থক্য এত অধিক হইতেছে যে, আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইতেছি। মনুষ্যকৃত এবং প্রকৃতিকৃত কার্য্যের ফলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। অর্থ-সচিবের অর্থনীতিক বিচক্ষণতার কোন পরিচয় বাঙ্গালা দেশ পূর্ব্বে কখন পায় নাই। সুতরাং মনে হইতেছে, সরকারী দপ্তরের মামুলি নীতি অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। অবশ্য এ কথা তিনি সরল ভাবে স্বীকার করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া মরণাহত বাঙ্গালার এই অতি দুর্দ্দিনে, ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাবের তিনি বাজেট সমর্থন করিয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ইতিহাস শ্রীযুত তুলসীচন্দ্রের মত বিদ্বানের যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' পাঠ করিতে বলি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-কালের রাজস্ব-সচিব রেজা খাঁ যে এ কালের শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামিরূপে বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা আমরা মনে করি না। মহম্মদ রেজা খাঁ সরফরাজ হইবার আশায় শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গালাকে শ্মশান করিয়াছিল! আজ কোন্ পদ-লিপ্সায় বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাজস্ব-সচিব ব্যয় বৃদ্ধি, কর বৃদ্ধি ও ঋণের বহর দেখাইয়া পুনরায় বাঙ্গালাকে শিবা-শকুনির লীলা-স্থল করিতে চাহেন, জানিতে পারি কি?

রেশনিং-ব্যবস্থা

কলিকাতায় এবং সহরগুলীতে পরিবার-প্রতি নির্দিষ্ট হারে খাদ্য বণ্টনের সুব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল না। অবশ্য এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সরকারের খাদ্যবিভাগ বিবৃতি ও ইস্তাহারের বহুবিধ পাঁয়তাড়া ভাঁজিতেছেন। দুই একটি মহল্লায় "কণ্ট্রোল' দরে" চাউল, আটা, চিনি দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা যাহারা মধ্যরাত্রি হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে তাহাদিগের জন্য। মধ্যবিত্ত পরিবারবর্গ, ভদ্র-মহিলা ও বিশেষতঃ যাঁহারা প্রাতে কার্য্যস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। জ্বালানী কয়লা পাওয়া যায় না, ময়দা, চিনি বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভদ্রজনের খাদ্য চাউল একসঙ্গে আধ মণ কোন দোকানে মিলে না। সরিষার তৈল, কেরোসিন তৈল পয়সা দিয়াও কিনিতে পাওয়া যাইতেছে না। বস্ত্র-সমস্যা ক্রমেই অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। 'গবর্ণমেণ্ট ষ্টোর্স' সাইনবোর্ড স্থানে স্থানে টাঙ্গানো হইলেও সে সকল "ষ্টোরে" এ পর্য্যন্ত কোন পণ্য আমদানী হয় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পুরাতন এ-আর-পি স্লিপের পরিবর্ত্তন করিয়া যে নূতন রেশন-স্লিপ দিবার কথা ঘোষিত হইয়াছিল, তাহাও সকল মহল্লায় কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ইহার পর ৫ই আশ্বিনের নূতন আদেশ অনুসারে তথ্য সংগ্রহের আয়োজন এখনও করা হয় নাই। পরিবার-হিসাবে এক দফা যে রেশন-স্লিপ দেওয়া হইয়াছিল, ষ্টোর্সে পণ্য না আসায় অনেকেরই পক্ষে তাহাতে আহার্য্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ইহার উপর মাথা-প্রতি গুণতির ব্যবস্থা করিয়া সুব্যবস্থা করিতে আরও যে কত কাল ব্যয় হইবে তাহা কে জানে! ইহা ধাপ্পাবাজির নামান্তর! রেশনিং কণ্ট্রোলার ও এ-আর-পি সার্ভিসের ওয়ার্ডেন্স শাখার কর্ম্মচারীদিগের কিন্তু নিয়মিত বেতন প্রাপ্তির এতটুকু ব্যাঘাত ঘটিতেছে না।

লর্ড হালিফাক্সের উপহাস

সম্প্রতি লর্ড হালিফাক্স (ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট) আমেরিকার 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিনে' লিখিয়াছেন—যাঁহারা বলিয়া থাকেন, "ভারতে অশান্তি ও বিদ্রোহ বিরাজ করিতেছে, তাঁহারা নিজেরাই এ প্রশ্নের উত্তর দিন যে, মাত্র কয়েক হাজার ইংরেজ বেসামরিক লোক এবং ৬০ হাজার ইংরেজ সৈন্য কি করিয়া ৪০ কোটি নরনারীকে তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরাধীন রাখিতে পারে?" ইহার উত্তর ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাল ভাবেই পাওয়া যায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতাক্ষুণ্ণকারী যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা গত আড়াই শত বৎসর ভারতে প্রবর্ত্তিত, প্রসারিত ও কার্য্যকরী করা হইয়াছে, সেগুলিই ভারতের বৃত্তিভোগী এই ভূতপূর্ব্ব বড়লাটটির শ্লেষ প্রশ্নের উত্তর দিবে! কোন্ থার্ম্মোমিটার দিয়া লর্ড হালিফাক্স ভারতবাসীর ইচ্ছার পরিমাপ করিলেন?

পাকিস্থানের অর্থনীতিক সুবিধা

"ফরেন য্যাফেয়ার্স" পত্রে জনৈক মার্কিণ অধ্যাপক পাকিস্থানের অর্থনীতিক অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিলে হিন্দুস্থানেই বেশীর ভাগ কয়লা ও কাঁচা মাল থাকিবে, পাকিস্থান পাইবে মাত্র তৈল। ইহাতে বাঙ্গালার শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করা হইলে হিন্দু-রাষ্ট্র বিশেষ সম্পন্ন হইবে এবং মসলেম রাষ্ট্র অত্যন্ত দরিদ্র হইবে। প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ কয়লা, ৯২ ভাগ কাঁচা মাল বেশীর ভাগ কাঁচা লৌহ ও আনুষঙ্গিক খনিজ দ্রব্য হিন্দুস্থান পাইবে।" কিন্তু মার্কিণ অধ্যাপক ভুল করিয়াছেন। পাকিস্থান গাছে না উঠিতেই যখন মসলেম লীগের পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী পাণ্ডারা অনেক কাঁদি লাভ করিয়াছেন—উজিরী—নকরি—সরকারী খাদ্য বিভাগের একচেটিয়া দালালী, তখন পাকিস্থান শিমুল বৃক্ষে আরোহণ করিতে সমর্থ হইলে অনেক কিংশুকই তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন!

বৃটেন ও আমেরিকা চঞ্চল

বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় এদেশী শাসকগণ কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। ভারতের বড়লাট ওয়াভেল বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় এ পর্য্যন্ত সহানুভূতির একটি বাণীও উচ্চারণ করেন নাই। বৃটেন তথা আমেরিকার বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলি বাঙ্গালার এই দুরবস্থায় সামরিক দুর্ব্বলতার আভাস পাইয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্র লিখিয়াছেন—বাঙ্গালার এই দুরবস্থার অবসান করিতে না পারিলে তাহাতে যে মাত্র বৃটিশ ও ভারতীয় রাজ-পুরুষদিগেরই অক্ষমতা প্রকাশ পাইবে, তাহা নয়, উহাতে সমর-প্রচেষ্টারও প্রভূত ক্ষতি হইবে। কারণ, বাঙ্গালাকে শীঘ্রই এশিয়ার সামরিক কার্য্য-কলাপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। "বিলাতের 'নিউজ ক্রনিকল', "ডেলী হেরাল্ড" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রগুলি বাঙ্গালাকে শীঘ্র রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহের ভারতস্থিত প্রতিনিধিগণ এদেশের দুর্দ্দশার বিবরণ প্রচার করিতেছেন। আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক পোষ্ট' লিখিয়াছেন—"ভারতে লক্ষ লক্ষ নর-নারী অনশনক্লিষ্ট। ব্রহ্মদেশ জয় না করিলেই নয়।" শিকাগো 'ডেলী নিউজের' সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"এখানেও বিপন্নদিগের সাহায্য-ব্যবস্থা মন্থর ও অকিঞ্চিৎকর। এখানে নারী ও শিশুরাই অধিকতর ক্লিষ্ট। দুর্দ্দশা হ্রাসের জন্য অতি বিলম্বে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য মিলিতেছে।" কলিকাতার মেয়রের আবেদন সম্বন্ধে মার্কিণ সরকার যে ভাবে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় রিলিফ কর্ম্মচারীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এই সঙ্গে মার্কিণ সাংবাদিকগণ ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শনের পরামর্শ দিয়াছেন। মার্কিণ 'লাইফ' পত্রে মিষ্টার জন জেসাপ লিখিয়াছেন—ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রতি অবিশ্বাস-ভাব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ভারতীয় সমস্যার মূল কথা, এই অবিশ্বাস। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা যে এই অবিশ্বাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তাহার কারণ, ফিলিপাইনসে মার্কিণ সাম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত নগণ্য; এবং আমেরিকা ফিলিপাইনসকে স্বাধীনতা দানের আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল বলিয়া প্রাচ্যবাসীর নিকট এখনও মর্য্যাদা পাইতেছে। প্রাচ্য দেশবাসীরা আজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমান অধিকার পাইবার দাবী করে। এশিয়ার এই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আগ্রহের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে কোন শ্বেতাঙ্গ জাতি এশিয়ায় আর মর্য্যাদা পাইবে না। এশিয়া সম্বন্ধে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি ইহাই হওয়া কর্ত্তব্য। আমেরিকা এই নীতি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিলে বৃটেনকেও এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। বাঙ্গালার এই সঙ্কট-সমস্যার প্রসঙ্গে আমেরিকা বলিতেছে, বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যার মীমাংসাই শুধু নয়—ভারতের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া আমেরিকা সে দাবী পূরণ করিতে ব্যগ্র,—সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন কি ইহাতে সম্মত হইবে?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলন

২রা আশ্বিন রামমোহন লাইব্রেরী-হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃতি সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে প্রবীণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ, সাংখ্যতীর্থ সুচিন্তিত অভিভাষণ-প্রসঙ্গে বলেন,—"জাতিই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের সংস্কৃতি-রক্ষাকল্পে আমাদিগকে সমগ্র ভাবে জাতির সেবায় ও রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ঔষধ ও পথ্য বিষয়ে আমাদিগের ঘৃণিত পরমুখাপেক্ষিতা, অমার্জ্জনীয় নিশ্চেষ্টতা এবং অধিকাংশ দেশবাসীর আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অভাব।"

কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-ডি ত্রিদোষতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীন চিকিৎসক শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস তাঁহার বক্তৃতায় অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ষড়্দর্শনতীর্থ, শচীন্দ্রনাথ সার্ব্বভৌম, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও সভাপতি মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। বৈদেশিক ঔষধ আজ যখন দুষ্প্রাপ্য, তখন কবিরাজ মহাশয়েরা যদি বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রকরণ মতে ঔষধাদি প্রস্তুত-করণে অধ্যবসায়ী হন, তাহা হইলে লোকে শুধু আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্যই উপলব্ধি করিবে না, রোগে সুলভে ঔষধ পাইয়া অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত